৭ বছর পর বাড়ি ফিরছে খান বংশের বড় ছেলে

#সাজ্জাদুল_খান_আবির । বাড়ি ফিরছে বললে ভুল হবে বিদেশ থেকে দেশে ফিরছে আবির। এই ৭ বছরে খান বাড়িতে ঘটে গেছে অনেক ঘটনা যার সাথে স্ব শরীরে যুক্ত নেই আবির, তবে আত্মিকভাবে প্রতিটা ঘটনায় জরিয়ে আছে সে। আবিরের বাবা চাচা তিনজন, আবিরের বাবা সবার বড় নাম,'আলী আহমদ খান' তানভীরের বাবা মেজো নাম, 'মোজাম্মেল খান' ছোট চাচ্চুর নাম ' ইকবাল খান' আবির তার বাবা মায়ের একমাত্র ছেলে। মেজো চাচা মানে মোজাম্মেল খানের এক ছেলে এক মেয়ে। ছেলের নাম #তানভির_খান। মেয়ের নাম #মাহদিবা_খান_মেঘ ছোট চাচার এক মেয়ে এক ছেলে মীম আর আদি। এখনো তারা এলাকার যৌথ পরিবারগুলোর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। বাড়ির সকলের প্রাণ যেনো এক সুতোয় বাঁধা । ৫ ভাইবোনের মধ্যে আবির সকলের চোখের মনি। আবিরের জন্মের পর তার বাবা মা দ্বিতীয় সন্তান নেওয়ায় চিন্তায় করেন নি। HSC পর্যন্ত সে বাড়িতেই ছিল সবার নয়নের মনি। আবিরের চাঞ্চল্যে মেতে থাকতো খান বাড়ি। আচমকা যেনো পরিবেশটা পাল্টে গিয়েছিল। ১৮ বছর বয়সে আবিরের হঠাৎ করে স্কলারশিপে বিদেশে পড়তে যাওয়া, বাড়ির সকলের সাথে শারীরিক ভাবে যেমন দূরত্ব বেড়েছিল। তেমনি দূরত্ব বেড়েছে মানসিকতার।

আমৃত্যু ভালোবাসি তোকে এখান থেকে বাকিটা শুরু ;

৭ বছর পূর্বের আবিরের সাথে বর্তমান আবিরের আকাশ পাতাল পার্থক্য। দেখেও যেনো চেনার উপায় নেই। ৬ ফুট লম্বা ছেলেটা গায়ের রঙ শ্যামলা, গাল ভর্তি ছাপ দাঁড়ি, চুলের স্টাইল কোনো নায়কের থেকে কম না তার ফ্যাশন আর লুকে যেকোনো মেয়ে এক দেখাতেই প্রেমে পরতে বাধ্য। প্লেনে বসে আবির অবলীলায় ভেবে যাচ্ছে অতীতে ফেলে আসা স্মৃতি গুলো। সেই চাঞ্চল্যকর মুহুর্তগুলো এখন শুধুই স্মৃতির পাতায়। মা কে রেখে এসেছিল সেই যৌবনের প্রথম দিকে যখন তার বয়স ছিল ১৮ । সেই সময়ে মা ই ছিল তার একমাত্র বন্ধু। আজ সে ২৪ বছরের যুবক। এতগুলো বছরের একটা দিনও বাদ যায় নি যে মায়ের সাথে ফোনে কথা বলে নি সে। বাড়ির সকলের সাথেই মোটামুটি কথা বলার চেষ্টা করেছে। ছোটবেলার স্মৃতি গুলো ভাবতে ভাবতে নিজের দেশে পৌছে গিয়েছে আবির। এয়ারপোর্টে আবিরের বাবা 'আলী আহমদ খান' আর তানভীর দাঁড়িয়ে আছে। তানভীর সম্পর্কে তার চাচাতো ভাই আর বয়সে ২ বছরের ছোট কিন্তু দুজন দুজনের বেস্ট ফ্রেন্ড আর কলিজার বন্ধু । তানভীর আবিরকে দেখেই দৌড়ে এসে জরিয়ে ধরলো। এই ৭ বছরে একবারের জন্য ও বাড়ি ফেরেনি আবির। তবে প্রতিনিয়ত কথা হয় আবির তানভীরের। আবির

তার আব্বুকে সালাম করে জরিয়ে ধরে। তারপর বাড়ি ফিরে তিনজন। বাড়িতে যেনো হৈহৈ রৈরৈ ব্যাপার । হবে নাই বা কেন বাড়ির বড় ছেলে এত বছর পর বাড়ি ফিরছে। রান্নাঘরে বাহারি রকমের রান্নার ধুম পরেছেন মা চাচিদের। হঠাৎ দরজায় আবিরকে দেখে সবার মধ্যে হৈচৈ শুরু হয়ে গেছে। আবিরের আম্মু দৌড়ে এসে জরিয়ে ধরলেন ছেলেকে। আবেগাপ্লুত হয়ে মাকে জরিয়ে ধরলো আবির। মমতাময়ী মাকে সেই ৭ বছর আগে ছুঁয়েছিল আজ এত বছর পর মায়ের ছোঁয়া পেলো আবির। মা চাচিদের সালাম করলো। সোফায় বসিয়ে ছেলেকে একের পর এক শরবত নাস্তা দিতে ব্যস্ত সবাই। এরিমধ্যে উদয় হলো মীম আর আদির। মিমের বয়স ১৪ বছর। তার ছোটভাই আদির বয়স মাত্র ১০ বছর। আদিই এই বাড়ির সবচেয়ে ছোট । আবির যখন দেশ ছেড়ে ছিল তখন আদির ৩ বছর হয়েছে মাত্র। ভিডিও কলে দেখতে দেখতে ভাইকে সে একটু একটু চিনে। দৌড়ে এসে জরিয়ে ধরেছে ভাই কে। আবিরও জরিয়ে ধরেছে আদিকে। মীম ও আবিরের পাশে বসেছে। খোঁশগল্প করছে সবাই মিলে। আদি জিজ্ঞেস করছে ‘ভাইয়া, আমার জন্য কি এনেছো? ‘ আবির যেইনা উঠতে যাবে মা চাচিরা উঠতে দিচ্ছে না। আগে শরবত খাবি তারপর উঠবি। আবির তানভিরের দিকে তাকিয়ে বললো ‘ঐ লাগেজ টা নিয়ে আয় তো ‘ তানভির একটা লাগেজ টান দিতে যাবে আবির আচমকা বসা থেকে দাঁড়িয়ে ‘ঐটা তে ছোঁবি না ‘ তানভির সহ বাড়ির সকলেই যেনো অবাক হয়ে গেলো। আবির আবার ঠান্ডা মাথায় বললো পাশের লাগেজ

টা নিয়ে আয়.... তানভিরও তার কথা মতো লাগেজ নিয়ে আসলো। লাগেজ খুলে যে যার মতো জিনিস বের করছে আর জিজ্ঞেস করছে এটা কার,ঐটা কার। আবির শরবত খেতে খেতে উত্তর করছে। আদির জন্য বিদেশি দামি দামি খেলনা, মীমের জন্য ড্রেস,কসমেটিকস বক্স, মা কাকিদের জন্য অনেক গিফট। তানভীরের জন্য মোবাইল, একটা ল্যাপটপ অন্যান্য গিফট। আলাদা আরেকটা ল্যাপটপ আছে। মীম জিজ্ঞেস করছে, 'ভাইয়া এই ল্যাপটপ টা কি তোমার? ' আবির উত্তর দেয়, 'না এটা মেঘের' মেঘের মা ' হালিমা খান' জিজ্ঞেস করলেন মেঘের ল্যাপটপ কি দরকার বাবা? আবিরঃ ওর তো HSC পরীক্ষা শেষ। সামনে Admission Test আছে। অনেক কিছু জানার বা পড়ার দরকার আছে। মোবাইল দেখে পড়ার থেকে ল্যাপটপে সুবিধা হবে তাই নিয়ে আসলাম। মীমঃ আমার জন্যও নিয়ে আসতা একটা..!! আবির অবলীলায় হেসে উত্তর দেয়। তোর ১৮ বছর বয়স হলে তোকেও কিনে দিব। চিন্তা করিস না। মীম খুশিতে গদগদ হয়ে বলে,'ধন্যবাদ ভাইয়া।' বাড়ির হৈচৈ শুনে ঘর থেকে বের হলেন ছোট চাচা ইকবাল খান। আবির চাচ্চুকে দেখেই সালাম করতে যায়, চাচ্চু বাঁধা দিয়ে জরিয়ে ধরেন ভাতিজা কে। ইকবাল খান বাড়ির সকলের দিকে এক পলক তাকিয়ে নরম স্বরে বলেন... এতদিনে এই বাড়িটা পরিপূর্ণ হলো। ইকবাল খানের জন্য আনা উপহার আবির নিজের হাতেই চাচ্চুকে দিলো। বাকিদের জিনিস গুলোও একটা একটা করে দিলো আবির। মেজো চাচ্চু মানে মোজাম্মেল খান বাসায় নেই। তাই

ওনার জন্য আনা গিফট যত্ন করে রেখে দিলো আবির। লাগেজে পরে আছে একটা বক্স যেটা রেপিং পেপারে মুড়ানো আর একটা শপিং ব্যাগ। আদি জিজ্ঞেস করছে, 'ভাইয়া ঐটা কার?' আবির ল্যাপটপের পাশে বক্স আর শপিং ব্যাগ টা রেখে উত্তর করলো এগুলো মেঘকে দিয়ে দিও। আমি রুমে যাচ্ছি ইকবাল খান এক পলক সবার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো 'মেঘ কোথায়?' হালিমা খান উত্তর দিলেন, ও তো কোচিং এ গেছে, এতক্ষণে তো চলে আসার কথা আবির বাকি ২টা লাগেজ নিয়ে উঠতে চাচ্ছিলো, হঠাৎ পিছন ফিরে মায়ের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলো, আমি কোন রুমে থাকবো? ছেলের এমন প্রশ্নের জন্য মা 'মালিহা খান' হতভম্ব হয়ে পরলেন,তৎক্ষনাৎ স্বাভাবিক হয়ে উত্তর করলেন তোর রুম তোরই আছে । আজ সকালেই পরিষ্কার করা হয়েছে। আবির কোনো কথা না বলে দুই লাগেজ নিয়ে উঠতে গেলে তানভির এগিয়ে আসে। আমায় দাও আমি নিয়ে যাচ্ছি। আবির একটা লাগেজ তানভিরের দিকে এগিয়ে দেয়। নিজে আরেকটা লাগেজ সযত্নে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে থাকে। ততক্ষণে দরজায় এসে উপস্থিত হয় এই বাড়ির বড় মেয়ে #মাহদিবা_খান_মেঘ মীম মেঘকে দেখে দৌড়ে এসে বলে, 'আপু আপু আবির ভাইয়া এসেছে' মেঘ সিঁড়ি দিকে তাকায়, লম্বা স্বাস্থ্যবান সুপুরুষ দেহি একজন হাতে লাগেজ নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠছে। শুধু পিছন টা দেখা যাচ্ছে। মেঘ ভিতরে ঢুকে সবার হাতে গিফট দেখে এদিক সেদিক তাকায়। ততক্ষণে আবির নিজের রুমে চলে গিয়েছে। মেঘের মা 'হালিমা খান' মেয়ের দিকে এগিয়ে

এসে তোর জন্য গিফট এনেছে। মেঘ তাকিয়ে বলে, ‘কি গিফট?’ সোফায় রাখা ল্যাপটপের দিকে চোখ পরে মেঘের, ছুটে যায় ল্যাপটপের কাছে। ‘এটা কি আমার?’ মীম: হ্যাঁ আপু এটা তোমার, বক্সটা আর শপিং ব্যাগটাও তোমার । ল্যাপটপ টা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছে মেঘ, যেনো আকাশকুসুম কিছু পেয়ে গেছে। তারপর শপিং ব্যাগ টা একটু খুলে দেখলো ২ টা ড্রেস মনে হচ্ছে। সে ল্যাপটপ আর বক্স গুলো নিয়ে রুমের দিকে চলে যায়।এতবছর পর নিজের রুমটা আশ্চর্যান্বিত নয়নে দেখছে আবির। সেই পরিচিত ঘ্রাণ যেখানে সে নিজের জীবনের ১২ টা বছর কাটিয়েছিলো। যেই রুমটা ছিল তার একান্ত ব্যক্তিগত, আজও তাই আছে। একটা জিনিসও এদিক সেদিক হতে দেন নি আবিরের মা ‘মালিহা খান’। এমনকি রুমে বছরের পর বছর তালা দিয়ে রেখেছেন তিনি। যখন ই ছেলের কথা মনে হতো ছেলের রুমে এসে নিরবে কেঁদে যেতেন যেনো কেউ বুঝতে না পারে। আবির রুমে ঢুকে লাগেজ খুলে নিজের পরনের টিশার্ট হাতে শাওয়ার নিতে চলে যায়। শাওয়ার শেষে বের হলেন একটা কফি কালার টিশার্ট আর একটা টাওজার পরে হাতে টাওয়েল নিয়ে মাথার চুল মুছতে মুছতে। খাটে বসে আছে তানভির। লাগেজ নিয়ে এসে রুমেই বসে আছে সে। তানভির কে দেখে আবির জিজ্ঞেস করছে, ‘কি হলো, কিছু বলবি?’ তানভির মুচকি হেসে জিজ্ঞেস করছে ‘আচ্ছা ভাইয়া ঐ লাগেজটা ধরতে দিলে না কেন? কি আছে ঐটাতে?’ আবিরের চক্ষুদ্বয়ে উদ্বেগ স্পষ্ট, চোয়াল শক্ত করে উত্তর দিলো ‘ঐটাতে আমার পার্সোনাল

কিছু জিনিস আছে।' তানভির হাসতে হাসতে উত্তর দেই, ' সেই পার্সোনাল জিনিস গুলো দেখতে চাচ্ছে আমার অবুঝ মন, কি করবো বলো?' স্বভাবসুলভ গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর দিলো আবির 'কাউকে দেখানোর জিনিস আশা করি পার্সোনাল হবে না?' তানভির ভাইয়ের আপত্তিস্বর বুঝতে পেরে এই বিষয়ে আর কিছু বলে নি। শুধু জিজ্ঞেস করে, "বিকালে কি বের হবে?" আবির উপর নিচ মাথা নেড়ে হ্যাঁ সূচক সম্মতি জানায়। তানভির কথা না বাড়িয়ে চুপচাপ বিদায় নেয় রুম থেকে। আবির খাটের এক কোণায় বসে মোবাইল হাতে নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু চেক করতে ব্যস্ত হয়ে পরে। মেঘ নিজের রুমে ঢুকে শপিং ব্যাগ খুলে ৩ টা ড্রেস বের করলো। ৩ টা জামা ই অসাধারণ সুন্দর। ২ টা গাউন ড্রেস আর একটা গর্জিয়াছ কাজের থ্রিপিস। ল্যাপটপ টাও খুলে দেখে, তার প্রয়োজনীয় সকল এপ ব্রাউজার অলরেডি ল্যাপটপে সেট করা আছে। মেঘের দৃষ্টি যায় রেপিং পেপারে মোড়ানো বক্সের দিকে। রেপিং পেপার খুলতেই চোখে পরে ৩ টা উপন্যাসের বই যেগুলোর উপরে ছোট একটা চিরকুটে লিখা 'এডমিশনের পরে পড়বি'। তারসাথে একটা ছোট বক্স যেখানে একবক্স রঙিন পাথর। মেঘের এই পাথর গুলো ছোটবেলায় খুব পছন্দ ছিল। তার সাথে একটা iPhone 13 pro max মোবাইলের বক্স। ফোন দেখে মেঘের চক্ষু চরখগাছ। অনেকদিন যাবৎ মনের কোণে সুপ্ত ইচ্ছে ছিল একটা আইফোন কেনার। কিন্তু কাউকে বলার মতো সাহস হয় নি তার।এগুলো দেখে খুশিতে গদগদ হয়ে পরেছে মেঘ। ইন্টার

সেকেন্ড ইয়ারে পড়াকালীন মেঘের যখন কলেজ, প্রাইভেট, কোচিং সব মিলিয়ে ব্যস্ততায় দিন কাটছিলো, তখন তানভির তার পুরোনো একটা ফোন দিয়েছিল মেঘকে। সীমটাও ছিল তানভিরের, বাসার মানুষের বাহিরে শুধু ৩-৪ জন বান্ধবীর নাম্বার ছিল সেই ফোনে। এমনকি স্যারদের কেও নাম্বার দিতে নি*ষেধ করেছিল ক*ড়া ভাষায়।। তানভির বরাবর ই বোনের ব্যাপারে খুব সিরিয়াস। ভাইরা বোনকে শা*সন করে ঠিক আছে কিন্তু তানভীর মেঘকে একটু বেশিই শা*সনে রেখেছে এত বছর। HSC পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে নিজের মায়ের পেটের ভাই তানভিরকে খুব সা*হস করে বলেছিলো, 'ভাইয়া পরীক্ষা শেষ করে আমায় একটা নতুন ফোন কিনে দিবা?' অ*গ্নিদৃ*ষ্টিতে তাকিয়ে ছিল তানভির, যেনো মস্ত বড়ো অ*ন্যায় করে ফেলছে। তারপর মেঘ নতুন ফোনের আশা পুরোপুরি ছেড়ে দিয়েছিল। আজ সে না চাইতেই আইফোন পেয়ে গেছে, ল্যাপটপ পেয়ে গেছে। এ যেনো মেঘ না চাইতেই জল। আনমনে ভাবছে, মনে হয় তানভির ভাইয়া বলেছে ফোন আনতে আর ল্যাপটপ আনতে নাহলে ওনি কিভাবে জানবে আমার ফোন নেই। এদিকে ১ ঘন্টা যাবৎ ফোনে মনোযোগ দিয়ে কি যেনো কাজ করছে আবির। হঠাৎ আদি দৌড়ে এসে দাঁড়ায় দরজায়, আদিঃ ভাইয়া তোমায় খেতে ডাকছে। আবিরঃ যা আসছি। ১০ মিনিটের মধ্যে সাদা শার্ট পরে রেডি হয়ে নিচে নামলো আবির। অসময়ে তেমন কেউ নেই নিচে। বিকাল ৪ টা বাজে। সবার খাওয়া শেষ অনেক আগেই। মালিহা খান বসে ছিলেন ছেলের জন্য। ছেলের

ফিটফাট হয়ে রেডি হওয়া দেখে মালিহা খান জিজ্ঞেস করছেন, ‘কোথাও যাবি?’ আবির,’ হ্যাঁ,একটু কাজ আছে!’ আবির চুপচাপ খাবার খাচ্ছে। ছোটবেলা যা যা সে পছন্দ করতো সব রান্না হয়েছে আজ। সব খেতে পারে নি যতটুকু সম্ভব খেয়ে উঠে পরেছে। এরিমধ্যে তানভির হাজির হয়েছে... ‘ভাইয়া রেডি আমি, এখন যাবে নাকি লেইট হবে?’ আবির, ‘এখনই বের হবো’ মালিহা খান রান্নাঘর থেকে ডেকে বলছেন, ‘গাড়ি নিয়ে বের হবি না? চাবি নিয়ে যাহ...’ আবিরঃ গাড়ি লাগবে না আম্মু দুই ভাই বের হয়ে গেলো..... যৌথ পরিবারগুলোর সবচেয়ে আনন্দময় সময় হলো সন্ধ্যাবেলা। বাড়ির সকলে মিলে হৈচৈ করে বিকালের নাস্তা খাওয়া,একটু টিভি দেখা, খেলাধুলা করা,আড্ডা দেয়া। সমস্যা শুধু বড় ভাই, তানভির সবসময় মেঘকে চোখে চোখে রাখে। কি করছে,কি না করছে, কখন খাচ্ছে, পড়াশোনা করছে কি না এসবকিছু দেখায় যেনো তার একমাত্র কাজ। কিন্তু মীম আর আদিকে কোনোদিন একটা ধ*মক পর্যন্ত দেয় নি তানভির। এ কেমন দুমুখো ব্যবহার। তানভির যতক্ষণ বাসার বাহিরে থাকে মেঘ ততক্ষণ মুক্ত,স্বাধীন । তানভির বাসায় না থাকায় তিনভাই বোন মিলে ছোটাছুটি করছে। মেঘ যা বলে ছোট ২ টা তাই করে। মেঘ আর আবিরের এখনও দেখা হয় নি। মেঘ কোচিং থেকে এসে রুমে যে ঢুকেছিল। তার গিফট নিয়ে ব্যস্ততার কারণে সবে মাত্র রুম থেকে নিচে এসেছে। অন্যদিকে আবির বাসা থেকে চলে গেছে আরও ২ ঘন্টা আগে। মেঘ,মীম আর আদির ছোটাছুটি শেষ হয় বড় আব্বু ‘জনাব আলী

আহমদ খানের’ বাসায় প্রবেশ দেখে। আলী আহমদ খান বাসায় ঢুকতে ঢুকতে নিজের স্ত্রী মালিহা খানকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘আবির কোথায়?’ মালিহা খান উত্তরে বললেন, ‘ও তো তানভিরকে নিয়ে বের হলো বললো কি কাজ আছে’ আলী আহমদ খান সোফায় বসতে বসতে মেঘের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, ‘পড়াশোনার কি অবস্থা আম্মু?’ মেঘ শান্তস্বরে উত্তর করলো, “আলহামদুলিল্লাহ ভালো বড় আব্বু। তবে ” ‘তবে কি?’ প্রশ্ন করলেন আলী আহমদ খান আমার ফিজিক্স আর ম্যাথে একটু সমস্যা, কোচিং এর সাথে কুলাতে পারছি না। প্রাইভেটগুলোতেও অনেকটা এগিয়ে গেছে। আলী আহমদ খান, ‘ ঠিক আছে তোমার জন্য প্রাইভেট টিউটর নিয়ে আসবো। কাল বা পরশুর মধ্যেই ম্যানেজ করতেছি , তুমি চিন্তা করো না মন দিয়ে পড়াশোনা করো আম্মু। তোমার ভাই তানভির তো আমার কোনো কথা শুনে না আর না শুনে তোমার আব্বুর কথা, কোথা থেকে মাথায় ভূত চেপেছে রাজনীতি করবে। পড়াশোনায় গুরুত্ব না দিয়ে রাজনীতিতে গুরুত্ব দিচ্ছে। তুমি পড়াশোনা করো ভালো করে, মেডিকেলে অথবা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যেনো চান্স টা হয়ে যায়।”‘ ‘জ্বি বড়আব্বু, চেষ্টা করবো।’ ‘খেয়েছো কিছু তোমরা?’ আলী আহমদ খান জিজ্ঞেস করলেন এবার উত্তর টা মীম দিলো, ‘হ্যাঁ বড় আব্বু খেয়েছি আমরা’ ঠিক আছে এখন রুমে গিয়ে পড়তে বসো। ৩ ভাই বোন কোনো কথা না বলে তিনদিকে যার যার রুমে চলে যায়। রাত ৯ টায় বাড়িতে ঢুকে আবির আর তানভির। খাবার টেবিলে খেতে বসেছেন ৩ ভাই আর আদি। মীম,

মেঘ কেউ নেই। রান্নাঘরে তিন ঝা খাবার রেডি করছেন। বিকেলে আবির সাদা শার্ট পরে বেরিয়েছিল। সাদা শার্টের ২-৩ জায়গায় একটু একটু রক্ত লেগে আছে আর আবিরের হাতে ৩ টা ওয়ানটাইম ব্যান্ডেজ লাগানো, নজরে পরে ইকবাল খানের। 'কিরে আবির,তোর হাতে কি হয়েছে? শার্টেই বা দাগ কিসের?' এই কথা শুনে ছুটে আসেন মালিহা খান, কি হয়েছে আবির? বুকের ভেতর ছ্যাত করে উঠেছে, একমাত্র ছেলের শরীরে একটা আচড় ও মা সহ্য করতে পারেন না। আবিরঃ তেমন কিছু না, হাতে একটু লেগেছিল । ঠিক হয়ে যাবে, চিন্তা করো না। আর কথা না বাড়িয়ে সিঁড়ির কাছে চলে যায় আবির। আলী আহমদ খান ছেলের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করেন, 'খাবে না?' 'না আব্বু। বিকেলে খেয়েছি খিদে নেই। ' এই বলে রুমের দিকে চলে যায় আবির। আবিরের কন্ঠ শুনে মেঘ রুম থেকে বের হয় তাড়াতাড়ি, এতগুলো গিফট দিলো অবশ্যই ধন্যবাদ জানানো উচিত, ৭ বছরে ভাইয়ের মুখটাও দেখে নি সে। কিন্তু মেঘ রুম থেকে বের হতে হতে আবির রুমে ঢুকে পরেছে। মেঘের চোখ মুখে নিরবতা, নিচে গিয়ে সবার সাথে খেতে বসে, তানভির ও খেতে বসেছে হাতমুখ ধৌয়ে। ইকবাল খান তানভিরের উদ্দেশ্যে বলে, 'তুই তো ছিলি আবিরের সাথে, কি হয়েছে বল?' তানভির: চাচ্চু আমি তো ভাইয়ার সাথে বের হয়েছিলাম কিন্তু পরে আমি পার্টি অফিসে চলে গিয়েছিলাম। তাই সঠিক জানি না। মেঘ যেনো কিছুই বুঝতে পারছে না। বাড়িতে এসেছে ৭-৮ ঘন্টা হয়ে গেছে মানুষটার, অথচ সে এখনও দেখেই নি তাকে

তারমধ্যে আবার কি অঘটন ঘটিয়েও ফেলেছে। সে শুধু চাচ্চু আর ভাইয়ার মুখের দিকে তাকাচ্ছে বার বার। আহমদ আলী খান গম্ভীর স্বরে তানভিরকে বললেন, ‘সে তো তোমার ভাই কম বন্ধু বেশি। তাকে বলে দিও কোনো প্রকার মা*রপি*ট আর রা*জ নী*তিতে যেনো না জরায়। আর এটাও বলে দিও তাকে, তার বয়সটা কিন্তু আমি পার করে এসেছি। তাকে দেশে এনেছি মা*রপি*ট করার জন্য না, আমাদের ব্যবসার হাল ধরার জন্য । ‘ তানভির: আসলে বড় আব্বু সামান্য হাত কেটেছে ভাইয়ার। আলী আহমদ খান: থাক আমায় কিছু বুঝাতে হবে না। কোনটা মা*রপি*টের কা*টা আর কোনটা কেটে যাওয়া আমি তা বুঝি। তুমি তো নিজের রাস্তা বেছেই নিয়েছো অন্তত তাকে বুঝাও এসবে যেনো না জরায় তানভিরঃ জ্বি বড় আব্বু। মেঘ আচমকা প্রশ্ন করে বসে, ‘কি হয়েছে? ‘ তানভির মেঘের দিকে চোখ রাঙিয়ে তাকিয়ে বলে, ‘তুই চুপচাপ খা’ ইকবাল খান বড় ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে বলে, ‘আবির কেনো মা*রামা*রি করবে,এতবছর বাহিরে ছিল ছেলেটা, এখানে ওর কে এমন শ*ত্রু আছে?’ বাড়ির সবার মধ্যে নিরবতা কেউ কোনো কথা বলছে না। মেঘ মনে মনে ভাবছে, ”আবির ভাইয়া মা*র*পি*ট করেছে? কিন্তু কেনো? এত বছর ভাবতাম আমার ভাই ই পঁ*চা, রা*জনী*তি করে, আমায় শা*সন করে।। কিন্তু আবির ভাই তো দেখা যাচ্ছে পুরাই হি**ট*লা*র’।কোন এক আশঙ্কায় আবিরের মাথায় চিনচিন ব্য*থা অনুভব হয়, ভী*তিতে রু*দ্ধ হয় তার শ্বাস। বারান্দায় দাঁড়িয়ে আনমনে কি যেনো ভেবে

যাচ্ছে আবির। দূরে ঐ চাঁদটার দিকে তাকিয়ে আছে চ*ক্ষুযূ*গল এক মুহুর্তের জন্যও সরছে না, পল্লব ও পড়ছে না একটিবার, তার দুর্বো*ধ্য দৃষ্টি। হঠাৎ কারো অস্তি*ত্ব বুঝতে পেরে সাবলীল ভঙ্গিতে নড়েচড়ে দাঁড়ায় দৃষ্টি সরিয়ে নেয় চাঁদ থেকে। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে নেয় মানুষটাকে তারপর, ধীরস্থির কণ্ঠে জানতে চাই, 'কিছু হয়েছে?' তানভির সরলমনে বলে, 'বড় আব্বু বুঝতে পেরে গেছে তুমি মা*রপি*ট করেছো, তাই তোমাকে সাব*ধান করতে বলেছে যেনো মা*রপি*ট আর রা*জনী*তিতে না জরাও।' 'আরকিছু?' অবহেলায় প্রশ্ন টা করলো আবির 'না, তেমন কিছু না ব্যবসার হাল ধরতে বললো। ' তানভির উত্তর দিলো। আবির: আচ্ছা ঠিক আছে। আর কিছু বলবি? তানভির: ভাইয়া, মাথা ঠা*ন্ডা করো তুমি। বাদ দাও প্লিজ। আমি তোমাকে শুধু জানিয়েছিলাম বিষয়টা। তুমি যে এভাবে দেশে চলে আসবে আর এইভাবে ঝামেলা হবে এটা আমি ভাবতে পারি নি। বু*ঝতে পারলে আমি আ*গেই ব্যা*পার টা স*লভ করে ফেলতাম। আবির: তুই আমায় বাদ দিতে বলছিস? বাহ। তানভির: আমি ঐভাবে কিছু বলি নি ভাইয়া। যা হবার তো হয়েছে।। তুমি যা করেছো এরপর আশা করি আর কিছু হবে না। তাই বলছিলাম ঐসব চি*ন্তা বাদ দিয়ে একটু রেস্ট নাও। অনেকটা জা*র্নি করে এসেছো। আবির: আচ্ছা তুই এখন যা, এরপর থেকে আমার ব্যাপারে তোকে যেনো কেউ কিছু না বলে, এটা সবাইকে বলে দিস। এতবছর বাহিরে ছিলাম। এখন তো আমি বাড়িতে আছি, যার যা কথা সব যেনো আমায় বলে সরাসরি।

আর আগামীকাল ১২ টার আগে কেউ যেনো ডাকতে না আসে আমায়।
তানভির: আচ্ছা। আসছি আমি। এতক্ষণে মেঘে ঢেকে গেছে চাঁদ। অসীম দূরত্বে তাকিয়ে কি যেনো ভাবছে ছেলেটা। তারপর রুমে ঢুকে দরজা আটকে ব্যাগ থেকে একটা সিগারেট বের করে, বারান্দায় বসে সি*গা*রেট জ্বা*লিয়ে ঠোঁ*টে ধরে... দৃষ্টি পরে দূরে গাছের পাতার ফাঁকে ল্যামপোস্টের ক্ষুদ্র আলোর দিকে, তারনিচে ২-৩ টা কুকুর আপন মনে চিল্লাচিল্লি করছে। সি*গারে*ট খাওয়াটা আবিরের নি*ত্যদিনের অভ্যাস না, যখন সে খুব রা*গান্বি*ত বা চি*ন্তিত থাকে, বা যখন নিজেকে ক*ন্ট্রোল করার সব শ*ক্তি হারিয়ে ফেলে তখন সিগারেটের ধোঁ*য়ার মধ্যে নিজের ক*ষ্ট, রা*গ,চি*ন্তা আর অ*ভিমান গুলোকে উড়িয়ে দেয়। সি*গারে*টে কয়েকটা টান দিয়ে সি*গা*রেট টা ফেলে দেয়। তারপর টানটান হয়ে শুয়ে পরলো নিজের বিছানায়। মাথার নিচে দুহাত রেখে চোখ বুজলো। মেঘ খাবার খেয়ে রুমে এসে ২-৩ ঘন্টা টানা পড়াশোনা করলো।। HSC পরীক্ষা শেষ হলো এক মাস ও হয় নি কিন্তু পড়াশোনা যেনো ৩ গুণ বেড়ে গেছে। এডমিশন একটা মস্তবড় যুদ্ধ যার একমাত্র অস্ত্র হলো পড়াশোনা তার সাথে অঙ্গাঅঙ্গী ভাবে জরিয়ে আছে ভাগ্য। HSC র রেজাল্ট কবে দিবে ঠিক নেই, পাশ করবে কিনা তাও জানা নেই। কিন্তু অনিশ্চিত ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুতি আগেভাগেই নিতে হচ্ছে। বয়সের তুলনায় মেয়েটা পড়াশোনায় একটু বেশিই এগিয়ে গেছে। ১৮ বছর বয়সে পা দিলো সবেমাত্র ২ মাস হয়েছে। তারমধ্যে HSC পরীক্ষা শেষ । কয়েকমাস

পরে সে স্নাতক শিক্ষার্থী হতে চলেছে ভাবতেই কেমন যেনো নিজেকে বড় বড় মনে হয় মেঘের। পড়াশোনা শেষ করে নিজের বিছানায় শুয়েছে হাতে তার নতুন মোবাইল। কিন্তু করবে কি সে, না আছে ফেসবুক আর না আছে অন্য কোনো একাউন্ট। ইউ*টিউবে ঢুকে কয়েকটা ভিডিও দেখে মোবাইল রেখে দেয়। শুয়ে ভাবতে লাগে আবির ভাইয়াকে ধন্যবাদ জানানো দরকার কিন্তু সে তো ভ*য়ে দাঁড়াতেই পারবে না আবিরের সামনে.. পু*রোনো স্মৃতিগুলো ভাবতে থাকে... মেঘ সবেমাত্র ৫ম শ্রেণিতে উঠেছিল । বয়সের গন্ডি ৯-১০ এর মাঝামাঝি । তখন মেঘের একটা বন্ধু হয়েছিল নাম জয়। ছেলেটা স্কুলে নতুন এসেই বন্ধত্ব করেছিল মেঘের সাথে। ছোটবেলা পিচ্চিদের বন্ধুত্ব যেমন ছিল, চকলেট শেয়ার করা,টিফিন শেয়ার করা,একসাথে খেলাধুলা করা। ১ টা সপ্তাহ ও হয়নি তাদের বন্ধুত্বের। ৭ দিনের মাথায় আবির স্কুলে গিয়ে মেঘকে আর জয়কে একসাথে খেলতে দেখে। স্কুলের সবার মাঝখানে মেঘের গালে কয়েকটা থা*প্প*ড় বসিয়ে দিয়েছিল আর রা*গা*ন্বিত স্বরে বলেছিল, “তোকে যদি আর কোনোদিন কোনো ছেলের সাথে কথা বলতে বা খেলতে দেখি তাহলে তোর খবর আছে। ” তারপর বোনকে টানতে টানতে বাড়িতে নিয়ে আসে, একটাবার বোনের দিকে তাকিয়েও দেখে নি। দুগালে আবিরের ৫ আঙুলের দাগ বসে গেছিলো। সেইযে থা*প্পড় দিয়েছিল মেঘ এক সপ্তাহ জ্ব*রে পরে ছিল। মেঘ ছোট বেলা থেকেই খুব অ*ভিমা*নী ছিল। ছোট্ট মেয়েটা এই থা*প্পড়ের ভ*য়ে আর আ*তঙ্কে আর কখনো

আবিরের দিকে চো*খ তুলে তাকায় নি, কথা বলা তো দূরের বিষয়, আবির বাসায় থাকাকালীন রুম থেকে বের ই হয় নি মেঘবালিকা । আবির ও কখনো খোঁজ নেয় নি মেয়েটার। ছোট্ট মেঘের মনে তখনই জন্ম নেয় আবির ভাই এর প্রতি অ*ভিমা*ন, সীমাহীন অভি*যোগ, কষ্ট আর বি*তৃষ্ণা। ২ বছর পর দেশ ছাড়ে আবির। এই সময়ের মাঝে মেঘ আবিরের সাথে এক টেবিলে খেতেও বসতো না। আবিরকে দেখলেই যেনো ছুটে পালাতো মেঘ। আবির বিদেশ চলে যাওয়ার পর মেঘ আবিরের ভয় থেকে নিজেকে সাবলীল করে আপন মনে রাজত্ব করতে থাকে খান বাড়িতে। আবিরের পাশের রুমটায় তার দখলে চলে আসে আবির থাকলে হয়তো কখনোই সে এই রুমে আসতো না। বিদেশ যাওয়ার পর আবির সবার সাথে ভিডিও কলে কথা বলেছে কিন্তু কথা হয় নি মেঘের সাথে, ২-১ বার মেঘের কথা জিজ্ঞেস করেছিল ঠিকই কিন্তু মেঘ আত*ঙ্কে কথা বলতে চাই নি। এর পর থেকে আবিরও কখনো মেঘের কথা জিজ্ঞেস করে নি।। এতবছর পর ভাই বাড়ি এসেছেন, এখনও দেখা হয় নি তারসাথে। এরিমধ্যে মা*রপি*ট করে ফেলেছেন। ছোটবেলায় অনুভূতি প্রকাশ না করতে পারলেও আজ আবিরের ক*র্মকা*ণ্ডের কথা শুনে মেঘের মনে একটা নাম ই ঘুরপাক খাচ্ছে সেটা হলো 'হি*ট*লা*র'। হি*ট*লা*রে*র সাথে আবিরের কতটা মিল বা বেমিল তা বিবেচনা করার বিন্দুপরিমাণ ইচ্ছে নেই তার ।। মাথায় একটা চিন্তায় ঘুরছে ধন্যবাদ জানানো উচিত কিন্তু সে কি আদোঃ কথা বলতে পারবে হি*ট*লা*রে*র সাথে..?? এসব

ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পরলো সে ভোর বেলা থেকেই বাড়িতে রান্নার ধুম পরে যায়। তিনভাই সকাল সকাল খেয়ে অফিসে চলে যায়। মীম আর আদিও স্কুলে চলে যায়। মেঘ ঘুম থেকে উঠে ৮ টায়, রাত জাগার কারণে সকালে উঠতে পারে না সে। মাঝে মাঝে গোসল করে খেয়ে বের হয় মাঝে মাঝে এমনিতেই চলে যায়।। ১০-২টা পর্যন্ত বাহিরে কোচিং,তারপর টিউশন শেষ করে বাড়ি ফিরে, ফ্রেশ হয়ে খেয়ে একটু ঘুমাই। বিকালে একটু হৈ-হুল্লোড় করে তারপর পড়াশোনা করে। এই তার বর্তমান জীবন। আজও তার ব্যতিক্রম হলো না।। খেয়ে কোচিং এর উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পরেছে, বাসার গাড়িই তাকে দিয়ে আসে আবার কল দিলে গিয়ে নিয়ে আসে। ঠিকঠিক ১২ টায় ঘর থেকে বের হয় আবির ধীরগতিতে নিচে আসে , চি*ন্তিত মুখ দেখে মা মালিহা খান ভীতস্বরে ছেলেকে জিজ্ঞেস করেন, ‘কিছু হয়েছে তোর বাবা.?’ আবির মুখের ভা*রিভা*ব বজায় রেখে উত্তর দিলেন... ‘কিছু হয় নি, খেতে দাও’ ছোটবেলার চঞ্চলতার ছি*টেফোঁ*টাও নেই ছেলেটার মধ্যে এটা ভেবেই বারবার হতাশ হচ্ছেন মালিহা খান। হঠাৎ চোখ পরে ছেলের হাতে ব্যা*ন্ডে*জের দিকে, হাতটাও ফুলে গেছে অনেকটা।। আবির খাবার খাচ্ছে আর তার মা শা*ন্তস্বরে ছেলেকে বুঝাচ্ছেন, এটা করো না, সেটা করো না, মনে হচ্ছে ৫ বছরের শিশু সে, আ*গুন- পানি চিনে না।। যদিও বাবা মায়ের কাছে সন্তানরা সারাজীবন শিশুই থাকে। খাওয়া শেষে মায়ের থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে যায় আবির। মেঘ বাড়ি ফিরেছে ১ ঘন্টা হবে, শাওয়ার নিয়ে

নিচে এসেছে খেতে। খাওয়া শেষ। তানভির রুম থেকে ছুটে এসে জিজ্ঞেস করে, ‘বড় আম্মু, ভাইয়া কোথায়?’ আঁতকে উঠেন মালিহা খান, ‘ও তো ২-৩ ঘন্টা আগেই খেয়ে বের হয়েছে, কেন?’ ‘ইশ,মিস করে ফেললাম’ মালিহা খানঃ কি হয়েছে বাবা? মেঘ নিরবে তাকিয়ে, ভাই আর বড় আম্মুর কথোপকথন শুনছে আর বুঝার চেষ্টা করছে ঘটনা টা কি। তানভির ভাইকে কল দিয়ে জিজ্ঞেস করে, ‘কোথায় আছো?’ আবির কি যেনো বললো শুনা যায় নি... তানভিরের চোখে মুখে উ*ত্তে*জনা স্প*ষ্ট। বড় আম্মু,আম্মু, কাকিমনি বাহিরে চলো কেউ প্রশ্ন করার আগেই তানভির ছোটে গেলো বাহিরে, তার পিছন পিছন মীম,আদি,মা কাকিরা সবাই দরজা পর্যন্ত গেলো,সবার পিছনে মেঘও গেলো সেখানে। এরিমধ্যে বাইকে বাড়ি ঢুকলো আবির, নীল রঙের চকচকে একটা সুন্দর বাইক,হেলমেট টাও নীল। হেলমেট খুলতে খুলতে তাকায় বাড়ির মানুষের দিকে.... মেঘ অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। সেই কবে দেখেছিলো আবিরকে সেই আবিরের সাথে এই আবিরের চেহারার কোনো মিল নেই। হেলমেট খুলাতে চুল গুলো এলোমেলো হয়ে গেছে আবিরের, চোখে সানগ্লাস, নেভিব্লু রঙের শার্ট কালো প্যান্টের সাথে ইন করে পরেছে, হাতে কালো ফিতার একটা ঘড়ি, পায়ে শো জুতা। আপাদমস্তক দেখলো আবিরের, হৃ*দপি*ণ্ডের চা*রপ্রকো*ষ্ঠ ছটপট করতে লাগলো মেঘের। আবিরের দিকে বি*ভোর দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সে। আবির বাড়ির সকলের উদ্দেশ্যে বললো, ‘বাইক টা কিনেছি,কেমন হয়েছে?’ আবিরের কণ্ঠ মেঘের

মনের গহীনে ধাক্কা খায় এতে হুঁশ ফিরে তার। দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না সে। একদৌড়ে নিজের রুমে ঢুকে দরজা আটকে শুয়ে পরে মেঘ ।। মীম আর আদি হৈ-হুল্লোড় করছে, আবির ভাইয়ার কাছে আবদার করছে ওদের বাইকে নিয়ে ঘুরার জন্য । মালিহা খান ছেলের পানে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'বাসায় ২-৩ টা গাড়ি থাকার পরও বাইক কেনো কিনলে?' 'আমার গাড়িতে চলাচল ভালো লাগে না',অবলীলায় উত্তর দিলো আবির। পিচ্চিরা খুশি হলেও খুশি হতে পারেন নি মালিহা খান, হালিমা খান আর আকলিমা খান। কারণ এই বাড়িতে বাইক ব্যবহার নিষেধ করেছিলেন স্বয়ং আলী আহমদ খান নিজেই। তিনি কোনো এক বয়সে বাইকে এক্সি*ডেন্ট করেছিলেন সেই থেকে বাইক কিনা বা বাইকে চলাচল নি*ষিদ্ধ করেছেন। ইকবাল খানের খুব ইচ্ছে ছিল বাইক কেনার কিন্তু বড় ভাইয়ের নিষেধ অমান্য করার সাধ্য নেই তাই কিনতে পারেন নি। তানভির খুব করে চাইছিল বাইক কিনতে, রা*জনীতি*র সুবাদে অনেক জায়গায় চলাচল করতে হয় বাইক থাকলে সুবিধা হয়। বাবা মোজাম্মেল খানকে বলেও ছিল সে, কিন্তু বাবার এক কথা , তোর বড় আব্বু বাইক পছন্দ করে না তোর দরকার পড়লে তুই একটা গাড়ি সবসময় ব্যবহার করিস তারপরও বাইক কিনার নাম মুখে নিস না। আবির বাড়ি ফিরেছে ২৪ ঘন্টা হবে হয়তো, এরমধ্যে ই বাইক কিনে ফেলছে, এর পরি*ণাম কি হবে তা ভেবেই ভয়ে আঁ*তকে যাচ্ছেন বাড়ির তিন বউ।। অষ্টাদশীর হৃদয় কাঁ*পছে, কেমন জানি অস্থির লাগছে সবকিছু। পরিচ্ছন্ন নয়নে তাকিয়ে

আছে রুমের জানালার দিকে, দৃষ্টি তার অসীম দূরত্বে। কি জানি কি ভাবলো কতক্ষণ হঠাৎ ঝলমলিয়ে উঠলো মেঘ সঙ্গে সঙ্গে চোয়াল শক্ত করে নিজেকে নিজে প্রশ্ন করলো, ‘ বাই এনি চান্স আমি কি হি*ট*লা*রটা*র উপর ক্রাশ খেয়েছি.....???’শ্বা*স ঝেঁ*ড়ে, নিজের মাথায় গা*ট্টা মে*রে মেঘ বলে, ‘ছিঃ মেঘ ছিঃ, কি সব ভাবছিস তুই, কেউ কি তার চাচাতো ভাইয়ের উপর ক্রাশ খায়? ভালো, ভদ্র হলেও মানা যেতো, এমন গু*রুগ*ম্ভীর, ব*দমে*জা*জি আর হি*ট*লা*র স্বভাবের কেউ কি কারো ক্রা*শ হয়..!! যে ছেলে ১০ বছরের মেয়ের গা*য়ে হা*ত তু*লতে পারে সে আর যায় হোক আমার ক্রাশ হতে পারে না। এটা ভাবতেই মেঘের বু*ক ভে*সে আসে ক*ষ্টে। নিজেকে স্বাভাবিক করতে মোবাইল হাতে নিয়ে কল করে মেঘের সবচেয়ে কাছের বান্ধবী বন্যাকে। প্রথম কল দিতেই রিসিভ হয় কল.. বন্যা- আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছো বেবি? মেঘ- ওয়ালাইকুম আসসালাম, আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি, তুই কেমন আছিস? বন্যা- হঠাৎ আমায় স্বরণ করার কোনো স্পেশাল কারণ আছে? তোর তো আবার ভাঙা ফোন ঠাসঠুস বন্ধ হয়ে যাবে। মেঘ রা*গান্বিত স্ব*রে একপ্রকার হুং*কার দিয়ে বলে... “তুই আজ কোচিং এ আসিস নি কেন? কি যে একটা জিনিস মিস করছিস...” বন্যা- কি মিস করেছি বলে ফেলো বান্ধবী মেঘ- এখন বললে কি আর সেই ফিল টা পাবি নাকি আজব বন্যা- আরে বেবি বলো তুমি। কাল শুক্রবার কোচিং বন্ধ, আবার দেখা হবে রবিবারে ততদিন সহ্য হবে না। বলে ফেল প্লিজ।

মেঘ- আমার হাতে এখন iPhone 13 pro max মেঘের কথা বন্যা এক বিন্দুও বিশ্বাস করে নি, হেসে উড়িয়ে দিয়ে বলছে, এখন বল ‘একটু পর 14 pro max কিনতে যাচ্ছিস,যাকে তার ভাই একটা আধা ভা*ঙা ফোন দিয়েছে ব্যবহারের জন্য, দিনে ১০০ বার বন্ধ হয়ে যায়, তার হাতে নাকি iPhone. তুই কি ঘুম থেকে স্বপ্ন দেখে উঠলি নাকি?’ মেঘের উৎফুল্ল মে*জাজ আচমকাই বি*গড়ে গেলো, অভিমানী স্বরে বললো, ‘কাল আবির ভাই আসছেন বিদেশ থেকে ওনিই নিয়ে আসছেন আমার জন্য।’ বন্যা- তাই বল, নাহয় তোর যে ভাই সে তোকে এই জীবনে ফোন কিনে দিতো না, তোর বাবা দিতে চাইলেও সে আ*ছাড় মে*রে ভে*ঙে ফেলতো। ওয়েট ওয়েট, এই আবির ভাইটা কে রে? যে তোকে ছোট বেলা মে*রেছিল, সে? মেঘ মুখ কালো করে উত্তর দিলো, ‘হ্যাঁ আমার চাচাতো ভাই।’ বন্যা- তা তোর প্রতি এত মায়া হলো কিভাবে ওনার? মেঘ- জানিনা। শুন তোকে কি বলি বন্যা- হ্যাঁ বল মেঘ- আসলে আজকে বিকালে আবির ভাইয়াকে দেখে ছোটখাটো একটা শ*ক খেয়েছি। বন্যা- মানে? মেঘ- কি সুদ*র্শন চেহারা,দাঁড়ানোর স্টাইল,লুক আর অগোছালো চুলদেখে আমার মনটায় এলোমেলো হয়ে গেছে, আমি মনে হয় ওনার উপর ক্রাশ খেয়েছি. মুখ ফুলিয়ে শ্বাস ছেড়ে একটু ধাতস্থ হয়ে গুরুগম্ভীর স্বরে বন্যা বললো, ‘তোর মাথা ঠিক আছে মেঘ?তুই এতবছর যাবৎ বলছিস এই মানুষটা তোর শৈশব নষ্ট করে দিয়েছে, আজ কৈশোরে পা দিতেই এই মানুষটার উপর ক্রা-শ খেয়ে ফেলছিস? মানুষ রঙ বদলায়, কারণে

অকারণে বদলায় কথাটা এতদিন শুনেছি কিন্তু আজ তোকে দেখে মনে হচ্ছে এই কথাটা ১০০% সত্যি। না হয় যাকে এত বছর শ*ত্রু ভেবে এসেছিস আজকে তার কথা অবলীলায় বলে যাচ্ছিস, বাহ মেঘ বাহ। ‘ মেঘের নিরবতা বুঝতে পেরে বন্যা আবার বলা শুরু করলো, ‘ এসব কোনো বিষয় না বেবি, হঠাৎ করে দেখেছিস তো তাই আহামরি সুদর্শন লেগেছে, বিষয়টা মাথা থেকে ঝে*ড়ে ফেল দেখবি সব ঠিক হয়ে গেছে, আমরা না দুজন দুজনকে কথা দিয়েছিলাম, একজন বিপথে গেলে আরেকজন সামলাবো । ভুলে গেলি?’ স্পষ্ট বুঝা গেলো মেঘের বদলে যাওয়া অভিব্যক্তি। সহসা নিজেকে সামলে আচমকা প্রশ্ন করে বসলো, ‘আমি কি দেখতে সুন্দর না? আমি কি কারো ক্রাশ হওয়ার যোগ্য না?’ মেঘের আকস্মিক প্রশ্নে বন্যা কিছুটা হতভম্ব হলো এরপর কয়েকমিনিট শুধু হেসেই গেলো.,স্বাভাবিক স্বরে বললো.. ‘অবশ্যই তুই সুন্দর, ক্রাশ খাওয়ার ও যোগ্য কিন্তু তুই ছেলেদের ক্রাশ হতে পারবি কি না সন্দেহ আছে। হতে পারিস রাস্তাঘাটের,গাছগাছালির, রঙচটা দেয়ালের, গরুছাগলের ও হতে পারিস।’ রা*গে ফুঁ*সতে ফুঁ*সতে কল কেটে দিয়েছে মেঘ আর ভাবছে, ‘আজকাল সান্ত্বনা নিতে চাইলেও মানুষ মজা নেয়’ যদিও বন্যার হাসির কারণ টা খুবই স্বাভাবিক । মেঘকে বরাবর ই চোখে চোখে রেখেছে তানভির সহ বাড়ির সকলে, 6-10 পর্যন্ত পড়েছে গার্লস স্কুলে, তারপর গার্লস কলেজ। আহারে জীবন ধূ ধূ মরুভূমির মতো কোথাও কেউ নেই। স্কুল কলেজের সামনেই বাসার গাড়ি

থাকতো,বাসা টু স্কুল,স্কুল টু বাসা। কোনো ছেলে না দেখলে ক্রা*শ কিভাবে খাবে! বো*ধশক্তি হওয়ার পর মেঘ মনে হয় ২-৩ টা বিয়ে খেয়েছে কাজিনদের।। যাকে বলে নামের বিয়ে খাওয়া। তানভিরের ভয়ে বিয়ে বাড়ির এক কোণে বসে থাকতো মেঘ। ভাইয়ের ক*ড়া শাসন ছিল ঘর থেকে বের হতে পারবি না, বরযাত্রী আসলে তো আরও না। ঘরের ভিতরেই তারজন্য খাবার পাঠানো হতো, তানভির নিজেই বোনকে খাওয়াতো ইচ্ছে মতো। তারপর বিয়ে শেষ হলে মা বোনকে নিয়ে চলে আসতো। গায়ে হলুদে নাচা,গান গাওয়া এমনকি মেহেদীও দিতে পারে নি কখনো।। এই কষ্টে এখন আর মেঘ কারো বিয়েতেই যায় না। এতে তানভির মনে হয় হাফ ছেড়ে বেঁচেছে।। মেঘের এই সাদাকালো জীবনের কথা শুনলে বন্যা কেনো পৃথিবীর সব মানুষ ই হাসবে। জীবনটা তার তেজপাতা হয়ে গেছে । মাঝে মাঝে ভাবে এই বাড়িতে জন্মানো টা কি খুব দরকার ছিল...!!! কয়েকবার বন্যা কল ব্যাক করেছে, নিজের জীবনের হতাশার জন্য মেঘ আর কল রিসিভ ই করে নি, বান্ধবীকে রাগ দেখিয়ে কি হবে...! জীবন যেখানে যেমন তা মানতেই হবে। মেঘের বেস্ট ফ্রেন্ড হওয়ার খেসারত দিতে হচ্ছে বন্যাকেও। মেঘের সাথে সাথে বন্যাকেও চোখে চোখে রাখে তানভির। কথায় আছে সঙ্গ দোষে লোহা ভাসে, সঙ্গ খারাপ হলে মেঘও খারাপ হবে তাই সব সময় বন্যার পিছনে লোক লাগিয়ে রাখে। শুধু বন্যাই না আরও ২ জন বান্ধবী আছে মেঘের, একজন পাখি আরেকজন মায়া। ওদেরকেও নজরে রাখে তানভির। বোনকে সব

দিক থেকে প্র*টেক্ট করাই যেন তার প্রথম এবং প্রধান কাজ। আবির বিকাল থেকে ঘুমাচ্ছে। সন্ধ্যা ৭ টায় ঘুম ভাঙে আদির ডাকে। নিচে আবিরের আব্বু আর মেঘের আব্বু বসে আছেন, আবিরের বাইক কেনার কথা শুনেই তাড়াতাড়ি চলে এসেছেন অফিস থেকে। আবির ঘুম থেকে উঠে চোখেমুখে পানি দিয়ে টাওয়েল দিয়ে কোনোরকমে মুখ টা মুছে তৎক্ষনাৎ রুম থেকে বের হয় । সে তার বাবাকে খুব ভালো করে চিনে ডাকার সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত না হলে বাড়িতে তা*ন্ডব শুরু করে দিবেন। আবিরের চোখে মুখে ঘুমের প্রভাব স্পষ্ট । ব্যস্তপায়ে হাঁটছে সে, আচমকা এলেমেলো পায়ে ছুটে রুম থেকে বের হয় মেঘ চুলগুলো অগোছালো। আকস্মিক ধা*ক্কা এড়াতে চটজলদি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে অ*গ্নিদৃ*ষ্টিতে তাকায় আবির, তৎক্ষনাৎ মোটা ভ্রু*যূগল শিথিল হয়ে যায়,অ*মত্ত চেয়ে রইলো সে একমুহূর্তের জন্য মস্তিষ্ক থমকে গেছে আবিরের, দৃষ্টি তার প্র*খর, আচ*মকা হাঁটা থামাতে শ্বাস ভা*রি হয় আবিরের, কালো জামা প*রিহিতা এক ললনার দিকে দৃষ্টি পরে, আ*পাদমস্তক দেখলো একবার, কালো জামাতে যাকে অ*প্সরার ন্যায় লাগছে, এলোমেলো চুলগুলো তার কোমড় ছাড়িয়েছে চুল দেখে মনে হয় জীবনানন্দ দাশের বনলতাকে উদ্দেশ্য করে লেখা, “চুল তার কবেকার অন্ধ*কার বিদিশার নিশা।” দ্রুতগতি থামাতে গিয়ে মেঘের ছোট দেহ কম্পিত হয়,দৃষ্টি পরে ৬ ফুট লম্বা মানুষটার বু*কে, মেঘ মুখ তুলে তাকায় সেই মানুষটার চেহারার পানে, আবিরের চোখের দিকে বি*স্ময়াভিভূত নয়নে তাকিয়ে আছে মেঘ, পলক ও পরছে না

একটিবার, আবিরের চোখে মুখে ছিটানো পানির ঝাপটায় এলোমেলো চুলগুলো থেকে চুইয়ে চুইয়ে পানি পরছে যা তার পরনের সাদা টিশার্ট অল্পস্বল্প ভিজিয়ে দিচ্ছে সেদিকে খেয়াল নেই আবিরের, আবির কয়েক সেকেন্ড স্ত*ব্ধ থেকে হঠাৎ চোখ সরিয়ে পুনরায় রু*দ্রমূর্তি ধারণ করে স*বেগে হাঁ*টা দেয় সিঁড়ির দিকে, পিছন থেকে অষ্টাদশীর কোমল কণ্ঠে ডাক শুনে থমকে দাঁড়ায় আবির তবে পিছনে তাকানোর প্রয়োজন মনে করে নি সে, মেঘ ভ*য়ার্ত কণ্ঠে বলে, 'Thank you Abir Vai' আবির শুনলো কি না কে জানে, এক মুহুর্ত দাঁড়িয়ে যথারীতি ব্য*স্ত ভঙ্গিতে নিচে নেমে যায়। মেঘ ঠায় দাঁড়িয়ে আছে দরজার সামনে,থরথর করে কাঁপছে মেঘের হাত পা, মেঘের মনে হচ্ছে ভোঁ ভোঁ করে ঘুরছে সমগ্র পৃথিবী। কেনো জানি দাঁড়িয়ে থাকার শক্তি পাচ্ছে না মেয়েটা, নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে তাড়াতাড়ি দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছে। এতগুলো বছর পর আবিরের চোখে চোখ রাখলো মেঘ, ভেতর টা ভ*য়ে আঁ*তকে উঠছে বার বার, অন্তরা*ত্মা শুকিয়ে যাচ্ছে মেঘের। সোফায় বসে আছেন ২ ভাই,বাড়ির মহিলা রান্নাঘরে কাজে ব্যস্ত থাকলেও নজর তাদের এদিকে, কি হবে কে জানে আলী আহমদ খান নিজের গা*ম্ভীর্যতা বজার রেখে একপ্রকার হুংকার দিয়ে প্রশ্ন করলেন, "তুমি নাকি বাইক কিনেছো?" এই কথায় হুঁশ ফিরে অষ্টাদশীর, কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে ২ পা সামনে এগিয়ে বারান্দার সাইডে দাঁড়িয়ে নিচে তাকায় মেঘ, নিচে সোফায় বসা আব্বু আর বড় আব্বু, তাদের থেকে কিছুটা দূরে দুহাত ভাজ করে সটান হয়ে দাঁড়িয়ে

আছে আবির। জ্বী', ভাবলেশহীন ভাবে উত্তর দেয় আবির। 'কিন্তু কেন?' পুনরায় হুংকার দেন তার আব্বু। 'আমার বাইক কেনার ইচ্ছে ছিল তাই কিনেছি,' 'তুমি জানো না এই বাড়িতে বাইক কেনা বা চালানো নিষেধ?' এবার প্রশ্ন টা চাচ্চু মোজাম্মেল খান করেছেন। 'হ্যাঁ জানি, ২০/৩০ বছর আগে কি ঘটে গেছে তা নিয়ে আতঙ্কে থাকার কোনো মানে হয় না, যদি কপালে খারাপ কিছু লিখা থাকে তাহলে সেটা ৭ সমুদ্র পারি দিয়ে হলেও আসবেই। সেটা আমি ঘরে বসে থাকলেও হবে আর গাড়িতে চলাচল করলেও হবে। ' 'তোমরা ২ ভাই কি নিজেদের মর্জি মতোই চলবে?' আলী আকবর খান রা*গান্বিত স্বরে প্রশ্ন করলেন। 'বাইক কিনা যদি নিজের ইচ্ছে মতো চলা হয় তাহলে আমি দুঃখিত আব্বু। এই ব্যাপারে আমি নিজের মনের কথায় শুনবো।' 'আমাদের নিজস্ব ৩ টা গাড়ি আছে, এত গাড়ি কেনো কিনলাম তোমাদের জন্যই তো' মোজাম্মেল খান কোমল স্বরে বললেন। 'গাড়িতে চলাচল আপনাদের ইচ্ছে তাই আপনারা গাড়ি কিনেছেন, আমার গাড়িতে চলাচল করতে ভালো লাগে না তাই আমি বাইক কিনেছি এটা নিয়ে এত কথা বাড়ানোর কি আছে চাচ্চু । তোমাদের বাইক সম্পর্কিত জে*রা শেষ হলে আমার তোমাদের কে একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলা আছে। ' আবির আব্বুর দিকে তাকিয়ে কথাগুলো বললো। এতক্ষণ বাড়ির মহিলা রান্নাঘরে থাকলেও এবার আর থাকতে পারলেন না, এক ছুটে সবাই ড্রয়িংরুমে চলে এসেছেন । মেঘ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আবিরের দিকে। এই বাড়িতে এত বছরে কাউকে গলা

উঁচু করে মুখের উপর কথা বলতে শুনেনি সে। তানভির ভাইয়া যত মেজাজ দেখিয়েছে সব মেঘের উপর, বড় আব্বু বা নিজের আব্বুর মুখের উপর কথা বলার সাহস হয় নি তার। আবির ভাই ২দিন হলো এসছে,আজই বাবার মুখের উপর নিজের ম*র্জি শুনাচ্ছে, এখন মেঘের মনে হচ্ছে ওনি হি*ট*লা*রের থেকেও বড়মাপের কিছু । মনোযোগ দিয়ে বাকি কথা শুনার চেষ্টা করছে মেঘ. আবির: আব্বু,চাচ্চু আমি অনেকদিন যাবৎ চিন্তা ভাবনা করেছি নিজে একটা কোম্পানি শুরু করার। তোমরা অনুমতি দিলে কাজ শুরু করবো মোজাম্মেল খান ও আলী আকবর খান দুজনের মাথায় যেনো আকাশ ভেঙে পরেছে। এতবছর ছেলেকে বাহিরে রেখে পড়াশোনা করিয়েছেন, দেশে এসে নিজের ব্য*বসার হাল ধরবে, দেশে পা দিতেই নিজে কোম্পানি খোলার চিন্তা ভাবনা করছে ছেলে। মোজাম্মেল খান চিন্তিত কণ্ঠে বললেন, আমরা তো ভেবেছিলাম তুমি পারিবারিক ব্যবসাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। আবির কিছু বলার আগেই আলী আকবর খান বলে উঠলেন, ‘ঠিক আছে, তুমি পড়াশোনা করে এসেছো, তোমার নিজস্ব মতামতের গুরুত্ব আমরা অবশ্যই দিবো,তোমার নতুন কোম্পানি নিয়ে আমাদের কোনো আপত্তি নেই তবে আমার একটা শর্ত আছে, তুমি আমাদের কোম্পানির CEO হবে, আগামীকাল শুক্রবার অফিস ছুটি তাই তুমি শনিবারে অফিসে যাবে,তোমাকে অফিসিয়াললি CEO পদ দেওয়া হবে। তারপর তুমি আমাদের অফিস সামলে যদি নতুন কোম্পানি শুরু করে প্রতিষ্ঠিত হতে পারো তাতে আমাদের কোনো

আপত্তি নেই। Best of luck my boy. আবির যেনো আগে থেকেই জানতো এরকম কিছু হবে তাই তার মধ্যে কোনো পরিবর্তন দেখা গেলো না' এতটুকু বলে সোফা থেকে উঠে রুমের দিকে হাঁটা শুরু করলেন আবিরের আব্বু, কয়েক কদম এগিয়ে আবার দাঁড়িয়ে আবিরের দিকে তাকিয়ে রু*দ্ধ কণ্ঠে বললেন, 'আমরা কোম্পানি সামলানোর জন্য সারাজীবন থাকবো না তোমাদেরকেই দায়িত্ব নিতে হবে, তুমি না পারলে তোমার প্রাণপ্রিয় ভাই তানভিরকে বলো রা*জ*নী*তি ছেড়ে ব্যবসায় আসতে তারপর তুমি তোমার মতো নিজে কোম্পানি খুলতে থাকো।' আবির চোয়াল শক্ত করে বাবার দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো, 'তানভির রা*জনী*তিই করবে ওর মাথায় ব্যবসা ঢুকানোর কোনো দরকার নেই, শনিবারেই অফিসে আসবো আমি। আমি একায় সবদিক সামলাতে পারবো। তোমরা দয়া করে তানভিরকে মুক্তি দাও, নিজের মতো করে রাজনীতি টা করতে দাও ওকে। তোমার শ*র্ত যেমন আমি মেনে নিয়েছি তোমাদেরকেও আমার একটা শর্ত মানতে হবে সেটা হলো, আমি আমার মন মতো কাজ করবো, আমার যখন যেখানে প্রয়োজন হবে নিজের কাজ গুছিয়ে আমি চলে যাব তখন আমাকে কোনো প্রকার বাঁ*ধা দিতে পারবে না কেউ। দরকার হলে ২ অফিসের কাজ শেষ করে আমি রাত ১২ টায় বা ২ টায় বাসায় ফিরবো এমনকি নাও ফিরতে পারি এতে তোমাদের যেনো মা*থা*ব্যথা না হয়।' একদমে কথাগুলো বলে কোনোদিকে না তাকিয়ে দ্রুতপায়ে বাসা থেকে বের হয়ে যায় আবির আলী আহমদ খান কয়েক

মুহূর্ত দাঁড়িয়ে কোনো কথা না বলে রুমের দিকে হাঁটা দেন। পিনপতন নীরবতা বাড়িতে। সোফায় বসে আছেন মোজাম্মেল খান, কাছেই তিন ঝা একজন আরেকজনের দিকে তাকাচ্ছে বারবার, তাদের আবিরের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস আছে কিন্তু সমস্যা হচ্ছে বাহিরের দুনিয়া সামলাতে গিয়ে নিজের প্রতি না যত্নহীন হয়ে পরে ছেলেটা এটায় তাদের চিন্তার বিষয়। নিচে উপস্থিত মানুষগুলোর মধ্যে চিন্তার ছাপ দেখা গেলেও উপরে দাঁড়িয়ে একপ্রকার বিনোদন উপভোগ করছিল মেঘ। যেই বড় আব্বুর কথার উপর কারো কথা চলে না আজ ওনার সাথে টক্কর দেয়ার মানুষ এসেছে। বাবা ছেলে কি শ*র্তটায় না দিচ্ছে। যেমন বাবা তেমন ছেলে এসব ভেবেই হাসি পাচ্ছে মেঘের। হঠাৎ করেই হাসিটা গা*য়েব হয়ে মুখটা ভা*রি হয়ে গেলো মেয়েটার, আর ফিসফিসিয়ে বলতে শুরু করলো, " নিজে তো হি*ট*লা*র সাথে আমার ভাইটাকে বড় গু*ন্ডা বানাতে কি সুন্দর উৎসাহ দিচ্ছে । এতবছর ভাইয়ের জ্বা*লায় জীবন তেজপাতা এখন আবার আরেকজনের আবির্ভাব হলো। কপালটায় খারাপ আমার। " এখন নিচে যাওয়ার পরিস্থিতি নেই তাই বিড়বিড় করতে করতে রুমে ঢুকতে যাবে হঠাৎ চোখ পরে আবির ভাইয়ার রুমের দিকে এক রাশ হতাশা নিয়ে রুমে ঢুকে যায় মেঘ। বাবা মা কে ছেড়ে আলাদা রুমে থাকলে খুব স্বাধীনতা পাবে ভেবে নিচতলা থেকে উপর তলায় চলে এসেছিল মেঘ, আবির ভাই বিদেশ যাওয়াতে কোনো চিন্তায় ছিল না। কিন্তু মেঘ আসার ১৫ দিনের মাথায় তানভির ও মেঘের পাশের রুমে চলে আসে জিনিসপত্র নিয়ে। সিঁড়ি

দিয়ে সোজা উঠতেই তানভিরের রুম। বোনকে পাহারা দিতেই মূলত এই রুমে আসা। তানভির যতক্ষণ রুমে থাকে ততক্ষণ নিজের রুমের দরজা টা খুলে রাখে, মেঘ সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে উঠতে গেলেও ভাইয়ের কথা ভেবে আস্তেধীরে উঠানামা করে। বর্তমানে মেঘের অবস্থা না*জে*হাল কারণ তার একপাশে আবির ভাই এর রুম,আরেকপাশে তানভির ভাইয়ের। তানভির ভাইয়ের পরের রুমটা মীমের জন্য ঠিকঠাক করা হচ্ছে কিছুদিন পর থেকে মীমও উপরে থাকবে কিন্তু তাতে কি! ভাইয়ের ঘর ডিঙিয়ে মীমের রুম পর্যন্ত যেতে পারবে কি না স*ন্দেহ আছে। রাত ১০ টার উপরে বাজে সবাই খাওয়াদাওয়া শেষ করে যার যার রুমে চলে গেছে। আবির এখনও বাড়ি ফিরে নি। মালিহা খান সোফায় বসে অপেক্ষা করছেন ছেলের জন্য । ১০-১৫ মিনিট পর বাড়িতে ঢুকলেন আবির আর তানভির, মাকে বসে থাকতে দেখে কিছুটা রা*গান্বিত হলো ছেলে। 'আম্মু তুমি আমার জন্য এভাবে রাত জেগে বসে থেকো না প্লিজ, আমি নিজের মতো করে খেয়ে নিবো।' 'তোর বউ আসলে আমি আর অপেক্ষা করবো না তোর জন্য,' সহসা উত্তর দিলেন মালিহা খান। বড় আম্মুর কথা শুনে স্ব শব্দে হেসে উঠে তানভির । আবির ঘাড় ঘুরিয়ে তাকায় তানভিরের দিকে সঙ্গে সঙ্গে তানভির হাসি থামিয়ে ফেলে, নিঃশব্দে হাসছে সে। তানভির বরাবর ই ভী*তু প্রকৃতির, বাহিরে যতই শ*ক্তপো*ক্ত থাকুক না কেন বাবা, চাচা আর ভাইয়ের সামনে সে যেনো ভে*জা বিড়াল। এতদিন যত কাজ ই থাকতো ছেলেটা ৮-৯ টার মধ্যে বাড়ি এসে সবার সাথে

খেতে বসতো। কিন্তু আবির ফেরাতে টাইম সিডিউলে কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে ছেলেটার।আবির মায়ের উদ্দেশ্যে ঠাট্টার স্বরে বলে উঠলো, ‘এর উল্টোটাও হতে পারে যেমন তোমার বউমা তোমার কোলে ঘুমিয়ে গেলো আর তুমি তাকে ঘুম পাড়াতে পাড়াতে আমার জন্য অপেক্ষা করলে’ ছেলের এরকম ঠাট্টায় ভ্যাবাচেকা খেলেন মালিহা খান। ‘আবির পুনরায় শান্ত অথচ ক*ড়া বলে উঠলো, ‘কাল থেকে তোমায় যেন বসে থাকতে না দেখি। আমার কিছু লাগলে চেয়ে নিবো আর খাবার টেবিলে রেখে দিও আমি খেয়ে নিব। ‘ এই কথার কোনো উত্তর বা দিয়ে,মালিহা খান স্বাভাবিক কণ্ঠে বললেন, ‘তানভির, মেঘ এখনও খায় নি, একটু ডেকে আসবি? এখন খাবে কি না!’ তানভির ঠিক আছে বলে উপরে গেলো, আবিরও নিজের রুমে গেলো। ৫ মিনিটে ড্রেস পাল্টে ফ্রেশ হয়ে নিচে নামছে। এতক্ষণে মেঘ খাবার টেবিলে চলে এসেছে। ভেবেছিল ভাই ফ্রেশ হয়ে নামার আগে তাড়াতাড়ি খেয়ে পালাবে। খাওয়া অর্ধেক হতেই তার দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় সিঁড়ির পানে, কালো টিশার্ট আর টাওজার পরে হাতে মোবাইল নিয়ে আপন মনে নামছে আবির, মেঘ সরু চোখে নিরীক্ষণ করছে আবিরকে। মানুষটাকে দেখে হৃৎস্পন্দন বাড়তে লাগলো মেঘের। এখন সে স্পষ্ট অনুভব করছে। তার বুকের ভেতরে কিছু একটা হচ্ছে । কিন্তু বোধগম্য হলো না কি হচ্ছে। নিজের অজান্তেই বুকের বা পাশে হাত রাখলো মেঘ। অনুভব করলো কিছু একটা অনবরত নৃত্য করছে বুকের ভেতর। আবিরের চেয়ার টেনে বসার শব্দে ঘোর কাটলো মেঘের, স্ব বেগে হাত

নামিয়ে আনলো বুক থেকে, আবির মেঘের ঠিক বিপরীত চেয়ারটায় বসেছে। মেঘের ছোট্ট বুকটা অনবরত কেঁপেই যাচ্ছে, চোখ তুলে তাকাতে পারছে না মেয়েটা। শরীর কাঁ*পা কাঁ*পি আর হৃদপিণ্ডের লাফা- লা*ফিতে সে বিদ্বিষ্ট, দিশেহারা অবস্থা অষ্টাদশীর। ইচ্ছে করছে ছুটে পালিয়ে যেতে আবিরের সামনে থেকে। কিন্তু পারছে না মনে হচ্ছে পায়ে শিকল দিয়ে বাঁধা। মালিহা খান, হঠাৎ মেঘের হাতে হালকা ধাক্কা দিলেন, 'কিরে কি হলো তোর?' দ্বিতীয় বার বার ঘোর কাটলো মেঘের, তৎক্ষণাৎ স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা করলো, কাঁপা কাঁপা গলায় বললো, 'কিছু না!' এই বলে পুনরায় খাওয়ার চেষ্টা করলো,কিন্তু এবার আর গলার দিয়ে খাবার নামছে না মেঘের। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে, কাঁ*পা কাঁ*পা হাতে গ্লাস নিয়ে ঢকঢক করে অর্ধেক গ্লাস পানি নিমিষেই শেষ করে ফেললো মেঘ। আবির আপন মনে খাচ্ছে, 'সামনে বা আশেপাশে কি হচ্ছে এসব দেখার প্রয়োজনই মনে করলো না সে। এই জগতের সবকিছু তার আগ্রহ সৃষ্টি করতে অক্ষম।
' আবিরের গা ছাড়া ভাব দেখে কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে খাওয়া শুরু করে মেঘ। মাঝখানে এক পলকের জন্য তাকিয়েছিল আবিরের দিকে, 'কালো টিশার্টে মুখ টা কত মায়াবী লাগছিল, এলোমেলো চুল, খাওয়ার স্টাইল দেখে দ্বিতীয় বারের মতো ক্রাশ খেলো অষ্টাদশী। কে বলতে পারে, দুইদিন আগে পর্যন্ত আবিরের কোনো স্মৃতি ছিল না মেঘের মন, মস্তিষ্ক জোড়ে। হঠাৎ মনে পরলেও শুধু ওকে মেরেছিল এই স্মৃতিটায় মনে হতো আর রাগে কটমট করতো মেঘ। আর আজ বিকাল থেকে

যতবার আবিরকে দেখছে ততবার মেঘের শীর্ণ বক্ষ ধরফড়িয়ে ওঠছে। ছোট বেলা যে ভ*য়টা ভাইয়ের প্রতি বোনের ছিল সেটা আজ বদলে গেছে। আবিরের দৃষ্টি তাকে বরফের ন্যায় জমিয়ে দিচ্ছে প্রতিনিয়ত। এই দৃষ্টিতে সূ*চালো কিংবা ধা*রালো অ*স্ত্র আছে যা এক কিশোরীর বক্ষপিঞ্জর এফোঁ*ড় ওফোঁ*ড় করে দেয়ার ক্ষমতা রাখে। আবিরের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে হাবিজাবি চিন্তা করছিল মেঘ। আবির চোখ তুলে তাকাতেই, মেঘের মনোযোগ ঘুরে গেলো, আবিরের ত*প্ত দৃষ্টি মনে হচ্ছে ফা*লা ফা*লা করে দিচ্ছে হৃদপিণ্ডটা, দৃষ্টি সংযত করে চিবুক নামিয়ে নিলো গলায়, সহসা মুখবিবর চুপসে গেছে আমস*ত্ত্বের ন্যায়। দ্বিতীয়বার আবিরের দিকে তাকানোর স্পর্ধা টুকু হয় নি অষ্টাদশীর। এরমধ্যে মালিহা খান ছেলে আবিরের উদ্দেশ্যে বলে উঠলেন, 'তোর নতুন কোম্পানি টা কি না খুললে হয় না? তোর বাবা বিষয়টা ভালোভাবে নিচ্ছেন না। কেনো বাবাকে রাগিয়ে দিচ্ছিস..!! তোর বাবা তোকে অনেক ভালোবাসে। ' শাণিত স্বরে মায়ের দিকে তাকিয়ে আবির বলা শুরু করলো, "ছেলেরা সারাজীবন বাবাদের প্রিয় থাকতে পারে না। নিজের স্বপ্ন,ইচ্ছেকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে দূরত্ব বেড়ে যায় বাবা ছেলের। এটা অস্বাভাবিক কিছুনা। যদি বাবার স্বপ্ন বা ইচ্ছের হাল প্রতিটা ছেলে ধরতো তাহলে পৃথিবী এতটা এগিয়ে যেতো না, আমাকেও দেশ ছেড়ে এত বছর বাহিরে পড়ে থাকতে হতো না। আব্বু নিজে এই কোম্পানি শুরু করেছিল, ওনি যদি ওনার বাবার ইচ্ছেকে প্রাধান্য দিতেন তাহলে আজ এতদূর পৌছাতেন না । তাছাড়া

আমি তো বলি নি বাবার স্বপ্ন বাদ দিয়ে আমি আমার স্বপ্নকে প্রাধান্য দিবো। আমার স্ব*প্ন একান্তই আমার। আমি দুদিক ই সামলাবো তুমি এসব নিয়ে অযথা চি*ন্তা করে নিজের শরীর খারাপ করো না।' মালিহা খান চিন্তিত স্বরে বলে উঠলেন, 'এত চাপ আর দৌড়াদৌড়ি করে তো নিজে অসুস্থ হয়ে পরবি বাবা।' আবির গম্ভীর কণ্ঠে বলে উঠলো, "তোমাকে তো বললাম আমার জন্য দুশ্চি*ন্তা করতে হবে না।" তানভির মাঝখান থেকে বলে উঠলো, "ভাইয়ার জন্য চি*ন্তা করার মানুষ আছে বড় আম্মু, তুমি রিলা*ক্সে থাকতে পারো।" মেঘ এতক্ষণ নিরবে খেলেও এই কথা শুনামাত্রই ছোট দেহ কম্পিত হয় তার, আত*ঙ্কিত হয়ে তাকালো আবিরের দিকে, আবির তৎক্ষণাৎ ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালো তানভিরের দিকে, ওমনি মুখটা চুপসে গেলো তানভিরের। করুন স্বরে বললো, 'সরি ভাই' পিনপতন নীরবতা খাবার টেবিলে। কেউ কোনো কথা বলছে না। মেঘের মনটা সহসা খারাপ হয়ে গেলো। "তানভির আবিরের একনিষ্ঠ ভক্ত । এক কথায় দুজন দুজনের বেস্ট ফ্রেন্ড। আবির গুরুগম্ভীর স্বভাবের, রাগী, কথা কম বলে কিন্তু দিনশেষে আবিরের অপ্রকাশিত আবেগগুলো তানভিরকেই শেয়ার করে এসেছে এতবছর,এমনকি এখনও। আবিরের থেকেও বেশি তানভির ভালোবাসে আবিরকে। আবির যদি বলে সারারাত এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকবি, তানভির তাই করবে। অবশ্য করবে নাই বা কেনো, সেই কলেজ লাইফ থেকে রাজ*নীতি করার ইচ্ছে তানভিরের, পড়াশোনাতে তার বিশেষ আগ্রহ ছিল না । বড় আব্বু এবং আব্বুকেও

বলেছে কয়েকবার তাদের কড়া জবাব, রাজ*নীতি আমাদের পছন্দ না. এই বাড়ির কেউ রাজ*নীতি করবে না। একদিন বাধ্য হয়ে ভাইকে কল করেছে তানভির, ভালোমন্দ কথা শেষ করে তানভির ভয়ে ভয়ে বললো, 'ভাইয়া তোমার সাথে আমার একটু কথা ছিল!' আবির সাবলীল ভঙ্গিতে উত্তর দিয়েছিল সেদিন, 'রাজ*নীতি করতে চাস তাই তো?' তানভির নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিল না, আবির এত স্বাভাবিক ভাবে কথাটা বলছে' আবির: 'তুই রাজ*নীতি কর সমস্যা নাই। কিন্তু কিছু বিষয় মাথায় রাখবি, বিষয় টা দেখতে যতটা সহজ ততটাও সহজ না। একনিষ্ঠ এবং সৎ থাকতে হবে তোকে । দল,মত নির্বিশেষে তোকে সত্যের পথে চলতে হবে পা চা*টা স্বভাব যেনো না হয়। ' তানভির ভয়ে ভয়ে বললো, 'বড় আব্বু আর আব্বু তো রাজি হচ্ছে না' আবির হেসে উত্তর দিয়েছিল, 'ঐসব আমি সামলে নিবে, তুই আমায় কথা দে তুই তোর জায়গায় সৎ থাকবি, আর যেকোনো সমস্যা আমায় শেয়ার করবি' সেদিন খুশিতে তানভিরের চোখ টলমল করছিল, আবির সামনে থাকলে হয়তো জরিয়ে ধরে কেঁ*দে দিতো ছেলেটা, সেদিনই ভাইকে কথা দিয়েছে, ' 'সে সারাজীবন সৎ থাকবে এবং একনিষ্ঠ ভাবে রাজ*নীতি করবে। ' এরপর থেকে রাজ*নীতি সম্পর্কিত যত ঝামেলা আছে, কি করা দরকার, কোনটা করলে ভালো হবে সবই ভাইয়ের সাথে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তানভির । আজ সে ছাত্রলী*গের সহ-সভাপতি। সবটুকু ক্রেডিট আবিরের। আগামীবছর মে*য়র নির্বাচনের পরে নতুন করে সভাপতি করা হবে। তাই তানভির

চেষ্টা করছে যেন এইবার সভাপতি হতে পারে। ‘ তানভিরের রাজ*নীতির জন্য বাবা-চাচার সাথে আবিরের কথা-কাটাকাটি সেই শুরু থেকেই। কিন্তু আবিরের এক কথা, তানভির রাজ*নীতিই করবে। আজ সন্ধ্যায় ও বাবা-চাচার মুখের উপর বলেছিল তানভিরকে কোনো প্রকার বাঁধা যেনো না দেয়া হয়। তানভিরের জীবনে আবির গাছের ন্যায়, যার ছায়ায় তানভিরের অবস্থান। ভাই ছাড়া তানভির অসহায় । খাওয়া শেষ করে আবির নিজের রুমে চলে গেছে, তানভির ও চলে গেছে। কিন্তু বসে আছে মেঘ, সে খাবার টেবিলে সবার আগে এসেছিল, ভেবেছিল ভাইয়ের আগে খেয়ে পালাবে কিন্তু তা আর হলো কই আবিরের জীবনে কেউ আছে এই কথাটায় মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে অষ্টাদশীর, ভাতের প্লেটে আঙুল ঘুরাচ্ছে আর ভাবছে, ‘আমার ছোট্ট মন টা এভাবে ভেঙে গেলো, প্রেমে পরার আগেই ব্রেকাপ হয়ে গেলো, ছিঃ’ তৎক্ষনাৎ নিজের মনকে নিজেই সান্ত্বনা দিচ্ছে, থাক মন খারাপ করিস না, ছেলেটা ভালো না,মনে নেই তোকে ছোট বেলা মেরেছিল, আস্ত হিট*লার, তোর জীবনে রাজপুত্র আসবে যার জীবনে রাজ করবি শুধু তুই,’ মালিহা খান মেঘের হাতে পুনরায় ধাক্কা দিয়ে বললো, থাক তোর আর খেতে হবে না, এতে হুঁশ ফিরে মেঘের। মেঘ কিছু বলার আগেই খাবারের প্লেট সামনে থেকে নিয়ে যান ওনি। বড় আম্মুর এসব কর্মকাণ্ডে আহাম্মক বনে যায় মেঘ। মালিহা খান বলে উঠেন: এভাবে ১৪ ঘন্টা ভাত নিয়ে বসে থাকলে বি*ষ হয়ে যাবে খাবার। মেঘেরও খাবার খাওয়ার তেমন ইচ্ছে নেই আর। সে তো নিজেকে সা*ন্ত্বনা

দিতে ব্যস্ত। হাত টা ধৌয়ে রুমের দিকে যাচ্ছে। মালিহা খান মেঘকে ডেকে আবার বললেন তোর কি পেট ভরেছে নাকি নতুন করে খাবার দিব তোকে, আর খাবো না' এটুকু বলে রুমে চলে আসে মেঘ ।
পড়তেও ইচ্ছে করছে না মেয়েটার, চুপচাপ শুয়ে আছে। চোখ বন্ধ করতেই ভেসে উঠে, 'আবিরের হাসি, বাইক এনে যখন হাসি মুখে বলছিল কথা গুলো কানে ভেসে আসছে, কি সুন্দর করে কথা বলে মানুষ টা, তাকানোর ধরন, রাগলে কুঁচকে ফেলা ঘন ভ্রু দুলো সবই যেনো চোখের সামনে ভাসছে মেঘের। ' সঙ্গে সঙ্গে চোখ খুলে ফেলে মেঘ, বুক ভে*ঙে আসে কষ্টে। এই লোক আমার ভাবনায় কেনো আসছে বার বার, এই লোক তো অন্য কারো। এই বলে অভিমানে ঘুমিয়ে পরে মেঘ। আজ শুক্রবার সকালে থেকে বাড়িতে হৈচৈ শুরু হয়ে গেছে। মীম, আদি আর মেঘ দুষ্টামি, আড্ডায় মাতিয়ে তুলেছে ড্রয়িংরুম। তিন ঝা রান্নায় ব্যস্ত। আবির বাড়ি ফিরেছে বলে আবিরের দুই মামা, দুই খালা তাদের বাচ্চারা সবাই দেখতে আসবে, মীম আর মেঘের মামা,খালাদের বাড়ি থেকেও বেড়াতে আসবে মানুষ।
বেশিরভাগ মানুষ ই চাকরিজীবী যার ফলে শুক্রবার ছাড়া কারও সময় নেই। ইকবাল খান ব্যস্ত বাজার করা নিয়ে। যখন যা লাগছে ওনি ছুটছেন আনার জন্য। তানভিরের সকাল থেকে কোনো খোঁজ নেই, সকালে নাস্তা করে বেরিয়েছে, পার্টি অফিসে কাজ আছে, বিকালে ফিরবে বলে চলে গেছে। এজন্য মেঘের কোনো ভয় ডর নেই। আপন মনে আড্ডায় মগ্ন মেয়েটা। হঠাৎ উপরে করিডোর থেকে আবির ডাক

দিলো মাকে, ‘আম্মু একটু কফি দিতে পারবে’ এই বলে রুমে চলে গেলো পুনরায়, “উত্তর শুনারও প্রয়োজন মনে করে নি সে । ” মালিহা খান কফি করে মেঘকে ডাক দিলেন, ‘কফি টা আবিরকে দিয়ে আয় তো মা!’ তৎক্ষনাৎ মেঘের মনে পরে গেলো গতরাতে কথা, সহসা বলে উঠলো, আমি কেনো মীম দিয়ে আসুক। মালিহা খান কিছুটা বিরক্তি নিয়ে বললো, ওরা নিলে ফেলে দিবে, তখন আরেক মুসিবতে পড়বো, বাড়িতে একটু পর মেহমান আসবে যা না মা। মেঘ আর কথা না বাড়িয়ে ধীর পায়ে পায়ে হাঁটতে হাঁটতে আবিরের দরজা পর্যন্ত আসলো। গলা শুকিয়ে যাচ্ছে মেঘের, বুকের ভেতরের ধুকপুক টা বেড়ে যাচ্ছে , হাত- পা কাঁপছে। আস্তে আস্তে দরজায় টুকা দিলো মেঘ আবির: দরজা খুলা আছে কাঁ*পা কাঁ*পা হাতে দরজা ধাক্কা দিলো মেঘ। আবির ল্যাপটপে কি যেনো করছে। তাকিয়েও দেখলো না কে এসেছে। আবির: এখানে রেখে যা মেঘ হাঁটতে পারছে না, হাত আরও বেশি কাঁপছে এখন, পায়ে একটুকু জোর পাচ্ছে না। ঠায় দাঁড়িয়ে আছে আগের জায়গায় আবির ল্যাপটপ টেবিলে রেখে মেঘের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে, হাত থেকে কফির কাপ টা নিয়ে ড্রেসিং টেবিলের সামনে রাখে, মেঘের সেদিকে কোনো মনোযোগ নেই, তার মস্তিষ্কের প্রতিটা নিউরন ছুটছে এদিক সেদিক। বডিস্প্রের তীব্র ঘ্রাণে হুঁশে ফেরে মেঘ, তার থেকে এক ফুটের দূরত্বে দাঁড়িয়ে আছে আবির, আচমকা এইভাবে এসে দাঁড়ানোয় একটু ভ্যাবাচেকা খেলো মেয়েটা। মেঘ ত্রস্ত ঘুরে গেলো নিজের উপর জোর খাটিশে পা বাড়ায় দরজার দিকে।

সবেগে,সুদূর হস্তে মেঘের কনুই চেপে ধরলো আবির, কড়া কণ্ঠে বললো, ‘এদিকে তাকা’ অনিচ্ছা স্বত্তেও ঘুরে দাঁড়ালো মেঘ। চিবুক নেমে গলায় আটকালো, সারা শরীর কাঁপছে, শীতল স্বরের হুমকিতে কানের লতি গরম হয়ে যাচ্ছে সাথে আবিরের শরীরের আর বডিস্প্রের তীব্র গন্ধ নাকে লাগছে মেঘের। আবির পুরু কণ্ঠে বলল, ‘কফিটা টেবিলে দিয়ে আসতে বলেছিলাম কথা কানে যায় না?’ এতটুকু বলতেই মেঘ হেলেদুলে পড়ে যেতে নেয় টালমাটাল মেয়েটার বাহু ধরে সোজা দাঁড় করিয়ে দিলো আবির, জ্ঞান হারাতে হারাতেও যেন হারায় নি মেঘ, আবিরের চাউনীতে তীক্ষ্ণতা গম্ভীর কণ্ঠে বললো, ‘তুই কি পুষ্টিহীনতায় ভুগছিস? অবশ্য ভুগবি নাই বা কেন, খাবার প্লেটে আঙুল ঘুরালে কি আর শরীরে পুষ্টি হবে!’ প্রথমে গম্ভীর কণ্ঠে বললেও শেষটা যেনো মজার ছলেই বললো।। মেঘের শরীর ঘামছে, কে বুঝাবে এই লোকটাকে, যাকে দেখলে অষ্টাদশীর সব শক্তি নিমিষেই মিলিয়ে যায় কোথায় যেন, যার দৃষ্টি কেঁ*ড়ে নেয় তার সমস্ত ধ্যান-জ্যান,মনোনিবেশ। আবির সাবলীল ভঙ্গিতে বলে উঠলো, ‘যেতে পারবি নাকি দিয়ে আসবো?’ নিজেকে সামলে মেঘ বললো,’পারবো। তারপর গুটিগুটি পায়ে রুম থেকে বের হয়ে যায় মেঘ!’ আবির তাকিয়ে আছে অষ্টাদশীর হাঁটার পানে। মেঘ কোনোরকমে নিজের রুম পর্যন্ত এসেছে,এক দৌড়ে এসে খাটে শুয়েছে, মন মস্তিষ্ক অস্বাভাবিকভাবে লাফালাফি করছে। কয়েক মুহুর্তের মধ্যে নিজের অস্তিত্ব খোঁজে পেলো না। সেন্স হারিয়ে পরে আছে বিছানায়। ১১ টার পর থেকে মেহমান

আসা শুরু হয়েছে। বাড়িঘর ভরে গেছে আত্মীয় স্বজনে। মীম, আদি গোসল করে সেজেগুজে গল্প করছে সবার সাথে, আবির একেবারে নামাজের সময় ঘর থেকে বের হয়েছে। টুপি, পাঞ্জাবি পড়ায় অন্যান্য দিনের থেকেও অনেক সুন্দর লাগছে ছেলেটাকে। সবাইকে সালাম দিয়ে টুকটাক কথা বলে মামাদের সাথে বেরিয়ে যায় নামাজ পরতে।। মেঘের দেহ এখনও বিছানায় লেপ্টে আছে। বোনকে খোঁজতে মীম উপরে গিয়ে দেখে মেঘ ঘুমাচ্ছে। ডাকতে ডাকতে মেঘের ঘুম ভাঙে, মীম: আপু, ও আপু উঠো। এখন ঘুমাচ্ছো কেনো? বাড়িতে মেহমান চলে আসছে। আজান পরে গেছে অনেকক্ষণ আগে উঠো, নামাজ পরে রেডি হও আম্মু আমায় পাঠাইছে তোমায় ডাকছে। কিছুক্ষণ পর মেঘের জ্ঞান ফেরে, পাশের দেয়ালে টানানো দেয়াল ঘড়ির দিকে তাকায় ১.১৫ বাজে। তৎক্ষনাৎ শুয়া থেকে উঠে বসে। আবিরকে কফি দিতে গেছিলো ৮.৩০-৯ টার মধ্যে। ৪ ঘন্টার উপরে তার জ্ঞান ছিল না। ৫ মিনিট বসে তারপর গোসলে চলে যায়। নামাজ পরে আবিরের দেয়া একটা জামা পরে নিলো মেঘ, বেগুনি রঙের গাউন, মোটামুটি গর্জিয়াস । চুল গুলো খোঁপা করে নিলো, এত লম্বা চুল ছেড়ে রাখলে কিছুই করতে পারবে না সে। মুখে হালকা ফেসপাউডার দিয়ে, গোলাপি রঙের লিপস্টিক দিলো হালকা করে। রুম থেকে বের হলো প্রায় ৩ টার দিকে। মামা খালারা সবাই খেতে বসেছে। ছোটদের খাওয়া শেষ। রুম থেকে বের হয়ে করিডোর দাঁড়িয়ে পরিস্থিতি বুঝার চেষ্টা করছে সে। বাড়িতে এত হৈ-হুল্লোড়ের শব্দে মাথা ধরে ফেলছে মেঘের। নজর

পরে সোফার দিকে, আবিরকে ঘেরাও করে বসে আছে সব মামালো খালাতো ভাই বোনরা, তারমধ্যে একজনের দিকে নজর পরে স্পেশাল একজন, মালা আপুর দিকে, মালা আপু অনার্স ৩য় বর্ষে পড়তেছে এখন, আবির ভাইয়ার মামাতো বোন, মালা আপুর একটা বড় আপুও আছে ওনি মাইশা। ওনার পড়াশোনা শেষ, জব করতেছেন এখন। দুই বোন ই এসেছেন। কিন্তু মালা আপুর দৃষ্টি কেমন জানি, আবির ভাইয়ার দিকে এমন ভাবে তাকিয়ে আছে যেনো চোখ দিয়েই গিলে খাবে আবির ভাই কে। বিষয়টা দেখেই মেঘের মেজাজ গরম হয়ে গেছে তৎক্ষনাৎ মনে পরে গেলো রাতের কথা, তানভির ভাইয়া তে বলেছিল আবির ভাই এর জীবনে কেউ আছে। মালা আপুই কি সেই কেউ টা। ভাবতেই বুক ভরে উঠে কষ্টে। আবিরের সমবয়সী একটা ভাইয়া আছে নাম সাকিব।। ওনি আবির ভাইয়ার দ্বিতীয় বেস্ট ফ্রেন্ড বলা চলে। আরও কয়েকটা ছোট ভাই আবির ভাইকে এটা সেটা অনেক কথা জিজ্ঞেস করছে, বিদেশে কেমন লাগে, পড়াশোনা কেমন, কিভাবে থাকতে হয় এসবই। মেঘ ধীরস্থির পায়ে সিঁড়ি দিয়ে নামছে, আবির এক পলক তাকায় সেদিকে পুনরায় ভাইদের কথায় মনোযোগ দেয়। মেঘকে দেখে ২-৪ জন ডাক শুরু করে, এই মেঘ কেমন আছিস, এদিকে আয়। মীম ছুটে আসে মেঘের দিকে, 'আপু তোমাকে অনেক সুন্দর লাগছে মাশাআল্লাহ নজর না লাগে কারো!' মেঘ মুচকি হাসলো মীম মেঘকে টেনে নিয়ে সোফায় বসালো, সবার সাথে কথা বলতে বলতে হঠাৎ দৃষ্টি পরে আবির ভাইয়ার দিকে, উপর থেকে সে

শুধু মালা আপুর নজর টায় দেখেছে। এখন সে আবিরকে দেখছে, নীল পাঞ্জাবি, সাদা প্যান্ট, মাথায় টুপি আহা কত মায়াবী লাগছে । আবিরের হাস্যোজ্জল মুখটা দেখে প্রেমে পরে গেছে মেঘ। যত্রতত্র দৃষ্টি সরিয়ে বাকিদের সাথে কথা বলায় ব্যস্ত হলো। বড়দের খাওয়া শেষ। মেঘ উঠে সবাইলে সালাম দিয়ে খুশগল্প করতে লাগে, খালামনি দের অনেক দিন পর দেখছে। আগে বিয়েতে গেলে টুকটাক দেখা হতো কিন্তু তানভিরের অত্যাচারে মেয়েটা বিয়ে বাড়িতে যাওয়া ছেড়ে দিছে তাই মামি আর খালাদের সাথে দেখায় হয় না। মামা অবশ্য মাঝে মাঝে দেখতে আসে, এটা সেটা নিয়ে আসে। সারাদিনের ঘুরাঘুরি শেষে সবাই নিজেদের বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। থাকার জন্য বলেছে সবাই কিন্তু চাকরিজীবীদের কাছে বেড়ানো মানেই কয়েক ঘন্টা । বিদায় বেলায় মালা আপুর আরচণে মাথায় রক্ত উঠে যায় মেঘের, ভালো করে বললেই হয় বেড়াতে যাবেন’ গায়ে ঢলে পরার কি আছে আশ্চর্য, মালার এরকম আচরণে আবির ভাই তৎক্ষনাৎ সরে না গেলে তো উপরে পরে যেতো এই মেয়ে। রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে মেঘ নিজের রুমে চলে যায়। মেহমানদের বিদায় দিয়ে আবিরও বাইক নিয়ে বেরিয়ে পরে কোথায় যেনো।মাঝখানে তানভির একবার এসেছিল সবার সাথে দেখা করে আবার বেরিয়ে গেছে। পার্টি অফিসে কি নিয়ে ঝামেলা চলছে তাই বসার সময় হয় নি তার। মেঘ নিজের রুমে দরজা বন্ধ করে কাঁদতে লাগলো। কিন্তু কেনো কাঁদছে সে নিজেও জানে না । অতিরিক্ত রাগে কান্না আসে মেয়েটার।মেঘ বরাবর ই খুব

অভিমানি। অল্পতেই কান্না করে দেয়।। রাত ১০ টা বেজে গেছে এখনও মুখ ফুলিয়ে রুমে বসে আছে মেয়েটা। সারাদিন খাওয়া নেই। তড়িঘড়ি করে তানভির বাড়িতে ঢুকে। এসেই মাকে জিজ্ঞেস করে, “মেঘ খেয়েছে?” হালিমা খান সহসা উত্তর দিলেন, ” সন্ধ্যার পর থেকে এত ডাকছি দরজায় তো খোলছে না।” তানভির আর কথা বাড়ালো না তড়িৎগতিতে ছুটে গেলো বোনের দরজার সামনে, প্রথমে আস্তে করে ডাকলো। মেঘের সারা নেই, আচমকা চোয়াল শক্ত করে একপ্রকার চিৎকার দিলো, ‘মেঘ তুই এই মুহুর্তে দরজা না খুললে তোর কপালে শ*নি আছে বলে দিলাম।’ মেঘ শুয়া থেকে এক লাফে উঠে বসলো। কয়েক সেকেন্ডে দৌড়ে গিয়ে দরজা টা খুললো। চোখ তুলে তাকানোর সাহস নেই ভাইয়ের দিকে। আজ পর্যন্ত তানভির মেঘের গায়ে হাত তুলে নি শুধু ধ*মক ই দেয়। কিন্তু ভাইকে এক বিন্দু বিশ্বাস করে না মেঘ। কখন আবির ভাইয়ের মতো নাক মুখে মারবে থা*প্পড় বিশ্বাস নেই। দরজা খুলতেই নরম স্বরে তানভির বললো, ‘খেতে যা’ “মেঘ তানভিরের এত নরম স্বর কোনোদিন শুনে নি,ভাবতেই পারছে ভাইয়া তাকে এত ভালোবেসে খেতে বলছে।” তানভির: খাওয়া শেষ হলে তোর ফোন টা দিস, তোকে একটা ফেসবুক আইডি খুলে দিব। তানভিরের এমন কথায় মেঘ আহাম্মক বনে গেলো । তানভির ভাই বরাবর ই এরকম। নিজেই ঝাড়বে তারপর নিজেই আদর করবে, এটা সেটা কিনে আনবে মেঘের জন্য। কিন্তু আজকের বিষয় টা সম্পূর্ণ ভিন্ন। এত নরম স্বর কখনো শুনেনি

এর আগে। নিমিষেই মনটা খুশিতে ভরে গেলো মেঘের। খাবার টেবিলে বসে আপন মনে খাচ্ছে মেঘ, আজকে তার পছন্দের অনেক রেসিপি আছে, একটু একটু করে সব চেক করছে। কিন্তু রাগে ফুঁসফুস করছে মেঘের আম্মু হালিমা খান। হালিমা খান: "সন্ধ্যা থেকে যে তোকে এতবার ডাকতে গেলাম বের হলি না কেন? ঠিক ই ভাইয়ের ভয়ে বের হয়ে আসলি। আমাকে কেনো কষ্ট দেস। তোকে কে কি বলে দুই দিন পর পর না খেয়ে পরে থাকিস। কিছুদিন পরে যে এডমিশন। না খেলে পড়বি কিভাবে, আর না পড়লে ভর্তি হবি কিভাবে। তুই ও তোর ভাইয়ের মতো হচ্ছিস, সে সারাদিন ভন্ডের মতো টুইটুই করে ঘুরে আর তুই ও এখন তার ভাব নিচ্ছিস। খেয়ে না খেয়ে রুমে পরে থাকিস। আর শুন মেয়ে মানুষের এত রাগ জেদ ভালো না, তোর এই রাগ জেদ সামলানোর জন্য আমরা সারাজীবন তোর পাশে থাকবো না । " এতটুকু বলতেই চোখ পরে ড্রয়িং রুমে দাঁড়ানো আবিরের দিকে। আবিরের চাউনিতে পরিষ্কার রু*ষ্টতা, শ্যামবর্ণের মুখমন্ডল কালো দেখাচ্ছে, ক*ড়া কণ্ঠে মামনির দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলো, "কি হয়েছে?" পুরুষালি কণ্ঠে আঁতকে উঠে মেঘ। হালিমা খান গলা নামিয়ে উত্তর দিলো, "খায় না ঠিক মতো, পড়াশোনা করে না কি করবো ওকে নিয়ে" আবির পূর্বের অভিব্যক্তি বজায় রেখে উত্তর দিলো, "ওকে কিছু বলো না, কাল থেকে মেঘ টাইম টু টাইম খাবে, একটু এদিক সেদিক হলে সেটা আমি দেখবো।" আবিরের কথায় খুশি হয়ে গেলো হালিমা খান।। কিন্তু মেঘ খুশি হবে

নাকি ভয় পাবে তা বুঝে উঠতে পারলো না। এতবছরে অভিমান করে মাঝে মাঝে না খেয়ে থাকলে তানভির এসে ধমকে বা বুঝিয়ে খাওয়াতো এখন সেই দায়িত্ব নিতে যাচ্ছে আরও একজন। ২ জন মিলে মেঘ কে শাসন করবে ভাবতেই মেঘের বুক কেঁপে উঠে আবার মনের মধ্যে অন্য রকম প্রশান্তিও কাজ করে মেঘের।। আবির ভাই এর মূল্যবান সময়ের মধ্যে ৫ মিনিট সময় যে মেঘ কে নিয়ে ভাববে এতেই খুশি খুশি লাগছে মেঘের। তৎক্ষণাৎ মনে হয়ে গেলো তানভির ভাইয়া বলেছে ফেসবুক আইডি খুলে দিবে, তাড়াতাড়ি খেয়ে রুমের দিকে ছুটলো মেঘ। রুম থেকে ফোন নিয়ে ছুটে গেলো তানভির ভাইয়ার রুমে কিন্তু তানভির ভাইয়া রুমে নেই।। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলো কিন্তু কোথাও নেই। মোবাইল নিয়ে নিজের রুমে ঢুকতে যাবে হঠাৎ শুনতে পেলো তানভিরের কণ্ঠ। কিন্তু কোথায় আছে বাধ্য হয়ে মেঘ জোরে ডাক দিলো, “ভাইয়া!” তানভির পাশের রুম থেকে উত্তর দিলো, “আবির ভাইয়ার রুমে আমি, আয়।” আবির ভাই নাম টা শুনেই মেঘের বুকটা হুহু করে উঠে চিন্তায়, নিজেকে নিজে সাহস দেয়ার চেষ্টা করলো । তারপর গুটিগুটি পায়ে হেঁটে দরজায় দাঁড়ালো। তানভির: ভেতরে আয় মেঘ: মেবাইল টা দিয়ে যায়, তুমি কাজ করো। তানভির: আরে ভেতরে আয়। বস তুই, তোকেও দরকার লাগবে। মেঘ আর কথা না বাড়িয়ে চুপচাপ খাটের কর্ণারে বসলো। আবির নেই রুমে, ওয়াশরুমে আছে মনে হয়। তানভির ফোন নিয়ে কি যেনো করছে, তখন ই ওয়াশরুম থেকে বের হলো আবির মেঘের দৃষ্টি পরে

সেদিকে, একটা ছাই রঙের টিশার্ট আর একটা ব্ল্যাক টাওজার, ভেজা চুল গুলো থেকে টপটপ করে পানি পরছে। শরীরের টিশার্ট টা অনেকটায় ভিজে গেছে।। মেঘ টেনে হিঁচড়ে দৃষ্টি নামিয়ে আনলো, মনে মনে ভাবছে, একটা মানুষ এত কিউট কিভাবে হয়,যদি পারতাম আমার পড়ার টেবিলে সাজিয়ে রাখতাম, সারাদিন পড়তাম আর দেখতাম। তাহলে আমার মন কখনোই খারাপ হতো না!লোকটা ফর্সা নন, শ্যামলা গায়ের রঙ কিন্তু দেখতে মারা*ত্মক সুন্দর। সবচেয়ে মারা*ত্মক ওনার লুক, তাকানোর স্টাইল। উফ,যতবার দেখছি ততবার ই নতুন করে ক্রাশ খাচ্ছি! আবির ভাই খাটের অপর পাশে মোবাইল হাতে নিয়ে বসেছেন। তানভির ভাইয়া মোবাইলে ফেসবুক অপশনে ক্রিয়েট নিউ একাউন্ট এ ঢুকতেই তানভির ভাইয়ার ফোনে কল আসে। দাঁড়িয়ে পকেট থেকে ফোন বের করে রিসিভ করে কথা বলা শুরু করে। ওমনি মেঘের মেবাইলটা আবিরের হাতে দিয়ে বলে ভাইয়া তুমি ওরে একাউন্ট টা খুলে দাও আমার গুরুত্বপূর্ণ কল আসছে। এই বলে মোবাইল রেখে রুম থেকে বেরিয়ে চলে গেলেন। মেঘ বসে আছে চুপচাপ, মুখ তুলে তাকাতে সাহস পাচ্ছে না। বুকটা এখনও ধুকপুক করছে। আবির মেঘের মোবাইলে নিজের মতো করে ফেসবুক একাউন্ট খুলছে, জন্মতারিখ, সাল,নাম কিছু জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন মনে করছে না ওনি। সবকাজ শেষ করে ফোনটা এগিয়ে দিলেন মেঘের দিকে। তখনি রুমে ঢুকলো তানভির। সহসা বলে উঠলো, শেষ? এই বলে ফোন টা নিজের হাতে নিলো।। ফেসবুকে ঢুকে

তানভিরের আইডি টা খোঁজে রিকুয়েষ্ট পাঠালো, আবিরের দিকে তাকিয়ে বললো, " ভাইয়া তোমাকে রিকুয়েষ্ট দেয়, এক্সেপ্ট করো নাকি!" আবির গম্ভীর কণ্ঠে বললো, "আমায় রিকুয়েষ্ট দিতে হবে না। " তানভির কথায় পাত্তা না দিয়ে কয়েক সেকেন্ড পর বললো, "ভাইয়া তোমায় রিকুয়েষ্ট পাঠিয়েছি। Accept করে নিও। না হলে আমার ছোট্ট বোনটা কষ্ট পাবে।" আবির তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তানভিরের দিকে। মেঘ মনে মনে খুশিই হলো ভাইয়ের কথায়, মেঘের তো কখনো সাহস ই হতো না আবির ভাই কে রিকু*য়েষ্ট দেয়ার বা এক্সে*প্ট করার কথা বলার। তানভির সেদিকে গুরুত্ব না দিয়ে, মেঘের হাতে ফোন দিয়ে বললো, তুই এখন যা, আমি আর ভাইয়া এক্সেপ্ট করে নিবো। তুই কি করিস না করিস সব নজরে রাখবো কিন্তু। মেঘ কোনো কথা না বলে মাথা নিচু করেই রুমে চলে আসলো মোবাইল নিয়ে। মেঘ রুমে এসে বিছানায় শুয়ে ফেসবুকে ঢুকতেই নজরে পরলো, 'Sazzadul Khan Abir' Accept your friend request. মেঘ শুয়া থেকে উঠে বসে, মেঘের খুশি দেখে কে, Friendlist এ একমাত্র ফ্রেন্ড সেটায় আবির ভাই। তার একটা স্ক্রিনশট রেখে দিল মেঘ। তার ৫ মিনিট পর এক্সে*প্ট করলো তানভির ভাই। আবির ভাইয়ার আইডিতে ঢুকলো, প্রোফাইল পিকটা নতুন কেনা বাইকে বসা, "একদম ওয়াও।" কভার ফটো সবুজ ঘাসের মাঝে বাইক টা রাখা তার সামনে বাইকে হেলান দিয়ে বসা আবির ভাই, ছবিটা "ওহ মাই গড, ওয়াও!" সবগুলো ছবি দেখে দেখে

ডাউনলোড করছে মেঘ। যত দেখছে ততই পাগ*ল হয়ে যাচ্ছে মেয়ে টা।মনে হয় পাবনা যেতে বেশিদিন লাগবে না। তারপর মোবাইল রেখে ঘুমানোর চেষ্টা করলো, চোখ বন্ধ করতেই চোখের সামনে ভেসে আসছে একটার পর একটা স্টাই*লিশ ছবি। কখন যেনো ঘুমিয়ে পরেছে মেয়েটা। আজ শনিবার, আবিরের অফিসে যাওয়ার দিন। সকাল সকাল উঠে শাওয়ার নিয়ে ফিটফাট হয়ে রেডি হয়ে পরেছে আবির। ৭.৩০ বাজে মাত্র । নিজের রুম থেকে বের হয়ে করিডোর দিয়ে দ্রুত হাঁটছে হঠাৎ মেঘের দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়ে দরজায় ডাক দেয়, ২ বার ডাকতেই ঘুমন্ত মেঘ, ঘুমে টলতে টলতে দরজা খুলে, সামনে দাড়িয়ে আছে আবির ভাই। নিজের চোখকে যেনো বিশ্বাস ই করতে পারছে না, প্রথমে ভেবেছে এটা স্বপ্ন, তারপর এদিক সেদিক তাকিয়ে বুঝলো এটা বাস্তব। আচমকা এইভাবে আবিরকে দাঁড়ানো দেখে ভ্যাবাচেকা খেল মেয়েটা। মেঘের চেহারায় নিদ্রিত ভাবটা লেপ্টে আছে এখনও। আবির পূর্ণ দৃষ্টিতে পরখ করলো অষ্টাদশী রাঙা মুখবিবর তারপর চোখ সরিয়ে নিয়ে বললো, " ৫ মিনিটের মধ্যে খেতে আয় " পুনরায় দ্রুতগতিতে হাঁটা দিলো। আবিরের অযাচিত উপস্থিতি নাড়িয়ে দিয়েছে মেঘের মস্তিষ্ক। হঠাৎ মনে পরে গেলো ৫ মিনিটে নিচে যেতে হবে। তৎক্ষনাৎ ছুটলো ওয়াশরুমে।। ৫ মিনিটের মধ্যে নিচে উপস্থিত হলো মেঘ। এই সময় মেঘকে খাবার টেবিলে দেখে অবাক হলো সকলে, ২ বছর যাবৎ মেয়েটা সকালে সবার সাথে খায় না, প্রাইভেট থাকলে আগে খায় না

হয় সবাই অফিস বা স্কুলে চলে গেলে তারপর খেয়ে কলেজে যায়। হালিমা খান ছুটে আসলেন মেয়ের দিকে," আয় আয় বস মা, কি খাবি বল!" টেবিলের কাছে আসতেই দেখলো একটা চেয়ার ই ফাঁকা আছে সেটা আবার আবির ভাইয়ের বিপরীতে। কিন্তু এখানে বসার বিন্দু পরিমাণ ইচ্ছে নেই তার। কারণ আবিরের আশেপাশে থাকলে মেঘ কেমন একটা ঘোরে থাকে। মন,মস্তিষ্ক সব যেনো আবিরের নিয়ন্ত্রণে থাকে। কিন্তু কিছু করার নেই। বাধ্য হয়ে বসতে হলো এই চেয়ারে। আবির মাথা নিচু করে মনোযোগ দিয়ে খাচ্ছে, মেঘ তখন ঘুমে টলতে টলতে আবির কে দেখেছিল রাজপুত্রের মতো, কিন্তু এখন আর সে তাকাতে পারছে না। শীর্ণ বক্ষ ধরফর করছে মেঘের, মনে মনে খুব করে চাচ্ছে একটু তাকিয়ে আবিরকে দেখতে। কিন্তু মনে হচ্ছে কিছু একটা মাথায় চেপে বসে আছে, মুখ টায় তুলতে পারছে না। আলী আহমদ খান হঠাৎ বলে উঠলেন, 'মেঘ মা আজ থেকে তোমার নতুন টিউটর আসবে। সারাদিন তে তুমি বাহিরে থাকবে তাই তাকে সন্ধ্যার পর আসতে বলেছি। " মেঘ চুপচাপ খাবার খাওয়ার চেষ্টা করছে, বুকের ভেতর যে ঝড় তুফান চলছে তা যেনো কেউ বুঝতে না পারে। আবির সবার আগে খাবার শেষ করে বাসা থেকে বের হয়ে গেলে। আবিরের পেছন পেছন আলী আহমদ খান, মোজাম্মেল খান ও ইকবাল খান ও চলে গেলেন। ইকবাল খান আগেই অফিসে জানিয়ে দিয়েছে অফিস যেনো সাজিয়ে গুছিয়ে রাখে, আবির অফিসের সামনে এসে বাইক পার্ক করে অফিসে ঢুকতে গেলে সিকিউ*রিটি গা*র্ড বলে

উঠেন, স্যার আপনার একটু বসতে হবে, বড় স্যাররা না আসলে আপনি ভেতরে যেতে পারবেন না। আবিরের পায়ের র*ক্ত মাথায় উঠে যাচ্ছে। রা*গে কটমট করতে করতে ওয়েটিং রুমে বসে আছে সে। ১০ মিনিটের মধ্যেই অফিসে ঢুকলেন তিন ভাই। আবির তখনও বসেই আছে। কিছুক্ষণ পর সিকিউ*রিটি গা*র্ড এসে ডাকলেন, "স্যার আপনাকে ভেতরে যেতে বলেছে!" আবির নি*র্ভীক ভঙ্গিতে হেটে ভেতরে চলে গেলো। অফিসের ভেতরে ফুল দিয়ে সাজানো, ঢুকতেই সবাই হাততালি দিয়ে কংগ্রাচুলেশন জানচ্ছে আবিরকে। দুএকজন ছবি তুলায় ব্যস্ত। বাবা – চাচা তিন জন আর আবির মিলে একটা কেক ও কাটলো। তিন ভাইয়ের তো আজকে খুশির দিন। বংশের বড় ছেলে তাদের কোম্পানির হাল ধরতে যাচ্ছে। এর থেকে বড় পাওয়া আর কি আছে। তানভিরের মতে আবির যদি মুখের উপর বলে দিতো আমি ব্যবসা সামলাবো না তখন তো কিছুই করার ছিল না। আবির যেহেতু মেনে নিয়েছে এতেই হবে। ঘন্টাখানেক হলো আবির অফিসে এসেছে। এরমধ্যে চাচ্চু ইকবাল খান ভাতিজাকে সব কাজ কর্ম বুঝিয়ে দিতে ব্যস্ত। অন্যদিকে আলী আহমদ খান এবং মোজাম্মেল খান আজ আড্ডায় মগ্ন।। তাদের মাথা থেকে সব চাপ চলে গেছে। দুই ভাই মিলে চা খাচ্ছে, খুনশুটি করছে। এত বছরের ব্যবসায়িক জীবনের অবসানের সময় এসেছে এবার। সারাদিন আবিরের ব্যস্ততায় কাটে, প্রথম দিনের অফিস, দায়িত্ব বুঝে নেওয়া বিশাল চাপ। মাঝখানে একবার সময় করে বাবা চাচাদের সাথে তুলা একটা ছবি ফেস*বুকে

শেয়ার ও করেছিল। ৬ টায় বাসায় ফিরেছে আবির। এসেই সোজা রুমে চলে গেছে, শাওয়ার নিয়ে রেস্ট নিচ্ছে। হয়তো ঘুমিয়ে পরেছিল।দূর স্বপ্নই দেখলো কি না আচমকা উঠে বসলো বিছানায়। আবিরের চোখে-মুখে উদ্বেগ স্পষ্ট। তড়িঘড়ি করে রুম থেকে বের হয়ে নিচে আসলো। পরিস্থিতি স্বাভাবিক, মালিহা খান এবং হালিমা খান কাজে ব্যস্ত। আদির আম্মু আদিকে নিয়ে পড়াতে বসেছেন। মীম ও হয়তো পড়ছে নিজের রুমে । কয়েক মুহুর্ত সোফায় বসে আবার উঠে রান্নাঘরের দিকে গেলো। হালিমা খানের দিকে তাকিয়ে ঠান্ডা কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো, “মেঘ কোথায় মামনি?” মেঘের টিউটর এসেছে, পড়ার ঘরে পড়াচ্ছে। আবিরঃ ওহ আচ্ছা। আমায় একটু কফি করে দিতে পারবে? হালিমা খান: একটু অপেক্ষা করো বাবা এখনি দিচ্ছি। আবির ছোট বেলা থেকেই নিজের মা মালিহা খানকে আম্মু, তানভিরের আম্মুকে মামনি আর আদির আম্মু কে কাকিয়া ডেকে অভ্যস্ত। এত বছরেও তার ডাকে পূর্বের ন্যায় মিষ্টতা মিশে আছে। সোফায় বসে কফি খাচ্ছে আর মোবাইল ঘাটাঘাটি করছে। ২০ মিনিট পর পড়ার রুম থেকে বের হলো একটা ছেলে বয়স হয়তো ২২-২৩ হবে। ৫.৭-৮ হবে লম্বা, চোখে চশমা। হালিমা খানকে বললো, “আন্টি আজ আসি আবার কাল আসবো” হালিমা খান ও হাসি মুখে বললেন, “আচ্ছা ঠিক আছে।” এদিকে আবিরের কোমলতা পাল্টে গেলো, চটে গেল ভীষণ, সবেগে ঘু*ষি বসাল সোফার পাশের দেয়ালে, আবিরের চোখ আগুনের মতো লাল হয়ে গেছে। একমুহূর্ত বসলে না, সোজা উঠে ধপধপ করে

সিঁড়ি দিয়ে উঠে নিজের রুমে চলে গেলো।মেঘ বরাবর ই খুব অভিমানি। অল্পতেই কান্না করে দেয়।। রাত ১০ টা বেজে গেছে এখনও মুখ ফুলিয়ে রুমে বসে আছে মেয়েটা। সারাদিন খাওয়া নেই। তড়িঘড়ি করে তানভির বাড়িতে ঢুকে। এসেই মাকে জিজ্ঞেস করে, "মেঘ খেয়েছে?" হালিমা খান সহসা উত্তর দিলেন, " সন্ধ্যার পর থেকে এত ডাকছি দরজায় তো খোলছে না।" তানভির আর কথা বাড়ালো না তড়িৎগতিতে ছুটে গেলো বোনের দরজার সামনে, প্রথমে আস্তে করে ডাকলো। মেঘের সারা নেই, আচমকা চোয়াল শক্ত করে একপ্রকার চিৎকার দিলো, 'মেঘ তুই এই মুহুর্তে দরজা না খুললে তোর কপালে শ*নি আছে বলে দিলাম।' মেঘ শুয়া থেকে এক লাফে উঠে বসলো। কয়েক সেকেন্ডে দৌড়ে গিয়ে দরজা টা খুললো। চোখ তুলে তাকানোর সাহস নেই ভাইয়ের দিকে। আজ পর্যন্ত তানভির মেঘের গায়ে হাত তুলে নি শুধু ধ*মক ই দেয়। কিন্তু ভাইকে এক বিন্দু বিশ্বাস করে না মেঘ। কখন আবির ভাইয়ের মতো নাক মুখে মারবে থা*প্পড় বিশ্বাস নেই। দরজা খুলতেই নরম স্বরে তানভির বললো, 'খেতে যা' "মেঘ তানভিরের এত নরম স্বর কোনোদিন শুনে নি,ভাবতেই পারছে ভাইয়া তাকে এত ভালোবেসে খেতে বলছে।" তানভির: খাওয়া শেষ হলে তোর ফোন টা দিস, তোকে একটা ফেসবুক আইডি খুলে দিব। তানভিরের এমন কথায় মেঘ আহাম্মক বনে গেলো । তানভির ভাই বরাবর ই এরকম। নিজেই ঝাড়বে তারপর নিজেই আদর করবে, এটা সেটা কিনে আনবে মেঘের জন্য।

কিন্তু আজকের বিষয় টা সম্পূর্ণ ভিন্ন। এত নরম স্বর কখনো শুনেনি এর আগে। নিমিষেই মনটা খুশিতে ভরে গেলো মেঘের। খাবার টেবিলে বসে আপন মনে খাচ্ছে মেঘ, আজকে তার পছন্দের অনেক রেসিপি আছে, একটু একটু করে সব চেক করছে। কিন্তু রাগে ফুঁসফুস করছে মেঘের আম্মু হালিমা খান। হালিমা খান: "সন্ধ্যা থেকে যে তোকে এতবার ডাকতে গেলাম বের হলি না কেন? ঠিক ই ভাইয়ের ভয়ে বের হয়ে আসলি। আমাকে কেনো কষ্ট দেস। তোকে কে কি বলে দুই দিন পর পর না খেয়ে পরে থাকিস। কিছুদিন পরে যে এডমিশন। না খেলে পড়বি কিভাবে, আর না পড়লে ভর্তি হবি কিভাবে। তুই ও তোর ভাইয়ের মতো হচ্ছিস, সে সারাদিন ভন্ডের মতো টুইটুই করে ঘুরে আর তুই ও এখন তার ভাব নিচ্ছিস। খেয়ে না খেয়ে রুমে পরে থাকিস। আর শুন মেয়ে মানুষের এত রাগ জেদ ভালো না, তোর এই রাগ জেদ সামলানোর জন্য আমরা সারাজীবন তোর পাশে থাকবো না । " এতটুকু বলতেই চোখ পরে ড্রয়িং রুমে দাঁড়ানো আবিরের দিকে। আবিরের চাউনিতে পরিষ্কার রু*ষ্টতা, শ্যামবর্ণের মুখমন্ডল কালো দেখাচ্ছে, ক*ড়া কণ্ঠে মামনির দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলো, "কি হয়েছে?" পুরুষালি কণ্ঠে আঁতকে উঠে মেঘ। হালিমা খান গলা নামিয়ে উত্তর দিলো, "খায় না ঠিক মতো, পড়াশোনা করে না কি করবো ওকে নিয়ে" আবির পূর্বের অভিব্যক্তি বজায় রেখে উত্তর দিলো, "ওকে কিছু বলো না, কাল থেকে মেঘ টাইম টু টাইম খাবে, একটু এদিক সেদিক হলে সেটা আমি দেখবো।"

আবিরের কথায় খুশি হয়ে গেলো হালিমা খান।। কিন্তু মেঘ খুশি হবে নাকি ভয় পাবে তা বুঝে উঠতে পারলো না। এতবছরে অভিমান করে মাঝে মাঝে না খেয়ে থাকলে তানভির এসে ধমকে বা বুঝিয়ে খাওয়াতো এখন সেই দায়িত্ব নিতে যাচ্ছে আরও একজন। ২ জন মিলে মেঘ কে শাসন করবে ভাবতেই মেঘের বুক কেঁপে উঠে আবার মনের মধ্যে অন্য রকম প্রশান্তিও কাজ করে মেঘের।। আবির ভাই এর মূল্যবান সময়ের মধ্যে ৫ মিনিট সময় যে মেঘ কে নিয়ে ভাববে এতেই খুশি খুশি লাগছে মেঘের। তৎক্ষণাৎ মনে হয়ে গেলো তানভির ভাইয়া বলেছে ফেসবুক আইডি খুলে দিবে, তাড়াতাড়ি খেয়ে রুমের দিকে ছুটলো মেঘ। রুম থেকে ফোন নিয়ে ছুটে গেলো তানভির ভাইয়ার রুমে কিন্তু তানভির ভাইয়া রুমে নেই।। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলো কিন্তু কোথাও নেই। মোবাইল নিয়ে নিজের রুমে ঢুকতে যাবে হঠাৎ শুনতে পেলো তানভিরের কণ্ঠ। কিন্তু কোথায় আছে বাধ্য হয়ে মেঘ জোরে ডাক দিলো, “ভাইয়া!” তানভির পাশের রুম থেকে উত্তর দিলো, “আবির ভাইয়ার রুমে আমি, আয়।” আবির ভাই নাম টা শুনেই মেঘের বুকটা হুহু করে উঠে চিন্তায়, নিজেকে নিজে সাহস দেয়ার চেষ্টা করলো । তারপর গুটিগুটি পায়ে হেঁটে দরজায় দাঁড়ালো। তানভির: ভেতরে আয় মেঘ: মেবাইল টা দিয়ে যায়, তুমি কাজ করো। তানভির: আরে ভেতরে আয়। বস তুই, তোকেও দরকার লাগবে। মেঘ আর কথা না বাড়িয়ে চুপচাপ খাটের কর্ণারে বসলো। আবির নেই রুমে, ওয়াশরুমে আছে মনে হয়। তানভির ফোন নিয়ে কি যেনো

করছে, তখন ই ওয়াশরুম থেকে বের হলো আবির মেঘের দৃষ্টি পরে সেদিকে, একটা ছাই রঙের টিশার্ট আর একটা ব্ল্যাক টাওজার, ভেজা চুল গুলো থেকে টপটপ করে পানি পরছে। শরীরের টিশার্ট টা অনেকটায় ভিজে গেছে।। মেঘ টেনে হিঁচড়ে দৃষ্টি নামিয়ে আনলো, মনে মনে ভাবছে, একটা মানুষ এত কিউট কিভাবে হয়,যদি পারতাম আমার পড়ার টেবিলে সাজিয়ে রাখতাম, সারাদিন পড়তাম আর দেখতাম। তাহলে আমার মন কখনোই খারাপ হতো না!লোকটা ফর্সা নন, শ্যামলা গায়ের রঙ কিন্তু দেখতে মারা*ত্মক সুন্দর। সবচেয়ে মারা*ত্মক ওনার লুক, তাকানোর স্টাইল। উফ,যতবার দেখছি ততবার ই নতুন করে ক্রাশ খাচ্ছি! আবির ভাই খাটের অপর পাশে মোবাইল হাতে নিয়ে বসেছেন। তানভির ভাইয়া মোবাইলে ফেসবুক অপশনে ক্রিয়েট নিউ একাউন্ট এ ঢুকতেই তানভির ভাইয়ার ফোনে কল আসে। দাঁড়িয়ে পকেট থেকে ফোন বের করে রিসিভ করে কথা বলা শুরু করে। ওমনি মেঘের মেবাইলটা আবিরের হাতে দিয়ে বলে ভাইয়া তুমি ওরে একাউন্ট টা খুলে দাও আমার গুরুত্বপূর্ণ কল আসছে। এই বলে মোবাইল রেখে রুম থেকে বেরিয়ে চলে গেলেন। মেঘ বসে আছে চুপচাপ, মুখ তুলে তাকাতে সাহস পাচ্ছে না। বুকটা এখনও ধুকপুক করছে। আবির মেঘের মোবাইলে নিজের মতো করে ফেসবুক একাউন্ট খুলছে, জন্মতারিখ, সাল,নাম কিছু জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন মনে করছে না ওনি। সবকাজ শেষ করে ফোনটা এগিয়ে দিলেন মেঘের দিকে। তখনি রুমে ঢুকলো তানভির। সহসা বলে উঠলো,

শেষ? এই বলে ফোন টা নিজের হাতে নিলো।। ফেসবুকে ঢুকে তানভিরের আইডি টা খোঁজে রিকুয়েষ্ট পাঠালো, আবিরের দিকে তাকিয়ে বললো, " ভাইয়া তোমাকে রিকুয়েষ্ট দেয়, এক্সেপ্ট করো নাকি!" আবির গম্ভীর কণ্ঠে বললো, "আমায় রিকুয়েষ্ট দিতে হবে না। " তানভির কথায় পাত্তা না দিয়ে কয়েক সেকেন্ড পর বললো, "ভাইয়া তোমায় রিকুয়েষ্ট পাঠিয়েছি। Accept করে নিও। না হলে আমার ছোট্ট বোনটা কষ্ট পাবে।" আবির তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তানভিরের দিকে। মেঘ মনে মনে খুশিই হলো ভাইয়ের কথায়, মেঘের তো কখনো সাহস ই হতো না আবির ভাই কে রিকু*য়েষ্ট দেয়ার বা এক্সে*প্ট করার কথা বলার। তানভির সেদিকে গুরুত্ব না দিয়ে, মেঘের হাতে ফোন দিয়ে বললো, তুই এখন যা, আমি আর ভাইয়া এক্সেপ্ট করে নিবো। তুই কি করিস না করিস সব নজরে রাখবো কিন্তু। মেঘ কোনো কথা না বলে মাথা নিচু করেই রুমে চলে আসলো মোবাইল নিয়ে। মেঘ রুমে এসে বিছানায় শুয়ে ফেসবুকে ঢুকতেই নজরে পরলো, 'Sazzadul Khan Abir' Accept your friend request. মেঘ শুয়া থেকে উঠে বসে, মেঘের খুশি দেখে কে, Friendlist এ একমাত্র ফ্রেন্ড সেটায় আবির ভাই। তার একটা স্ক্রিনশট রেখে দিল মেঘ। তার ৫ মিনিট পর এক্সে*প্ট করলো তানভির ভাই। আবির ভাইয়ার আইডিতে ঢুকলো, প্রোফাইল পিকটা নতুন কেনা বাইকে বসা, "একদম ওয়াও।" কভার ফটো সবুজ ঘাসের মাঝে বাইক টা রাখা তার সামনে বাইকে হেলান দিয়ে বসা আবির

ভাই, ছবিটা “ওহ মাই গড, ওয়াও!” সবগুলো ছবি দেখে দেখে ডাউনলোড করছে মেঘ। যত দেখছে ততই পাগ*ল হয়ে যাচ্ছে মেয়ে টা।মনে হয় পাবনা যেতে বেশিদিন লাগবে না। তারপর মোবাইল রেখে ঘুমানোর চেষ্টা করলো, চোখ বন্ধ করতেই চোখের সামনে ভেসে আসছে একটার পর একটা স্টাই*লিশ ছবি। কখন যেনো ঘুমিয়ে পরেছে মেয়েটা। আজ শনিবার, আবিরের অফিসে যাওয়ার দিন। সকাল সকাল উঠে শাওয়ার নিয়ে ফিটফাট হয়ে রেডি হয়ে পরেছে আবির। ৭.৩০ বাজে মাত্র । নিজের রুম থেকে বের হয়ে করিডোর দিয়ে দ্রুত হাঁটছে হঠাৎ মেঘের দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়ে দরজায় ডাক দেয়, ২ বার ডাকতেই ঘুমন্ত মেঘ, ঘুমে টলতে টলতে দরজা খুলে, সামনে দাড়িয়ে আছে আবির ভাই। নিজের চোখকে যেনো বিশ্বাস ই করতে পারছে না, প্রথমে ভেবেছে এটা স্বপ্ন, তারপর এদিক সেদিক তাকিয়ে বুঝলো এটা বাস্তব। আচমকা এইভাবে আবিরকে দাঁড়ানো দেখে ভ্যাবাচেকা খেল মেয়েটা। মেঘের চেহারায় নিদ্রিত ভাবটা লেপ্টে আছে এখনও। আবির পূর্ণ দৃষ্টিতে পরখ করলো অষ্টাদশী রাঙা মুখবিবর তারপর চোখ সরিয়ে নিয়ে বললো, ” ৫ মিনিটের মধ্যে খেতে আয় ” পুনরায় দ্রুতগতিতে হাঁটা দিলো। আবিরের অযাচিত উপস্থিতি নাড়িয়ে দিয়েছে মেঘের মস্তিষ্ক। হঠাৎ মনে পরে গেলো ৫ মিনিটে নিচে যেতে হবে। তৎক্ষনাৎ ছুটলো ওয়াশরুমে।। ৫ মিনিটের মধ্যে নিচে উপস্থিত হলো মেঘ। এই সময় মেঘকে খাবার টেবিলে দেখে অবাক হলো সকলে, ২ বছর যাবৎ

মেয়েটা সকালে সবার সাথে খায় না, প্রাইভেট থাকলে আগে খায় না হয় সবাই অফিস বা স্কুলে চলে গেলে তারপর খেয়ে কলেজে যায়। হালিমা খান ছুটে আসলেন মেয়ের দিকে," আয় আয় বস মা, কি খাবি বল!" টেবিলের কাছে আসতেই দেখলো একটা চেয়ার ই ফাঁকা আছে সেটা আবার আবির ভাইয়ের বিপরীতে। কিন্তু এখানে বসার বিন্দু পরিমাণ ইচ্ছে নেই তার। কারণ আবিরের আশেপাশে থাকলে মেঘ কেমন একটা ঘোরে থাকে। মন,মস্তিষ্ক সব যেনো আবিরের নিয়ন্ত্রণে থাকে। কিন্তু কিছু করার নেই। বাধ্য হয়ে বসতে হলো এই চেয়ারে। আবির মাথা নিচু করে মনোযোগ দিয়ে খাচ্ছে, মেঘ তখন ঘুমে টলতে টলতে আবির কে দেখেছিল রাজপুত্রের মতো, কিন্তু এখন আর সে তাকাতে পারছে না। শীর্ণ বক্ষ ধরফর করছে মেঘের, মনে মনে খুব করে চাচ্ছে একটু তাকিয়ে আবিরকে দেখতে। কিন্তু মনে হচ্ছে কিছু একটা মাথায় চেপে বসে আছে, মুখ টায় তুলতে পারছে না। আলী আহমদ খান হঠাৎ বলে উঠলেন, 'মেঘ মা আজ থেকে তোমার নতুন টিউটর আসবে। সারাদিন তে তুমি বাহিরে থাকবে তাই তাকে সন্ধ্যার পর আসতে বলেছি। " মেঘ চুপচাপ খাবার খাওয়ার চেষ্টা করছে, বুকের ভেতর যে ঝড় তুফান চলছে তা যেনো কেউ বুঝতে না পারে। আবির সবার আগে খাবার শেষ করে বাসা থেকে বের হয়ে গেলে। আবিরের পেছন পেছন আলী আহমদ খান, মোজাম্মেল খান ও ইকবাল খান ও চলে গেলেন। ইকবাল খান আগেই অফিসে জানিয়ে দিয়েছে অফিস যেনো সাজিয়ে গুছিয়ে রাখে, আবির অফিসের সামনে এসে

বাইক পার্ক করে অফিসে ঢুকতে গেলে সিকিউ*রিটি গা*র্ড বলে উঠেন, স্যার আপনার একটু বসতে হবে, বড় স্যাররা না আসলে আপনি ভেতরে যেতে পারবেন না। আবিরের পায়ের র*ক্ত মাথায় উঠে যাচ্ছে। রা*গে কটমট করতে করতে ওয়েটিং রুমে বসে আছে সে। ১০ মিনিটের মধ্যেই অফিসে ঢুকলেন তিন ভাই। আবির তখনও বসেই আছে। কিছুক্ষণ পর সিকিউ*রিটি গা*র্ড এসে ডাকলেন, "স্যার আপনাকে ভেতরে যেতে বলেছে!" আবির নি*র্ভীক ভঙ্গিতে হেটে ভেতরে চলে গেলো। অফিসের ভেতরে ফুল দিয়ে সাজানো, ঢুকতেই সবাই হাততালি দিয়ে কংগ্রাচুলেশন জানচ্ছে আবিরকে। দুএকজন ছবি তুলায় ব্যস্ত। বাবা – চাচা তিন জন আর আবির মিলে একটা কেক ও কাটলো। তিন ভাইয়ের তো আজকে খুশির দিন। বংশের বড় ছেলে তাদের কোম্পানির হাল ধরতে যাচ্ছে। এর থেকে বড় পাওয়া আর কি আছে। তানভিরের মতে আবির যদি মুখের উপর বলে দিতো আমি ব্যবসা সামলাবো না তখন তো কিছুই করার ছিল না। আবির যেহেতু মেনে নিয়েছে এতেই হবে। ঘন্টাখানেক হলো আবির অফিসে এসেছে। এরমধ্যে চাচ্চু ইকবাল খান ভাতিজাকে সব কাজ কর্ম বুঝিয়ে দিতে ব্যস্ত। অন্যদিকে আলী আহমদ খান এবং মোজাম্মেল খান আজ আড্ডায় মগ্ন।। তাদের মাথা থেকে সব চাপ চলে গেছে। দুই ভাই মিলে চা খাচ্ছে, খুনশুটি করছে। এত বছরের ব্যবসায়িক জীবনের অবসানের সময় এসেছে এবার। সারাদিন আবিরের ব্যস্ততায় কাটে, প্রথম দিনের অফিস, দায়িত্ব বুঝে নেওয়া বিশাল চাপ। মাঝখানে

একবার সময় করে বাবা চাচাদের সাথে তুলা একটা ছবি ফেস*বুকে শেয়ার ও করেছিল। ৬ টায় বাসায় ফিরেছে আবির। এসেই সোজা রুমে চলে গেছে, শাওয়ার নিয়ে রেস্ট নিচ্ছে। হয়তো ঘুমিয়ে পরেছিল।দূর স্বপ্নই দেখলো কি না আচমকা উঠে বসলো বিছানায়। আবিরের চোখে-মুখে উদ্বেগ স্পষ্ট। তড়িঘড়ি করে রুম থেকে বের হয়ে নিচে আসলো। পরিস্থিতি স্বাভাবিক, মালিহা খান এবং হালিমা খান কাজে ব্যস্ত। আদির আম্মু আদিকে নিয়ে পড়াতে বসেছেন। মীম ও হয়তো পড়ছে নিজের রুমে । কয়েক মুহুর্ত সোফায় বসে আবার উঠে রান্নাঘরের দিকে গেলো। হালিমা খানের দিকে তাকিয়ে ঠান্ডা কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো, “মেঘ কোথায় মামনি?” মেঘের টিউটর এসেছে, পড়ার ঘরে পড়াচ্ছে। আবিরঃ ওহ আচ্ছা। আমায় একটু কফি করে দিতে পারবে? হালিমা খান: একটু অপেক্ষা করো বাবা এখনি দিচ্ছি। আবির ছোট বেলা থেকেই নিজের মা মালিহা খানকে আম্মু, তানভিরের আম্মুকে মামনি আর আদির আম্মু কে কাকিয়া ডেকে অভ্যস্ত। এত বছরেও তার ডাকে পূর্বের ন্যায় মিষ্টতা মিশে আছে। সোফায় বসে কফি খাচ্ছে আর মোবাইল ঘাটাঘাটি করছে। ২০ মিনিট পর পড়ার রুম থেকে বের হলো একটা ছেলে বয়স হয়তো ২২-২৩ হবে। ৫.৭-৮ হবে লম্বা, চোখে চশমা। হালিমা খানকে বললো, “আন্টি আজ আসি আবার কাল আসবো” হালিমা খান ও হাসি মুখে বললেন, “আচ্ছা ঠিক আছে।” এদিকে আবিরের কোমলতা পাল্টে গেলো, চটে গেল ভীষণ, সবেগে ঘু*ষি বসাল সোফার পাশের দেয়ালে, আবিরের চোখ আগুনের

মতো লাল হয়ে গেছে। একমুহূর্ত বসলে না, সোজা উঠে ধপধপ করে সিঁড়ি দিয়ে উঠে নিজের রুমে চলে গেলো।"মনের উপর কারও হাত নেই। মনকে আমি যা বুঝাবো আমার মন তাই বুঝবে" এই স্লোগান দিতে দিতে নিজেকে শক্ত করলো মেঘ। আজকে সে ফজরের আজানের সময় উঠেছে। রাতে এলার্ম দিয়ে ঘুমিয়েছিল। দিন যত যাচ্ছে পরীক্ষা তত কাছে আসছে। যেভাবেই হোক চান্স পেতে হবে। প্রথম টার্গেট মেডিকেল, দ্বিতীয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। এজন্য সবই পড়তে হচ্ছে তাকে। নামাজ পরে পড়তে বসেছে মেঘ। ৭-৭.৩০ পর্যন্ত পড়াশোনা করেছে। সকালে খালি পেটে বেশিক্ষণ থাকা ক*ষ্টকর তাছাড়া পড়াশোনা করলে আরও বেশি খুদা পাই। গতকাল সন্ধ্যায় খেয়েছিল সারারাত কিছু খাই নি। খুদায় চু চু করছে পেট। দৌড়ে নিচে গেলো মেঘ... মেঘের দৌড় দেখে ভ*য় পেয়ে গেলেন হালিমা খান, ওনিও রান্নাঘর থেকে ছুটলেন। হালিমা খান: "কি হয়ছে তোর, এভাবে ছুটছিস কেন?" মেঘ: "আমার খুব খুদা পাইছে আম্মু তাড়াতাড়ি খেতে দাও।" হালিমা খান: তুই কখন উঠেছিস? মেঘ: ফজরের সময় উঠেছি তারপর পড়াশোনা করেছি। তাড়াতাড়ি খেতে দাও আমায়.। হালিমা খান যেনো খুশিতে গদগদ হয়ে গেলেন। ওনার মেয়ে পড়াশোনায় মনোযোগ দিচ্ছেন সাথে খাওয়া দাওয়াতেও। এ তো প্রতিটা মায়ের ই প্রধান ইচ্ছে। ওনি ছুটে গেলেন রান্নাঘরে। মেঘের পছন্দের সব খাবার হাজির করলেন মেয়ের সামনে। মেঘ খুদার তাড়নায় ঝটপট খাবার শেষ করে নিজের রুমে চলে গেলো। আজকে তার কোচিং, প্রাইভেট

কিছু নেই। সন্ধ্যায় শুধু শাহরিয়ার ভাইয়া পড়াতে আসবেন। সারাদিনের একটা রুটিন করে নিলো মেঘ। টার্গেট সেট করে পড়াশোনা করলে পড়াশোনা তাড়াতাড়ি এগোয়। এদিকে ৮ টার পর বাড়ির সবাই খেতে বসেছে। আবির একেবারে রেডি হয়ে নেমেছে। চেয়ার টেনে বসতে বসতে নজর পরে, সামনের চেয়ার টা ফাঁকা। নিষ্পলক তাকিয়ে কয়েক সেকেন্ডে স্বাভাবিক হয়ে খাওয়া শুরু করে। ইকবাল খান জিজ্ঞেস করলেন, "মেঘ কোথায়, উঠেনি এখনও? " হালিমা খান প্রফুল্ল মেজাজে উত্তর দিলেন, "ও নাকি সেই ভোর বেলা উঠেছে। পড়তে পড়তে খুদা লাগছে তাই কিছুক্ষণ আগেই খেয়ে গেলো। " আলী আহমদ খান শীতল কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, "শাহরিয়ার কি গতকাল এসেছিল?" হালিমা খান পুনরায় উত্তর দিলেন, "গতকাল আসে নি তো ভাইজান, মেঘ অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেছে। " আলী আহমদ খান স্বাভাবিক কণ্ঠে বললেন, "হয়তো কোনো সমস্যা আজ আসবে নিশ্চয়ই" কেউ আর কোনো কথা বললো না,চুপচাপ খাওয়াতে ব্যস্ত সকলে। কিছুক্ষণ পর খাওয়া শেষে উঠে চলে গেলেন বাড়ির কর্তারা। বসে আছে নাকি চার ভাই বোক। মীম আর আদি খুনসুটি করে খাওয়াতে ব্যস্ত। তানভির হঠাৎ আবিরের দিকে তাকিয়ে বললো, "ভাইয়া তোমার কি কিছু হয়ছে?" আবির নড়েচড়ে বসেছে, মুখ গোমড়া করে উত্তর দিলো, "কিছু হয় নি"। তানভির আর কথা বাড়ায় নি চুপচাপ নিজের খাওয়া শেষ করলো। এদিকে নিজের খাবার শেষ করে, ফ্রেশ হয়ে আবিরও অফিসে চলে গেলো। বাকিরাও নিজেদের

কাজে ব্যস্ত হলো। সারাদিনের ব্যস্ততা শেষে সকলেই বাড়ি ফিরলো, ফিরলো না কেবল আবির। আগামী মাস থেকে আবিরের নতুন কোম্পানি শুরু হবে সেই কাজেই ব্যস্ত সে। সারাদিন বাবার কোম্পানির কাজ সামলে সন্ধ্যার পর প্রায় ই এসে দেখতে হয় নিজের অফিসের কাজ কর্ম । সাথে তার আরও দুজন বন্ধু আছে। একজন রাকিব আরেকজন রাসেল । আবিরের পরেই তাদের পোস্ট আবির এর অবর্তমানে তারাই সামলাবে কোম্পানি । কয়েক বছর যাবৎ আবিরের সাথে প্ল্যান করে রেখেছিল এটারই পূর্ণতা পেতে চলেছে। এদিকে গতকালের ন্যায় আজও পড়ার রুমে অপেক্ষা করছে মেঘ। কিন্তু শাহরিয়ার ভাইয়া আসার কোনো খবর নাই। এই পৃথিবীতে কারো জন্য অপেক্ষা করা হলো সবচেয়ে ক*ষ্টের কাজ এটা মেঘের অভিমত। তাই রা*গে ফুঁ*সতে ফুঁ*সতে বড় আব্বুর কাছে দাঁড়ালো। আলী আহমদ খান সোফায় বসে কফি খেতে খেতে টিভি দেখছিলেন। মেঘ জিজ্ঞাসু চোখে তাকালো বড় আব্বুর দিকে তারপর আস্তে করে বললেন, “ভাইয়া কি পড়াতে আসবেন না?” আলী আহমদ খানের মনোযোগ সরলো টিভির দিক থেকে। এক পলক তাকালো মেঘের দিকে তারপর পকেট থেকে ফোন বের করে ডায়েল করলেন শাহরিয়ারের নাম্বারে। প্রথমবার রিসিভ হলো না। দ্বিতীয় বার রিসিভ হলো, আলী আহমদ খানঃ তুমি আসছো না কেনো? পড়াবে না? শাহরিয়ার শীতল কণ্ঠে উত্তর দিলো, “আংকেল আমার জন্য বাসাটা দূরে হয়ে যায়। সময় মেইনটেইন করাও একটু সমস্যা তাই আমি আর

আসতে পারবো না। সরি। ” আলী আহমদ খানঃ তাহলে তুমি এই কথাটা প্রথম দিন ই জানাতে পারতে।। শাহরিয়ার গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর দিলো, “একটু অসুস্থ ছিলাম আংকেল, হাসপাতাল থেকে আজই ফিরেছি। আপনাকে সময় করে ফোন দিতাম আমি। ” আলী আহমদ খান: কি হয়েছে তোমার? শাহরিয়ারঃ “তেমন কিছুটা, হালকা ব্যথা পেয়েছি। দোয়া করবেন আংকেল, আল্লাহ হাফেজ। ” আলী আহমদ খান :” সাবধানে থেকো। আল্লাহ হাফেজ। ” আলী আহমদ খান মেঘকে জানালেন পড়াবে না, মেঘ কি বলবে বুঝে উঠতে পারলো না ঠায় দাঁড়িয়ে রইলো সোফার পাশে। তখন ই সিঁড়ি দিয়ে নামছিল তানভির, মেঘের কাছে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলেন, “এখানে দাঁড়িয়ে আছিস কেন?” মেঘ মাথা নিচু করো, পাতলা অধর নেড়েচেড়ে বলে, “শাহরিয়ার ভাইয়া পড়াবেন না আমায়!” তানভির:” তাতে মন খারাপ করার কি আছে? মানুষের সমস্যা থাকতেই পারে! ” মেঘ চোখ তুলে তাকালো ভাইয়ের পানে, তানভির বড় আব্বুর দিকে তাকিয়ে পুনরায় বললো, “আমার একজন পরিচিত আপু আছে, ওনিও ভালো পড়ান জানি, আপনি অনুমতি দিলে আমি কি কথা বলে দেখবো?” আলী আহমদ খান তানভিরের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন,” হয়তো মনে মনে ভাবলেন যেই ছেলে জীবনে পড়াশোনায় করে না সেই ছেলে আবার বোনের জন্য টিউটর খোঁজছে।” মুখ ফোটে বললেন, ‘দেখো তোমার মতো গর্দ*ভ হয় না যেনো’ তানভির হাসি মুখে বললো এবার, ‘২-১ দিন পড়ার পর মেঘের যদি মনে হয় পড়বে তাহলেই ফিক্সড

করবো’ আলী আহমদ খান এবার যেনো স্বস্তি পেলেন, সহজভাবেই বললেন,” ঠিক আছে কালকেই আসতে বলো তাহলে” তানভির আর কথা না বাড়িয়ে চুপচাপ বের হয়ে গেলো বাসা থেকে। মেঘ ও নিজের মতো বই খাতা নিয়ে রুমে চলে গেলো। আজ মঙ্গলবার, মেঘ রেডি হয়ে একেবারে নিচে নামলো, ক্লাসের টাইম ৩০ মিনিট এগিয়ে দিয়েছে তাই তাড়াতাড়ি যেতে হবে। খাবার টেবিলে বসে তাড়াহুড়োয় খাবার খাচ্ছে মেঘ। সামনের চেয়ার ফাঁকা এতেই যেনো মেঘের স্ব*স্তি কাজ করছে। রবিবারের ধ*মক খাওয়ার পর থেকে মেঘ ইচ্ছে করেই আবির ভাইয়ের থেকে দূরে দূরে থাকতে চাই। এদিকে আবির ৮ টার দিকে না খেয়ে অফিসে চলে গেছেন। নিজের অফিসে কাজ শেষ করে তারপর বাবার অফিসে যাবে। মেঘ ও খাওয়া শেষ করে কোচিং এর উদ্দেশ্যে রওনা দিলো। ২ টায় মেঘ কোচিং থেকে এসে ফ্রেশ হয়ে খেতে বসেছে। ২ লুকমা মুখে তুললেই কারো পায়ের শব্দে ফিরে তাকায় মেঘ। আবির ভাই খাবারের টেবিলের দিকে আসছেন, মেঘ গলায় খাবার আটকে গেছে, গিলতে পারছে না মেয়েটা। কোনোরকমে পানি দিয়ে খাবার টা গিললো। এদিকে আবির বেসিন থেকে হাত ধৌয়ে এসে মামনিকে বললো খাবার দিতে, বসলো গিয়ে মেঘের বিপরীতে রাখা চেয়ারটাতে। মেঘের চিবুক নামলো গলায়, দৃষ্টি তার প্লেটের দিকে, মনে মনে আল্লাহ আল্লাহ করছে মেয়েটা, হাত পা কাঁ*পাকাঁ*পি শুরু হয়ে যাচ্ছে। ২ দিন পালিয়ে থেকেও লাভ হলো না। বার বার কানে বাজছে রবিবারের সেই কথাটা “এমন থা*প্পড় দিব

যার দাগ ১ মাসেও যাবে না” কে চাই স্বেচ্ছায় মা*ইর খেতে, কোনোরকমে খেয়ে সরে পরলেই বাঁ*চে সে। খাওয়ার গতি বাড়ালো, নাকে মুখে খাবার ঢুকাচ্ছে মেঘ। আবির ক্ষি*প্ত দৃষ্টিতে তাকালো মেঘের দিকে, গম্ভীর গলায়, কপাল কুঁচকে বললো, “কি হয়েছে তোর?” মেঘের নি*শ্বাস আটকে আছে। গলা শুকিয়ে কাঠ। সারাশরীরের কম্পনের মাত্রা তীব্র হলো এজন্য কথা বের হচ্ছে না মুখ দিয়ে, কিন্তু আজ তাকে বলতে হবে, হি*টলারের মুখোমুখি হতে হবে তাকে। নিজেকে নিজে সাহস দিলো, মেঘের সরল স্বীকারোক্তি, “কিছু হয় নি আমার।” আবির কিছু বলতে গিয়েও গিলে ফেললো কথাটা, এরমধ্যে হালিমা খান আবিরের খাবার নিয়ে এসেছেন। আবির খাওয়ায় মনোযোগ দিলেন। হালিমা খান আবিরকে উদ্দেশ্য করে বললেন, “সকালে কিছু খেয়েছিলি বাবা?” আবির গুরুভার কণ্ঠে উত্তর দিলো, “খায় নি” হালিমা খান কিছুটা চিন্তিত কণ্ঠে বললেন, “সকালে খেয়ে গেলেই পারতিস, একটু দেরি হলে না হয় হতো!” আবির কোনো উত্তর দিলো না। মেঘ মনে মনে ভাবছে, আমায় যে লোক হু*মকি দেয়, “ঠিকমতো খেতে হবে”, সে নিজে যখন না খেয়ে থাকে তখন তাকে কেনো কেউ ধম*ক দেয় না। সব দোষ এই মেঘের। থাক*বোই না এই বাড়িতে। উঠতে চাই টেবিল থেকে তৎক্ষণাৎ চোখ পরে আবির ভাইয়ের দিকে, আবির মাথা নিচু করে খাচ্ছে। এখন উঠতে গেলেই নিশ্চয় ধ*মক দিয়ে আবার বসাবেন, কে জানে আবার থা*প্পড় ই মা*রেন কি না। এসব ভেবে মেঘ আবার বসে দ্রু*তগতিতে খাওয়া

শুরু করে। আবির ভাই রাগে একপ্রকার চিৎকার দিয়ে উঠলেন, “একটা থা*প্পড় দিব তোকে, এভাবে খাচ্ছিস কেন?” মেঘ থমকে গেলো, ধ*মক খেয়ে চোখ টলমল করছে তার, মুখের ভাত গুলো কোনোরকমে গিললো, মনে মনে ভাবলো, “আমাকে থা*প্পড় দেয়ার এত ইচ্ছে আপনার?” আবিরের থা*প্পড়ের ভয়ে ২ দিন যাবৎ খাবার টেবিলে সবার সাথে খায় না মেয়েটা। কে জানতো এই দুপুর বেলা আবির ভাই অফিস থেকে বাসায় চলে আসবে। জানলে হয়তো আগে খেয়ে নিতো না হয় আবির ভাই খাওয়ার পর খেতে আসতো। কেনো এই মানুষ টা তার সামনে আসে। কেনোই বা এত রা*গ দেখায় ভেবে পায় না মেঘ। হঠাৎ মনে পরে যায় ঘুম থেকে উঠে বলা,স্লোগান টা। মনের উপর কারো হাত নেই। মেঘ ভয় পাবে না আবিরকে। তারপর স্বাভাবিক ভাবে প্লেটের ভাতগুলো শেষ করে হাত ধৌয়ে সিঁড়ি দিকে যেতে নেয়, সোফার কাছে পর্যন্ত যেতেই মীম আর আদি দৌড়ে এসে জাপ্টে ধরে মেঘকে। আকস্মিক ঘটনায় কিছুটা ঘাবড়ে গেলো মেঘ,তারপর স্বাভাবিক কণ্ঠে বললো, ” কি হয়েছে তোদের?” মীম ফিসফিস করে মেঘকে বললো, “আপু প্লিজ আবির ভাইয়াকে বলো না আমাদের নিয়ে বাইকে ঘুরতে, কখনো বাইকে উঠি নি প্লিজ বলবা!” মেঘ কোনো কিছু না ভেবেই বললো, “আমি বলতে পারবো না।” আদিঃ প্লিজ প্লিজ প্লিজ আপু। আমরা বলার সাহস পাচ্ছি না। প্লিজ তুমি একটু বলো না প্লিজ। মেঘ আবারও গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দিলো, ” আমি পারবো না বলতে। তোদের ঘুরতে ইচ্ছে করে তোরা বল। ”

মেঘ মনে মনে ভাবছে, “তোরাই সুখে আছিস আমাকে তো উঠতে বসতে মা*রার হুম*কি দিচ্ছে! আমি এবার এটা বললে নিশ্চিত এখনই খাবো থাপ্প*ড় টা।” আবিরের খাওয়া শেষ এদিকে আসতে দেখে মেঘ চাইলো সে তাড়াতাড়ি রুমে চলে যাবে। কিন্তু আদি আর মীম আরও করুন স্বরে বলছে, “প্লিজ তুমি বলো না। ” এবার মেঘ রেগে কটমট করে বলে, “আমি বললাম তো পারবো না।।” মীম আর আদি যেন চুপসে গেলো। মেঘ আর এক মুহুর্ত দাঁড়ালো না। সিঁড়ি দিয়ে উঠায় ব্যস্ত।। আবির বিষয়টা লক্ষ্য করেছে, আবির আদিকে জিজ্ঞেস করে, “কাকে কি বলতে বলছিস ওকে?” মীম শ্বাস টেনে সাহস নিয়ে বললো, “ভাইয়া আমাদের আপনার বাইকে নিয়ে ঘুরাবেন প্লিজ?” মেঘ সিঁড়িতে উঠতে উঠতে ফিসফিস করে বলছে, “হিট* লার নিবে বাইকে তোদের? সেগুরে বালি।” আবির কণ্ঠ তিনগুণ ভারি করে উত্তর দিলো, “আমার বাইকে কাউকে উঠাবো না, কিছুদিন পর তানভির কে বাইক কিনে দিব। তখন ও তোদের নিয়ে ঘুরবে। ” আদি অকস্মাৎ প্রশ্ন করে বসলো, “তুমি তানভির ভাইয়াকে নিয়ে ঘুরো না?” আবির এবার স্বাভাবিক কণ্ঠেই বললো, “এখনও তানভির আমার বাইকে উঠে নি! তবে ভবিষ্যতে উঠতে পারে । ওর সাথে তোদের কি সম্পর্ক?” মীম আর আদি বোবা হয়ে রইলো। মেঘের কথা ফলে যাওয়াতে নিজেকে নিয়ে গর্ব করতে করতে রুমের দিকে যাচ্ছে আর ভাবছে দুই ভাইয়ের গলায় গলায় সম্পর্ক অথচ বাইকে উঠার পারমিশন দেয় নি ছি: সহসা অভিব্যক্তি পাল্টালো মুখের। বিড়বিড় করে বললো হিট*লারের থেকে

ভালো আর কি আশা করা যায়? রুমে গিয়ে সোজা শুয়ে পরলো মেঘ। ফোনটা হাতে নিলো। এই ২-৩ দিনে একবারের জন্য ও ফে*সবুকে ঢুকে নি সে। মন খারাপ কাটাতে ঢুকলো ফে*সবুকে, কিছুক্ষণ ঘুরাঘুরির পর একটা পোস্ট সামনে আসছে ১ দিন আগে আবির ভাই ফেসবুক একটা অসম্ভব সুন্দর ছবি আপলোড দিয়েছেন সাথে ছোট করে ক্যাপশন লিখেছেন "শূন্যতা আমায় ঘিরে আছে, আর আমি ঘিরে আছি মোহে" মেঘ ছবিটা দেখে যতটা খুশি হলো তার থেকে বেশি চিন্তিত হলো ক্যাপশনে কি বুঝিয়েছেন ওনি তা ভাবতে। সে ক্যাপশন বুঝার চেষ্টায় মগ্ন হলো, "ওনি কি তাহলে সত্যি কারো সাথে রিলেশনে আছেন!? " তৎক্ষণাৎ উত্তর আসলো মনের ভেতর থেকে, ""ওনি প্রেম করলে তোর কি, তোরে যে উঠতে বসতে থা*প্পড় দে*য়ার ভ*য় দেখায়, তোর লজ্জা করে না এই হি*টলার কে নিয়ে ভাবতে!!!"" সঙ্গে সঙ্গে ডাটা অফ করে ফোন রেখে দিলো মেঘ, সত্যি ই তো, সে তো আবির ভাইয়ের উপর রা*গে আছে তাহলে আবার আবির ভাইকে নিয়ে ভাবছে কেনো..! এদিকে আবির ভাই রুমে এসে ৫-১০ মিনিট রেস্ট নিয়ে নিজের ল্যাপটপ আর কিছু কাগজপত্র নিয়ে বেরিয়ে পরেছে। সন্ধ্যায় মেঘের নতুন টিউটর এসেছে। বয়স এত বেশি না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিজিক্সে পড়াশোনা করছেন এবার ৩য় বর্ষে আছেন। দেখতে মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দরী, গোলগাল চেহারা, বোরকা পরে হিজাব পরে এসেছেন। গুছিয়ে কথা বলেন, সুন্দর করে বুঝিয়ে পড়িয়েছেন মেঘকে। মেঘ যেনো পড়ার থেকেও বেশি মুগ্ধ হয়েছে

ওনার কথার স্টাইলে। ওনার নাম জান্নাত। মেঘের ওনাকে এতই ভালো লেগেছে যে দু দিন পড়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারলো না। জান্নাত আপু চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গেলেন বড় আব্বুর কাছে। জানালেন, ওনার কাছেই পড়বে সে। 'আলী আহমদ খান' "যেনো কিছুটা নিশ্চিন্ত হলেন, তারপরও মেঘকে বললেন, কখনো যদি মনে হয় তোমার পড়ার ঘাটতি হচ্ছে তাহলে আমি নতুন টিউটর আনবো, তুমি চিন্তা করো না। পড়াশোনায় মনোযোগ দাও!" মেঘ "ঠিক আছে" বলে নিজের রুমে চলে গেলো। রাতের সবাই একসাথে খাওয়া দাওয়া করলো কিন্তু আবির নেই। ইদানীং আবির অফিস শেষ করে নিজের নতুন অফিসে চলে যায়। ওখানে সব গুছানো, প্ল্যানিং করা এসব নিয়ে ব্যস্ত থাকে। রাত ১১ টার আগে ফিরেই না। কেউ অপেক্ষাও করে না তার জন্য। কারণ আবিরের ক*ড়া নির্দেশ আমার জন্য কেউ অপেক্ষা করলে আমি আর ফিরবোই না। সেই থেকে মা আর মামনি শুয়ে পরে। আবির ১১ টার পরে এসে ফ্রেশ হয়ে নিজের মতো খায়। কেটে গেলো আরও দুদিন। দেখা হলো না মেঘ আর আবিরের। সকালে আবির খেতে আসলেও মেঘ আগে আগেই খেয়ে পা*লায়, সে আবির ভাইয়ের মুখোমুখি হতে চাই না। মেঘ ছোটবেলা থেকেই খুব আবেগী আর জে*দি। অল্পতে কা*ন্না করা তার স্বভাব। আর কোনো বিষয়ে জে*দ করলে তা সহজে কাটে না। যেমন সামান্য কয়ে*কটা থা*প্পড়ের জন্য আবির ভাই এর সাথে ৯ বছরের উপরে কথা বলে নি একটিবার। আবির ভাই দেশে আসাতে মনে অন্যরকম অনুভূতি

জন্মানো শুরু করেছিল সবেমাত্র। কিন্তু আবির ভাইয়ের হুমকি তে অনুভূতি গুলো চা*পা পরে যাচ্ছে। মেঘ নিজেই যেনো অনুভূতি গুলোকে মাটি চা*পা দিতে ব্যস্ত। কথায় আছে, 'চোখের আড়াল হয়ে গেলে, মনের আড়াল হতে বেশি সময় লাগে না' এজন্য মেঘ সর্বোচ্চ চেষ্টা করছে যেনো আবির ভাইয়ের সামনে সে না পরে। সবাই টেবিলে বসার আগেই সে খেয়ে নিজের রুমে চলে যায়, আবির ভাই অফিসে গেলে সে কোচিং এর জন্য বের হয়, দুপুরে আবির ভাই থাকে না বলে একটু রিলাক্সে খেতে পারে। রাতেও জান্নাত আপু পড়িয়ে যায় ৭.৩০ নাগাদ তখন ই খেয়ে রুমে চলে যায়। তখন তো আবির ভাই ফিরেই না দেখা হবে কি ভাবে..!! সেই রবিবার থেকে মেঘ পালিয়ে বেড়াচ্ছে। আজ বৃহস্পতিবার রাত, মেঘ নিজের পড়া শেষ করে শুয়ে মোবাইল টা হাতে নিয়েছে। আবির ভাইয়ের কথা খুব মনে হচ্ছে তার, তাই আবির ভাইয়ের আইডি তে ঢুকলো কিন্তু কোনো আপডেট নেই। মনের ভেতরটা কেমন জানি মোচড় দিলো মেঘের। মঙ্গলবার দুপুরে খেতে বসেছিল একসাথে তারপর আর দেখেই নি সে। মেঘের খুব ইচ্ছে করছে আবির ভাইকে দেখার।। মনকে কোনোভাবেই শান্ত করতে পারছে না। মনের জোর গুলোও নিস্তেজ হয়ে পরেছে। অনেকক্ষণ মনকে বুঝিয়ে ব্যর্থ হলো তাই রুম থেকে বের হয়ে গুটিগুটি পায়ে এগিয়েছে আবির ভাইয়ের রুমের দিকে। রাত তখন ১১ টার উপরে। ড্রয়িং রুমে একটা হালকা আলোর বাল্ব জ্বলছে, পুরো বাড়ি অন্ধকার। মেঘ আবির ভাইয়ের রুমের সামনে দাঁড়ালো। দরজা চাপানো, আস্তে

করে ধাক্কা দিলো মেঘ। চেক করতে চাইছিলো খোলা কি বন্ধ। মেঘের হালকা ধাক্কাতেই খুলে গেলো দরজা। কিছুটা ঘাবড়ে গেলো মেঘ। যদি আবির ভাই রুমে থাকেন তাহলে আজ থা*প্পড় নিশ্চিত। তাই দুগালে হাত দিয়ে আস্তে করে উঁকি দিলো রুমে। রুমের বারান্দায় বাল্ব জ্বলছে । সেটার আলোয় রুমে আসছে। মোটামুটি আলোকিত হয়ে আছে রুমটা। আবির ভাই কোথাও নেই। বিছানা টানটান করে পাতানো। টেবিলে বই, খাতা, কাগজপত্র এলোমেলো সাথে একটা ল্যাপটপের আলো জ্ব*লছে। চেয়ারের উপর ২-৩ টা কাপড় এলোমেলো পরে আছে। ছেলেদের রুম সচরাচর যেমন হয়। মেঘ মনে মনে ভাবছে, "আবির ভাই কি এখনও ফেরে নি?" নিজের রুমের দিকে ফিরে ১ কদম এগুতেই কানে ভেসে আসে গানের সুর । দাঁড়িয়ে পরলো মেঘ, মনে মনে ভাবছে, "গান কে গাইছে, আবির ভাই নয় তো?!" আবারও ঘুরে গুটিগুটি পায়ে এগিয়ে গেলো সিঁড়ির কাছে। মেঘ এই জীবনে কোনোদিন সন্ধ্যার পর ছাদে যায় নি। সবাই গেলেও যায় না, ওর ভ*য় লাগে, সন্ধ্যা বেলা নাকি ছাদে তাঁনারা ঘুরে বেড়ায়, সারারাত ছাদেই থাকেন এ ভয়ে ছাদে পা বাড়ায় না। সিঁড়ি নিচে থমকে দাঁড়ালো মেঘ, "এই গান কি তাঁনারা গাইতেছেন? আমাকে আকৃষ্ট করে নেয়ার জন্য? " যাবে কি যাবে না এটায় ভাবছে মেঘ, বুকে সাহস নিয়ে দু কদম এগিয়েছে মেঘ, একটু উঁকি দিয়ে দেখলো ছাদের দিকে। ছাদের গেইট খোলা। এটা দেখে মনে সা*হস পেলো মেয়েটা। তাঁনারা গান গাইলে গেইট খুলার কি দরকার। তারপরও আল্লাহ আল্লাহ করে

এগুচ্ছে মেঘ। গেইটের কাছে এসে বুকে হাত রেখে উঁকি দিলো ছাদের দিকে। ছাদের এক কর্ণারে নজর পরলো, চেয়ারের উপর হেলান দিয়ে বসে আছে কেউ একজন। চাঁদের উপর থেকে মেঘ সরে যেতেই স্পষ্ট বুঝা গেলো এটা আবির ভাই। মেঘ নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পরলো, এত রাতে আবির ভাই ছাদে কি করেন, কৌতুহল হলো মেঘের, আগে কি গান গেয়েছে তা মেঘ বুঝতে পারে নি, নিচ থেকে শুধু সুর টায় শুনেছে। এখন আবির ভাই নিরব। কয়েক মুহুর্ত পর আবির ভাই আবার শুরু করলো, "ছোট্ট বুকে মেঘ জমিয়ে ক্যানরে কাঁদিস পাখি? তুই ফিরবি বলে আমি কেমন সন্ধ্যা নামায় রাখি ছোট্ট তোর ওই ওমের ডানায় নাক ঘষতে দিবি কি? বুকের ভেতর ঘুলঘুলিতে একলা পাখি হবি? তুই বুকের ভেতর ঘুলঘুলিতে একলা পাখি হবি?" মেঘ উদ্বিগ্ন নয়নে তাকিয়ে আছে আবির ভাইয়ের দিকে, ছেলেদের গান শিখতে হয় না, তারা খালি গলাতে গান গাইলেও যেনো অসম্ভব সুন্দর লাগে। মেঘ মুগ্ধ হয়ে আবিরের গান শুনছে। আবির ভাই একই লিরিক্স বার বার গাওয়াতে গানে মনোযোগ দিলো মেঘ, নিজেকে নিজে প্রশ্ন করলো মেঘ, "" এই গান কাকে উদ্দেশ্য করে গাইছেন ওনি? আমাকে নিয়ে নয়তো? এটুকু বলতেই মুখে হাসি ফুটে উঠলো মেঘের, তৎক্ষনাৎ মনে হলো ওনি আমাকে নিয়ে কেনো গান গাইবেন, আমি কে! তানভির ভাই তো সেদিন বললো আবির ভাইয়ের জীবনে কেউ আছে তাহলে কি তার কথা ভেবেই গাইতেছেন? সঙ্গে সঙ্গে হাসি গায়েব হয়ে গেলো মেঘের। নিস্তব্ধ আঁখিতে তাকিয়ে আছে সে, বুকের বা পাশে হালকা

ব্যথা অনুভব হলো, ওনার মনে সত্যি অনেক দুঃখ না হয় এমন গান কেউ গায়..!!"" এরমধ্যে আবির ভাইয়ের গান থেমে গেলো, কিছুক্ষণ নিরব থেকে পকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে ঠোঁটে ধরলো, আ*গুন দিয়ে জ্বা*লালো সেই সিগা*রেট। এদিকে মেঘের মাথায় আকাশ ভে*ঙে পরেছে। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে ক*ষ্ট হচ্ছে, আবির ভাই সিগারেট খান.? দাঁড়িয়ে থাকার শক্তিটুকু পাচ্ছে না অষ্টাদশী । অকস্মাৎ দরজার এখানেই বসে পরেছে সে। মেঘের জাত শ*ত্রু হলো সিগারেট। যেখানে সিগারেটের গ*ন্ধ মেঘ সহ্য করতে পারে না, সিগারেটের গ*ন্ধে তার শ্বা*সকষ্ট হয়ে যায়। সেখানে আবির ভাই সিগারেট খাচ্ছেন। এটা যেনো মেঘ মানতেই পারছে না। ওষ্ঠদ্বয় উল্টে নিরবে চোখের জল ফেলে অষ্টাদশী। যাকে সে মিস করছিল, এতক্ষণ তাকে দেখার জন্য উদ্বেগ ছিল। তাকে খোঁজে এসে এরকম একটা দৃশ্য দেখবে তা সে কল্পনাও করে নি। অষ্টাদশীর মনটা নির্ম*মভাবে হ*ত্যা করেছে আবির ভাই।আবির ভাই অষ্টাদশীর মনে আর বসন্তের ফুলের মতো ফুটবে না । আবির ভাইয়ের প্রতি খুব রা*গ হলো মেঘের , রা*গের সাথে কান্নার মাত্রাও বাড়তে লাগলো। ছাদের দরজার পাশে বসেই ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদছে মেঘ। নিজেকে সান্ত্বনা দেয়ার কোনো ভাষায় খোঁজে পাচ্ছে না অষ্টাদশী। আচমকা আবির ভাই হাজির হলো মেঘের সামনে। মেঘ তখনও কা*ন্নায় ব্যস্ত। আবির গম্ভীর কণ্ঠে শুধালো, "এখানে কি করছিস?"আবির ভাইয়ের কণ্ঠ শুনে মেঘ ভূ*ত দেখার মতো চমকে উঠলো, মেঘের কা*ন্নার

তীব্রতা এতোটায় বেড়ে গেছিলো যে ছাদের কর্ণার থেকে আবির ভাই শুনতে পেয়ে ছুটে এসেছে। অতিরিক্ত কা*ন্নায় মেঘের শরীর কাঁ*পছে। জোর করে কা*ন্না থামিয়েছে। এখনও নাক টানছে আর জোরে জোরে শ্বাস ছাড়ছে। আবির ভাই গম্ভীর স্বরে পুনরায় বললো, "কথা বলছিস না কেন, এত রাতে এখানে কি করিস?" মেঘ এবার কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে, ছাদের ফ্লোরের দিকে তাকিয়ে ধীরস্থির কণ্ঠে উত্তর দিলো, "এমনেই এসেছিলাম" আবির ভাইয়ের শরীর ঝুঁকে এলো, মেঘ তখনও ছাদের ফ্লোরেই বসা। চাঁদের আলোতে স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছিলো মেঘের অভিব্যক্তি। চিবুক নেমেছে গলায়, হাত পা কাঁপছে, ভ*য় আর কা*ন্নার প্রতিক্রি*য়া দুটায় অনুভব করতেছে অষ্টাদশী। আবির ভাই আচমকা মেঘের বাহুতে ধরলো, এক টানে দাঁড় করালো মেঘ কে। মেঘের শরীরের কম্পন তীব্র হলো, হৃদপিণ্ডের ধুপধাপ বেড়ে যাচ্ছে সহসা। চোখ তুলে তাকাতে পারছে না। আবির তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালো মেঘের দিকে, রা*গে ক*টমট করতে করতে বললো, "তুই কাঁদছিলি কেনো?" মেঘ উত্তর খোঁজে পাচ্ছে না। কিভাবে বলবে, আবির ভাইয়ের সি*গারেট খাওয়া আর অন্য মেয়েকে উদ্দেশ্য করে গান গাওয়াতে তার ভেতর থেকে এমনিতেই কা*ন্না আসছে। মেঘ মাথা নিচু করে চুপ করে রইলো। আবির ভাই দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, কিছুটা স্বাভাবিক কণ্ঠে বললেন, "তুই কি সবসময় রাতবিরাতে ছাদে আসিস?" মেঘ তৎক্ষনাৎ বিদ্যুৎ বেগে কতক্ষণ মাথা নাড়লো, নাবোধক সম্মতি জানালো, তারপর আস্তে আস্তে বললো, " এই জীবনে

কোনোদিন সন্ধ্যার পর ছাদে উঠি নি আমি” আবির ভাই উদ্বিগ্ন কণ্ঠে শুধালো, “তাহলে আজ আসলি কেন?” মেঘ নিস্তব্ধ, নিরব। কিছু বলার সাধ্য নেই বলে দীর্ঘশ্বাস ফেললো মেয়েটা। এত রাতে ছাদের আসার কোনো অজু*হাতও খোঁ*জে পেলো না অষ্টাদশী । আবির ভাই কয়েক পা এগিয়ে মেঘের অনেকটা ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়ালো। আবির ভাইকে এত কাছাকাছি দেখে নিঃশ্বাস বন্ধ হওয়ার হাল হলো মেঘের। আবির ভাইয়ের গায়ের গ*ন্ধে মা*তাল হওয়ার অবস্থা। ভ*য়ংকর পরিস্থিতি থেকে নিজেকে বাঁচাতে দু কদম পিছিয়ে গেলো মেঘ। কিন্তু পিছনে আর জায়গা নেই দরজার পাশের পিলারে পিঠ ঠেকলো মেঘের। থরথ*র করে কাঁপছে অষ্টাদশীর ছোট দেহটা। পায়ের পাতা শিরশির করছে । সরে যেতে চাইলো সামনে থেকে, আচমকা আবির ভাই দুহাতে পিলারের দু পাশ চেপে ধরলো, কিছুটা ঝুঁকে মুখোমুখি হলো মেঘের, আবির ভাইয়ের উষ্ণ শ্বাস, তীব্র দৃষ্টি মেঘকে নাজেহাল করে দিচ্ছে। মা*নসিক টানাপো*ড়নে পরে গেলো অষ্টাদশী । মেঘের মনে হচ্ছে বুকের মধ্যে আজ কয়েকজন একসাথে নৃত্য করছে। যার শব্দ বাহির থেকে শুনা যাচ্ছে। শরীর ঘামতে শুরু করেছে। আবির ভাই হঠাৎ ই শীতল কণ্ঠে বললেন, “এতবছর তো খুব পা*লায় বেড়াইছিস! এখন দেখবো কতটা পা*লাতে পারিস তুই।” আবির ভাইয়ের ঠান্ডা হুম*কিতে কেঁপে উঠলো অষ্টাদশী। এই কথা শুনামাত্র মেঘের শরীরে হাই ভোল্টেজের ঝাঁকুনি দিলো। মেঘের বক্ষস্পন্দন জোড়ালো হলো। আবির ভাই সরু নেত্রে তাকিয়ে আছে অষ্টাদশীর পানে, হয়তো মেঘের

টাল*মাটাল অবস্থা বুঝতে পেরে সরে গেলো সামনে থেকে। পুনরায় শক্ত কণ্ঠে বললো, “রুমে যা” আবির সরে যাওয়াতে স্বস্তি পেলো মেঘ। দীর্ঘশ্বাস ফেলছে বারবার। কয়েক মুহুর্ত পর সিঁড়ির দিকে নামতে গেলো, অন্ধকার সিঁড়ি, পিছন ফিরে তাকিয়ে বুকে সা*হস নিয়ে ডাকলো, “আবির ভাই” আবির ভাই উল্টো দিকে ফিরে ছিল, ডাক শুনে ঘুরে তাকালো, “হুম” মেঘ ভয়ে ভয়ে বললো , “আমাকে একটু রুম পর্যন্ত দিয়ে আসবেন! প্লিজ” আবির বিস্ময় কণ্ঠে বললো, “কেনো? হাঁটতে পারছিস না? মেঘ মাথা নিচু করে আস্তেধীরে বললো, “ভয় লাগছে!” “কেন?” “তাঁনারা যদি আমায় ধরে ফেলে!!” আবির ভাই কয়েক সেকেন্ড থেমে, স্ব শব্দে হেসে উঠলো, আবির ভাই মেঘের কথায় হাসছে ভাবতেই খুশি লাগছে মেঘের। আবির ভাইয়ের হাসির শব্দে মেঘ অবাক হয়ে তাকালো আবির ভাইয়ের দিকে, ততক্ষণে আবির ভাইয়ের হাসি গায়েব। এবার আবির ভাই ঠাট্টার স্বরে শুধালো, “তা তুই ছাদে আসার সময় কি তাঁনারা বেড়াতে গেছিলো?” আবির ভাইয়ের এমন কথায় আহাম্মকের মতো তাকিয়ে আছে মেঘ। আবির ভাই সহসা বলে উঠলো,, ” তুই যা আমি পিছনে আছি!” মেঘ আর কিছু বলার সাহস পেলো না অবশ্য বলবেই বা কি! দুটা সিঁড়ি নামতেই হঠাৎ কি ভেবে থমকে দাঁড়ালো মেঘ, আবির ভাই নিরুদ্বেগ কণ্ঠে শুধালো, “আবার কি হলো?” মেঘ দুবার জোরে জোরে শ্বাস ছাড়লো,মনে তীব্র সাহস নিয়ে, পিছন ফিরে তাকালো। আবির ভাই ছাদের দরজার পাশে দাঁড়ানো, এমনিতেই ৬ ফুট লম্বা তারউপর মেঘ

বেশ কয়েকটা সিঁড়ি নেমে গেছে। এখন আবির ভাইয়ের লম্বা শরীরটা চাঁদের আলোয় সুপারি গাছের মতো মনে হচ্ছে । মেঘ উদ্বিগ্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করলো, "আবির ভাই আপনি সিগা*রেট খান কেনো?" মেঘের কথায় আবির ভাই যেনো ছোটোখাটো টাশকি খেলেন, মুহুর্তেই গম্ভীর কণ্ঠে বললো, "তার জবাবদিহি কি তোকে দিতে হবে?" মেঘ এবার কোমল কণ্ঠে বললো, "সিগারে*ট স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষ*তিকর, আর আমি.." এটুকু বলেই থেমে গেলো, আবির ভাই এবার কণ্ঠ দ্বিগুণ ভারি করে বললো, "আর তুই কি?" মেঘ ভ*য়ে ভ*য়ে বললো, "কিছু না" মেঘ আর থামলো না, সিঁড়ি দিয়ে নামতে ব্যস্ত হলো। মেঘ করিডোরে হাঁটছে, আবির ভাই পেছনে মোবাইলের ফ্ল্যাশ জ্বা*লিয়ে সিঁড়ি নিচ পর্যন্ত নামলো। মেঘ আর পিছন ফিরে আবির ভাই কে দেখার সাহস পাচ্ছে না। নিজের রুমের দরজা পর্যন্ত এসে রুমে ঢুকার সময় এক পলক তাকালো আবির ভাইয়ের দিকে, আবির নিচে তাকিয়ে মোবা*ইল চাপছে। মেঘ রুমে চলে গেলো। আবির ভাইয়ের আরও একটি রাত কাটলো নির্ঘুম, নিস্তব্ধ। প্রত্যেক সপ্তাহে ছুটির দিনের আগের রাতে আবির ভাই সারারাত জেগে থাকে। এটা তার বহু বছরের অভ্যাস। বিদেশে থাকাকালীন ও তাই করতো। দেশে এসে প্রতি বৃহস্পতিবার রাত নিজের মতো একাকী কা*টায়। হয়তো নিজেকে নিয়ে ভাবে, নিজের স্বপ্ন, ইচ্ছে, ভালোবাসা, প্রিয়জন সবকিছু নিয়েই ভাবে। মেঘ নিজের রুমে শুয়ে ছাদের বিষয়গুলো ভাবছে, আবির ভাইয়ের এত কাছে আসা, আবির ভাইয়ের বলা সেই কথাগুলো

বার বার মাথায় ঘুরছে। কখন ঘুমিয়েছে নিজেও জানে না। সকাল সকাল খাবার টেবিলে খাবার খাচ্ছে সবাই। শুক্রবার দিন ভালোমন্দ রান্না হয়। মেঘের মনটা আজ খুব ভালো। কেনো ভালো নিজেও জানে না তবে আবির ভাইয়ের প্রতি ভ*য় টা কিছুটা শিথিল হয়েছে। খাবার টেবিলে আবির ভাই নেই। মন টা কিছুটা খারাপ হলো কিন্তু তেমন পাত্তা দেয় নি। নিজের মতো খেয়ে পড়তে বসেছে। প্রতি শুক্রবারে প্রাইভেটে ১ ঘন্টার পরীক্ষা থাকে। ১ সপ্তাহে যা পড়ায় তার উপর পরীক্ষা থাকে। ৩ টা থেকে ৪ টা পর্যন্ত পরীক্ষা। অন্যদিকে তানভির ব্যস্ত হয়ে পরেছে রাজনীতি নিয়ে। সামনে এমপি নির্বাচন, তাদের প্রিয় নেতা মনোনয়ন কিনেছেন। সবাই মিটিং মিছিলে ব্যস্ত। জনসমর্থন যাচাই করে মনোনয়ন দেয়া হবে। তানভিরদের এখন সব এলাকায় যেতে হচ্ছে। জনগণের সুবিধা অসুবিধা শুনছে, লিস্ট করছে। এমপি নির্বাচনের কয়েকমাস পরেই হবে সভাপতি নির্বাচন। তানভিরের টার্গেট সভাপতি হওয়া। তাই তাকে আরও বেশি এক্টিভ থাকতে হচ্ছে। ২.৩০ টা নাগাদ মেঘ বেরিয়েছে পরীক্ষা দিতে। আজ একটু আগেই চলে এসেছে। পরীক্ষা শুরু হতে এখনও ১০ মিনিট বাকি। তাই বন্যা আর মেঘ গল্প করছে। বন্যা: কিরে তোর হি*টলার ভাইয়ের কি খবর রে? কিছু তো আর বললি না, ছবি দেখাবি বলছিলি তাও দেখালি না। সত্যি সত্যি মন থেকে বের করে দিয়েছিস? মেঘ: মুখে যা বলি তার সবটায় কি পারি? এত চেষ্টা করেও তো পারলাম না মন থেকে তাড়াতে। গতরাতে থাকতে না পেরে গেছিলাম ওনাকে দেখতে। একটা

বাঁশ যে খাইছি!! বন্যা: কেন কি হয়ছে? মেঘ: কি আর হবে লুকিয়ে দেখতে গেছিলাম, আবির ভাইয়ের কাছে ধরা পরে গেছি! বন্যা: ব্যাটার চোখ আছে তাহলে! ভালো হয়ছে গেলি কেন তুই! মেঘ মনে মনে ভাবছে এখন যদি বন্যাকে বলি আবির ভাইয়ের জন্য কা*ন্না করছি তাহলে বন্যা তো আমায় এখানেই বালি চা*পা দিয়ে দিবে। বন্যা আর মেঘের একটায় সিদ্ধান্ত ভার্সিটি ভর্তির আগে কোনো প্রকার প্রেম, বন্ধুত্ব, ক্রাশ কিছুই খাওয়া যাবে না। কোচিং এ নতুন কারো সাথে কথায় বলে না। মেঘ আগে আসলে বন্যার জন্য সিট রাখে, বন্য আগে আসলে মেঘের জন্য সিট রাখে। বিষয়টা অনেকটা হাইস্কুল জীবনের মতো। এত কিছুর পরও মেঘ আবির ভাইয়ের উপর ক্রাশ খেয়ে ফেলেছে । এরজন্য বন্যা অবশ্য প্রতিনিয়ত ই মেঘকে বুঝাচ্ছে। স্যার চলে আসছেন এতক্ষণে। পরীক্ষা শুরু হলো যথারীতি। ৪ টায় পরীক্ষা শেষ করে দুই বান্ধবী হাতে হাত ধরে বের হয়েছে। আশেপাশে মেঘদের গাড়ি নেই। তাই রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে ড্রাইভার আংকেল কে ফোন দিবে ভাবলো। হঠাৎ বাইক নিয়ে আবির ভাই হাজির হলো, হেলমেট পরা, সাদা শার্ট, কালো প্যান্ট,কালো শো, হাতে কালো ফিতার ঘড়ি, শার্টের বোতামের ফাঁকে সানগ্লাস ঝুলানো। মেঘের দিকে তাকিয়ে উচ্চস্বরে ডাকলো, “মেঘ” মেঘ আর বন্যা দুজনেই ডাক শুনে তাকিয়েছে। মেঘ এক পলক তাকাতেই চিনতে পারলো এটা আবির ভাই, আবারও নতুন করে ক্রাশ খেলো সে, মনে মনে ভাবছে, “কিন্তু ওনি এখানে কেনো? ওনি কি আমায় নিতে এসেছেন? কই সেদিন তো

মীম আর আদিকে ধমকে বললো কাউকে বাইকে উঠাবে না, তারমানে আমাকেও নিশ্চয় উঠাবে না! না উঠাক, ওনার বাইকে উঠতে আমার বয়েই গেছে! কিন্তু ওনি আসলো কেনো, আল্লাহ জানেন কোন পাপের শাস্তি দিতে এখানে এসেছেন। আল্লাহ বাঁচাও!" এসব হাবিজাবি ভাবনায় ব্যস্ত মেঘ। এদিকে বন্যা মেঘের হাতে ঝাপটে ধরে আছে। আবির ভাই মেঘের দিকে খানিকক্ষণ সুস্থির বনে তাকিয়ে আছে, হয়তো মেঘের অভিব্যক্তি বুঝার চেষ্টা করছিলো, এবার হেলমেট খুলে মেঘের দিকে চোখ রাঙিয়ে তাকিয়ে বললো, 'উঠ' মেঘ তো ঘোরে আছে, আনমনে হাবিজাবি ভাবনায় ব্যস্ত। আবির ভাইয়ের কথা কানেই গেলো না। বন্যাও মনেযোগ দিয়ে দেখছে ছেলেটাকে। আগে কখনোই এই ছেলেকে দেখে নি, আবির ভাইকেও বন্যা চিনে না। তানভির ভাইকে বন্যা দেখেছে। কিন্তু এই ছেলে কে? মেঘকে বাইকে উঠতে বলছে। বন্যা মেঘকে আরও শক্ত করে ধরে আছে।। আবির ভাই এবার ধ*মকে উঠলো, "এই মেঘ, উঠতে বললাম তো!" মেঘ এবার চমকে উঠে! গোল গোল চোখে তাকায়, পরপর দুবার জোরে জোরে শ্বাস নিয়ে নিজেকে কিছুটা স্বাভাবিক করে। তারপর বন্যার দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে বললো, "ওনি আবির ভাই" তৎক্ষনাৎ বন্যা মেঘের হাত ছেড়ে দিলো। হয়তো আবির ভাইয়ের চোখ মুখ দেখে ভয় পেয়েছে। মেঘ কয়েকপা এগিয়ে আবির ভাইয়ের কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছে। ততক্ষণে আবির ভাই বাইক থেকে নেমে দাঁড়িয়ে পরেছেন। আবির ভাই উদ্বিগ্ন কণ্ঠে মেঘকে বললেন, "এই তুই কি

কিছু খাস?” মেঘ কপাল কুঁচকে বললো, “মানে? কি খাবো?” “কোন দুনিয়ায় থাকিস তুই ডাকলে শুনিস না” মেঘ চুপচাপ মাথা নিচু করে রইলো। আবির ভাই আবার বললেন, ” বাইকে উঠ” মেঘ যেনো নিজের কানতে বিশ্বাস করতে পারছে না, আবির ভাই তাকে বাইকে উঠতে বলছে, এটাও সম্ভব। মেঘের হেলদোল নাই দেখে বাইক থেকে হেলমেট নিয়ে নিজেই পরিয়ে দিলো মেঘকে। তারপর পুনরায় বাইকে বসলেন, আবার বললেন, “তুই কি উঠবি?” এতকিছু না ভেবে হাসিমুখে ঐ পাশে গিয়ে বাইকে উঠে বসলো মেঘ। আবির ভাইয়ের গায়ের সাথে গা লাগছেই কেঁপে উঠলো কিছুটা। মেঘ কাঁধে হাত রাখবে নাকি রাখবে না তা নিয়ে দুটানায় আছে। এমনিতেই জীবনে প্রথম বাইকে উঠছে। তারপর আবার আবির ভাইয়ের বাইকে । আবির ভাই যেনো বুঝে নিলো মেঘের অস্থিরতা। শীতল কণ্ঠে বললেন, “ধরে বস না হয় পরে যাবি” কাঁপাকাঁপা হাতে কাঁধে হাত রাখলো মেঘ, সঙ্গে সঙ্গে হৃৎস্পন্দনের মাত্রা বাড়ছে অষ্টাদশীর। এদিকে বন্যা তাকিয়ে দেখছে তাদের আর ভাবছে, “”মেঘের বর্ণনায় কোনো ভুল ছিল না, আবির ভাই সত্যি ই অসাধারণ। যেকোনো মেয়ে এক দেখাতেই ক্রাশ খাবে। মেঘের ক্রাশ খাওয়ায় ভুল কিছু না। “” কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে বাইক স্টার্ট দিলো আবির ভাই, কিছুটা ভ*য়ে আবির ভাইয়ের কাঁধে জোড়ে চেপে ধরলো মেঘ, কান দিয়ে শা শা করে বাতাস ঢুকছে, প্রথমবার বাইকে উঠার অনুভূতি অসাধারণ। মেঘ নিভু নিভু চোখে চারপাশ দেখার চেষ্টা করছে। বেশকিছুক্ষণ পর তারা পৌঁছে গেলো,

“বসুন্ধরা সিটি শপিং কমপ্লেক্সে” মেঘ আনন্দে আত্মহারা হয়ে যাচ্ছে। আবির ভাই ওকে শপিং এ নিয়ো আসছে। ভাবতেই পারছে না সে, এত খুশি রাখবে কোথায়। আবির ভাই মেঘকে নিয়ে একটা হিজাবের দোকানে গেলো, রেগুলার পড়ার জন্য হিজাব চাইতেই দোকানদার জর্জেট হিজাবের বক্স বের করে দিলো। “মেঘের বুঝতে বাকি নেই, রবিবারে বলেছিল হিজাব পড়ে যেতে কিন্তু মেঘ ওড়না মাথায় দিয়ে যাচ্ছিলো, কি করবে সে। মা আর বড় মা ছাড়া মেঘ তো একা শপিং এ যায় নি কখনো। বড় আম্মুরাও এখন শপিং করবেন না। তাই মেঘ ভেবেছিলো কিছুদিন ওড়না মাথায় দিয়ে যাবে তারপর ওনারা শপিং এ গেলে নিয়ে আসবে।। ” মেঘ বক্স থেকে বেছে বেছে ৩ টা আলাদা করেছে। তারপর আবির ভাইকে জিজ্ঞেস করলো, “এই তিনটা নিব?” আবির ভাই মেঘের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে দোকানদার কে জিজ্ঞেস করলেন, “এগুলোর মধ্যে কয়টা কালার আছে আপনার কাছে?” দোকানদার বললেন, “ভাইয়া আপাতত ২৪ টা আছে, আপনি চাইলে আরও দিতে পারবো তবে কিছুদিন পরে নিতে হবে!” আবির ভাই স্বাভাবিক কণ্ঠে বললেন, “সবচেয়ে বড় সাইজের হিজাব ২৪ টা কালার ই দেন” আবির ভাইয়ের কথা শুনে মেঘ তড়িৎ বেগে তাকালো আবির ভাইয়ের দিকে, তৎক্ষনাৎ চোখ নামিয়ে শক্ত গলায় বললো, “এতগুলো লাগবে না, ৩ টা হলেই হবে!” আবির ভাই তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়েছে মেঘের দিকে,কটমট করে বললো, “তোকে কিছু জিজ্ঞেস করছি আমি?” ভ*য়ে সিটিয়ে পরলো মেঘ। আর কিছু বলার সাহস পেলো

না। কিন্তু ভেতরে ভেতরে ফুঁসছে । যেখানে তার কোচিং সপ্তাহে ৩-৪ দিন। ২-৩ টা হিজাব হলেই হয়ে যায়। ২৪ টা নেয়ার কোনো মানেই হয় না।। কিন্তু কিভাবে বুঝাবে হিট*লারকে। আবির ভাই নিজে পছন্দ করে আরও কয়েকটা পার্টি হিজাবও নিলো। মেঘ মাথানিচু করে মনে মনে শুধু আবির ভাইকে ব*কেই গেলো। আবির শপিং ব্যাগ গুলো হাতে নিয়ে মেঘকে বললো, "চল" মেঘ মুখের উপর জিজ্ঞেস করে ফেলেছে, " কোথায়?" আবির ভাই আবারও রাগান্বিত কণ্ঠে কটমট করে বললো, "কোথায় যাবো না যাবো কি তোরে বলে যাইতে হবে?" মেঘের নিজের মাথায় নিজে গাট্টা দিতে মন চাচ্ছে। সবসময় আম্মু, বড় আম্মুকে আর বন্যাকে কথার পাল্টা ঝটপট প্রশ্ন করে অভ্যস্ত মেঘ। তাই আবির ভাইকেও তেমনি জিজ্ঞেস করে ফেলছে। আবির ভাইয়ের পিছন পিছন একটা জুয়েলার্সের দোকানে ঢুকলো মেঘ। আবির ভাই একজনকে জিজ্ঞেস করলেন, "আজকে কি নেয়া যাবে?" লোকটা হাসিমুখে উত্তর দিলো " জ্বি ভাইয়া, দু মিনিট বসুন আমি বের করে দিচ্ছি। " ২ মিনিটের মধ্যেই লোকটা পূনরায় প্রশ্ন করলেন, "ভাইয়া প্যাকিং করে দিবো?" আবির ভাই তৎক্ষনাৎ বললেন, "প্যাকিং লাগবে না, রেডি হলে আমায় দেন" লোকটা ১ জোড়া নুপুর এগিয়ে দিলো আবির ভাইয়ের দিকে। মেঘও উৎসুক জনতার ন্যায় নুপুর ২টা দেখছে, অনেক মোটা আর খুব সুন্দর ডিজাইনের । হঠাৎ আবির ভাইয়ের কান্ডে মেঘ কারেন্টের খাম্বার ন্যায় স্তব্ধ হয়ে গেছে। আবির ভাইয়ের এক হাঁটু ফ্লোরে আরেকটা পা স্বাভাবিক রেখে নিচে বসেছে।

যেভাবে প্রপোজ করে অনেকটা সেভাবে। সহসা মেঘের এক পা নিজের হাঁটুর উপর রেখে একটা নুপুর পরিয়ে দিলেন, এদিকে মেঘের নিঃশ্বাস বন্ধ হওয়ার অবস্থা, হৃদপিণ্ড কম্পনের তীব্রতা বুঝতে পেরে মনে হচ্ছে এই যাত্রাই আর বাঁচবে না। আবির ভাইকে না করার শক্তিটুকুও পাচ্ছে না। খাম্বার মতোই স্থির, যা হওয়ার তা তো শরীরের ভিতরে হচ্ছে, র*ক্ত সঞ্চালনের মাত্রা বাড়ছে, মনে হচ্ছে এই বুঝি প্রেশার উঠে যাচ্ছে মেঘের। দু পায়ে নুপুর পরিয়ে আবির ভাই পুনরায় চেয়ারে বসে, মেঘের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, "দেখ, কেমন লাগছে " মেঘ তখনও নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে আছে আবির ভাইয়ের দিকে, আবির ভাই রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, "তোকে নুপুর দেখতে বলছি, আমায় না! " আবির ভাইয়ের কথায় দোকানদার জোরে হাসি শুরু করেছে। ততক্ষণে মেঘ স্বাভাবিক হলো, পরিস্থিতি বুঝতে পেরে তাড়াতাড়ি পায়ের দিকে তাকালো, সত্যিই অনেক সুন্দর লাগছে, ফর্সা পা গুলো দেখতে অন্যরকম লাগছে। খুশিতে গদগদ হয়ে বললো, "অনেক ধন্যবাদ আবির ভাই" আবির ভাই দোকানের বিল পরিশোধ করে কাছাকাছি একটা রেস্টুরেন্টে গেলেন, মেঘের মাথায় শুধু ঘুরছে এইসব কিছু স্বপ্ন, একটু পর ঘুম ভাঙবে আর সব শেষ হয়ে যাবে। রেস্টুরেন্টে বসে আবির ভাই মেঘের দিকে ম্যানু কার্ড এগিয়ে দিলেন, আর বললেন, তোর যা খেতে ইচ্ছে করে অর্ডার দে। মেঘ নিজের পছন্দ মতো কাচ্চি সাথে বোরহানি বললো। ওয়েটারকে ২ টা কাচ্চি দিতে বললো আবির। সাথে ২ টা

বোরহানি। মেঘ উত্তেজিত হয়ে জিজ্ঞেস করলো, “আবির ভাই আপনার কি কাচ্চি পছন্দ? ” আবির ভাই এবার বিরক্ত হয়ে বললো, “আমার পছন্দ অপছন্দ তোর জেনে কাজ নেই। ” মেঘের মুখটা চুপসে গেছে। খাবার আসায় দুজন চুপচাপ খাবার খেলো। মেঘ অবশ্য কয়েকবার চোখ তুলে তুলে আবির ভাই কে দেখছিলো কিন্তু আবির ভাইয়ের সেদিকে কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। সব কাজ শেষে আবির বাইকে উঠতে যাবে তখন মেঘ আবির ভাইকে ডাকলো, “আবির ভাই” “হুম” “না, কিছু না!” আবির ভাই এবার সত্যি সত্যি রাগ করলেন। কণ্ঠ তিনগুন ভারি হলো, রাগান্বিত স্বরে বলে উঠলেন, “তোকে হিজাব আর নুপুর দিয়েছি বলে খুশিতে বেশি লাফাইস না! মাথায় ওড়না দিয়ে বউয়ের মতো চলাফেরা যাতে না করতে পারিস সেজন্য হিজাব দিয়েছি। আর তুই সারাক্ষণ টুইটুই করে কোথায় ঘুরিস তা তোর নুপুরের শব্দেই বুঝতে পারবো, এতে তোকে শা*স্তি দিতে সুবিধা হবে।” মেঘ আহাম্মক বনে গেলো, কি না কি ভাবছিলো সে, আবির ভাই ভালোবেসে গিফট দিচ্ছে, আহা সে কি অনুভূতি। ” সেই অনুভূতিতে এক বালতি পানি ঢেলে দিলো আবির ভাই। আবির ভাই কণ্ঠ খাদে নামিয়ে বললেন, “উঠ” মেঘ ভ*য়ে ভ*য়ে চুপচাপ পিছনে উঠলো, এবার আর আবির ভাইকে ধরে বসবে না ঠিক করলো। আবির ভাই ধম*কে উঠলেন, “এক কথা তোকে কতবার বলতে হয় মেঘ, ধরে বস, না হয় রাস্তায় ফেলে চলে যাব” মেঘের ছোট দেহ কম্পিত হয়।। সহসা চেপে ধরে আবির ভাইয়ের কাঁধ। আবির ভাইয়ের অভিব্যক্তি

বুঝা গেলো না।বাসার সামনে পর্যন্ত আসলো কিন্তু কেউ কোনো কথা বললো না। বাসার সামনে বাইক থামিয়ে বললো, “বাসায় যা” মেঘ বাইক থেকে নেমে, আবির ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, “আপনি যাবেন না?” “না” “কোথায় যাবেন?” আবির বিরক্তি নিয়ে বললেন, “তুই কে যে তোকে আমার বলে যাইতে হবে কোথায় যাব না যাবো! আর একবার আমার মুখের উপর প্রশ্ন করবি সঙ্গে সঙ্গে থা*প্পড় দিব!” মেঘের মুখটা চুপসে গেছে, চিবুক নামিয়েছে গলায়, পাতলা ওষ্ঠে বিড়বিড় করে বললো, “হিট*লার একটা। ” আবির ভাই তৎক্ষনাৎ জবাব, “আমি হি*টলার হলে তুই কি?” আবির ভাই শুনে ফেলছে? আঁতকে উঠলো মেঘ, আবির ভাইয়ের দিকে তাকানোর সাহস হলো না, থা*প্পড়ের ভয়ে ছুটে পালালো বাড়ির ভিতর। আবির ভাই নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে আছে অষ্টাদশীর পায়ের দিকে, নুপুরের ঝনঝন শব্দ কানে লাগছে। অকস্মাৎ আবির ভাইয়ের ঠোঁটের কোণে এক চিলতে হাসির ঝলক দেখা গেলো.....মেঘ এক ছুটে বাড়ির ভেতরে ঢুকলো। সোফায় বসে গল্প করছিলো মালিহা খান, হালিমা খান আর আকলিমা খান। মেঘকে ছুটতে দেখে দৃষ্টি পরলো সেদিকে। আকলিমা খান ডেকে বললেন, “মেঘ কি হয়ছে তোর, এভাবে ছুটছিস কেনো?” মেঘ সিঁড়ির নিচে এসে থামলো, হাঁপাচ্ছে মেয়েটা, জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিচ্ছে আর বার বার দরজার দিকে তাকাচ্ছে। আবির ভাই বলেছে কোথায় যাবে তারপরও যদি কোনো কারণে বাসায় চলে আসে, এই আশংকায় বার বার তাকাচ্ছে মেঘ। হালিমা খান সূক্ষ্ম

নজরে মেঘের পায়ের দিয়ে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, “তুই নুপুর পেলি কোথায়?” মেঘ এবার দরজার দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে মা কাকিয়ার দিকে তাকালো, অকস্মাৎ বলে উঠলো, “আবির ভাই দিয়েছে! ” হালিমা খান, মালিহা খান আর আকলিমা খান তিনজন অবাক হয়ে চোখাচোখি করলো কিছুক্ষণ, মালিহা খান পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, “আবির তোকে নুপুর দিয়েছে মা?” মেঘ এবার স্পষ্ট দৃষ্টিতে তাকালো, একটু রাগী রাগী ভাব নিয়ে বললো, “আবির ভাই ই দিয়েছে বড় আম্মু! তোমার ছেলে না দিলে কি তোমার ছেলের কথা বলতাম আমি?” হালিমা খান কয়েক মুহুর্ত নিরব থেকে আবার বললেন, তোর মনে আছে মেঘ, “আবির বিদেশ যাওয়ার ৬ মাস আগে, তোর নুপুর গুলো তোর থেকে আমি নিয়ে নিছিলাম! ” মেঘ কিছুক্ষণ ভাবলো তারপর বললো, “হ্যাঁ আম্মু মনে পরছে, ঐ নুপুর গুলো কোথায়?” হালিমা খান সহসা উত্তর দিলেন, “ঐগুলো তো আমার কাছেই আছে। কিন্তু সেদিন নুপুর গুলো আমি নিজের ইচ্ছে তে নেই নি। আবির ই বলেছিলো নিতে।” মেঘ চমকে উঠলো মায়ের কথায়, ছুটে এসে বসলো সোফায়, “কি হয়ছিলো বলো আম্মু, কেনো নিয়েছিলে?” হালিমা খান একটু ভেবে চিন্তে বললেন, “তেমন কিছু না, আবির আমার কাছে এসে বলেছিলো, তোর পায়ের নুপুরের শব্দ নাকি ওর মাথায় ধরে, ঘুমাইলে তুই দৌড়াদৌড়ি করিস,ঝনঝন করলে ওর মাথা ব্যথা করে,পড়তে পারে না। তাই বলছিলো নুপুর খুলে রেখে দিতে। তাই আমিও আবিরের কথামতো তোর থেকে নুপুর নিয়ে নিছিলাম। এরপর

তুই ও আর কখনো চাস নি, আমিও আর তোকে দেয় নি । ২-১ বছর পর মনে হয়ছিলো আমার কিন্তু বের করে দেখি এগুলো তোর লাগবে না। এজন্য তোর আব্বুকে বলে রাখছিলাম, তুই চাইলে তোকে যেনো নুপুর বানিয়ে দেয়, তখন তো আবির ছিল না।। এজন্যই আজকে তোর পায়ে নুপুর দেখে আমরা অবাক হচ্ছিলাম। ” মেঘ ভাবনায় পরে গেলো, “ছোটবেলায় আবির ভাই নুপুর খুলতে বললে এখন ওনি নিজের হাতে কেনো পরিয়ে দিলেন, এখন কি ওনার মাথা ব্যথা ভালো হয়ে গেছে? তৎক্ষনাৎ মনে হলো আবির ভাইয়ের কথা, তাহলে কি সত্যি আমার চালচলন পর্যবেক্ষণ করতেই নুপুর গুলো দিয়েছেন নাকি ছোটবেলার কথা ভেবে মনটা নরম হয়েছে ওনার।” আকলিমা খান হাসিমুখে বলে উঠলেন, “ঐসব বাদ দে। শপিং ব্যাগে কি রে মেঘ?” মেঘ কাকিয়ার কথায় স্বাভাবিক হয়ে বললো, “হিজাব” কেউ আর কিছু বললো না, তারা তাদের আড্ডায় মনোযোগ দিলো মেঘ ও শপিং ব্যাগ নিয়ে সিঁড়ি তে উঠায় ব্যস্ত হলো.. রাতে আর আবিরের সাথে মেঘের দেখা হয় নি। প্রতিদিনের মতো আজকেও সকাল ৮ টায় অফিসের জন্য রেডি হয়ে খেতে বসেছে আবির,মেঘ ইচ্ছে করেই আজ সেজেগুজে খেতে নামবে ভাবলো, চুল ছাড়ায় সেগুলো কোমড় ছাড়িয়ে পরেছে , মাথায় পিচ্চি বাচ্চার মতো একটা পুতুলের বেল ও দিয়েছে, কালো জামা পরেছে সাথে ম্যাচিং কালো ওড়না, ওষ্ঠদ্বয়ে হালকা গোলাপি রঞ্জকও লাগিয়েছে, সিঁড়ি দিয়ে নামছে, আবির এক পলক তাকাতেই স্তব্ধ হয়ে রইলো, মেয়েটা এমনিতেই অনেক ফর্সা,তারমধ্যে

কালো জামা পরাতে অসম্ভব সুন্দর লাগছে, সাথে চুল গুলো ছাড়া থাকাতে মায়াবন বিহারির মতো লাগছে অষ্টাদশীকে।। আবির চোখ সরাতে পারছে না,অবিচলিত আঁখিতে তাকিয়ে আছে অষ্টাদশীর পানে, হঠাৎ তানভির ডেকে উঠলো, “ভাইয়া তুমি কি আজ ফ্রী আছো?” মনোযোগ নষ্ট হলো আবিরের, মেঘের দিক থেকে চোখ নামালো, তানভিরের দিকে না তাকিয়েই বললো, “কেনো?” “আজকে আমাদের হবু এমপির জন্মদিন, ওনি তোমার কথা বলছিলেন, তুমি দেশে আছো জেনে খুব করে বললেন তুমি যেতে।। ” আবিরের স্বাভাবিক জবাব, “কখন যেতে হবে?” তানভির: ৬ টায় আবির: আচ্ছা ঠিক আছে। মেঘ এতক্ষণে টেবিলের কাছে চলে এসেছে, তিন কর্তায় যেনো ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো। সকলেই এক নজর পায়ের দিকে তাকালো কিন্তু কেউ তেমন কথা বললো না। অবশ্য কথা বলারও কিছু নেই। মেয়েদের সাজুগুজুতে বাবা, চাচারা নাক গলায় না সচরাচর, বরং তারা চায় বাড়ির মেয়েরা সবসময় হাসিখুশি থাকুক। মেঘ চেয়ার টেনে বসলো আবির ভাইয়ের বিপরীতে, এক পলক তাকালো, আবির ভাইও আজ কালো শার্ট পরেছে। আবির ভাই সবসময় সাদা অথবা কালো শার্ট ই পড়েন। হঠাৎ কফি কালার বা আসমানি বা হালকা কোনো কালার পড়েন। শুধু পাঞ্জাবির ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম দেখা যায়। ড্রেস মিলে যাওয়াতে মেঘের মাথা নিচু করে মুচকি হাসলো।। ইকবাল খান তানভিরের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, “তোদের হবু এমপি আবিরকে কিভাবে চিনে?” তানভিরের সহজ সরল উত্তর, আমি একটা

প্ল্যান দিয়েছিলাম ওনাকে, প্ল্যান কার্যকর হওয়ায় খুশি হয়ে হবু এমপি বলছিলেন, “তোমার মাথায় এত প্ল্যান আসে কিভাবে? ” আমি তখন বলেছি, ” আমায় বেশিরভাগ প্ল্যান ভাইয়া দেন। আমি ভাইয়াকে প্রবলেম শেয়ার করি তারপর ভাইয়া আমায় প্ল্যান দেয়। ‘ তখনই এমপি বলছিলেন তাহলে তোমার ভাইয়াকে নিয়ে আইসো। তখন ভাইয়া বাহিরে ছিলেন। আজ ওনার জন্মদিন তাই সকাল বেলা ওনি নিজে আমায় কল করে জিজ্ঞেস করলেন ভাইয়া আসছে কি না, আমি হ্যাঁ বলাতে ওনি নিজেই বার বার বললেন ভাইয়াকে নিয়ে যেতে। ” ইকবালের খানের সাথে মোজাম্মেল খান এবং আলী আহমদ খান ও যেনো মনোযোগ দিয়ে তানভিরের কথা গুলো শুনছিলো। মোজাম্মেল খান সবসময় ই চুপচাপ থাকেন। যা সিদ্ধান্ত সকল কিছু বড় ভাইয়ের। তানভিরের এসব কথা শুনে আলী আহমদ খান রাগে ফুঁসছেন, রাগান্বিত স্বরে বললেন, “আবির, আমি কিন্তু তোমায় আগেই সাবধান করেছি! রাজনীতিতে তুমি জরাবে না। ” আবির নিরুদ্বেগ কণ্ঠে উত্তর দিলো, “আমি তো বলেছি রাজনীতি করবো না!” “তাহলে তানভির কে রাজনীতি নিয়ে প্ল্যান দাও কেন, রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামাও কেন, আর এমপির জন্মদিনে যেতে এক কথায় রাজি হলে কেনো? এই বুদ্ধি, প্ল্যান ব্যবসায় লাগালে আমাদের ব্যবসাটা আরও এগুতো। ” গম্ভীর কণ্ঠে একটানা কথাগুলো বললেন, আলী আহমদ খান। মেঘ, মীম আর আদি চুপচাপ খাচ্ছে। বাবা, চাচার কথায় কোনো মনোযোগ নেই তাদের। মেঘ খাচ্ছে আর মিটিমিটি হাসছে, আবার একটু পর পর

আবির ভাইয়ের দিকে পিটপিট করে তাকাচ্ছে। আলি আহমদ খানের কথায় আবির খাবার প্লেট থেকে চোখ তুলে তাকালো, রাশভারী কণ্ঠে বলা শুরু করলো, “”তোমাদের কয়েকবছর যাবৎ একটায় সমস্যা , তানভির কেনো রা*জনীতি করে, মেইন কথা তোমরা রা*জনীতি পছন্দ করো না। কিন্তু আমি মন থেকে চাই তানভির রা*জনীতি করুক এবং সেটা মাঝপথে ছাড়ার জন্য না। সভাপতি, এ*মপি,ম*ন্ত্রী পদে পদে নিজের সাফল্য বয়ে আনুক এবং আমার বিশ্বাস আমার ভাই সফল হবে, ইনশাআল্লাহ। কয়েক সেকেন্ড থেমে আবার বলা শুরু করলো, প্রতিটা বিষয় আমরা নিজেরা যখন ভাবি তখন একতরফা ভাবি, মনে হয় আমি যা ভাবছি সেটায় ঠিক, এটা করলেই পারফেক্ট হবে। কিন্তু সব দিক থেকে সেটা পারফেক্ট নাও হতে পারে। তাই তানভির পরিস্থিতি বুঝে নিজে যা ভাবে সেটা আমায় জানায় যদি ভাবনা ঠিক থাকে তাহলে আমি বলি ঠিক আছে, না হয় আমি সাজেশন দেয় এটা এভাবে না করে ওভাবে কর। এতটুকুই। এই কথাগুলো তানভির চাইলে আমায় না বলে তাদের কমিটির লোকজন কে বলতে পারতো কিন্তু তানভিরের যেহেতু ইচ্ছে সভাপতি হওয়ার, তার প্ল্যান সভাপতি জানলে সে কাজ করবে তখন তানভিরের নাম থাকবে না। এজন্য তানভির আমায় শেয়ার করে। আরেকটা বিষয় হলো ব্যবসা । আমি ব্যবসায় ঢুকেছি মাত্র ১ সপ্তাহ হলো, আমি সবকিছু বুঝে নেয় ঠিকমতো তারপর দেখো ব্যবসায় মনোযোগ দিতে পারি কি না। এমপির জন্মদিনে যেতে রাজি হওয়ারও কারণ আছে।

এবার বাবা চাচাদের দিকে এক পলক তাকিয়ে, চোখ নামিয়ে বলা শুরু করলো, তোমরা এখন নামি-দামি ব্যবসায়ী। একসময় তোমাদের ব্যবসাও অনেক ছোট ছিল। অনেক ঝামেলা পোহাতে হয়ছে তোমাদের। তখন আমি ছোট ছিলাম তবুও যতটা সম্ভব বুঝেছি। বর্তমানে আমি নতুন ব্যবসা শুরু করতে যাচ্ছি। আমারও কাগজপত্র নিয়ে অনেক জায়গায় দৌড়াদৌড়ি করতে হবে। অনেক বিত্তবানদের সঙ্গে ব্যবসার দিক থেকে টক্কর লাগবে। শুধু টাকা থাকলেই সবকিছু করা সম্ভব হয় না সাথে পা*ওয়ার প্রয়োজন হয়। অনেক সময় পুলিশের থেকেও রা*জনৈতিক পাও*য়ার বেশি কাজে লাগে। আইনি ভাবে যে বিষয় সমাধান করতে মাসের পর মাস লেগে যায় সেটা বড় বড় নে*তাদের একটা কলে*ই সলভ হয়ে যায়। তানভিরের যেহেতু রাজনীতি তে আগ্রহ আছে তাহলে সে মনোযোগ দিয়ে রাজনীতি করুক। আমি ব্যবসা সামলায়। তানভির ভালো অবস্থানে থাকলে,আর আমি মোটামুটি পরিচিত থাকলে আমাদের যেকোনো প্রয়োজনে আশেপাশে মানুষের সাহায্য পাবো।” এতগুলো কথা বলে এবার আবির থাকলো। মেঘ হা করে তাকিয়ে আছে আবির ভাইয়ের দিকে আর ভাবছে, ” কি দূরদর্শী চিন্তাভাবনা আবির ভাইয়ের, মেঘ মনে মনে নিজেকে বাহবা দিচ্ছে, আবির ভাইয়ের জন্য হি*টলার নাম টা একদম ঠিক ঠাক। ” আলী আহমদ খান, মোজাম্মেল খান এবং ইকবাল খান তিনজনই অবাক চোখে তাকিয়ে আছে। ইকবাল খান সহসা বলে উঠলেন, “দেখেছো ভাইয়া, আবিরের চিন্তা ভাবনা কত

দূর। আগে থেকেই ভেবে চিন্তে মাঠে নেমেছে। তুমি খামোখা চিন্তা করো ওর জন্য। দেখবে আমাদের ব্যবসাতে খুব শীগ্রই পরিবর্তন আসবে ইনশাআল্লাহ। ” আলী আহমদ খান আর কথা খোঁজে পেলেন না। খাওয়া শেষ করে উঠে গেলেন। মোজাম্মেল খান তানভিরের দিকে তাকিয়ে বললেন, “আমাদের মান না রাখ, আবিরের মান অন্ততঃ রাখিস ” তানভির শীতল কণ্ঠে জবাব দিলো, “আমি সর্বোচ্চ চেষ্টা করবো ভাইয়াকে সব দিক থেকে সাহায্য করার। ” সকলেই নিরব, এতক্ষণে মোটামুটি সবার খাওয়া শেষ। সবাই সবার মতো উঠে যাচ্ছে। আবিরের খাওয়া শেষ হতেই যেই না উঠতে যাবে, নজর পরলো অষ্টাদশীর পানে, কাজল পরিহিতা টানাটানা চোখ,গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আবিরের দিকে, আবির টেনে হিঁচড়ে দৃষ্টি সংযত করলো, হালকা করে কাশি দিলো, মেঘ এখনও বিভোরে তাকিয়ে আছে। আবির এবার দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললো, “মুখ টা বন্ধ কর মেঘ, মাছি ঠুকবে মুখে” মেঘ নড়েচড়ে বসলো, আবির ততক্ষণে বেসিনে চলে গেছে হাত ধুতে। মেঘ নিজের মাথায় নিজে গাট্টা দিলো, “ছিঃ আবির ভাই কি ভাবলো, যতই মন শক্ত করি, আহাম্মকের মতো আবির ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে থাকবো না ভাবি, ততই যেনো আবির ভাইয়ের কাছে বেকুব সাজতেছি। ” সেই যে মাথা নিচু করে খাচ্ছে আর মনে মনে নিজেকে ব*কতে ব্যস্ত, আবির ভাই কখন ব্যাগ নিয়ে বেড়িয়েছেন সেদিকেও নজর নেই মেঘের। খাওয়া শেষ করে রুমে গিয়ে পড়তে বসেছে। আজ কোচিং, প্রাইভেট নেই তাই ৩ টা পর্যন্ত

টানা পড়াশোনা করেছে। তারপর গোসল করে খেতে এসেছে। বিকেল হয়ে গেছে তাই কাকিয়া আর বড় আম্মু ঘুমাচ্ছেন, হালিমা খানও শুয়ে ছিলেন মেঘের সিঁড়িতে নামার সময় নুপুরের শব্দে বেড়িয়ে এসে খাবার দিলেন মেঘ কে, মেঘ চুপচাপ খাবার খাচ্ছে। হালিমা খান পাশে চেয়ারে বসে শান্ত কণ্ঠে মেয়েকে জিজ্ঞেস করলেন, "পড়াশোনা ঠিকমতো করছিস তো মা?" মেঘ উপর নিচ মাথা নাড়লো শুধু। হালিমা খান: আর তো কয়েকটা দিন এরপর ই তো রেজাল্ট দিয়ে দিবে। তারপর ই তো ভর্তি পরীক্ষার যু*দ্ধ শুরু হয়ে যাবে। মেঘ চুপচাপ খাওয়া শেষ করে সোফায় বসে টিভি দেখছিলো।। হালিমা খান সব গুছিয়ে মেয়ের পাশে বসলেন। মেঘ কিছুক্ষণ পর মায়ের উরুর উপর মাথা রেখে শুয়ে পরলো, হালিমা খানও সযত্নে মেয়ের মাথায় হাতবুলিয়ে দিচ্ছেন, বিকেলে গোসল করাতে চুলগুলো এখনও ভেজা।। হালিমা খান একটু রাগে রাগে বললেন, "সারাদিন বাসায় থেকেও বিকেলে গোসল করিস কেনো, ঠিকমতো না খেলে, ঠিক মতো গোসল না করলে অসুস্থ হয়ে পরবি, তখন তো পড়তেই পারবি না।" মেঘ চুপচাপ মায়ের হাঁটু আঁকড়ে শুয়ে আছে। ততক্ষণে ৫ টা বেজে গেছে। আবির আজ একটু তাড়াতাড়ি চলে এসেছে অফিস থেকে। ৬ টায় এমপির জন্মদিনের অনুষ্ঠানে যেতে হবে। বাড়িতে ঢুকে চুপচাপ সিঁড়ির দিকে যাচ্ছে। পায়ের শব্দে হালিমা খান তাকিয়ে দেখলেন আবির, হালিমা খান কোমল কণ্ঠে বললেন, "এত তাড়াতাড়ি চলে এলি যে, কফি দিব তোকে?" আবিরের দৃষ্টি পরে সোফায়, হালিমা খানের

উরুতে শুয়া মেঘকে দেখে বুকের ভেতর ছ্যাত করে উঠে আবিরের। মায়ের কথা শুনে মেঘ ও ঘাড় ঘুরিয়ে তাকায়, চোখ পরে সিঁড়ির কাছে আবির ভাইয়ের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে সোজা হয়ে উঠে বসলো। আবির তৎক্ষনাৎ তড়িৎগতিতে মেঘের কাছে আসে, ভয়ার্ত কণ্ঠে বললো, "কি হয়েছে তোর?" বলতে বলতে কপালে, গালে,গলায় হাত রাখলো একবার। আবির ভাইয়ের উষ্ণ হাতের ছোঁয়ায় কেঁপে উঠলো অষ্টাদশী। আবির হাত সরিয়ে উত্তেজিত কণ্ঠে পুনরায় প্রশ্ন করলো, "শরীর খারাপ লাগছে? মাথা ব্যথা করছে?" মেঘ যেনো বিস্ময়কর দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আবির ভাইয়ের অভিমুখে। আবির ভাইয়ের কপাল ঘামে চিকচিক করছে। হালিমা খান অভিযোগের স্বরে বললেন, "আরে দেখ না সারাদিন বাসায় থেকেও অসময়ে গোসল করে, এত লম্বা চুল শুকাতে তো সময় লাগে নাকি। নিজের কোনো যত্ন নেয় না কিছু না।" আবির সহসা বলে উঠলো, "মামনি একটু কফি করে দিবা প্লিজ?" হালিমা খানের সরল উত্তর, তুই বস একটু, এখনি নিয়ে আসছি। হালিমা খান উঠে রান্না ঘরে গেলেন, আবির ঘুরে গিয়ে হালিমা খানের জায়গায় বসলেন, মেঘ নিচের দিকে চেয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরে বসে আছে, শীর্ণ বক্ষ ধড়ফড় করছে অষ্টাদশীর। আবির ক্ষুদ্র চোখে তাকিয়ে আছে অষ্টাদশীর পানে, নিরুদ্যম কণ্ঠে শুধালো, "কি হয়েছে তোর? মন খারাপ? " মেঘের দুনিয়া ঘুরছে, মনের ভিতর টালমাটাল অবস্থা। হৃদপিণ্ড ছুটছে দ্বিকবিদিক।। কিছু সেকেন্ড পর, কোনোরকমে এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়লো। আবির একটু চুপ থেকে গম্ভীর কণ্ঠে বললো,

“কেউ বকেছে তোকে?” সহসা মেঘের জবাব, “কেউ বকে নি!” আবির এবার দীর্ঘশ্বাস ফেললো, বেশ ঠান্ডা কণ্ঠে বললো, “তাকা আমার দিকে!” মেঘ এবার দ্বিতীয় দফায় ধাক্কা খেলো, মেঘ নড়ে উঠলো, কাঁপা কাঁপা চোখে তাকালো আবির ভাইয়ের চোখের দিকে। আবির ভাইয়ের শীতল চাউনিতে অষ্টাদশীর মনে ঝড় শুরু হয়েছে। সাগরের গভীরতার ন্যায় চোখের দিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকা সম্ভব হলো না মেঘের । চটজলদি মাথা নিচু করে ফেললো। আবির তখনও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে অষ্টাদশীর দিকে। আবির কিছুটা ভেবে শক্ত কণ্ঠে বললো, “মেঘ, আমি এই বাড়ির সিঙ্গেল একটা মানুষের মুখেও তোর নামে অভিযোগ শুনতে চাই না” মেঘের অভিব্যক্তি বুঝা গেলো না, চিবুক গলায় নেমেছে। নিজের মনের উথাল-পাথাল পরিস্থিতি সামলাতে ব্যস্ত অষ্টাদশী। আবির কপাল গোটায়, হঠাৎ ই পল্লব ফেলে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে শ*ক্ত চাউনিতে মেঘের দিকে তাকায়, “কাল থেকে বিকালে কোচিং এ যাবি। ওনাদের ৩ টায় ব্যাচ আছে। প্রতিদিন ১১ টায় গোসল করবি, ১ টার পর নামাজ পরে খেয়ে প্রাইভেটে যাবি তারপর কোচিং শেষ করে বাসায় আসবি। আমি কোচিং এ কথা বলে নিবো। ” এতক্ষণে হালিমা খান কফি নিয়ে হাজির হলেন, আবির স্বাভাবিক কণ্ঠে বললো, “মামনি, মেঘ কাল থেকে ১১ টায় গোসল করবে, আর বিকালে কোচিং যাবে।। ওর গোসলের টাইম যদি ১ মিনিট এদিক সেদিক হয় তুমি সঙ্গে সঙ্গে আমায় কল করবা। ” এতটুকু বলেই কফির কাপ নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে

ধপধপ করে উপরে চলে গেলো। মেঘের হৃদপিণ্ড দুভাগ হয়ে গেলো আবির ভাইয়ের কথায়। এতদিন মনের ভেতর শুধু তু*ফান চালিয়েছে এই লোকটা। এখন মেঘের জীবনেও তুফা*ন চালাচ্ছেন। বন্যা তো ১০ টার ব্যাচে যাবে, মেঘ একা একা বিকালে পড়তে যাবে। ওখানে তো কাউরে চিনে না ভাবতেই আ*হত হলো মনটা। ঠায় সোফায় হেলান দিয়ে বসে আছে মেঘ। হালিমা খান মেঘকে এক কাপ কফি এনে দিলেন। মেঘ কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে কফি খাওয়ায় মনোযোগ দিলো। কিছুক্ষণ পর মেঘ সিঁড়ি দিয়ে উঠছে রুমে যাওয়ার উদ্দেশ্যে। তখন ই সিঁড়ি দিয়ে ব্যস্ত পায়ে নামছে আবির ভাই, এমপির জন্মদিনের অনুষ্ঠানে যাওয়ার জন্য রেডি হয়েছেন, খয়েরি রঙের শার্ট কনুই পর্যন্ত হাতা ভাজ করা, কালো প্যান্ট দিয়ে ইন করা, নতুন শো জুতা, চোখে নতুন একটা সানগ্লাস, চুল গুলো খুব সুন্দর করে স্টাইল করা। এক পলক তাকাতেই মেঘ থমকে দাঁড়ালো সিঁড়িতে, আবির ভাইয়ের এক হাত পকেটে অন্য হাতের আঙুলে বাইকের চাবি ঘুরাতে ঘুরাতে মেঘের পাশ কেটে নেমে গেলেন, মেঘ ওখানেই দাঁড়িয়ে পরেছে, বডি স্প্রের তীব্র গন্ধে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালো আবির ভাইয়ের দিকে, যতক্ষণ দেখা গেলো ততক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো, বিড়বিড় করে বললো, “ওনার য*ন্ত্রণায় আমাকে পা*বনা যেতে হবে মনে হচ্ছে! ” কিছুক্ষণ পর মেঘ রুমে চলে গেলো! তানভির সারাদিনেও বাসায় ফিরতে পারে নি সেই যে সকালে বের হয়েছিলো, সারাদিন নির্বাচনের কাজে ব্যস্ত। বিকেলে বাহিরেই খেয়েছে। তারপর থেকে জন্মদিনের অনুষ্ঠানের

কাজে ব্যস্ত। কোথায় কি রাখবে, কি ভাবে করবে, সভাপতি, সাধারণ সদস্য সকলেই ব্যস্ত। অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার পর্যায়ে আবির উপস্থিত হলো। আবিরকে দেখে তানভির ছুটে এসেছে। পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন হবু এমপির সাথে। হ্যান্ডসেক করে মতবিনিময় শুরু করলেন দুজনে। অনুষ্ঠান ভালোই ভালোই শেষ হলো। বেশ কিছু ছবিও তুলা হয়েছে। এমপির ফ্যামিলির সাথে, আবির তানভির এমপির দুপাশে দাঁড়িয়ে, কেক খাওয়ানো সহ আরও অনেক ছবি তুলা হয়েছে। সেখান থেকেই ৪ টা ছবি আবির ফেসবুকে আপলোড করেছে সাথে জন্মদিনের ক্যাপশন দিয়ে। অনুষ্ঠান শেষে তানভির বললো, "ভাইয়া তুমি কি আমায় বাইকে লিফট দিবা নাকি রিক্সা করে বাড়ি যাব?" আবির এক মুহুর্ত ভেবে উত্তর দিলো, "আজ থেকে যেতে পারবি, সমস্যা নেই!" তানভির খুশিতে আত্মহারা হয়ে গেছে। ১০ দিনের মাথায় ভাইয়ের বাইকে উঠার অনুমতি পেলো। বাইক চালাতে চালাতে আবির গম্ভীর কণ্ঠে তানভির কে বললো, "তোর কাছে মেঘের বান্ধবীর নাম্বার আছে?" তানভির স্বাভাবিক ভাবেই বললো, "হ্যাঁ আছে। কেনো ভাইয়া?" আবির রাশভারি কণ্ঠে বললো, "তুই তাকে কল দিয়ে বলিস কাল থেকে যেনো ৩ টায় কোচিং এ যায়, মেঘের ব্যাচ টাইম চেইঞ্জ করে দিয়েছি সাথে তারটাও। কোচিং এর লোকের সাথে কথা বলেছি। মেঘের একা একা বিকেলে ভালো লাগবে না। " তানভিরের চিন্তিত স্বরে বললো, "আবার কোনো সমস্যা হয়েছে ভাইয়া?" আবির এবার দীর্ঘশ্বাস ফেলে, কণ্ঠ দ্বিগুণ ভারি করে বললো, "তোর বোন ঠিক মতো

খায় না, গোসল করে না, পড়ে না কত অভিযোগ শুনতে হয়। এজন্য টাইম পাল্টে দিয়েছি, সাথে ওকেও ওয়ার্নিং দিয়েছি।” তানভির আর কিছু বললো না। চুপচাপ দুই ভাই বাসায় ঢুকে যে যার মতো রুমে চলে গেলো। রাত তখন ১০.৩০+ তানভির ফোন থেকে বন্যা নামে সেইভ করা একটা নাম্বারে কল দিলো। দুবার দেয়ার পর রিসিভ হলো। বন্যাঃ আসসালামু আলাইকুম। তানভিরঃ ওয়ালাইকুম আসসালাম বন্যাঃ কে বলছেন? তানভিরঃ আমি মেঘের ভাই। বন্যা একটু ভ*য়ে ভ*য়ে বললো, “আবির ভাইয়া?” তানভিরের কিছুটা রাগ হলো, অকস্মাৎ বলে উঠলো, “ভাইয়া তোমায় কল দিবে কেন, ভাইয়ার কি খেয়ে কাজ নাই যে তোমায় কল দিবে? ভাইয়া জীবনেও তোমায় কল দিবে না, শুধু তোমায় কেনো কোনো মেয়েকেই কল দিবে না! ” বন্যা আস্তে আস্তে শুধালো, “তানভির ভাইয়া?” তানভিরঃ হ্যাঁ। বন্যাঃ কোনো দরকার ভাইয়া? তানভিরঃ শুনো তুমি কাল থেকে ২ টার ব্যাচে প্রাইভেট পড়বে আর ৩ টার ব্যাচে কোচিং করবে। মেঘও বিকালে কোচিং করবে। এটায় জানানোর জন্য কল দিয়েছি। ভুল করে আবার সকালে চলে যেয়ো না। আল্লাহ হাফেজ। এতটুকু বলেই কল কেটে দিলো তানভির। বন্যা খাটের উপর টাশকি খেয়ে বসে পরলো। কিছু ভাবতে পারছে না। কিছুক্ষণ স্থির থেকে তাড়াতাড়ি কল করলো মেঘকে। ১ বার বাজতেই কল রিসিভ করলো মেঘ। বন্যাঃ এই পাগল, তোর কি হয়ছে রে? কাল থেকে এতবার কল দিচ্ছি কোনো খবর নাই তোর! সেই যে আবির ভাইয়ের সাথে বাইকে গেলি। কি হলো তাও

বললি না, কি অ*ঘটন ঘটাইছিস তুই? মেঘঃ আমি অ*ঘটন ঘটাই নি। আবির ভাই অঘটন ঘটাইছে। ওনি আমার মনের ভিতর ঢুকে আমার জীবনের ১৪ টা বাজায় দিছে। আমার খাওয়া,গোসল, ঘুম সবকিছুর নাজেহাল অবস্থা করে ফেলছে। ওনাকে যতবার দেখছি ততবারই ভেঙেচুরে যাচ্ছি আমি আমি। বারবার নতুন করে ক্রাশ খাই। কি করবো বল..!! বন্যা এবার রাগে বললো, রাত বিরাতে নে*শা করা ছেড়ে ঘুমা বাই। কি জন্য কল দিয়েছিলো তা বলতেই পারলো না, মেঘের এসব হাবিজাবি কথা শুনতে তার এখন একটুও ভালো লাগছে না। কোথায় সিরিয়াস মুডে কল দিলো মেঘকে। মেঘ যেনো ঘো*রেই পরে আছে। মেঘ ও আর কল ব্যাক করলো না। মেঘ ফেসবুকে ঢুকলো, ঢুকতেই সামনে আসলো আবির ভাইয়ের ৩ ঘন্টা আগে করা পোস্ট। ছবিগুলো খুব ভালো করে দেখছে মেঘ। টেনে টেনে বড় করে আবির ভাইকে মনোযোগ দিয়ে দেখছে। হঠাৎ ই একটা ছবি দেখে মেঘের দৃষ্টি স্থির হলো। আবির ভাইয়ের পাশে কড়া নীল রঙের একটা গাউন পরা মেয়ে। দেখেই মনে হচ্ছে শরীরে বড়লোক বড়লোক ভাব আছে একটা। মেঘের পায়ের রক্ত চড়চড় করো মাথায় উঠছে।ঐ মেয়ে কে আর আবির ভাইয়ের পাশে ঐ মেয়ে কি করে। কমেন্ট চেক করতে গেলো মেঘ, অনেকগুলো কমেন্টের ভিড়ে ঐ নীল জামা পরিহিতার একটা আইডি চোখে পরলো। আবির ভাইদের ছবি তে কমেন্ট করেছে, “আপনি অসম্ভব কিউট, ইচ্ছে করছিলো আপনাকে সবসময়ের জন্য রেখে দেয়। ইচ্ছে হলে বেড়াতে আসবেন আর সম্ভব

হলে ফ্রেন্ড রিকুয়েষ্ট এক্সেপ্ট করবেন।” রাগে শরীর ঘামছে মেঘের, শুয়া থেকে উঠে বসলো, কমেন্ট টাতে Angry রিয়েক্ট দিয়ে মেয়ের আইডিতে ঢুকলো। প্রোফাইল পিকটা ২ ঘন্টা আগেই আপলোড করা, কভার ফটোতে হবু এমপির সাথে ছবি, ক্যাপশন (বাবা-মেয়ে) মেঘের বুঝতে বাকি নেই এটা এমপির মেয়ে। একটা প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে। মেঘ রাগে ফুঁস ফুস করছে। আবারও আবির ভাইয়ের আইডিতে ঢুকলো মেঘ। Just Now একটা পোস্ট করেছেন আবির ভাই, “Teri Nazar Ne Ye Kya Kar Diya Mujh Se Hi Mujhko Juda Kar Diya” সাথে রাতের শহরে বাইকে বসা একটা ছবি শেয়ার করলেন। মেঘ মনোযোগ দিয়ে ক্যাপশন বুঝার চেষ্টা করছে। তারমানে আবির ভাই ঐ মেয়ের প্রেমে পরে গেছে। ভাবতেই নেত্রযূগল থেকে দুফোঁটা পানি গড়িয়ে পরলো। আবারও সেই কমেন্ট টা খোঁজতে গেলো মেঘ। কি এমন সুন্দর মেয়েটা দেখতে হচ্ছে তো! কিন্তু পোস্টের সব কমেন্ট ঘেটেও মেয়ের কমেন্ট পেলো না। তারমানে আবির ভাই ডিলিট করে ফেলছে? কিন্তু ঐ মেয়ে কে কি এক্সেপ্ট করে ফেললো? তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিজেকে নিজে সান্ত্বনা দিতে লাগলো, “আবির ভাই তো শুধুই আমার ক্রাশ। ক্রাশ তো ক্ষণিকের। ওনিও তো কিছুদিন পর বিয়ে করবেন তখন তো আমাকে মেনে নিতেই হবে। আমার তো সাহসে কুলাবে না আবির ভাইকে কিছু বলার। মা*ইর খাওয়ার থেকে চুপ থাকি, সেই ভালো।” এদিকে আবির বাসায় ফিরে ফ্রেশ হয়ে শুয়ে আছে। একটা ছবি Zoom করে

শুধু চোখ গুলোর দিকে তাকিয়ে আছে, আর বিড়বিড় করে গাইছে, Maine Jab Dekha Tha Tujhko Raat Bhi Wo Yaad Hai Mujhko Taare Ginte Ginte So Gaya Dil Mera Dhadka Tha Kaske Kuch Kaha Tha Tune Hanske Main Usi Pal Tera Ho Gaya কিছুক্ষণ থেমে আবার বললো, Teri Nazaron Ne Kuch Aisa Jaadu Kiya Lut Gaye Hum Toh Pehli Mulaqaat Meinপ্রতিদিনের মতো আজও খাবার টেবিলে একসাথে খেতে বসেছে সকলে। কিন্তু মেঘের মাথায় আজ অন্য প্ল্যান ঘুরছে। সবার খাওয়া মোটামুটি শেষ, মেঘ ইচ্ছে করেই অল্প অল্প খাচ্ছে। এদিকে মোবাইলে কি যেনো চেক করছিলো আবির, মোবাইল চেক করে করেই খাচ্ছিলো , আবিরের খাওয়া শেষ, তাই মোবাইল টেবিলের উপর একপাশে রেখে হাত ধৌতে উঠে পরে। ৩-৪ কদম যেতেই মেঘ হাত বাড়িয়ে আবির ভাইয়ের মোবাইল হাতে নেয়। তাড়াহুড়োতে হয়তো পাওয়ার বাটনে চাপ দিতে ভুলে গেছে আবির ভাই। হোমপেইজ ভেসে আছে। এখানে ২ টা হাতের ছবি। একটা বড় হাতের উপর একটা পিচ্চি হাত। মেঘ ১ সেকেন্ড তাকালো ছবিটার দিকে। কিন্তু এখন ছবি নিয়ে গবেষণা করার সময় না। তাই মেঘ তাড়াতাড়ি ফেসবুকে ঢুকলো, friend requests অপশনে ঢুকতেই চোখে পরলো কত ছেলে মেয়ের আইডি। সে খোঁজতে লাগলো গত রাতের নীল জামা পরিহিতাকে। একটু নিচে যেতেই পেয়ে গেলো, প্রত্যাশিত ব্যক্তির আইডি। এক সেকেন্ড না ভেবে ব্ল*ক করে দিলো

তাকে। তাড়াতাড়ি ফেসবুক থেকে বের হয়ে ফোন রেখে দিলো আগের জায়গায়। এবার মেঘ দীর্ঘশ্বাস ফেললো, মনে খুব শান্তি লাগছে এখন। আবির ভাই টেবিলের কাছে এসে মোবাইল নিতে নিতে, মেঘের দিকে তাকালো, নিরুদ্বেগ কণ্ঠে বললো, "যতক্ষণ সময় খাবার টেবিলে বসে থাকিস ততক্ষণ যদি তুই খাইতি, তাহলে আজ ক*ঙ্কালের মতো থাকতি না! " মোবাইল আর ব্যাগ নিয়ে অফিসের জন্য বেড়িয়ে গেলেন। এদিকে মেঘ মুচকি হেসে বিড়বিড় করে বললো, "আমি তো আপনার জন্যই বসে থাকি। আমি খাবার খেয়ে রুমে যেতে যেতে আপনি বাইক নিয়ে চলে যান। দেখতেই পারি না। তাই তো বাধ্য হয়ে এখন টেবিলেই বসে থাকি! " ★★★★ আবির ভাইয়ের কথা মতো মেঘ ১১ টার মধ্যে গোসল করেছে আজ। যথাসময়ে রেডি হয়ে রওনা দিলো টিউশনের উদ্দেশ্যে। মনটা ভিষণ খারাপ। আজ থেকে একা একা টিউশন আর কোচিং এ পড়তে হবে এটা ভেবেই মন ভা*ঙছে বারবার। টিউশনে ঢুকতেই বন্যা ডাকলো, "মেঘ,এখানে আয়!" মেঘ চোখ গোল গোল করে অবাক চোখে তাকালো, ছুটে গেলো বন্যার কাছে, মেঘ: তুই এই সময় টিউশনে কেন? আগের ব্যাচে পড়িস নি? বন্যা: কিভাবে পড়বো? তোর বেস্ট হয়েছি, তোর ভোগান্তি তো আমাকে ভুগতে হবেই। মেঘ: মানে? বন্যা: গতকাল রাতে তানভির ভাইয়া কল দিয়েছিল আমায়, বললো তোর সাথে আমারও টাইম পাল্টায় দিছে। আজ থেকে যেনো বিকেলে আসি। মেঘ: তাহলে তুই জানাস নি কেনো আমায়? আমি পুরো রাস্তা মন খারাপ করে এসেছি।

একা একা পড়তে হবে বলে। বন্যা: তোকে কিভাবে জানাবো? তুই তো আবির ভাইয়ের ঘো*রে ডুবে আছিস। মেঘ কিছুটা লজ্জা পেলো। তারপর স্ব শব্দে হেসে বললো, জানিস বন্যা আমার হিজাব টা আবির ভাই কিনে দিছে। শুধু এটায় না সর্বমোট ৩০ টা হিজাব কিনে দিয়েছে। শুধু তাই না দেখ আমার পায়ের নুপুর গুলো। এগুলোও আবির ভাই দিয়েছে। তাও আবার নিজের হাতে পড়িয়ে দিয়েছেন। দেখ, সুন্দর না? বন্যা কপাল ভাজ করে নুপুর গুলো দেখলো, তারপর বললো, "হ্যাঁ খুব সুন্দর হয়েছে। কিন্তু কাহিনী কি বল তো? ঐ ব্যাটার হঠাৎ তোর প্রতি এত মায়া হচ্ছে! তোকে কিছু বলছে কি?" মেঘ: হ্যাঁ বলছে। আমি কই যাই না যাই তা পর্যবেক্ষণ করতে নুপুর দিয়েছে। বন্যা হা করে তাকায় আছে! ততক্ষণে স্যার পড়াতে চলে এসেছেন। টিউশন, কোচিং শেষে মেঘ বাসার উদ্দেশ্যে চলে গেছে। সন্ধ্যার পর আবার জান্নাত আপু আসবে। পড়া রিভিশন দিতে হবে। জান্নাত আপু শুক্রবার, শনিবার বাদ দিয়ে বাকি ৫ দিন পড়ান। জান্নাত আপু খুব ভালো পড়ান। মেঘ ওনার ভক্ত হয়ে গেছে একেবারে। জান্নাত আপুও মেঘকে খুব আদর করে। পড়াশোনার পাশাপাশি কিভাবে পড়লে ভালো হবে, রুটিন করা সবকিছুতেই হেল্প করেন। এজন্য মেঘ ইদানীং পড়াশোনাতেও গুরুত্ব বেশি দিচ্ছে। এভাবে কেটে গেলো ১০-১২ দিন। আবিরের সাথে মেঘের প্রতিদিন সকালে খাবার টেবিলে দেখা হয়। মাঝে মাঝে মেঘ আগে আসে, মাঝে মাঝে আবির আগে চলে আসে। তারপরও দেখা তো হয়, এতেই যেনো মেঘের মনে সারাদিন প্রশান্তি

কাজ করে। আবির বাড়ি ফেরে ১১-১২ টার দিকে। আবিরের বাইকের শব্দ পেলেই মেঘ ছুটে যায় নিজের রুমের বারান্দায়। হেলমেট টা খুলে যখন বাইক থেকে নামে, "মেঘ গভীর মনোযোগ দিয়ে দেখে সে দৃশ্য আর গুনগুন করে গান গায় " তারপর বাড়িতে ঢুকার আগ পর্যন্ত যতটুকু সম্ভব তাকিয়ে তাকিয়ে আবির ভাই কে দেখে। আবির ভাই বাড়িতে ঢুকে গেলে হাসিমুখে ঘুমিয়ে পরে মেঘ। এটায় যেনো মেঘের দৈনিক রুটিন। কেনো আবির ভাইকে দেখে, তার কোনো উত্তর নেই অষ্টাদশীর কাছে। আবির ভাই কি শুধুই তার ক্রাশ নাকি সে আবির ভাইকে ভালোবাসে এর উত্তর নিজেও খোঁজে পায় না। তবে আবির ভাইকে অসম্ভব ভালো লাগে, আবির ভাইয়ের শীতল চাউনি বারংবার অষ্টাদশীর হৃদ*য়টা চূ*র্ণবিচূ*র্ণ করে। আবির ভাই অষ্টাদশীর মন-মস্তিষ্ক জোড়ে বিচরণ করছে । ১০-১২ দিন পর সকালবেলা আবির জুসের গ্লাস হাতে নিয়ে দু চুমুক খেলো কি না। আলী আহমদ খান বলে উঠলেন, "আবির তোকে একটু চট্টগ্রাম যেতে হবে। " আবির তৎক্ষনাৎ বিসুম খেলো। তানভির তাড়াতাড়ি উঠে, ভাইয়ের মাথায় ফু দিচ্ছে। রান্না ঘর থেকে ছুটে এসেছেন মালিহা খান। এদিকে মেঘ অসহায়ের মতো তাকিয়ে আছে আবির ভাইয়ের দিকে। কিছুক্ষণ পর আবির স্বাভাবিক হয়ে বললো, "আমি চট্টগ্রাম গিয়ে কি করবো?" আলী আহমদ খান স্বাভাবিক ভাবেই বললেন, "আমাদের কোম্পানিতে কিছু সমস্যা হচ্ছে, কিছু ডিলার ঝামেলা করতেছে শুনলাম। তোর কাকামনিকে সিলেট যেতে হবে। কোম্পানির CEO হিসেবে এখন

দায়িত্ব তোর উপর ই পরে। তুই কথা বললেই আশা করি সমাধান হবে। ডিলাররা অর্ডার ডেলিভারি করা পর্যন্ত তুই থাকবি ঐখানে। যদি সব ঠিকঠাক হয়ে যায় তখন চলে আসিস। ” আবির এক পলক মেঘের দিকে তাকালো, তারপর দৃষ্টি নামিয়ে প্রশ্ন করলো, “কবে যেতে হবে?” আলী আহমদ খান সহসা বলে উঠলেন, “আজ রাতে অথবা আগামীকাল সকালে চলে গেলে ভালো হবে। ” আবির চুপচাপ মাথা নিচু করে বসে আছে। আলী আহমদ খান আর মোজাম্মেল খান উঠে গেলেন। তানভির এবার ভাইকে বললো, “ভাইয়া তোমার কি একা যেতে খারাপ লাগবে? আমি কি যাবো তোমার সঙ্গে? ” আবির অ*গ্নিদৃষ্টিতে তাকালো তানভিরের দিকে, দাঁতে দাঁত চেপে বিড়বিড় বিড়বিড় করে কি যেনো বললো, কেউ কিছু বুঝলো না কিন্তু তানভির স্ব শব্দে হেসে উঠলো। আবির এবার রা*গে ফুঁসতে ফুঁসতে বললো, “”তানভির..!!”” তানভির হাসতে হাসতে চেয়ার থেকে উঠে বেসিনের দিকে দৌড় দিলো। আবির অ*গ্নিদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তানভিরের দিকে তারপর মাথা নিচু করে প্লেটের খাবার টা কোনোরকমে শেষ করে উঠে চলে গেলো। এদিকে মেঘ, মীম আর আদি বসে আছে। আদি আর মীম প্ল্যান করছে আবির ভাইয়াকে বলবে কক্সবাজার গেলে ওদের জন্য খেলনা, সাজুনি, শামুক নিয়ে আসতে। মেঘ নিশ্চুপ বসে খাচ্ছে! আবির ভাই কে দেখার জন্য ই এখন সে প্রতিদিন ফজরের সময় ঘুম থেকে উঠে। রাতে ঘুমানোর আগেও আবির ভাইকে দেখে ঘুমায়। আবির ভাই চট্টগ্রাম চলে গেলে ও থাকবে কিভাবে! মীম হঠাৎ

ডেকে উঠলো, “আপু ভাইয়াকে তুমি কি আনতে বলবা?” মীমের ডাকে ধ্যান ভাঙলো মেঘের, একটু হাসার চেষ্টা করলো, তারপর কোমল কণ্ঠে বললো, “আমার কিছু লাগবে না!” সারাদিন কেটে গেলো, মেঘ নিজের মতো কোচিং, টিউশন শেষ করে আসছে। মীম, আদি স্কুল থেকে ফিরেছে। আবির ৮ টায় বাসায় ফিরেছে। ততক্ষণে জান্নাত আপু পড়িয়ে চলে গেছেন। মেঘ বই খাতা নিয়ে নিজের রুমে চলে গেছে। রাত ১০ টার দিকে চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে বেড়িয়ে যাবে আবির। রুমে গিয়ে শাওয়ার শেষ করে, একেবারে রেডি হয়ে রুম থেকে বের হলো আবির। মেঘের রুমের দরজার সামনে এসে থামলো, দরজা ধাক্কা দিলো আস্তে করে। মেঘ বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে আছে । পাশে বই খাতা পরে আছে, ফ্যানের বাতাসে পৃষ্ঠা গুলো উড়ছে। জান্নাত আপু যাওয়ার পর ই রুমে এসে শুয়ে ছিল। আবির আস্তে করে ডাকলো, “মেঘ” কোনো সাড়া নেই। তাই রুমের ভিতরে ঢুকলো আবির। শান্ত পায়ে এগিয়ে গেলো মেঘের কাছে। মেঘের মুখের একপাশ বিছানায় লেপ্টে আছে। ফ্যানের বাতাসে চুল গুলো এলোমেলো হয়ে উড়ছে,ছোট চুল গুলো বার বার মুখে ঝাপটে পরছে, লাইটের আলোয় অপর গালটা চিকচিক করছে। আবির বিছানার এক পাশে বসলো, কিছুক্ষণ সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে পরখ করলো অষ্টাদশীকে। তারপর গালে হাত রেখে মুখ থেকে ছোট চুলগুলোকে সরিয়ে দিলো। ২-১ বার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে চুপচাপ রুম থেকে বেড়িয়ে, ব্যাগ নিয়ে নিচে চলে আসলো। মীম আর আদি খুব করে বললো, “ভাইয়া কক্সবাজার যেয়ো প্লিজ, চাটনি নিয়ে

এসো, খেলনা,শামুক আরও অনেক কিছুর আবদার করলো ভাইয়ের কাছে। ” উত্তরে আবির শুধু বললো, “সময় পেলে যাব!” খেয়ে ১০ টা নাগাদ বেড়িয়ে গেছে আবির। ইকবাল খান আগামীকাল সকাল ৮ টায় সিলেট যাবেন। আবিরের বাবার কোম্পানি ঢাকার বাহিরে তিনটা শাখা আছে। চট্টগ্রাম, সিলেট এবং রাজশাহী । ইকবাল খানকে বেশিরভাগ সময় ই বিভিন্ন জায়গাতে দৌড়াদৌড়ি করতে হয়। কখনো চট্টগ্রাম, কখনো রাজশাহী, কখনো সিলেট, বাকি সময় বাড়িতে থাকলে হেড অফিসে থাকেন। একই সাথে দুই শাখাতে যেতে হলে কখনো কখনো মোজাম্মেল খানকেও যেতে হয়। তবে আলী আহমদ খান এখন আর ঢাকার বাহিরে যান না। আবির আসাতে ওনি চাইছেন আবির সব দায়িত্ব বুঝে নেক। রাত ১১ টায় মীম এসে ডাকছে, “আপু উঠো, খাবে না?” মেঘ ঘুমঘুম চোখে তাকায় মীমের দিকে, মীম আবার বলে, “১১ টা বাজে, তুমি কখন খাবে? আম্মু, বড় আম্মু সবাই বসে আছে তোমার জন্য। আমিও খাই নি আসো। ” ১১ টা শুনেই মেঘের ঘুম উদাও হয়ে গেছে, সহসা মনটা খারাপ হলো। চিন্তিত স্বরে বললো, “আবির ভাই কি চলে গেছে?” মীম হাসিমুখে বলছে, “হ্যাঁ, ভাইয়া তো ১০ টার আগেই চলে গেছে। আমি আর আদি বলে দিছি আমাদের জন্য, খেলনা, গিফট, চাটনি নিয়ে আসতে। তোমার জন্যও আনতে বলেছি। ভাইয়া বলেছে সময় পেলে যাবে কক্সবাজার। ” মেঘের মনটা চূ*র্ণবি*চূর্ণ হয়ে গেছে। মনে মনে ভাবছে, কেনো যে শুইতে গেলাম, না ঘুমালে তো আবির ভাইকে দেখতে পারতাম। আমি ঘুমিয়ে ছিলাম

তাতে কি, আবির ভাই কি আমায় বলে যেতে পারতো না? মীম আবার ডাকলো, “আপু আসো খেতে যাই! ” মেঘ কঠিন স্বরে বললো, “আমার খিদা নেই । খাবো না। তুই খেয়ে নে। ওদের বল খেয়ে নিতে। আমি ঘুমাবো। আর লাইট টা অফ করে দিয়ে যা। ” মীম মন খারাপ করে চুপচাপ লাইট অফ করে চলে গেলো, এদিকে মেঘ ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁ*দছে, কিছুক্ষণ পর নিজে নিজেই ভাবছে, আবির ভাই তো আমায় নিয়ে ভাবেন ই না।ভাবলে তো আমাকে ডেকে বলেই যেতেন। তাহলে আমি কেনো ওনার জন্য কা*ন্না করছি। আর কাঁদবো না আমি। কিছুক্ষণ পর থামলো। খুব খিদে পাচ্ছে কিন্তু সে খাবে না। বড্ড অভিমান জমেছে বুকে। এভাবেই ঘুমিয়ে পরলো আবার। ভোরবেলাও উঠলো না মেঘ। ৮ টার উপরে বাজে খাবার টেবিলেও আসে নি। বাধ্য হয়ে মোজাম্মেল খান নিজে গেলেন মেয়েকে ডাকবে। মেঘ তখনও ঘুমে। আব্বুর ডাকে ঘুম ভাঙলো মেঘের। ১০ মিনিটের মধ্যে ফ্রেশ হয়ে নিচে আসলো। খাবার টেবিলে আবির ভাই নেই দেখে মনটা খারাপ হলো , কাকামনিও সকাল সকাল সিলেটের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছেন। চুপচাপ খেতে বসলো মেঘ কিন্তু গলা দিয়ে খাবার নামছে না। কোনো রকমে অল্প কিছু খেয়ে উঠে পরলো। রুমে গিয়ে পড়ার চেষ্টা করলো কিন্তু পড়া মাথায় ঢুকছে না। মাথায় শুধু আবির ভাই ঘুরছে। আবির ভাই কেনো বলে গেলো না, এখন আবির ভাই কোথায় আছেন, খেয়েছেন কি না এসব চিন্তায় ব্যস্ত হলো। একটু পর পর ডাটা অন করে ফেসবুকে ঢুকছে। কিন্তু আবির ভাই নেটে নাই, কোনো

আপডেট ও নেই। ১০ মিনিট পর পর মেঘ ফেসবুক চেক করছে কিন্তু তাতে কোনো লাভ হচ্ছে না। সারাদিন গেলো, এই পড়তে বসছে এই আবার ফোন চেক করছে। বিকাল নাগাদ কোনো খবর না পাওয়াতে মন খারাপ করে ঘুমিয়ে পরলো। আবির চট্টগ্রাম এসে অফিসের কাজে ব্যস্ত হয়ে পরেছে। বাসা থেকে আবিরের আম্মু কল দিয়ে খোঁজ নিয়েছে ছেলের। এছাড়া মোজাম্মেল খানও কাজের জন্য কয়েকবার কল দিয়েছে আবিরকে। দেখতে দেখতে ৩ দিন হয়ে গেলো আবিরের চট্টগ্রাম আসা। সাথে অফিসের ঝামেলায় সারাদিন এক মুহুর্ত রেস্ট নিতে পারে না। অফিসের কাজের ফাঁকে ২-১ বার বাসায় কল করে, আম্মু, মামনি,তানভিরের সাথে কথা হয়। মীম আর আদির এক কথা ভাইয়া কক্সবাজার যেয়ো প্লিজ, আমাদের জিনিস গুলো নিয়ে এসো। কিন্তু মেঘ যেনো নিখোঁজ।। আবির বিদেশে থাকাকালীন তানভির বাসায় না থাকলে যেই মেয়ে একায় সারা বাড়ি মাতিয়ে রাখতো। এখন আবির চট্টগ্রাম, তানভির সকালে বের হয়ে পার্টি অফিসে আর ফেরে ১০ টার দিকে। বাবা চাচাও সারাদিন অফিসে থাকে। তারপরও মেঘকে সারাদিনে খোঁজে পাওয়া যায় না। সকালে অল্প খেয়ে যে রুমে ঢুকে কোচিং থাকলে বের হয়, না হয় ৩-৪ টায় খুদা লাগলে চুপচাপ এসে খাবার খায়, মাকেও ডাকে না। জান্নাত আপু এসে পড়িয়ে গেলে, মেঘ অল্প খেয়ে আবার রুমে চলে যায়। মনমরা হয়ে থাকে সবসময়। আবিরের অফিসের ঝামেলা মোটামুটি মিটেছে। ডিলার প্রোডাক্ট ডেলিভারি দেয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। দুদিন ফ্রী থাকাতে মীম

আর আদির কথা মনে করে কক্সবাজার গেলো। এর আগে কখনো কক্সবাজার যায় নি আবির। এটায় জীবনে প্রথমবার। 5★ হোটেলে রুম নিয়েছে। ফ্রেশ হয়ে বের হতে হতে বিকেল হয়ে গেছে। সমুদ্র সৈকতে দাঁড়িয়ে আছে আবির, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের স্পষ্ট রূপ দিয়ে সজ্জিত বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত কক্সবাজার। কক্সবাজারের সূর্যাস্তের ছবি প্রায় সবাই স্মৃতি হিসেবে রেখেছেন নিজেদের মোবাইল ফোন বা প্রতিটা বাড়ির দেয়ালে।আবির সমুদ্রের ঢেউয়ের সঙ্গে গোধূলি বেলার সূর্যাস্ত দেখে বিমোহিত। অসংখ্য প্রাপ্তি, ক্লান্তি, হতাশা বিকীর্ণ হয়ে আছে আবিরের মনে। সমুদ্রের পানিতে অস্তমিত সূর্যের অপরূপ দৃশ্য উপভোগ করেছে। কিছুক্ষণ পর আবিরের ফোনে কল আসে।। পকেট থেকে ফোন বের করে দেখে তানভিরের কল। রিসিভ করে, তানভির: আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া আবির: ওয়ালাইকুম আসসালাম। তানভির: কোথায় আছো? আবির: কক্সবাজার আসছি আজ। কেনো? তানভির: একটু দরকার ছিল ! আবির: বল। তানভির: এমপির মেয়ে নাকি তোমায় রিকুয়েষ্ট দিয়েছিল। তুমি নাকি তাকে ব্লক করে দিয়েছো। আজ এমপির বাসায় গেছিলাম। মেয়ে তো তোমার কথা জিজ্ঞেস করতেছে আমায়। আবির: তুই কি বলছিস? তানভির: প্রথমে তো এমনিতেই বুঝানোর চেষ্টা করছি। কিন্তু মানতেছে না তাই বাধ্য হয়ে বলছি তুমি আরেকজনকে পছন্দ করো। তারসাথে তোমার বিয়ে ঠিক। আবির: আচ্ছা ঠিক আছে । তানভির: কিন্তু একটা সমস্যা আছে ভাইয়া। আবির: আবার কি সমস্যা? তানভির: এমপির মেয়ে যদি

এমপিকে বলে আর ওনি যদি আমায় জিজ্ঞেস করে তখন আমি কি বলবো? যদি মেয়ের কথা জিজ্ঞেস করে তখন কি বলবো? আবির: প্রথমত এমপি কোনোসময় এসব বিষয় নিয়ে মাথা ঘামাবে না। আর যদি শুনে ছেলে অন্য কাউকে পছন্দ করে তাহলে আরও কিছু বলবে না। তানভির: তারপর ও যদি জিজ্ঞেস করে ফেলে তখন কি বলবো? আবির: বলবি তোর বোনের সাথে বিয়ে ঠিক। তানভির: তারপর? আবির: তারপর আবার কি? বাকিটা আমি সামলে নিবো। তানভির: যদি ফোর্স করে? আবির একটু গম্ভীর কণ্ঠে বললো, “বেকুবের মতো কথা বলিস না তানভির। এমপির মেয়ে হোক আর মন্ত্রীর মেয়ে তারজন্য কি তুই নিজের ভালোবাসা কোরবান করবি নাকি, আজব।” তানভির আর কথা বাড়ালো না। তানভির: আচ্ছা ভাইয়া এখন রাখি তাহলে। আল্লাহ হাফেজ। আবির: আল্লাহ হাফেজ । কল কেটে আবির ডাটা অন করে ফেসবুকে ঢুকে। কেনো জানি মনে হলো ব্লকলিস্ট চেক করবে। ব্লক লিস্টে ঢুকতেই চোখে পরলো প্রথম আইডিটাই ঐ মেয়ের। দু সেকেন্ড ভাবলো, সে তো শুধু কমেন্ট ডিলিট করেছিল, ব্লক তো করে নি। এটা যে মেঘের কাজ তা বুঝতে বেশিক্ষণ সময় লাগলো না । কিন্তু মেঘ ফোন পেলো কোথায়? আরও কিছুক্ষণ ভাবার পর মনে হলো, টেবিলের উপর ফোন রেখে যাওয়ার ঘটনা। তারমানে সেদিন ই ব্লক করেছে। অজান্তেই ঠোঁটের কোণে এক চিলতে মুচকি হাসির ঝলক দেখা গেলো। আস্তে আস্তে বললো, “”এই সামান্য বিষয়ে জ্বলে উঠলে সইবি কিভাবে এত ঝড়-ঝঞ্ঝা। এত তাড়াতাড়ি তো

তোকে আমার করে নিবো না। আবার খুব বেশি কষ্টও দিবো না তোকে। ” অন্ধকার নেমেছে বিচে, একটু হাঁটাহাঁটি করলো আবির। ভাই বোনের জন্য কিছু কেনাকাটাও করলো। তারপর হোটেলে চলে আসছে। কেটে গেলো আরও ২ দিন। আবির বাড়ি নেই ৬ দিন যাবৎ। অষ্টাদশীর মনে বিষন্নতা ছেয়ে গেছে। খাই না ঠিক মতো, পড়াশোনা করে না, মোবাইল ও চাপে না, কথাও বলে না কারো সাথে। শুধু টিউশন আর কোচিং যায় আসে এতটুকুই। আজ সকাল থেকে মনটা মাত্রাতিরিক্ত খারাপ। তানভির ডেকে এনে খাবার টেবিলে বসিয়েছে। তানভির আজকাল পার্টি অফিসের দৌড়াদৌড়িতে মেঘকে কিছুই বলে না। মেঘকে এখন আর আগের মতো বকেও না। মেঘ যেমন পাল্টে গেছে তেমনি তানভিরও পাল্টে গেছে। মেঘ খাবার টেবিলে বসে কোনো কথা না বলেই অল্প খাবার খেলো। তানভির মোজাম্মেল খান কে প্রশ্ন করলো, আব্বু, ভাইয়া কবে ফিরবে? মোজাম্মেল খান যথারীতি জবাব দিলেন, “কাজ শেষ হলে ফিরবে, কাজ এখনও শেষ হয় নি!” মেঘের হৃদয়ে র*ক্তক্ষরণ হচ্ছে, কয়েকটা দিনেই আবির ভাইয়ের শূন্যতা খুব করে ভোগা*চ্ছে অষ্টাদশীকে। টিউশন শেষ করে কোচিং এ গেলো দুই বান্ধবী একসাথে। বন্যা বার বার জিজ্ঞেস করছে, “কি হয়ছে তোর?” মেঘ শুধু মাথা নাড়ছে একটা কথাও বলছে না। একটা ক্লাস শেষ হয়েছে । স্যার বেড়িয়ে যাওয়া মাত্রই ওষ্ঠ উল্টে কান্না শুরু করলো মেঘ, প্রথম দিকে ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদলেও নিজেকে বেশিক্ষণ কন্ট্রোল করতে পারলো না । কা*ন্নার মাত্রা বেড়ে

গেছে। শ্বাস নিতে পারছে না। মেঘের এই অবস্থা দেখে আঁতকে উঠে বন্যা। মেঘকে নিয়ে ওয়েটিং রুমে চলে যায়। ওখানে যাওয়াতে বাধভাঙ্গা কা*ন্না শুরু হয় মেঘের। বন্যা কোনোভাবেই শান্ত করতে পারছে না। ১০-১৫ মিনিট স্থির হয় এই কা*ন্না । তারপর কিছুটা থেমেছে, এখন জোরে জোরে শ্বাস ছাড়ছে। একটু কাঁদলেই মেঘের শ্বাসকষ্ট শুরু হয়। বন্যা মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে শান্ত কণ্ঠে বললো, "কি হয়েছে তোর? এভাবে কান্না করছিস কেন?" মেঘ ফুপিয়ে ফুপিয়ে উত্তর দিলো, "আমার খুব কা*ন্না পাচ্ছে! " বন্যা ভ্রু কুঁচকে বললো, "কা*ন্না পাচ্ছে তা তো দেখতেই পাচ্ছি! কিন্তু কেনো কান্না পাচ্ছে সেটা বল!" মেঘের গম্ভীর জবাব, "জানি না!" বন্যা নিজেকে কন্ট্রোল করে আবার প্রশ্ন করলো, "রেজাল্ট নিয়ে চিন্তা করছিস? নাকি চান্স পাওয়া নিয়ে? নাকি বাসায় কেউ বকেছে তোকে?" আবারও কাঁদছে মেঘ, কাঁদতে কাঁদতেই বললো, "আমি আবির ভাইকে খুব মিস করছি বন্যা, ওনি ফেসবুকেও আসেন না, আমি ওনাকে না দেখে, ওনার কথা না শুনে আর থাকতে পারছি না " বন্যা এবার অবুঝ বাচ্চার মতো হাসলো, তারপর বললো, "মিস করছিস তো কল দে" মেঘ কাঁদতে কাঁদতেই বললো, "ওনি কি আমার সাথে কথা বলবেন?" বন্যা এবার স্ব শব্দে হাসলো, "ওনি কথা বলবেন কি বলবেন না, এসব যদি তুই ভাবিস তাহলে ওনি কি ভাববেন?" মেঘ এবার মুখ তুলে তাকালো বন্যার দিকে, বন্যা এবার হাসতে হাসতে বললো, "বেবি, তুমি তো আবির ভাইয়ের প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছো, সাবধান বান্ধবী ডুবে যেয়ো না,

সামনে কিন্তু ভর্তি পরীক্ষা। ” মেঘ ভেংচি কেটে বললো, আমি আবির ভাইকে ভালোবাসি.. এটুকু বলেই থেমে গেলো, না টা বলার খুব চেষ্টা করলো কিন্তু বলতে পারলো না। বন্যা মেঘকে ঠান্ডা মাথায় বেশ কিছুক্ষণ বুঝালো। মেঘ শান্ত হয়ে বসে আছে। বন্যা বললো, “তুই তাহলে বাসায় চলে যা, ক্লাস করতে হবে না। ফোন দে, আমি ড্রাইভার আংকেল কে কল দিচ্ছি।। ” তারপর মেঘকে গাড়িতে দিয়ে বন্যা এসে ক্লাস টা শেষ করলো। মেঘ বাসায় এসে ফ্রেশ হয়েই ছুটে গেলো মায়ের রুমে। হালিমা খান ঘুমাচ্ছিলেন। মেঘ মায়ের হাতের উপর মাথা রেখে মাকে জরিয়ে ধরে শুয়ে পরেছে।। হালিমা খান ঘুমের মধ্যে ই একবার চোখ খুলে দেখলেন, মেঘকে দেখে মেঘের পিঠ বরাবর জরিয়ে ধরে ঘুমিয়ে পরলেন পুনরায়। অনেকক্ষণ কান্না করায় মেঘও ক্লান্ত ছিল সেও মাকে জরিয়ে ধরে ঘুমিয়ে পরেছিলো। বেশ কিছুক্ষণ পর মেঘের ঘুম ভাঙে। ততক্ষণে হালিমা খান সজাগ হয়ে গেছেন। শুয়ে শুয়ে মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। মেঘ সচরাচর মায়ের কাছে শুতে আসে না। যখন খুব বেশি মন খারাপ থাকে তখন ই আসে। মেঘের ঘুম ভাঙতেই হালিমা খান বললেন, “তোর কি শরীর খারাপ মা?” মেঘ মাথা নেড়ে, না করলো হালিমা খান পুনরায় বললেন, “রেজাল্ট নিয়ে চিন্তা করছিস?” মেঘ আবারও মাথা নেড়ে, না করলো মেঘ এবার মাকে শক্ত করে জরিয়ে ধরে বললো, “আম্মু আবির ভাই কবে আসবে?” মেয়ের প্রশ্নে হালিমা খান মুচকি হাসলেন আর বললেন, “কেনো ভাইয়ের জন্য পেট পু*ড়ছে?” মেঘ মনে মনে

বললো, “পেটের সাথে মনটাও পু*ড়ছে আম্মু। ” মেঘকে নিরব দেখে হালিমা খান বললেন, “দুপুরে তো কথা হলো, বললো আরও ২-৪ দিন লাগতে পারে। ” কথা হয়েছে শুনে সহসা মেঘের মনটা খারাপ হলো, নিজেকে সামলে বললো, “আম্মু আবির ভাইকে কল দাও না প্লিজ।” হালিমা খান: বিকেলেই তো কথা হলো। এখন আবার কল দিয়ে কি করবো, ছেলেটা মনে হয় ব্যস্ত। মেঘ: আম্মু প্লিজ দাও না। হালিমা খান নিজের ফোন হাতে নিয়ে কল দিলো আবিরকে। লাউড স্পিকারে দিয়েছেন। কয়েকবার রিং হতেই রিসিভ হলো। আবির: আসসালামু আলাইকুম মামনি আবির ভাইয়ের কন্ঠ শুনে মেঘের বক্ষস্পন্দন জোড়ালো হলো। হালিমা খান: ওয়ালাইকুম আসসালাম। ব্যস্ত আছিস বাবা? আবির: হ্যাঁ কিছুটা। কেনো? হালিমা খান: মেঘ একটু কথা বলবে তোর সাথে! আবির: ঠিক আছে দাও। হালিমা খান মেঘের দিকে ফোন এগিয়ে দিলেন। মেঘ কাঁপা কাঁপা হাতে ফোন নিলো, সঙ্গে সঙ্গে লাউডস্পিকার অফ করে দিলো মেঘ। মেঘ ধীর কন্ঠে বললো, “হ্যালো” আবির তৎক্ষনাৎ রেগেমেগে বললো, “হ্যালো কি রে? প্রথমে কল দিয়ে সালাম দিতে হয় এটাও জানিস না?” আবিরের ধমকে চুপসে গেলো মুখটা। আস্তেধীরে বললো, “আসসালামু আলাইকুম ” আবির গম্ভীর কন্ঠেই উত্তর দিলো, “ওয়ালাইকুম আসসালাম” মেঘ এবার কাঁপা কাঁপা গলায় বললো, “কেমন আছেন আবির ভাই?” আবির কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে বললো, “আলহামদুলিল্লাহ ভালো, তুই কেমন আছিস?” মেঘ দীর্ঘশ্বাস ফেলে উত্তর দিলো, “আলহামদুলিল্লাহ

। ” দুজনেই কয়েক সেকেন্ড নিরবতা পালন করলো, আবির নিরবতা ভেঙে রাশভারী কণ্ঠে শুধালো, “তোর ফোন দিয়ে কল দিতে পারিস না? মামনির ফোন থেকে দিতে হলো কেনো?” মুখের উপর মেঘ বলে ফেললো, “আপনার নাম্বার নাই আমার কাছে” আবির এবার দীর্ঘশ্বাস ফেললো, গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দিলো, “রাখছি, ব্যস্ত আছি আমি। ” এই বলে কল কেটে দিলো। মেঘ আহাম্মকের মতো ফোনের দিকে তাকিয়ে রইলো। বুঝে উঠতে পারলো না ব্যাপার টা। আবির ভাইয়ের নাম্বার নেই এই কথা শুনে রেখে দিলো নাকি সত্যি ই ব্যস্ত।এটা ভেবে পাচ্ছে না অষ্টাদশী। ফোনের স্ক্রীনে ভেসে আছে, আবির নামে সেইভ করা নাম্বার টা। মেঘ মনে মনে নাম্বার টা মুখস্থ করতে ব্যস্ত হলো। তারপর মাকে ফোন দিয়ে নিজের রুমের দিকে দৌড় দিলো। নিজের ফোনে আবির ভাইয়ের নাম্বার টা লিখে নামের অপশনে লিখলো, “আমার আবির সাথে লাভ ইমুজি কিছুটা দূরে লিখলো ভাই। ” সেইভ করলো নাম্বারটা।আবির ভাইয়ের সাথে কথা বলেছে এই খুশিতে মেঘ সারাবাড়ি ছুটছে। কে বলবে এই মেয়েটায় এক সপ্তাহ রুম থেকে বের হয় নি, কারো সাথে কথা পর্যন্ত বলে নি। আজ সে মীম আর আদিকে নিয়ে দুষ্টামি, খুনসুটিতে মগ্ন। মীম আর আদিও যেনো আপুকে এভাবে পেয়ে বড্ড খুশি। হঠাৎ জান্নাত আপু বাড়িতে ঢুকলো, মেঘকে এত হাসিখুশি দেখে জান্নাত আপুও খুশি হলো। এই ১ সপ্তাহে জান্নাত আপু যতদিন এসেছে। প্রতিদিন ই মেঘ মনমরা হয়ে বসে থাকে। পড়া ধরলে পারলে বলে, না পারলে চুপ থাকে, আপু বুঝালেও সারা নেই।

বুঝছে কি না তাও বলে না। জান্নাত আপু কম করে হলেও ২০ বার জিজ্ঞেস করে, “মেঘ তোমার কি হয়েছে বলো?” মেঘ কিছুই বলে না। এতে জান্নাত আপুও চিন্তিত ছিল। ওনি নিজে থেকেই অনেক বুঝিয়েছেন, রেজাল্ট নিয়ে যেনো চিন্তা না করে, এডমিশন টেস্ট নিয়ে যেনো না ভাবে। কিন্তু মেঘ এসবে কোনো সাড়া দেয় নি। তাই আজ মেঘকে খুশি দেখে জান্নাত আপুর মুখে সহসা হাসি ফুটে উঠেছে। জান্নাত আপু ডাকলে, “মেঘ” সোফায় বসা মেঘ পিছন ফিরে তাকিয়ে জান্নাত আপুকে দেখে ছুটে আসে। মেঘ: আপু কেমন আছো? জান্নাত: আলহামদুলিল্লাহ ভালো। তুমি কেমন আছো? মেঘ: আলহামদুলিল্লাহ ভালো। আপু তুমি একটু বসো , আমি রুম থেকে বই খাতা নিয়ে আসছি। বলেই সিঁড়ি দিয়ে ছুটছে রুমের দিকে। জান্নাত হাস্যোজ্জ্বল মুখে তাকিয়ে আছে মেঘের দিকে। সত্যি বলতে ছটফটে স্বভাবের মেয়েরা হঠাৎ শান্ত হয়ে গেলে সবার নজরে পরে যায়। মেঘের ক্ষেত্রেও তেমনটায় হয়েছে। জান্নাত আপুর পড়ায় মেঘের সম্পূর্ণ মনোযোগ আছে আজ। পড়ানোর আগেই সব বুঝে ফেলছে। জান্নাত আপু পড়িয়ে যাওয়ার পর আরও ১-২ ঘন্টা মীম আর আদির সাথে আড্ডা দিয়েছে মেঘ। নিজেও পড়ছে না ওদের কেও পড়তে দিচ্ছে না। এতে অবশ্য মা,কাকিয়া কিছুই বলছে না। মেয়েটা যে হাসিখুশি আছে এতেই সবার ভালো লাগছে। মোজাম্মেল খান এবং আলী আহমদ খান বাসায় ফিরেছেন কিছুক্ষণ আগে। ফ্রেশ হয়ে খেতে বসেছেন। মেঘ ও আজ সবার সাথে খেতে বসেছে। আবির ভাইয়ের

চেয়ারের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলো। মনে মনে বললো, “মিস ইউ আবির ভাই” আলী আহমদ খান মেঘকে জিজ্ঞেস করলেন, “মেয়েটা ভালো পড়াচ্ছে তো আম্মু?” মেঘ হাসিমুখে উত্তর দিলো, “আপু অনেক ভালো পড়ায় বড় আব্বু!” ‘কোনো সমস্যা হলে জানাইয়ো’ স্বাভাবিক ভাবেই কথাটা বললেন আলী আহমদ খান। মেঘও শান্ত স্বরে বললো, “ঠিক আছে বড় আব্বু!” মেঘ রুমে এসে শুয়ে পরেছে। আজ পড়তে একটুও ইচ্ছে করছে না। আবির ভাইয়ের সাথে কথা বলার খুশি, সাথে এটাও অনুভব করছে সে আবির ভাইকে ভালোবেসে ফেলেছে। এসব ভেবেই মেঘের ওষ্ঠ ছড়িয়ে আসে। সহসা ডাটা অন করে আবির ভাইয়ের আইডিতে ঢুকে। সেদিন রাগ করে ছবি ডিলিট করার পর আর ছবিগুলো ডাউনলোড করে নি। আজ আবার ইচ্ছে হলো ছবিগুলো সেইভ করার। এখন আর রা*গ, অভিমানে আবির ভাইয়ের ছবি ডিলিট করবে না এই প্রতিজ্ঞা করলো। আবির ভাইয়ের আইডিতে ঢুকতেই একটা পোস্ট চোখে পরে, “আমার স্বপ্নগুলো হাতছানি দেয়, সন্ধ্যাতারার মাঝে” সাথে কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে তুলা একটা ছবি। ২ ঘন্টা আগেই পোস্ট করেছেন।মেঘ সঙ্গে সঙ্গে ছবিতে কেয়ার রিয়েক্ট দিলো, একটা লাভ ইমুজিও কমেন্ট করলো। আবির ভাইয়ের ছবি দেখে মেঘেরও কক্সবাজার যেতে খুব ইচ্ছে করছে। কিন্তু চাইলেই তো সব ইচ্ছে পূরণ হয় না। এক দৃষ্টিতে ছবিটা কিছুক্ষণ দেখলো তারপর আস্তে আস্তে সব ছবি সেইভ করতে লাগলো। গ্যালারিতে একটা একটা এলবাম খুললো নাম দিলো – Pawky Trample এখানে আবির

ভাইয়ের সব ছবি একসাথে রাখলো। আবির ভাইকে দেখতে দেখতে কখন ঘুমিয়েছে কে জানে। কেটে গেলো আরও ২-৩ দিন। মেঘ নিজের রুটিন মতো খায়, গোসল করে, ঘুমাই, পড়াশোনা করে। মাঝখানে ৫/৭ দিন একদম ই পড়াশোনা করে নি। এই গ্যাপটাও এখন ফিলাপ করছে। ক্লান্ত লাগলে আবির ভাইয়ের ছবি দেখে। আজ কোচিং, টিউশন কিছু নেই। তাই দুপুরে খেয়ে ঘুমিয়েছে মেঘ। বিকেলে ঘুম থেকে উঠে ফ্রেশ হয়ে নিচে আসে কফি খাওয়ার। নিচে আসতেই চোখে পরে মীম আর আদি অনেক গিফট ছড়িয়ে দেখছে। মেঘকে দেখেই আদি ছুটে যায় মেঘের কাছে। আদি: আপু দেখো ভাইয়া কত গিফট নিয়ে আসছে আমাদের জন্য। অনেকগুলো শামুক এনেছে সবার নাম লিখা। আসো আসো এরমধ্যে মীম ২ টা শামুক নিয়ে এসেছে। দেখো আপু তোমার নামের একটা আমার নামের একটা।। মেঘ এক পলক তাকালো শামুকের দিকে। শামুক গুলোর উপর সুন্দর করে ভেসে আছে নামটা, মেঘ উত্তেজিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো, “আবির ভাই কখন এসেছে?” মীম হাসিমুখে উত্তর দিলো, “কিছুক্ষণ আগেই এসেছে । ” মেঘ আর কিছু না বলে সিঁড়ি দিয়ে ব্যস্ত পায়ে উঠতে লাগলো। মীম পিছন থেকে ডাকলো, আপু কোথায় যাচ্ছো, আরও গিফট আনছে ভাইয়া, আসো দেখে যাও। মেঘ গলা উঁচু করে বললো, “একটু পরে আসছি। ” হুটোপুটি করে উঠে, অন্তহীন ছুটে আবির ভাইয়ের রুমের দিকে, ঠিক দরজার সামনে এসে থামে, উত্তেজিত হাতের ধা*ক্কায় চাপানো দরজা সহসা খুলে গেলো, আবির শাওয়ার

শেষ করে কোমড়ে টাওয়েল জড়িয়ে উন্মুক্ত শরীরে ওয়াশরুম থেকে বের হয়েছে মাত্র। সারা শরীরে বিন্দু বিন্দু পানিতে চিকচিক করছে। প্রশস্ত বুকের লোমগুলোতেও পানি জমে আছে। চুল থেকে টুপ টুপ করে পানি পরছে। মেঘের দিকে নির্বাক চোখে তাকিয়ে আছে আবির। মেয়েটার এলোমেলো চুলগুলো উড়ছে এদিকসেদিক। এই কয়দিনেই অষ্টাদশীর মুখটা মলিন হয়ে গেছে। গায়ের রঙও কিছুটা চেপে গেছে। গভীর দৃষ্টিতে তা পরখ করতে ব্যস্ত আবির। এদিকে আবির ভাইয়ের আবেশিত, নেশা ভরা চোখের চাউনীতে অষ্টাদশীর কোমল মনে অশান্ত, অস্থির ঢেউ আঁচড়ে পরে। মনে হচ্ছে সিডর, আইলা, জলোচ্ছ্বাস সবকিছু একসাথে হানা দিয়েছে। এতদিন পর প্রিয় মানুষটাকে দেখছে তাও আবার এই অবস্থায়! আবির ভাইকে এই অবস্থায় দেখে মেঘের অন্তঃস্থলে শিহরণ জাগায়। মেঘের মনে অকস্মাৎ গান বেজে উঠলো, “দৃষ্টিতে যেন সে রাসপুতিন খু*ন হয়ে যায় আমি প্রতিদিন নামধাম জানি, সাথে তার সবকিছু তবুও নিলাম আমি তার পিছু!’ টেনে হিঁচড়ে অনেক কষ্টে দৃষ্টি নামালো মেঘ। বক্ষস্পন্দন জোড়ালো হলো। অষ্টাদশীর ভেতরটা ভরে এলো, এ যেনো প্রশান্তির হাওয়া। আবির তখনও দুর্বোধ্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে অষ্টাদশীর পানে। মেঘ গলা খাকাড়ি দিয়ে, দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাথা নিচু করে কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে বললো, “Sorry” আবিরের এবার হুঁশ ফিরে। অবাক চোখে তাকিয়ে কপাল কুঁচকে বললো, “SORRY কেন?” মেঘ কণ্ঠ খাদে নামিয়ে জবাব দিল, “অসময়ে চলে আসছি তাই,” এটুকু

বলেই চলে যেতে নেয় মেঘ। আবির হঠাৎ ই গম্ভীর গলায় বলে উঠলো, “দাঁড়া, কি বলতে এসেছিলি বল!” মেঘ তৎক্ষনাৎ শীতল কণ্ঠে বললো, “ভুলে গেছি ” আবির কয়েক সেকেন্ড থাকলো, ঠোঁটের কোণায় দুষ্টু হাসি, নিরুদ্বেগ কণ্ঠে বললো, “মনে করে বলে, তারপর যাবি” আবির ভাইয়ের কথা শুনে মেঘের হাত পা কাঁপা কাঁপি শুরু হয়ে গেছে। আবির ভাই থা*প্পড় দিবে না তো! মেঘ নরম স্বরে আস্তেধীরে আবারও বললো,। “সরি আবির ভাই, এভাবে আর রুমে ঢুকবো না। সরি” আবির কণ্ঠ দ্বিগুণ ভারি করে, বিরক্তি নিয়ে বললো, “এত ন্যাকামি করছিস কেনো মেঘ, তুই কি চাচ্ছিস, এখন আমি চিৎকার দিয়ে বাড়ির সব মানুষ জড়ো করে বলি, “”ওমা গো, ও বাবা গো, মেঘ আমার স*র্বনাশ করে ফেলছে, আমায় খালি গায়ে দেখে ফেলছে, এখন আমার কি হবে!”” আবির ভাইয়ের মুখে এমন কথা শুনে মেঘ হা করে তাকালো আবির ভাইয়ের দিকে। আবির ভাইয়ে খালি গা দেখে মনের ভেতর পুনরায় উতালপাতাল শুরু হয়ে যাচ্ছে। মেঘের সমস্ত গায়ে স্রোতের মতো শীতল হাওয়া বয়ে যায়। তৎক্ষনাৎ মাথা নিচু করে ফেললো মেঘ। আবির শক্ত কণ্ঠে আবার বললো, “আমি মেয়ে না যে আমায় এই অবস্থায় দেখে ফেলছিস বলে মানসম্মান চলে যাবে। তুই কি বলতে আসছিলি সেটা বল। ” মেঘ এবার মাথা নিচু করে কাঁপা কাঁপা গলায় আস্তে আস্তে বললো, “আপনাকে দেখতে আসছিলাম” আবির ভ্রু কুঁচকে তাকালো, তৎক্ষনাৎ বলে উঠলো, “দেখতে আসছিস দেখ, খোঁজ নে আমার, এত ফরমালিটি করছিস

কেনো?” মেঘ নরম স্বরে বললো, “দেখেছি এখন আসি!” ঘুরে এক পা ফেলতেই, আবির ডাকলো, “তোর সাথে কথা আছে, বস এসে” মেঘ ঠায় দাঁড়িয়ে পরলো সেখানে। মেঘের এবার রক্ত সঞ্চালণ বন্ধ হওয়ার পরিস্থিতি হলো। মুখ তুলে তাকাতেও পারছে না। মনে মনে বলছে, “আল্লাহ বাঁচাও ” আবির আবার বললো, “বসতে বললাম তো তোকে” মেঘ ধীরস্থির পায়ে এগিয়ে এসে বিছানার কোণায় বসেছে। চিবুক নামিয়েছে গলায়। দৃষ্টি তার ফ্লোরে। আবির একটা টিশার্ট হাতে নিয়ে ঘুরে এসে মেঘের থেকে কিছুটা দূরে বসেছে। আবির কঠিন স্বরে বললো, “কি হয়েছে তোর?” মেঘ আবারও কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে বললো, আবির ভাই আপনি কিছু একটা পড়ুন, প্লিজ। আবির মুচকি হেসে ভেজা শরীরেই হাতের গেঞ্জি টা পরে নিলো। আর বললো, “এবার শান্তি হয়ছে? এখন বল কি হয়েছে তোর?” মেঘ চিবুক নামিয়ে শীতল কণ্ঠে উত্তর দিলো, “কিছু হয় নি। ” রাগান্বিত স্বরে আবির বললো, “মেঘ, ভাবছি তোকে মেডিকেলে বিক্রি করে দিব!” মেঘের সংকীর্ণ মুখটা আরও বেশি ছোট হলো, নিভু নিভু চোখে তাকালো আবির ভাইয়ের দিকে, পাতলা অধর নেড়ে বললো, “কেনো? আমি কি করেছি?” আবির অভিভূতের ন্যায় নিষ্পলক চেয়ে রইলো মেঘের দিকে, প্রখর তপ্ত স্বরে বললো, “”এইযে তুই ঠিকমতো খাচ্ছিস না, দিনকে দিন কঙ্কাল হইতেছিস, তোকে এই বাড়িতে রাখার থেকেও মেডিকেলে রাখলে বেশি কাজে দিবে।”” কণ্ঠ ভিজে এলো মেঘের, নেত্র দ্বয় টলমল করছে, কাঁপা কাঁপা গলায় বললো, “খাই তো আমি!”

আবির এবার সরু নেত্রে তাকালো মেঘের চোখের দিকে, নেত্র যুগল টইটম্বুর হয়ে আছে, পল্লব ফেললেই পানি গড়িয়ে পরবে গাল বেয়ে। আবির দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলা শুরু করলো, এই কয়দিনে না তুই ঠিক মতো খেয়েছিস আর না তুই ঠিক মতো কোনো কাজ করেছিস। খাওয়া আর ঘুম যে ঠিকমতো করিস নি তা তোকে দেখলেই বুঝা যাচ্ছে। চুল গুলো কতদিন আঁচড়াস না আল্লাহ জানে। এমনকি তুই পড়াশোনাও করিস না। কোচিং, টিউশনের প্রতিটা পরীক্ষায় কম নাম্বার পেয়েছিস একটু থেমে রাগে কটমট করে বললো, "তুই কি পড়াশোনা করতে চাচ্ছিস না? তুই পড়াশোনা না করলে বল আমি বাড়ির সবার সাথে কথা বলে নিবো। আজকের পর কোনোদিন তোর বই নিয়ে বসতে হবে না। এরজন্য তোকে কেউ কিচ্ছু বলবে না!" মেঘের গাল বেয়ে অঝোরে পানি পরছে। কান্নারত কণ্ঠে বললো, "আমি পড়াশোনা করবো!" আবির পুনরায় গুরুভার কণ্ঠে বললো, "১ সপ্তাহে কোচিং, টিউশনের পরীক্ষায় কম নাম্বার পাওয়ার কারণ কি?" মেঘ ভণিতা ছাড়ায় বলে উঠলো, কম পায় নি তো! আবির দাঁতে দাঁত চেপে, কণ্ঠ তিনগুণ ভারি করে বললো, "আমার সামনে অন্ততপক্ষে মিথ্যা বলিস না। প্রতিটা ৩০ মার্কের পরীক্ষায় তুই ১২/১৫/২০ পেয়েছিস। এগুলো কি খারাপ মার্ক না? এই মার্ক পেলে তুই জীবনে চান্স পাবি?" মেঘ অকস্মাৎ আবির ভাইয়ের দিকে তাকায়,আওয়াজ বিহীন কান্নায় গাল বেয়ে গলায় এসেছে অশ্রুরা। ভেজা কণ্ঠে অবাক চোখে তাকিয়ে বললো, "আপনি কিভাবে জানেন?" আবির উদ্বেলিত ভঙ্গিতে তাকিয়ে

আছে অষ্টাদশীর পানে, শক্ত কণ্ঠে বললো, “মেঘ আমি তোকে ছাড় দিয়েছি, ছেড়ে দেয় নি! তুই কি ভাবছিস তোর কোনো খবর আমার কাছে নাই? তোর কোচিং এর পরিচালক আমার স্কুল ফ্রেন্ড। তাছাড়াও তোর নাম্বারের পাশে গার্ডিয়ানের যে নাম্বার টা দেয়া কোচিং এ সেটাও আমার নাম্বার। তুই পরীক্ষায় কত পাস, তোর কবে কি পরীক্ষা সব মেসেজ যেমন তোর কাছে যায়, তেমনি আমার কাছেও আসে। তোর টিউশনের স্যারও আমার পরিচিত। তুই যেদিকে পা দিবি সবটায় আমার দখলে। তাই মিথ্যা বলা, কোনোকিছু লুকানোর চেষ্টা কখনো করিস না!” মেঘ আহাম্মকের মতো তাকিয়ে কথা গুলো শুনলো, দুরু দুরু বুক কা*পছে। উদগ্রীব চোখদুটো লম্বাচওড়া মানুষটার মুখের দিকে। কান্না থেমে গেছে। গালে পানির দাগ স্পষ্ট । উদ্বেগহীন চাউনী আবির ভাইয়ের। কয়েক মুহুর্ত চোখাচোখি হলো দুজনের।শেষমেশ আবির ভাই দৃষ্টি ফেরালো। মেঘ আর কিছু বলার ভাষা খোঁজে পাচ্ছে না। চুপচাপ পা বাড়ায় দরজার দিকে, আবির সহসা ডাকে, “দাঁড়া!” মেঘের পা কাঁপছে, আবির হাতে একটা শপিং ব্যাগ নিয়ে এগিয়ে আসলো মেঘের কাছে। আবির ভাই কাছাকাছি আসতেই নাকে লাগলো চিরচেনা, পরিচিত গতরের গন্ধ। মাত্র শাওয়ার নেয়ায় সে গন্ধটা যেনো অন্যরকম সুন্দর লাগছিলো। আবির শপিং ব্যাগ এগিয়ে দিলো মেঘের দিকে। আর বললো, “এগুলো তোর, আর আজকের পর পরীক্ষা, পড়াশোনা, নিজের যত্নে একটুখানি ত্রুটি যদি আমি দেখি তাহলে আর মুখে কিছু বলবো না। যা এখন” আবির ভাইয়ের ঠান্ডা হুমকিতে

কম্পিত হলো অষ্টাদশীর দেহ। আঙ্গুল শুদ্ধ কাঁপছে। কাঁপা হাতে শপিং ব্যাগ নিয়ে ছুটে পালালো রুম থেকে। নিজের রুমের দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলো। শপিং ব্যাগটা বিছানার পাশে রেখে বিছানায় শুয়ে পরলো মেঘ। শপিং ব্যাগ টা খুলে দেখার ইচ্ছেও করছে না। ইচ্ছের থেকেও বড় বিষয় সেই শক্তিটায় পাচ্ছে না। বিছানায় শুয়ে চোখ বন্ধ করতেই চোখের সামনে ভেসে উঠলো আবির ভাইয়ের সেই উন্মুক্ত দেহ, গায়ে চিকচিক করতে থাকা বিন্দু বিন্দু পানি, সেই ধারালো চাউনী। অষ্টাদশীর হৃদয়ে লাগছে বসন্তের হাওয়া।। হৃদপিণ্ডের কম্পনের মাত্রা এতটায় তীব্র যা সহ্য করতে না পেরে মেঘ ডানহাত দিয়ে চেপে ধরেছে। কিন্তু তাতেও যেনো কম্পন থামছে না। সহসা চোখ মেলে তাকালো মেঘ। চোখের সামনে থেকে যেনো আবির ভাই সরছেই না। চোখ বন্ধ করলেও আবির ভাইকে দেখছে, চোখ মেলে তাকালেও আবির ভাইকেই দেখছে। আর বার বার মাথায় আসছে, আবির ভাইয়ের বলা কথা গুলো, “মেঘ তোকে ছাড় দিয়েছি, ছেড়ে দেয় নি!” আবার মনে হচ্ছে, “তুই যেদিকে পা দিবি সবটায় আমার দখলে” এসব ভেবেই বারবার কেঁপে উঠছে অষ্টাদশী সাথে এক অন্যরকম অনুভূতি কাজ করছে । প্রতিটা মেয়েই চাই তার প্রিয়জন তাকে আগলে রাখুন, চোখেচোখে রাখুক তেমনি মেঘের কাছে আবির ভাইও প্রিয়মানুষ।। আবির ভাই যদি বোনের নজরেও দেখে তারপরও তে মেঘ কে নিয়ে ভাবে এটা ভেবেই মানসিক শান্তি পাচ্ছে মেয়েটা। এভাবে চললো ৩০ মিনিটের উপরে। তারপর ঘুমের দেশে তলিয়ে

গেলো মেঘ। উঠলো ঠিক সন্ধ্যে নামার আগে। ফ্রেশ হয়ে এসে তৎক্ষনাৎ শপিং ব্যাগটা টেনে আনলো নিজের কাছে। শপিং ব্যাগটা উল্টে সবগুলো জিনিস বিছানার উপর ফেললো। অনেক ছোট ছোট জিনিস এলোমেলো হয়ে পরে আছে বিছানার উপর। কম করে হলেও ১৫-২০ টা হাতের ব্রেসলেট, মুক্তার মালা, কানের দুলের সংখ্যা অগণিত। দেখে মনে হচ্ছে ওনি বেছে দেখার সময় পান নি। যা পেয়েছেন সব নিয়ে নিয়েছেন। বড় একটা শামুকে লিখা, "My Pursuit" আরেকটা শামুকে লিখা, #মাহদিবা_খান_মেঘ এছাড়াও অসংখ্য ছোট ছোট শামুক একটা কাঁচের বয়ম ভরা যার সবগুলোই আবির নিজের হাতে কুড়িয়ে এনেছে। এগুলো বাদের আরও যা যা সাজার জিনিস ছিল, খাবার জিনিস যেগুলোর টেস্ট ভালো এগুলো দিয়েছে মেঘকে। মেঘ বিস্ময়কর চোখে তাকিয়ে দেখছে সবগুলো জিনিস, প্রিয়মানুষের নাম অথবা প্রিয়জনের কন্ঠ যেখানে আকাশ সম মন খারাপ দূর করতে সক্ষম সেখানে তার দেয়া সামান্যতম উপহারও অমূল্য সম্পদ । আবির ভাই যে তার কথা ভেবে আলাদা ভাবে জিনিস গুলো এনেছেন এতেই যেনো অষ্টাদশী খুশিতে আত্মহারা হয়ে গেছে।। একটা মুক্তার মালা গলায় পরলো, দুহাতে দুটা ব্রেসলেট, কানেও দুল পরলো এক সেট। ঠোঁটে হালকা গোলাপি কালার লিপস্টিকও দিয়েছে। উত্তেজিত পায়ে বাহিরে বের হলো নিজের রুম থেকে। সিঁড়ি দিয়ে নামতে যাবে তখন ই চোখ পরে আবির ভাই উঠতেছে সিঁড়ি দিয়ে। হয়তো কোথাও গিয়েছিলেন, মেঘ সিঁড়ি দিয়ে আর নামে নি ঠায়

দাড়িয়ে আছে সেখানে। বুকের ভেতর ধুকপুক করছে। আবির ভাই কাছাকাছি আসতেই উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠলো, “আবির ভাই, আমাকে কেমন লাগছে? ” আবির সিঁড়ি থেকে চোখ তুলে মেঘের দিকে তাকালো, কয়েক সেকেন্ড পর চোখ নামিয়ে বললো, “ভালো!” এমন ভাবলেশহীন উত্তরে মেঘের উত্তেজনা মিলিয়ে গেছে, মলিন হয়ে গেলো মুখটা, তবুও কিছুটা স্বাভাবিক স্বরে বললো, “Thank You Abir Vai” আবির নিজের মতো রুমের দিকে চলে যায়। মেঘ কিছুক্ষণ এখানেই দাঁড়িয়ে থাকে আর মনে মনে বলে, “সুন্দর লাগছে বললে কি আপনার জাত চলে যেতো? হি*টলার একটা”মেঘ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে মনে মনে আবির ভাইকে খুব করে বক*লো। তারপর মন শান্ত করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে চলে গেলো মীমের রুমে। মীম এখনও নিচেই আছে। ২-৩ দিনের মধ্যে উপরের রুমে চলে আসবে। মেঘ মীমের রুমের দরজায় দাঁড়াতেই মীম চোখ তুলে তাকালো। মেঘ কে দেখে উত্তে*জনায় চোখ বড় বড় করে তাকালো সহসা উঠে এলো কাছে, মীম: আপু মাশাআল্লাহ তোমাকে অনেক সুন্দর লাগছে! মুক্তার মালাতে তোমার মুখ টা চকচক করছে। মেঘ দাঁত বের করে হাসলো, মীম তৎক্ষনাৎ ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ার থেকে শপিং ব্যাগ বের করে মেঘের হাতে দিলো। মেঘ জিনিস গুলো বের না করেই দেখার চেষ্টা করলো, মীমের জন্য আনা জিনিস মেঘের তিনভাগের এক ভাগ হবে। মেঘ স্বাভাবিক কণ্ঠে বললো, ” সবগুলো সুন্দর হয়েছে । তুই একসেট পড় তারপর আমরা ছবি তুলবো নে” মীম ও হাসি মুখে রাজি হয়ে

গেলো। মীম হালকা সাজুগুজু করে নিলো। তারপর দুই বোন সোফায় বসে ছবি তুলায় ব্যস্ত হলো । ওদের হাসির শব্দ শুনে আদিও রুম থেকে ছুটে এসেছে। আদিকে সহ ৩ ভাই বোন বেশ কিছু ছবি তুললো, তারপর ছবি দেখে খুনসুটি করতে লাগলো, কাকে কোন ছবিতে কেমন লাগছে এসব নিয়ে। আবির সিঁড়ি দিয়ে ব্যস্ত পায়ে নামছে। মেঘের চোখে পরতেই অকস্মাৎ হাসি থেমে গেলো মেঘের । মাথা নিচু করে বিড়বিড় করে বললো, "তোরা রুমে গিয়ে পড়তে বস, আমিও রুমে চলে যায়" আবির দ্রুত পায়ে হেঁটে ডাইনিং টেবিলের কাছে এসে মাকে জিজ্ঞেস করলো, "আম্মু, রান্না হয়েছে?" মালিহা খান: হ্যাঁ রান্না শেষের দিকে। খেতে দিব তোকে? আবির: হ্যাঁ। ঐদিকে মেঘ চুপিচুপি সিঁড়ি দিয়ে উঠতে থাকে। বিকেলেই আবির ভাই পড়া নিয়ে কথা শুনাইছে।এখনও আড্ডা দিচ্ছে দেখলে নিশ্চিত মা*ইর দিবে। এই ভ*য়ে রুমে যেতে নেয় মেঘ। ৪-৫ টা সিঁড়ি উঠলো কি না! অকস্মাৎ আবির ডেকে উঠলো, "মেঘ, এদিকে আয়" আবির ভাইয়ের কথায় থমকে দাঁড়ায় মেঘ, মনে মনে আল্লাহ আল্লাহ করছে। ধীরগতিতে নিচে নেমে ডাইনিং টেবিলের কাছে আসলো।আবির পকেটে হাত দিয়ে টেবিলে হালকা ধাক্কা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দাঁড়ানোর স্টাইল দেখে মেঘ পুরাই ফিদা!অষ্টাদশীর মনের ভেতর ধুকপুক শুরু হয়েছে। মাথা নিচু করে দাঁড়ালো মেঘ। আবির গম্ভীর কণ্ঠে বললো, "খেতে বস!" মেঘ ভয়ে ভয়ে তাকিয়ে নরম স্বরে বললো, "খিদে নেই,পরে... " এতটুকু বলতেই চোখ পরলো আবির

ভাইয়ের চোখের দিকে, চোখ রাঙিয়ে তাকিয়ে আছে। মেঘের হাতপা কাঁপতে শুরু করেছে। আর কিছু বলার সাহস করলো না। চুপচাপ চেয়ার টেনে বসে পরলো। আবিরও এবার টেবিল ঘুরে নিজের চেয়ার টেনে বসলো। মেঘ মাথা নিচু করে চুপচাপ বসে আছে। আবির একবার মেঘের দিকে তাকাচ্ছে আবার ঘাড় ঘুরিয়ে রান্নাঘরে দেখছে। মালিহা খান আর হালিমা খান টেবিলে খাবার রাখতে ব্যস্ত হলো। আবির একটা প্লেটে ভাত দিয়ে এগিয়ে দিলো মেঘের দিকে। ছোট করে বললো, "নে খা" মেঘ কোমল হাতে প্লেট ধরতে হাত বাড়ায় কিন্তু হাত পায়ের সাথে শরীরের কাঁপাকাঁপির তীব্রতায় প্লেট পড়ে যেতে নেয়। আবির ছেড়ে দিতে নিয়েও মেঘের এ অবস্থায় আবার প্লেট ধরতে ব্যস্ত হলো। রাগান্বিত কণ্ঠে বললো, "তোর শরীরে কতটুকু শক্তি বুঝ এখন" হাত বাড়িয়ে মেঘের সামনে প্লেট রেখে নিজে খাওয়াতে মনোযোগ দিলো। আবির ভাইয়ের কথায় মেঘ মাথা নিচু করে ছোট করে ভেঙছি কাটলো, আর বিড়বিড় করে বললো, "আপনি সামনে আসলেই তো আমার সব শক্তি বিলীন হয়ে যায়! আমি কি করবো?" আবির তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালো মেঘের দিকে, কণ্ঠ দ্বিগুণ ভারি করে বললো, "তুই কি ভাত খাবি? নাকি থা*প্পড় খাবি?" মেঘ আবির ভাইয়ের কথায় আঁতকে উঠে, আস্তে আস্তে খাওয়া শুর করে। মেঘের এই ধীরস্থির গতিতে খাওয়া দেখে আবির বেশ কয়েকবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়েছে কিন্তু কিছু বলছে না। নিজের খাওয়া শেষ করে বেসিন থেকে হাত ধৌয়ে এসে পুনরায় চেয়ারে বসলো। মেঘ তখনও

আস্তে আস্তে খাচ্ছিলো কিন্তু আবির ভাইয়ের আবার বসা দেখে বুকটা কেঁ*পে উঠে, খাওয়ার গতিটা কিছুটা বাড়িয়ে দিয়েছে। আবির বিস্ময়কর চোখে তাকিয়ে আছে অষ্টাদশীর দিকে। গলায় মুক্তার মালাতে জ্বলজ্বল করছে মুখটা । খুব মনোযোগ দিয়ে দেখছে মেঘের খাওয়া। মেঘ একপ্রকার নাকে মুখে খাবার শেষ করছে। কিন্তু শেষ হওয়ার আগেই আবির ভাই আবারও প্লেটে খাবার দিলো, মেঘ থাপ্প*ড়ের ভয়ে বলতে চেয়েও কিছু বলতে পারছে না। বাধ্য মেয়ের মতো চুপ করে খাচ্ছে, এদিকে আবির মেঘের দিকে তাকিয়ে মুচকি মুচকি হাসছে। হালিমা খান আর মালিহা খান রান্নাঘরে কাজ করছিলেন কিন্তু আবিরের এমন কর্মকাণ্ডে তারাও যেনো খুশিই হয়েছেন। মেঘ বাড়ির কারো কথা শুনে না। বড় আব্বুর সামনে একটু সম্মানার্থে লক্ষী মেয়ের মতো থাকে। তাছাড়া বাবা মা, কাকামনি, কাকিয়া কারো কথায় শুনে না। তানভির এত বছর ধ*মকে একটু আধটু খাওয়াতো কিন্তু সারাদিন মুখ ভোঁ*তা করে রাখতো। তানভির সারাদিন শেষে রাতের বেলা বোনের জন্য এটা সেটা কিনে এনে বোনের রাগ ভাঙাতো। এতবছর পর, আবির যেনো দ্বিতীয় ব্যক্তি যে মেঘকে শা*সন করে, জো*র করে খাওয়ায় আর মেঘ ও যেনো বাধ্য মেয়ের মতো সবকিছু মেনে নেয়। তানভির ভাইয়ার সামনে তে*জ দেখালেও আবির ভাইয়ের সামনে মেঘ একেবারে নিশ্চল হয়ে যায়। মেঘের দূর্দ*শা দেখে মালিহা খান রান্নাঘর থেকেই বলছেন, “মেয়েটাকে ছেড়ে দে বাবা, আর খেতে পারছে না তো!” আবির গম্ভীর

কণ্ঠে বললো, “ও যদি ঠিকমতো খেতো তাহলে আমার এভাবে বসে থেকে ও কে খাওয়াতে হতো না। ” কেউ আর কোনো কথা বললো না, মেঘ চুপচাপ খাওয়া শেষ করলো। মেঘের খাওয়া শেষ হওয়া মাত্রই আবির উঠে বের হয়ে গেলো বাড়ি থেকে। মেঘ নিষ্পলক তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ দরজার দিকে। তারপর উঠে নিজের রুমে চলে গেলো। একটু রেস্ট নিয়ে পড়তে বসলো। রাত ১২ টার উপরে বাজে মেঘ পড়তেছে কিন্তু আবির ভাই এখনও আসছে না। চিন্তা লাগছে মেঘের, বারবার উঠে বারান্দায় যাচ্ছে মেঘ। তানভির ইদানীং খাওয়াদাওয়া বাদ দিয়ে কাজ করছে। মনোনয়নের ফলাফল ঘোষণা করবে আগামীকাল। কারো চোখে ঘুম নেই। দল থেকে মনোনয়ন পেয়ে গেলে আলহামদুলিল্লাহ। তারপর প্রচারণা চালাতে হবে। তারা কোনোভাবেই আজ রাতে তানভিরকে ছাড়ছিলো না, গো*পন মিটিং চলছে এমপির বাড়িতে । রাজনৈতিক মিটিং মিছিল থেকে ভাইকে আনতে বাধ্য হয়ে আবিরকেই যেতে হলো । এমপির বাড়ির হলরুমে মিটিং চলছিলো। আবির এমপির বাড়ির সামনে বাইক থামিয়ে হলরুমের দিকে যেতে নিলেই পথ আটকে দাঁড়ায় এমপির মেয়ে। আবির চোখ গোল গোল করে তাকালো মেয়ের দিকে, রাশভারি কণ্ঠে বললো, “পথ আটকে দাঁড়িয়েছেন কেনো?” মেয়ে হাসিমুখে উত্তর দিলো, “আপনাকে আমার অনেক ভালো লাগে ভাইয়া! প্লিজ আপনার নাম্বার টা দিবেন?” আবির কণ্ঠ দ্বিগুণ ভারি করে বললো, “আপনাকে তানভির বলে নি, আমি একজনকে ভালোবাসি? ” মেয়ে এই কথা

পাত্তায় দিলো না, হাসতে হাসতে উত্তর দিলো, “আমি তো তানভির ভাইয়ার কথা বিশ্বাস করি নি। ওনি আমার সাথে মজা করছেন!” আবির গম্ভীর কণ্ঠে বললো, “তানভির সত্যি কথা বলেছে” মেয়ে এমনভাবে হাসছে যেনো মনে হচ্ছে আবির জোক বলছে। আবির এবার দীর্ঘশ্বাস ফেলে রাগান্বিত কণ্ঠে বললো, “শুনো মেয়ে, এই আমিময় আবির অন্য কারো মালিকানায় বন্দি। আমার জীবনের অস্তিত্ব জুড়ে শুধু তার রাজত্ব চলে। ” এমপির মেয়ে অবিশ্বাস্য চোখে তাকালো আবিরের দিকে। কোমল কণ্ঠে বললো, “আপনি সত্যি সত্যি কাউকে পছন্দ করেন?” আবির সহসা বলে উঠলো, “সে আমার পছন্দ বা ভালো লাগা নয়, সে আমার ভালোবাসা। আমি আমৃত্যু ভালোবাসবো তাকে” মেয়েটার চোখ টলমল করছে, এটা দেখে আবির এবার বিরক্তি নিয়ে বললো, “শুনো, আমি শুধুই তোমার মোহ। দুদিন পর সব মোহ কেটে যাবে। আর যে সত্যি সত্যি তোমার জন্য আসবে সে তোমাকে কখনো অজুহাত দিবে না। তার কাছে তোমার প্রায়োরিটি থাকবে সবার প্রথমে। যেমন আমার কাছে সর্বোচ্চ প্রায়োরিটি আমার প্রেয়সীর। আশা করি তুমি আমার কথাগুলো বুঝতে পেরেছো। তাই ভবিষ্যতে এমন কোনো কাজ করবা না বা এমন কোনো কথা বলবা না যে কারণে তোমার এই পা*গলামি গুলো নিয়ে আমার সিরিয়াস হতে হয়। ভালো থেকো।” গম্ভীর কণ্ঠে কথা গুলো বলেই হলরুমের দিকে পা বাড়ায় আবির। পিছন থেকে এমপির মেয়ে ডেকে উঠলো, “সরি ভাইয়া, আর কখনো এমন হবে না। প্লিজ আব্বুকে কিছু বলবেন না,

প্লিজ!” আবির মুচকি হাসলো, মেয়েটা যে তার কথা বুঝতে পেরেছে এতেই ভালো লাগলো আবিরের। হলরুমে ঢুকেই সালাম দিলো এমপি কে। আবিরকে দেখে হ্যান্ডসেক করলেন এমপি। হাসিমুখে জিজ্ঞেস করালেন, “কেমন আছো, আবির?” আবির স্বাভাবিক কণ্ঠে বললো, “জ্বী, আলহামদুলিল্লাহ ভালো। আপনি কেমন আছেন? ” এমপি এবার চিন্তিত স্বরে বললেন, “আলহামদুলিল্লাহ ভালো তবে নির্বাচন নিয়ে একটু ঝামেলায় আছি। তা তোমার কোনো দরকার ছিল?” আবির ঠান্ডা কণ্ঠে বললো, “আসলে তানভির কে নিতে এসেছিলাম। এত রাতে কিভাবে যাবে এজন্য। ” এমপি আবারও হাসিমুখে বললেন, “মিটিং শেষ, খাওয়াদাওয়া করে চলে যেয়ো! ” আবির বললো, “আমরা খাবো না, অনেক রাত হয়ে গেছে। অন্য কোনো সময় খাবো ” এমপিও আর জোর করলেন না। আবির তানভিরকে নিয়ে বের হলো বাড়ি থেকে। বাইকে আবিরের পিছনে চুপচাপ বসে আছে তানভির ।। অনেকটা পথ যাওয়ার পর তানভির ভয়ে ভয়ে বললো, “ভাইয়া এমপির মেয়ের সাথে দেখা হয়ছিলো?” আবির বললো, “হ্যাঁ” তানভির আস্তে আস্তে বললো, ” তাকে কি বুঝাতে পারছো?” আবির গম্ভীর কণ্ঠে বললো, “আমার বুঝানো তো বুঝিয়েছি কিন্তু সে কতটা বুঝেছে এটায় এখন মূল বিষয় “‘ তানভির এবার অভিযোগের স্বরে বললো, “’”আমি কি করবো বলো ভাইয়া, কোনো দরকারে এমপির সাথে দেখা করা, গুরুত্বপূর্ণ মিটিং সবকিছু এমপির বাড়িতে হয়। আমার দেখা যায় প্রতিদিন অন্ততপক্ষে ২-১ বার এমপির বাড়িতে আসতেই হয়। আর

এই মেয়ে যেনো বসেই থাকে কখন আমি আসবো। দেখলেই ছুটে আসে, তোমার কথা জিজ্ঞেস করে শুধু । আমি কতবার বলেছি তুমি একজনকে পছন্দ করো, বিয়ে ঠিক, মেয়ে কোনো কথায় পাত্তা দেয় না। আমি এড়িয়ে গেলেও মেয়ে পথ আটকে দাঁড়ায়। এমপির চোখে এটা পড়লে তো আমাকে কালারিং বানাবে। ভাববে মেয়ের সাথে আমার কিছু চলে। তখন তো ঝামে*লায় আমি ফাঁ*সবো তাই তোমাকে বলেছি। “” একদমে কথাগুলো বললো তানভির। আবির স্বাভাবিক কণ্ঠে বললো, “সমস্যা নাই মেয়ে আশা করি আর কিছু বলবে না তোকে। তুই তোর কাজে মনোযোগ দিস। ” এরমধ্যে বাসায় চলে আসছে দুজন। প্রায় রাত দেড় টায় আবির ভাই বাড়িতে ঢুকলো বাইক নিয়ে পিছনে তানভির ভাইয়া। আবির ভাইকে দেখে মেঘের চিন্তিত মলিন মুখটা তৎক্ষনাৎ জ্বলজ্বল করে উঠেছে। সেই ১২ টা থেকে অপেক্ষা করছে আবির ভাইয়ের জন্য। বারান্দায় দাঁড়িয়ে আকাশের তারা গুনে শেষ করে ফেলছে মনে হয় কিন্তু আবির ভাই আসছিল না। মেঘ দীর্ঘশ্বাস ফেলে প্রফুল্ল মেজাজে দেখতে লাগলো আবির ভাইকে, বাসায় ঢুকার আগ পর্যন্ত যতটা দেখা যাচ্ছিলো। তারপর চুপচাপ শুয়ে ঘুমিয়ে পরলো। সকালে আবির রুম থেকে বের হয়ে করিডোর থেকে নিচে তাকালো ডাইনিং টেবিলে মেঘ নেই। এত রাত করে ঘুমানোর জন্য মেঘ সকালে ঘুম থেকে উঠতে পারে নি। আবির মেঘের দরজায় টুকা দিলো। ২ বার শব্দ হতেই ঘুমের মধ্যে টলতে টলতে এসে দরজা খুলে দিলো মেঘ। হাত দিয়ে চোখ কচলাতে কচলাতে তাকালো, সহসা

অক্ষি যুগল বিপুল হলো মেঘের, আবির বিমোহিত লোচনে চেয়ে আছে অষ্টাদশীর মুখের পানে। সদ্য ফুটে উঠা পদ্ম ফুলের ন্যায় সুন্দর লাগছে মেঘকে। খুব করে চাইছে দৃষ্টিতে সরাতে কিন্তু পারছে না। আবির ভাইকে দেখে মেঘের বুকের ভেতর সেই টিপটিপ আওয়াজ স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে। মেঘ মুখ ফঁ*সকে ডেকে উঠলো, "আবির ভাই" তৎক্ষনাৎ ঘোর কাটলো আবিরের, কিছুটা নড়েচড়ে উঠলো। আবির ঠান্ডা কণ্ঠে শুধালো, "এত রাতে বেলকনিতে দাঁড়িয়ে ছিলি কেনো?" আবির ভাইয়ের প্রশ্ন শুনে আঁতকে উঠে মেঘ, অকস্মাৎ চিরচেনা গতরের কাঁপা কাঁপি তীব্র হয়ে উঠে। বুকের ভেতর হাঁ*সফাঁ*স শুরু হয়েছে। হৃদস্পন্দন অনেক বেশি জোড়ালো হলো। চিবুক নামিয়ে চাপা কণ্ঠে বললো, "রাতে ঘুম ভেঙে গেছিলো! " আবির ভ্রু কুঁচকে তাকালো, সহসা গম্ভীর কণ্ঠে বলে উঠলো, "ঘুম ভেঙেছিল নাকি ঘুমাইতেই যাস নি, সত্যি করে বল!" আবির ভাইয়ের সামনে দাঁড়িয়ে মিথ্যা কথা বলার সাহস অষ্টাদশীর এখনও হয়নি। ভ*য়ে ভ*য়ে বললো, "ঘুম আসছিলো না!" আবির এবার ভ্রু নাচিয়ে শুধালো, "কেনো?" "মেঘ আর কিছু বলতে পারছে না। মনে হচ্ছে কথা আটকে আসছে গলায়। কোনো আওয়াজ বের হচ্ছে না মুখ থেকে। " আবির শ্বাস ঝাড়ে, ভারি স্বরে বললো, "কি হলো?" আবির ভাইয়ের ভারি কণ্ঠে চুপসে গেলো মেঘ, বিড়বিড় করে বললো, "আপনার জন্য! " আবির তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকায়, কয়েক মুহুর্ত নিরব থেকে, কণ্ঠ তিনগুণ ভারি করে বললো, "কেনো মেতেছিস ধ্বং*সের খেলায়, মেঘ, কখনো অনিশ্চিত

ভবিষ্যতের পিছনে ছুটবি না। নিজের লক্ষ্য স্থির না করলে, জীবনে কখনো সফল হতে পারবি না। ”আবির ভাইয়ের এত কঠিন কথাগুলো মেঘের মাথার তিনহাত উপর দিয়ে গেলো। কিছুই বুঝতে পারলো না সে। চিবুক নামিয়েছে গলায়। ওষ্ঠ উল্টে, গাল ফুলালো। আবির সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখছে। আবার রা*গান্বিত কণ্ঠে আবির বলে উঠলো, “এখন যে সময়টা কাটাচ্ছিস, সে সময় আর কখনো আসবে না, আ*জেবা*জে চিন্তাভাবনা বাদ দিয়ে পড়াশোনায় মনোযোগ দে। ” মেঘ এবার বুক ফুলিয়ে শ্বাস নিলো, ধীর কণ্ঠে ডাকলো, “আবির ভাই!” সহসা আবিরের তীব্র রা*গ বিলীন হয়ে গেছে, ভ্রু কুঁচকে শান্ত চোখে তাকালো অষ্টাদশীর দিকে। অতঃপর মৃদুগামী কণ্ঠে শুধু বললো, “হুমমমমমম” “এই হুম তে যেনো এক আকাশ সম ভালোবাসা, আবেগ, অনুভূতি মিশে আছে। মেঘ অতর্কিতে তাকালো আবির ভাইয়ের অভিমুখে। এই মোহঘোর মেশানো হুমমম শুনার জন্য মেঘের আমৃত্যু আবির ভাইকে ডাকতে ইচ্ছে হচ্ছে। মেঘ সারাজীবন আবির ভাইয়ের কানের কাছে ঘ্যানঘ্যান করবে, আবির ভাই প্রতিত্তোরে শুধু হুমমমমম বললেই হবে। ” এসব ভেবেই অষ্টাদশীর ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটে উঠেছে । আবির পুনরায় গম্ভীর কণ্ঠে বললো, “কিছু বলবি?” আবির ভাইয়ের কণ্ঠে মেঘের অনিন্দিত কল্পনাদের অবসান হলো। ১ সেকেন্ডেই গায়েব হলো ঠোঁটের কোণের মিষ্টি হাসি। চিবুক নামালো আবির ভাইয়ের মুখের থেকে। ওষ্ঠপুট নেড়ে নম্রভাবে বললো, “আবির ভাই আপনি একটু তাড়াতাড়ি বাসায় আসবেন, প্লিজ!”

অকস্মাৎ কথাটা বলে ফেললো মেঘ, কিন্তু এরপরই শুরু হলো কাঁপা কাঁপি, বুকের ধুকপুকানি বেড়ে যাচ্ছে। আল্লাহ জানেন আবির ভাই থা*প্পড় ই দেন কি না। সহসা দু হাত নিজের দুগালে রাখলো মেঘ। আবির ধম*ক দিতে নিয়ে মেঘের এমন কান্ডে কপাল কুঁচকালো, ঢুক গিলে রাগ গিলে সহসা চাপা কন্ঠে বললো, "কেনো?" অষ্টাদশী গালে হাত রেখে কাঁপা-কাঁপা কন্ঠে বললো, "আপনি বাসায় না ফিরলে আমার ঘুম আসে না! " কথাটা বলেই দুচোখ বন্ধ করে, কপাল কুঁচকে দাঁতে দাঁত চেপে ধরলো মেঘ। আবির প্রশস্ত নেত্রে চাইলো অষ্টাদশী দিকে। মেঘের হালচাল দেখে ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটে উঠে। কিন্তু অষ্টাদশীর চোখ বন্ধ থাকায় শব্দহীন সেই হাসি দেখতে পেলো না। আবির নিগূঢ় দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে অষ্টাদশীর দিকে যেনো এই দৃষ্টি সহজে কাটানো সম্ভব না। কয়েক মুহুর্ত চললো এভাবে। কিছুক্ষণ পর আবিরের ফোনে কল আসায় মনোযোগ নষ্ট হলো। পকেট থেকে ফোন বের করলো, অফিসের কল তৎক্ষনাৎ রিসিভ করলো, ৩০ সেকেন্ড হবে হয়তো, কথা বলে রেখে দিলো। এতক্ষণে মেঘ অনেকটায় স্বাভাবিক হয়ে গেছে। কিন্তু গাল থেকে হাত নামায় নি এখনো। আবির কল কেটে পুনরায় শক্ত কন্ঠে বললো, "আমার তাড়াতাড়ি অফিসে যেতে হবে। আমার খাওয়া শেষ হওয়ার আগে তোকে যেনো খাবার টেবিলে দেখি। " এই বলে করিডোরের দিকে পা বাড়ালো আবির। মেঘ পিছন থেকে কোমল কন্ঠে আবার ডেকে উঠলো, "আবির ভাই" আবির সহসা উত্তর দিলো, "হুমমমম" এই হুমম টা ছোট্ট মেঘের বুকে বারবার

যেনো ধা*ক্কা লাগছে।কোমল কণ্ঠে বললো, “বললেন না তো তাড়াতাড়ি আসবেন কি না?” আবির ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালো, মেঘ সঙ্গে সঙ্গে মাথা নিচু করে ফেললো, আবির কিছুটা গম্ভীর কণ্ঠে বললো, “আসতে পারি যদি তুই আমার কথা মানিস!” আর কিছু না বলে দ্রুত পায়ে নেমে গেলো নিচে। আবির ভাই এত সহজে মেনে নিয়েছে ভেবেই মেঘ খুশিতে আ*ত্মহারা হয়ে যাচ্ছে। দ্রুত ফ্রেশ হয়ে চুল গুলো ঠিকঠাক করে, হুটোপুটি করে নিচে নামতে লাগলো। হাসিমুখেই এসে বসলো আবির ভাইয়ের বিপরীতে।একবার দেখলো আবির ভাইকে, প্লেটের দিকেও তাকালো, কিন্তু ততক্ষণে আবির ভাইয়ের খাওয়া শেষের দিকে। মেঘ খাওয়া শুরু করতে করতে আবির ভাই খাওয়া শেষ করে উঠে ফ্রেশ হয়ে অফিসের উদ্দেশ্যে চলে যাচ্ছে। মেঘ এক মুহুর্ত তাকিয়ে রইলো আবির ভাইয়ের দিকে তারপর স্বাভাবিক হয়ে খেতে শুরু করলো। আবির ভাইয়ের এত কথার মধ্যে “হুমমমমম” টায় যেনো বার বার কানে বাজছে মেঘের। সবগুলো কথায় মনে পরছে। খাওয়া শেষ করে রুমে গিয়ে শুয়ে শুয়ে আবির ভাইয়ের কথা ভাবছে।মেঘ মনে মনে নিজেকে প্রশ্ন করছে, সেই প্রশ্নের উত্তর নিজেই দিচ্ছে।সবশেষে সব প্রশ্নের একটায় উত্তর পেলো।। “আবির ভাই চান আমি ভালোভাবে পড়াশোনা করি তারমানে এতেই আবির ভাই খুশি হবেন। আজ থেকে আমি সিরিয়াসলি পড়াশোনা করবো। তারপর দেখবো আবির ভাই আমার সাথে ভালো ভাবে কথা বলে কি না। ” কিছুক্ষণ শুয়ে থেকে সব ভেবে সহসা উঠে পড়তে বসলো। মেঘ

সবসময় জোরে পড়ে। মেঘ পড়লে করিডোর থেকে তো শুনা যায় ই পাশাপাশি তানভির বা আবিরের রুম থেকেও মোটামুটি শুনা যায় ।গোসল,নামাজ, কোচিং, টিউশন সবকিছু সময়মতো করছে মেঘ যেনো আবির ভাই আর রা*গ দেখাতে না পারে। কি সব ধ্বং*সের কথা বললো এসব কথা কঠিন কথা যেনো আর না শুনতে হয়। আবির ভাই যেনো সর্বদা কোমল, ভালোবাসা মিশ্রিত কণ্ঠে "হুমমমম" বলে। আর কিছুই বলতে হবে না। এদিকে মনোনয়নের ফলাফল ঘোষণা করা হয়েছে। তানভির দের এমপি দলীয় প্রতীকে মনোনীত হয়েছেন। পার্টি অফিস থেকে শুরু করে এমপির বাড়ি পর্যন্ত হৈচৈ শুরু হয়েছে। নি*ষেধা*জ্ঞা অমান্য করে সব গণহারে মিছিল দিচ্ছে। প্রথমবারের মতো মনোনীত হয়েছেন এমপি। তানভির সহ, সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, সাধারণ সদস্যরা মিষ্টি খাওয়াচ্ছেন সবাইকে। এক পর্যায়ে এমপির বাড়িতে গেলো তানভির সহ আরও দুজন -চারজন।।। এমপির মেয়ে হাসিমুখে তানভিরের সামনে এসে দাঁড়ালো। বাবা মনোনয়ন পেয়েছে এতে মেয়ের খুশির সীমা নেই। কিন্তু তানভির মেয়েকে দেখে কিছুটা ঘাবড়ে গেছে। আবির ভাইয়া গতরাতে বুঝিয়ে গেলো তারপর ও যদি মেয়ে পা*গলামিই করে আর সেটা এমপির নজরে পরলে তানভির শেষ। তানভির কিছুটা ভীতু গলায় বললো, "কিছু বলবেন?" এমপির মেয়ে হাসিমুখে উত্তর দিলো, "হ্যাঁ ভাইয়া। " তানভির কপাল কুঁচকে বললো, "কি?" এমপির মেয়ে হাসি থামিয়ে কিছুটা গম্ভীর কণ্ঠে বললো, "I am Sorry Vaiya.. আমি আপনাকে

এই কিছুদিন অনেক জ্বালিয়েছি। আপনি এতবার বলেছেন আবির ভাইয়ের গার্লফ্রেন্ড আছে কিন্তু আমি বিশ্বাস করি নি। গতকাল আবির ভাইয়াও বলে গেছেন ওনার জীবনে অন্য কেউ আছে। এজন্য আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি আর কোনোদিন ওনার কথা জিজ্ঞেস করবো না আপনাকে। আপনাকেও আর বিরক্ত করবো না কখনো। আপনি অনেক ভালো। আমি চাই আপনি আব্বুর জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করুন, যাতে আব্বু এমপি হতে পারেন। " তানভিরের চোখ ছানাবড়া হয়ে গেলো।মনে মনে বলছে, "বাহ! ভাইয়া, তোমার ২ মিনিটের কথায় আমার ১৫ দিনের সমস্যা সমাধান করে দিলে। You are great bro" হাসিমুখে বললো, "তুমি যে বুঝতে পারছো এতেই খুশি। " এইটুকু বলে মেয়ের থেকে বিদায় নিয়ে এমপির সাথে দেখা করতে চলে গেলো। বর্ষাকাল শুরু হয়ে গেছে কিন্তু এখনও বৃষ্টি শুরু হয় নি। আজ বিকেল থেকেই আকাশে মেঘের গর্জন। মেঘ কোচিং শেষে বাসায় এসেছে। মেঘের গর্জনের শব্দে পড়তে বসতে ইচ্ছে করছে না তাই বেলকনিতে দাঁড়িয়ে আছে। গোধূলি বেলায় টিপটিপ বৃষ্টি পড়া শুরু হয়েছে। মেঘ বেলকনিতে দাঁড়িয়ে রাস্তায় মানুষের ছুটোছুটি দেখছে।। সবাই ছুটছে নিজস্ব গন্তব্যে। মেঘ বেলকনি থেকে হাত বাড়িয়ে বৃষ্টি ছোঁয়ার চেষ্টা করছে। বৃষ্টির ফোঁটার স্পর্শে মেঘের সমস্ত অনুভূতিরা যেনো অবশ হয়ে যাচ্ছে, হাত বৃষ্টিতে রেখেই কল্পনার জগতে বিচরণ করছে মেঘ। বৃষ্টি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টির ছিটে ফোটা মেঘের চোখে মুখে পরতেই হুঁশ ফিরলো অষ্টাদশীর। বেলকনি থেকে রুমে চলে

গেলো। টাওয়েল দিয়ে হাত মুখ মুছে বিছানায় বসলো। মোবাইলের ডাটা অন করতেই একটা নোটিফিকেশন আসছে। ফেসবুকে ঢুকতেই সামনে আসলো আবির ভাইয়ের পোস্ট। অফিসের বেলকনি থেকে তুলা হাতের ছবি। ফোঁটায় ফোঁটায় বৃষ্টির পানি জমে আছে হাতে।সাথে বৃষ্টি নিয়ে সুন্দর একটা ক্যাপশন ও দিয়েছেন। মেঘ মনোযোগ দিয়ে ছবিটা দেখছে। অনুভূতিরা যেনো নাড়াচাড়া দিয়ে উঠেছে মনের ভিতর। "আবির ভাইও বৃষ্টিতে হাত ভিজিয়েছে। তারমানে আবির ভাইয়েরও বৃষ্টি ভালোলাগে। ভাবতেই লাজুক হাসলো মেঘ। নিজের ভালোলাগা গুলো যদি ভালোবাসার মানুষের সাথে মিলে যায় তাহলে আর কি লাগে!" সন্ধ্যার পর ঘন্টাদুয়েক পড়াশোনা করলো মেঘ বৃষ্টি বেশি থাকার কারণে জান্নাত আপু আসবেন না বলেছেন। বাড়ির কর্তারা বাড়ি ফিরে এসেছেন সেই বৃষ্টি শুরুর দিকে। গাড়িতে চলাচল করায় বৃষ্টি ছুঁতেই পারেন নি ওনাদের। তানভির ও হৈহল্লা করে বাড়ি ফিরেছে ঘন্টাখানেক আগে। আকলিমা খান ডাকছেন সবাইকে খাবার খাওয়ার জন্য। মেঘ নেমেই একবার দেখলো ডাইনিং টেবিলের দিকে, আবির ভাই এখনও ফিরেন নি বাকি সবাই আছেন। মেঘ পা বাড়ালো টেবিলের দিকে তখনই কাকভেজা হয়ে ফিরেছে আবির। মাথা থেকে পা পর্যন্ত ভিজে একাকার অবস্থা। মেঘ চেয়ারের হাতল ধরে দাঁড়িয়ে পরলো, আবিরের এই অবস্থা দেখে মোজাম্মেল খান বলে উঠলেন, "কিরে, এই বৃষ্টির মধ্যে আসতে গেলি কেন,। বৃষ্টি কমলে আসতে পারতি " আবির চুল ঝাড়তে ঝাড়তে উত্তর দিলো, "অফিসে বসে

থাকতে ইচ্ছে করছিলো না। ” সিঁড়ির দিকে যাচ্ছে। মালিহা খান ডেকে বললেন, “তুই কি এখন খাবি, নাকি পরে খাবি বাবা?” আবির সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে উত্তর দিলো, “৫ মিনিটে আসছি আমি! ” ৫ মিনিটের মধ্যে ফ্রেশ হয়ে একটা হালকা গোলাপি রঙের, শর্ট হাতার ট্রিশার্ট সাথে কালো ট্রাউজার পরে নিচে নামলো। ততক্ষণে মোজাম্মেল খান, আলী আহমদ খান চলে গেছেন। তানভিরের খাওয়াও শেষের দিকে। আবির চেয়ার টেনে বসতে নিলে মেঘের নজর পরে আবির ভাইয়ের দিকে। এই প্রথম বার আবির ভাই শর্ট হাতার ট্রিশার্ট পড়েছে। তাও আবার সাদা, কালো রঙ বাদে। মেঘ শব্দহীন হেসে উঠলো, দৃষ্টি তার আবির ভাইতে নিবদ্ধ । আবির বসে বললো, “Congratulation Tanvir, Go ahead. Best of luck. ” মেঘের দৃষ্টি এবার তানভির ভাইয়ার দিকে যায়। তানভির ভাইয়া খুশিতে গদগদ হয়ে উত্তর দিলো, “Thank you so much Vaiya.” আবির এবার কিছুটা চিন্তিত স্বরে বললো, “ঐ বিষয়টা কি সমাধান হয়ছে?” এবারও তানভির হাসিমুখে জবাব দিলো, “জ্বী ভাইয়া। আমার কাছেও মাফ চেয়েছে। ” মেঘ মনোযোগ দিয়ে দুই ভাইয়ের কথোপকথন শুনছিলো, সহসা উত্তেজিত কন্ঠে বলে উঠলো, “কি হয়েছে?” আবির মেঘের দিকে তাকিয়ে উত্তর দিলো, “তানভিরদের নেতা দলীয় মনোনয়ন পেয়েছে!” মেঘও এবার খুশিমনে ভাইকে অভিনন্দন জানায়,সাথে মীম আর আদিও অভিনন্দন জানায়। মীম মজার ছলেই বলে উঠলো, “ভাইয়া আমাদের ট্রিট দিবা না?” তানভির বললো, “কি

ট্রিট চাস বল!” মেঘ তৎক্ষনাৎ উত্তর দিলো, “এখন ট্রিট লাগবে না, জিতলে পরে বড় করে ট্রিট খাবো। ” তানভির বললো, “ঠিক আছে, আজকে তাহলে আমার পক্ষ থেকে তোদের নুডলস ট্রিট দিব রাত ১০ টায়। ” মীম বলে উঠলো, “তুমি রান্না করবা ভাইয়া? ” তানভির দাঁত বের করে হাসলো, আর বললো, “হ্যাঁ, আমিই রান্না করবো সাথে ভাইয়া থাকবে!” আবির অকস্মাৎ কপাল কুঁচকে, ঠাট্টার স্বরে জবাব দিলো, “ইসসস, তুই ট্রিট দিবি আমি কেন হেল্প করবো? আনন্দ যেমন তুই করে আসছিস, এখন কষ্ট টাও তোকেই করতে হবে। ” তানভির ভ্রু গুটিয়ে এক পলক তাকালো ভাইয়ার দিকে, তারপর বললো, “ঠিক আছে, ঠিক আছে।। আমিই করবো। তোমাদের আমার রুমে দাওয়াত রাত ১০ টায়। ” মেঘ,মীম আর আদি একসাথে বলে উঠে, “ইয়াহু” তানভির আঁতকে উঠে বলে, ‘এই থাম থাম, চুপ কর তোরা । বড় আব্বু আর আব্বু শুনলে সব আনন্দ মাটি চা*পা দিয়ে দিবে। ” তিনজনই থেমে গেলো। তানভির খাওয়া শেষ করে উঠে গেলো। মেঘ খাচ্ছে সাথে আবির ভাইকেও একটু পর পর দেখছে। কয়েকবার দেখার পর হঠাৎ আবির চোখ তুলে তাকাতেই চোখাচোখি হলো দুজনের । মেঘ তখনও শান্ত চোখে তাকিয়ে আছে। মেঘের চাউনি দেখে আবির কপাল কুঁচকালো কিন্তু মেঘের সে দিকে নজর নেই। মীম আর আদি খাচ্ছে তাই আবির কোনো কথা না বলে টানা ২-৩ ভ্রু নাচালো, এতক্ষণে মেঘের আবেশ কাটে। লাজুক হেসে মাথা নিচু করে ফেলে। মেঘ মাথা নিচু করেই খাবার শেষ করলো। রুমে গিয়ে

আবারও পড়তে বসলো মেঘ। আবির খাওয়া শেষ করে কিছুক্ষণ মা, মামনি আর কাকিয়ার সাথে গল্প করলো। এত রাতে বাড়ি ফেরায় তাদের সাথে ঠিকমতো কথায় হয় না ছেলেটার। গল্প শেষে নিজের রুমে যাওয়ার পথে কানে ভেসে আসে মেঘের পড়ার শব্দ । মুচকি হেসে রুমে চলে গেলো। রাত ১০ টার পর তানভিরের রুমে সামনে হাজির হলো মেঘ।বিছানার উপর বসে আছে মীম আর আদি। তানভির খাবার পরিবেশন করছে। মেঘ ঢুকতে নিলেই তানভির বলে উঠে, "বনু বসার আগে ভাইয়াকে একটু ডেকে আসবি প্লিজ! আর হ্যাঁ জোরে ডাকিস না।। আব্বুর কানে গেলে খবর আছে আমার!" মেঘ মলিন হাসলো। মনের ভেতর ধুকপুক শুরু হয়ে যাচ্ছে মেঘের। গুটিগুটি পায়ে এগিয়ে গেলো আবির ভাইয়ের রুমের দিকে। দরজা খুলায় ছিল। মেঘ দরজা থেকে উঁকি দিলো ভিতরে। কিন্তু রুমে কেউ নেই। ধীর পায়ে ভিতরে ঢুকে বেলকনির দিকে পা বাড়ালো মেঘ। আবির ভাই গ্রিলে হাত রেখে তাকিয়ে আছে আকাশের পানে। বৃষ্টি কম তবে আকাশে মেঘের গর্জন হচ্ছে আর কিছুক্ষণ পর পর বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে । মেঘের খুব ইচ্ছে করছে আবির ভাইয়ের পাশে দাঁড়িয়ে বৃষ্টি উপভোগ করবে। তাই চুপচাপ আবির ভাইয়ের পাশে দাঁড়িয়ে পরেছে। একটু পর পর বিদ্যুৎ চমকানো দেখে আঁতকে উঠছে মেঘ। দিনের বেলা বৃষ্টি তার যতই পছন্দ হোক না কেনো, রাতের বেলা বৃষ্টি হলে মেঘ কখনো বেলকনিতে বের হয় না।। শব্দের মাত্রা তীব্র হলে কানে আঙুল দিয়ে ঘুমায়। আজ সাহস করে রাত ১০ টায় আবির ভাইয়ের পাশে তো

দাঁড়িয়েছে কিন্তু বিদ্যুৎ চমকানো দেখে বার বার বুক কাঁপছে অষ্টাদশীর, আবির তখনও দুর্বোধ্য দৃষ্টিতে চেয়ে আছে অসীম দূরত্বে। সহসা বলে উঠলো, "মনে জোর নেই তাহলে এখানে দাঁড়িয়ে আছিস কেনো?" মেঘ আবির ভাইয়ের দিকে তাকালো কিন্তু আবির ভাইয়ের অভিব্যক্তি বুঝা গেলো না। তাকিয়ে আছে আকাশের পানে। মেঘ ভাবছে, "আবির ভাইয়ের কি সব দিকে চোখ আছে? " মেঘ আস্তে আস্তে বললো, "ভাইয়া ডাকতে বলছে আপনাকে। " আবির স্বাভাবিক কণ্ঠে বললো, "তুই যা, আমি আসছি!" মেঘ রুমে ঢুকতে নিতেই ঠা*টার শব্দ হয় সাথে বিদ্যুৎ চলে যাওয়ায় চিৎকার দিয়ে উঠলো। আবির দু কদম এগিয়ে সহসা মেঘের হাত ঝাপ্টে ধরে বলে, "কি হয়ছে? ভয় পাইছিস?" আবির পুনরায় বললো, "তুই ভিতরে ঢুক আমি আছি, ভয় পাইস না।" মেঘ দু'হাতে আঁকড়ে ধরলো আবির ভাইয়ের হাত, গুটি গুটি পায়ে ভেতরে ঢুকলো। আবির একহাতে বিছানার উপর থেকে ফোন টা নিয়ে ফ্ল্যাশ জ্বালালো। মেঘ তখনও শক্ত করে ধরে আছে আবির ভাইয়ের হাত। ফোনের আলোতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে মেঘের ভ*য়ার্ত মুখমন্ডল, কপাল কুঁচকে চোখ বন্ধ করে রেখেছে। আবির কোমল কণ্ঠে বললো, "কিছু হয় নি! তাকা" মেঘ আস্তে আস্তে চোখ পিটপিট করে তাকালো। চোখ পরলো আবির ভাইয়ের হাতের দিকে। দুহাতে খামছে ধরে আছে আবির ভাইয়ের হাত। তৎক্ষনাৎ ছেড়ে দিলো হাত। ততক্ষণে বিদ্যুৎ চলে এসেছে। মেঘ আর আবির ভাইয়ের দিকে তাকালো না ছুটে চলে গেলো রুম থেকে। ধীরপায়ে

ঢুকলো তানভির ভাইয়ার রুমে। বিছানার এককোনায় বসে পড়লো মাথা নিচু করে। ১ মিনিটের মধ্যে আবির ও রুমে ঢুকলো। তানভির সবাইকে খাবার দিতে ব্যস্ত হলো- নুডলস, চা,বিস্কুট, সাথে মুড়ি মাখিয়েছে। আবির তানভিরের দিকে তাকিয়ে ঠাট্টার স্বরে বললো, "বাহ! এত আয়োজন? সাবাশ!" তানভির হাসিমুখে বললো, "খেতে ভালো না হলে কেউ অভিযোগ করবা না!" সবাই খাওয়া শুরু করলো। মেঘের গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। কোনো ভাবেই খেতে পারছে না। কোনোরকমে চোখ তুলে তাকালো আবির ভাইয়ের হাতের দিকে, দেখার চেষ্টা করলো, খামছি টা কতটা লেগেছে। আবির ভাই হাত ঘুরাতেই চোখে পরলো সেই দাগ। তিন আঙুলের নখের চাপে চামড়া কেটে রক্ত জমাট বেঁধে গেছে। মেঘ আবির ভাইয়ের হাতের অবস্থা দেখে ভ্রু কুঁচকালো। টলমল করছে চোখ, নিজের প্রতি খুব রা*গ হচ্ছে, বার বার দীর্ঘশ্বাস ফেলছে। আদি আবির ভাইয়ের হাত দেখে চিৎকার দিয়ে উঠলো, "ভাইয়া তোমার হাতে কি হয়েছে?" সবার নজর পরলো আবিরের হাতের দিকে। আবির একপলক দেখলো মেঘকে, তারপর স্বাভাবিক কণ্ঠে বললো, "কিছু হয় নি! কোথায় লেগে কেটে গেছে!"তানভিরের রুম থেকে খেয়ে আবির চলে গেছে নিজের রুমে। ১ মিনিটের মধ্যে মেঘও বের হয়ে গেছে, কোনো দিক না তাকিয়ে চলে গেলো আবির ভাইয়ের রুমে। দরজার বাহির থেকে ধীর কণ্ঠে ডাকলো, "আবির ভাই.." কোনো সারা নেই। দ্বিতীয় বার আর একটু জোরে ডাকলো, "আবির ভাই.." আবির বললো, "ভেতর আয়" আবির

আধশোয়া অবস্থায় ফোনে কি যেনো করছে। ফ্যানের বাতাসে আবিরের চুলগুলো এলোমেলো উড়ছে। মেঘ আবির ভাইয়ের পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে চুপচাপ চেয়ে আছে আবির ভাইয়ের হাতের পানে। আবির অকস্মাৎ বলে উঠলো, "কিছু বলবি?" মেঘ কণ্ঠ খাদে নামিয়ে কাঁপা কাঁপা গলায় বললো, "Sorry আবির ভাই, এতটা লেগে যাবে বুঝতে পারি নি। " আবির স্বাভাবিক কণ্ঠেই উত্তর দিলো, "আমি কি কিছু বলেছি তোকে?" মেঘ পুনরায় বলে উঠলো, "বেশি ব্যথা লাগছে? মলম লাগিয়েছেন?" আবির গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর দিলো, "না! কিছু লাগাতে হবে না।" মেঘ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে, শক্ত কণ্ঠে বলে উঠলো, "লাগাতে হবে !" মেঘের শক্ত কণ্ঠের কথা শুনে আবির মোবাইল থেকে চোখ সরিয়ে অষ্টাদশীর পানে তাকালো। মেঘের চোখে মুখে অধিকারবোধ স্পষ্ট প্রতীয়মান হচ্ছে। আবির নিরুদ্বেগ কণ্ঠে বললো, "তাহলে তুই ই লাগিয়ে দে!" এতক্ষণ শক্ত থাকলেও এই কথা শুনার পর মেঘ আর শক্ত থাকতে পারলো না। বুকের ভেতর অনুভূতিরা ঢোল বাজিয়ে নৃত্য করছে। হাতপায়ের কম্পন তীব্র হতে শুরু করেছে। আবির ভাইকে মলম লাগিয়ে দিবে এটা ভাবতেই বার বার শিউরে উঠছে অষ্টাদশী। আবির পুনরায় শক্ত কণ্ঠে বললো, "হয় নিজে লাগিয়ে দিয়ে যা, না হয় চুপচাপ ঘুমাতে যাহ! আমি লাগাতে পারবো না। " আশপাশে তাকাচ্ছে মেঘ। চোখ পরলো ড্রেসিং টেবিলের উপর রাখা মলমের দিকে।মলম টা হাতে নিয়ে আবির ভাইয়ের কাছাকাছি বসলো। হৃদপিণ্ড ছুটছে এদিক সেদিক। আঙুল কাঁপছে অষ্টাদশীর। শীতল হস্তে, আলতোভাবে

মলম ছুঁয়ালো আবির ভাইয়ের হাতের সেই কাটা অংশে। হালকা কাঁ*পলো আবিরের হাত।মেঘ পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে মলম লাগিয়ে দিচ্ছে। আবির ভ্রু গুটিয়ে, শান্ত কণ্ঠে বললো, "ভাবিস না তোকে দিয়ে খাটাচ্ছি আমি! যে ভুল করবে, শাস্তি তো তাকেই পেতে হবে!" মেঘ মনে মনে ভাবছে, "এরকম হাজারটা শা*স্তি পেতেও আমি রাজি!" আবির অভিভূতের ন্যায় নিষ্পলক চেয়ে আছে মেঘের দিকে । আবির ভাইয়ের দৃষ্টি বুঝতে পেরে মেঘ চিবুক নামালো, কোনোদিকে না তাকিয়ে কোনোরকমে মলম লাগিয়ে, চুপচাপ রুম থেকে বের হয়ে যাচ্ছে। যেনো আর কিছুক্ষণ আবির ভাইয়ের কাছাকাছি থাকলে, নিজেকে বাঁ*চাতে পারবে না। আবির একবার হাতের দিকে দেখলো তারপর অষ্টাদশীর যাওয়ার পানে তাকিয়ে মৃদু হাসলো। সকাল বিকাল মেঘের নজর শুধু আবির ভাইয়ের হাতের দিকে। কেটে গেলো কয়েকদিন। খান বাড়ির প্রতিটা মানুষ ব্যস্ত নিজের কাজে। ইকবাল খান সিলেট থেকে রাতে ফিরেছেন। সেই খুশিতে সবাই জড়ো হয়েছে ড্রয়িং রুমে সাথে বাহারি খাবারের মেলা। সবাই আড্ডা আর খওয়ায় ব্যস্ত থাকলেও বরাবরের মতোই আবির ব্যস্ত ছিল নিজের কাজে। সামনের মাসের ১ তারিখ নিজের অফিস শুরু হবে, তাই সবকিছু গুছাতে হচ্ছে । সাথে আবিরের বেস্ট ফ্রেন্ড রাকিব আর রাসেল তো আছেই। রাকিব আর আবির প্রাইমারি স্কুল থেকে বেস্ট ফ্রেন্ড তারপর তাদের জীবনে আসে রাসেল। বর্তমানে তারা ৩ জনের জীবন এক সুতোয় বাঁধা। তাই কোম্পানিও শুরু করছে একসাথে। এছাড়াও আরও

২ বন্ধু আছে আবিরের, মোবারক এবং লিমন। এই ৫ জন প্রতি শুক্রবার একসাথে আড্ডা দেয় মাঝে মাঝে তানভিরও যুক্ত হয় তাদের সাথে। তবে সব বন্ধুর মধ্যেও একজন স্পেশাল ফ্রেন্ড থাকে যে সবকিছু জানে, সেটা হলো রাকিব। সবার মাঝে আবির নেই বলে ইকবাল খান কয়েকবার আবিরকে কল দিচ্ছেন কিন্তু আবির কল রিসিভ করছে না। কিছুক্ষণের মধ্যেই বাসায় ঢুকলো আবির। পকেট থেকে ফোন বের করতে করতে বললো, "সরি,কাকামনি! বাইকে ছিলাম তাই রিসিভ করতে পারি নি।" ইকবাল খান একগাল হেসে বললেন, "সমস্যা নাই, আয় বোস এসে। " আবির ভাই আসতেই মেঘ সোফা থেকে উঠে জায়গা দেয় আবির ভাইকে। আবির এসে মেঘের জায়গায় বসে স্বাভাবিক কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে, "কেমন আছো কাকামনি? কাজ ঠিকঠাক হয়েছে?" ইকবাল খান হাসিমুখে উত্তর দিলেন, "আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। সব ঠিকঠাক করে আসছি। আশা করি ২ মাসের মধ্যে আর সিলেটের পা দিতে হবে না।" ইকবাল খান পুনরায় মজার ছলেই বললেন, "তোর কোম্পানি কবে ওপেন করবি? আমাদেরকে দাওয়াত দিবি না?" আবির মলিন হেসে উত্তর দিলো, "ইনশাআল্লাহ আগামী মাসের ১ তারিখ! তোমাদের সবার জন্য কার্ড রেডি করছি খুব শীঘ্রই পেয়ে যাবে!" ইকবাল খান অবাক চোখে তাকিয়ে বললেন, "কার্ড? এত VIP আমি?" আবির এবার স্ব শব্দে হেসো উত্তর দিলো, "কার্ড স্পেশালি আব্বু আর চাচ্চুর জন্য , তুমি একা মিস যাবে কেনো তাই তোমাকেও দিবো!" তারপর তারা দুজন

ব্যস্ত হলো অফিসের আলোচনায়। এদিকে মেঘ বিমোহিত নয়নে আবির ভাইকে দেখছে আর ভাবছে, “একটা মানুষ এত সুন্দর করে কিভাবে কথা বলে?” আলী আহমদ খান ও মোজাম্মেল খান হাজির হলো এই আড্ডায় । তাই মেঘ নিজের রুমে গিয়ে পড়তে বসেছে। শুক্রবার মানেই খান বাড়িতে হৈচৈ শুরু হয়ে যায়। প্রতি শুক্রবারের মতো আজও বাড়িতে বেশ পদের রান্না করা হচ্ছে। মেঘ ঘুম থেকে উঠে নামাজ পড়ে ঘন্টা দুয়েক পড়াশোনা করেছে। নিচে নেমে মীম আর আদির সাথে আড্ডাও দিতে দিতে নাস্তাও করে এসেছে। কিন্তু আবির আর তানভিরের খবর নেই। তানভিরদের এমপি মনোনয়ন পাওয়ার পর থেকে তানভিরের ব্যস্ততা বেড়ে গেছে তিনগুন। তানভির ছোট থেকেই ভালো ছবি তুলতে পারে। রাজনীতি যেমন তার পছন্দ তেমনি ছবি তুলাও তার পছন্দের একটা কাজ। এমপি যেই না শুনেছে তানভির ভালো ছবি তুলতে পারে সেই থেকে দায়িত্ব দিয়ে দিয়েছে তানভিরের উপর। মনোনয়ন পাওয়ার পর একটা নির্দিষ্ট তারিখ পর্যন্ত এমপি কোনে জনসমাবেশ করতে পারবে না। তাই এমপির পক্ষ থেকে সভাপতি, সহ সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, যুগ্ম সম্পাদক থেকে শুরু করে প্রত্যেকে মিলে নির্দিষ্ট জায়গায় জনসমাবেশের আয়োজন করে এবং এমপি বাড়ি থেকে ভিডিপ কনফারেন্সের মাধ্যমে তাদের সঙ্গে কথা বলেন। এই টোটাল দায়িত্ব পরে গেছে তানভিরের উপর। সারাদিন শেষে বাকিদের থেকে ছবি সংগ্রহ। ইডিটিং। ভিডিও ক্রিয়েট সকল দায়িত্ব তানভিরের। সব কাজ শেষ করে ফিরতে ফিরতে রাত

১২-১ টা বেজে যায়। মাঝে মাঝে সময় পেলে একটু আগে চলে আসে। পুরোটায় এখন এমপির মতামতের উপর নির্ভর । ইদানীং আবির ৮-৯ টার মধ্যে বাড়িতে ফিরে আসে, সময় সুযোগ মিললে তানভির বাসায় এসে খেয়ে আবিরের বাইক নিয়ে আবার বের হয়। রাত করে ফেরার কারণ সকালে উঠতে একটু দেরি হয়ে যায়। আজ যেহেতু শুক্রবার তাই রিলাক্সে ঘুমাচ্ছে দুই ভাই। কিন্তু এদিকে মেঘ ছটফট করছে। ১০ টার উপরে বেজে গেছে এখনও আবির ভাই কেনো উঠছে না তা ভেবেই কুল কিনারা পাচ্ছে না। আবির যে বৃহস্পতিবার রাতে ঘুমায় না তা তো অষ্টাদশী জানেই না।
বৃহস্পতিবার রাত শুধু আবিরের শোকের রাত। ভোরবেলা নামাজ পরে ঘুমায়, উঠে ১২ টার দিকে। তারপর গোসল করে নামাজে যায়। অষ্টাদশীর কোমল মনকে কোনোভাবেই মানাতে পারছে না। তাই এতকিছু না ভেবে ছুটে গেলো আবির ভাইকে ডাকতে। শান্ত হস্তে দরজা ধাক্কা দিলো, সহসা খুলে গেলো দরজা। জানালার পর্দা টানা, রুমে আলোর পরিমাণ সীমিত, ফ্যানের বাতাসে পর্দা উড়ছে এদিক সেদিক। মেঘ প্রথমেই বিছানার দিকে তাকায়। বার বার পর্দা সরে যাওয়ায় বাহির থেকে আসা সূর্যের আলো চোখে মুখে পরছে আবিরের। মেঘ আপাদমস্তক দেখলো। আবির গভীর ঘুমে মগ্ন, উন্মুক্ত শরীর, পেট পর্যন্ত পাতলা কাঁথা দিয়ে ঢাকা। চোখ সরালো মেঘ, দৃষ্টি পরলো আবির ভাইয়ের তামাটে চেহারায়। কি অপরূপ সেই মুখমণ্ডল! সবাই ফর্সা ছেলেদের পিছনে ছুটে আর মেঘ যেনো এই তা*মাটে

চেহারা,গুরু-গম্ভীর, অনুভূতিহীন, হি*ট লার স্বভাবের লোকটার প্রতি মাত্রাতিরিক্ত দূর্বল হয়ে যাচ্ছে। মেঘের হৃদপিণ্ডের পিটপিট শব্দ যেন জানান দিচ্ছে, "সামনে আগালে তোর মৃ*ত্যু নিশ্চিত! " তবুও মেঘ পা টিপে টিপে আগাচ্ছে আবির ভাইয়ের কাছে যেনো নুপুরের শব্দ না হয়। আবির ভাইয়ের কাছাকাছি গিয়ে থামে। আবির অবসন্ন চেহারাটা গভীর মনোযোগ দিয়ে দেখছে মেঘ। ঘুমন্ত অবস্থাতেও আবির ভাইয়ের সৌন্দর্য যেনো একটুখানিও কমে নি বরং তা বেড়ে গেছে বহুগুণ । গাল ভর্তি ছাপ দাঁড়ি, সামনের দিকের লম্বা চুলগুলো ফ্যানের বাতাসে বারবার কপালে এসে পরছে। মেঘের মনে হচ্ছে, "আবির ভাইয়ের থেকে সুদর্শন পুরুষ দ্বিতীয়টি নেই। " মেঘের হৃদপিণ্ড ছুটছে দ্বিকবিদিক । নিশ্বাসের শব্দ জোড়ালো হলো।ফ্যানের নিচে দাঁড়িয়েও ঘামতে শুরু করেছে মেঘ। ভাবছে চলে যাবে, কিন্তু এই শোভিত পুরুষকে রেখে যেতে পারছে না। মেঘের ইচ্ছে করছে সারাজীবন এভাবেই আবির ভাইকে দেখতে। মেঘ দাঁড়িয়ে থাকার শক্তি পাচ্ছে না। তাই আবির ভাইয়ের পাশে বিছানাতেই বসে পরেছে। আবির তখনও ঘুমের দেশে নিমজ্জিত। অষ্টাদশী অভিনিবিষ্টের ন্যায় চেয়ে আছে। সব বাঁধা পেরিয়ে, দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে মেঘ আস্তে করে ডাকলো, "আবির ভাই" ঘুমন্ত আবিরের থেকে কোনো উত্তর আসে নি। মেঘের খুব ইচ্ছে করছে আবির ভাইকে ছুঁয়ে দিতে। মেঘ আরেকটু এগিয়ে আবিরের কাছাকাছি বসলো। কাঁপা কাঁপা হাত ছুঁয়ালো আবির ভাইয়ের গাল ভর্তি ছোট ছোট দাঁড়িতে। সঙ্গে সঙ্গে শিউরে উঠলো সমস্ত শরীর।

বোধশক্তি হওয়ার পর জীবনে প্রথমবার মেঘ নিজের ইচ্ছেতে কোনো পুরুষকে ছুঁয়েছে , যেই ছোঁয়ায় মিশে আছে ভালোবাসা, অন্যরকম অনুভূতি জাগিয়ে দিচ্ছে অষ্টাদশীর হৃদয়ে। সহসা আবির ডান হাতে চেপে ধরলো নিজের গালে রাখা অষ্টাদশীর হাত।মেঘের হাত কাঁপছে, দুনিয়া ঘুরছে, বক্ষে উথাল- পাতাল ঢেউ। বরফের ন্যায় জমে যাচ্ছে সম্পূর্ণ শরীর। আবির ঘুমের মধ্যেই মেঘের আঙুলের ভাঁজে আঙুল ডোবায়। গাল থেকে তুলে নিজের হাতের মুঠোয় নেয়। আবিরের হাতের মধ্যে মেঘের আঙুলগুলো কাঁপছে দেখে আবির আর একটু শক্ত করে চেপে ধরলো। মেঘের ভয়ে ভয়ে তাকিয়েছে আবির ভাইয়ের মুখের দিকে। আবির তখনও চোখ বন্ধ করেই শুয়ে আছে, অকস্মাৎ আবির আধোঘুমন্ত কণ্ঠে বলে উঠলো, “আমি ছুঁয়ে দিলে সামলাতে পারবি তো মেঘ?” মেঘ দুর্বোধ্য দৃষ্টিতে চেয়ে আছে আবির ভাইয়ের মুখবিবরে আর ভাবছে, “এখনও আধোঘুমে আছে মানুষটা, কিভাবে বুঝলো আমি এটা?” আবির একহাতে কাঁথাটা পেট থেকে টেনে বুকে তুললো। আরেকহাতে তখনও মেঘের হাত চেপে ধরে আছে। আবির পুনরায় কণ্ঠ ভারী করে বললো, “এভাবে হুটহাট আমার রুমে আসবি না, যা তা হয়ে যাবে তখন আমায় কিছু বলতে পারবি না!” সঙ্গে সঙ্গে শক্ত করে ঝাপটে ধরা হাতটাও ছেড়ে দেয়। “মেঘ নির্বোধের মতো চেয়ে আছে আবির ভাইয়ের দিকে। আবির ভাইয়ের কথাটা বুঝার চেষ্টা করছে কিন্তু মোটা মাথায় কিছুই ঢুকছে না। রুমে আসলে কি এমন হবে?” আবির পুনরায় বললো, “এভাবে চেয়ে থাকিস না, আমার

শরম করে” মেঘ সহসা চোখ গোল গোল করে তাকায়, কিন্তু আবির ভাইয়ের অভিব্যক্তি বুঝার ক্ষমতা তার এখনও হয় নি। মেঘ চুপচাপ রুম থেকে বের হয়ে গেছে। ঘন্টাখানেক পর আবির উঠে শাওয়ার নিয়ে কালো পাঞ্জাবি সাথে সাদা প্যান্ট পরে নামাজের উদ্দেশ্যে নামছে। ইকবাল খানও রেডি হয়ে বেরিয়েছেন রুম থেকে। ইকবাল খান আবিরকে দেখে ডাকলো, “কিরে নামাজে যাচ্ছিস?” আবির ঘাড় ঘুরিয়ে তাকিয়ে উত্তর দিলো, “হ্যাঁ, তুমি যাবে না?” “হ্যাঁ যাবে তো, আদি আসছে ওকে নিয়ে যাই। দাঁড়া একটু! ” ইকবাল খান বললেন। মেঘ সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে আবির ভাইকে দেখে ঠয় দাড়িয়ে পরে, সকালের ঘটনা মনে পরে যায় মেঘের। কালো পাঞ্জাবিতে মা*রাত্মক সুন্দর লাগছে আবির ভাইকে। নিজেকে নিজে সান্ত্বনা দিলো, “কিছু সুন্দর জিনিস দূর থেকে দেখায় শ্রেয়, কাছে গেলে জ্ব*লসে যাবি!” একপা একপা করে পিছন দিকে উঠছে। আবিরের দৃষ্টি পরে সিঁড়িতে থাকা অষ্টাদশীর দিকে। মেঘের কান্ডে আবির কপাল কুঁচকালো , তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে বুঝার চেষ্টা করলো।। আবির ভাইয়ের তাকানো দেখে মেঘ সহসা ছুটে রুমে চলে যায়। আবির, আদি আর ইকবাল খানও নামাজের জন্য চলে গেছেন। তানভিরও রেডি হয়ে দ্রুত বেরিয়ে যায়। এই সুযোগে মেঘ খেতে আসে। ৩ টায় মেঘের পরীক্ষা আছে টিউশনে। তাই রেডি হয়ে একেবারে বের হয়েছে রুম থেকে। পার্কিং এ গাড়ি আছে কিন্তু ড্রাইভার আংকেল নেই দেখে ফোন বের করলো কল দেয়ার জন্য। তখনি আবির আঙুলে চাবি ঘুরাতে ঘুরাতে বের

হলো। মেঘ ঘাড় ঘুরিয়ে তাকিয়ে আছে আবির ভাইয়ের দিকে। আবির বাইকের দিকে যেতে যেতে বললো, “আংকেল ছুটিতে আছে। কল দিয়ে লাভ নেই। ” মেঘ নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কি করবে বুঝতে পারছে না, রিক্সা দিয়ে চলে যাবে নাকি আবির ভাই নিয়ে যাবে কিছুই বুঝতে পারছে না। আবির বাইক টেনে মেঘের সামনে এসে থামলো, ছোট করে বললো, “উঠ” মেঘ লাজুক হেসে বাইকে উঠলো, আজ আর তাকে দ্বিতীয় বার বলতে হলো না, বাইকে বসেই আবির ভাইয়ের কাঁধে হাত রাখলো। বাইক থামলো টিউশনের সামনে মেঘ নেমেই ভেতরে ঢুকে গেলো, আসার পথে একটা কথাও বলে নি কেউ। কে ই বা বলবে, মেঘ তে সকালের ঘটনা নিয়েই এখনও আপসেট আর অন্যদিকে আবির তো স্ব ইচ্ছেতে কখনো কথায় বলে না। মেঘ ভিতরে ঢুকে বন্যর পাশে বসলো। দুই বান্ধবীর ২-১ টা কথা বলতে বলতে আবির ঢুকলো ভিতরে। স্যারকে সালাম দিতেই স্যার তাকালো আবিরের দিকে, কয়েক মুহুর্ত পর স্যার বলে উঠলেন, “তুই আবির না?” আবির হাসিমুখে উত্তর দিলো, “জ্বী। কেমন আছেন স্যার?” স্যার হাসিমুখে উত্তর দিলো, “আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। তোকে কতবছর পর দেখলাম। দেশে আসলি কবে?” “২০-২২ দিন হবে, বাসার সবাই কেমন আছে স্যার?” “আলহামদুলিল্লাহ সবাই ভালো আছে। মেঘ ই তো তোর বোন? ” “জ্বি স্যার, চাচাতো বোন!” আবির উত্তর দিলো। স্যার হাসিমুখে বললেন, “ও তো পড়াশোনায় খুব ভালো, মনোযোগী কিন্তু মাঝে মাঝে একটু ফাঁকি দেয়। তুই একটু নজর

রাখিস। ” “জ্বি স্যার, আমি আসি তাহলে । আসসালামু আলাইকুম স্যার।” মেঘ আর বন্যা এতক্ষণ অবাক চোখে তাকিয়ে আবির ভাই আর স্যারের কথোপকথন শুনছিলো। এক বান্ধবী আরেক বান্ধবীর দিকে তাকাচ্ছে বার বার। এরমধ্যে স্যার পরীক্ষা শুরু করে দিয়েছেন। ১ ঘন্টা পরীক্ষা দিয়ে বের হলো দুই বান্ধবী। আবির ভাই রাস্তার পাশে বাইকে বসে ফোন চাপতেছিলেন। মেঘকে দেখেই বাইক থেকে নেমে দাঁড়ালেন। মেঘ বন্যার থেকে বিদায় নিয়ে আবির ভাইয়ের কাছে এসে প্রশ্ন করলো, “আপনি যান নি?” আবির সবসময়ের মতো গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর দিলো, “না” আবির পুনরায় স্বাভাবিক কণ্ঠে বললো, “কিছু খাবি?” মেঘ মাথা দিয়ে হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়ালো। আবির বললো, “কি?” মেঘ ভয়ে ভয়ে বললো, “বক*বেন না তো?” আবির গুরুভার কণ্ঠে বললো, “কি খাবি বল” মেঘ কণ্ঠ খাদে নামিয়ে বললো, “ফুচকা” আবির সহসা বললো, “উঠ ” বাইক স্টার্ট দিলো থামালো এসে একটা ফুচকার দোকানের সামনে। মেঘ নেমে সাইডে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। আবির বাইক থেকে নেমে হেলমেট খুলতেই, দূর থেকে রাকিব দৌড়ে এসে ঝাপটে ধরে আবিরকে। আকস্মিক ঘটনায় কিছুটা নড়ে উঠে আবির। রাকিব ঠাট্টার স্বরে বললো, “কিরে বন্ধু, এই জীবনে তো তোকে ফুচকার দোকানে দেখি নি। তা হঠাৎ এখানে কেনো? সে আসবে নাকি?” আবির চোখে ইশারা দিতেই রাকিবের চোখ পরে মেঘের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে আবিরকে ছেড়ে কিছুটা দূরে গিয়ে দাঁড়ায় । রাকিব হাসিমুখে জিজ্ঞেস করে, “কেমন আছেন ভা... সরি আপু?”

মেঘ আবির ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে স্বাভাবিক কণ্ঠে উত্তর দিলো, “আলহামদুলিল্লাহ ভালো,আপনি কেমন আছেন?” “আলহামদুলিল্লাহ ভালো। আমি রাকিব। তোমার আবির ভাইয়ের ছোটবেলার বেস্ট ফ্রেন্ড। তুমি মেঘ তাই তো?” মেঘ উত্তর দিলো,” জ্বি” ” ফুচকা খেতে এসেছো?” প্রশ্ন করলো রাকিব ভাইয়া। মেঘ পুনরায় ছোট করে বললো, “জ্বি।” রাকিব এবার হাসিমুখে বললো, “আজ আমার পক্ষ থেকে তোমার জন্য ফুচকা ট্রিট। আনলিমিটেড ফুচকা খেতে পারো!” মেঘ কিছু বলার আগেই আবির রাগান্বিত কণ্ঠে বললো, “তোর ট্রিট দিতে হবে না। আনলিমিটেড ফুচকা খাওয়ানোর ক্ষ*মতা আমার আছে। ” রাকিব স্ব শব্দে হেসে বললো, “আরে বন্ধু রা*গ করছিস কেন, তুই তো খাওয়াবিই সারা....” এতটুকু বলতেই আবির রাকিবের মুখ চেপে ধরে। রা*গে ফুঁসতে ফুঁসতে বলে, “নিজের কাজে যা। আমার টা আমাকে বুঝে নিতে দে!” রাকিব কিছুটা আহত হলো। মেঘের থেকে বিদায় নিয়ে যাওয়ার সময় আবিরের দিকে তাকিয়ে বললো, “সন্ধ্যার পর চলে আসিস ” আবির সহসা বলে উঠলো, ‘ঠিক আছে”।আবির ২ টা চেয়ার এনে পরিষ্কার জায়গাতে রেখে নিজেই টিস্যু দিয়ে মুছে বললো, “বোস এখানে” আবির ৩ প্লেট ফুচকা অর্ডার দিয়ে এসেছে। মেঘের মন খুশিতে ভরে গেছে। আবির ভাইয়ের সাথে এতটা সময় সে আজই প্রথম কাটাচ্ছে। এই অনুভূতিহীন মানুষটা এককথায় ফুচকা খাওয়াতে রাজি হয়ে গেছে এটা ভেবেই মেঘ অজান্তে হেসে ফেললো, আবির পাশের চেয়ারে বসতে বসতে চোয়াল শক্ত

করে বললো, “বেকুবের মতো হাসছিস কেন?” আবিরের কথায় মেঘ কিছুটা ভ্যাবাচেকা খেলো। ভণিতা ছাড়াই জবাব দিলো, “এমনি” ততক্ষণে ফুচকা চলে এসেছে। তিন প্লেট ফুচকা দেখে মেঘ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে, “এত ফুচকা কি আমাদের? ” আবির উদ্বেলিত ভঙ্গিতে বলে, “শুধু তোর, এগুলো খাওয়ার পর মন চাইলে আরও নিতে পারিস। ” মেঘ আশ্চর্য নয়নে তাকিয়ে আছে, সহসা দুই অধরের মাঝে ফাঁকা হয়ে গেছে। মেঘের দিকে চেয়ে আবির কপাল গোঁটায়। বিরক্তি নিয়ে বললো, “মুখ টা বন্ধ করে খা। ” মেঘ প্রথম প্লেট হাতে নিয়ে চুপচাপ খাওয়া শুরু করলো। আবির বসে বসে ফোন চাপছে। মেঘ আগপাছ না ভেবে একপ্লেট ফুচকা কয়েক মুহুর্তে নির্বাণ করে ফেললো। দ্বিতীয় প্লেট হাতে নিয়ে আবির ভাইয়ের দিকে তাকালো তারপর সচেতন কণ্ঠে প্রশ্ন করলো, “আবির ভাই, আপনি খাবেন না ফুচকা?” আবির গুরুভার কণ্ঠে বললো, “আমি এসব খাই না” মেঘ কোমল কণ্ঠে বললো, “আজ একটু খেয়ে ফেলুন , অনেক সুস্বাদু! ” আবির ফোনের থেকে দৃষ্টি সরিয়ে মেঘের দিকে ক্ষুদ্র চোখে তাকালো,দাঁত খিচে বললো, “তুই খাচ্ছিস খা, আমি খাবো না” মেঘের প্রেমানুভূতি এতটায় তীব্র যে আবিরের তপ্ত স্বরের কথাগুলো কানেই যাচ্ছে না । হাস্যোজ্জ্বল মুখে আবির ভাইয়ের দিকে চেয়ে আহ্লাদী কণ্ঠে বললো, “একটা খান না প্লিজ” আবির তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাইলো, অকস্মাৎ অভিব্যক্তি বদলে গেলো আবিরের, খরখরে কণ্ঠে বললো, “দে” মেঘ তৎক্ষনাৎ প্লেট বাড়ালো আবির ভাইয়ের দিকে, আবির ভ্রু কুঁচকে

বিরক্তি নিয়ে বললো, “একটা ফুচকার জন্য আমি হাত নষ্ট করতে পারবো না, তুই খাইয়ে দে” মেঘ চোখ বড় করে তাকালো, জিভ দিয়ে ঠোঁট ভেজালো, মেঘের ডাগর ডাগর চোখে তাকানো দেখে আবির নিজের দৃষ্টি সংযত করে ফোনের দিকে তাকালো। মেঘ ধীর হস্তে ফুচকায় টক দিয়ে, আলতো হাতে আবির ভাইয়ের মুখের সামনে ধরতেই আবির হা করলো, মেঘও দু আঙুলে কোনোরকমে ফুচকা মুখে দিয়ে হাত সরালো দূরে। যেনো আবির ভাইয়ের ছোঁয়ায় কারেন্টের শক খেয়েছে। ফুচকা মুখে পরতেই আবির ভ্রু কুঁচকে চোখ বন্ধ করলো, কোনোরকমে গিললো,দাঁত কিরকির করছে। দাঁতে দাঁত চেপে গম্ভীর কণ্ঠে বললো, ” উফ, কিভাবে খাস এত টক?” মেঘ দাঁত বের করে হাসে, ঠাট্টার স্বরে বলে, “এভাবেই” আবির দাঁতে দাঁত চেপে ধরে আছে। ক্ষুদ্র চোখে তাকিয়ে আছে অষ্টাদশীর পানে।। কিছু বলতে চেয়েও বলছে না। হঠাৎ চোখ পরে দূরে, রাকিব দূর থেকে ফোন ধরে দাঁড়িয়ে আছে, আর দাঁত কেলিয়ে হাসছে। আবির কপাল কুঁচকে তাকালো, মেঘের চেয়ারের পিছনে হাত নিয়ে দু আঙুলে ইশারা দিলো,সঙ্গে সঙ্গে ফোন পকেটে রেখে জায়গা ত্যাগ করলো রাকিব। মেঘ আপন মনে ফুচকা খাচ্ছে। ২য় প্লেটের শেষ ফুচকায় অতিসামান্য টক দিয়ে আবির ভাইয়ের দিকে বাড়ালো, আবির সঙ্গে সঙ্গে হুংকার দিয়ে উঠলো, “আর খাবো না!” মেঘ পল্লব ঝাপটে অধর নেড়ে বললো, ” একটা খাইতে নেই, এটায় শেষ প্লিজ!” আবির আগে থেকেই ভ্রু গুটিয়ে, চোখ বন্ধ করে হা করলো। তবে এটাতে টক কম

দেয়ায় তেমন প্রভাব পরে নি। কোনোরকমে খেয়ে নিলো ফুচকাটা। একটু পানি খেয়ে মেঘের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে শুধালো, “একটা খেলে কি হয়?” মেঘের ঠোঁটে ফুটে উঠে রক্তজবার ন্যায় হাসি, তৎক্ষনাৎ হাসি থামিয়ে বললো, “একটা খেলে পানিতে পরে যেতেন” আবির বোকার মতো চেয়ে আছে মেঘের দিকে, কয়েক মুহুর্ত পর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিরক্তি নিয়ে বলল, “কি? কোত্থেকে শুনিস এসব আজগুবি কথাবার্তা? ” মেঘ বিজ্ঞের ন্যায় মাথা দুলিয়ে বললো, “আমার সোর্স আছে ” মেঘ মাথা নুইয়ে মুচকি হাসে।। আবির মেঘের কথা শুনে কপাল গোটায়, কন্ঠ দ্বিগুণ ভারি করে অকস্মাৎ বলে উঠে, “আমি পানিতে পরলে তো তুই ই সবচেয়ে খুশি হতিস” মেঘের উদ্বেলিত মনোভাব কমে আসে। সিক্ত চোখে তাকায় আবিরের দিকে। আবিরের নিরেট চোয়াল দেখেই মেঘ তটস্থ হয়ে সহসা চিবুক নামিয়ে মনে মনে বলে, “আমি আপনাকে পানি পরতে দিব না, আপনার কিছু হলে আমি কাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখবো। কে আমার স্বপ্নের রাজকুমার হবে?” আবির চুপচাপ চেয়ার থেকে উঠে চলে যায়। মেঘ কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর মুখ তুলে তাকায়, তাকিয়ে দেখে আবির ভাই নেই। পিছনে ঘুরে দেখলো আবির ভাই টাকা দিচ্ছেন। ১ মিনিটের মধ্যেই আবির এসে চেয়ারের হাতল ধরে দাঁড়িয়ে বললো, “তোর খাওয়া শেষ হইছে?” মেঘ মাথা নেড়ে “হ্যাঁ বললো” আবির ২ টা টিস্যু এগিয়ে দিলো মেঘের দিকে। আবির খরখরে কণ্ঠে বলল, “চল তাহলে” মেঘ উঠে আবির ভাইয়ের পিছন পিছন হাঁটে। বাইকের কাছে গিয়ে আবির মেঘের দিকে

একটা শপিং ব্যাগ এগিয়ে দেয়। মেঘ হাতে নিতে নিতে বলে, “কি এখানে?” “মীম আর আদির জন্য নিয়েছি” জবাব দিলো আবির। “মনের ভেতরের মুগ্ধতা মেঘের ঠোঁটের কোণে ভেসে উঠলো, আবির ভাইকে সে কখনো বলতেই পারতো না মীম আর আদির জন্য নেয়ার জন্য। মেঘ কে যে খাওয়াতে এনেছে এটায় অবাক কান্ড আবার তাদের জন্য ও নিচ্ছে। মেঘ বিড়বিড় করে বললো, ” বাহ! আবির ভাই।” আবির চোখ পা*কিয়ে তাকালো, হালকা স্বরে ধ*মকে উঠলো, ” এই মেয়ে, উঠবি? ” মেঘ সঙ্গে সঙ্গে আবির দিকে তাকায়, স্বাভাবিক হয়ে উঠে বসে বাইকের ব্যাক সিটে। বাসার সামনে নামিয়ে দিয়ে আবির চলে যায়। মেঘ খুশিতে গদগদ হয়ে মীম আর আদির কাছে যায়। আবির মসজিদে মাগরিবের নামাজ পরে বাইক স্টার্ট দেয়। একেবারে এসে থামে বন্ধুদের আড্ডার মহলে।রাকিব আর রাসেল আড্ডা দিচ্ছিলো। মোবারক আর লিমন এখনও আসে নি, রাস্তায় আছে মনে হয়। আবির বাইক থেকে নামতে নিলে রাকিব দাঁত কেলিয়ে হাসতে হাসতে জরিয়ে ধরতে যায় আবিরকে। আবির বাইক থেকে নেমেই ২-৩ ঘু*ষি বসিয়ে দেয় পেটে। ঘু*ষিগুলো এত জোরে না লাগলেও রাকিব কিছুটা নত হয়ে যায়। রাসেল বসা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে আঁতকে উঠে বলে, “কি হয়ছে তোদের?” রাকিব কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে বলে, “উফ, এমনে কেউ মারে?” আবির রাগান্বিত কণ্ঠে বললো, “তোর যেমন মুখ বেশি চলে , আমার তেমনি হাত বেশি চলে” রাসেল পুনরায় শক্ত কণ্ঠে বললো, “আরে হইছে টা কি, বলবি

আমায়?” রাকিব হাসতে হাসতে জবার দিলো, “আর বলিস না, আবিরকে বিকালে ফুচকার দোকানে দেখে আমি পুরাই টা*শকি খাইছি, যেই আবির এত বছরে ফুচকার দোকানের আশেপাশে যায় নি সে কেনো ফুচকার দোকানে আসছে আমার জানতে হবে না? আমি দৌড়ে গেছি আবিরের কাছে। আবিরের পাশে মেঘকে দেখে আমিতো আরও অবাক। খুশিমনে ওদের আপ্যায়ন করার জন্য বললে ফেলছিলাম, আমার পক্ষ থেকে ফুচকা খাওয়াবো সেই ঝা*ল এখন মিটাচ্ছে। ” আবির গম্ভীর কণ্ঠে বললো, ” ও আমার কাছে জীবনে প্রথম ফুচকা খাওয়ার আবদার করছে, তুই কেনো খাওয়াবি! ” রাসেল সহসা বলে উঠলো, “ঠিকই তো। আবিরের ও কে তো আবিরই খাওয়াবে। ” রাকিব পুনরায় ঠাট্টার স্বরে বললো, “এজন্যই তো আমি বলছিলাম, সারাজীবন তো আবির ই খাওয়াবে এবার নাহয় আমি খাওয়ায়।” রাসেল ভ্রু কুঁচকে তাকিয়ে বললো, “তুই কি এই কথা ওদের সামনে বলে ফেলছিলি?” রাকিব আবার বললো, “একটু বলছি। না মানে আমার কি দোষ, উত্তেজনায় মেঘ কে প্রথমে ভাবি বলে ফেলতে চাইছিলাম। ” রাসেল অবাক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো রাকিবের দিকে, অকস্মাৎ বলে উঠলো, ” ঠিকই আছে। আরও খা মা*ইর । ” রাকিব আবিরের দিকে তাকিয়ে নাক টেনে কিছুটা আবেগি কণ্ঠে বললো, “মাফ করে দে ভাই। মুখ ফঁসকে আর কিছু বলবো না।” আবির তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রাগান্বিত কণ্ঠে বললো, “মুখ ফঁসকে বলছিলি ভালো কথা, তুই আমাদের রোমান্টিক মুহুর্তে বেগরা দিছিস

কেন? আমি কি তোর প্রেমে কখনো বেগরা দিছি?” রাকিব ভেংচি কেটে বললো, “আমারটা তো মেঘের মতো এত লক্ষী না, আজ পর্যন্ত একটা ফুচকাও নিজের প্লেট থেকে দেয় নি আমাকে বরং আমার প্লেট থেকে আরও নিয়ে নেয়। ” আবির তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকায়, কিছু বলার আগে রাকিব পুনরায় বলা শুরু করলো, “মেঘ তোর জন্য সারাদিন না খেয়ে বসে থাকতে পারে আর আমারটা এক গামলা খেয়ে তারপর আমার সাথে ঝ*গড়া লাগে। যদি ঘুরতেও নিয়ে যাই, বাসা থেকে বের হয়ে সে আগে ফুচকা,চটপটি, হালিম খেয়ে নেয় একা একা। তারপর আমার সাথে দেখা করতে আসে। আমি যেখানে নিজে শান্তিতে প্রেম করতে পারি না সেখানে তোকে কেমনে করতে দেয়?” আবির কপাল গোটিয়ে ক্ষুদ্র চোখে তাকিয়ে আছে। রাসেল সহসা বলে, “রাকিব, কি করছিস তুই?” রাকিব আবারও হাসি শুরু করলো, এবার হাসির মাত্রা দ্বিগুণ বেড়ে গেছে। হাসতে হাসতে বললো, “রাসেলরে তোকে তো একটা জিনিস দেখানোই হয় নি। আয় বোস, একটা OMG জিনিস দেখায় তোকে।” আবিরের দিকে তাকিয়ে পুনরায় দাঁত কেলিয়ে বললো, “আয় নিজের কুকী*র্তি দেখে যা! ” তিন বন্ধু চেয়ার টেনে বসছে এরমধ্যে মোবারক আর লিমন ও এসেছে। ৫ জনেই চেয়ার কাছাকাছি এনে বসেছে। আবির ভেবেছিল ছবি দেখাবে তাই এতটা মনোযোগ দেয় নি। কিন্তু রাকিব একটা ভিডিও অন করলো। পিছন থেকে ভিডিও করেছে। মেঘের হিজাবের কারণে মুখটা তেমন ভাসে নি। কিন্তু আবিরের মুখের একপাশে স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে। মেঘ আবিরকে

মুখে তুলে ফুচকা খাইয়ে দিচ্ছে। এতটুকু দেখেই মোবারক আর রাসেল চিৎকার দিয়ে উঠে, “আবির... তুই ফুচকা খাইছিস?” লিমন অতর্কিত কণ্ঠে বললো, “আবির, তুই এক মেয়ের পাশে বসে ফুচকা খাচ্ছিস তাও মেয়ে খাইয়ে দিচ্ছে ! ” রাসেল এবার হাস্যোজ্জ্বল মুখে বললো, “এটা এক মেয়ে না রে, আবিরের জীবনের একমাত্র মেয়ে। ” মোবারক আবিরের দিকে চেয়ে সহসা বলে উঠে, “মেঘ নাকি নাম শুনেছিলাম। ওনিই কি সে?” আবির শুধু উপর নিচ মাথা নাড়ায়। লিমন অভিযোগের কণ্ঠে বললো, “এটা আমি মানতে পারলাম না।সেদিনও তো তোকে কত জোর করলাম ফুচকা খেতে। চেপে ধরেও তোকে খাওয়ানো গেলো না আর আজ..!” রাকিব দাঁত কেলিয়ে হেসে বললো, “মেঘ কিছু বললে আবির আবার না করতে পারে না।” তিন বন্ধু অবাক চোখে তাকিয়ে রইলো আবিরের দিকে। রাসেল সহসা বলে উঠলো, “তুই তো টক খাস না জীবনেও, ফুচকা কেমনে খেলি?” আবির মুচকি হেসে জবাব দিলো, “শুধু টক কেনো, ও আমায় বিষ দিলে আমি সেটাও চুপচাপ খেয়ে নিবো।” চারবন্ধু এবার বিস্ময়কর দৃষ্টিতে আবিরের দিকে তাকালো । কয়েক মুহুর্ত সবাই চাওয়াচাওয়ি করলো। মোবারক হাসিমুখে বললো, “বিয়ে কবে খাচ্ছি বন্ধু?” আবির ঠাট্টার স্বরে বললো, “আর বিয়ে....” লিমন কিছুটা চিন্তিত হয়ে বললো, “কেনো? কিছু হয়ছে?” আবির কিছু বলার আগেই রাকিব হাসতে হাসতে বলে উঠলো, “সেদিন যদি মেঘ রাজি হইতো তাহলে আবির আজ বিবাহিত থাকতো। ” তন্মধ্যেই রাসেল বলে বসলো, “তুই

মেঘকে কবে প্রপোজ করলি আর কবেই বা রিজেক্ট করলো শুনলাম না তো!" আবির চোখ-মুখ গোটাল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাইলো রাসেলের দিকে। রাকিব পুনরায় বললো, "আরে দূর প্রপোজ না। আবির মেঘকে বলছিলো, তুই পড়াশোনা না করলে বাদ দে। করতে হবে না তোর পড়াশোনা। কিন্তু মেঘ বেচারি বুঝলোই না, বলে বসলো পড়াশোনা করবো " লিমন কিছুটা ভেবে বললো, "পড়াশোনা না করলে কি করতি?" আবির দাঁত খিচে বললো, "পড়াশোনা করবে না বললে ১ ঘন্টার মধ্যে কাজী এনে বিয়ে করে ফেলতাম। " রাসেল স্ব শব্দে হেসে উঠলো। আর বললো, "মেঘ যদি রাজি না হতো?" আবির রাগান্বিত কণ্ঠে জবাব দিলো, "জোর করে বিয়ে করলে রাজি কি আবার। " লিমন,মোবারক আর রাসেল এত বেশি জানে না। রাকিব আবিরের সবকিছু জানে। রাকিবের সাথে রাসেল চলাফেরা করায় রাসেল টুকটাক জানে। লিমন দাঁত বের করে ঠান্ডা কণ্ঠে শুধালো, " বিয়েটা তো মেঘকে বলেও করতে পারিস। তাহলে তো আমরাও বিয়েটা খেতে পারি আর তোর বউও বিয়ের পরে পড়াশোনা করতে পারে। " আবির দীর্ঘশ্বাস ফেললো, কণ্ঠ খাদে নামিয়ে বললো, "এই কাজ আমি কখনোই করবো না। " মোবারক প্রশ্ন করলো, "কেনো?" আবির গম্ভীর কণ্ঠে বলা শুরু করলো, "কারণ মেঘকে বা বাসায় ঝামেলা করে আমি এখন বিয়েটা করলে, জীবনের কোনো এক সময়ে, মেঘের মনে হতে পারে আমি ওর যোগ্য না। পড়াশোনা, বাহিরে চলাফেরা, বন্ধুমহলের সাথে সে আমাকে মানাতে পারলো না। মেঘের কখনো যদি

মনে হয় আমি ওর জীবনে জোর করে এসেছি বা মেঘ আমার থেকে মুক্তি চাই তখন আমি কি করবো ? তার থেকে ভালো, ও পড়াশোনা করুক, নিজে প্রতিষ্ঠিত হোক। যখন ওর মনে হবে আমাকে ছাড়া ওর চলবে না তখনই আমি ওকে বিয়ে করবো। " গভীর মনোযোগ দিয়ে কথাগুলো শুনছিল সকলে। মোবারক মাথা চুলকে বললো, "একটু আগে যে বললি জোর করে বিয়ে করবি?" আবির এবার কপাল কুঁচকে, বিরক্তি নিয়ে বলা শুরু করলো, "মেঘ যদি বলতো সে পড়াশোনা করবে না তাহলে আমি জোর করে বিয়ে করতাম। কারণ তখন তার পড়াশোনা করে ক্যারিয়ার গড়ার ইচ্ছে থাকতো না, জীবনে চলার পথে নতুন বন্ধু হতো না। আমাকে ঘিরেই ওর পৃথিবী হতো। একটা না একটা সময় গিয়ে আমার প্রেমে পড়তে বাধ্য হতো। " লিমন এতক্ষণ নিরব থাকলেও এবার চিন্তিত স্বরে বললো, ""সবই বুঝলাম কিন্তু ভাবির জীবনে যদি অন্য কেউ চলে আসে তখন কি তুই ভাবিকে ছেড়ে দিবি?"" রাকির ফিক করে হেসে উঠলো, তাচ্ছিল্যের স্বরে বললো, ""যা বলেছিস তুই, আবির দিবে মেঘকে ছেড়ে, হাসাইলি। এই আবির দেশেই আসছে এক ছেলেকে পি*টাইতে । ছেলের অপরাধ কি! ছেলে মেঘের সাথে কথা বলার চেষ্টা করছিলো। কথা বলার চেষ্টাতেই ছেলে এখনও হাসপাতালে ভর্তি, যদি প্রেম করার চিন্তা করে তখন আবির কি করবে,তোরাই ভাব। "" রাসেল, লিমন আর মোবারক সম স্বরে চিৎকার দিয়ে উঠলো, ""আবির.....!"" আবির নিরেট কণ্ঠে বললো, "আস্তে" আবির পকেট থেকে ফোন বের করে

টাইম দেখে বললো, “নামাজের সময় হয়েছে। চল নামাজে যাই। ” সবাই নামাজ পরে বের হলো। রাকিব দাঁত কেলিয়ে বললো, “শুন আজ আবির আমাদের ট্রিট দিবে। কি খাবি বল তোরা” আবির বিরক্তি নিয়ে বললো, “আমি কেনো ট্রিট দিবো? আমি কি বিয়ে করছি নাকি?” রাকিব মুখ বাঁকিয়ে বললো, “বিকেলে যে বললি আনলিমিটেড ফুচকা খাওয়ানোর ক্ষ*মতা তোর আছে তাহলে এখন আমাদের খাওয়া। ” আবির গম্ভীর কণ্ঠে বললো, “এই অফার শুধু আমার কাদম্বিনীর জন্য। ” লিমন অকস্মাৎ বলে উঠলো, “আমাদের আনলিমিটেড খাওয়াতে হবে না লিমিটেডই খাওয়া। তোর কাদম্বিনীর তরফ থেকে। ” আবির কিছুটা ভেবে বললো, “ঠিক আছে, চল!” তিনটা বাইকে ৫ বন্ধু চললো। আবির একা, বাকি দুই বাইকে দুজন করে। নামিদামি রেস্তোরাঁয় এসে বসলো সকলে। আবির উৎফুল্ল কণ্ঠে শুধালো, “বুফে খাবি নাকি কাচ্চি?” ৪ বন্ধু চোখাচোখি করলো,রাসেল মুচকি হেসে বললো, “দেখলি লিমন, মেঘের কথা বলতেই বুফে অফার করছে। কি ভালোবাসা। ” মোবারক বলে বসলো, “তাহলে দুদিন পর পর ভাবির কথা বলে খাবার খাওয়া যাবে ” আবির কড়া কণ্ঠে জবাব দিলো, “এটায় আমার বিয়ের আগে আমাদের পক্ষ থেকে তোদের প্রথম এবং শেষ ট্রিট। এতদিন মেঘের কথা এত ডিটেইলস জানতি না তাই ট্রিটের কথা উঠে নি আজ যেহেতু জানছিস তাই ট্রিট দিচ্ছি আর কিছুই না। ” সবাই কাচ্চি আর বোরহানি নিলো। আবির ফোন বের করে টাইম দেখে তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করলো। বাকি চার বন্ধু

এখনও খাচ্ছে। আবির হাত ধৌয়ে টিস্যু দিয়ে হাত মুছতে মুছতে বললো, “তোরা কি আর কিছু খাবি?” “কেনো চলে যাবি নাকি?” রাকিব বললো। আবির মুচকি হেসে বললো, “তোদের ভাবি আমার জন্য অপেক্ষা করছে।” সবাই একসাথে বলে উঠলো, “অ্যাহ” লিমন অভিমানী স্বরে বললো, “বাহ বন্ধু বাহ! এক বাড়িতে প্রেম করে যা মজা নিচ্ছিস, এদিকে আমার সব কাজিনের বয়স ৫ বছরের এর কম। জীবনটা বেদনার। ” আবির একগাল হেসে বললো, “আর কিছু না খেলে বিল দিয়ে দিচ্ছি ” সবাই বললো, “আর কিছু খাবো না, দোয়া করি তোরা সুখী হ।” আবির বিল পরিশোধ করে সবার থেকে বিদায় নিয়ে বাসার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছে। এদিকে মেঘ সন্ধ্যার পর বাসায় এসে কিছুক্ষণ রেস্ট নিয়ে পড়তে বসেছিলো। ঘন্টাদুয়েক পড়ে খেয়ে নিয়েছে। আবির শুক্রবারে বাহিরেই বন্ধুদের সাথে হাবিজাবি খায় । রাতে বাসায় ফিরে আর ভাত খাই না। এজন্য মেঘও শুক্রবারে আবির ভাইয়ের কথা ভাবে না,সবার সাথে খাবার খেয়ে নেয়। ঘন্টাদুয়েক পড়াশোনা করে আবির ভাইয়ের জন্য অপেক্ষা করছে মেঘ। আজ আবির ভাইয়ের প্রতি ভালোবাসা উতলে পরছে মেঘের। ভাবছে আবির ভাই ফিরলে এককাপ কফি করে দিবে আবির ভাইকে। বেলকনিতে দাঁড়িয়ে আছে, হঠাৎ আবির ভাইকে বাইক নিয়ে গেইট দিয়ে ঢুকতে দেখে এক দৌড়ে নিচে চলে যায়। ড্রয়িং রুমে কেউ নেই। খাওয়াদাওয়া শেষ অনেকক্ষণ আগেই সবকিছু গুছিয়ে সবাই সবার রুমে চলে গেছেন। মেঘ পা টিপে রান্নাঘরে যায়। আবির চাবি দিয়ে

লক খুলে বাসার ভিতরে ঢুকে। বড় বড় কদম ফেলে হাঁটে সিঁড়ির দিকে। মেঘ ছোট একটা পাতিল টান দেয় পানি বসানোর জন্য। এই পাতিলের নিচে যে আরেকটা পাতিল ছিল সেটা তার চোখে পরে নি। পাতিল ফ্লোরে পরতেই জোরে শব্দ হয় , শব্দ শুনে আবির পাশ ফিরলো, তাকালো রান্নাঘরের দিকে। মেঘ চোখ বন্ধ করে, একহাতে পাতিল সহ, আরেকটা খালি হাতের আঙুল দিয়ে দু কান চেপে ধরে আছে। মেঘকে রান্নাঘরে দেখে আবিরের পায়ের র*ক্ত মাথায় উঠে গেছে। দ্রুত পায়ে হেঁটে গেলো রান্নাঘরের দিকে। আবির দাঁতে দাঁত চেপে, গম্ভীর কণ্ঠে শুধালো, "এখানে কি করছিস?" আবির ভাইয়ের কণ্ঠ শুনে কেঁ*পে উঠে মেঘ। ভ*ড়কে যায় কিছুটা। মনে মনে ভাবছে, "যদি বলি আবির ভাইয়ের জন্য কফি করতে আসছি তাহলে আমি শেষ।" নরম স্বরে আস্তে করে মেঘ বললো, " কফি খেতে ইচ্ছে হচ্ছিলো।" আবির সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে পরখ করলো অষ্টাদশীর আপাদমস্তক । গম্ভীর কণ্ঠে বললো, "তুই ডাইনিং এ বোস। আমি আনছি" মেঘ তটস্থ নজরে চাইলো। দৃষ্টি তার নিরেট। কয়েক মুহুর্ত পর পাতিল রেখে ডাইনিং টেবিলের চেয়ার টেনে বসলো। এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রান্নাঘরে। আবির বেসিন থেকে হাত ধৌয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই দুকাপ কফি নিয়ে ডাইনিং এ আসলো। এককাপ মেঘের দিকে এগিয়ে দিলো বসলো মেঘের বিপরীতে । মেঘ আস্তে আস্তে ফুঁ দিয়ে এক চুমুক খেলো। সঙ্গে সঙ্গে বিস্ময়কর চোখে তাকালো আবির ভাইয়ের দিকে। তারপর আরেক চুমুক দেয় কফিতে। আবির কফিতে এক চুমুক দিয়ে

মেঘের দিকে তাকিয়ে বললো, “চিনি ঠিক আছে?” মেঘ সহসা উপর নিচ মাথা নাড়লো। আবির ভ্রু নাচিয়ে শুধালো, “তাহলে এভাবে তাকিয়ে আছিস কেন?” মেঘ বিস্ময় কণ্ঠে বললো, “আপনি এত ভালো কফি বানাতে পারেন? কিভাবে শিখেছেন?” আবির নিরুদ্বেগ কণ্ঠে উত্তর দিলো, “বাহিরে থাকলে এরকম অনেক কিছুই শিখতে হয়। পরিস্থিতিই শিখিয়ে দেয়।। ” মেঘ কি বুঝলো কে জানে, একগাল হেসে বললো, “Thank you Abir Vai” অকস্মাৎ আবিরের অভিব্যক্তি বদলে গেলো, ভ্রু কুঁচকে ধম*কের স্বরে বলে উঠল, “বাড়িতে এতগুলো মানুষ আছে,সাথে একজন হেল্পিং হ্যান্ড থাকার পরও তুই রান্নাঘরে ঢুকলি কোন সাহসে?” আবির ভাইয়ের ধ*মকে চমকে উঠলো মেঘ। অক্ষিপল্লব কাঁপছে তিরতির, ঘামতে শুরু করেছে। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে আবির ভাইয়ের দিকে। আবির দ্বিতীয় বার গম্ভীর কণ্ঠে বললো, “দরকার হলে তোর জন্য আরও দুজন হেল্পিং হ্যান্ড রাখবো। তারপরও তোকে যেনো আগামী ৩ মাস রান্নাঘরে পা দিতে না দেখি। ” কথা শেষ হওয়া মাত্রই হাতে কফির কাপ নিয়ে নিজের রুমের দিকে চলে গেলো। মেঘ মানব মুর্তির ন্যায় চেয়ারে বসে রইলো ।আবির গভীর রাতে মেঘের দরজায় ডাকছে। দরজা খুলায় ছিল তারপরও ওনি ঢুকছেন না। কন্ঠ উঁচু করে বললেন, “আসবো?” মেঘ একগাল হেসে তৎক্ষনাৎ উত্তর দিলো, “আমার রুমে আসতে আপনার অনুমতির প্রয়োজন নেই। ” আবির মেঘের মাথার কাছে বিছানায় বসে কোমল কণ্ঠে বললো, “তুই এত

কিউট কেন, মেঘ?” আবির ভাইয়ের আজগুবি কথা শুনে বিস্ময়কর চোখে তাকালো, বারান্দায় জ্বালানো লাল রঙের লাইটের আলোতে আবিরের মুখমন্ডল টকটকে লাল বর্ণের হয়ে আছে। আবির কেমন করে চেয়ে আছে মেঘের দিকে, আবির ঠোঁট কামড়ে বললো, ” তোর এই ডাগর ডাগর চোখের চাউনি আমায় বারবার আ*হত করে। অভিমানী সেই কণ্ঠস্বর আমাকে বারংবার তোর প্রেমে পরতে বাধ্য করে। তোর অকৃত্রিম হাসি আমার সারাদিনের ক্লান্তি নির্বাণ করে। ” মেঘ হা করে তাকিয়ে আছে আবিরের দিকে। মুখ ফ*সঁকে বলে উঠলো, “আপনি আমায় ভালোবাসেন,আবির ভাই?” আবির সঙ্গে সঙ্গে বসা থেকে উঠে দাঁড়ালো। কিছু না বলেই চলে যাচ্ছে। মেঘ পিছন থেকে ডাকছে, “আবির ভাই” আবির ফিরেও তাকাচ্ছে না। পুনরায়” আবির ভাই ” চিৎকার দিয়ে উঠে বসলো বিছানায়। আশপাশে তাকিয়ে দেখে কোথাও আবির ভাই নেই। বারান্দার লাইটের আলোতে স্পষ্ট দেখা গেলো রুমের দরজা বন্ধ। মেঘ বিস্ময় সমেত তাকিয়ে রইলো দরজার পানে। ফ্যানের বাতাসে চুলগুলো উড়ে চোখে মুখে ঝাপটে পরছে। কয়েক মুহুর্ত লাগলো মেঘের বুঝতে, যে এটা স্বপ্ন ছিল। মেঘ দীর্ঘশ্বাস ফেললো, দূর-দূরান্ত থেকে আজানের শব্দ ভেসে আসছে। মেঘ মোবাইল টা হাতে নিয়ে টাইম দেখলো। ফজরের ওয়াক্ত হয়ে গেছে। মেঘ ফোন থেকে আবির ভাইয়ের নামে সেইভ করা ফাইল টা বের করে আবির ভাইয়ের ছবিগুলো দেখতে লাগলো। কিন্তু মেঘের মস্তিষ্ক জোড়ে মাত্র দেখা স্বপ্নটায় ঘুরছে। মেঘ বিড়বিড় করে বললো,

“স্বপ্নেও ভালোবাসি বললেন না, হি*টলার তো হি*টলার ই!” নামাজ পরে পড়তে বসেছে মেঘ। ভোরবেলা থেকেই গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হচ্ছে। ঠান্ডা ঠান্ডা আবহাওয়া। পড়ার থেকেও মাথায় দুষ্টুমি ঘুরছে বেশি। তারপর ও জোর করে ১-২ ঘন্টা পড়ে খাবার টেবিলে আসলো প্রতিদিনের মতো। আবির একেবারে পরিপাটি হয়ে নামছে সিঁড়ি দিয়ে তা দেখতে মেঘ ঘাড় ঘুরিয়ে তাকিয়ে মুচকি হাসলো। মনে পরে গেলো ভোররাতের স্বপ্নের কথা। ফিটফাট আবির ভাইকে দেখে নিলো আপাদমস্তক। একটা কালো শার্ট হাত তার কনুই পর্যন্ত উঠানো, হাতে একটা ব্লেজার,প্যান্ট টাও একই রঙের, চোখে কালো সানগ্লাস, ঘড়ি পড়তে পড়তে নিচে নামছেন। দ্রুত পায়ে এগিয়ে আসলেন ডাইনিং এর দিকে। মেঘ তখনও অভিভূতের ন্যায় চেয়ে আছে আবির ভাইয়ের পানে। আর গুনগুন করে গান গাইছে, “”কালো সানগ্লাসটাই কেনো এত সুখ। হে যুবক, দৃষ্টিতে যেন সে রাসপুতিন, খু*ন হয়ে যাই আমি প্রতিদিন, নামধাম জানি, সাথে তার সবকিছু, তবুও নিলাম আমি, তার পিছু।।”” আবির কাছাকাছি এসে সানগ্লাস খুলে, কপাল গুটালো কিন্তু মেঘের হুঁশ নেই। আবির গলা খাঁকারি দিয়ে বললো, “কি হয়ছে তোর ?” মেঘ একটু নড়েচড়ে উঠলো। গান থামিয়ে কণ্ঠ খাদে নামিয়ে জবাব দিলো, “ব্লেজার পরলে আপনাকে কেমন লাগবে সেটায় ভাবছি। ” আবির পুনরায় সানগ্লাস চোখে দিলো, কনুই পর্যন্ত তুলা হাত নামিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ব্লেজার পরে নিলো। মেঘ উচ্চস্বরে বলে উঠলো, “মাশাআল্লাহ, কারো নজর না লেগে যায়!” অকস্মাৎ মেঘ

চেয়ার থেকে উঠে আবির ভাইয়ের কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। আবির ভ্রু কুঁচকে চাইলো, মেঘ সহসা আবিরের ডানহাতের কনিষ্ঠা আঙুলে হালকা করে কামড় দেয়। আবির নির্বাক চোখে তাকিয়ে অষ্টাদশীর কান্ড দেখছে। ১ সেকেন্ডের মধ্যে মেঘ দূরে সরে গিয়ে চেয়ারে বসে পরে। নিজের কর্মকান্ডের প্রতি এখন নিজের ই রাগ হচ্ছে। আবির ভাই কিভাবে রিয়েক্ট করবে আল্লাহ জানেন, মনে মনে ভীত হচ্ছে অষ্টাদশী। আবির স্বাভাবিকভাবে হেঁটে মেঘের বিপরীতে বসতে বসতে গম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন করলো, "সুন্দর লাগলেই বুঝি ছেলেদের আঙুলে কামড় দেস তুই?" মেঘ চমকে উঠে তাকায় আবির ভাইয়ের দিকে, সঙ্গে সঙ্গে মাথা নাড়ে ডানে বামে, অভিমানী স্বরে বলে উঠে, "মীম ছাড়া কারো আঙুলে কামড় দেয় না " আবির কিছু বলার আগেই হালিমা খান খাবার নিয়ে হাজির হলেন। একগাল হেসে বললেন, "কি ব্যাপার দুই ভাই বোন আজ গল্প করছে নাকি?" আবিরকে দেখে পুনরায় বললেন, "মাশাআল্লাহ, তোকে খুব ভালো লাগছে!" ততক্ষণে আস্তেআস্তে সবাই খাবার টেবিলে আসতে শুরু করেছে। ইকবাল খান এসে আবিরকে দেখেই বলে উঠলেন, "মাশাআল্লাহ আবির, তোকে তো অনেক সুন্দর লাগছে। এতদিকে তোকে CEO মনে হচ্ছে । তোর লুকেই আজকের মিটিং জমে যাবে!" আলী আহমদ খান ও ছোট করে বললেন, "মাশাআল্লাহ " মোজাম্মেল খান চেয়ারে বসতে বসতে বললেন, "ভাইজান, আবিরকে বলা দরকার না কথাটা?" আলী আহমদ খান ১ সেকেন্ড থেমে বলে উঠলেন, "ও হ্যাঁ, আমার তো মনেই ছিল

না।” আবির নিরেট কণ্ঠে প্রশ্ন করলো, “কি হয়েছে?” আলী আহমদ খান সহসা বললেন, “তোকে একটু রাজশাহী যেতে হবে!৪-৫ দিনের জন্য ” আবির ২ আঙুল দিয়ে কপালে আলতো করে ছুয়েছে সাথে একপলক মেঘকেও দেখে নিয়েছে। মেঘ মনোযোগ দিয়ে খাবার খাচ্ছিলো তবে এই কথা শুনে মুখে খাবার নিয়েই চোখ গোল গোল করে তাকিয়ে আছে আবিরের পানে। আর মনে মনে বলছে, “প্লিজ আবির ভাই, আপনি যাবেন না, প্লিজ” আবির বাবার দিকে এক নজর তাকালো, তারপর মাথা নিচু করে বললো, “আমি এখন কোথাও যেতে পারবো না। ” মোজাম্মেল খান অকস্মাৎ বললেন, “কেনো?” আবির মনে মনে বললো, “আমি দূরে গেলে কারো খাওয়া বন্ধ হয়ে যায়, রাতে ঘুম হা*রাম হয়ে যায়। ” সহসা গলা খাঁকারি দিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে আবির বলে উঠলো, “আমার অফিসে কাজ আছে। ১ সপ্তাহ পর অফিস শুরু হবে, এই অবস্থায় সবকিছু ফেলে আমি কোথাও যেতে পারবো না। ” মোজাম্মেল খান এবার আলী আহমদ খানের দিকে চেয়ে বললেন, “তাহলে কি আমি যাব ভাইজান? ” আলী আহমদ খান কিছু বলার আগেই পুনরায় আবির বলে উঠলো, “কাউকেই যেতে হবে না। আমার পরিচিত লোক আছে আমি এখান থেকেই কাজ করাতে পারবো। তারপরও যদি সমস্যা হয় তখন তোমাদের আমি জানাবো। তবে আগামী ২*৩ মাস আমি কোথাও যাব না এটা বলে রাখলাম। চট্টগ্রামের কাজ মোটামুটি শেষ করে আসছি। সিলেটের কাজও কাকামনি শেষ করে আসছেন। রাজশাহীরটা আমি দেখছি তোমাদের

যেতে হবে না।” মেঘ নিঃশব্দে হাসছে। সবাই চুপচাপ খাবার খাচ্ছে। আবির খাবার শেষ করে উঠে যাবে তখন ইকবাল খান ডেকে উঠলে, “আবির বাহিরে বৃষ্টি, বাইক নিয়ে বের হইস না। আমি খাবার শেষ করে তোকে নিয়ে যাবো। একটু বস। ” আবিরও বাধ্য ছেলের মতো ছোফায় বসে রইলো। তারপর ইকবাল খানের সঙ্গে গাড়িতে করে অফিসের উদ্দেশ্যে চলে গেলেন। সারাদিনই বৃষ্টি হয়েছে আজ, মেঘের কোচিং, টিউশন কিছুই নেই, রুমে বসে সারা বেলা পড়াশোনা করেছে। বিকেলে বৃষ্টি কমে এক চিলতে রোদ বেরিয়েছে আকাশে। মেঘের আর পড়তে ইচ্ছে করছে না। তাই বই রেখে মোবাইল হাতে নিয়ে পুরো বাড়ি চক্কর দিলো কিন্তু সবাই ঘুমাচ্ছে তাই আড্ডা দেয়ার মতো কাউকে পেলো না। হঠাৎ মনে হলো,অনেকদিন ছাদে যাওয়া হয় না। সেই যে রাতের বেলা আবির ভাইয়ের গান শুনে ছাদে গিয়েছিলো তাও আবার ছাদের দরজা পর্যন্ত। তারপর থেকে আর ছাদের দিকে পা বাড়ায় নি মেঘ। মেঘ স্কুল, কলেজে পড়ার সময় প্রতিদিন বিকেল বেলা ছাদে যেতো। ফুল গাছ লাগানো আর তাদের যত্ন নেয়া ছিল তার নে*শা। তবে HSC র আগে টেস্ট পরীক্ষা থেকে মেঘ ছাদে যাওয়া ভুলেই গেছে। টিউশন,কোচিং শেষ করে বাসায় ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যার পর হয়ে যেতো। আর সন্ধ্যার পর ছাদে যাওয়ার মতো এত সাহস অষ্টাদশীর নেই। সেই থেকে গাছের যত্ন ছেড়ে দিয়েছে। গাছেরাও অযত্ন, অবহেলায় ম*রে গেছে। তখন থেকে মেঘ আর ছাদে যায় না। মেঘ গুঁটি গুটি পায়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠলো ছাদে। ছাদের গেইট খুলতেই

চোখ ছানাবড়া হলো অষ্টাদশীর। ছাদের যতটা অংশ চোখে পরছে পুরোটায় গাছে ভর্তি। মেঘ পা বাড়ালো ছাদের দিকে সম্পূর্ণ ছাদ পরিষ্কার করে তাতে তিন সারি গাছের টব রাখা। এক কর্ণারে শুধু ফলের গাছ বাকিসবটায় ফুলগাছে ভরপুর। নয়নতারা, বেশ কয়েক রঙের গোলাপের গাছ, পর্তুলিকার গাছ তবে বিকেল বেলাতে ফুল নেই, কাঠগোলাপের গাছ, জিনিয়া, অপরাজিতা,রঙ্গন থেকে শুরু করে কতকত ফুলের গাছ যার অধিকাংশ গাছের বা ফুলের নামই জানে না মেঘ। মেঘ নিজেকে নিজে প্রশ্ন করছে, "এতগাছ কে আনলো? তানভির ভাইয়া তো জীবনেও ছাদে আসে না। তাহলে কি আবির ভাই?" সহসা মেঘের চোখে মুখে উজ্জ্বলতা ফুটে উঠলো। ছাদ ভর্তি এতো গাছগাছালি দেখে মেঘের ভীষণ ভালো লাগছে। সবটা ছাদ ঘুরে দেখলো সারাদিন বৃষ্টি থাকায় পানি দেয়ার প্রয়োজন হলো না। ২০ – ৩০ টা ছবিও তুলেছে ফুলের আর গাছের। ততক্ষণে সূর্য ডুবতে শুরু করেছে। গোধূলি আলোতে ফুলের মুগ্ধতা দেখে মেঘ লো*ভ সামলাতে না পেরে একটা গোলাপ ফুল ছিঁ*ড়ে নিয়েছে । এতদিন পর নিজের বাড়ির ছাদে এত এত ফুল গাছ আর ফুলের সমাহার দেখে আবেশিত হয়ে পরেছে মেঘ। এদিকে আবির করিডোর দিয়ে নিজের রুমের দিকে আসছিলো। আবির মেঘকে দেখে ঠায় দাঁড়িয়ে পরলো সেখানে। এদিকে মেঘ আপন মনে ফুলের গন্ধ শুঁকছে আর হাঁটছে । আশেপাশে বা সামনে কেউ আছে কি না তাতে তার কোনো মনোযোগ নেই। হঠাৎ আবিরের প্রশস্ত বুকের সঙ্গে ধা*ক্কা খেলো মেঘ। নিজেকে সামলানোর

আগেই আবির মেঘের বাহু চেপে ধরে, সহসা স্বাভাবিক হয়ে মুখ তুলে চায় মেঘ। আবির ভাইয়ের তপ্ত দৃষ্টি দেখেই মাথা নুইয়ে ফেলে পুনরায়। আবির বাহু চেপে ধরে, দ্বিগুণ ভারি কণ্ঠে ধ*মকে উঠে, "ফুল ছিঁড়েছিস কোনো? " মেঘ ঢুক গিলে, মৃদু কণ্ঠে বললো, "SoRRy" আবির পুরু কণ্ঠে শুধালেন, "Sorry টা আমায় না বলে গাছকে বলিস" মেঘ নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরে আছে। আবির ভাইয়ের ধমকে ভিজে আসে নেত্রদ্বয়। আবির মেঘের বাহু ছেড়ে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে মেঘ চলে যেতে নেয়। আবির পুনরায় নিরেট কণ্ঠে ডেকে উঠলো, "শুন" মেঘ ঐখানেই দাঁড়িয়ে পরেছে। কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে উত্তর দিলো, "জ্বি" আবির এবার কিছুটা স্বাভাবিক কণ্ঠে বলে উঠলো, "সময় পেলে গাছগুলোর একটু যত্ন নিস, এগুলো তোরই!" মেঘ এবার বিস্ময়কর দৃষ্টিতে তাকায় আবিরের দিকে। নিষ্পলক তার দৃষ্টি , চোখ টলমল করছে পূর্বের জমা পানিতে, অধর সরে আছে কিছুটা দূরে। কয়েক মুহুর্ত পর উত্তেজিত কণ্ঠে শুধালো, "আমার?" আবির পূর্বের অভিব্যক্তি বজায় রেখে জবাব দিলেন, "হ্যাঁ! তোর নাকি ফুলের গাছ অনেক পছন্দ । তাই এনে দিলাম, এখন যত্ন নেয়ার দায়িত্ব তোর। আর হ্যাঁ গাছের যত্ন নিতে গিয়ে দুনিয়া ভুলে যাস নে যেন " মেঘ বশিভূ*ত চোখে চেয়ে আছে আবির ভাইয়ের দিকে। আবিরও এবার সরাসরি চোখ রাখে মেঘের চোখে মুখে। দু'ফোটা অশ্রুর দাগ হয়ে গেছে , সম্পূর্ণ গাল টকটকে লাল হয়ে আছে, গালের মাঝে একটা গাঢ় কালো রঙের তিল জ্বলজ্বল করছে। আবিরের দূর্বোধ্য দৃষ্টি দেখে, নিজের দৃষ্টি

সংযত করলো মেঘ। কোমল কণ্ঠে বললো, “Thank you Abir Vai” আবির কিছু বলার আগেই পুনরায় মেঘ প্রশ্ন করলো, “আজ এত তাড়াতাড়ি চলে আসলেন যে?” আবির উত্তর দিলো, “একটু পর আবার বের হবো। ” অষ্টাদশী পল্লব ঝাপটে আবির ভাইয়ের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করে, “কফি খাবেন আবির ভাই?” আবির খরখরে কণ্ঠে শুধালো, “গতরাতে কি বলেছি তোকে, মনে নেই?” মেঘ মাথা নিচু করে কন্ঠ খাদে নামিয়ে বলল, “অন্য কাউকে বলি করে দিতে?” আবির কন্ঠ দ্বিগুণ ভারি করে জবাব দিলো, “লাগবে না। তুই রুমে যা। ” মেঘ ও আর কথা বাড়ালো না। চুপচাপ রুমে চলে গেলো। রুমে শুয়ে শুয়ে বিকেলে তুলা ছবিগুলো দেখছিলো মেঘ সেখান থেকে কয়েকটা ছবি আপলোড দিলো ফেসবুকে “স্পেশাল গিফট” সাথে কয়েকটা লাভ ইমুজি দিলো ক্যাপশনে। সন্ধ্যার পর মেঘ পড়তে বসেছে। কিছুক্ষণ পরই ফোনে কল বেজে উঠলো। বন্যা কল দিচ্ছে, তৎক্ষনাৎ রিসিভ করলো মেঘ, বন্যাঃ আসসালামু আলাইকুম মেঘঃ ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছিস? বন্যাঃ আলহামদুলিল্লাহ ভালো। তুই কেমন আছিস? মেঘঃ আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো। বন্যা উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠলো, ” এই তোকে এত গাছ কে দিলো রে?” মেঘ স্ব শব্দে হেসে বললো, “আবির ভাই” “কি? আবির ভাইয়া?” আঁতকে উঠে বন্যা। মেঘ পুনরায় বলে উঠে, “হ্যাঁ,কবে আনছেন জানি না। কিছুদিন যাবৎ মীমের রুমে কাজ চলছে,ছাদেও কাজ চলছিলো তাই আমি তেমন বের হয় নি রুম থেকে আর ছাদেও

যায় না অনেকদিন যাবৎ । আজ হঠাৎ ছাদে গিয়ে দেখি ছাদ ভর্তি গাছ, ছাদের পরিবেশ পুরোই চেইঞ্জ ।। আসার সময় আবির ভাই বলছেন এগুলো নাকি আমার।" বন্যা উদ্বেলিত ভঙ্গিতে বললো, "বাহ! তোর শখ তো তাহলে পূরণ হয়েই গেলো। তুই তো খুব করে চাইতি তোর ছাদভরা গাছ হোক, যেদিকেই তাকাবি শুধু গাছ আর গাছ থাকবে। দেখলি তো আল্লাহ তোর ইচ্ছে পূরণ করেছেন?"" মেঘ খুশিমনে বললো, "তুই সময় করে আসিস বাসায়,ছাদে যাব নে। আর হ্যাঁ সকাল বেলা আসিস " "ঠিক আছে" বন্যা উত্তর দিলো। তারপর দুই বান্ধবী বেশকিছুক্ষণ পড়াশোনা নিয়ে কথা বলে রেখে দিলো। রবিবার থেকে ব্যস্ততায় কাটছে সকলের সময়। বর্ষাকাল থাকায় হুটহাট বৃষ্টি নেমে যায়। আবির বৃষ্টি না থাকলে বাইকে অফিসে যায় আবার বৃষ্টি থাকলে গাড়িতে যায়। মেঘ ও কোচিং টিউশন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পরলো। আবির ভাইয়ের সাথে তার টুকটাক দেখা হয়। হয়তো খাবার টেবিলে নাহয় সিঁড়িতে অথবা করিডোরে। আজ বৃহস্পতিবার। আবির সন্ধ্যার পর সোফায় বসে আছে হাতে ফোন আর সামনে কফির কাপ নিয়ে। মেঘ ও তখন বই নিয়ে রুম থেকে বের হয়েছে, কিছুক্ষণ পরেই জান্নাত আপু আসবে। মেঘ করিডোর থেকে সিঁড়ির কাছে আসতে আসতে নিচের দিকে একবার তাকায়।। চোখ পরে সোফায় বসা আবির ভাইয়ের দিকে। এক হাতে কফির কাপ নিয়ে কফি খাচ্ছের অন্য হাতে মোবাইলের দিকে তাকিয়ে আছেন। মোবাইলের হোমপেইজে সাদাকালো রঙের একটা ছবি। মেঘ গভীর দৃষ্টিতে দেখার

চেষ্টা করলো কিন্তু ক্লিয়ার বুঝা যাচ্ছে না। মেঘ দ্রুত পায়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নেয় যাতে কাছে গিয়ে ছবিটা দেখতে পারে কিন্তু মেঘের নুপুরের শব্দে আবির ঘাড় ঘুরিয়ে তাকিয়ে মোবাইল পকেটে রেখে দেয়। মেঘ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আবির ভাইয়ের দিকে চেয়ে চেয়ে নিচে নামছে আর মনে মনে বলছে, "কে এই মেয়ে যার ছবি আবির ভাইয়ের ফোনের ওয়ালপেপারে রেখেছেন। আমাকে দেখতেই হবে এই মেয়ে কে!" আবির কফি শেষ করে দীর্ঘ পায়ে বেরিয়ে যায় বাসা থেকে। মেঘ কিছুক্ষণ সিঁড়ির নিচে দাঁড়িয়ে পুনরায় পড়ার রুমের দিকে চলে যায়।। ১০-১৫ মিনিটের মধ্যেই জান্নাত আপু পড়াতে আসেন। আজ একটু বেশি সময় নিয়ে পড়িয়েছেন আপু। মোটামুটি ৮.৩০ এর কাছাকাছি বেজে গেছে ।ড্রয়িংরুমে কেউ নেই জান্নাত পড়ানো শেষে বের হতে যাবে। মেঘও তখন পিছন পিছন পড়ার রুম থেকে বের হয় দরজা লাগানোর জন্য। জান্নাত দরজার কাছাকাছি যেতেই আবির বাহির থেকে দরজা ধাক্কা দিয়ে ভিতরে ঢুকে। মুখোমুখি দেখা হয় আবির আর জান্নাতের। জান্নাত সহসা হাস্যোজ্জ্বল মুখে বলে, "আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া, কেমন আছেন?" আবিরও হাসি মুখে উত্তর দেয়, "ওয়ালাইকুম আসসালাম। আলহামদুলিল্লাহ ভালো, তুমি কেমন আছো?" মেঘ পড়ার রুমের কিছুটা সামনে স্ট্যাচুর মতো দাঁড়িয়ে আছে । আর বিড়বিড় করে বলছে, "আবির ভাই জান্নাত আপুকে চিনে? কিন্তু কিভাবে? তাহলে কি আবির ভাইয়ের ফোনে তারই ছবি ছিলো?" জান্নাত হাসিমুখে উত্তর দিলো, "আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি।

আপনাকে তো বাসায় দেখিই না ভাইয়া। ” আবির কিছুটা শক্ত কণ্ঠে বললো, “বাসায় ফিরতে একটু দেরি হয়ে যায়। তোমার পড়াতে কোনো সমস্যা হচ্ছে না তো?” জান্নাত শান্ত কণ্ঠে বলল, “না,না ভাইয়া। কোনো সমস্যা হচ্ছে না।” আবির এক পলক মেঘের দিকে চেয়ে পুনরায় জান্নাতের দিকে তাকালো, নিরেট কণ্ঠে শুধালো, “ও পড়ে তো ঠিকমতো?” জান্নাত এবার মেঘের দিকে চেয়ে হাসিমুখে বললো, “হ্যাঁ ভাইয়া।মেঘ অনেক মনোযোগী এবং খুব মেধাবী । আপনি চিন্তা করবেন না প্লিজ” আবির ছোট করে শুধালো, “খেয়েছো কিছু? বসো খাবার খেয়ে যেয়ো। ” জান্নাত তৎক্ষনাৎ বললেন, “নাস্তা করেছি ভাইয়া, আর কিছু খাবো না। আসি তাহলে আজ ” ওদের কথোপকথন শুনার জন্য মেঘ কিছুটা হেঁটে সামনের দিকে এগিয়ে আসলো। আবির স্বাভাবিক কণ্ঠে বললো, “সাবধানে যেয়ো। ” জান্নাত একগাল হেসে বললো, “আপনি আমাদের বাসায় বেড়াতে যাইয়েন। ” আবির হালকা হেসে উত্তর দিলো, “সময় পেলে অবশ্যই যাবো। ” প্রথমের কথা গুলো ঠিকমতো না শুনলেও শেষ কথাগুলো মেঘ স্পষ্ট শুনতে পেয়েছে। জান্নাত মেঘকে আল্লাহ হাফেজ বলে বেড়িয়ে গেছে বাসা থেকে। এদিকে মেঘের বুক কেঁ*পে উঠলো। মেঘ যেনো নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না। আনমনে ভাবছে, “জান্নাত আপু আবির ভাইকে বাসায় যেতে বলছেন? আবির ভাইও আবার হাসিমুখে বলছেন সময় পেলে যাবে। কই আবির ভাই তো আমার সাথে এত ভালো আচরণ করেন না, ওনি তো আমার সাথে আজ পর্যন্ত হাসিমুখে

কথায় বলেন নি। তাছাড়া জান্নাত আপুকে তো তানভির ভাইয়া নিয়ে আসছিলেন। তাহলে আবির ভাই কিভাবে চিনেন?” মেঘ আহ*ত চোখে তাকিয়ে রইলো আবির ভাইয়ের পানে। আবির দরজা বন্ধ করে সিঁড়ির দিকে যেতে নিলে সহসা পথ আটকে সামনে দাঁড়ালো অষ্টাদশী। আজ আর তার শরীর কাঁপছে না, হাত-পা রিমরিম করছে না কারণ হাজারটা প্রশ্ন তার মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে যেগুলোর উত্তর শুধু আবির ভাই জানেন। ড্রয়িং রুমের কোথাও কেউ নেই। জান্নাত পড়িয়ে গেলেই মূলত খাওয়াদাওয়ার পর্ব শুরু হয়। তাই এ সময় সবাই যে যার রুমেই থাকেন । অষ্টাদশীর পথ আটকানো দেখে আবির বিস্মিত চোখে চাইলো। মেঘের এলোমেলো চুল, চোখের কাজল কিছুটা লেপ্টে রয়েছে, শুষ্ক ওষ্ঠদ্বয় তিরতির করে কাঁপছে । এ অবস্থায় মেঘকে দেখে ঘোর লেগে যাচ্ছে আবিরের। হাজারও নিষিদ্ধ চিন্তা জেগে উঠছে আবিরের মনে । টেনে হিঁচড়ে কোনোরকমে নিজেকে সামলে ঢুক গিলে কিছুটা শক্ত কণ্ঠে বললো, “পথ আটকে দাঁড়িয়েছিস কেন?” মেঘের সরু নাক ক্রমেক্রমে ফুঁসছে। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে, ধৈর্যহীন কণ্ঠে শুধালো , “আপনি জান্নাত আপুকে চিনেন?” আবির উপর নিচ মাথা নাড়ে শুধু । মেঘ দ্বিতীয়বার গম্ভীর কণ্ঠে বললো, ওনাকে আপনি কিভাবে চিনেন? আবির রাশভারি কণ্ঠে বললো, ” পরিচিত.....! ” মেঘ ভেতর ভেতর ক্ষিপ্ত হলো। অষ্টাদশীর চেহারার পরতে পরতে ঘনিয়ে আসে মেঘ। এক সমুদ্র অভিযোগ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। একে গায়ের রঙ ফর্সা তার উপর রাগে গালদুটো লাল হয়ে আছে মেঘের।

দেখে মনে হচ্ছে টুকা দিলেই গাল বেয়ে রক্ত পরবে। রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে মেঘ বললো, " শুধু পরিচিত হলেই কি মানুষ নির্দ্বিধায় বাসায় যেতে বলে?" "তুই আমার কাছে কৈফিয়ত চাচ্ছিস, মেঘ?" চোয়াল শক্ত করে প্রশ্ন করলো আবির। মেঘ আজ আবিরের শক্ত কণ্ঠ শুনে আঁতকে উঠছে না। কারণ অষ্টাদশীর আজ মাত্রাতিরিক্ত রাগ হচ্ছে । অতিরিক্ত রাগলে মানুষের বোধশক্তি হারিয়ে যায়। তাছাড়া মেয়েমানুষের রাগ তো লিমিট ছাড়া, যখন রাগ হয় তখন দুনিয়ার কোনোকিছু দিয়েও শান্ত করানো যায় না,যতক্ষণ না নিজে থেকে শান্ত হয়। মেঘের নাকের ডগায় ঘাম জমে আছে। কপাল ঘামতে শুরু করেছে ধীরে ধীরে। নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো অষ্টাদশী । কয়েক মুহুর্ত পর নিরেট কণ্ঠে শুধালো, "আপনি ওনার বাসায় যাবেন?" আবির তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো, গুরুভার কণ্ঠে বললো, "প্রয়োজন হলে যাব " মেঘ চোখ গোল গোল করে চাইলো। মনের ভেতর হাজারটা প্রশ্ন ছুটছে এদিক সেদিক । মেঘের নিরবতা দেখে আবির গুরুভার কণ্ঠে জবাব দিলো, " তোকে আপাতত এসব নিয়ে ভাবতে হবে না।পড়াশোনায় মনোযোগ দে। তুই এখনও অনেক ছোট। সময় হলে সব জানতে পারবি " মেঘ দীর্ঘশ্বাস ফেলে রাগান্বিত কণ্ঠে বলা শুরু করলো, "আপনারা যা খুশি করতে পারেন যা খুশি বলতে পারেন তাতে কিছু হয় না আমি কিছু বলতে গেলেই ছোট, বয়স হয় নি এরকম করেন।" আবির দাঁতে দাঁত চেপে গম্ভীর কণ্ঠে বললো, "মেঘ, আস্তে কথা বল। বাড়ির মানুষ শুনবে। তাছাড়া জান্নাতের ব্যাপারে

আমি আপাতত কোনো কথা বলতে চাচ্ছি না। ” মেঘ রা*গে ফুঁস*তে ফুঁ*সতে বললো, “তা কেনো বলবেন, আপনার যত রাগ আর তেজ তো শুধু আমার উপরই দেখান।। কোথাকার কোন রাস্তার মেয়ের জন্য আপনার এত দরদ। ” আবিরের চোখ লাল হয়ে গেছে, দাঁত কটমট করছে, কণ্ঠ তিনগুণ ভারি করে ধমকে উঠলো, “জান্নাত কোথাকার কোন মেয়ে না । ওকে সম্মান দিয়ে কথা বলবি। ফারদার যদি তাকে রাস্তার মেয়ে বলিস তাহলে এর ফল ভালো হবে না বলে রাখলাম ” তৎক্ষনাৎ মেঘের অভিব্যক্তি বদলে গেলো, সহসা মনে পরে গেলো আবির ভাইয়ের ফোনে দেখা ওয়ালপেপারের ছবিটার কথা। তারমানে কি আবির ভাইয়ের প্রিয়ত..... আর কিছু ভাবতে পারছে না মেঘ। চোখে সর্ষে ফুল দেখছে। হৃদয় ভেঙে খন্ড খন্ড হয়ে যাচ্ছে । আবির কিছু একটা বলতে যাবে তার আগেই মেঘ শক্ত কণ্ঠে বলে উঠলো, “আপনি কি ওনাকে ভালোবা.....” এতটুকু বলার পরই আবির ডান হাতে মেঘের বাম গালে শক্তপোক্ত চড় বসিয়ে দিলো। অকস্মাৎ মেঘের মুখ বন্ধ হয়ে গেলো, কথাটা শেষও করতে পারলো না। মেঘের সমগ্র পৃথিবী ঘুরছে, বিপুল চোখে চেয়ে আছে আবিরের দিকে। স্তব্ধ হয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে রইলো সেখানে, একটা বারের জন্য গালে হাতও রাখলো না । অনুভূতিরা যেনো বিলীন হয়ে গেছে। রক্তাভ চক্ষুদ্বয় আবির ভাইয়ের চোখে নিবদ্ধ । আবির ভীষণ চটে গেছে, ডান হাতে নিজের চুল মুষ্টিবদ্ধ করে ধরলো, রাগান্বিত কণ্ঠে বললো, “যা বুঝার তা বুঝিস না, আজাইরা বিষয় নিয়ে পরে থাকিস। ” মেঘ নির্বাক চোখে

তাকিয়ে আছে আবির ভাইয়ের দিকে। আবির সঙ্গে সঙ্গে পা পিছিয়ে ঘুরে গেলো। দরজার পাশে দেয়ালে স্ব বেগে ঘুষি বসিয়ে দিলো। তা দেখে কেঁপে উঠে অষ্টাদশী। বাম হাত দিয়ে মেইন গেইট খুলে বেরিয়ে গেলো বাসা থেকে। মেঘ ঠায় দাঁড়িয়ে আছে সেখানে, দীর্ঘ সময় পর চোখ বেয়ে গরিয়ে পরে দুফোঁটা অশ্রু । ততক্ষণে মালিহা খান বেড়িয়ে আসলেন রুম থেকে। মালিহা মেঘকে দরজা মুখী দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে প্রশ্ন করলেন, "কিরে এভাবে দাঁড়িয়ে আছিস কেনো? ক্ষুধা লাগছে? " মেঘ কিছুটা নড়ে উঠলো, বড় আম্মুর দিকে না ঘুরেই শীতল কন্ঠে বললো, "না" তারপর পড়ার রুমে থেকে বই গুলো নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগলো। আকলিমা খান মেঘকে যেতে দেখে ডাকলেন, "মেঘ, খাবি না? " মেঘ গম্ভীর স্বরে বললো, "ক্ষুধা নেই! " মেঘ রুমে এসে হাতের বই খাতাগুলো ছুঁড়ে ফেলে দেয় বিছানায়,তারপর দরজা আঁটকে নিজেও বিছানায় লুটিয়ে পরে।মেঘের বুক ভে*ঙে আসে আকাশ সম ক*ষ্টে। চোখ বেয়ে অনর্গল নোনাজল গড়িয়ে পরছে। নিজেকে সান্ত্বনা দেয়ার কোনো ভাষা নেই অষ্টাদশীর। যেই আবির ভাইয়ের থাপ্পড়ের ভয়ে গত একটা মাস আবির ভাইয়ের চোখে চোখ রেখে কথা বলে নি, আবির ভাই যা বলেছে চুপচাপ মেনে নিয়েছে, নিজের রাগ, জেদ আর অভিমান আবির ভাইয়ের পদতলে চাপা দিয়ে দিয়েছিলো। সেই আবির ভাই কি না ১ মাস হওয়ার আগেই তাকে থাপ্প*ড় মা*রলো। তাও আবার কোথাকার কোন মেয়ের জন্য! এত শক্তপোক্ত চড়ে এখনও মুখের বাম পাশে ব্যথা করছে মেঘের।

শুয়া থেকে উঠে আয়নার সামনে দাঁড়ালো। বামগালে পাঁচ আঙুলের দাগ হয়ে আছে, রক্তবর্ণের সেই পাংশু। নিজের বিধ্বস্ত ধৃষ্টতা দেখে আঁ*তকে উঠে মেঘ। মুখমন্ডলের ন্যায় অষ্টাদশীর কোমল হৃদয় টাকেও চূর্ণবিচূর্ণ করে ফেলেছেন অনুভূতিহীন, কাটখোট্টা আবির ভাই। মেঘ আয়নার দিকে তাকিয়ে রইলো কয়েক মুহুর্ত, আনমনে কি ভাবছে কে জানে! যে অষ্টাদশীর মনটাকে কাঁচের ভাঙা গ্লাসের মতো, হাজারও টুকরোতে পরিণত করেছে। কোথায় সে দুরূহ পুরুষ? আবির বাসা থেকে বেরিয়ে বাইক স্টার্ট দিলো। কি কাগজ নিতে এসেছিল সেসব ভুলে গেলো। স্প্রীডে বাইক চালিয়ে আসলো নিজের অফিসে। কোনোদিক না তাকিয়ে সোজা নিজের রুমে চলে গেলো। কিছুক্ষণ পর রাসেল একজন স্টাফকে জিজ্ঞেস করলো, “আবির স্যার কি এখনও আসে নি?” স্টাফ সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলো, “স্যার তো কিছুক্ষণ আগেই চলে এসেছেন। ” “কি বলো, আবির আসছে অথচ আমায় ফাইল দিলো না!” চিন্তিত স্বরে বললো রাসেল। তৎক্ষনাৎ হাঁটা দেয় আবিরের রুমের দিকে। আবিরের রুমের দরজা ধাক্কা দিতেই চোখে পরলো বিধ্বস্ত রুম। যেনো কিছুক্ষণের মধ্যে ঘূর্ণিঝড় বয়ে গেছে এই রুমটার উপর দিয়ে। হেলমেট ভেঙে পরে আছে ফ্লোরে। কাগজপত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে পরে আছে সম্পূর্ণ রুমে। সেগুলো এলোমেলো উড়ছে ফ্যানের বাতাসে,চেয়ার পরে আছে কাত হয়ে। আবিরকে দেখা গেলো না।আবিরকে দেখার জন্য রাসেল দরজায় দাঁড়িয়েই উঁকি দিলো ভেতরে। জানালার পাশের দেয়ালে আবির অহিতেচ্ছা, অনবরত ডান

হাতে ঘুষি দিয়েই যাচ্ছে। বিস্ময় চোখে চাইলো রাসেল, এক সেকেন্ড দেরি না করে ছুটে গেলো আবিরের কাছে, চেষ্টা করলো আবিরকে থামানোর কিন্তু ব্য*র্থ হলো। ৬ ফুট লম্বা, শক্তিশালী, সুঠাম দেহি আবিরের সাথে ৫ ফিট ৭” লম্বা রাসেলের শক্তি কোনোমতেই কুলালো না। চেষ্টায় ব্য*র্থ হওয়ার দরজা পর্যন্ত দৌড়ে যায় রাসেল আর চিৎকার দিয়ে ডাকে, “রাকিব,এদিকে আয়!” ভয়ংকর সেই পুরুষালী চিৎকারের শব্দে রাকিব সহসা দৌড়ে আসে, সাথে ছুটে আসে অফিসের কিছু স্টাফ আর কিছু কর্মচারী । রাকিব আর রাসেল টেনে হিঁচড়ে আবিরকে দেয়াল থেকে দূরে সরিয়ে আনলো। আবিরের চোখে-মুখে ক্রো*ধ স্পষ্ট প্রতীয়মান হচ্ছে। শ্যামবর্ণের মুখবিবর পরিবর্তন হলো ঘুটঘুটে আঁধারে । উষ্কখুষ্ক চুলগুলো এলোমেলো হয়ে আছে, ঘামে ভেজা কপালে লেপ্টে আছে সামনের দিকের চুলগুলো। পরনের সাদা শার্ট ঘামে ভিজে লেপ্টে আছে গায়ের সাথে। রুমে ফুল স্প্রীডে ফ্যান চলছে সাথে এসি অন থাকা স্বত্তেও আবিরকে দেখে মনে হচ্ছে সবেমাত্র ৪০□সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ফুটবল খেলে এসেছে। রাকিব মাটিতে কাত করা চেয়ারটা এক হাতে তুলে আবিরকে জোর করে বসালো। আবিরের হাতের দিকে চাইলো, নিরবচ্ছিন্ন ঘু*ষির কারণে আঙুলের, হাতের কয়েক জায়গায় কেটে র*ক্ত পরছে । রাকিব তৎক্ষনাৎ ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালো দেয়ালে। সাদা রঙের দেয়ালের কিছুটা অংশ বেড়ে র*ক্ত গড়িয়ে পরেছে ফ্লোরে। রাকিব আঁতকে উঠে, একপ্রকার চিৎকার দিয়ে বললো, “রাসেল ফাস্ট এইড বক্স বের কর

তাড়াতাড়ি। ” আবির এখনও জোর করছে চেয়ার থেকে উঠার। কিন্তু রাকিব আবিরের পেট বরাবর শক্ত করে ঝাপ্টে ধরে পীতাভ কণ্ঠে আর্তনাদ করে উঠলো। তপ্ত স্বরে শুধালো, “কি হয়ছে তোর? এমন করছিস কেন আবির?” আবির সহসা চিৎকার দিয়ে বললো, “ছাড় আমাকে!” আবিরের রুষ্ট কণ্ঠের চিৎকারে কিছুটা নড়ে উঠলো রাকিব কিন্তু তারপরও ছাড়লো না। পুনরায় শান্ত কণ্ঠে বললো, “কেনো পাগলামি করছিস আবির? রা*গটা একটু কমা প্লিজ। কি হয়েছে বল আমায়!” আবির দ্বিতীয় বার চেয়ার থেকে উঠার চেষ্টা করে কিন্তু এবার রাকিব আর একটু শক্ত করে আবিরকে চেপে ধরে। নিরেট কণ্ঠে বললো, “মাথা ঠান্ডা কর আবির। ” আবির ব্যর্থ হয়ে বসে পরলো চেয়ারে। আবিরের র*ক্তবর্ণের চোখ বেড়ে গরিয়ে পরলো ক্রো*ধ মিশ্রিত এক ফোটা জল। রাসেল ফাস্ট এইড বক্স নিয়ে আসছে। দরজায় দাঁড়ানো দু একজন প্রশ্ন করছে, “কি হয়ছে স্যার?” “কি হয়েছে স্যারের?” “কোনো সমস্যা, স্যার?” আবির তাদের প্রশ্নে বিরক্ত হয়ে অগ্নিদৃষ্টিতে চাইলো। সঙ্গে সঙ্গে নিরব হয়ে গেলো জনতা। রাকিব রাসেলের দিকে চেয়ে শান্ত কণ্ঠে বললো, “তুই সবাইকে নিয়ে ঐদিকে যা। আমি আছি আবিরের কাছে। ” রাসেল চিন্তিত স্বরে বললো, “কোনো প্রয়োজন হলে ডাকিস আমায়” রাকিব শুধু মাথা দুলালো। রাসেল ১ সেকেন্ড দেরি না করে সবাইকে নিয়ে যার যার কাজে চলে গেলো। আবির চলন্ত ফ্যানের দিকে মুখ তুলে চেয়ে আছে। সবাই চলে যাওয়ার পর রাকিব গম্ভীর কণ্ঠে বললো, “দেখ হাতটার কি

অবস্থা করেছিস!” আবির এক পলক হাতের দিকে চেয়ে ক্রো*ধিত কণ্ঠে বললো, “আমি মস্ত বড় ভুল অপরাধ করে ফেলছি রাকিব, সেই অপরাধের কাছে আমার হাত কিছুই না। ” রাকিব কিছুটা চিন্তিত কণ্ঠে বললো, “কি হয়ছে? কি করছিস তুই?” আবিরের কণ্ঠস্বর ভিজে আসছে, পুনরায় দুফোঁটা পানি গরিয়ে পরলো গাল বেয়ে, শীতল কণ্ঠে জবাব দিলো, “আমি একই ভুল পুনরায় করে ফেলছি। ” রাকিব আঁতকে উঠে শুধালো, “কি...? তুই মেঘকে মেরেছিস? ” আবির দীর্ঘশ্বাস ফেলে শুধু। রাকিবের বুঝতে বাকি নেই যে, আবির মেঘকে মারার ক্রো*ধে নিজেকে আহ*ত করছে। ভ্রু গুটিয়ে রাকিব বললো, “কেনো মেরেছিস? ” দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে আবির বললো, “আমায় জান্নাতের সাথে কথা বলতে দেখে মেঘের মাথায় র*ক্ত উঠে গেছে। যা তা উল্টা পাল্টা বলা শুরু করছে। আমি রাগ কন্ট্রোল করতে পারি নি। ” “কি বলছিস আবির! জান্নাতের জন্য তুই মেঘকে মারলি?” অবাক চোখে তাকিয়ে আছে রাকিব। “আমি মেঘকে মারতে চাই নি বিশ্বাস কর। ও একপর্যায়ে প্রশ্ন করে বসলো আমি জান্নাতকে ভালোবাসি কি না। এই কথাটা সহ্য করতে পারি নি। ” রাকিব তপ্ত দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো। আবির বাম হাত দিয়ে কপাল থেকে চুল গুলো সরিয়ে মনোক*ষ্টে শুধালো, “আমি এখন কি করবো রাকিব? ” রাকিব দীর্ঘশ্বাস ফেলছে বার বার। কিছুটা ভেবে বললো, “দেখ, এখন তো মেঘ আগের মতো নেই। এখন তো মেঘও তোর প্রতি পসেসিভ, এজন্যই তো আজকে এভাবে রিয়েক্ট করেছে। আমার মনে হয় না যে

এই থাপ্পড়ের জন্য ও কথা বন্ধ করবে। ” আবির খরখরে কণ্ঠে উত্তর দিলো, ” তুই তো জানিস, মেঘ খুব জে*দি। এটায় আমার একমাত্র ভ*য়ের কারণ। ও যদি একবার জে*দ করে বলে,আমার সাথে কথা বলবে না তাহলে এই জীবনে আর কোনোদিন ও কথা বলবে না। ” রাকিব কপাল গুটিয়ে প্রশ্ন করলো “বাই দ্য ওয়ে, কয়টা থা*প্পড় দিছিস?” আবির তপ্ত স্বরে বললো, “১ টা” রাকিব স্বাভাবিক কণ্ঠে বললো, “তুই চিন্তা করিস না। কিছু হবে না। জান্নাত কে নিয়ে কিছু ভাবছিস? মেঘ কি আর পড়তে চাইবে ওর কাছে?” আবির গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দিলো, “দুদিন পর পর ওর জন্য টিচার কোথা থেকে খোঁজবো আমি। ওকে জান্নাতের কাছেই পড়তে হবে। ” রাকিব কোমল কণ্ঠে বললো, “আচ্ছা, সেসব পরে দেখা যাবে। এখন চল হাসপাতালে যাই একটু!” আবির তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে বললো, “হাসপাতালে যাব কেন?” রাকিব স্বাভাবিক কণ্ঠে বললো, “এতটা কেটেছে। কোনো সমস্যা হয় যদি। ডাক্তার দেখালে ভালো হয়তো না?” আবির সঙ্কটজনক স্বরে উত্তর দিলো, “এটা আমার শাস্তি। ” রাকিব খুব ভালো করে জানে আবিরকে জো*র করলে কোনো লাভ হবে না। তাই আর জো*র করে নি। রাকিব চিন্তিত স্বরে বললো, “এখন কি বাসায় যাবি? দিয়ে আসবো তোকে?” আবির একপলক তাকালো দেয়ালে লাগানো ঘড়ির দিকে। ১০ টা বাজতেছে। গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দিলেন, “কি করবো বুঝতে পারছি না। মেঘের মুখোমুখি হওয়ার মতো সা*হস পাচ্ছি না আমি। ” রাকিব জানালার দিকে চেয়ে বললো, “বাহিরে তো বৃষ্টি।

একটু ওয়েট কর তাহলে। বৃষ্টি কমলে আমি দিয়ে আসবো নে। ”
আবির পকেট থেকে ফোন বের করে তানভির কে কল করলো।
প্রথমবারেই রিসিভ হলো কল। তানভির কল রিসিভ করে সালাম
দিলো, আবির সালামের উত্তর দিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন,
“কোথায় তুই?” তানভির স্বাভাবিক ভাবে উত্তর দিলো, “আমি তো
পার্টি অফিসে। কেনো ভাইয়া?” আবির নিরেট কণ্ঠে জবাব দিলো,
“এমনি। ” তানভির চিন্তিত স্বরে বললো, “কোনো সমস্যা ভাইয়া?
তোমার কণ্ঠ এমন শুনাচ্ছে কেনো?” আবির গলা খাঁকারি দিয়ে কিছুটা
স্বাভাবিক কণ্ঠে বললো, “কোনো সমস্যা নেই। তুই কাজ কর।
রাখছি। ” কল কেটে মোবাইল পকেটে রেখে বাম হাত কপালের উপর
রেখে চেয়ারে হেলান দিলো। রাকিবও আর কিছু বললো না। চুপচাপ
রুম থেকে বেরিয়ে গেলো। এদিকে মেঘ কিছুক্ষণ আয়নার সামনে
নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকে। বাহিরে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে সাথে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি
পড়ছে। বারান্দার দরজা দিয়ে আসা শীতল হাওয়ায় কেঁপে উঠলো
অষ্টাদশী। আয়না থেকে দৃষ্টি সরিয়ে বেলকনির দিকে তাকালো।
ধীরগতিতে হেঁটে গেলো বেলকনিতে। গ্রিলে ধরে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে
আছে দূরের ল্যামপোস্টের আলোর দিকে।ক্ষণে ক্ষণে বৃষ্টির মাত্রা
বাড়ছে। বাতাসের সাথে বৃষ্টির ছিটে ফোটা পরছে মেঘের চোখে মুখে।
আজ আর হাত বাড়িয়ে বৃষ্টি ছুঁয়ার চেষ্টা করে নি অষ্টাদশী।
বেশকিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো বেলকনিতে। হঠাৎ ভেতরটা ছটফটিয়ে
উঠে। নিজের ভেতরে থাকা এক আকাশ সম অভিযোগ কাউকে বলতে

ইচ্ছে করছে মেঘের। বৃষ্টির পানি আপন গতিতে পৃথিবীর বুকে লুটিয়ে পরছে। তা দেখে মেঘেরও ইচ্ছে করছে মনের মধ্যে পুষে রাখা চাপা কথাগুলো খোলা আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে সৃষ্টি কর্তাকে জানাতে। কষ্ট শেয়ার করলে নাকি মন হালকা হয় । যেই অষ্টাদশী গত ১৭ বছরে রাতের বেলা একা ছাদে যায় নি সেই অষ্টাদশী আজ রাত ৯ টার পর একা ছাদে চলে গেছে। ছাদে পা দিতেই ভারি বর্ষণে কয়েক সেকেন্ডে ভিজে যায় অষ্টাদশীর সর্বাঙ্গ। হাতখোপা করা চুলগুলো খুলে যায় সহসা। বৃষ্টির পানি তোপে ধীরে ধীরে কোমড় ছাড়িয়ে নিচে নামতে থাকে চুল। মেঘ আশেপাশে তাকাচ্ছে । দূর-দূরান্তের উঁচু উঁচু বিল্ডিং এর ছাদ থেকে হালকা আলো ভেসে আসছে মেঘদের ছাদে। লাইটের আলোর প্রভাবে গাছভর্তি ছাদের এদিক সেদিক গাছের ছায়া পরে আছে। কিছু কিছু জায়গা দেখে মনে হচ্ছে ভূ*তেরা বসে মিটিং করছে। মেঘের দৃষ্টি সেদিকে পরতেই কিছুটা কেঁপে উঠে। তবে ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকানোতে বুঝতে পারে এগুলো গাছের ছায়া। বিদ্যু চমকানোর সঙ্গে সঙ্গে মেঘও সম্পূর্ণ ছাদে হাঁটছে। হাঁটতে হাঁটতে ছাদের একপাশে রাখা বেতের সোফাগুলোর একটাতে বসে পরলো। হেলান দিয়ে বসাতে চুলের কম অর্ধেক টা অংশ ছাদের ফ্লোরে পরে আছে। মেঘ আকাশের পানে তাকিয়ে বলা শুরু করলো, “আল্লাহ! আমার জীবনে তো হি*টলার স্বভাবের ব্যক্তির কোনো অস্তিত্ব ছিলো না। তাহলে কেনো তুমি ওনাকে আমার সামনে নিয়ে আসলে?এই অনুভূতিহীন মানুষটা কেনো আমার জীবনের সাথে জরিয়েছে? ওনি

যদি অন্য কাউকেই ভালোবাসেন, তাহলে আমায় কেনো ওনার প্রতি দূর্বল বানিয়েছো? আমি এখন কি করবো?” একসাথে প্রশ্নগুলো করে কয়েক মুহুর্ত নিরব থাকে। অক্ষি পল্লব বেয়ে অনর্গল নোনাজল গড়িয়ে পরছে, তার সাথে বৃষ্টি পানি মিশে কানের নিচ দিয়ে যাচ্ছে আপন গতিতে। বেশখানিকটা সময় নিরব থেকে শীতল কন্ঠে শুধালো, “আমি কি কখনো কারো প্রিয় হতে পারবো না?”বেশখানিকটা সময় মেঘ নিস্তব্ধ হয়ে বসে রইলো। মনের যত কষ্ট, ক্ষো*ভ, অপ্রাপ্তি ছিলো সবই প্রকাশ করলো আপন মনে। ঘন্টাখানেক বসার পর সোফা থেকে উঠে হাঁটতে শুরু করলো। একপাশে রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আপন মনে গুনগুন করে গান গাইছে, “আমি কি তোমায় খুব বিরক্ত করছি বলে দিতে পারো তা আমায় হয়তো আমার কোনো প্রয়োজন নেই তবুও লেগে থাকি একটা কোণায় তুমি বলে দিতে পারো তা আমায় চিঠি লিখবো না এই ঠিকানায় আমার ও তো মন ভাঙে চোখে জল আসে আর অভিমান আমার ও তো হয়। অভিমান আমার ও তো হয়” অন্য দিকে আবির এখনও চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আছে। ১১ টার দিকে মালিহা খান কল করলেন, আবির কল রিসিভ করে সালাম দিলো। মালিহা খান সালামের উত্তর দিয়ে কিছুটা তপ্ত স্বরে বললেন, “তুই কি বাসায় আসবি না?” আবির স্বাভাবিক কন্ঠে বললো, “আসবো একটু পর। কেনো?” রাগান্বিত কন্ঠে মালিহা খান বলে উঠলেন, “তোরা ভাই বোন মিলে কি শুরু করছিস? তুই বাহিরে বাহিরে থাকিস, তানভির নির্বাচনের ভেজালে ১২ টার আগে বাসায় ই ফিরতে পারে না। এদিকে

তোর বোনের এক- দু'দিন পর পর কি হয়ে যায়,খায় না কিছু না। তোরা যদি রাতে না ই খাবি তাহলে বলে রাখতে পারিস না! আমরাও তোদের জন্য আর রান্না করবো না । " আবির হেলান থেকে উঠে মেরুদণ্ড সোজা করে বসলো, নিরেট কণ্ঠে শুধালো, "মেঘ খায় নি?" মালিহা খান সহসা উত্তর দিলেন, "না" আবির গম্ভীর কণ্ঠে বললো, "তুমি শুয়ে পরো আমি আসছি। " আর কিছু না বলেই উঠে পরলেন। আবিরকে রুম থেকে বের হতে দেখে রাকিব আর রাসেল দুজনই ছুটে আসে। অন্যান্য দিন কাজ শেষ করে ১০-১০.৩০ এর মধ্যেই চলে যায় সকলে। কিন্তু আজ আবিরের মুড অফ দেখে তারা কাজ শেষ করেও বসে আছে। আবিরকে কিছু বলার সাহসও পাচ্ছিলো না। রাকিব স্বাভাবিক কণ্ঠে বললো, "চল আমি তোকে দিয়ে আসি। " আবির শক্ত কণ্ঠে জবাব দিলো, "আমি একা যেতে পারবো। " রাকিব পুনরায় বলে উঠলো, "তোর হাতের অবস্থা দেখছিস তুই? এই অবস্থায় বাইক চালালে তো এক্সিডেন্ট করবি। তার থেকে আমার কথা মান, আমি দিয়ে আসি তোকে। " আবির শক্ত দৃষ্টিতে তাকালো রাকিবের দিকে, দাঁতে দাঁত চেপে ঘোষণা করলো, "বললাম তো যেতে পারবো। " রাসেল ঠান্ডা কণ্ঠে বললো, "এত বৃষ্টিতে বাইক নিয়ে যেতে পারবি?" আবির আর কিছুই বললো না। বড় বড় পা ফেলে অফিস থেকে বেরিয়ে গেলো। টানা ২ ঘন্টার উপরে ভারী বর্ষণ হচ্ছে, যার ফলে ঢাকার রাস্তাঘাটে পানি জমে একাকার অবস্থা। মাথায় হেলমেট পর্যন্ত নেই, চোখ মেলে দেখার অবস্থা নেই তবুও বাইক থামছে না এক

সেকেন্ডের জন্য। বৃষ্টির পানি এতটায় ঠান্ডা, মনে হচ্ছে ফ্রিজ থেকে বের করে বরফের পানি ঢালছে কেউ । আপাদমস্তক ভিজিয়ে বাড়িতে ঢুকলো আবির।। ড্রয়িং রুমে কেউ নেই, সিঁড়ি দিয়ে উঠে সোজা নিজের রুমের দিকে হাঁটে। ৫ মিনিটে ফ্রেশ হয়ে একটা ধূসর রঙের টিশার্ট আর টাওজার পরে রুম থেকে বের হয়। সঙ্গে সঙ্গে হাঁটা দেয় মেঘের রুমের দিকে, মেঘের দরজার সামনে এসেই বামহাতে দরজা ধাক্কা দিলো। অনবরত ঘু*ষির কারণে ডান হাতে তেমন শক্তি পাচ্ছে না, তারপর আবার হাতের উপর জোর দিয়ে বাইক চালিয়ে এসেছে। দরজা খুলতেই চোখ পরে ফাঁকা বিছানায়, কেনো জানি বুকটা ছ্যাঁত করে উঠলো। ভিতরের দিকে দেখার চেষ্টা করলো, টেবিলের উপর ফোন,ল্যাপটপ পরে আছে, কিন্তু অষ্টাদশী কোথাও নেই। আবির রুমে ঢুকে বারান্দা সহ সব জায়গায় খোঁজলো কোথাও নেই। রুম থেকে বেরিয়ে সারা বাড়িতে চক্কর দিলো তবে কোথাও মেঘকে পেলো না । মীমের রুমের সামনে দাঁড়িয়ে আস্তে করে ডাকলো, সঙ্গে সঙ্গে মীম দরজা খুললো। এক গাল হেসে বললো, “ভাইয়া কিছু বলবেন?” আবির উদ্বিগ্ন কন্ঠে শুধালো, “মেঘ কোথায়?” মীম স্বাভাবিক ভাবেই উত্তর দিলো, “আপু তো রুমেই। সেই যে খাবে না বলে রুমে গেলো আর তো বের ই হতে দেখি নি। ” আবিরের চোখে মুখে চিন্তার ছাপ পরলো, গম্ভীর কন্ঠে শুধু বললো, “ঠিক আছে ” আবির আবারও মেঘের রুমে গেলো, সব জায়গা পুনরায় দেখলো কোথাও নেই। মাথা গরম হয়ে যাচ্ছে আবিরের। চোখে মুখে উদ্বেগের মাত্রা বাড়ছে। রুম

থেকে বের হয়ে নিজের রুমের দিকে যাচ্ছে, ফোন রেখে এসেছে নিজের রুমে। হঠাৎ চোখ পরে সিঁড়ির দিকে। মনের অজান্তেই বলে উঠে, “ও ছাদে যায় নি তো?” কোনো কিছু না ভেবে ছুটে যায় ছাঁদের দিকে। ছাদের দরজা বাতাসে একবার খুলছে, একবার বন্ধ হচ্ছে । আবির দরজা ধাক্কা দিয়ে ঘাড় ডানে বামে ঘুরিয়ে ছাদ দেখার চেষ্টা করছে। ভারী বর্ষণের ফলে ছাদেও পানি জমে আছে অনেকটা, পাইপ দিয়ে গিয়েও যেনো কুলাতে পারছে না সাথে বৃষ্টির ছিটে ফোটা পরছে আবিরের শরীরে। কোথাও কাউকে চোখে পরছে না। আবির বৃষ্টির মধ্যে পা বাড়ালো ছাদে, কিছুক্ষণ পরপর বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। আবির ছাদের চারপাশ দেখছে ঘুরে ফিরে। হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকানোতে আবিরের দৃষ্টিতে পরে, রেলিং ঘেঁষে ছাদের ফ্লোরে পরে আছে অষ্টাদশী । ছাদের সাইড দিয়ে যাওয়া পাইপের উপরে পরে আছে মাথা শরীরের বাকি অংশ ছাদের ফ্লোরে জমা পানির মধ্যে পরে আছে। আবির অকস্মাৎ চিৎকার দিয়ে উঠলো, “মেঘ.....” এক মুহুর্তে দৌড়ে গেলো মেঘের কাছে। অজ্ঞান হয়ে পরে আছে আবিরের প্রণয়িনী । আবিরের হাত কাঁপছে তবুও ঝাপটে ধরলো মেঘের পিট বরাবর, সহসা অষ্টাদশীর ঘাড় থেকে মাথা পর্যন্ত আঁকড়ে ধরলো নিজের প্রশস্ত বুকে । মেঘের শরীর বরফের ন্যায় শীতল হয়ে আছে, শুধু মাথাটা একটু একটু গরম। আবির কয়েকবার আকুল স্বরে মেঘকে ডাকলো, কিন্তু মেঘ নিস্তেজ হয়ে পরে আছে। মেঘের এই অবস্থা দেখে আবিরের সমগ্র পৃথিবী ঘুরছে। বৃষ্টির পানি বরাবর ই মানুষের উপকারে আসে। সাধারণত

বৃষ্টিতে ভিজলে কেউ বেহুঁশ হয় না তবে যদি সেই মানুষটা অতিরিক্ত চিন্তা বা মানসিক চাপে থাকে তবে শরীরের তাপমাত্রা কমে একটা সময় অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে। মেঘের ক্ষেত্রে ঠিক এই ঘটনাটায় ঘটেছে। এক আকাশ অভিমান জমে ছিল মনে তার প্রতিফলন ঘটলো এইভাবে। আবির সহসা দু' হাতে কোলে তুলে নিলো মেঘকে, সিঁড়ি দিয়ে হাঁটছে ঠিকই কিন্তু দৃষ্টি তার অষ্টাদশীর মলিন মুখের পানে।আবিরের চোখ বেয়ে দুফোঁটা অশ্রু গরিয়ে পরলো অষ্টাদশীর গালে। দুজনের শরীর বেয়ে অঝরে পানি পরছে। দীর্ঘ পা ফেলে করিডোর দিয়ে হেঁটে মেঘের রুমে ঢুকলো। ফ্লোরে বিছানার সাথে হেলান দিয়ে মেঘকে বসিয়ে দিলো। টাওয়েল এনে হাত মুখ আর মাথাটা কিছুটা মুছে দিলো। সঙ্গে সঙ্গে রুম থেকে বের হয়ে নিজের রুমে গিয়ে বাইকের চাবি আর হেলমেট নিয়ে ছুটে গেলো নিচে। হালিমা খানের দরজার সামনে ভেজা শরীর নিয়ে দাঁড়িয়ে ডাকছে। ২ বার ডাকার পরই হালিমা খান দরজা খুললেন, আবিরের জলসিক্ত শরীর দেখে চিন্তিত স্বরে শুধালেন, "ভিজে আসছিস?" আবির তপ্ত স্বরে বললো, "মামনি তুমি একটু মেঘের রুমে যাও, ওর অবস্থা ভালো না, আপাতত বাড়ির মানুষকে ডেকো না, আমি ডাক্তার নিয়ে আসছি " একদমে কথাগুলো বললো আবির, হালিমা খান আঁতকে উঠে বললেন, "কি হয়ছে?" আবির চলে যেতে নিয়ে দ্বিতীয় বার ঘাড় ঘুরিয়ে বললো, "আর হ্যাঁ। ওর শরীরটা একটু ধৌয়ে দিও। " আবির ছুটলো দরজার দিকে। হালিমা খান দ্রুত পায়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে ব্যস্ত হলেন, চোখে

তার পানি টলমল করছে। একমাত্র মেয়ে বলে কথা, মেয়ের মুখ গোমড়া থাকলেই যেখানে চিন্তায় পরে যান হালিমা খান, সেখানে মেয়ে অসুস্থ মানে হালিমা খানের মাথায় আকাশ ভে*ঙে পরা।। ২০ মিনিটের মধ্যে আবির ডাক্তার নিয়ে চলে আসছে। ডাক্তারকে রেনকোট দিয়েছে ঠিক ই কিন্তু আবিরের সর্বাঙ্গ ভেজা। মেঘের রুমের সামনে দাঁড়িয়ে গলা খাঁকারি দিলো আবির, নরম স্বরে বললো, "আসবো?" হালিমা খান কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে বললেন, "আয়" আবির ঢুকলো আবিরের পিছনে ডাক্তার ও মেঘের রুমে ঢুকলো। আবিরের গা থেকে পানি পরছে ফ্লোরে কিন্তু সেদিকে তার ভ্রুক্ষেপ নেই। তার দৃষ্টি অষ্টাদশীর মুখের পানে। ডাক্তার ১০ সেকেন্ড মেঘকে দেখলো কি না, আবির উদ্বিগ্ন কণ্ঠে শুধালো, "ওর কিছু হবে না তো?" ডাক্তার স্বাভাবিক কণ্ঠে বললেন, "তেমন কোনো সমস্যা নেই। বেশিক্ষণ বৃষ্টিতে ভিজেছে মনে হয়। তাছাড়াও হয়তো কোনো মানসিক চাপে আছে তারজন্য এমনটা হয়েছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই জ্ঞান ফিরে আসবে। আমি কিছু মেডিসিন লিখে দিচ্ছি জ্ঞান ফিরলে খাইয়ে দিও। যদি জ্ঞান না ফিরে তাহলে পরবর্তীতে জানিয়ো একটা স্যালাইন করতে হবে। জ্ঞান ফিরলেও কিছুদিন একটু রেস্টে রাখবা, কোনো প্রকার মানসিক চাপ দিও না। " ডাক্তার প্রেসক্রিপশন লিখে আবিরের হাতে দিলো। আবির ঔষধ গুলোর নাম পড়ে টেবিলের উপর প্রেসক্রিপশন রেখে ডাক্তারকে নিয়ে বেরিয়ে গেলো। ভেজা শরীরে পুনরায় বাইক দিয়ে ডাক্তারকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে ঔষধ গুলো কিনে নিয়ে আসলো। নিজের রুমে গিয়ে ১

মিনিটে ড্রেস পাল্টে শুকনো কাপড় পড়ে মেঘের রুমে আসছে। মেঘ তখনও অজ্ঞান অবস্থায় শুয়ে আছে। হালিমা খান মেঘের হাতে পায়ে তেল মালিশ করে দিচ্ছেন, কান্না করছেন আর বারবার মেঘকে ডাকছেন। মেঘের মাথার নিচে একটা টাওয়েল দিয়ে রেখেছেন। আবির ঔষধ গুলো টেবিলের উপর রেখে, মেঘের ওয়ারড্রবের একটা ড্রয়ার খুললো, এটাতে জামাকাপড়, দ্বিতীয় ড্রয়ার খুলতেই চোখে পরলো সকল ইলেক্ট্রনিক জিনিসপত্র। সেখান থেকে হেয়ার ড্রায়ার বের করে নিলো আবির। মেঘের কাছে দাঁড়িয়ে হালিমা খানকে বললেন, “” মামনি তুমি ওকে একটু ধরে বসো। ” আবির নিজেই হেয়ার ড্রায়ার ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চুল শুকাচ্ছে মেঘের । কোমড় ছাড়ানো চুল গুলো ভাগ ভাগ করে শুকাতে কিছুটা সময় লাগলো। পুনরায় মেঘকে শুইয়ে হাতে পায়ে তেল মালিশ করতে লাগলো দুজনে। হালিমা খান আবিরকে শীতল কণ্ঠে বললেন, “বাবা, তুই একটু বস আমি তোর চাচ্চুকে বলে আসি। মাঝরাতে ঘুম ভাঙলে তো ওনি আবার চিন্তায় পরে যাবেন। ” আবির গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, “মেঘের এই অবস্থার কথা বলো না। শুধু শুধু চিন্তা করে শরীর খারাপ হবে। ” হালিমা খান “ঠিক আছে ” বলে চলে গেলেন। হালিমা খান রুম থেকে বেরিয়ে যেতেই আবির মেঘের সন্নিকটে বসলো, মেঘের বাম হাত আবিরের বুকের সাথে মিশিয়ে , ওষ্ঠ এগিয়ে নিলো মেঘের কানের কাছে, গুনগুন করে বললো, “” Main sirf tera rahunga Tujhse hai waada yeh mera Tu maang le muskura ke Mera pyar haq hai tera”” তারপর

অষ্টাদশীর কপালে আলতোভাবে একটা চুমু দিয়েই বিছানা থেকে উঠে পরলো। চেয়ার টেনে বসলো বিছানার পাশে তারপর হাতে তেল নিয়ে মালিশ করতে লাগলো মেঘের হাতে। কিছুক্ষণের মধ্যেই হালিমা খান ফিরে আসলেন। হালিমা খানও মেয়ের ডান হাতে, দুপায়ে মালিশ করে দিচ্ছেন আর একটু পর পর মেঘকে ডাকছেন, বেশ খানিকক্ষণ পর মেঘের জ্ঞান ফিরেছে। সঙ্গে সঙ্গে আবির মেঘের হাত ছেড়ে দিয়েছে। হালিমা খান কান্না করতে করতে মেঘকে ডাকছে, "মেঘ, এই মেঘ, কি হয়েছে তোর?" মেঘ কয়েকবার পিটপিট করে চাইলো মায়ের দিকে, বুঝে উঠতে পারছে না তার সাথে এতক্ষণ কি ঘটেছে। মায়ের প্রশ্নের উত্তর দেয়ার মতো শক্তি তার নেই। চোখ ঘুরিয়ে নিজের অস্তিত্ব বুঝার চেষ্টা করছে। নিজের রুমটা পরখ করতে লাগলো মেঘ,হঠাৎ দৃষ্টি পরে বামপাশে চেয়ারে বসা আবির ভাইয়ের দিকে। মায়াভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মেঘের পানে। মেঘও কয়েক মুহুর্ত তাকিয়ে রইলো আবির ভাইয়ের দিকে। মনে পরতে লাগলো সন্ধ্যার পর থেকে ঘটে যাওয়া ঘটনা গুলো। তৎক্ষনাৎ দৃষ্টি সরিয়ে নিলো আবির ভাইয়ের দিকে থেকে। পুনরায় চোখ বন্ধ করে ফেললো মেঘ । হালিমা খান মেঘের কপালে হাত রেখে আঁতকে উঠলেন, সঙ্গে একবার গলাতেও হাত রাখলেন। সহসা বলে উঠলেন, "মেঘের তো জ্বর উঠতেছে।" আবির গম্ভীর কন্ঠে বললো, "তুমি ওকে উঠাও, আমি খাবার নিয়ে আসছি। ঔষধ খাইয়ে দিলে যদি একটু কমে!" হালিমা খান চিন্তিত স্বরে বললেন, "তানভির কোথায় আছে?" আবির শক্ত কন্ঠে জবাব

দিলো, “ওকে জানিয়েছি, আসতেছে। ” মেঘ নিস্তেজ অবস্থায় শুয়ে আছে। চোখ খুলে আবির ভাইকে দেখার শক্তিটুকু যেনো পাচ্ছে না, কথা বলা তো বহুদূরের বিষয় । আবির নিচে গিয়ে একটা প্লেটে অল্প ভাত আর একটু তরকারি নিয়ে আসলো। হালিমা খান মেঘকে কোনোরকমে উঠিয়ে খাটের সাথে হেলান দিয়ে বসিয়ে নিজে ধরে রেখেছেন। আবির ভাত মাখিয়ে মুখে সামনে ধরে ছোট করে বললো, “হা কর” পুরুষালী কণ্ঠে কিছুটা কেঁপে উঠে মেঘ। তৎক্ষনাৎ ছোট করে হা করলো । আবির ভাই অষ্টাদশীকে নিজের হাতে খাইতে দিচ্ছে কিন্তু অষ্টাদশীর মনের ভেতর আনন্দ নেই, নেই কোনো উত্তেজনা। যেই আবির ভাই তার মনের ভেতর সারাক্ষণ এক্কা দোক্কা খেলতো সেই আবির ভাইকে চোখে মেলে দেখার সাধ্যি তার হচ্ছে না। কয়েক লোকমা ভাত কোনোরকমে গিললো পরের বার দিতে গেলে আসতে করে বামে ডানে ঘাড় ঘুরালো। আবিরও বুঝতে পারলো মেঘের অভিব্যক্তি। জোর করলো না আর। হাত ধৌয়ে নিজের হাতেই মেঘের মুখ মুছে দিলো। তারপর ঔষধ খাইয়ে একবার মেঘের কপালে হাত রাখলো। জ্বরের মাত্রা বাড়ছে। আবির শীতল কণ্ঠে বললো, “মামনি তুমি থাকো ওর কাছে। কোনো সমস্যা হলে আমায় ডেকো, আমি সজাগ আছি। ” আবির প্লেট হাতে নিয়ে চুপচাপ বেড়িয়ে গেলো রুম থেকে। ১০-১৫ মিনিট পর তানভির দৌড়ে বাড়িতে ঢুকে। এমপির গাড়ি করে ড্রাইভার এসে দিয়ে গেছে তানভিরকে। মেঘের রুমে গিয়ে কোমল কণ্ঠে মাকে শুধালো, “কি হয়ছে মেঘের?” মেঘের পাশে বসে

কপালে হাত রাখলো । থার্মোমিটার এনে জ্বর মাপলো ১০০□C+ তাপমাত্রা । মেঘ জ্বরে কাঁপতেছে। তানভির ছুটে গিয়ে নিজের রুমের কেবিনেট থেকে আর একটা কম্বল এনে বোনের গায়ে ছড়িয়ে দিলো। তারপর একটা ছোট রুমাল ভিজিয়ে কিছুক্ষণ জলপট্টি দিলো। হালিমা খান এখনও ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদছেন। তানভির মায়ের দিকে চেয়ে মোলায়েম কণ্ঠে বললো, “ডাক্তার কি বলছে?” হালিমা খান কান্নারত কণ্ঠে বললেন, “”বলছেন সিরিয়াস কোনো সমস্যা না। রেস্ট নিতে আর চিন্তা কম করতে। ঔষধ দিয়ে গেছেন”” “ঔষধ খাওয়ানো হয়ছে?” হালিমা খান কোমল কণ্ঠে বললেন, “হ্যাঁ, আবির খাইয়ে দিয়ে গেছে!” তানভির নমনীয় কণ্ঠে মাকে প্রশ্ন করলো, “ভাইয়া কোথায়?” “কিছুক্ষণ হলো গেলো এখান থেকে। ” তানভির আর কিছু বললো না। চুপচাপ কিছুক্ষণ জলপট্টি দিলো বোনের কপালে। তবে জ্বর কমার কোনো নাম গন্ধ নেই। এদিকে আবির রুমে এসে বেলকনিতে পায়চারি করতে লাগলো। বাহিরে এখনও বৃষ্টি হচ্ছে। মাঝে মাঝে কিছুক্ষণ বিরতি নেয় আর ভারী বর্ষণ শুরু হয়। তাপমাত্রা কম থাকার পরও আবিরের শরীর ঘামছে। স্থির হতে পারছে না কোনোভাবেই। তামাটে চেহারা কুচকুচে কালো বর্ণের হয়ে আছে। দুপুরে খাবার খেয়েছিলো তারপর সন্ধ্যায় শুধু এককাপ কফি খেয়েছে। মধ্যরাত হয়ে গেছে, খায় নি এখনও তাই মুখটা মলিন হয়ে আছে। হাতের অবস্থাও করুন, বাসায় ফেরার পথে ব্যান্ডেজ খুলে ফেলেছিলো। বৃষ্টির পানিতে কাটা অংশ গুলো ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। কিছুক্ষণ পর আবির বড় বড়

পা ফেলে ছাদে চলে গেলো। সম্পূর্ণ শরীর ভিজতে বেশি সময় লাগলো না। ছাদের কর্ণার থেকে সিঙ্গেল সোফা টেনে মাঝ বরাবর রেখে সেখানে বসে পরলো। অসীম দূরত্বে চেয়ে থাকে অনেকটা সময় ধরে। পরপর চোখ বন্ধ করে শ্বাস টেনে নিজেকে প্রশ্ন করলো, “”আমি কি এখন ফিরে ভুল করে ফেললাম?”” আবিরের মনে পরছে পুরোনো স্মৃতি, এক প্রণয়িনীর ২ বছরের নিরবতা কুঁড়ে কুঁড়ে খাচ্ছিলো তাকে। প্রিয়মানুষের উপস্থিতি যেমন বক্ষস্পন্দন বাড়াতে সক্ষম তারথেকেও বেশি কষ্টদায়ক নিজের প্রেয়সিকে গুরুগম্ভীর থাকতে দেখা আর যার কারণ সে নিজেই। একটা সামান্য ভুলের কারণে গতদু’টি বছরে প্রেয়সী তার চোখে চোখ রাখে নি, এক টেবিলে, এক সাথে খেতেও বসে নি। মুখ ফোটে একটা কথা পর্যন্ত বলেনি। এর বেশি সহ্য করার ক্ষমতা একটা ১৮ বছরের যুবকের পক্ষে কখনো সম্ভব ছিল না। প্রেয়সীর প্রতি অনুভূতি তার অতলস্পর্শী বিশালতার সমুদ্রের ন্যায় যা কখনো পরিমাণ করা সম্ভব না। যখন তার সহ্যের সীমা শেষ হতে চললো, তখন তার সামনে দুটি রাস্তা ভেসে উঠেছিল। এক, স্কলারশিপে বিদেশ যাওয়া, দ্বিতীয় হলো ঢাকা ভার্সিটিতে পড়াশোনা। আবির বাড়ির প্রতিটা সদস্যের থেকে মতামত নিয়েছিল সেদিন। এমনকি তার হৃদয়হরনীর কাছেও সেদিন আকুল মিনতি করে জিজ্ঞেস করেছিল সে কি চাই। ছোট্ট হৃদয়হরনীর অভিমানের মাত্রা এতটায় তীব্র ছিল যে সেদিনও আবিরের চোখে চোখ রাখে নি, আবিরের কোনো কথার উত্তর ও দেয় নি। ২ বছর যে ললনার অভিমান ভাঙাতে অক্ষম

সেই ললনার অভিমান কয়েক মাসে ভাঙানো সম্ভব ছিল না। তারপরও আবির শেষ বার যাওয়ার আগে অভিভূতের ন্যায় নিষ্পলক চেয়ে ছিল তার সেই ললনার দিকে, যদি একবার বলতো 'ভাইয়া তুমি যেয়ো না' কিন্তু না শেষদিনও মুখ ফোটে কিছু বলে নি তার প্রেয়সী। আবির পারি জমালো ভিনদেশে, পার্থিব জগতের মাঝে অপার্থিব সৌন্দর্যের অধিকারী তার সেই ছোট্ট ললনাকে ফেলে চলে গিয়েছিল বহুদূর।অতীত_____ আবিরের কাদম্বিনী নুপুর পড়ে চঞ্চল পায়ে সারাক্ষণ খান বাড়িতে ছুটোছুটি করতো অথচ আবির সামনে আসলেই তার পা থেমে যেতো, মুখ লুকাতো মায়ের আঁচলের নিচে। আবির খুব চেষ্টা করেছিলো ললনার অভিমান ভা*ঙানোর কিন্তু সে প্রতিবার ই ব্য*র্থ হয়েছিল । পড়তে গেলে, ঘুমাতে গেলে সেই চঞ্চল পায়ের নুপুরের শব্দ আবিরের হৃ*দয় ভে*ঙে চূ*র্ণবিচূ*র্ণ করতো। যেই ছুটোছুটি, যেই চঞ্চলতা সে নিজের চোখে দেখতে পারে না তার শব্দ কানে আসলে আকাশ ভে*ঙে পরতো মাথায় । তাই খুলিয়ে নিয়েছিল মেঘের পায়ের নুপুর । দেশছেড়ে যাওয়ার কিছুদিন পূর্বে, তানভিরকে জরিয়ে ধরে দুবছরের জমাটবদ্ধ নীল পাহাড় ভে*ঙে অঝরে কেঁ*দেছিল আবির । বোধশক্তি হওয়ার পর সেটায় ছিল আবিরের প্রথম কান্না। লোকে বলে পুরুষ মানুষের কাঁ*দা নিষে*ধ, কা*ন্না এলেও কাঁদা যাবে না । চাপিয়ে রাখতে হবে তা মনের গহীনে। কিন্তু যখন জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান জিনিসটা হারিয়ে যায় বা নিজের থেকেও প্রিয় ব্যক্তির সাথে দূরত্ব বেড়ে যায় তখন পুরুষ মানুষ

চাইলেও নিজেকে শক্ত রেখে, অনুভূতি চেপে রাখতে পারে না। তানভির আবিরের সেই ম*রা কান্না দেখে বিস্ময়কর চোখে তাকিয়ে ছিল, কয়েক মুহুর্ত পর আবিরকে জরিয়ে ধরে কয়েকশত বার শুধু জিজ্ঞেস করেছিল, কি হয়েছে? কি হয়েছে ভাইয়া? কাঁদছো কেন? বলো আমায়... কিন্তু বাঁ*ধহীন কান্নার ফলে আবির কোনো উত্তর ই দিতে পারছিলো না। পরক্ষনেই তানভির উপলব্ধি করেছিল, হয়তো দেশ ছেড়ে, প্রিয়জনদের ছেড়ে চলে যাবে তাই এভাবে কাঁদছে। সে আর প্রশ্ন করে নি,চুপচাপ ভাইয়ের কান্নার গভীরতা মাপতে ব্য*স্ত হয়েছিল আবিরের সেই ক্র*ন্দন স্থির হয়েছিল প্রায় ১ ঘন্টা।কা*ন্নার মাত্রা কিছুটা কমার পর তানভির ধীর কন্ঠে শুধিয়েছিল, "কি হয়েছে ভাইয়া? এভাবে কাঁদছো কেনো?" আবির কা*ন্নারত কন্ঠে শুধু বলেছিল, "আমি ওকে ছেড়ে এতদূর কিভাবে থাকবো?" গভীর রাত, শান্ত, নিস্তব্ধ একটা পরিবেশে আবিরের এই কথাটা তানভিরের হৃ*দয়ে গিয়ে লেগেছিল। তানভিরের বয়স তখন সবেমাত্র ১৬ তে পরেছে। এতকিছু না বুঝলেও ভাইয়ের কথাটার মানে সে স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিল। তানভির ছোট করে প্রশ্ন করেছিল, "কে সে?" আবির তখনও অ*ঝরে কেঁ*দেই চলেছে, গলা খাঁকারি দিয়ে ছোট করে বলেছিল, "মেঘ" তানভির বিমোহিত নয়নে তাকিয়ে ছিল বেশ খানিকক্ষণ । তারপর ভাইকে শান্ত করে, ছাদের ফ্লোরে বসে আবিরের অব্য*ক্ত প্রেমানুভূতি শুনেছিল। তানভিরের কাঁধে ছিল গু*রু দায়িত্ব, একদিকে মায়ের পেটের বোন অন্যদিকে চাচাতো ভাইয়ের নি*র্মল

কা*ন্না । সবকিছু শুনে শেষমেশ তানভির আবিরের চোখ মুছে, মুচকি হেসে শান্ত কণ্ঠে বলেছিল, “তুমি চিন্তা করো না ভাইয়া। আমি আছি তো মেঘকে দেখে রাখার জন্য । তোমার ভালবাসা তোমার ই থাকবে। ” সেই রাতে একফোঁটাও ঘুমাই নি দুভাই। সারারাত জেগে শুধু মেঘকে নিয়েই অধিবেশন করেছিল । এমনকি দেশ ছেড়ে যাওয়ার দিনও আবির তানভিরকে জরিয়ে ধরে শুধু একটা কথায় বলেছিল, “ওকে দেখে রাখিস, ওর উপর যেনো কেনো আঁচ না পরে। ” আবির দেশ ছাড়ার পর থেকে মেঘকে দেখে রাখার গুরুদায়িত্ব পরেছে তানভিরের উপর। মেঘ কোথায় যায়, কার সাথে মিশে, খাওয়া,পড়াশোনা, স্কুল-কলেজ,টিউশন, পছন্দ -অপছন্দ সবকিছু দেখে রাখা ছিল তানভিরের প্রথম কাজ। শতব্যস্ততার মাঝেও আবির দিনে কমপক্ষে তিনবার করে তানভিরকে কল দিয়ে শুধু মেঘের খোঁজ নিতো। ৭ বছরে এমন একটা দিন কাটে নি যে আবির মেঘের খোঁজ নেয় নি। তবে গত ৭ বছরে মেঘের কোনো ছবি দেখে নি আবির, তানভির অনেকবার বলেছে, পাঠাতেও চেয়েছিল কিন্তু আবিরের এক কথা, বেঁ*চে থাকলে দেশে ফিরেই মেঘকে দেখবে । আবির দেশে ফেয়ার দিন এয়ারপোর্টে আসার পর, তানভির আবিরকে জরিয়ে ধরে কানে কানে বলেছিল, “আজ থেকে আমি রিলাক্স করবো, তোমার বউ তুমি সামলাবে। ” আবির মুচকি হেসে বলেছিল, ” বউকে সামলাতেই তো ৬ মাস আগে ফিরতে হলো।” আবির চেয়েছিল আরও ৬ মাস পর নিজেকে গুছিয়ে একেবারে আসতে কিন্তু হঠাৎ ই অ*নাকা*ঙ্ক্ষিত

ঘটনা ঘটলো যার ফলশ্রু*তিতে ৬ মাস ওয়েট করা আবিরের পক্ষে সম্ভব ছিল না। যেই ছেলের জন্য ছোট্ট কাদম্বিনীর গা*য়ে হা*ত তুলেছিল আবির, যার জন্য তাকে ৯ বছর যাবৎ প্রেয়সীর থেকে দূরে থাকতে হয়েছে সেই জয় নামক ছেলে পুনরায় আবির্ভূত হয়েছিল মেঘের জীবনে। HSC পর মেঘকে যে কোচিং এ ভর্তি করানো হয়েছে সেই কোচিং এ জয়ও ভর্তি হয়েছিল তা তানভির & আবিরের অজানা ছিল। জয় মেঘকে দেখার পর থেকে খুব চেষ্টা করছিল কথা বলার জন্য। কিন্তু কোনোভাবেই সুযোগ হইতেছিল না। কোচিং থেকে আবিরকে তা জানানোর পর, ছেলের ব্যাচ টাইম চেইঞ্জ করে দিতে বলেছিল আবির। তারপর তানভিরও কয়েকদিন মেঘকে কোচিং এ দিয়ে আসছে এবং নিয়ে আসছে । কিন্তু তাতেও কোনো লাভ হয় নি। ঐ ছেলে মেঘের ব্যাচ টাইমের আগে- পরে কোচিং এর সামনে দাঁড়িয়ে থাকতো। আবির তানভিরকে ঐ ছেলে সম্পর্কে খোঁজ নিতে বলে, দিনশেষে জানতে পারে এই ছেলেই ছোটবেলার সেই জয়। এটা জানামাত্র আবিরের মাথায় র*ক্ত উঠে গেছিলো। ইমার্জে*ন্সি ভি*সা ম্যানেজ করে দেশে ফিরেছে। দেশে ফিরেই ৯ বছরের রা*গ,ক্রো*ধ, আ*ক্রো*শ সবটা ঢেলে জয়কে পিটিয়েছিল আবির । বর্তমান _____ তানভির ঘন্টাখানেক মেঘের মাথায় জলপট্টি দিয়েছে কিন্তু জ্বর যেনো কোনোভাবেই কমছে না। হালিমা খান ঘুমিয়ে পরেছিলেন হঠাৎ সজাগ হয়ে তানভিরকে জলপট্টি দিতে দেখে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, “কিরে তুই এখনও এখানে? সেই কখন এসেছিস, খাবি না?” তানভির

ছোট করে বললো, “খিদে নেই। ” হালিমা খান পুনরায় বললেন, “আবিরও মনে হয় খায় নি, দুই ভাই মিলে খেতে যা। ” তৎক্ষনাৎ আবিরের কথা মনে পরলো তানভিরের, বিড়বিড় করে বললো, “এই রে ভাইয়া কোথায় আছে?” সঙ্গে সঙ্গে বসা থেকে উঠে দাঁড়ালো, স্বাভাবিক কণ্ঠে মাকে বললো, ” আম্মু একটু পর পর বনুর জ্বর টা চেক করো, সমস্যা মনে হলে আমায় ডেকো। ” কোনোরকমে কথাগুলো বলে স্প্রীডে বের হলো মেঘের রুম থেকে, এক ছুটে চলে গেলো আবিরের রুমে। কিন্তু আবির রুমের কোথাও নেই, বেলকনিতেও নেই। তানভির রুম থেকে বের হয়ে করিডোর থেকে নিচে দেখলো, নিচেও আবির নেই। তানভির দৌড় দিলো ছাদের দিকে, ছাদের দরজা থেকেই চোখে পরলো আবির সিঙ্গে*ল সোফাতে বসে আকাশের পানে মুখ করে বসে আছে। এক মুহুর্ত দেরি না করে তানভির বৃষ্টির মধ্যেই আবিরের কাছে দৌড়ে গেলো। ছোটাছুটির ফলে তানভিরের শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে, কয়েকবার ঘনঘন শ্বাস ছেড়ে আবিরকে ডাকলো, “ভাইয়া... বৃষ্টির মধ্যে বসে আছো কেন? রুমে চলো!” আবির আকাশের দিকে দৃষ্টি রেখেই শক্ত কণ্ঠে উত্তর দিলো, “তুই রুমে যা। ” তানভির পুনরায় বললো, “প্লিজ ভাইয়া, রুমে চলো। কি পাগলামি শুরু করছো তোমরা?” আবির ক্র*ন্দিত কণ্ঠে জবাব দিলো, “আমার জন্য মেঘের আজ এই অবস্থা। আমার ম*রে যাওয়া উচিত। ” আবিরের অবিদিত কথায় তানভিরের প্রচন্ড রা*গ হলো, রা*গে ফুঁস*তে ফুঁ*সতে বললো, “তোমাদের ম*রতে হবে না আমিই

ম*রে যায় তাতেই তোমাদের শান্তি হবে ” আবির ধ*মকের স্বরে বললো, “তানভির ” তানভির ধীরকণ্ঠে বললো, “আমাকে ধ*মকাচ্ছো কেন। বনু না হয় অবুঝ, পাগলামি করে ফেলছে, তাই বলে তুমি কেনো পাগলামি করছো ভাইয়া? তোমার কি এমন কাজ করা মানাচ্ছে?” একটু থেমে রাশভারি কণ্ঠে পুনরায় বললো, “রাকিব ভাইয়া তোমার অবস্থা দেখে ভয় পেয়ে আমায় কল দিয়েছিল। তুমি যদি স্ট্রং না থাকো তাহলে মেঘকে কে সামলাবে বলো? তুমি তো জানো ভাইয়া, আমার জীবনে মেঘ আর তুমি সবচেয়ে কাছের মানুষ। তোমার বা মেঘের কিছু হলে আমি বাঁ*চতে পারবো না। প্লিজ পা*গলামি করো না। রুমে চলো। ” প্রথম কথা গুলো শক্ত কণ্ঠে বললেও শেষ কথাগুলো বলার সময় তানভিরের গলা ভিজে আসছিলো। আবির যেনো বিগ্রহের ন্যায় বসে আছে। তানভির বেশ কিছুক্ষণ শান্ত কণ্ঠে আবিরকে বুঝিয়ে রুমে নিয়ে গেছে। আবিরকে শাওয়ার নিতে ঢুকিয়ে তানভির ও নিজের রুমে গিয়ে ফ্রেশ হয়ে এসেছে। আবিরের মুখোমুখি তানভির বসেছে। ছাদে অন্ধকার থাকার কারণে আবিরের অভিব্যক্তি বুঝা যায় নি। আবিরের চোখ- মুখ ফুলে আছে, দেখে বুঝায় যাচ্ছে বেশখানিকটা সময় কেঁ*দেছে তারউপর বৃষ্টি । এখনও চোখ টকটকে লাল হয়ে আছে। তানভির আবিরের হাতটা সামনে এনে এপাশ-ওপাশ ঘুরিয়ে দেখলো। হাতের অবস্থা খুব খারাপ। তানভির ঔষধের বক্স থেকে একটা মলম বের করে অল্প অল্প করে লাগিয়ে দিচ্ছে, আবির দাঁতে দাঁত চেপে তা সহ্য করছে। গত ১ ঘন্টা যাবৎ আবিরকে

বুঝিয়ে তানভির রুমে এনেছে, এখন কোনোভাবেই রিয়েক্ট করা যাবে না। তানভির যথেষ্ট শান্ত আর হাস্যোজ্জ্বল একটা ছেলে তবে রা*গ উঠলে কেমন যেন গ*ম্ভীর হয়ে যায়। আবিরের হাতে মলম লাগিয়ে তানভির আস্তে করে বললো, "ব্যান্ডেজ করে দিবো ভাইয়া?" আবির স্বাভাবিক কণ্ঠে জবাব দিলো, "ব্যান্ডেজ লাগবে না। খোলা থাকলে তাড়াতাড়ি ঠিক হবে । " তানভির স্বাভাবিক কণ্ঠে বললো, "ভাইয়া খাবে না?" আবির গ*ম্ভীর কণ্ঠে উত্তর দিলো, "না" তানভির কোমল স্বরে বললো, "প্লিজ ভাইয়া চলো না খেতে যাই।" আবির নিরেট কণ্ঠে জানালো, "আমি খাবো না বললাম তো। তুই খেয়ে নে" তানভির বুঝতে পারলো ভাইকে জোর করে কোনো লাভ হবে না । তাই চুপচাপ রুম থেকে বেরিয়ে চলে গেলো। আবিরের বাকি রাত কাটলো বেলকনিতে দাঁড়িয়ে ধীরে ধীরে ভারী বর্ষণ কমেছে, ঝিরিঝিরি বৃষ্টিও এক সময় কমেছে । ফরজের নামাজ পড়ার জন্য আবির বাসা থেকে বেরিয়ে গেছে ফিরেছে ঘন্টা দুয়েক পর। প্রতিদিন সকাল বেলা নিচে রান্না আর পেপার পড়ার ধুম লাগলেও আজ ড্রয়িংরুম সম্পূর্ণ ফাঁকা। আবির দীর্ঘ পায়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠলো। মেঘের রুমে সবাই হুমড়ি খেয়ে পরেছে। আলী আহমদ খান, মোজাম্মেল খান,ইকবাল খান থেকে শুরু করে বাড়ির তিন কর্তী, এমনকি মীম আদি আর তানভিরও উপস্থিত সেখানে। মেঘ শ*ঙ্কিত হয়ে রইলো। সবাই যেনো একজোটে মেঘের উপর হা*মলা চালাচ্ছে। মেঘ সবার দিকে বার বার তাকাচ্ছে শুধু। মোজাম্মেল খান রাগান্বিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, "বৃষ্টিতে ভিজতে গেছিলি

কেনো? বৃষ্টিতে ভিজলে যে জ্বর উঠবে, সেই বোধশক্তি কি তোর হয় নি এখনও?" ইকবাল খান মোজাম্মেল খানকে শান্ত করতে ব্যস্ত। এরমধ্যে আলী আহমদ খান ধীর কণ্ঠে বলে উঠলেন, " এখন এক মিনিট নষ্ট করা একটা দিন নষ্ট করার সময়। ইচ্ছেকৃত জ্বর বাঁধানো কি ঠিক হয়েছে তোমার?" কথাটা শান্ত স্বরে বললেও এই কথার অভিপ্রায় অষ্টাদশীর বোধগম্য হলো। মালিহা খান, আকলিমা খানও যেনো একজোটে বিলাপ শুরু করেছে । যে যার মতো প্রশ্ন করছে, কোথা থেকে ভিজে আসছিস? কখন গেছিলি? ভিজলি কেনো? আরও কত কত প্রশ্ন ।। মেঘ নির্বাক চোখে শুধু তাকিয়ে আছে। সে কি করে বলবে, "আবির ভাই অন্য কোনো মেয়ের প্রতি কনসার্ন, এইটা সহ্য করতে না পেরে এমনটা করেছে। " হালিমা খান কোমল কণ্ঠে বললেন, "তোর জন্য খাবার নিয়ে আসি মা? অল্প খেয়ে নে প্লিজ!" মেঘ সবার উপরে উঠা রা*গ যেনো মায়ের উপর ঝা*ড়ল, কাঁপা কাঁপা গলায় চিৎকার দিয়ে বললো, "বললাম তো খাবো না, তেঁতো লাগে সবকিছু । " কথাটা ঠিকমতো শেষও করতে পারলো না। আবির হাজির হলো রুমে। মেঘের দৃষ্টি আবিরের দিকে পরতেই অকস্মাৎ কম্বল টানলো কপাল পর্যন্ত । আবির গম্ভীর কণ্ঠে বললো, " এখানে এত ভিড় করার মতো কি হয়েছে? অসুস্থ রোগী দেখতে এসেছো, দেখে চুপচাপ চলে যাবে। রোগীকে এত প্রশ্ন করছো কেন? ডাক্তার বলেছেন, ওরে কোনোপ্রকার চাপ না দিতে। অনুগ্রহ করে ওকে একটু শান্তিতে থাকতে দাও । " একদমে কথাগুলো বললো আবির। ইকবাল

খান ভাতিজার রা*গ বুঝতে পেরে শান্ত কণ্ঠে বললেন, ” না মানে মেঘ জেনে-বুঝে বৃষ্টিতে কেনো ভিজেছে এটায় সবাই জিজ্ঞেস করছিলো। আর কিছু না ” আবির কণ্ঠ দ্বিগুণ ভারি করে বললো, “ওর ইচ্ছে হয়েছে বৃষ্টিতে ভেজার তাই ভিজেছে। তাছাড়া জ্বর হলে মাথা ফ্রেশ হয়। এখন সবাই নাস্তা করতে যাও। ” মেঘ কম্বলের নিচ থেকে ভেঙচি কেটে মনে মনে বললো, “যার জন্য করি চু*রি সেই বলে চো*র।আপনি আমায় বাধ্য করেছেন বৃষ্টিতে ভিজছে আর এখন সবার সামনে সেটা আমার ইচ্ছে বলে চালিয়ে দিচ্ছেন। বাহ হি*টলার বাহ! কি বু*দ্ধি আপনার! ” বাড়ির কেউ কোনো কথা বললো না। চুপচাপ সকলে রুম থেকে বের হতে লাগলো। আবির গম্ভীর কণ্ঠে বললো, “তানভির, মেঘের জন্য নাস্তা নিয়ে আয়। ” হালিমা খানও চলে গেলেন মেঘের নাস্তা রেডি করতে। মেঘ তখনও কপাল পর্যন্ত কম্বল টেনে রেখেছিলো। রুম নিস্তব্ধ হয়ে যাওয়ায় মেঘ ভেবেছে সবাই চলে গেছে। তাই এক আঙুলে আস্তে করে কম্বল টা কপাল থেকে নামাতেই চোখ পড়লো আবির ভাইয়ের শাণিত চোখের দিকে। মেঘ আর আবিরের চোখাচোখি হতেই আবির একটানা দুবার ভ্রু নাচালো। আবির ভাইয়ের এমন কান্ডে মেঘ হেসে ফেললো, তৎক্ষনাৎ মনে পরে গেলো, ও তো আবির ভাইয়ের উপর রে*গে আছে। অকস্মাৎ মুখ গোমড়া করে ফেললো মেঘ। আবির চেয়ার টেনে মেঘের বিছানার পাশে বসে মৃদু কণ্ঠে শুধালো, “এখন কেমন লাগছে? জ্বর কি কমেছে? ” মেঘ ওষ্ঠ উল্টালো কিছুই বললো না। আবির সহসা মেঘের কপালে হাত রাখলো

সাথে একবার গলায় হাত রেখে সঙ্গে সঙ্গে কপাল কুঁচকে হাত সরিয়ে নিলো। তটস্থ হয়ে বললো, “এখনও তো অনেক জ্বর..!! ” বসা থেকে উঠে টেবিল থেকে থার্মোমিটার নিয়ে বিছানায় বসে মেঘের জিহ্বার নিচে ধরলো। মেঘ হা করে তাকিয়ে আছে আবির ভাইয়ের দিকে। আবির কপাল কুঁচকে তাকিয়ে রইলো মেঘের দিকে। দুজনেই নিস্ত*ব্ধ, দুইজোড়া চোখ গভীরভাবে অনুবন্ধী । মেঘের বুকের ভেতর তোলপাড় শুরু হচ্ছে। এরমধ্যে তানভির গলা খাঁকারি দিয়ে রুমে ঢুকলো। তৎক্ষনাৎ দৃষ্টি সরিয়ে নিলো আবির। তানভিরের কণ্ঠ শুনে মেঘও দৃষ্টি সরিয়ে ভাইয়ের দিকে চাইলো। আবির থার্মোমিটার চেক করতে ব্যস্ত হলো, তানভির ভাইয়ের দিকে প্লেট বাড়াতেই মেঘ চোখ গোল গোল করে তাকালো। মনে মনে বললো, “এখনও কি আবির ভাই খাইয়ে দিবেন আমায়?” আবির কোনোদিকে না তাকিয়ে ছোট করে বললো, “তুই খাইয়ে দে। ” তানভির বিস্ময় সমেত তাকালো আবিরের দিকে । আবির তানভিরকে চোখ দিয়ে ইশারা করতেই তানভির স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বললো, “ঠিক আছে আমিই খাইয়ে দিচ্ছি। ” আবির বিছানা থেকে উঠে চেয়ারে বসে আছে। তানভির মেঘকে উঠিয়ে খাওয়ানো শুরু করলো। মেঘ জোর করে অল্প অল্প খাচ্ছে। তানভির মেঘকে এটা সেটা বলে বলে বুঝাচ্ছে আর খাওয়াচ্ছে। আবির যেনো নিরব দর্শক, একবার ফোনের দিকে দেখছে একবার মেঘের খাওয়া দেখছে। কোনোমতে অল্প খেয়ে মেঘ শীতল কণ্ঠে বললো, “আর খাবো না ভাইয়া” তানভিরও আর জোর করলো না। পানির গ্লাস এগিয়ে দিলো

মেঘের দিকে। খাওয়া শেষে পানির গ্লাস টেবিলে রাখতে রাখতে তানভির বলে উঠলো, “ভাইয়া, বনুকে ঔষধ গুলো খাইয়ে দাও প্লিজ । আমি নিচে যাচ্ছি, খুব খুদা লাগছে । ” তানভির রুম থেকে বেরিয়ে নিচে চলে গেছে। আবির ফোন পকেটে রেখে টেবিল থেকে ঔষধ রেডি করে মেঘের দিকে এগিয়ে দিলো। মেঘও মাথা নিচু করে ঔষধ গুলো খেয়ে নিলো। আবির নিরেট কণ্ঠে বললো, “” সাবধানে থাকিস। ”” আবির চলে যেতে নিলে মেঘ আবিরের ডানহাত আঁকড়ে ধরে। সহসা আবির ব্যথায় “উফফ” করে উঠলো। মেঘ সঙ্গে সঙ্গে হাত ছেড়ে দিলো। মেঘ ভেবেছে আবির ভাই হইতো বিরক্ত হয়েছেন মেঘের ছোঁয়াতে। অকস্মাৎ মেঘের মনটা খারাপ হয়ে গেলো। কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে মেঘ বললো, “”আমি ম*রে গেলে আপনি.....”” এতটুকু বলতেই আবির অ*গ্নিদৃষ্টিতে চাইলো অষ্টাদশীর দিকে। মেঘ কথা সম্পন্নও করতে পারলো না। আবির রা*গান্বিত কণ্ঠে বললো, “চুপ। ” আবির দাঁতে দাঁত চেপে পুনরায় বললো, “আর কোনোদিন যদি তোর মুখে এই কথা শুনি তাহলে ঐদিনই তোকে মে*রে বু*ড়িগ*ঙ্গায় ফে*লে দিয়ে আসবো। ” মেঘের ছোট হৃদয়টা আবির ভাইয়ের কথায় আবারও চূ*র্ণবিচূ*র্ণ হলো । একটু রম্য স্বরেও তো বলতে পারতেন, তা না মে*রে ফে*লবেন। মেঘের অক্ষিপট ভিজে আসছে। চিবুক নামিয়ে বিড়বিড় করে বললো, ” এই বাড়ির কেউ আমায় ভালোবাসে না, সবাই শুধু ব*কে। সবার রা*গ ঝাড়ার একমাত্র জায়গা আমি। কেউ কেউ তো আবার গা*য়েও হা*ত তুলেন। ” শেষ কথাটা বলে

আবিরের দিকে তাকালো। পল্লব ঝাপটাতেই গাল বেয়ে অশ্রু গরিয়ে পরলো । আবির অষ্টাদশীর মুখের পানে চেয়ে মনে মনে বললো, “এই কেউ টা তোকে ইচ্ছেকৃত মারতে চাই নি, এটা কি করে বুঝাবো তোকে। এই কেউটা যে নিজের থেকেও বেশি তোকে ভালোবাসে, তোকে মা*রার সাধ্যি কি তার আছে? আমি পারছি না তোকে বুকে জরিয়ে চিৎকার করে বলতে যে, তুই আমার সবকিছু, তোকে ছাড়া আমি নিঃস্ব। ” আবির বিছানার পাশে বসে গলা খাঁকারি দিয়ে তপ্ত স্বরে বললো, “তুই হয়তো জানিস না কারো অলিখিত কাব্য তুই। কারো স্বস্তির নিঃশ্বাস নেয়ার কারণ তুই। তোর ডাগর ডাগর চোখের চাউনীতে কারো বিনাশ নিশ্চিত। তোর অনাদেয় কর্মকান্ডে খুব শীঘ্রই কারো মস্তি*ষ্কে র*ক্তক্ষ*রণ ঘটানোর কারণ হবে। সময় থাকতে সাবধান হয়ে যা মেঘ। ” মেঘ বিস্ময়কর দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো। জ্বরের ঘোরে কথাগুলোর মানে বুঝলো কি না কে জানে। মেঘ কন্ঠ খাদে নামিয়ে বললো, ” কার?” আবির দীর্ঘশ্বাস ফেলে প্রখর স্বরে বললো, “তোর বাবা-মায়ের। ” [নিজের মনের ভাব চাচ্চু আর মামনির উপর চাপিয়ে দিতে বাধ্য হলো আবির।] মেঘ অক্ষি পল্লব ঝাপটে বৃহৎ নয়নে চেয়ে আছে আবিরের দিকে। আবির ঠান্ডা কন্ঠে বললো , “আর কার ভালোবাসা প্রয়োজন তোর? আমার আব্বু যেখানে আমার সাথে প্রয়োজনের বাহিরে কোনো কথা বলে না সেখানে তোর ইচ্ছে- অনিচ্ছা নিয়ে ভাবে, আম্মুর ভালোবাসা আশা করি আমার তোকে বুঝাতে হবে না। কাকামনি- কাকিয়া তো ওদের সন্তানের থেকেও তোকে বেশি

আদর করে। চাচ্চু আর মামনির কথা কি বলবো তোকে, চাচ্চুর আর মামনির খুব শখ ছিল একটা মেয়ে বাবুর। তোর জন্মের পর দুজন খুশিতে এত কান্না করছে যে এলাকার মানুষ ভেবেছিল এই বাড়িতে কেউ মা*রা গেছে। তানভির ছেলে হয়েও এতটা গুরুত্ব পায় নি, যতটা গুরুত্ব তুই চাচ্চু আর মামনির থেকে পাস। তানভিরের জীবনে বাবা-মায়ের পরেই তোর অবস্থান। মীম-আদি তো তোরই ভ*ক্ত । খান বাড়িতে তোর যতটুকু অগ্রাধিকার তা আমাদের কারো নেই। আর কার ভালোবাসা চাস? " একসাথে কথাগুলো বলে আবির থামলো তারপর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললো, "উল্টাপাল্টা কথা ভেবে নিজেকে কষ্ট দেয়া বোকামি ছাড়া কিছুই না । " মেঘ ডাগর ডাগর চোখে তাকিয়ে চিন্তিত কণ্ঠে শুধালো, "আপনার কথা বললেন না কেনো?" মেঘের প্রশ্ন শুনে আবির ঢুক গিলে কপাল কুঁচকালো, তারপর শক্ত কণ্ঠে বললো, "তোর এখন রেস্ট নেয়া প্রয়োজন । " আবির চেয়ার থেকে উঠতে নিলে মেঘ আবিরের ডানহাতের দু আঙুল আঁকড়ে ধরে। সঙ্গে সঙ্গে আবির দাঁতে দাঁত চেপে চোখ বন্ধ করে ফেলে। মেঘ সহসা আবিরের হাতের দিকে চাইলো। আবিরের হাতের কাটা অংশে চাপ পরায় র*ক্ত বের হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে হাত ছেড়ে দেয় মেঘ। মেঘ আর্তনাদ করে বললো, "আবির ভাই আপনার হাত এতটা কেটেছে কিভাবে?" আবির তপ্ত স্বরে শুধু বললো, "এমনি। " আর কিছু না বলে রুম থেকে বেরিয়ে গেলো। মেঘ নির্বাক চোখে তাকিয়ে আবির ভাইয়ের প্র*স্থান দেখলো। মেঘের মনে পরলো মেইন গেইটের পাশের দেয়ালে ঘু*ষি দেয়ার কথা, ধরে

নিলো এর ফলেই আবির ভাইয়ের হাত কে*টেছে। অষ্টাদশী জানতেও পারলো না তাকে থা*প্পড় দেয়ার অপরাধে আবির কতশত ঘু*ষিতে নিজেকে আ*হত করেছে। গতকালের ঘটনাগুলো পরপর মনে হতেই মেঘের নিজের উপর বড্ড রা*গ হলো। আবির ভাইয়ের অনুভূতি জানতে চাওয়ার কি দরকার ছিল।। রা*গে নিজের গালে থা*প্পড় দিতে ইচ্ছে হলো মেঘের। আবির ভাই জান্নাত আপুকে পছন্দ করলে মেঘের ব্যাপারে কোনো অনুভূতি থাকবে না এটায় তো স্বাভাবিক । আবিরের সাথে এই জীবনে কখনো মেঘের সুসম্পর্ক ছিলো বলে মনে পরছে না মেঘের। এই হি*টলার স্বভাবের ব্যক্তির জন্য আজ সে জ্বরে ভুগছে এটা ভাবতেই মাথায় র*ক্ত উঠছে। আবির মেঘের রুম থেকে বেড়িয়ে নিজের রুমে গেলো। একটা তালা নিয়ে ছাদের গেইটে তালা ঝুলিয়ে দিলো। তারপর নাস্তার টেবিলে চলে গেলো। ততক্ষণে নাস্তার টেবিল ফাঁকা হয়ে গেছে। তিন কর্তী রান্নাঘরে কাজ করছে আর এটা সেটা নিয়ে কথা বলছে। আবির রান্নাঘরের সামনে গিয়ে রাশভারি কণ্ঠে বললো, “ছাদের গেইটে তালা দিয়ে দিয়েছি। তোমাদের কারো ছাদে যাওয়ার প্রয়োজন হলে, আমার রুম থেকে চাবি নিয়ে যেও। ”
আকলিমা খান চিন্তিত কণ্ঠে শুধালেন, “মেঘ কি রাতে ছাদে গিয়ে ভিজেছিল ?” আবির উপর নিচ মাথা নাড়লো শুধু । মালিহা খান হালিমা খানের দিকে তাকিয়ে বললেন, “যে মেয়ে ভূ*তে ভ*য় পাই, সন্ধ্যার পর বৃষ্টি হলে কানে আঙুল দিয়ে বসে থাকে সেই মেয়ে এত রাতে ছাদে গেলো কিভাবে?” হালিমা খান নির্বাক চোখে তাকিয়ে

রইলো মালিহা খানের দিকে। এই প্রশ্নের উত্তর ওনার কাছেও নেই। আবির কণ্ঠ দ্বিগুণ ভারি করে বললো, “তোমাদের এসব নিয়ে গবেষণা করতে হবে না। যা হওয়ার হয়েছে। মেঘকে এই বিষয় নিয়ে আর কোনো প্রশ্ন করবা না। ছাদে না যেতে পারলে এমন কান্ডও আর ঘটাতে পারবে না। এই টপিক এখানেই শেষ। ” আবির চুপচাপ নাস্তা করে নিজের রুমে চলে গেছে। তানভিরের সারাদিন কাটলো চায়ের পর চা খেতে খেতে। আবিরের জন্য ঘন্টাখানেক তানভিরকেও বৃষ্টিতে ভিজতে হয়েছিল যার ফলস্বরূপ গলা ব্যথা, সর্দির উপক্রম হয়েছে। বিকেলে আবার এমপির সম্মেলনে যেতে হবে। তাই চা কফি খেয়ে গলা ঠিক রাখছে। দুপুরে খাবার খেয়ে বেড়িয়ে পরেছে সম্মেলনের উদ্দেশ্যে। আবির সারাদিনেও রুম থেকে বের হলো না। ৩ টার দিকে মালিহা খান আদিকে পাঠিয়েছিল ডাকার জন্য। কিন্তু আবির ঘুমাচ্ছে দেখে আদি দরজা থেকেই চুপচাপ চলে আসছে। আরও কিছুক্ষণ পর বাধ্য হয়ে মালিহা খান নিজেই সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেলেন ছেলের রুমে। দরজা থেকে একবার আবিরকে ডাকলো কিন্তু কোনো সাড়া নেই। মালিহা ছেলের কাছে গিয়ে বাহুতে হাত দিতেই আঁতকে উঠলেন। জ্বরে আবিরের গাঁ পু*ড়ে যাচ্ছে। ডানহাত ফু*লে গেছে কনুই পর্যন্ত। মালিহা খান এইযে ছেলেকে ডাকছে, আবির জ্বরের ঘোরে কিছুই বলতে পারছে না। মালিহা খান রুম থেকে বেরিয়ে হাঁকডাক শুরু করলেন। ইকবাল খান সোফায় বসে টিভি দেখছিলেন, ভাবির ডাক শুনে দৌড়ে গেলেন।মেঘ ঘুমাচ্ছিলো হালিমা খান মেঘের মাথায়

জলপট্টি দিচ্ছিলেন। বড় ঝা য়ের আর্তনাদে মেঘের রুম থেকে বেড়িয়ে ছুটে গেলেন আবিরের রুমে। আবিরের মুখমন্ডল অন্ধকার হয়ে আছে। হাতের ব্য*থা সাথে দীর্ঘ সময় বৃষ্টিতে ভেজার ফলে এই দশা হয়েছে।। ইকবাল খান সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার কে কল দিয়েছেন। ঘন্টাখানেক পর পরিস্থিতি শান্ত হলো। আবিরকে ব্যথার ঔষধ খাওয়ানো হয়েছে। মালিহা খান ছেলের মাথায় জলপট্টি দিতে ব্যস্ত হলো। হালিমা খান বেড়িয়ে মেঘের রুমে গেলেন ততক্ষণে মেঘের ঘুম ভে*ঙে গেছে। হালিমা খানের থমথমে চেহারা দেখে মেঘ শঙ্কিত হলো, উদ্বিগ্ন কন্ঠে শুধালো, "কি হয়েছে আম্মু?" হালিমা খান মেয়ের কাছে বসতে বসতে বললেন, "তোরা তিন ভাই বোন মিলে কি শুরু করছিস বল তো?" মেঘ স্বাভাবিক কন্ঠে বললো, "কেনো? কি হয়েছ? " হালিমা খান তপ্ত স্বরে বললেন, "এদিকে তোর অবস্থা খারাপ ওদিকে তানভিরের লাগছে সর্দি । সকাল থেকে চা কফি খেতে খেতে কিছুক্ষণ আগে বের হলো। । এখন আবার আবিরের.. " মেঘ আঁতকে উঠে প্রশ্ন করলো, "কি হয়েছে আবির ভাইয়ের?" হালিমা খান কোমল কন্ঠে বলা শুরু করলেন, "রাত থেকেই তো ছেলেটা দৌড়ের উপর । বৃষ্টিতে ভিজে অফিস থেকে আসছে তারপর তোরে ছাদ থেকে রুমে এনে রেখে ডাক্তার আনতে গেছে আবার ডাক্তার কে দিয়ে ঔষধ নিয়ে আসছে। কিভাবে যেন হাত কাটছে, সেই হাত ফুলে, ব্যথায় এখন জ্বর উঠে গেছে। জ্বরে চোখ খুলতে পারছে না ছেলেটা " মেঘ মায়ের দিকে ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে আছে আর মনে মনে ভাবছে, "আবির ভাই

আমার জন্য এতকিছু করেছে....????”তৎক্ষনাৎ মেঘের অভিব্যক্তি বদলে গেলো, চোয়াল শক্ত হয়ে এলো। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে কপাল কুঁচকালো। মনে মনে বললো, “আমি ওনাকে নিয়ে ভাবছি কেনো? ? ওনাকে নিয়ে ভাবার তো মানুষ আছেই। তাছাড়া ওনি আমায় মে*রেছেন তার শা*স্তি আল্লাহ ওনাকে দিয়েছেন। আমার তো এতে খুশি হওয়ার কথা।” কথাগুলো ভেবেই গাল ফুলালো তারপর মায়ের মলিন মুখের পানে একবার তাকিয়ে আবার মনে মনে বলা শুরু করলো, “যেখানে আম্মু-আব্বু আর ভাইয়া কোনোদিন আমার গা*য়ে হা*ত তু*লে নি, সেখানে ওনি আমার গা*য়ে হা*ত তুললেন কোন অধিকারে? তাও আবার আরেকজনের জন্য। ওনি আমাকে পছন্দ করলেও মেনে নিতাম, ওনি তো জান্নাত আপুকে ভালোবাসেন তাহলে আমার উপর অধিকার দেখাতে আসেন কেন? কারো জীবনে অবা*ঞ্ছিতের ন্যায় পড়ে থাকার চেয়ে, একাকী জীবন কাটানো অনেক ভালো। আমি আপনার জীবনে অবা*ঞ্ছিত হয়ে থাকতে চাই না। আজ থেকে আমার মনে হি*টলারের কোনো অ*স্তিত্ব থাকবে না। একবার সুস্থ হয় শুধু, আমার জীবনের সকল সিদ্ধান্ত আমি নিবো। আমার ব্যাপারে কাউকে নাক গ*লাতে দিব না । ” হালিমা খান মেয়ের কপালে হাত রেখে ব্যস্ত হলেন জলপট্টি দেয়ার জন্য । গতরাত থেকে নাওয়াখাওয়া এক করে মেয়ের যত্ন নিচ্ছেন। চোখ- মুখে ক্লান্তির ছাপ স্পষ্ট। মেঘের মাথায় জলপট্টি দিতে দিতে মেঘের চুলে হাত দিলেন। দীর্ঘ চুলে জট লেগে অগোছালো হয়ে আছে। হালিমা খান কোমল কণ্ঠে

মেয়েকে বললেন, “তুই সুস্থ হলে, তোকে নিয়ে পার্লারে যাব।” মেঘ ছোট করে শুধালো, “কেন?” হালিমা খান শ্বাস ছেড়ে,শীতল কণ্ঠে বললেন, “তোর চুল গুলো কাটাতে হবে। ” মেঘ আঁতকে উঠে বললো, “না..... চুল ছোট করবো না আমি।” হালিমা খান মেয়ের মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে ঠান্ডা স্বরে বুঝাচ্ছেন, “তুই তো নিজের যত্নই নিতে পারিস না, চুলের যত্ন কিভাবে নিবি? তার থেকে ভালো এখন চুল গুলো কেটে দিলে, ভর্তি পরীক্ষা দিতে দিতে দেখবি বড় হয়ে যাচ্ছে! ” মেঘ চুপচাপ মায়ের কথা শুনছে, কোনো প্রতিবাদ করলো না,চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছে। এখনও জ্বর ১০০□ c তেই আছে। ঔষধ খাওয়ানো হচ্ছে, তারপরও কমছে না। প্রয়োজন ছাড়া কারো সাথে কথা বলে না, সারাক্ষণ চোখ বন্ধ করেই শুয়ে থাকে আর না হয় ঘুমায়। তানভির বিকেলে বের হয়েই এমপির সম্মেলনে গেলো। সেখানে পোগ্রাম শেষ করে, তারা কয়েকজন মিলে এলাকায় বেরিয়েছে ভোট চাওয়ার জন্য। এক গলিতে কয়েকটা বাসায় ভোট চাওয়ার পর আচমকা তানভিরের নজর পরে মেইনরোডে। সাথের কয়েকজনকে দায়িত্ব দিয়ে তানভির দৌড়ে বেড়িয়ে এসেছে গলি থেকে। মেইন রোডে এসে গলা উঁচু করে ডাকলো, “এই মেয়ে, দাঁড়াও । ” বন্যা সহসা পিছনে ঘুরলো, তানভিরকে দেখে বিস্মিত হয়ে বললো, “ভাইয়া আপনি?” তানভির কয়েক কদম এদিয়ে বন্যার মুখোমুখি হয়ে গম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন করলো, “আমি তোমার কোন জন্মের ভাই?” তানভিরের গোমড়ামুখো কথায় বন্যা কিছুটা ভ্যাবাচেকা খেলো, উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললো, “না মানে, আপনি

মেঘের ভাইয়া তাই....” তানভির এবার কিছুটা ক*ড়া স্বরে বললো, “আমাকে ভাইয়া ডাকার অধিকার শুধু মেঘের। তোমার ইচ্ছে হলে তানভির ভাই বলতে পারো কিন্তু মায়ের পেটের ভাইয়ের মতো ভাইয়া ভাইয়া বলে ডাকবা না। ” বন্যা আস্তেআস্তে বিড়বিড় করলো, “মেঘের ভাইগুলো এমন কাটখোট্টা কেন? এতদিন শুধু মেঘের মুখেই শুনতাম এখন দেখি সত্যি সত্যি । ” তানভির টিস্যু দিয়ে নাক মুখে, ছোট করে শুধালো, “কোথায় যাওয়া হচ্ছিলো?” বন্যা তটস্থ হয়ে বললো, “ফুচকা খেতে। ” বন্যা পুনরায় স্বাভাবিক কণ্ঠে প্রশ্ন করলো, আপনি এখানে কেনো ভাইয়া..... প্রশ্ন শেষ করার আগেই চোখ পরলো তানভিরের দিকে। তানভির তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। বন্যা ঢুক গিলে ছোট করে বললো, “সরি, তানভির ভাই!” তানভির মুচকি হেসে উত্তর দিলো, “সামনেই নির্বাচন তাই ভোট চাইতে এসেছিলাম।” বন্যা নিরুদ্বেগ কণ্ঠে বললো, “ওওও” তানভির কপাল কুঁচকে বললো, “এভারে রিয়েক্ট করলা কেন? আমাদের এমপিকে কি পছন্দ না? ভোট দিবা না?” বন্যা আতঙ্কিত হয়ে তাকালো তানভিরের দিকে, ডানে-বামে মাথা নাড়িয়ে বললো, “না না তেমন কোনো বিষয় না। তাছাড়া আমি তো ভোটার ই হয় নি। ” তানভির বিরক্তি নিয়ে বললো, “তাতে কি হয়েছে? তোমার আব্বু, আম্মু, বড় বোন তো আছে, তারা তো ভোটার। যেভাবে রিয়েকশন দিচ্ছো মনে হচ্ছে, গোষ্ঠীর কাউকে ভোট দিতে দিবে না। ” বন্যা মুখ ফুলিয়ে শ্বাস ছেড়ে আস্তে করে বললো, ” আপনাদের এমপিকেই ভোট দিতে বললো। ” তানভির মোলায়েম কণ্ঠে বললো,

“ঠিক আছে। এখন বাসায় যাও। কিছুক্ষণের মধ্যেই তোমাদের বাসায় আসছি। সবাইকে হালকা নাস্তা দিও ” বন্যা চোখ গোল গোল করে চাইলো। তারপর ছোট করে বললো, “আমি ফুচকা খেতে যাচ্ছিলাম। ” তানভির কণ্ঠ ভারী করে বললো, “একদিন ফুচকা না খেলে কি ম*রে যাবে?” বন্যা নির্বাক চোখে চেয়ে রইলো। তানভির গলা খাঁকারি দিয়ে পুনরায় বলে উঠলো, ” ভেবো না তোমায় জোর করছি। সত্যি বলতে সম্মেলন থেকে সরকারি এদিকে চলে আসছি, ওরা সকালের পর থেকে এখনও খায় নি কিছু। তোমাদের এদিকে নাস্তা খাওয়ার মতো কোনো দোকান, রেস্টুরেন্ট কিছুই নেই। কাজ না শেষ করে যাওয়াও সম্ভব না।আবার সন্ধ্যার আগে কাজ শেষ করতে হবে। তুমি বনুর বেস্টফ্রেন্ড সেই সুবাদে তোমাকে বলছি। আমাকে না খাওয়ালেও চলবে ওদের জন্য একটু চা বিস্কুট আর হালকা নাস্তার ব্যবস্থা করে দিলে খুব ভালো হতো। ” বন্যা স্বাভাবিক কণ্ঠে বললো, “জ্বি অবশ্যই । আমি বাসায় গিয়ে ব্যবস্থা করছি , আপনি সবাইকে নিয়ে বাসায় আসবেন প্লিজ। ” বন্যা পুনরায় প্রশ্ন করলো, “বাসা চিনেন? ” তানভির উপর নিচ মাথা নাড়লো। বন্যা আর কথা না বাড়িয়ে চুপচাপ বাসার দিকে হাঁটা দিলো। বন্যাদের মধ্যবিত্ত পরিবার। বাবা সরকারি কর্মকর্তা । বন্যারা ২ বোন আর ১ ভাই। বন্যার বড় বোনের স্নাতক শেষ এখন চাকরির জন্য পড়াশোনা করছে আর বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষা দিচ্ছে, বন্যা ছোট মেয়ে, তাছাড়া বন্যার একটা ছোট ভাই ও আছে এখন ক্লাস ৮ এ পড়ে নাম রিদ। বন্যা বাসায় গিয়ে আম্মুকে আর বোনকে বলে

রান্নার ব্যবস্থা করছে। কিচ্ছুক্ষণ সময়ের মধ্যেই নুডলস, পাকোড়া, ফিরনি সাথে চা বিস্কুট রেডি করে ফেলেছে। কিছুক্ষণ পর হাজির হলো সকলে। এলাকার সববাড়িতে বলে শেষের দিকেই গিয়েছে বন্যাদের বাসায়। কলিং বেল চাপতেই কিছুক্ষণের মধ্যে বন্যা এসে দরজা খুলে দিলো। তানভির দুটা শপিং ব্যাগ এগিয়ে দিলো বন্যার দিকে। সবাইকে বসতে বলে বন্যা ভিতরে চলে গেছে। বন্যার আম্মু সকলকে নাস্তা দিতে ব্যস্ত। বন্যার বোন কাজ শেষ করে আগেই নিজের রুমে চলে গেছেন। একটা শপিং ব্যাগ খুলতেই চোখে পরলো পার্সেল করা ফুচকা। বন্যা আশ্চর্য নয়নে তাকিয়ে আছে আর বিড়বিড় করে বলছে, "তানভির ভাই আমার জন্য ফুচকা এনেছেন? ওনি কবে থেকে এত ভালো মানুষ হলেন?" তারপর দ্বিতীয় শপিং খুলে দেখলো এতে আপেল,মাল্টা আরও কি কি ফল। বন্যাদের বাসায় টুকটাক নাস্তা করে বেরিয়ে পরছে সকলে । বন্যা রান্নাঘর থেকে বেড়িয়ে মায়ের সাথে মেইনগেইট পর্যন্ত এসে দাঁড়িয়েছে। তানভির হাসিমুখে বন্যার মায়ের বিদায় নিলো। তারপর বন্যার দিকে চেয়ে স্বাভাবিক কণ্ঠে বললো, "তোমার বান্ধবী অসুস্থ , খোঁজ নিও ওর। আসছি " তারপর চুপচাপ বেড়িয়ে চলে গেলো তানভির। তানভির যাওয়ার পরপরই বন্যা রুমে এসে মেঘকে কল দিলো। টানা দু'বার কল বেজে শেষ হয়েছে, তৃতীয় বার রিসিভ হলো। বন্যা চিন্তিত স্বরে শুধালো, "তুই নাকি অসুস্থ ? কি হয়েছে তোর?" মেঘ জ্বরের ঘোরে কথা বলতে পারছে না। কাঁপা কাঁপা গলায় বললো, "জ্বর! তোকে কে বললো?" বন্যা স্বাভাবিক কণ্ঠে

জবাব দিলো, “তানভির ভাই আসছিলো। ওনিই বলে গেলেন। ” মেঘ কপাল কুঁচকে গলায় একটু জোর দিয়ে বললো, “ভাইয়া তোদের ওখানে গেছিলো কেন?” বন্যা বললো, “আমাদের এলাকাতে ভোট চাইতে এসেছিলেন আরও কয়েকজন ছিল। আমাদের বাসায় হালকা নাস্তা করে গেছেন আর তোর কথা বলে গেছেন। ” মেঘ ঠান্ডা কণ্ঠে বললো, “ওহ আচ্ছা ” বন্যা পুনরায় শুধালো, “জ্বর কি বেশি? আর জ্বর কিভাবে বাঁধালি? ” মেঘ ভরাট শীতল কণ্ঠে উত্তর দিলো, ” হুম অনেক জ্বর, এমনেই উঠছে।” মেঘ মনে মনে ভাবছে, “আবির ভাই থা*প্পড় মে*রেছে এটা কোনোভাবেই বন্যাকে বলা যাবে না। ” বন্যা উত্তেজিত কণ্ঠে বললো, “বেবি, শুন না?” মেঘ জ্বরের ঘোরেই বলছে, “বল শুনছি” বন্যা দ্বিগুণ উত্তেজিত কণ্ঠে বললো, “জানিস তোর ভাই তো আমার জন্য ফুচকা নিয়া আসছে আজ। ” মেঘ এবার চোখ গোল গোল করে চাইলো। গলা ঝেড়ে বললো, “কাহিনী কি পুরোটা বল। ” বন্যা এবার স্বাভাবিক কণ্ঠে সম্পূর্ণ ঘটনা খুলে বললো। সবটা শুনার পর মেঘের সোজাসাপ্টা উত্তর , “শুন আমার ভাই যতই রা*গ দেখাক না কেনো, দিনশেষে আমার পছন্দের সব জিনিস ভাইয়াই এনে দেয়। আবির ভাইয়ের মতো এত নি*ষ্ঠুর না। তাই ভবিষ্যতে আমার ভাইয়াকে নিয়ে বা*জে কথা বলবি না ” বন্যা উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললো, “আবির ভাইয়ের সাথে আবার কিছু হয়েছে নাকি?” মেঘ থা*প্পড়ের কথা এড়িয়ে গিয়ে বললো, “ওনার ফোনে একটা মেয়ের ছবি দেখেছি তাছাড়া জান্নাত আপুর সাথেও গতকাল কত মধুর স্বরে কথা বলেছেন

। আমার মনে হয় জান্নাত আপুকেই ওনি পছন্দ করেন। ” বন্যা বিরক্তি নিয়ে বলা শুরু করলো, “ফা*লতু ব্যা*টারে নিয়া একদম ভাববি না তুই। তোর জন্য কি*উট একটা বয়ফ্রেন্ড খোঁজে দিব। তুই কোনো চিন্তা করিস না। ঐ ব্যা*টার কথা তো ভুলেও ভাববি না। ঐ ব্যাটা কি হারাচ্ছে সেটা একদিন ঠিক বুঝবে। ” মেঘের অক্ষিপট ভিজে আসছে, গলা খাঁকারি দিয়ে আস্তে করে বললো, “সময় পেলে আমায় দেখতে আসিস, রাখছি এখন। ” সঙ্গে সঙ্গে কল কেটে দিলো মেঘ। বন্যাও বুঝতে পারলো মেঘের মন খারাপ। তাই আর বিরক্ত করে নি। মেঘ নিরবে কিছুক্ষণ চোখের জল ফেলে বিড়বিড় করে বললো, “আমাকেও অ*নুভূ*তিহীন আর নি*ষ্ঠুর হতে হবে যাতে দুনিয়ার কোনো ক*ষ্ট আমায় ছুঁতে না পারে। ” তারপর রুমের ছাদের দিকে চেয়ে অন্যমনস্ক কণ্ঠে গুনগুন করে গান গাইছে, আবছায়া চলে যায় হিজলের দিন, অ*ভিমান জমে জমে আমি ব্য*থাহীন। আহারে জীবন...আহা জীবন জলে ভাসা পদ্ম যেমন.... রাত ৯ টার দিকে আলী আহমদ খান আর মোজাম্মেল খান বাসায় ফিরেছেন। খাওয়াদাওয়া শেষ করে আবিরকে দেখতে এসেছেন। কিছুক্ষণের মধ্যে তানভির ও বাসায় ঢুকেছে। নিজের রুমে গিয়ে ফ্রেশ হয়ে মেঘের রুমে গেলো। হালিমা খান মেঘের মাথায় জলপট্টি দিচ্ছেন, মেঘ চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছে। মেঘের কাছে কিছুক্ষণ বসে আবিরের রুমে চলে গেলো তানভির। মালিহা খান ছেলের মাথার কাছে বসে বসে মাথায় হাত বুলাচ্ছেন , জ্বর কিছুটা কমেছে তবে হাতে হালকা ব্যথা সাথে ফুলাটাও

আছে। আলী আহমদ খান আর মোজাম্মেল খান চেয়ারে বসে আছেন।। তানভির রুমে ঢুকে অন্যপাশে ঘুরে এসে আবিরের বিছানায় বসলো। কপালে হাত দিয়ে তাপমাত্রা বুঝার চেষ্টা করলো। আলী আহমদ খান গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, "আবার কোথায় মা*রপিট করেছিলে ?" আবির নিস্তব্ধ হয়ে ছাদের দিকে চেয়ে আছে। আলী আহমদ খান পুনরায় শুধালেন, "কি হলো? কাকে মে*রে নিজের হাতের এই অবস্থা করেছো?" আবির আব্বুর দিকে চেয়ে নরম স্বরে বললো, "আমি খুবই ভদ্র ছেলে, মা*রপিট একদমই পছন্দ করি না। আপনি শুধু শুধু টেনশন করেন আমাকে নিয়ে। " আবিরের ভাবের কথা শুনে তানভির বিস্ময় চোখে চেয়ে আছে আর মনে মনে বলছে, "বাহ ভাইয়া বাহ! কি নাটক টায় না করছো? বলতেই হয়, আপনি গুরু আমি শিষ্য বুদ্ধি আমার কম, আপনি বুঝাইয়া দিলে বুঝিতে সক্ষম। " মোজাম্মেল খান কঠিন স্বরে বলে উঠলেন, "মা*রপিট যদি না ই করবা তাহলে এই অবস্থা হলো কেন শরীরের?" আবির আমতা আমতা করে বললো, " রাস্তায় কিসের সাথে ধা*ক্কা লেগে কে*টে গেছিলো। " তানভির মিটিমিটি হাসছে আর মনে মনে বিড়বিড় করছে, " আহারে বেচা*রা ভাই আমার।" আলী আহমদ খান বিরক্তির স্বরে বললেন, "আগেই বলেছিলাম বাইক না কিনতে। তিন তিনটা প্রাইভেট কার থাকার পরও তোমাদের হয় না। আজকে যদি গাড়িতে চলাচল করতে তাহলে বৃষ্টিতে ভিজতেও হতো না, হাতের এ অবস্থাও হতো না, আর এখন এভাবে জ্বরে পরে থাকতা না।" শ্বাস ছেড়ে

আবার বলা শুরু করলেন, “ঠিকই তো তোমার বন্ধু সেদিন এসে তোমার কোম্পানির ওপেনিং ডে’র ইনভাইটেশন দিয়ে গেলো, তুমি আ*ধমরা হয়ে পরে থাকলে ওপেন কে করবে?” আবির ছোট করে বললো, “আমি ই করবো। ” কপাল কুঁচকে আলী আহমদ খান হু*ঙ্কার দিয়ে বললেন, “এসব ভ*ণ্ডামি বাদ দিয়ে কাজে মনোযোগ দাও। মা*রপিট করে জীবনে কিছুই করতে পারবা না, শুধু শ*ত্রুর সংখ্যা ই বাড়াবা। কোম্পানি শুরু করার অনুমতি চেয়েছো, অনুমতি দিয়েছি। এখন যদি কোম্পানির কাজের বাহিরে নিজের মর্জি মতো চলো তাহলে আমাকেও কঠোর হতে হবে। এই আমি বলে রাখলাম। ” মালিহা খান কোমল কণ্ঠে বললেন, “ও তো বললো মা*রপিট করে নি!” আলী আহমদ খান গম্ভীর কণ্ঠে বলে উঠলেন, “তোমার ছেলের বয়সটা আমিও পার করে এসেছি, কোন কারণে কি হতে পারে সে সম্পর্কে আমার সম্পূর্ণ ধারণা আছে। একটা সময় রা*জনীতি আমিও করেছি, রা*জনীতির জন্য কত কত জায়গায় আমিও মা*রপিট করেছি । কি লাভ হয়েছে তাতে? দিনশেষে সব ছেড়ে ব্যবসা শুরু করতে হয়েছে। তোমার ছেলেকে সময় থাকতে বুঝাও এসব ঝা*মেলাতে না ঝরিয়ে, কাজে মন দিতে। ” আলী আহমদ খানের কথা শুনে আবির,তানভির আর মালিহা খান তিনজনই বিস্ময়কর দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো। কিছুক্ষণ পর মালিহা খান নরম স্বরে বলে উঠলেন, “আপনার র*ক্ত ই তো পেয়েছে। ” বড় আম্মুর কথা শুনে তানভির ফিক করে হেসে উঠলো। আলী আহমদ খান বিরক্ত হয়ে বললেন, “তোমরা ছেলেকে

লাই দিয়ে দিয়ে মাথায় তুলছো। তুলো, তুলো আমার সমস্যা নেই। একদিন শুধু আমার কানে ওর মা*রপিটের খবর আসুক.....”” কথা না শেষ করেই রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে চলে গেলেন আলী আহমদ খান। তানভির নিঃশব্দে হেসেই চলেছে। মোজাম্মেল খান কঠিন স্বরে বলে উঠলেন, “এত হেসে লাভ নেই, রা*জনীতি করার অনুমতি পেয়েছো বলে যা তা করে বেড়াবে তা কিন্তু সহ্য করবো না আমরা । তোমাদের দু’ভাইকেই সাবধান করে দিচ্ছি, এই বাড়িতে থাকতে গেলে বাধ্য ছেলের মতোই থাকতে হবে। ” মোজাম্মেল খানও বেড়িয়ে গেছেন। মালিহা খান ছেলের মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বললেন, “তুই এত বছর বাহিরে ছিলি, এখানে কার সাথে ঝা*মেলা করিস?” আবির কপাল কুঁচকে তাকালো মায়ের দিকে, কণ্ঠ ভারী করে বললো, “আম্মু, তুমি অন্ততঃ এসব কথা বলো না। আমি মা*রপিট করি নি। এমনেই কে*টে গেছে। এত চি*ন্তা করো না তো। ” আবির শ্বাস ছেড়ে আবার বললো, বিশ্বাস না করলে তোমার সামনে তানভির কে জিজ্ঞেস করছি, “কিরে তানভির, আমি কি মা*রপিট করি?” আবিরের এরকম প্রশ্নে ভ্যাবাচেকা খেলো তানভির। কিছুটা নড়েচড়ে, হাসি চেপে বললো, “না... একদম ই না। ভাইয়া র মতো নিষ্পা*প একটা শিশু কি মা*রপিট করতে পারে? বড় আম্মু তুমি শুধু শুধু চি*ন্তা করছো। ” মালিহা খান কিছু বলার আগেই আবির বলে উঠলো, “আম্মু তুমি এখন আব্বুর কাছে যাও। রাগে ফুঁস*তেছে মনে হয়। তুমি ওনাকে সামলাও গিয়ে। আমি ঠিক আছি। সমস্যা হলে কল দিব নে। ” মালিহা খানও

ছেলের কথামতো বেড়িয়ে মেঘকে দেখে নিচে চলে গেলেন। আবির মোলায়েম কণ্ঠে তানভিরকে শুধালো, "মেঘ কেমন আছে?" তানভির স্বাভাবিকভাবেই উত্তর দিলো, "শরীরের তাপমাত্রা তো কমছে না। ঘুমাচ্ছে দেখে আসলাম। আম্মু বললো বিকেলে একটু নাকি কমেছিল জ্বর। " আবিরের চেহারায় চিন্তিত ভাব স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে। তানভির কিছুটা তপ্ত স্বরে বললো, "নিজেকে আ*হত করে কি লাভ হলো? দিব্যি দুজন দুই রুমে পরে অসুস্থতায় ভুগতেছো। তুমি সুস্থ থাকলে তো বনুর কেয়ার করতে পারতা। " আবির চুপচাপ শুয়ে আছে। কিছুই বলছে না। আবিরকে নিরব থাকতে দেখে তানভির ছোট করে শুধালো, "ব্যথা কমেছে হাতের?" আবির গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর দিলো, "কিছুটা" তানভির পুনরায় প্রশ্ন করলো, "খেয়েছো ভাইয়া?" আবির সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলো, "হ্যাঁ" আবির হঠাৎ ই তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে তানভিরকে প্রশ্ন করলো, "কোথায় যাবি বলছিলি? গেছিলি? কি খাওয়ালো?" তানভির হাসিমুখে উত্তর দিলো, "নাস্তা খাওয়াইছে। " আবির স্বাভাবিক কণ্ঠে বললো, "Go ahead " তানভির শান্ত স্বরে বললো, "রেস্ট নিবা? লাইট অফ করে দিব?" আবির উপরনিচ মাথা নাড়লো শুধু। তানভির লাইট অফ করে বেরিয়ে গেছে। ঘন্টাখানেক পর আবির কোনোরকমে উঠে নিজের রুম থেকে বেড়িয়ে ধীরগতিতে মেঘের রুমে এসেছে। হালিমা খান কোনো কারণে নিচে গেছেন। বারান্দার লাইটের আলোতে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, মেঘ গভীর ঘুমে মগ্ন । ২৪ ঘন্টার জ্বরেই অষ্টাদশী মুখমণ্ডল মলিন হয়ে গেছে। মেঘের ঘুম বরাবরই খুব

গভীর। বাড়িতে বড়সড় দূ*র্ঘটনা হলেও,ঘুমে থাকলে মেঘ কিছুই বুঝতে পারে না। এখন তো জ্বর, তারউপর ঔষধের প্রভাবে সারাদিন রাত শুধু ঘুমায়। আবির বিছানার পাশে মেঘের কাছাকাছি এসে বসেছে। বাম হাত এগিয়ে দিলো অষ্টাদশীর কপাল বরাবর । জ্বরের তীব্রতা বুঝতে পেরে দীর্ঘশ্বাস ফেললো। অষ্টাদশীর চুলে হাত বুলাতে বুলাতে বিড়বিড় করে বললো, "আল্লাহ, ওর সব ব্যাধি আমায় দাও, তবুও ওকে তুমি সুস্থ করে তুলো প্লিজ। ওর এই অসুস্থতা সহ্য করার ক্ষমতা আমার নেই। " কিছুটা সময় নিস্তব্ধ হয়ে চেয়ে রইলো অষ্টাদশীর ক্লান্ত বদনে। মনে মনে কতশত ভাবনারা যেনো বাঁধ ভেঙে ছুটোছুটি করছে। মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে শীতল কণ্ঠে বলা শুরু করলো, "I am Sorry Megh, আর কোনোদিন তোর গায়ে হাত তুলবো না। প্লিজ এবারের মতো মাফ করে দিস আমায়। গত ৯ বছরের মতো, এবার অন্তত দূরে সরিয়ে দিস না । রা*গ কর আর যাই কর কিন্তু কথা বলিস প্লিজ । তুই কথা না বললে এবার হইতো দেশ নয়, দু*নিয়া ছেড়েই চলে যাব। " কথাগুলো একবারে বলে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ধীর পায়ে রুম থেকে বেড়িয়ে নিজের রুমে চলে গেলো আবির। রুমে গিয়েই ফোন হাতে নিয়ে ডাক্তারের নাম্বারে কল করলো, ডাক্তারের সাথে কথা শেষ করে একটা ছোট পৃষ্ঠাতে দুটা ঔষধের নাম লিখতে লিখতে তানভিরকে কল করলো। তানভির ১ মিনিটের মধ্যে রুমে হাজির হলো। আবির ওয়ালেট থেকে ১০০০ টাকার নোট বের করলো। ঔষধের নাম লেখা পৃষ্ঠা আর টাকা টা তানভিরের দিকে

এগিয়ে দিয়ে বললো, “কষ্ট করে এই দুটা ঔষধ নিয়ে আসবি প্লিজ, আর বাকি টাকা দিয়ে ওর জন্য খাবার নিয়ে আসিস। ” তানভির পৃষ্ঠা হাতে নিয়ে ঠান্ডা স্বরে বললো, “টাকা লাগবে না আমার কাছে আছে।” আবির শক্ত কণ্ঠে বললো, ” নিতে বললাম নে। আর ঔষধ এনে একটা ওরে এখনই খাওয়াইয়া দিস। ” তানভির “ঠিক আছে” বলে টাকা নিয়ে বেড়িয়ে পরেছে। আবির বিছানার সাথে হেলান দিয়ে বসে ফোনের ওয়ালপেপারে দেয়া মেঘের ছবিটা মনোযোগ দিয়ে দেখছে। আবির দেশে ফেরার পর শুক্রবারে যখন সব আত্মীয়রা আবিরকে দেখতে আসছিলো সেই সময়ে, সোফায় আবির আর মেঘ মুখোমুখি বসেছিল তখনই আবির মেঘের ছবি তুলেছি। সেই ছবিটায় ইডিট করে ওয়ালপেপার দিয়ে রেখেছে।। ছবিটা দেখতে দেখতে হঠাৎ ই ঠোঁটের কোণে এক চিলতে হাসি ফুটে উঠলো আবিরের তারপর গুনগুন করে গান গাইতে শুরু করলো, তুই তো আমার সব রে পা*গল, তুই তো আমার সব তুই তো আমার বেঁচে থাকার বড়ো অনুভব। কেটে গেলো দু’দিন আবির কিছুটা সুস্থ হয়েছে, হাতের ব্যথা একেবারে সারে নি, ঔষধ চলছে। এরমধ্যে রাকিব,রাসেল সহ বাকি বন্ধুরাও দেখতে এসেছিল আবিরকে। এই দুদিনে মেঘের জ্বর কমেছে ঠিকই তবে শরীর অ*তিরিক্ত দূ*র্বল। হালিমা খান ঘন্টায় ঘন্টায় মেয়ের জন্য এটা সেটা রান্না করে নিয়ে আসে আর মেয়েকে জোর করে খাওয়ান। আবির রাতে- দিনে বেশ কয়েকবার করে মেঘকে এসে দেখে যায়। মেঘ সজাগ থাকলেও আবিরকে দেখলেই চোখ বন্ধ করে শুয়ে থাকে।

আবির দু-একটা কথা বললেও মেঘ যেনো নিস্ত*ব্ধ হয়ে থাকে, সর্বোচ্চ মাথা নাড়ে শুধু । রবিবার রাতে আবির বিছানায় বসে বামহাতে ল্যাপটপে কাজ করছিলো। আগামীকাল ১ তারিখ। আবিরের অফিসের ওপেনিং ডে। ইকবাল খান দরজায় এসে হালকা কাশি দিয়ে বললেন, "ভিতরে আসবো?" আবির ল্যাপটপ থেকে চোখ সরিয়ে কাকামনির দিকে চেয়ে বললো, "কাকামনি, ভেতরে আসো। " ইকবাল খান চেয়ারে বসতে বসতে শুধালেন, "শরীরের কি অবস্থা এখন? কাল কি অফিস করতে পারবি?" আবির ঠান্ডা কণ্ঠে জবাব দিলো, "পারবো। তাছাড়া রাকিব, রাসেল তো আছেই সমস্যা হবে না আশা করি। " ইকবাল খান একটু শক্ত কণ্ঠে বললেন, "কালকে কিন্তু বাইক নিয়ে বের হবি না। আমি তোকে নিয়ে যাব। " আবির মাথা নিচু করে বললো, "আমি যেতে পারবো বাইকে। " ইকবাল খান এবার কিছুটা রে*গেই বললেন, "তোকে তো তোর বাবা চাচার সাথে যেতে বলছি না। তুই আমার সাথে যাবি। আমি তো নিজের টাকা দিয়ে গাড়ি কিনেছি। এখানে ওনাদের অধিকার নেই। " আবির গম্ভীর কণ্ঠে বললো, "তারপরও" ইকবাল খান রা*গান্বিত কণ্ঠে বলে উঠলেন, "তারপরও বলতে কিছু নেই। তুই আমার সাথে যাবি এটায় শেষ কথা। আর তুই যদি এই অবস্থায় বাইক নিয়ে বের হতে যাস তখন তো ভাইজান ডাইরেক্ট নি*ষেধ করবেন। তখন তো বাবার আদেশ মানতে ঠিকই বা*ধ্য হবি। এত ঝামেলার দরকার নেই তুই কাল আমার সাথে যাচ্ছিস এটায় শেষ কথা। " আবির দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে

বললো, " ঠিক আছে ।" সোমবার সকাল সকাল আবির একেবারে পরিপাটি হয়ে রুম থেকে বের হয়ে মেঘের রুমে ঢুকলো। ফিটফাট, সুদর্শন আবির ভাইকে দেখে মেঘের বুকের ভেতর ধুকপুক শুরু হয়ে যাচ্ছে। মেঘ বিপুল চোখে তাকিয়ে নিজেকে নিজে প্রশ্ন করছে, "ওনাকে এত ভাল্লাগে কেন ? দেখলেই যেনো মনটা শান্তিতে ভরে যায়।" আবির মেঘের কাছাকাছি এসে মোলায়েম কণ্ঠে শুধালো, "বসতে পারি?" মেঘ নির্বাক তাকিয়ে রইলো, কয়েক মুহুর্ত পর মাথা হেলিয়ে বুঝালো, বসার জন্য। আবির মেঘের কাছাকাছি বসে, ঠান্ডা হাতে মেঘের কপালে আলতো করে ছুঁতেই মেঘ কিছুটা কেঁ*পে উঠলো । আবির চিন্তিত স্বরে বললো, "জ্বর তো নেই তারপরও চোখমুখ এত শুকনো লাগছে কেন? খাস না কিছু?" মেঘ কিছুই বলছে না। আবির পুনরায় বললো, "বাহিরের কিছু খাবি? আসার সময় নিয়ে আসবো?" মেঘ সঙ্গে সঙ্গে মাথা নেড়ে না করলো। আবির উদগ্রীব হয়ে বললো, "কি খাবি বল, রেস্টুরেন্টের খাবার? কেক, বিস্কিট, চানাচুর, চিপস, চকলেট নাকি আইসক্রিম? " মেঘ আস্তে করে বললো, "কিছু খাবো না। " আবির ভ্রু নাচিয়ে শুধালো, "চিপস ও খাবি না?" মেঘ ছোট করে বললো, "না।" না বলেই সঙ্গে সঙ্গে ওষ্ঠ উল্টালো। আবির তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললো, " আচ্ছা বাদ দে, আজ আমার নিজস্ব অফিসের প্রথম দিন। দোয়া করিস আমার জন্য । " মেঘ আশ্চর্য নয়নে তাকিয়ে মনে মনে ভাবছে, "আবির ভাই আমার কাছে দোয়া চাইতে এসেছেন! এটা কি স্বপ্ন নাকি?" মেঘ মন খারাপ সরিয়ে

হাসিমুখে বললো, “ফি আমানিল্লাহ। আপনার জন্য অনেক অনেক শুভকামনা রইলো। ” মনে মনে বললো, “দোয়া করি আপনি আপনার ব্যবসা আর জান্নাত আপুকে নিয়ে সু*খে থাকুন।” আবির স্বাভাবিক কণ্ঠে বললো, ” ধন্যবাদ। তুই সাবধানে থাকিস আর খাওয়াদাওয়া ঠিকমতো করিস। আসছি” আবির রুম থেকে বের হতে হতে মনে মনে বলছে, “দোয়া কর যেনো খুব তাড়াতাড়ি সাকসেসফুল হতে পারি আর তোকে আমার করে নিতে পারি। ”মেঘের রুম থেকে বেড়িয়ে আবির নিচে এসে ডাইনিং টেবিলে বসেছে। মীম, মেঘ, তানভির কেউ নেই। কেমন যেন সুস্থির পরিবেশ। মীম বা মেঘ না থাকলে আদিও যেনো চুপচাপ থাকে। অসুস্থতার কারণে ২-৩ দিন আবির রুমেই খেয়েছে তাই তেমন কোনোকিছু উপলব্ধি করে নি। কিন্তু খাবার টেবিলে মেঘ নেই এতেই যেনো বুকটা কেঁপে উঠলো আবিরের। তানভির রুম থেকে রেডি হয়ে নামতে গেলে আকলিমা খান ডেকে বললেন, “তানভির, মীমকে একটু ডাক নিয়ে আয় তো। ”
গতসপ্তাহেই মীম উপরের রুমে শিফট হয়েছে তবে এখনও মন তার নিচেই পরে থাকে। ক্ষণে ক্ষণে ভাইকে আর মাকে দেখতে ছুটে আবার উপরে আসলে মেঘের রুমে যায়, আবার নিজের নতুন রুম গুছায়। তানভির মীমের দরজায় এসে ডাকলো, “মীম, খাবি না?” মীম জবাব দিলো, “আসছি, ভাই। ” তানভির এসে খেতে বসে কিছুক্ষণ পর মীমও এসেছে। মোজাম্মেল খান আবিরের দিকে তাকিয়ে বললেন, “তুমি কি আজও বাইকে যাওয়ার চিন্তাভাবনা করছো?” আবির কিছু

বলার আগেই ইকবাল খান বলে উঠলেন, “না না। আবির আমার সাথে যাবে। ” আলী আহমদ খান গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, “সেই ভালো তুই ই নিয়ে যাস। ওর তো আবার আমাদের সাথে আমাদের গাড়িতে চলাফেরা করতে সমস্যা । ” আবির চটজলদি খাওয়া শেষ করলো। যাওয়ার আগে স্বাভাবিক কণ্ঠে বললো, “আপনারা টাইমমতো চলে আসবেন প্লিজ। ” তানভিরের দিকে চেয়ে বললো, “তুই কি এখন যেতে পারবি?” তানভির জবাব দিলো, “একটু পরে যায়? ” আবির শান্ত স্বরে বললো, “ঠিক আছে।তাড়াতাড়ি চলে আসিস। আর বাইকের চাবি রুমে আছে। নিয়ে আসিস। ” তানভির হাসিমুখে মাথা নাড়লো। আলী আহমদ খান,মোজাম্মেল খান, ইকবাল খান থেকে শুরু করে রাকিব, রাসেলেরও আব্বু, চাচ্চু যারা ছিলেন তারা সকলেই এসেছেন। অফিসের কলিগদের সহ সকলকে দুপুরে খাওয়ানো হয়েছে। আবিরের একজন পরিচিত ছোটভাই, নাম মিরাজ। তাকে আবিরের পিএস হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে। সারাদিনের ব্যস্ততা শেষে যখন ঢাকার বুকে সন্ধ্যা তখন তানভিরের সঙ্গে বাড়ি ফিরেছে আবির। সাথে কয়েক প্যাকেট বিরিয়ানি। বাসায় ঢুকে তানভির বিরিয়ানি গুলো সবাইকে দিতে ব্যস্ত হলো। আবির একটা প্যাকেট নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠে মেঘের রুমে চলে গেলো। মেঘ পাশ ফিরে ফে*সবুকে ভিডিও দেখছিলো। আবির গলা খাঁকারি দেয়াতে পিছনে ঘুরেছে। আবির বিরিয়ানির প্যাকেট এগিয়ে দিয়ে ছোট করে বললো, “তোর জন্য এনেছি। খেয়ে নিস। ” মেঘ কপাল কপাল কুঁচকে প্রশ্ন করলো, “কি এতে?” আবির

উত্তর দিলো, “বিরিয়ানি ” মেঘ শুধু বলেছে, “আমারতো....!” আবির সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো, “আমি জানি তোর বিরিয়ানির থেকেও কাচ্চি অনেক বেশি পছন্দ কিন্তু সবদিক বিবেচনা করে অফিসে বিরিয়ানি ই দেয়া হয়েছে। আজ এটা খেয়ে নে আমি অন্য দিন তোর জন্য কাচ্চি নিয়ে আসবো। ” মেঘ আর কিছু বললো না। আবির ও বিরিয়ানি রেখে নিজের রুমে চলে গেছে। ২-৩ দিন কেটে গেলো। আবিরের ব্যস্ততা এখন দ্বিগুণ বেড়েছে । দুই অফিসের CEO এর দায়িত্ব পালন করা চারটে খানে কথা নয় তারপরও কোনো কাজেই ফাঁকি দেয় না ছেলেটা। নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার ঝোঁ*ক মা*থাচাড়া দিয়ে বসেছে। শত ব্যস্ততার মাঝেও প্রতিদিন ফজরের নামাজ পরে বাসায় ফিরে নিজের ভালোবাসার মানুষটাকে ঘুমন্ত অবস্থাতেই দেখে যায়। হালিমা খান ইদানীং মেঘের সাথে থাকায় আবিরের সুবিধায় হয়েছে। হালিমা খান ফজরের নামাজ পড়তে নিজের রুমে চলে যান তারপর রান্নার ব্যবস্থা করেন এই ফাঁকে আবির মেঘকে দেখে ছাদে চলে যায়। দু-তিনদিন যাবৎ বাসায় ফেরার সময় মেঘের জন্য এটা সেটা খাবার কিনে নিয়ে আসে। একদিন মেঘের জন্য চিপস কিনতে গিয়ে মহা মুসিবতে পরে গেলো আবির। আবির দোকানদারকে বলেছে, “চিপস দেন” দোকানদার জিজ্ঞেস করছে, “কোনটা দিবো?” কম করে হলেও ২০-৩০ জাতের চিপস। আবির হা হয়ে তাকিয়ে আছে। মেঘের পছন্দের ২ টা চিপসের নাম আবির জানতো কিন্তু অন্য কোন কোম্পানির চিপস পছন্দ করে তা আবিরের অজানা ছিল। তাই দোকান

থেকে সব ব্যান্ডের চিপস ২ টা করে, মোটামুটি এক বস্তা চিপস নিয়ে মেঘের রুমে হাজির হলো। ভাগ্যিস সময়টা তখন বিকেল ছিল। ড্রয়িং রুমে কেউ ছিল না। এত চিপস দেখে মেঘ অগার মতো চেয়ে থেকে শুধালো, "আপনি কি চিপসের ব্যবসা শুরু করেছেন?" আবির স্বভাব-সুলভ গম্ভীর কণ্ঠেই উত্তর দিলেন, "তোর পছন্দের চিপস কোনগুলো বের কর। " এত এত চিপসের ভীড় থেকে ৫ টা পছন্দের চিপস বের করে বললো, "এগুলোই আমার পছন্দ । " আবির ভারী কণ্ঠে বললো, "বাকিগুলো টেস্ট করতে পারিস, ভালো লাগলে পছন্দের লিস্ট বাড়াবি আর ভালো না লাগলে মীম আর আদিকে দিয়ে দিস। " বৃহস্পতিবার সকালে আবির অফিসে যাওয়ার পথে মীমকে ডেকে ছাদের চাবি দিয়ে বললো, "মেঘের শরীর ভালো থাকলে ওরে নিয়ে একটু ছাদে যাস। " মীম চাবি নিয়ে উত্তর দিল, "ঠিক আছে ভাইয়া" আবির অফিস থেকে ফেরার পথে মেঘের কোচিং আর টিউশন থেকে এই সপ্তাহের সকল নোট আর পরীক্ষার প্রশ্ন গুলো এনে মেঘের রুমে টেবিলের উপর রেখে নিজের রুমে চলে গেছে। মীম আর মেঘ ছাদে ঘুরে ঘুরে ফুলগাছ গুলো দেখছিলো। নয়নতারা কুড়িয়ে দু বোন দুটা কানে গুজে কয়েকটা ছবিও তুলেছে। আর এটা সেটা হাজারও গল্প করছে। ১ সপ্তাহে মেঘের শরীর কিছুটা সুস্থ হয়েছে। তবে মায়ের ঘন্টায় ঘন্টায় আনা খাবার খেতে হচ্ছে, আবিরও এটা সেটা নিয়ে আসে, মোজাম্মেল খান অথবা আলী আহমদ খান রুটি,কলা, ফল নিয়ে আসে, তানভির রাতে ফেরার সময় যা চোখের সামনে পরে তাই নিয়ে আসে। খেতে

খেতে আর শুয়ে থাকতে থাকতে ক্লান্ত হয়ে গেছে। বেশখানিকটা সময় ছাদে ঘুরাঘুরি করে নিচে এসে যে যার রুমে চলে গেছে। মেঘ রুমে ঢুকতেই চোখ পরলো টেবিলের উপর রাখা প্রশ্ন আর শীটের দিকে। এগুলো নিয়ে উল্টিয়ে পাল্টিয়ে দেখলো। বুঝতে বাকি নেই যে এগুলো আবির ভাই ই এনেছেন। মেঘ সন্ধ্যার পরে পড়তে বসেছে ।
অসুস্থতার ফলে এক সপ্তাহ যাবৎ বই নিয়ে বসতেই পারছিল না মেয়েটা। কিছুক্ষণ পড়াশোনা করে আবির ভাইয়ের আনা প্রশ্নগুলো দিয়ে পরীক্ষা দিয়ে নিজের অবস্থান চেক করছিলো । প্রতি শুক্রবারের ন্যায় এই শুক্রবারটাও ভালোভাবেই কাটলো সকলের। আবির আসরের নামাজ পড়ে করিডোর দিয়ে নিজের রুমের দিকে যাচ্ছিলো হঠাৎ ই সামনে পড়লো মেঘ। একটা স্কাই ব্লু কালারের জামার সাথে সাদা ওড়না গলায় পেঁচিয়েছে, হাতে একটা পার্টস নিয়ে খোলা চুলে বের হচ্ছে রুম থেকে। স্ট্রেইট লম্বা চুলগুলোর আগা হাটু ছুঁয় ছুঁয়। আবির ক্ষুদ্র চোখে তাকিয়ে রইল অষ্টাদশীর পানে। মেঘ রুম থেকে বেরিয়েই মুখোমুখি হলো আবির ভাইয়ের। সাইড কেটে চলে যেতে চাইলে আবির প্রশ্ন করে উঠলো, ” এভাবে চুল ছেড়ে কোথায় যাচ্ছিস?” মেঘ মাথা নিচু করে ছোট করে উত্তর দিলো, “পার্লারে ” আবির কপাল কুঁচকে শুধালো, “কেন? ” মেঘ মাথা নিচু করেই পুনরায় উত্তর দিল, “চুল কাটাতে” আবির এবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, “তোকে চুল কা*টার অনুমতি কে দিয়েছে? ” মেঘ একদমে বলে ফেললো, “আম্মু বলেছে আমি নাকি চুলের যত্ন নিতে পারিনা, তাই কাটাতে যাচ্ছি। ”

আবির গম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন করল, “মামনি বলেছে? ” মেঘ উত্তর দিল, “জ্বি” আবির ভিতরে ভিতরে রা*গে ফুঁ*সছে , কণ্ঠ দ্বিগুন ভারি করে জানালো, “চুল কাটাবি ভালো কথা কিন্তু চুল কোমরের উপরে যেন না উঠে ” মেঘ অন্য দিকে মুখ করে অভিমানী স্বরে বলল, ” আমার চুল আমি কাটাবো, কারো অভিমতের প্রয়োজন নেই। ” আবির দাঁতে দাঁত চেপে, দীর্ঘশ্বাস ফেলে, কড়া স্বরে বলল, “চুল কোমরের এক ইঞ্চি উপরে উঠলে তোর খবর আছে। ” কথাটা বলা শেষ করা মাত্রই আবির দ্রুত পায়ে নিজের রুমের দিকে চলে গেল। অষ্টাদশী স্ট্যাচুর মতো দাঁড়িয়ে বিড়বিড় করে বলল, “আমার চুল আমি যা ইচ্ছা তাই করব, আপনার কথা আমি কেন শুনবো? আপনি আপনার প্রিয়তমার উপর অধিকার খাটান গিয়ে, আমার ওপর অধিকার কাটাতে হবে না। ” কথাগুলো একদমে বলে সিঁড়ি দিয়ে নেমে মায়ের রুমে চলে গেলো। হালিমা খান মেয়েকে নিয়ে বাসার কাছেই একটা পরিচিত পার্লারে গিয়েছেন। হালিমা খান বলেছিলেন কাঁধের নিচ পর্যন্ত কেটে ফেলতে। কিন্তু মেঘের মন টানছে না, চুলের প্রতি যেনো তার বড্ড বেশি মায়া। মায়ের কথায় চুল কাটতে রাজি হয়েছে সেই অনেক। হালিমা খানের জোরাজোরিতে মেঘ পিঠ পর্যন্ত চুল কা*টাতে রাজি হয়েছে। পার্লারের মহিলা যখনই চুল কা*টার জন্য কাঁ*চি হাতে নিলো, তৎক্ষনাৎ মেঘের মনে পড়ে গেল আবির ভাইয়ের বলা কথাটা। মেঘ মনে মনে ভাবলো, “না না ! আবির ভাইয়ের উপর কোনো বিশ্বাস নাই। চুল ছোট করলে যদি ঐদিনের চেয়েও বেশি জোরে মা*রে।

তাহলে তো আমি ম*রেই যাব। থাক বাবা, এই ফা*লতু ব্যা*টার মা*র খেয়ে অকা*লে জীবন ত্যা*গ করার কোনো প্রয়োজন নেই। আর কিছুদিন জীবনটা উপভোগ করে নেই। ” সঙ্গে সঙ্গে মেঘ চিৎকার দিয়ে উঠলো। মেয়ের আচমকা চিৎকারে হালিমা খান কিছুটা ভরকে গেলেন, চিন্তিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, “কি হয়েছে তোর? এভাবে চিৎকার করছিস কেন?” মেঘ নিরুদ্বেগ কণ্ঠে বললো, “কোমড় পর্যন্ত কাটাবো চুল। ” হালিমা খান কিছুটা বিরক্ত হয়ে বললেন, “কোমড় পর্যন্ত কাটালে আর কি হবে, সেই তো বড়ই থাকবে। ” মেঘ মন খারাপ করে উত্তর দিলো, “তারপর ও কোমড় পর্যন্তই কাটাবো। আর ছোট করবো না প্লিজ আম্মু। ” হালিমা খানও আর জোর করলেন না। মেয়ের কথামতো কোমড় পর্যন্তই কাটানো হলো। কাজ শেষ করে সন্ধ্যার আগে আগে বাসায় ফিরেছেন মা মেয়ে। আবির ড্রয়িং রুমে সোফায় বসে কফি খাচ্ছিলো, কাউকে ঢুকতে দেখে চোখ তুলে এক পলক তাকালো, মেঘকে দেখে দৃষ্টি স্থির হলো, মেঘের চুল দেখার জন্য তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো। মেঘ সিঁড়ি দিয়ে উঠার পথে আবির ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে ভেংচি কে*টে দ্রুত পায়ে উঠে নিজের রুমে চলে যাচ্ছে। মেঘের কোমড় পর্যন্ত চুল দেখে আবির মাথা নিচু করে মুচকি হাসলো। আবির কফি শেষ করে বাসা থেকে বেরিয়ে পরেছে। প্রতি শুক্রবারের মতো মাগরিবের নামাজ পড়ে বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিতে চলে গেছে। বাসায় ফিরতে ফিরতে ১১ টা বেজে গেছে। শনিবারে ডাইনিং টেবিলে নাস্তা করছিলো সকলে তখনই মেঘ নেমে

আসছে, চঞ্চল পায়ের নুপুরের ঝনঝন শব্দে আবির চাইলো সিঁড়িতে , চুল ছোট করাতে যেনো অন্যরকম সুন্দর লাগছে তার অষ্টাদশীকে। কোমড়ে পরা চুলগুলো হাঁটার সঙ্গে সঙ্গে এদিক সেদিক নড়ছে। আবির সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি নামিয়ে খাওয়ায় মনোযোগ দিলো। মেঘ কাছাকাছি আসতেই, আলী আহমদ খান প্রশ্ন করলেন, "এখন শরীর কেমন?" মেঘ একগাল হেসে উত্তর দিলো, "আলহামদুলিল্লাহ ভালো, বড় আব্বু। " তানভির কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে প্রশ্ন করলো, "চুল কাটাইছিস নাকি?" এবার যেনো সকলের দৃষ্টি মেঘের চুলের দিকে গেলো। কেউ কিছু বললো না। মেঘ ছোট করে উত্তর দিলো, "হ্যাঁ" তানভির হুট করে বলে উঠলো, "ভালোই করেছিস, লম্বা চুলে তোকে শে*ওড়াগাছের পে*ত্নীর মতো লাগতো। " কথাটা বলে তৎক্ষনাৎ তানভির জিহ্বায় কা*মড় দিয়ে মাথা নিচু করে ফেলল। বাড়ির সকলে যে এখানে আছে সেটা তানভিরের মনেই ছিল না। মেঘ গাল ফুলিয়ে শ্বাস ছেড়ে ভাইয়ার দিকে সূক্ষ্ম নজরে তাকিয়ে রইলো। তারপর ভেংচি কেটে চুপচাপ আবির ভাইয়ের বিপরীতে বসে নাস্তা খাওয়া শুরু করলো। মোজাম্মেল খান রা*গী স্বরে বললেন, "নিজের বোনকে পে*ত্নীর সাথে তুলনা করছো। বাহ!" ততক্ষণে আলী আহমদ খান খাবার শেষ করে উঠে গেছেন। ইকবাল খান হাসি মুখে বললেন, "তানভির মজা করে বলেছে। বাদ দাও তো ভাইয়া।" মোজাম্মেল খান কঠিন স্বরে বললেন, "আমার মেয়েকে নিয়ে কেউ যেনো এরকম মজা আর না করে । আমার মেয়ের তুলনা শুধু পরীর সঙ্গেই সম্ভব। "

কথাটা বলেই মোজাম্মেল খান রা*গে ফুঁসতে ফুঁসতে চলে যাচ্ছেন। এদিকে বাবার কথায় খুশিতে মেঘ স্ব শব্দে হেসে উঠলো। বাবার যাওয়ার দিকে তাকিয়ে তানভির বিড়বিড় করে বললো, "পে*ত্নী তো তবুও গাছে থাকে, পরী হয়ে কোন দেশবিদেশে ঘুরবে তখন তো খোঁজেও পাবে না।" ইকবাল খান কিছুটা হেঁসে স্বাভাবিক কণ্ঠে বললো, "ভাইয়ার সামনে এসব উল্টাপাল্টা মজা করিস না। এসব মজা ভাইয়া নিতে পারে না । " তানভিরও আর কথা বাড়ালো না। ইকবাল খান খাবার খেয়ে উঠে পরেছেন। আবির যেন নিরব দর্শক। এক হাতে ফোনে কি চেক করছেন অন্য হাতে খাবার খাচ্ছেন। মেঘও মনোযোগ দিয়ে খাবার খেতে ব্যস্ত। মীম হঠাৎ ই বলে উঠলো, "আপু জানো কি হয়ছে?" মেঘ ঘাড় ঘুরিয়ে মীমের দিকে তাকিয়ে বললো, "কি হয়েছে?" আবিরও ফোন থেকে দৃষ্টি সরিয়ে মীমের দিকে চাইলো। মীম আবিরকে দেখেই ঢুক গিলে ছোট করে বললো, "পরে বলবো নে। " মেঘ বলে উঠলো, "কি হয়েছে বল। " আবির মেঘের দিকে তাকিয়ে থমথমে কণ্ঠে বললো, "চুপচাপ খেতে পারিস না? খেতে বসে এত কথা কিসের? " মেঘ আর মীম দুজনই মাথা নিচু করে চুপচাপ খাচ্ছে। আবিরও খাবার শেষ করে বেসিনে চলে গেছে। ততক্ষণে মালিহা খান ডাইনিং টেবিলের কাছে এসে শুধালেন, "তোদের কি আর কিছু লাগবে?" মেঘ উদগ্রীব হয়ে প্রশ্ন করলো, "আচ্ছা বড় আম্মু, তোমার ছেলের জন্মের পর কি মুখে মধু দাও নি?" মালিহা খান হেসে উঠলেন। আবির বেড়িয়ে যেতে যেতে রাশভারি কণ্ঠে বললো, "মধুতে

ভেজাল ছিল, তাই খাই নি। ” মেঘ আশ্চর্য নয়নে সহসা ঘাড় ঘুরালো কিন্তু ততক্ষণে আবির মেইনগেইট পেরিয়ে বেড়িয়ে গেছে। মেঘ পুনরায় মালিহা খানের দিকে চাইলো। মালিহা খান হাসি থামিয়ে বললেন, “আবিরকে সত্যি মধু দেয়া হয় নি। আবিরের জন্মের সময় আমার অবস্থা অনেক খারাপ ছিল তখন বাড়িতে দুজন ডাক্তার ছিল, কখন কি সমস্যা হয় সেজন্য । আর ডাক্তার রা কি মধু খেতে দিবে নাকি? বার বার নি*ষেধ করা হয়েছে কোনো প্রকার মধু,পানি খাওয়ানো যাবে না। আর তোর বড় আব্বুকে এখন কি দেখছিস, আবিরের জন্মের সময় ছেলেকে রেখে এক চুল ও কোথাও নড়ে নি। ডাক্তার যা যা বলেছে, যেভাবে বলেছে সেভাবেই সব করেছে। ” মেঘ মালিহা খানের দিকে তাকিয়ে নিরেট কণ্ঠে বলে, “এজন্যই তোমার ছেলে এমন কাটখোট্টা। ” মালিহা খান স্বাভাবিক কণ্ঠে বললেন, “আবির ছোটবেলা এরকম ছিল না। বিদেশে যাওয়ার আগে থেকেই কেমন জানি হয়ে গেছে। দেশে ফিরে তো আরও গম্ভীর হয়ে গেছে। সেসব কথা বাদ দে, তোরা তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করে পড়তে বস গিয়ে। ” সারাদিন শেষে রাতের বেলা মেঘ পড়ছিলো। পড়তে পড়তে হঠাৎ ই জান্নাত আপুর কথা মনে পরেছে। রবিবারে তো জান্নাত আপু আসার কথা। কিন্তু মেঘের তো জান্নাত আপুকে দেখার বা ওনার কাছে পড়ার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই। মেঘ পড়ছে আর অপেক্ষা করছে কখন তানভির বাসায় ফিরবে আর তানভিরকে বলবে, জান্নাত আপুর কাছে পড়বে না। রাত ১১ টার পর তানভির ফিরেছে। মেঘ পড়া শেষ করে

ভাইয়ার রুমের সামনে গিয়ে ডাকলো, “ভাইয়া..!” তানভির ভেতর থেকে বললো, “হ্যাঁ, ভেতরে আয়। ” মেঘ রুমে ঢুকে বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। তানভির বোনের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলো, “কিছু বলবি?” মেঘ কোমল কণ্ঠে বললো, “একটা কথা বলতাম।” তানভির স্বাভাবিকভাবে বললো, “হ্যাঁ বল।” মেঘ নির্দ্বিধায় বলে ফেললো, “জান্নাত আপুর কাছে আমি আর পড়বো না। তুমি ওনাকে না করে দিও। ” তানভির চিন্তিত কণ্ঠে শুধালো, “কেনো? কোনো সমস্যা? ” মেঘ মাথা নিচু করে বললো, “সমস্যা না। এমনি, পড়বো না। ” তানভির গলা খাঁকারি দিয়ে বললো, “বনু, এটার সমাধান আমি দিতে পারবো না। তুই ভাইয়ার সাথে কথা বলিস। ” মেঘ বিরস কণ্ঠে বললো, “তুমিই তো জান্নাত আপুকে এনেছিলে তাহলে তুমিই নি*ষেধ করে দিও। আমি ওনার সাথে কথা বলতে পারবো না।” তানভির এবার ঠান্ডা কণ্ঠে বলে উঠলো, “আমার কাছে জান্নাত আপুর নাম্বার নেই। ভাইয়ার কাছে আছে। তাছাড়া ভাইয়ার কথায় জান্নাত আপু তোকে পড়াতে আসছেন। তুই না পড়তে চাইলে ভাইয়াকে বলিস, ভাইয়া যা সি*দ্ধান্ত নিবে তাই হবে। এই বিষয়ে কথ বলার অধিকার আমার নেই। তোর অন্য কথা থাকলে বল। ” মেঘের মনের ভেতরের সুপ্ত ক্রো*ধ যেন মাথায় উঠে গেছে, চোখ মুখ লাল হয়ে যাচ্ছে। আর কোনো কথা না বলে রা*গে ফুঁ*সতে ফুঁ*সতে নিজের রুমে চলে গেলো। এত বছর তো তানভিরই মেঘের সকল সিদ্ধান্ত নিয়েছে তবে আজ কেনো আবির ভাইকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে! এটা মেঘ

কোনোভাবেই মানতে পারছে না। কিন্তু অষ্টাদশী তো জানে না, গত ৭ বছর যাবৎ আবিরের সিদ্ধান্তেই তানভির সবকিছু করেছে। সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠেই মেঘ রুমে পায়চারি করছে। আবির ভাইকে কিভাবে বলবে, কি বলবে তাই ভেবে পাচ্ছে না। আজ না আবার থা*প্পড় দিয়ে বসেন। তৎক্ষনাৎ নিজেকে নিজে সাহস দিয়ে বলে, "তুই কি এত দূর্বল নাকি! " দীর্ঘ সময়ের পায়চারিতে মেঘের নাকের ডগায় বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে গেছে যা মুক্তার ন্যায় চিকচিক করছে। বুকে সাহস নিয়ে অষ্টাদশী নিজের রুম থেকে বেড়িয়ে করিডোর দিয়ে আবিরের রুমের দিকে পা বাড়ালো, আবির শার্টের স্লিভ ফোল্ড করতে করতে নিজের রুম থেকে বের হচ্ছিলো, হঠাৎ মেঘকে দেখে সেখানেই দাঁড়িয়ে পরলো, মেঘ এক মুহুর্তের জন্য সবকিছু ভুলে আবির ভাইয়ের দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে রইলো, ছাই রঙের একটা শার্ট ইন করে পড়া, চোখে সানগ্লাস। ক্রাশ খাওয়ানো সেই লুকে দাঁড়িয়ে আছে আবির ভাই । সে তো জানে না, এই সুদর্শন লুকে ছোট্ট অষ্টাদশীর মনের মনিকোঠায় ব্য*থা অনুভব হয়। মেঘের অভিমুখে চাইলো আবির, নাকের ডগায় জমে থাকা ঘাম যেনো আবিরের দৃষ্টিকে টানছে, মেঘের শান্ত, অস্থির নয়নজোড়ার দিকে তাকিয়ে আবির মনে মনে বলে, "এই চোখে শুধু আমার সর্ব*নাশ দেখি। " মেঘের অভিব্যক্তি বদলাতে সময় লাগলো না, মাথা নিচু করে বুক ফুলিয়ে শ্বাস নিয়ে বললো, "আপনার সাথে আমার কথা আছে। " আবির স্বভাব-সুলভ ভারী কণ্ঠে বললো, "হুমম বল " মেঘ নিরেট কণ্ঠে বললো, "আমি জান্নাত আপুর কাছে

পড়বো না। ” মনের ভেতরের সুপ্ত ক্রোধটা এক নিমিষেই প্রকাশ করে ফেললো। মেঘের কথায় আবির স্বাভাবিক কণ্ঠে প্রশ্ন করলো, “কেনো?” মেঘ তপ্ত স্বরে জানালো, “ইচ্ছে নেই তাই পড়বো না। ” আবির ভ্রু গুটিয়ে বিরক্তি নিয়ে বললো, “তোর ইচ্ছেতে তো সবকিছু হবে না। তোকে জান্নাতের কাছেই পড়তে হবে। ” মেঘ আবারও ভেতরে ভেতরে রা*গে ফুঁসছে, গাল দুটা র*ক্তবর্ণ ধারণ করেছে। অধিক রাগে মেঘের গলার স্বর ভেঙে আসে, এবার কান্না জড়িত কণ্ঠে বলে উঠলো, “বললাম তো আমি ওনার কাছে পড়বো না। ” আবির দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে শক্ত কণ্ঠে বললো, “সব বিষয় নিয়ে ফাজলামো করবি না মেঘ। তোর ভালোর জন্যই জান্নাত কে আনা হয়েছে। আমি তোর খারাপ চাই না। ” মেঘ সহসা বলে ফেললো, “আমার ভালো-মন্দ আপনাকে ভাবতে হবে না। “। অন্তরের ক্রো*ধ যেনো এবার মেঘের চোখ বেয়ে গরিয়ে পরছে। মেঘের বলা কথাটা আবিরের হৃদয়ে লেগেছে। আবির কন্ঠ দ্বিগুণ ভারি করে বললো, “আজ থেকে জান্নাত পড়াতে আসবে, ঠিকমতো পড়াশোনা করবি কোনো প্রকার নাটক করলে এর ফল ভালো হবে না। ” কথাটা বলেই আবির মেঘকে পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছিলো। মেঘ মাথা উঁচু করে গলার স্বর শৃঙ্গে চড়িয়ে জানালো, “আমি ওনার কাছে পড়বো না, দরকার হলে আমি বড় আব্বুকে বললো। ” আবিরের মে*জাজ চ*রম লেবেলে খারাপ হলো। পায়ের র*ক্ত যেন মাথায় উঠে গেছে। সেখানেই দাঁড়িয়ে রা*গান্বিত স্বরে হুঙ্কার দিয়ে উঠলো, “কি বলবি আব্বুকে? জান্নাত পড়াতে পারে

না এটা বলবি? জান্নাতের আচার-আচরণ খারাপ এটা বলবি? আর তুই যে তোর টিচার কে নিয়ে উল্টাপাল্টা ভাবিস আর বাজে কথা বলিস এগুলো আব্বু শুনলে, সেটা কি ভালো হবে? এইযে তোকে এত ভালোবাসে, এত আদর করে, থাকবে তো এই ভালোবাসা? ” মেঘ সহসা মাথা নিচু করে, নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে রইলো, চোখ দিয়ে অঝরে পানি পরছে। আবির চোখ-মুখ গোটাল, নিজের রাগকে সংযত করার চেষ্টা করলো, রাশভারি কণ্ঠে বললো, “এই বাড়িতে থাকতে গেলে আমার মর্জিতেই তোকে চলতে হবে। ” কোনোরকমে কথা শেষ করে আবির নিজের মতো নিচে চলে গেল, কিছু না খেয়েই অফিসের জন্য বেড়িয়ে পরেছে। পিছন থেকে মালিহা খান, ইকবাল খান ডেকেছে কিন্তু আবিরের যেন সেদিকে কোনো হুঁশ নেই। মেঘ করিডোরে দাঁড়িয়ে কেঁদেই যাচ্ছে। অতিরিক্ত রা*গে মেঘের খুব কান্না পায়। খান বাড়ির নিয়ম ই যেনো এটা। আলী আহমদ খান আর মোজাম্মেল খানের আদেশ আবির আর তানভিরকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হয়। আবিরের আদেশ,শাসন মেঘকে পালন করতে হয়। তানভির শুধু মেঘকে না, মীম আর আদিকেও শাসন করে। তবে আবিরের মীম আর আদির ব্যাপারে কোনো মাথা ব্য*থা নেই। আবিরের ধ্যানে জ্ঞানে শুধুই মেঘ। মেঘ সকাল থেকে কিছুই খায় নি। কয়েকবার বন্যাকে কল ও করেছে কিন্তু বন্যা রিসিভ করে নি।দুপুর হয়ে গেছে মেঘ রুমে জোরে গান চালিয়ে বালিশে মুখ গুঁজে শুয়ে শুয়ে কাঁদছে । হঠাৎ ফোনে কল বেজে উঠেছে । মেঘ মুখ তুলে ফোনের দিকে তাকিয়ে

দেখলো বন্যা কল করেছে। মেঘ ফোন রিসিভ করতেই, বন্যা বলে উঠলো, “কিরে এত কল দিছিস কেনো? ” মেঘের কান্নার শব্দ শুনে বন্যা চিন্তিত স্বরে জিজ্ঞেস করলো, “কি হয়েছে বেবি? কাঁদছিস কেনো?” মেঘ কান্নার মাত্রা কমিয়েছে তবে এখনও ফুপিয়ে ফুপিয়ে কেঁদেই চলেছে... ক্রো*ধিত কণ্ঠে মেঘ বললো, “আমি এই বাড়িতে আর থাকবো না। চলে যাবো বাড়ি ছেড়ে। ” বন্যা কোমল কণ্ঠে শুধালো, “কেনো? কে কি বলছে তোকে?” মেঘ কণ্ঠ দ্বিগুণ ভারি করে বললো, “কেউ কিছু বলে নি, রেজাল্ট দিলে যদি পাশ করতে পারি তাহলে তুই যেই যেই ভার্সিটিতে আবেদন করবি সবগুলো ভার্সিটিতে আমার আবেদন টাও করবি। টাকা আমি দিব, তুই শুধু আবেদন করে দিবি। তারপর পরীক্ষার সময় একসাথে গিয়ে দুজনে পরীক্ষা দিব। বাংলাদেশের যে জায়গাতেই চান্স পাবো সেখানেই ভর্তি হবো, তারপরও এই বাড়িতে আমি থাকবো না। ” বন্যাঃ “সেসব পড়ে দেখা যাবে, আগে তুই বল হয়ছে কি?” মেঘ রা*গান্বিত কণ্ঠে বলা শুরু করলো, “কি হয়ছে জানি না। আমি এই বাড়িতে থাকবো না এটায় মূল কথা। একবার শুধু কোথাও চান্স পায়, দরকার হলে টিউশন পড়িয়ে আমি পড়াশোনা করবো, তারপর চাকরি করে, আম্মু আব্বুকে আমার কাছে নিয়ে যাবো। আব্বু না গেলে শুধু আম্মুকেই নিয়ে যাব। তবুও আমি এই বাড়িতে থাকবো না। যে যার মতো শুধু নিজেদের মর্জি আমার উপর চাপিয়ে দেয়। এতবছর সহ্য করেছি, এখন জীবনে আরেক হি*টলারের আবি*র্ভাব হয়েছে। আমার জীবনটা ত*ছনছ করে

দিচ্ছে। ওনি যা বলবেন, তাই মানতে হবে, যেভাবে বলবেন সেভাবেই চলতে হবে। কেনো? আমি ওনার কথা মেনে চলবো না। তুই আবেদন না করে দিলে বলিস আমি নিজে নিজেই করবো। বাই। ” একদমে কথাগুলো বলে ফোন কেটে বিছানার পাশে ফোন ফেলে আবারও বালিশে মুখ গুঁজে কাঁদছে। বন্যা আহাম্মকের মতো বসে রইলো। কি এমন হয়েছে যে মেঘ সব ছেড়ে ছুঁড়ে চলে যেতে চাইতেছে কিছুই তার মাথায় ঢুকছে না। আবির মেঘের রুমের দরজায় দাঁড়িয়ে মেঘের বলা প্রত্যেকটা কথা শুনেছে। আবির দাঁত পি*ষে, ক্ষিপ্ত দৃষ্টিতে চেয়ে আছে মেঘের দিকে। আবিরের এক হাতে কাচ্চির প্যাকেট অন্য হাতে চোখ থেকে খুলা সানগ্লাসটা মুষ্টিবদ্ধ করে চেপে ধরে আছে। সানগ্লাস ভেঙ্গে শুধু হাত কাটার অপেক্ষা। সকালে মেঘকে ঝেড়ে অফিসে যাওয়ার পর থেকেই আবিরের মন ছটফট করছিলো। কোনোভাবেই কাজে মন দিতে পারছিলো না। বাধ্য হয়ে অফিস থেকে বেরিয়ে জ্যাম পেরিয়ে অষ্টাদশীর পছন্দের রেস্টুরেন্ট থেকে কাচ্চি নিয়ে বাসার দিকে রওনা দিয়েছিল। মেঘ স্পেশাল কিছু রেস্টুরেন্ট ব্যতিত অন্য কোথাও থেকে কাচ্চি খায় না। গত সপ্তাহে আবিরের কাজের ব্যস্ততার ফলে সেই রেস্টুরেন্ট থেকে কাচ্চি নিয়ে খাওয়ানোর সময় সুযোগ হয়ে উঠে নি। তাই আজ সব কাজ ফেলে বেড়িয়েছিল। কিন্তু যাকে সে নিজের থেকেও বেশি ভালোবাসে সেই অষ্টাদশী তাকে ছেড়ে চিরতরে দূরে চলে যাওয়ার প্ল্যান করছে এটা শুনে যেনো আবিরের মাথায় আকাশ ভেঙে পরেছে, হৃদয় কেঁপে উঠেছে। নিজের অজান্তেই মনে মনে

বললো, “এত ঘৃ*ণা করিস আমায়?”মেঘের পানে ক্ষিপ্ত নয়নে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে আবির দুপা পিছিয়ে সিঁড়ির দিয়ে নেমে গেছে। ডাইনিং টেবিলের উপর কাচ্চির বক্স রেখে দ্রুত পায়ে মেইনগেট পেরিয়ে চলে যেতে নিলে আদি পেছন থেকে ডেকে উঠলো, “ভাইয়া..?” আদির ডাক আবিরের কান পর্যন্ত পৌছাল কি না কে যানে, ফিরেও দেখলো না। আবিরের অক্ষি যুগল আগ্নে*য়গি*রির লা*ভার ন্যায় লাল টুকটুকে হয়ে গেছে, গেইট পেরিয়ে বাইকে উঠতে গিয়ে হাতে থাকা সানগ্লাস টা ডাস্টবিনের দিকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়, নিজের ভেতরের সবটুকু ক্রো*ধ যেনো সানগ্লাস টার উপর ঢেলে দিয়েছে। সানগ্লাস ভেঙে খণ্ডবিখণ্ড হয়ে গেছে, সানগ্লাসের ভাঙা অংশের চাপে হাত ও কেটেছে ২-৩ জায়গাতে। এই হাত নিয়েই বাইক স্টার্ট দিয়ে নিজের অফিসে চলে যায়। অফিসে ঢুকতেই রাকিব ছুটে আসে, “স্যার, আপনি এত তাড়াতাড়ি চলে আসলেন যে? বউ কে সময় দেয়া শেষ?” আবির ক্রু*দ্ধ আঁখিতে চাইলো রাকিবের দিকে, কোনো কথা না বলে নিজের কেবিনে ঢুকে চেয়ারে চোখ ব*ন্ধ করে বসে পরলো। রাকিবও পেছন পেছন আবিরের কেবিনে ঢুকলো,সহসা চোখ পরলো আবিরের হাতের দিকে, আঁতকে উঠে ছুটে গিয়ে আবিরের হাত ধরে বললো, ” হাত কাটছিস কিভাবে? ” আবির হাত সরিয়ে বলল, “তুই এখন যা! আমি একটু একা থাকতে চাই! ” রাকিব আকুল স্বরে জানালো, “চলে তো যাবই, আগে বল কি হয়ছে?” আবির অনমনীয় কণ্ঠে উত্তর দিলো, ‘কিছু হয় নি। ” রাকিব ভাবুক স্বরে বললো, “কিছু একটা তো অবশ্যই

হয়েছে। আমি তোর বেস্টফ্রেন্ড এটা ভুলে যাইস না। এখন বল কি হয়ছে? মেঘ কিছু করেছে?” ক্রো*ধে আবিরের নাকের ডগা ফুলে আছে, নয়ন জোড়া এখনও র*ক্ত বর্ণ হয়ে আছে। বক্ষস্থলে থাকা হৃদপিণ্ডটা যেন দ্বিকবিদিক ছুটে বেড়াচ্ছে। আবির দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে কঠিন স্বরে বললো, “আমি ওর জীবনে কা*টার ন্যায়। আবির নামক কা*টা টা ওর জীবনে না থাকলে ও হয়তো অনেক বেশি হ্যাপি থাকতো। ” রাকিব ভ্রু কুঁচকে বললো, “কি বলছিস এসব! মাথা ঠিক আছে তোর। ” আবির শ্বাস ছেড়ে শক্ত কণ্ঠে উত্তর দিলো, “আমি ঠিক করেছি ওকে ওর মতো থাকতে দিবো। ওর ব্যাপারে কোনো কথা বলবো না। ” রাকিব এবার স্ব শব্দে হেসে উঠলো। আবির ভ্রু কুঁচকে ক্রো*ধিত নয়নে চেয়ে রইলো। রাকিবের সেদিকে হুঁশ নেই। হাসতে হাসতে পেট চেপে ধরেছে। আবির রাগান্বিত কণ্ঠে বললো, “অহেতুক হাসছিস কেন?” রাকিবের হাসি যেনো থামছেই না, আবিরের কাছ থেকে দূরে গিয়ে বলে, “বন্ধু এতকিছু করেও যখন প্রেমিকার মন পায় না তখন তার জন্য শুধু একটা গান ই গাইতে ইচ্ছে করছে... যার কারনে ছাড়লাম আমি জগত সংসার তবুও সে পাষাণ বন্ধু হইলো না আমার আমার দুঃখে কান্দে আকাশ কান্দেরে জমিন নিদয়া তুই পাষাণ বন্ধু এতোরে কঠিন তোর মনের পিঞ্জিরায় তুই কারে দিলি ঠাঁই কারে এতো করলি আপন পর করে আমায় তুই ভালো থাকিস বন্ধু আমার সুখে থাকিস রোজ তোর স্বপ্নে আমি আসবো ঠিকই নিতে তোর খোঁজ” আবির বসা থেকে উঠে দাঁড়াতেই রাকিব হাসতে হাসতে কেবিন থেকে

ছুটে বের হয়ে নিজের রুমে চলে গেলো। সারাদিনের ব্য*স্ততায় সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত হয়ে গেছে। অফিসের সবাই মোটামুটি চলে গেছে। রাকিবের গার্লফ্রেন্ড কলের পরে কল দিচ্ছে। গার্লফ্রেন্ডের নাম রিয়া। আবির দেশ ছেড়ে যাওয়ার পর রাকিবের সঙ্গে একই ভার্সিটিতে ভর্তি হয়েছিল রিয়া। সেই থেকে ধীরে ধীরে বন্ধুত্ব তারপর প্রেম। তাদের ২ বছরের রিলেশন চলছে। ৪-৫ বার কল করার পর রাকিব রিসিভ করে বলে উঠলো, "কি হয়েছে এত কল দিচ্ছো কেন? জানো না এ সময় অফিসে থাকি। " রিয়ার গলা দিয়ে কথা বের হচ্ছে না। কোনোরকমে বললো, "আমাকে একটা ইনহেলার আর কিছু ঔ*ষধ কিনে দিয়ে যেতে পারবা? " রাকিব এবার চিন্তিত স্বরে বললো, "কি হয়েছে তোমার?" "আজকে দুপুর পর্যন্ত বাসায় টুকিটাকি কাজ করছিলাম। বিকেল থেকেই শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। আস্তে আস্তে বাড়তেছে মনে হচ্ছে। " রাকিব কণ্ঠ ভারী করে বললো, "তুমি জানো তোমার ডা*স্ট অ্যা*লার্জি তারপরও কেন যাও কাজ করতে? আমি এসে কল দিচ্ছি। সাবধানে থাকো, বাই। " রাকিব আবিরের কেবিনের সামনে দাঁড়িয়ে বললো, " তুই বাসায় কখন যাবি?" আবির ল্যাপটপের দিকে তাকিয়েই উত্তর দিলো, "একটু দেরি হবে। কেনো?" রাকিব বললো, "রিয়া অসুস্থ, ঔষধ নিয়ে যেতে হবে। আমি কি চলে যাব?" আবির চোখ তুলে চেয়ে বললো, "সিরিয়াস কিছু?" রাকিব মৃদু হেসে উত্তর দিলো, "না না তেমন না। ওর তো সেই একটায় সমস্যা। " আবির স্বাভাবিক কণ্ঠে জানালো, "ঠিক আছে তুই যা। কোনো সমস্যা হলে জানাইস। "

রাকিব হাসিমুখে বললো, “তুই কাজ শেষ করে তাড়াতাড়ি চলে যাস। ” আবির মাথানিচু করে চুপচাপ কাজে মনোযোগ দিলো। অন্যদিকে মেঘকে পড়াতে জান্নাত আপু এসেছেন।মেঘ মনের বিরুদ্ধে বাধ্য হয়ে পড়তে বসেছে।। জান্নাত আপু কি পড়াচ্ছেন তাতে মেঘের কোনো মনোযোগ নেই। এক রাশ বির*ক্তি নিয়ে শব্দহীন বসে আছে । জান্নাত আপুর দিকে তাকিয়ে দেখলো একবার। খুবই সাদামাটা একটা মেয়ে, গায়ের রঙ ধবধবে সাদা না হলেও, চেহারায় অন্যরকম সৌন্দর্য আছে। বোরকা পড়া, সাথে সুন্দর করে হিজাব দিয়েছেন। মেঘ মনে মনে ভাবছে, “আমি কি ওনার মতো সুন্দরী না? আমি কি আপনার ভা*লোবাসা পেতে পারতাম না আবির ভাই?” পরদিন নাস্তার টেবিলে প্রত্যেকে উপস্থিত শুধু আবির ব্যতিত। আদির খাওয়া শেষ হতেই আকলিমা খান বললেন, “তোর ভাইয়া উঠছে কি না দেখে আয় তো। ” আদি দৌড়ে গেলো আবিরের রুমের সামনে। আদি বা মীম কেউ ই আবিরের রুমের ভেতরে ঢুকে না। দরজা থেকে ডেকে চলে আসে। আজও আদি দরজা থেকেই উঁকি দিয়ে দেখলো, কিন্তু আবির কোথাও নেই। দুবার ডেকেছেও কিন্তু সাড়া নেই। আদি করিডোর থেকে চিৎ*কার দিয়ে বললো, “ভাইয়া তো রুমে নেই, আম্মু” সবাই এবার মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে। রুমে নেই মানে কি, সকাল থেকে তো বের হতে দেখলাম না। তানভির গলা উঁচু করে বললো, “ছাদে দেখ তো আদি ” ভাইয়ের কথামতে আদি ছাদের দিকে গেলো। কিন্তু ছাদের গেইটেও তালা। আদি পুনরায় তা জানালো। মালিহা খান

চিন্তিত স্বরে বললেন, “আবির কি রাতে ফিরে নি?” মেঘ সহসা বড় আম্মুর দিকে চাইলো। এই বাড়িত ছেলেরা কখনো বাহিরে রাত কাটায় না। যত রাত ই হোক বাসায় ফিরে আসে এটায় খান বাড়ির রুলস। খুব প্রয়োজন হলে আলী আহমদ খানের থেকে অনুমতি নিয়ে থাকতে হয়।। ইকবাল খান সঙ্গে সঙ্গে ফোন বের করে আবিরকে কল দিয়েছেন। প্রথমবার রিসিভ হয় নি। দ্বিতীয় বার রিসিভ হতেই, ইকবাল খান শুধালেন, “কোথায় আছিস?” আবির ঠান্ডা কণ্ঠে উত্তর দিলো, “অফিসে” ইকবাল খান: তুই বাসায় ফিরিস নি কাল?” আবির: না। ইকবাল খান: কেনো? আবির গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দিলো, “অফিসে কাজ ছিল। ” ইকবাল খান তপ্ত স্বরে বললেন, ” ও আচ্ছা। আজ আমাদের অফিসে মিটিং আছে। আসবি না?” আবির ভারী কণ্ঠে জানালো, “চলে আসবো। এখন রাখছি কাজ আছে” আলী আহমদ খান রাগে বলে উঠলেন, “দুদিন হয়নি নিজের কোম্পানি খুলেছে এখনই ব্য*স্ততা দেখায়, কই আমাদের তো রাতে অফিসে থেকে কাজ করতে হয় নি কখনো। ” মালিহা খানের দিকে তাকিয়ে শ*ক্ত কণ্ঠে বললেন, “ছেলেকে বুঝাও, বাহিরে থাকাকালীন কি করেছে না করেছে সেসব আমার বাড়িতে চলবে না। ” ডাইনিং টেবিলে নিস্তব্ধতা ছেড়ে গেছে। কারো মুখে কোনো শব্দ নেই। আলী আহমদ খান উঠে গেছেন। মালিহা খান ডাইনিং এ এসে ইকবাল খানকে শুধালেন, “আবিরের জন্য কি খাবার দিয়ে দিবো? ও তো গতকাল সকালে না খেয়ে বেড়িয়েছিল। তারপর থেকে তো আর দেখি নি। ” আদি ততক্ষণে

ডাইনিং এর কাছে এসে উত্তেজিত কণ্ঠে বললো, “গতকাল দুপুরে ভাইয়া আসছিলো। আমি ভাইয়াকে ডাক ও দিয়েছি কিন্তু ভাইয়া শুনে নি। তারপর টেবিলে কাচ্চিবিরিয়ানির বক্স দেখে আমি সেটা নিয়ে উপরে আপুদের কাছে চলে গেছিলাম। তাই তোমাদের কাউকে জানাতে মনে নেই। ” আদির কথা শুনে মেঘ বিড়বিড় করে বললো, “কাচ্চিবিরিয়ানি আবির ভাই আনছিল? আগে জানলে ওনার আনা খাবার খাইতাম ই না। নিজের ইচ্ছে মতো মা*রবেন, ঝা*ড়বেন আবার মন চাইলে খাবার এনে খাওয়াবেন আর আমি সব ভুলে যাবো। এমন মেয়ে আমি না। ” ইকবাল খান বললেন, “বড়ভাবি আপনি খাবার দিয়ে দেন, আবির অফিসে আসলে খেয়ে যাবে নে। ” রাত ১০ টার দিকে আবির বাসায় ফিরেছে। ততক্ষণে তিন কর্তী ব্যতিত সকলের খাওয়া শেষ। আবির ফ্রেশ হয়ে, মা কাকিয়াদের সাথে খেতে বসেছে। এইযে মা, মামনি আর কাকিয়া এত এত প্রশ্ন করছে আবির নিসাড়ায় সব শুনছে। কোনো উত্তর দিচ্ছে না। কোনোরকমে খাওয়া শেষ করে রুমে চলে এসেছে। সময় চলছে নিজস্ব গতিতে। মাঝখানে কেটে গেলো ১০ দিন। আবির আর মেঘের দেখা হলেও কেউ কারো সাথে কথা বলে না। আবির খাবার টেবিলে একসাথে বসলেও মেঘের দিকে একবারের জন্যও তাকায় না। মেঘ ঠিকই দু-একবার তাকিয়ে দেখে কিন্তু আবির যেনো নিজকে শক্ত আবরণে আবৃত করে রেখেছে। বুকের উপর পাথর চাপা দিয়ে দিন কাটাচ্ছে। আবির যতক্ষণ বাসায় থাকে ততক্ষণ নিজের রুমের দরজা বন্ধ করে রাখে। মেঘও নিজের মতো

খাইতেছে, মীম আর আদির সাথে আড্ডা দিচ্ছে। জান্নাত আপু পড়িয়ে যাচ্ছে। কোচিং থাকলে কোচিং এ যাচ্ছে। বাসায় এসে পড়াশোনা করছে সবই নিজের মতো করছে। শুধু মাঝে মাঝে ভাবে, "আবির ভাইয়ের কি কিছু হয়েছে!" Salma Chowdhury – সালমা চৌধুরী আজ মেঘের HSC রেজাল্ট পাবলিশ হবে। সকাল থেকে না খেয়ে বসে আছে মেয়েটা। আলী আহমদ খান আর মোজাম্মেল খান অফিসে চলে গেছেন, ইকবাল খান কোনো এক দরকারে আদির স্কুলে গিয়েছেন। আবিরও সকাল সকাল অফিসের জন্য বেরিয়ে গেছে। আবিরের কিছুক্ষণ পর তানভিরও বেড়িয়েছে । ঘন্টাখানেক পর রেজাল্ট পাবলিশ হয়েছে, মাহদিবা খান মেঘ Golden GPA-5 পেয়েছে। খান বাড়িতে খুশির আমেজে ভরে উঠেছে। কিছুক্ষণের মধ্যে মোজাম্মেল খান আর আলী আহমদ খান মিষ্টি নিয়ে বাসায় হাজির হয়েছেন। ইকবাল খানও আদিকে নিয়ে ফেরার পথে কয়েক কেজি মিষ্টি নিয়ে এসেছেন। আবিরের পর মেঘ ই পড়াশোনায় খান বাড়ির মুখ উ*জ্জ্বল করেছে। মাঝখানে তানভির 4.00+ রেজাল্ট নিয়ে SSC, HSC পাশ করেছে। মালিহা খান ছেলেকে কল দিচ্ছেন, কিন্তু আবির কল ধরছে না। তানভিরকেও কল দিয়েছেন, কিন্তু ব্য*স্ত বলছে। বাড়িতে এত আনন্দ কিন্তু দু ভাই যেনো নিরুদ্দেশ। বেশ কিছুক্ষণ পর আবির আর তানভির বাসায় ফিরেছে। তানভির একটা রেপিং করা বক্স মেঘের হাতে দিয়ে হাসিমুখে বললো, "Congratulation my dear Bonu " মেঘ একগাল হেসে জানালো, "Thank you Vaiya. " আবির

কোনোদিকে না তাকিয়ে নিঃশব্দে দীর্ঘ পা ফেলে নিজের রুমে চলে গেছে। মেঘ আবিরের দিকে চেয়ে মনে মনে বললো, "একটা মানুষ এতটা হৃ*দয়হীন হয়ে থাকে কি করে, সামান্য একটা Congress শব্দও কি বলা যেতো না...??" তানভির মেঘের জন্য স্পেশালি রসমালাই নিয়ে আসছে। মেঘ তানভিরকে কয়েক পিস খাইয়ে বক্স নিয়ে দৌ*ড়ে গিয়ে ডাইনিং এ বসে খাচ্ছে যেনো অন্য কেউ ভাগ না বসায়। তানভির নিজের রুমে ফ্রেশ হতে চলে গেছে। ২০ মিনিটের মধ্যে আবির অফিসের জন্য রেডি হয়ে বের হচ্ছে। আবিরের পিছন পিছন তানভিরও নামছে। মালিহা খান আবিরকে ডেকে বললেন, "এই সময় আবার কোথায় যাচ্ছিস?" আবির ভারী কণ্ঠে বললো, "অফিসে কাজ আছে। " মালিহা খান আবারও বললেন, "মিষ্টি খেয়ে যা " আবির কণ্ঠ দ্বিগুণ ভারি করে বললো, " সময় নেই। " মেঘ তখনও ডাইনিং এর চেয়ারে বসে আছে। আবির ভাইয়ের কাটখোট্টা জবাবে অষ্টাদশীর মন খারাপ হলো। মনে মনে ভাবলো, "সত্যি ই কি আপনার সময় নেই? নাকি আমার রেজাল্টের মিষ্টি আপনি খেতে চান না,?" আবির চলে যাচ্ছে, হালিমা খান আবিরের যাওয়ার দিকে চেয়ে, পুনরায় সিঁড়িতে থাকা তানভিরের পানে তাকিয়ে চিন্তিত স্বরে বললেন, "আমি আরও ভাবলাম বোনের রেজাল্টের খুশিতে তোরা দু'ভাই মিলে এলাকায় মিষ্টি দিয়ে আসবি। " তানভির মৃদু হেসে প্রশ্ন করলো, "এক বাড়িতে কতবার মিষ্টি দিতে হবে?" হালিমা খান ছেলের কথার মানে বুঝলো না।। কপাল কুঁচকে বললেন, "মিষ্টি তো দেয়া হয় নি

এখনও। ” তানভির হাসিমুখে জানালো, “ভাইয়া আর আমি এলাকার সব বাড়িতে মিষ্টি দিয়েই বাসায় এসেছি। ” মেঘ বিস্ময়কর দৃষ্টিতে ভাইয়ার অভিমুখে তাকিয়েছে, অষ্টাদশীর চোখে মুখে উজ্জ্বলতা ফুটে উঠছে, ১০ দিনের রা*গ যেনো ১০ সেকেন্ডেই হাওয়া হয়ে গেছে।প্রিয় মানুষ বরাবরই প্রিয় থাকে, মাঝে মাঝে শুধু অভিমানের চাদরে ঢেকে যায়। মেঘ বিড়বিড় করে বললো, ” আমি কি ঠিক শুনেছি? আবির ভাই আমার রেজাল্টের খুশিতে এলাকায় মিষ্টি খাইয়েছেন? তাহলে বাসায় এমন মুড নিয়ে ছিলেন কেন? একটা মিষ্টি মুখেও দিলেন না কিন্তু কেনো? ওনি কি কোনো বিষয়ে রে*গে আছেন?” মেঘের পাশাপাশি সবাই যেনো অবাক চোখে তাকিয়েছে তানভিরের দিকে। তানভিরের কথায় আকলিমা খান ভ্রু কুঁচকে বললেন, “আমাদেরকে জানালে কি এমন হতো শুনি, আবির বা তুই কেউ তো বলতে পারতি ! ” তানভির হাসিমুখে উত্তর দিলো, “ভাইয়া লোক দেখানো কাজ পছন্দ করে না জানোই তো। তাছাড়া আমি তো এখন বললাম ই তোমাদের । ” মোজাম্মেল খান আবিরের এমন কান্ডে খুশি হয়ে বললেন, ” যাক বড় ভাইয়ের দায়িত্ব পালনে আবির অবহেলা করে নি, এটায় তো দরকার। ” আব্বুর মুখে এমন কথা শুনে মেঘের মুখটা মলিন হয়ে গেলো। আবির ভাইকে তো সে বড় ভাই হিসেবে ভাবেই নি কখনো। আবির ভাই হলে ক্রা*শ, না হলে বাঁ*শ। ভাই, টাই কিছু না। রাত ১০ টার দিকে আবির ফিরেছে, মেঘ তখন পড়ছিলো। আবির রাতে খাবার খেয়ে নিজের রুমে গিয়ে দরজা বন্ধ করে ফেলছে।

বেশকিছুক্ষণ পর মেঘ নিচে আসতেই আকলিমা খান বলে উঠলেন, “কিরে আবিরকে মিষ্টি দিলি না?” মেঘ আশ্চর্য নয়নে চেয়ে বললো, “তোমরা দাওনি কেন?’ হালিমা খান স্বাভাবিক কণ্ঠে জানালেন, “আমরা তো বলেছি, ও তো খাবে না বলে চলে গেলো। তুই একটু নিয়ে যা, তুই বললে যদি খায়!” একটা প্লেটে কয়েকটা মিষ্টি নিয়ে মেঘ গুটিগুটি পায়ে করিডোর পেরিয়ে আবির ভাইয়ের রুমের সামনে হাজির হলো। এক হাতে দরজা ধাক্কা দিতেই বুঝতে পারলো ভেতর থেকে দরজা ব*ন্ধ। দরজা বন্ধ দেখে মেঘের খটকা লাগলো, আবির ভাই আসার পর থেকে কখনও দরজা বন্ধ করে ঘুমায় না তাহলে ইদানীং দরজা বন্ধ করে রাখেন কেনো? রুমের ভেতরে কম সাউন্ডে গান ভাজতেছে। মেঘ মনোযোগ দিয়ে শুনার চেষ্টা করলো, “এই অবেলায় তোমারই আকাশে নীরব আপসে ভেসে যায় সেই ভীষণ শীতল ভেজা চোখ কখনো দেখাইনি তোমায় কেউ কোথাও ভালো নেই যেন সেই কতকাল আর হাতে হাত অবেলায় কতকাল আর ভুল-অবসন্ন বিকেলে ভেজা চোখ দেখাইনি তোমায়” মেঘ ওষ্ঠ উল্টে বিড়বিড় করে বললো, “আবির ভাই এত কষ্টের গান শুনছে কেন? ব্যাপার কি!” মেঘ দরজায় টুকা দিয়ে আস্তে করে ডাকলো, ” আবির ভাই” ভেতর থেকে কোন জবাব না আসায় মেঘ উচ্চস্বরে আবার ডাকলো, “আবির ভাই ” সহসা গান বন্ধ হয়ে গেলো, সি*গারেট হাতে দরজা খুলে দিল আবির। পড়নে কালো টিশার্ট আর টাওজার, কপালে আর নাকে ঘামের বিন্দু বিন্দু পানি জমে আছে,সাথে ঘামে জবজবে

পুরো শরীর, অগোছালো চুল, শ্যামবর্ণের মুখশ্রী মলিন হয়ে আছে। নিরেট কণ্ঠে বললো, “কিছু বলবি?” আবির ভাইয়ের হাতে দ্বিতীয় বারের মতো সি*গারেট দেখে মেঘের হৃ*দয় চূ*র্ণবিচূ*র্ণ হলো। হাজার রাগ, অভিমান থাকুক তারপরও আবির ভাইয়ের প্রতি মেঘের সুপ্ত ভালোবাসা এখনও বর্তমান । মেঘ আর্তনাদ করে বললো, “আপনি আবারও সি*গারেট খাচ্ছেন?” আবির গম্ভীর কণ্ঠে শুধালো, “তাতে তোর কোনো সমস্যা?” মেঘ মাথা নিচু করে শীতল কণ্ঠে জবাব দিলো, “হ্যাঁ।” আবির কপাল কুঁচকে তাকিয়ে শক্ত কণ্ঠে বললো, ” কি সমস্যা? ” প্রশ্ন করে দরজা থেকে সরে বিছানার পাশে বসে সি*গারেট ঠোঁটে ধরেছে, অকস্মাৎ মেঘ দ্রুত পায়ে আবিরের কাছে গিয়ে মুখ থেকে সি*গারেট টেনে ফ্লোরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে, রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে জবাব দিলো, “আপনি সি*গারেট খান এটায় আমার সমস্যা।” আবির আশ্চর্য নয়নে চেয়ে রইলো অষ্টাদশীর লালিত মুখবিবরের অভিমুখে । মেঘ রা*গে ফুঁসছে আর ঘন ঘন শ্বাস ছাড়ছে। আবার মনে মনে ভীত হচ্ছে, “আবির ভাই যদি মা*রেন। ” তৎক্ষনাৎ নিজেকে সাহস দিলো, “মা*রলে মা*রবে কিন্তু ওনাকে সিগারেট খেতে আমি দেখতে পারবো না। ” আবির ভারী কণ্ঠে শুধালো, “কেনো আসছিলি?” মেঘের মাথা থেকে ঐসব চিন্তা সরে গেছে। তবুও কিছুটা চিন্তিত স্বরে বললো, “আপনার জন্য মিষ্টি নিয়ে আসছি ” আবির ঠান্ডা কণ্ঠে উত্তর দিলো, “আমি মিষ্টি খাব না, নিয়ে যা। ” মেঘ ভ*য়ে ভ*য়ে জিজ্ঞেস করল, ” কেন খাবেন না? আমার রেজাল্টে কি আপনি খুশি না?” আবির

নিস্ত*ব্ধ হয়ে ফ্লোরে পরে থাকা আধখানা সি*গারেটের পানে চেয়ে আছে। মেঘ পুনরায় বললো, “কিছু বলছেন না যে” আবির গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর দিলো, ” তুই খুশি থাকলেই হলো। আমার খুশিতে কি আসে যায়। ” আবিরের নিরুদ্বেগ কণ্ঠে বলা কথায় মেঘের মনে কেমন যেনো খটকা লাগলো। মেঘ চিন্তিত কণ্ঠে শুধালো, “আবির ভাই, আপনি কি আমার উপর কোন কারণে রে*গে আছেন?” আবির এক পলক তাকালো মেঘের দিকে তারপর তপ্ত স্বরে বললো, “আচ্ছা মেঘ, আমি যদি দেশ ছেড়ে একেবারে চলে যায়, তাহলে তো তুই এই বাড়িতে আনন্দে থাকতে পারবি। তাই না? ” মেঘ আশ্চর্য নয়নে চাইলো আবির ভাইয়ের দিকে, বুকের ভেতর হৃ*দপিণ্ড ভ*য়ংক*রভাবে কাঁপছে । এই দেড় মাসেই আবির ভাই অষ্টাদশীর হৃদয়ের সবটুকু জায়গা জুড়ে অবস্থান করছে। আবির ভাই দেশ ছেড়ে চলে যাবে, এই কথাটায় কোনোভাবে মা*নতে পারছে না মেঘ। মেঘের সিক্ত নয়নজোড়ায় আবির ভাইয়ের প্রতি এক সমুদ্র ভালোবাসা স্পষ্ট প্রতীয়মান হচ্ছে। কণ্ঠ খাদে নামিয়ে মেঘ বললো, “আপনি কেনো চলে যাবেন?” আবির রাশভারি কণ্ঠে বললো, “যদি সত্যি সত্যি এমন হয় যে আমি চলে গেলে তুই বাড়ি ছেড়ে যাবি না তাহলে আমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চিরকালের জন্য দেশ ছেড়ে চলে যাবো। তবুও তুই ভালো থাকিস আর এই বাড়ির রাজকন্যা হয়ে থাকিস সারাজীবন। ” মেঘের সমস্ত আকাশ ঘুরছে, আবির ভাই এত কঠিন কথা কেনো বলছেন তার কারণ খুঁজে পাচ্ছে না অষ্টাদশী। অনেক ভাবার পর মনে পরলো, ১০ দিন আগের

ঘটনা, মনে মনে ভাবলো, “তাহলে কি বন্যার সাথে বলা কথাগুলো আবির ভাই শুনে ফেলছিল?” মেঘ বেশখানিকটা সময় নিরব থেকে শান্ত কণ্ঠে বললো, “আসলে ঐদিন আমার খুব রা*গ উঠছিল ।জান্নাত আপুর কাছে পড়তে চাই নি তবুও....” আবির কণ্ঠ দ্বিগুণ ভারি করে বললো, ” জান্নাত পড়াতে না পারলে, আমি আনতাম ই না। কেনো জান্নাত কে এনেছি, কেনো তোকে জান্নাতের কাছে পড়তে জো*র করছি সবটায় জানতে পারবি শুধু একটু ধৈ*র্য রাখ আর পড়াশোনা কর মন দিয়ে। আর নতুন টিউটর আনলে তোর মানিয়ে নিতেও সময় লাগবে। এখন তোর হাতে এত সময় নেই। একটা কথা মাথায় রাখিস, আর যাই হোক আমি তোর খারাপ চাই না। এইটুকু বিশ্বাস আমার উপর রাখতে পারিস। ” প্রথম কথাগুলো ভারি স্বরে বললেও শেষ কথাগুলো শীতল কণ্ঠে বললো আবির। মেঘ মনে মনে ভাবলো, “সত্যিই তো, জান্নাত আপু পড়ানো তে তো কোনো সমস্যা নেই। ওনাদের মধ্যে যাই থাকুক তাতে আমার কি। ” মেঘ ছোট করে বললো, “সরি, আবির ভাই। আর এমন করবো না” আবির স্বভাব-সুলভ ভারি কণ্ঠে উত্তর দিলো, “সমস্যা নেই, এখন যা তুই। ” মেঘ চিবুক নামিয়ে অভিমানী স্বরে বললো, “আপনি মিষ্টি না খেলে আমি যাব না।” আবির নিরেট কণ্ঠে বললো, “বললাম তো খাবো না, তুই যা।” মেঘ শক্ত কণ্ঠে বলে উঠলো, “বললাম তো যাবো না, একটা খান। ” আবির এবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাইলো, কিছু বলার আগেই মেঘ আহ্লাদী কণ্ঠে বলে উঠলো, “প্লিজ, আবির ভাই! ” সঙ্গে সঙ্গে আবিরের

অভিব্যক্তি বদলে গেলো, মুচকি হেসে বললো, “ঠিক আছে, দে।” আবির ভাইয়ের হাসিতে মেঘ গলে পানি হয়ে গেছে। রোমান্টিক মু*ডে বললো, “আমি খাইতে দেয় মিষ্টি? ” আবির মৃদু হেসে জানালো, “ঠিক আছে।” মেঘ মিষ্টির প্লেট নিয়ে আবির ভাইয়ের কাছাকাছি এসে দাঁড়ালো। আবির ভাইয়ের শরীর থেকে আসা পুরুষালি গ*ন্ধে মেঘের সর্বাঙ্গে ঝাঁকুনি দিলো। আবির ভাইয়ের কাছাকাছি এলে মেঘ নিজের অ*স্তিত্ব হারিয়ে ফেলে, ১০ দিনের রা*গ, অভিযোগ, অভিমানরা যেনো নিমিষেই বিলীন হয়ে গেছে। আবির ভাই মানেই একপ্রকার নে*শা। কাছে আসলেই অষ্টাদশী সেই নে*শায় আ*সক্ত হতে বাধ্য। হৃ*দপিণ্ডের কম্পনের তীব্রতা ক্ষণে ক্ষণে বেড়েই যাচ্ছে। মেঘ ধীর হস্তে কা*টা চামচে একটা মিষ্টি তুলে আবির ভাইয়ের মুখের সামনে ধরলো। আবিরও চুপচাপ খেয়ে নিলো। মিষ্টি খেয়ে আবির থমথমে কণ্ঠে শুধালো, “আরেকটা কি খেতে হবে? ” মেঘ সঙ্গে সঙ্গে উপরনিচ মাথা নাড়লো। আবির মনে মনে বললো, “তোর এই পাগ*লামি যেনো সারাজীবন থাকে। ” মেঘ আরেকটা মিষ্টি এগিয়ে দিলো আবির ভাইয়ের মুখের কাছে। আবির দ্বিতীয় মিষ্টি শেষ করে ছোট করে বললো, “বস এখানে” মেঘ সঙ্গে সঙ্গে বিছানার পাশে বসলো, আবির একটা মিষ্টি কেটে অর্ধেকটা মেঘের মুখে দিলো। মেঘ যেনো নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না। আবির ভাই তাকে মিষ্টি খাওয়াচ্ছে। মেঘ চুপচাপ মিষ্টি টা খেয়ে নিলো। আবির দ্বিতীয় বার কিছুটা মিষ্টি মেঘের মুখের সামনে ধরে বললো, “দু’বার না খাওয়ালে তো তুই

আবার পানিতে পরে যাবি। নে হা কর।” মেঘ মিষ্টি মুখে নিয়ে একগাল হাসলো। মিষ্টি খেয়ে মেঘ শান্ত স্বরে ডাকলো, “আবির ভাই” আবির দৃষ্টি মেঘের মুখ বরাবর নিয়ে সুমধুর কণ্ঠে উত্তর দিলো, “হুমমমমম। ” সেই দরদ ঢালা কণ্ঠে বলা হুমমমম টা অষ্টাদশীর মনের ভেতর উত্তাল-পাতাল ঢেউয়ের সৃষ্টি করেছে।। এই হুমমম তে মিশে আছে সীমাহীন ভালোবাসা। আবিরের দৃষ্টি অষ্টাদশীর মুখমণ্ডলে। ডাগর ডাগর আঁখিতে দীর্ঘ মনোযোগ দিয়ে চাইলো, গভীর নলকূপের ন্যায় বিমোহিত সেই নয়নজোড়া আবিরকে স্থির থাকতে দিচ্ছে না। আবির চাইলেও নিজেকে শক্ত খোলসে আবদ্ধ রাখতে পারছে না। দৃষ্টিতে নামিয়ে নিলো ফ্লোরে। মেঘ ঢুক গিলে নিজেকে কন্ট্রোল করে শান্ত আঁখিতে আবির ভাইয়ের দিকে চেয়ে বললো, “একটা কথা বলবো?” আবির নিচ দিকে তাকিয়ে থেকেই উত্তর দিলো, “বল” মেঘ ভীত স্বরে প্রশ্ন করলো, “যদি বলি আপনি আর সি*গারেট খাবেন না, তাহলে কি আপনি মানবেন?” আবিরের ঠোঁট কিছুটা প্রশস্ত হলো, দৃষ্টি তখনও ফ্লোরে,মনে মনে বললো, “তুই বললে হাসিমুখে জীবনটাও দিয়ে দিতে রাজি, সেখানে সি*গারেট আর এমন কি। আজ এই মুহুর্ত থেকে আমি আবির সি*গারেট ছাড়লাম। আর কোনোদিন ছুঁয়েও দেখবো না। প্রমিজ। ” মেঘ আস্তে করে বললো, “কি হলো?” আবির মেঘের দিকে আড়চোখে চেয়ে বললো, “ঠিক আছে, চেষ্টা করবো। ” এতটুকুতেই মেঘ মহাখুশি। না যে করেন নি সেই অনেক। মেঘ বুক ফুলিয়ে শ্বাস টেনে, সাহস নিয়ে বললো, “আরেকটা কথা জিজ্ঞেস

করি?” আবির ঠান্ডা কণ্ঠে বললো, “বল” মেঘ ঢুক গিলে শীতল কণ্ঠে প্রশ্ন করলো, “চুল, দাঁড়ি বড় হয়েছে, কাটান না কেনো?” মেঘের এমন প্রশ্নে আবির মূর্খবৎ হয়ে গেলো, মেঘের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে, ঠান্ডা কণ্ঠে শুধালো, “কেনো? এভাবে ভালো লাগে না?” মেঘ মিষ্টির প্লেট হাতে নিয়ে চুপচাপ উঠে দরজা পর্যন্ত গিয়ে, পেছনে তাকিয়ে বললো, “আপনাকে সব ভাবেই ভালো লাগে, তবে এখন আপনার ড্যাশিং লুক টা missing. ” কথাটা বলেই করিডোর দিয়ে অন্তহীন ছুটে নিজের রুমে চলে গেলো। আবির দরজার দিকে চেয়ে নিঃশব্দে হাসছে।মেঘ চলে যাওয়ার পর আবির পাশ থেকে ফোন নিয়ে মেঘকে হাইড করে ফে*সবুকে পোস্ট দিয়েছে, “ভালবাসি তোকে সেই পুরনো অনুভবে, এ মনের জগতে রাজকুমারী শুধু তুই। ” কেটে গেল আবিরের নির্ঘুম রাত তবে এই রাত কষ্টে*র নয়, কাউকে মিস করার তী*ব্র অনুভূতি সারারাত ঘুমাতে দেয়নি আবির কে। শুক্রবার ১০ টার পর আবির ঘুম থেকে উঠে ফ্রেশ হয়ে বেড়িয়ে গেছে বাসা থেকে। ঘন্টাখানেক পর মেঘ সোফায় বসে টিভি দেখছিল। আবির সাদা রঙের শর্ট হাতার টি-শার্ট পড়েছে, শক্তপোক্ত বাহুতে টিশার্টের হাতাটা টাইট হয়ে আছে। চুল-দাঁড়ি ছোট করে কেটে, সুন্দর একটা হেয়ারস্টাইলও করেছেন। চোখে সানগ্লাস দিয়ে ড্যাশিং লুকে বাসায় ঢুকছে। মেঘের চোখ দরজার দিকে পরতেই আবির ভাইকে দেখে বিস্ময়কর চোখে তাকিয়ে অকস্মাৎ বলে উঠলো, “Hai! Me Mar Jaunga” আবির কাছাকাছি এসে সানগ্লাস খুলে মেঘের দিকে তাকিয়ে দু’বার ভ্রূ

নাচালো, সঙ্গে সঙ্গে মেঘ ফিক করে উঠলো, হাসির দরুন মেঘের গালে থাকা বিউটি স্পট টা স্পষ্ট প্রতীয়মান হচ্ছে। আবির দৃষ্টি সরিয়ে নিজের রুমে চলে গেছে। আবির ভাইকে দেখার পর আর টিভি দেখতেও ইচ্ছে হচ্ছে না মেঘের। তারপরও কিছুক্ষণ টিভির দিকে চেয়ে রইলো কিছুক্ষণ পর উঠে রুমের দিকে যেতে নিলে আবারো আবির ভাইকে দেখতে পেলো, পেস্ট রঙের একটা পাঞ্জাবি, মাথায় টুপি দিয়ে নিজের রুম থেকে বের হচ্ছে নামাজে যাওয়ার জন্য।। মেঘ ঠায় দাঁড়িয়ে তাকিয়ে রইলো আবির ভাইয়ের পানে, দৃষ্টি যেনো সরছেই না। আবির মেঘের কাছাকাছি এসে মেঘের চোখে দিকে তাকিয়ে থমথমে কণ্ঠে শুধালো, "এখন ভালো লাগছে তো?" মেঘ উপর-নিচ মাথা নেড়ে, চিবুক নামিয়ে বিড়বিড় করে বললো, "ফিদা" মেঘ বিড়বিড় করে বললেও আবির শব্দটা স্পষ্ট শুনেছে , আবির মুচকি হেসে সহসা স্বাভাবিক কণ্ঠে বললো, "আমার রুমে টেবিলের উপর তোর জন্য গিফট রাখা আছে। দেখিস পছন্দ হয় কি না! " আবির দীর্ঘ পায়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে বেড়িয়ে যাচ্ছে মেইনগেইট পেরিয়ে, অষ্টাদশী অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রাজপুত্রের গমনপথে, অধরের কোণে মৃদু হাসিটা এখনও লেগেই আছে। কয়েক মুহুর্ত পর আবিরের রুম থেকে নিজের জন্য রাখা গিফট টা নিয়ে নিজের রুমে চলে আসছে। একটা ছোট বক্স সাথে একটা বড় বক্স। ছোট একটা চিরকুট ও আছে। "সংকল্প, শক্তি, সাহস এবং আত্মবিশ্বাসের সাথে জীবনের প্রতিটা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হবে। অনেক অনেক শুভকামনা

রইলো তোর জন্য । অভিনন্দন, Dear Sparrow. ” কয়েকবার চিরকুট টা পড়ে মেঘ শুধু Sparrow লেখাটার দিকে চেয়ে আছে। আবির ভাই যে স্পেশাল কোনো নামে মেঘকে সম্বোধন করেছেন তা দেখেই মেঘ খুশিতে আত্মহারা হয়ে গেছে। ছোট বক্সের রেপিং সরাতেই চোখে পরলো লাল রঙের একটা সুন্দর বক্স, সচরাচর গোল্ডের জিনিসপত্রের ক্ষেত্রে এগুলো বেশি থাকে। বক্স খুলতেই চোখে পরলো সুন্দর ডিজাইনের একটা গোল্ডের ব্রেসলেট। মেঘ আশ্চর্য নয়নে তাকিয়ে আছে ব্রেসলেটের দিকে। মেঘের সকল অপূর্ণ ইচ্ছে আবির ভাই যেনো ধীরে ধীরে পূরণ করেই যাচ্ছে। iPhone, ল্যাপটপ, নুপুর, বাইকে ঘুরা থেকে শুরু করে ছোট বড় কত কত ইচ্ছে পূরণ করতেই যেনো মেঘের জীবনে আবির ভাইয়ের আগমন ঘটেছে। ব্রেসলেট হাতে দিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছে, ফোন নিয়ে কয়েকটা ছবিও তুলেছে। তারপর বড় বক্সটা খুলতে দ্বিতীয় বারের মতো বড়সড় শ*কট খেলো। ১০ কালারের ২ সেট করে মোট ২০ ডজন কাঁচের রেশমি চুড়ি বক্সে জ্বলজ্বল করছে, সাথে অনেকগুলো আংটি। মেঘ চুড়ির দিকে চেয়ে মনে মনে ভাবছে, “যেই মানুষটা আমার সাথে ঠিকমতো কথায় বলেন না, উঠতে বসতে এত রা*গ দেখান, থা*প্পড় মা*রেন ওনি এসব কিছু আমার জন্য এনেছেন? যাকে এতদিন অনুভূতিহীন ভেবে আসছি ওনি আসলে এতটাও অনুভূতিহীন নয়। ” মেঘ সব কালারের চুড়ি পড়ে পড়ে ছবি তুলেছে, গতকাল তানভির একটা ব্র্যান্ডের ঘড়ি দিয়েছিল, সেটা পরেও ছবি তুলেছে, সবগুলো

হাতের ছবি একসাথে করে ফেসবুকে পোস্ট করেছে। পোস্ট করার সঙ্গে সঙ্গে বন্যাকে কল করেছে, বন্যাও গোল্ডেন জিপিএ-৫ পেয়েছে। গতকাল দুজনেই ব্যস্ত থাকার কারণে কথা বলতে পারে নি। বন্যা ফোন রিসিভ করেই বললো, “এত গিফট তোরে কে দিলো রে?” মেঘ স্ব শব্দে হেসে বললো, ” আমার স্বপ্নের নায়ক ” বন্যা কপাল কুঁচকে বললো, “আবার ফা*লতু ব্যাটারে নিয়ে স্বপ্ন দেখছিস?”‘ মেঘ ঠোঁট কামড়ে বললো, “আমি কি করবো, আমার এত ভাল্লাগে কেন ওনারে!” বন্যা স্বাভাবিক কণ্ঠে বললো, “সেসব বাদ দে, চল বিকেলে দেখা করি। পাখি আর মায়াও বলছে বের হবে। অনেকদিন দেখা হয় না ওদের সাথে । রেজাল্টের খুশিতে একটু আড্ডাও দেয়া যাবে। আসবি?” মেঘ একটু ভেবে বললো, “ঠিক আছে। ” আবির নামাজ থেকে এসে সকাল আর দুপুরের খাবার একবারে খেয়ে বেরিয়ে পরেছে। আবির বের হওয়ার কিছুক্ষণ পরই মেঘ নিচে নেমেছে, হালিমা খানকে জরিয়ে ধরে আহ্লাদী স্বরে বলছে, “”আম্মু একটু ঘুরতে যাই....!”” হালিমা খান মেয়ের দিকে না তাকিয়েই বললেন, “আমাকে বলছিস কেন? আমি অনুমতি দেয়ার কে? তোর ভাই রা আছে, বাপ-চাচা আছে, তাদের থেকে অনুমতি নিয়ে যা। ” মেঘ হাসছে আর বলছে, “তুমি বললেই হবে। আর কেউ তো বাসায় নেই। বন্যা,পাখি আর মায়া ও আসবে। যাই না প্লিজ!” হালিমা খান চিন্তিত স্বরে বললেন, ” যাবি যা কিন্তু বেশিদূর যাস নে আর ড্রাইভারকে বল দিয়ে আসতে। ” মেঘ ঠান্ডা কণ্ঠে বললো, “গাড়ি নিয়ে বান্ধবীদের সাথে

ঘুরতে যেতে আমার ভালো লাগে না। আমি রিক্সা দিয়ে চলে যাবো।” হালিমা খান কপাল কুঁচকে বলে উঠলেন, “তুই ও তো তোর ভাইদের মতই হইতেছিস। গাড়িতে চলাচল করতে তোদের এত কি সমস্যা , বুঝি না। ” মেঘ স্ব শব্দে হেসে নিজের রুমের দিকে ছুটে গেলো। কিছুক্ষণের মধ্যে রেডি হয়ে নিচে নামলো । মায়ের থেকে বিদায় নিয়ে রিক্সা করে চলে গেলো গন্তব্যস্থলে। ওরা তিনজন আগেই চলে এসেছে। ইচ্ছেমতো ফুচকা খেয়ে, কাছেই একটা ফাঁকা মাঠে ৪ বান্ধবী বসেছে আড্ডা দিতে। পড়াশোনা, পরিবারের কথার শেষে প্রেমের টপিক উঠলো। পাখির বিয়ে ঠিকঠাক, এডমিশন টেস্টের পরেই খালাতো ভাইয়ের সাথে বিয়ে।। এদিকে মায়ারও বয়ফ্রেন্ড আছে, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে। তাই মায়া মনেপ্রাণে চেষ্টা করছে যেনো জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পেতে পারে। ধীরে ধীরে আবির ভাইয়ের কথা উঠলো, মেঘ অবলীলায় আবির ভাইয়ের প্রতি নিজের অনুভূতি প্রকাশ করলো। সবকিছু শুনে মায়া অকস্মাৎ বলে উঠলো, “আমার কাছে একটা প্ল্যান আছে। ” বাকি তিনজনই একসঙ্গে বলে উঠলো, “কি প্ল্যান?” মায়া বললো, “আমাদের মধ্যে কারো ফোন থেকে তোর আবির ভাইয়ের নাম্বারে কল দে, একটু ঢং করে কথা বলবি দেখবি ওনার মনে কি আছে। যদি ওনি কাউকে পছন্দ করেন , তাহলে সেটাও প্রকাশ পাবে সাথে ওনার ক্যারেক্টার সম্পর্কেও ধারণা হয়ে যাবে। ” মেঘ প্রথম দিকে রাজি না হলেও ওদের চাপে রাজি হলো। মায়ার নাম্বার থেকেই কল দিলো আবির ভাইয়ের নাম্বারে। আবির ভাই

চট্টগ্রাম থাকাকালীন ই নাম্বার টা সেইভ করেছিলো মেঘ কিন্তু কোনোদিন কল দেয়ার সাহস করে নি। আজ মায়ার ফোনে আবির ভাইয়ের নাম্বার টা লেখার সময়ই মেঘের হাত কাঁপছিলো। ডায়াল করলো আবির ভাইয়ের নাম্বারে, ভয়ে মেঘের হাত-পা ঠান্ডা হয়ে আসছে। প্রথম বার রিসিভ হলো না। মায়া আর পাখি মেঘকে সাহস দিলো, বন্যা নিরব দর্শক । সে চায় মেঘ ভালো থাকুক, সেটা আবির ভাইয়ের সাথেই হোক বা অন্য কারো সাথে যে মেঘকে ভালো রাখবে। দ্বিতীয় বার কল দিয়েছে, কয়েকবার রিং হওয়ার পর রিসিভ হলো, লাউডস্পিকার দিয়ে মেঘ রোমান্টিক মুডে ডাক দিলো, "জা.....ন" আবির কপাল কুঁচকে প্রশ্ন করলো, "কে?" মেঘ ঢুক গিলে আহ্লাদী কণ্ঠে বললো, "আমি তোমার বউ। " আবির মুচকি হেসে উত্তর দিলো, "হ্যাঁ জান বলো। " মেঘ দাঁতে দাঁত চেপে, বৃহৎ চোখে চাইলো বান্ধবীদের দিকে। রাকিব ডেকে উঠলো, "কিরে আবির কার সাথে কথা বলিস। " আবির উত্তেজিত কণ্ঠে বললো, "আমার বউ কল দিছে, ডিস্টার্ব করিস না। " মেঘ সহ বাকি তিনজনই হা করে চেয়ে আছে। মায়া কল মিউট করে মেঘকে কানে কানে কি বলেছে, আনমিউট করে মেঘ স্বাভাবিক কণ্ঠে বললো, "I miss you Jaan" আবির নিঃশব্দে হেসে উত্তর দিলো, "I miss you too jaan. কোথায় আছো বলো আমি এখনি আসছি। " আবিরের মুখে এমন কথা শুনে মেঘ তাজ্জব বনে গেলো, নিঃশ্বাস যেন গলায় আটকে যাচ্ছে। শরীর ঘামতে শুরু করেছে। নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না। প্রেমিকা সুলভ

মনে এক মুহুর্তেই আঁধার নেমেছে। চেনা নেই জানা নেই আননোন নাম্বারের কোনো মেয়ের সাথে আবির ভাই এভাবে কথা বলবেন সেটা মেঘ ভাবতেই পারছে না। মেঘ এক হাতে মাথা চেপে ধরেছে। আবির পুনরায় প্রশ্ন করলো, "কি হলো? কথা বের হচ্ছে না গলা দিয়ে?" মায়া আর পাখির ঠ্যালায় মেঘ ধীর কন্ঠে শুধু বললো, " কিছু না। " আবির এবার স্বভাব-সুলভ গম্ভীর কন্ঠে প্রশ্ন করলো, " কোথায় বসে বাদড়ামি করা হচ্ছে শুনি " আবির ভাইয়ের প্রশ্নে মেঘ আরও বেশি আশ্চর্যান্বিত হলো। কয়েক মুহুর্ত নিরব থেকে কাঁপা কাঁপা কন্ঠে বললো, "মা... মানে?" আবির কন্ঠ দ্বিগুণ ভারী করে জবাব দিলো, "বাসা থেকে একা বের হয়েছিস, একবার জানানোর প্রয়োজন মনে করলি না। এত বড় হয়ে গেছিস। " মেঘের চোখ কোটর ছেড়ে বেড়িয়ে আসার অবস্থা হলো, শুধু দীর্ঘশ্বাস ফেলছে, এভাবে আবির ভাইয়ের কাছে ধরা পরে যাবে এটা ভাবতেও পারে নি। লাউডস্পিকার অফ করে ফোন কানে ধরেছে। মেঘকে নিশ্চুপ থাকতে দেখে আবির নিরেট কন্ঠে বললো, "যেখানে নিঃশ্বাসের শব্দে আমি তোর অস্তি*ত্ব উপল*ব্ধি করতে পারি, সেখানে তোর কন্ঠ আমি চিনবো না? ভাবলি কিভাবে !" মেঘ পাথরের ন্যায় বসে আছে। আবির ভাই কি বলছে তার কিছুই মাথায় ঢুকতে না। সে যে ধরা পরে গেছে এটা ভেবেই লজ্জায় ম*রে যেতে ইচ্ছে করছে। আবির ভাই কি না কি ভাববে, থা*প্পড় না দিয়ে বসেন আবার। থা*প্পড়ের কথা মনে পরতেই সঙ্গে সঙ্গে গালে হাত দিলো মেঘ। আবির পুনরায় প্রশ্ন করলো, "কোথায়

আছিস?” মেঘ তখনও গালে হাত দিয়ে নি*স্তব্ধ হয়েই বসে আছে। আবির রা*গান্বিত স্বরে বলে উঠলো, “কি হলো? বল!” মেঘের গলা কাঁপছে, কোনোরকমে জায়গার নামটা শুধু বললো।। আবির স্বাভাবিক কণ্ঠে জানালো, “আমি কিছুক্ষণের মধ্যে আসছি। ” বলেই কল টা কেটে দিলো। আবির ভাই কল কাটতেই অষ্টাদশী আকাশের পানে চেয়ে বড় করে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললো, “আল্লাহ বাঁচাও আমায়। আর জীবনে এমন কান্ড করবো না। এবারের মতো বাঁচিয়ে নাও।” বন্যা চিন্তিত স্বরে শুধালো, “কি হয়ছে ব*কা দিছে?” পাখি আর মায়াও অবুঝের মতো চেয়ে আছে। মেঘ এপাশ-ওপাশ মাথা নেড়ে জানালো, “কিছুক্ষণের মধ্যে আসবে। দোয়া কর যাতে মা*ইর না খায়। ” এই কথা শুনে পাখি, মায়া আর বন্যাও তটস্থ হয়ে গেছে। সবাই চিন্তায় পরে গেছে । ফাজলামো করতে গিয়ে এভাবে সিরিয়াস হয়ে যাবে ভাবতে পারে নি। কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা বাইক এসে থামলো রাস্তার পাশে। সেই নামাজের সময় পরা পাঞ্জাবি টা দেখেই মেঘ চিনতে পারলো। মেঘ সেদিকে চেয়ে দাঁতে দাঁত চেপে ভয়ে ভয়ে বললো, “আবির ভাই..... ” বাকি তিনজনের নজর পরলো সেদিকে। আবির বাইক থেকে নেমে বাইকের সাথে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে হেলমেট খুলছে। বন্যা আবির ভাইকে আগে দেখলেও পাখি আর মায়া আগে দেখে নি। মায়া উত্তেজিত কণ্ঠে বললো, “ওনি কি আবির ভাই?” বন্যা জবাব দিলো, “হ্যাঁ” মায়া পুনরায় বললো, “আল্লাহ কি হ্যান্ডসাম! মাশাআল্লাহ। এত কিউট জানলে আমিই কথা বলতাম, পটিয়ে আমার

করে নিতাম। ” মেঘ রাগান্বিত স্বরে বলে উঠলো, “আমার আবির ভাইয়ের দিকে কেউ ন*জর দিবি না বলে দিলাম। ” কথাটা বলেই মায়ার ফোন নিয়ে সেখান থেকে আবির ভাইয়ের নাম্বার টা ডিলিট করে ফোন রেখে নিজের পার্টস নিয়ে রা*গে ফুঁসতে ফুঁসতে উঠে চলে গেছে। মেঘের এমন কান্ডে পাখি আর মায়া দুজনেই হাসছে। কিন্তু বন্যা স্তব্ধ হয়ে চেয়ে আছে মেঘের দিকে। আবির ভাইয়া কিভাবে রিয়েক্ট করবেন সেটা দেখতে ব্যস্ত বন্যা। মেঘ আবিরের কাছাকাছি আসতেই আবির তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মেঘের দিকে চাইলো, ক্রো*ধিত মুখশ্রী দেখে আবির কপাল গুটালো, মেঘের সরু নাকের ডগা ফুলে উঠেছে, ঘামে চিকচিক করছে মুখ, সাথে লাল হয়ে আছে দু গাল। মেঘ কাছাকাছি আসতেই আবির ঠান্ডা কণ্ঠে শুধালো, ” রা*গ উঠেছে কেন? আরও আড্ডা দিলে যাহ! আমি ওয়েট করছি। সমস্যা নেই। ” মেঘ রা*গে ফুঁসতে ফুঁসতে উত্তর দিলো, “আড্ডা দিবো না, চলে যাবো। ” আবির চিন্তিত স্বরে বললো, “কি হয়েছে? কে কি বলছে? ” মেঘ মনে মনে বলছে, “আপনার উপর কারো নজর আমি সহ্য করতে পারবো না। ” আবির ঠান্ডা কণ্ঠে শুধালো, “চলে যাবি?” মেঘ উপর-নিচ মাথা নাড়লো। আবির নিজের হেলমেট টা মেঘকে নিজের হাতে পরিয়ে দিচ্ছে। মেঘ ভ্রু কুঁচকে আবির ভাইয়ের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলো, “এটা তো আপনার হেলমেট, আমায় দিচ্ছেন যে!” আবির ভারী কণ্ঠে উত্তর দিলো, “রাকিবের হেলমেট নিয়ে আসছি। আমি ঐটা পরবো। ” এই দৃশ্য তিন বান্ধবী অবাক চোখে দেখছে। বন্যা এবার স্বস্তির

নিঃশ্বাস নিচ্ছে। আবির ভাইয়া রিয়েক্ট করেন নি সেই অনেক।। পাখি হাসিমুখে বলছে, “মেঘ ওনাকে পেলে সত্যিই অনেক হ্যাপি থাকবে। দোয়া করি মেঘ যেনো ওনাকে পেয়ে যায়। ” মায়া ও সঙ্গে সঙ্গে তাল মেলাবো। কয়েক মুহুর্ত পর আবির বাইক স্টার্ট দিয়ে চলে গেলো।। ওরা তিনজন ও যে যার বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিলো। আবির মেঘকে একটা ভালোমানের হেলমেটের আউটলেটে নিয়ে গেছে। মেঘকে লেডিস হেলমেট পছন্দ করতে বলে আবির সাইডে বসে আছে। মেঘ ঘুরে ঘুরে দেখছে, অনেক ঘুরে ৩ টা হেলমেট নিয়ে হাজির হলো আবিরের সামনে।। ছোট করে প্রশ্ন করলো, “কোনটা নিবো?” আবির তিনটা হেলমেট পাশে রেখে ভারী কণ্ঠে বললো, “আমার জন্য পছন্দ করে নিয়ে আয়। ” মেঘ আহাম্মকের মতো চেয়ে আছে । নড়ছেও না জায়গা থেকে। আবির কপাল কুঁচকে তাকালো, গম্ভীর কণ্ঠে বললো, “কি বললাম আমি?” মেঘ চুপচাপ চলে গেলো। অনেক খোঁজে দুটা নিয়ে আসছে। আবির সবগুলো হেলমেট ভালো ভাবে দেখে প্যাকিং করে দিতে বললো।। মেঘ বিষ্ময় চোখে চেয়ে কোমল কণ্ঠে বললো, “এত হেলমেট নিয়ে কি করবেন! হেলমেট তো একটা হলেই হয়। ” আবির চোখ রাঙিয়ে মেঘের দিকে চাইলো। মেঘ সঙ্গে সঙ্গে চিবুক নামালো গলায় । মনে পড়ে গেলো হিজাব কেনার ঘটনা। মনে মনে বলছে, ” কি মানুষ রে বাবা! আমি কনফিউজড হয়ে ওনার কাছে এনেছি আর ওনি পছন্দ না করে সবগুলোই নিয়ে নিলেন। আমি যদি জানতাম ওনি ৫ টায় নিয়ে নিবেন তাহলে আমি ২ টা হেমলেট ই

বেছে নিয়ে আসতাম।” হেলমেট কিনে বের হয়ে আবির ভারী কণ্ঠে শুধালো, “কাচ্চি খাবি?” মেঘ স্বাভাবিক কণ্ঠে উত্তর দিলো, “হাবিজাবি অনেক কিছু খেয়েছি এখন আর কিছু খেতে ইচ্ছে করছে না। ” আবিরও আর কথা বাড়ালো না। মেঘকে বাসার সামনে নামিয়ে নিজের মতো চলে গেছে। মেঘ হেলমেট গুলো আবির ভাইয়ের রুমে রেখে নিজের রুমে এসে রেস্ট নিয়ে পড়তে বসেছে। বেশকিছুদিন চলে গেছে। মেঘের পড়াশোনার চাপ বেড়েছে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের আবেদন ছাড়ছে, ভর্তি পরীক্ষা ঘনিয়ে আসছে। পড়াশোনার ব্যস্ততার মাঝেও রোজ নিয়ম করে আবির ভাই অফিসে যাওয়ার সময় এবং রাতে ফেরার সময় বেলকনিতে দাঁড়িয়ে দেখে। আবিরও অফিসের কাজে ব্য*স্ত হয়ে পরেছে। চারদিক সামলাতে যথারীতি হিমসিম খাচ্ছে। একদিন মেঘের কাচ্চি খেতে খুব ইচ্ছে করছে। তানভির ভাইয়া নির্বাচনের কাজে ব্যস্ত তাই ফোন দিতে সাহস হচ্ছে না। মীমের কাছে গিয়ে বলাতে, মীম সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো, “ভাইয়া কে বলো নিয়ে আসতে। ” মেঘ ঢুক গিলে বললো, “আমি বলতে পারবো না। তুই কল দিয়ে বল। ” মীম ভয়ে ভয়ে জানালো, “আমি বলবো?” মীম টেলিফোন থেকে আবিরকে কল দিলো। আবির রিসিভ করতেই মীম বললো, “আসসালামু আলাইকুম, ভাইয়া। ” আবির স্বাভাবিক কণ্ঠে উত্তর দিলো, “ওয়ালাইকুম আসসালাম। কিছু বলবি?” মীম অকস্মাৎ বলে উঠলো, “আপুর কাচ্চি খেতে ইচ্ছে করছে। ” মেঘ রাগে মীমের দিকে তাকিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে কিড়মিড় করে বলছে, “তুই আমার

কথা বললি কেন ?” আবির কণ্ঠ ভারী করে প্রশ্ন করলো, “মেঘ কোথায়? ” মীম মৃদু হেসে বললো, “এখানেই আছে।” আবির রাগান্বিত কণ্ঠে বললো , “ওর কি ফোন নেই? নাকি ও কথা বলতে পারে না? তোকে দিয়ে বলাতে হয় কেন?” ধ*মক শুনে মেঘ সঙ্গে সঙ্গে চোখ বন্ধ করে দু হাতে কান চেপে ধরলো যাতে আবির ভাইয়ের বাকি কথা শুনতে না পারে। আবির গম্ভীর কণ্ঠে পুনরায় বলে উঠলো, “ওর কাছে ফোন দে। ” মীম ভীত স্বরে বললো, “আপু চোখ-কান বন্ধ করে বসে আছে। ” আবির দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে রা*গ হজম করে বললো, “ওর কান থেকে হাত সরিয়ে, ফোন টা ওরে দে।” মীম যথারীতি তাই করলো। মেঘ ভয়ে ভয়ে ফোন কানের কাছে নিলো। কিছু বলার আগেই আবির ঠান্ডা কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো, “কাচ্চি কি এখনই আনতে হবে নাকি ঘন্টাখানেক পর নিয়ে আসলে হবে?” মেঘ বিস্ময় চোখে তাকালো মীমের দিকে, ভেবেছিল না জানি কত ব*কা খাবে কিন্তু ঘটলো পুরো উল্টো । মেঘ স্বাভাবিক কণ্ঠে উত্তর দিলো, “পরে আনলেও হবে। ” ঘন্টাদুয়েক পর মেঘ রুমে বসে ইয়ারফোন দিয়ে গান শুনছিলো। এরমধ্যে আবির বাসায় এসেছে। গানের সাউন্ডে বাইকের শব্দও শুনেনি মেঘ। আবির মীমকে দু প্যাকেট দিয়ে বাকি একটা কাচ্চির প্যাকেট নিয়ে মেঘের রুমে গেলো। হঠাৎ আবির ভাইকে দেখে মেঘ ভূ*ত দেখার মতো চমকে উঠে কান থেকে ইয়ারফোন খুলে ফেললো। আবির কাচ্চির প্যাকেট মেঘকে দিয়ে শক্ত কণ্ঠে বললো, “তোর ফোনটা দে। ”মেঘ ভ*য়ে ভ*য়ে ফোন এগিয়ে

দিলো আবিরের দিকে। ফোন হাতে নিতেই আবিরের চোখে পরলো ফোনে গান বাজতেছে, “কি নে*শা ছড়ালে! কি মায়ায় জড়ালে” আবির তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মেঘের দিকে তাকিয়ে পুনরায় ফোনে মনোযোগ দিলো। কয়েক মুহুর্ত পর অষ্টাদশীর ফোনে ছবিসহ নিজের নাম (Amar Abir♡..... Vai) দেখে হুট করেই বিষম খেয়ে উঠলো আবির। কাশতে কাশতে বিছানার পাশে বসে পরেছে। মেঘ আঁতকে উঠে শুধালো, “কি হয়ছে আবির ভাই? ” মেঘ সঙ্গে সঙ্গে পানি ঢেলে গ্লাস এগিয়ে দিয়ে,আবির ভাইয়ের মাথায় ফুঁ দিচ্ছে। আবির কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে গ্লাসের সবটুকু পানি খেয়ে শেষ করলো। মেঘের ফোন বিছানায় রেখে দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো। গ্লাস মেঘকে দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে এক পলক তাকালো অষ্টাদশীর মুখের পানে, এমন কান্ডে হাসবে নাকি রা*গ করবে সেটাও বুঝে উঠতে পারছে না আবির। কিছুক্ষণ বসে, উঠে যাওয়ার সময় গম্ভীর কণ্ঠে বললো, “আমার নাম্বার তো তোর ফোনে আছেই। তাহলে মামনিকে দিয়ে,মীমকে দিয়ে কেনো কল দেয়াতে হয়? তুই কল দিতে পারিস না?” মেঘ জিহ্বায় কামড় দিয়ে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে। দু পা এগিয়ে আবির পুনরায় থমকে দাঁড়ালো, ঘাড় ঘুরিয়ে চেয়ে রাশভারি কণ্ঠে বললো, “ভ*ন্ডামি বাদ দিয়ে পড়াশোনায় মনোযোগ দে।” কথা টা বলে এক সেকেন্ডও দাঁড়ায় নি। বেরিয়ে পরেছে রুম থেকে। মেঘ বিড়বিড় করে বলছে, “স*র্বনা*শ! নাম্বার সেইভ করা দেখে বিষম খেলেন ওনি?” মেঘ তাড়াতাড়ি বসে নাম্বার টা বের করলো। একবার ভাবলো নাম টা

পাল্টাবে পরক্ষণেই মনে হলো, “যা দেখার তো দেখেই ফেলছে, এখন আর পাল্টালে কি হবে? ” মেঘ ছবিটা দেখে হাসছে আর আর বলছে, “আহারে! কবে যে নামের পিছন থেকে Vai টা সরাতে পারবো!”
কিছুদিন পর আলী আহমদ খান আর মোজাম্মেল খান অফিসে কাজের ফাঁকে গল্প করছিলেন। গল্প না ঠিক, দু ভাই নিজেদের সুখ- দুঃখের কথা শেয়ার করছিলেন। মোজাম্মেল খান আর আলী আহমদ খান ছোট থেকেই বন্ধুর মতো। এখন যেমনটা তানভির আর আবিরের সম্পর্ক ।
মোজাম্মেল খানকে চিন্তিত দেখে আলী আহমদ খান প্রশ্ন করলেন, “কিরে কি হয়েছে তোর? শরীর খারাপ নাকি?” মোজাম্মেল খান চিন্তিত স্বরে বললেন, “মেঘকে নিয়ে খুব চিন্তায় আছি, ভাইজান। ”
আলী আহমদ খান গম্ভীর কণ্ঠে শুধালেন, “মেঘ মা কে নিয়ে আবার তোর কিসের চিন্তা? কত লক্ষী একটা মেয়ে। ” মোজাম্মেল খান তপ্ত স্বরে বললেন, “সামনে ভার্সিটি পরীক্ষা, মেডিকেল পরীক্ষা। তানভির টা তো ঠিকমতো পড়লোই না, এখন সব আশা ভরসা তো মেঘকে নিয়েই। ” আলী আহমদ খান ভাইকে সাহস দিয়ে বললেন, “আরে চিন্তা করিস না। ইনশাআল্লাহ চান্স হয়ে যাবে না হলে কত কত প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় আছে ঐগুলোতে পড়াবো।। সমস্যা কি?”
মোজাম্মেল খান মন খারাপ করে বললেন, “আমি তো চাই মেয়েটা মেডিকেলে পড়ুক।” আলী আহমদ খান হাসিমুখে উত্তর দিলেন, ” ভাগ্যে যা আছে তাই হবে। দিনশেষে ওরা মানুষ হলেই হলো। আমার আর কোনো চিন্তা নেই। ” মোজাম্মেল খান এবার একটু ঠাট্টার স্বরে

বলে উঠলেন, “হ্যাঁ, তোমার আর চিন্তা কি! তোমার ছেলে তো পড়াশোনা শেষ করে, তোমার কথা মতো ব্যবসায় জড়িয়ে গেছে। তোমার তো খুশি লাগবেই। ” আলী আহমদ খান ভাইয়ের কথায় স্ব শব্দে হেসে উঠলেন, হাসতে হাসতে বললেন, “আমার ছেলে আমার কথা মেনে অফিসে আসছে এটা দেখছিস। সাথে নিজের মর্জিমাফিক কোম্পানি শুরু করেছে, বাইক কিনলো, রাত বিরাতে বাড়ি ফিরে, নিজের মতো চলে এগুলো নিয়ে তো কিছু বললি না। সেসব কথা বাদ দে, আমার ছেলে আর তোর ছেলে বলতে কিছু নেই। আমরা যেমন মিলেমিশে আছি। আমি চাই আমাদের সন্তানরাও সারাজীবন মিলেমিশে থাকুক।” মোজাম্মেল খান হাসিমুখে উত্তর দিলেন, “দোয়া করি তাই যেনো হয়। ” এরকমে আবির দরজায় দাঁড়িয়ে বললো, “আসবো?” আলী আহমদ খান তাকিয়ে বললেন, “হ্যাঁ আসো। তোমাকে কতদিন বলেছি, আমার রুমে আসতে অনুমতি নিতে হবে না। ” আবির ভারী কণ্ঠে উত্তর দিলো, “আপনারা কথা বলছিলেন, হুট করে ঢুকে পড়া টা ভালো দেখাবে না তাই ভেতরে ঢুকি নি। ” মোজাম্মেল খান বললেন, “আমাদের সব কথা তো তোমাদের কে নিয়েই। তোমরা ভালো থাকো এটায় তো চাই। ” চাচ্চুর দিকে চেয়ে আবির মুচকি হাসলো। তারপর আব্বুর দিকে একটা ফাইল এগিয়ে দিয়ে বলল, “সময় করে ফাইল টা একটু দেখে নিয়েন, প্লিজ। ” আবির যাওয়ার জন্য পা বাড়ালে আলী আহমদ খান ডেকে উঠলেন, “শুন।” আলী আহমদ খান ছেলের দিকে তাকিয়ে নরম স্বরে বললেন, “দুই অফিস সামলাতে কি খুব কষ্ট

হচ্ছে? " আবির মৃদু হেসে উত্তর দিলো, "না, সমস্যা নেই। কষ্ট না করলে আপনাদের মতো সাকসেসফুল কিভাবে হবো! " আলী আহমদ খান নিঃশব্দে হেসে বললেন, "সব বাদ দিয়ে কাজ করলে তো হবে না। নিজের যত্ন নিতে হবে তো। অফিস তো শেষ ই বাসায় যাবে না?" আবির ঠান্ডা কন্ঠে বললো, "৫-১০ মিনিট পর বেড়িয়ে যাবো। " আবির বাবার কেবিন থেকে বের হয়ে নিজের কেবিনে চলে গেছে।। মোজাম্মেল খান আর আলী আহমদ খান ফাইল চেক করে রেখে বেড়িয়েছে বাসায় যাওয়ার উদ্দেশ্যে। ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে আসতে আসতে, আলী আহমদ খান হঠাৎ ই শাহরিয়ারকে দেখে কিছুটা এগিয়ে গিয়ে উচ্চস্বরে ডাকলেন, "এই, শাহরিয়ার! " শাহরিয়ার কাছেই একটা দোকানে কি কিনতেছিলো। আলী আহমদ খানকে দেখে এগিয়ে এসে সালাম দিয়েছে। আলী আহমদ খান সালামের উত্তর দিয়ে বললেন, "কেমন আছো তুমি?" শাহরিয়ার হাসিমুখে উত্তর দিলেন, "জ্বি আলহামদুলিল্লাহ ভালো। আপনারা কেমন আছেন?" দু ভাই সমস্বরে বলে উঠলেন, "আলহামদুলিল্লাহ ভালো। " আলী আহমদ খান স্বাভাবিক কন্ঠে প্রশ্ন করলেন, "তুমি যে অসুস্থ ছিলা সুস্থ হয়েছো?" শাহরিয়ার মনে মনে বিড়বিড় করে বললো, "ছেলে মে*রে হাসপাতালে পাঠাইছে আর এখন বাপে খবর নিচ্ছে। ভালোই। " আলী আহমদ খান পুনরায় বলে উঠলেন, "তুমি যদি বলতে আমাদের বাসা দূরে হয়ে যায় তোমার জন্য । আমি পেমেন্ট বাড়াতাম। কিন্তু তুমি তো কিছু জানালেও না। " শাহরিয়ার শুধু বলেছে, "না মানে..." ওমনি চোখ

পরেছে অফিস গেইটের সামনে দাঁড়ানো আবিরের দিকে। চোখ রাঙিয়ে তাকিয়ে আছে শাহরিয়ারের দিকে। মোজাম্মেল খান গম্ভীর স্বরে বললেন, "কি হলো?" শাহরিয়ার ঢুক গিয়ে ধীর কণ্ঠে জানালো, "অসুস্থ ছিলাম তাই জানাতে পারি নি। এটা কি আপনাদের অফিস আংকেল?" আলী আহমদ খান হাসিমুখে উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ। আসো ভেতরে আসো। চা – কফি খেয়ে যাও। " শাহরিয়ার মাথা নেড়ে না করলো আর মনে মনে বললো, "আগে জানলে এই রাস্তায় আসতাম ই না। আবার অফিসে বসে চা- কফি খাবো। আর মা*ইর খেতে চাই না । " শাহরিয়ার চোখ তুলে চাইতেই দ্বিতীয় বার চোখাচোখি হলো আবিরের সাথে। আবির রা*গে কটমট করছে। শাহরিয়ার তাকাতেই আঙুল দিয়ে ইশারা করলো, চলে যেতে। শাহরিয়ার বাধ্য ছেলের মতো বিদায় নিয়ে সেখান থেকে কেটে পরলো। আলী আহমদ খান আর মোজাম্মেল খান ঘুরতেই আবির হেলমেট পড়তে ব্যস্ত হলো । মোজাম্মেল খান আবিরকে দেখে বলে উঠলেন, " ছেলেটাকে মেঘের জন্য টিউটর ঠিক করা হয়ছিলো। তুমি আসার পরেই তো পড়াতে গিয়েছিল। চিনতে পারো নি?" আবির গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর দিলো, "কি জানি, খেয়াল নেই । " আলী আহমদ খান ভাইয়ের দিকে চেয়ে জানালেন, "ছেলেটা পড়াবে বললে ত পেমেন্ট বেশি দিয়ে হলেও রাখতাম। বলতে তো পারতো। " আবির ভারী গলায়, কপাল কুঁচকে বললো, "ছেলে যদি পড়াতে না চায় তাহলে জোর করার কি দরকার তাছাড়া নতুন টিউটর তো শুনলাম ভালোই পড়াচ্ছে। " আলী আহমদ

খান বললেন, “একদিন এসে ছেলেটা আর বাসায় গেলো না, কল দিয়ে জানালোও না, ২-৩ দিন পর আমি কল দেয়ার পর বললো অসুস্থ আর পড়াবে না।। আজ সামনে পেয়েছি জিজ্ঞেস করলাম আরকি। ” আবির কণ্ঠ দ্বিগুণ ভারি করে জবাব দিলো, “ছেলের পড়ানোর ইচ্ছে ছিল না তাই হয়তো জানায় নি। আপনারা এখন তাকে এত প্রশ্ন করছেন এতে সে বিরক্তও হতে পারে। ” আলী আহমদ খান শ্বাস ছেড়ে বললেন, “তাও ঠিক। কথা তো আজ বললাম ই। আর তো কথা বলার দরকার নেই। ” আলী আহমদ খান আর মোজাম্মেল খান গাড়িতে উঠে বাসার উদ্দেশ্যে চলে গেছে। আবির নিজের অফিস থেকে ঘুরে ঘন্টাখানেক এর মধ্যে বাসায় এসেছে। আবিরের বাইকের শব্দে মেঘ বেলকনিতে ছুটে গেছে। অনেকদিন ছাদে যাওয়া হয় না। মেঘ মনে মনে ভাবছিলো আবির ভাই আসলে চাবি নিয়ে ছাদে যাবে। মেঘ নিজের রুম থেকে বের হয়ে আবির ভাইয়ের দিকে দুর্বোধ্য দৃষ্টিতে চেয়ে আছে, পলক পরছে না একটিবার। আবির মেঘের কাছে এসে একবার তাকিয়ে সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি নামালো, পকেট থেকে একটা কিটকেট চকলেট বের করে মেঘকে দিলো। মেঘ চকলেট নিয়ে মাথা নুইয়ে মুচকি হাসলো। নিজেকে স্পেশাল কেউ মনে হচ্ছে। আবির চলে যাচ্ছে তৎক্ষনাৎ মেঘের মনে পরে গেলো চাবির কথা।। মেঘ তটস্থ হয়ে ডাকে, “আবির ভাই....!” আবির রুমের দিকে যেতে যেতেই উত্তর দেয়, “”হুমমমমম...!”” মেঘ একগাল হেসে বলে, “ছাদে যাবো। চাবিটা কি দেয়া যাবে?” আবির গুরুভার কণ্ঠে বলল, “নিয়ে যা

এসে। ” মেঘ দ্রুত নিজের রুমে গিয়ে চকলেট টা লুকিয়ে রেখে মোবাইল নিয়ে বের হয়েছে। আদি চকলেট হোক আর চিপস যা পায় সব ই খেয়ে ফেলে। এজন্য মীম আর মেঘ প্রিয় জিনিস বা খাবার গুলো লুকিয়ে রাখে যাতে আদি নিতে না পারে। মেঘ চাবি নিয়ে তালা খুলে ছাদে চলে গেছে। বিকেলের রোদে গাছে থাকা ফুল গুলো জ্বলজ্বল করছে। ইদানীং প্রতি রাতেই বৃষ্টি হয় কিন্তু দিনের বেলা তার রেশমাত্র থাকে না। মেঘ কয়েকটা গাছের পাতা আর অবাঞ্ছিত ডালপালা কেটে হাত ধৌয়ে ছাদে হাঁটছিলো। ১০-১৫ মিনিট পর আবির একটা সেন্টু গেঞ্জি আর লুঙ্গি পড়ে ছাদে আসছে। আচমকা আবির ভাইকে দেখে কিছুটা ভ*য় পেয়েছে। তবে দেশে ফেরার পর এই প্রথমবার আবির ভাইকে লুঙ্গি পরা দেখে মেঘ দাঁত কেলিয়ে হেসে উঠলো। হাসি যেনো থামছেই না বরং হাসির তী*ব্রতা ক্রমশ বেড়েই যাচ্ছে ।আরির কপাল কুঁচকে তাকালো। আবিরের চাউনীতে মেঘ চিবুক নামিয়ে মুখে হাত চেপে হেসেই যাচ্ছে। আবির কপাল কুঁচকে প্রশ্ন করলো, “এভাবে হাসছিস কেন?” মেঘের সরল স্বীকারোক্তি, “আপনাকে দেখে হাসি পাচ্ছে। ” আবির বিরক্তি হয়ে বললো, “এভাবে হাসছিস যে, তোর তাঁনারা ধরবো নে। ” অকস্মাৎ মেঘের মুখ বন্ধ হয়ে গেলো। ঘাড় ঘুরিয়ে এদিক সেদিক তাকিয়ে দেখছে। মেঘের কান্ড দেখে আবির মুচকি হেসে ছাদের কর্ণারে সিঙ্গেল সোফায় গিয়ে বসে পরেছে। সূর্যের আলো ধীরে ধীরে কমতে শুরু করেছে। মেঘ সঙ্গে সঙ্গে চুল বেঁধে মাথায় ঘোমটা টেনে ধীর পায়ে আবির ভাইয়ের কাছে

গিয়ে দাঁড়িয়ে পরেছে। আবির ফোনে কথা বলছে আর মেঘ ছাদের রেলিং ঘেঁষে দাঁড়িয়ে এক দৃষ্টিতে আবির ভাইকে দেখছে। প্রথম দেখে হাসলেও এখন মেঘের ভালোই লাগছে।। শক্তপোক্ত উন্মুক্ত বাহু দেখেই মনে হচ্ছে জিম করে এমন বডি বানিয়েছেন। প্রশস্ত বুকের লোমগুলো হালকা হালকা দেখা যাচ্ছে । আবির ভাইকে এভাবে দেখে মেঘের বুকের ভেতর ধুকপুক শুরু হয়ে যাচ্ছে। আবির ভাইয়ের হাতে মেহেদী দেয়া থাকলেই এখন নতুন জামাই লাগতো। এটা ভাবতেই মেঘের মুখ লজ্জায় লাল হয়ে গেছে । আবির ভাইয়ের শ্যামবর্ণের মুখশ্রী সর্বক্ষণ মেঘের মস্তিষ্কে ঘুরপাক খায়। চোখ বন্ধ করলেও সেই তামাটে চেহারা চোখের সামনে ভেসে উঠে। মেঘ বিড়বিড় করে বললো, “ডুবে ডুবে ভালোবাসি, আপনি না বাসলেও আমি বাসি। ” মেঘ চুপিচুপি আবির ভাইয়ের ২-৩ টা ছবিও তুলে নিয়েছে। আবির কল কেটে মেঘের দিকে চেয়ে ঠান্ডা কণ্ঠে বললো, “এখানে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? রুমে যাহ। ” মেঘ আহ্লাদী কণ্ঠে বললো, “একটু থাকি না, প্লিজ। ” আবির আর কিছুই বললো না। আহ্লাদী কণ্ঠে মেঘ কিছু বললে আবির কখনোই না করতে পারে না। এই সেই ললনা যার সামান্যতম আবদারও আবির ফেলতে পারে না। আবিরের সমস্ত পৃথিবী একদিকে আর অন্যদিকে তার Sparrow. আবির চোখ বন্ধ করে সোফায় হেলান দিয়ে বসে আছে। বেশখানিকটা সময় মেঘ আবির ভাইকে সরু নেত্রে নিরীক্ষণ করে ধীর কণ্ঠে ডাকলো, “আবির ভাই.....!” আবির চোখ বন্ধ করেই জবাব দিলো, “হুমমমমম..!” মেঘ

উদ্বিগ্ন কণ্ঠে শুধালো, “আপনার কি মন খারাপ?” আবির মেঘের দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে উত্তর দিলো, “কই না তো। ” মেঘ কিছু বলতে যাবে তার আগেই আবির বলে উঠলো, “আজান পরবে কিছুক্ষণের মধ্যে, তোর একটু থাকার ইচ্ছে মিটলে রুমে যা। ” মেঘ বাধ্য মেয়ের মতো চুপচাপ রুমে চলে গেছে। আবির মনে মনে বলছে, ” আমি তো তোর সাথে জীবনের প্রতিটা সূর্যোদয়- সূর্যাস্ত দেখতে চাই। তারজন্য অনেক ঝড়ঝাপটা পেরোতে হবে। যাই হয়ে যাক, একদিন তোকে আমার করে নিবোই ইনশাআল্লাহ। ” হঠাৎ এক বৃহস্পতিবারে মেঘ আর বন্যা কোচিং থেকে বের হতেই দেখতে পেলো আবির ভাই বাইকের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। মেঘকে বের হতে দেখে আবির কিছুটা এগিয়ে আসলো। আবির বন্যার দিকে চাইতেই চোখাচোখি হলো দুজনের । বন্যা হাসিমুখে বললো, “আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া । কেমন আছেন?” আবির স্বভাবসুলভ গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর দিলো, “ওয়ালাইকুম আসসালাম। আলহামদুলিল্লাহ ভালো। তুমি কেমন আছো?” বন্যা উত্তর দিলো, “আলহামদুলিল্লাহ ভালো। ” আবির স্বাভাবিক কণ্ঠে প্রশ্ন করলো, ” তুমি ই তো বন্যা। ” বন্যা বলে, ” জ্বী ভাইয়া। ” বন্যা পুনরায় বলে উঠলো, “আমি আসছি ভাইয়া। ভালো থাকবেন। আসছি মেঘ ” কথাগুলো বলে বন্যা কোনোরকমে পালালো এখান থেকে। আবির মেঘের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে শুধালো, “তোর বান্ধবীও দেখা যায় তোর ই মতো। ” মেঘ আহাম্মকের মতো চেয়ে প্রশ্ন করলো, “কেমন?” আবির ঠাট্টার স্বরে বললো, “তাড় ছিঁ*ড়া। ”

মেঘ ভ্রু কুঁচকে বললো, “মোটেই না। ” মেঘ ভেঙচি কেটে গাল ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে । আবির স্ব শব্দে হেসে বললো, “চড়ুই পাখিকে গাল ফুলালে পেঁচার মতো লাগে।” মেঘ রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে আবির ভাইয়ের দিকে চাইলো। কিন্তু আবির ভাইয়ের মুখের অকৃত্রিম হাসি দেখে নিজের রা*গ টা ধরে রাখতে পারলো না।।মেঘ নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরে কয়েক সেকেন্ড অবাক চোখে তাকিয়ে থাকে সহসা মেঘের ওষ্ঠ ছড়িয়ে আসে। মেঘ মনে মনে বললো, “আপনার এই হাসিতে আমি বেসামাল হয়ে যাবো।” আবির বাইকের কাছে গিয়ে হেলমেট পরে নিলো। মেঘ কাছে যেতেই মেঘের জন্য কিছুদিন আগে কেনা একটা হেলমেট নিয়ে মেঘকে পড়াতে গেলে, মেঘ বলে, ” আমি পড়তে পারবো। ” আবির গম্ভীর কণ্ঠে শুধালো, “আমি পরিয়ে দিলে সমস্যা? ” মেঘের বুকের ভেতর তোলপাড় চলছে এটা সে আবির ভাইকে কিভাবে বুঝাবে। আবির ভাই কাছে আসলে ওনার শরীর থেকে আসা তী*ব্র ঘ্রা*ণ মেঘের মস্তিষ্কের নিউরন পর্যন্ত নাড়িয়ে দেয়। মেঘের বক্ষস্পন্দন জোড়ালো হয়। নিজেকে সামলানোর সব শক্তি ক্রমে ক্রমে বিলীন হয়ে যায়। আবির নিজেই হেলমেট পরিয়ে দিয়ে বাইকে বসলো। মেঘের দিকে চাইতেই মেঘ ঘুরে গিয়ে বাইকে বসলো । আবির বাইক টান দিতেই, হুমড়ি খেয়ে পরলো আবিরের পিঠে । নিজেকে সামলে সঙ্গে সঙ্গে দু হাতে আবির ভাইয়ের কাঁধ চেপে ধরলো। আবির উচ্চস্বরে বললো, “আর একদিন ও তোকে ধরতে বলবো না। পরে গেলে ফেলেই চলে যাবো। ” মেঘ চুপচাপ আশপাশে

দেখছে। কতকত কাপল ফুটপাত দিয়ে একসাথে হাঁটছে। কেউ কেউ রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে ফুচকা খাচ্ছে, কেউ বা শাড়ি পাঞ্জাবি পরে হাটছে আর কতক মানুষ বাইকে, রিক্সাতে ঘুরছে। তাদের দেখে মেঘের মনে প্রেমানুভূতি জাগ্রত হয়। খুব ইচ্ছে করছিলো আবির ভাইকে পিছন থেকে জরিয়ে ধরার কিন্তু সাহস হয় নি। সব দ্বিধা দ্ব*ন্দ্ব সরিয়ে অকস্মাৎ আবিরের পিঠে মাথা রাখলো মেঘ। আবির সঙ্গে সঙ্গে বাইকের গতি কমিয়ে, মৃদু হেসে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখার চেষ্টা করলো। মেঘ তা বুঝতে পেরে সহসা মুখ তুলে স্বাভাবিক হয়ে বসলো। আবিরের মুখের হাসিটা কয়েক সেকেন্ডে বিলীন হয়ে গেলো। কিছুক্ষণের মধ্যে একটা বাইকের শোরুমের সামনে এসে থামলো। মেঘ উদ্বিগ্ন কণ্ঠে শুধালো, “আমরা এখানে কেনো আসছি?” আবির নিরেট কণ্ঠে বললো, ” তোর ভাইয়ের জন্য বাইক কিনতে আসছি। ” মেঘ উত্তেজিত কণ্ঠে শুধালো, “সত্যি? ” আবির মেঘকে নিয়ে ভেতরে ঢুকে বললো, ” পছন্দ কর। ” মেঘের উত্তেজনা নিমিষেই মিলিয়ে গেলো, আস্তে করে বললো, “আমি তো বাইক চিনি না। আর আমার পছন্দ ভাইয়ার কি ভালো লাগবে?” আবির শক্ত কণ্ঠে বললো, “তানভিরের নির্দিষ্ট কোনো পছন্দ নেই। তাছাড়া তুই ওকে গিফট করবি এতে পছন্দ না হওয়ার কি আছে। তুই কালোর মধ্যে কয়েকটা পছন্দ কর। আমি তো আছিই। ” মেঘ আশ্চর্য নয়নে তাকিয়ে বললো, “আমি গিফট করবো মানে?” আবির কপাল কুঁচকে বললো, “এত মানে বুঝতে হবে না। ” আবির ঘুরে ঘুরে বাইকের ডিটেইলস বলছে

আর মেঘ পছন্দ করছে। সবশেষে দুটা বাইক নিয়ে কনফিউজড। মেঘ আবির ভাইয়ের দিকে চেয়ে ভণিতা ছাড়াই বলে উঠলো, “দয়া করে দু’টা নেয়ার চিন্তা করবেন না। প্লিজ। ” আবির মেঘের মুখোমুখি হয়ে ছোট করে বললো, “আমার টা রেখে এই দুটা নিয়ে নেই?” মেঘ চিৎকার দিয়ে উঠলো, “নাহ...। আপনার টা আমার অনেক পছন্দ । ” আবির মৃদু হেসে সাইডে গিয়ে বসলো। মেঘকে বললো তানভিরকে কল দেয়ার জন্য। আবিরের কথামতো মেঘ কল দিয়ে সেই সেই কথাগুলোই বলেছে যা আবির শিখিয়ে দিয়েছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই তানভির চলে আসছে। মেঘ তানভিরের হাতে দুটা চিরকুট দিয়ে বললো, “যেকোনো একটা তুলো। ” তানভির বনুর কথামতো তাই করলো। সহসা মেঘ উত্তেজিত কণ্ঠে বললো, “সারপ্রাইজ। এটা তোমার গিফট। আবির ভাইয়ের তরফ থেকে । ” আবির পাশ ফিরে মেঘের দিকে চেয়ে বললো, “আমাদের দুজনের পক্ষ থেকে, টাকা আমার পছন্দ ওর। ” তানভির আবিরকে জরিয়ে ধরে বললো, “Thank you so much Vaiya. ” মেঘকেও ধন্যবাদ দিলো। বাইকের সব কাজ শেষ করে শোরুম থেকে বের হয়েই মেঘ বললো, “ভাইয়া ট্রিট দিবা না?” তানভির হাসিমুখে বললো, “অবশ্যই দিবো। ১ মিনিট ওয়েট কর বনু। ” আবিরকে সাইডে নিয়ে তানভির কানে কানে বললো, “ভাইয়া, হেল্প করো প্লিজ। ” আবির কপাল কুঁচকে বললো, “কি হেল্প?” তানভির বিড়বিড় করে বললো, “তোমার মতো আমিও আমার ওনাকে প্রথমে বাইকে বসাতে চাই। ” আবির তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে তপ্ত স্বরে

শুধালো, " আমি কারে প্রথমে বাইকে উঠাইছি?" তানভির ঠাট্টার স্বরে বললো, "আমার সামনে ঢং করো না ভাইয়া। আমায় বাইকে উঠাতে হবে বলে একা একা বাইক কিনে নিয়ে গেছো। মীম, আদিকে বাইকে ঘুরাবা দূরের কথা আমায় বাইক ছুঁতে ই দাও নি। বনুরে নিয়ে সর্বপ্রথম বাইকে ঘুরছো। বনুরে নিয়ে ঘুরার কয়েকদিন পরে আমারে তোমার বাইকে প্রথম উঠতে দিছো। কি ভাবছো? আমি জানি না? তুমি যেদিন প্রথম বনুরে নিয়া ঘুরছো সেদিন ই আমার বন্ধু আমায় বলছে। " আবির নিঃশব্দে হেসে বলছে, "আস্তে বল, ও শুনে ফেলবে। " তানভির আকুল স্বরে বললো, "তাহলে আমার ব্যবস্থা করে দাও প্লিজ।" আবির গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর দিলো, "তোর ওনাকে তো আনতেই চাইছিলাম কিন্তু ওনাকে বলার আগেই ছুটে পালাইছে।" তানভির সুস্থির ভঙ্গিতে বললো, "প্লিজ ভাইয়া...!" আবির ভ্রু কুঁচকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে বললো, "তুই ও তো তোর বোনের মতোই হইছিস। ঠিক আছে, দেখছি। "আবির মেঘের কাছে এসে শান্ত স্বরে বললো, "তানভিরের আজকে কাজ আছে। কালকে পরীক্ষা দিয়ে তোর তা*ড় ছিঁ*ড়া বান্ধবীটাকে নিয়ে রিক্সা করে এখানে চলে আসিস। এখন চল । " মেঘ জিজ্ঞাসু চোখে চেয়ে শুধালো, "কোথায়?" আবির তাকাতেই মেঘ মাথা নিচু করে ফেললো। বুঝতে পারলো কথায় কথায় প্রশ্ন করাতে আবির ভাই রে*গে গেছেন। মেঘ লক্ষী মেয়ের মতো বাইকের পেছনে বসে আছে । ঘন্টাখানেক মেঘকে নিয়ে বাইকে ঘুরেছে, ফুচকা, আইসক্রিম থেকে শুরু করে যে যে স্ট্রিটফুড পেয়েছে,

মেঘের পছন্দ মতো সবই কিনে খাইয়েছে আবির। বিকেলের পর থেকে আবহাওয়া খা*রাপ হতে শুরু করেছে। পর্যায়ক্রমে মেঘের গ*র্জন শুরু হয়ে গেছে। মেঘ তখন আচার খেতে ব্যস্ত। আবির মেঘের দিকে চেয়ে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে শুধালো, "বৃষ্টি শুরু হয়ে যাবে তো। বাসায় যাবি না?" মেঘ আচার খেতে খেতে আবির ভাইয়ের অভিমুখে চেয়ে আহ্লাদী কণ্ঠে বলে উঠলো, "বৃষ্টিতে ভিজতে খুব ইচ্ছে করছে । " আবির কপাল কুঁচকে চেয়ে আছে, অপলক সেই দৃষ্টি । মেঘ মনে মনে বলছে, "এই গোধূলি আলোতে আপনার হাতে হাত রেখে বৃষ্টিতে ভিজতে চাই। বৃষ্টির প্রতিটা ফোঁটাকে চিৎকার করে বলতে চাই, এই মানুষটাকে আমি বড্ড বেশি ভালোবাসি। আমার কল্পনার জগতে আবির ভাই শুধুই আমার। " আবির কপাল কুঁচকে তাকিয়ে থেকেই শক্ত কণ্ঠে বললো, "বৃষ্টিতে ভিজে নিজের কি হাল করছিলি মনে নেই?" মেঘ একগাল হেসে উত্তর দিলো, "এবার আর এমন হবে না। কারণ আপনি....." আবির গম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন করলো, "আমি কি?" মেঘ মাথা নিচু করে মুচকি হেসে বললো, " কিছু না। " ঝিরিঝিরি বৃষ্টি পরা শুরু হয়ে গেছে। আবির আশপাশ দেখছে। মেঘ হাত থেকে ঘড়ি খুলে ব্যাগে রেখে আবির ভাইকে ব্যাগটা দিয়ে বলল, " আবির ভাই, ব্যাগ টাকে রেইনকোট দিয়ে ঢেকে রাখবেন, প্লিজ। " মেঘের কথায় আবির নির্বোধের ন্যায় মেঘের দিকে চেয়ে ঠোঁটের কোণে হাসি রেখে বললো, "রেইনকোট পড়া দরকার তোর আর তুই তোর ব্যাগকে রেইনকোট পড়াতে বলছিস! " মেঘ হাসিমুখে বললো, " বই খাতা ভিজলে তো

পড়তে পারবো না। আমি ভিজলে তো সমস্যা.... ” এতটুকু বলতেই আবিরের চোখে চোখ পরলো মেঘের। আবির তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে, মেঘ আস্তে করে বললো, “নেই..!” আবির কণ্ঠ দ্বিগুণ ভারি করে জানালো, “ভিজতেছিস ভিজ, জ্ব*র যদি হয় তাহলে তোর খ*বর আছে বলে দিলাম। সমস্যা আছে কি নেই সেটা তখন বুঝাবো। ” মেঘ বিড়বিড় করে বললো, “আগে আপনার সাথে বৃষ্টি উপভোগ করে নেয় তারপর প্রয়োজনে জ্বর – সর্দি উপভোগ করে নেব। ” বৃষ্টি বাড়তে শুরু করেছে, মানুষ ছোটাছুটি করছে। আবির আর মেঘ দাঁড়িয়ে মানুষের ছোটাছুটি দেখছে, একসময় বারিবর্ষণ শুরু হয়েছে। দুজনের সর্বাঙ্গ ভিজে একাকার অবস্থা।কিন্তু কেউ যেনো একচুল নড়ছে না। মেঘ আকাশের পানে মুখ করে চোখ বন্ধ করে বৃষ্টি উপভোগ করছে, আর আবির সেই মায়াবী মুখের অভিমুখে নে*শাক্ত চোখে চেয়ে আছে ঠোঁটের কোণে এক চিলতে হাসির ঝলক। মেঘ আকাশের পানে চেয়ে, মনে মনে কতকিছু চেয়ে ফেলেছে তা আবিরের অজানা । মেঘের খুব ইচ্ছে করছে আবির ভাইয়ের হাতে হাত রেখে বৃষ্টিতে হাঁটার। কিন্তু আবির ভাইয়ের হাত ধরার সাহস তো ছোট্ট অষ্টাদশীর এখনও হয় নি। তারপর ভাবলো, পাশাপাশি হাঁটতে পারলেই মনে শান্তি লাগবে। মেঘ কিছু সময় পর স্বাভাবিক হয়েছে, তৎক্ষনাৎ আবির দৃষ্টি সরিয়ে কিছুটা নড়েচড়ে উঠলো। মেঘ আবিরের দিকে চেয়ে আহ্লাদী কণ্ঠে বললো, ” চলুন না, হাঁটি । ” মেঘের কথা শুনে আবির সহসা দু কদম এগিয়েছে, মেঘ তখনও আগের জায়গাতেই দাঁড়িয়ে আছে। আবির

নিজের বামহাত বাড়িয়ে বললো, “হাতটা ধর নাহয় কখন আবার বৃষ্টিতে পা পিছলে পড়ে যাবি। ” কথাটা বলতে দেরি হয়েছে, কিন্তু আবিরের হাত খপ করে ধরতে এক সেকেন্ড দেড়ি করে নি মেঘ। এমনভাবে হাত আঁকড়ে ধরা দেখে আবির সামনের দিকে চেয়ে মুচকি হাসলো। অষ্টাদশী তো জানে না এই আবিরের মনে, অষ্টাদশীর চেয়েও হাজার গুণ বেশি প্রেমানুভূতি সর্বক্ষণ বিচরণ করে। ২৪ ঘন্টা আবিরের মাথায় শুধু মেঘই ঘুরপাক খায় । অষ্টাদশী কি ভাবে! কি চাই! সবই আবির বুঝতে পারে। তবে কিছু প্রকাশ করে, কিছু অপ্রকাশিত রাখে। রাজপুত্র আর রাজকন্যা হাতে হাত রেখে পাশাপাশি হাঁটছে। আবিরের দৃষ্টি সামনের দিকে থাকলেও, মেঘের সম্পূর্ণ দৃষ্টি আবিরে নিবন্ধ । ঠোঁটের কোণে লেগে থাকা হাসি যেনো সরছেই না বরং ক্রমে ক্রমে বেড়েই যাচ্ছে। মেঘের বুকের ভেতরে থাকা সুপ্ত ভালোবাসা গুলো কোনো বাঁধা মানতে চাইছে না। এই বৃষ্টিসিক্ত গোধূলিতে প্রকৃতিকে সাক্ষী রেখে বলতে ইচ্ছে করছে, “এই মানুষ টাকে আমার চাই। সম্পূর্ণ আমার করে পেতে চাই। ” মেঘ হাবিজাবি ভাবতে ভাবতেই অকস্মাৎ রাস্তার পাশে থাকা গাছের শেকড়ের সাথে হোঁচট খেয়ে উপুড় হয়ে পড়তে গেলে, আবিরের বাম হাতে থাকা মেঘের হাতটা আবির শক্ত করে ধরে, সহসা ডান হাতে মেঘের পেট বরাবর আঁকড়ে ধরলো । কয়েক সেকেন্ডের জন্য মেঘের মনে হয়েছিল পৃথিবীটা বুঝি থমকে গেছে। আচমকা হোঁচট খাওয়ায় মেঘের স্বাভাবিক হতে কিছুটা সময় লেগেছে। নিজের উদরে আবির ভাইয়ের শক্তপোক্ত হাতের ছোঁয়া

বুঝতে পেরে মেঘ বিস্ময় চোখে উদরে রাখা হাতের দিকে চাইলো। বৃষ্টিতে ভিজে পড়নের সুতি জামাটা আগে থেকেই গায়ের সাথে মিশে ছিল। আবির ভাই জামার উপর দিয়ে ছোঁয়ার পরও, মেঘের মনে হচ্ছে উ*ন্মুক্ত উ*দরে হাত রেখেছে আবির ভাই। মেঘের সর্বা*ঙ্গ শিহরিত হলো, বুকের ভেতরে থাকা হৃ*দপি*ণ্ডটা বাহিরে বেড়িয়ে আসতে চাইছে,মেঘের নিঃশ্বাস গলায় আটকে যাচ্ছে । হোঁচটের ফলে পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলের কোণা উঠে র*ক্ত বের হচ্ছে, স্না*য়ুত*ন্ত্রে ক্রমাগত সি*গনাল দেয়ার ফলে মেঘ বুঝতে পেরে "উফফ" করে উঠলো। নিজেকে কন্ট্রোল করে মেঘ দাঁড়িয়ে পায়ের দিয়ে চাওয়ার আগেই ব্য*থা বুঝতে পেরে ঠোঁট ফুলিয়ে কান্না শুরু করে দিয়েছে। আবির সঙ্গে সঙ্গে বসে পরলো আঙুল টা দেখতে, র*ক্ত যা বের হচ্ছে সবই বৃষ্টির পানিতে ধুয়ে চলে যাচ্ছে। পকেট থেকে একটা ওয়ানটাইম ব্যা*ন্ডেজ বের করে আপাতত আঙুলে পেঁচিয়ে দিলো। আবিরের ছোঁয়াতে পায়ের ব্যথা সারলো কি না কে জানে, মেঘের মনের ব্যথা যেন এক সেকেন্ডেই সেরে গেছে। মেঘ বাকরুদ্ধ হয়ে চেয়ে আছে, তার চোখ দিয়ে শুধু পানি পরছে। আবির দাঁড়িয়ে দুহাতের উল্টো পিঠ দিয়ে,মেঘ গাল বেয়ে পড়া চোখের পানি তার সাথের বৃষ্টির পানি মুছে দেয়ার চেষ্টা করলো। তারপর আবির তপ্ত স্বরে বললো, "এত সামান্য ব্যথায় এভাবে কাঁদলে হবে?" তৎক্ষণাৎ মেঘের ফুঁপানোও বন্ধ হয়ে গেছে। মেঘ কিছু বলার আগেই, আবির আচমকা মেঘকে কোলে তুলে নিলো। মেঘের চোখ কোটর ছেড়ে বেড়িয়ে আসতে চাইছে, নিজেকে

সামলাতে সহসা একহাতে আবিরের শার্টের বোতামসহ কিছুটা অংশ চেপে চোখ বন্ধ করে ফেলছে। রাস্তার দুপাশে বড় বড় গাছ, বৃষ্টিতে ভেজা পিচঢালা রাস্তায় মেঘকে কোলে নিয়ে আবির হাঁটছে । কিছুটা সময় পর মেঘ চোখ খুলে, বৃহৎ চোখে আবিরের শ্যামবর্ণের চেহারায় চেয়ে আছে, আবিরের চুলে, নাকে,মুখে গালে পড়া বৃষ্টির ফোঁটার কিছুটা মেঘের মুখেও ছিটকে পরছে। মেঘ ধীর কণ্ঠে বললো, "নামিয়ে দেন, আমি যেতে পারবো। " আবির ভাইয়ের এভাবে কোলে তুলে নেয়াতে মেঘের সর্বা*ঙ্গে কা*রে*ন্টের শ*ক খেয়েছে। এই মানুষটা কাছাকাছি আসলেই যেখানে মেঘের হৃ*দপি*ণ্ডের ধুকপুকানি বেড়ে যায়, সেখানে এভাবে কোলে তুলাতে তার সবকিছু যেনো এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। তাই মন না চাইতেও আবিরকে বললো, নামিয়ে দিতে। আবির নিরেট কণ্ঠে বললো, " চুপ করে থাক। " মেঘ নিশ্চুপ হয়ে আবির ভাইকে দেখছে। ধ*মক খেয়ে মন খারাপ হওয়ার বদলে তার ঠোঁটে মিষ্টি হাসি লেগে আছে। কিছুদূর যাওয়ার পর, একটা চায়ের দোকানের কাছে গিয়ে, পিচ্চি ছেলেকে ডেকে বললো চেয়ার দিতে, খোলা আকাশের নিচে ছেলেটা চেয়ার দিলো, আবির মেঘকে বসাতেই মেঘ বলল, "আপনি তখন না ধরলে পড়ে নিশ্চিত আমার মা*থা ফা*টতো। " আবির শক্ত কণ্ঠে জবাব দিলো, "এত সহজে তোর কিছু হতে দিব না, পরিস্থিতি যতই বেসামাল হোক, আমি ঠিকই তোকে সামলে রাখবো।" এই কথা শুনে মেঘ বিস্ময় চোখে আবির ভাইয়ের পানে চেয়েছে। কথার গভীরতা ঠিক কতটা, সেটা বুঝতে না পারলেও,

কথাটা তার খুব মনে ধরেছে। বৃষ্টি কিছুটা কমে এসেছে, আবির শান্ত কণ্ঠে বললো, “চা খাবি?” মেঘ ঘাড় কাথ করে সম্মতি দিলো। বেশিকরে আদা কুচি দিয়ে দু-কাপ লিকার চা নিয়ে আসছে। এককাপ মেঘকে দিয়ে আবির কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে চা খাচ্ছে। মেঘ চা খাওয়ায় মনোযোগ দিলো, বৃষ্টিতে বসে এভাবে চা খাওয়া এটায় জীবনে প্রথমবার । বৃষ্টির ছোট ছোট ফোঁটা চায়ে পরছে আর মেঘ আপন মনে চা খাচ্ছে । হঠাৎ মেঘের অভিমুখে আবির কেমন করে চাইলো, আবির মিহি কণ্ঠে ডাকল, “মেঘ!” আচমকা আবির ভাইয়ের সুমধুর কণ্ঠে নিজের নাম শুনে মেঘ বরফের ন্যায় জমে গেলো। আবিরের তপ্ত দৃষ্টি মেঘের হৃ*দপি*ণ্ডে ক্রমাগত ছু*রি চালাচ্ছে, এই বুঝি ছোট্ট অষ্টাদশীর প্রা*ণ টা দে*হ ছে*ড়ে বেড়িয়ে যাবে। মেঘ কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে জবাব দিল, “জ্বি...!” আবির তখনও শীতল চাউনিতে মেঘের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। কয়েক সেকেন্ড পর প্রগাঢ় কণ্ঠে শুধালো, “যদি কখনো এমন হয়, তোর জীবনের সবচেয়ে প্রিয় দুটা জিনিস থেকে যেকোনো একটাকে বেছে নিতে বলা হয়। তখন তুই কি করবি?” আবির ভাইয়ের বলা এত কঠিন কথার মানে মেঘ বুঝতে পারছে না। কপাল গুজিয়ে আবির ভাইয়ের দিকে চেয়ে কথাটা বুঝার চেষ্টা করছে। আবির কন্ঠ খাদে নামিয়ে পুনরায় প্রশ্ন করল, “পারবি তো একটাকে বেছে নিতে? ” মেঘ নির্লিপ্ত চোখে তাকিয়ে আছে। মেঘের মাথায় হাজারটা চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে। আবির ভাই তাকে এমন করে কেনো জিজ্ঞেস করছে, ওনি কোথাও গেলে তো আমার পছন্দের সবজিনিস না

চাইতেও নিয়ে নেন, বেছে নিতে দেন না। তাহলে কি এমন জিনিস যা একটায় বেছে নিতে হবে। মেঘের নিরুত্তর পরিস্থিতি দেখে আবির মনে মনে বললো, ” যেদিন তুই দুটা প্রিয় জিনিস থেকে একটা বেছে নিতে পারবি, মন শক্ত করে বলতে পারবি এটায় আমার লাগবে, সেদিন তোকে এই প্রশ্ন টা দ্বিতীয় বার করবো। ” আবির গলা খাঁকারি দিয়ে বললো, “বাদ দে এসব। আরেক কাপ চা দিতে বলছি তুই চা খা। আমি বাইক টা নিয়ে আসি। ” আবির আশপাশ দেখে। চায়ের টাকা দিয়ে আরেক কাপ চা দিতে বলে বাইক আনতে চলে গেছে। ডাক্তার দেখিয়ে ঔষধ নিয়ে মেঘকে বাসার সামনে নামিয়ে দিলো। বরাবরের মতো মেঘ আজও প্রশ্ন করলো, “বাসায় আসবেন না?” আবির মৃদু হেসে উত্তর দিলো, “আসবো একটু পর। তুই সাবধানে রুমে যাস, আঙ্গুলে চাপ যেন না পরে। ” মেঘ ধীর পায়ে হেঁটে বাড়িতে ঢুকে গেলো। আবির চলে গেলো অজানা গন্তব্যে। আজ মেঘ ইচ্ছে করেই একটু সাজুগুজু করছে। চোখে গাঢ় করে কাজল দিলো, হালকা গোলাপি রঙের রঞ্জক লাগিয়েছে ঠোঁটে। আবির ভাইয়ের পছন্দের রঙ অনুসরণ করে একটা সাদা রঙের ড্রেস পরেছে সাথে সুন্দর হিজাবও পরে নিয়েছে। হুটহাট আবির ভাই কোচিং এর সামনে চলে আসে বিধায় সে সাদামাটায় ঘুরে। তবে আজ আবির ভাইয়ের সাথে ঘুরবে এটা সে আগে থেকেই জানে। তাই সেজেছে। পরীক্ষা শুরুর আগেই বন্যাকে বলেছে তানভির ভাইয়ার ট্রিটের কথা তবে বন্যা কোনোভাবেই রাজি হচ্ছিলো না। মেঘ জোর করে রাজি করিয়েছে।

যথারীতি পরীক্ষা শেষে দুই বান্ধবী রিক্সা করে নির্দিষ্ট জায়গাতে চলে এসেছে। আবির আর তানভির আগে থেকেই দাঁড়িয়ে ছিলো। মেঘ দূর থেকে আবিরকে দেখেই একগাল হাসলো। কাজল কালো সেই ডাগর ডাগর আঁখি আর অকৃত্রিম, মায়াবী হাসি দেখে আবিরের মন উতলা হয়ে উঠেছে। অন্তঃস্থলে শিহরণ জাগছে। বক্ষস্পন্দন জোড়ালো হচ্ছে, আবির ঢুক গিলে স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা করছে। কিন্তু তার দৃষ্টি যেনো সরছেই না। আবিরের অশান্ত মনকে শান্ত করার সকল ক্ষমতা বিলীন হয়ে গেছে। আবির মনে মনে বিড়বিড় করে বলছে, "আমায় ধ্বং*স করতে কেনো উঠেপড়ে লেগেছিস?" মেঘ রা নামতেই তানভির রিক্সা ভাড়া দিয়ে দিলো। শান্ত কণ্ঠে শুধালো, "আসতে সমস্যা হয় নি তো কোনো?" দুজনেই মাথা নেড়ে না করলো। তানভির বন্যার দিকে চেয়ে ছোট করে বলল, "Congratulation " বন্যা হেসে উত্তর দিল, "Thank You" তানভির আবিরকে ডাকলো, "ভাইয়া চলো..!" তানভিরের ডাকে আবির স্বাভাবিক হলো। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, "চল।" কাছেই একটা রেস্টুরেন্টে গেছে খেতে। খাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে আবির শুধু মেঘকে দেখছে, মেঘ তাকালেই দৃষ্টি সরিয়ে নিচ্ছে। এই চোখে জাদু আছে যা এই শ্যামবর্ণের, সু*ঠাম দেহি পুরুষকে মূহুর্তেই দূ*র্বল করে দিয়েছে। না পারছে দীর্ঘ সময় ঐ চোখে চেয়ে থাকতে আর না পারছে নিজেকে সংযত রাখতে। অন্যদিকে বন্যা আর তানভিরেরও কয়েকবার চোখাচোখি হয়েছে। তবে চোখে চোখ পরতেই দুজনেই সঙ্গে সঙ্গে চোখ নামিয়ে নিচ্ছে। বন্যা সবুজ রঙের একটা

ড্রেস পরেছে সাথে হিজাব পরা। এত সাজগোছ নেই, দেখতে খুবই সাদামাটা, গায়ের রঙ ফর্সা হলেও সেটা মেঘের তুলনায় কিছুটা চাপা। ঠোঁটে হালকা লিপস্টিক আছে। উচ্চতায়ও মেঘের তুলনায় ১ ইঞ্চি কম হবে। হাসিটা মাত্রাতিরিক্ত সুন্দর । তবে সচারাচর মেয়েটা হাসে না। বেশিরভাগ সময় সিরিয়াস মুডেই থাকে। খাওয়া শেষে বেড়িয়েছে সবাই। মেঘ আর বন্যা দুজনেই তানভিরকে ধন্যবাদ জানালো ট্রিটের জন্য। আবির একবার তানভিরের দিকে চেয়ে চোখ দিয়ে কিছু ইশারা করলো। তারপর আবির গম্ভীর কণ্ঠে বললো, "তানভির আমি মেঘকে নিয়ে বাসায় যাচ্ছি। তুই বন্যাকে বাসায় পৌছে দিয়ে তারপর যেখানে ইচ্ছে যাবি। " তানভির স্বাভাবিক কণ্ঠে জানালো, "ঠিক আছে ভাইয়া।" মেঘ বন্যাকে টা টা দিয়ে বাইকে বসলো। আবির দেরি না করে মেঘকে নিয়ে জায়গা ত্যাগ করলো। আবিররা যাওয়ার পর ই তানভির বাইকে বসে বন্যার দিকে চেয়ে বললো, "উঠো" বন্যা ঠান্ডা স্বরে জানালো, "আমি রিক্সা করে চলে যেতে পারবো। " তানভির একটু রা*গী ভাব নিয়ে বললো, "শুনো নি ভাইয়া কি বলছে? তোমায় বাসায় দেয়ার পর আমার দায়িত্ব শেষ হবে। উঠো। " বন্যা আর কথা বাড়ালো না হেলমেট পড়ে, মাঝখানে জায়গা রেখে বাইকে বসলো । পেছন দিকে ধরে রেখেছে। তানভির জীবনে প্রথম মেয়েকে নিয়ে বাইক চালাচ্ছে তাই কিছুটা ভ*য়ে আছে। এজন্য এত জোরে বাইক চালাচ্ছে না। কিছুটা যাওয়ার পর রাস্তার পাশে বাইক রেখে বললো, " তুমি একটু দাঁড়াও আমি আসছি। " বন্যা সাইডে দাঁড়িয়ে আছে। কিছুক্ষণ পর

বেরিয়ে তানভির একটা শপিং ব্যাগ বন্যার দিকে এগিয়ে দিলো, বন্যা জিজ্ঞাসু চোখে চেয়ে বললো, “কি এতে? ” তানভির শান্ত স্বরে বলল, “তোমার রেজাল্টের গিফট। ” বন্যা কোনোভাবেই নিতে রাজি হচ্ছে না। বাধ্য হয়ে তানভির ধ*মক দিলো, “বলছি নিতে, নাও ” বন্যা ভ*য়ে কিছুটা কেঁপে উঠলো। কাঁপা কাঁপা হাতে ব্যাগ টা নিয়ে ছোট করে বলল, “Thanks” তানভির মৃদু হেসে আবার বাইকে বসলো। পিচঢালা রাস্তায় বাইক চলছে। বন্যা নিরব, শান্ত মেয়ের মতো চুপচাপ বসে আছে। নিরবতা ভেঙে তানভির বললো, “গতকাল ভাইয়া আর বনু মিলে আমায় এই বাইকটা গিফট করেছে। কেমন হয়েছে বলো তো?” বন্যা হাসিমুখে উত্তর দিলো, “অনেক সুন্দর হয়েছে। ” তানভির পুনরায় বলল, “তারজন্যই আজকে ট্রিট দিলাম।” বন্যা এবার মৃদুস্বরে শুধালো, “আমায় ট্রিট দেয়ার কি প্রয়োজন ছিল। আমি তো...!” এটুকু বলতেই তানভির বললো, “তোমাকে দেয়ার প্রয়োজন ছিল। ঐদিন তোমাদের বাসায় খেয়ে আসলাম। তাছাড়া তুমি বনুর বেস্টফ্রেন্ড। আর আমাকে যেভাবে ভাইয়া ভাইয়া ডাকো আমি তো মাঝে মাঝে কনফিউজড হয়ে যায় যে আমি কার ভাই। ” কথাগুলো শুনে বন্যা কিছুটা লজ্জা পেলো তারপরও স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করলো। এরমধ্যে বন্যাদের বাসার গলি পর্যন্ত চলে আসছে। বন্যা তাড়াহুড়ো করে বললো, “ভাইয়া এখানে নামিয়ে দেন, প্লিজ। ” তানভির বাইক থামিয়ে বললো, “আবার!” বন্যা হেলমেট খুলতে খুলতে তপ্ত স্বরে বললো, “সরি তানভির ভাই। এখান থেকে হেঁটেই যেতে পারবো।

কেউ দেখলে সমস্যা হবে। ” সমস্যা বুঝতে পেরে তানভির স্বাভাবিক কণ্ঠে বললো, “সাবধানে যেও। আর পড়াশোনা করো ঠিক মতো। আল্লাহ হাফেজ। ” বন্যাও আল্লাহ হাফেজ বলে, শপিং ব্যাগ নিয়ে গলি দিয়ে হাঁটছে। তানভির কিছুক্ষণ স্থির দাঁড়িয়ে চেয়ে রইলো সেদিকে তারপর আবার বাইক স্টার্ট দিয়ে চলে গেলো। আবির বাসার দিকে না গিয়ে অন্যরাস্তায় যাচ্ছে দেখে মেঘ চিন্তিত স্বরে বললো, “বাসায় যাবেন না?” আবির কঠিন স্বরে জবাব দিল, “বাসায় যাওয়ার এত তাড়াতাড়ি কিসের তোর। ” মেঘ আর কিছু বললো না। আবির ভাইয়ের কাছাকাছি তো সেও থাকতে চাই কিন্তু তানভিরের সামনে আবির বলেছে, বাসায় চলে যাবে এজন্যই মেঘ জিজ্ঞেস করেছিল। আবির মেঘকে নিয়ে একটা পার্কে এসেছে। পার্কে মানুষের ভিড় দেখে আবির কিছুটা ভী*ত হলো। মেঘের দিকে চেয়ে বললো, “ঢুকবি নাকি অন্য কোথাও যাবো? ” মেঘ একগাল হেসে উত্তর দিলো, “এসেছি যখন তাহলে ঢুকি। ভালো না লাগলে চলে যাব নে। ” আবির মেঘের হাত ধরে হাঁটছে। মেঘ আশেপাশে তাকাচ্ছে আর বার বার আবির ভাইয়ের শক্ত করে ধরে রাখা হাতের দিকে তাকাচ্ছে। এমনভাবে হাত ধরে রেখেছে যেন ছেড়ে দিলেই তার প্রেয়সী হারিয়ে যাবে বহুদূরে। মেঘ সেই হাত ধরা দেখে গতকালের ন্যায় বারবার লজ্জায় আড়ষ্ট হচ্ছে। মেঘ চারপাশে তাকিয়ে দেখছে, কত কত মানুষ, কেউ কেউ পরিবার নিয়ে এসেছে, ছোট বাচ্চা নিয়ে এসেছে, বন্ধুরা মিলে ছবি তুলছে, আড্ডা দিচ্ছে। বেশ কয়েকটা কাপল ও দেখেছে হাত হাত রেখে

হাঁটছে। সেসব দেখে মেঘেরও নিজেকে আবির ভাইয়ের প্রেমিকা মনে হচ্ছে। এটা ভাবতেই লজ্জায় দু গাল লাল হয়ে গেছে, ঠোঁটের মুচকি হাসি যেনো সরছেই না। একটা ফাঁকা ব্র্যাঞ্চ দেখে আবির মেঘকে ইশারা দিলো বসার জন্য । আবির কিছুটা দূর থেকে একটা আইসক্রিম নিয়ে আসছে।মেঘকে আইসক্রিম দিয়ে মেঘের থেকে কিছুটা দূরে বসেছে আবির। মেঘ আপন মনে আইসক্রিম খাচ্ছে একবার আবির ভাইকে দেখছে আবার আশপাশ দেখছে। আবির আচমকা ডেকে উঠলো, "তাকা এদিকে। " হঠাৎ ডাকায় মেঘ কিছুটা কেঁপে উঠেছে। তারপর স্বাভাবিক ভাবে ঘাড় ঘুরিয়ে আবির ভাইয়ের দিকে তাকালো। আবির ভ্রু কুঁচকে চিন্তিত স্বরে বলল, "এভাবে সেজেছিস কেনো?" মেঘ মুভ ভোঁতা করে আবিরের দিকে তাকিয়ে আছে। কয়েক মুহুর্ত পর বললো, "কই সাজছি। শুধু কাজল আর...!" এটুকু বলতেই আবির বলল, "শুধু কাজল টাও আর দিবি না। " আবির মনে মনে বলল, " তোর এই চোখের মায়ায় আমি ছাড়া, আর কাউকে পরতে দিব না । " মেঘ আহ্লাদী কণ্ঠে শুধালো, "কাজল দিলে কি আমায় অনেক সুন্দর লাগে?" আবির তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে বললো, "ঐ যে দূরে গাছটা দেখা যাচ্ছে, ঐ গাছের ঢালে বসে থাকা পে*ত্নী টার মতো লাগে। এজন্যই বলছি কাজল পরে রাস্তাঘাটের মানুষকে ভ*য় দেখাইস না। " মেঘ নিচের ওষ্ঠ উল্টে আবিরের দিকে চেয়ে আছে, চোখ পানিতে টইটম্বুর হয়ে গেছে, পল্লব ঝাপটালেই গাল বেয়ে গরিয়ে পরবে। আবির কপাল কুঁচকে চেয়ে আছে। বিরক্ত নিয়ে বলল,

“তোর সমস্যা কি মেঘ ? কিছু বলার আগেই কা*ন্না করে দেস কেন? এক মিনিট কাঁ*দলে ১ ঘন্টা মাথা ব্যথায় ভুগিস সেটা মাথায় থাকে না?” মেঘ অবাক চোখ তাকিয়ে ভেজা কন্ঠে প্রশ্ন করল, “আপনি কিভাবে জানেন আমার মাথা ব্য*থা হয়?” আবির ঢুক গিলে কন্ঠ দ্বিগুণ ভারি করে বলল, ” এটা জানা এমন কোনো কঠিন বিষয় না। দূরে ছিলাম মানে এই না যে সব ছেড়ে গেছিলাম। চল বাসায় যায়। ”সময় চলে যাচ্ছে নিজস্ব গতিতে। মাঝখানে কেটে গেছে বেশকিছুদিন। আবিরের ব্য*স্ততম দিন কাটছে। এই সপ্তাহে নির্বাচন তানভিরেরও ব্য*স্ততা বেড়েছে তিনগুণ। নির্বাচনের কাজে এতটায় ব্য*স্ত, কখনো রাত ২-৩ টায় বাসায় ফিরে, কখনো বা ফিরেও না। নিজস্ব বাইক থাকাতে এখন তেমন একটা সমস্যা হচ্ছে না। বাইক কেনার পর বাসায় টুকিটাকি সমস্যা হলেও সবকিছু আবির ই সামলে নিয়েছে। আগামী মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এডমিশন টেস্ট। তার কিছুদিন পর মেডিকেল পরীক্ষা। কোচিং এর ক্লাস শেষ, এখন শুধু মডেল টেস্ট পরীক্ষা চলছে। ১০ টা থেকে ১২ টা পর্যন্ত কোচিং এর পরীক্ষা হয়, পরীক্ষার পড়া, জান্নাত আপুর পড়া তার সাথে নিজস্ব পড়ার চাপ তো রয়েছেই। তবে সবকিছুর মাঝেও আবির ভাই যেনো মেঘের সমস্ত পৃথিবী ঘিরে রয়েছে। সকাল আর রাতে বেলকনিতে দাঁড়িয়ে আবিরকে দেখা এখন মেঘের অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে। শুক্রবারটা শুধু ব্যতিক্রম। তবে শুক্রবারে মেঘ নাস্তা খেতে যাওয়ার আগে চুপিচুপি আবির ভাইয়ের দরজা পর্যন্ত এসে আবির ভাই কে দেখে যায়। ধ*রা

পরার ভ*য়ে রুমের ভেতরে ঢুকে না। আজ আবিরের অফিসে মিটিং আছে। রেডি হয়ে কোনো রকমে হালকা নাস্তা করেই বেড়িয়ে পরেছে। প্রথমে বাবার অফিসের কাজ শেষ করতে হবে। ১২ টায় মিটিং টাইম দিয়েছে। ১১.৫০ নাগাদ আবির নিজের অফিসে পৌঁছেছে। রাকিবের পার্সোনাল সমস্যার জন্য এখনও অফিসে আসতে পারে নি। আবির রাকিবকে কল দিয়ে জিজ্ঞেস করছে, "কই তুই? আমি কি ওয়েট করবো নাকি মিটিং শুরু করবো?" রাকিব জ্যামে আঁটকে আছে। ঢাকা শহরের জ্যাম মানে লাগছে তো লাগছেই শেষ আর হবে না। রাকিব ঠান্ডা স্বরে বলল, "তুই শুরু কর। আমি কাছাকাছি আছি। আসতেছি। " আবির আর কথা বাড়ায় নি। জাস্ট ১২ টায় মিটিং শুরু করেছে, ২ মিনিটও হয় নি কথা শুরু করেছে। এর মধ্যে টেবিলে রাখা মোবাইল ফোনে ভাইব্রেশন হচ্ছে। বিরক্তিতে কপাল কুঁচকে ফোনের দিকে তাকাতেই রীতিমতো আশ্চর্য হয়ে গেলো। কাঙ্ক্ষিত নাম্বার থেকে অনাকাঙ্ক্ষিত সময়ে কল চলে আসছে। সহসা আবিরের ঠোঁটে হাসি ফুটে উঠেছে। সামনে বসে থাকা স্টাফ রাও অবাক চোখে সেই হাসি দেখছে। কারণ এই মানুষ টা অফিসে থাকাকালীন ভুল করেও হাসে না। প্রয়োজন ছাড়া কারো সাথে কোনো কথা বলে না। গোমড়ামুখো মানুষের হাসি এত সুন্দর হয় তারা হয়তো সেটা ভেবেই চেয়ে আছে। আবির ফোন হাতে নিয়েছে, ফোনের স্ক্রিনে নাম ভেসে উঠেছে – 💕হৃদয়হরনী💕 সাথে একটা হাস্যোজ্জল ছবি। নাম্বার টা আরও ১ বছর আগে থেকেই সেইভ করা ছিল আবিরের ফোনে।কিন্তু এই প্রথমবার

কল আসছে। আবির সবার উদ্দেশ্যে “Excuse me” বলে কল টা রিসিভ করে। বুকের ভেতর হৃ*দপিণ্ড টা খুশিতে ধুকপুক করছে। আবির কিছু বলার আগেই ওপাশ থেকে কান্নার শব্দ ভেসে আসছে। এক সেকেন্ডেই আবিরের হাসি গায়েব হয়ে গেছে। বুকের ভেতরটা মো*চড় দিয়ে উঠেছে। ফোনের ওপাশ থেকে কান্নাজড়িত কণ্ঠে ডাকলো, “আবির ভাই! ” এই ডাকে আবিরের হৃদয় ভেঙে বিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। কপাল কুঁচকে পুরো কণ্ঠে প্রশ্ন করল, “কি হয়েছে তোর? ” কান্নার তোপে কথা বলতে পারছে না। ঘন ঘন শ্বাস নিচ্ছে। আবির পুনরায় ডাকলো, “এই মেঘ, কি হয়েছে তোর?” মেঘ কোনোরকমে বলল, “একটা ছেলে আমার হাত ধরে...” এটুকু বলতেই আবার কান্না শুরু করেছে। আবিরের বুকের ভেতর তান্ডব চলছে, তীব্র যন্ত্রণা শুরু হয়েছে বুকে। সেই যন্ত্রণা বুক খুঁড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে। হৃদয়ের তোলপাড় চোখে ভাসতে বেশি সময় লাগে নি। চোখের বর্ণ পরিবর্তন হতে শুরু করেছে, ক্ষণিকের ব্যবধানে র*ক্তবর্ণ ধারণ করেছে চোখ। রুমে ৩ টা এসি চলছে তারপরও আবির ঘেমে একাকার হয়ে যাচ্ছে। আবির উদ্বিগ্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করলো, “কোথায় আছিস?” মেঘ কাঁদতে কাঁদতে জায়গার নাম বললো। আবির শক্ত কণ্ঠে বলল, “আমি আসছি এখনি। ” “মিটিং অফ” কথাটা বলেই আবির ভীষণ তাড়াহুড়োতে মিটিং রুম থেকে বেড়িয়ে গেছে। সবাই আশ্চর্য বনে গেছে। আবিরের চোখ টকটকে লাল হয়ে গেছে। পড়নের ব্লেজার খুলে নিজের রুমের দরজা থেকে ভেতরে ছুঁড়ে ফেলে বের হয়ে যাচ্ছে। আবিরের PS ছুটে

এসে ডাকছে, “কোথায় যাচ্ছেন স্যার, আজকের মিটিং টা অনেক গুরুত্বপূর্ণ। ” আবির অ*গ্নিদৃষ্টিতে চেয়ে বলল, “আমার যাওয়াটা এর থেকেও অনেক বেশি দরকার। আটকিয়ো না আমায়। ” কথায় রাগের তীব্রতা স্পষ্ট। PS চিন্তিত স্বরে বলল, “স্যার, ওখানে একটু পরে গেলে হয় না? অথবা অন্য কেউ গেলে মিটিং টা আপনি করতে পারতেন। ” আবির রাগান্বিত কণ্ঠে হুঙ্কার দিয়ে উঠলো, “কার বুকে এত সাহস, যে আমার কলিজায় হাত দিছে। ঐ কু*ত্তা*র বা*চ্চারে না মা*র*লে আমার শান্তি হবে না। ” এরমধ্যে রাকিব অফিসে ঢুকছে। আবিরের চিৎকার শুনে ছুটে আসে। আবিরের এত ভ*য়ং*কর রূ*প দেখে ভী*ত স্বরে প্রশ্ন করে, “মেঘের কিছু হয়ছে? ” আবির কোনো কথা না বলে রা*গে ক*টমট করতে করতে চলে যাচ্ছে। রাকিব পিছন থেকে ডেকে বলল, “আমি কি যাব তোর সঙ্গে? ” আবির শক্ত কণ্ঠেই বলল, “লাগবে না। ” আবির এক প্রকার দৌড়ে বেড়িয়ে গেছে অফিস থেকে। রাকিব এবার PS এর দিকে চেয়ে শুধালো, “কি হয়ছে? ” ছেলেটা শান্ত স্বরে সব বর্ণনা করলো। রাকিব স্বাভাবিক কণ্ঠে শুধালো, “কোনো কথায় মেঘ নাম শুনছো?” ছেলেটা উপর-নিচ মাথা নাড়লো। রাকিব দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে গম্ভীর কণ্ঠে বলল, “ভাই, আজ প্রথমবার আবিরের পথ আটকাইছো তাই তোমায় কিছু করে নি। ভবিষ্যতে আর কোনোদিন আবিরকে আটকানোর চেষ্টা করো না। তাহলে ওর সম্পূর্ণ রা*গ তোমার উপর ঝা*ড়বে। আবিরের পৃথিবীর ৯৯.৯৯% জুড়ে শুধু মেঘ। বাকি ০.০১% তার পরিবার, আমরা,অফিস সবকিছু। যা বলছে

তাই করো মিটিং অফ রাখো। ” ছেলেটা ভী*ত কণ্ঠে প্রশ্ন করলো, “মেঘ কি স্যারের গার্লফ্রেন্ড? ” রাকিব মৃদু হেসে উত্তর দিলো, “শুধু গার্লফ্রেন্ড হলে বোধহয় এতকিছু করতো না। আবির বেঁচে আছেই শুধু এই মেঘের জন্য। না হয় কবেই পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে চলে যেতো। ” ছেলেটা কপাল কুঁচকে তাকিয়ে আছে রাকিবের দিকে। রাকিব তা বুঝতে পেরে স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, “সেসব বাদ দাও। কিন্তু ভবিষ্যতে এমন কাজ আর করো না। অন্ততপক্ষে মেঘের ব্যাপারে তো কোনোদিন নাক গলাবাই না, তাহলে দেখবা তুমি আছো কিন্তু তোমার নাক নেই। সো বি কেয়ার ফুল। যতটা কুল আর শান্ত আবিরকে দেখো সে এতটাও শান্ত নয়। ” রাকিব চিন্তিত স্বরে বিড়বিড় করে নিজের কেবিনে যাচ্ছে, “আল্লাহ জানে কোন বি*পদে আছে। ” জ্যামের জন্য মেইন রোড দিয়ে যাওয়া অসম্ভব, অনেকটা রাস্তা ঘুরে আবির ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছেছে । মেঘ একটা ব্রেঞ্চে বসে কাঁ*দছিল । আশেপাশে ২-৩ টা লোক দাঁড়িয়ে আছে। আবিরকে বাইক থেকে নামতে দেখে মেঘ দৌড়ে গিয়ে আবিরকে জরিয়ে ধরে হাউমাউ করে কান্না শুরু করেছে। একটা মেয়ের মনের বিরুদ্ধে কোনো কিছু ঘটলে সেটার বহিঃপ্রকাশ ঘটে আপন মানুষের সামনে। মেঘের ক্ষেত্রেও এমনটায় ঘটেছে। আবিরকে দেখে যেনো নিজের প্রাণ ফিরে পেয়েছে। তাই সব শক্তি ঢেলে কাঁদছে । আবির একহাতে হিজাবের উপর দিয়ে মেঘের মাথা আঁকড়ে ধরে রেখেছে। অন্য হাত মুষ্টিবদ্ধ করে দাঁতে দাঁত চেপে আছে। নিজের সবটা রাগ হজম করে শান্ত স্বরে বললো, ”

কিছু হবে না আমি আছি তো। একটু শান্ত হ, প্লিজ। ” কয়েক মুহুর্ত চলে এই বাঁধহীন কান্না। কিছু সময় পর মেঘ বুঝতে পারে, এভাবে আবির ভাইকে জরিয়ে ধরা ঠিক হয় নি । সঙ্গে সঙ্গে মেঘ নিজে থেকে সরে দাঁড়ায়। মেঘের কান্না জরিত মুখ আবিরের সত্ত্বাকে নাড়িয়ে দিয়েছে। মেঘের চোখ মুখ ফুলে গেছে, সারা মুখে র*ক্তচা*প বেড়ে গেছে যার ফলে গাল, নাক, থুতনি সব লাল হয়ে আছে। আবির দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে, দু হাতে মেঘের চোখ মুছে ভারী কণ্ঠে শুধালো, “কোন ছেলেটা?” মেঘ ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালো। আবিরের চোখ ও সেদিকে পরেছে। একটা ছেলে গাছের দাঁড়িয়ে আছে। তাকে ঘিরে ৪-৫ জন লোক দাঁড়িয়ে আছে। আবির কোনো কথা না বলে, ছেলের কাছে গিয়ে এলোপাতাড়ি ঘু*ষি, লা*থি শুরু করেছে। আচমকা আক্রমণে ছেলেটা বেসামাল হয়ে গেছে। আশেপাশে থাকা ৪-৫ জন ভ*য়ে কিছুটা দূরে সরে গেছে। আবিরের রা*গান্বিত চাউনি আর মুখ দেখে তারা যেনো আটকাতেও সাহস পাচ্ছে না। মেঘ বিষ্ময় চোখে আবির ভাইয়ের পানে চেয়ে আছে, আবির ভাইয়ের এই রূপ জীবনে প্রথমবার দেখছে। বাসায় কয়েকবার শুনেছে আবির ভাই মা*রপি*ট করেছে কিন্তু আজ তা নিজের চোখে দেখছে। থ*রথ*র করে কাঁপছে অষ্টাদশীর ছোট দেহ। ছেলেটার নাক-মুখ দিয়ে র*ক্ত গরিয়ে পরছে, কিন্তু আবির এক সেকেন্ডের জন্যও থামছে না। ছেলেটা প্রথম কয়েকবার আটকানোর চেষ্টা করলেও এখন তার নিথর দেহ পরে আছে। এই সময় পুলিশে গাড়ি এসে থামে। দুজন কনস্টেবল গাড়ি থেকে নেমে দ্রুত এসে

আবিরকে আটকানোর চেষ্টা করছে। ৪-৫ জন লোকের মধ্যে একজন এসপি স্যারের কাছে গিয়ে বলে, “স্যার আমিই আপনাকে কল করেছিলাম। কিন্তু হুট করে এই ছেলে এসে এভাবে মা*রতে শুরু করেছে। ” এসপি স্যার দ্রুত আবিরের কাছে গিয়ে বলে, “থামুন আপনি। এভাবে মারছেন কেনো? আমাদের বিষয়টা দেখতে দিন। ” দুই কনস্টেবলের সাথে আরও কয়েকজন লোক আবিরকে টেনে হিঁচড়ে ছেলেটার থেকে দূরে সরিয়ে নেয়। এসপি স্যার ছেলেটাকে একটু দেখে তারপর আবিরের দিকে তাকায়। সঙ্গে সঙ্গে কপাল কুঁচকে প্রশ্ন করে, “তুমি ইকবালের ভাইপো না?” আবির তখনও রাগে ফুঁ*সতে। দাঁতে দাঁত চেপে রা*গ হজম করার চেষ্টা করছে তার সাথে ঘন ঘন নিঃশ্বাস নিচ্ছে । এসপির কথা শুনে, ওনার দিকে তাকিয়ে রাগান্বিত কণ্ঠে উত্তর দেয়, “জ্বি। ” এসপি এবার স্বাভাবিক কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে, “তুমি বিদেশ ছিলে না এতবছর? আবির ই তো নাম তোমার? ” আবির কপাল কুঁচকে পুনরায় উত্তর দেয়, “জ্বি। ” এসপি মৃদু হেসে বলে, “আমি ইকবালের কলেজ ফ্রেন্ড। ছোট বেলায় তোমাদের বাসায় অনেকবার গিয়েছি। এখনও ইকবালের সাথে মাঝে মাঝেই কথা হয় আমার। তা তুমি এই ছেলেকে এভাবে মা*রছিলে কেন?” আবির ঘাড় ঘুরিয়ে মেঘের দিকে তাকিয়েছে, মেঘ নিশ্চুপ, বাইকের পাশে দাঁড়িয়ে বৃহৎ চোখে চেয়ে আছে, শরীরের কম্পন এখনও তীব্র। আবিরের সাথে সাথে এসপি ও ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলো মেঘকে। আশেপাশের লোক বলছে, “স্যার ঐ মেয়েটার সাথেই

অস*ভ্যতা করেছে ছেলেটা। ” এসপি আবিরের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করল, ” তোমার বোন?” আবির মেঘের দিকে চেয়েই উত্তর দিল, “চাচাতো বোন। ” এসপি একবার ছেলেটাকে দেখছে, আশেপাশে মানুষের কথা শুনছে। তারপর আবিরকে কিছুটা সরিয়ে সাইডে নিয়ে বলল, “তোমরা আমার পরিচিত। আমি চাই না এই বয়সে তোমরা কোনো কেইসে ফেঁ*সে যাও। সামনে তোমাদের ভবিষ্যৎ আছে। আর ওরা নে*শাখো*র, ওদের বড় বড় লোক আছে। আমরা ঐ গ্যাং টা ধরার চেষ্টা করছি। তাদের ধরতে পারলে, এরা কিছুই না। তাই বলি তুমি তোমার বোনকে নিয়ে চলে যাও। বিষয়টা আমি দেখছি। ” আবি কথাগুলো শুনলো, দুহাত এখনও মুষ্টিবদ্ধ করে ক*টম*ট করছে। বুঝতে পারলো এখানে কিছু বলে লাভ নেই। তাই কথা না বলেই মেঘের কাছে চলে গেছে। এসপি আর দুই কনস্টেবল আহত ছেলেটাকে নিয়ে থানায় চলে যাচ্ছে । আবিরের এলোমেলো চুল, ঘামে ভেজা শার্ট শরীরের সাথে চেপে আছে, চোখ মুখে ঘাম আর রা*গ দুটায় জ্বলজ্বল করছে। চোখ এখনও লাল রঙা হয়ে আছে। কয়েক সেকেন্ড মেঘের কাঁপা কাঁপি দেখে আবির চলে গেলো। দোকান থেকে একটা পানির বোতল কিনে নিজের চোখে মুখে পানি দিলো,সাথে মাথায় কিছুটা পানি ঢেলে রাগ কমানোর চেষ্টা করছে। মেঘের কাছে গিয়ে তপ্ত স্বরে বলল, “নে পানি খা। ” মেঘ আবিরের দিকে চেয়ে কাঁপা কাঁপা হাতে বোতল টা নিলো। আবিরের চুলের পানি মুখে পরছে, মুখ থেকে পানি শরীরে, নিচে টুপটুপ করে পরছে। । মেঘ

নির্বোধের ন্যায় চেয়ে আছে। আচমকা আবির একটু নিচু হয়ে মেঘের ওড়নার মাথা টেনে নিজের মুখ আর চুল মুছতে শুরু করেছে। আবিরের এমন কান্ডে মেঘ যেনো আশ্চর্য বনে গেলো । আবির চোখ মুখ মুছে পুনরায় মেঘের দিকে চেয়ে শান্ত কণ্ঠে বলল, "মনে কর তুই কিছু দেখিস নি। এখন একটু পানি খা। " মেঘ ঢকঢক করে কিছুটা পানি খেয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেললো। ছেলেটার আচরণে যতটা ভ*য় পেয়েছিল তার থেকেও তিনগুণ ভ*য় পেয়েছে আবির ভাইয়ে পে*টা*নো দেখে। তখনই রাকিব কল করেছে, আবির কল রিসিভ করে ঠান্ডা ক*ণ্ঠে বলল, "বল!" রাকিব চিন্তিত স্বরে শুধালো, "ঝা*মেলা কি বেশি? আমি আর রাসেল কি আসবো?" আবির ভারী কণ্ঠে বলল, "না আসতে হবে না। আমি চলে আসবো। " রাকিব, "তাহলে কি মিটিং ডাকবো?" আবির মেঘের দিকে চেয়ে ২ সেকেন্ড ভেবে জানালো, "হ্যাঁ। আসতেছি আমি।" রাকিব চিন্তিত স্বরে পুনরায় প্রশ্ন করলো, "মেঘ কোথায়?" আবির জবাব দিল, "আছে, এখানেই।" রাকিব মৃদু হেসে প্রশ্ন করলো, "মেঘকে নিয়ে আসবি অফিসে?" আবির "হ্যাঁ , রাখছি। " বলে কল কেটে দিয়েছে। আবির ফোন পকেটে রাখতে রাখতে স্বভাব-সুলভ ভারি কণ্ঠে শুধালো, "এখন বাসায় না গেলে কি খুব সমস্যা হবে? আমার একটা মিটিং আছে। মিটিং শেষ করে তোকে বাসায় দিয়ে আসলে চলবে?" মেঘ ঘাড় কাথ করে সম্মতি দিলো। তারপর অফিসের উদ্দেশ্যে চলে গেছে। অফিস গেইটের সামনে আসতেই রাকিব আর রাসেল একটা তাজা ফুলের

তোড়া নিয়ে হাজির হলো, মেঘের দিকে চেয়ে, তোড়া এগিয়ে দিয়ে হাসিমুখে রাকিব বলল, “ওয়েলকাম, ম্যাডাম। ” মেঘ কপাল কুঁচকে তাকিয়ে বলল, “আমি ম্যাডাম হলাম কিভাবে? আমি তো... ” এতটুকু বলতেই আবির ধমকে উঠলো, ” যা দিচ্ছে নে। এত কথা বলতে হয় কেন?” মেঘ আর কথা বাড়ালো না চুপচাপ ফুলের তোড়া নিলো। তারপর আবিরের পেছন পেছন আবিরের কেবিনে চলে গেলো। আবির কেবিনের দরজা আটকে বলল, “হিজাব খুলে ওয়াশরুম থেকে ফ্রেশ হয়ে আয়। ” মেঘ কিছুক্ষণের মধ্যে হাতমুখ ধৌয়ে, হিজাব খুলে চুল ঠিক করে বেড়িয়ে এসেছে। আবির টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে ল্যাপটপে কিছু একটা চেক করছিলো। মেঘ রুমে আসতেই আবির নিজের চেয়ার দেখিয়ে বলল, “বস এখানে। ” মেঘ বিড়বিড় করে বলল, “এটা তো আপনার চেয়ার। ” আবির চোখ রাঙিয়ে তাকাতেই মেঘ মাথা নিচু করে চুপচাপ আবিরের চেয়ারে বসে পরলো। আবির ২ মিনিট ল্যাপটপে কাজ করে, ভারী কন্ঠে বলল, “আমি শাওয়ার নিতে যাচ্ছি। কেউ ডাকলে দরজা খুলার দরকার নেই। তুই নিজের মতো রেস্ট নে। ” আবির ৫ মিনিটে শাওয়ার নিয়ে কোমড়ে টাওয়েল জড়িয়ে ওয়াশরুম থেকে তাড়াহুড়ো করে বেড়িয়েছে। চোখে মুখে চি*ন্তার ছাপ। আচমকা আবিরকে এভাবে দেখে মেঘের বুকটা কেঁ*পে উঠলো। উন্মুক্ত শরীর, শুধু কোমড় থেকে হাঁটুর নিচ পর্যন্ত ঢাকা। মেদ হীন পেটে সিক্স প্যাকের হালকা চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। শরীরে থাকা বিন্দু বিন্দু পানির কণাগুলো চিকচিক করছে। তা দেখে মেঘের হৃৎস্পন্দনের মাত্রা

বেড়ে যাচ্ছে, নিঃশ্বাস ভারি হয়ে আসছে। আবির এসে চেয়ারের দু হাতল চেপে মেঘের ঘনিষ্ঠ হয়ে মেঘের দিকে তাকালো। মেঘও বিস্ময় চোখে চেয়ে আছে আবিরের চোখের দিকে। এই চোখের ক্রো*ধ এখনও কমে নি। এত কাছে আসাতে, আবিরের নিঃশ্বাস ছুঁয়ে দিলো মেঘের লালিত মুখমণ্ডল। মেঘের রক্তসঞ্চালন বেড়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে মেঘের শিরা-উপশিরায় তু*ফান চলছে। আবিরের দৃষ্টি মেঘের নেত্রে নিবদ্ধ। কন্ঠ চারগুণ ভারি করে শুধালো, "ঐ ছেলে তোর হাত ছাড়া অন্য কোথাও ছুঁয়েছিল?" আবিরের প্রশ্ন মেঘের কর্ণপাত হলো কি না কে জানে, খানিকটা সময় সময় পর মেঘ চিবুক নামাতে নিলে, আবির দু আঙুলে আটকে দেয়। মেঘ পুনরায় আবিরের মুখের পানে তাকায়, চোখে মুখে ক্রো*ধ স্পষ্ট। আবির পুনরায় রা*গান্বিত কন্ঠে প্রশ্ন করলো, "বল শুধু আর কোথায় ছুঁয়েছে, ঐ কু*ত্তা*র বা*চ্চা*রে জ্যা*ন্ত ক*ব*র দিয়ে আসবো। " আবির ভাইয়ের মুখে ভ*য়ংক*র কথা শুনে মেঘের শরীর কেঁপে উঠলো । ঢুক গিলে, কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে বলল, "আর কোথাও ছুঁয় নি। " আবির ভারী কন্ঠে প্রশ্ন করলো, "সত্যি তো?" মেঘ আস্তে করে বলল, "সত্যি" এরমধ্যে দরজায় রাসেল ডাকছে, "আবির, মিটিং এর সময় হয়ে যাচ্ছে। " আবির এবার দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে মেঘের থেকে দূরে সরে দাঁড়ালো । টেবিলের উপর রাখা ফোনে টাইম দেখে নিলো। একটা শার্ট আর প্যান্ট পরে রেডি হয়ে চলে যাচ্ছিলো, দরজা পর্যন্ত গিয়ে থমকে দাঁড়ালো। মেঘের দিকে চেয়ে বলল, "দরজা টা ভেতর থেকে ব*ন্ধ করে রাখ। কফি আর নাস্তা

দিতে বলে যাচ্ছি। দরজা থেকেই নিবি,কেউ ভেতরে যেনো না ঢুকে। আমি মিটিং শেষ করে আসছি। ” আবির চলে গেছে কিছুক্ষণের মধ্যেই আবিরের PS কিছু খাবার আর এক কাপ কফি নিয়ে আসছে। মেঘ নাক পর্যন্ত ওড়না টেনে, মাথা নিচু করে খাবার গুলো নিলো। তারপর দরজা বন্ধ করে। ওড়না সরিয়ে রুমটা ভালোভাবে দেখছে । দেয়ালে কিছু কিছু মোটিভেশন লেখা, তার সাথে একটা দেয়ালে দুটা হাতের ছবি আঁকা। যে ছবিটা আবির ভাইয়ের ফোনে মেঘ দেখেছিলো। একটা বড় হাতের উপর একটা পিচ্চির হাত শক্ত করে ধরা। নিচে দুটা লাইনও লেখা, “আমার দেহে প্রাণ আছে যতদিন, এই হাত ছাড়বো না আমি ততদিন।” তার নিচে ❤D❤ এভাবে লেখা। অক্ষর দেখে মেঘ কপাল কুঁচকে চেয়ে আছে। মাথায় কিছুই ঢুকছে না। D দিয়ে কার নাম হতে পারে। মেঘের নাম M দিয়ে, জান্নাত আপুর নাম J দিয়ে। মেঘ বিড়বিড় করে বলল, “তাহলে কি জান্নাত আপুর অন্য নাম আছে?”হাবিজাবি অনেক চিন্তা মেঘের মাথায় ঘুরছে।হঠাৎ মনে হলো, “আচ্ছা আমার নাম তো মাহদিবা, দিবা নাম তো D দিয়ে শুরু। তাহলে কি আমি? কিন্তু এই জীবনে আবির ভাইয়ের সাথে আমার কখনো সুসম্পর্ক ছিল বলে তো আমার মনে হয় না। তাহলে বোধহয় আমি না, অন্য কেউ। ” সবকিছু ভালোই থাকে কিন্তু জান্নাত আপু বা আবির ভাইয়ের জীবনে অন্য কেউ আছে এটা ভাবলেই যেনো মা*থা গ*রম হয়ে যায় মেঘের। তারসাথে ঐ ছেলের ঘটানো কা*ন্ড তো মাথায় আছেই। মেঘ চেয়ারে বসে কফি টা কোনোরকমে খেলো।

মাথা ব্য*থার জন্য কিছুই ভালো লাগছে না। বেশি কা*ন্না করছে যার ফলে মাথা ব্যথাটাও অনেক বেশি হচ্ছে । কফি টা শেষ করে মেঘ টেবিলের উপর মাথা রেখে চোখ বন্ধ করে বসে আছে। ঘন্টাখানেক পর আবির এসে ডাকছে, "মেঘ!" মেঘ দ্রুত গিয়ে দরজা খুলে আবার চেয়ারে বসে পরলো, মাথা ব্য*থার জন্য বসে থাকতে পারছে না। পুনরায় টেবিলে মাথা রেখেছে। আবির রুমে ঢুকে কপাল কুঁচকে তাকালো, টেবিলের উপর সব খাবার ই পরে আছে। শুধু কফি টায় খেয়েছে। মেঘের কাছে গিয়ে ঠান্ডা কন্ঠে শুধালো, "মাথা ব্য*থা করছে?" মেঘ ওভাবেই উত্তর দিলো, "হ্যাঁ!" আবির মেঘের দিকে তাকিয়ে ভারি কন্ঠে শুধালো, "খাস নি কেন কিছু?" মেঘ মুখ তুলে তাকালো, তারপর মন খারাপ করে উত্তর দিল, "খেতে ইচ্ছে করছে না। " মেঘ পুনরায় প্রশ্ন করল, "আমরা বাসায় যাব না?" আবির গম্ভীর কন্ঠে বলল, "এইযে খাবার দিয়ে গেলাম কিছুই খাস নি। বাসায় গিয়েও তো খাবি না। তাই তোকে খাইয়ে তারপর দিয়ে আসবো। " আবির পিএস কে ডেকে এক প্যাকেট কাচ্চি আর ঔষধ আনতে বলছে। আবির ফোন বের করে মামনিকে কল দিলো। হালিমা খান কল রিসিভ করতেই আবির সালাম দিলো। হালিমা খান সালামের উত্তর দিয়ে স্বাভাবিক কন্ঠে শুধালেন, "কিরে এসময় কল দিলি যে। কোন দরকার?" আবির ঠান্ডা কন্ঠে বলল, "মেঘ আমার অফিসে আছে। এটা জানানোর জন্য তোমাকে কল দিয়েছি। গাড়ি জ্যামে আটকে ছিলো তাই আমি গিয়ে নিয়ে আসছি। আমার একটু কাজ

আছে। শেষ করে ওকে নিয়ে বাসায় ফিরবো। আর আংকেল কে বলেছি গাড়ি নিয়ে বাসায় চলে যেতে। ” একসাথে কথাগুলো বলে তারপর থামলো। হালিমা খান হাসিমুখে উত্তর দিলেন, “আচ্ছা ঠিক আছে। মেঘ জ্বা*লালে মা*থা গর*ম করিস না বাবা। কাজ শেষ করে চলে আসিস । ” আবির মৃদু হেসে বলল, “সমস্যা নাই। তুমি চিন্তা করো না। ” কল কাটতেই মেঘ বলল, “আপনি আম্মুকে বললেন না কেনো?” আবির মেঘের দিকে তাকিয়ে উত্তর দিল, “সব কথা সবসময় সবাইকে বলতে হয় না। ” মেঘ কিছুই বলছে না। চুপচাপ বসে আছে। এরমধ্যে তানভির মেঘের নাম্বারে কল দিয়েছে,মেঘ রিসিভ করার আগেই আবির মেঘের ফোন নিয়ে রুম থেকে বেরিয়ে গিয়ে তানভিরের সাথে কথা বলছে। রুমে এসে মেঘের ফোন টেবিলের উপর রেখে পাশের চেয়ারে বসে গম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন করলো, “কি হয়েছিলো তোর সাথে ? সম্পূর্ণ ঘটনা বল!” মেঘ ঢুক গিলে ধীরে ধীরে বলা শুরু করলো, “কিছুদিন যাবৎ কয়েকটা ছেলে কোচিং এর সামনে দাঁড়িয়ে থাকে, সি*গারে*ট খাই আরও কি কি খায় আর মেয়েদেরকে উ*ল্টা*পা*ল্টা কথা বলে। অনেক স্টুডেন্ট একসাথে বের হয় তাই কোচিং এর সামনে দাঁড়ানো যায় না। এজন্য আমি আর বন্যা প্রতিদিন বের হয়ে একটু সাইডে দাঁড়ায়। আমাদের গাড়ি আসলে আমি চলে যায়। বন্যাও চলে যায়। কিন্তু বন্যা জ্বর-সর্দি এজন্য গতদিন আসে নি, আজও আসতে পারে নি। কোচিং থেকে বের হয়ে আমি অন্যান্য দিনের মতোই সাইডে দাঁড়িয়ে ড্রাইভার আংকেলকে কল

দিচ্ছিলাম। আংকেল বললো জ্যামে আছে, একটু দেরি হবে আমি যেনো কোচিং এর ভেতরে বসি। আমি আবার যখন ঘুরে কোচিং এ যেতে নিবো তখনই কয়েকটা ছেলে পথ আটকে দাঁড়ায়ছে। আমি সাইড দিতে বলছি কিন্তু মা*তা*লের মতো কি যেনো বলছিলো, আমি ভ*য়ে উল্টোদিকে হাঁটা শুরু করেছি। ঐখান থেকে একটা ছেলে আমার পিছু নিয়েছে। আমি দ্রুত হাঁটছিলাম, আর ফোনে ভাইয়ার নাম্বারে কল দিতেছিলাম। ঐ ছেলে বা*জে বা*জে কথা বলতে বলতে আমার কাছে চলে আসছে। তারপর আমি দৌড় শুরু করি ঐ ছেলেও দৌড়ে এসে আমার হাত চেপে ধরে। আশেপাশে কোনো মানুষ নেই, আমি হাত ছাড়ানোর অনেক চেষ্টা করছি। কিন্তু পারছিলাম না। চিৎকার করছি কিন্তু কেউ নেই, ঐ ছেলে আমায় ধরতে নিলে দূর থেকে একটা লোক দৌড়ে আসে। ঐ লোককে আসতে দেখে ছেলেটা দৌ*ড় শুরু করে, অনেকটা যাওয়ার পর কয়েকজন মিলে ছেলেটাকে ধরে। আমি তখন আবারও ভাইয়াকে কল দিছি, ভাইয়া রিসিভ করে নি তারপর বাধ্য হয়ে আপনাকে কল দিছি। ঐ ছেলেকে আটকিয়ে ২-৩ জন এসে আমাকেও নিয়ে গেছে সেখানে, অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করেছে । পরে কেউ একজন পুলিশ কল দিছে। ” পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে কথাগুলো শুনলো আবির, দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে নিজেকে শান্ত রাখার চেষ্টা করলো। কিন্তু তার চোখ যেনো কিছুতেই শান্ত হতে চাইছে না। আবিরের চোখ রাগে জ্বলছে।আবির নিজের ফোন বের করে কি একটা টেক্সট কাকে পাঠিয়ে ফোন রেখে দু’হাত টেবিলের উপর রেখে তারউপর মাথা

রাখলো। তার এই রু*দ্রমূর্তি ধার*ণকৃত রূপ কোনো ভাবেই যেনো মেঘ না দেখে তাই নিজেকে আ*ড়াল করার চেষ্টা করছে।। মেঘ নির্বোধের ন্যায় আবির ভাইয়ের চুলের দিকে চেয়ে আছে। সামনের দিকের লম্বা চুলগুলো টেবিলে পরে আছে। মেঘ মৃদু হেসে নিজের ডানহাত এগিয়ে দিলো আবির ভাইয়ের চুলের দিকে। টেবিলে পরে থাকা চুলগুলোকে আলতোভাবে ছুঁয়ে দিলো। ধ*ম*কের ভ*য়ে হাত সরিয়ে নিলো সঙ্গে সঙ্গে, আবিরের নিরবতা দেখে আবারও ছুঁয়ে দিলো আবিরের চুলে।। মেঘের এমন কা*ন্ডে আবিরের লুকানো রা*গা*ন্বিত মুখমন্ডলে অকস্মাৎ হাসি ফুটে উঠেছে। ক্ষণিকের ব্যবধানে আবিরের রা*গী অভিব্যক্তি বদলে গেছে। মেঘ কিছুক্ষণ আবিরের চুল নিয়ে দু*ষ্টামি করে, চুল ছেড়ে স্বাভাবিক হয়ে বসলো, তারপর শীতল কন্ঠে ডাকলো, “আবির ভাই...!” সহসা সেই চিরচেনা সুমধুর কন্ঠে উত্তর আসলো, “হুমমমমমম।” মেঘ কয়েক সেকেন্ড এই ডাক শুনে মুগ্ধ হয়ে রইলো,তারপর ঢুক গিলে ভ*য়ে ভ*য়ে প্রশ্ন করলো, “দেয়ালে যে D লেখা। D দিয়ে কার নাম?” আবির মাথা তুলে, ভ্রু কুঁচকে মেঘের দিকে চেয়ে নিরুদ্বেগ কন্ঠে বলল, “হবে কোনো এক ঢং*গী। ” আবির কথা ঘুরানোর জন্য শক্ত কন্ঠে বলা শুরু করলো, ” আজকের পর থেকে তোর কোনো ধরনের সমস্যা হলে বা যদি মনে হয় সমস্যা হতে পারে সঙ্গে সঙ্গে আমায় কল দিবি। তানভির ব্যস্ত থাকে, চাইলেও সবকিছু ম্যানেজ করতে পারে না তাই তানভিরকে কল দেয়ার আগে আমায় কল দিবি। আর কোচিং-এ আপাতত তোর যেতে হবে না।

কোচিং এ গেলে কেউ কিছু বলবে বা খারাপ আচরণ করবে তারজন্য নয়, তুই চাইলে ঐখানের সবকয়টা ছেলে এখনই তোর পায়ে ধরে মাফ চাইবে, আর কোনোদিন কোচিং এর আশেপাশেও আসবে না। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে তুই তো এই বিষয়টা স্বাভাবিক ভাবে নিতে পারবি না, তুই কোচিং এ যেতে আসতে ভ*য়, আমি চাই না আজেবাজে প্রেশার দিয়ে নিজের মাথাটা হ্যাং করে রাখিস। তার থেকে কোচিং এর রুটিন অনুসারে পড়বি আমি প্রশ্ন নিয়ে আসবো। জান্নাত তোর পরীক্ষা নিবে। দরকার হলে জান্নাত ৩ ঘন্টা সময় নিয়ে পড়াবে তোকে। ”
মেঘ আস্তে করে বলল, “বেশি রাত হলে জান্নাত আপু কিভাবে যাবে?”
আবির কপাল কুঁচকে তাকালো, গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর দিলো, “জান্নাতের চিন্তা তোর করতে হবে না। আগে নিজের চিন্তা কর। ” এরমধ্যে পিএস খাবার আর ঔষধ নিয়ে আসছে। মেঘকে খেতে দিয়ে আবির অফিসে বাকি কাজগুলো দ্রুত শেষ করছে, রাকিব আর রাসেলের সাথেও কথা বলে আসছে। পিএস ছেলেটা এক ফাঁকে আবিরের কাছে মাফ ও চেয়েছে।আবির সারাদিন যাবৎ ই রা*গে ফুঁ*সতে। অফিসের সবার সাথেই হুট*হাট রা*গ দেখাচ্ছে। নিজের রা*গ ক*ন্ট্রোল করতে পারছে না। কয়েকবার চোখে -মুখে পানিও দিয়েছে তাতেও কাজ হচ্ছে না। মেঘ খাচ্ছে আর আর বিড়বিড় করে বলছে, ” আপনার জান্নাত আপুর প্রতি কেয়ার টা খুব তাড়াতাড়ি সরাতে হবে।কোথাও চান্স পেলেই জান্নাত আপুর কাছে আর পড়বো না। তারপর আপনার কেয়ারও কমে যাবে। ধীরে ধীরে আমি নিজেই আপনার প্রেমিকা হয়ে

যাবো।” কথাগুলো বলতে বলতে মেঘের ঠোঁটে সহসা হাসি ফুটে উঠেছে। কাজ শেষ করে নিজের রুমে এসে মেঘকে হাসতে দেখে,আবিরের সব রা*গ নিমিষেই মিলিয়ে গেছে। মনে মনে ভাবছে, “তোর ঐ হাসিতে কি এমন জাদু আছে? যে হাসি আমার সব রা*গ এক মুহুর্তেই নিঃশেষ করে দিতে সক্ষম। ” মেঘ তাকাতেই আবির নড়ে উঠলো। স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, “রেডি হয়ে নে। বাসায় যাব। ” মেঘকে বাসার সামনে নামিয়ে আবির গম্ভীর কণ্ঠে বলল, “রুমে গিয়ে ডিরেক্ট ঘুমাবি। কাউকে কিছু বলার দরকার নেই। যদি কিছু বলতে হয়, আমি বাসায় ফিরে বলবো।” কয়েক ঘন্টা সময় পার হওয়াতে মেঘও অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে গেছে। রুমে গিয়ে ফ্রেশ হয়ে ঘুমিয়ে পরেছে । ঘন্টাদুয়েক পর চিল্লাচিল্লির শব্দে মেঘের ঘুম ভাঙে, করিডোর থেকে নিচে তাকিয়ে দেখে বাড়ির তিন কর্তা সোফায় বসা, তিন কর্তী কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে আছে। সোফা থেকে কিছুটা দূরে আবির ভাই দাঁড়িয়ে আছে। দেখে মনে হচ্ছে ওনার মতো ভদ্র আর শান্ত ছেলে দ্বিতীয় আর নেই। আবিরের থেকেও কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে আছে তানভির । আলী আহমদ খান চিৎকার দিয়ে উঠলেন, “তোমাকে এতবার সাবধান করার পর আবারও মা*রপি*ট কেনো করেছো?” বড় আব্বুর রা*গা*ন্বিত স্বরে মেঘের শরীর কেঁপে উঠলো। আবির ভাই তো জানাতে চাই নি তাহলে বড় আব্বু জানলো কিভাবে। এই বাড়িতে আসার পর থেকেই আবির ভাইকে প্রতিনিয়ত নি*ষে*ধ করা হচ্ছে কিন্তু আজ তো মেঘ নিজের চোখে আবির ভাইয়ের ক্রো*ধ দেখেছে,

মা*র*পিট দেখেছে। আজ আবির ভাইয়ের কি হবে এটা নিয়ে ভাবনায় পরে গেছে মেঘ। অথচ আবির ভাইয়ের মধ্যে কোনো ভ*য় ডর কিছুই নাই। মেঘ সবেমাত্র ঘুম থেকে উঠেছে , এলোমেলো চুল, আর ক্লান্ত মুখশ্রী নিয়ে ধীরে ধীরে সিঁড়ি বেয়ে কিছুটা নিচে নামলো। আবিরকে নিরুত্তর থাকতে দেখে আলী আহমদ খান পুনরায় ধম*কে উঠলেন, "কথা কেনো বলছো না ? গু*ন্ডা*মী করার জন্য তুমি দেশে আসছো?" আবির ভণিতা ছাড়াই উত্তর দিল, "এই বাড়ির মেয়ের গায়ে কেউ হাত দিবে, আমি তা সহ্য করতে পারবো না। " আলী আহমদ খান পুনরায় বললেন, " সহ্য করতে না পারা একবিষয় মা*র*পি-ট করা অন্য বিষয়। মা*রপি*ট কেন করলা? লোকে কি বলবে, বিদেশ থেকে পড়াশোনা করে দেশে ফিরছে ছেলে, সে এখন রাস্তাঘাটে মা*রপি*ট করে?" আবির মাথা নিচু করে ভারি কণ্ঠে বলল, " আপসোস আমাকে নিয়ে যতটা মাথা ঘামাচ্ছেন, তার কিছুটা মাথা যদি ঐ ছেলেগুলোর জন্য ঘামাতেন , তাহলে কেনো মে*রে*ছি প্রশ্ন টা আমায় করতেন না।" মোজাম্মেল খান কঠিন স্বরে বললেন, "ঐ ছেলেগুলোর জন্য আ*ইন আছে, পু*লি*শ আছে। তোমাকে তো দায়িত্ব দেয়া হয় নি। তুমি ছেলেকে না মেরে মেঘকে নিয়ে চলে আসতে পারতে। " আবির বিড়বিড় করে বলল, "আ*ই*ন আর পু*লি*শ ছিল বলেই তো ঐগুলারে আবা*র পি*টা*তে হয়ছে। " ইকবাল খান চিন্তিত স্বরে বললেন, "দেখ আবির, এসপি আমার বন্ধু ছিল আর তোকে চিনছে বিধায় ঝামেলা করে নি। আর আমাকেও কল দিয়ে জানিয়েছে।

এখানে অন্য কেউ থাকলে তো ঝামেলা হইতো। ” আলী আহমদ খান পুনরায় বলে উঠলেন, “মানসম্মানের চিন্তা কি এই ছেলের আছে?” আবির রা*গ ক*ন্ট্রোল করতে না পেরে চিৎকার করে উঠলো, “আমায় ক্ষমা করবেন। আমি আপনাদের মতো ভদ্রলোকের মুখোশ পরে চলতে পারবো না আর আপনাদের মতো পা*ষা*ণ হৃ*দ*য় নিয়ে বাঁ*চতে পারবো না। কেউ আমার গ*ন্ডিতে ছোঁয়ার চেষ্টা করলে সেই হাত ভেঙ্গে দিতে আমি দ্বিতীয় বার ভাববো না।” কথা গুলো বলে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গিয়ে মেঘকে দেখে দ্বিতীয়বার ধম*কে উঠলো, “তোকে ঘুমাতে বলছি, বের হইছিস কোন সা*হসে। ” আবিরের পিছন পিছন মেঘও নিজের রুমে ছুটে গেছে। ড্রয়িং রুমে পিনপতন নিরবতা। তানভির নিষ্পলক তাকিয়ে ছিল, আবিরের যাওয়ার পথে, তানভিরের চোখের সামনে ভেসে উঠেছে, কিছুক্ষণ আগে আবিরের ঘটানো তা*ন্ডব । যে কয়টা ছেলে কোচিং এর সামনে ছিলো সবকটাকে ধরে এনে, মেরে আধমরা করেছে। আর যেই ছেলেটা মেঘের হাত ধরেছিলো, ঐ ছেলেকে পু*লিশ শা*সিয়ে ছেড়ে দিয়েছিল। ঐ ছেলেকে এনে, ধা*রা*লো ছু*রি*তে এই ছেলের হাত কা*ট*ছে। গ*লা কা*টা*র জন্য উঠেপড়ে লেগেছিলো কিন্তু রাকিব, রাসেল আরও কয়েকজন মিলে জোর করে আ*টকিয়েছে।আবিরের রা*গ ক*ন্ট্রোলের একমাত্র পন্থা হলো মেঘ। মেঘের কথা বলে অনেক কষ্টে আবিরকে শান্ত করে, র*ক্তে রঞ্জিত জামা পাল্টিয়ে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে আসছে তানভির। আর রাকিব, রাসেল সহ বাকিরা ঐগুলোরে হাসপাতালে নিয়ে গেছে।

যেখানে দুপুরে রাস্তায় সামান্য মা*রের কারণে বাড়ির মানুষের এত প্রশ্নের সম্মুখিন হতে হয়েছে, সেখানে বাড়ির মানুষ যদি দ্বিতীয় দফার মা*র সম্পর্কে জানতে পারে তাহলে নিশ্চিত ভাবে ২-১ জন হার্ট-অ্যাটার্ক করবে। সকলের নিরবতা দেখে তানভিরও নিজের রুমে চলে গেছে।ঘন্টাখানেক পর মেঘ চুপিচুপি নিজের রুম থেকে বেড়িয়ে আবির ভাইয়ের রুমের দিকে যায়। আবিরের রুমে দরজা লাগানো, ভেতর থেকে রা*গা*ন্বিত কন্ঠে হুংকার শুনা যাচ্ছে। ফোনে হয়তো কাউকে ঝা*ড়*ছেন। ভ*য়ে মেঘ দৌড়ে নিজের রুমে চলে গেছে। কয়েকদিন কেটে গেছে। আবির ইদানীং বাড়ির সবাইকে এড়িয়ে চলে। একসাথে খায় না। অফিসে গেলেও নিজের মতো কাজ শেষ করে চলে যায়। মেঘ তো ভ*য়ে সামনেই যায় না। গত ৩ মাসে আবির ভাইয়ের এত রাগ সে আগে দেখে নি। আবির ভাইকে দেখলেই আ*ত*ঙ্কে থাকে। ঠিকই লুকিয়ে লুকিয়ে আবির ভাইয়ের যাওয়া আসা দেখে। মাঝখানে নির্বাচন হয়ে গেছে। তানভিরদের এমপি বিপুল ভোটে জয়লাভ করেছেন। সেই সুবাদে আগামীকাল খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। বাড়ির সবাইকেই দাওয়াত দিয়েছেন কিন্তু বাড়ির মানুষ রা*জনী*তি পছন্দ করে না বিধায় তানভির কাউকে বলেই নি। শুধু মেঘকে বলেছে যাওয়ার কথা। মীম বা আদিকে বললে ওরা বাসায় বাকিদের বলবে। আর বাকিদের বললেই শুধু শুধু ঝাড়ি খেতে হবে। এমনিতেই আবিরের কথাতে ওনারা রে*গে আছে। তাতে অবশ্য আবিরের কিছু যায় আসে না। এই পৃথিবীতে আবিরের কাছে সবচেয়ে মূল্যবান মা

আর মেঘ, তাই মেঘের বিপরীতে যা খুশি থাকুক তার কোনোকিছুতেই আবিরের আগ্রহ নেই। ভোর বেলা উঠেই তানভির চলে গেছে। সবকিছু আগে থেকেই প্যানিং করা। মেঘদের বাসা থেকে কিছুটা দূরে একটা মোড় আছে। আবির অফিস থেকে ফিরে ঐ মোড়ে দাঁড়াবে, মেঘ বেড়িয়ে যাবে। প্ল্যান মোতাবেক সব হলো। আবির সাদা শার্ট আর কালো প্যান্ট ইন করে পরে চোখে সানগ্লাস লাগিয়ে পুরাই নায়ক সেজে আসছে। মেঘও পছন্দের একটা কালো রঙের জামা পরেছে। ইদানীং আবির ভাইয়ের পছন্দের কালার গুলো মেঘ একটু বেশিই পড়ছে। দুজনকে একসাথে দেখলে যে কেউ ভাববে তারা কাপল। এমপির বাড়িতে এসে এমপির সাথে দেখা করে কথাবার্তা বলেছে। তারপর তিন ভাইবোন ছবি তুলেছে।সবশেষে খাওয়াদাওয়াও করেছে। সেই অফিসের পর, আজ আবির ভাই মেঘের সাথে স্বাভাবিক আচরণ করছে এটা দেখেই মেঘের মন উড়ু উড়ু করছে। প্রোগ্রাম শেষে মেঘ আর আবির চলে যাবে। তানভির মেঘকে একটু দূরে নিয়ে কি যেনো বলছিলো। আবির কিছুটা এগিয়ে বাইকের কাছে যাচ্ছে আচমকা এমপির মেয়ে হাজির হলো সামনে। এমপির মেয়ে হাসিমুখে জিজ্ঞেস করলো, “আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া, কেমন আছেন?” আবির স্বাভাবিক কণ্ঠে উত্তর দিলো, “ওয়ালাইকুম আসসালাম। আলহামদুলিল্লাহ ভালো। তুমি কেমন আছো?” মেয়েটা হেসে উত্তর দিলো, “আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো, আব্বু এমপি হয়েছেন তার ক্রেডিট তানভির ভাইয়া সহ আরও অনেকের। আপনিও শুনেছি অনেক

হেল্প করেছেন। তার জন্য ধন্যবাদ " আবির মৃদু হাসলো আর কিছুই বলল না। মেয়েটা আবার প্রশ্ন করলো, "ভাইয়া আপনার গার্লফ্রেন্ড কেমন আছে?" আবির মৃদু হেসেই উত্তর দিল, "আলহামদুলিল্লাহ ভালো।" তানভির মেঘকে বিদায় দিয়ে ভেতরে চলে গেছে, মেঘ আবির ভাইয়ের দিকে তাকাতেই চোখে পরলো একটা সুন্দরী মেয়ে আবির ভাইয়ের সাথে কথা বলছে। ভালোভাবে দেখতেই মনে পরলো আবির ভাইয়ের ফোন থেকে ব্লক করা সেই মেয়েটা মানে এমপির মেয়ে। আবির ভাইয়ের সাথে কথা বলছে দেখে মেঘের মে*জাজ খা*রাপ হয়ে যাচ্ছে। এক প্রকার দৌড়ে মেঘ আবির ভাইয়ের পাশে গিয়ে দাঁড়ালো, মেয়েটা মেঘের দিকে তাকিয়ে মুখ গোমড়া করে ফেললো, ঠান্ডা কন্ঠে শুধালো, "ওনি কি আপনার গার্লফ্রেন্ড? " এমপির মেয়ে এমন প্রশ্নে মেঘ ভ্যাবাচেকা খেলো। তীব্র উৎসাহ নিয়ে তাকিয়েছে আবির ভাইয়ের চোখে মুখে। এ যেনো আবির ভাইয়ের মনের কথা জানার বিশাল সুযোগ। এই সুযোগ সে হাতছাড়া করতে চাই না মেঘ। বৃহৎ নয়নে চেয়ে আছে আবির ভাইয়ের চোখ-মুখ নিরীক্ষণ করছে। আবির ভাই চোখের ইশারায় কিছু বললে, সেটাও আজ বুঝে নিবে অষ্টাদশী। আবির মেঘের দিকে এক পলক তাকালো, পুনরায় চোখ সরিয়ে গম্ভীর কন্ঠে বলল, "না, ও আমার কাজিন। " এই সামান্য কথায় অষ্টাদশীর হৃ*দয় ভে*ঙে চূ*র্ণ*বিচূ*র্ণ হয়ে গেছে। মেয়েটা হাসিমুখে মেঘকে এটা সেটা জিজ্ঞেস করেছে মেঘ মনের বি*রুদ্ধে উত্তর গুলো দিয়েছে। মেয়েটা বিদায় নিয়ে চলে গেছে কিন্তু

মেঘ এক পা ও নড়ছে না, ছলছল নয়নে চেয়ে আছে আবির ভাইয়ের দিকে । মনে মনে ভাবছে, “আমি কি শুধুই মোহের পেছনে ছুটছি?” আবির আকাশের পানে চেয়ে মনে মনে বলল, ” তোর চোখে চোখ রেখে মি*থ্যা বলার সা*ধ্যি আমার নেই। কিন্তু তোর ভালোর জন্য এই মি*থ্যাটা বলতে হয়েছে। আমি চাই না আমার কারণে তুই তোর জীবনের লক্ষ্য থেকে সরে যাস। তোকে মা*নসিক ভাবে শ*ক্ত হতে হবে, এর থেকেও কঠিন পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে হবে তোকে।” মেঘ সারা রাস্তা কাঁ*দতে কাঁ*দতে এসেছে। প্রতিদিন আবির ভাইয়ের কাঁধে হাত রাখলেও আজ ইচ্ছে করেই দূরে সরে বসেছে। বাইকের পেছনে হাত রেখেছে তবুও আবির ভাইকে ছোঁয়েও দেখেনি। এই অনূ*ভুতিহীন মানুষটা কোনোদিন মেঘের অনূ*ভুতি বুঝবে না। যেখান থেকে মেঘকে নিয়ে গেছিলো ঠিক সেখানেই মেঘকে নামিয়ে দিয়েছে আবির। মেঘ হেলমেট রেখে একবারের জন্যও তাকায় নি আবিরের দিকে। যথারীতি বাড়ির উদ্দেশ্যে হাঁটছে। বুকের ভেতর অসহনীয় য*ন্ত্রণা হচ্ছে তার। এই যন্ত্রণার এক অংশ যদি আবির ভাই বুঝতো। মেঘ কাঁ*দছে আর বাড়ির দিকে হাঁটছে । গত ১৭ বছরেও সে এত কা*ন্না করেনি, এই আবির ভাই দেশে ফেরার পর যতবার কা*ন্না করেছে। আবির বাইক থেকে দুর্বোধ্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মেঘের হাঁটার দিকে, কয়েক মুহুর্ত নিশ্চুপ থেকে অকস্মাৎ বলে উঠলো, “তোকে প্র*তিশ্রু*তি দিবো না মেঘ, বউ করে Direct প্রমাণ করে দিবো। এই আবির কথা দিচ্ছে, তোর এই কা-ন্না চিরতরে মুছে দিবো

সেদিন,ইনশাআল্লাহ। ” নির্বাচনের ঝামেলার পর থেকে তানভির বেশ শান্তিতে আছে। আপাতত কাজের এত চাপ নেই। এমপিও বিভিন্ন কাজে ব্য*স্ত, প্রয়োজন হলে মিটিং ডাকে, তখন উপস্থিত থাকতে হয় সেখানে। কয়েকমাসের কার্যক্রমে তানভির এমপির কাছের লোকদের মধ্যে একজন হয়ে উঠেছে। কোনো পোগ্রাম কিভাবে করলে ভালো হবে তা ম্যানেজ করার দায়িত্ব বেশিরভাগ টায় তানভিরের থাকে। নিজে না পারলে আবির তো আছেই। এমপির বাড়িতে দৌড়াদৌড়ি আর কাজ করতে করতে ধীরে ধীরে এমপির মেয়ের সাথেও তানভিরের সুসম্পর্ক হয়ে গেছে। মেয়েটাও তানভিরকে আপন ভাইয়ের মতোই দেখে। তানভিরদের একটা কাজের দায়িত্ব দিয়ে এমপি কোনো এক জায়গায় চলে গেছেন। তানভির আরও কয়েকজন মিলে কাজ করতেছিলো। হঠাৎ এমপির মেয়ের আগমন হয়। মেয়েটা হাসিমুখে বলে, “তানভির ভাইয়া, একটু বসি এখানে?” একে এমপির মেয়ে তারউপর নিজের বাড়ি তানভিরের তো না করার ক্ষমতা নেই। তাই ধীর কণ্ঠে বলল, “বসো। ” মেয়েটা বসে আস্তে করে বলল, “আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে এসেছি। জিজ্ঞেস করবো?” “কি কথা?” মেয়েটা আশেপাশে তাকিয়ে দেখলো তারপর ধীর কণ্ঠে বলল, “ঐদিন পোগ্রামে আবির ভাইয়ার সাথে একটা মেয়ে আসছিলো। ঐ মেয়েটা কে?” তানভির কপাল কুঁচকে শুধালো, “কেন?” মেয়েটা মৃদু হেসে উত্তর দিলো, “মেয়েটা মাশাআল্লাহ অনেক কিউট । আমি ভাইয়াকে জিজ্ঞেস করছিলাম মেয়েটা কে, ভাইয়া বলছে কাজিন।

আপনি আর ভাইয়াও তো কাজিন তাহলে মেয়েটা কি আপনার বোন?” তানভির স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, “হ্যাঁ। আমার একমাত্র বোন মাহদিবা খান মেঘ। এখন বলো ঘটনা কি?” মেয়েটা আমতা আমতা করে বলল, “আসলে আপনার বোনকে আমার অনেক পছন্দ হয়ছে। আমার ভাইয়া UK তে পড়াশোনা করে। আমার মনে হচ্ছে আমার ভাইয়ার সাথে মেঘকে খুব ভালো মানাবে। ” এটুকু বলেই থামলো। তানভির কপাল কুঁচকে তাকিয়ে আছে। পুনরায় মেয়েটা বলা শুরু করলো, ” না না। এখন বিয়ে দিতে হবে না। ভাইয়া ২-১ বছরের মধ্যে ছুটি নিয়ে দেশে আসবে। তখন যদি....” তানভির দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে রা*গ কন্ট্রোল করে মৃদু হাসলো, তারপর শক্ত কণ্ঠে উত্তর দিল, “আমায় বলেছো, এখানেই থামো। ভাইয়া যদি এগুলো শুনে, তো আল্লাহ জানে কি করবে। ভাইয়ার যার সাথে বিয়ে ঠিক সে আর কেউ না, আমার একমাত্র বোন মেঘ। ভাইয়ার পৃথিবী জুড়ে শুধু মেঘের অস্তিত্ব । না ভাইয়া কারোর হবে আর না মেঘকে কারোর হতে দিবে। ” মেয়েটা বিস্ময় চোখে চেয়ে বিড়বিড় করে বলল, “ভাইয়াকে জিজ্ঞেস করেছিলাম গার্লফ্রেন্ড কি না, ওনি তো না করেছেন, বললেন কাজিন। ” তানভির হাসিমুখে উত্তর দিলো, “গার্লফ্রেন্ড না, তাই না করেছে। বউ কি না জিজ্ঞেস করতা তাহলে ঠিকই হ্যাঁ বলতো। ভাইয়া মেঘকে কখনো গার্লফ্রেন্ড ভাবে না, সবসময় বউ ভাবে আর বউ হিসেবেই পরিচয় দেয়। সে যাই হোক এই বিষয় নিয়া আর কথা বাড়িয়ো না। যাও এখান থেকে।” মেয়েটা মন খারাপ করে চলে

যাচ্ছে। আবিরকে ভালো লাগছিলো আবির অন্য কারো মালিকানায় বন্দি, এখন মেঘকে নিজের ভাইয়ের জন্য পছন্দ করছে এই মেঘও আবির ভাইয়ের দখলে। বিড়বিড় করে আবিরকে বক*তে বক*তে বাসার ভেতরে চলে গেছে। তানভির কাজ শেষ করে দুপুরে বাইক নিয়ে বের হইছে। মেঘদের কোচিং এর সামনে ওয়েট করছে। কিছুক্ষণের মধ্যে কয়েকজনের সাথে বন্যাও বেড়িয়ে আসছে। বন্যাকে দেখে তানভির বাইক থেকেই জোরে ডাকল, "এই মেয়ে, এদিকে আসো। " বন্যা অবাক চোখে তাকালো। মেঘ তো কোচিং এ আসে না। ঐদিন ঝামেলার পরে মেঘ ই কল দিয়ে বন্যাকে সব বলেছে। তাহলে তানভির ভাইয়া কোচিং এর সামনে কেনো আসছেন? বন্যা গুটিগুটি পায়ে এগিয়ে আসলো তানভিরের কাছে। তানভির স্বাভাবিক কণ্ঠে শুধালো, "আজকের পরীক্ষা কেমন হয়েছে?" বন্যা মৃদু হেসে উত্তর দিল, "জ্বি ভালো। " তানভির গলা খাঁকারি দিয়ে ধীর কণ্ঠে শুধালো, "তুমি নাকি অসুস্থ ছিলা, সুস্থ হইছো?" বন্যা বিস্ময়কর দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। বন্যা অসুস্থ ছিল এটা তানভির ভাই কিভাবে জানে, অবশ্য জানবে না ই বা কেন। মেঘ ই নিশ্চয় বলেছে। বন্যা উপর নিচ মাথা নাড়লো। তানভির বাইকের সাইড থেকে একটা হেলমেট খুলে বন্যার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, "এটা পড়ে বাইকে বসো। " বন্যা ভ্রু কুঁচকে তাকিয়ে বলল, "কেনো?" তানভির কিছুটা শক্ত গলায় বললো, "উঠতে বলছি উঠো। " বন্যা তানভির ভাই সম্পর্কে খুব ভালো করেই জানে। তাই ত্যা*ড়া*মি না করে চুপচাপ বসছে। তানভিরের পেছনে

নিজের ব্যাগ রেখে তারপর বসেছে, যেনো গায়ে না লাগে। তানভির বন্যাকে নিয়ে একটা রেস্টুরেন্টে এসেছে। বন্যার পছন্দ মতো খাবার অর্ডার দেয়া হয়েছে। আগে একদিন মেঘ সাথে ছিল বলে বন্যার এতটা অস্বস্তি লাগে নি। তবে আজ একা তানভিরের সাথে খেতে এসে নিজের হাত-পা স্থির রাখতে পারছে না। বন্যার অস্বাভাবিকতা দেখে তানভির স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, "এত ভ*য় পাচ্ছো কেন? আমি তো অপরিচিত কেউ না। আর আশেপাশের মানুষ যদি তোমার এই কাঁপা-কাঁপি দেখে তাহলে নিশ্চিত ভাববে আমি তোমাকে কি*ড*না*প করে নিয়ে আসছি। প্লিজ স্বাভাবিক হও। " বন্যা কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে, কোমল কণ্ঠে শুধালো, "আমায় আবারও ট্রিট দেয়ার কারণ কি?" তানভির উত্তর দিল, "আমাদের এমপি জিতেছে সেই খুশিতে খাওয়াচ্ছি। আরও আগেই খাওয়াবো ভাবছিলাম কিন্তু সময় পাই নি।মাঝখানে এমপির বাড়িতে পোগ্রাম ছিল, অবশ্য ঐখানে তোমাকে যেতে বলতাম কিন্তু তুমি তো সেখানে যাবে না, তাই আর বলি নি। আজ একটু ফ্রী আছি এজন্য তোমাকে নিয়ে আসলাম। " বন্যা কিছু একটা ভেবে পুনরায় প্রশ্ন করলো, "তাহলে মেঘকেও নিয়ে আসতেন!" তানভির সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল, "বনুকে নিয়ে আসতে চাইছিলাম, কিন্তু ভাইয়া নি*ষেধ করলো। " কথাটা বলেই ভাবনায় পরে গেছে তানভির। যদি বন্যা কিছু বুঝে ফেলে। যেই কথা সেই কাজ, বন্যা প্রশ্ন করে উঠলো, "আপনি মেঘের আপন ভাই, তাহলে ওনি নি*ষেধ করবেন কেন?" তানভির আমতা আমতা করে বলল, " ঐদিনের

কোচিং এর ঘটনা তো তুমি নিশ্চয় শুনেছো। আসলে ঐ ঘটনার পর থেকে বনু একটু চিন্তিত। এই অবস্থায় এদিকে আসলে যদি ভ*য় পায়, তাই ভাইয়া না করছে। আর কিছুই না। অবশ্য ওদের সবাইকে নিয়ে ঘুরতে যাবো। অনেকদিন ধরেই মীম আর আদি খুব করে ধরছে ঘুরতে নিয়ে যাওয়ার জন্য। এতদিন নির্বাচনের ঝামেলার জন্য পারি নি। এখন না নিয়ে গেলে বাসায় ঝামেলা হয়ে যাবে। " বন্যা মৃদু হাসলো। বাসার ঝামে*লার ভ*য়ে ভাই বোনদের ঘুরতে নিয়ে যাবে। তানভির যে কোনো কিছুকে ভ*য় পায় এটা শুনেই বন্যার হাসি পাচ্ছে। বন্যার অপরূপ হাসি দেখে তানভিরও হেসে ফেললো। তানভিরের উচ্চতা ৫ ফিট ৯" গায়ের রঙ উজ্জ্বল শ্যামলা, সুস্বাস্থ্যের অধিকারী, বলতে গেলে কিছুটা গুলুমুলু টাইপের, তানভিরের দাঁড়িও আবিরের মতোই ছোট করে কা*টা। ফুল হাটার টিশার্ট কনুই পর্যন্ত উঠানো,সাথে জিন্স প্যান্ট, হেলমেটের কারণে গুছানো চুলগুলো অগোছালো হয়ে গেছে। বন্যা তানভিরের মুখের দিকে কিছুক্ষণ দেখলো। এমনিতে খুব মু*ডি মনে হলেও হাস্যোজ্জল মুখ দেখলে মনেই হয় না এই মানুষ টা এত রা*গী। দুজনেই খাওয়া শেষ করলো। তারপর বন্যাকে বাসার গলি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে বাসায় ফিরেছে তানভির। দিনটা বৃহস্পতিবার ছিলো। মেঘ সন্ধ্যাবেলা সোফায় বসে নুডলস খাচ্ছিলো। এমনিতেই ইদানীং মেঘের মন ভালো নেই। আবির ভাইয়ের মুখে সেদিনের না শব্দ শুনার পর থেকে মেঘ আর আবির ভাইয়ের সাথে কথা বলে না। আবিরও আগ বাড়িয়ে কথা বলতে আসে

না। মেঘের নুডলস খাওয়ার মাঝে মালিহা খান হুট করে এসে মেঘের পাশে বসলেন। মেঘ অবাক চোখে চাইলো বড় আম্মুর দিকে, তারপর ঠান্ডা কণ্ঠে শুধালো, "কি হয়েছে বড় আম্মু?" মালিহা খান উত্তেজিত কণ্ঠে বলা শুরু করলেন, "হ্যাঁ রে মেঘ, মেয়েটা যে তোকে পড়ায় কি যেনো নাম?" মেঘ ভ্রু কুঁচকে উত্তর দিল, "জান্নাত আপু, কেনো?" মালিহা খান উত্তেজিত কণ্ঠে পুনরায় বললেন, "জান্নাত মেয়েটাকে তোর কেমন লাগে? আমার তো বেশ ভালো লাগে, খুব ঠান্ডা, মন মানসিকতাও ভালোই মনে হলো। আমার মাথায় একটা চিন্তা ঘুরতেছে। আবিরের তো বিয়ের বয়স হয়েই গেছে, জান্নাতের সঙ্গে তোর আবির ভাইকে মানাবে ভালো। তাই না?" মেঘের মনে হচ্ছে মাথার উপরে অবস্থিত ছাদ টা অকস্মাৎ মেঘের মাথায় ভেঙে পরেছে। মেঘের বুকটা কেঁপে উঠলো। যেই মেয়েকে নিয়ে নিজেই আ*তঙ্কে আছে সেখানে বড় আম্মু ঐ মেয়েকেই বউ করার কথা বলছে। এ যেনো কা*টা গায়ে নুনের ছিটা দেয়ার মতো। মেঘ ঢুক গিলে নিজেকে স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করছে। কিন্তু চাইলেই কি সবকিছু লুকানো সম্ভব! যেই মানুষটার জন্য বুকের ভেতর এক আকাশ সমান ভালোবাসা সেই মানুষটার বিয়ের কথা শুনছে তাও অন্য মেয়ের সাথে। মেঘের চিৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছে করছে। বড় আম্মুকে কি করে বুঝাবে, "তিন মাসেই আবির ভাইকে নিজের থেকেও বেশি ভালোবেসে ফেলেছে। " মালিহা খান পুনরায় প্রশ্ন করলেন, "এই মেঘ, জান্নাত কে জিজ্ঞেস করিস তো কাউকে পছন্দ করে কি না! পছন্দ না থাকলে

ভাবছি আবির আর তোর বড় আব্বুর সাথে এই বিষয়ে কথা বলবো। ” কথা শেষ করে মালিহা খান উঠে রান্না ঘরে চলে গেছেন, এদিকে মেঘের গলা দিয়ে নুডলস নামছে না। বুক ফেটে কা*ন্না আসছে। নুডলস এর প্লেট রেখে নিজের রুমে চলে গেছে। ফ্যান ছেড়ে, লাউড স্পিকারে গান চালিয়ে ইচ্ছে মতো কেঁ*দে*ছে। মনের কষ্ট প্রকাশ করার মতো কেউ নেই মেঘের জীবনে। তাই কান্না ই তার একমাত্র সঙ্গী। ঘন্টাখানেক পর জান্নাত আপু পড়াতে আসছে। মেঘ হাতমুখ ধৌয়ে ফ্রেশ হয়ে নিচে পড়তে আসছে। জান্নাত আপুকে দেখে মেঘের মাথায় শুধু বড় আম্মুর কথা গুলোই ঘুরছে। পড়ানো শেষে মেঘ বলল, “আপু একটা কথা জিজ্ঞেস করি?” জান্নাত মিষ্টি করে হেসে বলল, “হ্যাঁ অবশ্যই। ” মেঘ শীতল কন্ঠে প্রশ্ন করলো, “আপু আপনি কি কাউকে পছন্দ করেন?” মেঘের এমন প্রশ্নে জান্নাতের ওষ্ঠদ্বয় আরও বেশি প্রশস্ত হলো। শান্ত স্বরে উত্তর দিলো, “হ্যাঁ।” মেঘ যেই না প্রশ্ন করতে যাবে “কে সে” তার আগেই জান্নাতের ফোনে কল আসছে। কল রিসিভ করে কথা বলতে বলতে মেঘের থেকে বিদায় নিয়ে জান্নাত বেড়িয়ে গেছে। অষ্টাদশীর মনের ভেতর তোলপাড় চলছে। বড় আম্মুর বলা কথাগুলো মাথায় ঘুরছে, জান্নাত আপুর বিষয়ে আবির ভাইয়ের কেয়ার, কিছুদিন আগে মেঘকে কাজিন বলে পরিচয় দেয়া, আজ জান্নাত আপুর পছন্দের মানুষ আছে জানতে পারা। সবকিছু যদি এক সুতোয় বাঁধা হয় তাহলে মেঘের কি হবে! মেঘের চোখ টলমল করছে, দু ফোঁটা পানি গরিয়ে পরতেই মেঘ হাতের

উল্টোপিঠ দিয়ে চোখ মুখে, শক্ত কণ্ঠে নিজেকে শাঁসালো, “একদম কাঁদবি না। যে মানুষটা কোনোদিন তোর হবেই না। তাকে নিয়ে কেনো কাঁদছিস?” মেঘ রাতে খায় নি, সবাই অনেক ডেকেছে কিন্তু তাতেও মেঘ রুম থেকে বের হয় নি। আবির বাসায় ফেরার পর থেকে ছাদে ছিল। রুমে এসেছে শেষরাতের দিকে। তাই সে এসবের কিছুই জানে না। শুক্রবারে সকাল থেকে মেঘের কোনো হদিস নেই। তানভির পর্যন্ত ডেকে আসছে কিন্তু মেঘ আসে নি। আবির ঘুম থেকে উঠেছে ১২ টার দিকে, শাওয়ার নিয়ে রেডি হয়ে নামাজে গেছে। মেঘ তখনও রুমে। শাওয়ার নিয়ে নামাজ পরে আবার শুয়ে পরেছে। বের হয়ে আবির ভাই বা বড় আম্মুর মুখোমুখি হওয়ার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই তার। আবির নামাজ থেকে এসে খেতে বসেছে, বাকিরাও খেতে বসতেছে। আকলিমা খান হালিমা খানকে উদ্দেশ্য করে আস্তে করে বললেন, “মেজো আফা, মেঘ তো এখনও খেতে আসলো না। ” এই কথা আবিরের কান পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। খাবার মুখে দিতে গিয়েও থেমে গেলো, সহসা তানভিরের দিকে তাকিয়ে ইশারা দিলো। তানভির সঙ্গে সঙ্গে উঠে গেছে। মেঘকে ডেকে,ধ*ম*কে নিয়ে আসছে। মেঘের চোখমুখ ফুলে আছে, চুলগুলো এখনও ভেজা, চুল থেকে টুপটুপ করে পানি পরছে। মাথা নিচু করে খেতে বসেছে। চুল দিয়ে বেশ অর্ধেক মুখ ডেকে রেখেছে। কিন্তু আবির মেঘের বিপরীতে বসায় স্পষ্ট মেঘের চোখ, নাক, মুখ দেখতে পাচ্ছে । আবির খাওয়ার মাঝখানে বেশ কয়েকবার মেঘের দিকে তাকিয়েছে। ভেবেই পাচ্ছে না “হলো কি?”

কিন্তু মেঘ ভুল করেও একবার মুখ তুলে তাকায় নি। মেঘের হাবভাব দেখে মোজাম্মেল খান রে*গে গেলেন, কঠিন স্বরে বললেন, “পরীক্ষা যত কাছে আসছে তোমার অমনোযোগিতা ততই বাড়ছে। যা যা চাইতেছো সবই তোমাকে দেয়া হচ্ছে তারপরও তোমার পড়াশোনা তে এত অবহেলা। শুনলাম ইদানীং কোচিং এও যাচ্ছো না, অবশ্য যাবেই বা কিভাবে, যাই হোক বাড়িতে অন্তত ঠিকমতো পড়াশোনা করো। ” আবির খাওয়া বন্ধ করে দাঁতে দাঁত চেপে বসে আছে, আবিরের অন্য হাত টেবিলের নিচে তানভির চেপে ধরে রেখেছে। আবির প্লেটের খাবার শেষ করে সবার আগেই উঠে গেছে। কোনোদিকে না তাকিয়ে সোজা রুমে চলে গেছে। ১-১.৩০ ঘন্টা পর তানভির মীমকে আর আদিকে ডেকে বলেছে রেডি হওয়ার জন্য, ঘুরতে নিয়ে যাবে।। দুই ভাই বোন খুশিতে গদগদ হয়ে রেডি হতে চলে গেছে। জীবনে প্রথমবার বাইকে ঘুরতে যাচ্ছে। আবির আগে থেকে রেডি হয়েই সোফায় বসে আছে। শুক্রবার মানেই আবিরের পাঞ্জাবি পড়ার দিন, বেগুনি রঙের একটা পাঞ্জাবি পরেছে, সাথে সাদা রঙের প্যান্ট, বেলি ফুলের সুগন্ধ যুক্ত তীব্র পারফিউম দিয়েছে গায়ে, সাথে একটা সুন্দর ডিজাইনিং ঘড়ি, চুল গুলোও সুন্দর করে স্টাইল করেছে। যদিও হেলমেট পরলে চুল অগোছালো হবেই। আবির সোফায় বসে ফোন চাপতেছিলো। তানভিরের পড়নে পাঞ্জাবি আর লুঙ্গি। নামাজ থেকে এসে লুঙ্গি পরেছিল এখনও তাই পড়নে। প্যান্ট পড়ার সময়ও পাচ্ছে না ছেলেটা। সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে আবিরের থেকে কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে

বিড়বিড় করে বলল, “ভাইয়া, বনু তো ঘুরতে যাবে না বলছে! ” সঙ্গে সঙ্গে আবির চোখ রাঙিয়ে তাকিয়েছে। তানভির ঢুক গিলে ছোট করে বলল, “আচ্ছা আমি রাজি করাচ্ছি। ” আবার দ্রুত দৌড় দিলো বোনের রুমের দিকে। মেঘকে বুঝাচ্ছে কিন্তু মেঘ কোনোকিছুতেই রাজি হচ্ছে না। রা*গে চিৎকার করছে, “বললাম তো যাবো না। তোমরা ঘুরে আসো আমার ইচ্ছে নেই। ” তানভির আবার নিচে আসছে, আবিরকে কিছু বলার আগেই আবিরের তপ্ত দৃষ্টি দেখে ভ-য়ে আবার বোনকে রাজি করাতে গেছে। ৪-৫ বার উপর নিচ করতে করতে অবশেষে বোনকে রাজি করাতে সক্ষম হয়েছে। মেঘ রাজি হয়েছে শুনে আবির বাসা থেকে বেড়িয়ে বাইকে বসে আছে। তানভির সহ সবাই রেডি হয়ে বেড়িয়েছে। তানভির আবির কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে আস্তে করে বলল, “বনুকে রাজি করিয়ে এনেছি ঠিকই কিন্তু তার শর্ত সে তোমার বাইকে যাবে না। ” আবির অন্য দিকে মুখ করে কি*ড়মিড় করে বলল, “তোর বোন আমার সাথে না গেলে তোর খবর আছে। ” তানভির মনে মনে বলছে, “আল্লাহ তুমি আমায় উদ্ধার করো। দুই দিকে আ*গ্নে*য়গি*রি মাঝখানে আমি অসহায় এক বালতি পানি। কি করে সামলাবো এই দুই পাগলরে?” তানভির বাধ্য হয়ে মেঘকে বুঝাতে গেলো। মেঘ মাত্রাতিরিক্ত রে*গে আছে। আজ তানভিরের কথা শুনা বা মানার কোনো ইচ্ছে তার নেই। আবির ভাইয়ের সাথে যাবে না মানে যাবেই না। তানভির আবিরের দিকে তাকাতেই দেখলো আবির রা*গে ফুঁ*সছে। তানভির বিড়বিড় করে বলল, “কি মসিবতে পড়লাম আমি! ”

কোনোকিছুতেই যখন বোনকে মানাতে পারছিলো না তখন তানভির বলে উঠলো, “দেখ বনু, ভাইয়ার বাইক এ একজনই বসতে পারবে, দুজন বসলে রিস্ক হয়ে যাবে। আমার বাইকে দুজন বসা গেলেও দুজন মেয়ে বসা যাবে না। মীম জীবনে প্রথম বাইকে উঠবে, তোরা দুজন একসাথে বসলে যদি এ*ক্সিডে*ন্ট করে ফেলি। তাই বলছি তুই ভাইয়ার সাথে যা। ” মেঘের এপাশ ওপাশ মাথা নাড়িয়ে বলল, “আমি এসব জানি না। আমি ঐ বাইকে যাব না। তাহলে তোমরা ঘুরে আসো আমি যাব না । ” তানভির আঁতকে উঠে বলে, ” না, তুই যাবি। প্লিজ, এটায় লাস্ট টাইম এরপর থেকে আমিই তোকে নিয়ে যাবো। এবারের মতো ভাইয়ার সাথে চলে যা। ” এই কথা বলে তো ফেলছে। কিন্তু ঘুরে ভাইয়ের দিকে তাকানোর সাহস পাচ্ছে না। কারণ এই কথা শুনে নিশ্চিত ভাবে আবিরের রা*গ দ্বিগুণ বেড়েছে, আর ভাইয়ের র*ক্ত ব*র্ণের চোখে চোখ রাখার ক্ষমতা তানভিরের নেই। সে তো বোনকে বুঝানোর জন্য এই কথা বলছে কিন্তু আবির তো এটা সহ্য করবে না। মেঘ শক্ত কণ্ঠে বলল, “ঠিক আছে ” তানভির দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে হাসলো। বোনকে মানাতে পারছে এতেই শুকরিয়া। মেঘ আবিরের পেছনে বসেছে ঠিকই কিন্তু মাঝখানে একহাত ফাঁকা রেখে। আবির উচ্চস্বরে বলে উঠলো, “তানভির তোর বোন রে বল ধরে বসতে, না হয় রাস্তায় আ*ধম*রা হয়ে পরে থাকবে তখন বোনের জন্য কাঁ*দিস না। ” আবির ভাইয়ের ভারি কণ্ঠের হুং*কার শুনে মেঘ সঙ্গে সঙ্গে আবির ভাইয়ের কাঁধ চেপে ধরে আবিরের কাছাকাছি এসে বসলো, আবির

হেলমেটের আড়ালেই মৃদু হাসলো। তারপর বাইক স্টার্ট দিলো। এদিকে তানভির বিড়বিড় করে বলছে, “আহারে, আমার বোনের কিছু হলে আমার আগে তো তুমিই মই*রা যাবা। ” তানভিরও যথারীতি মীম আর আদিকে নিয়ে বাইক স্টার্ট দিলো। ৩ ঘন্টা ঘুরেছে, সবার পছন্দ মতো খাবার খেয়েছে, নাগড় দোলায় উঠেছে, অথচ মেঘের মুখে হাসির ছিটেফোঁটাও নেই। সে জড়বস্তুর ন্যায় আচরণ করছে। মেঘকে এতটা উদাসীন থাকতে দেখে আবিরের ই কষ্ট হচ্ছে। আবির তো চেয়েছিলো মেঘের মনোযোগ যেনো আবিরের থেকে কিছুটা সরে পড়াশোনায় যায়। সে তো কখনো চাই না তার অষ্টাদশী এভাবে মুখ গোমড়া করে থাকুক। মীম, আদি আর তানভিরকে বাড়ি পাঠিয়ে আবির মেঘকে নিয়ে অনেকটা পথ পেরিয়ে একটা নির্জন রাস্তায় আসছে। রাস্তার পাশে অনেকটা দূরে দূরে ল্যামপোস্টের লাইটের আলো জ্বলছে। আবির বাইক থামিয়ে হেলমেট খুলে রাখলো, তারপর ঠান্ডা কণ্ঠে শুধালো, “কি হয়েছে তোর?” নির্জন রাস্তায় আচমকা এমন প্রশ্নে, মেঘ কিছুটা কেঁপে উঠেছে। কি বলবে সে, এই প্রশ্নের উত্তর মনের মধ্যে থাকলেও তা বলার মতো সাহস নেই মেঘের । সামান্য এক প্রশ্নে যেই থা*প্প*ড় খেয়েছিলো আজ যদি বিয়ে নিয়ে কথা বলে তাহলে হয়তো এই নির্জন রাস্তায় মে*রে ফেলে রেখে চলে যাবে। এসব ভেবেই মেঘের শরীর কাঁপছে। আবির পুনরায় প্রশ্ন করলো, “তোর কি শরীর খারাপ লাগছে?” মেঘ ঢুক গিলে আস্তে করে বলল, “না, ঠিক আছি। ” আবির শক্ত কণ্ঠে শুধালো, “তাহলে বল তুই কি

নিয়ে এত আপসেট? পরীক্ষা নিয়ে টেনশনে আছিস?” মেঘের মনে অন্য চিন্তা থাকা সত্ত্বেও উপর নিচ মাথা নাড়লো। আবির ভারী কণ্ঠে বলা শুরু করলো, ” এডমিশন টেস্ট নিয়ে এত ভাবিস না। তোর কাজ পড়াশোনা করা তুই শুধু তাই কর। আর নামাজ পরে আল্লাহ র কাছে চাইবি। কে কি বললো, কে কি করছে, কোথায় কি হচ্ছে এসব ভেবে মাথা নষ্ট করার প্রয়োজন নেই। তুই যদি কোথাও চান্স নাও পাস তাতেও কেউ তোকে কিছু বলবে না, সেটা আমি দেখবো। কিন্তু নিজেকে যাচাই করার আগেই ভে*ঙে পরবি না। ” মেঘ মাথা নিচু করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। আবির মেঘের দিকে তাকিয়ে আছে। দূর থেকে আসা ল্যামপোস্টের আলো মেঘের গালে আর কপালের একপাশে পরছে, সেই আলোতে মেঘকে অসম্ভব সুন্দর লাগছে। মেঘের সম্পূর্ণ মুখ দেখতে আবির এক আঙুলে মেঘের চিবুক উঠালো। আলোয় জ্বলজ্বল করে উঠলো অষ্টাদশীর চাঁদের ন্যায় মুখবিবর। আচমকা আবির ভাইয়ের আঙুলের ছোঁয়াতে মেঘের দেহ কম্পিত হলো। আবির ভাইয়ের মুখের দিকে তাকালো মেঘ। বুকে জমে থাকা অভিমান রা যেনো অভিযোগ হয়ে বেড়িয়ে আসতে চাইছে, মনের সব কষ্ট উজাড় করে বলতে ইচ্ছে করছে এই মানুষটাকে। কয়েক সেকেন্ডের জন্য মেঘের মনে হচ্ছে এই পৃথিবীর বুকে মেঘের সামনে দাঁড়ানো ব্যক্তিটা মেঘের সবচেয়ে কাছের মানুষ। এই মানুষটা একান্তই মেঘের। আবির মেঘের চোখে চোখ রেখে তপ্ত স্বরে বলল, “আমি বিশ্বাস করি, আমার মেঘ এত সহজে হে*রে যাওয়ার মেয়ে নয়। ”

এই কথা শুনা মাত্র মেঘের মনে হচ্ছে মস্তি*ষ্কের নিউ*রনেরা দ্বিকবিদিক ছুটছে। মনে একটা কথায় বারবার ঘুরছে, “আমার মেঘ” আবির ভাই, আমার মেঘ বলে সম্মোধন করেছেন এটা ভাবতেই মেঘের সকল মন খারাপ এক মুহুর্তেই পালিয়ে গেছে। সহসা মেঘের মুখে হাসি ফুটে উঠেছে। মেঘের মুখের অকৃত্রিম, মায়াবী হাসি দেখে আবিরও নিঃশব্দে হাসলো, মেঘের দিকে তাকিয়ে থেকেই পুনরায় ধীর কণ্ঠে বলল, “This is my sparrow. I always want to see you like this.” মেঘ নিস্তব্ধ হয়ে চেয়ে আছে আবিরের দিকে। এইযে এই মানুষ টাকে নিয়ে এত অভিমান, এত অভিযোগ সামনে আসলে কেনো এই অভিযোগ আর অভিমানরা পালিয়ে যায়। এত এত রা*গ কেনো দেখাতে পারি না ওনাকে! ওনি যদি সত্যি সত্যি জান্নাত আপুকে পছন্দ করেন আর জান্নাত আপুও যদি ওনাকে পছন্দ করেন তাহলে তো ওনাদের বিয়ে খুব শীঘ্রই হয়ে যাবে। তখন আমি কি করবো? এইযে এই মানুষটার ছোট ছোট কথাতেই আমার সব রা*গ গলে পানি হয়ে যায়, আবার নতুন করে ওনার প্রেমে হাবুডুবু খায়, ওনি জান্নাত আপুকে বিয়ে করলে আমার কি হবে? তখনও কি ওনার প্রতি আমার এরকম ই টান থাকবে? নাকি এখনের অনূভুতি গুলো তখন শুধুই স্মৃতি হয়ে থাকবে? এসব ভাবতে ভাবতে মেঘ ঠোঁট ফুলিয়ে কা*ন্না শুরু করে দিয়েছে। হঠাৎ কান্না দেখে আবির কিছুটা অবাক হয়ে গেছে। কিছুই তার মাথায় ঢুকছে না। সে ভেবেছিল শুধু এমপির বাড়ির ঘটনা থেকেই মেঘের মন খারাপ আর বাকিটা

পড়াশোনা নিয়ে। কিন্তু এই মন খারাপের সবটা জুড়ে যে জান্নাত এটা আবির বুঝতেও পারছে না। আবির কিছুক্ষণ সময় নিয়ে চুপচাপ মেঘের দিকে তাকিয়ে আছে। একবারের জন্য কা*ন্না থামাতেও বলছে না। অনেকটা সময় কাঁদার পর মেঘ আবিরের মুখের দিকে তাকালো। একটা মেয়ে এভাবে কাঁদছে অথচ এই মানুষটা কিছু বলছেনও না। এতক্ষণে তো অন্ততপক্ষে ৪-৫ টা ধ*মক আর ২-১ টা থা*প্প*ড় খেয়েই ফেলতো। তাহলে আজ এত নিশ্চুপ কেনো ওনি। এটা ভেবেই মেঘ তাকিয়েছে, ল্যামপোস্টের আলোতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে আবির মুচকি মুচকি হাসছে । মেঘ তাকাতেই আবিরের হাসির মাত্রা বেড়ে গেছে। মেঘ কপাল কুঁচকে চেয়ে রইলো, গাল বেয়ে অনর্গল নোনাজল গড়িয়ে পরছে । এইযে ম*রার মতো এতক্ষণ যাবৎ কাঁদছে, আর এই ব্যাটায় কি সুন্দর হাসছে। মেঘের মে*জাজ আবার খা*রা*প হয়ে যাচ্ছে। মুখ ফুলিয়ে শ্বাস ছেড়ে আবিরের দিকে চেয়ে গম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন করল, “হাসছেন কেনো?” আবির হাসিটা একটু কমিয়ে উত্তর দিল, “কাঁদলে তোকে অনেক বেশি সুন্দর লাগে তো তাই। ” মেঘ রা*গী ভাব নিয়ে বলল, ” কাঁদলে আবার কাউকে সুন্দর লাগে নাকি, আর তাই বলে আপনি এভাবে হাসবেন?” আবির মৃদু হেসে উত্তর দিল, “আসলে তোর বান্ধবীর থেকেও সুন্দর লাগছিল, তাই হাসি আটকাতে পারছিলাম না। ” মেঘ আঁতকে উঠে প্রশ্ন করল, “বান্ধবী মানে?” আবির স্ব শব্দে হেসে উত্তর দিল, “ঐ যে শেও*ড়াগাছে যে থাকে তোর বান্ধবী টা। ঐ টার থেকেও তোকে সুন্দর লাগছিল। ” মেঘ আশেপাশে

তাকাচ্ছে, এমনেই অন্ধকার হয়ে গেছে চারপাশ, ল্যামপোস্টের আলোতে রাস্তা আলোকিত থাকলেও, রাস্তার আশেপাশে বিশাল গাছের কালো ছায়া দেখে ভ*য় পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে দু হাতে আবিরের শার্ট খামচে ধরে আবিরের বুকে মুখ লুকিয়ে ফেলেছে। মেঘকে ভ*য় দেখানোর একমাত্র অস্ত্র হচ্ছে ভূ*ত, পে**ত্নী আর কোনোকিছুতেই ভ*য় পায় না মেয়েটা। আবির এটা খুব ভালো করেই জানে। এজন্য ই ইচ্ছে করে মেঘকে খুঁচা*য়। আবির মেঘের পিঠে হাত রাখতে গিয়েও হাত সরিয়ে নিয়েছে। মনের বিরুদ্ধে নিজেকে কন্ট্রোল করা কতটা কষ্টের সেটা আবিরের থেকে ভালো কেউ জানে না। আবিরের ও ইচ্ছে করছে মেঘকে দু হাতে ঝাপটে ধরতে কিন্তু সব ইচ্ছে তো পূর্ণতা পায় না। আবির নিজেকে সংযত করে মুচকি হেসে প্রশ্ন করলো, "এইযে তুই হুট করে ম*রা কা*ন্না জুড়ে দেস আবার হুট করেই পাগ*লের মতো হাসতে থাকিস তোর এমন আচরণেই মানুষ ভাববে তুই শেও*ড়া পা*ড়ায় থাকিস। " মেঘ এখনও ২ হাতে শার্ট খামচে ধরে আছে, ভেজা কণ্ঠে বলল, " এসব কথা বলবেন না প্লিজ। " আবির মৃদু হেসে উত্তর দিল, "তাহলে তুই বল কাঁ*দছিলি কেনো? তোরে কে কি বলে যে তুই এভাবে কাঁ*দিস? এত আবেগ দিয়ে জীবন চলবে না মেঘ, কে কি বলল, কে কি করলো, কে কোথায় চান্স পেলো এসব ভেবে নিজেকে গুটিয়ে নিলে জীবনে কোনোদিন উন্নতি করতে পারবি না। নিজেকে কন্ট্রোল করতে শিখতে হবে। " মেঘ আবিরকে ছেড়ে একটু দূরে সরে মাথা নিচু করে দাড়িয়েছে। আবির ছোট করে ধ*মক

দিল, “তাকা এদিকে। ” মেঘ এক সেকেন্ডের মধ্যে আবিরের চোখের দিকে তাকালো। আবির ঢুক গিলে শক্ত কণ্ঠে বলল, “তোকে অনেক বেশি শ*ক্ত আর সা*হসী হতে হবে। আশেপাশে তোকে কাঁ*দানোর জন্য হাজারো মানুষ থাকবে। তাদের কথায় তুই কেঁ*দেছিস মানে তারা জিতে গেলো। এত সহজে অন্য কে জিতিয়ে দেয়া কি ঠিক হবে?” একটু থেমে পুনরায় বলল, “জীবনে যাই হয়ে যাক, তবুও নিজের মনোবল ভাঙতে দেয়া যাবে না। এখনও অনেক সত্যির মুখোমুখি হওয়া বাকি।” মেঘ কপাল কুঁচকে প্রশ্ন করল, “কি এমন সত্যি? ” আবির স্বাভাবিক কণ্ঠে উত্তর দিল, ” এখন তোর না জানলেও চলবে। দেরি হয়ে যাচ্ছে, বাসায় যেতে হবে।” রবিবারে অফিস থেকে ফিরে ফ্রেশ হয়ে আবির সোফায় বসে আছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই জান্নাত বাসায় ঢুকছে। মেঘ একটা খাতা রেখে আসছিলো সেটা আনতে আবার রুমে গেছে। জান্নাত কে দেখে আবির হাতে কয়েক প্রশ্ন নিয়ে এগিয়ে গেলো। প্রশ্ন গুলো দিয়ে কি যেনো কথা বলছিলো। মেঘ খাতা নিয়ে নামতে গিয়ে সেই দৃশ্য দেখে ফেলছে। যার মনে যেটা থাকে সেটায় সবার আগে মাথায় আসে। মেঘ তাড়াতাড়ি করে নামছে। কাছাকাছি আসতেই আবির ঘাড় ঘুরিয়ে মেঘ কে দেখলো, তারপর স্বাভাবিক কণ্ঠে জান্নাত কে বলল, “তুমি ঐসব নিয়ে চিন্তা করো না। আমি দেখছি। আর তুমি ফ্রী হয়ে আমায় একটা কল দিও। ” জান্নাত চিন্তিত স্বরে উত্তর দিল, “আচ্ছা, ঠিক আছে। ” এদিকে মেঘ ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে আছে দুজনের দিকে। মাথার ভেতরে প্রশ্নেরা সব

এলোমেলো ছুটছে, জান্নাত আপুকে চিন্তা করতে না করছে? আবির ভাই দেখবে এসবের মানে নি? ওনাদের মধ্যে সম্পর্ক না থাকলে তো এসব বলতো না। আবার কলও দিতে বলছে। মেঘ বিড়বিড় করে বলছে, "গেলো রে গেলো, তোর আবির ভাই অন্য মেয়ের হয়ে গেলো। " আবিরের আনা কোচিং এর কয়েকটা প্রশ্ন দিয়ে জান্নাত পরীক্ষা নিয়েছে। মোটামুটি ৩ ঘন্টার উপরে সময় লাগছে। ড্রাইভার আর তানভির কে পাঠিয়েছে জান্নাতকে বাসা পর্যন্ত দিয়ে আসতে। মেঘ খেতে বসেছে, ২ মিনিটের মধ্যে আবিরও খেতে আসছে। বাড়ির সবার খাওয়াদাওয়া অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে। আবির ইচ্ছে করেই মেঘের জন্য ওয়েট করছিলো। এইযে সে জান্নাতের সাথে কথা বলেছে, মেঘের মনে কি চলছে তা বুঝার জন্যই ওয়েট করছিলো। ২ জন ই চুপচাপ খাচ্ছে। হঠাৎ মালিহা খান তানভিরের চেয়ার টেনে আবিরের পাশে বসছেন। তারপর শান্ত কণ্ঠে বললেন, "বাবা, তোর সাথে একটু কথা ছিল" আবির খেতে খেতেই জবাব দিল, "বলো, শুনছি। " মেঘের খাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে। সে খুব ভালোই বুঝতে পারছে বড় আম্মু কি বলতে চাচ্ছেন। আজকে জান্নাত আপু যাওয়ার সময় ও মেঘ দেখেছে বড় আম্মু জান্নাতকে দূর থেকে বউ দেখার মতো পরখ করছিলো। মালিহা খান শীতল কণ্ঠে বলা শুরু করলেন, "আর কিছুদিন পরেই তোর ২৫ বছর হতে চলল, তুই যেহেতু এখন ব্যবসাও করছিস, তোর আব্বুর মুখে শুনেছি তুই খুব মনোযোগী আর তুই যাওয়াতে নাকি ব্যবসায় অনেক উন্নতি হচ্ছে। তাই বলছিলাম

বিয়ে তো করা দরকার, আমি সেদিন মেঘকে জান্নাতের কথা জিজ্ঞেস করছিলাম। মেয়েটাকে আমার ভালো লাগছে। তোর পছন্দ হলে ভাবছি তোর আব্বুকে জানাবো। ” আবির পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে মায়ের বলা এলোমেলো কথাগুলো শুনলো। যতই রা*গ উঠুক আবির মায়ের উপর সহজে চেঁ*চায় না। মেঘের দিকে এক পলক তাকালো আবির। মেঘ অনেকক্ষণ আগে থেকেই খাওয়া বন্ধ করে, মাথা নিচু করে বসে আছে। আবির মনে মনে ভাবছে, “মানুষ ঠিক ই বলে, জীবনে হাজার হাজার শ*ত্রুর প্রয়োজন হয় না, ঘরে ২-১ এমন মানুষ থাকলেই যথেষ্ট । হায় আল্লাহ! আমি বিয়ে করার আগেই তো ওরা আমার সংসার ভেঙে দিবে । তারমানে এই কারণেই মেঘ সেদিন এত কা*ন্না করছিলো। আর আমি ওকে পড়াশোনা নিয়ে এত জ্ঞান দিলাম।” আবিরকে নিশ্চুপ থাকতে দেখে মেঘের মনটা দুমড়ে মুচড়ে যাচ্ছে। আবির ভাই রাজি হলেই সামনে বিয়ে। অবশ্য রাজি হবে না ই বা কেনো। ওনিও তো... এটুকু ভেবেই মেঘ থেমে গেলো।চোখ টলমল করছে, ঠোঁট কাঁপছে । আবির মায়ের দিকে তাকিয়ে ভারী কণ্ঠে অকস্মাৎ বলে উঠল, “একটা মেয়ে এই বাড়িতে পড়াতে আসছে। আর তোমরা কি সব ভাবছো। তাছাড়া আমি এখন বিয়ে করবো না। এই টপিকে আর কথা বলো না। ” এটুকু বলেই আবির দাঁড়িয়ে পরলো। মেঘের দিকে তাকিয়ে তপ্ত স্বরে বলল, “এই মেয়ে খাওয়া শেষ করে পড়তে বস গিয়ে। এসব আজা*ইরা চিন্তা মাথায় ঢুকাবি না। ” এডমিশন টেস্টের চাপে মেঘের নাজেহাল অবস্থা। প্রতিদিন ই জান্নাত

পড়াতে আসে, টানা ৩ ঘন্টা পরীক্ষা নেয়া, বুঝানো শেষে বাসায় ফেরে। অন্যান্য দিনের মতো আজও মেঘ সব পড়া শেষ করে ১১.৩০ এর দিকে শুয়েছে। আবির এখনও ফিরে নি। মেঘ একবার আবিরের রুম থেকে ঘুরেও আসছে। আরও ২০ মিনিট অপেক্ষা করেছে, আবির ফিরছে না বলে বাধ্য হয়ে ফোনে সেইভ করা আবিরের নাম্বার টা বের করে, কোচিং এর ঘটনার পর আজ দ্বিতীয় বারের মতো আবির ভাইকে কল দিতে যাচ্ছে। অষ্টাদশীর হৃদয়ের কম্পন তীব্র হতে শুরু করেছে। কল রিং হচ্ছে, কয়েক মুহুর্তেই রিসিভ হলো । সঙ্গে সঙ্গে মেঘ কাঁপাকাঁপা গলায় সালাম দিল, একই সময় ওপাশ থেকে একটা মেয়ের কন্ঠ স্বর ভেসে আসছে। সালাম আর ওপাশের মেয়েলি কন্ঠের বলা কথাটা একসাথে হওয়ায় মেঘ কথাটা বুঝতে পারে নি। আবির উচ্চস্বরে কাকে বলে উঠল, “Stop!” সহসা স্বাভাবিক কন্ঠে সালামের উত্তর দিয়ে বলল, “ঘুমাস নি এখনও?” আবিরের স্টপ শুনে মেঘ এখনও স্টপ হয়েই আছে, কোন মেয়ে, কি বলেছে, আবির ভাই এখন কোথায়, কিছুই ভেবে পাচ্ছে না। কিছুটা ভেবেচিন্তে মেঘ প্রশ্ন করল, ” আপনি এখন কোথায়? বাসায় কখন আসবেন?” আবির গম্ভীর কন্ঠে উত্তর দিল, ” বাসায় ফিরতে একটু দেরি হবে। কেন?” মেঘ পুনরায় প্রশ্ন করল, “কোথায় আছেন?” আবির রাশভারি কন্ঠে উত্তর দিল, “একটা কাজে আসছি, তানভিরও আছে আমার সাথে, চিন্তা করিস না।” মেঘ খুশি হয়েও হতে পারলো না। মেয়ের কন্ঠ শুনে মনে ভ*য় ঢুকে গেছিল, তানভির সাথে আছে শুনে একটু খুশি হলেও বেশি খুশি

হতে পারল না। কারণ তানভির আপন ভাই হওয়া সত্ত্বেও ভাইয়ের খোঁজ না নিয়ে আবির ভাইয়ের খোঁজ নিচ্ছে। বিষয়টা কেমন হয়ে গেলো না! মেঘ আস্তে করে শুধালো, "ভাইয়া কি আপনার পাশে?" আবির উত্তর দিল, "না একটু দূরে, কথা বলবি? ডাকব?" মেঘ সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, "না না, এমনিতেই। আসছেন না যে। অপেক্ষা করতেছি। " আবির ঠান্ডা কণ্ঠে বলল, "অপেক্ষা করতে হবে না। আমরা চলে আসবো। " মেঘ আস্তে করে বলল, " টেনশনে ঘুম আসছে না। " আবির কপাল কুঁচকে স্বাভাবিক কণ্ঠে উত্তর দিল, "আচ্ছা, আসতেছি। " মেঘ বেলকনিতে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে। অনেকক্ষণ পর আবির আর তানভির বাসায় ফিরেছে। তানভির আগে আগে বাসায় ঢুকে পরলেও আবির নিচে দাঁড়িয়ে কারো সাথে ফোনে কথা বলছে। মেঘ বেলকনি থেকে দাঁড়িয়ে সেই দৃশ্য দেখছে, ঠোঁটে তার মিষ্টি হাসি।মেঘ বিড়বিড় করে বলছে, " আবির ভাইয়ের উপস্থিতিই যে আমার হৃদয়ে বসন্ত জাগাতে সক্ষম। ওনি কবে বুঝবেন এটা?" মেঘ আনমনে কতকিছু ভেবে যাচ্ছে। কখন আবির বাসায় ঢুকেছে অষ্টাদশীর সেই খেয়াল নেই। আবির নিজের রুমে না গিয়ে, সোজা মেঘের রুমে এসেছে। মেঘকে রুমে না পেয়ে যেই না বেলকনির দিকে যাবে, তখন ই দৃষ্টি পরে মেঘের খাতার দিকে। কেমিস্ট্রির বিক্রিয়ার পাশে বড় বড় অক্ষরে লেখা, "আবির ভাই "। আবির তৎক্ষনাৎ খাতাটা হাতে নিয়েছে। লাস্ট কয়েকটা পৃষ্ঠা উল্টিয়ে দেখেছে। পড়ার ফাঁকে ফাঁকে খাতা জুড়ে আবির ভাই লেখা, আরও

কিছু কিছু রোমান্টিক লাইন, কবিতার অংশ, গানের লাইন এসব লেখা। এসব দেখে আবির মাথায় র*ক্ত উঠে গেছে। খাতা টেবিলের উপর ছুঁড়ে ফেলে বেলকনিতে পা রাখতে রাখতে চিৎকার দিয়ে উঠল, "এই মেয়ে, সমস্যা কি তোর?" আচমকা আবির ভাইয়ের কণ্ঠ শুনে চমকে উঠে মেঘ। আবিরের রাগান্বিত মুখবিবর দেখে ভ*য়ে দু-পা পিছিয়ে মাথা নিচু করে নরম স্বরে বলল, "কোনো সমস্যা নেই। " আবির দ্বিতীয় বারের মতো চিৎকার দিয়ে উঠল, "তুই কি পড়াশোনা করবি নাকি করবি না?" মেঘের মাথায় কিছুই ঢুকছে না। আবির ভাইকে বাসায় আসতে বলার সাথে মেঘের পড়াশোনার কি সম্পর্ক। জান্নাত আপুর নেয়া পরীক্ষাতেও তো ভালোই মার্ক পায় তাহলে আবির ভাই এমন কেন করছেন। মেঘ ঢোক গিলে ছোট করে বলল, "করবো। " আবির রাগান্বিত কণ্ঠে বলল, "লোক দেখানো পড়াশোনা করার কোনো দরকার নেই। এটা তোর জন্য লাস্ট ওয়ার্নিং, যদি তুই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স না পাস তাহলে তোর পা দুটা ভেঙে ঘরে বসাইয়া রাখবো। পড়াশোনা যদি করতে চাস তাহলে চান্স পাইতে হবে আর না হয়..." এটুকু বলেই আবির থামলো, চোখে মুখে এক রাশ বিরক্তি আর ক্রো-ধ। এক সেকেন্ড না দাঁড়িয়ে চলে যায়, মেঘের টেবিলের পাশে থাকা কাঠের চেয়ারে সজোরে লা*থি দিয়ে রুম থেকে বেরিয়ে পরেছে। লা*থি টা চেয়ারে দিলেও কেঁ*পে উঠেছে অষ্টাদশীর সর্বা*ঙ্গ। মাথায় ঢুকছে না কিছুই। কি এমন হলো যে আবির ভাই এতটা রে*গে আছেন। বাসায় ফেরার কথা বলে কি ভুল করে

ফেলেছি, ওনি কোথায় ই বা গেছিলেন । মেঘ কিছুক্ষণ পর রুমের দিকে পা বাড়ায়, চেয়ারটা ফ্লোরে পরে আছে। মেঘ চেয়ার টা তুলে ঠিকমতো রাখতে গেলেই চোখে পরে খাতাটা। ফ্যানের বাতাসে খাতার পৃষ্ঠাগুলো উড়ছে। মেঘ সঙ্গে সঙ্গে খাতা তুলে নেয় হাতে। খাতা জুড়ে আবির ভাই লেখা দেখে কলিজা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। বিড়বিড় করে বলছে, "স*র্বনা*শ, এই খাতা কি আবির ভাই দেখে ফেলেছেন?" তখনই আবির আবার রুমে আসছে। ফ্যান বন্ধ করে মেঘের হাত থেকে খাতাটা এক টানে নিয়ে, হাতে থাকা লাই*টার দিয়ে আ*গুন জ্বালিয়ে দিয়েছে। মেঘ বিস্ময়কর দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে, বিশালাকার চোখে সেই আ*গুন স্পষ্ট প্রতীয়মান হচ্ছে। আগুনের মাত্রা বাড়তে শুরু করেছে, তাই আবির খাতা ছেড়ে দিয়েছে। ফ্লোরে খাতা টা পরতেই আ*গুন দ্বি*গুণ বেড়ে গেছে। আবির সেই আগুনের দিকে তাকিয়ে থেকে রাশভারি কণ্ঠে বলল, "ভবিষ্যতে এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটলে, তার ফলাফল টা আরও বেশি ভ*য়ানক হবে। মনে থাকে যেন।" আবির চলে গেছে। মেঘ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে সেই আ*গুন দেখে তারপর সেখানেই বসে পরেছে। নির্বাক চোখে চেয়ে আছে পুড়া খাতার অবশিষ্ট অংশের পানে। আবির শুধু খাতায় পুড়ায় নি পুড়িয়েছে অষ্টাদশীর হৃদয়ে বাড়তে থাকা ভালোবাসাকে। আবির কিছু না বলেও বুঝিয়ে দিয়েছে, আবিরকে ভালোবাসার যোগ্যতা মেঘের নেই। আবির ভাইয়ের ক্রো*ধিত আঁখিতে অষ্টাদশীর কোমল মন ঝলসে গেছে। চোখ বেয়ে আজ এক ফোঁটা পানিও পরছে না কেমন যেনো পাথরের ন্যায়

বসে আছে। এক সপ্তাহ পর শুক্রবার সন্ধ্যেতে আবির বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিতে বেরিয়েছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই তানভির হাজির হলো সেখানে। আজ তানভিরের তেমন কাজ নেই। বন্ধুদের সাথে ঘুরাঘুরি করেছে, বিকেলের দিকে এমপির বাড়ি থেকেও ঘুরে এসেছে। কি করবে ভেবে না পেয়ে বড় ভাইদের সাথে আড্ডা দিতে আসছে। তানভির হাসিমুখে সবার সাথে হ্যান্ডসেক করে একটা চেয়ার টেনে বসলো। সবাই তানভিরকে পেয়ে গণহারে প্রশ্ন করা শুরু করেছে। নির্বাচন নিয়ে, তানভিরের কাজ নিয়ে, এমপির কর্মসূচি নিয়ে। তানভির যা জানে সব উত্তর ই ঠিকঠাক মতো দিচ্ছে। আবির চুপচাপ বসে বসে ফোন চাপছে। আড্ডার কেন্দ্রবিন্দু তানভির হওয়ায় মেঘের টপিক উঠতে বেশি সময় লাগলো না। এতদিন সবাই তানভিরকে আবিরের ছোট ভাই হিসেবেই সম্বোধন করে এসেছে। রাকিব সব জানলেও বরাবরই সে ভদ্র মানুষ ছিল। তবে এখন সবাই মেঘের কথা জানে। মেঘ আর আবিরের কথা জানার পর আজই তানভিরকে পেয়েছে। তাই সবাই নতুনভাবে তানভিরের সাথে পরিচিত হচ্ছে। কথার কথা লিমন বলে উঠল, ” তানভির, তুই তোর বোনকে আবিরের কাছে বিয়ে দিতে রাজি হয়েছিস কেন?” তানভির আবিরের দিকে তাকিয়ে স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, “আমার বিশ্বাস, ভাইয়া আমার বোনকে সারাজীবন রাজরানী করে রাখবে। আমার বোনের জীবনে যত ঝড় ই আসুক না কেন, ভাইয়া সবসময় তার সামনে ঢাল হয়ে দাঁড়াবে। ভাই হিসেবে এর থেকে বেশি আমি কি চাইবো?” রাসেল সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল,

“আমার একটা প্রশ্ন আছে।” তানভির বলল, “বলো ভাইয়া।” রাসেল একটু ভেবে বলল, “এইযে তুই আবিরকে ভাইয়া ডাকিস, তোর বাকি ভাই বোনেরাও আবিরকে ভাইয়া ডাকে, তাহলে মেঘ কেনো ভাইয়া ডাকে না?” তানভির স্ব শব্দে হেসে উত্তর দিল, “তোমার কি মনে হয়, বনু ডাকে নি? সত্যি বলতে বনু আমায় ভাইয়া বলে অভ্যস্ত হয়ে গেছে তাই ভাইয়াকে শুধু ভাইয়া ডাকতে পারে না। ভাইয়া দেশে ফেরার পর প্রথম প্রথম বনু ভাইয়াকে একবার “আবির ভাইয়া”, একবার “আবির ভাই”, এমন করে ডাকতো। একদিন বড় আম্মুর সামনে আবির ভাই বলায় বড় আম্মু বললেন, ভাইয়ের নাম ধরে ডাকিস না, বড় ভাইয়া বলে ডাকবি। ” লিমন বলল, “পরে?” তানভির আবিরের দিকে একবার তাকালো। আবির চুপচাপ বসে আছে। কারণ সে ভালো করেই জানে তানভির আসলে বন্ধুরা আবিরের কুকীর্তি জানতে চাইবেই। আবিরকে চুপচাপ থাকতে দেখে তানভির একটু সাহস নিয়ে পুনরায় বলা শুরু করলো, পরে আর কি, বনু কিছু বলার আগে ভাইয়াই চিৎকার দিয়ে উঠছে। ভাইয়া বলে, “ভাইয়া ডাকার কোনো প্রয়োজন নাই, যা ডাকছে তাই ডাকুক।” বড় আম্মু এখান থেকে যাওয়ার পর বনু মজা করে বলছে, “আবির ভাইয়া...” ভাইয়া সঙ্গে সঙ্গে বলে, “ভুলেও যদি আর একবার ভাইয়া ডাকিস তাহলে এমন থা*প্পড় দিব, জীবনের মতো ভাইয়া ডাক বন্ধ হয়ে যাবে।” সেই থেকে বনু আবির ভাই বলেই ডাকে। ” সবাই আবিরের দিকে চেয়ে হাসছে। লিমন আবিরকে উদ্দেশ্য করে বলে, ” ভাই ডাক শুনতে কেমন লাগে

বন্ধু?” আবির বিরক্তি নিয়ে উত্তর দিল, “ভাই ডাকটা অনেক কষ্টে সহ্য করে নিয়েছি। কিন্তু ভাইয়া ডাক সহ্য করতে পারবো না। ” রাকিব তানভিরের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, “এমপির মেয়ের কি খবর রে? এখনও কি উল্টাপাল্টা কিছু বলে?” তানভির স্বাভাবিক কণ্ঠে উত্তর দিল, “মেয়ে ভালোই আছে। তবে ইদানীং আরেকটা কথা বলছে যেটা আমি ভাইয়াকেও বলি নি। ” আবির ভ্রু কুঁচকে প্রশ্ন করল, “কি বলছে?” তানভির ঢোক গিলে আস্তে করে বলল, “এমপির মেয়ের বনুরে অনেক ভালো লাগছে। ” আবির কপাল কুঁচকে, গম্ভীর কণ্ঠে বলল, ” তো?” তানভির আস্তে করে বলল, “এমপির ছেলের বউ মানে এমপির মেয়ে ভাবি বানাতে চাই। ” আবির বসা থেকে উঠে রাগান্বিত কণ্ঠে শুধালো, “কি?” তানভির চেয়ার থেকে উঠে দৌড়ে গিয়ে রাকিবের পেছনে লুকাইছে। রাকিব ও দাঁড়িয়ে পরেছে। লিমন আর রাসেল সঙ্গে সঙ্গে আবিরকে ধরেছে। তানভির রাকিবের পেছন থেকে উচ্চস্বরে বলে উঠল, “তুমি এভাবে আমায় মা*রতে পারো না, ভুলে যেয়ো না আমি তোমার সম্বন্ধী হয়। ” আবির রা*গে ফুঁসতে ফুঁসতে বলল, “এই কথাটা মাথায় রাখি বলেই আজ পর্যন্ত তুই আমার হাতে মাই*র খাস নি। ” রাকিব হাসতে হাসতে বলছে, “তানভির তোর ভাগ্য ভালো। শা*লা হলে যে কি দশা হইতো তোর। আল্লাহ ভালো জানেন। ” আবির রাগান্বিত কণ্ঠে বলল, “তানভির, তোরে আমি আগেই না করছিলাম মেঘরে ঐ বাড়িতে নেয়ার দরকার নেই। তুই জোর করছিলি বলে আমি নিছিলাম। এমপির মেয়েরে এমনেই সহ্য

হয় না। এখন আবার ভাই। ছেলের নাম কি, কই পাবো এটা বল শুধু! ” তানভির ঠান্ডা কণ্ঠে বলল, “ছেলে UK তে থাকে, ছেলে এসবের কিছুই জানে না। এমপির মেয়ের ই ভালো লাগছিল। আমি না করে দিছি। বলছি বনু তোমার বউ। কাহিনী যেনো না বাড়ায়। ” আবির গম্ভীর কণ্ঠে শুধালো, “আমায় আগে বলিস কি কেনো?” তানভির তখনও রাকিবের পেছনেই লুকিয়ে আছে। ধীর কণ্ঠে বলল, “এখানে ৪ জনের সামনে বলেই জান বাঁচানো কষ্টকর হয়ে যাচ্ছে, বাড়িতে আমায় একা পেয়ে মাই*র যে দিবা না তার কি গ্যারান্টি আছে! ” আবির কন্ঠ দ্বিগুণ ভারি করে বলল, “এমপির মেয়েটা যদি ছেলে হইতো তাহলে এর খবর আছিল। এমপির ছেলে দেশে ফিরলে জানাইস তো। ” তানভির চিন্তিত স্বরে বলল, “কেন মা*রবা নাকি? কিন্তু ছেলে তো কিছুই জানে না!” আবির স্বাভাবিক কণ্ঠে উত্তর দিল, ” সেটা সময় বলে দিবে। ” আরও ঘন্টা দুয়েক আড্ডা দিয়ে ১০ টার পরে বাসায় ফিরেছে দুই ভাই। মেঘের জন্য খাবার নিয়েছে। তবে সেই খাবার আজ আর আবির দেয় নি। তানভির কে দায়িত্ব দিয়ে আবির নিজের রুমে চলে গেছে। আবির চাইছে মেঘ তার সর্বোচ্চ চেষ্টা টা করুক। আবিরের জন্য যেনো মেঘের পড়াশোনায় কোনো সমস্যা না হয়। মেঘকে শক্ত আর স্বাভাবিক করতেই আবিরের এত কঠিন পদক্ষেপ নেয়া। অবশেষে আজ সেই কাঙ্ক্ষিত দিন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা। মেঘ সকাল সকাল রেডি হয়ে নিচে নামলো। পরীক্ষায় কান ঢাকা নি*ষেধ এজন্য হিজাব পরে

নি আজ। খেতে বসেছে ঠিকই কিন্তু খাবার গলা দিয়ে নামছে না। প্রিপারেশন আলহামদুলিল্লাহ কিন্তু মাত্রাতিরিক্ত দুশ্চিন্তায় গত দু-রাত ঘুমাতে পারে নি। গতকাল রাতেই ঠিক হয়েছে, গাড়ির থেকে বাইকে গেলে সুবিধাজনক হবে তাই তানভির মেঘকে পরীক্ষার হলে নিয়ে যাবে। কিন্তু সকাল থেকে তানভিরের হদিস নেই। এখনও ঘুম থেকেই উঠে নি। ইকবাল খান যেই না তানভির কে ডাকতে যাবে তখনই চোখে পরলো আবির রেডি হয়ে নামছে। ইকবাল খান আবিরকে দেখেই উচ্চস্বরে বলে উঠলেন, "কিরে আবির তুই কোথাও যাচ্ছিস নাকি?" আবির স্বাভাবিক কণ্ঠে উত্তর দিল, "তানভির একটু অসুস্থ, বললো মেঘকে আমি নিয়ে যাইতে। যেহেতু আজ শুক্রবার তাই ভাবলাম নিয়েই যায়। " মোজাম্মেল খান বলে উঠলেন, "ভালোই হয়েছে। ঐ ছেলেরে দিয়ে কোনো বিশ্বাস নাই। দেখা গেল যাইতে যাইতে পরীক্ষা শেষ হয়ে যাবে। তার থেকে ভালো তুই ই নিয়ে যা। " আবির মৃদু হাসলো। মালিহা খান ছেলেকে ডেকে বললেন, "তোকে খেতে দিব ?" আবির খাবে না বলে বেড়িয়ে গেছে। কিছুক্ষণের মধ্যে মেঘও বেড়িয়েছে। সবাই গেইট পর্যন্ত মেঘকে বুঝাতে বুঝাতে এগিয়ে দিয়ে এসেছে। এক ঘন্টার মধ্যে উপস্থিত হলো পরীক্ষার কেন্দ্রে। চারপাশে অসংখ্য শিক্ষার্থী আর তাদের সাথে অভিভাবক, শুধু বন্ধুরা মিলেও পরীক্ষা দিতে এসেছে। কেউ কেউ রাস্তার পাশে বসে পড়তে ব্য*স্ত। মেঘ আশেপাশের পরিবেশ দেখে আরও বেশি শঙ্কিত হয়ে যাচ্ছে । এখনও গেইট খুলা হয় নি। মেঘ আশেপাশে এত এত

শিক্ষার্থী দেখতে ব্যস্ত । অথচ আবির মেঘের দিকে তাকিয়ে আছে। আবির হঠাৎ ই শীতল কণ্ঠে ডাকলো, “মেঘ!” মেঘ আবিরের মুখের পানে তাকিয়ে উত্তর দিল, “জ্বি। ” আবির অকস্মাৎ দু-হাতে আলতোভাবে মেঘের দু-গাল স্পর্শ করে মেঘের চোখে চোখ রেখে নিরেট কণ্ঠে বলল, “আমি গর্ভ করে বলতে পারি, এখানে উপস্থিত হাজার হাজার শিক্ষার্থীর মধ্যে আমার মেঘ সবচেয়ে বেশি বুদ্ধিমতী। পরীক্ষা শেষে আমি তোর মুখে সেই অকৃত্রিম হাসিটা দেখতে চাই,যেই হাসিটা শুধুই বিজয়ের। আমার বিশ্বাস তুই পারবি। ” মেঘ নির্বাক চোখে তাকিয়ে আছে আবিরের মুখবিবরে। মেঘকে ছেড়ে একটু দূরে সরে আবির পুনরায় বলল, “টেনশন করিস না, বের হয়ে সোজা এখানে আসবি। আমি এখানেই থাকবো। ” ততক্ষণে গেইট খুলে দিয়েছে। হাজার হাজার পরীক্ষার্থীর ভিড়ে মেঘও কেন্দ্রে ঢুকে গেছে। আবির বাহিরে অপেক্ষা করছে, পরীক্ষা মেঘের হলেও চিন্তা সব আবিরের। তার প্রথম আর একমাত্র চিন্তা অসময়ে দেশে ফেরা। ভেবেছিল ভর্তি পরীক্ষা শেষে ফিরবে কিন্তু জয়ের জন্য তা আর হলো কই। দেশে ফেরার পর থেকে একটায় চিন্তা আবিরের জন্য মেঘের না কোনো সমস্যা হয়। ৩ মাস যাবৎ কত কৌশলই না অবলম্বন করছে মেঘকে শক্ত করতে। আজকের পরীক্ষাতেই বুঝা যাবে আবির কতটুকু সফল আর কতটুকু ব্য*র্থ।কিছুক্ষণ হলো পরীক্ষা শেষ হয়েছে। এত এত পরীক্ষার্থীর ভিড়ে আবিরের দৃষ্টি খোঁজছে সেই কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তিকে । অবশেষে চোখ পরে তার অষ্টাদশীর পানে। দ্রুত পায়ে এগিয়ে আসছে,

মুখে তার তৃপ্তির হাসি, খুশিতে জ্বলজ্বল করছে দুই আঁখি। এক নিমিষেই আবিরের দুশ্চিন্তা উধাও হয়ে গেছে। মেঘ কাছাকাছি এসে খুশিতে গদগদ হয়ে বলল, "আলহামদুলিল্লাহ, পরীক্ষা ভালো হয়েছে। " সঙ্গে সঙ্গে প্রশস্ত হলো আবিরের দুই ওষ্ঠ। ঠান্ডা কণ্ঠে বলল, "আলহামদুলিল্লাহ। " বাসায় কল দিয়ে সবার সাথে কথা বলেছে। আবির মেঘের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, " এখন কি বাসায় যাবি?" বাসায় যাওয়ার কথা শুনেই মেঘের মনটা খারাপ হয়ে গেছে। ২৪ ঘন্টা বাসায় থাকতে থাকতে বির*ক্ত হয়ে গেছে। কোচিং এ যাওয়া ব*ন্ধ হওয়ার পর শুধু একদিন ভাই বোনদের সাথে ঘুরতে বের হয়েছিলো। সেই থেকে বলতে গেলে ঘরবন্দী। মেঘের মন খারাপ দেখে আবির পুনরায় প্রশ্ন করল, "ঘুরতে যাবি?" সহসা মেঘ হাসিমুখে আবিরের দিকে তাকিয়েছে। কিন্তু হাসিটা কয়েক সেকেন্ডেই গায়েব হয়ে গেছে। মনে পরে গেল কিছুদিন আগের খাতা পুড়ানোর ঘটনা। যার মনে মেঘের জন্য বিন্দু মাত্র জায়গা নেই, তার সাথে কথা বলায় বেমানান । ওনার নাম লেখাতে যেই মানুষটা কয়েকমিনিটের মধ্যে সম্পূর্ণ খাতা পু*ড়িয়ে ফেলেছেন, সেই মানুষটার থেকে দূরে থাকায় শ্রেয়। মেঘ মাথা নিচু করে উত্তর দিল, "না বাসায় চলে যাব।" আবির কপাল কুঁচকে কেমন করে চেয়ে আছে। আবির খুব ভালো করেই বুঝতে পারছে, তার অষ্টাদশী অভিমান করে আছে । আবির গম্ভীর কণ্ঠে বলল, "আগে চল খেতে যায়। তোর জন্য তাড়াহুড়োতে সকালে না খেয়ে বের হয়ছি। খুব খুদা লাগছে। " আজ শহর জুড়েই জ্যাম।

পরীক্ষার্থীদের ভিড়ে গাড়ি এক জায়গাতেই ঘন্টার পর ঘন্টা আটকে আছে। মেঘকে নিয়ে নাস্তা করে বেড়িয়েছে। ১ ঘন্টায় বিশাল জ্যাম পেরিয়ে বাইক ছুটছে নিরুদ্দেশের পথে। মেঘ দুবার জিজ্ঞেস করেছে, " কোথায় যাচ্ছি? " কিন্তু আবির কোনো উত্তর দেয় নি। ঘন্টাখানেকের মধ্যে পৌঁছে গেছে এক অপরূপ সুন্দর জায়গায়। উত্তরা ১৫ নম্বর সেক্টরের সুপরিচিত সেই জায়গার নাম দিয়াবাড়ি। দিয়াবাড়ি সবসময় ই বেশ জনপ্রিয়। তবে শরৎকালে কাশফুলের শুভ্রতায় এই স্থানের মাধুর্যতা কয়েকগুণ বেড়ে যায়। আকাশে যেমন সাদা মেঘেরা ঘুরে বেড়াচ্ছে তেমনি প্রকৃতি জুড়েও সাদার মেলা। মুগ্ধ আঁখিতে কাশফুল দেখছে মেঘ। কাশফুলের শুভ্রতায় মেঘের মন ফুরফুরে হয়ে গেছে। গুটিগুটি পায়ে এগিয়ে গিয়ে, আলতো হাতে কাশফুল ছুঁয়ে দিচ্ছে। এদিকে আবির বাইকে হেলান দিয়ে দুর্বোধ্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে সেই দৃশ্য দেখছে। মুহুর্তেই আবিরের ঠোঁটের কোণে হাসির ঝলক দেখা গেল। আনমনে বলে উঠল , "মানুষ শুধু শরতে কাশফুলের মায়ায় পড়ে, অথচ আমি প্রতিদিন,প্রতিক্ষণ শুধু তোর মায়ায় পড়ে থাকি।" মেঘের মনে আনন্দের সীমা নেই। আনন্দ হবে নাই বা কেনো। ঢাকা শহরে থেকেও এত বছরে কোনোদিন এই জায়গায় আসতে পারে নি। শুধু দুএকবার নাম ই শুনেছে। বাবা-কাকারা ব্যবসার কাজে এতই ব্যস্ত থাকেন যে, সবাইকে নিয়ে ঘুরতে যাওয়ার সময় ই নেই কারো। কাকামনি মাঝে মাঝে মেঘ, মীম আর আদি কে নিয়ে বের হলেও সেটা ৩ মাসে একবার। অথচ আবির দেশে ফিরেছে

সবেমাত্র ৪ মাস হবে। এই অল্প সময়েই আবির মেঘকে নিয়ে ঢাকার আশেপাশে সব জায়গা ঘুরে ফেলেছে। অবশেষে আজ কাশফুলের রাজ্যেও নিয়ে আসছে, ভাবতেই পারছে না মেঘ। আবির মেঘকে বুঝতে না দিয়ে, মেঘের বেশকিছু ছবি তুলেছে।ফোন পকেটে রেখে, কতগুলো কাশফুল একসাথে এনে মেঘের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, "তোর কিছু ছবি তুলে দিব?" মেঘ আবিরের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেললো। সেও মনে মনে ভাবছিল, মোবাইল টা নিয়ে আসলে ছবি তুলতে পারতো। কিন্তু আবির ভাইকে এই কথা বলার সাহস পাচ্ছিলো না। আবির মেঘের মনের কথা বলে ফেলেছে, তাই না চাইতেও মেঘ হেসে ফেলেছে । আবির কয়েকটা ছবি তুলে দিয়েছে, ছবিগুলো দেখে মেঘ স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, "ধন্যবাদ, আমরা কি এখন চলে যাব?" আবির ভ্রু কুঁচকে বলে উঠল, "এত স্বা*র্থপর কেন তুই?" মেঘ চোখ বড় করে তাকিয়ে শুধালো, "মানে?" আবির বিরক্তির স্বরে বলল, "এইযে এত কষ্ট করে এতদূর নিয়ে আসলাম তোকে,ছবিও তুলে দিলাম। একটা বার বলতে তো পারতি,দেন আপনাকে দুটা ছবি তুলে দেয় বা একটা সেলফি অন্তত তুলি। যেই নিজের ছবি তুলা শেষ ওমনি বাসায় যায় গা, স্বা*র্থপর একটা। " "আমি স্বা*র্থপ*র হলে আপনি হি*টলা*র। " মুখের উপর মেঘ জবাব দিয়ে ফেলছে। আবির কপালে কয়েক ভাঁজ ফেলে, ভারী কণ্ঠে বলল, "আমি হি*টলা*র হলে তুই হি*টলা*রের নানী । " এ যেনো বিতর্ক প্রতিযোগিতা চলছে। মেঘ ভেঙচি কেটে বলল, "জীবনেও না। আমি আপনার মতো এত পা*ষাণ

না। ” এ কথা শুনে আবির হেসে ফেললো। আচমকা হাসাতে মেঘ বিস্ময় সমেত তাকিয়েছে। মেঘ ভেবেছিল আবির ভাই হয়তো রে*গে যাবেন। কিন্তু ওনি হাসছে দেখে বেশ অবাক হয়েছে। আবির গলা খাঁকারি দিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে বলা শুরু করল, “সামান্য একটা কারণে গত ৯ বছর তুই আমার সাথে কথা বলিস নি। তুই ভুল করলে, বড় ভাই হিসেবে কি তোকে শা*স্তি দেয়ার অধিকার ছিল না আমার ? এইযে এতগুলো বছরে একটা বার কথা বলিস নি আমার সাথে, তখন একবারের জন্যও কি নিজেকে পা*ষাণ মনে হয় নি তোর? হয়তো দেশে না ফিরলে এখনও কথা বলতি না। একবারও মনে হয়নি, এই মানুষটার সাথে কথা বলা উচিত? তোর এই অসীম দূরত্বে সেই মানুষটারও খারাপ লাগতে পারে, ভেবেছিস কখনো? ভাবিস নি!” মেঘ শান্ত চোখে তাকিয়ে আছে। ওষ্ঠদ্বয় কাঁপছে তিরতির করে। আবির ভাইয়ের সাথে এতবছরে একবারের জন্য ও কথা বলতে ইচ্ছে হয় নি তার। অথচ ওনাকে দেখার পর, ওনার ভারী কণ্ঠে বলা একেকটা কথা, অনুভূতিহীন আচরণ, ক্রো*ধিত আঁখি, তাকানোর স্টাইল, ঘন কালো চুল আর গাল ভর্তি ছোট ছোট দাঁড়ি দেখে ধীরে ধীরে প্রেমে পড়তে বাধ্য হয়েছে। আবির ভাই তো দেশে ফিরে আবারও থা*প্পড় দিয়েছে তাকে । কই এবার তো সে কথা বন্ধ করে নি। রা*গ, অভি*মান শেষে ঠিকই বার বার কথা বলেছে। এইযে সেদিন খাতা পুড়ালো তারপরও আজ সেই মানুষটার সাথেই ঘুরতে এসেছে। তাহলে এত বছর কেনো কথা বলতে ইচ্ছে হয় নি তার? মেঘ কিছু

বলছে না দেখে আবির বাইকের দিকে চলে যাচ্ছিলো। মেঘ আচমকা বলে উঠল, “আপনার সাথে একটা ছবি তুলা যাবে?” আবির মুচকি হেসে উত্তর দিল, “Why not ” ঘুরাঘুরি শেষে বাসায় ফিরছে। মেঘের হাতে অনেকগুলো কাশফুল। তার খুব ইচ্ছে করছে এগুলো বাসায় নিয়ে মীম আর আদিকে দেখাবে। কিন্তু আবিরের ক*ড়া নি*ষেধ বাসায় নেয়া যাবে না।বাধ্য হয়ে মানতে হলো আবির ভাইয়ের কথা। রাস্তায় ২ টা পিচ্চি মেয়েকে ফুলগুলো দিয়ে বাসায় চলে আসছে। সময় চলছে নিজস্ব গতিতে। মেঘের পড়াশোনার অন্ত নেই। সবেমাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা শেষ হলো। সামনে মেডিকেল পরীক্ষা। পড়ার চাপ যতটা মেঘের, ঠিক ততটায় জান্নাতের। প্রতিদিন ৩-৪ ঘন্টা সময় নিয়ে পড়ানো। নিজে প্রশ্ন করে মেঘের পরীক্ষা নেয়া, সেগুলোর সমাধান করা। ১৫ দিনের মাথায় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা। যতদিন না মেঘ চান্স পাচ্ছে ততদিন চলবে এই লড়াই। সপ্তাহ খানেক পরই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক ইউনিটের ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। মেঘের সিরিয়াল আসছে। সেই খুশিতে খান বাড়িতে উৎসব চলছে। প্রতিটা মানুষ ই মহাখুশি, তবে মোজাম্মেল খান তেমন খুশি না। কারণ ওনার ইচ্ছে মেঘ মেডিকেলে পড়বে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি ওনার আগ্রহ নেই বললেই চলে। বাড়ির সবাই হৈ চৈ করছে দেখে এক সময় ধ*মক দিয়েই বসলেন, “মেডিকেল পরীক্ষা এখনও হয় নি। এত খুশি হওয়ার কিছু নেই। সামনে পরীক্ষা। পড়তে বসো গিয়ে। ” আবির রুমের বাহিরে বেলকনিতে দাঁড়িয়ে নিচে সবার হৈ-

হুল্লোড় দেখছিল। তবে মোজাম্মেল খানের ধ*মকে আজ আবিরের রা*গ হচ্ছে না। বরং মেঘের চান্স পাওয়ার খুশিতে এসব সামান্য বিষয়কে সে পাত্তায় দিচ্ছে না। কিন্তু মোজাম্মেল খানের ধম*কে মেঘের মন খারাপ হতে সময় লাগলো না। সিঁড়ি দিয়ে উঠে নিজের রুমে যেতে গিয়ে আবিরকে দেখেই থ*মকে দাঁড়ালো। শীতল চোখে তাকালো একবার। হয়তো বুঝতে চেয়েছিলো রেজাল্ট এর কথা শুনে আবির ভাই খুশি হয়েছেন কি না! কিন্তু আবিরের অভিব্যক্তি বুঝা গেল না। তাই মাথা নিচু করে মেঘ রুমে চলে গেছে। মেঘের পড়া যেমন থেমে নেই তেমনি জান্নাত আপুর ও ছুটি নেই। কিছুদিন পর মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা দিলো। এবার আর আবির নিয়ে যায় নি। মোজাম্মেল খান নিজে গাড়ি করে মেয়েকে নিয়ে গেছেন। পরীক্ষা যেমন ই হয়েছে,রেজাল্টের অপেক্ষায় আছে সবাই। কিছুদিন পর একদিন আবির আর রাকিব অফিসে কাজ করছিলো। হঠাৎ রাসেল ছুটে এসে উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, “কিরে আবির মেঘ কি চান্স পাইছে?” আবির ল্যাপটপের দিকে তাকিয়ে থেকেই উত্তর দিল, “DU তে হয়ছে, জগন্নাথে ওয়েটিং। কেন?” রাসেল পুনরায় বলল, “আরে ভার্সিটি না। মেডিকেলে চান্স পাইছে কি না জিজ্ঞেস করছি। ” আবির অবাক চোখে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, “রেজাল্ট দিয়ে দিছে নাকি?” রাসেল সহসা উত্তর দিল, “হ্যাঁ, মাত্র দেখলাম। এজন্যই তো তোকে জিজ্ঞেস করতে আসছি।” আবির তাড়াতাড়ি ফোন বের করে নেটে রেজাল্ট দেখল, অকস্মাৎ আবিরের মুখটা মলিন হয়ে গেলো। রাকিব জিজ্ঞেস

করল, " কি হলো, চান্স পায় নি?" আবির ভারী কণ্ঠে উত্তর দিল, "সরকারি তে আসে নি, প্রাইভেটে পড়তে পারবে।" আবির সঙ্গে সঙ্গে তানভির কে কল দিয়েছে। তানভির বাসায় নেই। আবির বসা থেকে উঠে রুমের মধ্যে পায়চারি শুরু করেছে। কি করবে বুঝতে পারছে না। বাসায় কি চলছে কে জানে! হঠাৎ ই মীমের কথা মনে পড়লো । তাড়াতাড়ি আকলিমা খানের নাম্বারে কল দিয়েছে। প্রথম কলটায় রিসিভ করলো মীম। মায়ের ফোন বেশিরভাগ সময় মীমের কাছেই থাকে। মীম আর আদি মিলে গেম খেলে। মীম কল রিসিভ করেই সালাম দিলো। আবির সালামের উত্তর দিয়ে ভারী কণ্ঠে বলল, "বাসার কি অবস্থা? " মীম চিন্তিত স্বরে বলল, "চাচ্চু আপুকে ব*কতেছে। আম্মু আর মামনি মিলেও থামাতে পারছে না। আব্বু, বড় আব্বু, বড় আম্মু কেউ বাসায় নেই। আমাকে আর ভাইকেও ধ*মকে রুমে পাঠিয়ে দিয়েছে। " আবির আর কিছু না বলেই কল কেটে দিয়েছে। তৎক্ষনাৎ বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিল। আবির সেদিনই চাচ্চুর মনের কথা বুঝেছিল। এই ঝামেলা টা হওয়ার ই ছিল, কিন্তু আজ রেজাল্ট দিবে এটা আবিরের জানা ছিল না।। জানলে হইতো আজ বাসা থেকে বের ই হতো না। বাইকের গতিই বুঝিয়ে দিচ্ছে ভেতরে ভেতরে আবির কতটা ক্ষি*প্ত। বাসার গেইট টা কোনোরকমে পেরিয়ে বাইক রেখে ছুটে গেছে অন্দরমহলে। ড্রয়িং রুমে সোফায় বসে আছেন মোজাম্মেল খান, ওনার পাশে হালিমা খান স্বামীকে শান্ত করার চেষ্টা করছে। সিঁড়ির পাশে ভীত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে মেঘ। চিবুক নেমে গলার সঙ্গে

মিশে আছে। কান্নার তোপে সামনেরদিকের চুলগুলো ভেজা গালে লেপ্টে আছে, দৃষ্টি তার ফ্লোরের দিকে। আকলিমা খান রান্নাঘরে। ভাসুর কে থামানোর সাধ্য নেই বলেই সরে পরেছেন। আলী আহমদ খান মালিহা খানকে নিয়ে ডাক্তার দেখাতে গিয়েছিলেন। এখনও ফেরে নি। ইকবাল খান হয়তো কোনো কাজে বেড়িয়েছেন। মোজাম্মেল খান তখনও রা*গান্বিত কণ্ঠে বলেই যাচ্ছেন, "তোকে এত আদর ভালোবাসা দিয়ে কি হলো। সরকারি মেডিকেলে চান্স টায় পাস নি। কত গর্ভ করে সবাইকে বলেছিলাম আমার মেয়ে মেডিকেলে পড়বে। এখন আমি কোন মুখে বলবো যে আমার মেয়ে চান্স পায় নি। তোকে...." এতটুকু বলতেই আবির উচ্চস্বরে বলে উঠল, "এই মেঘ রুমে যা। " আচমকা আবিরের কণ্ঠ শুনে মেঘ কিছুটা কেঁপে উঠল। মোজাম্মেল খানও থেমে গেলেন। মেঘ মুখ তুলে আবিরের দিকে তাকিয়েছে। কাঁদতে কাঁদতে চোখ লাল করে ফেলেছে। মোজাম্মেল খান বাসায় ফেরার পর থেকে মেঘকে ব*কেই যাচ্ছেন। ঘুরে ফিরে এক কথায় বার বার বলছেন, "এত আদরে থেকে, এত সুযোগ সুবিধা পেয়েও মেডিকেলে চান্স পাস নি। ছেলে যেমন ভ*ন্ড, মেয়েটাও এরকম ই হচ্ছে। সামান্য একটা ভর্তি পরীক্ষাতে চান্স পেতে পারে নি। এই থেকে শুরু করে আর যা যা বলার ছিল সবই বলেছেন।" অতিরিক্ত রা*গে মানুষের বুদ্ধি লোপ পায়। তখন যা বলে তার বেশিরভাগ ই অহেতুক আর বিবেকহীন কথা। মেঘ সিক্ত আঁখিতে আবিরের দিকে তাকিয়েই আছে। আবির নিরেট কণ্ঠে পুনরায় বলল,

“রুমে যেতে বলেছি তোকে।” মেঘ মাথা নিচু করে ফেলেছে। বাবার দিকে তাকানোর সাহস পাচ্ছে না। এতক্ষণ বাবার ধম*ক খেয়েছে এখন আবির ভাইয়ের ধ*মক খাওয়ার আর ইচ্ছে নেই। তাই ধীর পায়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগলো। আবির কয়েক কদম এগিয়ে সোফার কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়ে মোজাম্মেল খানের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে বলা শুরু করলো, ” যা হওয়ার তা হয়ে গেছে। এমন তো নয় যে, মেঘ চেষ্টা করে নি। আর এমনটাও নয় যে, সে পাশ করে নি। আপনার যদি পড়ানোর ইচ্ছে থাকে তাহলে এত এত প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ আছে। ঐখানের কোনোটাতে পড়াতে পারেন।” মেঘ রুমে যেতে যেতে আবিরের কথাগুলো শুনেছে।আবির ভাই যে বাপের ব*কার হাত থেকে মেঘকে বাঁচাতে এসেছে। এটা ভেবেই মেঘ অবাক হয়ে যাচ্ছে। কিছুদিন আগে ওনিই বলেছিলেন DU তে চান্স না পেলে পা ভে*ঙে ঘরে বসিয়ে রাখবেন। অথচ আজ সেই মানুষটার ভিন্ন রূপ। “একটা মানুষের কত রূপ ই না হতে পারে!” মোজাম্মেল খান রে*গে বললেন, “প্রাইভেটে পড়ানোর ইচ্ছে থাকলে মাস শেষে এত এত টাকা মেয়ের পড়াশোনার জন্য খরচ করতাম না। বাসা থেকে বের হলেই আশেপাশের মানুষ আমায় প্রশ্ন করবে, কেন চান্স পায় নি, কি বলবো আমি তখন?” আবির দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, “আপনি কি চাইছেন এখন? ঘন্টার পর ঘন্টা মেয়েটার উপর রা*গ ঝাড়লেই কি রেজাল্টে পরিবর্তন আনতে পারবেন? এডমিশন টেস্টের সময় একটা মানুষ এমনিতেই ডিপ্রেশনের মধ্যে দিয়ে সময় পার করে, সেখানে

তাকে এভাবে কথা শুনাচ্ছেন! আজ আপনার যতটা কষ্ট হচ্ছে। তার থেকেও হাজার গুণ বেশি কষ্ট হচ্ছে মেঘের । দিনরাত এক করে চান্স পাওয়ার জন্য পড়াশোনা সে করেছিলো। বাবা মা হিসেবে ওকে সাপোর্ট করাটা আপনাদের দায়িত্ব ছিল। কিন্তু কি বলবো, আপনারা তো সন্তানের থেকেও সমাজ কে বেশি প্রাধান্য দেন। " কথাগুলো বলে আবির সিঁড়ি দিয়ে উঠে যাচ্ছে। মোজাম্মেল খান নিশ্চুপ বসে আছেন। ভেতরে ভেতরে এখনও রা*গে ফুঁসছেন। কিন্তু আবিরের বলা কথাগুলোর প্রতিত্তোর ছিল না বলেই চুপ করে গেছেন। হালিমা খানও শান্ত স্বরে স্বামীকে বুঝাচ্ছেন। মেঘ বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে কাঁদছে। চুলগুলো এলোমেলো হয়ে ছড়িয়ে আসে। আবির একটু শব্দ করেই দরজা ধাক্কা দিল। কিন্তু মেঘের কোনো সাড়াশব্দ নেই। অবিরত কেঁদেই যাচ্ছে , এই কান্নার কোনো অন্ত নেই। আবির বিছানার পাশে বসে আস্তে করে ডাকলো, "মেঘ " সঙ্গে সঙ্গে মেঘ একটু থামলো। তারপর আবার কান্না শুরু করলো। আবির আলতোভাবে মাথায় হাত রেখেছে। এলোমেলো চুল গুলো কিছুটা গুছিয়ে স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, "তোর সাথে কথা আছে,উঠ। " মেঘ কাঁদতে কাঁদতে উত্তর দিল, "আমার সাথে কথা বলতে হবে না। আপনি চলে যান। " আবির গম্ভীর কণ্ঠে বলল, "তোর সাথে কথা না বলে আমি যাব না। আমি ১০ পর্যন্ত গুনবো, এরমধ্যে মুখ ধৌয়ে আমার সামনে এসে বসবি। " মেঘ তবুও নড়ছে না। আবির ভারী কণ্ঠে বলা শুরু করল, "এক....." "দুই....." মেঘ তড়িঘড়ি করে উঠে ওয়াশরুমে চলে গেছে। মেঘের এই তড়িঘড়ি

দেখে আবির মৃদু হাসলো। মেঘ ফ্রেশ হয়ে আবির মুখোমুখি বসেছে। আবির মোলায়েম কণ্ঠে শুধালো, “তুই কাঁদছিলি কেনো? চান্স পাস নি বলে নাকি চাচ্চু ব*কেছে তাই?” মেঘকে নিশ্চুপ থাকতে দেখে আবির আবার শুধালো, “তুই কি মেডিকেলে পড়তে চাস? পড়তে চাইলে বল। প্রাইভেটেই পড়াবো তোকে। কেউ রাজি না হলে, আমি তোকে পড়াবো। শুধু বল পড়তে চাস কি না। ” মেঘ মাথা নিচু করে উত্তর দিল, “জানি না। ” এই প্রশ্নের উত্তর নেই মেঘের কাছে। কারণ ছোটবেলা থেকে ভালো স্টুডেন্ট হওয়ায় JSC এর পর সবার মতো পরিবারের কথায় তাকেও সাইন্স নিতে হয়েছিল। আর সাইন্স নেয়া মানেই বাড়ির মানুষ ডাক্তার বানানোর স্বপ্ন দেখা শুরু করে। সবার স্বপ্ন কে বাস্তবায়ন করতেই এতদিন সে চেষ্টা করে এসেছে। আবির শ্বাস ছেড়ে ভারী কণ্ঠে বলা শুরু করলো, “দেখ, যদি এমন হয় ডাক্তার হওয়ায় তোর একমাত্র লক্ষ্য । তুই মন প্রাণ দিয়ে চাস ডাক্তার হতে। তাহলে তুই প্রাইভেটে পড়তে পারিস। প্রাইভেট থেকে পড়েও প্রতিবছর হাজার হাজার ভালো ডাক্তার বের হচ্ছেন। কিন্তু যদি মনে হয়,ডাক্তার হওয়া তোর একমাত্র স্বপ্ন নয়। তুই সাইন্স নিয়েছিস, আর আশেপাশের মানুষ চাইছে তুই ডাক্তার হ। শুধুমাত্র তাদের ইচ্ছে পূরণ করতে মনের বিরুদ্ধে তুই ডাক্তার হতে চাচ্ছিস,তাহলে আমি বলবো কোনো দরকার নেই। কারো কথায় বা কারো চাপে নিজের ইচ্ছে কে কখনোই মাটি চাপা দিবি না। তোর যেখানে পড়তে ইচ্ছে করে তুই সেখানেই পড়তে পারিস। কে কি বলবে সেটা আমি বুঝবো!” মেঘ

নির্বাক চোখে চেয়ে আছে আবির ভাইয়ের মুখের পানে। আবিরের বলা কথাগুলো শুনে মেঘের চোখ আবারও টলমল করছে। তার আব্বুও তো কথাগুলো এভাবে বলতে পারতো । আবির তপ্ত স্বরে পুনরায় বলল, "পৃথিবীর মানুষ কি ভাবছে তাতে আমার কিছু যায় আসে না। তোর ইচ্ছেটায় আমার কাছে সবচেয়ে মূল্যবান । দিনশেষে আমি তোর মুখে মিষ্টি হাসি দেখতে চাই। কারো কথায় নয়, নিজে সিদ্ধান্ত নিবি তুই কি চাস। আবারও বলছি, তুই যা চাস তাই হবে। " আবির চলে গেছে। আবিরের দেয়া সান্ত্বনা তে আর কিছু হলো কি না জানা নেই তবে মেঘের কা*ন্না থেমে গেছে। দীর্ঘসময়ের অশান্ত মন শান্ত হয়ে গেছে। তবে এখন নিচে যাওয়ার কোনো ইচ্ছে তার নেই। লাইট অফ করে শুয়ে শুয়ে ফোন চাপছিলো। বন্যার সাথে কথা হয় নি। বন্যাকে ২ বার কল দিয়েছে। কিন্তু কোনো খবর নেই। ফে*সবুকে ঘুরতে ঘুরতে আবির ভাইয়ের একটা ছবি সামনে আসছে। এতদিন পড়াশোনার চাপে আবির ভাইয়ের আইডিটাও ঘুরে দেখা হয় না। তাই আজ সময় নিয়ে আইডিতে ঘুরতেছে। হঠাৎ ই চোখে পরলো সামনে আবির ভাইয়ের জন্মদিন। মেঘ দিন গুনছে, আর মাত্র তিনদিন বাকি। কিভাবে কি করবে এসব ভাবতে ভাবতে রেজাল্টের চিন্তা মাথা থেকে চলে গেছে। তারপর কখন যে ঘুমিয়ে পরেছে কে জানে! কিছুক্ষণের মধ্যে মালিহা খান আর আলী আহমদ খান বাসায় ফিরেছেন। মেঘের মন খারাপ শুনে দেখতেও গিয়েছিলেন। কিন্তু মেঘ ঘুমাচ্ছে দেখে ডাকেন নি। ছোট বেলা থেকেই মেঘের ঘুম অনেক গভীর আর ঘুমের মধ্যে

মেঘকে ডাকলে মাথা ব্যথা করে। তাই সচরাচর কেউ ই ডাকে না। কিছুক্ষণ পর আবির মায়ের রুমে গেছে। কিছুদিন যাবৎ ই মালিহা খানের প্রেশার বাড়তি, মাথা ভার হয়ে থাকে, চোখে ঝাপসা দেখছিলেন। আবির মায়ের কাছে কিছুক্ষণ বসে, খাবার খাইয়ে তারপর ঔষধ খাইয়ে নিজের রুমে আসছে। এটুকু সময়ের মধ্যে আলী আহমদ খান রুমে আসেন নি। হয়তো বা দুই ভাই অন্য রুমে কথা বলছেন। ঘন্টাখানেক পর তানভির বাসায় ফিরেছে। আবিরের কাছ থেকে সবই শুনেছে। মেঘকে দেখতেও গিয়েছিল কিন্তু লাইট অফ দেখে সেও ডাকে নি। রুমে বসে কি করবে বুঝতে পারছে না। তখনই বন্যার নাম্বার থেকে কল আসছে। তানভির অবিশ্বাস্য চোখে তাকিয়ে কলটা রিসিভ করল, বন্যা বলল, "আসসালামু আলাইকুম। " তানভির উত্তর দিল, "ওয়ালাইকুম আসসালাম।" বন্যা চিন্তিত কণ্ঠে শুধালো, "আপনি কি বাসায়? মেঘ কোথায় বলতে পারবেন? এতগুলো কল দিচ্ছি রিসিভ করছে না তো তাই বাধ্য হয়ে আপনাকে কল দিলাম । " তানভির স্বাভাবিক কণ্ঠে জবাব দিল, "আমি বাসায়। বনু তো ঘুমাচ্ছে, মনে হয় ফোন সাইলেন্ট করা।" বন্যা আবার প্রশ্ন করলো, "মেঘের কি সরকারিতে চান্স হয়ছে?" তানভির ভারী কণ্ঠে উত্তর দিল, "না, প্রাইভেটে। তোমার?" বন্যা মন খারাপ করে বলল, "আমারও । " তানভির ধীর কণ্ঠে বলল, " চিন্তা করো না। যা হবে ভালোই হবে। DU তে তো তোমার ও চান্স হয়েছে শুনলাম। বনুরে বুঝাইয়া দুজনেই ভর্তি হয়ে পরো। হয়তো আল্লাহ চাচ্ছেন দুই বান্ধবী একসাথে থাকো।"

বন্যা মৃদু হেসে উত্তর দিল, “হয়তো বা। দোয়া করবেন। আল্লাহ হাফেজ। ” তানভির ও আল্লাহ হাফেজ বলে ফোন রেখে দিয়েছে।অনেক ভেবেচিন্তে মেঘ একটা প্ল্যান করেছে। আবির ভাইয়ের জন্মদিনের দিন ই সে আবির ভাইকে নিজের ভালোবাসা র কথা বলবে। হ্যাঁ হোক বা না সে এই লুকোচুরির সমাধান চাই। অষ্টাদশী যতটা উত্তেজিত ঠিক ততটায় আতঙ্কিত। মনটা শুধু কু গাইছে। সকাল থেকে বন্যা কে কম করে হলেও ১০০ বার কল করেছে। মেঘ বিশাল এক লিস্ট তৈরি করেছে কিন্তু শপিং করতে সে যাবে কিভাবে! গতকাল ই রেজাল্ট দিল। এই অবস্থায় শপিং এ যাবে বললে আব্বু কি করবে আল্লাহ জানেন। আলী আহমদ খান আর মালিহা খান সকাল থেকে বেশ কয়েকবার মেঘকে বুঝিয়ে গেছেন। কিন্তু সেসব শুধুই পড়াশোনা নিয়ে। শপিং এ যেতে দিবে কি না! আবার যেতে দিলেও যদি আম্মু বা বড় আম্মু সঙ্গে যায় তাহলে তো আবির ভাইয়ের জন্য কিছুই নিতে পারবে না সে। বিকেলের দিকে আবারও বন্যা কে কল দিয়েছে। মেঘঃ আমি কি করবো বল না, প্লিজ। বন্যাঃ তোকে তো বললাম, তুই বাসা থেকে বের হলে আমায় জানাইস আমি শপিং এ যাব তোর সাথে । কিন্তু বাসায় বসে থেকে কি করব, কি করব করিস না। মেঘঃ বাসা থেকেই তো বের হতে পারবো না। বন্যাঃ তাহলে একটায় উপায় আছে। অনলাইনে অর্ডার করতে পারিস। মেঘঃ সেটা কিভাবে করে? আমি তো কখনও করি নি। বন্যাঃ আমিও করি নি। কিন্তু আপু মাঝে মাঝে অনলাইনে কেনাকাটা করে। কিন্তু বিস্তারিত

জানি না। মেঘঃ এখন কি করব? বন্যাঃ তোর ভাইকে জিজ্ঞেস করতে পারিস। মেঘঃ ভাইয়া কে বলার সাহস নাই আমার। যদি জিজ্ঞেস করে কি আনবো বা বলে আমি এনে দেয়, তখন? বন্যা চিন্তিত স্বরে বলল, সেটাও হতে পারে। কিন্তু কিছু করার নেই। বের হতে যেহেতু পারবি না তাহলে রিস্ক তো নিতেই হবে। আর না হয় বাদ দে। মেঘ ফোঁস করে শ্বাস ছেড়ে বলল, "বাদ দিতে পারবো না। আমার জানতেই হবে ওনি কাকে ভালোবাসেন।" বন্যা পুনরায় বলল, "যদি বলেন জান্নাত আপুকে ভালোবাসেন তখন কি করবি?" মেঘের কণ্ঠস্বর ভিজে আসছে, ভেজা কণ্ঠে বলল, "তাহলে আমি এই বাড়ি ছেড়ে চলে যাব। যে বিশ্ববিদ্যালয়ে ই ভর্তি হবো, সেখানের হোস্টেলে চলে যাব। আর বাসায় ফিরবো না। চোখের আড়াল হলে ধীরে ধীরে হয়তো আবির ভাই মনের আড়ালও হয়ে যাবেন।" শেষ কথাটুকু বলে কান্না শুরু করে দিয়েছে। বন্যা কিছু বলার আগেই কল কেটে দিয়েছে মেঘ। রাত ১০ টার দিকে মেঘ তানভিরের জন্য বেলকনিতে পায়চারি করছে। তানভির কে কিভাবে কি বলবে সেই শব্দগুলো সাজাচ্ছে। কিন্তু অনেকক্ষণ হয়ে গেছে তানভির ফিরছে না। কিছু একটা ভেবে মেঘ আবিরের রুমের দিকে পা বাড়ালো। দরজায় দাঁড়িয়ে আস্তে করে বলল, "আসবো?" আবির ফোনে কথা বলছিল, মেঘের কন্ঠ শুনে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালো। ফোন কানে রেখেই বলল, "আয়।" মেঘ বিছানার পাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। ফোনের ওপাশ থেকে কে যেনো কি বলেছে, আবির উচ্চস্বরে হেসে উত্তর দিল, " আমার চিন্তা না করে

এখন নিজের চিন্তা করো। রাখছি। ” কল কেটে মেঘের দিকে তাকিয়ে স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, “কিছু বলবি?” আবির ভাইয়ের ফোনে বলা কথাটা মেঘের মাথায় ঘুরছে। এক মুহুর্তেই মনটা খারাপ হয়ে গেল। কার সাথে কথা বলছিল, কিসের কথায় বা বলছিল? মেঘ এসব ভাবনায় মগ্ন। আবির কপাল কুঁচকে ভারী কণ্ঠে প্রশ্ন করল, “কি হয়েছে? কথা বলছিস না কেন?” মেঘ নড়ে উঠল। শীতল কণ্ঠে বলল, “অনলাইনে শপিং কিভাবে করে?” মেঘের এমন প্রশ্ন শুনে আবির ভ্রু জোড়া কপালে তুলে অবাক দৃষ্টিতে তাকালো। আবির ভেবেছিল এখনও হয়তো রেজাল্টের চিন্তায় মেঘ মন খারাপ করে আছে। কিন্তু সে যে রেজাল্টের চিন্তা থেকে বেড়িয়ে শপিং করার কথা ভাবছে বা শপিং করতে চাচ্ছে এতে আবির খুব খুশি হয়েছে। আবির ঠান্ডা কণ্ঠে বলল, “কি লাগবে বল। আমি এনে দিব নে। ” মেঘ মাথা নিচু করে জানাল, “আমায় শিখিয়ে দিবেন, প্লিজ। ” আবির নিজের ফোন থেকে কিছু টাকা মেঘের নাম্বারে দিয়ে, শপিং এর সিস্টেম বুঝিয়ে দিয়েছে। মেঘ চলে যেতে নিলে আবির ভারী কণ্ঠে বলল, “দাঁড়া ” মেঘ দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে পরেছে। আবির নিজের ওয়ালেট থেকে একটা ক্রেডিট কার্ড বের করে মেঘের দিকে এগিয়ে দিলো। আবির পুরু কণ্ঠে জানাল, “এই কার্ড টা আমার ছিল। আজ থেকে এটা তোর। যখন যা ইচ্ছে কিনতে পারিস।” সাথে ক্রেডিট কার্ড এর পিন নাম্বার টাও বলে দিয়েছে। আবিরের এমন কান্ডে মেঘ আশ্চর্য বনে গেল। জিভ দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে, বৃহৎ নয়নে আবিরের দিকে তাকিয়ে আছে। আবির বড়

করে নিঃশ্বাস ছেড়ে ভ্রু গুটিয়ে বলল, " এভাবে তাকাইস না, প্লিজ।" মেঘ সঙ্গে সঙ্গে মাথা নিচু করে রুম থেকে বেড়িয়ে যাচ্ছে । আবির নিশ্চুপ চেয়ে আছে তার প্রিয়তমার যাওয়ার পানে। আজ রাত ১২ টায় আবিরের জন্মদিন। বন্ধুরা আবিরকে আঁটকে রেখেছে। আবির কখনো জন্মদিন পালন করে না। কিন্তু এতবছর পর বন্ধুর জন্মদিনের সময় বন্ধুকে কাছে পেয়েছে। তাই সবাই মিলে প্ল্যান করেছিল, তানভির কেও আগে থেকে সবকিছু জানিয়ে রেখেছিল। কাছের ৪ বন্ধু আর তানভির বাদেও আরও ২০ জন বন্ধু আসছে। ওদের সাথে তেমন দেখা সাক্ষাৎ হয় না । আবিরের জন্মদিন উপলক্ষে সবগুলো প্ল্যান করেই আসছে। বিশাল বড় কেক সাথে গিফট, পার্টি স্প্রে সব নিয়ে আসছে। ১২ টা পর্যন্ত অপেক্ষা করা সম্ভব না বলে রাত ১০ টার পরেই কেক কে*টে ফেলছে।বন্ধুদের হৈ-হুল্লোড় শেষে সবাইকে নিয়ে রেস্তোরাঁয় গেছে। খাওয়াদাওয়া শেষে সবাইকে বিদায় দিয়ে আবির আর তানভির বাসার দিকে চলে আসছে । ঘড়ির কাঁটা যখন ঠিক ১২ টায়, তখন আবির আর তানভির বাসায় ঢুকেছে। বাড়ির সবাই অনেক আগেই ঘুমিয়ে পরেছে। খান বাড়িতে কখনোই কারো জন্মদিন পালন করা হয় না। তাই জন্মদিন আর অন্য দিনের মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য নেই বললেই চলে। হাতে বন্ধুদের কিছু গিফট নিয়ে আবির রুমের দিকে যাচ্ছে। তানভিরও রুমে চলে গেছে। আবির মেঘের রুমের সামনে এসে থমকে দাঁড়ালো, একবার তাকিয়ে দেখলো। নিচ থেকেও তাকিয়ে দেখেছে বেলকনিতে মেঘ ছিল না, দরজাও চাপানো, লাইট অফ।

প্রতিদিন অপেক্ষা করলেও আজ মেঘ ঘুমিয়ে পরেছে। এটা ভেবে আবিরের মন কিছুটা খারাপ হলো। যত ব্যস্ত ই থাকুক না কেন, আবিরের মাথায় সবসময় থাকে, বাসায় কেউ একজন তার অপেক্ষা করছে। ভাবতেও ভাল লাগে। তবে আজ তার ব্যতিক্রম ঘটলো। আবির কয়েক মুহুর্ত থেমে আবার নিজের রুমের দিকে চলে গেলো। এক হাতে গিফট গুলো নিয়ে অন্য হাতে দরজা ধাক্কা দিতেই আশ্চর্য নয়নে তাকালো। রুম জুড়ে মাটির প্রদীপ জ্বলছে। বিছানার উপর একটা কেক রাখা, তার আশেপাশে ছোট বড় বেশকয়েকটা গিফট বক্স।। অকস্মাৎ মেঘ পাশ থেকে একগুচ্ছ লাল রঙের গোলাপ আবিরের সামনে ধরে কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, “Happy Birthday Abir Vai ” একটা সাদা রঙের জামা পরনে, চুলগুলো ছাড়া এই কয়েক মাসে মেঘের চুলগুলো বেশ লম্বা হয়ে গেছে, চোখে ঘাড় করে কাজল দেয়া, ঠোঁটে হালকা করে লিপস্টিকও লাগিয়েছে আজ । রুম জুড়ে জ্বলজ্বল করা প্রদীপের আলোতে মেঘকে দেখে আবির বশিভূত নয়নে তাকিয়ে আছে। বুকের বা পাশে থাকা হৃদপিণ্ডের তীব্র স্পন্দন জানান দিচ্ছে, খুব শীঘ্রই একটা অঘটন ঘটতে যাচ্ছে। আবির ফুলগুলো হাতে নিয়ে চোখ বন্ধ করে দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো। কিন্তু হৃদপিণ্ডের ছুটোছুটি কমছে না বরং দ্বিগুণ বেড়ে গেছে। মেঘও তাকিয়ে আছে আবিরের মুখের পানে। আবির ভাইকে দেখে সবসময়ের মতো আজও মেঘের হৃৎস্পন্দন জোড়ালো হলো। আবিরের মোহময় দৃষ্টি তাকে স্থির থাকতে দিচ্ছে না। মাথায় থাকা প্রশ্ন গুলো ভুলতে শুরু

করেছে। মেঘের কাজল দেয়া চোখ আবিরকে নিয়ন্ত্রণহীন করে তুলছে। আবির হাতে থাকা গিফট গুলো ড্রেসিং টেবিলে রাখতে রাখতে গম্ভীর কণ্ঠে শুধালো, "এসবের মানে কি?" আবিরের কণ্ঠস্বরে মেঘ স্বাভাবিক হলো। মাথা নিচু করে ফেললো সঙ্গে সঙ্গে। কিছুই বলল না। নিস্তব্ধতায় কাটলো কিছুক্ষণ। আবির ফুলগুলোতে আলতো হাতে ছুঁয়ে সেগুলো বিছানার উপর কেকটার পাশে রেখে একটা টাওজার নিয়ে ওয়াশরুম চলে গেছে। আবির চলে যাওয়ায় মেঘ ধপ করে বিছানার পাশে বসে পরেছে। আবির ভাই কিছু না বলেই চলে গেছেন। আল্লাহ জানে আজ কপালে কি আছে। আবির ভাই যদি কেক ফেলে দেন, যদি আবারও থা*প্পড় দেন আনমনে হাবিজাবি ভাবছে । মেঘ বুঝতে পারছে না, আবির ভাইয়ের জন্য অপেক্ষা করবে নাকি রুমে চলে যাবে। ৫-৭ মিনিট বসে থেকে মেঘ সিদ্ধান্ত নিলো, রুমে চলে যাবে। তারপর আবির ভাই যা করার করতে থাকুক। মেঘ উঠে কয়েক পা এগোতেই আবির ওয়াশরুমের দরজা থেকে বলল, "কোথায় যাচ্ছিস, কেক কাটবো না?" মেঘের পা থেমে গেছে। মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে পরেছে সেখানেই । আবির ওয়াশরুম থেকে বের হয়ে একটা সাদা রঙের টিশার্ট পরেছে। হয়তো ইচ্ছে করেই পরেছে। ভেজা চুল গুলো থেকে এখনও পানি পরছে। তবে মুছার চেষ্টাও করছে না। মেঘের কাছে এসে দাঁড়াতেই মেঘ কিছুটা কেঁপে উঠলো,এই বুঝি থা*প্পড় টা মা*রবেন। নিজেকে বাঁচাতে সহসা দুহাতে দুগাল চেপে ধরলো। অষ্টাদশীর কান্ড দেখে আবির নিজের ভ্রু যুগল নাকের ডগায় টেনে

নিল। স্বভাব সুলভ তপ্ত স্বরে বলল, “এসব করার জন্যই সেদিন অনলাইনে শপিং শিখতে এসেছিলি?” মেঘ মাথা নিচু করে ফ্লোরের দিকে তাকিয়ে আছে। আবির পুনরায় বলল, “অনেক সুন্দর সাজিয়েছিস। অসংখ্য ধন্যবাদ। তবে এটায় যেনো লাস্ট টাইম হয়। আমার জন্মদিন পালন করা ভালো লাগে না। আর এই বাড়িতে এসব কিছু চলে না। প্রথমবার পা*গলামি করেছিস তাই কিছু বললাম না। ” মেঘ আবিরের মুখের দিকে তাকিয়েছে। আবির তখনও তাকিয়েই ছিল। দ্বিতীয় বার সেই কাজল কালো চোখে চোখ পরায় আবির সঙ্গে সঙ্গে নিজের দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে বিছানার কাছে চলে গেলো। এই চোখে দীর্ঘসময় তাকালে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না সে। মেঘ ও আবিরের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে তবে মনে থাকা প্রশ্ন গুলো করার বিন্দুমাত্র সাহস অবশিষ্ট নেই। তাই ভাবল, আজকের মতো কেক কেটে এখান থেকে পালাতে পারলেই বাঁচি। আবির কেক কেটে প্রথমেই মেঘকে অল্প একটু খাইয়ে দিল। যথারীতি মেঘও খাইয়ে দিয়েছে। ফুচকা খাওয়ানোর পর আজ আবির ভাইয়ের মুখে তুলে কেক খাওয়াতে গিয়েও মেঘের সেই পূর্বের অনূভুতি কাজ করছে। আবির নিচু হয়ে বাকি কেক টা কাটছিল আচমকা মেঘের আঙুলে লেগে থাকা ক্রিম দু আঙ্গুলে আবিরের গালে ছুঁইয়ে দৌড় দিতে নিলে এক সেকেন্ডেই আবির হাত চেপে ধরে ফেলল। আবির ঘুরে দু পা এগিয়ে মেঘের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। আবির ভাইয়ের কাছে আসাতে মেঘ আ*তঙ্কে দু পা পিছালো। আবিরের হাতে মুঠোয় থাকা নিজের

হাতটা ছুটানোর খুব চেষ্টা করছে। কিন্তু আবির শক্ত হাতে ধরে রেখেছে। আবির এক পা এগুচ্ছে আর মেঘ এক পা পিছাচ্ছে। মেঘ কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে বলছে, "আর জীবনেও এমন করবো না। প্লিজ এবারের মতো ছেড়ে দেন। " আবির তপ্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে এগিয়ে আসছে। মেঘ পেছাতে গিয়ে অনুভব করলো দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে তার। আবিরের হাতে থাকা মেঘের হাতটা দেয়ালে চেপে ধরে, একটু নিচু হয়ে অপর হাতে ছুঁয়ে দিলো অষ্টাদশীর গাল। মেঘ গালে ক্রিম লাগানোর সঙ্গে সঙ্গে আবির কেকের উপর হাত রেখে সবটুকু ক্রিম নিজের হাতে লাগিয়েছিল। সেটায় মেঘের দু গালে লাগিয়ে দিয়েছে। মেঘের হাত-পা কাঁপছে। আবির মাথা নিচু করাতে ভেজা চুলগুলো কপালে পরেছিল। আবির অকস্মাৎ মাথা ঝাঁকাতে কপালে থাকা চুলগুলো কিছুটা সরে গেছে। সাথে সাথে চুলের পানি ছিটকে পরেছে অষ্টাদশীর চোখে মুখে। সহসা দুচোখ বন্ধ করে ফেলেছে মেঘ। আবির বিরক্তি ভরা কণ্ঠে বলল, "আর কত জ্বালাবি? তুই কি একটুও শান্তি দিবি না আমায় ? যা না করতে বলি তাই বেশি বেশি করিস, চোখে কাজল দিতে না করেছিলাম, তারপর ও কেনো দিয়েছিস? আমার ধৈর্যের সীমা অতিক্রম করতে কেনো উঠেপড়ে লেগেছিস? " আবির বুঝতে পারছে মেঘের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। আবিরের হাতে থাকা হাতটা খুব জোরে কাঁপছে। অষ্টাদশীর সম্পূর্ণ দেহ তীব্রভাবে কম্পিত হচ্ছে। আবির আপাদমস্তক দেখলো একবার। আবির মেঘের হাতটা ছেড়ে দু পা পিছিয়ে গেলো। আবির দূরে সরাতে মেঘ যেনো হাঁপ

ছেড়ে বেঁচেছে। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে নিজেকে কিছুটা স্বাভাবিক করে রুম থেকে ছুটে পালালো। আবিরও দরজা পর্যন্ত এগিয়ে গেলো। ততক্ষণে মেঘ নিজের রুমে চলে গেছে। আবির বিছানায় বসে ফুলগুলো হাতে নিয়ে গন্ধ শুঁকে দীর্ঘ চুমু এঁকে দিল। হাত ধৌয়ে এসে ধীরে ধীরে সবগুলো গিফট খুলে দেখলো। অনলাইনে ছেলেদের জন্য যা যা পেয়েছে সবই নিয়ে নিয়েছে। সবগুলোই মোটামুটি সুন্দর ছিল। আবির জিনিসগুলো সুন্দর করে গুছিয়ে রেখে ঘুমিয়ে পরেছে। আজ শুক্রবার, সেই রাতের পর মেঘ আর আবিরের সামনে পরে নি। ভ*য়ে, আতঙ্কে, নিজেকে রুমের মধ্যে বন্দী করে রেখেছে। আব্বুর সামনেও যায় না। দুপুরের দিকে যেই না রুম থেকে বের হতে যাবে তখনই আবিরের মুখোমুখি হলো। আবির নামাজের জন্য বের হইতেছিলো। মেঘকে দেখে থামলো, মৃদুস্বরে বলল, “নামাজ পরে রেডি হইস। একটা প্রোগ্রামে নিয়ে যাব তোকে। ” মেঘ আস্তে করে বলল, “কিসের প্রোগ্রাম? ” আবির ঠান্ডা কণ্ঠে উত্তর দিল, “সেটা গেলেই বুঝতে পারবি। রেডি হয়ে বের হয়ে পরিস। আমি বাহিরে ই থাকবো। ” মেঘ আর কিছু বলল না। আবির টুপি মাথায় দিতে দিতে বাসা থেকে বেরিয়ে পরেছে। আবিরের কথামতো নামাজ পরে মেঘ একটা গর্জিয়াছ ড্রেস পরে সুন্দর করে সেজেছে। তবে আজ ভুল করেও সে কাজলে হাত দেয় নি। ঘন্টা দুয়েক পর মেঘ রুম থেকে বেড়িয়েছে। বিকেল বেলা ড্রয়িং রুম সবসময় ফাঁকা থাকে। তাই কারো কোনো প্রশ্নের সম্মুখিন হতে হয় নি তাকে। বাসা থেকে বের হয়ে কিছুটা যেতেই

চোখে পরলো আবির ভাই দাঁড়িয়ে আছে। প্রতি শুক্রবারের মত আজও পাঞ্জাবি পড়েছেন তবে আজকের টা একটু গর্জিয়াছ। মেঘ কাছাকাছি আসতেই আবির মৃদু হেসে বলল, "মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর লাগছে তোকে।" মেঘ মাথা নিচু করে বিড়বিড় করে বলল, "আপনাকেও অনেক সুন্দর লাগছে। " আবির কথাটা শুনে নিঃশব্দে হেসে হেলমেট পরে নিলো। তারপর মেঘকেও নিজের হাতে হেলমেট পড়িয়ে বাইক স্টার্ট দিল। ৩০ মিনিটের রাস্তা জ্যাম পেরিয়ে ১ ঘন্টা ৩০ মিনিটে পৌছেছে। বাইক পার্ক করে মেঘকে নিয়ে ঢুকলো একটা কমিউনিটি সেন্টারে। মেঘ কিছু জিজ্ঞেস করতে গিয়েও ভ*য়ে জিজ্ঞেস করতে পারছে না। তাই বাধ্য মেয়ের মতো আবিরের পিছন পিছন গেইট পেরিয়ে ভেতরে ঢুকলো। কিছুদূর যাওয়ার পরই চোখ পরলো স্টেজের দিকে। অসংখ্য ফুল দিয়ে সাজানো সুন্দর একটা স্টেজে লাল লেহেঙ্গা পরে বউ বেশে বসে আছে এক সুন্দরী । ওনার পাশে জামাই সেজে এক সুদর্শন এক পুরুষ বসে আছে। ফটোগ্রাফার বিভিন্ন স্টাইলে তাদের ছবি তুলায় ব্যস্ত। মেঘ স্টেজের দিকে তাকিয়ে সেই দৃশ্য দেখে চমকে উঠে বলল, " জান্নাত আপু "মেঘ তাড়াহুড়ো করে আইসক্রিম শেষ করেছে। দুঃশ্চিন্তায় আইসক্রিম টাও শান্তিমত খেতে পারে নি। একদৃষ্টিতে আবিরের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে, কিন্তু আবিরের দৃষ্টি অন্য কোথাও। আবির নিরবধি আকাশের পানে চেয়ে আছে, রাস্তার পাশে থাকা লাইটের আলোতে স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে, আবিরের চোখমুখের উজ্জ্বলতা বিলীন হয়ে গেছে। বিকেলে আসার সময় যতটা উৎফুল্ল

আবির ভাইকে মেঘ দেখেছিল, এই আবির ভাই যেন অন্য কেউ, চোখে মুখে চিন্তার ছাপ । মেঘ কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেল। আবির শোণিত কন্ঠে বলে উঠল, " এই পৃথিবীতে প্রতিটা মানুষের জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হলো মা। সেই মায়ের লা*শ দেখার বা ছোঁয়ার অধিকার যদি কোনো সন্তানের না থাকে তাহলে সেই সন্তান পৃথিবীতে বেঁচে থেকেও মৃত।" মেঘের ভ্রু কুঁচকালো। আবির ভাই কি বলছে, কি বুঝাতে চাচ্ছে কিছুই বুঝতে পারছে না সে। আবির অসীম দূরত্ব থেকে দৃষ্টি সরিয়ে মেঘের দিকে তাকিয়ে ভরাট কন্ঠে বলল, "যে মানুষটাকে দেখে এসেছিল, তিনি আর কেউ নয় তোর, আমার, আমাদের সবার একমাত্র ফুপ্পি " এই কথা শুনামাত্র মেঘের রক্ত সঞ্চালন বন্ধ হওয়ার অবস্থা হয়ে গেছে, মেঘ চিৎকার দিয়ে উঠল, " কি? " আবির সরু নেত্রে তাকিয়ে আছে। মেঘের চোখ যেন কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে। চোখে মুখে অবিশ্বাসের ছাপ। এই কথা কখনোই বিশ্বাসযোগ্য নয়। জন্মের পর থেকে মেঘ জেনে এসেছে তাদের বাবা-চাচা তিনজন। ১৮ বছর পর হঠাৎ করে ফুপ্পি আসবে কোথা থেকে! আচমকা এমন কথা শুনলে বিশ্বাস করবে না এটায় স্বাভাবিক। আবির গম্ভীর কন্ঠে বলল, " আমি জানি তুই বিষয়টা এত সহজে মানতে পারবি না কিন্তু কিছু সত্যি কঠিন হলেও মানতে হবে। " মেঘের দম বন্ধ হয়ে আসছে। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে, গলা দিয়ে কোনো কথায় বের হচ্ছে না। এতক্ষণ যাবৎ কত প্রশ্ন ই মাথায় ঘুরছিল এক মুহুর্তেই যেন সব প্রশ্ন উধাও হয়ে গেছে। মেঘ

আতঙ্কিত কণ্ঠে শুধালো, “আপনি কি আমার সাথে মজা করতেছেন? প্লিজ সত্যি করে বলুন ওনি কে? ” আবির কপাল কুঁচকে ভারী কণ্ঠে বলল, ” তোর সাথে কি আমার মজার সম্পর্ক? আর সিরিয়াস বিষয় নিয়ে আমি মজা কেন করব? ওনার নাম মাহমুদা খান আমিনা। নাম শুনে কি মনে হচ্ছে তোর? ” মেঘ এখনও অবিশ্বাস্য দৃষ্টিতেই তাকিয়ে আছে। ঢোক গিলে ভারী কণ্ঠে বলল, ” আপন ফুপ্পি?” আবির কণ্ঠ দ্বিগুণ ভারি করে বলল, “হ্যাঁ! আলী আহমদ খান আর মোজাম্মেল খানের একমাত্র ছোটবোন এবং ইকবাল খানের একমাত্র বড় বোন। ” মেঘের দু’কান দিয়ে হিজাবের উপর দিয়েই গরম বাতাস বের হতে শুরু করেছে। নিঃশ্বাস আঁটকে আসছে বারবার । আবির ভাই তো মজা করার মানুষ না। আর ওনার চোখমুখ দেখে মনেও হচ্ছে না যে ওনি মজা করছেন। আর বিয়েতে ঐ মহিলার আচরণও বুঝিয়ে দিচ্ছিলো ওনার সাথে গভীর কোনো সম্পর্ক আছে। তাহলে কি ওনি সত্যি সত্যি ফুপ্পি হোন ! এত বড় কথাটা কোনোদিন ও শুনলো না । কিন্তু কেন? মেঘ ভাবনাচিন্তা করে প্রশ্ন করল, “এত বছরে কোনোদিন তো ওনাকে আমাদের বাসায় যেতে দেখি নি। আব্বুদের আপন বোন হলে বাসায় যান না কেন?” আবির মৃদু হাসল, ভরাট কণ্ঠে বলল, “ওনাকে বাসায় যেতে দেখবি কিভাবে! তোর জন্মের প্রায় ১০ বছর আগে ওনি খান বাড়ি ছেড়েছেন। ২৭ বছর হবে ঐ বাড়িতে পা পড়ে নি ওনার। ” মেঘ ভ্রু কুঁচকে প্রশ্ন করল, “কেন? কি হয়ছিল?” আবির শান্ত কণ্ঠে বলা শুরু করল, ফুপ্পি যখন ভার্সিটিতে পড়াশোনা করতো তখন ফুপ্পির

একজনের সাথে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠে। পুরো ঘটনা আমি জানি না, তবে বাসায় বিষয় টা জানাজানি হয়ে গেছিল। তখন আমার আম্মু নতুন বউ, বছরখানেক হবে আম্মুর বিয়ে হয়ছে। তোর আম্মুর তখনও বিয়েই হয় নি। ফুপ্পির এই ঘটনা জানার পর আব্বু আর চাচ্চু ফুপ্পিকে মে*রে,একটা রুমে ৩ মাস দরজা বন্ধ করে আটকে রাখছিল। তখন দাদু বেঁচে ছিলেন,তবে অসুস্থ ছিলেন, কথাও বলতে পারতেন না। আম্মু দাদুর যত্ন করতো আবার, ফুপ্পির দেখাশোনাও করত। ফুপ্পি আম্মুর হাতে পায়ে ধরে অনেক কান্নাকাটি করেছে , কিন্তু আম্মুর কিছুই করার ছিল না। ৩ মাস ফুপ্পির উপর দুই ভাই অত্যাচার করেছে যেনো ঐ ছেলেকে ভুলে যায়। এক পর্যায়ে ফুপ্পি খাওয়াদাওয়া বন্ধ করে দেয়, ধীরে ধীরে অনেক বেশি অসুস্থ হয়ে পরছিল। চিকিৎসা করে ফুপ্পিকে কিছুটা সুস্থ করার পর, ফুপ্পি বাড়ি থেকে চলে গেছিল। ভাইদের অত্যাচারে সেই যে বাড়ি ছাড়ছিল আর কোনোদিন বাড়িতে ঢুকতে পারে নি। বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে ফুফা কে বিয়ে করে বছরখানেক ঢাকাতেই ছিল। চিঠির মাধ্যমে আম্মুর সাথে কয়েকবার যোগাযোগ ও করেছিল। ফুপ্পি বাড়ি ছাড়ার ১ বছরের মাথায় দাদু মারা গেছেন। ভাগ্যক্রমে তখন মেজো মামা আমাদের বাসায় ছিল। ঢাকা চাকরির পরীক্ষা দিতে আসছিল। আম্মু মেজো মামাকে ফুপ্পির বাসার ঠিকানা দিয়ে দাদুর মৃত্যুর খবর পাঠাইছিল। এই কথা আব্বুরা কেউ জানতো না। ফুপ্পি, ফুফা দু'জনেই আসছিল দাদুকে দেখতে, তখন আসিফ ভাইয়া ফুপ্পির পেটে ছিল। খান বাড়ির চৌকাঠে পা রাখতেই

আব্বুর চোখ পরে দরজায়। চিৎকার দিয়ে, এক সেকেন্ডেই দাদুর লা*শ চাদর দিয়ে ঢেকে রান্নাঘর থেকে দা নিয়া বের হইছিলো। যদি ফুপ্পি চৌকাঠ পার হওয়ার চেষ্টা করে তাহলে খু*ন করে ফেলবে। বাড়ি ভরা মানুষ থাকায় আব্বুকে আর চাচ্চুকে সবাই আটকিয়ে রাখছিলো। না হয় সেদিন খু*নাখু*নি হয়ে যেত। কত কত মুরব্বিরা উপস্থিত ছিল কিন্তু আব্বুর মাথা সেদিন কেউ ঠান্ডা করতে পারে নি। দাদুর লা*শ ছোঁয়া তো দূর, ফুপ্পিকে লা*শ দেখতে পর্যন্ত দেয় নি। লা*শ দাফন করে বাড়িতে পা রেখে প্রথম প্রশ্ন টায় করেছিলেন, "আমিনারে খবর দিছে কে ?" মায়ের মৃত্যুর শোকের থেকেও সেদিন হাজার গুণ বেশি তীব্র ছিল ওনার রা*গ । কোনোভাবে জানতে পারছে আম্মু খবর পাঠাইছে, সেইদিন সেই অবস্থাতেই আম্মুকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছিল। অথচ ফুপ্পি ওনার ই মায়ের পেটের বোন। সেই বোনকে খবর দেয়ার শাস্তিস্বরূপ আম্মুকে ২ মাস নানা বাড়িতে থাকতে হয়েছিল। একদম সংসার ভাঙার পর্যায়ে চলে গেছিলো। তখনকার সময়ে সংসার ভাঙা আম্মুর পক্ষে বা নানা বাড়ির মানুষের পক্ষে মেনে নেয়া সম্ভব ছিল না। তারপর নানা, বড় মামা, আত্মীয় স্বজনরা অনেক বুঝিয়ে ২ মাস পরে আম্মুকে বাসায় নিয়ে আসছে। আব্বুর শর্ত একটায় ছিল আর কোনোদিন ফুপ্পির সাথে যোগাযোগ করতে পারবে না। নিজের সংসার বাঁচাতে বাধ্য হয়ে সেই শর্ত মেনে নিয়েছিল আম্মু। মেজো মামা ফুপ্পির বাসায় গিয়ে সব ঘটনা বলে আসছিল। সেইদিন থেকে আজ পর্যন্ত ফুপ্পির সাথে বাসার কারো যোগাযোগ নেই। " মেঘ

এতক্ষণ যাবৎ বিস্ময়কর দৃষ্টিতে আবিরের মুখে পানে তাকিয়ে ছিল। নিজের বাড়িতে এতবড় রহস্য লুকিয়ে আছে অথচ সে কিছুই জানে না। আবির গলা খাঁকারি দিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে বলল, " তুই আমায় পা*ষাণ, হি*টলার বলিস। অথচ আমার থেকেও বড় মাপের হি*টলা*র এতবছর যাবৎ খান বাড়িতে রাজত্ব করে আসছেন। যাদের কথার উপর কারো কথা চলে না, যাদের ইচ্ছের বিরুদ্ধে কেউ কিছু করতে পারে না। ফুপ্পি নিজের পছন্দের মানুষকে বিয়ে করার অপরাধে মায়ের লা*শ দেখার অধিকার টা পর্যন্ত হারিয়েছেন। ২৮ বছর যাবৎ বাবার বাড়ি পা রাখতে পারেন না। কতটা নিষ্ঠুর হলে মানুষ এমন কাজ করতে পারে!" মেঘ দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে প্রশ্ন করল, "আপনি ফুপ্পিকে কিভাবে চিনেন?" আবির শ্বাস ছেড়ে পুনরায় বলা শুরু করল, " আমি ওনার সম্পর্কে জানতাম না। ছোটবেলা একবার আম্মু পুরাতন জিনিস পত্র বের করছিলেন, তখন একটা অ্যালবাম বের হয়ছিল। আমি অ্যালবাম টা খুলে দেখছিলাম। আম্মু আব্বুর বিয়ের ছবি থেকে শুরু করে দাদা-দাদুর, চাচ্চুর মোটামুটি অনেকের ছবিই ছিল। যেহেতু ছোট ছিলাম, আগ্রহ নিয়ে ছবিগুলো দেখছিলাম। আর সবাইকে চেনার চেষ্টা করছিলাম। হঠাৎ কয়েকটা ছবি চোখে পরে। ছবিগুলো দেখে চিনতে পারছিলাম না বলে আম্মুকে জিজ্ঞেস করছিলাম, আম্মু কিছু বলার আগেই আব্বু রুমে চলে আসছিল। আব্বু আমার হাত থেকে অ্যালবাম নিয়ে আমায় পড়তে বসতে বলেন। আমিও চুপচাপ পড়তে চলে গেছিলাম এই বিষয়ে আর ভাবি নি। তার কয়েক বছর পর, দেশ

ছাড়ার আগে আব্বু আম্মুর কিছু কাগজ পত্রের দরকার ছিল। আমি তখন আব্বুর ফাইলে কাগজ খুঁজছিলাম। তখন একটা ফাইল চোখে পরে। ঐ ফাইলে সার্টিফিকেট, ছবি আরও কিছু কাগজপত্র ছিল। মাহমুদা খান আমিনা নামটা আমি প্রথমবার সেখানেই দেখছিলাম। বাবা মায়ের নামের জায়গায় দাদা-দাদুর নাম লেখা ছিল। ছবিগুলো দেখে ছোটবেলায় অ্যালবামে দেখা ছবিগুলোর কথা মনে হয়ছিল। আমি সেখান থেকে একটা ছবি নিয়ে গেছিলাম। আম্মুকে একবার জিজ্ঞেস ও করেছিলাম, কিন্তু আম্মু বলছেন আম্মু কিছু জানে না আর এই বিষয়ে যেনো আর কোনোদিন কাউকে কিছু জিজ্ঞেস না করি। তখন কিছুদিন আমার মাথায় বিষয়টা ঘুরছিল। পরে ভাবছি হয়তো মারা গেছেন তাই আম্মু জানে না বা জিজ্ঞেস করতে না করেছেন। বিষয়টা সেখানেই ভুলে গেছিলাম। কিন্তু ছবিটা যে আমার কাগজপত্রের সাথে চলে গেছিল এটা আমি জানতাম না। ঐখানে গিয়ে ছবিটা দেখে ফেলতেও ইচ্ছে করছিল না তাই আব্বু আম্মুর ছবির সঙ্গে রেখে দিছিলাম। তবে কোনোদিন এই বিষয় নিয়ে ভাবি নাই। ” কথাগুলো শেষ করে আবির একটু থামলো। মেঘ জিজ্ঞাসু চোখে চেয়ে থেকে আস্তে করে বলল, “তারপর! ” “গতবছরের শেষ দিকে জান্নাত আর আসিফ ভাইয়াকে নিয়ে একটু ঝা*মেলা হয়ছিল। তখন রাকিব আমাকে আসিফ ভাইয়ার ফে*সবুক আইডি পাঠাইছিল। ঐখানে কভার ফটোতে একটা ছবি ছিল। কেন জানি আমার ছবিতে থাকা মহিলাটাকে খুব পরিচিত মনে হয়তেছিল। আমি রাকিবকে বলে আসিফ ভাইয়ার

বায়োডাটা সংগ্রহ করি। ঐখানে আমি দ্বিতীয় বারের মতো নাম দেখি- মাহমুদা খান আমিনা। সেদিন প্রথমবারের মতো আমি বড়সড় ধাক্কা খাইছিলাম। আমি সবকিছু খোঁজে সেই পুরোনো ছবিটা বের করে বার বার ফে*সবুকের ছবির সাথে মিলিয়ে ছিলাম। অস্থিরতায় সেদিন প্রায় ম*রতে বসেছিলাম। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছিলো যে আমার একজন ফুপ্পি আছে তাও আবার জীবিত। সেদিন পরিস্থিতি সামলানোর বিন্দুমাত্র শক্তি ছিল না আমার। সেই রাতেই তানভির আর রাকিবকে আসিফ ভাইয়ার বাসায় পাঠাইছি। আমি ফুপ্পির সাথে সেদিন প্রথমবারের মতো ফোনে কথা বলছিলাম। নাম পরিচয় বলার পর ওনার সে*কি কা*ন্না, তানভিরকে আঁকড়ে ধরে অনেক কেঁদেছিল। ফুপ্পির ২৮ বছর চেপে রাখা সব কষ্ট কান্নায় পরিণত হয়েছিল । তারপর বেশ কয়েকবার কথা হয়েছে ওনার সাথে। বারবার জিজ্ঞেস করেছি ঘটনা বলতে কিন্তু বলেন নি । বলছেন আমি দেশে ফিরলে বলবে। দেশে ফেরার কয়েকদিনের মধ্যেই আমি, তানভির আর রাকিব ওনাদের বাসায় গেছিলাম। সেখানে গিয়েই সব ঘটনা শুনেছি” মেঘ আগের তুলনায় কিছুটা স্বাভাবিক হয়েছে। মেঘ পুনরায় প্রশ্ন করল, “জান্নাত আপুর কি ঝামেলা হয়ছিল?” আবির এতক্ষণ গম্ভীর থাকলেও এবার একটু হাসার চেষ্টা করল। ধীর কণ্ঠে শুধাল, “তেমন কিছু না” মেঘ আস্তে করে বলল, “প্লিজ বলুন। ” আবির না পারতেও বলল, “ফুপ্পিরা এতবছর যশোর ছিল। গতবছর ভাইয়ার চাকরি হওয়ায় স্ব পরিবারে ঢাকা আসছে। কোনো এক

অনুষ্ঠানে ভাইয়া জান্নাতকে দেখেছে। ভাইয়ার জান্নাতকে ভালো লাগছে। কোনোভাবে খবর নিয়েছে জান্নাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে সেই থেকে প্রায় প্রায় ই ভার্সিটির আশেপাশে, জান্নাতকে ফলো করতো। কিন্তু কোনোদিন কথা বলে নি। ৬ মাস শুধু দূর থেকে ফলো ই করেছে। একদিন সাহস নিয়ে কথা বলতে আসছিল। যদিও কথা বলতে পারে নি। কিন্তু সেটা রাকিবের কান পর্যন্ত পৌছে গেছিলো। রাকিব ২-৩ দিন খেয়াল করে বিষয়টা আমায় জানাইছিল। রাকিবের ভাইয়াকে পে*টানোর চিন্তাভাবনা ছিল। আমাকে জানানোর পর আমি বলছিলাম, ছেলেটার একটু খোঁজ নিতে, যদি সমস্যা মনে হয় তাহলে পে*টাতে। রাকিব খোঁজ নিয়ে জানতে পারছে ভালো জব করে, অফিসের সবার সাথে নম্র ভদ্র আচরণ করে। সেখান থেকেই ফে*সবুক আইডি সংগ্রহ করে আমায় দিছিলো। যাকে পেটা*নোর প্ল্যান ছিল, সে আমার ভাই হয়ে গেলো। যখন জানতে পারছে ভাইয়া জান্নাতকে পছন্দ করে, তখন রাকিব আর বাঁধা দেয় নি। তবে রাকিবের একটায় কথা ছিল আমি দেশে না ফিরলে, আর ফুপ্পির পুরো ঘটনা না জানলে সে জান্নাতের বিয়ের সিদ্ধান্ত নিবে না। ধীরে ধীরে জান্নাত আর ভাইয়ার মধ্যে মোটামুটি ভালো সম্পর্ক হয়ছে। আমি দেশে ফিরলাম। ভেবেছিলাম দেশে ফিরেই ওদের বিয়ে দিব। কিন্তু দেশে আসার পর তোর কোচিং, টিউশন থেকে খবর নিয়ে দেখলাম তোর পড়াশোনার না*জেহাল অবস্থা। এভাবে পড়লে চান্স পাবি না। তোর পড়াশোনা গুছিয়ে দেয়ার জন্য একজন মানুষ দরকার ছিল।

তখন জান্নাতের কথা মাথায় আসে আর জান্নাত কে আনি। জান্নাতের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার যেহেতু রাকিবের, আর রাকিব আমার বেস্ট ফ্রেন্ড। তাই বিয়ের আলোচনা হওয়ার আগেই ব*ন্ধ করে দিয়েছিলাম। কিন্তু অফিসিয়াল কাজে ভাইয়াকে ছয়মাসের জন্য দেশের বাহিরে যেতে হবে। ভাইয়া চাইতেছিল বিয়ে করে বউ নিয়া কয়েকমাস ঘুরে তারপর যাবে। কিন্তু তোর এডমিশন টেস্টের থেকে আমার কাছে তাদের বিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। আমি রাজি হয় না বলে ভাইয়া ঘুরাঘুরির প্ল্যান বাদ দিয়ে বলেছে শুধু বিয়েটা করবে। বিয়ের পর তোকে যত ইচ্ছে পড়াতে। কিন্তু আমার কথা হলো, একবার বিয়ে হলো মানে জান্নাতের মাথায় সংসারের চিন্তা ঢুকবে। তখন তোর প্রতি তার দায়িত্ব কমে যাবে। এটা তো আমি কখনোই হতে দিব না। ভাইয়া যখন বুঝতে পারছে আমায় মানাতে পারবে না তখন জান্নাতকে বুঝানো শুরু করছে। কিন্তু জান্নাত তো আমায় বা রাকিবকে সবই বলে দেয়। জান্নাতের মাথা যাতে না খেতে পারে, সেজন্য ২-১ মাস যাবৎ জান্নাতের সঙ্গে ভাইয়ার যোগাযোগ বন্ধ রেখেছি। রাকিব নতুন সীম কিনে দিছে জান্নাতকে।যেদিন রাতে তুই আমায় কল দিছিলি, সেদিন আমি,রাকিব আর তানভির ফুপ্পিদের বাসায় ই ছিলাম। বিয়ের কথাবার্তা বলতে গেছিলাম। তুই চান্স পেলেই বিয়ে হবে এরকম টায় শর্ত ছিল। কিন্তু রাতে ফেরার পর তোর খাতা ভর্তি হাবিজাবি লেখা দেখে আমার মাথায় র*ক্ত উঠে গেছিল। যার জন্য আমি এত মানুষের বিরুদ্ধে লড়তেছি সে কিনা পড়াশোনা টাকে গুরুত্ব ই দিচ্ছে না। সেই

রা*গে সেদিন খাতা পুড়িয়েছিলাম। যাতে তুই পড়াশোনায় মনোযোগ দেস। যাদের সামনে বার বার গর্ব করে বলেছি আমার মেঘ চান্স পাবেই। চান্স না পেলে, আমি তাদের মুখোমুখি হতে পারতাম না। তারা মুখে কিছু বলুক বা না বলুক, মনে মনে হলেও বলতো, এতকিছু করেও তো মেঘ চান্স পেলো না। এই কথাটা পৃথিবীর কোনো মানুষ যাতে বলতে না পারে সেইজন্য আমি তোকে সারাক্ষণ পড়ার কথা বলতাম। আলহামদুলিল্লাহ। তোর চেষ্টা, আমার ইচ্ছে পূরণ হয়েছে। আল্লাহ আমার আশা পূরণ করেছেন আর তোকেও অসংখ্য ধন্যবাদ। ”
মেঘের গলায় আটকে থাকা নিঃশ্বাস টা দীর্ঘশ্বাস হয়ে বেড়িয়ে আসলো। মেঘের আড়ালে মেঘকে নিয়ে কত কত ঘটনা ঘটেছে। আবির ভাইয়ের গত চারমাসের করা আচরণগুলো বারবার মনে হচ্ছিল।আবির রাশভারি কণ্ঠে আবার বলে উঠল, “সবাই জানে খান বংশের বড় ছেলে আমি। চাচাতো ভাই বোনদের মধ্যে আমি বড় হলেও, সত্যিকার অর্থে আসিফ ভাইয়া আমাদের মধ্যে সবার বড় আর আমি দ্বিতীয়। পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে বা আমি সফল হতে পারবো কি না জানি না, তবে আমি আমার জায়গা থেকে সর্বোচ্চ চেষ্টা করব ফুপ্পির সাথে আমাদের বাসার সম্পর্ক ঠিকঠাক করার।” একটু থেমে আবির আবার বলল, “জানিস মেঘ, এই দুজন মানুষের জন্য আমাদের বাড়ির প্রতিটা মানুষ ভেতর থেকে দুমড়ে মুচড়ে ভেঙে গেছে। তাদের রা*গ, আর অনাদেয় কর্মকান্ডের ফলাফল ভোগ করতে হয় বাকি সদস্যদের। ফুপ্পির মতো কাকামনির জীবনের সুখ শান্তিও

কেড়ে নিয়েছে এই মানুষগুলো। কাকামনি ঠান্ডা মেজাজের মানুষ হওয়ায় আর শুধুমাত্র ভাই বলে হয়তো এখনও সম্পর্ক ঠিক আছে। নাহয় ফুপ্পির মতো অবস্থা কাকামনিরও হতো। কাকামনি সবার সামনে প্রাণোচ্ছল থাকে ঠিকই কিন্তু ওনার ভেতরটায় সবচেয়ে বেশি বিধ্বস্ত। ফুপ্পিতো তো তবুও ভালোবাসার মানুষকে পেয়েছেন, কাকামনি তো তাও পেলেন না। " মেঘের মস্তিষ্ক জোড়ে বিচরণ করছে লক্ষাধিক প্রশ্ন কিন্তু সেসব প্রশ্নের উত্তরে শুধু বাবা-চাচার নাম ই উঠে আসবে। কাকামনির জীবনের ইতিহাস শুনারও ইচ্ছে নেই, তাই এই বিষয়ে প্রশ্ন করল না। নিজের আব্বু আর বড় আব্বু এতটা পা*ষাণ এটা ভাবতেই মেঘের কষ্ট হচ্ছে। মেঘ বিভোর হয়ে স্মৃতি মনে করায় ব্যস্ত। আবির ভাই ফেরার পর থেকে যা যা ঘটেছে সব মনে করার চেষ্টা করছে। হঠাৎ মাথায় আসলো, আবির ভাই যে বার বার বাবা-চাচার মুখের উপর কথা বলেন। ওনারা যদি আবির ভাইকে...এটুকু ভেবেই মেঘ থেমে গেল। চিন্তিত স্বরে বলল, " আপনি আব্বু বা বড় আব্বুর মুখের উপর আর কথা বলবেন না প্লিজ।" নিজের প্রতি প্রেয়সীর দুশ্চিন্তা দেখে আবির আনমনে হেসে উঠল, স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, "আমি যদি কথা না বলি তাহলে ওনারা ওনাদের মর্জি মতো সবকিছু করবেন। ওনাদের সকল ইচ্ছে পূরণ করা আমার পক্ষে সম্ভব না। আমি কারো প্রিয় হয়ে থাকতে চাই না। আমি তাই করব যা আমার করতে ইচ্ছে করবে। " মেঘের শীতল চাউনি দেখে আবির ভারী কণ্ঠে বলে উঠল, "তোকে আগেও বলেছি এখন আবার বলছি, কখনো কারো

মন রাখার চেষ্টা করবি না। ঠিক সেই কাজ টায় করবি যেটা তোর মন করতে চাইবে। বিষয় ছোট হোক বা বড় আগে নিজের মনকে প্রায়োরিটি দিবি। আর ফুপ্পির বিষয়টা ভুলেও কাউকে বলবি না, বাড়িতে কাউকে এই বিষয়ে কোনো প্রশ্ন করবি না। তোকে জানানো দরকার ছিল তাই জানিয়েছি। আজকের পর থেকে বুঝে শুনে পা*গলামি করবি। কারণ আমি চাই না তোর পা*গলা*মিকে সিরিয়াসলি নিয়ে কেউ তোর মনে আ*ঘাত করুক। ” কথা শেষ করে মেঘকে নিয়ে বাড়ি ফিরছে আবির। মেঘের মনে আজ কোনো অনুভূতি নেই। এইযে এতদিন জান্নাত আপুকে নিয়ে এত দুশ্চিন্তা করল। সেই জান্নাত আপু সম্পর্কে তার ভাবি হয়ে গেছে। বাড়ির রহস্য না জানলে, আজ মেঘ আবিরকে নিজের মনের কথা বলেই দিত। কিন্তু তার বাড়ির মানুষ যে ভালোবাসার জা*তশ*ত্রু। তারা তো কোনোদিন মানবে না। আবির ভাইয়ের প্রতি যে সে অসম্ভব দূর্বল। আবির ভাইকে এই জীবনে কি আদোঃ পাবে? আবির বাইক চালাচ্ছে আর মনে মনে ভাবছে, “আমার জীবনটা কেন এমন হলো! তোর প্রবল অভিমান আমায় দেশ ছাড়তে বাধ্য করেছিল। ৬ বছর যাবৎ আমি নিজের উপলব্ধি জমিয়েছি। সেই সুদীর্ঘ অভিসন্ধি বাস্তবায়নের সুযোগ টাও পেলাম না আমি। ভেবেছিলাম দেশে ফিরে তোর কাছে আমার চিত্তের অব্যক্ত প্রণয় প্রকাশ করব। এত বছরে তোকে ঘিরে কত লক্ষাধিক স্বপ্ন দেখেছি, সেই সব স্বপ্নের কথা জাহির করব। গত ৬ বছর শুধু একটায় পরিকল্পনা করেছি, কিভাবে তোকে আমাতে আসক্ত করব।

তিনমাসের মধ্যে তোকে আমার বউ করে নিবো এই দৃঢ় সংকল্পে নিজেকে প্রস্তুত করছিলাম । কিন্তু একটা ঘটনা, আমায় চূ*র্ণবি*চূর্ণ করে দিয়েছে। গত ১ বছর যাবৎ আমি নিজের সঙ্গে ল*ড়াই করছি। তোকে উপেক্ষা করার বিন্দুমাত্র শক্তি যে আমার ছিল না। দেশে ফিরে প্রথমবার তোর লালিত মুখমণ্ডল আর মায়াবী আঁখি দেখে এক মুহুর্তের জন্য নিজেকে উ*ন্মাদ মনে হয়েছিল। ইচ্ছে হয়েছিল, খান বাড়ির সব নিয়মনীতির বি*নাশ করে হলেও তোকে আমার করে নেই। কিন্তু আমি পারি নি। আজও আমি তোকে ভালোবাসি বলতে পারছি না। তুই পরিবার ছাড়তে পারবি না আর আমি তোকে! নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা ছাড়া আমি আর কোনো পথ খোঁজে পাচ্ছি না। তোকে পাওয়ায় জন্য যতটুকু যোগ্যতা অর্জন করা দরকার আমি ঠিক ততটুকুই যোগ্য হবো। তারপরও আমার তোকেই লাগবে। আমার তোকে পাওয়ার ইচ্ছে যতটা প্রবল, তোর মনেও আমাকে পাওয়ার সেই শাণিত ইচ্ছে জাগতে হবে। পরিস্থিতি যতই কঠিন হোক, তোর আমার প্রতি প্রগাঢ় আস্থা থাকতে হবে। তুই আমার হলে, আমি পুরো দুনিয়ার সঙ্গে লড়তে পারব। কিন্তু তোকে না পেলে আমার প্রণয়ের পরিণতি হবে মৃ*ত্যু।”

বাসার সেই মোড়ে মেঘকে নামিয়ে আবির ঠান্ডা কণ্ঠে বলল, “যা বলেছি তা মাথায় রাখিস। সামনে তানভির আছে,ওর সঙ্গে বাসায় যাবি। বাসায় কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে তোর কিছু বলার প্রয়োজন নেই। যা বলার তানভির বলবে। জান্নাতের বিয়ের কথা কাউকে বলিস না। আর অতিরিক্ত দুশ্চিন্তা করে নিজের শরীর খারাপ করিস না।

ফুপ্পির সাথে সম্পর্কটা আমি ঠিকঠাক করার চেষ্টা করবো, তুই সাবধানে থাকিস। ” তানভির বাসার কাছেই মেঘের জন্য অপেক্ষা করছিল। মেঘকে নিয়ে বাসায় ঢুকেছে ।ড্রয়িং রুমে দুই ভাই বসে আছেন। মেঘ আর তানভির কে দেখেই মোজাম্মেল খান প্রশ্ন করলেন, “কোথায় গেছিলা?” মেঘ তানভিরের মুখের দিকে তাকাতেই, তানভির বলল, “তুই রুমে যা।” ভাইয়ের কথামতো মেঘ রুমে চলে গেছে। ওরা দুই ভাই মেঘকে এমনভাবে আগলে রাখে যেন বাড়ির কেউ কিছু বলতে না পারে। বড় রা কিছু বললে কষ্ট বেশি পাবে কিন্তু তানভির যেহেতু ছোট থেকেই শাসন করে তাই ভাইয়ের শাসন মেঘের এখন সয়ে গেছে। তানভির যা যা কথা বলার, তা বলে রুমে চলে গেছে। মেঘ ফ্রেশ হয়ে শুয়ে পরছে। বিকেল থেকে এত এত ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়ছে যেগুলো মাথায় স্থির হতেও একটু সময় লাগবে। মেঘের আবেগ, অনূভুতি সব বিলীন হয়ে গেছে। আবির ভাইয়ের বলা প্রতিটা কথা মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে । একটা কথা বার বার মনে হচ্ছে, “এই বাড়ির প্রতিটা মানুষ ভেতর থেকে দুমড়েমুচড়ে ভেঙে গেছে। ” ফুপ্পির বিষয় জানার পর মেঘের হৃদয়টা ভেঙে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে। চারমাসের প্রেমানুভূতি প্রকাশ করার আগেই সব শেষ হয়ে গেল। আবির ভাইয়ের প্রতি যে আকাশ সম প্রলয়লীলা , সবই ফিকে হয়ে গেছে। ফুপ্পি আর কাকামনির মনে কত ই না কষ্ট। এসব ভেবে কখন যে ঘুমিয়ে পরেছে নিজেও জানে না। আবিরের জন্য অপেক্ষা করার শক্তিটুকুও আজ ছিল না। আবির মেঘকে নামিয়ে দিয়ে আবার বিয়ের

প্রোগ্রামে গেছে। রাকিবের বেস্ট ফ্রেন্ড হিসেবে এসময় আবিরকে রাকিবের পাশে থাকা খুব বেশি প্রয়োজন। রাকিবের একমাত্র বোন জান্নাত। রাকিবের আর একটা ছোট ভাইও আছে। তবে বোনের প্রতি ভাইদের ভালোবাসা একটু বেশিই তীব্র হয়। সপ্তাহখানেক হয়ে গেছে। কিন্তু মেঘের মাথা থেকে ফুপ্পির ঘটনা কোনোভাবেই যাচ্ছে না। যতবার আব্বুকে আর বড় আব্বুকে দেখে ততবারই মনে হয় ওনারা হি*টলা*রের থেকেও নিকৃষ্ট। এতদিন আবির ভাইকে হি*টলা*র বলায় নিজেই অনুতপ্ত হচ্ছে। এখন আর মেঘ আগের মতো আবিরকে জ্বালায় না, আবিরের রুমে যায় না, অনুভূতি প্রকাশের চেষ্টাও করে না। আব্বু আর বড় আব্বুকে দেখলে যতটা রা*গ হয়, আবির ভাইকে দেখলে ঠিক ততটায় কষ্ট হয়। আজ তানভির প্রোগ্রামে ব্যস্ত। হঠাৎ ফোনে কল বাজতেছে। ফোন বের করে অবাক চোখে তাকায়। বন্যা কল দিচ্ছে। প্রোগ্রাম থেকে বের হয়ে এক পাশে গিয়ে ফোন রিসিভ করল। বন্যা- আসসালামু আলাইকুম। তানভির- ওয়ালাইকুম আসসালাম। বন্যা- ভাইয়া, আপনি কি বাসায়? তানভির- ভাইয়া ডাকতে কতবার না করেছি তোমায়! বন্যা-সরি, আর ভাইয়া বলবো না। মেঘের কি কিছু হয়েছে? আমি কল দিলে রিসিভ করে না। হঠাৎ রিসিভ করলেও ঠিকমতো কথা বলে না। তানভির- বনু একটু মানসিক চাপে আছে। কিছুদিনের মধ্যে ঠিক হয়ে যাবে। বন্যা- কি হয়েছে? বন্যা মনে মনে ভাবছে, আল্লাহ জানে আবির ভাইকে নিয়ে কোনো ঝামেলা ই হলো কি না! তানভির – তেমন কিছু না। তোমার কি খুব দরকার? কিছু বলার

থাকলে আমায় বলতে পারো আমি বনুকে জানিয়ে দিব নে। বন্যা আমতা আমতা করে বলল, “ঐরকম কিছু না। কথা হইতেছে না তাই চিন্তা হচ্ছিল। এজন্য আপনাকে কল দিলাম।” তানভির ঠান্ডা কণ্ঠে শুধালো, “আর কোনো কারণ নেই?” বন্যা আস্তে করে বলল, ” না মানে, আছে!” তানভির ধীর কণ্ঠে বলল, “বলো” বন্যা ঢোক গিলে ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করল, “আজকে কি আপনার একটু সময় হবে? ” তানভির ভ্রু কুঁচকে প্রশ্ন করল, “কেনো?” বন্যা একটু থেমে বলল, “আপনার সাথে কি দেখা করা যাবে? আপনি মেঘকে নিয়ে আসলে ভালো হতো। যদি আপনার সময় হয় আর কি!” তানভির জানাল, “বনুর মনের অবস্থা খুব একটা ভালো না। তারপরও আমি জিজ্ঞেস করব নে। বনু না আসলে কি আমি আসতে পারবো? নাকি দেখা করতে হলে বনুকে নিয়ে আসতেই হবে?” বন্যা কিছু বলছে না দেখে তানভির আবার বলল, “আমি বিকেলে কল দিব তোমায়। রাখছি এখন। ” তানভির ফোন রেখে আবিরকে কল দিল। আবিরের কড়া নিষেধ মেঘকে এখন কোথাও নেয়া যাবে না। মেঘের মন মেঘকেই ঠিক করতে হবে। সব বিষয়ে আবির বা তানভির মেঘকে সাহায্য করতে পারবে না। তানভির কি করবে বুঝতে পারছে না। মেঘকে জিজ্ঞেস না করলে বা মেঘের মতামত না নিলে, পরবর্তীতে বন্যা বিষয়টা জানলে তানভিরকে ভুল বুঝবে। আবার মেঘ যদি ঘুরতে যেতে রাজি হয়ে যায় তাহলে আবির তো তানভিরকে মে*রেই ফেলবে। দু-টানা কাটিয়ে শেষমেশ মেঘকে কল করল তানভির, মেঘ

তখন উপন্যাস পড়ায় ব্যস্ত। বাসায় শুয়ে বসে থেকে আর ভালো লাগছিল না। ফোন চাপতে গেলে আবির ভাইয়ের আইডি আসে সামনে।আবির ভাইকে দেখলেই বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠে। পড়াশোনার চাপ নেই। বাড়ির কারো সাথে কথা বলতে ভালো লাগে না। চুপচাপ শুয়ে বসে থাকলে বার বার শুধু ফুপ্পির কথা মনে পরে। এসবকিছু কাটাতে আবির ভাইয়ের দেয়া উপন্যাসের বই গুলো পড়া শুরু করেছে। বেশির ভাগ সময় উপন্যাস ই পড়ে। উপন্যাস পড়ার আরেকটা অন্যতম কারণ হলো নিজেকে সবার থেকে আড়াল করে রাখা। তানভির ২-৩ বার জিজ্ঞেস করেছে ঘুরতে যাবে কি না! কিন্তু মেঘের ঘুরতে যাওয়ার কোন ইচ্ছে নেই। বোন রাজি না হওয়াতে তানভিরের জন্য ভালোই হয়েছে। আবিরের কাছে ব*কা খেতে হয় নি। কিন্তু বন্যা দেখা করবে কি না কে জানে! বিকেলের দিকে প্রোগ্রাম শেষ করে তানভির বন্যাদের বাসার গলি পর্যন্ত গিয়ে বন্যাকে কল দিল। বন্যা কিছুক্ষণের মধ্যে রেডি হয়ে একটা শপিং ব্যাগ হাতে নিয়ে আসলো। তানভিরের সাথে একা ঘুরতে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল না বলেই মেঘকে আনতে বলছিল। কিন্তু মেঘ এলো না অথচ তানভির এসে দাঁড়িয়ে আছে। তাই বাধ্য হয়ে বন্যা বেরিয়েছে। ঘন্টাখানেক তানভিরের সাথে বাইকে ঘুরেছে, কিন্তু একবারের জন্যও তানভিরকে স্পর্শ করেনি। সন্ধ্যার দিকে রেস্টুরেন্টে বসে আছে বন্যা আর তানভির। বন্যা আশেপাশে একবার তাকিয়ে পরিস্থিতি বুঝার চেষ্টা করল, তারপর হাতের শপিং ব্যাগটা তানভিরের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল,

“এগুলো আপনার জন্য। ” তানভির বিস্ময় সমেত তাকিয়ে বলল, “আমার জন্য! ” বন্যা উপর নিচ মাথা নাড়লো। “কিন্তু কেন?” “আপনি দুবার আমায় ট্রিট দিয়েছেন, গিফটও দিয়েছেন। আমারও তো উচিত চান্স পাওয়ার খুশিতে আপনাকে কিছু দেয়া।” তানভির শপিং ব্যাগ টা নিজের কাছে এগিয়ে নিল। রেপিং এ মোড়ানো একটা বক্স খুলতেই চোখে পরলো একটা কালো চেইনের ঘড়ি। অনেক সুন্দর ডিজাইনের, মোটামুটি দামিও। তানভির ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ঘড়িটা দেখে বলল, “ঘড়িটা অনেক সুন্দর কিন্তু আমি তো ঘড়ি পড়ি না!” বন্যা আস্তে করে বলল, “ছেলেদের হাতে ঘড়ি থাকলে ভালো লাগে, তাই নিয়েছি। আপনি ঘড়ি পড়েন কি না তা তো আমি জানতাম না!” “ব্যাপার না। পছন্দ করে এনেছো তার জন্য ধন্যবাদ। ” এই বলে তানভির ঘড়িটা হাতে দিল। শপিং ব্যাগে আরেকটা সুন্দর ওয়ালেট। ওয়ালেট আর ঘড়ির বক্স শপিং ব্যাগে রেখে খাওয়াদাওয়া করে বন্যাকে বাসার কাছে পৌঁছে দিয়ে তানভির বাসায় আসছে। আবির ড্রয়িংরুমে বসে কফি খাইতেছিল। তানভিরের হাতে ঘড়ি দেখে কপাল কুঁচকে ঠাট্টা স্বরে বলল, ” কারো জন্য কেউ একজন তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে কত কাজ ই না করছে! অবশ্য এসব দেখতে ভালোই লাগছে। ” তানভির ঘড়ি পরা হাতটা নিজের পিছনে লুকিয়ে, মন খারাপ করে বলল, “মজা করছো !” আবির স্ব শব্দে হেসে উঠল। তানভির গাল ফুলিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠছে। আবির সোফায় বসে সেদিকে তাকিয়ে হেসেই যাচ্ছে। বেশকিছুদিন কেটে গেলো। খাবার টেবিলে

দেখা হয় মেঘ আবিরের। মেঘ দু একবার আবির ভাইয়ের দিকে তাকায়, চোখাচোখি হলেই চোখ নামিয়ে নেয় মেঘ। আবির সকালে খেয়ে অফিসে চলে যায়, মীম আর আদিও স্কুলে চলে যায়, মেঘ বাসায় একা একা থাকে। প্রতিদিন বিকেলে ছাদে যায়, গাছগুলোর দেখাশোনা করে। বাকি সারাদিন আবির ভাইয়ের দেয়া উপন্যাসের বই পড়ে। ২ টা উপন্যাস শেষ করে ফেলেছে। তৃতীয় উপন্যাসটা যত পড়ছে মেঘের মনের ভেতর প্রেমানুভূতি তত সক্রিয় হতে শুরু করেছে। ফিকে হয়ে যাওয়া অনুভূতিরা আবারও জাগ্রত হচ্ছে। আবির ভাইয়ের প্রতি ধারালো ভালোবাসার টানে ২৮ বছরের গত হয়ে যাওয়া ইতিহাসকে পেছনে ফেলে নতুন করে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে। “”হয়তো আবির ভাইকে পাওয়ার স্বপ্ন পূরণ হবে, নয়তো সারাজীবন আবির ভাইকে এক তরফা ভালোবেসে যাবে। তবুও মুখ লুকিয়ে, আবির ভাইকে এড়িয়ে চলবে না। “” রাত ১১ টার দিকে মেঘের ৩য় উপন্যাস পড়া শেষ হয়েছে। সেই থেকে আবির ভাইয়ের জন্য অপেক্ষা করছে। গত কিছুদিন যাবৎ আবির ভাইয়ের বাড়িতে আসা যাওয়াতে মেঘের বিশেষ কোনো নজর ছিল না। বাইকের শব্দ শুনেও বেলকনিতে যেতে ইচ্ছে হয় নি তার। আজ এতদিন পর মেঘ আবির ভাইয়ের জন্য বেলকনিতে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে। অথচ আবির ভাই ফিরছে না। আবির ইদানীং অফিস থেকে সন্ধ্যায় বাসায় ফিরে ঘন্টাখানেক পর আবার বের হয়। ফিরতে ফিরতে রাত ১২ টা বেজে যায়। যেহেতু মেঘ আবিরের সাথে কথা বলে না, আবিরের জন্য অপেক্ষা করে না তাই আবিরও নিজের

মতোই চলাচল করে। ১২ টার দিকে আবির বাসায় ফিরেছে। আবিরকে দেখেই মেঘ বেলকনি থেকে মিষ্টি করে হাসলো। এতদিন পর আজ মেঘের মুখে একটু হাসি ফুটেছে। আবির বাইক থেকে সেই দৃশ্য দেখল কি না কে জানে!আবির নিজের রুমে ফ্রেশ হতে চলে গেছে। মেঘ চুপিচুপি ড্রয়িং রুমে আসছে। এত রাতে কেউ ই সজাগ নেই। টেবিলের উপর আবিরের জন্য খাবার ঢেকে রাখা হয়েছে। মেঘ খাবারগুলো দেখছে। এরমধ্যে আবির নিচে নামলো। মেঘের থেকে কয়েক পা পিছনে দাঁড়িয়ে ডাকল, " কি করছিস এখানে " আবিরের কণ্ঠ শুনে, আতঙ্কে উঠে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালো মেঘ। মেঘ আবিরের চোখাচোখি হতেই আবির একটানা দুবার ভ্রু নাচালো। মেঘ নিঃশব্দে হেঁসে উঠলো। দীর্ঘ প্রতিক্ষার পর প্রেয়সীর মুখে হাসি দেখে আবিরের মন এক মুহুর্তেই শান্ত হয়ে গেছে। আবির চোখ বন্ধ করে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে নিজেকে সুস্থির করার চেষ্টা করল। মেঘ মাথা নিচু করে বলল, "আপনি এগুলো দিয়ে কিভাবে খাবেন। আপনাকে একটা ডিম ভেজে দেয়?" মেঘের এমন কথায় আবির চোখ মেলে তাকালো, ভারী কণ্ঠে জবাব দিল, "কোনো প্রয়োজন নেই। আমি খেতে পারবো।" আবির ভারী কণ্ঠে বললেও মেঘের সেসবে মাথা ব্যথা নেই। কারণ তার মাথায় উপন্যাসের প্রেমালাপ ঘুরপাক খাচ্ছে। সে আবার বলল, " আপনি তো বলেছিলেন পরীক্ষার পর রান্নাঘরে যেতে পারবো। পরীক্ষা তো শেষ। এখনও কি যেতে পারবো না?" আবির স্বাভাবিক কণ্ঠে প্রশ্ন করল, "তোর কি ডিমভাজা খেতে ইচ্ছে করছে? আমি করে নিয়ে

আসবো?” মেঘ ডানে-বামে মাথা নেড়ে বলল, “আমি ভাজবো।” আবির গম্ভীর কণ্ঠে শুধালো, “তুই ডিম ভাজতে পারিস?” মেঘ দাঁত কেলিয়ে হেসে বলল, “আম্মুরা ডিম ভাজার সময় আমি দেখেছি।” আবির পুনরায় বলল, ” তোর ভাজতে হবে না। তুই বস আমি ডিম ভেজে নিয়ে আসছি। ” মেঘ শক্ত কণ্ঠে বলল, “না, আমি আনবো।” আবির ধমক দিতে গিয়েও থেমে গেল। মেয়েটা এতদিন পর আবিরের সঙ্গে কথা বলতে আসছে। ধম*ক দিলে মনে কষ্ট পারে। তাই ধমক দিতে পারছে না। আবার ডিম ভাজতে পাঠাতেও সাহস পাচ্ছে না। আবির দু পা এগিয়ে থমকে দাঁড়ালো। সেখান থেকে ঘুরে এসে চেয়ার টেনে বসল। পকেট থেকে ফোন বের করে কিছু একটা চেক করছিল। একবার রান্নাঘরে তাকাচ্ছে একবার ফোনে। দুবার ডেকে বলেছে, “তুই কি পারবি নাকি আমি আসবো!” মেঘ দুবার ই উচ্চস্বরে বলেছে, “পারব” কিন্তু আবিরের কলিজা কাঁপছে। প্রথমবার মেঘ রান্না করতে গেছে। পেঁয়াজ কাটতে গিয়ে যদি হাত কে*টে ফেলে! কয়েকবার রান্নাঘরে দেখে যেই না ফোনের দিকে মনোযোগ দিয়েছে। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে মেঘ চিৎকার দিয়ে উঠেছে।মেঘের চিৎকারের শব্দে আবিরের হৃদয় কেঁপে উঠেছে।সহসা ফোন ফেলে ছুটে যায় রান্নাঘরে। গরম তেল ছিটকে পরেছে মেঘের হাতে,পায়ে। এত রাতে বাসার মানুষ সজাগ হলে ঝামেলা হবে ভেবে চি*ৎকার দিয়েই নিজের মুখ চেপে ধরেছে। ফ্লোরে বসে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে মেঘ। আবির চুলা বন্ধ করে, ঝড়ের বেগে টুথপেষ্ট নিয়ে আসছে। হাঁটু গেড়ে বসে

আলতো করে হাতে আর পায়ে পেস্ট লাগিয়ে দিচ্ছে। কয়েক মুহুর্তের মধ্যেই আবিরের শরীর ঘেমে একাকার অবস্থা। রক্তাভ দুচোখ মেঘের হাতে পায়ে নিবদ্ধ। বুকের ভেতর হৃদপিণ্ডটা অবিরাম কাঁপছে। মেঘের হাতে পায়ে পেস্ট লাগিয়ে ফুঁ দিয়ে দিচ্ছে। মেঘ কেঁদেই যাচ্ছে, তবে এই ক্রন্দন শব্দহীন। আবির ভ্রু কুঁচকে, নিজের ভেতরে থাকা সবটুকু আক্রোশ কণ্ঠে ঢেলে দাঁতে দাঁত চেপে বলল, "আমায় না জ্বালালে কি তোর শান্তি হয় না?" আবির ভাইয়ের রাগান্বিত কণ্ঠ শুনে মেঘ জলসিক্ত চোখে আবিরের মুখের পানে তাকায়। চোখ পড়ে রক্তাভ দুচোখে , এই চোখে অসহায়ত্ব স্পষ্ট প্রতীয়মান হচ্ছে। আবিরের নিঃশ্বাসের মাত্রা তীব্র, কপালে বিদ্যমান ঘামের বিন্দুগুলো চিকচিক করছে। আচমকা আবির মেঘকে কোলে তুলে নেয়, ওমনি মেঘের চক্ষু চড়কগাছ। এক মুহুর্তেই কান্না থেমে গেছে, অবাক চোখে তাকিয়ে আছে আবিরের মুখের পানে। আবির কোনোদিকে না তাকিয়ে মেঘকে নিয়ে সোফায় বসিয়ে ঠান্ডা কণ্ঠে শুধালো, "এখনও জ্বলতেছে?" মেঘ এপাশ-ওপাশ মাথা নেড়ে "না" করল। আবির মেঘের হাতে- পায়ে ফুঁ দিতে দিতে হঠাৎ অত্যন্ত নমনীয় স্বরে বলে উঠল, " কথা বললে কেন কথা শুনিস না, তেলটা যদি আর একটু বেশি পরতো কি তখন কি হতো বল !" মেঘ অপলক দৃষ্টিতে আবিরের দিকে তাকিয়ে আছে। আবির ভাইয়ের বলা কথাটা মেঘের কলিজায় লাগছে। আবির ভাইয়ের এত কোমল কণ্ঠ কোনোদিন শুনেনি সে। মেঘের অপলক দৃষ্টিতে আবিরের অদ্ভুত ঘোর কাজ করছে। কোনোমতে চোখ নামিয়ে শুধালো,

“রাতে খাইছিস?” মেঘ আস্তে করে বলল, “না” আবিরের মেজাজ খারাপ হলো, কপাল কুঁচকে মেঘের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, “এত রাত হয়ে গেছে, খাস নি কেন?” মেঘ যে উপন্যাস পড়তে পড়তে ১১ টা বাজিয়ে ফেলেছে, তারপর থেকে আবির ভাইয়ের অপেক্ষাতে আছে। এ কথা আবির ভাইকে কিভাবে বলবে সে! মেঘের হাত আর পায়ের দিকে একবার দেখে ঠান্ডা কণ্ঠে বলল, “এখানে চুপচাপ বসে থাক, আসছি আমি। ” কিছুক্ষণের মধ্যে আবির আরেকটা ডিম ভেজে ভাত নিয়ে আসছে। মেঘ নির্বাক চোখে চেয়ে আছে। হৃদপিণ্ডের ধুকপুকানি শুরু হয়ে যাচ্ছে। আবির ভাই খাবার নিয়ে আসছে। আবির ভাই কি খাইয়ে দিবেন! এসব ভেবেই অস্থির হয়ে যাচ্ছে। জ্বরের ঘোরে প্রথমবার মেঘকে আবিরের খাইয়ে দেয়ার অনুভূতি ঠিকমতো বুঝতে না পারলেও আজ সে অনুভব করতে পারছে। খুব যত্নসহকারে মেঘকে খাইয়ে দিচ্ছে আবির, পানির গ্লাসটাতে পর্যন্ত ছুঁতে দিচ্ছে না। খাওয়া শেষে মেঘের হাত আর পা পরিষ্কার করে ফ্রিজ থেকে দই বের করে দিয়েছে। এরমধ্যে কম করে হলেও ১০০ বার প্রশ্ন করে ফেলছে, জ্বলছে কি না, ব্যথা করছে কি না, মেঘের থেকেও আবির যেন কয়েক গুণ বেশি দুশ্চিন্তায় আছে। আবিরের আতঙ্কিত কণ্ঠস্বর শুনে মেঘ বারবার অবাক চোখে তাকাচ্ছে। আবির ভাইয়ের এই আচরণ কি ভাইয়ের প্রতি বোনের ভালোবাসা? নাকি অন্য কিছু! অন্য কিছু ভেবেও বারবার আটকে যাচ্ছে, মনে পড়ে যাচ্ছে ফুপ্পিকে নিয়ে আবির ভাইয়ের বলা কথাগুলো। মেঘকে কোলে নিয়ে রুম পর্যন্ত দিয়ে আসছে। ৩ দিন

হয়ে গেছে মেঘের হাতে পায়ে তেল পরেছে । ভাগ্য ভালো ছিল বলে মেঘের হাতে ফোসকা পরে নি, তবে দাগ হয়ে আছে। এই দাগ মুছতে বেশকিছুদিন লাগবে।পে সময় চলমান। মেঘ আর বন্যা দুজনই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হয়েছে। ক্লাসও শুরু হয়ে গেছে। মায়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পেয়েও ভর্তি হয় নি। তার পছন্দমতো জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে। পাখি এখনও ভর্তি হয় নি। বন্যা আর মেঘের নতুন তিনজন বান্ধবী হয়েছে। লিজা, সাদিয়া আর মিষ্টি। আর দুজন ছেলে বন্ধুও হয়েছে। মিনহাজ আর তামিম। মিনহাজের সাথে বন্ধুত্বটা খুব অদ্ভুতভাবে হয়েছে। প্রথমদিন মেঘ আর বন্যা আশপাশ দেখতে দেখতে ডিপার্টমেন্টে হাঁটছিল। এক ছেলে একটা রুম থেকে দৌড়ে বের হচ্ছিলো। মেঘ আর বন্যা অন্যমনস্ক থাকায় বিষয় টা খেয়াল করে নি। ছেলেটা কাছাকাছি আসতেই মেঘ দ্রুত সরতে গিয়ে হাতে ব্যথা পেয়েছিল। অথচ ছেলেটা মেঘ আর বন্যাকে দেখে দৌড় থামিয়ে উচ্চস্বরে চেঁচিয়ে উঠে, ” দেখে চলতে পারো না! কোন ইয়ার? ” বন্যা আস্তে করে বলে, “প্রথম বর্ষ।” ছেলেটা বিরক্তির স্বরে “ওহ” বলে চলে যায়। বন্যা আর মেঘ দুজনেই আহাম্মকের মতো চেয়ে থাকে। ছেলের হাবভাবে মনে হয়েছিলো সিনিয়র কোনো ভাইয়া । তারপর যখন দেখলো এই ছেলে ওদের সাথেই পড়ে তখন দুই বান্ধবী তেলে বেগুনে জ্বলে উঠেছিল। এরপর থেকে ছেলে বেশ কয়েকবার মেঘ আর বন্যার সঙ্গে কথা বলতে আসছে। প্রথমদিনের দুষ্টামির জন্য প্রতিদিন কম করে হলেও ১০ বার

করে মাফ চাই। বন্যা আর মেঘকে এখন “আপু” বলে ডাকে। সেই মিনহাজের সাথে ভর্তির দিন থেকে তামিমের পরিচয়। আস্তে আস্তে ভালো বন্ধুত্ব হয়ে গেছে । মিনহাজের মাধ্যমে বন্যা আর মেঘের সঙ্গেও তামিমের খুব ভালো বন্ধুত্ব হয়ে গেছে। আজ শুক্রবার, বাড়িতে মীম, আদি আর মেঘের হৈচৈ চলছে। আবির সকাল সকাল উঠে নাস্তা করে বেশখানিকটা সময় ধরে ভাই বোনদের দুষ্টামি দেখছে। দুপুরের পরপর আবিরের বড় মামা আসছেন। ওনার বড় মেয়ে মাইশাকে ছেলে পক্ষ দেখতে আসবে তাই ওনি সবাইকে দাওয়াত দিতে আসছেন। যদি পছন্দ হয় তাহলে বিয়ের দিনতারিখ ঠিক হয়ে যাবে। আলী আহমদ খান স্বাভাবিক কণ্ঠে বললেন, “আমি এখন যেতে পারবো না , আপনি বরং আবিরের মা কে নিয়ে যান। বিয়ে ঠিক হোক, বিয়ের সময় সবাই যাব। ইনশাআল্লাহ। ” বড় মামা আবিরের দিকে তাকাতেই আবির বলে উঠল, ” বড়মামা,আমায় যেতে বলো না প্লিজ। আমার অনেক কাজ আছে। তুমি আসছো যেহেতু আম্মুকে আজই নিয়ে যাও এতে কোনো সমস্যা নেই। তবুও আমায় যেতে বলো না। ” বড় মামা একটু রেগে বললেন, “এখন তোদের সমস্যা শুনছি কিন্তু বিয়ের সময় আমি কারো কোনো সমস্যা শুনতে চাই না। আমার মেয়ের বিয়েতে সবাইকে উপস্থিত থাকতে হবে। ” আবির ঠান্ডা কণ্ঠে বলল, “যদি চাও সবাই মাইশা আপুর বিয়েতে উপস্থিত থাকুক তাহলে আগামী মাসের মাঝামাঝি তে তারিখ দিও। বাকিটা তোমাদের ইচ্ছে। ” এই বলে আবির চলে গেছে। আগামী মাসে মীম আদির বার্ষিক পরীক্ষা শেষ

হবে, তারপর বিয়ে হলে সবাই যেতে পারবে। এজন্যই আবির বিয়ের তারিখ আগামী মাসের মাঝামাঝি দিতে বলেছে। কয়েকদিন পর সকাল বেলা খাবার টেবিলে সবাই একসাথে খাবার খাচ্ছিল। আলী আহমদ খান হঠাৎ ই বলে উঠলেন, "আবির, তোর কি কিছুদিন সময় হবে?" আবির বাবার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, "কেনো?" আলী আহমদ খান বললেন, " তোকে রাজশাহী যেতে হতো!" আবির ভাই রাজশাহী যাবে শুনেই মেঘ আঁতকে উঠে। ঘুম থেকে উঠে আর রাতে ঘুমাতে যাওয়ার পূর্বে আবির ভাইকে দেখা মেঘের নিত্যদিনের অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে। আবির ভাইকে রাজশাহী যেতে হবে শুনে অষ্টাদশীর মন সহসা খারাপ হয়ে গেছে। আবির কিছু বলার আগেই পাশ থেকে ইকবাল খান ওঠে বেসিনের দিকে চলে গেছেন। আবির একবার বেসিনের দিকে দেখে পরক্ষণেই মেঘের দিকে এক পলক তাকালো। মেঘ মাথা নিচু করে বসে আছে। আবির ভারী কণ্ঠে বলল, "ঠিক আছে। কবে যেতে হবে? " মোজাম্মেল খান বললেন, "আগামীকাল গেলে ভালো হবে। " কেউ আর কোনো কথা বলছে না, তানভির কিছু একটা বলতে গিয়েও থেমে গেছে। আবির খাবার শেষ করে অফিসের জন্য বেরিয়ে পরেছে। বিকেলের দিকে মেঘের ঘুম ভাঙে, ফ্রেশ হয়ে বেলকনিতে দাঁড়াতেই দেখল নিচে আবির ভাইয়ের বাইক রাখা। তারমানে আবির ভাই বাসায়, মেঘ রুম থেকে বেড়িয়ে আবিরের রুমের দরজায় পা রাখতে রাখতে ডাকল, "আবির ভাই! " পর্দা সরাতেই চোখে পরলো রাকিব ভাইয়া সহ আরও ৩-৪ টা ছেলে। মেঘ

সঙ্গে সঙ্গে দরজা থেকে সরে গেছে। মেঘ ওড়না মাথায় দিতে ব্যস্ত। আবির দরজা পর্যন্ত এসে বলল, “কি হয়েছে, বল!” মেঘ মোলায়েম কণ্ঠে বলল, “ছাদে যাব। চাবিটা কি দেয়া যাবে? ” আবির স্বাভাবিক কণ্ঠে উত্তর দিল, “তুই দাঁড়া। আমি নিয়ে আসছি!” রুমে ঢুকতেই রাকিব বলে উঠল, “বাহ! আবির, বাহ! এখন থেকেই বউ কে” এতটুকু বলতেই আবির রাকিবের মুখ চেপে ধরে বিড়বিড় করে বলল, “মুখটা বন্ধ রাখ, ও বাহিরে আছে, শুনতে পাবে । ” উচ্চস্বরে রাসেল, লিমন, মোবারক আর শিশির বলে উঠল, “.....ও.....” আবির রাকিবকে ছেড়ে ছাদের চাবি মেঘকে দিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে বলল, ” ১ ঘন্টার মধ্যে নিচে আসবি। ” মেঘ “আচ্ছা” বলে যেতে নিয়ে আবার থমকে দাঁড়ালো। আবির তখনও দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। মেঘকে দাঁড়াতে দেখে প্রশ্ন করল, “আবার কি হলো?” মেঘ আস্তে করে বলল, ” রাকিব ভাইয়া বাসায় আসছে, ভালোমন্দ খবর নেয়া দরকার না? ” আবির কপাল কুঁচকে তাকালো, ধীরস্থির কণ্ঠে বলল, “এখানে রাকিব ছাড়াও আরও কয়েকজন আছে। সবার সাথে কথা বলার আপাতত কোনো প্রয়োজন নেই। আর তোর পক্ষ থেকে আমি রাকিবের খবর নিব নে। যা এখন। ” ঘরে ঢুকতেই সবাই একসাথে বলে উঠল, “এখনই এই অবস্থা আবির! ” আবির বিরক্তির স্বরে বলল, “কি অবস্থা? ” “এখনই ও বলে সম্বোধন করিস। বিয়ের পর কি বলবি?” আবির ঠাট্টার স্বরে বলল, “ওগো, হে গো, জান, কলিজা,ফুসফুস , ময়না, টিয়া, টুনটুনি কতকিছুই আছে।” শিশির বলে

উঠল, “ফাজলামো বাদ দিয়ে বিয়ে টা তাড়াতাড়ি কর। আমরা তোর প্রণয়ের শুভ পরিণত দেখতে চাই। ” আবিরের মুখের হাসি মুহুর্তেই গায়েব হয়ে গেছে। ধপ করে বিছানার পাশে বসে গুরুভার কণ্ঠে বলল, ” যদি পারতাম সেই কবেই ওরে আমার রানী বানিয়ে ফেলতাম। পারছি না তো!” রাসেল স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, “সেসব বাদ দে। তোর এখন রাজশাহী যাওয়ার কি দরকার বলতো! এই সপ্তাহে আমাদের মিটিং হওয়ার কথা ছিল। তুই চলে গেলে কিভাবে হবে?” আবির বলল, “আমায় যেতে হবে। মিটিং পরে করব। ” লিমন সচেতন কণ্ঠে শুধাল, “তোর ইকবাল চাচ্চুকে পাঠালেই হয়। এমনিতেও ওনিই তো বেশিরভাগ দায়িত্ব সামলান। ” আবির ভারী কণ্ঠে বলল “ওনি সিলেট আর চট্টগ্রামের সব দায়িত্ব সামলান। ওনার রাজশাহী যাওয়া বারণ। ” “কেন?” লিমন প্রশ্ন করল। আবির বলা শুরু করল, “অনেক বছর আগের ঘটনা, যখন রাজশাহীতে প্রথমবার কোম্পানির কাজ শুরু হয়েছিল, তখন বেশ কয়েক বছর কাকামনি রাজশাহীতে ছিলেন। ঐখানে যেই বাসাতে ছিলেন। ঐ বাসার মালিকের মেয়েকে কাকামনির ভালো লাগতে শুরু করে। মালিকের মেয়েরও কাকামনিকে ভালো লাগে। ধীরে ধীরে ওনাদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠে। কিছুদিনের মধ্যে মালিকের পরিবার বিষয়টা জানতে পারে। তাদের দিক থেকে আপত্তি ছিল না। বিয়েও করিয়ে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু কাকামনি চেয়েছিল পরিবার নিয়ে গিয়ে বউ উঠিয়ে আনবে। সেই যে রাজশাহী থেকে বাসায় আসছিল আব্বু আর চাচ্চুকে নিতে। ঐ

দিনের পর থেকে আজও রাজশাহীতে পা দিতে পারেন নি। বিয়ে তো করতে পারেই নি, রাজশাহী পর্যন্ত যেতে পারেন না। জোর করে আব্বু চাচ্চুর পছন্দে কুমিল্লা থেকে কাকিয়াকে বিয়ে করিয়ে এনেছেন। মনের বিরুদ্ধে গিয়েও সংসারে মনোযোগ দিতে হয়েছিল। সংসারে মনোযোগ আনার পেছনে পুরো ক্রেডিট কাকিয়ার। ওনি অনেক ভালো মানুষ, ওনি কাকামনির পাশে বন্ধুর মতো ছিলেন। এখন পর্যন্ত রাজশাহীর বেশিরভাগ কাজ চাচ্চু করেন, এই প্রথম আমি যাব। " শিশির দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, "তোর কি হবে রে আবির!" আবির মুচকি হেসে উত্তর দিল, "সিদ্ধান্ত তো কবেই নিয়ে নিয়েছি, মেঘকে পেলে বাঁ*চবো, আর না হয় _" রাসেল প্রশ্ন করল, "তোর বাবা আর চাচার সমস্যা কি?" আবির দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, "সমাজ। ওনারা সমাজের চোখে ভালো থাকতে আপন মানুষদের মনকে হাজার বার খু*ন করতে পারেন।" অফিসিয়াল কিছু বিষয় নিয়ে বেশকিছুক্ষণ আলোচনা চলল। এরমধ্যে মেঘ এসে চাবি দিয়ে গেছে। সন্ধার দিকে রাকিব রা চলে গেছে। রাকিবদের গেইট পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে ফেরার পথে মেঘের দরজার সামনে আবির দাঁড়িয়ে পরলো। দরজা ধাক্কা দিয়ে তাকাতেই চোখে পরলো, মেঘ টেবিলের উপর মাথা নিচু করে বসে আছে। আবির মোলায়েম কণ্ঠে বলল, "আসবো?" মেঘ মাথা তুলে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকিয়েছে। অশ্রুসিক্ত লোচনে তাকালো, ওমনি গাল বেয়ে নোনাজল গড়িয়ে পড়তে শুরু করে । আবিরকে দেখে মেঘ আবার মাথা নিচু করে ফেলেছে। আবির এগিয়ে এসে মেঘের পাশে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করল,

“চা খাবি নাকি কফি? ” এমন প্রশ্ন শুনে পুনরায় মুখ তুলে আবিরের মুখের পানে তাকালো। এইযে সে কান্না করছে। কই একটু সান্ত্বনা দিবে, তা না । মেঘ মনে মনে ভাবছে, “কখন কি বলতে হয় এই বে*টা কি কিছুই জানে না!” মেঘের বৃহৎ অক্ষি যুগল আবিরের চোখে নিবদ্ধ। গাল বেয়ে এখনও নোনাজল গড়িয়ে পরছে। আবিরের ওষ্ঠদ্বয় কিছুটা প্রশস্ত হলো, কণ্ঠ খাদে নামিয়ে বলল, “এইযে কান্না করছিস, একটু পর ই তো মাথা ব্যথা শুরু হবে। তুই নিজের চিন্তা না ই করতে পারিস। আমার তো করতে হবে। ” মেঘ সিক্ত আঁখিতে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, “আপনার চিন্তা করতে হবে কেন?” আবির একটু ভেবে বলল, “কাঁদতে কাঁদতে যদি চোখে অন্ধকার দেখিস, তখন সবাই তোকে কা*নি বলবে। তানভিরের কত কষ্ট ই না হবে, যখন সবাই ওকে কা*নির ভাই বলবে। ” আবির স্ব শব্দে হাসছে। আর মেঘ নির্বাক চোখে তাকিয়ে আছে। আবির হাসি থামিয়ে বলল, “চা খাবি নাকি কফি খাবি এটা বল। তারপর কান্না করিস। ” মেঘ কপাল গুটিয়ে বলল, “কফি ” আবির মুচকি হেসে বলল, “গুড গার্ল। এবার কান্না শুরু কর। আমি আসার আগ পর্যন্ত কাঁদবি, এক সেকেন্ডের জন্য থামবি না। রেডি ” মেঘ আহাম্মকের মতো চেয়ে আছে। আবির হাসতে হাসতে রুম থেকে বেরিয়ে গেছে ।কিছুক্ষণের মধ্যেই আবির দু কাপ কফি নিয়ে আসছে। কফির কাপ দুটা টেবিলের উপর রেখে পকেট থেকে একটা গাদাঁ ফুল বের করে মেঘের কানে গুঁজে দিল। আবিরের কর্মকাণ্ড দেখে মেঘ অভিভূতের ন্যায় চেয়ে আছে। নিষ্পলক দৃষ্টি তার।

আবির ভাই নিজের হাতে কানে ফুল গুঁজে দিচ্ছে এটা অনুভব করতেই মেঘের হৃদপিণ্ড দ্বিকবিদিক ছুটাছুটি শুরু করে দিয়েছে। আবিরের প্রতি অষ্টাদশী এতটায় আসক্ত হয়ে গেছে যে দিবারাত্রি শুধু আবির ভাইকে নিয়েই স্বপ্ন দেখে। তাই কোনটা বাস্তব আর কোনটা কল্পনা সেটায় মাঝে মাঝে গুলিয়ে ফেলে। আবির মেঘের দিকে তাকিয়ে শান্ত কণ্ঠে বলল, "মাশাআল্লাহ, আমার ফুল ছেঁড়াটা সার্থক হলো।" মেঘ জানালার গ্লাসের দিকে তাকিয়ে নিজেকে দেখল, এলোমেলো কালো চুলে মধ্যে হলুদ রঙের ফুলটাকে অসম্ভব সুন্দর লাগছে। পরক্ষণে নিজের চোখ-মুখের দিকে নজর পরতেই গ্লাস থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিল। কান্নার তোপে মুখমণ্ডল লাল হয়ে গেছে, নিজের বিষন্ন মুখশ্রী দেখতে কারোর ই ভালো লাগে না। আবির ঠান্ডা কণ্ঠে বলল, "কফিটা খা। " আবির কফির কাপ হাতে নিয়ে বিছানার পাশে বসেছে। কফির কাপে দু চুমুক দিয়ে রাশভারি কণ্ঠে বলে উঠল, " নিজেকে এতটা উৎপীড়িত ভাবিস না, মুখ লুকিয়ে কান্না তারাই করে যাদের নিজের প্রতি কোনো আস্তা নেই। " মেঘের নিস্তব্ধতা দেখে আবির দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে পুনরায় বলল, "তুই যত কাঁদবি, মানুষ তোকে আরও বেশি কাঁদাতে চাইবে। কিছু মানুষের কাজ ই হলো অন্যের দূর্বল জায়গাতে আঘাত করা। ভার্সিটিতে পড়ছিস, নতুন বন্ধু হচ্ছে। আর যাই করিস, কখনও নিজের দূর্বলতা কারো কাছে প্রকাশ করবি না। " মেঘ মনোযোগ দিয়ে কফি খাচ্ছে আর আবিরের কথা শুনছে। আবির ভাইয়ের প্রতি অষ্টাদশীর নিষিদ্ধ প্রেমানুভূতি এতটায় প্রখর

হতে শুরু করেছে, যা প্রকাশ করতেও সাহস পাচ্ছে না, প্রকাশ না করেও থাকতে পারছে না। যতবার ই ভাবে আবির ভাইকে নিজের মনের কথা বলবে, ততবার ই ফুপ্পির কথা মনে পরে যায়। ফুপ্পির কথা মনে হলেই শুধু কান্না পায়। আবির ভাই রাজশাহী চলে যাবে শুনে এমনিতেই মন খারাপ ছিল। তারমধ্যে সন্ধ্যাবেলা জান্নাত আপু কল দিয়েছে, জান্নাত আপুর ফোন দিয়েই ফুপ্পির সাথে কথা বলেছে। ফুপ্পির কান্না শুনে মেঘও কান্না শুরু করে দিয়েছে। বার বার শুধু মনে হয়, এই বাড়ির মানুষগুলো এত নিষ্ঠুর কেন! আব্বু- বড় আব্বু কিভাবে পারছেন বোনকে রেখে এতগুলো বছর কাটাতে! ওনাদের কলিজা কি একটাবারের জন্যও কেঁপে উঠে না? তানভির ভাইয়াও তো মেঘের সাথে এতবছর যাবৎ এমনটায় করে আসছেন। যদি জানতে পারে মেঘ আবির কে ভালোবাসে, তাহলে আব্বু-বড় আব্বুর মতো দুইভাই নিশ্চিত এমন আচরণ ই করবে! এসব ভেবেই মেঘ কাঁদছিল। মেঘ আস্তে করে বলল, “জান্নাত আপু কল দিয়েছিল।” আবির ঠান্ডা কণ্ঠে জবাব দিল, “আমি জানি, ফুপ্পির সঙ্গে তোর কথা হয়েছে এটাও জানি। ” মেঘ শীতল কণ্ঠে শুধালো, ” ফুপ্পি কি আমাদের বাসায় আসবেন না? ফুপ্পির জন্য আমার খুব কষ্ট হচ্ছে। ” কথাটা বলেই মেঘ আবারও কান্না শুরু করে দিয়েছে। আবির অত্যন্ত ধীর কণ্ঠে বলে উঠল, “তুই একমাসেই এত অধৈর্য হয়ে যাচ্ছিস, অথচ ফুপ্পি ২৮ বছর যাবৎ এই কষ্ট সহ্য করেই বেঁচে আছেন। ফুপ্পি কিছু বললে তুই যদি সঙ্গে সঙ্গে কান্না শুরু করিস, তখন তো ফুপ্পি আরও বেশি ভেঙে

পরবেন। নিজেকে আগে শক্ত কর। ফুপ্পির সাথে খুব শীঘ্রই সম্পর্ক ঠিক করার চেষ্টা করবো।" একটু থেমে আবার বলল, "ফুপ্পির সাথে কথা বললে একটু সাবধানে বলিস, বাড়ির কেউ যেন কোনোভাবে কিছু বুঝতে না পারে। " মেঘ শীতল কণ্ঠে জবাব দিল, "আচ্ছা। " আবির আরও কিছুটা সময় নিয়ে মেঘকে বুঝানোর চেষ্টা করল। তারপর নিজের রুমে চলে আসছে। আবির নিজের রুমে ব্যাগ গুছাচ্ছিল। হঠাৎ তানভির দরজা থেকে ডাকল, "ভাইয়া, আসবো!" "আয়!" তানভির কয়েক কদম এগিয়ে বিছানার পাশে দাঁড়ালো। আবির শার্ট ভাজ করতে করতে প্রশ্ন করল, " কিছু বলবি?" "হ্যাঁ" "বল" " বনুরা ইদানীং মিনহাজ আর তামিম নামের দুটা ছেলের সঙ্গে কথা বলে, ওরা একই ডিপার্টমেন্টে পড়ে। তুমি কি এই বিষয়ে কিছু জানো?" আবির ধীর কণ্ঠে উত্তর দিল, "জানি। " "তাহলে কিছু বলছো না কেন?" আবির নিশ্চুপ। তানভির পুনরায় বলল, "আমি ছেলে দুটার খোঁজ নিয়েছি। তুমি বললে আমি বনু বা ঐ ছেলেগুলোর সঙ্গে কথা বলি?" আবির এখনও নিশ্চুপ। সে ব্যাগ গুছানোতে ব্যস্ত। তানভির আবারও বলল, " ভাইয়া, আমি কি ওদের ওয়ার্নিং দিব?" আবির ভারী কণ্ঠে বলল, "কোনো প্রয়োজন নেই। " "কেন?" "এমনি। যদি পারিস আমি ফেরার আগ পর্যন্ত একটু খেয়াল রাখিস। " "তা তো রাখবোই। কিন্তু " "তুই যা এখন। " তানভির রুম থেকে বেরিয়ে গেছে, সঙ্গে সঙ্গে রাকিব কে কল দিয়ে সব জানিয়েছে। ১০ মিনিটের মধ্যে রাকিব আবিরকে কল দিয়েছে। আবির কল রিসিভ করেই গম্ভীর কণ্ঠে বলল,

“তুই ও কি একই বিষয়ে কথা বলতে ফোন দিছিস?” রাকিব চিন্তিত কণ্ঠে শুধালো, “তোর সমস্যা কি?” আবির বিরক্তির স্বরে জানাল, “সমস্যা নেই। ” “তুই কি বিষয় টা কে গুরুত্ব দিচ্ছিস না? ওয়ার্নিং দিলেই ঠিক হয়ে যাবে। তুই শুধু বল ওয়ার্নিং দিব কি না! বিষয়টা আমি বা তানভির ই সামলাতে পারবো। ” আবির কণ্ঠ দ্বিগুণ ভারি করে বলল, “ওয়ার্নিং দেয়ার হলে আমি প্রথম দিন ই দিতাম। এতদিন অপেক্ষা করতাম না। ” “কিছু বলছিস না কেন, তুই কি মেঘের প্রতি ..... ” রাকিবের কথা শেষ করার আগেই আবির রাগান্বিত কণ্ঠে চিৎকার দিয়ে উঠলো, “থাম! মেঘকে ছাড়া আমি আমার অস্তিত্ব কল্পনা করতে পারব না। ওকে নিয়ে আমি কোনোপ্রকার নেগেটিভ কথা শুনতে চাই না। ” “তাহলে বিষয়টাকে গুরুত্ব কেন দিচ্ছিস না?” “আমি মেঘকে চাই, আমৃত্যু আমি ওকে ই চাইব। মেঘ ব্যতীত এই আবিরের হৃদয় স্পর্শ করার সাধ্যি পৃথিবীর কারোর নেই।কিন্তু আমি চাইলেই তো হবে না। মেঘকেও তো বুঝতে হবে, ওর মনে আমার জন্য সমপরিমাণ ভালোবাসা আছে কি না! এই আবির কি মাহদিবা খান মেঘের হৃদয়ে তোলপাড় চালাতে সক্ষম কি না! এটা তাকে ই বুঝতে হবে। ” একটু থেমে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে আবার বলে উঠল, “কতদিন আর সবকিছু থেকে ওকে আঁটকে রাখব। এখন ভার্সিটিতে পড়ছে, চারপাশে কত চাকচিক্যময় পরিবেশ। সবকিছুর ভিড়ে ওর মন যদি আমায় খোঁজে নেয়, তবেই না আমার ভালোবাসা পূর্ণতা পাবে!” রাকিব রাগান্বিত কণ্ঠে বলল, “তোর এই পাগলামির পরিণাম খুব

ভয়ানক হবে। মিলিয়ে নিস। এখনও সময় আছে, তুই শুধু একবার বল।” আবির কণ্ঠ তিনগুণ ভারী করে বলা শুরু করল, “জীবনটা তো এমনিতেই তছনছ হয়ে গেছে। ভয়ানক পরিণামের আর কি ই বা বাকি আছে! তুই বিশ্বাস কর রাকিব, ওরে কাঁদতে দেখলে আমার কলিজা কেঁপে উঠে। মনে হয়, আমার হৃদপিণ্ড টা কে কেউ অবিরত ছু*রি দিয়ে আ*ঘাত করছে। আর যখন বুঝতে পারি এই কান্নার কারণ টা আমি, তখন নিজেকে বড্ড অপরাধী মনে হয়। এই জীবন তো আমি চাই নি রাকিব। ওকে কাঁদাবো বলে তো ভালোবাসি নি! তবে কেন আমার সাথেই এমনটা হলো। ” রাকিব কথা খোঁজে পাচ্ছে না, আমতা আমতা করে বলল, “থাক চিন্তা করিস না, সব ঠিক হয়ে যাবে। ইনশাআল্লাহ। ” আবির আর কোনো কথা বলে নি। ফোন কেটে দিয়েছে। ভোর বেলা রওনা দিতে হবে। ব্যাগ গুছিয়ে ঘুমিয়ে পরেছে। আবির রাজশাহীতে গেছে তিনদিন হলো। আজকে মালিহা খান ভাইয়ের বাড়ি থেকে ঘুরে আসছেন। মাইশার বিয়ে আগামী মাসের মাঝামাঝিতে ঠিক করা হয়েছে। ততদিনে মীম আর আদির পরীক্ষা শেষ হয়ে যাবে। মীম আর আদি র সামনে পরীক্ষা বলে লেখাপড়া একটু বেশি করতে হচ্ছে। আকলিমা খান ছেলে মেয়েকে পড়ানোতে ব্যস্ত। মেঘ শুয়ে বসে আর টিভি দেখে দিন কাটায়। সন্ধ্যার পর মেঘ টিভিতে প্রোগ্রাম দেখছিল, মালিহা খান মেঘের পাশের সোফায় বসে শান্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, “তোর ভাইয়ের সাথে কি আজকে কথা হয়ছে?” মেঘ টিভির থেকে মনোযোগ সরিয়ে বড় আম্মুর দিকে

তাকিয়ে বলল, “কোন ভাই?” মালিহা খান ভণিতা ছাড়াই বললেন, “আবিরের সাথে কি আজকে কি কথা হয়ছে? ” মেঘ ঠান্ডা কন্ঠে উত্তর দিল, “আমার সঙ্গে তো কথা হয় নি, সকালে আম্মুর সাথে কথা হয়ছিল।” মালিহা খান কিছুটা গম্ভীর কন্ঠে বললেন, “তোরা ভাই-বোনেরা এমন কেন? আমার ভাইয়েরা বিয়ের এতবছর পরেও প্রতিদিন কেউ না কেউ ফোন দিয়ে, আমার খোঁজ খবর নেয়। আর তোরা এখন ই কথাবার্তা বলিস না।তোদের বিয়ে দিলে শ্বশুর বাড়ি থেকে তো জীবনেও ভাইদের খবর নিবি না। ” বিয়ের কথা শুনেই মেঘের মন খারাপ হয়ে গেছে। বাবা-মা, বড় আম্মু, কাকিয়া, ভাই-বোনদের ছেড়ে যেতে হবে ভেবে এতবছর বিয়ের কথা শুনলেই মেঘের রাগ উঠে যেতো। এখন সবার সঙ্গে আরও একজন ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। আবির ভাইয়ের প্রতি তার অসীম ভালোবাসার পরিণাম কি হবে! আবির ভাই ছাড়া অন্য কাউকে নিয়ে ভাবতেই পারে না সে। মালিহা খান আদেশের স্বরে বললেন, “আবির কে একটা কল দে তো! আমি সকাল ১১ টায় কল দিলাম, বিকেলেও দিলাম কিন্তু তোর ভাই তো কল ধরছে না। কল দিয়ে দেখ তো ধরে কি না!” মেঘ পাশ থেকে ফোন নিয়ে আবিরের নাম্বারে ডায়াল করল। কয়েকবার রিং হওয়ার পর ই রিসিভ হলো। মেঘ তৎক্ষনাৎ বড় আম্মুর দিকে ফোন এগিয়ে দিল। আবির “তি..” বলতেই মালিহা খান বলে উঠলেন, “সারাদিন কই ছিলি? সকালেও কল দিলাম, বিকালেও কল দিলাম! ” আবির বিস্ময় সমেত তাকিয়ে ভারী কন্ঠে বলে,

“আম্মু!” মালিহা খান পুনরায় বললেন, “কোথায় আছিস?” আবির ঢোক গিলে তপ্ত স্বরে বলল, “ভুলে ফোন রেখে অফিসে চলে গেছিলাম। মাত্রই রুমে আসছি। ” আবিরের আম্মু মুখ গোমড়া করে বললেন, ” ফোন যে রেখে গেছিলি, সেটা কি জানানোর দরকার ছিল না? আমি চিন্তায় চিন্তায় অস্থির হয়ে যাচ্ছিলাম। ” আবির ঠান্ডা কণ্ঠে উত্তর দিল, “আম্মু তোমাকে তো বলেছি, আমার জন্য এত চিন্তা করো না। তুমি কখন আসছো সেটা বলো।” “আসছি দুপুরের পরে। মাইশার বিয়ে ঠিক হয়ছে। আগামী মাসে। শুন, তোর মামা সহ বাড়ির সবাই কম করে হলেও ১০০ বার করে বলে দিছে যেন তুই বিয়েতে যাস। ” “সেসব নিয়ে ভাবার সময় আছে। তোমার শরীরের কি অবস্থা? ” “আলহামদুলিল্লাহ, সুস্থ আছি । তুই কেমন আছিস বাবা ? কবে আসবি? ” “আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। কবে আসবো এখনও বলতে পারছি না। কেন?” “তুই আসলেই বলবো। ” “আচ্ছা। মেঘ কোথায়?” “এখানেই আছে।” “ফোনটা ওকে দাও তো!” নে, তোর ভাই কথা বলবে। এই বলে ফোনটা মালিহা খান মেঘের দিকে এগিয়ে দিল। মেঘ কাঁপা কাঁপা হাতে ফোনটা নিল। আবির ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলতে গেলে এখনও অস্বস্তিতে ভোগে মেয়েটা। মেঘ ফোন হাতে নেয়ায় মালিহা খান উঠে রান্নাঘরের দিকে চলে গেছেন। মেঘ ফোন কানে ধরে শীতল কণ্ঠে সালাম দিল। আবির সালামের উত্তর দিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে শুধালো, “তুই যে কাজগুলো করিস এগুলো কি বুঝে করিস?” মেঘ ভয়ে ভয়ে শুধালো, “কি?” “তুই যে হুট করে আম্মুর

কাছে ফোন দিয়ে দিলি। আমি তো তুই ভেবে কথা বলছিলাম। যদি কিছু বলে ফেলতাম।” “কি বলে ফেলতেন ” “সে যায় বলি, এমন কাজ আর কখনও করবি না। ফোন কাউকে দেয়ার আগে বলে তারপর দিবি। মনে থাকবে?” “হ্যাঁ। ” “আগেও কি কল দিছিলি?” মেঘ আস্তে করে বলল, “না। ” “তা দিবি কেন, আমি বাড়িতে না থাকলে তো তোর ঈদ লেগে যায়। নিজের মতো চলতে পারিস, সবকিছু করতে পারিস। ” মেঘ বিড়বিড় করে বলল, “আপনাকে কল দিতে ভয় লাগে!” কথাটা শুনামাত্র আবিরের মেজাজ খারাপ হয়ে গেছে, কপাল গুটিয়ে অত্যন্ত পুরু কণ্ঠে বলল, ” খুব ভালো, আমার মাথা ব্যথা করছে । রাখছি।” মেঘ আর কিছুই বলতে পারলো না। আবির কল কেটে দিয়েছে। অষ্টাদশী মন খারাপ করতে চেয়েও করতে পারলো না। তিনদিন পর আবির ভাইয়ের সাথে একটু হলেও কথা হয়েছে, এতেই মন টা হালকা হয়ে গেছে। তবে আবির ভাইয়ের মাথা ব্যথা শুনে চিন্তাও লাগছে। খাওয়াদাওয়া শেষ করে রাতে শুয়ে শুয়ে ভাবছে আবির ভাইকে কল দিবে কি না! ভাবতে ভাবতে ডায়াল করল আবিরের নাম্বারে। অষ্টাদশীর বুকে ধুকপুকানি শুরু হয়ে গেছে। বার বার মনে হচ্ছে শ্বাস আটকে আসছে, শুয়া থেকে উঠে বসেছে। আবির ফোন রিসিভ করেই বলল, “Sorry” “কেন?” “সন্ধ্যার আচরণের জন্য। ” মেঘের অক্ষি যুগল কোটর ছেড়ে বাহিরে আসতে চাইছে। আবির ভাই তাকে সরি বলছে। এটাও কি সম্ভব! মেঘ কোমল কণ্ঠে শুধাল, “আপনার মাথা ব্যথা কি কমেছে? ” আবির ঠাট্টার স্বরে বলল,

“যদি বলি কমেছে তাহলে কি কথা বলবি না ?” মেঘ ভণিতা ছাড়াই বলে উঠল, “বলবো। ” আবির মৃদু হেসে বলল, “তারমানে কথা বলতে ফোন দিছিস?” মেঘ আমতা আমতা করে উত্তর দিল, “নাহ” আবির ভ্রু কুঁচকে প্রশ্ন করল, “তাহলে ফোন কেন দিছিস?” মেঘ মন খারাপ করে বলল, “জানি না। ” আবির স্ব শব্দে হেসে বলে, “হায় আল্লাহ! এত কনফিউজড! ” হাসি থামিয়ে আবির স্বাভাবিক কণ্ঠে বলে উঠল, “চিন্তা করিস না। খাবার খেয়ে ঔষধ খাইছিলাম এখন মাথা ব্যথা কমেছে। তুই কি করিস?” “আমি বসে আছি। ” “খাইছিস?” “হ্যাঁ” “ক্লাসে গেছিলি?” “জ্বি” মেঘ মোলায়েম কণ্ঠে বলল, “আবির ভাই! ” সেই সুপরিচিত কণ্ঠে আবির বলে, “হুমমমমমমম” মেঘ চোখ বন্ধ করে সেই শব্দ টা অনুভব করার চেষ্টা করল।তারপর ঢোক গিলে নিজেকে সংযত করে প্রশ্ন করল, “আপনি বাসায় আসবেন কবে?” আবির নিজের চুল ঠিক করতে করতে বলল, “বাসার কেউ তো আমার কথা মনে করেই না। তাই ভাবছি এখানেই থেকে যাবো।” আবিরের কথায় মেঘের অভিমান হলো। মেঘ বিছানা থেকে নেমে বেলকনিতে গিয়ে দাঁড়ালো। নিচে রাখা আবিরের বাইকটা দেখে মুচকি হেসে বলল, ” আচ্ছা, সাবধানে থাকবেন। দোয়া করি ভালো থাকুন। রাখছি। ” আবির উচ্চস্বরে বলে উঠল, “এই,Wait ” মেঘ মৃদু হেসে শুধালো, “কিছু বলবেন?” আবির দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে উত্তর দিল, “কাজ শেষ করতে পারলে পরশু চলে আসবো, ইনশাআল্লাহ। ” মেঘ ভাব নিয়ে প্রশ্ন করল, “কোনো ঐখানে থাকবেন না?” আবির দাঁত চিবিয়ে

চিবিয়ে উত্তর দিল, “সেটা সময় বলে দিবে। ” মেঘ মোলায়েম কণ্ঠে বলল, “আমি মজা করছিলাম। সাবধানে থাকবেন। এখন রাখছি। ” ” আচ্ছা। তুই ও সাবধানে থাকিস। ” মেঘ বেলকনিতে দাঁড়িয়ে ফোনে আবিরের ছবি দেখায় ব্যস্ত। প্রতিটা ছবিতেই আবির ভাইকে অসম্ভব সুন্দর লাগছে। এত সুদর্শন কোনো পুরুষ হতে পারে, এটা আবির ভাইকে না দেখলে মেঘের বিশ্বাস ই হতো না। আবির ভাইয়ের বলা প্রতিটা কথায় অষ্টাদশীর হৃদয়ে দোলা দিচ্ছে। এই কয়েকমাসে আবির ভাই অষ্টাদশীর পুরো পৃথিবী দখল করে ফেলেছে।এতগুলো ছবি দেখলো কিন্তু একটা ছবিতেও হাসির ছিটেফোঁটা নেই। অথচ ঐ মানুষটা নিজেও জানে না, ওনার হাসিটা অষ্টাদশীর অতীব প্রিয়। মেঘের মাঝেমাঝে মনে হয়, ফুপ্পির মতো আমার জীবনটাও যদি এমন হয়। পরক্ষনেই ভাবে, “ফুফার মতো আবির ভাই কি কোনোদিন ভালোবাসবেন আমায় ? ” আজ সেই কাঙ্ক্ষিত দিন। আবির ভাই আসবে বলে মেঘ দুপুর থেকে বেলকনিতে অপেক্ষা করছে। অথচ আবির ফেরার কোনো নামগন্ধ নেই। বার বার ফোন হাতে নিচ্ছে কিন্তু কল দেয়ার সাহস হচ্ছে না। কিছুক্ষণ পর মীম রুমে আসছে। মীম- আপু, কি করো? মেঘ বেলকনি থেকে রুমে ঢুকতে ঢুকতে বলল, “এমনি দাঁড়ায় ছিলাম। তোর হাতে ঐটা কি? ” মীম- আপু জানো আমার এক বান্ধবী এটা দিয়েছে। সুন্দর না? মেঘ হ্যান্ড প্রিন্ট করা ট্রিশার্ট টা হাতে নিয়ে দেখলো। মেঘ- অনেক সুন্দর হয়েছে। তোর বান্ধবী করেছে? মীম- না,আমার বান্ধবীর বড় বোন । অনলাইন থেকে

শিখে নাকি করছে। আপু চলো না আমরাও শিখি! মেঘ- তোর শিখতে হবে না। সামনে তোর পরীক্ষা না, আমি শিখে তোকে একটা জামা ডিজাইন করে দিব নে। মীম- আপু সত্যি? মেঘ একগাল হেসে উত্তর দিল, "সত্যি সত্যি সত্যি। খুশি?" মীম মেঘকে জরিয়ে ধরে বলল, "অনেক খুশি। " মীম মেঘের রুম থেকে বের হতেই আবিরের সাথে দেখা। মীম হাসিমুখে প্রশ্ন করল, "ভাইয়া, কেমন আছেন?" ভাইয়া শব্দ শুনেই মেঘের হৃৎস্পন্দন বেড়ে যাচ্ছে। মেঘ দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেল দরজার দিকে। আবির স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, "আলহামদুলিল্লাহ ভালো। তুই কেমন আছিস?" "ভালো।" "নিচে তোদরে জন্য খাবার রেখে আসছি। যা" মীম চলে গেছে। মেঘের হাতে মীমের দেয়া টিশার্ট টা। ডিজাইন দেখার জন্য রাখছিল। আবির মেঘের দিকে তাকিয়ে পরপর দুইবার ভ্রু নাঁচালো। সহসা মেঘের মুখে হাসি ফুটে উঠেছে। আবির মেঘকে আপাদমস্তক দেখে কপাল কুঁচকে বলল, "হাতে ওটা কি?" মেঘ টিশার্ট টা খুলে দেখালো, আর বলল এটা মীমের বান্ধবী মীমকে দিয়েছে। আবির কপাল কুঁচকে পুনরায় শুধালো, "তো এটা তোর কাছে কেন?" মেঘ আস্তে করে বলল, "আমি হ্যান্ড প্রিন্টিং শিখবো।" আবির দ্বিগুণ ভারী কণ্ঠে শুধালো, "কোথা থেকে? " মেঘ চট করে উত্তর দিল, "অনলাইনে " কথাটা শুনে আবির স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। মৃদু হেসে উত্তর দিল, "আচ্ছা শিখিস। যা যা লাগে বলিস আমায়। এনে দিব নে। " পকেট থেকে দুটা কিটকেট চকলেট বের করে মেঘকে দিয়ে নিজের রুমে চলে গেছে। মেঘ দরজায় দাঁড়িয়ে

আবিরের হাঁটার দিকে তাকিয়ে আছে। ২ দিন পর আবিরের মামাতো বোন মাইশার বিয়ে। আবিরের মামা দিনে কয়েকবার করে ফোন দিচ্ছেন। বাসায় এসেও সবাইকে বলে গেছেন। আবির সন্ধ্যার দিকে ছাদের এক পাশে বসে আছে। তানভির পিছন থেকে ডাকল, "ভাইয়া। " আবির পিছনে না তাকিয়েই উত্তর দিল, "এদিকে আয়। " তানভির আবিরের কাছে আসতে আসতে ভারী কণ্ঠে বলল, " আগে থেকেই বলা ছিল, এখন থেকে তোমার বউ তুমি সামলাবে। নিজের বউ নিজে নিয়ে যাও বিয়েতে, আমায় যেতে বলো না। " আবির- তুই বিয়েতে যাবি না? তানভির – আমি কিভাবে যাবো বলো, সামনে সভাপতি নির্বাচন। এই অবস্থায় আমার পক্ষে তিন-চার দিনের জন্য বিয়েতে যাওয়া অসম্ভব। তুমি যাও সমস্যা নেই। আমি বিয়ের দিন যাব। আবির গম্ভীর কণ্ঠে বলল, "আমার তো যেতে সমস্যা ছিল না। কিন্তু" "কিন্তু কি?" "মালা র জন্য একটু টেনশন হচ্ছে। গত দুই বছর যাবৎ মেয়েটা আমায় অতিরিক্ত জ্বালাইতেছে। দিনে-রাতে শুধু মেসেজ আর কল দেয়। সব ঝামেলার মূলে আমার বাসার মানুষ। মালা ফোন কিনছে ভালো কথা, আম্মুর আমার নাম্বারটা কেন দিতে হলো । প্রথমবার ভালোভাবে কথা বলছি, সম্পর্কে মামাতো বোন আমিও ঐভাবেই কথা বলছি। এরপর থেকে প্রায় ই কল দেয়, কয়েকবার নরমাললি কল রিসিভ করেছি, আমি মামা-মামির সাথে কথা বলি আর ঐ মেয়ে দেখি কেমন করে তাকায় থাকে। যখন তখন ফোন দেয়, কি উল্টাপাল্টা কথা বলে। ধমক দিলে মামা বা মামির হাতে ফোন ধরিয়ে

দেয়। মামা-মামিকে তো কিছু বলতে পারি না। না পারছিলাম নাম্বার ব্লক করতে, না পারছিলাম ভালো ভাবে কথা বলতে। এখন তো বিয়ের জন্য ঐ বাড়িতে যেতে হবে। ঐ মেয়ের আচরণ দেখে তোর বোন না আবার হাইপার হয়ে যায়, এই চিন্তায় ভালো লাগছে না। " "এত কাহিনী তো আমায় বলো নি!" "অসহ্যকর বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেও আমার অসহ্য লাগে। " তানভির একটু ভেবে বলল, " ভাইয়া ভেবো না, তোমার একটা থাপ্পড় খাইলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।" আবির বিরক্তির স্বরে জানাল, "বাসায় যেদিন আসছিল ঐদিন ই থাপ্পড় দিতে ইচ্ছে হয়ছিল। তোর বোন ব্যতীত আমি স্ব ইচ্ছায় কোনো মেয়েকে ছুঁতে চাই না বলে ঐ মেয়ে এখনও আমার থাপ্পড় খায় নি। " "এখন কি করবা?" আবির দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, "যদি মালার কারণে মেঘের চোখ থেকে এক ফোঁটা পানিও পরে, মালার খবর আছে। আমি ভুলে যাবো সে আমার বোন হয়। " তানভির ভীত স্বরে বলে, "ভাইয়া,তোমার রাগটা কন্ট্রোলে রাইখো প্লিজ। বনুরে মালার থেকে দূরে দূরে রাইখো। আর পারলে বনুরে একটু সময় দিও। "তানভিরের সাথে বেশকিছুটা সময় কথা বলে আবির নিচে আসছে। মেঘ সোফায় বসে টিভি দেখতেছে। ড্রয়িং রুমে আর কেউ নেই। আবির মেঘকে দেখেও না দেখার মতো করে রান্নাঘরে চলে গেছে। নিজের জন্য কড়া করে এক কাপ কফি করেছে। কফির কাপটা হাতে নিয়ে আবির সিঁড়ির দিকে যাচ্ছে । মেঘ কপাল কুঁচকে এক দৃষ্টিতে আবির ভাইকে দেখছে। আবিরের মনের ভেতরের দুশ্চিন্তাগুলো চেহারায় ভেসে উঠছে।

অষ্টাদশী আবিরের তামাটে চেহারা দেখে বুঝার চেষ্টা করছে, আবির ভাইয়ের কি হয়েছে। মেঘ একবার ভাবছে জিজ্ঞেস করবে, কিন্তু সাহস ও হচ্ছে না। আবির সিঁড়ি পর্যন্ত যেতেই মালিহা খান নিজের রুম থেকে বের হতে হতে আবিরকে ডাকলেন। আবির সিঁড়ির পাশে দাঁড়িয়ে পরেছে। মালিহা খান সোফায় এসে বসলেন, আবিরের দিকে তাকিয়ে বললেন, "তোর সাথে কথা আছে। " আবির নির্বিকার কণ্ঠে বলল, "আম্মু, তুমি যে বিষয় নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছো, সেই বিষয়ে আমি কথা বলতে চাই না বলেই রাজশাহী থেকে ফেরার পর থেকে তোমার সাথে দূরত্ব রেখে চলছি। " "কথা বলতে চাই না বললেই কি সবকিছু এড়িয়ে যেতে পারবি? তোর কি বিয়ের বয়স হয় নি? বিয়ে কি করবি না?" আবির তপ্ত স্বরে জানাল, " বিয়ে করার সময় হলে নিজেই তোমাদের বলবো। " মালিহা খান শুষ্ককণ্ঠে বলে উঠলেন, " আমি আমার ছেলের এই রূপ দেখব বলে ছেলেকে বিদেশে পাঠায় নি। তোকে এতো মনমরা দেখতে আমার ভালো লাগে না। আমি চাই তুই বিয়ে কর। " একটু থেমে পুনরায় বললেন, "জান্নাত মেয়েটাকে আমার খুব ভালো লাগছিল।এতদিন মেঘের টিউটর ছিল, এখন তো আর সে আমাদের বাসায় পড়ায় না। মেয়েটার খোঁজ নিতে তো সমস্যা নেই। " আবির নিশ্চুপ। মেঘ হা হয়ে তাকিয়ে আছে বড় আম্মুর মুখের পানে।মেঘের চোখে মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ। কিভাবে বলবে জান্নাত আপুর যে বিয়ে হয়ে গেছে, তাও আবার আসিফ ভাইয়ার সঙ্গে। মেঘ সহসা আবিরের মুখের পানে তাকালো। মালিহা খান মেঘের দিকে তাকিয়ে

বললেন, “তোর কাছে জান্নাতের নাম্বার আছে ?” মেঘ বলে, “জান্নাত আপুর... ” মেঘের কথার মাঝে আবির বলে উঠে, “ওর কাছে নাম্বার থাকবে কোথা থেকে।তুমি কি শুরু করছো আম্মু। মেয়েটা পড়াতে আসছিল, পড়াইছে, আলহামদুলিল্লাহ মেঘ চান্স পাইছে। মেয়েটাকে দাওয়াত দিয়ে খাওয়াতে চাইছো, গিফট দিতে চাইছো সব ইচ্ছে ই পূরণ করা হলো। এরপরও এই বিষয় নিয়ে কথা কেন উঠে?” মেঘ আহাম্মকের মতো আবিরের দিকে চেয়ে আছে। বলে দিলেই হয়, জান্নাত আপুর বিয়ে হয়ে গেছে। আবির মেঘের দিকে চোখ রাঙিয়ে ইশারা করল, যাতে কিছু না বলে। আবির দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে পুনরায় বলল, “সামনে মাইশা আপুর বিয়ে তুমি বরং সেদিকে মনোযোগ দাও। আর বিয়ে বাড়িতে গিয়ে কোনোভাবে আমার বিয়ের কথা তুললে, আমি কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বিয়ে বাড়ি থেকে চলে আসবো। কথাটা মাথায় রেখো।” মেইনগেইট থেকে ভেতরে দু কদম এগিয়ে আলী আহমদ খান উচ্চস্বরে বললেন, “হয়ছে টা কি? মা ছেলের মধ্যে কি নিয়ে মনোমালিন্য চলছে?” আবির মায়ের দিকে তাকিয়ে ধীর কণ্ঠে বলল, “আব্বুকে কিছু বলবা না কিন্তু। ” বাবার দিকে তাকিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে বলল, “কিছু না । ” আবির চলে গেছে। বড় আব্বুকে দেখে মেঘ ও টিভি বন্ধ করে চলে যাচ্ছে। আলী আহমদ খান সোফায় বসতে বসতে মালিহা খানকে শুধালেন, “কি হয়ছে?” মালিহা খান মনমরা হয়ে উত্তর দিলেন, “কি আর হবে! বিয়ের কথা বলছিলাম এজন্য রাগারাগি করছে। ” আলী আহমদ খান ভারী কণ্ঠে বললেন, “তুমি ছেলেরে আর

কিছু বইলো না । মাথাটা একটু ঠান্ডা হোক আমিই কথা বলবো।” মালিহা খান শীতল কণ্ঠে জানালেন, “ঠিক আছে।” আজ মাইশার গায়ে হলুদ। মালিহা খান আর আলী আহমদ খান গতকাল ই বিয়ে বাড়িতে চলে গেছেন। মালিহা খান মাইশাদের বড় ফুপ্পি তাই ওনার দায়িত্বও একটু বেশি। আরও আগেই যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু অসুস্থতার কারণে আলী আহমদ খান স্ত্রীকে একা ছাড়তে রাজি নন। ডাক্তার দেখিয়ে গতকাল ওনি নিজেই নিয়ে গেছেন। তানভির ব্যতিত বাকিরা আজ বিয়ে বাড়িতে যাবে। আগে থেকেই বলা,আবির ইকবাল খানের গাড়ি নিয়ে যাবে। মামনি, কাকিয়া, মেঘ,মীম আর আদিকে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব আবিরের। মোজাম্মেল খান আর ইকবাল খান অফিস করে বিকেলের দিকে রওনা দিবেন। সকাল থেকে সাকিব আবিরকে কলের পর কল দিয়েই যাচ্ছে। যেন, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিয়ে বাড়িতে উপস্থিত হয়। সকালের নাস্তা করে ইকবাল খান আর মোজাম্মেল খান অফিসের উদ্দেশ্যে বেড়িয়ে পরেছেন। বাকিরা রেডি হচ্ছে। গায়ে হলুদের পাঞ্জাবি, শাড়ি নেয়ার দায়িত্ব ছিল আবিরের। নিজের কিছু জামাকাপড় সহ, সব ব্যাগ গাড়ির ডিকিতে রাখতে গিয়ে হঠাৎ কিছু একটা মনে করে বাড়ির ভেতরে ঢুকছে আবির। মীম,আদি, মামনিরা ততক্ষণে রেডি হয়ে মেঘকে ডাকতে ডাকতে বেরিয়ে পড়ছেন। কাকিয়া আবিরকে জিজ্ঞেস করলেন, “আবার কোথায় যাচ্ছিস?” উত্তরে আবির জানাল, “ওয়ালেট টা রুমে ফেলে আসছি। তোমরা গাড়িতে বসো আমি এখনি আসছি।” হালিমা খান পুনরায়

ডেকে বললেন, “মেঘ রেডি হলো কি না একটু দেখিস তো। ”
আবির ” আচ্ছা ” বলে সিঁড়ি দিয়ে দ্রুত পায়ে উঠে রুম থেকে ওয়ালেট আর একটা জ্যাকেট নিয়ে বের হয়েছে। জ্যাকেট টা পড়ে ওয়ালেটটা চেক করতে করতে মেঘের দরজা পর্যন্ত এসে ডাকলো, “আর কতক্ষণ লাগবে তোর?” আবিরের কণ্ঠ শুনে মেঘ চমকে উঠে। ত্রস্ত ঘুরে দাঁড়ালো সে। সঙ্গে সঙ্গে বিছানা থেকে জ্যাকেট টেনে গায়ে জরিয়ে নিয়েছে। মেঘের হুড়োহুড়ি কর্মকাণ্ডে আবির মেঘের দিকে তাকালো। মেঘের গায়ে এমনভাবে জ্যাকেট জড়ানো দেখে আবির কয়েক সেকেন্ডের জন্য স্থির দৃষ্টিতে তাকায়। মেঘ চিবুক নামিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মেঘ কালো রঙের একটা গাউন পড়েছে, সাথে আবিরের গিফট করা একটা গর্জিয়াছ হিজাবও পরেছে। মেঘকে দেখতে এত মায়াবী আর মোহময় লাগছে যে আবির দৃষ্টি সরাতে পারছে না। মেঘকে আপাদমস্তক দেখে আবির মেঘের আঁতকে উঠার কারণ টা বুঝার চেষ্টা করল। যদিও কিছু বুঝতে পারে নি তবুও আবির চোখ নামিয়ে “Sorry” বলে রুম থেকে বের হতে যাচ্ছিলো। মেঘ অস্বস্তি কাটিয়ে ডাকল, “আবির ভাই! ” আবির দরজার বাহির থেকে উত্তর দিল, “হুমমমমমমম।” “মীমকে একটু ডেকে দিবেন, প্লিজ। ” আবির বেলকনি থেকে ড্রয়িংরুমে একবার তাকালো। কোথাও কেউ নেই। আবির উচ্চস্বরে জানালো, “সবাই বের হয়ে গেছে, মীমও গাড়ির কাছে চলে গেছে। কোনো সমস্যা? আমি কি কোনোভাবে হেল্প করতে পারবো? ” মেঘ কি করবে বুঝতে পারছে না। মীমকে বেশ কয়েকবার

ডেকেছে। আদি আর মীম হৈ-হুল্লোড় করে বেড়িয়ে গেছে তাই মেঘের ডাক মীম আর শুনে নি। আবির ভাইকে বলবে কি না বুঝে উঠতে পারছে না। মেঘকে নিস্তব্ধ থাকতে দেখে আবির পুনরায় মেঘের রুমে ঢুকেছে। আবির রুমে ঢুকতেই মেঘ আঁতকে উঠল। বৃহৎ চোখে তাকালো। আবির ভ্রু কুঁচকে প্রশ্ন করল, "কি হয়েছে? " মেঘ চিবুক নামিয়ে নিল।মেঘ এখনও জ্যাকেট জরিয়েই দাঁড়িয়ে আছে। অষ্টাদশীর অশান্ত মন কেমন করে কাঁপছে। কথা আঁটকে আসছে, মাথা নিচু করে অনেক কষ্টে বলল, "জামার চেইন টা লাগাতে পারছি না। " আবির স্বাভাবিক ভঙ্গিতে মেঘের কাছে এগিয়ে এলো। আবিরের আগানোতে অষ্টাদশীর হৃৎস্পন্দনের মাত্রা বাড়তে শুরু করেছে। আবির মেঘের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে শান্ত কণ্ঠে বলল, "ঐদিকে ঘুর। " মেঘ না চাইতেও আবিরের দিকে পিঠ করে দাঁড়ালো। জ্যাকেট টা ধরে রাখার শক্তিটুকু পাচ্ছে না। আবির জ্যাকেটে হাত দিতেই মেঘ জ্যাকেট ছেড়ে দিয়েছে। পড়ে যেতে নিলে আবির তাড়াতাড়ি জ্যাকেট টা ধরে বিছানার উপর রাখল। হিজাব দিয়ে সম্পূর্ণ পিঠ ঘুরা। আবির অতি সন্তর্পণে পিঠ থেকে হিজাব টা সরায়, সহসা অষ্টাদশীর উজ্জ্বল বর্ণের পিঠ উন্মুক্ত হয়। না চাইতেও আবিরের নজর পরে সেই অচ্ছদ পৃষ্ঠে যেখানে পাশাপাশি দুইটা কৃষ্ণবর্ণের বিউটিস্পট ঝলমল করছে। আবির ঢোক গিলে দৃষ্টি সরিয়ে নিল, আবিরের বক্ষপিঞ্জরে আবদ্ধ হৃদপিণ্ডটা দিগবিদিক ছুটছে। যেন পাঁজরের হাড় ভেঙ্গে বেড়িয়ে আসবে এখনি । আবিরের সর্বাঙ্গ ঘামতে শুরু করেছে । আবিরের হাত কাঁপছে। অন্য

দিকে তাকিয়ে কাঁপা কাঁপা হাতে জিপারের স্লাইডারে ছুঁতে গেলে উষ্ণ হস্তের তিন আঙ্গুল মেঘের উন্মুক্ত পিঠ স্পর্শ করে। আবির আর মেঘ দুজনের গাত্র এবার একসঙ্গে কম্পিত হলো। আবিরের স্পর্শে অষ্টাদশীর অঙ্গে অব্যক্ত শিহরণ জাগছে। দেহের প্রতিটা শিরা-উপশিরায় তুফান শুরু হয়ে গেছে। কয়েক সেকেন্ডের ব্যবধানে শরীরের প্রতিটা লোম দাঁড়িয়ে পরেছে।মেঘ চোখ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে, তবে তার দাঁড়িয়ে থাকার শক্তি ক্রমশ কমে আসছে। আবির তাড়াহুড়ো করে স্লাইডার টেনে উপরে উঠিয়ে দ্রুত পায়ে রুম থেকে বের হয়ে গেছে। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে পড়নের জ্যাকেট টা খুলে ফেলল। মনে হচ্ছে সারাশরীর থেকে গরম বাতাস বের হচ্ছে। চোখের সামনে বার বার প্রেয়সীর উন্মুক্ত পৃষ্ঠ ভেসে উঠছে। নিচে এসে চেয়ার টেনে বসে, এক নিঃশ্বাসে এক গ্লাস পানি শেষ করল । দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে নিজেকে ধাতস্থ করার চেষ্টা করল। পকেটে থাকা ফোনটা অবিরত ভাইব্রেশন হচ্ছে । ফোন বের করে কল রিসিভ করল, সাকিব কল দিয়েছে। কথা বলতে বলতে মেইন গেইট পেরিয়েছে। মামনি আর কাকিয়া গাড়িয়ে বসে আছেন। মীম আর আদি ছুটোছুটি করছে। কে সামনে বসবে সেটা নিয়েই দুই ভাইবোন বিবাদ করছে। আবির কে বের হতে দেখেই দুজন শান্ত হয়ে গেছে। অন্যদিকে আবিরের প্রস্তানের পরপরই অষ্টাদশী ধপ করে বিছানায় বসে পরেছে। উন্মুক্ত পৃষ্ঠে আবির ভাইয়ের স্পর্শ অনুভব করতেই বার বার শিহরিত হচ্ছে মেঘের গাত্র। যাও ভেবেছিল জ্যাকেট টা পরবে কিন্তু এখন মনে হচ্ছে

গ্রীষ্মের প্রখর রোদে পুড়ছে তার দেহ। কিছুক্ষণের মধ্যে নিচে নামলো মেঘ। আবির গেইটে তালা ঝুলিয়ে গাড়ির কাছে আসতেই শুনতে পেল তিন ভাইবোনের কথোপকথন। তিনজন ই সামনে বসার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে । আবির সেদিকে মনোযোগ না দিয়ে ড্রাইভিং সীটে বসে পরলো। আকলিমা খান গাড়ির ভেতর থেকে ডাকলেন, "কিরে, তোরা কি গাড়িতে উঠবি?" মেঘ বাকিদের উদ্দেশ্যে বলছে, "শুন, আবির ভাই যেই রা*গি, গাড়িতে বসে ঘাড় ঘুরালেই দিবে মা*ইর। তোরা কেউ সামনে বস। আমি বরং পিছনেই বসবো।" মেঘের কথা শুনে মীম আর আদি দুজন দুজনের দিকে তাকালো। আদি দৌড়ে এসে মায়ের পাশে বসে পরেছে। আদির পিছন পিছন মীমও ছুটে এসে বলছে, "আমিও আম্মুর সাথে যাব। " মেঘ মনমরা হয়ে বলল, "কি আর করার, তাহলে তো আমাকেই সামনে বসতে হবে।" উপরে উপরে মনমরা ভাব দেখালেও মনের ভেতরে তার রাজ্য জয়ের খুশি। আদি একগাল হেসে বলল, "মেঘাপু তুমি ই বরং সামনে বসো।" মেঘ যে মনে মনে তাই চাইছিল এটা তো আর তারা জানে না। আবির ভাই গাড়ি চালাবে আর মেঘ পিছনে বসবে তা হতেই পারে না। গতকাল রাত থেকেই প্ল্যান করে রেখেছে যেভাবেই হোক তাকে সামনে বসতেই হবে। মেঘ মিটিমিটি হেসে গাড়িতে উঠেছে। আবির এতক্ষণ বেখেয়ালি থাকলেও পুরো ঘটনায় সে মনোযোগ দিয়ে শুনেছে। গাড়ির জানালা দিয়ে বাহিরের দিকে তাকিয়ে হাত দিয়ে মুখ ঢেকে মুচকি হাসল। আবির চাইলেই সবার মধ্যে মেঘকে সামনে বসতে বলতে

পারতো না। মেঘ যে নিজে থেকে আবিরের পাশে বসার চেষ্টা করেছে এতেই আবিরের মন প্রশান্তিতে ভরে গেছে। দিনকে দিন মেঘের করা পাগলামি গুলো আবিরকে তার প্রেয়সীর প্রতি আরও বেশি আসক্ত করে তুলছে। খান বাড়ির রাজপুত্র আর রাজকন্যারা ঢাকা থেকে ত্রিশালের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেছে। আবিরের মামার বাড়ি ময়মনসিংহ বিভাগের ত্রিশালে। যানজট পেরিয়ে আসতে অনেকটায় সময় লেগে যায়। আবির পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে গাড়ি চালাচ্ছে। মেঘ একবার রাস্তার দিকে দেখছে, মাঝে মাঝে আড়চোখে আবিরকেও দেখছে। আবিরের দিকে যতবার তাকায়, ততবারই বাসার ঘটনার কথা মনে পরে যায়। প্রতিবারই অষ্টাদশী লজ্জায় নুইয়ে পড়ে। আকলিমা খান আর হালিমা খান সাংসারিক আলোচনা করতে ব্যস্ত। গাজীপুর চৌরাস্তা পেরিয়ে কিছুদূর যাওয়ার পর আবির গাড়ির কাঁচ নামিয়ে দিয়েছে। শীতল পরিবেশ, রাস্তার পাশে বিশাল আকৃতির গাছ। মেঘ একমনে তাকিয়ে সেসব দৃশ্য দেখছে, আর আপনমনে কতকি ভাবছে। অষ্টাদশীর অশান্ত মনে ছুটোছুটি করছে কতশত প্রেমময় বার্তা। আচমকা আবির রাস্তার পাশে গাড়ি থাকাতে মেঘ সহ বাকিরাও চমকে উঠে। আবির মামনি আর কাকিয়ার উদ্দেশ্যে বলে, “তোমরা একটু বসো। আমি আসছি। ” ৫ মিনিটের মধ্যে একটা শপিং ব্যাগ আর কিছু খাবার নিয়ে গাড়িতে উঠেছে। খাবার গুলো মীমদের দিয়ে শপিং ব্যাগ টা মেঘকে দিয়ে বলল, “এটা রাখ। পরে নিবো।” দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে আবিরের মামা বাড়িতে পৌছালো। তিন মামার বাড়ি

পাশাপাশি। বড় মামার বাড়ি দুতলা বিল্ডিং। বিয়ে বাড়িত গেইট অনেক দূর থেকেই সবার চোখে পরেছে । গেইটের কাছে অনেকেই অপেক্ষা করছে। মীমদের নামতে দেখে বরণডালা নিয়ে মালা ঘর থেকে বেরিয়ে আসছে। মেঘ বের হতে যাবে এমন সময় আবির মেঘের হাত টেনে এক হাজার টাকার নোট মেঘের হাতে দিয়ে আস্তে করে বলল, "বরণ করলে এটা দিয়ে দিস। " মেঘকে কেউ যেন কোনোভাবে কিছু বলতে না পারে, তাই আবির আগে থেকেই চোখ কান খোলা রাখার চেষ্টা করছে। আবিরের সামনে মালা বরণডালা ধরতেই আবির বিরক্তির স্বরে বলল, "আমার এসব পছন্দ না। বরণ করলে ওদের কর।" আবির বরণডালায় টাকা দিয়ে, মালা কে পাশ কাটিয়ে বাড়িতে ঢুকে পরেছে। মালা যথারীতি হাসিমুখে বাকিদের বরণ করল। আবির একটু ভেতরে আসতেই সাকিব দৌড়ে এসে আবিরকে জরিয়ে ধরে বলল, "কেমন আছো ভাইয়া?" "আলহামদুলিল্লাহ ভালো। তুই কেমন আছিস?" "আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো। কত বছর পর তুমি আমাদের বাড়িতে আসছো। ভালো তো থাকতেই হবে।" আবির স্বাভাবিক কণ্ঠে শুধালো, "বাকিরা কোথায়?" "আছে। চলো।" ততক্ষণে মেঘরাও বাড়িতে ঢুকে পরেছে। আবির বারান্দায় পা রাখতে রাখতে সবার উদ্দেশ্যে সালাম দিল। সালামের উত্তর দিয়ে একেক জন একেক প্রশ্ন করছে। তাদের মধ্যে একজন বয়স্ক মহিলা বলে উঠলেন, "এইডা বাবু না? কত বড় হইয়া গেছে। মাশাআল্লাহ। বাবুরে চেনার তো কোনে উপায় ই নাই। " উঠান থেকে মেঘ কথাটা শুনেই ফিক করে হেসে

দিল। আবির ভাইয়ের মত সুপুরুষ দেহী, এত লম্বা-চওড়া মানুষকে কেউ বাবু বলে সম্বোধন করছে এটা শুনেই হাসি পাচ্ছে। তারপরও নিশ্চিত হওয়ার জন্য মায়ের দিকে তাকিয়ে শুধালো, "বাবু কে আম্মু?" হালিমা খান বললেন, "আবিরকে ওর নানাবাড়ির মানুষ ছোটবেলা বাবু বলে ডাকতো। ওনি তোর বড় আম্মুর চাচি হোন।" আবির মৃদু হেসে শুধালো, "নানু কেমন আছো?" "আলহামদুলিল্লাহ ভালা আছি ভাই। তুমি ভালা আছো নি?" "আলহামদুলিল্লাহ। " বেশকিছুটা সময় আলাপচারিতা চলল। আবির মাইশার সঙ্গে দেখা করতে ভেতরে চলে গেছে। মাইশার রুমের সামনে এসে ডাকল, "আপু আসবো?" মাইশা আবিরকে দেখেই মিষ্টি করে হাসলো। বিছানা থেকে নেমে জিজ্ঞেস করল, "কেমন আছিস ভাই আমার! কত বছর পর তোকে দেখছি। " আবিরের ওষ্ঠদ্বয় প্রশস্ত হলো, উত্তরে আবিরও বলল, " তোমাকেও। আচ্ছা আপু, এই বিয়েতে তুমি খুশি তো?" "আলহামদুলিল্লাহ। আব্বু আম্মু খুশি থাকলে আমিও খুশি। শুধু একটায় ইচ্ছে, যার কাছে বিয়ে দিচ্ছে সে মানুষটা যেন ভালো হয়। " "চিন্তা করো না। মানুষ হিসেবে ভাইয়া খুব ভালো। আমি খোঁজ নিয়েছি। তাছাড়া ওনার সাথে আমার দেখাও হয়েছে। ইনশাআল্লাহ তুমি সুখী হবে।" "তুই দেখা করছিলি?" এরমধ্যে মীম, মেঘ আর আদিও মাইশা আপুকে দেখতে আসছে। মাইশা বরাবর ই চাপা স্বভাবের একটা মানুষ। কখনো কারো বাড়িতে বেড়াতেও যায় না। তবে ফোনে প্রায় ই সবার সাথে কথা হয়। তাছাড়া মালিহা খান বেড়াতে আসলে ওনার মুখে বাসার সবার কথায় শুনে।

সেভাবেই চিনে সকলকে। আবির ভ্রু কুঁচকে শুধালো, “কেনো? ভাইয়া কি তোমায় বলে নি?” ” কথা বলি না তো। বিয়ে ঠিক হওয়ার পর একদিন কথা হয়ছিল। আমার কথা বলতে খুব অস্বস্তি লাগে। ওনি মাঝে মাঝেই কল দেন কিন্তু আমি রিসিভ করি না। ” আবির শপিং ব্যাগ আর নিজের পকেট থেকে একটা চিঠি বের করে মাইশা আপুর হাতে দিয়ে বলল, “তুমি কথা বলো না বলে তোমার জামাই মাঝরাস্তায় দাঁড়িয়ে থেকে আমাকে দিয়ে পাঠাইছে। এটা পড়ে ওনাকে কল দিতে বলছে। ” মেঘ উত্তেজিত কণ্ঠে শুধালো, “রাস্তার ঐ লোকটা কি আপুর বর ছিল?” আবির মেঘের দিকে তাকিয়ে উপরনিচ মাথা নাড়লো। মেঘ মুচকি হেসে বলল, “মাশাআল্লাহ, আপু ভাইয়া কিন্তু কিউট আছে। ” মাইশা লজ্জায় আড়ষ্ট হয়ে যাচ্ছে। মাইশা কিছু বলার আগেই আবির মেঘকে উদ্দেশ্য করে গম্ভীর কণ্ঠে বলে, ” হইছে তোর আর পাকনামি করতে হবে না। আপুর হাসব্যান্ড আপু বুঝবে। তোরা যা এখন । ” মেঘ,মীম আর আদি রুম থেকে বেড়িয়ে যাচ্ছে। আবির পা বাড়াতেই মাইশা আবিরের হাতে চিমটি কেটে আস্তে করে বলল, “আমার জামাই রে কিউট বলছে তাতে তোর এত জ্বলে কেন! কাহিনী কি? কি চলে? ” তখনই রুমে মালার আগমন হলো। আবির মালাকে দেখে থমথমে কণ্ঠে জবাব দিল, ” কিছু না। ” মালা বলল, “ভাইয়া কেমন আছো? ” “ভালো।” আবির মাইশার থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেছে। আবির সাকিবের সঙ্গে থাকবে। তাই গাড়ি থেকে ব্যাগ নামিয়ে সাকিবের রুমে গেল। সাকিব আর মালারাও সম্পর্কে চাচাতো ভাই-

বোন। মেঘ, মীম, দিশা, স্মৃতি ওরা চারজন এক রুমে থাকবে বলে ঠিক করেছে। দিশা মালার আপন ছোট বোন। স্মৃতি সাকিবের ছোট বোন। খাওয়াদাওয়া করে বিকেলের দিকে চার কাজিন মিলে পুরো বাড়ি ঘুরে দেখছিল। বিয়ে বাড়ি মানেই হৈ-চৈ। বিকেল হতে হতে আত্মীয় স্বজনদের ভিড় জমতে শুরু হয়েছে। মেঘ, মীম আগেও কয়েকবার এসেছিল তবে সেসব ছোটবেলার ঘটনা। এখন আর কিছুই মনে নেই তাদের। আবিরদের তিন মামার বাড়ি পাশাপাশি হওয়ায় তিনটা উঠান মিলে বাড়ির সামনে বিশাল মাঠের ন্যায় জায়গা। একপাশে খাবারের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। আরেক পাশে গায়ে হলুদের স্টেজ করা হচ্ছে। সাকিব, মিলন, আবির এমনকি আদিও স্টেজ সাজানোতে ব্যস্ত। মেঘ আবিরকে দেখেই থমকে দাঁড়ালো। পা বাড়ালো সেদিকে । স্মৃতি পেছন থেকে ডাকল, “মেঘাপু কোথায় যাচ্ছো?” “স্টেজ সাজানো দেখতে। ” “ঘুরবা না?” “তোমরা ঘুরে আসো। আমি যাব না। ” মেঘ আর কোথায় যাবে । তার আবেগের কেন্দ্রবিন্দু তো আবির ভাই। আবির ভাইকে দেখাতে যতটা শান্তি, সেই শান্তি আর কোথাও নেই। তাই মেঘ স্টেজের দিকে এগিয়ে আসলো। সাকিব মেঘকে দেখে জিজ্ঞেস করল, “কেমন আছো, মেঘবতী? ” “আলহামদুলিল্লাহ। আপনি কেমন আছেন?” “আলহামদুলিল্লাহ।” মেঘের কণ্ঠ শুনে আবির পেছন ফিরে মেঘকে দেখলো। চুল গুলো বেঁধে, মাথায় ওড়না দিয়ে রেখেছে। আবির লাইটিং সেট করতে করতে শুধালো, “খাইছিস কিছু?” “জ্বি।” সাকিব মেঘকে উদ্দেশ্য করে বলল,

“ভাইয়া কিন্তু এখনও খায় নি। তুমি ভাইয়ার খোঁজ নিলে না কেন?” আবির দাঁতে দাঁত চেপে সাকিবের দিকে তাকিয়ে বলে, “বেশি কথা বললে তোর শরীরে তার পেঁচিয়ে দিব।” মেঘ শীতল কণ্ঠে বলল, “আমি তো জানতাম না। ” আবির মেঘের দিকে তাকিয়ে বলল, ” আমি খাইছি। সাকিব এমনেই মজা করছে। ” আবির, সাকিবেরা কাজ করছে। মেঘ চেয়ারে বসে বসে তাদের কাজ করা দেখছে। কিছুক্ষণ পর স্মৃতি, দিশা আর মীমও চলে আসছে। সবাই চেয়ারে বসে গল্প করছে অথচ মেঘের নজর আবিরের দিকে। আশেপাশে কে কি বলছে সেসবে কোনো মনোযোগ নেই তার। স্টেজ সাজানো প্রায় শেষের দিকে, তখন মালা একটা প্লেটে অনেক রকমের পিঠা নিয়ে আসছে। আবিরকে ডেকে বলছে, “আবির ভাইয়া, তোমার জন্য পিঠা নিয়ে আসছি।” মালার কথায় আবির কোনোরূপ প্রতিক্রিয়া দেখালো না। ফিরে তাকালোও না। অথচ মেঘের ছ্যাত করে রাগ উঠে গেছে। মনে পরে গেছে,বাসায় আবির ভাইয়ের উপর ঢলে পড়তে যাচ্ছিল এই মালা আপু। আবির ভাইয়ের প্রতি তখন তীব্র ভালোবাসা অনুভব করতে না পারলেও সেদিন ঠিকই কেঁদেছিল সে। তবে এখন তো সে আবিরকে ভালোবাসে। আবির ভাই ভালোবাসুক বা না বাসুক, অষ্টাদশী মনে প্রাণে আবিরকে ভালোবাসে। আবিরের আশেপাশে সে কাউকে সহ্য করতে পারবে না। মেঘ ভেতরে ভেতরে রাগে ফুঁসছে। মালা পুনরায় বলল, “পিঠা গুলো খেয়ে নেও ভাইয়া। ” আবির পেছনে না ফিরেই বলল, “আমি খাব না পিঠা, ওদের দে। ” হাত দিয়ে মেঘদেরকে

ইশারা করল। আবিরের কথাটা মালার পছন্দ হয় নি। অকস্মাৎ সাকিব বলল, “৩ দিন যাবৎ এত কাজ করতেছি। আমাকেও তো একটা পিঠা সাধতে পারিস।” মালা সাকিবের উপর নিজের ক্ষোভ প্রকাশ করে, “তুই কি বাড়ির মেহমান যে তোকে আলাদা করে পিঠা দিতে হবে” সাকিব মন খারাপ করে বলল, “আজ মেহমান হতে পারি নি বলে কেউ দাম ই দেয় না। ” মালা আর কথা বাড়ালো না। মেঘের হাতে পিঠাগুলো দিয়ে চলে গেছে। পিঠাগুলো সে আবিরের জন্য আলাদা করে এনেছিল। নকশি পিঠার সবগুলোই লাভ আকৃতির। পিঠাগুলোর দিকে নজর পড়তেই দ্বিতীয় দফায় রাগ উঠে গেল মেঘের। মীম আর স্মৃতির দিকে পিঠাগুলো দিয়ে বলল, “তোরা খা, আমি খাব না। ” আবির সাকিবের দিকে তাকাতেই সাকিব জিজ্ঞেস করল, “কি হয়েছে মেঘবতী ? পিঠা খাবে না কেন তুমি? আমাদের বাড়ির পিঠাগুলো কি অপরাধ করেছে যে তুমি তাদের ছুঁয়েও দেখছো না। ” মেঘ গম্ভীর মুখ করে উত্তর দিল, “পিঠা খাবো তবে এগুলো না। ” সাকিব বলে, “এই মিলন, মেঘবতীর জন্য পিঠা নিয়ে আয়। যত জাতের পিঠা ঘরে আছে সবগুলো নিয়ে আসবি। ” মেঘ ভ্রু কুঁচকে বলল, “আমি এখন খাবো না পিঠা। ” মিলন সেসবে পাত্তা দেয় নি, কিছুক্ষণের মধ্যে ই বড় প্লেট দিয়ে অনেক প্রকারের পিঠা এনে মেঘকে দিয়েছে। মেঘ না চাইতেও ২-১ টা পিঠা খেয়েছে। আবির লাইটিং এর কাজ শেষ করে মেঘের পাশের চেয়ারে বসেছে। মেঘ আবিরের দিকে প্লেট এগিয়ে দিয়ে বলল, “নেন পিঠা খান। ” আবির দুহাত সামনে এগিয়ে বুঝালো হাতে ময়লা,

খাবে কি করে। মেঘ ভণিতা ছাড়াই বলল, “হাত ধৌয়ে আসুন। ” আবির রাশভারি কণ্ঠে বলে, “কষ্ট লাগছে।” মেঘ মুচকি হেসে আস্তে করে বলল, “খাইয়ে দিব আমি?” “দিলে খারাপ হয় না।” মেঘ কথাটা মজা করে বলেছিল। আবির ভাই যে এভাবে রাজি হয়ে যাবে এটা ভাবে নি। আবিরের পছন্দমতো কয়েকটা পিঠা খাইয়ে দিয়েছে। হঠাৎ আবিরের চোখে পরে, বড় মামার সঙ্গে আবিরের আব্বু বাড়িতে আসতেছেন। আবির মেঘকে বলে, ” আর খাবো না, তুই খা। ” আবির তৎক্ষনাৎ চেয়ার থেকে উঠে স্টেজে চলে গেছে। স্টেজের বাকি কাজ করছে। আবির ভাইয়ের অকস্মাৎ পরিবর্তন দেখে মেঘ ভ্রু কুঁচকে তাকিয়ে রইলো। মনে মনে ভাবছে, “এই বেটার সমস্যা কি, মাঝে মাঝে মনে হয় ওনার মতো রোমান্টিক মানুষ এই পৃথিবীতে আর একটাও নেই, আবার মাঝে মাঝে মনে হয় ওনার মতো পাষাণ আর একটাও নেই। ওনি এমন কেন!” আলী আহমদ খান মীম আর মেঘকে দেখে হাসিমুখে প্রশ্ন করলেন, “তোমরা কখন আসছো?” বড় আব্বুর কণ্ঠস্বরে মেঘের ধ্যান ভাঙ্গে। মীম স্বাভাবিক কণ্ঠে বলে, “দুপুরের দিকে আসছি বড় আব্বু।” আবিরের বড় মামা শুধালেন, খাওয়াদাওয়া করছো? নাকি শুধু পিঠায় খেতে দিছে তোমাদের? ” মেঘ আলগোছে হেসে উত্তর দিল, “আমরা এসেই ভাত খেয়েছি। এখন আবার পিঠা খাচ্ছি। ” মামা পুনরায় বললেন, “বাড়িটাকে নিজের বাড়ি মনে করবে। যা ইচ্ছে হবে নিজের হাতে নিয়ে খাবে। সেটা গাছের কোনো ফল ই হোক অথবা ঘরের কোনো খাবার। ” মীম আর মেঘ একসঙ্গে বলল,

“আচ্ছা বড় মামা। ” হঠাৎ করেই বাড়ির পরিবেশ বদলে গেছে। হৈ-হুল্লোড় যেন তিনগুণ বেড়ে গেছে। মাইশার শ্বশুর বাড়ি থেকে বেশ কয়েকজন গায়ে হলুদের শাড়ি,মেহেদী আরও কি কি নিয়ে আসতেছে । আবির আগন্তুকদেরকে কয়েক মুহুর্ত পর্যবেক্ষণ করলো। ৪-৫ টা অল্পবয়স্ক মেয়ে সাথে ৫-৭ টা ছেলে। মালা গেইটের সামনে গিয়ে তাদের বরণ করছে। স্মৃতি আর দিশাও গেইটের কাছে চলে গেছে। মীম যেতে নিলেই আবির ধমক দেয়। আবিরের ধমকে মীমের সঙ্গে সঙ্গে মেঘ ও কেঁপে উঠেছে । আবির মেঘ আর মীমকে উদ্দেশ্য করে বলল, ” তোরা এখন রুমে যা। মেহমান যাওয়ার আগপর্যন্ত, তোদের এক বোনের ছায়াও যদি আমি দেখি তাহলে খবর আছে বলে রাখলাম। ” মেঘ মাথা নিচু করে বলল, “আপুকে হলুদ লাগাবো না?” আবির বিরক্তির স্বরে বলল, “রাতে লাগাইস। এখন যা। ” মেঘ আর মীম দুজনেই মাথা নিচু করে একে অপরকে অভিযোগ জানাতে জানাতে রুমে চলে গেছে। এতদিন তানভির ভাইয়া এমন করেছে। মীম আর মেঘ দুজনকেই অতিরিক্ত শাসনে রেখেছে। এবার তানভির আসে নি তাই ভেবেছিল একটু আনন্দ করবে। সব আনন্দে আবির ভাই পানি ঢেলে দিল। সন্ধ্যার পরপরই মেহমান চলে গেছে। মাইশা আপু মীম আর মেঘকে খোঁজে না পেয়ে দিশাকে দিয়ে ডেকে পাঠাইছে। মাইশা আপুর ৪ জন বান্ধবী এসেছে। মালা আপুর ও ৩ টা বান্ধবী এসেছে। এছাড়াও খালাতো, মামাতো বোনেরা তো আছেই। সন্ধ্যার পর থেকে বাড়িতে শাড়ি পরার ধুম পরেছে। মীম আর মেঘ

বিছানার এক পাশে বসে সবার সাজগোছ দেখছে। মাইশা আপু বারবার দুজনকে শাড়ি পড়তে বলছে। মীম শাড়ি দুচোখে সহ্য করতে পারে না। কিন্তু সবার শাড়ি পড়া দেখে মেঘের খুব ইচ্ছে করছে শাড়ি পড়তে। তবে আজ পর্যন্ত কখনও শাড়ি পড়ে নি সে, তাই শাড়ি সামলাতে পারবে না ভেবে ভয় পাচ্ছে। মাইশা আপুর এক বান্ধবীকে দেখে হঠাৎ মেঘের রাকিবের গার্লফ্রেন্ড এর কথা মনে পরে গেল। জান্নাত আপুর বিয়েতে কত সুন্দর করে সেজে আসছিল। রাকিব ভাইয়ার গার্লফ্রেন্ড কে দেখে সেদিন মেঘেরও শাড়ি পড়তে ইচ্ছে হয়েছিল। তবে আজ আর সাহস পাচ্ছে না। আচমকা মাইশা আপু মেঘের দিকে তাকিয়ে জোড় গলায় বললেন, “মেঘ তুমি কিন্তু শাড়ি পড়বে। একদম না শুনবো না। পড়বে মানে পড়বেই।” “আপু আমি তো কখনো শাড়ি পড়ি নি।” “তোমার যেভাবে সুবিধা হবে সেভাবেই পড়ানো হবে। তুমি চিন্তা করো না।” মীমের এসব শাড়ি পরা দেখতে দেখতে আর ভালো লাগছে না। মেঘ শাড়ি পড়বে শুনে মন খারাপ করে রুম থেকে বেড়িয়ে গেছে। মেঘ ও রেডি হতে ওয়াশরুমে গেছে। মাইশা আপু মিটিমিটি হাসছে। মাইশা আপুর বেস্টফ্রেন্ড জিজ্ঞাসু চোখে চেয়ে প্রশ্ন করল, “কিরে হাসছিস কেন?” মাইশা আশেপাশে দেখে বান্ধবীর কানের কাছে বিড়বিড় করে বলল, “আবিরের কথা বলছিলাম না তোকে, ওর চাচাতো বোন মেঘ। আমি সিউর আবির মেঘকে পছন্দ করে, কিন্তু কিছু বলতে পারছে না। মেঘকে শাড়ি পড়াচ্ছি যাতে আবিরের রিয়েকশন বুঝতে পারি, বুঝলি। ”মাইশার শ্বশুর বাড়ির

লোকজন চলে গেছে অনেকক্ষণ হলো। তবুও মেঘ, মীমের পাত্তা নেই। আবির আদিকে দিয়ে ডেকে পাঠিয়েছে অথচ মেঘ আর মীম এখনও নামছে না। হঠাৎ আবিরের মনে হলো, মেঘের জন্য সে আলাদা করে গায়ে হলুদের ড্রেস নিয়ে আসছিল, যেটা আবিরের ব্যাগেই আছে। আবির সাকিবদের ঘরে গিয়ে ড্রেসটা বের করে দেখছে। গায়ে হলুদ উপলক্ষে সবার জন্য রানী গোলাপি রঙের শাড়ি-পাঞ্জাবি আনা হয়েছে। কালার পছন্দ করার দায়িত্ব আবিরের ছিল, তাই হলুদ রঙ বাদ দিয়ে অন্য রঙকেই প্রাধান্য দিয়েছে সে । শাড়ি- পাঞ্জাবি কেনার দিন ই মেঘের জন্য একটা ড্রেস কিনেছিল। কিন্তু বাসায় আসার পর সেই জামা দেখে মন ভরছিল না। তাই গতকাল রাতে মার্কেটে গিয়ে অনেক খোঁজে মেঘের জন্য পছন্দমতো রানী গোলাপি রঙের একটা ড্রেস নিয়ে আসছে। ড্রেসটা পড়লে তার Sparrow কে কেমন লাগবে সেটায় ভাবছে। কিছু একটা ভেবেই নিজের মাথায় গাট্টা মেরে আনমনে হেসে ফেলল । ড্রেসটা শপিং এ ভরে মালাদের ঘরের সামনে উঠান পর্যন্ত আসতেই মালিহা খান ডাকলেন, “এসে থেকে কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছিস? ভাবি বললো আসার পর নাকি অল্প ভাত খাইছিলি । তোর কি খিদে পায় না? পিঠা দিব তোকে? নাকি ভাত খাবি?” “এখন কিছু খাবো না, আম্মু। বিকেলে পিঠা খাইছি। খুদা লাগলে খাব। তুমি টেনশন করো না। ” আবির মায়ের সাথে কথা বলে যেই না ঘরে ঢুকতে যাবে। তখনই সামনে মালা হাজির হলো। আবিরের কন্ঠ শুনেই নিজের রুম থেকে বেড়িয়ে এসেছে। মালা উত্তেজিত কন্ঠে শুধালো,

“ভাইয়া, তোমার কি কিছু লাগবে? আমায় বলো আমি এখনি দিচ্ছি। ” আবিরের হাতে শপিং ব্যাগ দেখে পুনরায় প্রশ্ন করল, “শপিং ব্যাগে কি?” আবির রাগান্বিত কণ্ঠে উত্তর দিল, “সে যায় থাকুক, তোর ভাবতে হবে না। আর আমার কিছু লাগলে আমি নিজেই নিতে পারবো। তুই নিজের চরকায় তেল দে। ” আবিরের রাগান্বিত কন্ঠ শুনে মালা মাথা নিচু করে মনে মনে বলল, “আমার ই তো ভাবতে হবে। আমি যে তোমাকে ভালো..” আবির ধমক দিল, “রাস্তা থেকে সরে দাঁড়া। ” মালা তড়িঘড়ি করে সরে দাঁড়ালো। আবিরকে যেতে দেখে মালাও নিজের রুমে সাজতে চলে গেছে। আবির বারান্দা পেরিয়ে দুতলায় যাওয়ার জন্য কয়েক সিঁড়ি উঠতেই, আচমকা আলতা রাঙা একটা পা চোখে পরলো। পায়ের মালিক দুতলা থেকে নামছিল, সিঁড়িতে এক পা রেখেই যেন থমকে দাঁড়িয়েছে। আবির স্বাভাবিক ভাবে চোখ তুলে তাকাতেই আশ্চর্য বনে গেল। চোখ পড়ে এক মায়াবিনীর দিকে, সহসা মুগ্ধ আঁখিতে তাকায়। সেই মায়াবিনী যেন মায়ার জাল বিছিয়ে রেখেছে, আবিরের মতো হাজারো সুপুরুষ যুবক তার এই রূপে ঝলসে যাবে। বাঙালি স্টাইলে রানী গোলাপি রঙের শাড়ি পরিহিতা মায়াবিনীর কোমড় ছাড়ানো চুলগুলো অতিশয় ধীর গতিতে উড়ছে। মুখে হালকা মেকাপ, চোখে আইলানারের সঙ্গে গাঢ় করে কাজলও লাগানো, ঠোঁটে লাল টকটকে লিপস্টিক । গলায় হালকা গহনা তার সঙ্গে কোমড়ের বিছা । আবির কিংকর্তব্যবিমূঢ়, বিস্ময় চোখে মায়াবিনীকে আপাদমস্তক দেখলো। বাকরুদ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে সেই

আঁখি জোড়ায় । মায়াবিনীর দিকে তাকিয়ে, উপরের সিঁড়িতে পা রাখতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়তে নিলে সঙ্গে সঙ্গে হ্যান্ডরেলে ধরে কোনোরকমে নিজেকে সামলালো। আবিরকে হোঁচট খেতে দেখে মায়াবিনী কয়েক সিঁড়ি নেমে আতঙ্কিত কণ্ঠে শুধালো, "কি হয়েছে আপনার?" মায়াবিনীকে কাছে আসতে দেখে আবির তৎক্ষনাৎ ২/৩ সিঁড়ি নিচে নেমে, নেশাক্ত কণ্ঠে বিড়বিড় করে কি যেন বলল, মায়াবিনী শুধু শেষে বলা "উফফ" টায় বুঝতে পেরেছে। মায়াবিনী চিন্তিত স্বরে শুধালো, "আপনি ঠিক আছেন তো?" আবির উত্তর না দিয়ে উল্টো প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল, "তুই কি ঠিক থাকতে দিচ্ছিস ?" আবিরের প্রশ্ন শুনে মায়াবিনী অপলক দৃষ্টিতে তাকালো। চোখে মুখে উজ্জ্বলতা ফুটে উঠেছে। উত্তেজিত কণ্ঠে পুনরায় প্রশ্ন করল, "শাড়িতে কেমন লাগছে আমায়?" আবির পুনরায় তাকালো, ক্লান্তিহীন অমত্ত চেয়ে রইলো কিছুটা সময়। মেঘ তীর্যক চোখে চেয়ে আছে, মুখে তার মিষ্টি হাসি। আবিরের ঘোর যেন কিছুতেই কাটছে না। দৃষ্টি তার সরছেই না। মনে হচ্ছে, মায়াবিনীকে দেখার ব্যাকুলতা এই জনমে আর শেষ হবে না। মৃত্যু ব্যতীত মায়াবিনীর মায়ার জাল থেকে বের হতে পারবে না সে । মেঘ পুনরায় প্রশ্ন করল, "কেমন লাগছে বললেন না!" মেঘের কথায় আবিরের মনোযোগে বিঘ্ন ঘটে, আবেশিত কণ্ঠে বলল, " মায়াবিনী " আবির ভাইয়ের মুখে মায়াবিনী শব্দ শুনে অষ্টাদশী লজ্জায় আড়ষ্ট হয়ে গেল। ব্লাশ দেয়া কপোল আরও বেশি রক্তিম বর্ণ ধারণ করেছে। ডিসেম্বরের তীব্র শীতেও অষ্টাদশীর নাক ঘামে চিকচিক করছে। প্রিয়

মানুষের মুখে নিজের প্রশংসা শুনে অষ্টাদশীর কলেবরে অন্যরকম শিহরণ জাগছে। এতক্ষণ আবির ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে থাকলেও, এখন লজ্জায় চোখ তুলে তাকাতে পারছে না। আবির গলা খাঁকারি দিয়ে বলল, "হাতটা দেখি। " আবির নিজের হাত বাড়ালো, মেঘ ডান হাত একটু এগুতেই আবির মেঘের হাত ধরে, এক সিঁড়ি উপরে উঠে মেঘের ডান হাতের কনিষ্ঠা আঙুল মুখের কাছে নিল। মেঘের কনিষ্ঠা আঙ্গুল ব্যতিত বাকি আঙুলগুলো স্থান পেল আবিরের গালে। আবিরের গালে থাকা খোঁচা খোঁচা দাঁড়ি স্পর্শ করতেই অষ্টাদশীর বুকের ভেতর উতালপাতাল ঢেউ শুরু হয়ে গেছে। আবির মেঘের কনিষ্ঠা আঙুলে আস্তে করে কামড় দিল। ওমনি অষ্টাদশী কেঁপে উঠলো। মেঘের অস্বস্তি বুঝতে পেরে আবির হাত ছেড়ে কিছুটা দূরে দাঁড়ালো। আবির স্বভাবসুলভ ভারী কণ্ঠে বলল, " আমায় সুন্দর লাগছিল বলে তুই একদিন নজর কাটিয়েছিলি, আজ আমি কাটালাম। " মেঘ নিস্তব্ধ, নিরেট দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে । আবির নিজেকে সামলে গম্ভীর কণ্ঠে বলল, " মানুষ মা*রার প্ল্যান টা কার?" "মানে?" " তুই তো কোনোদিন শাড়ি পড়িস নি, আজ হঠাৎ শাড়ি পরার কারণ কি?" মেঘ আমতা আমতা করে বলল, "মাইশা আপু জোর করলো শাড়ি পড়ার জন্য। আপু আর আপুর বান্ধবী মিলেই আমায় সাজিয়ে দিয়েছে। " "তাই তো বলি..." "কি?" "কিছু না। পড়েছিস ভাল কথা কিন্তু তোর জন্য শাড়ি আনা হয় নি। এইযে তোর ড্রেস, শাড়ি টা পাল্টে ড্রেস টা পড়ে নিচে আসবি। " মেঘ শপিং ব্যাগ টা হাতে নিয়ে একটু দেখল,

তারপর মন খারাপ করে বলল, " আনা হয় নি মানে শাড়িটা তো মাইশা আপুই আমায় দিয়েছে। ওখানে তো অনেক শাড়ি ছিল। " "এত বেশি বুঝিস কেন? শাড়ি বেশি থাকলেই কি পড়তে হবে?" একটু থেমে পুনরায় বলল, " তুই এভাবে স্টেজে গেলে মাইশা আপুর বদলে, সবাই তোকেই হলুদ লাগাতে আসবে। তার থেকেও বড় বিষয়, বিয়ে বাড়িতে এত এত মানুষ, কত বাজে মেন্টালিটির ছেলে আছে, কখন কোন ছেলে কি বলে ফেলবে, তখন তো গাল ফুলাইয়া কান্না শুরু করে দিবি। আমি তানভির না, যে সর্বক্ষণ তোকে চোখে চোখে রাখবো, কোনো সমস্যা হলে ঠান্ডা মাথায় সমাধান করবো। বাই এনি চান্স কোনো ছেলে উল্টাপাল্টা কিছু বললে,তখন আমার হাত উঠে যাবে।আমি বিয়ে খেতে আসছি, মা*রপিট করতে নয়। তুই কি চাস, তোর জন্য আমি বিয়ে বাড়িতেও মা*রপিট করি?" মেঘ ডানে-বামে মাথা নেড়ে উচ্চস্বরে বলল, "নাহ" আবির মোলায়েম কণ্ঠে বলল, " যদি বিয়ে বাড়িতে কোনোরকম ঝামেলা না চাস, তাহলে এসব মেকাপ তুলে, ড্রেসটা পড়ে সিম্পলি নিচে আসবি। আর যদি মনে হয়, সবাই শাড়ি পড়েছে তাই তোকেও শাড়িই পড়তে হবে তাহলে এভাবেই যেতে পারিস। চয়েজ ইজ ইউর'স। " মেঘ আর কিছু বলল না । শপিং ব্যাগটা হাতে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠছে। মন খারাপ হওয়ার বদলে অষ্টাদশীর চোখে-মুখে প্রখর উজ্জ্বলতা । আবির ভাইয়ের বলা "মায়াবিনী" শব্দটা বার বার কানে বাজছে। আবির ভাই যে তাকে নিয়ে চিন্তা করে, এটা ভাবতেই মেঘের হৃদয়ে প্রশান্তির হওয়া বয়ে গেল।

আবিরের দৃষ্টি মেঘেতে নিবদ্ধ, অকস্মাৎ বুকে হাত রাখল। মস্তিষ্কের নিউরনে অবিরাম বাজছে, “তোর রূপে এই আবির বিধ্বস্ত। ” মানসিক টানাপোড়েনে ভুগছে সে। অশান্ত মনকে শান্ত করার কোনো শব্দ খোঁজে পাচ্ছে না। হৃদয়ে গান বাজছে, “Yeh dil pagal bana baitha Isey ab tu hi samjha de Dikhe tujhme meri duniya Meri duniya tu banja re” যতক্ষণ অষ্টাদশীকে দেখা যাচ্ছিল, আবির ততক্ষণ দুর্বোধ্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল। অষ্টাদশী আড়াল হতেই আবির ধপ করে সিঁড়িতে বসে পড়েছে, হাত দিয়ে চোখ-মুখ ডেকছে । বক্ষপিঞ্জরে উতালপাতাল ঢেউ। তখনই সাকিব আসছে। আবিরকে সিঁড়িতে বসে থাকতে দেখে চিন্তিত স্বরে শুধালো, “কি হয়ছে ভাইয়া? এখানে বসে আছো কেন?” আবির চোখ-মুখ থেকে হাত সরিয়ে সাকিবের দিকে তাকিয়ে শ্বাস ছেড়ে বলল, “সাকিবরে আমি শেষ। ” সাকিব আবিরের কাছাকাছি এসে শুধালো, ” কি হয়ছে বলবা তো ” “যত দিন যাচ্ছে, আমি ওর প্রতি তত বেশি আসক্ত হয়ে যাচ্ছি। মায়াবিনীর মায়া কাটানোর ক্ষমতা যে আমার নেই।” “মায়া কাটানোর দরকার কি? তুমি তো মেঘবতীকেই ভালোবাসো। বিয়ে করে নাও, তাহলে এই মায়ার বাঁধন আরও বেশি শক্ত হবে। তোমাদের দুজনকে পাশাপাশি দেখলে আমার কি যে ভাল লাগে ” সাকিব মাথা চুলকে শুধালো, “ভাইয়া, তুমি না বলছিলা দেশে আসার ৩ মাসের মধ্যে বিয়ে করবা। এখন তো ৬ মাস হয়ে যাচ্ছে। বিয়ে করছো না কেন?” বিয়ের কথা শুনতেই আবিরের চোখে-মুখে

বিষন্নতা ছেয়ে গেছে। মামা-মামিরা ব্যতীত আবিরের ফুপ্পির ঘটনা আর কেউ জানে না। আবিরও নিজে থেকে সাকিবকে কিছু বলে নি। আবির সিঁড়ি থেকে উঠে যেতে যেতে বলল, " পরিস্থিতি বলতে একটা শব্দ আছে। জানিস তো? আমি এখন পরিস্থিতির অধস্তনে বন্দি। পরিস্থিতি যেদিকে নিয়ে যাবে আমি সেদিকে যেতে বাধ্য। " সাকিব কিছুই বুঝলো না। আবিরকে প্রশ্ন করার আগেই আবির সেই জায়গা ত্যাগ করল। আশপাশে না তাকিয়ে সোজা সাকিবের রুমে চলে গেল। রুমে ঢুকেই বিছানায় চোখ বন্ধ করে শুয়ে পড়ল। বক্ষে তার তীব্র কম্পন, পৃথিবীর সবার চোখে অদম্য, গুরুগম্ভীর আর শক্তপোক্ত ব্যক্তিটা আজ এক মায়াবিনীর রূপে বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। এত বছর বুকের ভেতর চেপে রাখা অনুভূতিরা যেন খাঁচা ছেড়ে বেড়িয়ে আসতে চাইছে। অষ্টাদশী কি করে বুঝবে, তাকে এই রূপে দেখে আবিরের হৃদয়ে কতটা তোলপাড় চলছে। ২০ মিনিট কেটে গেল। আবিরের এক হাত মাথার নিচে অপর হাত বুকের বা পাশে। আচমকা চোখ মেলে তাকায়, ঠোঁটের কোণে দুষ্টু হাসি। বিছানার পাশে রাখা ফোনটা হাতে নিল। গ্যালারিতে ঢুকেই প্রথম ছবিটাতে চাপ দিল। ওমনি মেঘের শাড়ি পরা একটা ছবি ভেসে উঠেছে। মেঘের চোখ ফাঁকি দিয়ে কিছুক্ষণ আগেই ২ টা ছবি তুলেছিল আবির। সেখান থেকেই একটা ছবি সুদীর্ঘ মনোযোগ দিয়ে দেখছে। কাজল কালো চোখ, লজ্জায় লালিত মুখমণ্ডল, ওষ্ঠদ্বয়ে মায়াবী হাসি আবিরের অশান্ত মন জানান দিচ্ছে, "মায়াবিনীর মায়াজালে আবিরের মৃত্যু নিশ্চিত। " আবির ফেসবুকে ঢুকে নিজের

টাইমলাইনে একটা পোস্ট করে, “মনের বিরুদ্ধে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার চেয়ে যুদ্ধে শহীদ হওয়া বোধহয় অধিকতর শান্তিপূর্ণ। ” নিচে ছোট করে লিখেছে ” Best Surprise ever ❤" আবির পুনরায় মেঘের শাড়ি পরা ছবিটা বের করেছে। এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সে। অকস্মাৎ ফোনের যান্ত্রিক আওয়াজ বেজে উঠলো। তানভির কল করেছে। আবির রিসিভ করতেই ওপাশ থেকে উদ্বিগ্ন কণ্ঠ ভেসে এলো, “ভাইয়া, তুমি ঠিক আছো ? বনু ঠিক আছে তো? ” আবির মৃদু হেসে উত্তর দিল, “তোর বোন বোধহয় সিদ্ধান্ত নিয়েই নিছে, আমায় না মে*রে থামবে না। “কেন? কি হয়ছে? বনু কিছু করছে? রাগে বকা দাও নি তো আবার! ” “তোর বোন এমন রূপে আমার সামনে আসছে, ধমক দেয়া বহু দূর, আমি তো..... ” “তুমি তো কি? বনু কেমন রূপে আসছে?” “তুই না আমার সম্বন্ধি হোস, ছোট বোনের প্রেমালাপ শুনতে চাস, লজ্জা লাগে না তোর। ” “আচ্ছা সরি। তোমরা ঠিকঠাক থাকলেই হলো। তোমাদের দুজনকে একসাথে পাঠিয়ে এখন টেনশনে আমার হাত পা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে। তোমার স্ট্যাটাস দেখে আরও বেশি ভয় লাগছিল। তাই তাড়াতাড়ি কল দিলাম। কিছুক্ষণ আগে মাইশা আপু কল দিয়েছিল আমায়। যাই নি বলে রাগারাগি করছে। আমি বলছি সকাল সকাল চলে আসবো। ” “আচ্ছা। সাবধানে থাকিস । আর আসার সময় আমার বাইকটা নিয়ে আসিস। ” “আচ্ছা। ” “রাখছি। ” “ভাইয়া শুনো” “হ্যাঁ বল।” “বনুর সাথে রাগ দেখিও না প্লিজ। ” “এখন রাগ দেখানোর অবস্থায় আমি নেই। তোর

বোনকে নিয়ে পালাইয়া না যায়, এই টেনশনে আছি। রাখছি " আবির কল কেটে ওয়াশরুম থেকে হাতমুখ ধৌয়ে আসছে। তানভির আহাম্মকের মতো বসে আছে, বনু কি করছে, ভাইয়ার কি হয়ছে, কি বললো সব যেনো এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। আবির ভাইয়া পরিবারের জন্য এত দৃঢ় সংকল্প নিয়ে, হুট করে পালিয়ে যাওয়ার কথায় বা কেন বলছে। ভাইকে কল দিলেও লাভ নাই। মাঝে মাঝে তানভির ভাবে, ভাইয়ার সম্বন্ধি না হয়ে শালা হলেই ভালো হতো। মজার ছলেও অন্ততপক্ষে ভাই কিছু বলতো। যাতে ভাইয়ের মনোভাব বুঝতে পারতো সে। আবির কিছুক্ষণের মধ্যে রেডি হয়ে বের হয়ছে, রানী গোলাপী রঙের পাঞ্জাবি পরায় আজ আবিরকে অন্যরকম সুন্দর লাগছে। সাদা, কালো আর ধূসররঙের ভিড়ে উজ্জ্বল বর্ণটা আবিরকে বেশ মানিয়েছে। প্যান্ডেলে ঢুকতে গিয়ে আশেপাশে তাকিয়ে দেখলো, মেঘ কোথাও নেই। মীম, দিশা আরও কয়েকজন মিলে গল্প করছে। আবির মীমকে ডেকে জিজ্ঞেস করল, "মেঘ কোথায়?" মীম ও আশেপাশে তাকাচ্ছে, ধীর কণ্ঠে বলল, "আপুকে তো দেখছিলাম নিচে আসছিল, এখন তো দেখছি না।রুমে গিয়ে দেখে আসবো ভাইয়া ?" "তোর যেতে হবে না। " আবির দুপা এগুলোতেই সাকিব ছুটে আসছে। আতঙ্কিত কণ্ঠে বলল, "ভাইয়া এতক্ষণে আসছো তুমি। তোমার মেঘবতী তো সেজেগুজে নিচে আসছিল, ঐনে মালা আর ওর দুই বান্ধবী কথা বলছিল। কি কথা বলছে তো শুনি নাই কিন্তু দেখলাম মেঘবতী মুখ গোমড়া করে উপরে চলে যাচ্ছে। তখন আব্বু, চাচ্চু

আমায় ডেকে নিয়ে গেছে, কিছু প্রয়োজনীয় জিনিস আনার দরকার ছিল। তাড়াহুড়োতে রুম পর্যন্ত যেতে পারছিলাম না, ফোনটাও রুমে চার্জে রেখে আসছি তাই জানাতেও পারছিলাম না। কাজ শেষে দৌড়ে আসছি..” আবির দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, “যে ভ*য়টা পাচ্ছিলাম....”
আবির ঝড়ের গতিতে মেঘদের রুমে গেছে। রুমে কেউ নেই, বিছানার উপর শাড়ি, কসমেটিকস এলেমেলো পরে আছে। আবির আশেপাশের ২-৩ টা রুম চেক করল। কোথাও কেউ নেই। হঠাৎ সিঁড়ির দিকে নজর পরতেই ছুটলো সেদিকে। ছাদ জুড়ে ঝলমল করছে লাল নীল আর সবুজ রঙের আলো, তার একপাশে মেঘ দাঁড়িয়ে আছে । হাতে একটা গাছের ঢাল যেটা দিয়ে ছাদের রেলিং এ অবিরত আঘাত করছে। মেঘ ড্রেস পড়ে নিচে নামতেই চোখ পরে মালা আপু আর তাদের বান্ধবীদের দিকে। তারা কোনো বিষয় নিয়ে গভীর আলোচনায় মগ্ন। মেঘ সেসবে পাত্তা না দিয়ে দু পা এগুতেই কানে আসে, ”
আবির ভাইয়ার সাথে আমার দুবছর যাবৎ ফোনে কথা হয়, প্রায় ই ভিডিও কলে কথা হয়,আমি যে ওনাকে ভালোবাসি এই কথাটা এখনও বলি নি। আজকে সুযোগ পেলে ভাইয়াকে বলে ফেলব। তোরা আমায় বুদ্ধি দে, কিভাবে বললে ওনি সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে যাবেন। ”
কথাগুলো কানে আসতেই মেঘ স্তব্ধ হয়ে গেছে। দাঁতে দাঁত চেপে ধরল। ক্রোধে কপালের শিরাগুলো দৃশ্যমান হয়ে গেছে। মেঘের চোখ-মুখ রক্তাভ হয়ে ওঠেছে। দাঁত কিড়মিড় করছে। আবির ভাই মালা আপুর সাথে কথা বলে, এই কথাটা অষ্টাদশীর মনে চরমভাবে আঘাত

করেছে। রাগে গজগজিয়ে ছাদে চলে আসছে। রাগ টা আসলে কার উপর উঠেছে সেটা নিজেও বুঝতে পারছে না। মালা আপুর আচরণ ভালো লাগে নি এজন্য মালা আপুকে আগে থেকেই সহ্য করতে পারে না। অথচ আবির ভাই..! ভাবতেই বক্ষস্পন্দন থমকে গেল। রাগে ফুঁসতে আর ভাবছে, " এতগুলো বছরে একটাবারও আপনি আমার সঙ্গে কথা বলেন নি, এখন জোর করতে পারলে তখন কেন জোর করে আমার সাথে কথা বললেন না। যদি কথা না ই বলবেন, তাহলে মালা আপুর সাথে কেন কথা বলেছেন। তাহলে কি আপনি....!" এটুকু ভেবেই থেমে গেল। ক্রোধ যেন কমছেই না বরং বাড়ছে। পাশে একটা গাছ থেকে একটা ঢাল ভেঙে সেটা দিয়ে রেলিং এ আঘাত করেই নিজের ক্রোধ কমানোর চেষ্টা করছে। আবির বিদ্যুৎ বেগে ছুটে এসে মেঘের হাত চেপে ধরল। হাত থেকে ঢাল টা নিয়ে ছুঁড়ে ফেলল। আবির সরু নেত্রে খেয়াল করল অষ্টাদশীর চোখ-মুখ। লাইটের আলোতে বারবার পরিবর্তন হচ্ছে চেহারার বর্ণ। মেঘের চোখে-মুখে তীব্র ক্ষিপ্রতা। আবিরের উপস্থিতি বুঝতে পেরে রাগ যেন তিনগুণ বেড়ে গেছে। আবিরের হাত থেকে নিজের হাতটা ছাড়ানোর চেষ্টা করছে। কোথাও কেটেছে কি না, আবির সেটা দেখার চেষ্টা করছে। অথচ মেঘ নিজের সবটুকু শক্তি দিয়ে হাত সরানোর চেষ্টা করছে। মেঘের এমন কান্ডে আবির অগ্নি চোখে তাকিয়েছে। ধমক দিতে গিয়েও থেমে গেল, ঢোক গিলে নিজের রাগ কন্ট্রোল করার চেষ্টা করল। মেঘের অন্য হাতটা টেনে নিল। মেঘের দু'হাত একসঙ্গে রেখে কব্জি

বরাবর চেপে ধরে তপ্ত স্বরে বলল, “এখন দেখব কিভাবে নিজের হাত ছাড়াস ” মেঘ রাগে কটমট করে বলল, “ছাড়ুন আমায়। ” “না ছাড়লে কি করবি?” রাগে কটমট করছে মেঘ প্রশ্ন করল, “কোন অধিকারে আমায় ছুঁয়েছেন? ” মেঘ রাগে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে কথাটা বলল। আবির নিরেট কণ্ঠে উত্তর দিল, ” আমায় অধিকারবোধ শেখাতে আসিস না। তোকে ছোঁয়ার জন্য যদি অধিকারনামায় স্বাক্ষর করতে হয়, আমি সেই অধিকারনামায় স্বাক্ষর করে হলেও তোকে ছুঁবো।” রাগের মাথায় আবিরের কথাগুলো মেঘ শুনলো কিনা কে জানে। অতিরিক্ত ক্রোধে মেঘের মাথা ঘুরছে, তবুও শান্ত হওয়ার নাম নেই। মেঘ রাগান্বিত কণ্ঠে পুনরায় চেঁচিয়ে উঠল, “আমায় ছাড়ুন বলছি। ” “ছাড়ার জন্য তো ধরি নি, ছাড়িয়ে নিতে পারলে নে। ” মেঘ রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে বলল, “আমি কিন্তু চিৎকার করব।” আবির এবার স্ব শব্দে হাসলো। মেঘ আশ্চর্য নয়নে তাকিয়ে বলল, “হাসছেন কেন? আমি কিন্তু সত্যি সত্যি চিৎকার করবো।” আবির তপ্ত স্বরে প্রশ্ন করল, “তুই যে অগাচণ্ডী সেটা কি জানিস?” “মানে...” “এইযে চিৎকার করবি বললি, চিৎকার তুই করতেই পারিস, কিন্তু সবাই আসলে বলবি টা কি শুনি? আমি তোর হাত ধরেছি এটায় নালিশ করবি? তোর কি মনে হয়, তোর এই নালিশের ভয়ে আমি তোর হাত ছেড়ে দিব? জীবনেও না। বরং তুই নালিশ করলে আমার সুবিধায় হবে। দে চিৎকার। ” আবিরের কথাগুলো শুনে মেঘ হঠাৎ ই আবিরের দিকে কেমন করে তাকালো। এতক্ষণ নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ ছিল না।

আবিরের ঠোঁটের কোণে এক চিলতে হাসির ঝলক দেখে অষ্টাদশীর রাগ কিছুটা কমে এসেছে। তবে এখনও পুরোপুরি শান্ত হতে পারে নি। আবিরের মুখের পানে দুর্বোধ্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। দৃষ্টি নামাতেই চোখ পরে রানী গোলাপী পাঞ্জাবিতে। সঙ্গে সঙ্গে অষ্টাদশীর অভিব্যক্তি পাল্টাতে শুরু করলো। আবির ভাইকে এভাবে দেখে যেন চোখ ফেরাতে পারছে না। আচমকা ফোঁস করে শ্বাস ফেলল। নিজের ভেতরের সমস্ত রাগ ঝেড়ে ফেলতে চাইলো। এই মানুষটার সাথে আর যাই হোক রাগ করা অষ্টাদশীর পক্ষে অসম্ভব বিষয়। আবির গলা খাঁকারি দিয়ে বলতে শুরু করল, "তোর কি হয়েছে আমি জানি না, জানতেও চাই না। আমি কিছু কথা বলবো তুই চুপচাপ সেগুলো শুনবি।" আবিরের কথায় মেঘের দৃষ্টি সরল, মাথা নিচু করে দাঁড়ালো। আবির বলে, "মনে কর, তুই একটা ড্রেস কিনতে একটা দোকানে গেছিস, অনেক খোঁজার পর একটা ড্রেস তোর খুব পছন্দ হয়েছে। যেই ড্রেসটা নিতে যাবি তখনি অন্য একজন এসে তোর পছন্দের ড্রেসটা নিয়ে দেখতে লাগল । তারও ড্রেসটা খুব পছন্দ হয়েছে। তখন তুই কি করবি ড্রেসটা হাসিমুখে তাকে দিয়ে দিবি? নাকি শক্ত গলায় বলবি, এই ড্রেসটা আমি নিব। যদি অভিমান করে তোর পছন্দের জিনিস গুলো মানুষকে দিতে থাকিস, পরে একটা সময় দেখবি তোর আশেপাশে প্রিয় জিনিস বলতে কিচ্ছু নেই। " মেঘ মনোযোগ দিয়ে কথাগুলো শুনলো। আবির মেঘের হাত ছেড়ে স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, "আমাদের আশেপাশে এমন অনেক ঘটনা ঘটে যেগুলো দেখেও না

দেখার মতো করে চলতে হয়। যদি আমরা সেগুলোকে পাত্তা দেয়, তাহলে আমাদের জীবন ধ্বংস। অনিশ্চিত জীবনে যতদিন বাঁচবি, ততদিন নিজেকে নিয়ে বাঁচার চেষ্টা করবি। আমি নিচে যাচ্ছি, ১০ মিনিটের মধ্যে ফ্রেশ হয়ে নিচে আসবি। ” আবির দীর্ঘ পা ফেলে সিঁড়ির কাছে গিয়ে আবার পেছন ফিরে তাকালো, উচ্চস্বরে বলল, “My Dear Sparrow, সবকিছু চাইলেই পেয়ে যাবেন, এমনটা নাও হতে পারে। প্রয়োজনে কিছু জিনিস আদায় করে নিতে হয়।” আবির চলে গেছে। মেঘ ঠোঁট কামড়ে দাঁড়িয়ে আছে। মাথায় ঘুরছে আবির ভাইয়ের বলা শেষ কথাটা। “প্রয়োজনে কিছু জিনিস আদায় করে নিতে হয়।” মেঘের রাগ, অভিমান, মন খারাপের কারণগুলো এক মুহুর্তেই পালিয়েছে। আবির ভাই যেন অষ্টাদশীকে ইন্ডাইরেক্টলি তাকে বুঝিয়ে দিয়েছে, “আবির ভাইয়ের ভালোবাসা আদায় করে নিতে হবে। ” সহসা মেঘের ঠোঁটে হাসি ফুটেছে। এই হাসিতে কোনো খাদ নেই। মনের ভেতর নেই কোনো অভিযোগ। মেঘ দ্রুত রুমে গিয়ে ফ্রেশ হয়ে, অন্তহীন পায়ে ছুটতে ছুটতে নিচে নামলো। মেঘের ছুটোছুটি দেখে হালিমা খান বিরক্ত হয়ে বললেন, “এভাবে দৌড়াচ্ছিস কেন, পরে ব্যথা পেলে কি হবে?” মেঘ এক গাল হেসে উত্তর দিল, “আমার কিচ্ছু হবে না। ” দৌড়ে বেরিয়ে আসে ঘর থেকে। আঁখি জোড়া কাউকে খোঁজছে। হঠাৎ চোখ পরে প্যান্ডেলের দিকে। একটা ব্রেঞ্চে আবির ভাই বসে আছে।পেছনের সাইড দেখা যাচ্ছে, মেঘ চুলগুলো দেখেই চিনতে পেরেছে। আবিরের পাশে সাকিবকে দেখে সিউর

হয়েছে। সাকিব এদিকেই তাকিয়ে ছিল। সাকিব আবিরের কানের কাছে বিড়বিড় করে বলল, “ভাইয়া, তোমার প্রেয়সী আসছে কিন্তু সাথে শত্রুপক্ষের আগমন হচ্ছে। বি কেয়ারফুল। ” সাকিব আবিরের পাশ থেকে উঠে আবিরের বিপরীতে একটা চেয়ার টেনে বসল। মেঘ আবিরের কাছাকাছি আসতেই চোখে পরল, মালা একটা ট্রে নিয়ে মেঘের আগে আবিরের সামনে হাজির হলো। কিছু খাবার আর এক গ্লাস শরবত। আবিরের কাছে এসে মালা মোলায়েম কণ্ঠে বলল, “ভাইয়া, তোমাকে কতক্ষণ যাবৎ খোঁজতেছিলাম। তুমি তো দুপুরের পর আর কিছু খাও নি। তাই খাবার নিয়ে আসছি। ” মালার আহ্লাদী কণ্ঠে আবিরের মেজাজ খারাপ হলো। তবুও স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করল। আবির প্রখর তপ্ত স্বরে জানাল, “আমি এখন খাবো না। নিয়ে যা। ” মেঘের রাগ ক্রমে ক্রমে বেড়েই চলেছে। গাল ফুলিয়ে আবিরের থেকে কিছুটা দূরে আবিরের মুখোমুখি এসে দাঁড়ালো। সামনে থেকে আবিরকে দেখছে। অথচ আবির কারো দিকেই তাকাচ্ছে না। মালা পুনরায় বলল, “খাবার টা খেয়ে নাও প্লিজ।” আবির রাগান্বিত কণ্ঠে কিছু বলতে যাবে তার আগেই মেঘ আবিরের কাছাকাছি দাঁড়ালো। ঝোঁকে আবিরের মুখোমুখি হলো। মেঘকে কাছে আসতে দেখে আবির একটু পিছিয়ে গেল। মেঘ আচমকা আবিরের বুকের উপরের বোতাম টা লাগাতে লাগাতে বলল, “পাঞ্জাবি তো পরেছেন ঠিকই, বোতাম গুলোও ঠিকমতো লাগাতে পারেন নি। ” বোতাম লাগিয়ে তাকালো মাথায়, এক মুহুর্তের ব্যবধানে চুলে হাত দিল। দুহাতে চুলগুলো ঠিক

করতে করতে বলল, “ইশশ, চুলগুলোও এলোমেলো করে ফেলেছেন। আমি না থাকলে যে আপনার কি হবে, এটায় ভেবে পায় না।” আবির অবিশ্বাস্য দৃষ্টিতে মেঘকে দেখছে। নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে নিম্নাষ্ঠ কামড়ে ধরল। চোখে মুখের বিস্ময় যেন সরছেই না। মেঘ যে এমন কান্ড করবে, এটা আবির কল্পনাতেও ভাবতে পারে নি। মেঘের কান্ডে স্তব্ধ হয়ে গেছে আবির। মেঘ চুল ঠিক করে এক পা পিছিয়ে আবিরকে ভালোভাবে পরখ করে মোলায়েম কণ্ঠে বলল, “এইতো এখন ভালো লাগছে। মাশাআল্লাহ। ” কথাটা বলেই ধপ করে আবিরের পাশে বসে পরল। সাকিব চেয়ারে বসে এতক্ষণ বিপুল চোখে সব ঘটনা দেখছিল। ছেলেটা মুখ চেপে হেসেই যাচ্ছে। সবার মুখে হাসি থাকলেও। মালা রাগে ফুঁসছে। মেঘকে আবিরের বোন ব্যতিত কিছু ভাবে নি সে। তবে এখন মেঘের আচরণ দেখে মালার সহ্য হচ্ছে না। মেঘ মালার দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বলল, “আপু, আবির ভাই এ সময় কিছু খায় না। কিছু লাগলে আমি এনে দিব নে। তুমি বরং তোমার বান্ধবীদের সময় দাও। ” মালা রাগে কটমট করে চলে যাচ্ছিল। সাকিব পেছন থেকে ডাকল, “মালা, খাবার টা বরং আমায় দিয়ে যা। আমি খেয়ে তোর জন্য দোয়া করবো। ” মালা হুঙ্কার দিয়ে উঠল, “তোর দোয়া আমার লাগতো না। ” আবির মেঘের দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। আজ সকাল থেকে যা যা ঘটছে তারপর আবির আর কোনোভাবেই নিজেকে সংযত রাখতে পারছে না। মালা চলে যাওয়ায় মেঘও আবিরের দিকে তাকালো। চোখে চোখ পড়তেই আবির ভ্রু নাচালো। মেঘ নিঃশব্দে

হাসলো। কাজল কালো চোখ সাথে অকৃত্রিম হাসিতে আবির ঘায়েল হয়ে গেছে। নেশাক্ত কন্ঠে শুধালো, “এটা কি ছিল?” মেঘ হাসিমুখে উত্তর দিল, “আপনি বুঝবেন না। ” আবির ভ্রু কুঁচকে তাকাতেই সাকিব বলে উঠল, “ভাইয়া, শুধু হাতে পায়ে লম্বা হলেই হয় না। বুদ্ধির ও প্রয়োজন আছে। তোমার উচিত মেঘবতীর থেকে কিছু বুদ্ধি ধার নেয়া। ” আবির মেঘের দিকে তাকিয়ে থেকেই মুচকি হেসে জানাল, “আমিও তাই ভাবছি। এখন থেকে যখন ই বুদ্ধির প্রয়োজন হবে, তখন ই ওর কাছে যাবো।” মেঘ আবিরের মুখের পানে চেয়ে ভেঙচি কেটে উঠে চলে গেছে । আবির নিঃশব্দে হাসছে আর অষ্টাদশীর প্রস্থান দেখছে। আবিররা যেখানে বসেছে তার পেছনে কিছুটা দূরে গায়ে হলুদের স্টেজ। মীম, দিশা আরও কয়েকটা মেয়ে সেখানেই বসে আছে। মীমকে দেখে মেঘও সেখানে গিয়ে মীমের পাশে বসেছে। সাকিব চেয়ার থেকে উঠে এসে আবিরের পাশে বসতে বসতে মোবাইল এগিয়ে দিয়ে বলল, “নাও তোমার ভিডিও আর ছবি। ঠিক আছে কি না দেখো।” আবির টেনে টেনে সবগুলো দেখছে। মেঘের ভেঙচি থেকে শুরু করে আরও অনেক ছবি তুলে ফেলছে। ১ টা ছবিতে দু’জন দু’জনের চোখের দিকে তাকিয়ে আছে। একটা ভিডিও করেছে। ভিডিওটা তে বোতাম লাগানো, চুল ঠিক করার দৃশ্য। সাকিব আস্তে করে বলল, ” ভাইয়া আমার কিন্তু খুব রাগ উঠতেছে। ” আবির ফোনটা পকেটে রেখে বলল, ” কেন? ” আবির ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাতেই দেখল মেঘ সবার সঙ্গে কথা বলছে আর হাসছে। সাকিবের কাঁধে

মাথা রেখে আবির মেঘকে দেখছে। সাকিব ঠান্ডা কণ্ঠে বলল, ” তোমাদের লুকোচুরি প্রেম আর কতদিন চলবে? ” “জানি না।” “এইযে কিছু বলতে পারো না তোমার খারাপ লাগে না?” “খারাপ তো লাগেই। ওর জন্য কত নির্ঘুম রাত কাটে আমার। ও যদি জানতো! নির্ঘুম রাত কাটিয়ে সকালবেলা ওর মায়াবী আঁখি জোড়া দেখলে মনে হয় আরও শত শত রাত নির্ঘুম কাটাতে পারবো।” সাকিব মজা করে বলল, “আহারে ভালোবাসা। ”আবিরের ঘোর যেন কোনোমতেই কাটছে না। সাকিবের কাঁধে মাথা রেখে ক্লান্তিহীন অমত্ত চোখে মেঘকে দেখেই যাচ্ছে। নিজে পছন্দ করে কেনা ড্রেসটাতে অষ্টাদশীকে যতটা মোহনীয় লাগবে ভেবেছিল তার থেকেও কয়েকগুণ বেশি রমণীয় লাগছে। মেঘের মায়াবী হাসি দেখে আবিরের টালমাটাল অবস্থা। মায়াবিনীর মায়াবী হাসি দেখলে বরাবরই আবিরের সকল দুশ্চিন্তার অবসান ঘটে । হৃদয়ে অন্যরকম অনুভূতি কাজ করে। আজ সকাল থেকে ঘটা একের পর এক ঘটনা আবিরকে বেসামাল করে দিচ্ছে। নিজেকে সামলানোর বিন্দু মাত্র শক্তি আবিরের নেই। নানান রকমের নিষিদ্ধ ইচ্ছা যেন মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। অষ্টাদশীর প্রাণোচ্ছল হাসি, তার সাথে গাঢ় কাজল টানা দু চোখ দেখে আবির আনমনে বিড়বিড় করে বলে, “আমার ক্লান্ত মস্তিষ্ক জোড়ে শুধু তোর বিচরণ চলে ” সাকিব ঠাট্টার স্বরে শুধালো, “কার?” সাকিবের প্রশ্নে আবির কিছুটা নড়ে বসল। বুঝতে পারল, তার মনের কথা মুখ ফঁসকে বেড়িয়ে গেছে। নিজেকে সামলে উত্তর দিল, “মাহদিবা খান মেঘ” “এখনও মেঘবতীকেই দেখছ

নাকি? কোথায় মেঘবতী, দেখি! ” যেই না ঘাড় ঘুরাতে যাবে,ওমনি আবির আঁটকে দিল। তেজঃপূর্ণ ভারী স্বরে বলল, ” আমার সম্পত্তিতে ভুলেও নজর দিবি না। ” সাকিব আমতা আমতা করে বলল, “আমি তো শুধু দেখতে চাইছিলাম। ভাইয়ের সম্পত্তিতে নজর দিব এত নিকৃষ্ট আমি না। তাছাড়া আমার মানুষ আছে। ” আবির কোনো কথা বলল না। একটু থেমে সাকিব পুনরায় বলল, “ভাইয়া চলো একটা জায়গায় যায়। ” আবির উদাস কণ্ঠে বলে উঠল, “আমি জানি তুই কোথায় যেতে চাচ্ছিস। কিন্তু আমি এখন কোথাও যাচ্ছি না।” “প্লিজ ভাইয়া চলো না। ওদের সন্ধ্যার পর আমাদের বাড়িতে আসার কথা ছিল,আমি বলছিলাম এগিয়ে নিয়ে আসবো। ” আবির ব্যস্ত ভঙ্গিতে বলল, ” ইশশ কি প্রেম! দুইটা বাড়ি পরেই তো বাড়ি। এখান থেকেও আবার এগিয়ে আনতে হয় ? আর কত কি যে দেখতে হবে। ” সাকিব একগাল হেসে প্রশ্ন করল, ” এই কথা তুমি বলছ ভাইয়া? ২৪ ঘন্টা যার চোখের সামনে মেঘবতী ঘুরঘুর করে, মেঘবতীর কণ্ঠ না শুনলে রাতে যার ঘুম হয় না, সেই সাজ্জাদুল খান আবির এই কথা বলছে?” আবির গম্ভীর কণ্ঠে বলে, “চুপ থাকবি তুই। ” “আর একটা প্রশ্ন, বাসায় তো সারাদিন মেঘবতীকে দেখই তারপরও এত বিভোর হয়ে আছো কেন, বলবা ? ” আবির রাশভারি কণ্ঠে জবাব দিল, “বাসায় তো এভাবে দেখার সুযোগ পায় না। একবারের বেশি দুবার তাকাতে গেলেই চোখে চোখ পরে যায়। না চাইতেও বাধ্য হয়ে আমার ই দৃষ্টি সরিয়ে নিতে হয়। আজ এতদিন পর ও কে দেখার সুযোগ পেয়েছি। দয়া করে

তোর মুখ টা বন্ধ রাখ। ” “ওদের কি আনতে যাব না?” আবির গম্ভীর কণ্ঠে জানাল, “কল বা মেসেজ দিয়ে বল চলে আসতে। আমি এখন কোথাও যাব না। আর তুই ও যেতে পারবি না। প্রোগ্রাম শেষে এগিয়ে দিয়ে আসিস। এখন ডিস্টার্ব করিস না। ” সাকিব পকেট থেকে ফোন বের করে মেসেজ করছিল। সাকিবের কাঁধে আবিরের মাথা, অক্ষি যুগল নিবদ্ধ মেঘের চোখে-মুখে। প্রেয়সীর মুগ্ধতায় ডুবে আছে সে। পল্লব ফেলছে না একটিবারও। ইহজগতের আর কোনোকিছুতেই মনোযোগ নেই তার। আচমকা কেউ একজন আবিরের কান চেপে ধরায়, আঁতকে উঠে। অগাধ মনোযোগে ছেদ পরল। আকস্মিক ঘটনায় আবির কিছুটা ভড়কে গেল। হকচকিয়ে সোজা হয়ে বসে সঙ্গে সঙ্গে তাকায় সেদিকে। মাইশা শক্ত হাতে আবিরের কান চেপে ধরে আছে, চোখে-মুখে পরিষ্কার রুষ্টতা। আবির বিস্ময় চোখে তাকায়, ভ্রু কুঁচকে নরম স্বরে বলল, “উফ, আপু লাগছে। ” মাইশা রাগী স্বরে জবাব দেয়, “লাগুক। তোরে কতক্ষণ পি*টাইলে মনে শান্তি পাইতাম। ” আবির নিরুদ্বেগ কণ্ঠে বলল, “আমি আবার কি করলাম?” “ফাজিল ছেলে, আবার কথা বলিস।” “প্লিজ আপু কান ছাড়ো। ব্যথা পাচ্ছি ।” মাইশা কান ছেড়ে আবিরের পিঠে ঠাস ঠাস করে ২-৩ থাপ্পড় বসিয়ে দিয়েছে। আবির কপাল গুটিয়ে কোমল কণ্ঠে আর্তনাদ করে, “আপু.....!” সাকিব চিন্তিত স্বরে শুধালো, “হয়ছে টা কি আপু? ভাইয়াকে মারতেছো কেন?” মাইশা রাগান্বিত কণ্ঠে বলা শুরু করে, “মারবো না তো কি করব। আমি নিজে না সেজে কতটা সময় নিয়ে মেঘকে সাজিয়েছি।

সাথী শাড়ি পড়িয়ে দিয়েছে, মুন্নি আর আমি মিলে মেকাপ করে দিয়েছি, আলতা টা পর্যন্ত আমি দিয়ে দিয়েছি। বার বার মেয়েটাকে বলছি, তুমি বসে থাকো আমি রেডি হলে একসাথে নিচে আসব। ছটফটে মেয়ে একটুও বসলো না, রুম থেকে ছুটে চলে আসছে। আমি রেডি হয়ে আসতে পারলাম না, মেঘের পড়নে না আছে শাড়ি, আর না আছে কোনো সাজগুজ। আমি সিউর এটা এই ফাজিলের কাজ। ” বলতে বলতে আবিরের পিঠে আরেকটা থাপ্পড় বসিয়ে দিয়েছে। সাকিব মাইশার কথা শুনেই বসা থেকে উঠে গেছে। আবিরের মুখোমুখি হয়ে শুধায়, ” ওহ আচ্ছা, এই কারণেই তাহলে তোমার টালমাটাল অবস্থা?” মাইশা পুনরায় চেচিয়ে উঠে, ” কিরে কথা বলছিস না কেন?” আবির অন্য দিকে তাকিয়ে উত্তর দিল, “আমি কি বলব।” “মেঘ শাড়ি পাল্টালো কেন?” “জানি না ” “আবির, একদম ফাজলামো করবি না। আমি ডেম সিউর এটা তোর কাজ। ” সাকিব পাশ থেকে বলে উঠল, “এতক্ষণে বুঝলাম, ভাইয়ার মাথা নষ্টের কারণ মেঘবতীর শাড়ি। থাক আপু, তুমি মন খারাপ করো না। ভাইয়া মেঘবতীর প্রতি একটু বেশিই সিরিয়াস তো, তাই হয়তো শাড়ি পাল্টাতে বলছে।” মাইশা ভ্রু কুঁচকে শুধালো, “তুইও জানিস? আবির তাহলে সত্যি সত্যি মেঘকে পছন্দ করে?” সাকিব উত্তেজিত কণ্ঠে জানাল, “পছন্দ না গো আপু। মেঘবতীর প্রেমে আবির দেওয়ানা বলো। মানুষ তো প্রেমে হাবুডুবু খায়, ভাইয়া পুরোপুরি ডুবে আছে। কবে যে নিঃশ্বাস আটকে মরে যায় আল্লাহ জানেন।” আবির সাকিবের দিকে চোখ রাঙিয়ে তাকিয়ে আছে।

সাকিবের সেদিকে হুঁশ নেই। আবির ধমক দিতে যাবে তার আগেই মাইশা শীতল কণ্ঠে বলে উঠে, “ছিঃ আবির তোর থেকে অন্তত এটা আশা করি নি। ছোট বেলা থেকে তুই বলতি, আমি নাকি তোর সবচেয়ে ভালো বোন। ভালো বোন হওয়ার এই প্রতিদান দিলি। একটাবার বলতে তো পারতি!” আবির কৈফিয়তের স্বরে জবাব দিল, “কি করে বলব! তোমার সাথে কি নিরবে কথা বলতে পারি? ফোনে কথা বললে মামা, মামি, মালা, দিশা কেউ না কেউ থাকেই সবসময়। বলবো কিভাবে?” মাইশা সেসবে পাত্তা না দিয়ে বলে, “তুই আমার প্ল্যানে পানি ঢালছিস, এখন আমি তোর প্রেমে আগুন লাগাবো। ওয়েট বাবু। ” মাইশা রাগে গজগজ করে ২-৩ কদম এগুতেই আবির ছুটে গিয়ে মাইশার পথ আঁটকে দ্বিগুণ ভারি কণ্ঠে প্রশ্ন করে, “কি করবা?” “তানভির কে কল দিয়ে বলব, তুই যে গোপনে হের বোনের পিছে ঘুরছিস। ” আবির মাইশার সামনে থেকে সরে একপাশ হয়ে দাঁড়িয়ে উত্তর দিল, “ওহহ ” মাইশা ভ্রু কুঁচকে আবিরের মুখের পানে তাকায়। আবিরের ঠোঁটের কোণে হাসি দেখে মাইশার চরম রাগ উঠে গেছে। সাকিবের দিকে তাকাতেই সাকিব হেসে ফেলল। সাকিবকে হাসতে দেখে মাইশা রাগে প্রশ্ন করল, “হাসছিস কেন?” “হাসছি, কারণ তুমি যাকে বিচার দিতে যাচ্ছো। সে অলরেডি সবকিছু জানে। এখন না, আরও ৭-৮ বছর আগে থেকেই জানে। ” “কি? আবির কি এতবছর যাবৎ মেঘকে ভালোবাসে? ” “হ্যাঁ।” মাইশা আবিরকে শুধালো, “মেঘ জানে?” “না” “বলিস না কেন?” “সময় হলে বলব।” “তুই সময়ের

অপেক্ষা কর, আমি এখনি বলে দিব। ” আবির আতঙ্কিত হয়ে বলে, “আপু প্লিজ, ওরে এখন কিছু বলো না।” ” আমি বলবই। ” “সরি আপু। প্লিজ ওরে কিছু বলো না। ” ” সরি বললেই কি সবকিছুর সমাধান হয়ে যায়? এত কষ্ট করে সাজিয়ে দেখতেই পারলাম না আর একটা ছবিও তুলতে পারলাম না। এখন তোরে কি করতে মন চাই বল ” ” আপু শুনো, ভাইয়া যেহেতু ঢাকায় জব করেন, বিয়ের পর তো তুমিও ঢাকা তেই থাকবা। কোন একদিন মেঘকে শাড়ি পরিয়ে তোমার সাথে দেখা করাবো, দরকার হলে তোমাদের বাসা থেকেও ঘুরে আসবো। তবুও শাড়ি পরা নিয়ে আর কিছু বলো না। আম্মুরা কারো কানে একথা গেলে তুলকালাম হয়ে যাবে। প্লিজ। ” “ফুপ্পি জানে না?” “না।” “ঠিক আছে, মাফ করতে পারি তবে একটা শর্তে” “কি শর্ত?” ” কানে ধর ” “এখন?” “হ্যাঁ এখন। কানে ধরবি নাকি মেঘকে বলবো?” “আচ্ছা ধরছি ” বলে আবির দু’হাতে আলতোভাবে কানের লতি স্পর্শ করল। মাইশা মৃদু হেসে শুধালো, “মেঘকে প্রথমবার শাড়িতে দেখার অনুভূতি বল ” আবিরের জবাব এলো, “কানে ধরে কেউ অনুভূতি শেয়ার করে?” “কেউ করে না বলেই তুই করবি।” “শুনো তবে, শাড়ি পরিহিতা মাহদিবা খান মেঘকে দেখে সাজ্জাদুল খান আবিরের অন্তরতম অঁচল পূর্বাভাস বিহীন কালবৈশাখী ঝড়ের কবলে পড়েছে। মাহদিবার সাহচর্য ব্যতীত আবিরের অশান্ত হৃদয় শান্ত হবে না।” মাইশা আর সাকিব দুজনেই হা করে তাকিয়ে আছে। মাইশা উচ্চস্বরে হেসে বলল, “হায় আল্লাহ! আমার ভাই এখন প্রেমিক

পুরুষ হয়ে গেছে। ” মাইশার হাসির শব্দে মীমদের নজর পড়ে। আবির কে দেখে বসা থেকে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলে, “আপু, দেখো ভাইয়া কানে ধরে দাঁড়িয়ে আছে। ” তৎক্ষনাৎ মেঘের নজর পরে সেদিকে। আবিরকে এই অবস্থায় দেখে মেঘের মাথায় চক্কর দিয়ে উঠে। মেঘ, মীম ছুটে যায় সেদিকে। মেঘ দূর থেকে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে শুধায়, “কি হয়েছে? আপনি কানে ধরে আছেন কেন?” মাইশা আবিরকে ইশারা দিতেই আবির কান থেকে হাত নামিয়ে বলে, ” কিছু হয় নি। ” “কিছু হয়নি মানে কি?” মাইশা মেঘের দিকে তাকিয়ে কোমল কণ্ঠে বলে, “আবির ভুল করেছিল তাই আমি শাস্তি দিয়েছি। ” মীম প্রশ্ন করে, “ভাইয়া কি ভুল করছিল?” “সেটা তোমাদের বলা যাবে না। ” এই বলে মাইশা চলে গেছে। মেঘ আবিরের মুখের পানে চেয়ে চিন্তিত স্বরে জিজ্ঞেস করল, “কি করছিলেন আপনি?” আবির কিছু বলার আগেই সাকিব বলল, “ভাইয়া ছোট একটা ভুল করেছিল তাই আপু শাস্তি দিয়েছে। তুমি টেনশন করো না। ” এই কথা শুনে মেঘ ফিক করে হেসে উঠলো। আবির ভ্রু কুঁচকে প্রশ্ন করল, “হাসছিস কেন?” মেঘ মুচকি হেসে এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ল। মীমের হাত ধরে হাসতে হাসতে চলে যাচ্ছে। আবির কপাল গুটিয়ে প্রেয়সীর গমনপথে চেয়ে আছে। মেঘের চিন্তান্বিত চেহারার হঠাৎ পরিবর্তনের কারণ আবিরের মাথায় ঢুকছে না। মাইশাকে স্টেজে বসানো হয়েছে। প্যান্ডেলে আত্মীয়ের সমাগম। এরমধ্যে দুটা অল্পবয়স্ক মেয়ে শাড়ি পড়ে বাড়িতে ঢুকছে। সাকিব একপলক তাকিয়ে আবিরের কানে ফিসফিস

করে কি যেন বলে সেদিকে চলে গেছে। মালা আর ওর বান্ধবীরা কয়েকটা ছেলের সাথে হেসে হেসে কথা বলতে ব্যস্ত। ছেলেগুলো মালার ই বন্ধু। আবির তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারপাশ পর্যবেক্ষণ করছে। মেঘ চেয়ারে বসে মাইশার ছবি তুলছে আর সেগুলো মীমকে দেখাচ্ছে। মাঝে মাঝে দুইবোন সেলফিও তুলছে। সাকিব গেইটের কাছে গিয়ে একটা মেয়ের সঙ্গে একটু কথা বলেই সরে গেছে। আদি ছুটে এসে মীমকে টেনে নিয়ে কোথায় চলে গেছে। এই সুযোগে আবির লোকজনের ভিড় পেরিয়ে মেঘের পেছনে দাঁড়িয়ে মেঘের মাথায় গাট্টা মারে। আকস্মিক ঘটনায় মেঘ আঁতকে উঠে। পেছন ফিরে আবিরকে দেখে কিছুটা স্বাভাবিক হয়। আবির রাশভারি কণ্ঠে প্রশ্ন করে, "তখন হাসছিলি কেন ?" "এমনি!" "এমনি কেউ হাসে না। কারণ বল। " "আপনাকে শাস্তি দেয়ার মানুষ আছে দেখেই হাসি পাচ্ছিল। " "তারমানে আমি শাস্তি পেলে তুই খুশি?" "আমি এই কথা কখন বললাম! " "সব কথা বলতে হয় না। তোর মনের কথা চোখে স্পষ্ট ভাসতেছে।" মেঘ ঘন ঘন পল্লব ফেলে শুধালো, "আপনি কি চোখের ভাষাও বুঝেন?" "জ্বি।" "সবার?" "জ্বি না। তোর মতো তার ছিঁড়া মানুষের মনের কথা বুঝার ক্ষমতা আল্লাহ আমায় দিয়েছেন। " "আমি তার ছিঁড়া? " "কি মনে হয়?" মেঘ গাল ফুলিয়ে শ্বাস ছেড়ে বলল, "আমি মোটেই তাঁর ছিড়া না।" "সেসব পরে দেখা যাবে। মামি খাওয়ার জন্য ডেকে গেছেন। মীম, আদিকে নিয়ে তাড়াতাড়ি আয়।" মালা আর ওর বান্ধবীরা দূর থেকে আবির মেঘের কথোপকথন শুনার

চেষ্টা করছিল। স্টেজ থেকে মাইশাও আবির মেঘকে দেখছিল। মাইশার মুখে মিষ্টি হাসি। মাইশা আর আবিরের বয়সের পার্থক্য মাত্র ১ বছর হওয়ায় দুই ভাই- বোনের মধ্যে ছোট থেকেই বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক। মামা বাড়িকে কেন্দ্র করে আবিরের শৈশবের অনেকখানি স্মৃতি জড়িয়ে আছে। মামা বাড়ির সবচেয়ে কাছের মানুষ ছিল মাইশা। সাকিব একটু বড় হওয়ার পর থেকে সাকিবের সঙ্গেও খুব ভালো সম্পর্ক হয়েছে । বাকিদের সঙ্গে তেমন আন্তরিকতা নেই। মাইশা পড়াশোনার জন্য বাড়ির বাহিরে চলে যাওয়া, আবিরের দীর্ঘদিন মামা বাড়িতে না আসা, তারপর বিদেশে চলে যাওয়া। সব মিলিয়ে মাইশার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হয়নি অনেক বছর। মালার ফোন দিয়ে বেশ কয়েকবার কথা হয়েছে। তবে সবসময় মালা আশেপাশে থাকে। মালার সামনেই মাইশা আবিরকে অনেকবার প্রশ্ন করেছে, আবির কাউকে পছন্দ করে কি না। কেউ আছে কি না! কিন্তু আবির সবসময় এই প্রশ্ন এড়িয়ে গেছে। ব্যস্ততা দেখিয়ে কল কেটে দিয়েছে। মাইশাও আলাদা ভাবে কখনো আবিরকে কল দেয় নি, আবিরও নিজ থেকে কিছু বলে নি। এতদিন পর মাইশা আবিরের মনের কথা জানতে পেরেছে। তাই মেঘ আবিরের খুনসুটি দেখে আনমনে হাসছে। তবে মাইশা খুশি হলেও মালা তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠেছে। সন্ধ্যার ঘটনার পর থেকে দুজনকে একসঙ্গে দেখলেই মালা ফুঁসে ওঠে। আবির বাড়ির ভেতরে চলে গেছে। মীম আর আদি আসার পর মেঘও ওদের নিয়ে খেতে চলে গেছে। মাইশার বাবা-চাচারা, মামারা আরও যারা যারা

আছেন সবাই মাইশাকে হলুদ লাগাতে ব্যস্ত। ২ জন ক্যামেরাম্যান ছবি তুলতেছে। মেঘদের পিছুপিছু মালাও ওর বান্ধবীদের নিয়ে খেতে গেছে। মালিহা খান আর আবিরের ছোট মামি মিলে সবাইকে খাওয়াচ্ছেন। মালাকে বসতে দেখেই সাকিব ঠাট্টার স্বরে বলল, "কিরে মালা, তুই খেতে বসছিস কেন?" "তোর কি সমস্যা? " "আমার আবার কি সমস্যা হবে। যে মেয়ে সাজলে সারাদিন পানিও খায় না। সেই মেয়ে শাড়ি পরে, সেজেগুজে ভাত খেতে বসছে। ঘটনা কি?" " তোর মাথা। " সাকিব আর কথা না বাড়ালো না। আবিরের একপাশে সাকিব বসেছে। অপরপাশে আদি বসেছে, তারপর মীম, এরপর মেঘ। মেঘের পাশেই মালা বসেছে। মালাকে মেঘের পাশে বসতে দেখেই আবির চোখ রাঙিয়ে সাকিবের দিকে তাকিয়ে আছে। সাকিব চোখে ইশারা করল, আবির যেন শান্ত থাকে। মালার থেকে মেঘকে দূরে দূরে রাখতে চেয়েও পারছে না। আবির নিজের রাগ কন্ট্রোল করে খুব তাড়াহুড়োয় খাবার খাচ্ছে। আবির খাবার প্রায় শেষ। তখন মালা মেঘকে উদ্দেশ্য করে বলছে, "মেঘ তুমি বরং এই মাছটা খাও।" একটা মাছের পিস চামচে তুলে মেঘের দিকে এগুতেই আবির রাগান্বিত কণ্ঠে বলে, "মাছের তরকারি অনেক ঝাল হয়েছে, মেঘ এত ঝাল খেতে পারে না। " মালা পুনরায় মাছ বাটিতে রেখে দিল। আবিরের কথা শুনে মেঘ চোখ জোড়া বড় করে তাকালো। অষ্টাদশীর খাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে। মেঘ এত ঝাল খেতে পারে না, এটা আবির ভাই মনে রেখেছে, ভেবেই অষ্টাদশীর মন খুশিতে ভরে গেছে। মেঘ

চিবুক নামিয়ে লাজুক হাসলো। আবির ভাইয়ের প্রতি ভালো লাগা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। আবির উঠে যেতে যেতে মালাকে উদ্দেশ্য করে গম্ভীর কণ্ঠে বলল, " মেঘকে খাওয়ানোর দায়িত্ব তোকে দেয়া হয়নি। তোর যতটুকু কর্তব্য ততটুকুই করিস। এর বাহিরে কোনো প্রকার ভালোবাসা দেখানোর প্রয়োজন নেই। " আবির রাগে কটমট করে রুম থেকে বেরিয়ে পরেছে। রাগটা পুরোপুরি প্রকাশ করতে পারছে না। আবার গিলতেও পারছে না। খাওয়ার মধ্যে তানভির ৫-৭ বার কল দিয়ে ফেলেছে। তানভিরের সাথে কথা বলে নিজের ভেতরের ক্ষোভ প্রকাশ করছে। তানভিরও ঠান্ডা মাথায় ভাইকে বুঝাচ্ছে । আচমকা আবিরের সামনে মেঘ দাঁড়াতেই আবিরের কথা বন্ধ হয়ে গেছে। ক্ষোভের পরিবর্তে আবিরের চোখে-মুখে মুগ্ধতা প্রতীয়মান হচ্ছে। মায়াবিনীর মায়াবী মুখ দেখলে আবিরের ক্রোধ যেন নিমিষেই বিলীন হয়ে যায়। আবির উঠে যাওয়ায় মেঘ তাড়াহুড়ো করে খাবার খেয়ে ছুটে এসেছে। আবির ভাইয়ের অপ্রকাশিত ভালোবাসা বেশ ভালোই বুঝতে পারছে সে। আবিরকে নিরুত্তর থাকতে দেখে তানভির কয়েকবার হ্যালো হ্যালো বলছে । কয়েক মুহূর্ত পর আবির বলে, "এখন রাখছি। পরে কল দিব।" মেঘ মোলায়েম কণ্ঠে শুধালো, "ভাইয়া কল দিয়েছিল?" "হ্যাঁ।" "ভাইয়া কি রাতে খেয়েছে?" "হ্যাঁ। তুই কি জন্য এসেছিলি?" "আপনাকে দেখতে। " আবির কপাল কুঁচকে বলে, "মানে?" " আপনার শীত লাগছে কি না দেখতে আসছিলাম। ঠিক আছে চলে যাচ্ছি। " আবিরের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মেঘ

লজ্জায় আড়ষ্ট হয়ে যাচ্ছে। নিজের প্রতি রাগ হচ্ছে। মুখ ফসকে সবসময় সত্যি কথায় কেন বের হয়! মেঘ কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে স্টেজের দিকে চলে গেছে। মেঘকে দেখেই মাইশা হাতে ইশারা করলো স্টেজে যাওয়ার জন্য। ঘন্টাদুয়েক গায়ে হলুদের প্রোগ্রাম চলল। স্টেজের আশেপাশে ছবি তুলার জন্য বেশ কিছু সোফা, তার আশেপাশে ফুল দিয়ে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। সেখানেই সকলে দল বেঁধে ছবি তুলছে। সবার হলুদ ছোঁয়ানো শেষে নাচের প্রোগ্রাম শুরু হয়েছে। দিশা, মালা, মালার বান্ধবীরা সবাই গায়ে হলুদের গানে অনেক সুন্দর নেচেছে। ছেলেদের মধ্যেও বেশ কয়েকজন নেচেছে। সবার শেষে ১০ জন ছেলে স্টেজে উঠেছে। সবার পরনে রানী গোলাপী পাঞ্জাবি , সবাই এক গানে নাচছে। মেঘ সামনের দিকে চেয়ারে বসে সেই নাচের ভিডিও করছে। কারণ ১০ জনের কেন্দ্রবিন্দু হলো আবির। সবাই নিজেদের মতো নাচলেও আবিরকে স্টেজে উঠানো যায় নি। মাইশা আপু আর সাকিবের জোড়াজুড়িতে আবির শেষমেশ সবার সাথে নাচতে রাজি হয়েছে। টানা ৩ টা গানে ১০ জন একসঙ্গে পারফর্ম করেছে। আবির স্টেজ থেকে নেমে একটা চেয়ারে বসতে বসতে মেঘকে বলল, “একটু পানি নিয়ে আসবি, প্লিজ। ” “এক্ষুনি আনছি। ” বলে মেঘ হুটোপুটি করে পানি আনতে চলে যায়। পানির গ্লাস নিয়ে আসতে আসতে দেখে মালা আবিরকে পানির বোতল সাধতেছে। মেঘ গ্লাস হাতে মাঝপথেই দাঁড়িয়ে পরেছে। আবির ঘাড় ঘুরিয়ে উচ্চস্বরে বলল, “পানি কি দিবি? ” মালা পুনরায় বলল, “এটা

ভালো পানি। খাও। ” মেঘ কয়েক পা এগিয়ে আবিরের কাছে আসতেই আবির হাত বাড়িয়ে পানির গ্লাস নিতে নিতে বলল, “বোতল দিয়ে পানি খায় না আমি। ” মালা রাগে গজগজ করে চলে যাচ্ছে। যতবারই আবিরের কাছে যেতে চায়, আবির ততবারই মালাকে অবহেলা করে, দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। এটা মালার একদম সহ্য হচ্ছে না। মেঘের প্রতি এত কেয়ার সহ্য করতে পারছে না সে। মেঘ পানির গ্লাস নিতে নিতে বলল, “আপনি এত ভালো ডান্স করেন। জানতাম না তো! ” আবির মুচকি হেসে বলে, ” সময় হলে আরও অনেককিছু জানতে পারবেন। ” মেঘ অবাক লোচনে আবিরের দিকে তাকিয়ে আছে। প্যান্ডেলের আনাচে-কানাচে মানুষের ভিড়। শীতের রাত বলে প্রোগ্রাম তাড়াতাড়ি শেষ করা হয়েছে। মেহেদী দেয়ার জন্য পার্লার থেকে তিনজন মেহেদী আর্টিস্ট আনা হয়েছে। মাইশা রুমে চলে যাওয়ায় পাড়া-প্রতিবেশীরাও যে যার মতো বাড়ি চলে যাচ্ছে। এত মানুষের ভিড়েও দু’জোড়া চোখ একে অপরকে দেখছে। উভয়ের তপ্ত দৃষ্টি তোলপাড় চালাচ্ছে উভয়ের হৃদয়ে। হৃৎস্পন্দনের মাত্রা তীব্র হচ্ছে। দুজনার আঁখি যুগল জড়িয়ে আছে মোহময়তায়। হঠাৎ ফোন ভাইব্রেশন হওয়ার আবিরের দুর্ভেদ্য চাহনিতে ছেদ পরে। স্ক্রিনে তাকাতেই সাকিবের নাম চোখে পড়ে । ঘাড় ঘুরিয়ে সাকিবের হাস্যোজ্জল মুখ দেখে আবির পুনরায় মেঘের দিকে তাকায়। মেঘ তখনও গভীর মনোযোগের সঙ্গে আবিরকে দেখছে। আবির মেঘের চোখের সামনে দু আঙুলে তুড়ি বাজিয়ে মেঘের ঘোর কাটানোর চেষ্টা

করল। তুড়ির শব্দে মেঘ নড়ে ওঠে। সম্বিৎ ফিরতেই মেঘ লাজুক হাসলো। সে কল্পনায় আবির ভাইয়ের সঙ্গে কাপল ডান্স করতেছিল। আবির তুড়ি বাজিয়ে রোমান্টিক মুহুর্তটা নষ্ট করে ফেলেছে। মেঘকে হাসতে দেখে আবির কপাল গুটিয়ে বলল, "কি হলো?" মেঘ জিভ দিয়ে ঠোঁট ভিজালো। দীর্ঘ এক নিঃশ্বাস ছেড়ে ডাকল, "আবির ভাই..!" আবির আবেশিত কণ্ঠে জবাব দিল, "হুমমমমমম। " আগপাছ না ভেবেই মেঘ বলল, "আপনি মানুষটা খুব তেঁতো। " মেঘের কথায় আবির তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালো। কিন্তু কোনো প্রতিক্রিয়া দেখালো না। মুচকি হেসে আশেপাশে তাকিয়ে ভাবলেশহীন জবাব দিল, "তেঁতো হয়েই যে বিপদে আছি, মিষ্টি হলে না জানি কি হতো!" মেঘের ওষ্ঠদ্বয় আরও প্রশস্ত হলো। আবির ভাই ঠিকই বলেছেন। আবির ভাইয়ের এই অ্যাটিটিউড দেখেই মালা আপু, এমপির মেয়ের মতো না জানি আরও কত মেয়ে পাগল। মালা আপুর আচরণে মনে হয় আবির ভাই তার সম্পত্তি। ভাবতেই আচমকা মেঘের হাসি গায়েব হয়ে গেছে। মুখ ফুলিয়ে শ্বাস টেনে বিড়বিড় করে বলল, "আবির ভাই শুধুই আমার। আর কারোর না। " আবির তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মেঘের হঠাৎ পরিবর্তন দেখছে। মেঘের যে ক্ষণে ক্ষণে কি হয়ে যায় এটা ভেবেই আবির ক্লান্ত। আসার পর থেকেই মেয়েটাকে চোখে চোখে রাখছে। তারপরও কি যে হয়! বাসায় থাকলে আবির কখনোই এতটা সময় মেঘকে দিতে পারতো না।বিয়ে বাড়ি আত্মীয়ে পরিপূর্ণ। তাছাড়া সাকিব আর ওর বন্ধুরা আবিরকে অনেকদিকে সাহায্য করছে। মামারা বা আবিরের বাবা

কোনো কাজে আবিরকে খোঁজতে গেলে সাকিবের বন্ধুরায় সে কাজ করে দিচ্ছে। আবিরকে ডাকার সুযোগ ই দিচ্ছে না তারা। সাকিব দু'দিকে ই নজর রাখছে। আবির গলা খাঁকারি দিয়ে ডাকল, "এইযে " মেঘের নজর পরলো আবিরের চোখে। কোনো উত্তর দিল না। আবির রাশভারি কণ্ঠে বলল, " অনেক রাত হয়ে গেছে। আর টইটই করতে হবে না। কুয়াশার মধ্যে বাহিরে ঘুরলে ঠান্ডা লাগবে। প্রোগ্রাম তো শেষ ই। এখন রুমে যা। " "আপনি কি করবেন?" " আমার কাজ আছে ।" মেঘ এবার ভাব নিয়ে বলল, "রাত অনেক হয়েছে। আপনারও টইটই করা উচিত হবে না।" আবির প্রশস্ত নেত্রে তাকাতেই মেঘ ছুটে পালালো সেখান থেকে। আবির ঘাড় ঘুরিয়ে তাকিয়ে আছে। সহসা স্বভাবসিদ্ধ হাসে। আবিরের প্রতি মেঘের ভয়ভীতি যেমন কমছে, তেমনি বাড়ছে মেয়েটার দায়িত্ববোধ। প্রেয়সীর অল্পস্বল্প যত্ন দেখে আবির বেশ বিস্মিত হয়। মনখারাপের জায়গায় ভিড় করে একরাশ মুগ্ধতা। মেঘের সবকিছুই আবিরকে টানে তবে ছোট ছোট পাগলামি আর দুষ্টামি গুলো আবিরের অনেক বেশি টানে। দুজন মেহেদী আর্টিস্ট মিলে এক রুমে মাইশার দুহাতে মেহেদী দিয়ে দিচ্ছে। মাইশাকে যেন কেউ বিরক্ত না করে তাই পাশের রুমে আরেকজন সবাইকে মেহেদী দিয়ে দিচ্ছে। মেঘ মাইশার রুমে বসে মেহেদী দেয়া দেখছে। মাইশা মেঘের হাতের দিকে তাকিয়ে স্বাভাবিক কণ্ঠে বলে, " তোমার হাত ফাঁকা কেন? মেহেদী দিতে পারো না?" "না" "সমস্যা নেই। পাশের রুমে একজন আপু আছেন, ওনি সবাইকে দিচ্ছেন। ওনাকে বলো

তোমাকে দিয়ে দিতে। ” “মেহেদী লাগাবো না আপু।” “এসব বললে হবে না। সবার হাতে মেহেদী তোমার হাত ফাঁকা দেখলে তোমার আবির ভাই আমার সাথে রাগ দেখাবে। এক হাতে অন্তত দাও। ” “আবির ভাই কিছু বলবে না। ” “তোমাকে বলবে না। আমাকে ঠিকই বলবে। যাও বলছি।” “ঠিক আছে আপু।” মেঘ পাশের রুমের দরজায় দাঁড়িয়ে রুমের পরিস্থিতি দেখল। একপাশে মালার বান্ধবীরা যে যার মতো একে অপরকে মেহেদী দিয়ে দিচ্ছে। পার্লারের আপুটা মীমকে মেহেদী দিয়ে দিচ্ছে। মেঘকে দেখে মীম ডাকল, “আপু আসো। তোমাকেও মেহেদী দিয়ে দিবে।” মেঘ মীমের পাশে বসেছে। মীমের মেহেদী দেয়া প্রায় শেষ। মেঘ বসে মেহেদী ডিজাইন দেখছে। আপুটা খুব দ্রুত আর অসম্ভব সুন্দর করে মেহেদী দিয়ে দিচ্ছেন। মীমের মেহেদী দেয়া শেষ। মীম বিছানায় ওঠে বসেছে, দিশারা আগে থেকেই বিছানায় বসে ছিল। মেঘকে মেহেদী দেয়ার জন্য আপু মেঘের বামহাতের কব্জিতে ধরতেই মালা রুমের দরজায় দাঁড়িয়ে গম্ভীর কণ্ঠে বলল, “আপু, এখন আমাকে মেহেদী দিয়ে দিবেন। ” আপুটা হেসে বলল, “তুমি একটু বসো। বেশিক্ষণ লাগবে না। ” মালা রাগে কটমট করে বলল, “মেঘ তুমি বরং পরে মেহেদী দিও। এখন আমি দিব। ” মেঘ চুপচাপ উঠে রুম থেকে বেরিয়ে গেছে। মেঘ উঠতেই মালা মেঘের জায়গায় বসে নিজের হাত বাড়ালো। আবির আর মেঘ প্যান্ডেলে কথা বলার সময় মালা নিজের রুম থেকে দেখেছে। সন্ধ্যার পর থেকে মালা মেঘকে সহ্য ই করতে পারছে না। নিচে মালা কাজ

করছিল, মেঘ মেহেদী দিতে আসায় মালার বান্ধবী মালাকে কল দিয়েছে। সব কাজ ফেলে মালা মেহেদী দেয়ার নাম করে মেঘের মনে আঘাত দিতে আসছে। মালার আচরণে মেঘের মন খারাপ হওয়ার থেকেও বেশি অপমানিত হয়েছে। সে তো ইচ্ছে করে মেহেদী দিতে আসে নি, মাইশা আপু জোর করায় এসেছিল। প্রায় ৪০-৪৫ মিনিট পর আবির কোথা থেকে এসেছে। মালাদের উঠোন পেরিয়ে সাকিবদের উঠোনে যেতে যেতে আচমকা থমকে দাঁড়ালো। চোখ পরে স্টেজের দিকে। স্টেজের পাশে একটা টেবিলের উপর মেঘ মাথা রেখে বসে আছে। কিছু চুলে পিঠ ঢেকে আছে আর কিছু চুল টেবিলের উপর। আবির ভ্রু জোড়া নাকের ডগায় টেনে, এগিয়ে গেল সেদিকে। তপ্ত স্বরে ডাকল, "মেঘ। " মেঘ মুখ তুলে পেছন ফিরে আবিরকে দেখে পুনরায় মুখ লুকালো। আবির মেঘের কাছাকাছি এগিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে শুধালো, "আবার কি হয়ছে?" মেঘ আগের অবস্থায় থেকেই উত্তর দিল, "কিছু না। " আবিরের মেজাজ খারাপ হয়ে যাচ্ছে। ভারী কণ্ঠে বলল, " কে কি বলছে?" মেঘকে নিশ্চুপ থাকতে দেখে আবির মেঘের ডান বাহু চেপে ধরে একটানে দাঁড় করালো। আকস্মিক ঘটনায় মেঘের ছোট দেহ কম্পিত হয়।আবিরের মুখের পানে তাকাতেই মেঘের বুক কেঁপে উঠে। আবিরের রক্তাভ দুচোখ দেখেই মাথা নিচু করে ফেলেছে । ভয়ে জড়সড় হয়ে যাচ্ছে। আবির রাগান্বিত কণ্ঠে ধমক দিল, "তাকা আমার দিকে। " মেঘ আঁতকে উঠে তাকালো আবিরের তামাটে চেহারায়। চারপাশে এত লাইটিং থাকা সত্ত্বেও আবিরের মুখে

উজ্জ্বলতার ছিটেফোঁটা নেই। কপাল গুটিয়ে প্রশ্ন করল, “এখানে বসে ছিলি কেন?” মালার আচরণে মেঘের খুব রাগ হয়েছিল। আজ পর্যন্ত তাকে কেউ এমনভাবে অপমান করে নি। মালা কি না এভাবে কথা বলল! সেই আক্রোশেই রুম থেকে বেরিয়ে প্যান্ডেলে এসে বসে আছে। চারপাশ কুয়াশায় আচ্ছাদিত। লাইটের আলোতে কুয়াশাগুলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। সামান্য জ্যাকেটে শীত মানছে না তবুও মেঘ রুমে যাচ্ছে না। মেঘ এতক্ষণ রাগে ফুঁসলেও প্রিয় মানুষের উপস্থিতিতে এখন অনেকটা শান্ত হয়ে গেছে। মেঘের কণ্ঠস্বর ভার হয়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে এই বুঝি ভেতরের ক্রোধ কান্না হয়ে বেড়িয়ে আসবে। মেঘ উদ্বেল কণ্ঠে বলে, “আমি এখানে থাকবো না। বাসায় চলে যাব। ” আবির ঢোক গিলে ছোট করে শুধালো, “কি হয়ছে বল, প্লিজ। ” মেঘ দীর্ঘ শ্বাস ছেড়ে, অভিযোগের স্বরে আবিরকে মালা আপুর নামে নালিশ জানালো। মনের যত ক্ষোভ ছিল একদমে সব প্রকাশ করল। আবির অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে মেঘের অভিযোগ গুলো শুনেছে। এতক্ষণ ধরেই আবির মেঘের বাহু চেপে ধরেছিল। মেঘের কথা শেষ হওয়া মাত্রই আবির মেঘের বাহু ছেড়ে দিয়ে মোলায়েম কণ্ঠে বলল, ” মেহেদী দিতে পারিস নি বলে এত রাগ? ” মেঘ কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে বলল, “আমি কি একবারও বলছি মেহেদী দিতে পারি নি বলে রাগ উঠেছে? দূর ভাল্লাগে না। আমি থাকবোই না। ” এই কথা বলে মেঘ চলে যেতে নিলে সঙ্গে সঙ্গে আবির মেঘের হাত ধরে এক টানে নিজের কাছে টেনে নেয়। টাল সামলাতে না পেরে আবিরের প্রশস্ত

বুকে ধাক্কা খেল মেঘ। তৎক্ষনাৎ আবিরের পাঞ্জাবি আঁকড়ে ধরল। মেঘের হাত স্পর্শ করতেই আবির পুনরায় কপাল গুটালো। মেঘের আঙুলগুলো বরফের মতো ঠান্ডা হয়ে আছে। মেঘ আবিরকে ছেড়ে একটু দূরে সরে দাঁড়ালো। আবির তখনও মেঘের হাত ধরেই আছে। মেঘ সরে যাওয়ায় আবির দুহাতে মেঘের হাত ঘসতে ঘসতে বলল, "মানুষের উপর রাগ করে নিজের ক্ষতি করা কবে বন্ধ করবি তুই?" মেঘ ওষ্ঠ উল্টে আবিরের অভিমুখে চেয়ে আছে। আবির পুনরায় বলল, "তোর হাত আর বরফের মধ্যে বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই। কথা বললে শুনিস না কেন? " মেঘ আস্তে করে বলল, "সরি। এখনি রুমে চলে যাব।" "এখন আর রুমে যেতে হবে না। বস এখানে। আসছি আমি। " মেঘ চেয়ারে বসে আছে। আবির সাকিবের রুমে গেছে। ২ মিনিটের মধ্যে পাঞ্জাবি পাল্টিয়ে টিশার্ট তার উপর জ্যাকেট পরে আসছে। হাতে একটা শপিং ব্যাগ আর একটা চাদর হাতে নিয়ে আসছে। মেঘের গায়ে চাদর জরিয়ে পাশ থেকে একটা চেয়ার টেনে মেঘের অভিমুখে বসলো। শপিং ব্যাগ উল্টাতেই টেবিলে ৮-১০ টা মেহেদী পরল। মেঘ বিপুল চোখে তাকিয়ে আছে মেহেদী গুলোর দিকে। আবির বলল, "তোকে মেহেদী দিতে দেয় নি কথাটা একবার জানাতি আমায়..." আবির টেবিল থেকে একটা মেহেদী নিল। মেঘের বামহাতের কব্জিতে ধরে শুধালো, "এই হাতে দিব?" আবিরের কথা শুনে মেঘ আশ্চর্য বনে গেল। অবিশ্বাস্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। গলা খাঁকারি দিয়ে আস্তে করে বলল, "আবির ভাই, আপনি মেহেদীও দিতে

পারেন?” আবির স্বভাবসুলভ ভারী কণ্ঠে জবাব দিল, “হয়তো আর্টিস্টদের মতো সুন্দর হবে না। কিন্তু চেষ্টা করতে পারি। অবশ্য তুই না চাইলে দিব না।” তখন অভিভূত হয়ে গেছে। আবির ভাই মেহেদী দিয়ে দিবে এটা অষ্টাদশীর কল্পনাও করতে পারছে না। মেঘ উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, “আপনার যেভাবে ইচ্ছে সেভাবেই দেন। ” আবির মেঘের হাত ধরে কাঁপা কাঁপা হাতে মেহেদী দিয়ে দিচ্ছে। আর মেঘ অপলক দৃষ্টিতে সেই দৃশ্য দেখছে। মালিহা খানের হঠাৎ নজর পরে স্টেজের কাছে আবির মেঘ বসে আছে। ওনি কৌতূহল বশতই এগিয়ে যান সেদিকে। কাছাকাছি যেতেই চোখে পরে আবির মেঘের হাতে মেহেদী দিয়ে দিচ্ছে। ততক্ষণে মেহেদী দেয়া প্রায় শেষদিকে। মালিহা খান হাসিমুখে বললেন, “আলহামদুলিল্লাহ। ” মায়ের কণ্ঠ শুনে আবির আঁতকে উঠে। মেঘের মনোযোগেও বিঘ্ন ঘটে। দু’জনেই মালিহা খানের দিকে তাকায়। মালিহা খানের হাস্যোজ্জল মুখ দেখে মেঘ আবির দুজনেই স্তব্ধ হয়ে আছে। মালিহা খান পুনরায় বললেন, “আমি তো এই আবিরকেই দেখতে চাইছিলাম। বোনের প্রতি এই টান এতদিন কোথায় ছিল?” আবির উত্তর না দিয়ে স্বাভাবিক কণ্ঠে শুধালো, ” কাকামনি আর চাচ্চু কখন আসছেন?” মালিহা খান বললেন, “কিছুক্ষণ আগেই আসছে। খাওয়াদাওয়া করে শুয়ে পরছে।” একটু থেমে মালিহা খান আবার বললেন, “কত বছর পর মেহেদী হাতে নিছিস বল তো আবির?” “মনে নেই। ” মেঘ একবার বড় আম্মুর দিকে তাকাচ্ছে আবার আবিরের দিকে। বড় আম্মুর কথার মানে বুঝার চেষ্টা করছে

মেঘ। মালিহা খান মেঘকে উদ্দেশ্য করে বললেন, “জানিস মেঘ, ছোটবেলা আবির মেহেদী না দিয়ে দিলে তুই কি যে কান্না করতিস।” মেঘ ভ্রু কুঁচকে শুধালো, “আমি?” “হ্যাঁ তুই। মীম তখন কোলে ছিল। ঈদের সময় আশেপাশের বাসার পিচ্চিদের হাতে মেহেদী দেখে তুই বাসায় এসে কান্না করতিস। তখন তো এত পার্লারও ছিল না। আমি তোর মা, কাকিয়া কেউ ই মেহেদী দিতে পারতাম না। বাধ্য হয়ে আবির ই তোরে মেহেদী দিয়ে দিতো।মীমরেও কয়েকবার দিছে। তবে তোরে বেশি দিয়ে দিছে। ” মেঘ ডান হাতে মাথা চুলকে বলল, “আমার কিছু মনে নাই কেন?” মালিহা খান হেসে উত্তর দিলেন, “জন্মের পর থেকে ৬-৭ বছরের ঘটনা কারোর ই মনে থাকে না। কিন্তু তোরা এত ঠান্ডায় এখানে বসে আছিস কেন? ” আবির রাগান্বিত কণ্ঠে বলল, “আম্মু তোমার ভাইয়ের মেয়েকে সাবধান করে দিও।” মালিহা খান চিন্তিত স্বরে বললেন, “কে? মালা?” “হ্যাঁ” “মালা আবার কি করছে?” “মালা মেঘকে অপমান করছে। মেঘ কি ওদের বাড়িতে দাওয়াত ছাড়া আসছে? যা তা ব্যবহার কেন করবে! এরকম আচরণ যদি আর একবার করে আমি কিন্তু ওর খবর করে ছাড়বো। ” মালিহা খান হেসে উত্তর দিলেন, “মালাকে আমি বুঝিয়ে বলব নে। দাঁড়া তোর মামনি আর কাকিয়াকে ডেকে আনি। ওদের দেখায় আমার ছেলেটা ঘরমুখো হচ্ছে। ” মালিহা খান দ্রুত পায়ে বাড়ির দিকে চলে গেছেন। এদিকে মালা দুহাতে মেহেদী দিয়ে প্রতিটা রুমে রুমে মেঘকে খোঁজছে অথচ মেঘ কোথাও নেই। মালিহা খানকে ঘরে ঢুকতে দেখে মালা প্রশ্ন

করল, “কি হয়েছে ফুপ্পি। এত তাড়াহুড়োতে কোথায় যাচ্ছ?” “আবির মেঘের হাতে মেহেদী দিয়ে দিচ্ছে। এই দৃশ্য দেখার জন্য আমার দুই ঝা করে ডাকতে যাচ্ছি।” মালিহা খান চলে গেছেন। কথাটা মালার কাটা গায়ে নুনেরছিটের মতো লাগছে। দ্রুত বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ায়। ঘন কুয়াশার মধ্যেও চোখ পরে মেঘ আবিরের দিকে। নিজের উপর এখন আরও বেশি রাগ হচ্ছে। আবির মেঘকে মেহেদী দিয়ে দিচ্ছে, এটা কোনো স্বাভাবিক বিষয় নয়। সে যদি মেঘের সাথে এই আচরণ না করত তাহলে আবির আর মেঘ কাছাকাছি আসতো না, আবিরও মেঘকে মেহেদী দিয়ে দিত না। রাগে মালার চোখ-মুখ জ্বলছে। রুমে ঢুকেই ঠাস করে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। বড় আম্মু যাওয়ার পর থেকে মেঘ আবিরকে দেখেই যাচ্ছে। পল্লবও ফেলছে না। আবির তড়িঘড়ি করে মেহেদী দিচ্ছে। মেঘ কিছু বলতে চেয়েও বলতে পারছে না। মনের ভেতর এক রাশ মুগ্ধতা। আবির ভাই ছোটবেলা নিজের হাতে মেঘকে মেহেদী দিয়ে দিতো। এটা ভেবে ই আনমনে হাসছে। আবির মেহেদীটা টেবিলের উপর রাখতে রাখতে বলল, “তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পরিস। আমি গেলাম। ” বলেই সাকিবদের ঘরের দিকে দৌড় দিল। মেঘ মুগ্ধ আঁখিতে আবিরকে দেখছে। কয়েক মুহুর্তের মধ্যে আবির ঘরে ঢুকে পরেছে। মেঘ তখনও সেদিকেই তাকিয়ে আছে। ততক্ষণে তিন ঝা আসছেন। দূর থেকে মেঘকে ডেকে বলল, “কিরে আবির কই?” “চলে গেছে। ” কাকিয়া মেঘের হাত ধরে এপাশ-ওপাশ ঘুরিয়ে বলল, “বাহ! অনেক সুন্দর করে দিয়েছে তো। ” কাকিয়ার

কথায় মেঘ এবার নিজের হাতের দিকে তাকালো। মেহেদী আর্টিস্টদের মতো না হলেও খুব একটা খারাপ হয় নি। মেঘ হাতের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। মন, মস্তিষ্ক জোড়ে আবির ভাই বিচরণ করছে। মনে অন্যরকম প্রশান্তি কাজ করছে। মনে মনে হাজার বার মালা আপুকে ধন্যবাদ দিচ্ছে । "মালা আপু অপমান না করলে, আবির ভাইয়ের সাথে এত সুন্দর মুহুর্তটা কখনো উপভোগ করতে পারতো না সে। " মা কাকিয়ারা কি বলছে তার কোনোকিছুতেই মেঘের মনোযোগ নেই। অষ্টাদশীর হৃদয়ের প্রতিটা স্পন্দন বলছে, " আবির ভাই, আপনি আমার সেই পূর্ণতা। ভালোবাসি আপনাকে। " মা কাকিয়ার সঙ্গে ঘরে গিয়ে সোজা নিজের রুমে চলে গেছে। মীম, দিশারা অনেকক্ষণ আগেই ঘুমিয়ে পরেছে। মেঘ মীমের পাশে শুয়েছে। সারাদিনের ক্লান্তিতে মেহেদী না তুলেই ঘুমিয়ে পরেছে। অনেকক্ষণ যাবৎ ফোন ভাইব্রেশন হচ্ছে। মেঘ গভীর ঘুমে নিমগ্ন। দীর্ঘ সময় ভাইব্রেশনের পর মেঘ চোখ বন্ধ রেখেই পাশ থেকে ফোনটা নিয়ে রিসিভ করে কানের উপর রাখল। ওপাশ থেকে আবেশিত কন্ঠ ভেসে আসে, "ম্যাম, আপনার ঘুম কি এখনও ভাঙে নি? এক ঘন্টা যাবৎ আপনার জন্য অপেক্ষা করছি। "ঘুমে কাতর মেঘের ভারী নিঃশ্বাসের শব্দ ভেসে আসছে। ফোনের অপর পাশের আবেশিত কন্ঠ শুনে ঘুম ঘুম চোখে স্ক্রিনে তাকাতেই আবিরের ছবি ভেসে উঠেছে তার সঙ্গে সেইভ করা নামটা। সহসা অষ্টাদশীর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় সতেজ হয়ে উঠেছে। এক মুহুর্তেই চোখ থেকে ঘুমের রেশ কেটে গেল, অক্ষি যুগল প্রশস্ত হলো । মেঘ

উৎকণ্ঠিত হয়ে বলল, “আবির ভাই! ” এই প্রথমবার আবির নিজ থেকে মেঘকে কল করেছে। আধলা ঘুমে থাকায় আবিরের কণ্ঠ ঠিকমতো বুঝতে পারে নি। মেঘ এক লাফে বিছানায় বসে ফোন কানের কাছে নিতেই পুনরায় আবিরের নেশাক্ত কণ্ঠ ভেসে আসে, “ম্যাম, আপনার দর্শন পেতে আর কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে? ” মেঘ ভ্রু কুঁচকে একবার স্ক্রিনে তাকাচ্ছে আরেকবার ফোন কানে ধরছে। কি হচ্ছে কিছুই বুঝতে পারছে না। নাম্বার টা আবির ভাইয়ের নামেই সেইভ করা, কণ্ঠস্বর ও আবির ভাইয়ের। কিন্তু আবির ভাই তো কখনো এভাবে কথা বলেন না। মেঘের মাথা চক্কর দিচ্ছে। মেঘ ফোন কানে ধরে আশেপাশে তাকালো। মীম, দিশারা গভীর ঘুমে তলিয়ে আছে। আবির পক্ষান্তরে মৃদুস্বরে ডাকল, “ম্যাম..!” মেঘ জবাব দিল, “জ্বি। ” “আপনি কি এখনও ঘুমাচ্ছেন?” “না তো। ” “কষ্ট করে একটু বেলকনিতে আসবেন!” মেঘ ফোন বিছানার উপর রেখে এক হাত দিয়ে অন্য হাতে চিমটি কেটে নিজেই ‘উফফ’ করে উঠল। বুঝতে পারল এটা স্বপ্ন নয় সত্যি। ফোন কানে ধরে আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে বিছানা থেকে নেমে হুড়মুড়ি করে বেলকনিতে পা দিতেই কপাল কুঁচকে সরু নেত্রে তাকালো। পূর্ব দিগন্তে উদিত সূর্যের আলোয় মেঘ ঠিকমতো তাকাতে পারছে না। চোখ কচলে বেশকয়েকবার পিটপিট করে স্বাভাবিক দৃষ্টিতে তাকাতেই নজর পরে উঠোনের মাঝ বরাবর একটা চেয়ারে হেলান দিয়ে পায়ের উপর পা তুলে আবির ভাই বসে আছেন। পড়নে কালো হুডি, একহাত হুডির পকেটে অন্য হাতে

কানে ফোন ধরে তাকিয়ে আছে বেলকনির দিকে। পূর্বাভিমুখে বসায় শীতের সকালের অনুচ্চ আলোয় জ্বলজ্বল করছে আবিরের মুখবিবর। মেঘ স্থির দৃষ্টিতে আবিরকে দেখছে। হুডিতে আবির ভাইকে মারাত্মক সুন্দর লাগছে। চোখ বন্ধ করে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে পুনরায় তাকালো। এদিকে আবিরের চোখে সূর্যরশ্মি আছড়ে পরছে, সেই রশ্মি উপেক্ষা করে অতি সঙ্কীর্ণ লোচনে মেঘকে দেখছে। আংশিক সময়ব্যাপী চলে এই দৃশ্য। আবির আচমকা গলা খাঁকারি দিয়ে বলল, "ফ্রেশ হয়ে ১০ মিনিটের মধ্যে নিচে আসেন। " "কেন?" "আমি বলছি তাই।" মেঘ হাসিমুখে বলল, "আচ্ছা। " কান থেকে ফোন নামাতে যাবে ওমনি আবির আবার ডাকল, " ম্যাম শুনেন...!" "জ্বি স্যার, বলুন। " আবির মৃদু হেসে বলল, "খালি পায়ে আসবেন । রাখছি। " আবির কল কেটে দিয়েছে। তবে দৃষ্টি এখনও মেঘেতে নিবদ্ধ। মেঘ কয়েক সেকেন্ড স্থির থেকে হঠাৎ ই হুড়োহুড়ি করে রুমে চলে গেছে। হাতের মেহেদী তুলা হয় নি। ১০ মিনিট সময়ের মধ্যে নিচে যেতে হবে তাই তাড়াহুড়ো করছে। এত সকালে বেশিরভাগ মানুষ ই ঘুমে। যারা উঠেছেন তারা সবাই রান্নার কাজে ব্যস্ত। মেঘ চুপিচুপি ঘর থেকে বেরিয়ে আসলো। ১০ মিনিটের আগেই মেঘ নিচে চলে আসছে। আবির মাথা নিচু করে ফোন চাপতেছিল আচমকা নুপুর পড়া আলতা রাঙা পায়ে নজর পরতেই আবির আঁতকে উঠে সঙ্গে সঙ্গে ফোন পকেটে রেখে চোখ তুলে তাকাল। মেঘ আবিরের ঠিক সামনে দাঁড়ানো। চোখাচোখি হলো দু'জনের। মেঘ আবিরের অবসন্ন ধৃষ্টতা দেখে চিন্তিত স্বরে শুধালো,

“আপনি কি রাতে ঘুমান নি?” আবির স্বভাবসুলভ ভারী কণ্ঠে উত্তর দিল, “ঘুম আসছিল না। হাতটা দেখি!” মেঘ হাত বাড়িয়ে মেহেদী টা দেখালো ।মেহেদীর গাঢ় রঙ দেখে আবির মৃদু হাসলো। মেঘ শীতল কণ্ঠে বলল, “রাতে কিছু বলতে পারি নি..” মেঘের কথা শেষ হওয়ার আগেই আবির আড়চোখে চেয়ে প্রশ্ন করল, “কি বলতি?” “থ্যাংক ইউ আবির ভাই। এত সুন্দর করে মেহেদী দিয়ে দেয়ার জন্য। ” আবির নিঃশব্দে হেসে বলল, “ওয়েলকাম। এই মেহেদী দেখে কান্না করে দেস কি না এই টেনশনে ছিলাম। ” “কাঁদবো কেন?” “সবাই সুন্দর করে দিয়েছে তোর টা সুন্দর হয় নি বলে যদি কান্না করিস। ” মেঘ ভেঙচি কেটে বলল, “জীবনেও না। আমার টা সবচেয়ে সুন্দর হয়ছে। আবির স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, “চল এখন!” আবির উঠে হাঁটতে শুরু করেছে। মেঘও গুটিগুটি পায়ে হাঁটছে। মামাদের বাড়ির পেছনদিকে মাটির রাস্তায় পা দিতেই মেঘ শুধালো, “আমরা কোথায় যাচ্ছি?” “তোকে নিয়ে পালাচ্ছি।” অকস্মাৎ মেঘ বিষম খেল, জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে শুধালো, “কোথায়?” “কোনো এক কোলাহল শূন্য নিসর্গে ।” মেঘ আর কিছু বলতে পারল না। শীতের সকালের এলোমেলো ঠান্ডা হাওয়া তারসাথে আবিরের বলা কথায় মেঘের মনে অজানা শিহরণ জাগে। অষ্টাদশীর আঁখি জোড়ায় রঙিন স্বপ্ন। আবির ভাই তাকে নিয়ে পালাবে , এটা ভাবতেই হৃদয়ে বসন্ত দোলা দিচ্ছে। বুকের ভেতর কে যেন অবিরাম ঢোল পেটাচ্ছে। মস্তিষ্কে ঘুরপাক খাচ্ছে নিষিদ্ধ প্রেমানুভূতি। আবির কিছুটা এগিয়ে গিয়ে নিরস্ত হলো। পেছন ফিরে

দেখল মেঘ এখনো আগের জায়গাতেই দাঁড়িয়ে আছে। আবির দুর্বহ কণ্ঠে বলে উঠে, “ম্যাম, Are you okey?” আবিরের কণ্ঠস্বর কানে আসলেই কল্পনার জগৎ থেকে বেরিয়ে কোমল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, “আপনি আমাকে ম্যাম বলছেন কেন?” ” ভয়ে।” “মানে?” “শীতকালে এত সকাল সকাল আপনাকে ঘুম থেকে উঠালাম। কখন জানি ফোঁস করে রেগে যান। তাই! ” মেঘ বোকার মতো চেয়ে পুনরায় শুধালো, “আপনি আমায় ভয় পান, আবির ভাই ?” “মাঝে মাঝে ।” মেঘ হতবাক। চোখ বড় করে চেয়ে আছে। মেঘের অবিশ্বাস্য চাহনি দেখে আবির ভ্রু নাঁচালো। মেঘ লাজুক হেসে চিবুক নামালো। ঠোঁট জুড়ে বিশ্বজয়ের হাসি। মুখবিবরে প্রাপ্তির ছাপ। মেঘের লজ্জামাখা হাসি দেখে আবিরও মুচকি হাসল। কথা না বাড়িয়ে আবির খালি পায়ে এগিয়ে যাচ্ছে। আবিরের পিছুপিছু মেঘও হাঁটছে। মেঘের ঠোঁট থেকে হাসি যেন সরছেই না। গতকাল থেকে আবির ভাইয়ের আদতে অষ্টাদশীর হৃদয়ে তোলপাড় বেড়েছে কয়েকগুণ। আবির ভাইয়ের কথা, যত্ন, ব্যবহার, চাহনি সবকিছুই জানান দিচ্ছে, “আবিরের হৃদয়ের অস্ফুট বরফ গলতে শুরু করেছে।” অষ্টাদশী স্পষ্টরূপে বুঝতে পারছে তা। নিজেকে আবির ভাইয়ের গার্লফ্রেন্ড ভাবছে আর বার বার লজ্জায় আড়ষ্ট হচ্ছে। আবিরের পেছন পেছন মেঘ মাটির রাস্তা পেরিয়ে বিস্তীর্ণ মাঠে পা রাখতেই কেঁপে উঠল। শিশিরে ভিজে আছে সবুজ ঘাস। এতক্ষণ যাবৎ আবিরকে এমনভাবে অনুসরণ করছিল, যেন আশেপাশে তাকানোর মত সময় নেই। পলক ফেললেই হারিয়ে যাবে শখের

পুরুষ। অষ্টাদশী উষ্ণ পায়ের স্পর্শে শিশিরে স্নান ঘাস মাড়িয়ে যাচ্ছে। হৃদয় দোলছে শীতল হাওয়ায়। ব্যস্ততম শহরে মাটির স্পর্শ পাওয়া দুষ্কর। প্রকৃতি সাথে প্রিয়জনের সান্নিধ্যে মেঘের মনে প্রেম প্রেম অনুভূতি জাগছে। আবির যেখানে পা ফেলছে আবিরের পায়ের ছাপ দেখে মেঘও ঠিক সেই জায়গাতেই পা ফেলছে। বেশকিছু টা যাওয়ার পর আবির ঘাড় ঘুরিয়ে তাকিয়ে মেঘের কান্ড দেখে কপাল কুঁচকালো, মৃদু হেসে সামনের দিকে ঘুরলো। "পাগলির পাগলামিতে অত্যাসক্ত আবির। " বিশালাকৃতির মাঠের পরেই কয়েক সারি ঘর। আশেপাশে নানান রকমের গাছ। দুইটা ঘরের মাঝ বরাবর সরু রাস্তা। মেঘ একান্তে আবিরকে অনুসরণ করেই চলেছে। ইহজগতের আর কোনোকিছুতেই মনোযোগ নেই তার। বাড়িগুলো পেরিয়ে কিছুদূর গিয়ে আবির পিছু ঘুরল। তৎক্ষনাৎ মেঘের মাথা ঠেকে আবিরের বুকে। মেঘ কুণ্ঠায় দু পা পিছিয়ে চোখ তুলে তাকালো। এভাবে আবির ভাইয়ের পিছু নেয়ায় আবির ভাই যদি রেগে যায়, আতঙ্কে মেঘের বুক কাঁপছে। কিন্তু আবিরের অভিব্যক্তি বুঝা গেল না। মেঘের সামনে থেকে সরে পাশে দাঁড়াতেই মেঘ বিপুল চোখে তাকালো। দৃষ্টির সীমানা জুড়ে হলুদ রঙের সরষে ফুল। আশ্চর্য নয়নে চেয়ে আছে মেঘ। এত সরষে ফুল একসঙ্গে কখনো দেখেনি সে। কয়েক মুহুর্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেছে। আবিরের দিকে তাকাতেই আবির মুচকি হেসে বলল, "এক খন্ড হলুদের রাজ্যে আপনাকে স্বাগতম। যেখানে নেই শহরের কোনো কোলাহল, নেই কোনো নিষিক্ত অনিল। সবটুকু জুড়েই শুধু স্নিগ্ধতা। "

নীল আকাশ আর প্রকৃতি জুড়ে সরিষা ফুল। এই মনোমুগ্ধকর দৃশ্য দেখে অনুভূতিরা অষ্টাদশীর হৃদয়ে ছোঁয়ে যাচ্ছে। প্রকৃতি নিরন্তর অনিন্দিত। সরিষা ফুল তার এক প্রীতিপদ নিদর্শন। দিগন্ত জোড়া মাঠের প্রতিটা সরিষা ফুলে জমে আছে শিশিরের কণা। সেই দৃশ্য দেখে মেঘের মন প্রেমের রঙে সুশোভিত হয়ে গেছে। মেঘ গুটিগুটি পায়ে এগিয়ে আলতো হাতে শিশিরে ভেজা সরিষা ফুল স্পর্শ করল। মেঘ আপনমনে ছুটে যাচ্ছে। কিছুদূর যাওয়ার পর হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো। পিছনে ঘুরে দৌড়ে আবিরের কাছে চলে আসছে। আবির ভ্রু কুঁচকে তাকিয়ে আছে। মেঘ আবিরের কাছে এসে হাঁপাতে শুরু করল। আবির কণ্ঠ দ্বিগুণ ভারি করে শুধালো, “কি হয়ছে?” মেঘ ওড়না টেনে মাথায় ঘোমটা দিল। হাত দিয়ে আবিরকে ইশারা করতেই আবির একটু নিচু হয়ে মেঘের মুখোমুখি হলো। মেঘ দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে আবিরের কানে কানে বলল, ‘আপনি কি জানেন না, সরিষা খেতে তাঁনাদের বসবাস!’ আবির সিরিয়াস মুডে কথা শুনতে এসেছিল। কিন্তু মেঘের আজগুবি কথা শুনে স্ব শব্দে হেসে বলল, “তোর তাঁনারা বেড়াতে গেছে। ” মেঘ ভয়ে ভয়ে শুধালো, “আপনাকে কে বলছে?” “রাতে তোর তাঁনাদের সাথে দেখা হয়ছিল। বলে গেছিলাম সকালে তোকে নিয়ে আসবো। তোর তাঁনারা যেন ঘুরতে চলে যায়। ” “কোথায়?” “তোর শ্বশুরবাড়ি। ” “মানে?” “এমন ভাবে বলছিস, মনে হচ্ছে তাঁনারা যেখানেই যায় আমার থেকে অনুমতি নিয়ে যায়।” “আপনিই তো বললেন!” ” আল্লাহ! কোন পাগলির পাল্লায় পড়লাম।” মেঘ গাল

ফুলিয়ে ওষ্ঠ উল্টে তাকালো। আবির মেঘের মাথায় আস্তে করে গাট্টা মেরে বলল, “তোর মাথায় তাঁনাদের কথা কে ঢুকাইছে বল তো!” “বড় আম্মু। ” “কি??? আম্মু তোকে এসব বলে?” “জ্বি।” “আর কি বলে?” “আরও অনেক কিছুই বলে। কিন্তু সেসব আপনাকে বলা যাবে না। পার্সোনাল কথা । ” আবির ভ্রু গুটিয়ে বিড়বিড় করে বলল, “শাশুড়ি-বৌ মিলে আমায় পাগল বানায় ছাড়বে।” আবির গলা খাঁকারি দিয়ে বলল, ” এসব আজগুবি কথা আর বলবি না। তাঁনারা বলতেই কিছু হয় না।” “আমার ভয় লাগে। বড় আম্মু বলছে তাঁনারা আমায় নিয়ে যাবে । ” আবির অত্যন্ত গম্ভীর কণ্ঠে বলল, “আমি থাকতে তোর কিসের ভয় ? আমার চোখের সামনে, আমার অনুমতি ব্যতিত কেউ তোকে ছুঁতেও পারবে না। ” মেঘ প্রশস্ত নেত্রে তাকিয়ে মুচকি হাসলো। ভীষণ লজ্জা পেয়েছে। চিবুক নামিয়ে ঘুরতেই মেঘের মাথা থেকে ওড়না পরে গেল। পা বাড়াতেই আবির গম্ভীর কণ্ঠে বলল, ” দাঁড়া। ” মেঘ দাঁড়াতেই আবির আলতোভাবে মেঘের চুল থেকে কাকড়া বেন্ট খুলে দিল।ওমনি মেঘের ঘন কালো চুল কোমড় ছাড়িয়ে পরেছে। আবির দু’হাতে কতগুলো সরিষা ফুল ছিঁড়ে মেঘের চুলে ছড়িয়ে দিয়েছে। কালো চুলে হলুদ ফুলগুলো অসাধারণ সুন্দর লাগছে। একহাতে মুষ্টিবদ্ধ হাতে সরষে ফুল ছিঁড়ে দু পা এগিয়ে মেঘের কানে গুঁজে দিয়ে মোয়ালেম কণ্ঠে বলল, “এবার যেতে পারিস। ” মেঘ ভয়ে ভয়ে পা বাড়ায়। আবির পকেট থেকে ফোন বের করে মেঘের ভিডিও করায় ব্যস্ত। অনেকটা সময় ঘুরাঘুরি শেষে মেঘ হঠাৎ বলল, “Can I

take a picture with you?” “yes, of course.” মেঘ নিজের ফোন দিয়ে আবিরের সঙ্গে দুটা ছবি তুলেছে। আবিরের ফোন ভাইব্রেশন হতেই আবির পকেট থেকে ফোন বের করে রিসিভ করল। পরপর ই মেঘের দিকে তাকিয়ে বলল, “চল। ” “কোথায়?” “নদীর পাড়ে।” নদীর পাড়ে যেতেই দেখল সাকিব হাতে একটা বোতল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মেঘকে দেখেই বলল, “শুভ সকাল, মেঘবতী। ” “শুভ সকাল ” “তোমার জন্য গাছ থেকে খেজুরের রস আনছি। খেয়ে দেখো কেমন লাগে। ” মেঘ অল্প একটু খেয়ে বলল, “আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।” সাকিব হাসিমুখে বলল, “ধন্যবাদ আমাকে না দিয়ে তোমার আবির ভাইকে দাও। এত ঠান্ডায় আলো ফোঁটার আগে আমায় টেনে তুলে কুয়াশার মধ্যে খেজুরের রস আনতে পাঠাইছে। ” মেঘ আশ্চর্য নয়নে আবিরের অভিমুখে চেয়ে শুধাল, ” আপনি বলছেন? ” আবির নিরুদ্বেগ কণ্ঠে উত্তর দিল, “তুই কখনো খেজুরের রস খাস নি তাই আনাইছি। তোকে নিয়ে যাব ভাবছিলাম। কিন্তু অনেকটা দূর হয়ে যাবে তাই যায় নি। ” আবিরের ভাইয়ের এত যত্ন দেখে মেঘ বার বার অভিভূত হয়ে যাচ্ছে। গতকাল থেকে কতশত বার আবিরের প্রেমে পড়েছে তার হিসেব নেই। ঘন্টাদুয়েক মেঘ আবির আর সাকিব একসঙ্গে নদীর পাড়ে বসে আড্ডা দিয়েছে। আবির আর সাকিবের শৈশবের স্মৃতিগুলো সাকিব অবলীলায় মেঘকে জানাচ্ছে। এই নদীতে কতকত দিন গোসল করেছে একসাথে। ফুটবল, ক্রিকেট খেলার ঘটনা থেকে শুরু করে এক পর্যায়ে সাকিবের মনের মানুষের কথাও বলেছে।

সেই থেকে মেঘ বায়না ধরেছে সাকিবের গার্লফ্রেন্ড কে দেখবে। আবির কয়েকবার না করছে কিন্তু মেঘ কোনো কথায় শুনছে না। আবির ধমক দিতে গিয়েও বার বার আঁটকে যাচ্ছে।সে কোনোভাবেই মেঘের মনে আঘাত দিতে চাচ্ছে না। মেঘের পাগলামিতে সাকিব বাধ্য হয়ে মেয়েটাকে কল দিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা মেয়ে মাথায় ঘোমটা দিয়ে ওদের কাছে আসলো। থ্রিপিস পড়নে, চুলগুলো বেনি করা, গ্রামের খুব সাধারণ একটা মেয়ে তবে রূপ-লাবণ্যে পরিপূর্ণ। মেঘ বসা থেকে দাঁড়িয়ে সালাম দিল। মেয়েটা হাসিমুখে সালামের উত্তর দিয়ে মেঘকে ভালোমন্দ জিজ্ঞেস করছে। আবির আর সাকিব মুখ চাওয়াচাওয়ি করে কিছু একটা ইশারা করল। সাকিব মেয়েটাকে বলল, "শিমু, তুমি চাইলে আমাদের সাথে বসতে পারো। " শিমু আস্তে করে বলল, "বাসায় বলে আসি নি। চলে যেতে হবে।" মেঘ মন খারাপ করে বলল, "ভাবি একটু বসেন না প্লিজ।" শিমু লজ্জায় নুইয়ে পড়ল। মেঘের কথায় সাকিব হাত দিয়ে কপাল চাপড়াচ্ছে। আবির তাড়াতাড়ি পকেট থেকে ফোন বের করল। হাজার হোক আবির সাকিবের বড় ভাই। ছোট ভাইয়ের প্রেমিকাকে লজ্জার হাত থেকে বাঁচাতেই আবির তৎক্ষনাৎ জায়গা ত্যাগ করল। শিমু শীতল কণ্ঠে বলল, "অন্য কোনোদিন সময় নিয়ে তোমার সাথে আড্ডা দিব" "আচ্ছা আপু। " শিমু যেতে নিলে সাকিব পিছু ডাকে, সাকিব আর শিমুকে কথা বলতে দেখে মেঘ কিছুটা সরে দাঁড়ালো। আবির ফোনে কথা বলতে বলতে মেঘকে ডাকলো। মেঘ কাছে আসতেই আবির স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল,

“চল বাড়ি যায়। সবাই খোঁজতেছে।” মেঘ মোলায়েম কণ্ঠে শুধালো, “জায়গাটা অনেক সুন্দর। আর একটু পরে গেলে হয় না?” “নো ম্যাম। এখনি যেতে হবে। ” মেঘ মন খারাপ করে হাঁটতে শুরু করল। আবির মেঘের থেকে কিছুটা পেছনে রাকিবের সাথে কথা বলে বলে হাঁটছিল। অফিসের কিছু কাগজপত্রে ঝামেলা হয়েছে সেসব নিয়েই কথা বলছে। সাকিব দৌড়ে এসে আবিরকে উদ্দেশ্য করে বলল, “নিজের কাজ শেষ ওমনি আমায় ফেলে চলে যাচ্ছ নাকি?” আবির কান থেকে ফোন সরিয়ে ভারী কণ্ঠে বলল, “তোকে কথা বলার সুযোগ দিয়ে আসলাম। ” “সুযোগ না ছাই। তোমরা আসতেই ভয়ে পালাইছে। ” আবির মৃদু হেসে রাকিবের সঙ্গে কথা বলায় মনোযোগ দিল। আবির আর সাকিব মেঘকে মাটির রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দিল, মেঘ মুখ গোমড়া করে বাড়িতে ঢুকলো। উঠোনে দাঁড়িয়ে আশেপাশে চোখ বুলাচ্ছে। অনেক বেলা হয়ে যাওয়ায় বাড়ির সব মেহমান উঠে পরেছে। সবাই কাজে ব্যস্ত। মেঘ ঘরে ঢুকতে গেলেই পেছন থেকে ডাকল, “বনু।” মেঘ পেছন ফিরতেই দেখল তানভির। মেঘ উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, “ভাইয়া, কখন আসছো?” “একটু আগেই আসছি। কোথাও গেছিলি?” “নদীর পাড়ে। ” তানভির ভ্রু কুঁচকে প্রশ্ন করল, “একা গেছিলি?” “না, আবির ভাই আর সাকিব ভাইয়াও ছিল।” “ওহ আচ্ছা। ভাইয়া এখন কোথায়?” “বাড়ির পেছনে। ” আকলিমা খান মেঘকে ডেকে নিয়ে গেছেন। সকাল থেকে খাওয়া হয় নি। তানভির বেরিয়ে গেছে আবিরের সঙ্গে দেখা করতে। তানভির বাড়ি থেকে নামতে গিয়ে

সাকিব আর আবিরকে দেখে থমকে দাঁড়ালো। সাকিব তানভিরকে দেখেই ছুটে এসে জরিয়ে ধরে উদ্বেগপূর্ণ কণ্ঠে বলল, “কিরে কেমন আছিস?” “আলহামদুলিল্লাহ। তুই কেমন আছিস?” “ভালোই ছিলাম। কিন্তু ভাইয়ার অবস্থা দেখে আর ভালো থাকতে পারছি না। ” “কেন কি হয়ছে?” “বিশ্বাস করবি কি না জানি না, গতকাল সারারাত গেছে ভাইয়া এক মিনিটের জন্যও ঘুমায় নি। আমি যতবার সজাগ হয়ছি ততবার ই দেখি ভাইয়া বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে, নয়তো শুয়ে তোর বোনের ছবি দেখছে। একটা মানুষ কেমনে নির্ঘুম রাত কাটায় এর জলজ্যান্ত প্রমাণ হলো ভাইয়া। ভাইয়ার এই অবস্থা দেখে আমিই ভয় পেয়ে গেছিলাম।” আবির ক্রোধিত আঁখিতে সাকিবের দিকে তাকিয়ে আছে। সাকিব আবিরের মুখের পানে চেয়ে পুনরায় তানভির কে বলল, “তোর বোনকে তাড়াতাড়ি বিয়ে দে।” তানভির হেসে উত্তর দিল, “বিয়ে দেয়ার ক্ষমতা যদি আমার হাতে থাকতো তাহলে অনেক আগেই বিয়ে দিয়ে দিতাম।” আবির গম্ভীর কণ্ঠে ধমক দিল, “আমার বিয়ে নিয়ে গবেষণা করতে হবে না। মাইশা আপুর বিয়েতে ফোকাস কর।” তানভিরকে উদ্দেশ্য করে বলল, “এত সকালে চলে আসলি যে!” “মাইশা আপু ভোরবেলা থেকে কল দিতে দিতে আমার ঘুমের চৌদ্দটা বাজায় দিছে। একা কুলাতে পারছিল না বলে আব্বুকে আর বড় আব্বুকে দিয়ে কল দেয়াইছে বাধ্য হয়ে ঘুম থেকে উঠেই রওনা দিতে হয়ছে।” “বাইক আনছিস?” “হ্যাঁ। এই নাও চাবি।” আবির চাবি নিয়ে বাড়িতে চলে গেছে। সাকিব আর তানভির কিছুক্ষণ কথা বলে যে

যার মতো ব্যস্ত হয়ে গেছে। মেঘ বসে বসে আবিরের সঙ্গে তোলা সেলফি গুলো দেখছে। সেখান থেকে একটা ছবি ফেসবুক ডে তে পোস্ট করে ফোন ব্যাগে রেখে গোসলে চলে গেছে। এদিকে বন্যা ক্লাস শেষ করে ফেসবুকে ঢুকে মেঘের ডে দেখে রীতিমতো শকট খেয়েছে। আবির ভাইয়ের সাথে মেঘ ছবি পোস্ট করেছে এটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। পাশে এক বান্ধবীকে বলল চিমটি কাটতে, বার বার ছবি টা দেখছে। খুশিতে বন্যার চোখ ছলছল করছে। ডে পোস্টে রিপ্লাই দিয়েছে, কল দিয়েছে মেঘ নেটে নেই। আনন্দে বন্যার হাত কাঁপছে। মেঘের নাম্বারে বার বার কল দিচ্ছে, মেঘ রিসিভ করছে না। মেঘের সাথে কথা না বলেও শান্তি পাচ্ছে না। ১০-১৫ বার মেঘকে কল দেয়ার পর, তানভিরের নাম্বারে ডায়াল করল। তানভির কল রিসিভ করে সালাম দিল। বন্যা সালামের উত্তর দিয়ে উত্তেজিত কণ্ঠে শুধালো, ” মেঘ কোথায়? ” “বনু তো এখানে নেই। কেন কি হয়ছে?” “একটু দরকার ছিল। মেঘকে কি দেয়া যাবে?” “আচ্ছা ওয়েট করো আমি দেখছি। এখন কোথায় তুমি?” “ভার্সিটিতে। ” “সব ঠিক আছে তো? মনে হচ্ছে কোনো বিষয়ে আপসেট।” “আপসেট না। এমনি-ই মেঘের সাথে একটু কথা ছিল। ” তানভির কথা বলতে বলতে মেঘের রুমে গিয়ে ফোন দিয়ে আসছে। মেঘ বন্যার সাথে কথা বলে, একেবারে রেডি হয়ে তানভিরের ফোন নিয়ে নিচে নামছে। তানভিরকে খোঁজতে খোঁজতে গেইট পর্যন্ত চলে গেছে। গেইটের কাছে তানভির সাকিবসহ মাইশার আরও কয়েকটা কাজিন কাজ করতেছিল। আবির এখানে

নেই। মেঘ ডাকতেই তানভির উঠে এসে ফোনটা নিল। মেঘ চলে যেতে নিলে তানভির গম্ভীর কণ্ঠে শুধালো, “তোর ফ্রেন্ড কল দিয়েছিল কেন?” মেঘ আমতা আমতা করে বলল, “ক্লাসের জন্য। ” “কাল ক্লাস আছে?” “হ্যাঁ!” মেঘ যেতে নিলে তানভির পুনরায় ডাকল, “শুন” মেঘ মুখ গোমড়া করে বলল, “আমি জানি তুমি কি বলবা” “কি বলব?” “বলবা, বরযাত্রী আসলে ঘর থেকে যেন না বের হয়,কারো সাথে যেন কথা না বলি, খাবার ঘরে নিয়ে খাওয়াবা এসব ই তো। ” তানভির স্ব শব্দে হেসে বলল, “না এসবের কিছুই বলব না। তুই যেখানে ইচ্ছে ঘুরতে পারিস। ” “সত্যি?” “হুমম। তবে একা যাবি না। মীমকে সাথে নিয়ে যাবি।” “আচ্ছা। কিন্তু তুমি কি বলতে চাইছিলা?” “চুল ছেড়ে ঘুরিস না। হিজাব পরে আসিস। ” “ঠিক আছে।” মেঘ রুমে যাওয়ার জন্য সিঁড়ি পর্যন্ত যেতেই মালার সাথে দেখা হলো। মালা হেসে বলল, “মেঘ কোথায় ছিলে তুমি? রুমে খোঁজতে গেছিলাম তোমায়। ” মেঘ তপ্ত স্বরে বলল, “নিচে ছিলাম।” মালা আশপাশে তাকিয়ে বলল, “তুমি কি আমার উপর রেগে আছো? রাতে তোমার সাথে ঐরকম ব্যবহার করা ঠিক হয় নি। তারজন্য দুঃখিত। ” মেঘ ওষ্ঠদ্বয় প্রশস্ত করে উত্তর দিল, “রাগ করি না।” মালা উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, “দেখো তো আমার মেহেদী টা কেমন হয়েছে। ” হাত বাড়াতেই মেঘ মালার হাতের দিকে তাকালো। মেহেদী ডিজাইন খুব সুন্দর হয়েছে। হঠাৎ ই মেঘের ভ্রু যুগল কুঁচকে গেল। মালার হাতে A অক্ষর দেখে মেঘ ভীষণ চটে গেছে। সে খুব ভালো করেই বুঝতে পারছে মালা ইচ্ছে করে আবির

ভাইয়ের নামের প্রথম অক্ষর লিখেছে এবং সেটা মেঘকে দেখাতে আসছে। মেঘ রাগে পাশ কাটিয়ে চলে গেছে। মালা আড় চোখে চেয়ে হাসলো। বরযাত্রী আসছে অনেকক্ষণ হলো। গেইটে জামাই বরণ চলছে। হুড়োহুড়ি কর্মকাণ্ডের কোথাও মেঘ নেই। সেই যে রুমে ঢুকেছে আর বের হয় নি মেয়েটা। মীম দিশাদের সাথেই আছে। তানভির টেনশনে পরে গেছে, হিজাব পড়তে বলায় বোন রেগে গেল কি না। মেঘের নাম্বারে কল দিল। কিন্তু মেঘ কল রিসিভ করছে না। এত মানুষের ভিড় ঠেলে বাড়িতে ঢুকতেও ইচ্ছে করছে না। তানভির এমনিতেই নেট অন করল। ফেসবুকে ঢুকতেই মেঘ আবিরের সেলফি দেখে আনমনে হেসে বলল, "মাশাআল্লাহ" । কিন্তু সেই হাসিটা বেশিসময়ের জন্য স্থির হলো না। মেঘের আইডি দেখে ভ্রু গুটালো। আবির ফেসবুকে কিছু শেয়ার করলে সেগুলো কাস্টম করেই শেয়ার করে। কিন্তু মেঘ যে হুট করে আবিরের সাথে ছবি আপলোড করল বাসার মানুষের নজরে পড়লে সর্বনাশ হয়ে যাবে। এসব ভেবেই তানভির ভয় পাচ্ছে। তানভির তাড়াতাড়ি উঠে আবিরের কাছে গেল। আবিরের কানে কানে কিছু বলতেই আবিরের অভিব্যক্তি বদলে গেল। তানভির ফোন থেকে সেই পোস্ট টা দেখালো। আবির দাঁতে দাঁত চেপে বলল, "মেঘ কোথায়?" বনুকে হিজাব পড়তে বলছিলাম। সেই যে উপরে গেছে আর তো আসছে না। কল দিলাম কল ধরে না। আবির গম্ভীর কণ্ঠে বলল, "মীম কে বল ডেকে নিয়ে আসতে।" আবির, সাকিব, সাকিবের কয়েকটা বন্ধু সবাই মিলে বরযাত্রীদের

খাবার পরিবেশন করছে। তানভিরও চেয়েছিল, কিন্তু মামারা রাজি হোন নি।আবির ওনাদের বোনের ছেলে, আবিরের প্রতি যতটুকু অধিকারবোধ আছে তানভিরের প্রতি ততটুকু নেই। তাই তানভিরকে ওনারা মেহমানের মতোই যত্ন করছে। কোনো প্রকার দায়িত্ব দিচ্ছেন না। মীম রুম থেকে মেঘকে নিয়ে নামছে। আত্মীয় আর বরযাত্রীদের ভিড়ে উঠোনে পা রাখার জায়গা নেই। দিশা, মীম, মেঘ আরও কয়েকজন কাজিন নতুন জামাই এর সঙ্গে দেখা করতে স্টেজে গেল। জামাইয়ের সাথে কথা বলে আসার সময় একটা ছেলে পাশ থেকে ডেকে বলল, "Excuse me " মীম আর মেঘ দুজনেই পাশ ফিরল। কিন্তু কিছু বলল না।ছেলেটা পুনরায় বলল, "আপনারা বৌয়ের কি হোন?" মীম স্বাভাবিক কণ্ঠে উত্তর দিল, "বোন। কেনো?" "তাহলে তো তোমরা আমার বিয়াইন হোও। তা তোমার পাশের জনের নাম কি?" "নাম দিয়ে আপনার কাজ কি?" মীম রাগে উত্তর দিল। ছেলেটা স্ব শব্দে হেসে বলল, "কাজ আছে বলেই তো জিজ্ঞেস করছি। " ছেলেটার একটু পেছনে আবির দাঁড়াতেই মেঘ বৃহৎ নয়নে তাকালো। আবির চোখ দিয়ে ইশারা করতেই মেঘ মুচকি হেসে মীমকে বলে, "চল আমরা ঐদিকে যায়। " বোনের কথামতো মীম ও চলে যাচ্ছে। ঐ ছেলে পুনরায় পিছু ডাকে, "এই সুন্দরী তোমার হাসিটা খুব সুন্দর। প্লিজ, তোমার নামটা বলো। " পেছন থেকে আবির গুরুতর স্বরে বলল, " এইযে মিস্টার, সুন্দরীর নাম আমি আপনাকে বলছি। আপনি বরং একটু ঐদিকে আসুন।" বরযাত্রী খাওয়ানো শেষে বাড়ির সব

কাজিনদের খেতে বসানো হয়েছে। আবির ইচ্ছেকৃত মেঘদের টেবিলের দায়িত্ব নিয়েছে যাতে মনমতো খাওয়াতে পারে। তানভিরের কথামতো মেঘ হিজাব পড়েই এসেছে। গাঢ় বেগুনি রঙের একটা গর্জিয়াছ ড্রেস পড়েছে তারসঙ্গে ম্যাচিং হিজাব। হালকা করে সাজুগুজু করেছে তবে সবসময়ের মতোই মায়াবী লাগছে। আবির খাবার দিতে দিতে বেশ কয়েকবার আড় চোখে তাকাচ্ছে। খাওয়ার শেষ পর্যায়ে আবির হঠাৎ মেঘকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পরখ করল। সহসা আবিরের অভিব্যক্তি বদলে গেছে। আঁখি যুগল ক্রোধে জ্বলছে। সঙ্গে সঙ্গে আবির জায়গা ত্যাগ করল। মেঘ কলতলা থেকে হাত ধৌয়ে ফেরার পথে আবিরকে দেখেই থমকে গেল। আবিরের ক্রোধিত আঁখি দেখে মেঘের অন্তরাত্মা শুকিয়ে যাচ্ছে। আবিরে রুদ্রমূর্তি রূপ দেখে মেঘ ভয়ে ঢোক গিলল। আবির মেঘের হাত নিজের কাছে টেনে খুললো,মেঘের হাতে মেহেদী দিয়ে "Abir" লেখা। আবির রক্তাভ দুচোখে নিজের নাম টা দেখলো। দেখেই বুঝা যাচ্ছে কাঁপা কাঁপা হাতে মেঘ নামটা লিখেছে। আবির কন্ঠ চারগুণ ভারি করে বলল, "এসবের মানে কি?" মেঘ হাত টেনে নিজের পেছনে লুকালো। আবির দাঁতে দাঁত পিষে চলে গেছে। ভয়ে হাত-পা কাঁপছে। কয়েক মিনিটের মধ্যে আবির একটা মেহেদী নিয়ে আসছে। মেঘের হাত টেনে একটু মেহেদী নামের উপর রেখে বৃদ্ধাঙ্গুল দিয়ে নিজের নামটা লেপ্টে দিয়েছে। মেঘ আবিরের রক্তাভ চোখে অসহায়ের মতো তাকিয়ে আছে।যে মেয়ে ঠিকমতো মেহেদী ধরতে পারে না, সে মেয়ে আজ এত কষ্ট করে মেহেদী দিয়ে আবিরের নাম

লিখেছে। কোথায় আবির একটু খুশি হবে তা না রাগে নামটায় মুছে দিল। আবিরের কার্যকলাপে মেঘের গালসহ পুরো মুখ লাল হয়ে গেছে। নিরুদ্যম ক্রোধে আবিরের চোখ জ্বলছে। মেঘ জড়বস্তুর ন্যায় স্তব্ধ হয়ে আছে,ওষ্ঠদ্বয় অবিরাম কাঁপছে। আবির ক্রোধান্বিত কণ্ঠে বলল, "সবকিছুর একটা লিমিট থাকা দরকার। তুই কি ভাবছিস, তুই যা ইচ্ছে করবি আর কেউ তোকে কিচ্ছু বলবে না? কোন সাহসে আমার নাম লিখেছিস?" একদমে কথাগুলো বলে দাঁতে দাঁত চেপে ধরলো। চোখ ফেটে যেন আগুন বের হচ্ছে। আবিরের অগ্নিদৃষ্টি দেখে মেঘের বুক ফুঁড়ে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসলো। আবির ভাইয়ের এই রূপ আর কখনও দেখে নি সে। ভয়ে বুক কাঁপছে। অক্ষিপট ভিজে আসছে। হঠাৎ হাতে ব্যথা অনুভব হওয়ার চিবুক নামিয়ে তাকালো হাতে। আবির মেঘের হাতটা এখনও শক্ত করে চেপে ধরে আছে। অতীব ব্যথা অনুভব হওয়া স্বত্তেও মুখ ফুটে কিছু বলতে পারছে না। আবিরের অভিমুখে চেয়ে আছে, চোখ টলমল করছে সাথে হৃদয়ে জমছে এক আকাশ সম অভিমান। পৃথিবীর বুকে সবচেয়ে নিষ্ঠুরতম মানুষটার চোখে বিবশ হয়ে চেয়ে আছে। অকস্মাৎ পল্লব ঝাপ্টাতেই অষ্টাদশীর গাল বেয়ে নোনাজল গড়িয়ে পড়ল। আবির কপাল গুজিয়ে প্রখর নেত্রে খেয়াল করল। প্রণয়ের নারীর চোখে পানি দেখে আবিরের মেজাজ দ্বিগুণ পরিমাণে খারাপ হলো। রাগে কটমট করে বলল, "চুপ, একদম কাঁদবি না।এক ফোঁটা পানি মাটি স্পর্শ করতে দেরি হলেও, আমার হাত তোর গাল স্পর্শ করতে দেরি হবে না।" ভয়ে মেঘের

সর্বাঙ্গ কম্পিত হলো। ডানহাতে তাড়াতাড়ি করে চোখ মুছার চেষ্টা করল। গাল বেয়ে অনর্গল নোনাজল গড়িয়ে পরছে, চোখ মুছে কুলাতে পারছে না। ভেতর ফেটে কান্না আসছে তার। কোনোভাবেই সেই ক্রন্দন আটকাতে পারছে না। বুকের ভেতর জমা অভিমানগুলো ক্রমশ বেড়েই চলেছে। আবির চোখ বন্ধ করে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে মনে মনে বলল, " আমি জানি, আমার গতিবিধি তোর হৃদয়ে আঘাত করেছে। কিন্তু আমি নিরুপায়। বিশ্বাস কর, যেই হাত দিয়ে আজ নামটা মুছেছি, সেই হাত দিয়েই একদিন তোর হাতে আমার নাম লিখে দিব। শুধু মেহেদী দিয়ে নয় কাগজে-কলমে লিখিত থাকবে, সাজ্জাদুল খান আবির শুধুই মাহদিবা খান মেঘের। সেই নাম হবে চিরস্থায়ী। পৃথিবীর কেউ কোনোদিন সেই নাম মুছতে পারবে না, ইনশাআল্লাহ। "
অতিরিক্ত কান্নায় মেঘের নিঃশ্বাস ভারী হয়ে আসছে। শ্বাস ফেলতে পারছে না। ঘন ঘন শ্বাস নিচ্ছে আর চোখ মুছছে। মেঘের এ অবস্থা দেখে আবির ভ্রু কুঁচকে প্রশ্ন করল, "কি হলো?" ধমকের শব্দে মেঘ হকচকিয়ে তাকালো। কান্নায় ভেজা চোখের পাপড়ি, লালবর্ণের কপোল আর লেপ্টে যাওয়া কাজল দেখে অষ্টাদশীকে জড়িয়ে ধরার প্রতিষেধ ইচ্ছে জাগছে আবিরের অন্তরে। হঠাৎ মেঘের চোখ পড়ে মালার দিকে। নতুন জামাইয়ের জন্য খাবার নিয়ে যাচ্ছিলো। মালাকে দেখেই মেঘের পুরোনো ঘটনা মনে পরছে। ভেতরে জমা অভিমানরা অভিযোগ হয়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে। মেঘ কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলল, " প্রতিনিয়ত থাপ্পড়ের ভয় না দেখিয়ে, আপনি বরং আমায় একেবারে

মে*রে ফেলুন। দুনিয়ার সবাই ধৌয়া তুলসি পাতা, একমাত্র আমি ব্যতিত। কারো দোষ আপনার চোখে পরে না শুধু আমারগুলোই চোখে পরে।" আবির তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে গম্ভীর কণ্ঠে শুধালো, "কি বলতে চাচ্ছিস?" " অন্য কেউ ও তো হাতে নাম লিখেছে কই তাকে তো কিছু বললেন না!" মেঘ এটুকু বলেই থেমে গেছে। আবির অবাক লোচনে মেঘকে দেখছে। পেছন ফিরে মালাকে একবার দেখে নিল। পুনরায় মেঘের দিকে চেয়ে ঢোক গিলে ভারী কণ্ঠে বলল, " সবমেয়ের উপর নজরদারি করার দায়িত্ব আমি নেই নি, আর যার তার উপর আবির অধিকারও খাটায় না। তোর উপর আমার যতটা অধিকার আছে তা আর কারো উপর নেই। " মেঘ মালার দিকে তাকিয়ে থেকেই রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে বলল, "যেই অধিকারবোধের সবটুকু জুড়েই শুধু রাগ আর অসন্তোষ, প্রয়োজন নেই সেই অধিকার দেখানোর। " মেঘের মুখে বিষবাক্য শুনে আবির বিমোহিত নয়নে স্তিমিত মুখের পানে চেয়ে আছে। কয়েক সেকেন্ডের ব্যবধানে হঠাৎ ই মেঘের হাত ছেড়ে দিয়েছে। আবির হাত ছাড়তেই মেঘের হুঁশ ফেরে। মালার প্রতি তীব্র আক্রোশে কি না কি বলে ফেলছে সে নিজেও জানে না। এদিকে আবির প্রবল চেষ্টায় নিজের রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে চাচ্ছিল কিন্তু মেঘের কথায় সেই রাগ দ্বিগুণ বেড়েছে। হাতে থাকা মেহেদী টা ছুঁড়ে ফেলে দিল। মেঘ আবিরকে দূর থেকে দেখেই তানবির ভয়ে তটস্থ হয়ে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে ওদের কাছে আসে। তানভির কাছাকাছি এসে নরম স্বরে মেঘকে ডাকলো, "বনু..!" মেঘ সিক্ত চোখে তাকাতেই তানভিরের

বুক কেঁপে উঠলো। প্রগাঢ় চোখে তাকালো আবিরের অভিমুখে। তানভিরের দৃষ্টিতে ব্যাকুলতা। বনু কেনো কাঁদছে তা জানার জন্য ব্যাকুল হয়ে গেছে। আবির বাড়ি থেকেই বলে আসছিল, মেঘ কাঁদলে মালার খবর আছে! তবে কি কোনো অঘটন ঘটতে যাচ্ছে। হয়েছেই বা কি! তানভিরের উপস্থিতিতে মেঘ ভীষণ অস্বস্তিতে পড়ে গেছে। আবির ভাইয়ের নাম লিখেছে এটা তানভির জানতে পারলে কি হবে সেটা ভেবেই ভয়ে চোখ নামিয়ে পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে। আবির আড়চোখে চেয়ে মনে মনে বলল, "প্রয়োজন নেই বললেই তো আমি তোকে ছেড়ে দিতে পারবো না। তুই যদি আমার রাগের কারণ ই না বুঝিস তবে আমার অর্ধাঙ্গিনী হবি কেমন করে!" মেঘ একটু দূরে যেতেই তানভির উদ্বিগ্ন কণ্ঠে শুধালো, "বনু কাঁদছে কেন ভাইয়া?" আবির কিছু বলতে পারছে না, কথা আঁটকে আসছে তার। বার বার ঢোক গিলে ভিতরের কষ্ট লুকানোর চেষ্টা করছে। যেই মেঘের জন্য আবির নিজের জীবন দিতে রাজি সেই মেঘ আজ এত বড় কথা বলেছে। আবিরের অস্বাভাবিক অবস্থা দেখে তানভির আবিরের বাহুতে ধরে ডাকল, "ভাইয়া কি হয়ছে?" আবির ঘাড় ঘুরিয়ে তানভিরের মুখের পানে চাইলো। আবিরের চোখের প্রতিটা শিরা-উপশিরা রক্তাভ হয়ে আছে। দৃষ্টিতে তীব্র আগুন নির্গত হচ্ছে। প্রখর তপ্ত স্বরে বলল, "তোর বোন মেহেদী দিয়ে হাতে আমার নাম লিখছে!" "কি সর্বনাশ! "
"একটাবারের জন্য ভাবলোও না, বাসার কারো চোখে এই নাম পড়লে কি অবস্থা হতে পারতো! ও কে কিভাবে বুঝাবো এখন আমার পক্ষে

ওর মাত্রাতিরিক্ত পাগলামিকে সাপোর্ট করা সম্ভব না। আমার মনের অবস্থা বলতে পারছি না কারণ এই বয়সে ও কে পারিবারিক ঝামেলায় কোনোভাবেই জড়াতে চাই না আমি।" তানভির আবিরের কথাগুলো শুনে ঠান্ডা কণ্ঠে বলল, "তুমি মাথা ঠান্ডা রাখো,প্লিজ ভাইয়া।" " তোর বোনের জন্য কি পরিমাণ পীড়া আমি সহ্য করতেছি, এর একাংশ যদি তোর বোন বুঝতো!" কথাগুলো বলেই আবির দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়লো। মেঘকে জেনে-বুঝে কখনও কষ্ট দিতে চাই না আবির। কিন্তু মাঝেমধ্যে বাধ্য হয়ে নিজের অনিচ্ছা স্বত্তেও মেঘকে শাসন করতে হয়। মীম বা আদিও যদি মেঘের হাতে আবিরের নাম দেখে সেই কথা আদির মা, মেঘের মা বা আবিরের মায়ের কান পর্যন্ত যেতে বেশি সময় লাগবে না। মা, কাকি জানা মানেই বাবাদের কানে পৌছাবে। বাসার মানুষ কিছু টের পেলে কি হবে এটায় ভেবেই, নিজের মনের বিরুদ্ধে গিয়ে প্রেয়সীর হাতে জ্বলজ্বল করা নিজের নামটা মুছে যতটা কষ্ট মেঘকে দিয়েছে, তার থেকে কয়েকগুণ বেশি কষ্ট আবির পাচ্ছে। তানভির কিছু বলতে চাচ্ছিলো হঠাৎ ই আলী আহমদ খান কিছুটা দূর থেকে ডাকলেন, "আবির, কোনো সমস্যা? " আলী আহমদ খানের ডাকে আবির আর তানভির দুজনেই আঁতকে উঠেছে। আবির নিজেকে সামলে আস্তে করে গলা ঝেড়ে ধীর কণ্ঠে বলল, "কিছু হয় নি আব্বু। " আবিরের রক্তিম আঁখি যুগল এখনও অপরিবর্তিত, চোখেমুখে লেপ্টে আছে তীব্র আক্রোশ। এ অবস্থায় আব্বুর মুখোমুখি হওয়া কোনোভাবেই সম্ভব না, এজন্য কয়েক কদম এগিয়ে চোখ-মুখে পানি

ছিটিয়ে স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা করল। আলী আহমদ খান তানভিরের কাছাকাছি এসে শুধালেন, “কি হয়েছে আবিরের?” তানভির সোজাসাপ্টা উত্তর দিল, “তেমন কিছু না বড় আব্বু। শরীরটা বোধহয় একটু খারাপ লাগছে। ” আলী আহমদ খান আবিরকে এক পলক দেখে একটু উঁচু গলায় বললেন, “প্রথমবারের মতো মেহমানদারি করছে খারাপ লাগাটায় তো স্বাভাবিক।” আবির হাত দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে চলে যেতে নিলে আলী আহমদ খান পুনরায় বললেন, “কোথায় যাচ্ছ?” “খাওয়ানো শেষ হয় নি ” আবিরের আব্বু স্বাভাবিক কণ্ঠে বললেন, “খাবারের ঐখানে আর যেতে হবে না। তোমরা দুভাই বরং দেখে আসো নতুন জামাইয়ের ঠিকঠাক মতো আপ্যায়ন করা হচ্ছে কি না!” “আচ্ছা” বলে বাধ্য ছেলের মতো আবির স্থান ত্যাগ করল। তানভিরও আবিরকে অনুসরণ করল। চোখে মুখে পানি দিয়েও রাগ কন্ট্রোল করতে ব্যর্থ হলো। যেতে যেতে দুই ভাইয়ের মধ্যে আরও কিছুক্ষণ বাকবিতন্ডা চলল। কি হচ্ছে আর কি হতে যাচ্ছে সেসব ভেবেই তানভির ঘাবড়ে যাচ্ছে, তারপরও ভাইকে বোঝানোর ব্যর্থ চেষ্টা করল। আবিরের ক্রোধের কাছে সবই বৃথা। স্টেজের কাছে যেতেই চোখ পরল মালার দিকে সাথে ৩-৪ জন কাজিন। মেঘের বলা কথাটা মনে পড়ে গেল, “অন্য কেউ ও তো হাতে নাম লিখেছে কই তাকে তো কিছু বললেন না!” আবির সূক্ষ্ম নেত্রে মালার হাতটা খেয়াল করছে। হঠাৎ ই চোখে পড়ে বড় করে লেখা A অক্ষরটায়। মেঘ যতটা জায়গা নিয়ে আবির নাম লিখেছে প্রায় ততটুকু জায়গা নিয়েই মালা অক্ষরটা

লিখেছে। মালা আবিরকে দেখে লাজুক হাসলো। এতে আবিরের মেজাজ আরও বেশি খারাপ হলো। আবিরের দৃষ্টিতে তিক্ততা। কোনো দিকে না তাকিয়ে চলে গেল। মেহমান খাওয়ানো প্রায় শেষ দিকে। সাকিবের রুম থেকে বেড়িয়ে উঠোনের মাঝখান থেকে আবির উচ্চস্বরে ডাকল, "সাকিব!" আবিরের রাগী কন্ঠ শুনে সাকিবের সঙ্গে সঙ্গে তিন মামাও অবাক চোখে তাকালেন। ছোট মামা সাকিবকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "কি হয়ছে দেখ তো গিয়ে!" "আচ্ছা" সাকিব হাতদুটা কোনোমতে ধৌয়ে ছুটে আসল। আবির পাঞ্জাবি হাতা ভাজ করতে করতে রাগান্বিত কন্ঠে বলল, "মালা কে নিয়ে বাড়ির পেছনে আয়। " সাকিব আশপাশ তাকালো, তানভিরের চিন্তিত মুখবিবর আর আবিরের রাগান্বিত কন্ঠ শুনে বুঝতেই পারছে কিছু একটা হয়েছে। সাকিব মোলায়েম কন্ঠে প্রশ্ন করল, "এখনি?" আবির নিস্তব্ধ কন্ঠে বলল, "Right now " "Okay Vaiya " মেঘ রুমে আসার পর থেকে কেঁদেই যাচ্ছে। মালার উস্কানিতেই মেঘ এমন কান্ড করেছে, না হয় কখনো সে এমনটা করতো না। বিষয়টা নিয়ে যত ভাবছে তত বেশি কান্না পাচ্ছে। আবির ভাইয়ের আচরণের থেকেও নিজের উপর রাগ বেশি উঠতেছে। নাম লেখার সময় একবারের জন্যও বাসার কথা মনে হয় নি তার শুধু মালার প্রতিই জেদ কাজ করছিল। আবির ভাই রাগে নামটায় মুছে দিয়েছেন অথচ আব্বু আর বড় আব্বু দেখলে যে কি হতো! হয়তো বাড়িতে ঢুকতেই দিতেন না। আদো বাড়ির কেউ হাতের নাম দেখে ফেলল কি না এটা ভেবে ভয় ও পাচ্ছে। এই

ঘটনার পর আবির ভাইয়ের সাথে কথা বলা তো দূর সামনে দাঁড়ানোর মতো অবস্থা নেই মেঘের। নিজের করা অপকর্মের জন্য লজ্জা, আবিরের প্রতি সুপ্ত অভিমান, মালার প্রতি ক্ষোভ সবকিছু মিলে অষ্টাদশীর কোমল মনটাকে বিষিয়ে দিয়েছে। গতকাল থেকে আজ নাগাদ আবিরের সঙ্গে কত ভালো সময় কাটছিল, একটা ভুলের কারণে সবকিছু শেষ হয়ে গেল। আবিরের সামনে কিভাবে দাঁড়াবে এই ভেবেই আরও বেশি কান্না পাচ্ছে। বুকের ভেতর অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে। নিঃসঙ্গতায় ছেয়ে গেছে মেঘের মন। অষ্টাদশীর মেঘাচ্ছন্ন মনের অস্ফুট বাসনা ডিসেম্বরের কনকনে ঠান্ডার মধ্যেও যদি ভারী বর্ষণ হতো। বৃষ্টির মতোই মেঘের মনের সকল শঙ্কা, আক্রোশ, শোক সব ধুয়েমুছে যেত। আচমকা তানভির দরজা থেকে ডাকল, “বনু, আসবো?” মেঘ তাড়াতাড়ি করে চোখ মুছতে মুছতে উঠে বসল। স্তিমিত কণ্ঠে বলল, “আসো।” তানভির নরম কণ্ঠে বলল, “মন খারাপ কেন?” “এমনি। ” উচ্ছ্বাসিত কণ্ঠে তানভির পুনরায় বলল, ” থাক আর কাঁদতে হবে না, তোকে এখনি বিয়ে দিচ্ছি না। ” মেঘ অবাক চোখে তাকিয়ে রইলো। তানভির হাসছে। তানভিরের হাসি দেখে মেঘ মন খারাপ করে বলল, “ভাইয়া তুমি এখন যাও।” তানভির গলা খাঁকারি দিয়ে পুনরায় বলল, ” তোকে শাস্তি না দিয়ে তো যাব না। ” ঠোঁট ভিজিয়ে চিন্তিত হয়ে প্রশ্ন করল, “কিসের শাস্তি? ” আতঙ্কে মেঘের বুক কেঁপে উঠলো। তবে কি আবির ভাই সব বলে দিয়েছেন? ভাইয়া তার ই শাস্তি দিতে এসেছেন। মেঘ চিবুক নেমে গলায় আটকালো। ভয়ে হাত-পা কাঁপছে।

আজ কোনোভাবেই রক্ষা নেই। তানভির হাসিমুখে উত্তর দিল, “তুই যে শুধু ভাইয়ার সঙ্গে ছবি পোস্ট করলি, আমার সঙ্গে করলি না। কাজটা কি ঠিক করছিস?” মেঘ নিশ্চুপ। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। হাত-পা অবশ হয়ে যাচ্ছে। মেঘকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে আবারও বলল, “এটার শাস্তিস্বরূপ তুই এখন ফ্রেশ হয়ে নিচে যাবি, আমার সঙ্গে ছবি তুলবি সেই ছবি পোস্ট করবি। ” মেঘ প্রখর নেত্রে তানভিরকে দেখল। ভাইয়ার হাসিমুখ দেখে মেঘ না চাইতেও হাসলো। মেঘের মুখে হাসি দেখে তানভির স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লো। একদিকে আবিরের রাগ অন্যদিকে মেঘের কান্না, ভাই হিসেবে তানভিরের দুদিক ই সামলাতে হয়। তানভিরের কথা শুনে মেঘের মনের ভয় অনেকাংশে কেটে গেছে। সকাল বেলা ছবি পোস্ট করার সময় তানভিরের কথা মনে ছিল না মেঘের। কোনোকিছু না ভেবেই আবিরের সাথে ছবি পোস্ট করেছিল। সারাদিনে আর মোবাইল ধরা হয় নি। মেঘ নিচে নামতেই মীম আর আদি দুজনেই ছবি তুলার জন্য ছুটে আসছে। তানভির আগেই ওদেরকে বলে গেছিলো। তানভিরের সঙ্গে ছবি তোলার পরপর তানভির নিজেই সেখান থেকে একটা ছবি মেঘের ফে*সবু*ক আইডিতে পোস্ট করেছে। তারপর মীম, আদির সঙ্গে, নবদম্পতির সঙ্গে ছবি তুলেছে। মীম হঠাৎ ই মেঘের হাত ধরে প্রশ্ন করল, “আপু মেহেদী দিয়ে হাতটা এভাবে নষ্ট করেছো কেন? ” আদিও মেঘের হাতটা খেয়াল করে বলল, “মেঘাপু তোমার হাতটা খুব পঁচা দেখাচ্ছে। ” মেঘ মৃদু হাসলো। ভাই বোনদেরকে তো বলতে

পারবে না আবির ভাইয়ের নাম লেখার শাস্তিস্বরূপ আবির ভাই হাতটা নষ্ট করেছেন। মাইশা সবার দিকে এক পলক তাকিয়ে তানভিরকে প্রশ্ন করল, “আবির কোথায়?” “ভাইয়া ফ্রেশ হতে গেছিল। আসতেছে।” “ওহ আচ্ছা ” আবির ভাই আসতেছে শুনেই মেঘের বক্ষস্থলে কম্পন শুরু হয়ে গেছে। পা কাঁপছে। আবির ভাইয়ের মুখোমুখি হবার জন্য অষ্টাদশীর বিন্দুমাত্র সাহস বেঁচে নেই। চলে যাওয়ার জন্য দু পা বাড়াতেই আবির উপস্থিত হলো। পাঞ্জাবি পাল্টে খয়েরী রঙের শার্ট সাথে কালো প্যান্ট ইন করে পরেছে, ভেজা চুলগুলো হাত দিয়েই সেট করেছে, সাথে বডিস্প্রের ঝাঁঝালো গন্ধ অষ্টাদশীর হৃদয় কেড়ে নিচ্ছে। যতই রাগ, অভিমান আর মনোমালিন্য থাকুক না কেন প্রিয়জনের উপস্থিতি ই যেন সব সমস্যার একমাত্র সমাধান। সব ভুলে মেঘ ব্যগ্রভাবে আবিরকে দেখছে, হৃদয়ে ঝড় চলছে। ঝড়ের আবাস বুঝতে পেরে আবির নিজের দৃষ্টি প্রতিরুদ্ধ করে পাশ কেটে স্টেজে চলে গেল। আবির আসায় নতুন করে আবারও ছবি তোলা হচ্ছে, পাঁচ ভাইবোন, মাইশা আর তার হাসব্যান্ডের সঙ্গে, সাকিব, মামারা, বাবা-চাচা মোটামুটি সবার সঙ্গেই ছবি তুলেছে। বেশকিছু ছবিতে মেঘ আবির পাশাপাশি থাকলেও কেউ কারো দিকে তাকায় নি। ছবি তোলা শেষ হতেই মেঘ হালিমা খানের সাথে বাড়ির ভেতরে চলে গেছে। ছোটবেলা থেকেই মেঘের অভ্যাস কারো প্রতি অভিমান হলে, সেটা প্রকাশ করতে না পারলে গম্ভীর হয়ে যায়। কারো সাথে বেশি কথা বলে না, মায়ের পিছনে ঘুরঘুর করে। আচমকা বিয়ে

বাড়ির অভিলাষ বদলে গেছে। চারদিকে কান্নার রব। কনেপক্ষের জন্য সবচেয়ে কষ্টকর মুহুর্ত হলো কনে বিদায়। গায়ে হলুদ, মেহেন্দি, বিয়ে পর্যন্ত সবার মধ্যে যতটা আমেজ থাকে, কনে বিদায়ে সবটায় অভিষঙ্গে মিশে যায়। জন্মের পর থেকে ২০-২৫ বছর এক বাড়িতে বেড়ে ওঠা মেয়েটাকে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হয় এক অচেনা পরিবারে। বাবা-মা, ভাইবোনদের প্রতি এতবছরের ভালোবাসা, আবেগ, অনুভূতির বাঁধন ছিঁড়ে চিরতরে চলে যেতে হয়। বিয়ে নামক সামাজিক বন্ধনের কারণে বাবার-মায়ের আদরে বড় করা রাজকন্যারা বাবার বাড়ির মেহমান হয়ে যায়। শুরু হয় এক নতুন জীবন। যেই জীবনের প্রথম লড়াই টায় হলো অচেনা, অপরিচিত মানুষগুলোকে আপন করে নেয়া। বড় মামার বড় মেয়ে মাইশা তাই সবার খুব আদরের। বড় মামা, মামি, মাইশার বাধভাঙ্গা কান্না দেখে বিয়ে বাড়ির প্রতিটা মেহমান কাঁদছে। বোনকে জড়িয়ে ধরে বিরামহীন কাঁদছে মালা আর দিশা। দিশার থেকেও মালার কান্নার গভীরতা অনেক বেশি। দুই বোনের সম্পর্ক ছিল বন্ধুর মতো। মাইশার বড় ভাই না থাকায় আবির,তানভির,সাকিব আরেকটা কাজিনকে মাইশার সাথে শ্বশুর বাড়ি যেতে হবে তবে তারা রাতেই চলে আসবে। মেয়েদের মধ্যে স্মৃতি আর দিশা যাচ্ছে মাইশার সঙ্গে। সবার থেকে বিদায় নিয়ে নবদম্পতি গাড়িতে উঠল। ফুল দিয়ে সজ্জিত এক সাদা রঙের প্রাইভেট কার ধীর গতিতে যাত্রা শুরু করেছে। গাড়ি চলছে ধীর গতিতে, মাইশা কেঁদেই যাচ্ছে, একপাশে দিশা অপর পাশে মাইশার হাসব্যান্ড। বাড়িতে আত্মীয়-স্বজনদের কান্নার শব্দ, মাইশার

বিদায়ের পর আত্মীয়দের ভিড় ঠেলে সেই যে মালা রুমে ঢুকেছে, রুম থেকে আর বের হয় নি। মেঘ বিকেল থেকেই মায়ের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে। মাইশা আপুর কান্না দেখে নিজের অজান্তেই মেঘের চোখ বেয়ে অনর্গল জল পরছিল, মায়ের আঁচল দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে আঁচল ভিজিয়ে ফেলেছে। আজ এত কাছে থেকে কনে বিদায় দেখে মেঘের নিজের প্রতি প্রচন্ড ভয় কাজ করছে। সে যে এত সামান্য কারণে কেঁদে একাকার অবস্থা করে, বিয়েতে কি অবস্থা হবে! তৎক্ষনাৎ মনে মনে বিড়বিড় করল, "আবির ভাইকে বিয়ে করলে তো আমায় বিদায় ও দিবে না আর আমার কাঁদতেও হবে না। " কান্নায় ভেজা চোখ, গাল বেয়ে পড়া পানির দাগ তারসঙ্গে মুখে অকৃত্রিম মায়াবী হাসি।একটা বয়স পর থেকে মেয়েটা সবকিছুর সঙ্গে নিজেকে তুলনা করে। তেমনি মাইশা আপুর বিদায় দেখে মেঘ নিজের চিন্তায় মগ্ন হয়ে গেছে। তবে অকৃত্রিম, অকৃপণ হাসিটা বেশিসময়ের জন্য স্থির হতে পারে নি। আবির ভাইয়ের লেপ্টে দেয়া মেহেদীর দিকে নজর পরতেই মনটা খারাপ হয়ে গেল। আনমনে বিড়বিড় করে বলল, " আবির ভাইয়ের অনুভূতির রাজ্য জুড়ে কোন মহীয়সীর বসবাস! আমার হাত থেকে নাম মুছার কারণ কি শুধুই পরিবার নাকি অন্য কোনো রমণী ?" সন্ধ্যার বেশ খানিকটা সময় পর বিয়ে বাড়ির পরিবেশ কিছুটা স্বাভাবিক হয়েছে। আবিরের মামারা, আবিরের বাবা-চাচ্চু, মাইশার মামা, খালু সবাই একসঙ্গে আড্ডা দিতে বসেছেন। যার যার ব্যবসা, চাকরি, সন্তান নিয়ে কথা বলতে বলতে আবিরের বিয়ে নিয়ে কথা উঠেছে।

আলী আহমদ খানকে প্রশ্ন করায় তিনি স্বাভাবিক ভাবেই উত্তর দিয়েছেন, " ছেলে রাজি থাকলে আগামী বছর ই ছেলেকে বিয়ে করাবো। " মীম, মেঘ, আদি মাইশার কাজিনদের সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করেছে। মালা আপুকেও ডেকেছে কিন্তু মালা দরজায় খুলে নি। সবার ডাকাডাকিতে অনেকক্ষণ পর মালা রুম থেকে বেরিয়ে আসছে। মীমরা তখন রাতের খাবার খাচ্ছিলো। কাঁদতে কাঁদতে মালার চোখ-মুখ ফোলে গেছে, সারাদিন খায় নি, তাই জোর করেই খেতে বসানো হয়ছে। মালার প্রতি মেঘের বিতৃষ্ণা আর ক্ষোভ থাকলেও বোনের প্রতি বোনের ভালোবাসা দেখে মেঘের বড্ড মায়া হচ্ছে। মেঘ নিজে থেকেই মালার সঙ্গে বেশকয়েকবার কথা বলেছে। কিন্তু মালার আচরণে মনে হচ্ছে মেঘকে সে সহ্য ই করতে পারছে না তা বুঝতে পেরে মেঘ রুমে চলে গেছে। সারাদিনের ক্লান্তিতে বিছানায় শুয়ে চোখ বন্ধ করতেই ঘুমের দেশে পাড়ি দিয়েছে। আবিররা ফিরেছে প্রায় ১০ টার দিকে, ততক্ষণে বিয়ে বাড়ির হৈ চৈ শেষ। শীতের সময় ১০ টা মানেই গভীর রাত। মামিরা ব্যতিত সকলেই শুয়ে পরেছে। আবিররা ফ্রেশ হয়ে উঠোনের শেষ প্রান্তে আগুন জ্বালিয়েছে। আবার কবে কাজিনরা একত্রিত হতে পারলে তা জানা নেই। দিনটাকে স্বরণীয় করে রাখতেই সমবয়সী সকলে গভীর রাতে আগুন পোহাচ্ছে আর সবার জীবনের গল্প বলছে । ঘন্টাখানেক গল্প করার পর সাকিব তানভিরকে উদ্দেশ্য করে বলল, "কিরে তানভির,তোর অন্তরের প্রদেশে যে এক ললনা বসতি স্থাপন করছে তা তো বললি না" তানভির কন্ঠ খাদে নামিয়ে

উত্তর দিল, “তেমন কিছু না। ” “তুই বলবি কি না বল” “কি বলব?” “তুই মেঘবতীর বান্ধবীকে কবে থেকে পছন্দ করিস?” “কিছুদিন হবে। ” সাকিব মাথা চুলকে শুধালো, “আমি তো শুনেছিলাম তুই অনেক বছর যাবৎ বন্যাকে ফলো করিস। ” তানভির ভ্রু কুঁচকে উত্তর দিল, ” এত বছর কি আমার জন্য ফলো করেছি নাকি। ভাইয়া ই তো বলছে বনুর কাছের বান্ধবীদের উপর নজরদারি করার জন্য । ” আবির প্রখর নেত্রে তানভিরকে দেখে বলল, “আমি না হয় নজরদারি করতে বলছিলাম। প্রেমে পড়তে তো বলি নাই। ” সাকিব ভাব নিয়ে বলল, “কথা সত্য।” তানভির মন খারাপ করে উত্তর দিল, “প্রেমে পড়েছি কি পড়ি নি সেটা তো আর সেই মেয়ে জানে না। আমি কখনো বলতেও যাব না তাহলেই তো হবে” সাকিব আর আবির দুজনেই স্ব শব্দে হেসে উঠল। সাকিব হাসিমুখে বলল, “এত সিরিয়াস হয়ে যাচ্ছিস কেন? আমরা তো মজা করছি। তুই শুধু বল প্রেমে কবে পড়েছিস তাহলেই হবে।” আবিরের হাসি দেখে তানভির এক বুক সাহস নিয়ে বলা শুরু করল, “বনুদের বিদায় অনুষ্ঠানে বনুকে নিয়ে কলেজে গেছিলাম। ভাইয়া বারণ করেছিল বিধায় বনুকে শাড়ি পড়তে নিষেধ করেছিলাম। কিন্তু কলেজ গেইটে ওনাকে শাড়ি পড়া দেখে আমার মনোযোগ থমকে গেছিল। বুকের ভেতর এক অদ্ভুত মায়া কাজ করছিল। বনুর ফ্রেন্ড হিসেবে মেয়েটাকে ছোট থেকেই দেখে আসছি অথচ কখনও এমনটা মনে হয় নি। সেদিন তাকে দেখে মনে হয়েছিল, আজীবন ক্লান্তিহীন তাকিয়ে থাকলেও তাকে দেখার তৃপ্তি মিটবে না।”

আবির, সাকিব সহ বাকিরাও মুগ্ধ আঁখিতে তানভিরের দিকে তাকিয়ে আছে। তা দেখে তানভির ই লজ্জায় পড়ে গেছে। সাকিব মৃদু হেসে সোজাসাপ্টা জবাব দিল, "ওনাকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ দেয়া উচিত যে তোকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্ত থেকে টেনে এনেছে। বিষাদ ছুঁতে চাওয়া তানভির পুনরায় কারো মোহমায়ায় জড়িয়েছে।" আবির হিমশীতল কণ্ঠে বলল, " তুই ঠিক থাকলে বাকিটা আমি সামলে নিব। কিন্তু এবার যদি তোর মধ্যে উল্টাপাল্টা কিছু দেখি তাহলে তোর একদিন কি আমার যে কয়দিন লাগে। " তানভির ঘাড় বেঁকিয়ে সম্মতি দিল। মীমের ডাকে সকাল সকাল ঘুম ভাঙে মেঘের। মেঘ ঘুম ঘুম চোখে তাকাতেই মীম পুনরায় বলল, "ভাইয়া তোমায় রেডি হতে বলছে।" মেঘ ঘুমের ঘোরেই বলল, "কেন?" "তোমায় ঢাকা নিয়ে যাবে।" "এখন?" "হ্যাঁ। ভাইয়া রেডি হয়ে গেছে। তুমি তাড়াতাড়ি উঠো।" মীমের কথা শুনে মেঘের ঘুম উধাও হয়ে গেছে।✕পরবর্তী পর্ব আসবে (মে মাসের ১৫ তারিখ/ তারপর, ইনশাআল্লাহ) বিস্তারিত কমেন্টে এক লাফে শুয়া থেকে উঠে বসে মেঘ আশেপাশে তাকাচ্ছে, সদ্য ফোটা ভোরের আলোয় মেঘের কুহকী মুখমন্ডলে চিন্তার ছাপ স্পষ্ট। চোখ কচলাতে গিয়ে দৃষ্টি পরে হাতের দিকে, ক্ষণিকের ব্যবধানে ছোট্ট হৃদয়ে হানা দেয় রাজ্যের অভিমান।গতকাল সকাল টা কত মিষ্টি ছিল, আবিরের কণ্ঠে ঘুম ভেঙেছিল। অথচ আজ! অষ্টাদশীর হৃদয়ে পুষা ভালোবাসার অনুভূতিগুলো অভিষঙ্গে রূপ নিয়েছে। মেঘ অভিমানী কণ্ঠে বলে, " ওনাকে বলে দিস, বাসায় ফিরলে সবার সঙ্গেই

ফিরব। আমি এখন ঘুমাবো, আমায় আর ডাকবি না। ” কথাটা বলেই মেঘ গায়ে লেপ জরিয়ে শুয়ে পরেছে। মীম বোনের কথা মতো নিচে গিয়ে সবাইকে জানিয়ে দিয়েছে। একে একে আম্মু, বড় আম্মু, কাকিয়া সবাই ডেকেছে কিন্তু মেঘের জেদের কাছে সকলেই হার মানতে বাধ্য হয়েছে। তানভির শীতল কণ্ঠে আবিরকে বলল, “বনু যেহেতু এখন যেতে চাচ্ছে না, জোর করে নেয়ার চেয়ে পরে আমাদের সঙ্গে নিলে ভালো হতো না?” আবির গম্ভীর কণ্ঠে বলল, ” ও কে রেখে যাওয়ার রিস্ক আমি নিব না। ” “আমি আছি তো। মালার সঙ্গে কথা বলার সুযোগ ই দিব না। চোখে চোখে রাখবো বনুকে। ” “কিভাবে ভরসা করবো বল! নিজেকেই তো ভরসা করতে পারছি না। তোর বোন যেন কষ্ট না পায় তার জন্য যতটা সম্ভব সময় দিয়েছি, আশেপাশে থেকেছি, এমনকি ১২ বছর পর ওর জন্যই মেহেদী ছুঁয়েছি। এতকিছু করেও তোর বোনের মুখের হাসি ধরে রাখতে পারলাম না!” “বনু এমনিতেই তোমার উপর রেগে আছে, ওর মনের বিরুদ্ধে জোর করে নিয়ে গেলে যদি আরও বেশি রেগে যায়!” আবির নিশ্চুপ। মেঘকে নিয়ে দুশ্চিন্তা আবিরের মনেও ঘুরপাক খাচ্ছে। গতকাল মেঘের বলা কথায় আবির অনেক কষ্ট পেয়েছে, প্রচন্ড ঠান্তায় গভীর রাতে নদীর পাড়ে ঘন্টার পর ঘন্টা একাকী বসে ছিল। হাত- পা জমে বরফ হওয়ার জোয়ার হয়েছে অথচ হৃদয়ের র*ক্তক্ষরণ থামানোর সামর্থ্য ছিল না। শেষরাতে বাড়ি ফিরে কিছুক্ষণ রেস্ট নিয়েই রেডি হয়েছে। বাবা, কাকা আর মামাদের গতকাল রাতেই জানিয়ে দিয়েছিল। আবির ঢাকা ফিরবে বলে সকাল

সকাল নিশ্চিন্তে আলী আহমদ খান, মোজাম্মেল খান আর বড় মামা ঘুরতে বেড়িয়েছেন। মেয়েকে উঠাতে ব্যর্থ হওয়ায় হালিমা খান তানভির আবিরকে উদ্দেশ্য করে বললেন, “এই মেয়ে মনে হয় না এখন আর উঠবে। আজকের ক্লাস না হয় মিস ই দিয়ে দিক।” আবির রাশভারি কণ্ঠে বলল, ” দু ঘন্টার জন্য ক্লাস মিস দেয়ার কোনো মানে হয় না। তোমরা আজ থাকলে আমি কিছুই বলতাম না।একটু পর তোমরা যদি যাও ই তাহলে এখন আমার সঙ্গে ক্লাসে যেতে সমস্যা টা কোথায়? ” “তোর সাথে যেতে সমস্যা হবে কেন, ঠান্ডার মধ্যে উঠতে হয়তো আলসি লাগছে।” “আমি দেখছি।” বলে আবির ঘরে ঢুকলো, মেঘের রুমের সামনে এসে চারপাশে চোখ বুলিয়ে দেখল। আশেপাশে কেউ নেই। বিছানায় লেপ মুড়ি দিয়ে মেঘ গভীর ঘুমে মগ্ন। ধীর গতিতে রুমে ঢুকে বিছানার পাশে বসল। ঘুমন্ত মেঘের মুখের পানে মুগ্ধ নয়নে তাকিয়ে আছে। সামনের দিকের ছোট চুলগুলো মেঘের গালে, কপালে এলোমেলো হয়ে আছে, তা দেখে আবিরের ভ্রুযুগল কুঁচকে আসে। চুলগুলোকে বড্ড হিংসে হচ্ছে তার। অতি সামান্য কারণেই আবিরের নাক ক্রোধে ফুঁসে ওঠেছে। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে দুই হাতের কনুই এ ভর দিয়ে এগিয়ে গেল মেঘের কাছাকাছি। ফুঁ দিয়ে অগোছালো চুলগুলো সরানোর চেষ্টা করল। দু-একটা চুলের খোঁচায় মেঘ ঘুমের মধ্যেই বাম হাত দিয়ে বাকি চুল গুলো সরিয়ে কপালের উপর হাত রেখে পুনরায় ঘুমের রাজ্যে ডুব দিল। আবির মেঘের হাতের দিকে তাকাতেই বুকের ভেতরটা কেমন যেন মোচড় দিয়ে

উঠল। কিছুক্ষণ স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে মেঘের হাত নিজের কাছে টেনে আলতোভাবে ওষ্ঠ ছোঁয়াল মেহেদী দিয়ে লেপ্টানো রঙের উপর। যার কারণে আবিরের প্রেয়সীকে কাঁদতে হয়েছিল। আবির মেঘের হাতে হাত রেখেই মোলায়েম কণ্ঠে ডাকল, "ম্যাম!" মেঘের সাড়া নেই দেখে দ্বিতীয় বারের মতো হাতে অনুগ্র চুমু খেয়ে হাত ছেড়ে পুনরায় কিছুটা উচ্চস্বরে ডাকল, "ম্যাম! " ঘুমন্ত কণ্ঠের আওয়াজ ভেসে আসলো, "হুমমমমমমম।" মেঘের নেশাক্ত আওয়াজে আবিরের হৃদয়ের রক্তক্ষরণ নিমিষেই থেমে গেছে। ঠোঁটের কোণে এক চিলতে হাসির ঝলক দেখা গেল। প্রেয়সীর ডাকের প্রতিত্তোরে সর্বদায় "হুমমমমমমম" বলা আবির আজ প্রেয়সীর মুখে এই শব্দ শুনে নে*শাগ্রস্ত হয়ে পরেছে। আনমনে বিড়বিড় করে বলল, "উফফ! আপনার ঘুম ভাঙানোর সম্পূর্ণ দায়িত্বটা যে কবে নিতে পারবো!" আবির গলা খাঁকারি দিয়ে একটু গম্ভীর কণ্ঠে ডাকল, "এর বেশি লেইট হলে অফিস, ক্লাস কোনোটায় ধরতে পারবো না কিন্তু। " আবিরের কথা মেঘের কান পর্যন্ত পৌঁছাতেই সহসা চোখ মেলল। চোখ পরল আবিরের গভীর নেত্রে। শ্যামবর্ণের পুরুষের কোমলপ্রাণ দৃষ্টি অকারণেই সেই পুরুষের প্রেমে পড়তে বাধ্য করে, হৃদপিণ্ডের চার প্রকোষ্ঠ জুড়ে অনুভূতিদের বিচরণ শুরু হয়েছে। আবিরের ছুরির ন্যায় চাউনী দেখে মেঘ পল্লব ঝাপ্টালো। দৃষ্টি সরিয়ে তাকালো অন্য দিকে। মনের পাড়ায় জমে থাকা অভিমানেরা ক্রোধে রূপান্তরিত হতে বেশি সময় লাগল না। রাগান্বিত কণ্ঠে "আমি এখন যাব না" বলতেই আবির

বাজখাঁই কণ্ঠে বলল, “তুই যাবি কি না সেই সিদ্ধান্ত শুনতে আসি নি। ২০ মিনিট সময় দিলাম তোকে। ২০ মিনিটের মধ্যে রেডি হবি। ” মেঘের প্রবল জেদ আবিরের হুঙ্কারের সামনে নিস্তেজ হয়ে পরেছে। মেঘ মিনমিনে স্বরে বলার চেষ্টা করল, “আমি বললাম....” “১৯ মিনিট বাকি। ” মেঘ সরু নেত্রে আবিরের দিকে চেয়ে বিড়বিড় করে বলল, “ফালতু ব্যাটা” আবির মেঘের চোখে চোখ রেখে বলল, “১৮” মেঘ বিড়বিড় করতে করতে তাড়াহুড়ো করে বিছানা থেকে নেমে ওয়াশরুমে ঢুকতে গিয়ে, ছুটে এসে ব্যাগ থেকে ড্রেস বের করে পুনরায় ওয়াশরুমে ঢুকলো। আবির মুচকি হেসে পকেট থেকে ফোন বের করল। মেঘ ফ্রেশ হয়ে বেরিয়ে দেখে আবির বিছানায় হেলান দিয়ে ফোন চাপতেছে, মেঘ বের হতেই আড়চোখে একবার দেখে নিল। ঠান্ডা পানি দিয়ে হাত-মুখ ধৌয়ায় মেঘের হাত-পা থেকে শুরু করে সারা শরীর অনবরত কাঁপছে। কাঁপা-কাঁপি দেখে আবির উদ্বিগ্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করল, “খুব বেশি ঠান্ডা লাগছে? বাইকে যেতে পারবি নাকি গাড়ি নিয়ে যেতে হবে?” আবির ভাইয়ের যত্ন দেখে প্রতিটা ক্ষণে নতুন করে আবিরের প্রেমে পড়লেও আজ সবকিছু বিরক্ত লাগছে। বারবার শুধু মালা আপু আর নাম মুছার কথা মনে পড়ছে। আর মনে মনে বলছে, ” আবির ভাই শুধু আমাকেই শাস্তি দিলেন, অথচ মালা আপুকে কিচ্ছু বললেন না! এখন আমার যত্ন নিতে হবে না। ” আবির আবারও শুধালো, “কি হলো? গাড়ি বের করবো?” “প্রয়োজন নেই।” মেঘের অভিমানী স্বর বুঝতে পেরে আবির আর কথা বাড়ায় নি। রেডি

হতে বলে নিচে চলে আসছে। আবির মামী, নানু, কাজিনদের সঙ্গে কথা বলছে। মেঘ নিচে আসতেই মামীরা তাড়াতাড়ি করে পিঠা খেতে দিয়েছেন। এত সকালে রান্না হয় নি। না খেয়ে বের হলে বড় মামা রাগারাগি করবেন। আবির, সাকিব, তানভির ওরা ভোরবেলায় পিঠা খেয়েছিল। মেঘ অল্প খেয়ে সবার থেকে বিদায় নিয়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও মালার রুমে ঢুকল। মালা শুয়ে শুয়ে ফোন চাপতেছিল, মেঘ স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, "আপু আসছি। ভালো থাকবেন। " মালা মেঘের দিকে কেমন করে চেয়ে আছে। মিনিটখানেক নিরব থেকে কঠিন স্বরে বলল, "তুমিও ভালো থেকো। খুব বেশি ভালো থেকো।" মেঘ হতভম্ব হয়ে মালার মুখের পানে তাকিয়ে আছে। মালা ভিতরের সবটুকু আক্রোশ নিয়ে কথাটা বলেছে। মাইশা আপু যতটা ঠান্ডা, মালা ঠিক ততটায় উগ্র। সেটা তার আচরণেই প্রকাশ পায়। ভারী জ্যাকেট, হেলমেট, হ্যান্ডগ্লাভস, বুট পড়ে, হাতের ব্যাগ টা মাঝখানে রেখে বসেছে। সকলকে বিদায় দিয়ে রওনা হলো ঢাকার উদ্দেশ্যে। সাকিব আর তানভির গত রাত থেকে আবিরকে বুঝাচ্ছে। মেঘের আচরণে যতই খারাপ লাগুক, আবির সহজে সেটা মেঘের সামনে প্রকাশ করবে না। কিন্তু সেই খারাপ লাগার মাত্রা বেড়ে গেলে সবটা ঝড় আবিরের উপর দিয়ে যাবে। রাগের বশে নিজের ক্ষতি করে ফেলবে এই ভয়ে আছে দুজন। বাইক চলছে নিজস্ব গতিতে, কিছুদূর গিয়ে আবির বাইক থামায়, নিজের ব্যাগ থেকে চাদর বের করে মেঘের গায়ে জড়িয়ে দিয়েছে, কিছুদূর এগিয়ে চায়ের স্টল থেকে চা খেয়েছে, ঢাকা পর্যন্ত

পৌঁছাতে পৌঁছাতে কম করে হলেও দশবার বাইক থামিয়েছে। সচরাচর বাইক চালানোর সময় আবির এত ব্রেক নেয় না, গন্তব্যে পৌঁছে তবেই থামে। কিন্তু আজ তার ব্যতিক্রম হচ্ছে। প্রেয়সীর অভিমান ভাঙানোর ব্যর্থ চেষ্টা করছে বারবার। এতটা পথ একসঙ্গে এসেছে, কতবার বাইক থামিয়ে এটা সেটা কিনেছে, চা খেয়েছে অথচ সম্পূর্ণ পথেই মেঘ নিশ্চুপ ছিল। ভুলকরেও একটাবারের জন্য চোখ তুলে তাকায় নি। ভার্সিটির গেইটের কাছেই বন্যা, লিজা,সাদিয়া,মিষ্টি, মিনহাজ, তামিম সকলে আড্ডা দিচ্ছিল। মেঘ তাদের দেখে আবিরকে বলল, "এখানেই নামবো। " আবির যথারীতি ব্রেক কষলো। মেঘ নেমে হেলমেট খুলতেই তামিম আর লিজা একসঙ্গে বলল, "ঐ তো মেঘ এসেছে। " বাকিরাও মেঘের দিকে তাকিয়ে আছে। মেঘ ঘুরে ওদের দিকে তাকিয়ে হাসার চেষ্টা করলো। কিন্তু এই হাসিতে নেই কোনো মুগ্ধতা। মেঘ কয়েক পা এগুতেই আবির পিছু ডাকল, "ক্লাস শেষ হলে ওয়েট করিস।আমি নিতে আসবো। " বাইকে হেলমেট পড়া আবিরকে দেখে মিনহাজ ভ্রু কুঁচকে তামিমের দিকে তাকালো। দু'জন তাকাতাকি করল কিছুক্ষণ। তামিম বন্যাকে জিজ্ঞেস করল, "বাইকার টা কে রে বন্যা?" বন্যা মুচকি হেসে বলল, "যার আশিকিতে মেঘ অত্যাসক্ত। " মিনহাজ, তামিম সহ সাদিয়া, মিষ্টি সকলেই একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, "What" বন্যা ভ্রুক্ষেপহীন উত্তর দিল, "এত অবাক হওয়ার কি আছে!" মিনহাজ গম্ভীর কণ্ঠে শুধালো, "কি হয় মেঘের?" "চাচাতো ভাই। " "আপন?" "হ্যাঁ" ততক্ষণে মেঘ কাছাকাছি চলে আসছে।

মেঘের গোমড়া মুখ দেখে সাদিয়া আহ্লাদী কণ্ঠে শুধালো, “কি হয়ছে আমার জানুটার? বয়ফ্রেন্ড চলে যাচ্ছে বলে মন খারাপ?” লিজা, সাদিয়া, মিষ্টি তিনজনেই উচ্চস্বরে হাসছে। বন্যা মৃদু হাসছে। মেঘ বন্যার দিকে রাগী চেহারায় তাকিয়ে আছে। সাদিয়ারা হাসলেও হাসি নেই তামিম আর মিনহাজের মুখে। দুই বন্ধু বার বার চাওয়াচাওয়ি করতেছে। শুভেচ্ছা ক্লাসের দিন গেইটের সামনে প্রথমবার মেঘকে দেখেই মিনহাজের ভালো লেগেছিল। অফিসে কাজ থাকায় তাড়াহুড়ো করে অফিসে চলে গিয়েছিল বিধায় মেঘের সঙ্গে কথা বলতে পারে নি। কিছুক্ষণ পর মেঘ আর বন্যা যখন ক্লাস খোঁজতেছিল তখন মিনহাজ মেঘকে দেখে ইচ্ছেকৃত ধাক্কা দিতে চেয়েছিল। কিন্তু মেঘ সরে যাওয়ায় ধাক্কাটা লাগে নি। তারপর সিনিয়রের ভাব নেয়া, ফাজলামো করা, বন্ধুত্ব সবটায় ছিল মিনহাজের প্ল্যান। একবার বন্ধুত্ব হয়ে গেলে সময় সুযোগ বুঝে প্রপোজ করবে এই আশাতেই দিন গুনছিল। কিন্তু মেঘ অন্য পুরুষে আসক্ত শুনে মিনহাজের মাথায় আকাশ ভেঙে পরেছে। শীতের সকালেও মিনহাজের শরীর বেয়ে ঘাম ছুটছে। অস্বস্তি লাগছে। শুকনো গলায় ঢোক গিলল। মেঘ ঘড়িতে টাইম দেখে সবার উদ্দেশ্যে রাগী স্বরে বলল, “তোরা কি ক্লাসে যাবি নাকি আমি একায় চলে যাব?” “যাব” বলে ওরা ক্লাসের উদ্দেশ্যে রওনা দিল। মিনহাজ ধীর পায়ে হাঁটছে আর তামিমকে উদ্দেশ্য করে বলছে, “আমি যে মেঘকে ভালোবেসে ফেলেছি তার কি হবে?” “টেনশন করিস না। চল ক্লাস শেষ করে আসি। তারপর মেঘকে নিয়ে বসবো। মেঘের সাথে ঐ

ছেলের প্রেমের সম্পর্ক আছে নাকি শুধু ভালোলাগা সবটায় জেনে নিব।” বন্যা সামনে থেকে ব্যস্ত গলায় বলল, “কিরে, তোরা ক্লাস করবি না?” তামিম উচ্চস্বরে বলল, “এখনি আসছি।” মিনহাজ হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে তামিমের দিকে তাকালো, তামিম নিরুদ্বেগ দৃষ্টিতে চেয়ে প্রশ্ন করল, “কি হয়েছে?” “তোর যদি বন্যাকে ভালো লেগে থাকে। তাহলে প্রপোজ করে ফেল। মেঘের মতো বন্যার জীবনে কেউ থাকলে পরে কান্না করিস না। ” ক্লাস শেষ করে বের হতে না হতেই মিনহাজ বলল, “চল, তোদের আজকে ফুচকা খাওয়াবো।” মিষ্টি প্রশ্ন করল, হঠাৎ? কাহিনী কি? প্রেমে টেমে পরছিস নাকি?” “তোরা আমার বান্ধবী, তোদের খাওয়াতে কারণ লাগে নাকি?” লিজা হাসতে হাসতে বলল, “বান্ধবী বলেই আজ পর্যন্ত একটা চকলেটও কপালে জুটে নি। ” “খাবি কি না বল!” “অবশ্যই খাবো, চল। ” মিনহাজ মেঘের দিকে তাকিয়ে বলল, “চল। ” মেঘ আস্তে করে বলল, ” তোরা যাহ, আমার ফুচকা খেতে ইচ্ছে করছে না। ” “ফুচকা না খেলে অন্য কিছু খাবি তবুও চল, প্লিজ। ” “আমি যাব না বললাম তো। ” লিজা, সাদিয়া, মিষ্টি আর তামিমের জোরাজোরিতে মেঘ আর বন্যা দু’জনেই রাজি হয়েছে। মিনহাজদের পরিচিত এক ফুচকার দোকানে সবার পছন্দমতো খাবার অর্ডার দিয়ে, চা খেতে খেতে গল্প করছে। তামিম মেঘকে প্রশ্ন করল, “ঐ ছেলেটা কি সত্যি ই তোর বয়ফ্রেন্ড? ” মেঘ গম্ভীর গলায় জবাব দিল, “না, দূর্ভাগ্যবশত ওনি আমার চাচাতো ভাই।” বন্যা ভ্রু কুঁচকে তাকিয়ে মেঘকে শুধালো,

“কালকে পর্যন্ত তো ওনার জন্য দেওয়ানা ছিলি, ডে তে ছবি আপলোড করলি। আজ হঠাৎ কি হলো?” “কিছু না।” মিনহাজ ভারী গলায় প্রশ্ন করল, “তোদের কি রিলেশন চলে?” “নাহ। ” “তাহলে?” মেঘ রাগে গজগজ করে বলল, “একতরফা ভালোবাসা বুঝিস? আমি ওনাকে পছন্দ করি কিন্তু ওনি করেন না। এটুকুই। এর বেশি প্রশ্ন করবি না। ” তামিম আর মিনহাজ চাওয়াচাওয়ি করে বলল, “আচ্ছা। তোরা বস আমরা খাবার নিয়ে আসি।” বন্যা এক দৃষ্টিতে মেঘকে দেখেই যাচ্ছে। একবারের জন্য পলক ফেলছে না। মেঘ চিবুক নামিয়ে বসে আছে। ছটফটে স্বভাবের মেয়েটা আজ এত শান্ত হয়ে বসে আছে। বন্যার একদম ভালো লাগছে না। মেঘকে আপাদমস্তক দেখল, হাতের মেহেদী ক্লাসেও দেখেছিল কিন্তু কিছু বলে নি। মেঘ কথা বলছে না দেখে মেঘের হাতের মেহেদী ডিজাইন দেখতে দেখতে বলল, “এত সুন্দর করে মেহেদী কে দিয়ে দিল?” “আবির ভাই। ” বন্যা চোখ বড় করে তাকিয়ে বলল, ” কি! এটা কিভাবে সম্ভব! সত্যি?” “হ্যাঁ সত্যি। ” “আবির ভাইয়া মেহেদী দিয়ে দিয়েছেন তারপরও তোর মন খারাপ? ” মেঘ পুনরায় চিবুক নামালো। বন্যা হাত উল্টাতেই হাতের তালুর লেপ্টানো রঙ চোখে পরল, স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, “মাঝখানটা এভাবে নষ্ট করেছিস কেন?” “আমি করি নি। ” “কে করছে?” “আবির ভাই। ” “ওমা কেন?” “ওনার নাম লিখেছিলাম তাই। ” মেঘের কথা শুনে বন্যা স্তব্ধ হয়ে আছে। কি বলবে কিছুই বুঝতে পারছে না। নির্বিকার হয়ে বসে আছে। মেঘের অবস্থা দেখে বুঝায় যাচ্ছে, কিছু

বললেই কেঁদে ভাসাবে। বন্যা আশেপাশে মাথা ঘুরালো। লিজারা একটু দূরে বসে তিনজন গল্প করছে। তামিম আর মিনহাজও দূরে। বন্যা অত্যন্ত যত্ন সহকারে মেঘের হাতে হাত বুলাতে বুলাতে নমনীয় কণ্ঠে শুধালো, " নাম লিখেছিলি কেন?" মেঘ অভিমানী কণ্ঠে বলা শুরু করল, "আবির ভাইয়ের মামাতো বোন মালা, ওনি অনেকদিন যাবৎ আবির ভাইকে পছন্দ করেন। আবির ভাই দেশে ফেরার পরপর একদিন আমাদের বাসায়ও আসছিলেন। তখন থেকেই ওনার ভাব ভালো লাগে নি। ওনাদের বাড়িতে যাওয়ার পর থেকেই আবির ভাইয়ের পিছে ঘুরঘুর করছিল, আমার সাথেও খারাপ ব্যবহার করেছে। শেষ পর্যন্ত ওনার হাতে "A" লিখে আমায় দেখাচ্ছিল। সেই রাগে আমিও আমার হাতে "Abir" লিখেছিলাম। সেটা আবির ভাই দেখে এমনটা করেছেন। অথচ মালা আপুকে কিছুই বললেন না। " বিরহের অনলে পুড়ছে মেয়েটা। বেস্ট ফ্রেন্ডকে সান্ত্বনা দেয়ার ভাষা পর্যন্ত খোঁজে পাচ্ছে না। স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে বিড়বিড় করে বলল, " ওনি কি কোনোভাবে ঐ মেয়েকে পছন্দ করেন?" "জানি না। " তামিমরা খাবার নিয়ে চলে আসছে। মেঘের চোখ টলমল করছে। তামিম খাবার দিতে দিতে বলল, "কিরে কি হয়ছে তোর? কাঁদছিস কেন?" সাদিয়া, মিষ্টি সকলেই এবার মেঘকে লক্ষ্য করছে। মেঘের মতো প্রাণোচ্ছল মেয়ের চোখে পানি, এটা কেউ ই মানতে পারছে না। একের পর এক প্রশ্ন করছে, বন্যা সবার উদ্দেশ্যে গুরুতর কণ্ঠে বলল, "কিছু হয় নি। এমনিতেই। খা তোরা। " মিনহাজ,তামিম মেঘ আর

বন্যার মুখোমুখি বসেছে। মিনহাজ খাচ্ছে, খানিকক্ষণ পর পর মেঘকে দেখছে। মেঘ চিবুক নামিয়ে বসে চটপটি খাচ্ছে। খাওয়া শেষে বাটি রাখতে গিয়ে চোখ পরে রাস্তার পাশে বাইকের দিকে। রক্তাভ আঁখিতে চোখ পরায় অকস্মাৎ কেঁপে উঠল। ব্যাগ থেকে ফোন বের করতে করতে এগিয়ে গেল বাইকের দিকে। ফোনের স্ক্রিনে তিনটা মিসডকল ভেসে আছে। তিনটা কল ই আবির করেছিল। ক্লাসে ঢুকলে মেঘ সবসময় ফোন সাইলেন্ট করে রাখে, ক্লাস শেষে ভাইব্রেশন মুড অন করে দেয়। আজ ক্লাস শেষে খেতে চলে আসায় ফোন হাতেই নেয় নি। আবিরের কাছাকাছি এসে কাঁপা গলায় বলল, "ফোন সাইলেন্ট ছিল।" আবির অন্য দিকে মুখ করে বিরক্ত হয়ে বলল, "১০ মিনিট ওয়েট করার ধৈর্য হয় নি! আড্ডা দেয়ায় এত ইচ্ছে ছিল, আমায় জানালেই হতো। অফিসের কাজ ফেলে কাউকে বিরক্ত করতে আসতাম না। " মেঘ ড্যাবড্যাব করে আবিরের দিকে তাকিয়ে আছে। মুখ দেখা যাচ্ছে না, তবুও ঘাড় কাথ করে মেঘ আবিরের মুখ দেখার চেষ্টা করছে। সকাল বেলা হেলমেট না খুলায় কেউ আবিরকে দেখতে পারে নি। এখন হেলমেট খুলায় মিনহাজ, তামিম সহ মেয়েগুলোও দাঁড়িয়ে আবিরকে দেখার চেষ্টা করছে । আবির একটা রিক্সা ডেকে ভাড়া দিয়ে বন্যাকে উদ্দেশ্য করে বলে, "এই মেয়ে, বাসায় যাও। " বন্যা না করতে যাবে, তখনই চোখাচোখি হয় আবিরের সঙ্গে। কপালে ভাঁজ সাথে আবিরের রাগান্বিত চাহনি দেখে না করার সাহস হয় নি। ভদ্র মেয়ের মতো রিক্সায় উঠে পরে। বন্যা যাওয়ার পর আবির মিনহাজ

আর তামিমকে এক পলক দেখে বাইক স্টার্ট দেয়। বাড়ির মানুষজন অনেকক্ষণ আগেই চলে এসেছে। আবির তানভিরের সঙ্গে কথা বলে এক মুহুর্তও দাঁড়ালো না। বাসা থেকে বেড়িয়ে রওনা দিল অফিসের উদ্দেশ্যে। পাঁচমিনিটের মধ্যে তানভিরও বেরিয়ে পরেছে। সপ্তাহ খানেক পর নির্বাচন, যার জন্য তানভির দীর্ঘদিন যাবৎ অপেক্ষা করছে। মেঘ ফ্রেশ হয়ে সেই যে ঘুমিয়েছে মীমের ডাকে উঠেছে প্রায় সন্ধ্যে বেলায়। ফ্রেশ হয়ে দুবোন ছাদের গাছগুলোকে দেখতে গেছে। কিছু গাছের আগাছা পরিষ্কার করে গাছগুলোতে পানি দিয়ে আজানের সঙ্গে সঙ্গে রুমে চলে এসেছে। বছর শেষ হতে চলল, একবছরের সকল হিসেব মেলাতে রীতিমতো হিমসিম খাচ্ছে আবির। তারমধ্যে তানভিরের নির্বাচনের প্রেশার। সে রিস্ক নিয়ে তানভিরকে রাজনীতিতে পাঠিয়েছে, তানভির ব্যর্থ হলে সেই ব্যর্থতার সম্পূর্ণ দায় পরবে আবিরের উপর তার থেকেও বড় বিষয় হলো তানভিরকে ঠিক রাখতে কষ্ট হয়ে যাবে। এদিকে মেঘের আচরণ ভালো লাগছে না। মেয়েটা ইদানীং অনেক বেশি ঠান্ডা হয়ে গেছে। হঠাৎ করেই যেন ম্যাচিউরিট ভর করেছে মেঘের উপরে। কথায় কোনো চঞ্চলতা নেই, খাবার সময় ছাড়া নিচে সচরাচর নামতেই দেখা যায় না। ভার্সিটি,ঘুম আর গাছের যত্ন নিয়েই দিন কাটিয়ে দেয়। সন্ধ্যার পর থেকে পড়াশোনা করে বাকিটা সময় অনলাইনে হ্যান্ডপ্রিন্টিং এর কাজ শেখে। খুব বেশি মন খারাপ থাকলে মাকে জরিয়ে ধরে শুয়ে থাকে। আবিরের সঙ্গে সকালে খাবার টেবিল ব্যতিত দেখায় হয় না। আবিরও বাসায় ঠিকমতো সময়

দিতে পারে না। সারাদিন দুই অফিস সামলে সন্ধ্যার পর বাসায় ফিরে ফ্রেশ হয়ে জিমে যায়। জিম থেকে ফিরতে প্রায় ১২ টা বেজে যায়। রেগুলার চলছে এই রুটিন। ভার্সিটির বন্ধুরা কেউ মেঘের ফ্রেন্ডলিস্টে এড ছিল না। স্কুল, কলেজের ফ্রেন্ডরায় শুধু এড ছিল। মিনহাজ আর তামিম বলতে বলতে এড করেছে ওদেরকে। সাথে সাদিয়া, মিষ্টি ওদেরকেও এড করেছে। এক বিকেলে মেঘ আর মীম দুবোন ছাদের গাছে পানি দিতে দিতে গল্প করছিল হঠাৎ ই মীম বলল, "আপু, একটা কথা তোমায় বলা হয় নি!" মেঘ সন্দিহান হয়ে প্রশ্ন করল, "কি কথা?" "মালা আপুর হাতে না মেহেদী দিয়ে নাম লেখা দেখেছিলাম।" অকস্মাৎ মেঘের মন খারাপ হয়ে গেছে। কিছুদিন যাবৎ সবকিছু এড়িয়ে চলছে যেন স্বাভাবিক হতে পারে। হাতের মেহেদীও ওঠতে শুরু করেছিল। মীম পুনরায় মনে করিয়ে দিল। মীম পুনরায় বলল, "কি নাম ছিল জানো আপু?" মেঘ "A" অক্ষর দেখেছিল। কোনো নাম ছিল না। কিন্তু মীম নাম কোথায় পেল। তবে কি পরে আবির ভাইয়ের নাম লিখেছিল! মেঘ আনমনে এসব ভেবে প্রশ্ন করল, "কি নাম?" "Ashik" মেঘ চমকে উঠে প্রশ্ন করল, "আশিক? তুই ঠিক দেখেছিস?" "হ্যাঁ। আমি একদম ঠিক দেখেছি। বিয়ের দিন রাতে দেখেছি। তোমাকে বলতে গিয়ে দেখি তুমি ঘুমিয়ে পরেছো। তারপর দিশাকে জিজ্ঞেস করছি, আশিক কে? তখন দিশা বলছে মালা আপুর এক্স বয়ফ্রেন্ডের নাম আশিক। " "এক্স বয়ফ্রেন্ড?" "দিশা তো তাই বললো। " মেঘ গভীর চিন্তায় পরে গেছে। মালা আপুর বান্ধবীদের

সঙ্গে বলা কথা আর ওনার আচরণে স্পষ্ট বুঝা গেছে ওনি আবির ভাইকে পছন্দ করেন। সকালবেলা হাতে শুধু "A" অক্ষরটায় ছিল, খুব উৎসাহ নিয়েই দেখাচ্ছিলেন। রাতে সেই অক্ষর Ashik কিভাবে হলো? কেউ কি হাতে কখনো এক্স এর নাম লিখে? তবে কি অন্য কেউ ওনার হাতে নাম লেখিয়ে দিয়েছে। কে সে? আবির ভাই নয় তো! মেঘের হৃদয়ের শক্ত খোলস ভেদ করে অকৃত্রিম হাসি ফুটে ওঠেছে। তাড়াতাড়ি গাছে পানি দিয়ে রুমে চলে গেছে। বেলকনিতে দাঁড়িয়ে আবিরের জন্য অপেক্ষা করছে। আবির সিঁড়ি দিয়ে উঠতেই মেঘ রুমের দরজা খুলে বেরিয়ে আসলো ঠোঁট লেগে আছে মায়াবী হাসি। আবির ভ্রু কুঁচকালো। মেঘ হাস্যোজ্জ্বল মুখে বলল, "আবির ভাই..!" আবির কোনোপ্রকার ভাবাবেগ প্রকাশ না করে কিছুটা তপ্ত স্বরে বলল, "কিছু বলবেন?" মেঘের হাসিমুখ মুহুর্তেই অন্ধকারে ছেয়ে গেছে। আবিরের এমন উত্তর আশা করে নি সে। মুখ গোমড়া করে বলল, "আমি যা বলতে চাই তা শুনার ধৈর্য আপনার হবে না। বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত। " দুপা পিছিয়ে রুমে ঢুকেই মেঘ দরজা আঁটকে দিয়েছে। আবির অভিভূতের ন্যায় বন্ধ দরজার পানে চেয়ে আছে।কিছু মুহুর্তের জন্য আবিরের দৃষ্টি স্থির হয়ে রইল। আবিরের মলিন চাহনি দেখে তানভির নিজের রুমের দরজা থেকে ডাকলো, " কি হয়েছে, ভাইয়া?" বন্ধ দরজা থেকে মনোযোগ সরলো আবিরের। তানভিরের দিকে না তাকিয়েই ছোট করে বলল, "কিছু না। " নিজের রুমের দিকে পা বাড়াতে যাবে তানভির পুনরায় বলল, "ভাইয়া, তোমার কি

কিছুক্ষণ সময় হবে?” “কেন?”‘ “এমপি তোমাকে দেখা করতে বলছিল।” “আমাকে কেন?” “জানিনা। সামনে নির্বাচন হয়তো সেই বিষয়েই কথা বলবেন। ” “কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর, ফ্রেশ হয়ে আসছি। ” “আচ্ছা।” আবির ফ্রেশ হয়ে তানভিরের সঙ্গে বেড়িয়ে গেছে। মেঘ রুমে বসে বসে হ্যান্ডপ্রিন্টিং এর কাজ করছিল। বেশ কিছুদিন যাবৎ মীমের একটা ড্রেসে কাজ করছে। ড্রেসের কাজ শেষ করেই বন্যাকে ছবি পাঠিয়েছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ছবি দেখে বন্যা কল করেছে। দুই বান্ধবী প্রায় ৩০ মিনিট গল্প করেছে। বন্যা জামা-কাপড় সেলাই করতে পারে, মেঘ যেহেতু হ্যান্ডপ্রিন্টিং শিখে ফেলছে দুই বান্ধবী মিলে অনলাইনে বিজনেস করবে। সেই বিজনেস এর টাকা দিয়ে তারা দেশের সুন্দর সুন্দর জায়গাগুলো ঘুরবে তারপর দেশের বাহিরে ট্যুর দিতে যাবে। যখন যা ইচ্ছে করতে পারবে, কারো কাছে অনুমতি নিতে হবে না এসব নিয়েই আড্ডা দিচ্ছিলো। কথা শেষ করেই মেঘ ড্রেসটাকে নিয়ে হুটোপুটি করে নিচে নামলো। আম্মু, কাকিয়া, আব্বু সবাইকে দেখানোর জন্য। সবার প্রশংসা শুনতে শুনতে মেঘের গাল দুটো লজ্জায় লাল হয়ে গেছে। মীম তো খুশিতে বোনকে জরিয়ে ধরেছে।আদি ওয়ারড্রব থেকে নিজের ৫-৭ টা শার্ট আর টিশার্ট বের করে নিয়ে আসছে, মেঘ যেন সেগুলোতে কার্টুনের ক্যারেক্টার আর্ট করে দেয়। আদির এমন কান্ড দেখে বাড়ির প্রত্যেকেই হাসতে হাসতে ক্লান্ত হয়ে গেছে। এমন সময় তানভির আর আবির বাসায় ঢুকল। ড্রয়িংরুমের হাস্যোজ্জল পরিবেশ দেখে তাদের মনোযোগও সেদিকে

গেল। মোজাম্মেল খান তানভীরকে উদ্দেশ্য করে ঠাট্টার স্বরে বললেন, “দেখো, আমার মেয়ে কত সুন্দর করে জামা প্রিন্ট করেছে। আমার মেয়ে বলে কথা!” তানভির ড্রেস টা ভালোভাবে দেখে নিল। ড্রেস দেখে বুঝায় যাচ্ছে কাঁচা হাতের কাজ। প্রথমবারে কোনো কাজ ই পারফেক্ট হয় না তারপরও দূর থেকে তেমন কিছু বুঝা যায় না, কালার কম্বিনেশন ভালো হওয়াতে দূর থেকে দেখতে মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর লাগছে। তানভিরের পাশাপাশি আবিরও ড্রেসের দিকে তাকালো। চোখাচোখি হলো আবির মেঘের। অভিমানে মেঘ চোখ নামিয়ে নিল। কয়েক সেকেন্ড পর আবিরও অন্যদিকে তাকালো। তানভির আব্বুর ঠাট্টা বুঝতে পেরে সেও মজার ছলে বলল, ” শুধু আপনার মেয়ে বলে না। আমার বোন বলে এত সুন্দর প্রিন্ট করতে পেরেছে। আমার বোনের মতো লক্ষ্মী মেয়ে আর একটাও খোঁজে পাওয়া যাবে না। ” তানভিরের কথা শুনে সকলেই হাসতে শুরু করেছে। একটা ড্রেস প্রিন্ট করা নিয়ে বাবা-ছেলে মিলে মেঘকে নিয়ে টানাটানি শুরু করে দিয়েছে। তানভির খানিক হেসে আবিরের দিকে তাকিয়ে ভ্রু জোড়া নাচালো। আবিরের ওষ্ঠদ্বয় কিছুটা প্রশস্ত হলো। তানভির যে আবিরকে শুনানোর জন্যই ইচ্ছেকৃত বোনকে লক্ষ্মী বলে সম্বোধন করেছে এটা আবিরের বুঝতে বাকি নেই। আবির আর মেঘের মধ্যে কোনোকিছু নিয়ে মানঅভিমান চলছে সেটা বুঝতে পেরেই তানভির সন্ধ্যে থেকে আবিরকে জিজ্ঞেস করছে। কিন্তু আবির কিছুই বলছে না। মেঘের বিষয়ে কিছু বললেই কথা এড়িয়ে যাচ্ছে।

মোজাম্মেল খান তানভিরের কথার প্রতিত্তোরে বললেন, ” আমার মেয়ের এত এত গুণ যে আমার মেয়ে যেই বাড়িতে বউ হয়ে যাবে সেই বাড়িতেই রাণীর মতো থাকবে, বুঝলে। ” তানভির দ্বিতীয়বারের মতো আবিরের দিকে তাকিয়ে হালকা কাশি দিয়ে ভ্রু নাচালো। ইশারাতেই যেন প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল আবিরকে, ” কি রাখবে তো রাণীর মতো?” তানভিরের মুখে হাসি থাকলেও আবিরের ভ্রু যুগল কুঁচকানো। আব্বু, চাচ্চুকে সে এক বিন্দু বিশ্বাস করতে পারে না। আজ মজার ছলে বলছেন কিন্তু দুদিন পর যে তার ব্যবস্থা করতে যাবেন না তার কি গ্যারেন্টি আছে। ভাবতেই আবিরের কলিজা কেঁপে উঠলো। আর একমুহূর্ত দাঁড়ালো না। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে মালিহা খানকে উদ্দেশ্য করে বললেন, “আম্মু খাবার রেডি করো। ” মেঘ চোখজোড়া ছোট করে সিঁড়ির পানে চেয়ে আছে। অষ্টাদশীর অভিমানী মনে অভিমানেরা তীব্রভাবে হানা দিয়েছে। সন্ধ্যাবেলা আবির ভাইকে রাগ দেখালো অথচ আবির ভাই নিজ থেকে একবারের জন্যও কথা বলার চেষ্টা করল না। ড্রেস দেখে সকলেই প্রশংসা করেছে। কিছুএকটা কমেন্টস হলেও করেছে অথচ আবির ভাই কিচ্ছু বললেন না। পৃথিবীর বুকে এই একটা মানুষের হৃদয় ই বোধহয় শক্ত পাথরের তৈরি। যেই হৃদয়ে না আছে কোনো অনুভূতি আর না আছে আবেগ। ড্রেসটা মীমকে দিয়ে দিল। এখনও রঙ ঠিকমতো শুকায় নি। শুকালেই ব্যবহার করতে পারবে। সবার সঙ্গে মেঘও খেতে বসেছে। আবির একটা ব্যাগে ল্যাপটপ আর কিছু জামাপ্যান্ট নিয়ে নিচে এসেছে। ব্যাগ রেখে খেতে

বসেছে। খুব তাড়াহুড়োতে খাবার শেষ করছে। আলী আহমদ খান একবার ব্যাগের দিকে তাকাচ্ছেন একবার আবিরের দিকে। ছেলের তাড়াহুড়ো দেখে কিছু বলতে গিয়ে বারবার আঁটকে যাচ্ছেন। অবশেষে শুধালেন, "এত রাতে কোথায় যাবে?" "কাজ আছে। " " আসবে কখন? " "তিন-চারদিন পর।" "অফিস?" "ঢাকাতেই থাকবো। সমস্যা নেই অফিসে সময়মতো চলে আসবো। " "ঢাকাতে থাকবে মানে? ঢাকা তোমার কি এমন কাজ যে বাসা ছেড়ে বাহিরে থাকতে হবে?" "আছে হয়তো কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজ।" সকলেই নির্বাক। আবির খাবার শেষ করে হাত ধৌয়ে ব্যাগ নিয়ে সবার থেকে বিদায় নিয়ে বেড়িয়ে পরেছে। সকলের মতো মেঘও স্তব্ধ হয়ে গেছে। কথাবার্তা নেই হুট করে বাসা থেকে বেড়িয়ে গেলেন। এসব কাজ ছেলেদের পক্ষেই সম্ভব। বাহিরে রাত কাটানো, বড়দের মুখের উপর কথা বলা, বেপরোয়া চলাফেরা সব স্বাধীনতায় ছেলেদের । মালিহা খান রান্নাঘর থেকে বেড়িয়ে আসতে আসতে বললেন, "আপনাকে কতবার বলেছি ছেলেকে বিয়ে করাতে। ঘরে বউ থাকলে এভাবে রাত-বিরেতে বাহিরে ঘুরতে পারবে না।" "আচ্ছা দেখছি। " দেখতে দেখতে তিনদিন কেটে গেল। আবির এখনও বাসায় ফিরে নি। অভিমানী মেঘ সারাক্ষণ নিজেকে ব্যস্ত রাখে যেন আবির ভাইয়ের কথা মনে না পরে। মীম, আদির সঙ্গে খেলাধুলা করে, টিভি দেখে, ক্লাসে যায় অথচ সারাদিনের ব্যস্ততার মাঝেও হঠাৎ করেই বুকের ভেতর থেকে দীর্ঘশ্বাস বেড়িয়ে আসে। কারো কণ্ঠ শুনার জন্য মনটা ছটপট করতে থাকে। সহ্য

করতে না পেরে কল দিল সেই পাথুরে হৃদয়ের মানবকে। পরপর দুবার কল দিল অথচ রিসিভ হচ্ছে না। মনকে সান্ত্বনা দিচ্ছে, “হয়তো ব্যস্ত আছেন”। কিন্তু মনটাও মাঝে মাঝে সান্ত্বনা মানতে চাই না। মনটা যেন চিৎকার করে বলছে,” তাকে লাগবে মানে লাগবেই, এখন এই মুহুর্তেই লাগবে।” মনের কথা রাখতে তৃতীয়বারের মতো ডায়াল করল অথচ নো রেসপন্স। পাঁচমিনিটের মতো নিশ্চুপ বসে রইল মেঘ। বার বার ফোনের দিকে তাকাচ্ছে মনে হচ্ছে এই বুঝি সেই পাথুরে মানবের কল আসলো। নিজের প্রতি রাগ আর অভিমান বেড়েই চলেছে । নিজে রাগ করে নিজেই বেহায়ার মতো কল দিচ্ছে। অথচ আবির ভাই রিসিভও করছেন না। রাগে ক্ষোভে একসময় দুচোখ বেয়ে পানি পড়তে শুরু করেছে । বিকেল পেরিয়ে রাত হয়ে গেছে অথচ আবির ভাইয়ের কোনো খবর নেই। প্রায় ১০ টার দিকে আবির কল ব্যাক করেছে। একবার রিং হতেই মেঘ সঙ্গে সঙ্গে রিসিভ করল। ওপাশ থেকে আবির বলল, ” সরি, কাজে ব্যস্ত ছিলাম। ফোন দেখি নি। ” প্রখর অভিমান মুহুর্তেই গলে পানি হয়ে গেছে। মেঘ ফুপিয়ে কাঁদতে শুরু করে দিয়েছে। আবির উদ্বিগ্ন কণ্ঠে শুধালো, “মেঘ, কি হয়েছে তোর। এই মেঘ। ” সঙ্গে সঙ্গে কল কেটে দিয়েছে মেঘ। আবির কলের পর কল করছে অথচ রিসিভ হচ্ছে না। প্রেয়সীর মলিন চেহারা যেখানে আবিরের হৃদয়কে ক্ষতবিক্ষত করে। সেখানে তার প্রেয়সী কাঁদছে। কিছুক্ষণের মধ্যে ই আবির বাড়িতে ফিরল । ড্রয়িংরুমে সোফায় বসে ইকবাল খান নিউজ দেখছিলেন। আবিরকে দেখে চিন্তিত কণ্ঠে

বললেন, " তুই না আরও দুদিন পরে আসবি বলছিলি?" জবাবে আবির বলল, " ইচ্ছে হলো তাই চলে আসছি।" আবির দ্রুত পায়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠেই মেঘের রুমে ঢুকল। মেঘ বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে ছিল। হয়তো ঘুমিয়ে পরেছে। আবির ব্যাগটা চেয়ারের উপর রাখতেই মেঘ উঠে বসেছে। সিক্ত চোখে একপলক আবিরকে আপাদমস্তক দেখেই চিবুক নামিয়ে নিল। আবির মেঘের কাছাকাছি এসে প্রশ্ন করলো, "কি হয়েছে তোর?" মেঘের নিস্তব্ধতা দেখে আবির মেঘের কপালে হাত দিয়ে জ্বর পরীক্ষা করল, কপাল ঠান্ডা, তবে হলো টা কি? কয়েকবার মেঘকে জিজ্ঞেস করার পর সাড়া না পাওয়ায় আবির বিছানার পাশে ফ্লোরে বসে পরেছে। ফ্লোরে বসে বিছানার পাশে মাথা রেখে মেঘের অভিমানী মুখের পানে চেয়ে আছে। আবিরের কান্ড দেখে মেঘ তার চিবুক নামিয়ে গলায় ঠেকালো। তবে আবিরের দৃষ্টি সরলো না। হঠাৎ ই আবির হাত বাড়িয়ে ব্যাগ টা নিজের কাছে নিয়ে সেখান থেকে একটা শপিং ব্যাগ আর একটা কাচ্চির প্যাকেট বের করে চেয়ারের উপর রেখে সেই শপিং ব্যাগ থেকে কয়েকটা বেলীফুলের মালা বের করল। মেঘ আড়চোখে মালাগুলোর দিকে তাকিয়ে সহসা মুখ অন্যদিকে ঘুরিয়ে ফেলেছে। আবির মোলায়েম কণ্ঠে ডাকল, "ম্যাম।" মেঘ আবিরের দিকে তাকিয়ে ভেঙছি কেটে বিড়বিড় করে বলল, "আহ্লাদী ডাকে মেঘের রাগ ভাঙবে না!" মেঘ পুনরায় মুখ ঘুরালো। আবির মৃদু হেসে বলল, "হৃ*দয়ে বহিছে প্লাবন, তীব্র ব্যাকুলতা। তুই আমার নিভৃতে যতনে রাখা বেলিফুলের পুষ্পমালা।"

মেঘ কপাল কুঁচকে চোখ গোলগোল করে তাকিয়ে রাগান্বিত কণ্ঠে বলল, “এসব ভাবের কথা আমায় শুনাতে আসবেন না। সবকিছু মাথার উপর দিয়ে যায়। ” আবির কিছুটা শব্দ করেই হাসলো। মন খারাপ,রাগ, অভিমান দূরে সরিয়ে হাত বাড়িয়ে নমনীয় কণ্ঠে বলল, “দেখি হাতটা দে। ” “দরকার নেই।” আবির কণ্ঠস্বর ভারি করে বলল, “শরীরে আকাশ সম ক্লান্তি নিয়েও জ্যাম পেরিয়ে শহর ঘুরে ফুল নিয়ে আসছি। ঢং করিস না প্লিজ। ” “আমি ঢং করছি?” “ঢংগীরা ঢং করবে এটায় তো স্বাভাবিক। ” মেঘের উত্তরের তোয়াক্কা না করেই আবির মেঘের হাত টেনে আলতোভাবে হাতে বেলীফুলের মালা বেঁধে দিচ্ছে। মেঘ কয়েকবার হাত সরাতেও চেয়েছে কিন্তু আবিরের অগ্নিদৃষ্টি দেখে মাথা নিচু করে রাগে গজগজ করতে করতে বলল, “আপনার কি আমাকে লোভী মনে হয়?” “কেন?” “যখন যা ইচ্ছে আচরণ করবেন, যা তা বলবেন, যেভাবে খুশি ভাব দেখাবেন তারপর কাচ্চি,মালা, চকলেট হাবিজাবি নিয়ে এসে আমার মন গলানোর চেষ্টা করবেন।” আবির কণ্ঠস্বর ভারি করে বলল, ” যা ইচ্ছে আচরণ আমি করতে চাই না। তোর কিছুকিছু কর্মকান্ড আমায় সেসব আচরণ করতে বাধ্য করে। ” “সেজন্যই তো কল দিলে কল ধরেন না, পাষাণ। ” আবির শান্ত কণ্ঠে বলা শুরু করল, “আমি সত্যি সত্যি ব্যস্ত ছিলাম। অফিসের পাশাপাশি অন্যান্য কাজ নিয়ে খুব ব্যস্ত ছিলাম। বিকেলের পর ফোন হাতে নেয়ার ই সময় পায় নি। সত্যি বলছি আমি। বিশ্বাস কর।” মেঘ বিরক্তির স্বরে বলল, “আমি আপনাকে বিশ্বাস করি না।”

আবির চোখের বর্ণ কিছুটা পরিবর্তন হতে শুরু করেছে। আবির ভ্রু কুঁচকে পুনরায় প্রশ্ন করল, “তুই আমায় বিশ্বাস করিস না?” “নাহ।” “একটুও করিস না?” “না” “সত্যি? ” “হুম” “যেখানে বিশ্বাস নেই সেখানে আবিরের কোনো কথাও নেই। ” আবির চলে যেতে নিলে মেঘ মুচকি হেসে বলে, “একটু একটু বিশ্বাস করি। ” ” একচিমটি বিশ্বাসের কোনো প্রয়োজন নেই, চোখ বন্ধ করে আমায় বিশ্বাস করতে পারলে তবেই বলিস। আবির কারো অবিশ্বাসের পাত্র হয়ে থাকতে চাই না। ” মেঘ আহাম্মকের মতো চেয়ে আছে। সামান্য কথাতে আবির ভাই এভাবে রেগে যাবে মেঘ সেটা ভাবতেও পারে নি। আবির রাগে ব্যাগ নিয়ে নিজের রুমের উদ্দেশ্যে বেড়িয়ে পরেছে । রাত ১১.৫০ নাগাদ মেঘ চুপিচুপি আবিরের রুমের সামনে এসেছে। ড্রয়িং রুমের একটা লাইট ব্যতিত পুরো বাড়ির লাইট অফ। ১২ টায় নিউ ইয়ার। এজন্যই মূলত আবির ভাইকে বেশি মিস করছিল। কল দিয়েই বলতো কিন্তু আবিরের কন্ঠ শুনে নিজেকে স্বাভাবিক রাখতে পারে নি। বুকের ভেতরের অভিমানের পাহাড় গলতে শুরু করেছিল। নতুন বছর প্রিয় মানুষের সঙ্গে কাটাবে ভেবেই সন্ধ্যায় ছাদ থেকে অনেকগুলো ফুল এনে সেগুলোকে সাজিয়েছে। সাথে একটা সুন্দর গিফটকার্ড বানিয়ে তাতে ডিজাইন করে “Happy New Year” ও লিখেছে সাথে সুন্দর একটা চাবির রিং কিনে এনেছে । মানুষ বলে বছরের প্রথম দিন যেভাবে কাটে সারাবছর নাকি সেভাবেই কাটে। কুসংস্কার জেনেও মেঘের ইচ্ছে সে আবিরের সাথে নতুন বছর শুরু করবে। গিফটগুলো

নিয়ে আস্তে করে দরজা ধাক্কা দিতেই চোখ পরে বিছানার দিকে। সামান্য আলোতে আবিরের নাক আর কপাল দেখা যাচ্ছে। লেপে ঢাকা সম্পূর্ণ শরীর। মেঘ সেখানে দাঁড়িয়েই পায়ের নুপুর দুটাকে নিচ থেকে হাত দিয়ে উপরে তুলে পায়ের মাংসল অংশে আঁটকে দিয়েছে যেন হাঁটলে শব্দ কম হয়। খুব সতর্কতার সহিত পা রাখলো রুমের মধ্যে। গিফট গুলো যত্নসহকারে টেবিলের উপর রেখে তাকালো আবিরের অভিমুখে। গত তিনদিন ঠিকমতো ঘুম খাওয়া কিছুই হয় নি। ক্লান্তিতে আবিরের চোখের পাতা বারবার বন্ধ হয়ে আসছিল তাই রুমে এসে শাওয়ার নিয়েই শুয়ে পরেছে। মেঘ আবিরের মাথার কাছে দাঁড়ানোতে আবিরের থুতনি পর্যন্ত দেখা যাচ্ছিলো। থুতনির নিচ থেকে বাকি শরীর লেপের নিচে ঢাকা। মেঘের বুকে চাপা অভিমান দীর্ঘশ্বাস হয়ে বেড়িয়ে আসছে। সঙ্গে সঙ্গে ঢোক গিলে নিজের নাক-মুখ চেপে ধরল। একবার আবির ভাই বলেছিল, “নিঃশ্বাসের শব্দে আমি তোর অস্তি*ত্ব উপল*ব্ধি করতে পারি” পুরোনো কথাটা মনে পড়তেই নাক-মুখ চেপে ধরেছে। এবার আর কোনোভাবেই ফাঁসা যাবে না। মন বারবার চলে যেতে বলছে অথচ মেঘ দৃষ্টি সরাতে পারছে না। আবির ভাইয়ের ঘুমন্ত, মায়াময় চেহারার পানে মুগ্ধ আঁখিতে চেয়ে আছে। যে মানুষটার উপস্থিতি হৃদয়ে তোলপাড় চালায়, যার শাণিত দৃষ্টি হৃদয়টাকে ক্ষতবিক্ষত করে সেই মানুষটা কি সুন্দর ঘুমিয়ে আছেন! অষ্টাদশীর মনের রাজ্যে অনুভূতিরা সব অভিমান ভুলে নবরূপে সেই শ্যামবর্ণের পুরুষের প্রেমে পড়তে বাধ্য হয়েছে। স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে মনে মনে

বিড়বিড় করে বলল, “আপনি এত কিউট কেন? মনে হয় আল্লাহ আপনাকে বানানোর সময় কিউটনেসের ডিব্বা আপনার উপর ঢেলে দিয়েছিল।” বেলকনি দিয়ে আসা কনকনে ঠান্ডা বাতাস গায়ে লাগতেই শরীরের লোম দাঁড়িয়ে পরেছে। সেই সঙ্গে মেঘও কেঁপে ওঠে। এই ঠান্ডায় বেশিক্ষণ এখানে থাকা যাবে না। শরীরের কম্পনের শব্দেই আবির ভাই সজাগ হয়ে যাবে। বারবার যেতে চাইছে কিন্তু ঘুমন্ত আবির ভাইকে দেখার লোভ সামলিয়ে যেতে পারছে না। কে বলবে এই মেয়ে গত ৯ বছর যাবৎ আবিরকে সহ্য ই করতে পারতো না। আবির বাড়ি ফিরেছে সবেমাত্র ৬ মাস হয়েছে। এতেই আবিরের প্রতি পুরোপুরি আসক্ত হয়ে পরেছে। যে মেয়ের রাগ আর জেদের কাছে খান বাড়ির প্রতিটা সদস্য হার মানতো সেই মেয়ের রাগ-অভিমান এখন আবিরের রাগের সামনে তুচ্ছ। ভালোবাসা বোধহয় এমনই হয়, শতরাগের পরও প্রিয় মানুষটার উপস্থিতি হৃদয় প্রশান্ত করে তুলে। দেয়াল ঘড়ির টিনটিন শব্দে মেঘের ঘোর কাটে, ঘাড় ঘুরিয়ে সেদিকে তাকিয়ে দেখল ঘড়িতে ১২.০০ বাজে। বুক ধুকপুক করতে শুরু করেছে। মনে অপরাধমূলক কাজ করার নিষিদ্ধ ইচ্ছে জেগেছে। বুক ফুলিয়ে অনেকটা শ্বাস টেনে নিঃশ্বাস আঁটকে আবিরের কপাল বরাবর মুখ এগিয়ে নিল, উদ্দেশ্য আবিরের কপালে চুমু খাবে। একটু সামনে এগুতেই বুকের ভেতরটা অস্বাভাবিকভাবে কাঁপতে শুরু করেছে। অষ্টাদশী বুঝতে পারছে এই কাজ তার পক্ষে সম্ভব না। ঘনঘন নিঃশ্বাস ফেলতে শুরু করেছে। নিজেকে সামলাতে বাম হাত দিয়ে মুখ চেপে

চলে যাওয়ার জন্য পা বাড়াতে যাবে ওমনি ডানহাতে টান অনুভব করে। কয়েক সেকেন্ডের ব্যবধানে নিজেকে বিছানায় আবিষ্কার করল। আবির মেঘের ডানহাতে জোরে টান দেয়ায়, মেঘ আবিরের উপর এসে পরে, তৎক্ষনাৎ মেঘকে উপর থেকে পাশে সরিয়ে আবিরের গায়ের লেপ দিয়ে মেঘের গা ঢেকে দিয়ে মেঘের কাঁধের দুপাশে দু'হাতে ভর দিয়ে মেঘের মুখোমুখি উপুড় হয়ে শুয়েছে । আবিরের শরীরে না আছে লেপ না আছে শীতের ভারী কোনো জ্যাকেট। একটা টাওজার আর ফুলহাতা টিশার্ট পড়নে। মেঘ দাঁতে দাঁত চেপে ধরে আছে, বন্ধ দু'চোখের পাতা। হাত খোঁপায় বাঁধা চুলগুলো খুলে এলোমেলো হয়ে আছে, দুহাতে বেলীফুলের মালা। বেলীফুলের সুবাস ছড়াচ্ছে রুমে। নিশ্চুপ আবির, দৃষ্টি মেঘেতে নিবদ্ধ। মেঘ নিভু নিভু চোখে তাকাতেই আবিরের ঘনিষ্ঠতা উপলব্ধি করল। পুনরায় চোখ বন্ধ করে ফেলেছে। অষ্টাদশীর হৃৎস্পন্দনের মাত্রা বেড়েছে কয়েকগুন। বেলীফুলের সুবাসের সঙ্গে আবির ভাইয়ের শরীর থেকে আসা তীব্র ঝাঁঝালো গন্ধে মাতোয়ারা হয়ে যাচ্ছে। আবির ভাইয়ের এত কাছাকাছি আসায় মেঘের শরীরের রক্ত সঞ্চালন বেড়ে যাচ্ছে, অজানা শিহরণ বইছে শরীরে। আবিরের আঁখি যুগলে ঘুম লেপ্টে আছে। শান্তিময় ঘুমের দেশে নিমগ্ন ছিল আবির। কিন্তু অষ্টাদশীর অনাদেয় কর্মকান্ড আবিরের গভীর ঘুমের ব্যাঘাত ঘটিয়েছে। আবির ঘুমঘুম চোখেই মেঘকে দেখছে। মেঘ কয়েকবার ঢোক গিলে ভয়ে ভয়ে চোখ মেলল। চোখাচোখি হলো আবিরের সঙ্গে। লেপের ভেতর মেঘের শরীর ঘামতে শুরু করেছে।

বুকের ভেতর প্রবল ঝড় বইছে। মেঘ চোখ নামিয়ে বলতে চেষ্টা করল, “আ...আমা....আমার...” আবির একহাতে শরীরের সম্পূর্ণ ভর ফেলে অন্যহাতের আঙ্গুল দিয়ে মেঘের ঠোঁট স্পর্শ করল। ওমনি মেঘ পাথর বনে গেল। আবিরের দৃষ্টি, স্পর্শ কোনোকিছুই আজ স্বাভাবিক নয়। অষ্টাদশীর মস্তিষ্ক জোড়ে চিন্তারা ঘুরপাক খাচ্ছে। কি হতে চলেছে তার সাথে? একদিকে আবির ভাইয়ের কাছে ধরা পরার ভয় অন্যদিকে আবির ভাইয়ের এত কাছে আসা। প্রচন্ড অস্বস্তিতে ভুগছে মেঘ। দীর্ঘকালীন নিরবতা ভেঙে আবির ঘুমঘুম কণ্ঠে বলল, ” নিষেধ অমান্য করার শাস্তি তবে দিতেই হচ্ছে। ” মেঘ বিপুল চোখে তাকিয়েছে। শরীরের কম্পন তীব্র থেকেও তীব্রতর হচ্ছে। ভয়ে নাক ঘামছে। আবির ঠোঁটের উপর থেকে আঙুল সরিয়ে মেঘের নাকের ঘাম মুছে পুনরায় কাঁধের পাশে হাত রাখল। মেঘের গলা ভার হয়ে আসছে, কথা আঁটকে যাচ্ছে, জোরপূর্বক বলল, “Sorry!” “এসব সরি-টরিতে আবিরের মন গলানো সম্ভব না। আগেই সাবধান করেছিলাম, অঘটন ঘটলে আমি দায়ী না। তারপরও কথা মানিস নি, ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে এসেছিস। ” মেঘ ভয়ে ভয়ে বলল, “প্লিজ ছাড়ুন।” আবির ভ্রু কুঁচকে বলল, “ধরিই তো নি। ছাড়বো কেমন করে?” “সরুন, আমি যাব।” “এত সহজে তো সরছি না, ম্যাম। আপনি অপরাধ করেছেন শাস্তি আপনাকে পেতেই হবে। ” মেঘ চোখ বন্ধ করে ফেলেছে। আজ তারসঙ্গে কি হতে চলেছে সে নিজেও জানে না। এদিকে আবির দু’হাতে ভর রেখেই অষ্টাদশী মুখোমুখি এগিয়ে যাচ্ছে। দু’জোড়া ওষ্ঠের

মাঝে শুধু কয়েক সেন্টিমিটারের ব্যবধান। মেঘের চোখ বন্ধ, ক্রমাগত কাঁপছে ওষ্ঠদ্বয়। তখনই আবিরের ফোনের রিংটোন বেজে উঠলো রিংটোনের শব্দে আবির মেঘের কাছ থেকে সরে শুয়া থেকে উঠে বসলো। মেঘের এলোমেলো চুলের নিচে আবিরের ফোন। মেঘ মাথা তুলে হাত বাড়িতে ফোনটা হাতে নিয়ে স্ক্রিনে তাকাতেই দেখল, "Mala" নামে সেইভ করা নাম্বার থেকে কল আসছে। ফোন এগিয়ে দিল আবিরের দিকে। মেঘের লজ্জায় লালিত মুখমণ্ডল মুহূর্তেই বদলে গেছে। ক্রোধে চোখ দুটি জ্বলছে। মালা নাম দেখে আবির সাইলেন্ট করে ফোন পাশে রেখে দিয়েছে। মালা আপু রাতবিরেতে আবির ভাইকে কল করে এটা মেঘ সহ্যই করতে পারছে না। গা থেকে লেপ সরিয়ে বিছানা থেকে নামতেই আবির আলতোভাবে মেঘের হাত ধরে। কিন্তু মেঘ রাগে এক ঝটকায় আবিরের হাত ছাড়িয়ে গজগজ করতে করতে রুম থেকে বের হয়ে যাচ্ছে, আবির তপ্ত স্বরে বলল, "শাস্তিটা তোলা রইলো পরের বার ছাড় দিব না।" মেঘ রাগে আবিরের দিকে তাকিয়েছে। দরজা টা ঠাস করে লাগিয়ে রুমে চলে গেছে। মালা আপু আবির ভাইকে পছন্দ করে। হয়তো আবির ভাই পছন্দ করেন না। মীমের বলা ঘটনা যদি সত্যি হয় তবে মালা আপুর হাতে "Ashik" নাম আবির ভাই ই লিখিয়েছেন আর সেই কাজ মেঘের জন্য ই করেছেন। মেঘ সবই বুঝতে পারছে। কিন্তু এত রাতে মালা আপুর কল দেয়া সে মেনে নিতে পারছে না। আজ মেঘ দেখেছে বিধায় রাগ করছে, সবসময় তো সে দেখে না। "তবে কি প্রতিদিনই মালা আপুর

সঙ্গে আবির ভাইয়ের কথা হয়?” মেঘের রাগ বেড়েই চলেছে। মালা আপুর থেকেও আবির ভাইয়ের প্রতি বেশি রাগ হচ্ছে। কেটে গেল কিছুদিন। মেঘ ইদানীং আবিরকে ইগ্নোর করে চলে। আবির ভাইকে দেখলেই মালা আপুর কথা মনে হয় আর রাগে ফুঁসতে থাকে। আজ সভাপতি নির্বাচন। সভাপতি নির্বাচনের সময় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে জনপ্রিয়তাকেই প্রাধান্য দেয়া হয় তবে তানভিরদের ক্ষেত্রে বিষয়টা একটু ঝামেলার। যেমন বর্তমান সভাপতি আর তানভির দুজনের জনপ্রিয়তায় প্রায় সমান সমান। তবে কাজের প্রতি দায়িত্ববোধ, কথা বলার দক্ষতা, জনসাধারণের প্রতি আচরণ এসব ক্ষেত্রে সভাপতির থেকেও তানভির এগিয়ে আছে। তাছাড়া এমপির পছন্দের প্রার্থীও তানভির। তানভির আর আবির দুজনকেই বলেছিল, এমপি কথা বলে সরাসরি সভাপতি পদ তানভিরকে দিয়ে দিবে। কিন্তু দুভাইয়ের কেউ ই রাজি হয় নি। জিতলে নির্বাচন করেই জিতবে। সকাল সকাল দুভাই বেড়িয়ে গেছে। বাড়ির মহিলারা যেমন দুশ্চিন্তা করছে, তেমনি তানভিরের আব্বু মোজাম্মেল খানও চিন্তায় আছেন। হাজার হোক একমাত্র ছেলে বলে কথা। উপরে যতই রাগ দেখাক না কেন, ছেলে যেই কাজ করছে সেটাতে যেন সফল হতে পারে সেই দোয়ায় করছেন তিনি। ২-৩ বার আবিরকে কল দিয়ে খবর ও নিয়েছেন। সারাদিন না খেয়ে ফলাফলের অপেক্ষায় বসে আছেন। সন্ধ্যার পর পর আবির মিষ্টি নিয়ে বাসায় ফিরেছে। আবিরের পিছন পিছন তানভিরও প্রবেশ করল। সোফায় তিনভাই, আদি বসে আছে। মেঘ আর মীম ডাইনিং এ বসে

গল্প করছিল। আবির ঢুকতেই ইকবাল খান শুধালেন, “খবর কি?” আবির হাসিমুখে বলল, “আলহামদুলিল্লাহ।” তিনভাই ই একজোটে বললেন, “আলহামদুলিল্লাহ।” মেঘ আর মীম দুজনেই ছুটে এসে তানভির কে প্রশ্ন করে, ” জিতছো?” তানভির হেসে উপরনিচ মাথা নাড়ে। “Congratulation Vaiya” “Thank you bonu, আজ থেকে তোর নতুন পরিচয়। তুই জেলা ছাত্রলীগের সভাপতির বোন।” মীম গাল ফুলিয়ে প্রশ্ন করল, “আর আমি?” “তোকেও কি আলাদা করে বলতে হবে? আচ্ছা ঠিক আছে তুই ও সভাপতির বোন।” মীম আস্তে করে বলে, ” ট্রিট দিবা না?” “অবশ্যই দিব।” আম্মু, বড় আম্মু, কাকিয়া সবাই তানভিরকে অভিনন্দন জানাচ্ছে। তানভির ভয়ে আছে কখন জানি আব্বু বা বড় আব্বু লেকচার দেয়া শুরু করেন। আবির মায়ের হাতে মিষ্টির বক্সগুলো দিয়ে সবাইকে মিষ্টি দিতে বলল। তানভির সিঁড়ি পর্যন্ত যেতেই মোজাম্মেল খান ভারী কণ্ঠে বললেন, “মিষ্টি ভাবি কেন দিবে, তানভিরের উচিত সবাইকে মিষ্টি মুখ করানো।” তানভির আঁতকে উঠে। আব্বু তাকে মিষ্টি খাওয়াতে বলছে, ভাবা যায়। তানভির হাসিমুখে মিষ্টির বক্সগুলো থেকে একটা বক্স হাতে নিয়ে বড় আব্বু, আব্বু, কাকামনি, বড় আম্মু, আম্মু, কাকিয়া, আবির,মেঘ, মীম,আদি সবাইকেই নিজের হাতে মিষ্টি খাইয়ে দিয়েছে। সেই সঙ্গে বড় আব্বু আর আব্বুর সঙ্গেও বেশকিছুক্ষণ কথা বলেছে। তানভির ভেবেছিলাম রাজনীতির জন্য তাকে নিজের বাড়িতে সবসময় চোরের মতো চলতে হবে অথচ আব্বু, বড় আব্বু এত সুন্দর ভাবে

সাপোর্ট দিচ্ছে যে সে অভিভূত হয়ে যাচ্ছে। মেঘ রুমে গিয়েই তানভিরের সঙ্গে একটা ছবি খোঁজে বের করে ফেসবুকে অভিনন্দন পোস্ট করেছে। সেই পোস্টে মেঘের সব বান্ধবীরা লাইক কমেন্টস করছে, বন্যাও Congratulation লিখে কমেন্ট করেছে। পরক্ষণেই মনে হলো তানভির ভাইকে কল দেয়া উচিত। কিন্তু সাহস পাচ্ছে না, কি না কি মনে করে এসব ভেবে অবশেষে কল করলো। প্রথমবারে রিসিভ হলো না। দ্বিতীয়বার রিসিভ হলো। "আসসালামু আলাইকুম। " "ওয়ালাইকুম আসসালাম।" "হঠাৎ কি মনে করে কল দিলে?" "Congratulation" তানভির ঠাট্টার স্বরে বলল, "বাব্বাহ! তুমি আমায় অভিনন্দন জানাবে তা তো কল্পনাও করতে পারছি না।" "না মানে, মনে হলো জানানো উচিত। " "যাক বাবা, মনে তো হইছে। Thank you so much." "এখন রাখি।" "শুনো" "জ্বি বলুন।" "আগামীকাল ফ্রী আছো?" "কেন?" "ছোটখাটো একটা ট্রিট দিতাম।" " শুধু শুধু ট্রিট দেয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। " "শুনো মেয়ে, ট্রিট দেয়া কখনো প্রয়োজনের আওতায় পরে না। এটা যার যার ইচ্ছে থেকে আসে। বিকেলে কল দিব রেডি থেকো।" "শুনেন।" "বলো" "আমি কিন্তু একা যাব না।" "তো কাকে নিয়ে আসবা?" " ট্রিট দিলে মেঘ আর আমাকে একসঙ্গে দিতে হবে। আমি একা যাব না।" "ঠিক আছে, তোমাদের ক্লাস শেষ হওয়ার আগেই আমি ভার্সিটির সামনে থাকবো।" "আচ্ছা, আল্লাহ হাফেজ। " "আল্লাহ হাফেজ।" কল কেটেই বন্যা মেঘকে কল দিয়ে সবকিছু জানিয়েছে। মেঘ আর বন্যা

দু’জনেই আজ সকাল সকাল বেড়িয়েছে। তানভিরের জন্য গিফট কিনবে সেটা রাতেই প্ল্যান করে রেখেছিল, দুজনে ঘুরেফিরে গিফট কিনে তারপর ভার্সিটিতে এসেছে। ততক্ষণে সাদিয়া, মিষ্টি, মিনহাজ, তামিম চলে আসছে। দুএকটা কথা বলে মেঘ আর বন্যা ক্লাসে চলে গেছে। মিনহাজ আর তামিম দুজন বাহিরের দাঁড়িয়ে আছে। মিনহাজের মেঘকে সেই প্রথমদিন থেকে পছন্দ হলেও তামিম বন্যার উপর ঐরকম ভাবে ক্রাশ খায় নি। তবে মিনহাজ আর তামিম সর্বক্ষণ একসাথে থাকায়, দুই বন্ধু কথা বলতে বলতে একসময় কথা উঠে বন্যার বিষয়ে।মিনহাজ আর তামিম যেমন বেস্ট ফ্রেন্ড, মেঘ আর বন্যাও তেমন বেস্ট ফ্রেন্ড। মিনহাজ যেহেতু মেঘকে পছন্দ করে, তাদের সম্পর্ক হলে সেই সাথে বন্যা আর তামিমের জুটি হলে তাদের বেশ মানাবে এসব ভেবেই মূলত বন্যার প্রতি কিছুটা সিরিয়াস হয়েছে। এখন মিনহাজ তামিমকে বুঝাচ্ছে, যেন বন্যাকে আজকেই প্রপোজ করে। মেঘ যেহেতু আবিরকে পছন্দ করে তাই মেঘকে হুটকরে প্রপোজ করতে গেলে কখনোই মানবে না বরং বন্ধুত্ব ভেঙে যেতে পারে। তবে বন্যার এখন পর্যন্ত কারো প্রতি কিছুই শুনে নি তাই মিনহাজ তামিমকে একপ্রকার জোর করছে যেন বন্যাকে প্রপোজ করে। ক্লাস শেষ হওয়া মাত্র ই মেঘ আর বন্যা গল্প করতে করতে বেড়িয়ে পরেছে। তামিমও তাদের সঙ্গে হাঁটছে। একসময় তামিম বন্যাকে ডাকল, দুজনেই থেমে গেল। বন্যা স্বাভাবিক কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, “কিছু বলবি?” “হ্যাঁ!” “বল” “দেখ বন্যা, আমি এত ঘুরিয়ে

পেঁচিয়ে কথা বলতে পারি না। তোর সঙ্গে প্রায় অনেকদিনের বন্ধুত্ব। তুই, মেঘ দুজনেই খুব ভালো আর আন্তরিক। তবে ইদানীং আমার তোর প্রতি অন্যরকম অনুভূতি কাজ করছে যেটা বন্ধুত্বের থেকেও বেশিকিছু। তুই যদি রাজি থাকিস তাহলে বন্ধুত্বের সম্পর্কের পাশাপাশি আমরা ভালোবাসার সম্পর্কে জড়াতে পারি।" মেঘ হা হয়ে তাকিয়ে আছে। প্রথমবারের মতো কেউ বন্যাকে প্রপোজ করছে দেখে মেঘ খুব মজা নিচ্ছে । কোচিং চলাকালীন বন্যা বলেছিল প্রেম করলে ভার্সিটিতে উঠে করবে, ভার্সিটিতে এটায় প্রথম প্রপোজাল। বন্যা কিছুক্ষণ নিরব থেকে স্বাভাবিক ভঙ্গিতেই বলতে শুরু করল, "তোর মনে অনুভূতি জেগেছে তা আমায় জানিয়েছিস কিন্তু আমার মনে তোর প্রতি এরকম কোনো অনুভূতি নেই। আমি এখন কোনোরকম সম্পর্কে জড়াতে চাই না, আর সমবয়সী কোনো ছেলের সাথে তো নয় ই। তোকে বন্ধু ভেবেছি সবসময় তাই ভাববো। এর বেশি কিছু ভাবা আমার পক্ষে সম্ভব না। সরি। " বন্যা চলে যাচ্ছে। মেঘ আহাম্মকের মতো তাকিয়ে থেকে সেও বন্যার পিছু নিল। তামিম ছেলে হিসেবে খারাপ না। দেখতেও মাশাআল্লাহ। দুজনকে মানাবেও ভালো। মেঘ ভেবেছিল হয়তো বন্যা রাজি হয়ে যাবে, না হয় ভাবার জন্য সময় নিবে। কিন্তু সরাসরি না করাতে মেঘ বেশ অবাক হয়েছে। মেঘ গেইট পর্যন্ত ছুটে আসতেই তানভিরকে দেখল। আজ সে গাড়ি নিয়ে এসেছে। মেঘকে ছুটতে দেখে গম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন করল, "ছুটছিলি কেন?" "এমনি। " বন্যার চোখে মুখে কিঞ্চিৎ রাগ। তানভির দুজনকেই এক পলক দেখে,

পুনরায় প্রশ্ন করল, “কি হয়েছে বনু? কোনো সমস্যা?” “না না। সমস্যা নেই। ” ” বল কি হয়ছে” “Actually, আমাদের একটা ফ্রেন্ড বন্যাকে মাত্রই প্রপোজ করেছিল। ”মেঘ মুখে হাসি রেখে খুব সহজভাবে কথাটা বললেও তানভির সেটাকে সহজ ভাবে নিতে পারে নি। তানভিরের দুচোখ সরু হয়ে আসে, ভ্রু জোড়ার মাঝে কয়েকস্তর ভাঁজ হয়ে গেছে। চোখের শিরা-উপশিরার বর্ণ পরিবর্তন হতে শুরু করেছে । তানভির অত্যন্ত গুরুতর কণ্ঠে প্রশ্ন করল, “কে?” মেঘ স্বাভাবিকভাবেই মজার ছলে উত্তর দেয়, “তামিম। ” সহসা তানভির ডানহাত মুষ্টিবদ্ধ করতে করতে গেইটের দিকে তাকায়, তানভিরের দৃষ্টি অবিরত তামিমকে খোঁজছে । কিন্তু তামিম কোথাও নেই। বন্যা আর মেঘ কথা বলে চলে আসলেও তামিম সেখানেই দাঁড়িয়ে পরেছিল। এইভাবে বন্যা রিজেক্ট করে দিবে এটা সে কোনোক্রমেই ভাবতে পারে নি। ভেবেছিল বন্যা হয়তো একটু সময় নিবে। কিন্তু না! মিনহাজ তামিমকে সান্ত্বনা দিতে ব্যস্ত। তানভির গলা খাঁকারি দিয়ে ঢোক গিলল। নিজের রাগ নিয়ন্ত্রণ করতেই মূলত এমনটা করা। রক্তচক্ষু ঢাকতে পকেটে রাখা সানগ্লাসটা চোখে দিয়েই বন্যার দিকে তাকালো। বন্যা মাথানিচু করে শান্ত মেয়ের মতো দাঁড়িয়ে আছে, বাহিরে শান্ত থাকলেও তার মনের ঝড় চলছে। এই ঝড় প্রবল রাগের কারণে সৃষ্টি হয়েছে। ভার্সিটিতে উঠে জীবনে প্রথমবারের মতো দুটা ছেলে বন্ধু হয়েছে। কয়েকমাসের বন্ধুত্বেই তামিম এভাবে প্রপোজাল দিয়ে দিল। যতবার মনে পড়ছে ততবার রাগে বন্যার নাক ফুলে

উঠছে। তানভির গাড়ির দরজা খুলে গম্ভীর কণ্ঠে বলল, “গাড়িতে বস। আমি আসছি। ” মেঘ গাড়িতে বসতে বসতে জিজ্ঞেস করল, “কোথায় যাবে ভাইয়া?” “কাজ আছে ” তানভির ফোন চাপতে চাপতে ভার্সিটির মেইন গেইট পেরিয়ে ভেতরে ঢুকলো। ৫ মিনিটের মধ্যেই ফিরে আসছে। চোখে এখনও সানগ্লাস পড়া। গাড়ির ড্রাইভিং সিটে বসে ফোনটা গাড়ির সামনের দিকে ছুঁড়ে ফেলে, গাড়ি স্টার্ট দিল। সানগ্লাসের কারণে চোখ দেখা না গেলেও মুখবিবরে আঁটকে রাখা নিঃশ্বাসের কারণে গাল দুটো অনেক বেশি গুলুমুলু দেখা যাচ্ছে। মেঘ বন্যাকে এটা সেটা বলে হাসানোর চেষ্টা করছে। তামিমের বিষয়টা বন্যা সিরিয়াসলি নিলেও মেঘ এত সিরিয়াসলি নেয় নি বরং খুব মজা পেয়েছিল। কিন্তু বন্যাকে সে এভাবে মুড অফ করে থাকতে দিবে না। তাই রাজ্যের যত আজগুবি কাহিনী বানিয়ে বানিয়ে বন্যাকে বলছে। একপর্যায়ে বন্যার সব রাগ মেঘের আজগুবি গল্পের কাছে হার মেনে নিয়েছে। বন্যা হাসতে হাসতে পেট চেপে ধরেছে। সেই সাথে মেঘও হাসছে। তানভির গাড়ির মিররের দিকে তাকিয়ে দুজনের স্বতঃস্ফূর্ত হাসি দেখে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে আবারও মুখ ফুলিয়ে শ্বাস টানলো। দুই বান্ধবীর হাসি থামার নাম ই নেই। আজ যে ড্রাইভারের বদলে তানভির গাড়ি চালাচ্ছে এদিকে মেঘের কোনো হুঁশ নেই। আচমকা বন্যার নজর মিররে পড়তেই আঁতকে উঠে মেঘের হাত চেপে ধরে। শেষ! তানভিরের গুরুগম্ভীর চেহারা দেখে দুই বান্ধবীর হাসি গায়েব। চোখে- চোখে ইশারায় কথা বলছে। তখনই তানভিরের ফোনে কল

আসে। কল টা রিসিভ করে লাউডস্পিকারে রেখে দেয়। আবির স্বাভাবিক কণ্ঠে প্রশ্ন করে, “কোথায় আছিস?” আবিরের কণ্ঠ শুনে মেঘ নড়েচড়ে বসে। বিড়বিড় করে বন্যাকে বলে, “এইযে হিট*লা*র কল দিয়ালছে।” তানভিরের গুরুতর কণ্ঠের জবাব, “রাস্তায়। ” আবির উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, “আমার ব...” ওমনি তানভির লাউডস্পিকার অফ করে এক হাতে ফোন কানে ধরেছে। দু-একটা কথার জবাব দিল কি না, তানভির গম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন করল, “তোমাকে আমি কতগুলো টেক্সট করেছি, তুমি কি সেগুলো দেখো নি?” আবিরের উত্তর শুনা গেল না। তানভির কিছুটা রাগান্বিত কণ্ঠে বলল, “সেগুলো দেখে দ্রুত রিপ্লাই করো। রাখছি।” বন্যা আর মেঘ দুজনেই মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। কারো মুখে কোনো কথা নেই। কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা একটা রেস্টুরেন্টে ঢুকল। মেঘদের বসিয়ে তানভির সোজা ফ্রেশ হতে চলে গেছে। চোখে-মুখে পানি দিয়ে টিস্যু দিয়ে হাত মুখ মুছতে মুছতে ওদের বিপরীতে বসে। সেই ভার্সিটির সামনে সানগ্লাস পরেছিল সেটা সবেমাত্র খুলেছে। মেঘ খাবারের কথা বলতে গিয়ে তানভিরের দিকে তাকাতেই ভয় পেয়ে যায়। করুণ স্বরে আর্তনাদ করে উঠে, “ভাইয়া তোমার চোখ এত লাল কেন?” মেঘের আর্তনাদে বন্যাও সেদিকে তাকায়। চোখাচোখি হয় দুজনের। তানভিরের চোখের প্রতিটা শিরা-উপশিরা রক্তাভ হয়ে আছে। তা দেখে বন্যাও ভয় পেয়ে গেছে। দৃষ্টি সরিয়ে নিয়েছে বন্যা। তানভির ও অন্যদিকে তাকিয়েছে। কিন্তু মেঘ অনর্গল প্রশ্ন করেই যাচ্ছে, “তোমার চোখে কি কিছু পড়েছে? তুমি কি

অসুস্থ? কিছু হয়ছে? রাগ উঠছে? কোনো বিষয় নিয়ে আপসেট? ”
বোনের অবিরাম প্রশ্নের উত্তরে তানভির শুধু বলল, “চোখে-মুখে পানি দিয়েছি, হয়তো তারজন্য। ” মেঘ সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখার চেষ্টা করছে। ভ্রু যুগল কুঁচকে আছে। সে আবিরের রাগান্বিত চোখও দেখেছে। কিন্তু এতটা ভয়ানক নয়। মেঘ পুনরায় বলল, ” পানি দিলে চোখ এত লাল হয়? আমায় বেক্কল পাইছো? ভালো করে তাকাও তো দেখি!” তানভির টেবিল থেকে সানগ্লাস নিয়ে পুনরায় চোখে দিয়ে ভারী কণ্ঠে বলল, “হয়েছে, এত ডাক্তারি করতে হবে না। ” মেঘ ভেঙচি কেটে ঢং করে বলল, “আমার ভাইয়ের ব্যাপারে আমি ডাক্তারি করবো না তো কে করবে শুনি? অবশ্য তুমি চাইলে অন্য ব্যবস্থাও করতে পারি। ”
তানভির কপাল গুটিয়ে প্রশ্ন করল, “কি ব্যবস্থা?” “আব্বুকে বলে একটা ডাক্তার ভাবি বাসায় নিয়ে আসব। তখন আর আমার ডাক্তারি করতে হবে না। চোখ লাল কেন, হাত কাটা কেন, মাথা ধরা কেন এ সবকিছুর চিকিৎসা ভাবিই করবে। ” তানভির ফোন রিসিভ করে উঠতে উঠতে বলল, ” হ্যাঁ! ডাক্তার মেয়ের বাপেরা তো আমায় মেয়ে দেয়ার জন্য বসে আছে। পাকামি বাদ দিয়ে খাবার শেষ কর। ”
তানভির কথা বলতে বলতে উঠে গেছে। বন্যা মেঘের দিকে তাকিয়ে ফিক করে হেসে উঠল। এতক্ষণ যাবৎ অনেক কষ্টে সে হাসি আঁটকে রেখেছিল। বন্যার হাসি দেখে মেঘ প্রশ্ন করল, “হাসছিস কেন?”
“তোদের কথা শুনে আমি কল্পনায় তোর ভাই আর ভাবিকে নিয়ে ভাবছিলাম। তোর ভাইয়ের যেই রাগ আর তেজ, কোন মহীয়সীর

কপাল যে পুড়বে আল্লাহ ভালো জানেন। ভাবি সকাল-সন্ধ্যা হাসপাতালে ভর্তি থাকবে। ” মেঘ গাল ফুলিয়ে শ্বাস ছেড়ে বলল, “তোরে বলছে ! আমার ভাই যতটা রাগী তার থেকে কয়েকগুণ বেশি কেয়ারিং। শুধু রাগী আর উগ্র মেজাজ হলে আমার মাইর খেয়ে সারাবছর হাসপাতালে ভর্তি থাকতে হতো। অথচ আমার ভাই আজ পর্যন্ত আমায় একটা থা*প্পড় পর্যন্ত দেয় নি।” বন্যা ঠাট্টার স্বরে বলল, “আমি বিশ্বাস করি না। সত্যি করে বল কয়দিন মাইর খাইছিস?” “সত্যি বলছি, একদিনও না। ” এরমধ্যে তানভির চলে আসছে। ভারী কণ্ঠে বলল, ” খেতে বসে এত কথা কি?” মেঘ পাস্তার পেট তানভিরের দিকে এগিয়ে দিয়েছে। তানভির খাবে না । মেঘদের খাওয়া শেষ করতে করতে কম করেও ৪-৫ বার ফোনে কথা বলার জন্য উঠে গিয়েছে। যতবার এসে বসেছে ততবার মেঘ এটা সেটা সেধেছে কিন্তু তানভির কিছুই নিচ্ছে না। অবশেষে মেঘ আর বন্যার জোরাজোরিতে তানভির একটা ড্রিংকস নিয়েছে। কালোরঙের গ্লাস ভেদ করে তানভির এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে বন্যার লালিত মুখমণ্ডলে। মেয়েটা আহামরি সুন্দরী নয়, তবে তার চোখের দিকে তাকালে মনে হয় উপচে পড়ছে তীব্র মায়া। ছোট থেকেই মেয়েটাকে দেখছে তানভির। কিন্তু কখনও ঐভাবে চোখ-মুখ খেয়াল করে নি। তবে ইদানীং মেয়েটার প্রতি অন্যরকম টান কাজ করে। রাত বিরেতে হঠাৎ ই তাকে দেখার সাধ জাগে। দেখা হলেও ঠিকমতো তাকাতে পারে না। চোখাচোখি হলে মেয়েটা লজ্জায় নুইয়ে যায়। মেয়েটার অস্বস্তি দেখে তানভিরও আর

তাকাতে পারে না। সামনে থাকলে তাকাতে পারে না ঠিকই কিন্তু চোখের আড়াল হলেই বুকের ভেতর ছটফটানি শুরু হয়ে যায়। যেই ছটফটানির বলে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। আজ মেঘ সাথে থাকায় বন্যা মেঘের সঙ্গে কথা বলায় ব্যস্ত। এই সুযোগে তানভির মুগ্ধ আঁখিতে বন্যাকে দেখেই যাচ্ছে। আচমকা তানভিরের দু'ঠোঁটের এক কোন কিঞ্চিৎ প্রশস্ত হয়। ফোন হাতে নিয়ে ফেসবুক টাইমলাইনে একটা পোস্ট করে, "তুমি আমার ক্ষয়িষ্ণু হৃদয়ের মায়াময় প্রশান্তি।" ওদের খাওয়া শেষ অনেকক্ষণ হলো। মেঘ কয়েকবার তানভিরকে চলে যাওয়ার কথা বলেছে। কিন্তু তানভির তার কথা কানেই তুলছে না। বন্যার বাসা থেকে কল আসছে, কথা শেষ করে বন্যা চেয়ার থেকে উঠতে উঠতে বলল, "আমি আসছি মেঘ। বাসায় যেতে হবে।" মেঘ ঘাড় কাত করে সম্মতি দিলেও তানভির হুঙ্কার দিয়ে উঠে, "এই মেয়ে, কোন সাহসে উঠে যাচ্ছো? বসো বলছি। " বন্যার সম্পূর্ণ দেহ একসাথে কম্পিত হয় সেই সাথে হৃৎস্পন্দন থেমে গেছে কয়েক সেকেন্ডের জন্য। ধপ করে চেয়ারে বসে পরেছে। নিঃশব্দে শ্বাস ছাড়ল। এমনভাবে সে কখনোই কারো ধমক খায় নি। ভয়ে কলিজা পর্যন্ত ঠান্ডা হয়ে গেছে। বন্যার সাথে মেঘও কিছুটা ভয় পেয়েছে। দু'জোড়া চোখ অসহায়ের মতো তানভিরের দিকে তাকিয়ে আছে। তানভির কপাল কুঁচকে বিরক্তির স্বরে বলল, "আমি যখন নিয়ে আসছি, বাসা পর্যন্ত আমি ই দিয়ে আসব। " বন্যা কণ্ঠস্বর খাদে নামিয়ে বলল, "ইমারজেন্সি বাসায় যাওয়া প্রয়োজন। " "কেন? বাসায়

যাওয়ার এত তাড়া কিসের? ” “নানু অসুস্থ। দেখতে যেতে হবে। ” “ওহ আচ্ছা । চলো তাহলে। ” “আমি একা.. ” তানভির গাড়ির চাবির রিং সহ হাতটাকে এমন ভাবে টেবিলের উপর রেখেছে, যে কাঁচ আর চাবির শব্দে আশপাশ স্তব্ধ হয়ে গেছে। সেই সঙ্গে বন্ধ হয়ে গেছে বন্যার অর্ধেক বলা কথাটাও। যথারীতি ওদের নিয়ে গাড়ি স্টার্ট দিল তানভির । কিছুদূর যাওয়ার পর থেকেই তীব্র যানজট । তানভির স্টিয়ারিং এ মাথা ঠেকিয়ে বসে আছে। তামিমের ঘটনা মাথা থেকে কোনোভাবেই সরাতে পারছে না। খানিক বাদে বাদে রক্ত টগবগ করে উঠছে। রাগ কন্ট্রোল করতে পারছে না আর সেই রাগের প্রভাব পরছে মেঘ আর বন্যার উপর। যানজট পেরিয়ে বন্যাকে বাসা পর্যন্ত এগিয়ে দিল। তারপর মেঘকে নিয়ে বাসায় আসছে। বাসায় ঢুকে এক গ্লাস পানি খেয়ে, ফ্রিজ থেকে বরফের টুকরো বের করে মাথায় দিতে দিতে বেরিয়ে পরেছে। হালিমা খান, আকলিমা খান এতবার ডাকলেন, কত প্রশ্ন করলেন কিন্তু তানভির নিরুত্তরে বেড়িয়ে গেছে। ঘন্টাখানেকের মধ্যেই তানভির আবিরের অফিসে আসছে। আশেপাশে না তাকিয়ে সরাসরি আবিরের কেবিনে হাজির হলো। চোখের সানগ্লাস টা খুলে টেবিলের উপর ছুঁড়ে ফেলে। আবির দীর্ঘ মনোযোগ দিয়ে ল্যাপটপে কাজ করছিল। আবিরের অপর পাশে টেবিলের পাশে দু’হাত রেখে কিছুটা ঝুঁকে রাগান্বিত কণ্ঠে হুঙ্কার দিয়ে উঠে, “আটকালে কেন আমায়?” আবির নিরুত্তর। তানভির পুনরায় বলা শুরু করে, “দুদিন হয় নি ঢাকা এসে মানুষের পাখনা গজাই গেছে। পাখনা দুটা আজই

পুড়াইয়া দিতাম। ঐ ছেলের বন্যাকে প্রপোজ করার সাহস হয় কি করে! তার বুকটা চিঁড়ে হৃদপিণ্ডটা মেপে দেখার অতীব ইচ্ছে আমার। আটকালে কেন আমায়? " আবির ল্যাপটপের দিকে তাকিয়ে থেকেই বলল, " বস। " "আমি এখানে বসতে আসি নি। তুমি মারবার জন্য নিষেধ কেন করেছো? ঐ ছেলের প্রতি এত দয়া কিসের তোমার? এখনও সময় আছে, একবার ওকে বলো!" আবির একটু উচ্চস্বরে পিএস কে ডাকলো। পিএস আসতেই স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, "একটা কোল্ড কফি দিতে বলো। সাথে কিছু নাস্তা আনানোর ব্যবস্থা করো।" "জ্বি ভাইয়া। " আবির পুনরায় ডাকল, "শুনো" "অন্য কাউকে না পাঠিয়ে বরং কষ্ট করে তুমি যাও। নাস্তার সাথে ভালো দেখে একটা ফুলের মালা নিয়ে আইসো। আর হ্যাঁ অবশ্যই সেটা যেন তাজা ফুলের মালা হয়। জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আমার অফিসে আসছে। কাগজফুলের মালা দিলে তো মানসম্মান থাকবে না। " "জ্বি আচ্ছা ভাইয়া। " বলে পিএস চলে গেছে। তানভির অগ্নিদৃষ্টিতে আবিরের দিকে তাকিয়ে আছে। পিএস বের হতেই তানভির রাগান্বিত কণ্ঠে চিৎকার চেচামেচি শুরু করেছে। আবির সেসবে পাত্তা না দিয়ে ল্যাপটপে কাজ করছে আর মিটি মিটি হাসছে। তাদের দু'ভাইয়ের দু রকম সমস্যা। আবিরের রাগ যখন কন্ট্রোলের বাহিরে চলে যায় তখন তার হাত পা স্থির থাকে না, কোনো ছেলের উপর রাগ উঠলে সেই ছেলেকে হাসপাতালে পাঠিয়ে তবেই শান্ত হয় আর পরিবার বা প্রিয়তমার উপর রাগ করলে সেই রাগ নিজের উপর দিয়ে যায়।

কখনও দেয়ালে অবিরাম ঘু*ষি দিয়ে নিজেকে ক্ষতবিক্ষত করে, কখনো বা শখের জিনিস গুলো ভেঙেচূড়ে একাকার করে ফেলে। অন্যদিকে তানভিরের স্বভাব উল্টো, মারপিটে তার তেমন আগ্রহ নেই। তবে আবির বিদেশে থাকাকালীন ভাইয়ার জন্য অনেকবার অনেককেই হালকা পাতলা মাইর দিতে হয়েছে। তবে খুব বেশি রাগ উঠলে তানভির প্রচুর চিল্লায়। যা মুখে আসে তাই বলতে থাকে, কাউকে পরোয়া করে না। তার কথায় লজিক থাকুক বা না থাকুক রাগ উঠছে মানে সে চিল্লাবেই। এই স্বভাব অনেকটা মেঘেরও আছে। বুঝক আর না বুঝক চিৎকার করে বাড়িঘর মাথায় উঠিয়ে ফেলবে। পুরো ১০ মিনিট তানভির গলা ফাটিয়ে চিৎকার চেচামেচি করেছে। অথচ আবির নিরব শ্রোতা। সে তার ভাইয়ের স্বভাব জানে। তানভিরের রাগ উঠেছে মূলত তামিমের উপর। এই রাগ আরও ২-৩ মাস আগে থেকেই। আবিরকে সে বেশকয়েকবার ওয়ার্ন করেছে। মারতেও চেয়েছে কিন্তু আবির প্রতিবার ই বাঁধা দিয়েছে। কথা বলে বা মেরেই হোক বিষয় টা সমাধান করে ফেললে আজ এই দিন দেখতে হতো না! অথচ আজও আবির নিরব, ছেলেকে কিছু বলতেও নিষেধ করেছে। এই রাগেই তানভির উল্টাপাল্টা চিল্লাচ্ছে।আবির তার কথায় মনোযোগ দিচ্ছে না দেখে তানভির হুট করে আবিরের ল্যাপটপ অফ করে দিয়েছে। আবির ভ্রু কুঁচকে বলে, ” কাজ টা শেষ করতে তো দিতি ” তানভিরের রাগ তিনগুণ বেড়ে গেছে, হুঙ্কার দিয়ে বলল, “কোনো কাজ করতে হবে না। তুমি আমার বিষয় সমাধান করে তারপর যা ইচ্ছে করবা।”

একপর্যায়ে তানভিরের মেজাজি কথাবার্তা শুনে সবাই আবিরের রুমের সামনে হাজির হয়ে গেছে। রাকিব নিজের রুমে থাকায় সে এই ঘটনার কিছুই শুনেনি। ২-১ জন বাধ্য হয়ে শেষমেশ রাকিবকে জানিয়েছে। রাকিব তৎক্ষনাৎ ছুটে আসে তানভিরের কথার জবাবে আবির হেসে বলে, "জ্বি জনাব। আপনি যা বলবেন তাই হবে। অনেকক্ষণ যাবৎ চিল্লাচিল্লি করছেন। অনুগ্রহ করে আপনি শান্ত হয়ে একটু বসুন। কফি টা খেয়ে, নাস্তা করে আবার শুরু করবেন। ঠিক আছে? " টেবিলের উপর থেকে একটা কাঠের বক্স দেয়ালে ছুঁড়ে মারে আর চিৎকার করে বললে, "কিচ্ছু ঠিক নেই। আর তুমিও ঠিক নেই!" ছুঁড়ে ফেলা বক্সটা দেয়ালে লেগে ফেরত আসে। এমন সময় রাকিব রুমে ঢুকে। তৎক্ষনাৎ না সরলে বক্সটা রাকিবের মাথায় লাগতো। রাকিব আঁতকে উঠে বলে, "তোরা দুই ভাই কি আমায় মা*রার প্ল্যান করছিস নাকি? কি হয়ছে তানভির?" তানভির ভারী কণ্ঠে বলে, " তোমার বন্ধু আমার ভাই হতে পারে না। এই আবিরকে আমি চিনি না। " "কেন কি হয়ছে?" তানভির পুনরায় বলল, "তোমার বন্ধুর দেশে ফেরার কারণ টা তোমার মনে আছে ভাইয়া? " "হ্যাঁ! জয়কে পিটাতে। " "এক ছেলেকে পেটানোর জন্য নিজের কাজ শেষ না করে, ইমার্জেন্সি টিকেট ম্যানেজ করে দেশে ফিরেছিল। আমরা কতবার বলেছিলাম জয়ের বিষয়টা আমরা দেখতে পারব।অথচ সে আমাদের কথা না মেনে দেশে ফিরেছে, ঐ ছেলেকে মেরে হাসপাতালে পাঠাইছে। টানা ৩ মাস ছেলে হাসপাতালে ভর্তি ছিল। ঐ ছেলের

অপরাধ ছেলে আমার বোনের সাথে কথা বলতে চেয়েছিল। কথা তো বলতে পারেই নি উল্টো হাত- পা ভাঙলো। অথচ তিনমাস হলো বনুরা দুটা ছেলের সঙ্গে চলাফেরা করে, কথা বলে এদিকে তার কোনো হুঁশ নেই। এ কোনোভাবেই আমার ভাই হতে পারে না। ” রাকিব মৃদু হেসে বলল, “এই বিষয় নিয়ে আমিও আবিরকে অনেকবার বলেছি। কিন্তু ও র মাথায় কি ঘুরতেছে এটা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। এইযে অফিসে আসে, নিজের মতো কাজ করে, কাজ শেষে চলে যায়। এমনিতে তো কোনো কথা বলেই না, কোনো কিছু দশবার জিজ্ঞেস করলেও উত্তর দেয় না।” তানভির কিছুক্ষণ নিরব থেকে আবিরের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ ই গম্ভীর কণ্ঠে বলে উঠল, ” আমার খুব ভয় হচ্ছে, ভাইয়ার এমন আচরণ আমায় খুব ভাবাচ্ছে। ভাই হয়ে বোনের প্রতি অন্যায় করছি না তো? যাকে চোখ বন্ধ করে ভরসা করি, যার হাতে আমার একমাত্র আদরের বোনকে তুলে দিয়েছি সে আমার বোনকে আর আমাকে ঠকাবে না তো?” আবিরের ভ্রু কুঁচকে আসে, দু ভ্রুরের মাঝে কয়েকস্থর ভাঁজ পরে, গুরুগম্ভীর কণ্ঠে বলে, “কি সব বাজে কথা বলছিস। অনেক হয়ছে এবার থাম। ” তানভির পুনরায় উচ্চ স্বরে বলে, “কেন থামবো? আমি কি এমন বাজে কথা বলছি, তুমি বেশকিছুদিন যাবৎ আমার বোনকে ইগ্নোর করতেছ, কি ভাবছো আমি দেখি না? আমাকেও কিছু শেয়ার করো না, নিজের মর্জি মতো চলো, ৩ দিনের জন্য বাড়ি থেকে গায়েব হয়ে গেছো। এত এত কল দিলাম, রিসিভ করার প্রয়োজন মনে করো নি। একটা সময় পর্যন্ত

যেই আবির ভাইয়া বলতো, আমার বোনের চোখে নিজের ধ্বংস দেখে, সেই এখন আমার বোনের হাস্যোজ্জল জীবন টাকে ধ্বংক করতে উঠে পড়ে লেগেছে। সত্যি করে বলো, আমার বোনের থেকেও তোমার জীবনে কি এমন গুরুত্বপূর্ণ জিনিসের আবির্ভাব হয়েছে যে তুমি আমার বোনকে এত অবহেলা করছো। নাকি তোমার জীবনে নতুন কোনো রমনীর আগমন ঘটেছে? যে আমার বোনের থেকেও... " তানভির কথা সম্পূর্ণ করার আগেই আবির রাগান্বিত কণ্ঠে বলল, "আমার লোচনে দেখা ভয়ংকর সুন্দরী হলো আমার মেঘ। এই তল্লাটের লক্ষকোটি সুশ্রীদের ভিড়েও আবিরের দৃষ্টি এক কাদম্বিনীতেই আটকাবে।নিষ্ঠুর পৃথিবীতে তার মোহাচ্ছন্নতা ব্যতীত আবিরকে ধ্বংস করার কোনো অস্ত্র, এখনও আবিষ্কৃত হয় নি। শেষ বারের মতো বলছি কান খুলে শোন, তোর বোনই আমার জীবনের একমাত্র রমনী, যার আগে বা পরে ভুলক্রমেও কোনো মেয়ে আমার জীবনে আসে নি আর আসবেও না। তোর বোন ছিল, আছে, আর সারাজীবন পাশে থেকে এই আবিরের উপর তার কর্তৃত্ব চালাবে। এক আবিরের প্রাণ এক মেঘেতে নিবদ্ধ।" "যদি তাই হয় তবে আমার বোনের প্রতি এত অবহেলা কেন? আমার বোনকে কেউ অবহেলা করবে এটা আমি কখনো সহ্য করব না। সে যদি সাজ্জাদুল খান আবিরও হয় তাও I Don't Care." আবির ভ্রু উঁচিয়ে চোখ বড় করে তাকিয়ে আছে। তানভির যে তাকে ঠান্ডা হুমকি দিচ্ছে আবির খুব ভালোই বুঝতে পারছে। তাই এভাবে চেয়ে আছে! "ভাই হিসেবে কি আমি চাইবো না যে, আমার বোন

সবসময় হাসিখুশি থাকুক? এটা কি আমার অপরাধ? " আবির নিজের চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে কণ্ঠস্বর দ্বিগুণ ভারি করে বলে, " আমার তোর বোনকে অবহেলা করার জন্য তোমার বোনই দায়ী। ও কে আমি যতটা সম্ভব আগলে রাখি। ভার্সিটিতে উঠার পর থেকে সব রকম স্বাধীনতা দিচ্ছি। শুধুমাত্র তোর বোনকে খুশি রাখার জন্য। ড্রাইভার আংকেল প্রায় ই ১ ঘন্টা, ৩০ মিনিট, ২০ মিনিট তোর বোনের জন্য গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করে। তোর বোন বন্ধু- বান্ধবীদের সাথে আড্ডা দেয়, খাওয়াদাওয়া করে। আংকেল ডাকতে গেলে ওর মন খারাপ হবে তাই আংকেল কে বলছি যতক্ষণ ই সময় লাগুক না কেন ওনি যেন অপেক্ষা করেন। আমার সামর্থ্যের সবটুকু দিয়ে চেষ্টা করি যেন তোর বোন হাসিখুশি থাকে। তোর বোনের অবহেলা দেখে তোর কষ্ট হচ্ছে অথচ তোর বোন যখন আমাকে অবহেলা করে তখন? আমার খারাপ লাগে না? যেখানে তোর বোনের ঠোঁটে হাসি না থাকলেই আমার বুকে চিনচিন ব্যথা শুরু হয়ে যায়, যার হাসিতে আবির বাঁচে, তার হাসি না দেখে আবির বাঁচতে কেমন করে?" "কি হয়ছে?" " মাইশা আপুর বিয়ের সময় তুই না করা স্বত্তেও আমি জোর করেই ও কে নিয়ে আসছিলাম যাতে মালা তোর বোনের মাথায় আজেবাজে কথা ঢুকাতে না পারে। ভার্সিটির ক্লাস শেষে আমার জন্য ওয়েট করতে বলছিলাম। তোর বোনের হাতের মেহেদী নষ্ট করেছি, মন খারাপ করে ছিল। ভাবলাম মেহেদী মুছার বিষয়টা ও কে বুঝিয়ে বলবো। অথচ তোর বোনের অপেক্ষা করার ধৈর্য হয় নি। বন্ধুদের সাথে খেতে চলে গেছে।

যাও ভেবেছিলাম ও কে বুঝাবো।। ওর আচরণে কথা বলতেই ইচ্ছে হয় নি। তারপর আরেকদিন ফেসবুকে ঢুকতেই তোর বোনের পোস্ট সামনে আসছে। যেখানে তামিম আর মিনহাজের উল্টাপাল্টা কমেন্ট দেখে আমার পায়ের রক্ত মাথায় উঠে গেছে। স্বাধীনতা দিয়েছি বলে ঐ ছেলেগুলোকে ফ্রেন্ডলিস্টে এড করে ফেলবে? একবার ভাবার প্রয়োজন বোধ করে নি। ঐদিন বাসায় যাওয়ার পর তোর বোন কি যেন বলতে আসছিল, আমি একপ্রকার রাগেই কথা বলছিলাম, এতে তোর বোন রেগে গেছে। এরপর রাতে তোদের বাপ-ছেলের কথোপকথন শুনে আমার মেজাজ আরও খারাপ হয়ছিল। তোর বাপ যেভাবে মেয়ের শ্বশুর বাড়ির সুখের কথা বলছিলেন, তা সহ্য করতে পারি নি তাই চলে আসছিলাম। ৫ দিন থাকলে কাজ মোটামুটি গুছাতে পারতাম। নতুন বছর শুরু হচ্ছে। ভেবেছিলাম ১২ টায় তোর বোনকে কল দিয়ে একটু কথা বলে নিব। কিন্তু ১০ টার দিকে দেখি তোর বোন অনেকগুলো কল দিছে। কল ব্যাক করতেই শুনি কান্না করতেছে। কিসের কাজ কিসের কি সব ফেলে বাসায় গেছি। তোর বোনের অভিমান ভাঙানোর সুযোগ টাও পেলাম না। হুট করে মালা কল দিয়েছে, দূর্ভাগ্যক্রমে তোর বোন সেই কল দেখে ফেলছে আর তেলে বেগুনে জ্বলে উঠেছে। সেই থেকে তোর বোন আমায় দেখলেই রাগে ফুঁসতে থাকে। এতে আমার কি দোষ বল! মালাকে কি আমি বলছিলাম আমায় কল দিয়ে আমার রোমান্টিক মুডের ১৪ টা বাজা। ” “তাহলে কার দোষ? আর মালার কি লাজ লজ্জা বলতে কিছু নাই?” “বিয়ের

দিন তো তুই সামনেই ছিলি। যা যা ঘটেছে সবটায় তোর সচক্ষে দেখা। এখন মালার যদি লজ্জা না থাকে তো আমি কি করব? " "মালা কেন কল দিছিল?" "জানি না। কথা হয় নি।" " ফোনটা দাও" "আমার ফোন?" "হ্যাঁ!" "কেনো?" "তুমি যা বলছো তা সত্যি কি না দেখি!" "মানে? তুইও কি তোর বোনের মতো আমায় অবিশ্বাস করিস?" "বিশ্বাস অবিশ্বাস কিছু না। আমার বোন যতদিন তোমার উপর অধিকার দেখাতে পারবে না ততদিন আমাকেই সেই দায়িত্ব পালন করতে হবে। যদি একটু এদিক সেদিক পাই তাহলে বনুকে দিব না। " আবির ফোন বের করে তানভিরের সামনে টেবিলে রেখে রাগী স্বরে বলল, "নে ফোন। যা পরীক্ষা করার কর। কিন্তু বার বার তোর বোনকে টেনে আমায় থ্রেট দিবি না। তোর বোন আমার মানে আমার ই। বেশি করলে ওরে কিডনাপ করে বিয়ে করে ফেলব। " তানভির হেসে ফোনটা হাতে নিল। হোমস্ক্রিনে মেঘের ছবি দেয়া। তানভির আবিরের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলো। আবির স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, "ভাই প্লিজ, একটা ফাইল ছাড়া যা দেখার দেখ।" তানভির ঠাট্টার স্বরে বলল, "কেন কি আছে ঐ ফাইলে? দেখতে হচ্ছে তো!" "তোর বোনের আর আমার ছবি আছে, যা দেখে আয়। ছবি দেখে লজ্জায় পড়লে আমি দায়ী না। " তানভির এক মিনিটেই ফোন আবিরের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, "বনুর সাথে কথা বলো। " আবির ফোনের ক্রিনে তাকাতেই নাম ভেসে উঠেছে , "হৃদয়হরনী" কয়েক সেকেন্ড হয়ে গেছে কল রিসিভ হয়েছে। আবির কল কানে ধরতে ধরতে তানভিরের

দিকে তাকিয়ে কপাল কুঁচকালো। এভাবে মেঘকে কল দেয়ায় খুব অস্বস্তিতে পরে গেছে সে। ফোন কানে ধরে খুব স্বাভাবিক কণ্ঠে আবির প্রশ্ন করল, "কি করছিস?" মেঘের রাগান্বিত কণ্ঠের জবাব, "ঘাস কাটি।" "মানে?" "শুয়ে আছি। " "খাইছিস?" "ভাইয়া ট্রিট দিয়েছে। জানেন না?" জানি। তাহলে জিজ্ঞেস করছেন কেন? এমনি। "কল দিয়েছেন কেন?" "দিতে পারি না?" " অবশ্যই পারেন কিন্তু আমায় কল দিতে হবে না। রাখছি, ঘুমাবো। " মেঘ কল কেটে দিয়েছে। আবির তানভিরের দিকে তাকিয়ে রাগী স্বরে বলল, "দেখছিস, এজন্যই কথা বলি না। ও যে ছেলেদের সাথে মিশছে, ঘুরছে সেদিকে সমস্যা নেই। আমায় কেন মালা কল দিয়েছে এই জিদে এখনও এমন করতেছে। এই হলো মেয়ে জাতি। নিজের বেলা ১৬ আনার ১৬ আনা ই লাগবে। আর অন্যের বেলায় দুনিয়া ভেসে যাক। " তানভির আর রাকিব দুজনেই স্ব শব্দে হাসছে। দুভাইয়ের কথোপকথনে রাকিব এতক্ষণ নিরব দর্শক ছিল। দুই ভাই রাগারাগি করবে একটু পরেই মিলে যাবে এটা অনেক পুরোনো ঘটনা। অনেকক্ষণ আগেই কফি আর নাস্তা নিয়ে আসছে। মালাটাও রাকিবকে দিয়ে গিয়েছিল কিন্তু ওদের কথা কাটাকাটি দেখে রাকিব ফুলের মালাটা পাশেই রেখে দিয়েছিল। তানভিরের মেজাজ এখন অনেকটায় শান্ত। সে আপন মনে কফি খাচ্ছে। আবির মৃদু হেসে প্রশ্ন করল, "তুই এখানে কেন আসছিলি বলতো! তামিমকে মারতে দেয় নি তারজন্য। অথচ ১ ঘন্টা যাবৎ তোর বোনকে নিয়ে ঝগড়া করছিস। এখন তুই ভাব তোর রাগ কেমন!

লজিক থাকুক আর না থাকুক, রাগ উঠছে মানে চিল্লাতেই হবে। ”
তানভির ভারী কণ্ঠে পুনরায় হুঙ্কার দিল, “তুমি অনুমতি দিকে ঐ ছেলেকে এখনই মাটিতে কুপে রেখে আসবো।” “তাতে কি লাভ হবে শুনি! আমি পুরো ঘটনায় জানি। তুই যা বলেছিস সেটাও বুঝেছি। কিন্তু সমস্যা টা হচ্ছে তোর ওনি। তোর ওনার ব্যাপারে যতটুকু তথ্য আমি পেরেছি, ওনি খুব বাস্তববাদী একজন মানুষ আর খুব স্ট্রিক। তোর বোন জেদি ঠিক আছে তবে আমি তাকে সামলানোর ক্ষমতা রাখি। কিন্তু তোর যা অবস্থা, রাগ উঠলে লজিক বেলজিক যেভাবে একাকার করে ফেলিস! থাক আর কিছু বললাম না। এখন মূল ঘটনায় আসি, তোর ওনাকে তামিম প্রপোজ করছে। ওনি যদি স্ট্রং ম্যান্টালিটির মেয়ে না হতো তাহলে ওনি মুখের উপর রিজেক্ট করতে পারতো না। সময় নিতো, ভাবতো পরে ইনিয়ে বিনিয়ে না করতো। এখন এই ঝামেলা বিহীন ঘটনায় তুই গিয়ে হুট করে ঐ ছেলেকে পেটালি। এতে আর কিছু হোক বা না হোক বন্যার সামনে তোর ইমেজ টা নষ্ট হবে। তুই রাজনীতি করিস এটা অলরেডি একটা নেগেটিভ ইস্যু, এখন এভাবে মারপিট করলে অবশ্যই বন্যার কানে কথা যাবে। তোর প্রতি তার নেগেটিভ চিন্তাভাবনা আরও বেড়ে যাবে। এখন তো কথা বলে, পরে দেখবি তোকে দেখলে কথাও বলবে না। তখন প্রপোজ করতে গেলে জীবনেও এক্সেপ্ট করবে না। বরং সম্পর্ক আরও নষ্ট হবে। আমি চাই না তুই একই ধাক্কা দুবার খাস। প্রথমবার তোর ভুল ছিল না তবুও কষ্ট টা তুই বেশি পাইছিস। এতবছর পর নতুন করে কারো প্রতি

ইমোশন আসছে। ইমোশন টা ধরে রাখিস, ভুল রাস্তায় পা বাড়ানোর আগে অন্ততপক্ষে ১০ বার ভাবিস । আর ঐ ছেলে যদি বাড়াবাড়ি করতে আসে তখন বিষয়টা আমি দেখবো। তবুও তুই কিছু করিস না প্লিজ। তুই যেমন তোর বোনের খুশি দেখতে চাস তেমনি আমিও তোদের দুজনের খুশি দেখতে চাই। ভুলে যাস না আমরা সবাই এক মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ। আমার কিছু হলে যেমন তুই কষ্ট পাবি, তোর কিছু হলে তেমন তোর বোন কষ্ট পাবে আর তোর বোনের কিছু হলে তো আমি শেষ হয়ে যাব। ”“প্লিজ ভাইয়া,এভাবে বলো না। কারোর কিছু হবে না ইনশাআল্লাহ। কতশত স্বপ্ন পূরণ করা বাকি, প্রাপ্তি খাতা যে এখনও শূন্য। জীবনে সফলতা, প্রেম, বিয়ে কিছুই তো হলো না। এ জীবনে কি পেলাম আমি! আমার কতদিনের ইচ্ছে মামা ডাক শুনার সেই ইচ্ছে টাও তো কেউ পূরণ করছে না!” তানভিরের কথা শুনে আবির শুকনো মুখেই বিষম খেল। রাকিব তাড়াতাড়ি পানির গ্লাস এগিয়ে দিচ্ছে। কোনোরকমে একটু পানি খেয়ে গ্লাস টা টেবিলে রাখতে রাখতে আবির বলল, “তোর বোনের সাথে প্ল্যানিং টা তাহলে খুব শীঘ্রই করতে হচ্ছে। ” আবিরের কথা শুনে তানভির পুরাই বেকুব হয়ে গেছে। আবিরের সিরিয়াস মুড ঠিক করতেই তানভির মজা করেছিল। আবির যে এমন কথা বলতে এটা সে ভাবতেই পারে নি। রাকিব ঠাট্টার স্বরে বলল, “প্রেম, বিয়ের খবর নেই ডিরেক্ট বাপ হওয়ার ধান্দা। ” আবির রাকিবের দিকে তাকিয়ে ঠোঁট বেঁকিয়ে হেসে জানাল, “সবাই তো সিরিয়াল মেইনটেইন করেই আমি বরং উল্টোটা

করলাম। শুধু আমার বউটা রাজি হলেই হবে। ” তানভির আর রাকিব দুজনেই হাসছে সেই সাথে আবিরও। বেশ কিছুক্ষণ চললো এসব ফাজলামো। আবিরের জুনিয়র তানভিরকে মামা ডাকবে নাকি চাচ্চু সেই নিয়েও আলাপচারিতা চলল। খানিকক্ষণ বাদে তানভির স্বাভাবিক কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, ” ভাইয়া, বন্যা কি আমার জন্য ঠিকঠাক? আমি আবারও ভুল পথে পা বাড়াচ্ছি না তো?” “দেখ ভাই, সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা আমাদের আছে কিন্তু সেই সিদ্ধান্ত সঠিক নাকি ভুল তা বলার ক্ষমতা আমাদের নেই। বন্যা মেয়েটা খুব ভালো এই কথায় কোনো ভুল নেই। কিন্তু তোকে আর একটু সাবধান হতে হবে। আমি জানি তুই ওর জন্য নিজেকে প্রতিনিয়ত পরিবর্তন করার চেষ্টা করছিস। তারপরও একটু কেয়ারফুল থাকিস। রেগে গেলে যে উল্টাপাল্টা আচরণ করিস সেটার প্রভাব যেন কোনোভাবেই তার উপর না পরে। প্রয়োজন, অপ্রয়োজনে একটু খোঁজ খবর নিবি। জানিস তো, মেয়েরা সুদর্শন পুরুষের থেকেও দায়িত্বশীল পুরুষের প্রেমে বেশি পড়ে। ” দুপুর পেরিয়ে বিকেল হয়ে গেছে। দুই ভাইয়ের কথা ফুরাচ্ছে না। এরমধ্যে ফুপ্পি আবিরকে কল দিয়েছিল। দুই ভাই ই ফুপ্পির সঙ্গে কথা বলেছে। আবির আর তানভির যত ব্যস্তই থাকুক না কেন, সপ্তাহে অন্ততপক্ষে একদিন হলেও ফুপ্পির সাথে দেখা করে আসে। আসিফ ভাইয়া এখনও দেশে ফেরে নি। তবুও জান্নাতের একায় দু বাড়িতেই যাতায়াত করতে হয়। একদিকে রাকিবদের একমাত্র বোন অন্যদিকে ঐ বাড়ির বড়বৌ। জান্নাত সবার ই খুব আদরের। বিশেষ করে

মাহমুদা খানের চোখের মনি। শাশুড়ী সর্বক্ষণ বউমাকে চোখে হারায়। বিকেলে খাওয়াদাওয়া করার সময় তানভির কৌতুহল নিয়ে প্রশ্ন করল, “ভাইয়া একটা কথা জিজ্ঞেস করি?” “কি কথা?” “তিনদিন তুমি কোথায় ছিলে? ” “তোকে নিয়ে যাব নে। নিজেই দেখে আসিস কোথায় ছিলাম।” “আচ্ছা। ” অফিসের কাজ শেষ করা পর্যন্ত তানভির অফিসেই ছিল। যতটুকু পেরেছে নিজেও হেল্প করেছে। অফিস শেষে রাকিব সহ তানভির আর আবির ঘুরতে বেড়িয়েছে। সেখান থেকে বাসায় ফিরেছে প্রায় ৮ টার দিকে। মেঘ সোফায় বসে টিভি দেখছিল। আবির পকেট থেকে একটা কিটকেট চকলেট বের করে সোফার সামনে রাখা টি টেবিলে ঠিক মেঘের সামনে রাখল। মেঘ চকলেটের দিকে তাকিয়ে রাগী স্বরে বলল, “আমি খাব না চকলেট। ” আবিরের ভারী কণ্ঠের জবাব, “না খেলে ফেলে দে। ” মেঘ সঙ্গে সঙ্গে চকলেট টা হাতে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। আবির তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে খানিক চেয়ে রইলো। পরক্ষণেই নিজের রুমের দিকে চলে যাচ্ছে। তখনই রুম থেকে আদি আসছে। ফ্লোরে চকলেট পরে আছে দেখে চকলেট হাতে নিয়ে মেঘের কাছে ছুটে এসে প্রশ্ন করে, “মেঘাপু, চকলেট টা কার? ” “খেতে ইচ্ছে হলে খেয়ে ফেল। ” “Thank you Meghapu” বলেই আদি চকলেটের প্যাকেট ছিঁড়তে ছিঁড়তে রুমের দিকে চলে গেছে। আবির উপর থেকে সেটা দেখে নিজেও রুমে ঢুকে গেছে। মেঘ অত্যন্ত জেদি একটা মেয়ে। যা বলবে তাই করবে। কোনোকিছু খাবে না বললে, দুনিয়া উল্টে গেলেও খাবে না। আবার কোনো জিনিস লাগবে

মানে লাগবেই। মালার প্রতি তার রাগ অনেকদিন যাবৎ। ঐদিন রাতে কল দেয়ার পর থেকে সেই রাগ এখন কন্ট্রোলহীন হয়ে গেছে। রাত ১২ টার পর কোনো মেয়ে কারণ ছাড়া কোনো ছেলেকে কল দেয় না। যদি এমনটাও হয় যে আবির মালাকে পছন্দ করে না এমনকি তার হাতে আশিক নাম টাও আবির ই লিখিয়েছে তবে কেন মালা আবারও আবিরকে কল দিবে। আর আবির ই বা কেন মালাকে ব্লক করছে না। মূলত এই জিদেই মেঘ এমন আচরণ করছে। ৯.৩০ নাগাদ তানভির বন্যার নাম্বারে কল দিয়েছে। ২ বারের বেলায় কলটা রিসিভ হলো । বন্যা সঙ্গে সঙ্গে সালাম দিয়েছে। তানভির সালামের উত্তর দিয়ে কিছুটা রেগে প্রশ্ন করল, “তোমার চোখে কি কোনো সমস্যা আছে?” “কই না তো। কেনো?” “তোমাকে কয়েক ঘন্টা আগে ফ্রেন্ড রিকুয়েষ্ট পাঠিয়েছি। দেখো নি? নাকি এক্সেপ্ট করার প্রয়োজন মনে করো নি?” বন্যা তৎক্ষনাৎ ফোন কেটে দিয়েছে। আরও ২ ঘন্টা আগেই দেখেছে তানভির রিকুয়েষ্ট পাঠিয়েছে। এমনকি তানভিরের আইডি ঘুরেও দেখেছে । বন্যা ইচ্ছেকরেই এক্সেপ্ট করে নি। এমনিতেই যেভাবে শাসন করে, সেখানে ফ্রেন্ড লিস্টে এড করলে সবকিছুতে নজরদারি করবে এই ভয়েই এক্সেপ্ট করে নি। কিন্তু এভাবে কল দেয়াতে বন্যা তাড়াতাড়ি গিয়ে এক্সেপ্ট করে দিয়েছে। কিছুক্ষণ পর তানভির আবার কল করেছে। কল রিসিভ করতেও বন্যার এখন হাত কাঁপছে। ভয়ে ভয়ে রিসিভ করেছে। তানভির এবার স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, “কল কেটেছো কেন?” “এক্সেপ্ট করেছি। ” “ওকে। কোথায় আছো?” “নানু

বাড়িতে। ” “তোমার নানু কেমন আছেন?” “এখন কিছুটা সুস্থ, দোয়া করবেন। ” “ফি আমানিল্লাহ। রাতে খেয়েছো?” “জ্বি। আপনি?” “হ্যাঁ।” “আচ্ছা রাখি এখন” “এই শুনো ” “জ্বি ভাইয়া। ” “আবার ভাইয়া। ” “সরি, মুখ ফস্কে বেরিয়ে গেছে। বলুন ” “I am Sorry. দুপুরে তোমার সাথে রাগ দেখানো টা একেবারেই উচিত হয় নি। কিছু মনে করো না প্লিজ। মেজাজ একটু গরম ছিল। ” বন্যার অক্ষি যুগল প্রশস্ত হয়ে গেছে। হা হয়ে রুমের দেয়ালে চেয়ে আছে। স্বয়ং তানভির খান তাকে সরি বলছে এটাও ভাবা যায়। ছোট থেকে মেঘ আর বন্যা তানভিরের কম ধমক খায় নি সেসব এখন অতীত। স্কুল কলেজের গন্ডি পেড়িয়ে দুজনেই এখন ভার্সিটির স্টুডেন্ট। মেঘ আর বন্যার আচরণে যেমন পরিবর্তন এসেছে তেমনি তানভিরের আচরণেও অনেক পরিবর্তন এসেছে। তবে আজকের সরি বলাটা বন্যার কাছে অকল্পনীয় বিষয়। তানভিরের সঙ্গে কথা শেষ করেই মেঘকে কল দিয়েছে। বন্যা- জানিস তোর ভাই আমাকে ফ্রেন্ড রিকুয়েষ্ট পাঠিয়েছে আবার দুপুরের আচরণের জন্য সরিও বলেছে। মেঘ- তোকে আগেই বলেছি আমার ভাইয়ের মতো মানুষ হয় না। রাগী হলেও মন ফ্রেশ। বন্যা- কিসের ফ্রেস। তোর ভাইয়ের আইডিতে ঢুকছিলাম। লাস্ট কয়েকদিনের পোস্ট পড়ে আমি এখন কোমায় যাওয়ার রাস্তা খোঁজছি। মেঘ- ওমা কেন? বন্যা- একেকটা স্ট্যাটাস যে দিয়েছে, লাইন গুলো পড়েই আমি ক্লান্ত হয়ে গেছি। স্ট্যাটাসের মানে বুঝা তো বহুদূরের বিষয়। মেঘ- এটা আমার ভাইয়ের একার সমস্যা না। আমার মনে হয় এটা ছেলের

ব্রেইনের সমস্যা। মাঝে মাঝে আবির ভাইও আধ্যাত্মিক লেবেলের কথা বলেন। আমার এক কান দিয়ে ঢুকে অন্য কান দিয়ে বেড়িয়ে যায়। আগামাথা কিছুই বুঝি না। বন্যা- আবির ভাইয়ের টা জানি না তবে আমার কি মনে হয় জানিস, তোর ভাই হয়তো প্রেমে ছ্যাঁকা খেয়েছে । আজকে দুপুরেও দেখলি না রেগে ছিল, কতবার ফোনে কথা বলতে উঠে উঠে গেছে। বিশ্বাস না করলে তুই নিজেই ওনার স্ট্যাটাস গুলো দেখিস। মেঘের হাসিমুখে অন্ধকার ছেয়ে গেছে। খুব চিন্তায় পরে গেছে মেয়েটা । বন্যা পুনরায় বলল, "আমার আসতে কয়েকদিন দেরি হবে। তুই সাবধানে থাকিস আর ক্লাস গুলো ঠিকমতো করিস। " মেঘ আচ্ছা বলে কল কেটে দিয়েছে। তার মাথায় বন্যার বলা কথাটায় ঘুরছে। সঙ্গে সঙ্গে ফেসবুকে ঢুকে তানভিরের আইডি চেক করল। বেশ কয়েকটা পোস্টে আবির ভাই আর রাকিব ভাইয়াদের কমেন্ট ও আছে। মেঘ সেসব কমেন্টও পড়েছে বিষয় টা বুঝার জন্য কিন্তু কিছুই বুঝতে পারছে না। মেঘের শরীর ঘামছে, চোখেমুখে চিন্তার ছাপ। ফোন রেখে রুম থেকে বেড়িয়ে তানভিরের রুম পর্যন্ত আসছে। দরজা ভেতর থেকে লাগানো, রুমে কম সাউন্ডে গান বাজতেছে, "একাকি মন আজ নিরবে বিবাগি তোমার অনুভবে ফেরারি প্রেম খুজে ঠিকানা আকাশে মেঘ মানে বোঝ কিনা!" গানটা শুনে মেঘ কয়েক সেকেন্ডের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেছে। কিছু ভেবে দু কদম পিছিয়ে গেছে। ডাকবে কি না বুঝতে পারছে না। মনে অশান্তির ঝড় চলছে। চলে যেতে নিয়ে পুনরায় এসে দরজায় ডাকল। ভেতর থেকে তানভির প্রশ্ন করে,

“কে?” “আমি। দরজা টা খুলো। ” তানভির সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে দিয়েছে। মেঘ তানভিরকে পাশ কাটিয়ে রুমে ঢুকে ফোনের গান টা অফ করে একটা চেয়ার টেনে ঠিক রুমের মাঝখানে ফ্যানের নিচে বসেছে। মেঘের এমন আচরণে তানভির একটু অবাক হয়েছে। মেঘের দিকে তাকিয়ে শুধালো, “এত রাতে তুই এখানে। কিছু হয়ছে?” “হ্যাঁ হয়ছে। তবে আমার না তোমার ” তানভির ঢোক গিলে নিজেকে স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করে। বন্যা নিশ্চয় মেঘকে কিছু বলছে আর তারজন্যই মেঘ এসেছে। মেঘ হঠাৎ ই গুরু গম্ভীর স্বরে প্রশ্ন করে, “তুমি এমন ছ্যাঁকা খাওয়া গান শুনছিলা কেন? কি হয়ছে তোমার?” “কিছু হয় নি। গানটা ভালো লাগে তাই শুনছিলাম।” “এসব গান তারাই শুনে যাদের মনে অনেক দুঃখ। তোমার মনে কিসের দুঃখ বলো। কে তোমায় কি বলছে?” তানভির মৃদু হেসে জবাব দেয়, “আমায় আবার কে কি বলবে। কিছু হয় নি আমার। টেনশন করিস না। ” “টেনশন তো করতেই হবে। দুপুর থেকে তোমার মধ্যে অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করছি। বাই এনি চান্স, তোমার কি তার সঙ্গে কোথাও দেখা হয়ছিল?” “কার সঙ্গে?” “তোমার অতীত। যার জন্য তুমি এখনও এসব গান শুনতেছো।” “মাথা নষ্ট হয়ছে তোর? আমি কাউকে মিস করে এসব গান শুনছি না। আর কারো সঙ্গে আমার দেখাও হয় নি। তুই অযথা চিন্তা করছিস। ” “সত্যি বলছো নাকি আমাকে বোকা বানাচ্ছ তা আমি জানি না। কিন্তু আর কোনোদিন তোমায় যেন ছ্যাঁকা খাওয়া গান শুনতে না দেখি। যদি আমার কথা না

মানো তবে আব্বু, বড় আব্বু সবাইকে বিচার দিব।” “আচ্ছা ঠিক আছে। তুই যা বলবি তাই হবে। এখন আজেবাজে চিন্তা বাদ দে। শুধু শুধু চিন্তা করে চেহারাটাকে পেত্নীর মতো করতেছিস। ঘুমা গিয়ে” উঠে যেতে নিবে হঠাৎ ই মেঘ থমকে দাঁড়িয়ে শক্ত কণ্ঠে বলা শুরু করল, “ভাইয়া শুনো, কোনোদিন যদি ভুলক্রমেও ঐ মেয়ের সঙ্গে তোমার দেখা হয়ে যায় চোখ বন্ধ করে একটা থা*প্পড় মারবা। তুমি না পারলে আমায় বইলো আমি দিব নে। প্রয়োজনে আমার ১৫-২০ টা বান্ধবী নিয়ে যাব। সবাই একটা করে থাপ্পড় দিলে ঐ মেয়ে শেষ। আর শুনো থাপ্পড় কিন্তু এক গালেই দিবা। তাহলে ঐ মেয়ের আর জীবনে বিয়ে হবে না। ” মেঘের কথা শুনে তানভির নিঃশব্দে হাসছে। কিন্তু মেঘের চোখ রাগে জ্বলছে। আচমকা দরজা থেকে আবির বলে উঠে, “আলী আহমদ খান, মোজাম্মেল খান এখন কোথায়? ওনাদের আদরের মেয়ের এই রূপ কি তারা দেখেন না? তাদের মতে আবির গু*ন্ডা আর মেঘ একমাত্র লক্ষ্মী তাই না? আমিও ভিডিও করে রেখেছি আরেকদিন আমায় কিছু বললে আমিও দেখিয়ে দিব তাদের লক্ষ্মী মেয়ে কোন লেবেলের গু*ন্ডী।” মেঘ চোখ গোলগোল করে আবিরের দিকে তাকিয়ে আছে। আবির মিটিমিটি হাসছে। মেঘ গাল ফুলিয়ে শ্বাস ছেড়ে রাগী স্বরে বলল, “ডিলিট করুন ভিডিও। ” “আগে এককাপ কফি করে নিয়ে আয় তারপর ভেবে দেখবো। ” “আমি কফি করতে পারি না।” মেঘ মনে মনে বিড়বিড় করে বলল, “আমি কেন কফি করব। রাত ১২ টার পরে যার সাথে কথা বলেন তাকে বলতে পারেন

না?” আবির কোমল কণ্ঠে বলে, “পারি না বললে কিভাবে হবে! শিখতে হবে তো! আমি শিখিয়ে দিচ্ছি বানিয়ে নিয়ে আয়। ” মেঘের ইচ্ছে না থাকা সত্ত্বেও কফি বানাতে যাচ্ছে। আবির পুনরায় ডেকে উঠল, ” সাবধান, হাত পুড়াইয়েন না আবার। ” আবির তানভিরের সাথে দুমিনিট কথা বলে দ্রুত নিচে আসছে । মেঘ ততক্ষণে গ্যাসে পানি গরম দিয়েছে মাত্র। আবির রান্নাঘরে এসে শান্ত কণ্ঠে বলল, “যা আমি করতেছি। ” “আপনি ই যদি করবেন তবে আমায় পাঠাইছিলেন কেন?” “তোরে কিছু বললে তো ভয় লাগে।যদি হাত পা পুড়াইয়া ফেলিস, তাহলে তো জীবনের জন্য আমার কফি খাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে। ” “এখন ভিডিও টা ডিলিট করুন।” “ভিডিও করিই নি, ডিলিট কি করবো।” “মানে? আপনি আমার সাথে ফাজলামো করছেন?” “জ্বি ম্যাম। ” মেঘ রাগে আবিরের মুখের পানে চেয়ে আছে। আবির মুচকি হেসে শুধালো, “রাগ করছেন?” মেঘ রাগে ফুঁসছে। আবির পুনরায় বলল, ” রাগ টা কি একটু কমানো যায় না?” মেঘের রাগ দ্বিগুণ বেড়ে গেছে। রাগে গজগজ করতে করতে বলে, ” আমার রাগে কার কি যায় আসে?” আবির নরম স্বরে বলল, “Sorry.” মেঘ ভেঙচি কেটে চলে যেতে নিলে আবির ডেকে বলে, “কাল বিকেলে রেডি থাকিস একটা জায়গায় নিয়ে যাব। ” “আমি যাব না।” “কেন?” “আমার কোথাও যাওয়ার মুড নেই তাও আবার আপনার সাথে। ” “ঠিক আছে। আমার সাথে না গেলে তানভিরের সঙ্গে যাস। ” “কারোর সাথেই যাব না।” “না গেলে কিন্তু স্পেশাল কিছু মিস করবি। মিস যদি না করতে চাস

তাহলে কালকের জন্য রাগ টা পাশের বাড়িতে রেখে তানভিরের সঙ্গে চলে যাস। ” “আমি যাব না মানে যাব ই না।” মেঘ রাগে কটমট করতে করতে চলে যাচ্ছে। আবির পেছন থেকে আবারও ডেকে বলে, ” ভেবে দেখিস, রাগ টা পাশের বাড়িতে রাখা যায় কি না! ” মেঘ আর পেছন ফিরে তাকায় নি। বিড়বিড় করে বকতে বকতে রুমে চলে গেছে। সকাল থেকে আবির আর তানভির বাসায় নেই। অফিস ৩ দিনের ছুটি। কিন্তু দু ভাই ভোরবেলা না খেয়েই বেরিয়ে পরেছে। তানভির ঠিক ২ টার সময় বাসায় ফিরেছে। ১-১.৩০ ঘন্টা মেঘকে বুঝিয়ে, রিকুয়েষ্ট করেছে রেডি হওয়ার জন্য। কিন্তু জেদি মেয়ে যাবে না মানে যাবেই না। আবিরের প্রতি ক্ষোভ ই কমছে না তার। আবির ভাইকে দেখলে একটু আধটু প্রেমানুভূতি জাগলেও তানভিরের কথা মনে পড়তেই সব ভুলে যায়। তানভির ভাইয়ের মতো তার জীবনটাও না এমন হয়! মালার সাথে যদি আবির ভাইয়ের সত্যিই কিছু থেকে থাকে তবে তাকেও তার ভাইয়ের মতো ছ্যাঁকা খাওয়া গান শুনে জীবন কাটাতে হবে এসব ভেবেই মাথা ব্যথা শুরু হয়ে যায়। মেঘকে বুঝাতে ব্যর্থ হয়ে তানভির ৪ টার দিকে আবার বেরিয়ে পরেছে। আলী আহমদ খান আর মোজাম্মেল খান সন্ধ্যায় সোফায় বসে চা খাচ্ছেন আর গল্প করছিলেন, সেই সকালে আবির আর তানভির বেরিয়েছিল, তানভির ২ ঘন্টার জন্য বাসায় ফিরলেও আবির সারাদিনেও ফেরে নি। বিষয় টা দুভাইয়ের ই নজরে পরেছে। আবিরের আম্মুকেও জিজ্ঞেস করেছে ওনিও জানেন না। সারাদিনে আবিরের সাথে কথাও হয় নি। আলী

আহমদ খান নিজেও দুবার কল দিয়েছেন নো রেসপন্স। আবিরের সঙ্গে বাবা চাচার দূরত্ব দিনকে দিন বেড়েই চলেছে। আবির টাইমমতো অফিসে যায়, নিজের কাজও ঠিকঠাক মতো করে, সেই সাথে বাবা – চাচার কাজও একা হাতে সামলায়। কাজের বাহিরে ১০ মিনিটের জন্যও ওনাদের সাথে বসে না, এক কাপ চা পর্যন্ত খায় না। প্রয়োজনের বাহিরে কোনো কথা বলে না। অথচ একটা সময় পর্যন্ত আবির যা করতো সব আব্বু আর চাচ্চুকে জানিয়ে করতো। বাহিরে থাকাকালীনও রেগুলার আব্বু আর চাচ্চুর সঙ্গে কথা হতো। গত দের বছরে ছেলের এত পরিবর্তন মেনে নিতে পারছেন না আবিরের আব্বু। প্রায় ই দুই ভাই এই বিষয় নিয়ে কথা বলেন। কিন্তু এর কোনো সমাধান পান না। রাত ৯ টার দিকে আবির কয়েক বক্স মিষ্টি নিয়ে বাসায় আসছে। একটা বক্স হাতে নিয়ে উপরে সোজা মেঘের রুমে হাজির হয়েছে। মেঘ জামা প্রিন্ট করছিল। হঠাৎ পেছনক ঘুরতেই আবিরকে দেখে আঁতকে উঠে। আবির ঠিক তার পেছনে দাঁড়ানো। আবির একটা মিষ্টি হাতে নিয়ে নরম স্বরে বলল, “নে হা কর। ” “কিসের মিষ্টি।” “হা করতে বলছি” ভারী কন্ঠ শুনে মেঘ হা করে মিষ্টিটা মুখে নিল। আবির দ্বিতীয় মিষ্টিটা দু আঙুলে নিতে নিতে গম্ভীর কন্ঠে বলল, ” তুই যদি কথা মানতি তাহলে জানতে পারতি কিসের মিষ্টি। যেহেতু যাস নি তাই এ বিষয়ে তোকে আপাতত আর কিছুই বলব না। ” আবির আরেকটা মিষ্টি মেঘকে খাইয়ে দিয়ে বক্সটা টেবিলের উপর রেখে চলে গেছে। আজ সকাল থেকে বাড়িতে মানুষের

ভিড়। আবিরের রুমে কাজ করাবে। এত বছরে বাড়ির অন্যান্য রুমগুলো ২-১ বার রং করা হলেও আবিরের রুমে রঙ করা হয় না অনেকবছর যাবৎ। রঙ করলে ছেলের স্মৃতি মুছে যাবে বলে মালিহা খানের কড়া নির্দেশ ছিল আবিরের রুমে কোনোরকমের কাজ করানো হবে না। আবির ফিরেছে অনেকদিন তবুও রঙ করায় নি। মায়ের অনুমতি নিয়েই রুমে কাজ করাচ্ছে। পুরাতন কিছু জিনিসপত্র সরিয়ে নতুন জিনিস আনা হচ্ছে। রুমে এসি লাগানো হচ্ছে। দুপুর বেলা মেঘ হঠাৎ ই কি মনে করে যেন আবিরের রুমে আসছে। রুম সম্পূর্ণ অগোছালো। পা ফেলার অবস্থা নেই। দেয়ালে সাদা রঙ করা হচ্ছে, এরপর অন্য রঙ দেয়া হবে। মেঘ আহ্লাদী কণ্ঠে ডাকল, "আবির ভাই." "হুমমমমমম" "আমি কিন্তু আপনার রুমের দেয়ালগুলোতে আর্ট করব। " আবির এদিক সেদিক তাকিয়ে একটা দেয়াল দেখিয়ে বলল, "তুই চাইলে এই দেয়ালে তোর লতাপাতার ডিজাইন করতে পারিস। " মেঘ অভিমানী স্বরে বলল, "থাক লাগবে না।" হ্যান্ডপ্রিন্টিং এর কাজ শিখছে তাই মান অভিমান সাইডে রেখে এসেছিল প্রিয় মানুষের রুমটাকে নিজের মতো করে সাজাতে। আবির ভাই চান বা না চান সে তো নিজেকে আবির ভাইয়ের প্রেমিকা মনে করে। সেই অধিকারবোধ নিয়েই এসেছিল। কিন্তু আবির একটা দেয়ালে রঙ করার অনুমতি দেয়ায় তার বড্ড অভিমান হয়েছে। আবির বিরক্তিকর কণ্ঠে বলল, "রঙ না করলে বলছিস কেন? আর আসছিস কেন আমার রুমে? আমি ডেকে আনছিলাম তোকে? যা এখান থেকে আগামী ৭ দিন তোর

আমার রুমে আসা সম্পূর্ণ নিষেধ। যদি ভুলেও আমার রুমের আসার চেষ্টা করিস তাহলে তোর খবর আছে। ” রুমে কয়েকজন মিলে রঙ করছিল।সবার সামনে এভাবে কথা বলায় মেঘ খুব অপমানিত হয়েছে। কাঁদতে কাঁদতে বলে, “আপনার রুমে আসছি বলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেছে? ” ” হ্যাঁ হয়েছে। একদম কাঁদবি না। যা এখান থেকে। ” মেঘ কাদঁতে কাঁদতে বেড়িয়ে যেতে নিলে কিসের সঙ্গে হোটচ খেয়ে পড়তে নিলে নিজেকে সামলাতে এক হাত দরজায়, আরেক হাত সদ্য রঙ করা দেয়ালে রেখে কোনোরকমে পড়ে যাওয়ার হাত থেকে বেঁচেছে। স্বাভাবিক হয়ে মেঘ পেছন ফিরে তাকিয়েছে, আবির যেন দেখেও না দেখার ভান করে আছে। একটা জলজ্যান্ত মানুষ পরে যেতে নিচ্ছিল অথচ তার ধরার কোনো চেষ্টা নেই, ঠিক আছে কি না জিজ্ঞেস করার কোনো প্রয়োজনবোধ করছেন না। এমন আবির ভাইকে মেঘ কখনও চাই নি। আবির ভাইয়ের এটিটিউটের চেয়েও বেশি ওনার যত্নের প্রেমে পরেছিল মেঘ। সেই মানুষটা এত পরিবর্তন হয়ে গেছে। ভেবেই মেঘ অবাক হয়ে যাচ্ছে। মাথা নিচু করে রুম থেকে বেড়িয়ে গেছে। ৫ মিনিটের মধ্যেই রুমে সাদা রঙ করা শেষ হয়ে গেছে। কয়েকজনের মধ্যে একজনের নজর পরে দরজার পাশের দেয়ালের দিকে। মেঘের হাতের চাপে দেয়ালে স্পষ্ট ছাপ পরে গেছে। ছেলেটা রঙ নিয়ে এগিয়ে আসতে আসতে বলে, ” রঙটা দেখা যায় নষ্ট হয়ে গেছে। সমস্যা নাই এখনই ঠিক করে দিচ্ছি।” আবির গম্ভীর গলায় বলে, “সাবধান, এই ছাপের উপর যেন রঙ না পরে। ”

“ভাই এভাবে রাগ দেখানো ঠিক না। আপনার বোনের হাত বোধহয় ভুলে দেয়ালে লেগে গেছে । এখনও ভেজা আছে রঙ দিয়ে দিলেই ঠিক হয়ে যাবে। কিছু বুঝা যাবে না। ” আবির মুচকি হেসে বলে, “এই ছাপ ভুল করে হয় নি। আমি ইচ্ছে করেই করিয়েছি। এই রুমটা যার তার স্মৃতি তো রাখতেই হবে।” মেঘ যাওয়ার জন্য পা বাড়াতে যাবে এমন সময় আবির পা বাড়িয়ে দিয়েছিল । আর আবিরের পায়ের সঙ্গে হোটচ খেয়েই মেঘ পড়তে নিয়েছিল। ছেলেটা দাঁত কেলিয়ে হেসে বলে, “ভাই, ওনি কি আপনার ভালোবাসার মানুষ?” “হ্যাঁ!” “তাহলে এত রাগ দেখালেন যে। ” “কারণ আছে। তুমি কাজ করো। আর হ্যাঁ ও যেন কোনেভাবেই রুমে না আসে। খেয়াল রেখো।” “আইচ্ছা ভাই। ” দুইদিন হয়ে গেছে আবিরের রুমে রঙ করা হয়েছে। মেঘ অনিচ্ছা স্বত্তেও ছাদে যাওয়ার সময় আবিরের রুমের দিকে তাকিয়েছে। আবির বাসায় থাকলে সবসময় দরজা বন্ধ থাকে। আর বাসায় না থাকলে রুম তালা দেয়া থাকে। রুমে তালা দেখে মেঘের মেজাজ আরও বেশি খারাপ হয় । সন্ধ্যার দিকে মেঘ ড্রয়িং রুমে বসে বসে মা কাকিয়াদের সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছিলো।মেঘ অকস্মাৎ বলে উঠল, “বড় আম্মু তুমি কি জানো তোমার ছেলে যে অবৈধ কাজ করে?” “মানে? কি বলছিস কি?” “হ্যাঁ। তা না হলে বাড়ির মধ্যে এত মানুষ থাকা সত্ত্বেও ওনার রুমে তালা দিয়ে রাখতে হয় কেন বলো?” “আবির রুম তালা দিয়ে রাখে?” “হ্যাঁ। বিশ্বাস না করলে ওনি বাসায় না থাকলে দেখে আইসো।” আচমকা মাথায় গাট্টা খাওয়ায় মেঘ “উফফফফ” বলে

পেছন দিকে তাকাতেই দেখে আবির দাঁতে দাঁত চেপে দাঁড়িয়ে আছে। কণ্ঠস্বর দ্বিগুণ ভারী করে বলে, “রুমে তালা দিয়ে রাখছি বলে কি আমি অবৈধ ব্যবসা করি? এ কেমন লজিক আচ্ছা আমি কি অবৈধ কাজ করি বল! না বলতে পারলে তোর একদিন কি আমার একদিন।” মেঘ মাথায় হাত ঘষতে ঘষতে বলল, ” আপনার ব্যবসা আপনিই ভালো জানেন। ” মেঘ উঠতে নিলে আবির ধমক দিয়ে বলে, “সব বিষয় নিয়ে ফাজলামি করবি না। তোদের যন্ত্রণায় রুমে তালা দিয়ে রেখেছিলাম। আমার রুমে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র আছে। যার মধ্যে একটা কাগজ হারালে সেটাকে খোঁজে বের করা জীবনেও সম্ভব না। সেগুলো যেন নষ্ট করতে না পারিস তারজন্য তালা দিয়ে রেখেছি।” মেঘ মাথা নিচু করে চেয়ারে বসে আছে। ইদানীং আবির ভাইয়ের সাথে ঝামেলা একটু বেশিই হচ্ছে। মজা করে কিছু বললেও আবির ভাই কেমন যেন সিরিয়াস হয়ে যায়। আবির এককাপ কফি হাতে নিয়ে সোফায় গিয়ে বসেছে। ল্যাপটপে কাজ করছিল। মেঘ কিছুক্ষণ বসে থেকে রুমে চলে যাচ্ছে। সিঁড়ি দিয়ে উঠার পথে হঠাৎ নজর পরে ল্যাপটপের পাশে রাখা আবিরের ফোনের দিকে। ফোনে একটার পর একটা কল আসছে। আবিরের সেদিকে কোনো নজর নেই। মনোযোগ দিয়ে কাজ করছে আর কফি খাচ্ছে। মেঘ ৩ টা সিঁড়ি নিচে নেমে দেখার চেষ্টা করছে কার কল আসছে, সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাকিয়ে কোনরকমে সিউর হলো কলগুলো মালা আপুর নাম্বার থেকে আসছে। মেঘের মেজাজ খারাপ হতে দু সেকেন্ড সময় লাগল না। আবির

ভাইয়ের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতির মূলে এই মালা আপু। মেঘ রাগে গজগজ করে নিজের রুমে চলে গেছে। কিন্তু রুমেও স্থির হতে পারছে না। একবার রুমের বেলকনিতে যাচ্ছে, একবার শুয়তেছে, রুম থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি পর্যন্ত এসে আবার রুমে চলে যাচ্ছে। কি করবে না করবে বুঝতে পারছে না। একবার রুম থেকে বেরিয়ে বেলকনিতে আসতেই নিচে নজর পরে সোফায় আবির ভাই নেই। ল্যাপটপ ফোন এমনিতেই পরে আছে। রান্নাঘরেও কেউ নেই। মেঘ দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসে। ফোনের লক খোলা দেখে তাড়াতাড়ি করে কল লিস্টে ঢুকেছে মালা আপুর নাম্বার থেকে মোট ৩৫ টা মিসকল এসেছে। তখন ই ফোনে একটা মেসেজ আসছে। মেঘ মেসেজে চাপ দিতেই মালার নাম্বার থেকে আসা শতশত মেসেজ চোখের সামনে ভেসে উঠে। যতধরনের আবেগী, প্রেমময় কথা আছে সবই বলেছে। এত মেসেজ পড়ার সময় নেই। লুকিয়ে আবিরের ফোন দেখছে এই ভয়ে হাত কাঁপছে। আগেও কয়েকবার আবিরের ফোন ধরতে নিষেধ করেছিল তারপরও মেঘ ফোন ধরেছে। কয়েকটা মেসেজের উপরে হঠাৎ ই আবিরের দেয়া একটা মেসেজ চোখে পরে, মেসেজ টাতে লেখা ছিল, “তোকে আর কিভাবে বললে আমাকে বিরক্ত করা বন্ধ করবি বল। বহুবার বলেছি আমি সিঙ্গেল না। যদি মনে করিস ঘন্টায় ১০০ মেসেজ করলে আমি গার্লফ্রেন্ডের সঙ্গে ব্রেকাপ করে তোর সঙ্গে রিলেশনে যাব তাহলে তুই বোকার স্বর্গে বাস করছিস। কারণ আমার এমন কোনো সুযোগ নেই। এখন পর্যন্ত কাউকে বলি নি। তোকেই

প্রথম বলছি, আমি বিবাহিত । বাসার কেউ জানে না যে আমি বিয়ে করেছি। বিদেশে বউ ...” সহসা আবির মেঘের হাত থেকে ফোন কেড়ে নেয়। অগ্নিদৃষ্টিতে চেয়ে রাগান্বিত কণ্ঠে বলে, “কতবার বলেছি আমার ফোনে হাত দিবি না। কোন সাহসে ধরেছিস? মেঘ ঢোক গিলছে। কান্না যেন ভেতর থেকে উপতে পড়তে চাইছে। অবিরত হেঁচকি উঠছে। কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে শুধালো, “আবির ভাই, আপনি বিবাহিত?” “হ্যাঁ। বিদেশে বউ রেখে আসছি। কিছুদিন পর চলে যাব। হইছে? শান্তি?” আবারও প্রশ্ন করে, “আপনি সত্যি বিবাহিত? ” “আমার একটা বাচ্চাও আছে। এখন যা এখান থেকে। ” বাচ্চার কথা শুনে মেঘের হেঁচকি থেমে গেছে সেই সাথে নিঃশ্বাস আঁটকে গেছে গলায়। নিজের চোখ আর কান কোনো কিছুকেই বিশ্বাস করতে পারছে না। আঁখি জোড়ায় পানি টইটম্বুর হয়ে আছে। শুধু উপতে পড়ার অপেক্ষা। মেঘ তৃতীয় বারের মতো বলে, “আপনি সত্যি সত্যি বিবাহিত? ” “আর একটা কথা বললে এমন থাপ্পড় দিব, সাতদিন অজ্ঞান হয়ে পরে থাকবি। যা এখান থেকে। ” মেঘ স্তব্ধ হয়ে গেছে। একদৃষ্টিতে চেয়ে আছে আবিরের মুখের পানে। চোখে পানি জমার জন্য চোখে ঝাপসা দেখছে। আবির আবারও ধমক দেয়, “যা এখান থেকে।” মেঘ সঙ্গে সঙ্গে চলে গেছে। মেঘের সারারাত নির্ঘুম কেটেছে। ছটফট করতে করতে রাত পার করেছে। কাদঁতে কাঁদতে চোখ মুখ ফুলিয়ে একাকার অবস্থা করে ফেলছে। সকালে কোনো মনে হালকা নাস্তা করেই ভার্সিটিতে চলে গেছে। এই বাড়িটাতে এখন মেঘের দম

বন্ধ হয়ে আসছে। একটা ক্লাস কোনোমতে করেছে। ক্লাসও বিরক্ত লাগছিল তাই মাঠে ছিল। মিনহাজ, তামিম, মিষ্টি, সাদিয়া ক্লাস শেষ করে মেঘের কাছে এসে বসেছে। বন্যা এখনও নানু বাড়ি থেকে ফেরে নি। তাই অসহায় মেঘের কষ্ট শেয়ার করার মতও কেউ নেই। মেঘের চোখমুখ ফোলা দেখে মিনহাজ, সাদিয়া, মিষ্টি বার বার জিজ্ঞেস করছে কি হয়েছে বলার জন্য কিন্তু মেঘ কিছুই বলছে না। ওদের জোরাজোরিতে মেঘ শেষমেশ বলেছে, "আমি যাকে ভালোবাসি তিনি অলরেডি বিবাহিত আর এক বাচ্চার বাপ।" সাদিয়া, মিষ্টি দুজনেই আর্তনাদ করে উঠে। মিনহাজ মনে মনে খুব খুশি হয়েছে। এ যেন মেঘ না চাইতেই জল। ওদের জোরাজোরিতে মেঘ কয়েকদিনের ঘটে যাওয়া বিস্তারিত ঘটনা বলেছে। ওদের মধ্যে মিষ্টি খুব ত্যাড়া। মিষ্টি কপাল গুটিয়ে বলা শুরু করল, "এতকিছুর পরেও তুই ঐ বাড়িতে আছিস কেন। আমি হলে তো কবেই বাড়ি থেকে চলে আসতাম। চোখের সামনে প্রিয় মানুষ অপ্রিয় হওয়ার চেয়ে, চোখের আড়ালে যা খুশি করতে থাকুক। এইযে তোর এত কষ্ট, খারাপ লাগা। কিছুদিন দূরে থাকলেই দেখবি সব ভুলে গেছিস। তুই এক কাজ কর তুই হোস্টেলে সিট নিয়া নে। আমাদের সঙ্গে হোস্টেলে থাকবি। আমরা একসাথে ঘুরবো ফিরব, আড্ডা দিব, পড়াশোনা করবো, দেখবি তোর মাথা থেকে ওনার ভূত একেবারে চলে যাবে। তখন আর আবেগ কাজ করবে না। " মেঘ আবারও কান্না শুরু করেছে। ওরা সবাই বুঝিয়েও মেঘকে শান্ত করতে পারছে না। কাঁদতে কাঁদতে হিজাব অর্ধেক

ভিজিয়ে ফেলেছে। চোখ-মুখ লাল টকটকে হয়ে গেছে। সাদিয়া, মিষ্টি, মিনহাজ, তামিম প্রায় ঘন্টাখানেক বুঝিয়েছে। তাদের সব কথার মূল কথা মেঘ যেন বাড়ি থেকে চলে যায়। মেঘ হোস্টেলে আসলে মিনহাজের জন্যও বেশ সুবিধা হবে। তাই মিনহাজ আরও বেশি উৎসাহ দিচ্ছে । শেষ পর্যন্ত মেঘও মন স্থির করেছে সে বাড়ি ছেড়ে চলে আসবে। ভার্সিটি কোচিং করার সময় একবার মন স্থির করেছিল, ভার্সিটিতে চান্স পেলে বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে। কিন্তু আবির ভাইয়ের আবেগে জরিয়ে এতদিন বাড়ি ছাড়ার ইচ্ছে হয় নি। তবে ইদানীং আবির ভাইয়ের আচরণ প্রতিনিয়ত মেঘকে কষ্ট দিচ্ছে। গতকালের বলা কথাটাতে মেঘ পুরোপুরি বিধ্বস্ত হয়ে পরেছে। এমতাবস্থায় তার পক্ষে একই বাড়িতে আবিরের মুখোমুখি চলাফেরা করা কোনোভাবেই সম্ভব না। তাই সিদ্ধান্ত নিয়েছে সে সত্যি হোস্টেলে চলে আসবে। স্যারের সাথে কথা বলে ফরমও নিয়ে গেছে।ভার্সিটি থেকে ফেরার পর থেকে মেঘ হালিমা খানের রুমেই শুয়ে আছে। এই বাড়ি ছেড়ে, বাড়ির মানুষগুলোকে ছেড়ে, আম্মুকে ছেড়ে হোস্টেলে চলে যাবে ভাবতেও বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠছে। মাকে জড়িয়ে ধরে ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদছে মেঘ। হালিমা খান পাশ ফিরে মেঘের মুখের দিকে তাকাল। কান্নায় ভেজা চোখের দিকে চেয়ে অত্যন্ত মোলায়েম কণ্ঠে শুধালেন, “কি হয়ছে মা? কাঁদছিস কেন এভাবে? কেউ কিছু বলছে?” “কিছু হয় নি আম্মু।” হালিমা খান বেশকয়েকবার মেঘকে জিজ্ঞেস করেছেন কিন্তু মেঘ উত্তর দেয় নি। আম্মুকে জড়িয়ে ধরেই ঘুমিয়ে পরেছে। সন্ধ্যার

দিকে হালিমা খান উঠে গেছেন। মেঘ সন্ধ্যার আরও অনেক পর পর্যন্ত ঘুমিয়েছে। ইদানীং মন খারাপের কারণে ঠিকমতো খাওয়াদাওয়া করে না মেয়েটা, শরীরও অনেক দূর্বল হয়ে গেছে। আবির সন্ধ্যার দিকে বাসায় ফিরেছে। মেঘের রুমের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় নজর পরে মেঘের রুমের দরজা খোলা, ফোনটাও বিছানার উপর পরে আছে। গতকাল রাতে ধমক দেয়ার পর থেকে এখনও মেঘকে দেখে নি আবির। মেঘের রুমে পা বাড়ালো কিন্তু মেঘ কোথাও নেই। ফাঁকা রুম দেখে আবিরের বুকটা মোচড় দিয়ে উঠেছে। নিচে মীম আর আদি খেলতেছে ওখানে মেঘ নেই, রুমেও নেই, ফোনটাও রুমে ফেলে গেছে। রুম থেকে বের হওয়ার জন্য দু কদম এগুতেই মেঘের ফোনে কল বেজে উঠেছে। আবির ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো ফোনের দিকে। 'Minhaz' নামে সেইভ করা নাম্বার দেখে আবিরের মেজাজ চরম মাত্রায় খারাপ হলো। কল রিসিভ করতেই ওপাশ থেকে মিনহাজ বলে উঠে, "কিরে তুই কি বাসায় বলছিস? বাসার মানুষ রাজি হয়ছে? কবে আসতেছিস তাহলে?" আবির অত্যন্ত গুরুতর কণ্ঠে শুধালো, "কোথায়?" মেঘের ফোনে কোনো পুরুষের কণ্ঠস্বর শুনে মিনহাজ সঙ্গে সঙ্গে কল কেটে দিয়েছে। ভয়ে মিনহাজের হাত- পা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে। তানভির নাকি আবির কল রিসিভ করেছে এটাও বুঝতে পারে নি সে। অবশ্য বুঝার কথাও না কারণ আবিরকে দেখলেও ঠিকমতো কথা শুনেনি। আর তানভিরের কথা মিনহাজ শুনেছে তাছাড়া ফেসবুকে ছবি দেখেছে। এখনও বাস্তবে দেখে নি তাই কণ্ঠস্বর বুঝার কোনো উপায়

নেই। এখন মেঘের জন্য মিনহাজের খুব চিন্তা হচ্ছে। মেঘ বাসায় না বলে থাকলে নিশ্চয় এখন বকা খাবে। আবির মেঘের ফোন রেখে নিজের রুমে চলে গেছে। জানুয়ারি মাসের হাড় কাঁপানো শীতেও রাগে আবিরের শরীর ঘামছে। ফ্রেশ হয়ে সোজা নিচে আসছে।। আবিরকে আসতে দেখে মীম আর আদি যে যার মতো রুমে চলে গেছে। আবির ড্রয়িং রুম থেকে মামনিকে প্রশ্ন করে, "মামনি, মেঘ কোথায়?" "ও তো আমার রুমে ঘুমাচ্ছে। কেন, কোনো দরকার? " "নাহ। তেমন কিছু না। দেখছি না যে তাই ভাবলাম বাসায় নাকি বাহিরে। " হালিমা খান চিন্তিত কণ্ঠে বললেন, " আমার মেয়েটার কি যেন হয়ছে, কিছু বলে না সারাদিন ই মন খারাপ করে বসে থাকে। বেশি কিছু বলতে গেলে কান্নাকাটি শুরু করে। আমি কি করবো কিছুই বুঝতে পারছি না। " আবির কয়েক মুহুর্ত নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থেকে সোফায় গিয়ে বসল। দুহাতে মাথা চেপে ধরে আছে। চারদিকের নানান দুশ্চিন্তায় মাথায় প্রচন্ড ব্যথা অনুভব হচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই তানভির নিচে আসছে। আবিরকে এভাবে বসে থাকতে দেখে আবিরের কাছে বসতে বসতে জিজ্ঞেস করল, "কি হয়ছে ভাইয়া?" আবির অসহায় দৃষ্টিতে তানভিরের দিকে তাকালো। আবিরের চোখ-মুখের দূরাবস্থা দেখে তানভির শান্ত কণ্ঠে শুধালো, " এত টেনশন করছো কি নিয়ে?" আবির আশেপাশে চেয়ে দেখে নিল। কোথাও কেউ নেই দেখে আস্তে করে বলা শুরু করল, "আমি আর পারতেছি না ভাই। দিনকে দিন মানুষের সহ্য ধৈর্যের সীমা বাড়ে আমার উল্টো সহ্য ধৈর্যের মাত্রা শূন্য হয়ে

যাচ্ছে। তোর বোনের এই অবস্থা সহ্য করার সামর্থ্য আমার নেই। ওর চোখের দিকে তাকাতে পারি না আমি, নিজেকে বড্ড অপরাধী মনে হয়। প্রতিনিয়ত নিজের মনের সঙ্গে যু*দ্ধ করেই চলেছি। নিজেকে সামলাতে না পেরে সবসময় ওরে দূরে সরিয়ে রাখি। বুকে পাথর রেখে আর কতদিন চলবো? তোর বোনের কান্নায় আমার বুকের উপর জমানো পাথর পর্যন্ত গলে গেছে । আমি এমনই অভাগা যে মনের রাজ্যের রানীকে তার প্রাপ্য অধিকারটুকু দিতে পারছি না। ওর দুচোখের পানি মুছে বলতে পারছি না, " আজকের পর তোকে আমার কারণে কাঁদতে হবে না। ও কে জড়িয়ে ধরে চিৎকার করে বলতে পারছি না, "আমি তোকে আকাশ সম ভালোবাসি।" "বনুকে সময় দিলে তো ওর মনটা একটু হালকা হতো।" "ঐদিন দেখলি তো তোর বোন কি করল, তুই, আমি এতবার বলার পরও বের হতে রাজি হলো না। আমি জানি ও আমার উপর রেগে আছে, আর কেন রেগে আছে সেটাও খুব ভাল করে জানি। তারপরও ওর রাগ ভাঙাতে পারছি না। রাগ ভাঙাতে গেলেই একের পর এক প্রশ্ন করবে, আমি সেই প্রশ্নগুলোর মিথ্যা উত্তর দিতে পারব না। দরকার হয় দূরে থাকব তবুও আমি ও কে আর কোনো মিথ্যে কথা বলবো না। এটা আমার প্রমিজ" "ফুপ্পির বিষয়ে কিছু ভাবছো?" "সেটায় ভাবতেছি। কিভাবে ভাই বোনদের সামনাসামনি করব আর কি রিয়াকশন হবে এসব ভেবেই মাথা আওলে যাচ্ছে আমার। " হালিমা খান দুভাইয়ের জন্য কফি আর নুডলস নিয়ে আসতেই দুভাইয়ের কথোপকথন থেমে গেছে। আবির

নিজের ফোন হাতে নিয়ে চাপাচাপি করতেছে। কফি দেয়ায় এক হাতে কফি নিয়ে অন্য হাতে ফোন ধরে তানভিরের সঙ্গে রাজনীতি নিয়ে কথা বলা শুরু করল। মেঘ ঘুম থেকে উঠে মায়ের রুম থেকে বের হতেই সোফায় আবির আর তানভিরকে দেখে মাথায় ভালোভাবে ওড়না দিয়ে মাথা নিচু করে চুপচাপ সিঁড়ি দিয়ে উঠে যাচ্ছিলো। তাকাবে না ভেবেও নিজেকে আটকাতে পারল না। সিঁড়ি থেকে তাকালো আবিরের দিকে। নজর পড়ে সোজা আবিরের ফোনের ওয়ালপেপারের দিকে। গতকাল ফোন চেক করার সময়ও ওয়ালপেপারে এই ছবিটা দেখেছিল, যেখানে আবিরের গাল,কান সহ মাথার একপাশ দেখা যাচ্ছিল, নিচু হয়ে কিছু করছিল। কললিস্ট চেক করার তাগিদে ওয়ালপেপারের ছবিটা ভালোভাবে দেখতে পারে নি। তবে আজ আবিরের হাতে থাকা ফোনে ওয়ালপেপার টা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ছবিটাতে আবির ঝুঁকে আছে, একহাতে কোনো মেয়ের হাতের আঙুলগুলো ধরে রেখেছে। সেই সাথে আবিরের ওষ্ঠদ্বয় সেই হাতের উল্টোপিঠের ঠিক মাঝ বরাবর স্পর্শ করে আছে। সদ্য ঘুম থেকে উঠা মেঘ, ঘুম ঘুম চোখে ছবিটা দেখতেই বুকটা ছ্যাত করে উঠল। নিরেট দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো সেই ছবির দিকে। যে আবির ভাইকে ঘিরে রঙিন স্বপ্নে বিভোর ছিল মেঘ সেই আবির কোনো মেয়ের হাতে চুমু খাচ্ছে। ভাবতেই মেঘের দম বন্ধ হয়ে আসছে। নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরে কান্না আটকানোর চেষ্টা করে নিজের রুমে চলে গেছে। চোখের সামনে থেকে সেই দৃশ্য যেন সরছেই না। গতকাল আবির ভাই বলেছেন, ওনি

বিবাহিত। মেঘ সেকথা বিশ্বাস করলেও পুরোপুরি করে নি। তবে আজ প্রমাণ পেয়েছে তাই অবিশ্বাস করার কোনো অপশন নেই। কান্নারাও আজ বিশ্বাসঘাতকতা করছে। কাঁদতে চেয়েও কাঁদতে পারছে না। গলায় আঁটকে আসছেন কান্না। আজ পুরো টেবিল ফাঁকা শুধু এক কোণে মেঘ বসে আছে। অনেকক্ষণ যাবৎ ই মেঘ খাবার টেবিলে বসে অপেক্ষা করছে। আব্বু আর বড় আব্বুকে হোস্টেলের ব্যাপার টা কিভাবে বলবে সেটায় ভাবছে। স্যারের থেকে আনা হোস্টেলের ফরম টা গতরাতেই পূরণ করে রেখেছে। এই বাড়িতে আর থাকবে না বলে মানসিক প্রস্তুতিও নিয়ে নিয়েছে। আস্তে আস্তে সবাই খাবার টেবিলে উপস্থিত হলো। মেঘ সবার আগে খাবার শেষ করে বসে আছে। কিভাবে বলবে এই সাহসটুকু হচ্ছে না। সামনে আবির বসা এজন্য মূলত আরও বলছে না । আবির খাবার শেষ করে বেসিনের দিকে যেতেই মেঘ বলল, “আব্বু, আমার একটা কথা বলার ছিল ” “বলো আম্মু। কিছু লাগবে তোমার ” “প্রতিদিন বাসা থেকে ভার্সিটি পর্যন্ত যেতে অনেক সময় লেগে যায়, আংকেলকেও আমার জন্য গাড়ি নিয়ে ঘন্টাখানেক অপেক্ষা করতে হয়। তারপর যানজট পেরিয়ে আবার বাসায় ফিরতে হয়। এত জার্নি করে আমারও খুব টায়ার্ড লাগে, পড়াশোনা হয় না ঠিকমতো। তাই বলছিলাম আমি হোস্টেলে সিট নিব। বান্ধবীদের সাথেই থাকবো। মাঝে মাঝে বাসায় এসে ঘুরে যাব। ” তানভিরের খাবার আঁটকে গেছে গলায়। চোখ বড় করে তাকিয়ে আছে মেঘের দিকে তৎক্ষনাৎ ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালো বেসিনের

দিকে। আবির নেই, আতঙ্কিত হয়ে তানভির ঢোক গিলল। আবির ভাইয়া শুনেনি ভেবে দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো। আলী আহমদ খান আর মোজাম্মেল খান দু'জনেই নিরব। মেঘ পুনরায় বলল, "আমি স্যারের সঙ্গে কথা বলেছি। ফরম পূরণও করেছি। আপনারা অনুমতি দিলে আমি আজই ফরম জমা দিব। " বলেই মেঘ বাম হাতটা টেবিলের নিচ থেকে তুলে, হাতে হোস্টেলের সেই ফরম টা। তানভির কিছু বলতে যাবে তার আগেই আবির টেবিলের অপর পাশ থেকে ফরম টা নিয়ে এক টানে ছিঁড়ে ফেলেছে। আচমকা আবিরকে দেখে আঁতকে উঠে তানভির। সে ভেবেছিল আবির হয়তো চলে গেছে। কিন্তু আবির যে তার পেছনে দাঁড়িয়ে ছিল এটা তানভির খেয়াল ই করে নি। আবির রাগান্বিত কণ্ঠে চিৎকার করে উঠে, " কোন সাহসে তুই হোস্টেলে যাওয়ার অনুমতি চাচ্ছিস। কে তোকে এত সাহস দিচ্ছে?যে বা যারা তোকে উস্কাচ্ছে তাদের বলে দিস, সব কয়টাকে আধমরা করে নিজের বাড়ি পাঠাবো। ঢাকা থেকে পড়াশোনা শেষ করতে হবে না! তোকে কিছু বলি না বলে যা ইচ্ছে করবি, জেদ দেখালেই সব পেয়ে যাবি ভাবছিস? তোকে লাস্ট ওয়ার্নিং দিচ্ছি, পড়াশোনা করলে এই বাড়িতে থেকেই করতে হবে, বাড়ির বাহিরে যেতে চাইলে পা দুটা ভেঙে ঘরে বসাইয়া রাখব।" আলী আহমদ খান গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, "আবির, হচ্ছে টা কি! বাড়ির মেয়েদের সাথে উচ্চস্বরে কথা বলবা না। যাও এখান থেকে। " আবির রাগে কটমট করতে করতে চলে যাচ্ছে আর বলছে, "এরপরও যদি কেউ অনুমতি দেন। এর ফল খুব খারাপ

হবে " গতকালের মিনহাজের বলা কথাগুলো বার বার মনে পরছে। ওদের উস্কানিতেই মেঘ এসব করছে এটা বুঝতে বাকি নেই আবিরের । এদিকে তানভির কি বলবে বুঝতে পারছে না। আবির এভাবে চিৎকার করল, আব্বু বা বড় আব্বু কিভাবে রিয়েক্ট করবে এটাও বুঝতে পারছে না। তারপরও তানভির বলল, " প্রয়োজনে আমি তোকে বাইকে দিয়ে আসবো, ক্লাস শেষে কল দিলে আবার গিয়ে নিয়ে আসবো। তবুও হোস্টেলে যেতে হবে না। " মেঘ চিবুক নামিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চোখ তুলে তাকাতে পারছে না। মোজাম্মেল খান ভারী কণ্ঠে বললেন, "থাক তোমার আর নিয়ে যেতে হবে না। তোমাদের দুই ভাই-বোনকে একসাথে যেতে দিব না তাও আবার বাইকে। এক্সিডেন্ট করে রাস্তাঘাটে পরে থাকবা, নিজেও ব্যথা পাবা সাথে আমার মেয়েটাকেও ব্যথা দিবা। দরকার হলে আমি আমার মেয়েকে নিয়ে যাব।" পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে তানভির ঠাট্টার স্বরে বলল, "আপনি আমায় এত অবিশ্বাস করেন?" "বাইকারদের উপর আমার বিন্দুমাত্র বিশ্বাস নাই। " "ভয় পাইয়েন না। আমার জীবন থাকতে আপনার মেয়ে আর আমার বোনের গায়ে একটা আঁচড় ও পড়তে দিব না আমি। এটুকু বিশ্বাস রাখতে পারেন। " মেঘ এবার ছলছল নয়নে তানভিরের দিকে তাকিয়েছে। তানভির মেঘকে অনেক ভালোবাসে এটা মেঘ বুঝতে পারে। কিন্তু আজ এত কনফিডেন্স নিয়ে আব্বুর সামনে এভাবে কথা বলছে দেখেই মেঘ আশ্চর্য নয়নে তাকিয়ে আছে। আচমকা আবিরের রুম থেকে কাঁচ ভাঙার শব্দ আসে। শব্দ শুনে মেঘ

সেদিকে এক পলক তাকিয়ে তৎক্ষনাৎ সিঁড়ির দিকে ছুটে। তানভিরও খাবার রেখে বেসিনে হাত ধৌতে যায়। রান্নাঘর থেকে মালিহা খান আর হালিমা খান আর্তনাদ করে উঠেন। ইকবাল খান উঠে যেতে চাইলে আলী আহমদ খান আঁটকে দেন। গম্ভীর কণ্ঠে বলেন, "এটা ওদের ভাই বোনের ব্যাপার। ওদেরকে বুঝে নিতে দাও। বড় রা সেখানে উপস্থিত থাকলে বিষয়টা আরও খারাপের দিকে যাবে। " মালিহা খান যেতে চাইলে ওনাকেও আঁটকে দেন। মালিহা খান চিন্তিত কণ্ঠে বললেন, "আবির যদি রেগে গিয়ে মেঘের গায়ে যদি হাত তোলে!" "তানভির মাত্র কি বলল শুনলে না, বোনের গায়ে একটা আঁচড় ও পড়তে দিবে না। দেখি সে তার দায়িত্ব কতটা পালন করতে পারে। " এদিকে মেঘ অন্তহীন পায়ক ছুটে যায় আবিরের রুমে।দরজা থেকে তাকায় ভেতরে। আবির তাকে রুমে ঢুকতে নিষেধ করেছিল। তাই সরাসরি ঢুকতে পারছে না। দরজা থেকে উঁকি দিতেই দেখে আবির বিছানার একপাশে বসে আছে। দু হাঁটুর উপর দু'হাত। ডানহাতের কয়েক জায়গায় ভাঙা কাঁচের টুকরো লেগে আছে। সেখান থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় রক্ত পরছে। মেঘ সব ভুলে রুমে ঢুকে চিৎকার করে উঠে, "এটা কি করেছেন আপনি?" ড্রেসিং টেবিলের ঠিক মাঝবরাবর আবির ঘুষি টা দিয়েছে। অর্ধেক কাচঁ ভেঙে পরে গেছে আর অর্ধেকটা এখনও লেগে আছে। মেঘ হাত থেকে কাঁচ ছুটাতে গেলে আবির নিজের হাত সরিয়ে নিয়ে রাগান্বিত কণ্ঠে বলে, "Don't touch me. " মেঘ সেসব কথায় কান না দিয়ে আবার এগিয়ে যায়

আবিরের কাছে। দ্বিতীয় বারের মতো হাত ধরতে গেলে আবির চারগুণ ভারি কণ্ঠে চিৎকার করে উঠে, “বললাম তো, ছুঁবি না আমায়” বলেই পাশের টেবিলে থাকা কাঁচের গ্লাস ছুঁড়ে মারে ড্রেসিং টেবিলের দিকে। এই দৃশ্য দেখে মেঘ আতঙ্কে উঠে দু কদম পিছিয়ে যায়। ভয়ে শরীর ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে। হাত পা কাঁপছে। দাঁড়িয়ে থাকার শক্তি পাচ্ছে না। ড্রেসিং টেবিলের বাকি অর্ধেক কাঁচ সাথে গ্লাসের ভাঙা টুকরোতে ফ্লোর ভরে গেছে। মেঘ কপাল কুঁচকে তাকিয়ে আছে আবিরের হাতের দিকে। কাঁচের টুকরো গুলো এখনও হাতে ঢুকে আছে। খুলার চেষ্টাও করছেন না। ফ্লোরে লাল টকটকে রক্ত ভেসে যাচ্ছে। মেঘের গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। এমন সময় তানভির রুমে ঢুকে। আবিরের কাছে যেতেই আবির রাগী স্বরে বলল, “তানভির, তোর বোনকে এখান থেকে যেতে বল” তানভির স্বাভাবিক কণ্ঠেই মেঘকে বলল, “তুই রুমে যা। ” মেঘ কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে বলল, “ওনার হাতে কাঁচ....” ” আমি দেখছি। তুই যা, প্লিজ । ” মেঘ রুম থেকে বেড়িয়ে যাচ্ছে। যেতে যেতে বেশ কয়েকবার তাকিয়েছে। চোখ ছলছল করছে। সামান্য হোস্টেলে যাওয়ার কথাতে আবির ভাই এভাবে রিয়েক্ট করবেন মেঘ ভাবতেও পারে নি। আজ ভার্সিটিতেও যায় নি। মিনহাজ, সাদিয়া, মিষ্টি অনেকবার কল দিয়েছে। কল ও রিসিভ করে নি। তানভির আবিরের হাত পরিষ্কার করে একজন ডাক্তার এনে ব্যান্ডেজ করিয়েছে। মেঘ সারাদিনেও রুম থেকে বের হয় নি। সন্ধ্যার পর তানভির মেঘের রুমে আসছে। তানভির- ভাইয়াকে দেখতে গেছিলি? মেঘ- নাহ। ওনি বারণ

করেছেন যেতে। তানভির- তখন তো রাগে বারণ করেছে। একবার গিয়ে দেখে আসিস। মেঘ- আমি যাব না। তানভির- কেন? মেঘ- ওনি আমায় ওনার রুমে যেতে বারণ করেছেন। ওনাকে ছুঁতে নিষেধ করেছেন। আমি কেন যাব ওনাকে দেখতে? তানভির- এত রাগ,জেদ ভালো না বনু। মেঘ- আমাকে বলছো কেন। রাগ, জেদ ভালো না এগুলো তোমার ভাইয়াকে বলো গিয়ে। তানভির উঠে যেতে যেতে তপ্ত স্বরে বলল, "থাক তোরা তোদের রাগ নিয়ে। আমার কি" মেঘ মিহি কণ্ঠে ডাকল, "ভাইয়া " "কি?" "একটা কথা জিজ্ঞেস করি?" "কর" "আবির ভাই কি বিবাহিত? " তানভির ভ্রু কুঁচকে প্রশ্ন করে, "তোকে কে বলছে?" "আবির ভাই" "ভাইয়া তোকে এই কথা বলছে?" "হ্যাঁ" "ভাইয়া তোকেই বলছে?" "ঠিক আমাকে না। মালা আপুকে মেসেজে বলছে।পরে আমি জিজ্ঞেস করছি তখন বলছে হ্যাঁ বিবাহিত। " "ওহ আচ্ছা। মালা ভাইয়াকে অনেকদিন যাবৎ ডিস্টার্ব করে। পিছু ছুটাতে বাধ্য হয়ে হয়তো বিবাহিত বলেছে। " "আমাকেও তো বলেছে। আমি কি ওনাকে ডিস্টার্ব করি নাকি?" "দূর পাগলী। তোকে তো মজা করে বলছে। " "আর বাচ্চা? " তানভির কপাল গুটিয়ে আহাম্মকের মতে প্রশ্ন করল, "কিসের বাচ্চা? " "ওনি যে বলল ওনার একটা বাচ্চা আছে। " "হায় আল্লাহ। ভাইয়া বলছে আর তুই বিশ্বাস করে ফেলছিস। তোর সাথে ফাজলামো করছে পাগল। এসব চিন্তা বাদ দিয়ে ভাইয়াকে দেখে আসিস। " তানভির চলে গেছে। মেঘ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়লো। কিন্তু মনের ভেতরের অস্বস্তি কাটল না । আবির ভাইয়ের

ফোনের ওয়ালপেপারটা বার বার চোখে ভাসছে। যদি বিবাহিত না হোন তবে ঐ ছবিতে মেয়েটা কে? আগেও একবার আবির ভাইয়ের ওয়ালপেপারে একটা মেয়ের ছবি ছিল। ঐ মেয়েই বা কে? অনেকক্ষণ ভাবনা চিন্তা করে অবশেষে আবিরের রুমের সামনে আসলো। দরজায় দাঁড়িয়ে চেয়ে আছে। আবির ঘুমাচ্ছে তাই ভেতরে ঢুকছে না। একদৃষ্টিতে চেয়ে আবিরকে দেখছে। এত রাগ, অভিমান, ক্ষোভ সবকিছুর পরেও ওনার প্রতি এক অন্যরকম টান কাজ করে। এই অনুভূতি পৃথিবীর সব অনুভূতিকে হার মানাবে। ১০ মিনিট পর আবির সজাগ হয়েছে। দরজায় মেঘকে দেখে আস্তে করে বলল, "ভেতরে আয়।" পুরুষালি কণ্ঠ মস্তিষ্কে পৌছাতেই মেঘের ঘোর কেটে যায়। ধীর পায়ে রুমে ঢুকে। দাঁড়িয়ে আছে দেখে আবির বসতে বলল। মেঘ চেয়ারে বসতে গেলে আবির বিছানার পাশে দেখিয়ে বলল, "এখানে বস।" মেঘও আবিরের কথামতো আবিরের মাথার কাছে বসলো। দুজনেই বেশখানিকটা সময় নিরবতা পালন করল। অবশেষে মেঘ নমনীয় কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, "হাতে কি ব্যথা আছে?" "কম" "ঔষধ খাইছেন?" "নাহ" "কেন?" "এমনি। ইচ্ছে হয় নি" "ঔষধ খেতে কি কারো ইচ্ছে হয়?" "কি জানি!" "আপনি তো এমন ছিলেন না। এমন হচ্ছেন কেন?" "কেমন হচ্ছি?" "ভ*ন্ড" "মনে হয় তোর ছোঁয়া লেগে হইতেছি।" "ইসসস, আমি মোটেই ভ*ন্ড না। " "হুমমমমমমম। মাঝে মাঝে একটু ভন্ডামি করিস আর কি। " আবির ভাইয়ের মায়াবী কণ্ঠে হুমমমমম শুনে মেঘের সব অভিমান গলে গেছে। মুখ গোমড়া করে

ডাকল, “আবির ভাই..” আবির দৃষ্টি সরাসরি মেঘের চোখে পরে, চাওয়াচাওয়ি হয় দুজনের। এবার আবির হুমমমম না বলে ভ্রু জোড়া পরপর দুবার নাচায়। আবিরের এমন কান্ডে মেঘ নিঃশব্দে হেসে মাথা নিচু করে ফেলে। আবির ভাইয়ের এমন চাহনি প্রতিবার মেঘকে লজ্জায় আড়ষ্ট করে। আবির মোলায়েম কন্ঠে শুধালো, “কিছু বলবি?” মেঘ উপর নিচ মাথা নাড়ে। আবির বলে, “বল” “আপনি কি সত্যি বিবাহিত?” “হয়তো” “বাচ্চা?” “প্ল্যানিং করব ভাবছি। ” “মানে কি এসবের ” “বিয়ে করেছি, বাচ্চার প্ল্যানিং করব না?” “কাল যে বললেন বাচ্চা আছে।” “ওটা তো কল্পনায়” মেঘ গম্ভীর কন্ঠে বলল, “ফাইজলামি বন্ধ করুন। ভাইয়া বলছে আপনার বউ বাচ্চা কিচ্ছু নাই। ” “নাহ। এ হতে পারে না। আমার বউ আছে, কল্পনায় বাচ্চাও আছে। আরেকটা প্ল্যানিং করব ভাবছি।” “ফাজলামো বাদ দিন। সত্যি করে বলুন প্লিজ। ” “আচ্ছা তুই না আমায় বিশ্বাস করিস না। তাহলে এই কথা চোখ বন্ধ করে বিশ্বাস করে ফেলছিস কিভাবে?” “তারমানে ভাইয়া যা বলছে তা সত্যি? ” “আল্লাহ জানেন। ” আবিরের ওয়ালপেপারের ছবিটার কথা ভেবে মেঘ পুনরায় ডাকে, “আবির ভাই” “হুমমমমম” “আপনার ওয়ালপেপারের ছবিটা কার?” “আমার কেন?” “আপনার তো জানি। কিন্তু মেয়েটা কে?” “মেয়ে আসলো কোথা থেকে? ” “আমি দেখেছি!” আবির পাশ থেকে ফোন নিয়ে লক খুলে মেঘের দিকে ধরল। ছবিটাতে আবির ঝুঁকে জুতার ফিতা বাঁধতেছিল। আবিরের থেকে কিছুটা দূরে একটা ছেলে একটা মেয়ের হাতে চুমু

খাচ্ছে। ওয়ালপেপার টা দূর থেকে দেখলে মনে হবে আবির ই মেয়েটার হাতে চুমু খাচ্ছে। মেঘ ছবি টা দেখে আবিরের দিকে ফোন দিয়ে বলল, "ওয়ালপেপার দেয়ার মতো আর ছবি নেই আপনার?" "আছে। " "এটা Change করবেন।" "ওকে ম্যাম।" মেঘ নিশ্চুপ। নিজের পঁচা চিন্তাভাবনার জন্য লজ্জায় মাথা নিচু করে বসে আছে। আবির মোলায়েম কণ্ঠে বলল, " আসছিস যখন এক কাজ কর" "কি" "ঐখানে তেল আছে। আমার চুলে তেল দিয়ে দে।" "আমি?" "তো কে? আমার যে বউ আছে এটা তো তুই মানতেছিস না। এখন দিয়ে দে তেল। " "আপনাকে ছুঁতে নিষেধ করেছিলেন। হয়তো ভুলে গেছেন। চুলে তেল দিলে তো স্পর্শ করতে হবে। " "ওহ আচ্ছা। তারমানে ছুঁবি না বলে মনস্থির করেই ফেলছিস?" "জ্বি" "এত জেদ কোথায় থাকে তোর?" "জানি না। " আবির বামহাতে মেঘের ডানহাত টেনে নিজের কপালের উপর রেখে বলল, "দেখ গায়ে কত জ্বর! মাথা ব্যথায় তাকিয়ে থাকতে পারছি না। তারপরও তুই যদি জেদ নিয়ে থাকতে চাস আমার কিছুই বলার নেই। " মেঘ তাড়াতাড়ি গিয়ে তেলের বোতল টা নিয়ে আসছে। এতক্ষণ গা ছুঁয় নি বলে জ্বরের মাত্রা বুঝতে পারে নি। অল্প অল্প করে তেল হাতে নিয়ে আবিরের চুলে ম্যাসেজ করে দিচ্ছে। আবির অপলক দৃষ্টিতে মেঘের দিকে তাকিয়ে আছে, ঠোঁটের কোণে এক চিলতে হাসির ঝলক । মেঘের নজর পড়তেই মেঘ হালকা ধমকের স্বরে বলল, " মাথায় না ব্যথা, চোখ খুলে রেখেছেন কেন?" আবির সঙ্গে সঙ্গে চোখ বন্ধ করে ফেলেছে।

মেঘ বেশ খানিকক্ষণ চুলে ম্যাসেজ করে, মাথা টিপে দিয়েছে। চোখ বন্ধ রাখতে রাখতে আবির কখন যে ঘুমিয়ে পরেছে নিজেও জানে না। মেঘ ১০ মিনিট চুপচাপ বসে রইলো। কি করবে বুঝতে না পেরে ভাবলো রুমে চলে যাবে। যেই না উঠতে যাবে ওমনি আবির কাথ হয়ে মেঘের হাত জড়িয়ে ধরেছে। আবির জ্বরের ঘোরেই বিড়বিড় করতেছে, "তুই যাইস না, প্লিজ " মেঘ দুবার আবিরকে ডাকে কিন্তু আবির গভীর ঘুমে তলিয়ে আছে। জ্বর বাড়তেছে। জলপট্টি দিবে যে তার ব্যবস্থাও নেই। আবির হাত আঁকড়ে ধরায় উঠতেও পারছে না। আবিরের মাথায় হাত বুলাচ্ছে, আবিরকে ডাকছে কিন্তু আবিরের কোনো সারা নেই। কপালে, গলায় হাত দিয়ে মেঘ বার বার জ্বর পরীক্ষা করছে। দিশাবিশা না পেয়ে মেঘ নিজের গাল আবিরের কপালের সঙ্গে মিশিয়ে রেখেছে যেন গায়ের তাপ কিছুটা হলেও মেঘের শরীরে চলে আসে।মেঘ নিজের গাল আবিরের কপালে চেপে ধরেছে ঠিকই কিন্তু হৃদয়ের তোলপাড় কোনোক্রমেই সামলাতে পারছে না। আবিরের গা থেকে আসা তীব্র, ঝাঁঝালো গন্ধ মেঘের নাক দিয়ে ঢুকে সোজা স্নায়ুতন্ত্রকে কম্পিত করছে। মেঘের নিঃশ্বাস ভারী হয়ে আসছে, ঘন ঘন শ্বাস ছাড়ছে যা আবিরের নাকে মুখে পরছে। নিজেকে সংযত করতে না পেরে মেঘ তৎক্ষনাৎ উঠে বসেছে। বুকটা অসহনীয় পর্যায়ে কম্পিত হচ্ছে। ফিনফিন করে কাঁপছে ঠোঁট। হাত ছাড়ানোর চেষ্টা করছে কিন্তু সম্ভব হচ্ছে না। এদিকে আবিরের জ্বর কমছে না বরং ক্রমে ক্রমে বেড়েই চলেছে। মেঘ যে নিচে গিয়ে বড় আম্মুকে ডাকবে

এই সুযোগ টাও পাচ্ছে না। মেঘের ফোন রুমে রেখে আসছিল। আবিরের ফোনের লক খুলতে পারছে না। আবিরের জ্বর বাড়তেছে দেখে দুরুদুরু কাঁপছে বুক, চোখেমুখে চিন্তার ছাপ। আবিরের অকস্মাৎ কান্ডে মেঘের নিঃশ্বাস আঁটকে গেছে। স্তব্ধ হয়ে গেছে, আঁখি জোড়া প্রশস্ত হয়ে গেছে, এই বুঝি কোটর ছেড়ে বেড়িয়ে আসবে। নিঃশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে হৃৎস্পন্দনও থেমে গেছে। জ্বরের ঘোরে আবির বালিশ থেকে সরে মেঘের উরুতে শুয়েছে। এক হাতে মেঘের কোমড় আঁকড়ে ধরেছে। আবিরের মুখ ঠিক মেঘের উদরের সঙ্গে মিশে আছে। আবিরের উষ্ণ শ্বাস জামা ভেদ করে মেঘের নমনীয় উদর স্পর্শ করছে। এতেই মেঘ পাথর বনে গেছে। অনেকটা সময় নিঃশ্বাস আঁটকে ছিল, শেষ পর্যায়ে ভেতরে আটকানো নিঃশ্বাসটা খুব জোরে ছাড়ে। বক্ষপিঞ্জরে আবদ্ধ পাখিটা এই বুঝি উঁড়ে যাচ্ছে। আবিরের একেকটা নিঃশ্বাস মেঘের উদর স্পর্শ করছে আর মেঘের ছোট্ট দেহ প্রতিবার কম্পিত হচ্ছে। কাঙ্ক্ষিত পুরুষের অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণে মেঘ পুরো হতভম্ব হয়ে গেছে। কিছু সময়ের ব্যবধানে শ্বাসনালীতে তুফান শুরু হয়ে গেছে। গলা শুকিয়ে কাট, বার বার ঢোক গিলছে। অবিরত কাঁপছে দুহাত। আবির জ্বরের ঘোরে মেঘকে আরও শক্ত করে জরিয়ে ধরেছে। এমন কল্পনাতীত কান্ডে মেঘের হৃৎস্পন্দনের মাত্রা বেড়ে আকাশ ছোঁয়ার পথে। জানালা দিয়ে আসা কনকনে ঠান্ডা বাতাস মেঘের কানে ঢুকছে, বাতাসেরা যেন মেঘের কানে কানে বলছে, ” তুই তো আবির ভাইয়ের প্রণয়ের অনলে পুড়তেই চাস। তবে কিসের এত

অভিশঙ্কা?” মেঘের শরীর ঝাঁকুনি দিয়ে উঠল। আবিরের গায়ের জ্বরের তাপে মেঘের পেট পুরো গরম হয়ে গেছে। জ্বরের ঘোরে আবির আবোলতাবোল বলা শুরু করেছে। দীর্ঘ সময় পর মেঘ নিজের কাপাঁ কাঁপা হাতে আবিরের মাথায় আলতোভাবে স্পর্শ করেছে। গলা খাঁকারি দিয়ে কোমল কণ্ঠে ডাকল, “আবির ভাই ” আবির উত্তর দেয়ার অবস্থাতে নেই । ঘোরের মধ্যে কি সব বলেই যাচ্ছে। মেঘ কান পেতে শুনছে। বুঝতে চেষ্টা করছে আবির কি বলছে। সব কথা বুঝতে না পারলেও শেষটুকু শুধু বুঝতে পেরেছে, “আমি মা*রা গেলে তুই কাঁদিস না, প্লিজ” আবিরের এমন কথা শুনে মেঘ আবিরের মাথা দু হাতে শক্ত করে আঁকড়ে ধরে আর্তনাদ করে উঠে, “এমন কথা বলবেন না প্লিজ। কিছু হবে না আপনার। ঠিক হয়ে যাবেন। আপনার কিচ্ছু হতে দিব না আমি। ” বেশ খানিকক্ষণ পর মেঘ আবিরকে রেখে দৌড়ে নিচে নামলো। ততক্ষণে বাড়ির সবাই শুয়ে পরেছে। শীতের রাত তাই সবাই একটু তাড়াতাড়ি ই শুয়ে পরে। বড় আম্মুকে ডাকতে গিয়েও থেমে গেল। বড় আম্মুও অসুস্থ, আবির ভাইয়ের এ অবস্থা দেখলে বড় আম্মুর শরীর আরও খারাপ হবে এই ভেবে আর ডাকে নি। ছুটে গেল তানভিরের রুমে। তানভিরও বাসায় নেই। মেঘ নিজের রুম থেকে ঔষধ আর ফোনটা নিয়ে তানভিরকে কল করতে করতে আবিরের রুমে গেল। তানভিরকে আবিরের অবস্থা জানিয়ে তাড়াতাড়ি আসতে বলেছে। অনেকক্ষণ ডাকার পর আবিরের একটু হুঁশ আসছে। মেঘ কোনোরকমে আবিরকে উঠিয়ে ঔষধ খাইয়ে দিয়েছে। আবির

চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছে মেঘ আবিরের কপালে জলপট্টি দিয়ে দিচ্ছে। আবির বেশখানিকটা সময় নিস্তেজ হয়ে পরে রইলো। জ্বর মাথায় উঠে গেছে। মেঘ জলপট্টি দিচ্ছে আর সরাচ্ছে, কপালের তাপে কয়েক মুহুর্তেই পট্টি গরম হয়ে যায়। তাই বার বার পাল্টাতে হচ্ছে। প্রায় ১ ঘন্টা পর আবির হঠাৎ ই চোখ মেলল। জ্বর কিছুটা কমেছে তাই হুঁশ ফিরেছে। সরাসরি মেঘের চোখের দিকে তাকালো।শরীরের উত্তাপে চোখ লাল হয়ে গেছে। মেঘ জলপট্টি দিতে দিতে শুধালো, "শরীর কি বেশি খারাপ লাগছে?" আবির মলিন হাসলো। মেঘ পুনরায় প্রশ্ন করল, "কি হয়েছে?" "কিছু না। আর পট্টি দিতে হবে না। অনেক রাত হয়ছে ঘুমাতে যা। " "আপনি চুপ করে থাকুন, প্লিজ।" আবিরের হাসি ঠোঁট থেকে সরছেই না। বরং ধীরে ধীরে প্রশস্ত হচ্ছে আবিরের ওষ্ঠদ্বয়। মনে মনে মেঘকে নিয়ে রঙিন স্বপ্নের দুনিয়ায় পাড়ি জমিয়েছে। মেঘ এমনভাবে আবিরের যত্ন নিচ্ছে "ঠিক যেন ঘরের বউ"। আবির জ্বরের ঘোরেও মেঘের চিন্তায় বিভোর হয়ে আছে। আবিরের নেশাক্ত দৃষ্টি দেখে মেঘ জিজ্ঞেস করল, " আপনি কি কিছু বলতে চাচ্ছেন?" জ্বরের কারণে আঁটকে আঁটকে বলে, "বলতে তো চাই" "বলুন।" "না থাক। কিছু না" "বলুন।" "বাদ দে। জলপট্টি দিতে হবে না । একটু শান্ত হয়ে বস। হাত নাড়াচাড়া করছিস পরে হাত ব্যথা করবে। " মেঘ গম্ভীর কণ্ঠে বলল, "আমার হাত ব্যথার চিন্তা আপনাকে করতে হবে না। নিজের হাত নিয়ে ভাবুন।" "আমার হাত ঠিক হয়ে যাবে। " মেঘ হঠাৎ ই মায়াবী দৃষ্টিতে আবিরের চোখের

দিকে তাকিয়েছে। মেঘের দুচোখ ছলছল করছে। বুকে চাপা পড়া কষ্টে ভেতরটা ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাচ্ছে। আবিরের নজরও ঠিক মেঘের চোখ বরাবর। অষ্টাদশীর মায়াবী দৃষ্টি আবিরের বুকে ধ্রিম ধ্রিম কম্পনের কারণ। অনুভূতি লুকাতে অক্ষম, জ্বরের কারণে আবিরের হৃদয়ের ব্যকুলতা স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে। মেঘ আবিরের চুলে হাত বুলাতে বুলাতে কোমল কণ্ঠে বলল, "আপনি এমন কেন করেন? " আবির ক্ষীণ হেসে প্রশ্ন করে, "কেমন করি?" " নিজেকে এত আঘাত করেন কেন? সকালে এভাবে হাত না কাটলে তো এখন জ্বরটা উঠতো না।" " রাগ কন্ট্রোল করতে পারি না, এতে আমার কি দোষ" "এত বড় ছেলে হয়েও রাগ কন্ট্রোল করতে পারেন না আবার আমায় জেদ কমাতে বলেন।" "তোর জেদটা কমালেই আমার রাগ কমে যাবে।" "কিভাবে?" "তা তো এখন বলবো না। জ্বর তো এখন কমেছে। তুই বরং রুমে চলে যা।" "তাড়িয়ে দিচ্ছেন কেন?" "তাড়াচ্ছি না। শীতের রাত এমনিতেই ঠান্ডা অনেক। তারমধ্যে এত রাতে তুই আমার রুমে..." "আজব তো।। এত রাতে কি আমি শুধু শুধু আপনার রুমে আসছি নাকি। ভাইয়া বলছিল বলেই আসছি। আর আমি না আসলে তো জানতামও না যে আপনি জ্বরে পরে আছেন। ঔষধ পর্যন্ত খান নি। ঔষধ টা খেয়েছেন বলেই জ্বরটা একটু কমেছে। তাছাড়া আমি তো নিচে গিয়েছিলাম। বড় আম্মু,আম্মু সবাই ঘুমে ছিল তাই ডাকি নি। ভাইয়াকে কল দিয়ে বলছি, ভাইয়া আসতেছে। বাসায় কেউ অসুস্থ হলে কি দেখাও যাবে না?" "আচ্ছা বাবা সরি। আর কিছুই বলব না

তোকে।” “কিছু বলতে হবে না। কি খাবেন সেটা বলুন। খাবার নিয়ে আসি। ” “কিছু খাব না। মাথায় প্রচন্ড ব্যথা করছে, তুই শুধু মাথায় হাত বুলিয়ে দে তাহলেই হবে। ” মেঘ আলতো হাতে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে, একসময় আবির ভাইয়ের চুলে হাত দেয়ার কত ইচ্ছে ছিল, কতই না বাহানা খুঁজেছে কিন্তু সাহস করে ছুঁতে পারতো না। আজ আবির ভাই নিজেই সেই অধিকার দিয়েছেন। মেঘ আবিরের মলিন চেহারায় তাকিয়ে ঈষৎ হাসলো। আবিরের চোখ বন্ধ। মেঘ এক দৃষ্টিতে আবিরের মুখের পানে চেয়ে আছে। এই শ্যামবর্ণের পুরুষ যে অষ্টাদশীর মনের রাজ্যের একমাত্র রাজকুমার। যাকে নিয়ে রোজ রাতে স্বপ্নের দেশে পারি জমায়, কল্পনায় ঘুরে বেড়ায় দেশ থেকে দেশান্তরে। অষ্টাদশীর মনিকোঠায় একমাত্র আবির ভাইয়ের বসবাস। তখনই তানভির রুমে ঢুকে। আবির ঘুমাচ্ছে, মেঘ আবিরের মুখের পানে চেয়ে মাথায় হাত বুলাচ্ছিল। তানভির হুট করে রুমে প্রবেশ করে এই দৃশ্য দেখে হকচকিয়ে উঠলো। রুম থেকে বেড়িয়ে যাবে নাকি ঢুকবে বুঝতে পারছে না। তানভির আস্তে করে গলা খাঁকারি দিতেই মেঘ আঁতকে উঠে। আবিরের থেকে কিছুটা দূরে সরে বসে। তানভির কাছাকাছি এসে জিজ্ঞেস করল, “ভাইয়ার জ্বর কি কমছে?” মেঘ ছোট করে বলল, “অনেকটা কমেছে। ” তানভির আবিরের কপালে আর গলায় হাত রেখে জ্বরের মাত্রা বুঝার চেষ্টা করল। তারপর স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, “তুই আর কিছুক্ষণ বস। আমি ফ্রেশ হয়ে আসছি।” “আচ্ছা। ” তানভির রুম থেকে বের হতে হতে মুচকি হাসলো। সে এটায়

চাইছিল। সকাল থেকে সারাদিন আবিরকে বুঝিয়ে মাথা ঠান্ডা করেছে। মিনহাজের প্রতি যতটা না ক্ষোভ তার থেকেও বেশি রাগ উঠেছিল মেঘের প্রতি। আবির যেখানে আব্বু, আম্মু, চাচা-চাচিদের সামনে নিজেকে সংযত রাখার চেষ্টা করে, মেঘ সেখানে হুট করে সবার সামনে বাড়ি ছাড়ার কথা বলে ফেলছে। আবির মন-প্রাণ দিয়ে চেষ্টা করছে সম্পর্ক ঠিক করতে অন্যদিকে মেঘ কিছু মানুষের উষ্কানিতে সেটা ভাঙতে চাইছে । এজন্যই মূলত আবিরের রাগ কন্ট্রোলের বাহিরে চলে গেছে আর আব্বু চাচ্চুর সামনে যা তা বলে ফেলছে। আবির নিজেও ভেবে পাচ্ছে না আব্বু- চাচ্চু এই ঘটনাটা কিভাবে নিয়েছে বা এর পরিণাম কি হতে চলেছে। মেঘের ভুল আর অন্যায় গুলো তানভির খুব সুন্দর করে ঢাকার চেষ্টা করেছে। আবিরের মাথা ঠান্ডা করতে তানভির শেষ পর্যন্ত হুমকিও দিয়েছে, “যদি মেঘের সঙ্গে ঠিকঠাক মতো কথা না বলে তাহলে সে নিজে মেঘকে নিয়ে হোস্টেলে দিয়ে আসবে। ” একপ্রকার বাধ্য হয়েই আবির শর্ত মেনে নিয়েছে। শত রাগের পরও মেঘকে না দেখে আবির থাকতে পারবে না। গত ৭ বছর অনেক কষ্টে নিজের আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করে রেখেছে। আর সম্ভব না। এখন কয়েক ঘন্টা মেঘকে না দেখলেই ছটফট করতে থাকে। বাসায় থাকলে কারণে অকারণে বার বার নিচে আসে যেন মেঘকে একপলক দেখতে পারে। তানভির রুমে চলে গেছে। মেঘ খানিকটা সময় মাথা নিচু করে বসে রইলো। নির্লজ্জের মতো আবির ভাইকে দেখছিল এটা ভাইয়া দেখে ফেলছে ভেবেই লজ্জায় মুখ তুলতে পারছে না। আবির

ঘুমের মধ্যে পাশ ফিরতেই বালিশের উপর রাখা মেঘের হাত আবিরের গাল স্পর্শ করে। আবিরের গালের খোঁচা খোঁচা দাঁড়ির স্পর্শে মেঘের গাত্রে শিহরণ জাগে। শিরা-উপশিরায় তুফান শুরু হয়ে গেছে। হুটহাট আবির ভাইয়ের অনাকাঙ্ক্ষিত স্পর্শ মেঘের হৃদয়ে প্রেমানুভূতি জাগ্রত করে। হাত সরিয়ে মুগ্ধ আঁখিতে তাকিয়ে রইলো আবিরের অন্যপাশের গালে। আবির কখনো ক্লিন সেইভ করে না। ছোট করে কেটে রাখে দাঁড়ি। সপ্তাহ খানেক আগেই হয়তো কাটিয়েছিল এখন কিছুটা বড় হয়েছে। খোঁচা খোঁচা দাঁড়ি সহ গালটা মেঘকে টানছে। আবির ভাইয়ের প্রতি তীব্র প্রেমানুভূতি, মুগ্ধতায় পরিপূর্ণ গাল মেঘের হৃদয়ের সমস্ত প্রাচীর ভেঙে দিচ্ছে। ইহজগতে আবির ভাইয়ের গাল ব্যতীত আপাতত আর কোনোদিকে তাকাতে পারছে না। মেঘ আস্তে করে আবির কে ডাকল, কিন্তু সারা নেই। সকালের ঘটনায় শরীর থেকে অনেকটা রক্ত বেড়িয়ে গেছে। তাছাড়া কিছুদিনের দৌড়াদৌড়িতে আবিরের শরীরও বেশ দূর্বল। ঠিকমতো খায় না, নিজের যত্ন নেয় না, তারউপর জ্বর, সব মিলিয়ে ক্লান্তিতে বার বার চোখ বন্ধ হয়ে আসছে। তাছাড়া প্রেয়সীর সঙ্গ পেয়ে আবিরের হৃদয় প্রশান্তিতে ভরে গেছে। মেঘ মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়ায় আবিরের মনে হচ্ছিল, “ইহজগতে আর কিছুই প্রয়োজন নেই তার। এভাবেই তার Sparrow কে নিয়ে বাকি জীবন কাটিয়ে দিবে সে। ” আবিরের সারা শব্দ না পেয়ে মেঘ দ্বিতীয় & তৃতীয় বার ডাকে। কিন্তু আবির গভীর ঘুমে তলিয়ে আছে। মেঘ ধীরে ধীরে বিছানা থেকে নেমে, আবিরের গালে টুক করে কিস করেই রুম

থেকে ছুটে পালায়। বেলকনিতে যেতেই আর একটুর জন্য তানভিরের সঙ্গে ধাক্কা লাগতে যাচ্ছিলো। তানভির সামনে থেকে সরে কিছুটা তপ্ত স্বরে প্রশ্ন করল, "এভাবে ছুটছিস কেন? কি হয়েছে? " "কিছু না" বলেই মেঘ নিজের রুমে চলে গেছে। তানভির আবিরের রুমে ঢুকতেই দেখে আবির গালে হাত দিয়ে হা করে তাকিয়ে আছে। তানভিরকে ঢুকতে দেখেই আবির তৎক্ষনাৎ হাত সরিয়ে স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা করে । তানভির ঠাট্টার স্বরে বলল, " আমি কি অসময়ে চলে আসলাম?" আবির নিঃশব্দে হেসে লেপের নিচে মুখ লুকিয়েছে। তানভির হাসতে হাসতে বলল, "নববধূও এত লজ্জা পাবে না তুমি যতটা লজ্জা পাচ্ছো! সমস্যা নেই। আমি কিছু বুঝি নাই। চিল" আবির লেপের নিচ থেকে মুখ তুলে গম্ভীর কণ্ঠে বলল, " তুই বুঝলেই বা কি! আমি কি অবৈধ কিছু করছি নাকি?" "নাহ! একদম ই না।" তানভির একটু থেমে সিরিয়াস মুডে বলল, "থ্যাংকস ভাইয়া। বিশ্বাস করো, তোমাদের দুজনকে হাসিখুশি দেখলে আমার সব দুশ্চিন্তা দূর হয়ে যায়। সবসময় এভাবেই থেকো প্লিজ।" "ভাইরে এভাবে থাকলে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করা কষ্ট হয়ে যাবে। তোর বোনের যন্ত্রণায় আমি কোনো একটা অঘটন ঘটিয়ে ফেলব।" " তোমার প্রতি আমার বিশ্বাস আছে। তারপরও কোনো অঘটন ঘটলে সমস্যা নেই। আমি সামলে নিব।" তানভির খানিকক্ষণ চুপ থেকে পুনরায় বলে, " হাতের কি অবস্থা? ব্যথা আছে?" "আছে। একটু কম।" "তুমি জানো,তোমার নিজের দোষেই আজ তোমার এই অবস্থা " "আমি আবার কি

করলাম?” “তোমার কিছুদিনের আচরণে এমনিতেই বনুর মেজাজ বিগড়ে ছিল তারমধ্যে তুমি বিবাহিত এ কথা কেন বলতে গেছিলা? তারউপর তুমি নাকি এক বাচ্চার বাপ! এসব বলছিলা কেন? এজন্যই জিদে হোস্টেলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিছিলো।” “আমি কি করব। ঐদিন ফোন টা রেখে জাস্ট একটু রুমে গেছি আর আসছি। এরমধ্যে তোর বোন আমার ফোন চেক করে ফেলছে। মালাকে পাঠানো ম্যাসেজ দেখছে। কতটুকু পড়তে পারছে জানি না। তাছাড়া ওয়ালপেপারে যে তোর বোনের সঙ্গে ছবি দেয়া ঐ ছবিও নিশ্চয় দেখছে। কতটুকু কি দেখছে তা বুঝার জন্যই বউ আর বাচ্চার কথা বলছি। তোর বোনের রিয়েকশন দেখে বুঝছি ওয়ালপেপার টা সে ভালোভাবে খেয়াল করে নি। কিন্তু পরদিন তুই আর আমি যখন সোফায় বসে ছিলাম তখন তোর বোন সিঁড়ি থেকে আবারও আমার ফোনের ওয়ালপেপার টা দেখছে। বউ বাচ্চার ব্যাপার টা বিশ্বাস করুক আর না করুক ওয়ালপেপার দেখছে মানে ওরে আর কোনোভাবেই কিছু বিশ্বাস করাতে পারব না। তাই বাধ্য হয়ে আমার ছবি দিয়ে আরেকটা ছবি ইডিট করাইতে হয়ছে। ঐ ছবিটা ওয়ালপেপার দিয়েছি। যাতে তোর বোন ভুল না বুঝে। ভাগ্য ভালো দূর থেকে তোর বোন ওয়ালপেপার টা ঠিকঠাক মতো দেখে নি। না হয় সিউর বুঝে যেত এটা ইডিট করা ছবি। ” তানভির হাসতে হাসতে আবিরের উপর গড়িয়ে পরছে। তানভিরের অট্ট হাসি দেখে আবিরের ভ্রু যুগল কুঁচকে আসে। কন্ঠ খাদে নামিয়ে হুঙ্কার দেয়, “পাগলের মতো হাসছিস কেন?” তানভিরের

হাসি থামছেই না, হাসতে হাসতে কোনো মতনে বলল, “আমার বোনকে এত ভয় পাও?” “ভয় তো পেতেই হবে একমাত্র বউ বলে কথা। ও মানে কি না জানি না! আমি তো ও কে আমার বউ মানি। আমার মতে, পৃথিবীর ৯০% বিবাহিত পুরুষ ই তাদের বউকে ভয় পায়। পৃথিবীর বুকে রাজ করা পুরুষটাও তার বউ এর সামনে নাথিং। এর একটায় কারণ, বউয়ের প্রতি প্রবল ভালোবাসা। আর বাকি যে ১০% পুরুষ আছে তারা বউকে ভালোই বাসে না। পছন্দ তো একজনকে করিস ই, দেখবি রাজনৈতিক ক্ষমতা, দাপট তার সামনে কিছুই না।” তানভিরের হাসি থেমে গেছে। সত্যিই তাই! বন্যার প্রতি যবে থেকে ইমোশন কাজ করে তবে থেকে নিজেকে প্রতিনিয়ত পরিবর্তন করার চেষ্টা করছে তানভির। কেন করছে সে নিজেও জানে না। দু’দিন কেটে গেছে। মেঘ এই দুদিন ক্লাসে যায় নি। কারো সাথে যোগাযোগও করে নি। মিনহাজ কম করে হলেও ৫০ বার কল করেছে। সাদিয়া, মিষ্টি, তামিমও কল করেছে কিন্তু মেঘ কারো ফোন ধরে নি। রাগ তার নিজের প্রতিই, ওদের উস্কানিতে নিজের গলে যাওয়া একদম ই উচিত হয় নি। আজ ভার্সিটিতে আসছে। অনেকদিন পর বন্যাও আজ ক্লাসে আসছে। বন্যাকে দেখেই মেঘ জড়িয়ে ধরেছে। ক্লাস শেষ হতেই সকলে এক জায়গায় জড়ো হয়েছে। মিনহাজ – কিরে, এতগুলো কল দিলাম ধরিস নি কেন? মিষ্টি – তোকে কতগুলো কল, মেসেজ দিলাম কোথায় নিখোঁজ হয়ে গেছিলি। মেঘ- কোথাও না। বন্যা- কিরে কি হয়ছে? কোনো সমস্যা? মেঘ- আমার জীবনটায়

সমস্যায় ভরপুর। বন্যা – হয়ছে কি বল তো মেঘ- আমি ভাবছিলাম হোস্টেলে সিট নিব। ওরা সবাই বলতেছিল হোস্টেলে আসলে ভালো হবে। তাই ফরম নিয়ে গেছিলাম। ফরম পূরণ করে পরদিন আব্বু আর বড় আব্বুকে বলেছি, ওনারা কিছু বলার আগেই আবির ভাই ফরম ছিঁড়ে, চিল্লাচিল্লি শুরু করছেন, এমনকি আমার পা ভাঙার হুমকি পর্যন্ত দিয়েছেন। বড় আব্বু আবির ভাইকে ধমক দিয়েছে। ঐ রাগে রুমে গিয়ে ড্রেসিং টেবিল ভেঙে হাত কেটে একাকার অবস্থা করে ফেলছে। ৩ দিন ধরে হাত ব্যথা আর জ্বরে ভুগতেছে। আজ দেখছি এ অবস্থাতেই অফিসে যাচ্ছে। মিষ্টি, সাদিয়া, মিনহাজ, তামিম, বন্যা সকলেই পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে সবটা শুনলো। বন্যা আতঙ্কিত কণ্ঠে বলল, ” তোর বইন বিরাট সাহস হয়ছে। তুই জানিস ছোট থেকে তোরে কিভাবে বড় করছে। প্রয়োজন ছাড়া এক পা এদিক সেদিক যেতে পারিস নি। তুই ভাবলি কিভাবে যে তোকে হোস্টেলে আসার অনুমতি দিবে। আর তুই অনুমতি চাইতেই বা গেলি কোন সাহসে? তোরে মে*রে আধমরা করে নি সেই কপাল। তুই আমায় একটাবার কল দিতি। আমি ডিরেক্ট নিষেধ করতাম তোকে। ” মেঘ – আমি কিভাবে জানবো এমন কিছু হবে। আবির ভাইয়ের উপর রাগ করেই তো চলে আসতে চাইছিলাম। মিষ্টি রাগান্বিত কণ্ঠে বলা শুরু করল, “তুই হোস্টেলে আসলে এই ব্যাটার কি সমস্যা? ব্যাটা বিয়ে করতে পারে, বাচ্চা থাকতে পারে আর তুই সামান্য হোস্টেলে আসবি এতেই এত হাঙ্গামা। আসলে পুরুষ জাত টায় খা*রাপ। আমি তোর জায়গায়

থাকলে না বলেই চলে আসলাম।” মিনহাজ- দেখ মিষ্টি সব ছেলে কিন্তু খারাপ হয় না। দেখিস না আমি কত নিষ্পাপ ! তামিম- আমিও। বন্যা- কি বলছিস তুই এসব? আবির ভাই বিবাহিত? বাচ্চা আছে? এসব কি শুনছি মেঘ? মেঘ- ওনি সেদিন বলছিলেন ওনি বিবাহিত, বাচ্চা আছে। তারপর জানছি আমার সাথে ফাজলামো করছে। মিষ্টি – আজকে ফাজলামো করে বলতেছে, দুদিন পর দেখবি সত্যি সত্যি বউ নিয়া বাসায় চলে আসছে। পরে চিল্লাবি না বলে রাখলাম। সাদিয়া – এই মিষ্টি চুপ করবি। তোর ব্রেকআপ হয়ছে বলে কি তুই সারা দুনিয়ার মানুষের ব্রেকাপ করিয়ে বেড়াবি নাকি? মিষ্টি- আমি চাই না আমার ফ্রেন্ডরা কেউ ফালতু ছেলের জন্য নিজের জীবন বরবাদ করুক। মেঘ- আবির ভাই মোটেই ফালতু ছেলে না। বাদ দে। আমার আবির ভাইকে নিয়ে তোরা কেউ কিছু বলবি না। আমার আবির ভাই ভালো হলেও আমার, খারাপ হলেও আমার। হইছে? মিষ্টি – ব্যাটা বিয়ে করে ফেলছে শুনে সেদিন তুই ই কান্নাকাটি শুরু করছিলি। মনে নাই? এখন আমাদের দোষ? বন্যা- ও দিনে ১০০ বার আবির ভাইয়ের জন্য কান্না করে, ১০০ বার হাসে। তাই বলে তোরা ওকে আরও উস্কাবি? আমি দুদিনের জন্য বেড়াতে গেছি কি না, আমার বেবিটার ব্রেইন ওয়াশ করা শুরু করে দিছিস! মিনহাজ- আমরা তো চাই তোর বেবিটা হাসিখুশিতে থাকুক। তোর বেবির খেয়াল রাখার দায়িত্ব তো আমাদের ও। বন্যা- দেখলাম তো কেমন খেয়াল রাখছিস। ফাঁসাইয়া দিয়া নিজেরা তো বিরাট শান্তিতে আছিস। যা ঝড় গেছে তো আমার বেবিটার উপর দিয়ে

গেছে।। মেঘ- আবির ভাই বলছে, যারা আমাকে উস্কাইছে তাদের সবকটাকে আধমরা করে নিজের বাড়ি পাঠাবে। বন্যা- একদম ঠিক আছে। এদের মা*রা ই উচিত। তামিম- বন্যা, তুই এভাবে বলতে পারলি? বন্যা- তুই আমার সঙ্গে কথায় বলিস না। বদমাশ পোলা। মিনহাজ- মনে হয় তোর আবির ভাইয়ের থ্রেটে আমরা ভয় পাইছি। বলিস আসতে, দেখব নে তোর ভাইয়ের কত পাওয়ার আর আমার ভাই ব্রাদার্সদের কত পাওয়ার। বন্যা হাসতে হাসতে বলল, "এই গর্জন টা আবির ভাইয়া বা তানভির ভাইয়ার মুখোমুখি হওয়ার পর যেন থাকে। চল মেঘ" মেঘকে নিয়ে বন্যা চলে গেছে। মেঘ বন্যাকে সব ঘটনা খুলে বলেছে। বন্যা শুধু একটা কথায় বার বার বলছে, "তুই আমাকে একটা বার জানাতে পারতি। তুই জানিস, তুই বাড়ির প্রত্যেকটা মানুষের কলিজার টুকরা তারপরও এমন কান্ড কেন ঘটালি। আবির ভাই না চিল্লালে তোর ভাই, আব্বু বা বড় আব্বু নিশ্চয় রাগ দেখাতো। " মেঘ নিজের প্রতি নিজেই বিরক্ত। বন্যাও আর বেশি কিছু বলে নি। মেঘকে বিদায় দিয়ে নিজেও বাসায় চলে গেছে। এদিকে আবির আজ সকাল সকাল অফিসে আসছে। হাত এখনও পুরোপুরি ঠিক হয় নি। কিন্তু একটা বিদেশি কোম্পানির সঙ্গে আজ গুরুত্বপূর্ণ মিটিং। গত তিনবছরের অর্ডারের সমতূল্য এই একটা অর্ডার। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে আবির দের কোম্পানি দেশের সেরা পাঁচটা কোম্পানির মধ্যে একটা হবে। তাই হাতের দূরাবস্থা নিয়েও আবির অফিসে আসছে। টানা দেড় ঘন্টা মিটিং চলল আবির নিজের সর্বোচ্চ

চেষ্টা করেছে। মিটিং শেষে ওনারা ডিল কনফার্ম না করেই চলে গেছেন। বলেছে পরবর্তীতে কল দিয়ে জানাবে। তাই সকলেই একটু টেনশনে আছে। আবির আব্বুর থেকে বিদায় নিতে গেলে আলী আহমদ খান আবিরকে ঠান্ডা কণ্ঠে বললেন, " শুনো আবির, নিজের রাগ যদি নিয়ন্ত্রণে রাখতে না পারো। তবে জীবনে সফল হতে পারবে না।" আবির মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে। সে খুব ভালোভাবেই জানে, ঐদিনের বাড়িত ঘটনার ক্ষোভ প্রকাশ করবেন আলী আহমদ খান। চুপচাপ সহ্য করা ছাড়া কিছুই করার নেই তার।আলী আহমদ খান পুনরায় বললেন, "বাহিরে যায় করো না কেন, বাসায় অন্ততপক্ষে ঠান্ডা থাকার চেষ্টা করবা। ভুলে যেয়ো না তুমি বাড়ির বড় ছেলে। তোমার উপর বাকিরা নির্ভর। তানভির মতো মেঘ, মীম, আদি তিনজনকে আগলে রাখার দায়িত্বও তোমার। কোনো বিষয় নিয়ে অতিরিক্ত চেচামেচি করলে, রাগ দেখালে তোমার উপর থেকে তাদের ভরসা উঠে যাবে। তোমার তাদের সাথে সফ্টলি মিশতে হবে। যাতে ওরা ভুল পথে পা বাড়ালেও তোমাকে তা জানাতে দ্বিধাবোধ না করে। তারপর তুমি বিষয়টা দেখবে, ঠিক মনে হলে ঠিক আর ভুল মনে হলে ভাই বোনদের বুঝিয়ে সেটা থেকে সরিয়ে আনবে। কিন্তু চিৎকার করে, রাগ দেখিয়ে ওদের সাথে কখনও দূরত্ব বাড়িয়ো না। আমি যে ভুল করেছি আমি চাই না একই ভুল তুমিও করো। আমার পরে খান বাড়িত পুরো দায়িত্ব তোমার। তাই তোমাকে যেমন শক্ত তেমন কোমল হতে হবে। আশা করি বুঝতে পেরেছো। এখন যেতে পারো।। " "জ্বি

আচ্ছা” বলে আবির অফিস থেকে বেড়িয়ে পরেছে। হাতের দূরাবস্থার জন্য বাইক নিতে পারে নি। রিক্সা করে নিজের অফিস হয়ে বাসায় আসছে। সন্ধ্যার কিছুক্ষণ পরেই আলী আহমদ খান, মোজাম্মেল খান হাতে মিষ্টি নিয়ে বাড়ি ফিরেছেন। ইকবাল খান সিলেটে আছেন। বাড়িতে ঢুকেই সবাইকে ডাক শুরু করলেন।মেঘ, মীম,আদি, তানভির, আবির সহ সকলেই নিচে আসছে। আলী আহমদ খান হাস্যোজ্জল মুখে বললেন, “Congratulation My Boy. Order Confirmed. I am proud of you.” আবিরও হাসিমুখে “Thank you ” জানালো। সকলেই বেশ খুশি। সবাইকে মিষ্টি দেয়া হলো। আলী আহমদ খান নিজে আবিরকে মিষ্টি খাইয়ে দিয়েছেন। সবশেষে আলী আহমদ খান আবিরকে উদ্দেশ্য করে বললেন, “আজকের এই খুশির কারণ একমাত্র তুমি। এত অল্প সময়ের মধ্যে তুমি কাজে এত মনোযোগী হয়েছো তারজন্য তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এটা তোমার জন্য অনেক বড় সফলতা । জীবনের সর্বোচ্চ সিঁড়ি পর্যন্ত এগিয়ে যাও।” আবির মৃদু হেসে বলল, “দোয়া করবেন আমার জন্য। ” মোজাম্মেল খান বললেন, “ফি আমানিল্লাহ। দোয়া করি যেন সবসময় সবজায়গায় তুমি সফল হতে পারো।” আলী আহমদ খান শুধালেন, “আজকের এই খুশির দিনে, তোমার কি চাই বলো। যা চাইবে তাই পাবে।” আবির ঢোক গিলে হাসার চেষ্টা করল, খানিকক্ষণ নিরব থেকে বললো, “আমার এখন কিচ্ছু চাই না,তবে একদিন চাইবো। এমন কিছু চাইবো যা দেয়ার জন্য আপনাদের এতবছরের নিয়ম-নীতি পর্যন্ত ভাঙতে হতে

পারে। আশা করবো সেদিনের জন্য মানসিক ভাবে প্রস্তুত থাকবেন।” কথা শেষ করেই আবির নিজের রুমে চলে গেছে। মেঘ আহাম্মকের মতো চেয়ে আছে। আবির ভাইয়ের কথা কিছুই মাথায় ঢুকে নি। কেউ কিছু দিতে চাইছে, নিয়ে নিলেই তো ঝামেলা শেষ। প্যাঁচ লাগাতে হয় কেন। মেঘ এটায় ভেবে পায় না। আলী আহমদ খান আর মোজাম্মেল খানও মুখ চাওয়াচাওয়ি করলেন। আবিরের মা, মেঘের মা আর মীমের মাও নিজেদের মধ্যে কথা বলাবলি করছেন। মীম মেঘকে প্রশ্ন করল, “আপু তোমায় যদি বলতো, যা চাও তাই পাবা। তাহলে তুমি কি চাইতা?” মেঘ মনে মনে বলল, “আবির ভাইকে চাইতাম। আবির ভাইয়ের সম্পূর্ণ হৃদয় জুড়ে আমার অস্তিত্ব চাইতাম। আমি আবির ভাইয়ের পৃথিবী হতে চাইতাম” মীম পুনরায় ডাকে, “আপু বলো না, কি চাইতা?” “জানি না” বলে মেঘ নিজের রুমে চলে যাচ্ছে। মীম তারপরও মেঘের পিছন পিছন ছুটছে। তানভির এতক্ষণ যাবৎ নিরব ভূমিকা পালন করছিল। চলে যাবে কি না সেটাও বুঝতে পারছে না। মেঘ – মীম চলে যাওয়ায় নজর পরে তানভিরের দিকে। মোজাম্মেল খান স্বাভাবিক কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, ” তোমার ভাইয়ের এখন কিছু লাগবে না বলে গেল। তোমার কি কিছু লাগবে?” তানভির এপাশ ওপাশ মাথা নেড়ে না করল। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে মনে মনে বিড়বিড় করে বলে, ” বউ লাগবে। দিবেন এনে? ভাইয়ারও বউ ই লাগবে ” দু-তিনদিন পর বিকেলে আবির তানভির কেউ বাসায় নেই। মেঘ আর মীম টিভি দেখতেছিল। মালিহা খান আর আকলিমা খান

রান্না ঘরে নাস্তা বানাচ্ছিলেন। তখনই জান্নাত বাসায় আসে। গেইট থেকে বলে, “ভেতরে আসতে পারি?” মেঘ,মীম সহ রান্নাঘরে থাকা দুই কর্তীর নজর পরে মেইন গেইটের দিকে। মেঘ জান্নাত আপুকে দেখে আশ্চর্য নয়নে তাকায়। তৎক্ষনাৎ সোফার উপর দিয়ে লাফিয়ে ছুটে গিয়ে জান্নাতকে জড়িয়ে ধরে। জান্নাতও মেঘকে জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞেস করে, “কেমন আছো?” “আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালো। তুমি কেমন আছো ভাবি?” জান্নাত হাসিমুখে উত্তর দেয়, “আলহামদুলিল্লাহ ভালো। এখানে ভাবি বলো না, যে কেউ শুনে ফেলবে।। ” মেঘ আস্তে করে শুধায়, “ফুপ্পি কেমন আছেন?” “আলহামদুলিল্লাহ। ” মালিহা খান রান্না ঘর থেকে বেড়িয়ে এসে বললেন, “আরে জান্নাত যে। এতদিন পর আমাদের কথা মনে পড়ল?” “এদিকে কাজ নেই তাই তেমন আসা হয় না। আজ একটু কাজ ছিল এজন্য ভাবলাম আপনাদের সাথে দেখা করে যায়। ” “খুব ভালো করেছো। ভিতরে আসো। এই মেঘ ভিতরে নিয়ে যা। এখানেই দাঁড় করিয়ে রেখেছিস ” জান্নাত সোফায় বসলো। জান্নাতকে দেখে মীম টিভি বন্ধ করে রান্না ঘরে চলে গেছে। মেঘ জান্নাতের পাশে বসে ফিসফিস করে সব প্রশ্ন করছে, আসিফ ভাইয়া কবে আসবে, কেমন আছে, বাকিরা কেমন আছে থেকে শুরু করে এটা সেটা জিজ্ঞেস করেই যাচ্ছে। জান্নাত আস্তেধীরে সব প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে। মেঘ হঠাৎ ই প্রশ্ন করল, “আপু তুমি যে বিবাহিত এটা বলবা না?” “না” “কেনো?” ” আবির ভাইয়া বারণ করেছেন। ” “আবির ভাই জানে তুমি বাসায় আসবে?” “আবির ভাইয়া ই আমায়

পাঠিয়েছেন। ওনি আর তানভির এখন আমার শ্বশুর বাড়িতে। ”
“ওনারা হঠাৎ ফুপ্পির বাসায় কেন?” “ওনারা প্রতি সপ্তাহেই আমার শাশুড়িকে দেখতে যায়। ” মেঘ উত্তেজিত কণ্ঠে বলে, “কিহ? আমায় একদিনও নিয়ে যায় না কেন?” “আমরা সবাই ই তোমার কথা বলি। তোমাকে নেয় না বলে আম্মু প্রতিবার আবির ভাইয়াকে রীতিমতো ধমকায়।” “দেখেছো তারপরও আমায় নিয়ে যান না। আজকে আসুক বাড়িতে। ” এরমধ্যে মালিহা খান নাস্তা নিয়ে আসছেন। পাশের সোফায় বসে জান্নাত কে ভালোভাবে পরখ করছেন। ওনার সেই অনেকদিনের ইচ্ছে জান্নাতকে ছেলের বউ বানাবেন। আলী আহমদ খানকে বলেওছেন। ওনি তেমন সারাশব্দ করছেন না। ওনি আবিরকে একটু সময় দিতে চাচ্ছেন ব্যবসায় ঠিকমতো মনোযোগ দিলেই বিয়ে করাবেন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। জান্নাতের নাস্তা খাওয়ার এক ফাঁকে আলী আহমদ খান বাসায় ঢুকলেন। জান্নাতের সাথে টুকিটাকি কথা বলে নিজের রুমে চলে গেছেন। জান্নাতও খানিকক্ষণ বসে মেঘের রুমে ঘুরে আড্ডা দিয়ে বেড়িয়ে গেছে। আবির আর তানভির রাতে খেয়ে বাসায় ফিরেছে। ফুপ্পির বাসায় গেলে কখনও না খাইয়ে ছাড়েন না। আবির ফেরার কিছুক্ষণ পরেই মেঘ আবিরের রুমে হাজির হলো। আবির ভ্রু জোড়া নাচিয়ে প্রশ্ন করল, “কিছু বলবি?” মেঘ কপালে কয়েকস্তর ভাঁজ ফেলে বলল, “আমার ভাগ কোথায়?” আবির স্বাভাবিক কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, “কিসের ভাগ?” “ভালোবাসার” আবির ঢোক গিলে ছোট করে বলল, “মানে” “ফুপ্পির ভালোবাসার ভাগ দেন ”

“কাছে আয় দিচ্ছি ” মেঘ দু কদম এগিয়ে গেল, আবির হাত বাড়িতে মাথায় গাট্টা মেরে বলল, “ফুপ্পির হাতে আমি শুধু গাট্টায় খাই। তার ভাগই দিলাম। আর খাবারের ভাগ চাইলে এরপর থেকে নিয়ে আসব। ”মেঘ ঠোঁট উল্টে বলল, “ইসসস, এত জোরে কেউ গাট্টা দেয়? মাথাটা ব্যথা হয়ে গেছে। ” আবির কোমল কণ্ঠে বলে, ” তুই ভালোবাসার ভাগ চাইছিস। কম করে কিভাবে দেয় বল!” “গাট্টামারা ভালোবাসা আমি চাই নি। ” আবির হঠাৎ ই মেঘের দিকে কেমন করে চাইল, উদ্বিগ্ন কণ্ঠে শুধালো, “তো কেমন ভালোবাসা চাইছিস?” মেঘ দরদ মাখা কণ্ঠে বলল, ” আপনাদের মতো আমিও ফুপ্পির সাথে দেখা করতে চাই, গল্প করতে চাই, ফুপ্পির যত্ন পেতে চাই। ” “ওহ আচ্ছা। আমি ভাবলাম অন্য কিছু। ” মেঘ ভ্রু কুঁচকে প্রশ্ন করল, “অন্য কিছু মানে?” “কিছু না। এখন ফুপ্পির বাসায় তোকে নিয়ে যাওয়া যাবে না। তোকে নিয়ে আমি বা তানভির যে কেউ বের হলেই হাজার টা প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। তারথেকে কিছুদিন শান্ত থাক। আমি দেখছি কি করা যায়।” মেঘ আস্তে করে শুধালো, “জান্নাত আপুকে আসতে বলছিলেন কেন?” “দরকার আছে। আচ্ছা বল তো, জান্নাতের সঙ্গে আম্মুর কথা হয়ছিল? আম্মুর রিয়েকশন কি?” “কথা হয় নি আবার! বড় আম্মু পাশের সোফায় বসে খুব সুন্দর মতনে আপুর সঙ্গে কথা বলছেন। বড় আম্মু তো অনেকদিন যাবৎ জান্নাত আপুকে আপনার বউ বানাতে চাচ্ছেন । আপনারা কেন বলছেন না যে আপুর বিয়ে হয়ে গেছে?” “এটা বলে দিলে তো মজাটায় শেষ।” “মানে” “জানতে

পারবি খুব শীঘ্রই। আর হ্যাঁ মুখ ফস্কে জান্নাতের বিয়ের কথা বলে দিস না যেন।" "আমি এত বেক্কল না। " আবির হেসে বলল, "I know that you are the smartest girl in the world. মেঘ ফিক করে হেসে ফেলল। আবির ভাইয়ের মুখে নিজের প্রশংসা শুনে ভীষণ লজ্জা পেয়েছে। লজ্জায় মাথা নিচু করে নিজের রুমে চলে গেছে। সময় ধাবমান। জানুয়ারি পেরিয়ে ফেব্রুয়ারিতে পা দিয়েছে। তীব্র ঠান্ডা অনেকটা কমে এসেছে। মেঘদের ক্লাস শেষ হয়েছে সবেমাত্র পাঁচ মিনিট হলো। বন্যা আর মেঘ গল্প করতে করতে দুজনে হাত ধরে হাঁটছে। তামিম দৌড়ে এসে বন্যার পিছনে দাঁড়িয়ে বন্যাকে ডাকে, "এই বন্যা " বন্যা শুনেও না শুনার মতো হাঁটতে থাকে। তামিম এবার বন্যা আর মেঘের সামনে এসে দাঁড়ায়। বন্যা, মেঘ দুজনেই থমকে দাঁড়ালো। মেঘ তামিমের মুখের পানে তাকালেও বন্যা তাকায় নি, মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে। তামিম অভিযোগের স্বরে বলল, "বন্যা, তুই আমার সাথে ঠিকমতো কথা বলিস না কেন?" "কারণ টা কি তোর অজানা?" "এতদিন হয়ে গেছে এখনও ঐ বিষয় নিয়ে পরে আছিস। চলতে চলতে কারো প্রতি ইমোশন আসতেই পারে, তোর প্রতিও আসছিল তাই আমি তোকে আমার মনের কথা বলছিলাম। তুইও তোর মতামত জানিয়েছিস এবং আমি তা মেনে নিয়েছি। তুই না করছিস এরপর কি আমি তোকে কোনো প্রশ্ন করছি বা জোরাজোরি করছি? তুই রিজেক্ট করছিস বলে এই না যে আমি মরে যাব। কিন্তু তার প্রভাব বন্ধুত্বের উপর কেন পড়বে বলতো! তারপরও আমি

আন্তরিকভাবে দুঃখিত। প্লিজ বন্ধুত্বের সম্পর্কের সুবাদে হলেও আমায় ক্ষমা করে দে।” বন্যা কিছুটা ভারী কণ্ঠে বলল, “আচ্ছা” এরমধ্যে মিনহাজ ও এগিয়ে আসল। তিনজনকে উদ্দেশ্য করে বলল, “কিরে, তোরা এখনও এখানে ” তামিম প্রশ্ন করে, “তুই কোথায় গেছিলি?” “নেতারা আসছে। ওনাদের সামনে মাস্টার্স পরীক্ষা। ভার্সিটি থেকে বেড়িয়ে যাওয়ার সুবাদে ওনারা একটা পোগ্রাম করবে শুনলাম। ভার্সিটির পাশাপাশি ঢাকার সুনামধন্য কলেজের স্যাররা, বড় বড় অবস্থানে থাকা ব্যক্তি বর্গরাও সেই পোগ্রামে আমন্ত্রিত থাকবে।” বন্যা বলল, “ভালো কিন্তু তুই ঐখানে কি করতে গেছিলি?” “এমনিতেই। নেতাদের সাথে দেখা করতে গেছিলাম। ওনাদের সাথে পরিচয় থাকা ভালো। রাজনৈতিক পাওয়ার থাকবে, যেকোনো সমস্যায় সাহায্য পাওয়া যাবে। তাছাড়া সাধারণ সম্পাদক আমার রুমমেট। মেঘ বলছিল না, ওর আবির ভাই নাকি আমাদের আধমরা করে বাড়ি পাঠাবে। আর কিছুদিন ওয়েট কর দেখবি আমার কত পাওয়ার হয় !” বন্যা মেঘের দিকে চেয়ে হাসতে হাসতে বলল, “দেখছিস মেঘ, তোর আবির ভাইয়ের ভয়ে নেতাদের পিছু নিচ্ছে।” পুনরায় মিনহাজকে উদ্দেশ্য করে বলল, ” নিজের নাই দুই আনা ক্ষমতা আবার ভাব দেখায় ষোল আনার। সেদিন যেভাবে বলছিলি ভাই ব্রাদার্সের পাওয়ার দেখাবি, তখন তো ভাবছিলাম তোদের এলাকার ভাইদের কথা বলছিস। ” মেঘ মৃদু হেসে বলল, “এজন্যই বলি আমার আবির ভাই সবার সেরা। তোদের মতো ৮-১০ জনকে পে*টানো আমার আবির

ভাইয়ের কাছে জাস্ট ৫ মিনিটের ব্যাপার। ওনার কাউকে প্রয়োজন নেই, একায় ১৯৯ জনের সমান। " তামিম উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলল, "১৯৯ জনের সমান কিভাবে হয়? হলে ১০০ জনের সমান হবে।" " আমার আবির ভাই একটু ব্যতিক্রম তাই ১৯৯ জনের সমান।" "এটা কেমন লজিক? " "এটা আমার লজিক তোরা বুঝবি না। " মিনহাজ তপ্ত স্বরে বলল, "শুন, কথায় কথায় আমার আবির ভাই, আমার আবির ভাই করিস না। কানে খুব লাগে" "তোর কানে লাগে এটা তোর কানের সমস্যা। তাড়াতাড়ি ডাক্তার দেখা গিয়ে। আমি আমার আবির ভাই ই বলবো। আমার আবির ভাই, আমার আবির ভাই, আমার আবির ভাই। " মিনহাজের মেজাজ খারাপ হচ্ছে। তবুও শান্ত থাকার চেষ্টা করছে। মিনহাজ রাগে অন্যদিকে তাকিয়েছে। অকস্মাৎ মেঘদের দিকে চেয়ে বলল, "এই সাইড দে, ভাই রা আসতেছে। " বন্যা, মেঘ, তামিম সাইড হয়ে দাঁড়িয়ে। প্রায় ১৫-২০ জন ছেলে হেঁটে আসছে। রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা জুনিয়রদের সালাম দেখেই তাদের অবস্থান বুঝা যাচ্ছে। মেঘদের কাছে আসতেই মিনহাজ সুন্দর করে সালাম দিল, সামনের দিকের গম্ভীর চেহারার একজন চোখ দিয়ে একটু ইশারা করল। সালাম গ্রহণ করেছে এটায় বুঝালো। ওনারা পাশ কেটে যেতেই মেঘ বলল, "কিরে তোর ভাই তো সালামের উত্তর টাও দিল না।" মিনহাজ বিরক্তিভরা কণ্ঠে বলল, "ওনার কি এত মানুষের সালামের উত্তর দেয়ার সময় আছে নাকি।" ২ মিনিট পরেই কিছুটা দূর থেকে হৈ হুল্লোড়ের শব্দ ভেসে আসছে। মেঘরা পিছন ফিরে তাকাতেই দেখে

ছেলেগুলো কাকে ঘিরে কথাবার্তা বলতেছে। কাকে ঘিরে আছে তা দেখা যাচ্ছে না। কৌতুহল বশতই মেঘ, বন্যা, মিনহাজ, তামিম সবাই সেদিকে তাকিয়ে আছে। কয়েকজন একটু সরতেই বাইকটা সাইড করে হেলমেট খুলল। মেঘ উত্তেজিত কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলো, "আবির ভাই। " বাইকটা দেখেই পরিচিত লাগছিল। কিন্তু সিউর ছিল না। হেলমেট খুলতেই মেঘের চোখ কপালে উঠে গেছে। বিস্ময় চোখে তাকিয়ে আছে। বুকের ভেতর হৃদপিণ্ডটা পিটপিট করছে। মেঘ ভার্সিটিতে ভর্তির পর থেকে আবির মেঘকে নিতে বা দিতে আসলে মেইনগেইটের কাছেই নামিয়ে দেয়। কখনও ভিতরে আসে না। আজ ই প্রথম আবির ভিতরে আসছে। মেঘের সাথে সাথে মিনহাজ, তামিম, বন্যাও বেশ অবাক হয়েছে আবির বাইক থেকে নামতেই সভাপতি, সহ সভাপতি, যুগ্ম সম্পাদক, আহ্বায়ক, সাধারণ সম্পাদক একে একে সবাই আবিরকে জরিয়ে ধরছে। আবিরও স্নেহের সহিত সবাইকে জড়িয়ে ধরছে। মেঘ, বন্যা সহ বাকিরাও কিছুটা এগিয়ে গেল। কি হচ্ছে কিছুই বুঝতে পারছে না। মেঘ বার বার চোখ কচলে তাকাচ্ছে। আবির ভাইয়ের ভার্সিটিতে কেউ পরিচিত আছে, এটা মেঘ জানতোই না। তাও আবার রাজনৈতিক ছেলেপেলের সাথে । রাগী, গুরুগম্ভীর স্বভাবের ছেলেটা হাসিমুখে বলল, "Thanks Vaiya, তুমি আমাদের কথা মেনে এত ব্যস্ততার মধ্যেও আসছো এটায় অনেক। আমরা তো ভাবছিলাম তুমি হয়তো আসবেই না।" " তোরা যে এত বছর পরও আমায় স্মরণ করেছিস সেই অনেক বড় ব্যাপার। " "তোমাকে কি

ভুলা সম্ভব? কলেজের হিরো ছিলা তুমি। স্যারদের চোখের মনি সেই সাথে পুরো কলেজের মেয়েদের ক্রাশ বয়। " শেষ লাইনটা কানে যেতেই মেঘ সাপের মতো ফোঁস করে ওঠলো । সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাকায় আবিরের দিকে। আবির ভাইয়ের আশেপাশে ২-১ টা মেয়ের নামই সহ্য করতে পারে না। সেই আবির ভাই নাকি কলেজের সব মেয়ের ক্রাশ ছিল। আল্লাহ জানেন কত মেয়ে প্রেমের প্রপোজাল দিয়েছেন আর কত মেয়ের সাথে প্রেম করে বেড়িয়েছেন। মেঘ নিজের কপাল চাপড়ে বিড়বিড় করে বলল, " মেঘরে তুই শেষ, হাজারো মেয়ের ক্রাশ ওনি, সেখানে তুই কে? তোর দিকে কোনো ছেলে ফিরেও তাকায় না, ক্রাশ তো বহুদূরের বিষয়। তুই আবার আবির ভাইকে চাস। ছিঃ লজ্জা লাগে না ? আবির ভাই যে বোন হওয়ার সুবাদে তোর সাথে দু-একটা কথা বলে সেই তোর কপাল।" বন্যা মেঘের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, " কি বিড়বিড় করছিস? " মেঘের চোয়াল অকস্মাৎ ঝুলে পরল। মনের ঘর মেঘাচ্ছন্ন হয়ে গেছে । শক্ত কণ্ঠে বলল, "কিছু না" আবির ছেলেটার হাতে চাপড় মেরে বলে, " বাজে কথা বাদ দে। হঠাৎ আমায় স্মরণ করার কারণ কি?" আরেকজন বলে উঠলো, " তুমি আমাদের স্পেশাল গেস্ট তাই স্মরণ করেছি। অবশ্য তোমায় মালা দিয়ে বরণ করা উচিত ছিল। আচ্ছা সমস্যা নেই, পোগ্রামের দিন অবশ্যই মালা দিব।" আবির উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলল, "এই থাম থাম, আমায় বরণ করবি মানে? আমি কে?" "তুমি আমাদের শ্রদ্ধেয় বড় ভাই। যার জন্য আমরা আজ এই অবস্থানে। " "আমার জন্য না । বরং তোরা

নিজের অবস্থান নিজেরা তৈরি করেছিস। ” ” যখন পথভ্রষ্ট হয়ে গেছিলাম তখন রাস্তা তো তুমিই দেখিয়ে দিয়েছিলে।” “আচ্ছা বুঝলাম। কিন্তু পোগ্রাম টা কিসের?” “ভার্সিটিতে লাস্ট একটা পোগ্রাম করতে চাচ্ছি।” “প্রোগ্রাম করবি কর। আমার কি কাজ? আমি তো ভার্সিটির কেউ না, পড়িও নি এখানে” “পড়ো নি তাতে কি? বাহিরে পড়তে না গেলে তুমি এই ভার্সিটির ই স্টুডেন্ট থাকতা। এখন কথা হলো, ভার্সিটির পাশাপাশি, আমরা আমাদের কলেজের স্যার- ম্যামদের ইনভাইট করতে চাচ্ছি। আর ইনভাইট তুমি করবা। তাছাড়া তোমাদের মতো সাকসেসফুল কিছু ব্যক্তিবর্গদের ও ইনভাইট করা হবে। তোমরা তোমাদের সুদর্শন চেহারা দেখিয়ে জুনিয়রদের সঠিক পথ দেখাবা। ” “প্রথমত আমি কোনো সাকসেসফুল ব্যক্তি না। দ্বিতীয়ত আমি এই ভার্সিটির স্টুডেন্ট না। তৃতীয়ত তোদের প্রোগ্রামে আমি স্যারদের ইনভাইট করার কে?” “প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় বুঝি না। তুমি আমার ভাই এটায় একমাত্র কথা। ভাই তো নাকি?” “হ্যাঁ ভাই। তো?” “তুমি তো আমাদের অবস্থা দেখেই গেছিলা। স্যাররা একপ্রকার বের করে দিচ্ছিল কলেজ থেকে। সেদিন তুমি স্যারদের রিকুয়েষ্ট না করলে আমাদের যে কি অবস্থা হতো আল্লাহ ভালো জানেন। তুমি চলে যাওয়ার পর আমরা যতদিন কলেজে ছিলাম, এমন একটা দিন যায় নি যে স্যাররা আমাদের সামনে আসলে তোমার নাম নেয় নি। তুমি না বললে আমাদের বের করে দিত, আরও কত কথা। সেসব এখন অতীত। তোমার কথামতো পড়াশোনা করে আমাদের ১২ টা বন্ধুর

মধ্যে ৯ জন ই DU তে ভর্তি হয়েছি। বাকিরাও ভালো অবস্থানে আছে। তোমার সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছি কিন্তু তুমি নেটওয়ার্কের বাহিরে ছিলা। কিছুদিন আগে হঠাৎ একদিন তোমাকে একটা মেয়ের সঙ্গে দেখলাম। ডাকার সুযোগ ছিল না। অনেক খোঁজ নিয়ে জানতে পারছি তুমি তানভিরের ভাই। তারপর তানভিরের থেকে ফেসবুক আইডি নিলাম। আমার বা আমাদের জীবনের গল্পে তুমি অন্যরকম ভূমিকা পালন করেছো যার ঋণ কোনোদিন দিয়ে শেষ করতে পারব না। তাই তোমার পোগ্রামে আসতেই হবে।" "বাবা গো! তোরা যেভাবে আমার প্রশংসা করছিস, আমার বাপেও আজ পর্যন্ত এত প্রশংসা করে নি।" "তুমি যে কি চিজ, তোমার বাপে হয়তো বুঝেই নাই " আবির মৃদু হাসলো। আরেকজন বলে উঠল, " ভাইয়া জানো, একই শহরে থেকেও গত পাঁচ বছর যাবৎ কোনোদিন কলেজে পা দেয় নি। স্যারদের দেখে মুখ লুকিয়ে চলছি। এখন তো ভার্সিটি লাইফ শেষ। দুদিন পর কে কোথায় থাকবো তা জানা নেই। তাই পোগ্রাম টা করতে চাচ্ছিলাম। ভার্সিটির স্যারদের সঙ্গে কথা বলেছি। ওনাদের আপত্তি নেই। এখন তুমি আমাদের সাথে যাবে, আমাদের পক্ষ থেকে কলেজের স্যারদের একটু বলবা। আমরা বললে যদি না আসে, তুমি বললে নিশ্চয়ই রাজি হবেন। " আবির রুষ্ট স্বরে বলল, "সবই করে দিব প্রয়েজনে পোগ্রামেও আসবো কিন্তু গেস্ট হিসেবে নয়। সাধারণ মানুষ আর তোদের ভাই হিসেবে। যদি কোনোপ্রকার মালা দিয়ে বরণ, আমায় নিয়ে ৫০০ শব্দের ভাষণ শুরু করিস। তাহলে

একেকটাকে স্টেজে ফেলে পেটা*বো বলে রাখবাম।” “তাই বলে আমাদের জীবনের গল্পের নায়কের প্রশংসা করব না?” “না করবি না। আমি শুধু তোদের পথ দেখিয়েছি। বাকি সব তোরা করেছিস। তোদের সাকসেস তোদের এতে আমার কোনো হাত নেই। তোরা যে আমার কথা মনে রেখেছিস এতেই শুকরিয়া। এমনও মানুষ আছে যাদের জন্য জীবন দিয়ে দিলেও তারা সেসব ভুলে যায়। দোয়া করি জীবনে সাকসেসফুল হ।” “দেখো তো! তোমায় রাস্তায় দাঁড় করিয়েই জীবন ইতিহাস শুরু করে দিয়েছি। চলো ভেতরে চলো।” “ভেতরে আর যাব না। কথা তো হলোই। আমার নাম্বার রাখ। কবে কলেজে যাবি জানাইস। অফিসে কাজ ফেলে আসছি ” “একদিন কাজ একটু কম করলে কিছু হবে না। কতবছর পর তোমাকে পেয়েছি। আড্ডা না দিয়ে ছাড়ছি না। চলো চলো।” আবির ঘুরতেই মেঘদের দেখতে পায়। কিছুটা দূরেই দাঁড়িয়ে ছিল ওরা। আবির পেছন ফিরে থাকায় আগে দেখতে পায় নি। মেঘ আশ্চর্য নয়নে তাকিয়ে আছে। ওদের সব কথোপকথন ই মেঘ মনোযোগ সহকারে শুনেছে। বুঝতে বাকি নেই ওদের পড়াশোনাতে আবির ভাইয়ের অবদান অনেকখানি। তবে সেই ছেলেগুলোর কি হয়েছিল তা শুনার বেশ আগ্রহ জাগছে মেঘের মনে। আবির কিছুটা এগিয়ে এসে মেঘের মুখোমুখি দাঁড়ালো। ছোট করে শুধালো, “ক্লাস শেষ?” আবিরের কণ্ঠে মেঘ হকচকিয়ে তাকাল, মনোযোগ ছিল অন্য কোথাও। উপর নিচ মাথা নেড়ে বলল, “শেষ। কিন্তু আপনি এখানে কেন?” মেঘ সব কথা শুনেও না শোনার মতো

প্রশ্ন টা করেছে। আবির চোখের ইশারায় ছেলেগুলোকে দেখিয়ে বলল, “ওদের সঙ্গে দেখা করতে আসছিলাম।” ছেলেগুলো এগিয়ে গেছে, আবিরকে না পেয়ে পেছন ফিরে তাকাতেই মেঘকে দেখল। দু কদম এগিয়ে এসে বলল, “ওনাকেই দেখেছিলাম তোমার সাথে। ওনি কে ভাইয়া? তোমার..” আবির তার আগেই বলল, “আমার কাজিন। তোরা যা আমি আসছি। ” ছেলেগুলো এগিয়ে যাচ্ছে। আবির মেঘকে উদ্দেশ্য করে গলায় তেজ এনে বলল, “আড্ডা দেয়া শেষ হলে বাসায় যা। গাড়ি অপেক্ষা করছে।” মিনহাজ আর তামিমকে দেখেও না দেখার মতো করে চলে যাচ্ছে। মেঘ পিছন থেকে ডেকে বলল, ” আমি আপনার সঙ্গে যাব। ” অনেকদিন হলো আবিরের বাইকে ওঠে না। রাগারাগি, মান অভিমানে ঠিকমতো কথায় বলে নি বাইকে উঠা তো দূরের বিষয়। আজ মেঘের খুব ইচ্ছে করছে আবির ভাইয়ের সাথে বাইকে ঘুরবে। তাছাড়া ফুপ্পির জন্যও মনটা ছটফট করতেছে। সে প্ল্যান করেছে ফুপ্পিকে দেখে একেবারে বাসায় ফিরবে। আবির দু আঙুলে ইশারা দিতেই মেঘ আবিরের কাছে এগিয়ে গেল। আবির প্রখর তপ্ত স্বরে বলল, “আমি না আসলে কি করতি?” মিনহাজ আর তামিমের প্রতি ক্রোধ চেপে রাখতে পারছে না । ওদের দিকে তাকালেই অঘটন ঘটতে পারে তাই তাকাচ্ছে না। মেঘ স্বাভাবিক কণ্ঠে উত্তর দিল, “আপনি না আসলে গাড়িতে যেতাম। আপনি এসেছেন তাই বাইকে যাব।” “আমি তোকে নিতে আসি নি। অন্য কাজে আসছি ” মেঘ জেদ দেখিয়ে বলল, “আমি এতকিছু জানি না। আপনি

আমায় নিয়ে যাবেন এটায় শেষ কথা। ” মেঘের জেদের কাছে আবিরের সুপ্ত ক্রোধ হার মানতে বাধ্য হয়েছে। আবির ক্ষীণ হাসলো। মেঘ জেদ দেখিয়ে কথা বললে, ওর নাক ফোলে যায়, গাল দুটা লাল টকটকে হয়ে যায়। দুধে আলতা চেহারায় রক্ত বর্ণের ছাপ ভেসে ওঠে, গলার দুপাশের দুটা রগ ফুলে ওঠে । মেঘকে এভাবে দেখলে আবিরের উদ্বেলিত হৃদয়ের কম্পন তীব্র হয়ে ওঠে। কল্পনার জগতে পাড়ি দিতে ইচ্ছে করে। রক্তাভ দুগালে ভালোবাসার পরশ এঁকে দিতে ইচ্ছে করে। কিন্তু বরাবরের মতোই সে অসহায়। নিজের অনুভূতি লুকাতে হয় প্রতিবার। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, “কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে।” “ব্যাপার না। অপেক্ষা করবো, বিড়বিড় করে বলল, সারাজীবন” আবির দু কদম এগিয়ে পিছন ফিরে আবার তাকালো। কিন্তু কিছু বললো না। এখানে তামিম, মিনহাজ আছে যাদের সহ্য হয় না। আবার মেঘকে নিয়ে ভেতরে যাবে সেখানেও প্রায় ২০-৩০ টা ছেলে আছে। কে কোন নজরে মেঘকে দেখবে এই চিন্তায় মেঘকে কিছু বলল না। আবির চলে যেতেই বন্যা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে মিনহাজ আর তামিমের দিকে তাকালো। মিনহাজ আর তামিম দুজনেই স্তব্ধ হয়ে আছে। চোখের সামনে এতক্ষণ যা ঘটলো তার কিছুই বিশ্বাসযোগ্য না। নিজের চোখ, নিজের কান কোনোকিছুকেই বিশ্বাস করতে পারছে না। কোথায় ভেবেছিল ভার্সিটির নেতাদের ক্ষমতা দেখিয়ে মেঘদের সামনে একটু ভাব নিয়ে চলবে। উল্টো বড়সড় একটা বাঁশ খেলো। খেলো তো খেলো একদম মেঘদের সামনে।

মেয়েরা মুখে প্রকাশ করুক বা না করুক, বেশিরভাগ মেয়েরায় দাপটি ছেলেদের পছন্দ করে। কেউ কিছু বললে ছেলেটা যেন মুখ লুকিয়ে সেখান থেকে প্রস্থান না নেয়। মেয়েটার সম্মান বাঁচাতে ছেলেটা যেন প্রতিবাদ করতে পারে। প্রতিনিয়ত আবিরের এত প্রশংসা শুনে মিনহাজ ও ভেবেছিল রাজনীতি করবে, নেতাদের পরিচিতি লাভ করে মেঘের মন জয় করে নিবে। কিন্তু আবির ক্ষণে ক্ষণে তার সব প্ল্যান ভেস্তে দিচ্ছে। বন্যা ওদের অসহায় মুখের পানে চেয়ে থেকে হঠাৎ ই হাসি শুরু করেছে। হাসতে হাসতে মেঘের উপর হেলে পড়ছে। বন্যার স্বতঃস্ফূর্ত হাসি দেখে মেঘও হাসলো। বন্যা কেন হাসছে এটা কারোর ই অজানা নয়। ২ মিনিট, ৫ মিনিট, ১০ মিনিট হয়ে গেছে বন্যা হেসেই যাচ্ছে। হাসতে হাসতে পেটে ব্যথা হয়ে গেছে তবুও বন্যার হাসি থামছে না।। মিনহাজ সহ্য করতে না পেরে রাগান্বিত কণ্ঠে বলল, “হইছে বইন থাম। এর বেশি হাসলে ম*ইরা যাইবি। ” বন্যা হাসতে হাসতে বলল, “তোর শ্রদ্ধেয় রাজনৈতিক বড় ভাইদের আমার সালাম দিস। সালামের পরে বলিস, তুই যে আবির ভাইয়াকে মা*রার হুমকি দিয়েছিস। আবির ভাইয়ার প্রতি তাদের যেই ভালোবাসা দেখলাম, আশা করি তারাই তোকে যোগ্য সম্মানী দিয়ে দিবে। ” মিনহাজ রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে বলল, “আমি হুম*কি দিলাম কখন?” “তোর ভাই ব্রাদার্সের পাওয়ার দেখাবি বলছিলি, মনে নেই? এত মন ভুলা তুই?” “আচ্ছা বাদ দে।” “এখন বাদ দিচ্ছি। কিন্তু ভবিষ্যতে এসব আকাশচুম্বী কথাবার্তা বললে তোর শ্রদ্ধেয় ভাইদের বলে দিব।” “আচ্ছা

ঠিক আছে। ” মেঘ এতক্ষণ যাবৎ ই নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে। ইদানীং নিজের সাহস দেখে মাঝে মাঝে নিজেই অবাক হয়ে যায়। আবির ভাইয়ের মুখের উপর জেদ দেখালো, যদি আবির ভাই ভার্সিটির সবার সামনে থা*প্পড় মা*রতো, তবে কি হতো! ভাবতেই ভয়ে কেঁপে উঠছে। সবার সামনে থা*প্পড় খেলে মুখ দেখানোর অবস্থা থাকত না। আবির কিছুক্ষণের মধ্যেই বেড়িয়ে আসছে মেঘ বাসায় চলে গেলে হয়তো বেশিক্ষণ আড্ডা দিত কিন্তু মেঘকে বাহিরে রেখে গেছে তাই মাথায় চিন্তা কাজ করছে। এজন্য তাড়াতাড়ি চলে আসছে। মেঘকে ডাকতেই মেঘ এগিয়ে গিয়ে বলল, “আংকেল কি চলে গেছেন?” “হ্যাঁ। তুই না বললি বাইকে যাবি! তাই তো আংকেলকে চলে যেতে বলছি । কেন?” “আপনার তো অফিস আছে। আমায় নিয়ে গেলে সময় নষ্ট হবে তাই বলছিলাম আমি গাড়িতে চলে যেতাম।” “এটা আগে মনে হয় নি? তোর ভাইয়ের মতো রাগ উঠলে তোরও মাথা ঠিক থাকে না। তখন কিছু বুঝার অবস্থাতেও থাকিস না। ব্যাপার না, চল। ” “আমি রিক্সা দিয়ে বাসায় চলে যায়?” “মেজাজ খারাপ করিস না। চল বলছি।” মেঘ ভয়ে ভয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। ফুপ্পির বাসায় নিয়ে যাবে না আগেই বলছে এখন আবার ফুপ্পির কথা বললে নিশ্চিত মা-ইর খাবে। আবির একটা রিক্সা ঠিক করে বন্যাকে যাওয়ার জন্য ইশারা করল। তারপর মেঘকে নিয়ে চলে গেছে। বাইক চলছে কিন্তু মেঘ স্ট্যাচুর মত বসে আছে। কোনো কথা বলছে না। আবির স্ট্রিট ফুড দেখে কয়েকবার জিজ্ঞেস করেছে খাবে কি না। মেঘ শুধু না করেই যাচ্ছে। অবশেষে

একটা ফুচকার দোকান দেখে বাইক থামালো। আবির শীতল কণ্ঠে বলল, “মাথাটা বোধহয় এখনও ঠান্ডা হয় নি। ফুচকা খেলে নিশ্চয় মাথাটা ঠান্ডা হবে।” মেঘ মাথা নিচু করে বলল, “আমি ফুচকা খাব না।” “আমি মনে হয় ভুল শুনলাম” মেঘ ঠান্ডা অথচ শক্ত কণ্ঠে বলল, “আপনি ঠিকই শুনেছেন। আমি ফুচকা খাব না।” আবির হেসে বলল তাকা আমার দিকে, মেঘ ধীর গতিতে চোখ তুললো। তাকালো আবিরের চোখের দিকে,আবির তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে মোলায়েম কণ্ঠে শুধালো, “ম্যাম,আপনি সত্যি সত্যি ফুচকা খাবেন না?” আবিরের হাবভাব দেখে মেঘ না চাইতেও হেসে ফেলল। সে আবিরের ভয়ে ফুচকা খাবে না বলছিল, কিন্তু আবির ই তাকে বার বার উস্কাচ্ছে। মেঘ আবিরের মুখের পানে চেয়ে মনে মনে ভাবছে, ” আপনার মধ্যে কি এমন স্পেশাল গুণ আছে যা ক্ষনিকের ব্যবধানে রাগকে ভয়ে আবার ভয়কে জয়ে পরিণত করতে সক্ষম।” আবির ভ্রু নাচাতেই মেঘ মৃদু হাসলো। ফুচকা অর্ডার দিয়ে বসে আছে। আবির মেঘকে দেখছে আবার আশেপাশে তাকাচ্ছে। আবির হঠাৎ ই মুচকি হেসে বলল, “তোকে আজ অনেক বেশি কিউট লাগছে” মেঘ চোখ গোলগোল করে তাকালো। গলায় শ্বাস আঁটকে গেছে। ঠিক শুনছে নাকি ভুল! আবির ভাই মেঘকে কিউট বলেছে। ভাবা যায়! মেঘ লজ্জায় আড়ষ্ট হয়ে যাচ্ছে তবুও স্বাভাবিক থাকার খুব চেষ্টা করছে। আবির পুনরায় বলল, “নীল রঙটা তোকে খুব মানাচ্ছে। আগে বোধহয় কখনো নীল রঙের জামাতে দেখি নি।” মেঘ এবার আরও বেশি লজ্জা পেয়েছে। চোখ দ্বিগুণ

নামিয়ে নিয়েছে। আবির স্থির দৃষ্টিতে মেঘকে দেখছে। পলক ও ফেলছে না। তা বুঝতে পেরে মেঘ আরও তাকাতে পারছে না। গাল আর নাকের ডগা আবারও লাল হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে লাল রঙের ব্লাশ লাগিয়েছে। মেঘ ঘনঘন নিঃশ্বাস ফেলছে, সামান্য কিউট বলাতে যে কেউ এত লজ্জা পেতে পারে, এটা মেঘকে না দেখলে বুঝায় যেত না। মেঘ বার বার নিজেকে স্বাভাবিক করার চেষ্টা করছে কিন্তু চোখ তুলতেই পারছে না। ওষ্ঠদ্বয় কাঁপছে তিরতির করে। মেঘের অবস্থা বুঝতে পেরে আবির দৃষ্টি স্বাভাবিক করে পুনরায় বলল, "ফুপ্পিকে দেখতে যাবি?" মেঘ এবার আশ্চর্য নয়নে তাকালো। তার মনের কথা আবির ভাই কিভাবে বুঝলো। মেঘের লজ্জায় রাঙা মুখ দেখে আবির ঢোক গিলল। চোখ বন্ধ করে দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো। মনে মনে বলল, " উফফফফ, আমার শান্ত মনটাকে উল্টেপাল্টে দিতে তোর লজ্জায় লালিত মুখটায় যথেষ্ট। তোকে এভাবে দেখলে বউ বউ ফিল পাই। কবে তোকে আমার করে পাবো? অপেক্ষার প্রহর যে ফুরায় না। " মেঘ উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, "আপনি কিভাবে বুঝলেন আমি ফুপ্পির সাথে দেখা করতে চাই?" "তুই ই তো বলছিলি।" "আমি সেই কবে বলছিলাম।তা কি এখনও মনে আছে?" "তুই কবে কি বলিস সবই আমার মাথায় থাকে। শুধু সুযোগের অপেক্ষায় থাকি।" "সবার কথায় আপনার মাথায় থাকে?" "সবার কথা মানে?" "যে যা বলে সবকিছু মনে থাকে?" "না, প্রয়োজনের বাহিরে সবকিছুই ভুলে যায়" মেঘ হুট করে বলে উঠল, "আপনার গার্লফ্রেন্ড কয়টা?" মেঘের এমন প্রশ্নে

আবির হকচকিয়ে উঠলো। থতমত খেয়ে বলল, “মানে?” “গার্লফ্রেন্ড চিনেন না? মেয়ে বন্ধু বা প্রেমিকা। ” “তা বুঝলাম। কিন্তু হঠাৎ এমন প্রশ্ন কেন?” “শুনলাম কলেজের সব মেয়ের ক্রাশ ছিলেন। তাই আর কি” আবির নিঃশব্দে হাসলো। মেঘের মনে হিংসা কাজ করছে এটা আবির বেশ বুঝতে পারছে। আবির জ্বিভ দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে বলল, “আছে হাজার খানেক” মেঘ চেঁচিয়ে উঠল, “What!” আবির দু’হাতে ইশারা দিয়ে বলল, “Cool” “ফাজলামো করেন আমার সাথে? সত্যি করে বলুন কয়জন? ” “না বলা যাবে না। তুই সবাইকে বলে দিবি।” “সত্যি বলব না।বলুন” “গার্লফ্রেন্ড নেই তবে একটা গোলাপি কালার বউ আছে। ” মেঘ ফোঁস করে শ্বাস ছাড়লো। ভ্রু কুঁচকে রাগান্বিত কণ্ঠে বলল, ” থাকেন আপনার গোলাপি কালার বউ নিয়ে। দরকার হলে লাল, নীল, হলুদ বউ নিয়ে থাকুন। ” মেঘ উঠতে নিলে আবির মেঘের হাত চেপে ধরে বসালো। তপ্ত স্বরে বলল, “আমার লাল, নীলের প্রয়োজন নেই। গোলাপিটায় যথেষ্ট।” “ফাইজলামি বন্ধ করুন। মেজাজ খারাপ হচ্ছে” “কি আমার মেজাজ গো, তাও আবার একটু পর পর খারাপ হয়। আচ্ছা ঠিক আছে বন্ধ করলাম। তুই ও আমায় এমন প্রশ্ন আর করবি না। ” “করলাম না এমন প্রশ্ন। ” ফুচকা খেয়ে শেষ করে আবিরের সঙ্গে ফুপ্পির বাসায় আসছে। ফুপ্পি মেঘকে দেখে ভীষণ খুশি হয়েছেন। সেই সঙ্গে বাসার সকলেই খুশি হয়েছে। আবির মেঘকে দূরে সরিয়ে রাখে বলে আবিরকে সবাই সবসময় বকা দেয়। ফুপ্পি তো বকেন, উল্টাপাল্টা কথা বললে মাঝে মাঝে গাট্টাও দেন।

মেঘ ফুপ্পিকে জড়িয়ে ধরে কান্না শুরু করে দিয়ছেে। মেঘের কান্না দেখে ফুপ্পিও কাদঁছেন। মেয়ে মানুষের মায়া একটু বেশিই থাকে। ফুপ্পির কথা মেঘ যেদিন শুনেছে তার পর থেকে প্রতিরাতেই ফুপ্পির কথা মনে করে মন খারাপ করে, কখনও কখনও কান্নাও করে। মাঝে মাঝে ভাবে আব্বু, বড় আব্বু রাতে কিভাবে ঘুমান! ওনাদের কি বোনের কথা মনে হয় না? মেঘদের কান্না দেখে আবির ভারী কণ্ঠে বলল, " তোমাদের চোখের পানিতেই দুদিন পর পর রাস্তাঘাটে পানি জমে যায়। এভাবে কান্নাকাটি করো বলেই মেঘকে নিয়ে আসি না। আজকেও যদি কাঁদো তাহলে আর কখনোই নিয়ে আসব না।" দুজনের কান্নায় কমে এসেছে। আইরিন মজার ছলে বলল, "ওদের কান্নায় যদি রাস্তায় পানি ওঠে, তোমার কান্নার কারণে নিশ্চয় বাংলাদেশে বন্যা হয়" আবির গম্ভীর কণ্ঠে বলল, "হ্যাঁ। সামনের বন্যায় তোকে ভাসাইয়া দিব নে।" "ইহহ। আমি সাঁতার পারি।" "তাহলে তো আরও ভালো। সাঁতার কেটে শ্বশুর বাড়িতে যাবি আবার বাপের বাড়িতে আসবি।" "কিসের শ্বশুর বাড়ি, কার শ্বশুর বাড়ি?" আবির ফুপ্পিকে উদ্দেশ্য করে বলল, "ফুপ্পি তোমার মেয়ের জন্য ছেলে দেখা শুরু করছি।এই বর্ষার আগেই বিয়ে দিয়ে দিব।" আইরিন আর্তনাদ করে উঠে, "নাহ, কিসের বিয়ে? নিজের বিয়ের খবর নাই আমার পিছনে লাগছো! তুমি আগে বিয়ে করো। " আবির ঠাট্টার স্বরে বলল, "আমি খবর পাইছি তুই জান্নাতকে খুব জ্বালাস। আমার বউকে জ্বালাবি না তার কি গ্যারেন্টি আছে? এজন্য তোকে বিয়ে দিয়ে তারপর ই বিয়ে করব।" আইরিন

জান্নাতকে জিজ্ঞেস করল, “ভাবি সত্যি করে বলো, আমি তোমাকে জ্বালায়?” জান্নাত এপাশ ওপাশ মাথা নেড়ে, হেসে উত্তর দিল, “কখনোই না।” আইরিন মেঘকে শুধালো, “মেঘ আপু আমি কি তোমাকে জ্বালায়? ” আবির মাথা নিচু করে জ্বিভে কামড় দিয়ে বসে আছে। মনে মনে বলছে, “এই মেয়েটা নিশ্চিত ফাঁসাবে।” মেঘ স্বাভাবিক ভাবেই উত্তর দিল, “কই না তো। তুমি তো অনেক লক্ষ্মী মেয়ে” এবার আইরিন আবিরের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে বলল, “দেখছো আমি কাউকেই জ্বালায় না।” পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে আবির বলল, “সেসব পরে দেখা যাবে। ফুপ্পি খুব খুদা লাগছে। দুপুরে খায় নি। খেতে দাও ” জান্নাত বলল, “আপনারা ফ্রেশ হোন। আমি এখনি খাবার দিচ্ছি।” ১-২ ঘন্টা গল্প করে মেঘকে নিয়ে বাসায় ফিরছে । রাস্তায় যেতে যেতে মেঘ হঠাৎ ই আবিরকে ডাকল, ” আবির ভাই” “হুমমমমম ” “আমাদের ভার্সিটির ছেলেগুলো কি আপনার কলেজের? ” “হ্যাঁ। এক ব্যাচ জুনিয়র ছিল ” “ওরা আপনার এত প্রশংসা করছিল কেন। আপনি কি করছিলেন?” “তুই কি সব শুনে ফেলছিস?” “জ্বি” “কলেজে থাকাকালীন একটু ঝামেলা হয়ছিল তখন স্যারদের কে রিকুয়েষ্ট করছিলাম। এই আর কি।” “কি ঝামেলা সেটায় তো জানতে চাচ্ছি!” “জানতেই হবে?” “জ্বি” “ওরা কলেজে ভর্তির পর কিছুদিন নিয়মকানুন মেনে চলছে, রেজাল্ট ও ভালো করছিল কিন্তু ৬ মাস পর থেকে কোথাকার কোন ছেলেদের সঙ্গে মিশে নে*শা করে একেকটা ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে চলে গেছিলো। পড়াশোনার অবস্থা নেই,

নিয়ম মানে না, স্যারদের সাথে উগ্র আচরণ,পরীক্ষায় রেজাল্ট খারাপ করছে। সব মিলিয়ে স্যাররা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল সবকটার বাবা মাকে এনে অপমান করে কলেজ থেকে বহিষ্কার করে দিবে। আমি কয়েকজনের মাধ্যমে জানতে পারছি, ২-৩ জন বাদে সবগুলোর পারিবারিক অবস্থা খুব খারাপ। বাবা- মা অনেক কষ্ট করে টাকা ইনকাম করে ঢাকা শহরে ছেলেকে পড়তে পাঠাইছে। আর এগুলো সঙ্গ দোষে নিজের জীবন ধ্বংস করছে। জানার পর নিজেরই কষ্ট লাগতেছিল। তারপর ওদের সঙ্গে কিছুদিন বসেছি। ওদের সবার গল্প শুনেছি, বুঝিয়েছি। তখন আমার ক্ষুদ্র মাথায় যা মনে হয়েছিল তাই করেছি আর কি । যখন দেখলাম ওরা আমার কথা একটু একটু মানতে শুরু করেছে তখন স্যারদের রিকুয়েষ্ট করলাম যেন পরবর্তী পরীক্ষা পর্যন্ত ওদের সময় দেয়। স্যারদের খুব আদরের স্টুডেন্ট ছিলাম বলে হয়তো স্যাররা মেনে নিয়েছেন। ৩য় সেমিস্টারে মোটামুটি ভালো রেজাল্ট করেছে। তারপর আমিও চলে গেছি ওদেরও খবর নেয়া হয় নি। ” “বাহ!” “কি?” “আপনি খুব ভালো” “ধন্যবাদ ম্যাম।” আবির মেঘকে বাসার সামনে নামিয়ে দিয়ে আবারও অফিসে চলে গেছে। আজ ৭ ফেব্রুয়ারি। ভার্সিটিতে যেতেই নজর পরে অনেকেই গোলাপ হাতে ঘুরছে। কেউ কেউ বন্ধুদের দিচ্ছে, কেউ আবার বান্ধবীকে দিচ্ছে। মেঘ, বন্যা এসব ডে কখনো পালন করে না। মনেও থাকে না কবে কি ডে। হঠাৎ মিনহাজ একটা গোলাপ এনে মেঘকে দিয়ে বলল, “Happy Rose Day” বন্যার দিকে তাকিয়ে বলল,

“একটায় ফুল পাইছি রে। না হয় তোকেও দিতাম। এখন তোর বেবিকেই দেই। ” মেঘ আশেপাশে তাকালো। হঠাৎ ই মাথায় ভূত চেপেছে। গম্ভীর কণ্ঠে বলল, “আমি তোর থেকে গোলাপ নিব না, শুধু আবির ভাইয়ের থেকে নিব। বন্যাকে দিয়ে দে” মিনহাজ না চাইতেও বন্যাকে দিল, কিন্তু বন্যাও নেয় নি। বরং উল্টো বলল,”তোদের থেকে ফুল নিতেও ভয় করে। কার মনে কি চলে তোরাই জানস” মেঘ আজ তাড়াতাড়ি করে বাসায় চলে আসছে। ছাদ থেকে একটা লাল টকটকে গোলাপ এনে, সাথে একটা চিরকুট লিখে আবিরের রুমে রেখে আসছে। আবির সন্ধ্যার দিকে বাসায় ফিরে দেখল টেবিলের উপর গোলাপ আর চিরকুট রাখা। এগিয়ে গেল টেবিলের কাছে। চিরকুট হাতে নিতেই দেখল, চিরকুটে লেখা, “আপনি মানুষটা রক্তিম গোলাপের মতন, যার কাঁটার আঘাতে শতশত বার ক্ষতবিক্ষত হয়েও, তার মুগ্ধতার পিছনেই ছুটছি।” Happy Rose Day Abir Vai আবির ফুলটা হাতে নিয়ে আলতোভাবে ঠোঁট ছোঁয়ালো। মুচকি হেসে বলল, ” আমার জীবনেও তুই রক্তিম গোলাপের মতন, যাকে দেখলেই হৃদয়ে তোলপাড় চলে, প্রেমানুভূতি জেগে উঠে বার বার। খুব ইচ্ছে করে, গোলাপের প্রতিটা পাপড়ির ভাঁজে তোর আমার প্রণয়ের নিশান এঁকে দেয়। ফুলের রানী গোলাপের মতো তোকেও আবিরের মহারানী বানিয়ে রাখি। ”আবির গোলাপ আর চিরকুট টেবিলের উপর রেখে ফ্রেশ হয়ে নিচে নামলো। এই সুযোগে মেঘ চুপিচুপি আবিরের রুমে আসছে। চিরকুট আর ফুল যেভাবে রেখেছিল সেভাবেই আছে দেখে

মেঘের প্রফুল্ল মন সহসা খারাপ হয়ে গেছে। ঠোঁট ফুলিয়ে শ্বাস ছাড়লো। আবির ভাই এখনও দেখে নি ভেবেই মেঘের আনন্দিত বদন বদলে গেছে। মাথা নিচু করে মনে মনে বিড়বিড় করতে করতে রুম থেকে বেড়িয়ে বেলকনিতে হাঁটছে। আচমকা ভারী কিছুর সাথে কপাল ঠেকে। বডি স্প্রের তীব্র ঘ্রাণ নাকে লাগতেই আবেশে চোখ বন্ধ হয়ে আসে। সামনে দাঁড়ানো ব্যক্তিটা যে মেঘের একান্ত ব্যক্তিগত প্রিয় পুরুষ তা বুঝতে বাকি রইলো না। মেঘের ইচ্ছে করছে এই প্রশস্ত বুকে মাথা রেখে সারাজীবন কাটিয়ে দিতে কিন্তু তা সম্ভব না। অনিচ্ছা স্বত্তেও মাথা তুলে দু কদম পিছিয়ে গেল। মেঘের দৃষ্টি তখনও আবিরের পায়ের দিকে। আবির সূক্ষ্ম নেত্রে চেয়ে রইলো। মেঘের চুল খোলা, এলোমেলো হয়ে আছে চুল । মশার কামড়ে কপালের দু তিন জায়গায় দাগ হয়ে গেছে। উজ্জ্বল বর্ণের কপালে দাগগুলো লাল টকটকে দেখা যাচ্ছে। আবির খানিক ভেবে হাত দিল মেঘের সুদীর্ঘ চুলের মাঝবরাবর। চুলের আগ শুকিয়ে গেলেও মাঝামাঝি আর গুঁড়ার দিকের চুলগুলো এখনও ভেজা । আবিরের কুঁচকানো ভ্রু যুগল একসঙ্গে লেগে গেছে, দাঁত খিঁচে গম্ভীর কণ্ঠে বলে, ” এই অনিয়ম কি সারাজীবন ই করবি? কথা শুনবি না আমার?” মেঘ শশব্যস্ত চোখে তাকালো আবিরের দিকে। আবিরের ভারী কণ্ঠস্বর শুনে মেঘের মুখটা আরও চুপসে গেছে। চাউনিতে শীতলতা। মন জুড়ে তার অন্য চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছিল। আবির ভাই চিরকুট দেখে কিভাবে রিয়েক্ট করবেন তাই ভাবছিল। আবিরের হাত তখনও মেঘের চুলে, দ্বিতীয় বার কণ্ঠ দ্বিগুণ

ভারি করে বলল, “কি বললাম আমি?” আগের কোনো কথায় মেঘের কর্ণকুহরে পৌছায় নি এটা আবিরকে কিভাবে বলবে, নিরুপায় হয়ে মেঘ উল্টো প্রশ্ন করল, “আমি কি করেছি?” “অসময়ে শাওয়ার নিছিস কেন? দুদিন পর পর যে মাথা ব্যথায় ভুগিস মনে থাকে না? তোকে সকাল সকাল শাওয়ার নিতে বলছিলাম। কথা মানিস না কেন?” একদমে কথাগুলো বলল আবির। চোখে সাফ রুষ্টতা। মেঘের অনিয়ম সহ্য করতে পারে না সে। মেঘ মনে মনে উত্তর সাজাচ্ছে। কি বললে এ যাত্রায় উদ্ধার হতে পারবে সেসব ভাবছে। মেঘ উদ্বেগপূর্ণ কণ্ঠে বলল, ” ভার্সিটি থেকে এসে ঘুমিয়ে পরেছিলাম তাই একটু দেরি হয়ে গেছে। ” “কাল থেকে শাওয়ার নিয়ে তারপর ভার্সিটিতে যাবি। মনে থাকবে?” মেঘ ঘাড় কাত করে সম্মতি জানানো। ধমক খায় নি ভেবেই মনে মনে আনন্দিত হলো। আবির মেঘের চুল থেকে হাত সরিয়ে নিল। কপাল গুজিয়ে আবির পুনরায় আওড়ালো, “এভাবে ভালোবাসার নিশান নিয়ে ঘুরতে লজ্জা লাগে না?” মেঘ থতমত খেয়ে বলল, “মানে? কার ভালোবাসা? কিসের নিশান?” আবির নিজের ফোনের সেলফি ক্যামেরা অন করে মেঘের সামনে ধরলো। কপালের মাঝবরাবর মশার কামড়ের তিনটা দাগ, নাকের ডগায় একটা, থুঁতনির পাশ একটা, ২-১ টা গলাতেও আছে। মেঘ কি বলবে উত্তর খোঁজে পেল না। আবির কণ্ঠ খাদে নামিয়ে বলল, ” বুঝলাম মশাকে ভালোবাসিস তাই বলে তাদের নিশান নিয়ে ঘুরতে হবে?” মেঘ আহাম্মকের মতো চেয়ে আছে। আবিরের মুখের ভঙ্গি দেখে মেঘ ওষ্ঠ উল্টালো। আবির পাশ কাটিয়ে

যেতে নিলে মেঘ তড়িঘড়ি করে বলল, “আমি মশাকে ভালোবাসি না। ” “তা তো নিশান দেখেই বুঝা যাচ্ছে। ” আবিরের ঝটপট উত্তর। মেঘ আবিরের পেছনে দাঁড়িয়ে বিড়বিড় করে বলল, “আমি মশাকে না আপনাকে ভালোবাসি। আপনি কি বুঝেন না?” আবির মুচকি হাসলো। কথাটা ঠিকই তার কান পর্যন্ত পৌছেছে। সহসা হাসি থামিয়ে ঘাড় হালকা ঘুরিয়ে মেঘের দিকে আড় চোখে তাকিয়ে বলল, “মশারী টানিয়ে ঘুমাইস” দীর্ঘ কদম ফেলে আবির বেলকনিতে হাঁটছে আর মনে মনে বলছে, ” যে অঙ্গে আবিরের ভালোবাসার নিশান থাকার কথা, সে অঙ্গে অন্য কোনো নিশান আবির সহ্য করবে না। সেটা যদি সামান্য মশারও হয় তবুও না।” রুমে ঢুকতে ঢুকতে বিড়বিড় করে বলে, ” Mahdiba is mine.” বলেই ফোঁস করে নিঃশ্বাস ছাড়লো। নিঃশ্বাসের তীব্রতায় বুঝা যাচ্ছে মশার প্রতি তার কতটা হিংসা কাজ করছে। রুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে ঘন্টাখানেক মেঘের চিরকুট আর গোলাপ হাতে বসে রইলো। কল্পনায় কতটা পথ হেঁটে আসছে কে জানে! তারপর একটা ডায়েরির ভাঁজে গোলাপ আর চিরকুট রেখে শুয়ে পরেছে। ভ্যালেন্টাইন সপ্তাহ চলছে। প্রতিদিনই কোনো না কোনো স্পেশাল ডে। আবির প্রতিদিন অফিস থেকে ফিরেই টেবিলে একটা চিরকুট দেখতে পায়। প্রপোজ ডে, চকলেট ডে, টেডি ডে একেকটা ডে তে একেকটা স্পেশাল চিরকুট সাথে চকলেট, টেডি কিছু না কিছু থাকে। কিন্তু আবিরের কোনো প্রতিক্রিয়া মেঘের চোখে পরে না। আবির অফিসে চলে গেলেই মেঘ ছুটে যায় আবিরের রুমে। খোঁজে

নিজের দেয়া চিরকুটগুলো কিন্তু কিছুই খোঁজে পায় না। আবিরের রুমের প্রত্যেকটা জিনিসে তালা দেয়া। টেবিলের উপর রাখা বই, খাতা সব চেক করেছে কিন্তু কিচ্ছু পায় নি। মেঘ বিড়বিড় করে বলে, " হি*টলা*র ব্যাটা, জিনিসগুলো যেমন তালা দিয়ে রাখছে, নিজের কলিজাটাকেও তালা মেরে রাখছে। যতই তালা দিয়ে রাখুন না কেন, আমি তালা ভেঙে হলেও আপনার হৃদয়ে জায়গা করে নিবই।" আজ প্রমিস ডে। আবির অফিসের কাজে সকাল সকাল বেড়িয়ে গেছে। মেঘও ভার্সিটিতে এসেছে। মন টা তেমন ভালো না। আশেপাশে সবাই সবাইকে এটা সেটা প্রমিস করছে, মেঘ তাকিয়ে তাকিয়ে সেই দৃশ্য দেখছে। আবির ভাইয়ের থেকে চকলেট, টেডি ই যেখানে পায় নি, সেখানে প্রমিস ডে তে কোনো প্রমিস আশা করা বোকামি ছাড়া কিছুই না। এর মধ্যে বন্যা আসছে। মেঘের মন খারাপ দেখে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে শুধালো, "কি হয়ছে বেবি? মন খারাপ কেন?" "কিছু হয় নি। এমনি ভালো লাগছে না। " "এমনি তো না। অবশ্যই কারণ আছে। আবির ভাইয়া কিছু বলছেন? অথবা তানভির ভাই?" " নাহ। " "মিনহাজ, তামিমরা কিছু বলছে?" "নাহ। " "তাহলে হয়ছে টা কি?" "আজকে কি ডে জানিস? বন্যা স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, "এসব ডে দিয়ে আমার কি কাজ? আমি জেনে কি করবো? তুই বল" "আজ প্রমিস ডে। দেখ চারপাশে সবাই সবাইকে প্রমিস করছে। আমায় কেউ প্রমিস করে না। " "ওরে আমার বেবি টা। তোমার প্রমিস লাগবে আগে বলবা না? " বন্যা নিজের ওড়না থেকে একটা সুতা ছিঁড়ে মেঘের কনিষ্ঠা

আঙ্গুলে পেঁচিয়ে মোলায়েম কণ্ঠে বলা শুরু করল, ” আজকের স্পেশাল দিনে আমি বন্যা তোকে প্রমিস করছি আমাদের বন্ধুত্বের সম্পর্ক সারাজীবন অটুট থাকবে। জীবনে যতই ঝড় আসুক না কেন, সেই ঝড়ের কবলে দুজন পৃথিবীর দুই মেরুতে চলে যায় না কেন। তারপরও আমাদের বন্ধু একই রকম থাকবে। তোর যেকোন বিপদে আমায় পাশে পাবি। আজেবাজে অজুহাত দেখিয়ে আমি কোনোদিন দূরে সরে যাব না, প্রমিস। Happy Promise Day Baby” মেঘ সঙ্গে সঙ্গে বন্যাকে জড়িয়ে ধরেছে। বন্যা ছোট থেকেই খুব ম্যাচিউর একটা মেয়ে। মেঘ আর বন্যার মধ্যে মেঘ ঠিক যতটা দুষ্টু আর উগ্র বন্যা ঠিক ততটায় শান্ত। দুষ্টামির জন্য মেঘ স্যার ম্যামদের কাছে অনেক বকা খেয়েছে । বন্যা যথাসম্ভব মেঘকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করেছে। মেঘের রাগ বেশি হওয়ায়, সামান্য ব্রেঞ্চে বসা নিয়েও স্কুল লাইফে বান্ধবীদের সাথে ঝগড়া লেগে যেতো। সেখানেও বন্যায় ঝ*গড়া মিমাংসা করে দিতো। মেঘকে বুঝিয়ে রাগ কন্ট্রোল করতো। বয়স বাড়ার সাথে সাথে মেঘের চঞ্চলতাও কমে এসেছে। বাড়িতে মীম আর আদির সাথে টুকটাক দুষ্টামি করলেও বাহিরে এখন খুব ভদ্র থাকার চেষ্টা করে। মেঘ যে পরিস্থিতিতেই থাকুক না কেন, বন্যাকে সে চোখ বন্ধ করে ভরসা করতে পারে। বন্যাও মেঘকে বোনের মতোই যত্নে রাখে। এত বছরের বন্ধুত্বেও বন্যা এত সুন্দর করে কখনো প্রমিস করে নি। মেঘও বন্যাকে জড়িয়ে ধরে বলল, “আমিও তোকে প্রমিস করছি, আমি যতদিব বেঁচে থাকবো ততদিন তোর বেস্ট ফ্রেন্ড হয়েই থাকবো। তোর

সাথে কত দুষ্টামি করছি, ঝগড়া করছি, রাগ দেখায়ছি ইনফ্যাক্ট এখনও কত রাগ দেখায় তুই কি সুন্দর সব মেনে নেস। তোর মতো বান্ধবী পাওয়া সত্যি ই ভাগ্যের বিষয়। আমি খুব ভাগ্য করে তোকে আমার জীবনে পেয়েছি। তোকে কখনোই হারাতে চাই না আমি। খুব ভালোবাসি তোকে " বন্যাও আহ্লাদী কণ্ঠে বলল, "আমিও খুব ভালোবাসি।" মিনহাজ আর তামিম দুজনেই একসঙ্গে বলে উঠলো, " আহাগো, দুই বান্ধবীর কত প্রেম । " মেঘ হাসিমুখে নিজের কনিষ্ঠা আঙ্গুল ওদের সামনে ধরে উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, "দেখ আমার বেস্টু আমায় প্রমিস করেছে। " মিনহাজ মাথা চুলকে বলল, "ও হো আজ তো প্রমিস ডে। মনেই ছিল না। প্রমিস করতে হবে তো!" মেঘ উঠে যেতে যেতে বলল, "আমার বেস্টু আমায় প্রমিস করে ফেলছে। এখন আমার আবির ভাইয়ের প্রমিস প্রয়োজন। আবির ভাই যদি একবার বলে "কখনো ছেড়ে যাবে না " তাহলেই আমার জন্য যথেষ্ট। তোদের প্রমিস দিয়ে কি ঘোড়ার ঘাস কাটবো?" "এভাবে অপমান করলি? দেখবি তোর আবির ভাই তোকে প্রমিস করবে না। এটা আমার অভিশাপ " মেঘ হাতের কলম ছুঁড়ে মারে। কলমটা ঠিক মিনহাজের কপালে লাগে। মিনহাজ ব্যথায় উফ করে ওঠে। মেঘ রাগান্বিত কণ্ঠে বলে, "শকুনের দোয়ায় গরু মরে না। আর যদি মরে, তাহলে তোকেও মরতে হবে।" মেঘ ক্লাস শেষ করে বাসায় আসছে। মনটা ভীষণ অস্থির। আবির ভাইয়ের প্রতিক্রিয়া বুঝতে পারে না বলে আজ কোনো চিরকুট লিখে নি। চিন্তা করেছে সরাসরি আবিরকে বলবে।মেঘ

বেলকনিতে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল। সন্ধ্যার খানিক বাদেই আবির বাসায় ফিরেছে। আবির রুমে ঢুকেই টেবিলের দিকে তাকায়। আজ কোনো চিরকুট নেই দেখে আনমনে কপাল গুটালো। ড্রেস চেইঞ্জ করে শাওয়ার নিতে চলে গেছে। প্রায় ৩০ মিনিট পর মেঘ আবিরের রুমে আসলো। আবির তখন ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে ভেজা চুল ঝাড়ছিল। আগের ড্রেসিং টেবিল ভাঙার পর সেটা পাল্টিয়ে নতুন একটা আনিয়েছে। আগের টার থেকেও এটা অনেক বেশি সুন্দর। আবির রুমে না থাকলে মেঘ প্রায় প্রায় এসে ড্রেসিং টেবিলের সামনে সাজুগুজু করে, ছবি তুলে। আবিরের চুলের পানি ছিটকে গিয়ে মেঘের গায়ে পরে। মেঘ সেখানেই থমকে দাঁড়ায়। ঘাড় ঘুরিয়ে আবিরকে দেখলো। আয়নায় তাকিয়ে কিছু একটা ভাবছিল আবির হঠাৎ মেঘের উপস্থিতি বুঝতে পেরে কিছুটা নড়ে ওঠে। ঠান্ডা কণ্ঠে শুধালো, " কিছু বলবি?" "আপনি কিছু বলবেন?" "নাহ" "কিচ্ছু বলার নেই?" "নাহ" "আজকে কি ডে বলুন তো" "Monday মানে সোমবার কেন?" 'এই ডে এর কথা বলিনি" আবির আড়চোখে চেয়ে শুধালো, " তাহলে কোন ডে?" মেঘ সূক্ষ্ম নেত্রে তাকালো। তপ্ত স্বরে বলল, "আপনার টেবিলের উপর রাখা চিরকুট গুলো দেখেন নি?" আবির ঠাট্টার স্বরে বলল, "চিরকুট তুই রাখছিলি নাকি?" মেঘ লাজুক হেসে চিবুক নামিয়ে বলল, "জ্বি।" আবির টেবিল থেকে ফোন নিয়ে কিছু চেক করতে করতে বলল, "কি ছিল চিরকুটে?" মেঘ অসহায়ের মতো চেয়ে শীতল কণ্ঠে প্রশ্ন করল, "আপনি চিরকুট গুলো দেখেন নি?" "কি জানি। খেয়াল

করি নি। ” মেঘের তৎক্ষনাৎ মিনহাজের অভিশাপের কথা মনে পড়ে গেছে। সেই সঙ্গে আবিরের কথাটা আগুনে ঘি ঢালার মতো কাজ করেছে। মেঘের মেজাজ খারাপ হলো।রাগান্বিত কণ্ঠে বলল, “আমার চিরকুট গুলো আমায় দিন। আপনার সাথে আর কোনো কথা নেই। ” আবির শশব্যস্ত হয়ে ফোন থেকে চোখ সরিয়ে মেঘের দিকে তাকালো। মৃদু হেসে জানাল, ” তোর চিরকুট কোথায় উড়ে গেছে কে জানে!” রাগে মেঘের চোখ জ্বলছে। মিনহাজের দেয়া অভিশাপ টা বারবার মনে পড়ছে আর তেলে বেগুনে জ্বলে উঠছে। রাগের মাথায় হুট করে বলে উঠল, “আপনি আমার জীবনে কেন আসছেন?” প্রতিত্তোরে আবির বলল, “আমি তোর জীবনে আসি নি বরং তুই আমার জীবনে আসছিস।” মেঘ কপাল কুঁচকে প্রশ্ন করে, “কিভাবে?” আবির মেঘের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকায়। খানিক চুপ থেকে ঠান্ডা কণ্ঠে শুধায়, “তোর জন্ম আগে হয়ছে নাকি আমার?” “আপনার” “তো কে কার জীবনে আসছে?” মেঘ চিবুক নামিয়ে বিড়বিড় করে বলল, “জানি না’ আবির প্রখর তপ্ত স্বরে প্রশ্ন করে, “রুমে কেন আসছিলি?” মেঘের পুনরায় মিনহাজের অভিশাপের কথা মনে পরে যায়। মেঘ রাগ অভিমান সাইডে রেখে কোমল কণ্ঠে বলল, ” আজকে প্রমিস ডে তাই উইশ করতে আসছিলাম” “এসব ডে টে আমি পালন করি না।” “কেন?” “আমার মতে গোলাপ দেয়া, চকলেট দেয়া, টেডি দেয়ার জন্য স্পেশাল কোনো দিনের প্রয়োজন নেই। ইচ্ছে থাকলে প্রতিদিনই এসব ডে পালন করা সম্ভব।” “তাই বলে সামান্য উইশ টাও করতে পারবেন

না?” ” আমার উইশ করলে তা চিরকুট পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখতে পারব না। কাজে কর্মে দেখিয়ে দিব।” আবিরেট কথা মেঘ বুঝার চেষ্টায় করছে না। বরং মিনহাজের কথা মনে করে বার বার বলছে, “আজকে অন্তত উইশ করুন। আর বলব না, প্লিজ” ” আজ করলে, কাল কি সমস্যা? এসব বাদ দিয়ে অন্য কিছু বলার থাকলে বল” মেঘ মন খারাপ করে রুম থেকে বেড়িয়ে যেতে যেতে বলল, “মিনহাজ, তোর অভিশাপ ফলে গেছে” আবির গম্ভীর কণ্ঠে ডাকল, “শুন” মেঘ থমকে দাঁড়ালো । আবির ভ্রু কুঁচকে তাকিয়ে রইলো। হঠাৎ শীতল কণ্ঠে বলল, “কি প্রমিস চাস?” মেঘ সহসা চোখ গোলগোল করে তাকালো। আবির পুনরায় বলল, “কি হলো বল?” মেঘ ভেবেচিন্তে শান্ত কণ্ঠে বলল, ” আপনি প্রমিস করুন, আমাকে আর কখনো ধমক দিয়ে কথা বলবেন না” মেঘের খুব ইচ্ছে ছিল আবিরকে বলতে, যেন কখনো ছেড়ে না যায়। কিন্তু থা*প্পড়ের ভয়ে বলতে পারে নি। আবির ভারী কণ্ঠে বলল, ” তুই ভুল করলেও শাসন করতে পারবো না?” “পারবেন। তবে হুটহাট ধমক দিয়ে কথা বলবেন না, প্লিজ। আমার ভয় লাগে ” আবির ঠোঁট বেঁকিয়ে হাসলো। ঠোঁটে হাসি রেখেই বলল, ” আমি প্রমিস করছি, আজকের পর অকারণে তোকে কখনো ধমক দিব না। হয়েছে?” “হুমমমমমমমমম. Thank you ” মেঘের মায়াবী কণ্ঠে হুমমমমমম শুনে আবির আশ্চর্য নয়নে চেয়ে আছে। মেঘের চোখে মুখে উজ্জ্বলতা ফুটে উঠছে। আবির ভাই প্রমিস ডে তে মেঘকে প্রমিস করেছে ভাবতেই হৃদয়ে তোলপাড় শুরু হয়ে যাচ্ছে।

মিনহাজের অভিশাপ বিফলে গেছে ভেবেই মুখে হাসি ফুটে উঠেছে। খুশিতে গদগদ হয়ে রুম থেকে বেড়িয়ে গেছে।১২ তারিখ কিস ডে ছিল। আবিরের জ্বর থাকাকালীন গালে কিস করার ঘটনা মনে পড়তেই মেঘ লজ্জায় দু হাতে মুখ লুকালো। সেই লজ্জায় চিরকুট ও লিখে নি। আবির বাসায় ফেরার পর থেকে আবিরের সামনেও পড়ে নি। প্রমিস ডে পর্যন্ত ঠিক ছিল কিন্তু কিস ডে, হাগ ডে এগুলো পালন করা মেঘের পক্ষে অসম্ভব বিষয় । তাই মুখ লুকিয়ে চলছে। আজ ১৩ ফেব্রুয়ারি। ফাল্গুনের প্রথম দিন। অন্যান্য দিনের মতো আজও আবির, তানভির যে যার কাজে বেড়িয়েছে। মীম আর আদিও স্কুলে গেছে। দুপুরের দিকে মেঘ,মীম, আদি তিনজনই বাসায় ফিরেছে। তার ঘন্টাখানেক পরই আবির বাসায় আসছে। আবিরের হাতে দুটা শপিং ব্যাগ। অসময়ে আবিরকে বাসায় ফিরতে দেখে মালিহা খান প্রশ্ন করলেন, “কিরে তুই এ সময় বাসায় যে ?” “আজ পহেলা ফাল্গুন। ভাবলাম মীম, আদি আর মেঘকে নিয়ে বের হবো। তানভিরও আসছে। ” “আজ যেমন ভাই-বোনদের কথা মনে করছিস। এমনভাবে কাজের ফাঁকে মাঝে মাঝে ওদের সময় দিতে পারিস না? তোর আব্বু প্রায়ই বলে, তানভির ছাড়া তুই কারো সাথে ঠিকমতো কথা বলিস না।এটা তোর আব্বুর ভালো লাগে না। ” “আচ্ছা, চেষ্টা করব।” আবির দুটা শপিং ব্যাগ হাতে নিয়ে মেঘের রুমের সামনে আসলো। হালকা কাশি দিয়ে দরজা ধাক্কা দিতেই মেঘ থতমত খেয়ে ওঠে। একটু আগেই ফেসবুকে হাগ ডে র ভিডিও দেখছিল, তা দেখেই আবির

ভাইকে নিয়ে অলীক কল্পনায় পাড়ি জমিয়েছিল। অকস্মাৎ আবির রুমে ঢুকায় মেঘ আঁতকে উঠে । ওড়না ঠিক করতে করতে তাড়াতাড়ি ওঠে বসে। আবির একটা শপিং ব্যাগ মেঘের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, "এটাতে তোর জন্য শাড়ি আছে। কাকিয়াকে বলিস শাড়িটা পড়িয়ে দিবে।" দ্বিতীয় শপিং টা বিছানার উপর রেখে বলল, "এটাতে মীমের জন্য শাড়ি আর একটা ড্রেস আছে। ওর যেটা ভালো লাগে সেটায় পড়তে বলিস। " মেঘ ঠোঁট উল্টে বলল, "আমার ড্রেস কোথায়?" "তুই শাড়িই পড়বি তাই ড্রেস আনি নি। একটু তাড়াতাড়ি রেডি হওয়ার চেষ্টা করিস। " আবির দরজা পর্যন্ত গিয়ে আবারও থামলো। ঘাড় ঘুরিয়ে শীতল চোখে তাকিয়ে কোমল কণ্ঠে বলল, "আজ হিজাব পড়তে হবে না। "আবিরের বেসামাল অবস্থা দেখে তানভির মৃদু হেসে ঠাট্টার স্বরে মেঘকে বলল, " ভয় পাইস না, ভাইয়ার মনে আরশোলা কামড় দিছে এজন্য অস্থির লাগছে সবকিছু। ঠিক হতে একটু সময় লাগবে।" মীম আর আদি দু'জনে একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলো, "গাড়িতে আরশোলা আছে? কই আরশোলা, আল্লাহ বাঁচাও!" ওদের নাচানাচিতে তানভির গাড়ি সাইড করে পেছন ফিরে তাকালো। তেজঃপূর্ণ গম্ভীর কণ্ঠে শুধালো, " আমি কি একবারও বলছি গাড়িতে আরশোলা আছে?" আদি আর্তনাদ করে বলল, "তুমি না বললা, ভাইয়াকে আরশোলা কামড় দিছে!" তানভির উদাস ভঙ্গিতে বলল, "ভাইয়াকে কখন, কোথায় আরশোলা কামড়াইছে কে জানে। তোরা চুপচাপ বস। গাড়িতে আরশোলা নেই তারপরও লাফালাফি করলে আরশোলার বাড়িতে

ফেলে দিয়ে আসবো। ” আবির তখনও চোখ বন্ধ করেই বসে ছিল।তানভির এবার আবিরের দিকে তাকিয়ে একগাল হেসে বিড়বিড় করে শুধালো, “ভাইয়া, ব্যথা কি বেশিই লাগছে? হাসপাতালে নিতে হবে?” আবির সহসা চোখ খুললো। আড়চোখে তানভিরের দিকে তাকালো। কিন্তু কোনো রিয়াকশন দেখালো না। তানভির তখনও হেসেই যাচ্ছে। তানভির পুনরায় ডাকল, আবির শুধু ভ্রু নাচালো। তানভির ঠোঁট বেঁকিয়ে হেসে বলল, ” চোখ বন্ধ করে জোরে নিঃশ্বাস ছাড়ো। আর বলো, ‘All is well’ দেখবা একটু শান্তি লাগছে। ” আবির ভ্রু গুটিয়ে তাকালো, তানভিরের হাসি দেখে আবিরও খানিক হাসলো। তারপর তপ্ত স্বরে বলল, “মজা নিচ্ছিস?” তানভির স্ব শব্দে হেসে উত্তর দিল, “একদম ই না।” আবির ভারী কণ্ঠে বলল, “দিন আমারও আসবে। তখন বুঝাবো কত ধানে কত চাল। চুপচাপ গাড়ি স্টার্ট দে” তানভিরও আর কিছু বললো না। ঠোঁটের কোণে হাসি রেখেই গাড়ি স্টার্ট দিল। মাইশা আপুর বিয়েতে মেঘকে শাড়ি পড়া দেখে আবির সারারাত ঘুমাতে পারে নি। সাকিব তানভির কে সবই বলেছে। তখনকার অবস্থা তানভির স্বচক্ষে না দেখতে পারলেও এখনের অবস্থা ঠিকই দেখতে পারছে। গাড়িতে এসি চলছে তারপরও আবির ঘামছে। স্থির থাকতে পারছে না, একবার টিস্যু দিয়ে চোখ- মুখ মুছছে, সানগ্লাস খুলে সামনে রাখছে আবার চোখে দিচ্ছে , এই ফোন বের করছে আবার পানি খাচ্ছে। বুকের বা পাশে অবস্থিত হৃদপিণ্ডটা অবিরত কাঁপছে। কথায় আছে শাড়িতেই নারী। যে অষ্টাদশী জামা পরে

পিচ্চি মেয়ের মতো সারা বাড়ি ছুটাছুটি করতো সে আজ শাড়ি পড়ে পরিপূর্ণ নারী রূপে আবিরের সামনে আসছে। মায়াবিনী তো জানে না, তার মায়ার জালে আবিরের মনটা বন্দি হয়ে আছে বহুবছর ধরে। নারীরূপী মায়াবিনীকে অনন্তকাল দেখার স্বাদ জাগছে আবিরের অন্তরে। ইচ্ছে তো অনেক কিছুই করছে, মায়াবিনীর দুগাল স্পর্শ করে চোখে চোখ রেখে মায়াবিনীর সমুদ্রের ন্যায় গভীর দুচোখে চিরকালের জন্য ডুবে যেতে। কপালে আলতোভাবে নিজের ঠোঁট ছোঁয়াতে, হৃদয়ে জমানো নিবরধি ভালোবাসার একখণ্ডে মায়াবিনীর উদ্বেলিত মনটাকে শান্ত করতে। মায়াবিনীর চোখে চোখ রেখে সাত সমুদ্র পাড়ি দিতে, নীল আকাশ, অগণিত পাখি আর সমুদ্রের সুবিশাল জলরাশিকে সাক্ষী রেখে বলতে, “আমৃত্যু ভালোবাসি তোকে।” আবির সিটের সঙ্গে হেলান দিয়ে বসে আছে। দৃষ্টি তার গাড়ির মিররে। পেছনের সিটে বসা অষ্টাদশীকে আপনমনে দেখেই চলেছে। হঠাৎ ই ঠোঁটের কোণে এক চিলতে হাসির ঝলক দেখা গেল। কেন হাসলো কে জানে।এদিকে মেঘ শাড়ি ঠিক করায় ব্যস্ত। প্রথমবার এভাবে শাড়ি পরেছে, বার বার মনে হচ্ছে এদিকে ওদিকে খুলে যাচ্ছে তাই সেসব চেক করায় ব্যস্ত। স্বাভাবিক হয়ে বসতেই মিররে চোখ পড়ে, আবিরের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই মেঘ সঙ্গে সঙ্গে চোখ নামিয়ে নিয়েছে। সহসা মেঘ ভ্রু কুচকায়, এক মুহুর্তের জন্য থমকে গেছে সবকিছু। মাথাভর্তি হাজারও ভাবনার মধ্যে একটা ভাবনা হৃদয়ে আঘাত করে, “আবির ভাই কি আমায় দেখছেন?” মেঘ সঙ্গে সঙ্গে আবারও মিররে তাকায়। ততক্ষণে আবির

চোখে সানগ্লাস পড়ে ফেলছে তা দেখে মেঘের কুঁচকানো ভ্রুযুগল আরও কুঁচকে আসে, সূক্ষ্ম নেত্রে তাকিয়ে থাকে বেশখানিকক্ষণ। মনে মনে ভাবছে, "ঐ একজোড়া চোখ কি আমায় দেখে থমকে গিয়েছিল? শুধু কি দৃষ্টিই আঁটকে গেছিল নাকি দৃষ্টির সঙ্গে অন্তরতম অঁচলও? " ভাবতেই মেঘের ওষ্ঠদ্বয় প্রশস্ত হলো। হৃদয়ে জমানো অনূভুতিরা চোখে উপচে পড়ছে। আবির ভাই তাকে দেখে মুগ্ধ হয়েছে ভেবেই মেঘের মন প্রজাপতির মতো উঁড়ে বেড়াচ্ছে। মেঘ নিজেকে আওড়ালো, "ওনার কোমলপ্রাণ চাহনি কি কিছু বলতে চাইছিল? তবে কি আবির ভাইয়ের মনেও আমার জন্য অনুভূতি জন্মাচ্ছে?" বাকিটা পথ মেঘ আবিরের চিন্তাতেই মগ্ন থেকেছে। শ্যামবর্ণের এক পুরুষের প্রেমে মেঘ মাতোয়ারা হয়ে গেছে। আবিরের যত্ন, রাগ, তীব্র অধিকারবোধ, স্নিগ্ধতা মিশ্রিত চাহনি অষ্টাদশীর মনেরপাড়ায় বারংবার বিপর্যয় ঘটায়। মেঘের প্রাণোচ্ছল জীবনে আবিরের আবির্ভাব টা ঠিক যেন ধূমকেতুর মতো। কয়েকমাসেই অষ্টাদশীর কোমল মন আবির ভাইকে নিয়ে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে। মেঘের জীবনে বাবা আর ভাইয়ের পর আবির ই একমাত্র ছেলে যার সংস্পর্শে নিজেকে নিরাপদ মনে হয়। যার দৃষ্টি, স্পর্শ কোথাও অশ্লীলতার ছোঁয়া অনুভব করে নি। তারজন্যই বোধহয় আবির খুব দ্রুত অষ্টাদশীর হৃদয়ে জায়গা করে নিয়েছে। সেই থেকে অষ্টাদশীর মস্তিস্কজোরে আবিরের সঙ্গ পাওয়ার অদম্য প্রয়াস সর্বক্ষণ বিচরণ করে। আচমকা গাড়ি থামানোতে মেঘের সুদীর্ঘ ভাবনার অবসান ঘটে। চিরিয়াখানা দেখেই আদি সবার আগে গাড়ি থেকে নেমে

পরে।ইকবাল খান আগেও কয়েকবার মেঘদের নিয়ে চিরিয়াখানায় এসেছিলো। তাই আদির এই জায়গা খুব পরিচিত। চিরিয়াখানায় ঘুরতে ঘুরতে আদির খুদা লেগে গেছে। আদির সঙ্গে মীমও জানালো, তারও খুদা লাগছে। কিন্তু মেঘের সেসবে মনোযোগ নেই। তার মন মস্তিষ্ক জুড়ে শুধুই আবির ভাই ঘুরপাক খাচ্ছে। এরমধ্যে বেশ কয়েকবার চোখাচোখি হয়েছে দুজনের। মেঘের আগে আবিরই চোখ নামিয়ে নেয়। চিরিয়াখানা থেকে বের হতেই তানভির ঠান্ডা কণ্ঠে বলল, "ভাইয়া, তুমি বনুকে নিয়ে বোটানিক্যাল গার্ডেনে যাও আমি সবার জন্য খাবার নিয়ে আসছি।" মীম আর আদিও তানভিরের কাছেই রয়ে গেছে। আবির দুটা টিকেট কেটে মেঘকে নিয়ে ভেতরে ঢুকলো। এ যেন গাছের সাম্রাজ্যে ঢুকে পরেছে। চারপাশে শুধু সবুজ আর সবুজ। প্রায় ৮৪ হেক্টর জায়গা জুড়ে অবস্থিত এই উদ্ভিদের সাম্রাজ্য। মেঘ আবিরের পিছুপিছু হাঁটছে আর চারপাশের পরিবেশ দেখছে। হঠাৎ কি মনে করে মেঘ হাঁটার গতি বাড়িয়ে আবিরের পাশাপাশি এগিয়ে গেল।। আবিরের সাথে তাল মেলানোর চেষ্টা করছে। আবির যেখানে পা ফেলছে, সমান দূরত্বে মেঘও পা রাখার চেষ্টা করছে। আবিরের হাঁটার গতি বেশি হওয়ায় মেঘ শাড়ি পড়ে ঠিক কুলাতে পারছিল না। আবির আড়চোখে চেয়ে মেঘের পাগলামি দেখে মুচকি হাসলো। পকেট থেকে ফোন বের করতে করতে হাঁটার গতি কমিয়ে আনলো। দুইজোড়া পা এখন সমানতালে এগিয়ে যাচ্ছে। বাসন্তী রঙের পাঞ্জাবিতে আবির,তার সঙ্গে বাসন্তী রঙের শাড়িতে মেঘকে বেশ মানিয়েছে। লম্বাটে আবিরের

পাশে মেঘকে আজ খুব একটা পিচ্চি লাগছে না। শাড়ি সঙ্গে হিল জুতাতে বেশ বড়ই লাগছে মেঘকে। তানভির কল দেয়ায় আবিরের গতি কিছুটা কমে গেছে। মেঘ সামনে চলে গেছে। পাশ দিয়েই ৩-৪ টা ছেলে যাচ্ছিলো তাদের মধ্যে একজন ঠাট্টার স্বরে বলে উঠল, "কিরে মামা! আজকাল পরীরা আসমান থেকে নেমে বোটানিক্যাল গার্ডেনে ঘুরতে আসতাছে নাকি?" দ্বিতীয় জন বলল, "হ রে মামা, আমারও তাই মনে হচ্ছে। চুলগুলো দেখছিস? জোস না?" "আসলেই জোস। এমন একটা মেয়ে যদি আমার গার্লফ্রেন্ড হতো" আচমকা ছেলেগুলোর মুখ বন্ধ হয়ে গেছে। মেঘ আবিরের দিকে তাকাতেই দেখলো আবির ফোন চাপছে। মেঘ ঘাড় ঘুরিয়ে আবারও ছেলেগুলোর দিকে তাকালো। ততক্ষণে ছেলেগুলো মাথা নিচু করে চলে যাচ্ছে। মেঘ আবিরের অভিমুখে চেয়ে আছে। আবির ফোন থেকে চোখ তুলতেই মেঘের চোখে চোখ পরে। আবির ভ্রু নাচাতেই মেঘ কপাল কুঁচকে প্রশ্ন করল, "আপনি ছেলেগুলোকে কিছুই বললেন না কেন?" " আজ কিছু বলার মুড নেই।" মেঘ উদ্বিগ্ন কণ্ঠে শুধালো, "এত পরিবর্তন কিভাবে সম্ভব? " আবির ঠোঁট বেঁকিয়ে হাসলো। মৃদুস্বরে বলল, " ফাল্গুনের প্রথম দিন আমি আমাকে সময় দিতে এসেছি। এসব ছেলেদের সাথে কথা বাড়িয়ে নিজের অবস্থান নষ্ট করতে চাই না " "তাই বলে কিছুই বললেন না?" "তুই কি চাস এখন ছেলেগুলোকে ধরে পি*টায়? তাহলে তোর শান্তি লাগব?" মেঘ গাল ফুলিয়ে বলল, "জানি না" মেঘের মনে অভিমান জমেছে। একদিন এক ছেলে মেঘের হাত ধরেছিল বলে

আবির অফিস থেকে এসে মাঝরাস্তায় ছেলেটাকে মে*রেছিল। আর আজ ছেলেগুলো বাজে কমেন্টস করেছে তাতেও আবির কোনো প্রতিক্রিয়া দেখালো না। মেঘের মনে আবারও দুশ্চিন্তা ঢুকে গেছে। আবির ভাইয়ের এই পরিবর্তন মানতে পারছে না মেঘ। ছেলেগুলোকে একটা ধমক দিলেও মেঘ মানসিক শান্তি পেতো। আবিরের পিছুপিছু হাঁটতে হাঁটতে অনেকটা দূর চলে গেছে। অকস্মাৎ মেঘের নজর পরে সামনে গাছের নিচে একটা কাপল বসে আছে। মেঘ আবিরের মনোভাব বুঝার জন্য ঐদিকে দেখিয়ে বলল, " জায়গাটা অনেক সুন্দর, তাই না?" মেঘের দৃষ্টি অনুসরণ করে আবিরও সেদিকে তাকিয়েছে। কাপল টা কে দেখে আড়চোখে মেঘের দিকে তাকালো, মেঘ খুব মনোযোগ সহকারে কাপলটাকে দেখছে। আবির গলা খাঁকারি দিয়ে অন্যদিকে তাকিয়ে ঠান্ডা কণ্ঠে বলল, "হ্যাঁ, অনেক সুন্দর। " মেঘ একটু ভারী কণ্ঠে বলল, "ঐদিকে না, এদিকে দেখতে বলছি। " মেঘ ইন্ডাইরেক্টলি আবিরকে কাপল টাকে দেখতে বলছে। আবির বুঝেও না বুঝার মতো ভান করছে আর মিটিমিটি হাসছে। আবির এবার কাপলটার দিকে তাকালো। খানিক বাদে প্রশ্ন করল, "তুই তো বোটানির স্টুডেন্ট। ওরা যে গাছটার নিচে বসে আছে ঐ গাছটার বৈজ্ঞানিক নাম কি বল? " মেঘ আহাম্মকের মতো তাকিয়ে আছে। এ কেমন মানুষ, বুঝাচ্ছে কি আর ব্যাটায় বুঝতেছে কি! মনে প্রেম-ভালোবাসা নাই ঠিক আছে, তাই বলে ঘুরতে এসেও পড়াশোনা? এটা কেমন কথা! আবির মেঘের দিকে তাকিয়ে পুনরায় প্রশ্ন করল, "কি

হলো? জানিস না?” জানবো না কেন। এটার বৈজ্ঞানিক নাম Meghalemophyta ceratoabiropteris আবির হা করে তাকিয়ে আছে।মেঘের মাথায় আস্তে করে গাট্টা দিয়ে আবির বলল, “এটা Terminalia arjuna, কি পড়াশোনা করিস এটাও জানিস না।” আরেকটা গাছের দিকে দেখিয়ে পুনরায় বলল, “এই গাছটার নাম বল” মেঘ ফোঁস করে শ্বাস ছেড়ে রাগী স্বরে বলল, “বোটানিতে পড়ি বলে যেখানেই যাই সেখানেই শুধু বৈজ্ঞানিক নাম ধরতে হবে? আমি কি এখানে পড়তে আসছি? ” “তাহলে কেনো আসছিস?” “বেড়াতে আসছি।” “বেড়াতে আসছিস বেড়া। এদিক সেদিক নজর আঁটকায় কেন?” আবির ঘুরিয়ে ফিরিয়ে হলেও বুঝিয়ে দিয়েছে, ঐ কাপলটাকে দেখা আবিরের ভালো লাগে নি। মেঘ ভেংচি কেটে যেতে যেতে বলল, “সুন্দর জিনিসে নজর তো পরবেই” আবির সেদিকে তাকিয়ে ধীর কণ্ঠে বলল, ” আমার চোখে যেমন তুই ব্যতীত সব মেয়েই কুৎসিত তেমন কাপল হিসেবে আমি আর আমার Sparrow ব্যতীত সবাই অসুন্দর। আমি চাই সবাই আমাদের দেখুক, আমি কেন অন্যদের দেখবো!” কথা গুলো বলেই আবির ঠোঁট বাঁকালো। দ্রুত পায়ে মেঘের কাছাকাছি এগিয়ে আসলো। আবারো পাশাপাশি হাঁটছে দুজন। আবির একটু পর পর আড়চোখে মেঘকে দেখছে। সামনে যেতেই তানভিরদের সঙ্গে দেখা হলো। আবির তানভিরকে দেখেই শান্ত স্বরে বলল, “ভাবছিলাম তোর বোনের মাথাটা ঠিক আছে। এখন দেখি ও আরও বড় তাড়ছিঁড়া ” “কেনো? কি হয়ছে?” ” নির্দ্বিধায় বৈজ্ঞানিক

নাম বানিয়ে বলে, পা*গলের লক্ষণ।” “এটা তো ভালো কথা। আমার বোনের কত ট্যালেন্ট দেখছো?” আবির হেসে বলল, “তোর বোনের ট্যালেন্ট দেখে আমি শিহরিত ” আবির আর তানভির দুজনেই স্ব শব্দে হাসছে। মেঘ মীমের হাত ধরে ঘুরছে। সুন্দর জায়গা দেখে ছবি তুলছে। আদি ওদের সামনে হাঁটছে আর খাচ্ছে। ঘন্টাদুয়েক ঘুরা শেষে গেইট থেকে বের হয়ে কিছুটা সামনে আসতেই তিনটা ছেলে ছুটে আসে। মোলায়েম কণ্ঠে বলল, “I am Sorry Apu. তখন আমাদের ঐভাবে কমেন্টস করা একেবারেই উচিত হয় নি। প্লিজ আপু, কিছু মনে করবেন না। সরি প্লিজ। আর কখনো আপনাকে বা অন্য কোনো মেয়েকে এভাবে বলবো না। মাফ করে দিন প্লিজ।” মেঘ আবিরের দিকে তাকালো কিন্তু আবির নিরুদ্বেগ। আবিরের বেপরোয়া ভাব দেখে মেঘ কপাল গুটালো, তাকালো তানভিরের দিকে। তানভির আগে থেকেই সূক্ষ্ম নেত্রে তাকিয়ে আছে। কি হয়েছে বা কি হচ্ছে কিছুই বুঝতে পারছে না সে! মেঘ নম্র স্বরে জানালো, “ঠিক আছে। আপনারা এখন যান” ছেলেগুলো পুনরায় জিজ্ঞেস করল, “আপু, মাফ করেছেন ?” “হ্যাঁ করেছি।” ছেলেগুলো চলে গেছে। তানভির আবিরকে ইশারায় জিজ্ঞেস করল, “সমস্যা কি?” আবিরও ইশারাতেই বুঝালো, “তেমন কিছু না” মেঘ সন্দেহের দৃষ্টিতে আবিরকে দেখছে। আবির মেঘের দিকে না তাকিয়ে তানভিরকে বলল, “তুই ওদের নিয়ে ঘুরে আয় । আমি মেঘকে নিয়ে এক জায়গায় যাব” তানভির ভ্রু উঁচিয়ে চোখ বড় করে তাকালো। আবিরের নিরেট দৃষ্টি দেখেই

তানভির এগিয়ে গিয়ে গাড়িতে বসলো। মীম আর আদিকে নিয়ে গাড়ি স্টার্ট দিল। মেঘ তখনও আবিরের দিকেই তাকিয়ে আছে আবির এবার সরাসরি মেঘের মুখের দিকে তাকালো। মেঘের কপালে কয়েক স্তর ভাজ, ভ্রু কুঁচকানো, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে, নাকের ডগা ক্রমশ ফুলছে, গাল ফুলিয়ে জোরে জোরে নিঃশ্বাস ছাড়ছে। আবির গলার স্বর কিছুটা উঁচু করে বলল, "এভাবে তাকিয়ে আছিস কেন? আমার কি লজ্জা লাগে না?" মেঘ শ্বাস ছেড়ে ধীর কণ্ঠে শুধালো, " ছেলেগুলো আমায় সরি বলল কেন?" "আমি কি জানি!" মেঘের রাগ চোখেমুখে ভেসে উঠছে। রাগান্বিত কণ্ঠে বলল, "আপনি সত্যিই কিছু জানেন না?" আবির নিচের ঠোঁট কামড়ে এক আঙুলে মেঘের নাকের ডগায় আলতোভাবে স্পর্শ করে বলল, "যাই বল, রাগলে তোকে সেই লাগে, পুরায় অ*গ্নিকন্যা। সারাক্ষণ এভাবে ঘুরবি তাহলে কোনো ছেলে বাজে কমেন্টসও করবে না তারপর তাদের এসে সরিও বলতে হবে না। " আবির এগিয়ে গিয়ে একটা রিক্সা ঠিক করলো। হাতের ইশারায় মেঘকে ডাকলো। আবির রিক্সা থেকে হাত বাড়ালো, মেঘ একহাতে শাড়ির কুঁচি ধরে অন্যহাতে আবিরের হাত শক্ত করে ধরে রিক্সাতে উঠে বসলো। আবির মেঘের দিকে ঝুঁকে শাড়ির আঁচল টেনে মেঘের মাথায় দিয়ে দিয়েছে যেন বাতাসে চুল এলোমেলো না হয়। মেঘ অবাক চোখে সেই দৃশ্য দেখছে। রিক্সা চলতে শুরু করেছে, আবির খানিকক্ষণ পরপর ই মেঘের দিকে ঝুঁকে দেখে কোনোকিছু গাড়ির চাকায় আঁটকায় কি না! আবির যতবার কাছে আসে আবিরের গায়ের

গন্ধে মেঘের ছোট্ট দেহ ততবারই কম্পিত হয়। কিছুদূর যাওয়ার পর একটা ফুলের দোকান দেখে আবির রিক্সা থামিয়ে সেখান থেকে তাজা ফুলের মাথার মুকুট কিনেছে। সাথে দুহাতের জন্য তাজা ফুলের ব্রেসলেট। আশেপাশে ফুলের সুগন্ধ ছড়াচ্ছে। আবির নিজের হাতেই মেঘকে সেসব পড়িয়ে দিয়েছে। মেঘ আজ নির্বাক। কথা বলতে একদমই ইচ্ছে করছে না। আবির ভাইয়ের সঙ্গে এক রিক্সাতে পাশাপাশি বসে আছে এতেই তার খুশির সীমা নেই। তারউপর আবিরের যত্নে বারংবার অভিভূত হচ্ছে, নতুন করে নতুন ভাবে প্রেমে পড়তে ইচ্ছে করছে। কোথায় যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে কোনো কিছুই জিজ্ঞেস করার ইচ্ছে নেই তার। আর একটু সামনে গিয়ে মিষ্টি র দোকান থেকে মিষ্টি কিনেছে। মেঘ তখনও নির্বাক ছিল। আবির ভাই আজ যেখানে নিয়ে যাবে অষ্টাদশী সেখানেই যাবে, কোনো প্রশ্ন করবে না। যেই কথা সেই কাজ রিক্সা থেকে নেমে একটু হেঁটে একটা বাসায় ঢুকলো। মেঘ কিছুটা দূরে দাঁড়ানো। কলিং বেল চাপতেই কিছুক্ষণের মধ্যে দরজা খুলে দিল। আবির হাসিমুখে বলল, “আসসালামু আলাইকুম ” মাইশা আপু একগাল হেসে উত্তর দিল, “ওয়ালাইকুম আসসালাম। এতদিকে বোনের কথা মনে পরলো?” আবির মুখে হাসি রেখে ঠাট্টার স্বরে বলল, ” আমার মতো ব্যস্ত মানুষ আর একটাও পাবে না” “আহাগো! কি কাজে ব্যস্ত তা আমার জানা আছে।” আবির মাইশার দিকে একটু এগিয়ে গিয়ে ধীর কণ্ঠে বলল, “তোমার জন্য সারপ্রাইজ আছে।” মাইশা উত্তেজিত কণ্ঠে প্রশ্ন করল, “কি

সারপ্রাইজ? " আবির কণ্ঠস্বর উঁচু করে ডাকল, "এইযে ম্যাম, আসুন" মেঘ গুটিগুটি পায়ে দরজা পর্যন্ত আসতেই মেঘকে দেখে মাইশা দু হাতে নিজের দুগালে হাত রাখলো। মেঘকে আপাদমস্তক দেখে দরজার বাহিরে এসে মেঘকে জরিয়ে ধরে। মেঘও মাইশা আপুকে দেখে অবাক হয়ে গেছে। আপুর বিয়ের পর আজই আপুকে দেখছে। আবির অবশ্য আগেও এসেছে। বাসাও আবির ই ঠিক করে দিয়েছিল। মেঘ জিজ্ঞেস করে, "ভাইয়া কোথায়?" "ও বের হয়ছে। চলে আসবে এখনি। তোমরা ভেতরে এসে বসো।" মেঘ ঘুরে ফিরে বাসাটা দেখছে। আবির ঠান্ডা কণ্ঠে মাইশাকে বলল, "আমি কিন্তু আমার কথা রেখেছি, শাড়ি পড়িয়ে তোমার সামনে এনেছি।" মাইশা আবিরকে বিড়বিড় করে বলল, " তার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। কিন্তু প্রেমিকা না আমি তাকে তোর বউ হিসেবে দেখতে চাই। ভালোবাসার অভাবে আমার ভাইয়ের মুখটা কেমন শুকিয়ে গেছে। আহারে!" আবির ঠোঁট ফুলিয়ে অভিযোগের স্বরে বলল, " তুমিই একমাত্র বুঝছো।" মেঘের দিকে তাকিয়ে বলল, "আর কেউ তো বুঝেই না" মাইশা হাসতে হাসতে বলল, "দাঁড়া বলে দিচ্ছি!" "এই নাহ! আপু প্লিজ, বলো না" ততক্ষণে মেঘ এসে সোফায় বসতে বসতে বলল, "কি হয়েছে আপু?" মাইশা মুখে হাসি রেখেই বলল, "মেঘ তোমাকে আজ অনেক সুন্দর লাগছে। মাশাআল্লাহ। সাবধানে থেকো। তোমাকে দেখে কারোর হার্ট অ্যাটাক না হয়ে যায়! তোমরা বসো আমি নাস্তা নিয়ে আসি। " একটু পর মাইশা আপুর হাসবেন্ড বাসায় আসছেন। কিছুক্ষণ আড্ডা দিয়ে,

নাস্তা করে আবির মেঘকে নিয়ে বের হবে। মাইশা মেইনগেইট পর্যন্ত এগিয়ে এসে উচ্চস্বরে বলল, “আবির মেঘের শাড়ির কুঁচিগুলো ঠিক করে দে।” মেঘ আর আবির দুজনেই অবাক চোখে মাইশার দিকে তাকালো। মাইশা স্বাভাবিক কণ্ঠে পুনরায় বলল, “কি হলো? ঠিক করে দে!” মাইশার কথামতো আবির হাঁটু গেড়ে বসে আস্তেধীরে কুঁচিগুলো ঠিক করে দিচ্ছে। মেঘ বিপুল চোখে তাকিয়ে সে দৃশ্য দেখছে, হাত পা কাঁপছে মেঘের। আবির দাঁড়াতেই মাইশা আবিরকে ডাকল। আবির কাছে যেতেই মাইশা হেসে বলল, ” শুধু ভালোবাসলেই হবে না ভাই, যত্নশীল হতে হবে।” আবির মুচকি হেসে বলল, “বিয়ে টা করতে দাও। যত্ন কি,কাকে বলে, কত প্রকার বিস্তারিত দেখতে পারবা। আসছি” আবির মেঘকে নিয়ে বাসার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছে। অন্যদিকে তানভির, মীম আর আদিকে নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে বন্যাদের বাসার এদিকে আসছে। আবিরের চোখে প্রেমানুভূতি দেখে তানভিরেরও খুব ইচ্ছে করছিল বন্যাকে দেখতে। কিন্তু হুটহাট বন্যাকে কল দেয়া টা নিজের কাছেই খারাপ লাগে। ছোট বোনের বান্ধবীকে কল দিয়ে কি বলবে, সেটা বোনের কান পর্যন্ত কিভাবে পৌছাবে তা ভেবেই কল করার সাহস পায় না। তানভির ধীর গতিতে গাড়ি চালাচ্ছে, আর আশেপাশে তাকাচ্ছে। আঁখি জোড়া অনবরত তাকেই খোঁজছে। মীম শুধালো, “ভাইয়া আমরা এদিকে কেন আসছি? আমাদের বাসা তো এদিকে না!” “ঘুরতে আসছি। চুপচাপ বসে থাক” কিছুটা এগিয়ে যেতেই হঠাৎ চোখে পরলো হলুদ সেলোয়ার-কামিজ

পড়নে একজনের দিকে, মাথায় সাদা ওড়না, ঠোঁটে হালকা লিপস্টিক, আপন মনে ঝালমুড়ি খাচ্ছে। সিউর হওয়ার জন্য একটু এগিয়ে গেল। গাড়ি থামাতো বন্যার কাছাকাছি এসে । গাড়ির হর্নের শব্দে বন্যা ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাতেই তানভিরের হৃদয়ে ছু*রির ন্যায় কিছু ঢুকার মতো অনুভূতি হলো। বন্যার দুচোখে গাঢ় করে কাগজ দেয়া, বাসন্তী রঙের জামা আর সাদা ওড়নাতে অসম্ভব সুন্দর লাগছে বন্যাকে। তানভিরের দৃষ্টি সরছেই না। ভেতর থেকে মীম বন্যাকে দেখে বলে উঠল, "ভাই, দেখো বন্যা আপু।" এতে তানভিরের হুঁশ ফিরে। মীম আর আদি যে তানভিরের সাথে ছিল এটা তানভিরের মনেই ছিল না। তানভির শান্ত স্বরে বলল, "তোরা বস। আমি আসছি।" তানভির বের হয়ে একটু সামনে এগিয়ে গেল, বন্যা মৃদু হেসে প্রশ্ন করল, "আপনি এখানে?" "এমনিতেই আসলাম " বন্যা নিজের হাতের ঝালমুড়ির দিকে তাকিয়ে আবারও তানভিরকে দেখে আস্তে করে বলল, "ঝালমুড়ি খাবেন?" "নাহ। খাও তুমি।" কয়েক মুহুর্তের নিস্তব্ধতা কাটিয়ে তানভির শুধালো, "বাসা থেকে এত দূর ঝালমুড়ি খেতে আসছো?" বন্যা এবার একটু শব্দ করেই হাসলো।এপাশ ওপাশ মাথা নেড়ে বলল, "নাহ। ঘুরতে বের হয়ছিলাম। আপু আর ভাই একটু সামনে গেছে। তাই আমি ঝালমুড়ি খাচ্ছিলাম।" বন্যা ঘাড় ঘুরাতেই ঠোঁট জোড়া আরও প্রশস্ত হলো। স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, "ঐতো আপুরা চলে আসছে।" ওনারা আসতেই। বন্যা বোনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। যদিও তানভির আগে একবার বন্যাদের বাসায় গিয়েছিল কিন্তু তখন বড়

আপুর সঙ্গে দেখা হয় নি। তানভির কিছুটা থতমত খেয়েছে তবুও স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করছে। তানভির সহজ স্বরে বলল, "আসসালামু আলাইকুম আপু, কেমন আছেন?" "আলহামদুলিল্লাহ ভালো। আপনি কেমন আছেন?" "আলহামদুলিল্লাহ ভালো। আমি মেঘের বড় ভাই।" "চিনতে পারছি। আপনার কথা অনেক শুনি। আপনি নাকি খুব রাগী!" তানভিরের মুখের হাসি মুহুর্তেই গায়েব হয়ে গেছে। কি বলবে বুঝে উঠতে পারছে না। বন্যার আপু পুনরায় প্রশ্ন করলেন, "তা আমাদের এদিকে কি মনে করে? ঘুরতে নাকি এমনিতেই?" তানভির ঢোক গিলে শান্ত কণ্ঠে বলল, "ভাই বোনদের নিয়ে ঘুরতে বেড়িয়েছিলাম। ভাবলাম এদিকেও ঘুরে যায়।" বন্যা উত্তেজিত কণ্ঠে প্রশ্ন করল, "মেঘ আসছে?" তানভির মৃদু হেসে বলল, "না বনু আসে নি। মীম আর আদি গাড়িতে আছে।" বন্যা তটস্ত হয়ে বলল, "আগে বললেন না কেন? আপু, তোমরা কথা বলো, আমি দেখা করে আসি" বন্যার বড় বোন হাসিমুখে বলল, "ভাই বোনদের নিয়ে আসছেন রাস্তায় কত ঘুরবেন, বাসায় চলুন।" "না আপু। অন্য কোনদিন আসবো।" বন্যা, মীম আর আদির সঙ্গে গল্প করেছে। ঝালমুড়ি কিনে দিয়েছে। তাদের থেকে বিদায় নিয়ে তানভির বাসার উদ্দেশ্যে রওনা দিলো। বাসার গলি পর্যন্ত এসে গাড়ি থামালো। ততক্ষণে আবির মেঘকে নিয়ে চলে আসছে। তানভির গলিতেই ওদের নামিয়ে দিয়েছে। তিনভাই বোন গল্প করতে করতে যাচ্ছে। আবির ভাই মেঘকে মাথার মুকুট কিনে দিয়েছে, সেটা দেখেই মীম মেঘের কাছে আবদার করছে তাকেও যেন এনে

দেয়। তারপর বন্যার সঙ্গে দেখা হয়েছে সেই কথাও বলছে। বাসায় ফিরে কিছুক্ষণ পর ই তানভির বন্যার নাম্বারে কল দিল। আজ প্রথম বারেই কল রিসিভ হলো। তানভির গম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন করল, "কি করতেছো?" "তেমন কিছু না। কেন?" "হাত কাটছো কিভাবে?" বন্যা আঁতকে উঠে নিজের হাতের দিকে তাকায়। তানভির সন্ধ্যার দিকেই হাতের অবস্থা দেখেছে। আপু চলে আসায় হাতের কথাটা জিজ্ঞেস করতে পারে নি। বন্যা জ্বিভ দিয়ে নিচের ঠোঁট ভিজিয়ে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলল, "দা লেগে কেটে গেছিল" তানভির রাগী স্বরে বলল, "দা লেগে হাত কিভাবে কাটে? কাজ করার সময় মনোযোগ কোথায় থাকে?" বন্যা মৃদু হেসে বলল, "বেশি কাটে নি" "তা তো ব্যান্ডেজ দেখেই বুঝেছি। ঔষধ খেয়ো ঠিক মতো। রাখছি " এদিকে মেঘ ঘন্টাখানেক পর আবিরের জন্য এক কাপ কফি নিয়ে আস্তে আস্তে আবিরের রুমে ঢুকেছে। আবির চোখ বন্ধ করে বিছানার পাশে হেলান দিয়ে বসে আছে। মেঘ খুব সন্তর্পণে কাপটা টেবিলের উপর রাখল। কয়েক সেকেন্ড আবিরকে দেখল। বলতে চাইলো,কফিটা খাওয়ার জন্য, কিন্তু কেন জানি গলা দিয়ে কথা বের হচ্ছে না। মেঘ চলে যাওয়ার জন্য পা বাড়াতে নিলে আবির সুস্থির কণ্ঠে ডাকল, "মেঘ" ওমনি মেঘের পদযূগল স্তব্ধ হয়ে গেছে। পা বাড়াতে চেয়েও বাড়াতে পারছে না, মুখ ফুটে কিছু বলতেও পারছে না। আবির অত্যন্ত ধীর কণ্ঠে বলল, "মাথায় খুব ব্যথা করছে। কিছু মনে না করলে একটু টিপে দিবি। প্লিজ" আবিরের কন্ঠ অনেক ভার। কথাগুলোও অনেক কষ্টে বলেছে।

মেঘ ঢোক গিলে আস্তে করে গলা খাঁকারি দিয়ে বলল, “আপনার জন্য কফি নিয়ে আসছিলাম।” “এই ব্যথা কফিতে কমবার নয়” মেঘ এগিয়ে এসে আবিরের মাথার পেছনে দাঁড়িয়ে আলতোভাবে চুলে স্পর্শ করে। আবির চোখ বন্ধ করে বসে আছে। একবারের জন্য তাকিয়েও দেখছে না। আবিরের মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে মেঘ ডাকল, “আবির ভাই” “হুমমমমমমম” “আপনার কি হয়েছে? কি নিয়ে এত টেনশন করছেন?” “ভাবছি আগামীকাল ফুপ্পির সাথে বাসার মানুষদের দেখা করাবো। কিন্তু কিভাবে কি করবো কিছুই ভেবে পাচ্ছি না। বাসার মানুষদের রাজি করানোর উপায় পাচ্ছি না। তাই খুব টেনশন হচ্ছে ” মেঘ খানিক ভেবে বলল, “আমি কি কোনোভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি?” “নাহ। তোকে আমি কোনোকিছুতে জড়াতে চাই না। তোর কিছু করতে হবে না।” “কেন? ফুপ্পি কি আপনার একার নাকি। ফুপ্পিকে বাসায় ফেরানোর দায়িত্ব একা আপনার না। এ দায়িত্ব আমারও। আমার মাথায় একটা প্ল্যান আছে। বলি?” “বল” মেঘ আবিরের কানের কাছে বিড়বিড় করে সব প্ল্যান জানালো। তা শুনে আবির তপ্ত স্বরে বলল, ” আমি বললাম তো, তোকে আমি এই ঘটনায় জড়াতে চাই না। কেন বুঝতে চাইছিস না?” “কিছু হবে না আমার। আপনিই তো বলেন আমি এই বাড়ির রাজকন্যা। রাজকন্যার কথা কে অমান্য করবে শুনি?” আবির মলিন হাসলো। পুনরায় গম্ভীর কণ্ঠে বলল, ” তোকে কিছু বলতে হবে না। ” “আমি বড় আব্বু আর আব্বুকে রাজি করাতে পারবো। আপনি এত ভয় পাবেন না। ” আবির

প্রখর তপ্ত স্বরে জানালো, ” রাজকন্যার উপর অনাকাঙ্ক্ষিত আক্রমণ বা সামান্যতম আঁচড়ও আমি সহ্য করতে পারব না। ” “রাজকন্যার কিছুই হবে না জনাব। আমি এখনি রাজি করিয়ে আসছি ” “এই শুন” “পরে শুনবো, রাজকন্যা এখন গুরু দায়িত্ব পালন করতে যাচ্ছে। ”আবির আবারও মেঘকে ডাকে ততক্ষণে মেঘ রুম থেকে বেড়িয়ে পরেছে। মাথা ব্যথা, ভয়, মেঘের চিন্তায় আবিরের মনটা খুঁতখুঁত করছে, অস্থির লাগছে। আবির যে নিজের সর্বশক্তি দিয়ে মেঘকে সর্বক্ষণ আগলে রাখে তা কি অষ্টাদশী জানে? মেঘকে অতি সামান্য কারণেও কেউ ধমক দিলে আবিরের পায়ের রক্ত মাথায় উঠে যায়। এ অবস্থায় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে না বলে মেঘকে আগে থেকেই সাবধানে রাখে। মেঘের সাড়াশব্দ নেই, আবির বুঝতে পারে মেঘকে থামানো সম্ভব না। গত দু’রাত নির্ঘুম কাটিয়েছে, প্রচন্ড মাথা ব্যথা স্বত্তেও আবির উঠে বেলকনিতে আসলো। ততক্ষণে মেঘ নিচে চলে গেছে। সোফায় বসে আলী আহমদ খান আর মোজাম্মেল খান কিছু কাগজপত্র দেখছিলেন। আবির উপর থেকে স্থির দৃষ্টিতে বাবা,চাচা আর মেঘকে দেখছে। ভেতরটা ভয়ে কাঁপছে। আবির ছোট থাকাকালীন আলী আহমদ খান কয়েকবার আবিরকে নিয়ে ঘুরতে গিয়েছিলেন তারপর থেকে আজ অবধি পরিবার নিয়ে কোথাও যান না তিনি। মেঘ, মীমরা কোথাও ঘুরতে যেতে চাইলে ইকবাল খান নিয়ে যান। কখনো বাড়ির তিন বউ একসঙ্গে শপিং এ যান, কখনো তিন ভাই একসঙ্গে অফিসে বা অন্য কোথাও যান, আবার কখনো খান বাড়ি ৩ রাজপুত্র

আর ২ রাজকন্যা একসঙ্গে ঘুরতে যায়। কিন্তু সকলে একসঙ্গে আজ পর্যন্ত কোথাও যায় নি। ফুপ্পির জন্য মেঘ আজ রিস্ক নিয়ে আব্বু, বড় আব্বুকে রাজি করাতে নিচে আসছে। কিভাবে কি বলবে বুঝতে না পেরে রান্নাঘরে ছুটে গেল। রান্নাঘরে মালিহা খান চা করতেছিলেন। মেঘ উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, "বড় আম্মু, দাও আজ চা আমি করবো। " "তুই পারবি না মা, হাত পুড়ায়া ফেলবি।" " মোটেই না। তোমরা সবাই আমাকে এত ছোট মনে করো কেন? আমি কত বড় হয়ে গেছি দেখছো না!" "তুই বড় হয়ে গেছিস?" "অবশ্যই হইছি। আগামী মাসে ১৯ বছরে পা দিতে যাচ্ছি।" "মাশাআল্লাহ। বিয়ের বয়স তো হয়েই গেছে, জামাই দেখতে হবে তাহলে" মেঘ লজ্জায় বড় আম্মুর আঁচল দিয়ে নিজের মুখ ঢেকে ফেলল। মনে মনে বলল, " জামাই ফিক্সড, এখন তোমার ছেলের হাতে সব। তোমার ছেলে যত তাড়াতাড়ি রাজি হবে তত তাড়াতাড়ি আমি তোমার ছেলের বউ হবো। আহা কি শান্তি! " মালিহা খান ধীর হস্তে মেঘের মুখ থেকে আঁচল সরিয়ে খানিক হেসে বললেন, " বিয়ের নাম শুনেই এত লজ্জা?" মেঘ লাজুক হাসলো। মেঘের এই লজ্জার কারণ যে অন্যকিছু এটা মালিহা খানকে বুঝতে দিল না। কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে দুকাপ চা নিয়ে চলে গেল। মেঘের হাতে চায়ের কাপ দেখে দু ভাই ই নড়েচড়ে বসলেন। মোজাম্মেল খান চায়ের কাপ হাতে নিতে নিতে শান্ত স্বরে শুধালেন, "আম্মু, তুমি চা আনতে গেলে কেন?" " এমনিতেই। " আলী আহমদ খান প্রখর নেত্রে মেঘকে দেখে বললেন, "মুখ দেখে মনে হচ্ছে বড়সড়

আবদার আছে। কি লাগবে বলো মা” মেঘ হাসিমুখে উত্তর দিল, “কিছুই লাগবে না বড় আব্বু” মোজাম্মেল খান পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, “তোমরা নাকি আজ ঘুরতে গিয়েছিলে? কোথায় গিয়েছিলে? ” “চিরিয়াখানা আর বোটানিক্যাল গার্ডেনে।” “ঘুরাঘুরি করে মন ভালো হয়েছে?” মেঘ চোখ বন্ধ করে ঢোক গিলল। মনে সাহস জুগিয়ে বলল, “ভালো লাগে নি বরং মনটা আরও বেশি খারাপ হয়ে গেছে। ” “কেন?” ভয়ে মেঘের বুক কাঁপছে। আব্বু বা বড় আব্বু ধমক না দিয়ে বসেন। দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে মেঘ বলে উঠল, ” সবাই সবার আব্বু-আম্মু সহ পুরো পরিবার নিয়ে ঘুরতে আসছিল। তারা কত আনন্দ করছিল, তাদের দেখতেও ভাল লাগছিল। আমার বোধশক্তি হওয়ার পর থেকে আমি কোনোদিন দেখি নি আমাদের বাসায় সবাই একসঙ্গে কোথায় ঘুরতে গিয়েছে! আমি চাই আগামীকাল আমাদের বাসার সবাই একসঙ্গে ঘুরতে যাব। এটা আমার অভিযোগ সেই সঙ্গে আবদারও ” আলী আহমদ খান ধীর কণ্ঠে বললেন, “তোমার আম্মু, বড় আম্মু, কাকিয়া কে নিয়ে যেও আর আমি ইকবালকে বলবো নে, সেও তোমাদের সঙ্গে যাবে।” মেঘ অভিমানী কণ্ঠে জানালো, “আমি বলেছি সবাই মানে খান বাড়ির প্রত্যেকে। সেখানে আপনারা দু’জনও পড়েন।” মোজাম্মেল খান ভারী কণ্ঠে বললেন, “আমাদের কাজ আছে। বাকিদের নিয়ে যেও ” “আগামীকাল বিশ্ব ভালোবাসা দিবস আমি খোঁজ নিয়েছি অফিস ছুটি। প্লিজ আব্বু, প্লিজ বড় আব্বু চলুন না” “না মামনি। তোমরা ঘুরে আসো। টাকা দিয়ে দিব নে, খাওয়াদাওয়া করে

কেনাকাটা করে আইসো।” মেঘ এবার কিছুটা ক্ষিপ্ত স্বরে বলল, ” থাক টাকা লাগবে না। আপনাদেরও কোথাও যেতে হবে না। আমি কত আশা নিয়ে আসছিলাম, সবাই একসঙ্গে ঘুরতে যাব, কত ভালো লাগবে। সত্যি বলতে আপনারা আমায় ভালোই বাসেন না। শুধু মুখেই বলেন। ” “এভাবে বলছো কেন মা! আচ্ছা ঠিক আছে তোমার আব্বুও সাথে যাবে। তবুও মন খারাপ করো না” মেঘ অত্যন্ত গুরুতর কণ্ঠে বলল, “বললাম তো কাউকে যেতে হতে না। আপনারা আপনাদের ব্যবসা, কাজ নিয়েই ব্যস্ত থাকুন। আমাদের ভালোবাসার প্রয়োজন নেই। এরপর থেকে আমাকেও লক্ষ্মী মেয়ে বলে সম্বোধন করবেন না। আপনাদেরকে বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত। আপনারা আপনাদের কাজ করুন। ” মেঘ চলে যেতে নিলে আলী আহমদ খান ডাকলেন। শান্ত স্বরে মেঘকে বুঝানোর চেষ্টা করলেন। কিন্তু মেঘ নিজের জেদ থেকে নড়বেই না। একপর্যায়ে মেঘ বলে বসলো, আগামীকাল ঘুরতে না গেলে বাড়ির কারো সঙ্গে কথা বলবে না মেঘ। আলী আহমদ খান বেশকিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে ভাবলেন। ছোট থেকেই বোনকে অনেক আদরে বড় করেছিলেন আলী আহমদ খান এবং মোজাম্মেল খান। বোনের কোনো আবদার কখনও অপূর্ণ রাখেন নি। খরচের টাকা বাঁচিয়ে বোনের জন্য গিফট নিয়ে আসতেন, প্রতি সপ্তাহেই চার ভাইবোন মিলে ঘুরতে যেতেন। ইকবাল খান সবার ছোট থাকা সত্ত্বেও আলী আহমদ খান আর মোজাম্মেল খানের বোনের প্রতিই ভালোবাসা বেশি ছিল। কিন্তু বোন এমন কান্ড ঘটানোর ফলে ভাইবোনের

শারীরিক,মানসিক দুভাবেই বিচ্ছেদ ঘটেছে। পরিবারকে সময় দেয়া বিশেষ করে ঘুরতে নিয়ে যাওয়াটা একেবারেই ছেড়ে দিয়েছেন। দু-একবার গেলেও মাথায় শুধু বোনের স্মৃতি ঘুরতো। তারজন্য পরিবারের দায়িত্ব ছেড়ে ব্যবসার হাল শক্ত করে ধরেছেন। বড় ভাইয়ের দেখাদেখি মোজাম্মেল খানও ধীরে ধীরে একই পথের পথিক হয়ে গেছেন। সেই সঙ্গে পরিবারের পুরো দায়িত্ব পরেছে ইকবাল খানের উপর। বাসার বাজার থেকে শুরু করে কেউ অসুস্থ হলে হাসপাতালে নেয়া, ডাক্তার দেখানো, ঘুরতে নিয়ে যাওয়া সম্পূর্ণ দায়িত্বই ইকবাল খানের। অনেক ভেবেচিন্তে অবশেষে আলী আহমদ খান জানালেন, তিনিও আগামীকাল যাবেন। এবার মেঘের খুশি দেখে কে! মেঘ ছুটে গিয়ে আম্মু, বড় আম্মুকে ডেকে নিয়ে আসছে, আকলিমা খান মীম, আদিকে পড়াচ্ছিলেন তাদেরকেও ডেকে নিয়ে আসছে। এরমধ্যে আবির নিচে নামছে। মেঘ আবিরের দিকে তাকিয়ে টানা দু'বার ভ্রু নাঁচালো। আবিরও নিঃশব্দে হাসলো। চোখের ইশারাতেই মেঘের প্রশংসা করল। আবির নামতেই মোজাম্মেল খান জিজ্ঞেস করলেন, "আগামীকাল কি তুমি ফ্রী আছো?" "কিছু কাজ আছে। কেন চাচ্চু?" "মেঘ একদম পাগল করে ফেলতেছে আগামীকাল নাকি ভালোবাসা দিবস। সেই উপলক্ষে বাসার সবাইকে নিয়ে ঘুরতে যাবে। তুমি কি সময় দিতে পারবে?" আবির উদাসীন কণ্ঠে বলল, "সবাই গেলে আমার তো সময় দিতেই হবে। কাজ না হয় পরেই করলাম। আবিরের ভাবের কথা শুনে মেঘ কপাল কুঁচকে আবিরের দিকে তাকিয়ে আছে। দিনরাত এক

করে ফুপ্পিকে নিয়ে ভাবা মানুষটা ফুপ্পির সাথে সবার দেখা করানোর চিন্তায় আধমরা হয়ে যাচ্ছিলো। অথচ আব্বুর সামনে এসে কি সুন্দর করে বলছেন ওনার নাকি কাজ আছে। কি এমন কাজ টা ওনার! এরমধ্যে ইকবাল খান বাসায় আসছেন। তানভিরকেও জানানো হয়েছে। কোথায় যাওয়া হবে, কখন যাবে সব সিদ্ধান্ত শেষে যে যার মতো চলে গেছে। আলী আহমদ খান, মোজাম্মেল খান দুজন আবারও কাগজপত্র দেখছেন। ইকবাল খান, আকলিমা খান, মীম, আদি সকলে রুমে চলে গেছেন। আবির খেতে বসছে। আবিরকে দেখে মেঘও আবিরের বিপরীতে গিয়ে বসলো। ডাইনিং টেবিলে আর কেউ নেই। হালিমা খান খাবার রেডি করছেন। মেঘ আবিরের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে বলল, "আপনার আগামীকাল কি এমন কাজ শুনি?" "কোনো কাজ নেই। কেনো?" একটু আগে যে বললেন, "ব্যস্ত, কাজ আছে" আবির ওষ্ঠদ্বয় কিছুটা প্রশস্ত করে বলল, " কখনো কখনো পরিস্থিতি বুঝে মুখেমুখে হলেও ব্যস্ততা দেখাতে হয়। সবাই এক্সাইটেড হয়ে গেলে সমস্যা আছে।" মেঘ মাথা চুলকে বলল, "আপনি কি ভাবেন আর কি করেন আপনিই জানেন" আবিরের প্রশস্ত ওষ্ঠ আরও বেশি প্রশস্ত হলো। আবির তপ্ত স্বরে বলল, "Thank you my dear Sparrow." "My pleasure" আজ সকাল থেকে বাড়িতে হৈচৈ। মীম, মেঘ, আদি তিনজনই খুব এক্সাইটেড। গতকাল হুট করে আবির শাড়ি নিয়ে আসছিলো। তাই সাজার তেমন সময় পায় নি। আজ মেঘ সকাল সকাল চুলে শ্যাম্পু করে অনেকটা সময় নিয়ে শাওয়ার

নিয়েছে। ভেজা চুল ছেড়ে সারা বাড়ি ঘুরছে। সবাই রেডি হয়ে যাচ্ছে। কি ড্রেস পরবে, মেঘ এখনও সিদ্ধান্ত ই নিতে পারছে না। ভালোবাসা দিবসে আবিরের সঙ্গে মিলিয়ে জামা পরবে এটা আগে থেকেই ভেবে রেখেছিল। কিন্তু সারাদিন যাবৎ আবিরের কোনো হদিস নেই। সেই সকালে বেড়িয়েছে এখনও আসছে না। সবার বলাবলিতে মেঘ রেডি হতে চলে গেছে। মেঘ লাল রঙের একটা গাউন পড়েছে। চুলগুলো বেঁনি করে সামনের দিকে রেখেছে। একহাতে ঘড়ি আরেকহাতে আবিরের দেয়া কাঁচের চুড়ি থেকে একসেট লাল রঙের চুড়ি পড়েছে। আজ কানে বড় দুল দিয়েছে, ঠোঁটে লাল টকটকে লিপস্টিক, চোখে আইলাইনারের সাথে হালকা করে দেয়া কাজল। আগে মেঘ গাঢ় করে কাজল দিতো। কিন্তু আবিরের ভয়ে এখন কাজল দেয়া ছেড়েই দিয়েছে। হঠাৎ হঠাৎ হালকা করে একটু দেয়। মেঘ রেডি হয়ে সোফায় বসে ফোন চাপতেছিল। এরমধ্যে আবির বাসায় আসছে। আড়চোখে মেঘকে খানিক দেখেই দ্রুত রুমে চলে গেল। ২০ মিনিটের মধ্যেই শাওয়ার নিয়ে একেবারে রেডি হয়ে নেমে পরেছে। আজকেও পাঞ্জাবি পরেছে। আবিরের পাঞ্জাবিটা বেশ কয়েকটা রঙের কম্বিনেশনে তৈরি। তবে সেটাতে লাল রঙ একটু বেশিই ভাসছে। মেঘের ইচ্ছে পূরণ হয়েছে দেখেই মাথা নিচু করে মুচকি হাসলো। আবির বাসা থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। পেছন পেছন মেঘও ছুটলো। মেঘকে ছুটতে দেখে আবির থমকে দাঁড়ালো। মেঘ কাছে আসতেই শান্ত স্বরে বলল,”
“ওখানে একদম শান্ত থাকবি। ফুপ্পিকে তুই চিনিস না। আর আজকের

জন্য জান্নাত আপুকেও চিনিস না। ওদের দেখে উত্তেজিত হয়ে জড়িয়ে ধরতে যাবি না। মনে থাকবে?” “আচ্ছা ঠিক আছে।কিন্তু আপনি সকাল থেকে কোথায় ছিলেন?” “ফুপ্পি দুশ্চিন্তা করতে করতে অসুস্থ হয়ে পরছিল। আইরিন কল দিয়ে কান্নাকাটি করতেছিল তাই বাসায় গেছিলাম।” মেঘ উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলল, “আমার ফুপ্পির জন্য খুব টেনশন হচ্ছে। ” “আর আমার আব্বুর জন্য বেশি টেনশন হচ্ছে। আচ্ছা যাই হোক। তুই মুড অফ করে থাকিস না। বাসার সকলের সঙ্গে ঘুরার ইচ্ছে পূরণ হচ্ছে সেটাতেই ফোকাস কর। ” মেঘ কথা না বাড়িয়ে সোজা গাড়িতে বসলো। একটু পর মীম, আদি সহ সকলেই চলে আসছে। বাসার আশেপাশে সুন্দর নিরিবিলি জায়গা ঘুরে হালকা নাস্তা করে পরিশেষে রমনা পার্কে আসলো। আবির আর তানভির এমন ভাব নিচ্ছে যে বাবা, চাচার কথা ছাড়া তারা কোনোদিকে যায় না। রমনা পার্কে যাবে কি না সেই অনুমতিও বাবার থেকে নিয়েছে আবির। শান্ত পরিবেশে হাঁটছে সকলে। মেঘের কথা মাথায় রেখে আলী আহমদ খান নিজেই মীম,মেঘদের ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাচ্ছেন, এটা সেটা গল্প বলছেন। সামনের দিকে তিন ভাই, মীম, আদি,মেঘ, তারপর তিন বউ সবশেষে আবির আর তানভির। ফুপ্পির কথা জানতে মেঘ ইচ্ছে করেই সামনে থেকে পিছনে আসছে। কিন্তু পরিস্থিতি বেশ ঠান্ডা। আবির, তানভির কোনো কথা বলছে না। আবির ফোনে কাকে যেন মেসেজ পাঠাচ্ছে। তানভির, আবির কারো কাছে পাত্তা না পেয়ে মেঘ চলে যেতে নিলে আবির আচমকা মেঘের হাতের কব্জিতে শক্ত করে ধরে।

মেঘ পেছন ফিরতেই আবির চোখে ইশারা করলো, সামনে না আগানোর জন্য। সামনে সবার হাঁটা হঠাৎ ই থেমে গেছে। মেঘ এবার ঘাড় ফিরিয়ে তানভিরকে দেখার চেষ্টা করল। তানভির কিছুই দেখেনি ভাব করে মেঘকে ক্রস করে সামনে গিয়ে মেঘকে আড়াল করে দাঁড়িয়েছে। আবির মেঘের হাত ধরে রাখছে এই দৃশ্য যেন কারো নজরে না পরে তারজন্যই আড়াল করে দাঁড়িয়েছে। মালিহা খান জান্নাতকে দেখেই এগিয়ে গেছেন। বাকিরা সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে। মালিয়া খান উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, "আরে জান্নাত, কেমন আছো?" জান্নাত একগাল হেসে উত্তর দিল, "আলহামদুলিল্লাহ ভালো। আপনি কেমন আছেন আন্টি? আপনারা সবাই বুঝি ঘুরতে আসছেন?" "আলহামদুলিল্লাহ ভালো। মেঘের আবদার আজকের স্পেশাল দিনে সবাইকে নিয়ে ঘুরবে তারজন্য আসলাম।" জান্নাত এবার আলী আহমদ খানকে উদ্দেশ্য করে বলল, "আসসালামু আলাইকুম আংকেল, কেমন আছেন?" "আলহামদুলিল্লাহ। তুমি ভালো আছো তো?" "জ্বি আলহামদুলিল্লাহ। " হালিমা খান স্বাভাবিক কণ্ঠে শুধালেন, "তা জান্নাত, তুমি কি একা আসছো?" জান্নাত হাসিমুখে বললো, "নাহ" বলে ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে গাছের নিচে বসা মহিলার দিকে তাকালো। মালিহা খান কিছুটা পিছিয়ে আলী আহমদ খানের কাছাকাছি এসে আস্তে করে বললেন, "ওনি মনে হয় জান্নাতের আম্মু। আপনাকে যে বলছিলাম কিছু তো বললেন না। আজকে তাহলে আমাদের বাসায় দাওয়াত দিব নে। আপনি কি বলেন?" "ঠিক আছে। তোমার যেহেতু

এত ইচ্ছে, দিও দাওয়াত। আমার কোনো সমস্যা নেই" মালিহা খানের মুখে উজ্জ্বলতা ঝলঝল করছে। উত্তেজিত কণ্ঠে জান্নাতকে প্রশ্ন করলেন, "ওনি তোমার আম্মু না? ডাকো একটু কথা বলি।" জান্নাত ঘাড় ঘুরিয়ে ডাকলো, "আম্মু এদিকে আসো।" ঠোঁটে হাসি রেখেই জান্নাত মালিহা খানকে বলল, "ওনি আমার শাশুড়ি আম্মু।" সহসা স্তব্ধ হয়ে গেছে সবকিছু। মালিহা খান অবিশ্বাস্য চোখে তাকিয়ে আছে জান্নাতের দিকে। জান্নাতের কথা শুনে আলী আহমদ খানও কপাল কুঁচকালেন। মালিহা খান প্রায় প্রায়ই আবিরের জন্য জান্নাতের কথা বলেন, কিন্তু আলী আহমদ খান তেমন সাড়া দেন নি বলে এতদিন কিছুই বলতে পারেন নি। অথচ সেই মেয়ে বিবাহিত। ওনাদের সাথে সাথে বাকিরাও অবাক চোখে তাকিয়ে আছে। মালিহা খান এতটায় শকট যে কিছুই বলতে পারছেন না। এদিকে আবির মেঘের হাত ধরেই রেখেছে যাতে মেঘ কোনোভাবেই সামনে না যায়। তানভির মেঘের সামনে দাঁড়ানো তাই মেঘ জান্নাত আপুর কথা শুনলেও আপুকে দেখতে পারছে না। মেঘ ঘাড় কাত করে জান্নাতকে দেখার চেষ্টা করছে। আকলিমা খান খানিক ভেবে প্রশ্ন করলেন, "তোমার বিয়ে কবে হয়ছে?" "অক্টোবরের ১২ তারিখ আন্টি। " মালিহা খান এবার দ্বিতীয় বারের মতো আশ্চর্য হলেন। আজ ফেব্রুয়ারি ১৪ মানে ৪ মাসের উপরে হয়ছে জান্নাতের বিয়ে হয়েছে। অথচ ওনি তাকে ছেলের বউ বানাতে উঠেপড়ে লেগেছিলেন। হালিমা খান বললেন, "আমাদের বললে না তো" "আসলে আন্টি হুট করেই বিয়ের দিন তারিখ ঠিক

হয়েছিল আর ঐরকম পোগ্রামও করা হয় নি। তারজন্য আর বলা হয় নি।” “তা তোমার হাসবেন্ড কি করে?” “জবের জন্য আপাতত দেশের বাহিরে আছেন। দোয়া করবেন আমাদের জন্য। ” “ফি আমানিল্লাহ। স্বামী সংসার নিয়ে সুখে থাকো।” মালিহা খানের চোখ-মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। জান্নাতকে দেখে যতটা উত্তেজিত ছিল এখন ঠিক ততটায় নিরুদ্বেগ। কোমল দৃষ্টিতে জান্নাতের দিকে তাকিয়ে আছে। জান্নাত পুনরায় একটু উঁচু স্বরে ডাকলো, “কি হলো আম্মু? আসো” এবার মহিলা উঠলেন। মাথায় ওড়না দেয়া, মাথা নিচু করে এগিয়ে এসে ভরাট, শীতল কণ্ঠে বললেন, “আসসালামু আলাইকুম। ” আস্তে করে সকলেই সালামের উত্তর দিয়ে তাকালেন সেই মহিলার দিকে। মহিলা মুখ তুলে তাকাতেই চোখাচোখি হলো আলী আহমদ খানের সাথে, পাশে তাকাতেই মোজাম্মেল খান। প্রকৃতি যেন থমকে গেছে, মুহুর্তেই নিস্তব্ধতায় ছেড়ে গেছে সবকিছু। মাহমুদা খানের দৃষ্টি একে একে সকলকে দেখছে। মালিহা খান, ইকবাল খান, পেছনে হালিমা খান আর আকলিমা খানকেও একপলক দেখে নিলেন। আবিরের হাতে থাকা মেঘের ছোট্ট হাতটা থরথর করে কাঁপছে। ভয়ে বুকের ভেতর হৃদপিণ্ড ছুটছে এদিকসেদিক। হাত- পা ঠান্ডা হয়ে আসছে। ২৮ বছর পর মুখোমুখি হয়েছে ভাই বোন। কি হতে চলেছে ভেবেই মেঘের শরীর ঘামতে শুরু করেছে। আবির দু কদম এগিয়ে মেঘের পাশে দাঁড়ালো। মেঘের হাত ছাড়তেই মেঘ ব্যালেন্স হারিয়ে পরতে নিলে আবির তৎক্ষনাৎ ডানহাত দিয়ে মেঘের কনুই এর উপর চেপে ধরলো।মেঘ

আড়চোখে আবিরের দিকে তাকাতেই আবির মলিন হেসে প্রখর তপ্ত স্বরে বলল, " হেই, রিলাক্স। কিচ্ছু হয় নি!" মেঘ শীতল চোখে আবিরের মুখের পানে তাকিয়ে আছে। কপালের ঘাম বেয়ে বেয়ে নিচে পরছে। দুশ্চিন্তায় দুধের ন্যায় মুখবিবর রক্তাভ হয়ে গেছে। মেঘ অল্পতেই ইমোশনাল হয়ে যায়। পরিস্থিতি সামলানোর আগেই ভেঙে পরে। আবির পকেট থেকে রুমাল বের করে আলতোভাবে মেঘের কপাল,নাক,থুতনি মুছতে মুছতে বলল, " এই পাগল, এত টেনশন কিসের তোর? আমি আছি তো নাকি?" আবির মেঘের মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে ধীর কণ্ঠে বুঝাচ্ছে। মেঘও শান্ত মেয়ের মতো আবিরের কথা শুনছে। এদিকে মাহমুহা খানের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সকলেই। ২৮ বছর পর কাউকে হুট করে দেখলে কখনোই চেনা সম্ভব না। বেশকিছুক্ষণ পর ইকবাল খান শ্বাস ছেড়ে গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, "আফা!" মীম, আদি একবার আব্বুর মুখের দিকে তাকাচ্ছে, আবার মহিলাকে দেখছে আবার ঘাড় ফিরিয়ে বাকিদেরও দেখছে। হালিমা খান আর আকলিমা খান মাহমুদা খানকে বাস্তবে দেখে নি দু একবার শুধু ছবিই দেখেছিল তাই তেমন চিনে না। মোজাম্মেল খান ভারী কণ্ঠে বললেন, "তুই...!" মালিহা খান এখনও নিশ্চুপ। জান্নাতের বিষয়টাতেই এখনও স্বাভাবিক হতে পারছেন না। তারউপর এত বছর পর ননদের সাথে দেখা। সবকিছু মাথার উপর দিয়ে যাচ্ছে ওনার। এদিকে আলী আহমদ খানও পাথরের ন্যায় দাঁড়িয়ে আছেন। মীম আর আদি দু'জনে বেশকিছুক্ষণ মুখ চাওয়াচাওয়ি করে অবশেষে আব্বুকে

প্রশ্ন করল, “আব্বু, ওনি কে?” ইকবাল খান উত্তর দিতে পারছেন না। নিজের সন্তানের সামনে বোনকে কি বলে পরিচয় দিবেন সেটাও বুঝতে পারছেন না। ইকবাল খান অসহায়ের মতো তাকিয়ে আছে মোজাম্মেল খানের দিকে। মীম একবার প্রশ্ন করে থেমে গেলেও আদি বার বার প্রশ্ন করেই যাচ্ছে। কেউ কোনো উত্তর দিচ্ছে না। দীর্ঘ সময়ের নিরবতা ভেঙে মাহমুদা খান জিজ্ঞেস করলেন, “কেমন আছো ভাইজান?” একমাত্র বোনের মুখে ভাইজান ডাক শুনে আলী আহমদ খানের বুকটা কেঁপে উঠল। ঢোক গিলে অনুষ্ঞ স্বরে বললেন, “আলহামদুলিল্লাহ।” স্নিগ্ধ শীতল পরিবেশ। পাখিদের কিচিরমিচির শব্দ ব্যতীত আর কোনে শব্দ নেই। কেউ কোনো কথা বলছে না। আবার জায়গা থেকে নড়ছেও না। আদি কিছুক্ষণ থেমে থেমে আবার প্রশ্ন করে, মাহমুদা খানের পরিচয় জানতে চায় কিন্তু কেউ বলে না। জান্নাত সশরীরে এতক্ষণ উপস্থিত থাকলেও তার মনোযোগ ছিল ফোনে। আসিফ কল দেয়ায় ফোন নিয়ে একটু দূরে চলে গিয়েছিল। কথা শেষ করে এগিয়ে আসতে আসতে স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, “আম্মু কথা শেষ হয় নি? চলো বাসায় যায়” মাহমুদা খানের কান্না গলায় আঁটকে আছে। এত বছর পর ভাইদের স্ব চক্ষে দেখছেন, ঠিকমতো কথাও বলতে পারছেন না। মাহমুদা খান শীতল কণ্ঠে বললেন, “আসছি ভাইজান। ” মাহমুদা খান জান্নাতের পাশে হেঁটে যাচ্ছেন। প্রত্যেকেই সেদিকে তাকিয়ে আছে। প্রতিটা সদস্যদের ভেতর খুঁড়ে শুধু দীর্ঘশ্বাস বেড়িয়ে আসছে। আলী আহমদ খান, মোজাম্মেল খান সহ সকলেই আজ কঠিন

সত্যের মুখোমুখি হয়েছে। সন্তানদের প্রশ্নের উত্তরে না পারছে সত্যি বলতে আর না পারছে এড়িয়ে যেতে। মেঘ আবিরের দিকে তাকিয়ে ভ্রু কুঁচকালো। আবির নিঃশব্দে ডান ভ্রু উঠাতেই মেঘ বিড়বিড় করে বলল, "ফুপ্পি চলে গেল কেন?" "আমিই বলছি চলে যেতে।" "কেন?" " আবেগ, অনুভূতি, ভালোবাসা ২৮ বছর যাবৎ চাপা পরে কঠিন পাথরের রূপ নিয়েছে। সেই পাথর ৫-১০ মিনিটে গলবে না। তার জন্য পর্যাপ্ত সময় লাগবে। " স্তব্ধ পরিবেশ স্তব্ধ রেখেই সকলে বাসায় ফিরে আসছে। কারো মুখে কোনো কথা নেই। বাসায় আজ রান্না নেই, খাওয়াদাওয়া নেই। মীম, আদিও আজ তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পরেছে। তিন বউ রান্নাঘরে দাঁড়িয়েই ঘন্টাখানেক আলোচনা করেছে। তিনভাইয়ের মনে কি চলছে কে জানে। তিন জনই তিনজনের রুমে বসে আছে। কি ভাবছে কে জানে! তানভির বাসায় ফিরে আবার বেড়িয়েছে। টুকিটাকি কাজ ছিল সেগুলো শেষ করে বন্যাদের এলাকায় আসছে। কিন্তু বন্যার কোনো হদিস নেই। আজকের স্পেশাল দিনে বন্যার দেখা পাবে না ভাবতেই ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠে। সন্ধ্যার পর হয়ে গেছে, বন্যার বের হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। কিন্তু তানভিরের মন যেতেও চাইছে না। প্রায় ১ ঘন্টা অপেক্ষার পর তানভির বন্যাকে কল দিল, বন্যা কল রিসিভ করতেই তানভির বলল, "এই মেয়ে, কোথায় আছো?" তানভিরের ধমকের স্বরে বলা কথাতে বন্যা না চাইতেও কেঁপে উঠে। সদ্য ঘুম থেকে উঠা মেয়েটা নরম স্বরে উত্তর দিল, "বাসায়। কেন?" "আমি তোমাদের বাসার গলির সামনে

দাঁড়িয়ে আছি। তাড়াতাড়ি আসো” “মানে?” “আসতে বলছি, আসো” বলেই তানভির কল কেটে দিয়েছে। বন্যা শোয়া থেকে উঠে বসে। ফোনের নাম্বার টা আবারও চেক করে। সত্যি সত্যি তানভির ভাই, কিন্তু ওনি হঠাৎ এখানে এসে কল কেন দিবেন এটায় ভেবে পাচ্ছে না বন্যা। চোখে মুখে অল্প একটু পানি ছিটিয়ে টাওয়েল দিয়ে মুছলো কি না ছুটে গেল নিচে। সদ্য ঘুম থেকে উঠায় চুলের অবস্থাও নাজেহাল। কিন্তু আঁচড়ানোর সময় নেই। নিচে বন্যার ভাই টিভি দেখছিল। বন্যাকে ছুটতে দেখে শুধায়, “ছোট্টআপু পাগলের মতো কোথায় যাচ্ছিস?” “সামনেই। ” “কি হয়ছে আমায় বল” “কিছু হয় নি। তুই টিভি দেখ” বলেই বন্যা দৌড়ে বেড়িয়ে গেছে। গলির ঠিক সামনেই তানভির দাঁড়িয়ে আছে। তানভিরকে দেখামাত্রই দৌড়ের গতি কমে গেছে। ধীর গতিতে এগিয়ে গেল। গলায় ওড়না প্যাঁচানো। চুল অগোছালো, মুখ মলিন হয়ে আছে। তানভির কপাল গুটিয়ে সূক্ষ্ম নেত্রে বন্যাকে নিরীক্ষণ করলো। বন্যা কিছু বলার আগেই তানভির ভারী কণ্ঠে বলল, “সন্ধ্যাবেলা চুল ছেড়ে বের হয়ছো কেন? আর চুলের এ দশা কেন? মাথায় ওড়না দাও। ” বন্যা ওড়না মাথায় দিতে দিতে নিরুদ্বেগ কণ্ঠে জবাব দিল, “ঘুমাইছিলাম” “অসময়ে ঘুমাও কেন? সন্ধ্যা বেলা ঘুমাতে নেই তুমি জানো না?” “জানি। ঘুম পাচ্ছিলো তাই” “হাতের কি অবস্থা দেখি” বন্যা আস্তে করে হাত বাড়ালো। ব্যান্ডেজ খুলে ফেলছে। তানভির বন্যার হাতে ধরে ফোনের আলো দিয়ে ভালোভাবে হাতটা দেখলো। তারপর ধীর স্বরে বলল, “দেখেশুনে কাজ করতে পারো না”

কিছু ঔষধ বন্যার হাতে দিয়ে বলল, “এই ঔষধ গুলো ঠিকমতো খেয়ে। তাড়াতাড়ি ঠিক হয়ে যাবে। গতকালই নিয়ে আসতাম কিন্তু জরুরি কাজে বের হয়ছিলাম আর এত রাতে বের হতে পারবে না তাই আসি নি।” “আমি ঔষধ খাচ্ছি ” “আজ থেকে এগুলো খাবা, আন্দাজি আনি নি, ডাক্তারের সাথে কথা বলেই নিয়ে আসছি। এটুকু বিশ্বাস রাখতে পারো।” “বিশ্বাসের কথা আসছে কোথা থেকে। আমি বলছিলাম” “আর কিছু বলতে হবে না। খাবার গুলো খেয়ে নিও। নাও” “এতকিছু কেন আনছেন? এসবের কোনো দরকার ছিল না।” “তাহলে কি দরকার বলো, এনে দিয়ে যাচ্ছি। ” “আল্লাহ! কিছুই দরকার নাই আমার। মেঘ কোথায়?” “বাসায়।” “কল দিলে কল ধরে না। একটু বলে দিবেন প্লিজ” “বনু একটু টেনশনে আছে। টেনশন ফ্রী হলে নিজেই কল দিবে।” বন্যা চিন্তিত কণ্ঠে শুধালো, “কি হয়েছে?” “তেমন কিছু না। বাসায় একটু সমস্যা চলতেছে। জানোই তো, বনু অল্পতেই হাইপার হয়ে যায়। এই আর কি” বন্যার মাথায় আবির ভাইয়ার কথায় ঘুরছে। বাসার আর কোনো সমস্যাও কথা বন্যার মাথার আসছে না। তবে কি আবির ভাইয়ার সঙ্গে সমস্যা হয়ছে। বন্যা উদ্বিগ্ন কণ্ঠে আবারও প্রশ্ন করল, “বাসায় কি সমস্যা হয়ছে বলা যাবে? প্লিজ” “বনুকে জিজ্ঞেস কইরো বনুই বলবে। সন্ধ্যার পর এতক্ষণ বাহিরে থাকা ঠিক না। বাসায় চলে যাও।” “জ্বি আচ্ছা। ধন্যবাদ। ” বন্যা গলি দিয়ে চলে যাচ্ছে লাইটের আলোতে তানভির স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে সেই দৃশ্য দেখছে। এদিকে বাসার হিমশীতল পরিবেশ দেখে মেঘের খুব

চিন্তা হচ্ছে।মেঘ বাসায় ফিরে ফুপ্পির সঙ্গে কথা বলেছে। বেশিকিছু সময় যাবৎ আবির সোফায় হেলান দিয়ে বসে আছে। ড্রয়িং রুমে আর কেউ নেই। মেঘ বেলকনি থেকে আবিরকে দেখেই নিচে আসলো। আবিরের চোখ বন্ধ দেখে মেঘ মৃদুভাবে ডাকল, "আবির ভাই" আবির চোখ মেলে আড়চোখে তাকালো। কিছুই বলল না। মেঘ আবারও বলল, "এখানে বসে আছেন কেন? রুমে যান" "রুমে যেতে ভয় লাগতেছে। আব্বুর নিস্তব্ধতা আমায় খুব ভাবাচ্ছে। আর কারোর টা জানি না তবে আব্বুর জন্য খুব চিন্তা হচ্ছে। " "বড় আম্মুও খুব কষ্ট পাইছে। জান্নাত আপুর বিষয়টা আগে জানিয়ে দিলেই হতো।" "আম্মুর কষ্ট পাওয়াটা আহামরি কিছু না। আমি বার বার বারণ করা স্বত্তেও আমার বউ ভাবতে হয় কেন? কয়েকবার বলার পরও যেহেতু মানে নি তাই আমি আর কিছু বলি নি। বউ ভাবতে থাকুক, আমার না হউক আসিফ ভাইয়ার বউ তো। আমি যেটা চাইছিলাম ওটা হয় নি। " "কি চাইছিলেন?" "তানভিরকে দিয়ে জান্নাতকে আনাইছি। তানভির আর জান্নাতের বয়স কাছাকাছি। আমি ভাবছি আম্মু বা মামনি করলে, তানভিরকে নিয়ে সন্দেহ করবে। আর আমি ঐটাকে কাজে লাগাবো। উল্টো আমি ফেঁসে গেছি। আম্মু ডিরেক্ট আমার বউ বানানোর চিন্তা করে ফেলছে " "তারমানে এসব আপনাদের প্ল্যান?" "হ্যাঁ। সবটায় পরিকল্পিত।" "আগে যে বলছেন, আমার জন্য জান্নাত আপুকে আনছিলেন?" "তোর জন্যই তো আনছি। ফুপ্পি কি তোর না? চান্স কি তুই পাস নি? তাহলে কার জন্য করছি এসব?" মেঘ নিশ্চুপ। আবির

পুনরায় বলল, “তোর জন্য যদি শুধু শিক্ষক লাগতো তবে এই শহরে ভালো শিক্ষকের অভাব ছিল না। তারা তোকে দায়িত্ব নিয়ে পড়িয়ে চান্স ও পাওয়াতো। কিন্তু ফুপ্পির সাথে কিভাবে সম্পর্ক ঠিক করব তা ভেবে পাচ্ছিলাম না। একমাত্র উপায় ছিল জান্নাত। জান্নাত তোকে পড়ালে আর তুই চান্স পেলে বাসার মানুষের জান্নাতের প্রতি পজিটিভ চিন্তা আসবে। তখন ধীরে ধীরে ফুপ্পির সংস্পর্শে আসা যাবে। আরেকটা হচ্ছে বউ বানানোর চিন্তা। ঐটা আসলে শুরুতে ছিল না। তানভিরকে দিয়ে আনাইছিলাম কারণ আমি দেশে ছিলাম না। দেশে ফিরে আমি টিচার কিভাবে পাবো। তাছাড়া জান্নাত যে রাকিবের বোন এটা জানলে সবাই সিউর ধরে নিতো আমার জান্নাতের সাথে সম্পর্ক। এজন্যই মূলত তানভিরকে দিয়ে আনানো। কিন্তু তাতে কোনো লাভ হলো না। ” মেঘ কপাল চুলকে বিড়বিড় করে বলে, “আপনি খুব চালাক, মাগনা হি*ট*লা*র বলি না আপনাকে। ” “চালাক আর হতে পারলাম কোথায়। নিয়তির বেড়াজালে বন্দি হয়ে আছি আমি । ” “কি হয়েছে?” “কিছু না। রুমে গিয়ে রেস্ট নে” মেঘ রুমে এসে টেবিলের উপর মাথা রেখে চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছে। ২০-২৫ মিনিট পর আবির দরজায় আসলো, ঠান্ডা কণ্ঠে বলল, “আসবো?” মেঘ মাথা তুলতেই দেখল আবির। মৃদু হেসে বলল, “আসুন।” আবির হাতে নুডলসের বাটি নিয়ে রুমে ঢুকলো। মেঘের টেবিলে নুডলসের বাটি রেখে বলল, “রাতে রান্না করে নি। এটা খেয়ে নে” “নুডুলস আপনি রান্না করছেন?” “হ্যাঁ” “আপনি নুডলসও রান্না করতে পারেন?” “জ্বি

ম্যাডাম” “আর কি কি পারেন?” “কি খেতে চান বলুন শুধু।” “বাব্বাহ! এত কনফিডেন্স” “হুমমমমমমমমম” মেঘ মায়াবী দৃষ্টিতে আবিরকে দেখছে। আবিরের কণ্ঠে এই হুমমমমমমম শুনলে অষ্টাদশীর কোমল হৃদয়ে ঘূর্ণিঝড় বয়ে যায়। মাত্র রান্না করে আসায় আবির শরীর কিছুটা ঘেমে গেছে। ঘামে ভেজা কপালে চুল লেপ্টে আছে, নাকের ডগায় ঘাম চিকচিক করছে, দাঁড়ি গুলোতে চোখ পড়তেই অষ্টাদশী ঢোক গিলল। সম্পূর্ণ আবিরই অষ্টাদশীর প্রিয় তবে আবিরের দাঁড়ি অষ্টাদশীর ইমোশন। দাঁড়িতে নজর পড়তেই ছুঁতে ইচ্ছে করে আর কোনোভাবে স্পর্শ করলেও গা শিউরে ওঠে। আবিরের দাঁড়ি দেখতে দেখতে আবিরের গালে কিস করার ঘটনা মনে পরে গেল। ওমনি মেঘ লজ্জায় মাথা নিচু করে ফেলল। আবির মৃদুস্বরে শুধালো, “কি হয়েছে? কোনো সমস্যা? ” মেঘ মনে মনে আওড়াল, “আপনি মানুষটা আগাগোড়ায় সমস্যা। মায়ার চাদরে আবদ্ধ করে দিককে দিন আমার প্রগাঢ় মনকে অনুগ্র করে তুলছেন।” “কি ভাবছিস?” “তেমন কিছু না” “বল শুনি” “বলব?” “বল” “ধমক দিবেন না তো?” “নাহ। ধমক দিব না। তোর মনে যা যা অজ্ঞাত কথা আছে বল। সব শুনবো আমি।” “আমি....” বলতেই মেঘের ফোনে কল বেজে উঠলো। মেঘ ফোন হাতে নিতেই দেখলো মিনহাজের কল। আবিরের চোখে মিনহাজ নাম পরা মাত্রই আবিরের রগে রগে রক্ত সঞ্চালন বেড়ে গেছে। রাগে শরীর গরম হতে শুরু করেছে। চোখ রক্তাভ হয়ে গেছে। মেঘ কল কেটে দিয়েছে, তারপরও আবার কল দিয়েছে। আবির ফ্লোরের দিকে

তাকিয়ে রাগ কমানোর চেষ্টা করছে। আজকের স্পেশাল দিনে আবির মেঘকে একটুও সময় দিতে পারে নি । তাই ভেবেছিল আজ মেঘের মনের সুপ্ত অনুভূতি জানবে। যতটা সম্ভব মেঘকে আশ্বস্ত করবে। কিন্তু মিনহাজ কল দিয়ে সব ধ্বংস করে দিয়েছে। মিনহাজের ২য় কল রিসিভ করল মেঘ। মিনহাজ আধোআধো কণ্ঠে বলল, "বেবি, Happy Valentine's Day" কথা কানে ঢুকা মাত্র আবিরের কান দিয়ে গরম বাতাস বের হতে শুরু করেছে। ক্রোধে এক হাতে কপালের দুপাশ চেপে ধরেছে। বসে থাকতে ইচ্ছে করছে না। বসা থেকে উঠে দীর্ঘ কদম ফেলে রুম থেকে বেরিয়ে গেছে। মেঘ আবিরের প্রস্থানের শব্দ শুনেই ঘাড় ফিরিয়ে দেখলো। রাগে গজগজ করতে করতে মিনহাজকে বলল, "হারামী, রাখ তোর ভ্যালেন্টাইন। আমার ভ্যালেন্টাইনের ১৮ টা বাজায় দিছস। আমায় বেবি বলবি না বানর। তুই জীবনেও ভালো হবি না। কল কেটে দেয়ার পরও বার বার কেন কল দিচ্ছিস। আমার কপাল টায় খারাপ। দূর ভাল্লাগে না। বাই" মেঘ রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে কল কেটে দিয়েছে। আবির ভাই যখনই মেঘের কাছাকাছি আসে, একটু শান্তশিষ্ট ভাবে কথা বলে তখনই কেউ না কেউ বাঁধা দেয়, মেঘের মেজাজ চরমে। বন্যা ফোন দিচ্ছে। কল কেটে রাগে ফোন বন্ধ করে রেখে দিয়েছে। এদিকে আবিরের আক্রোশ ক্রমে ক্রমে বাড়ছে। নিজের প্রতি বড্ড রাগ হচ্ছে। আজ মনে হচ্ছে মিনহাজ আর তামিমকে প্রথম দিনই ওয়ার্নিং দেয়ার দরকার ছিল। তানভির আর রাকিব এতবার বলার পরও আবির সায় দেয় নি, প্রতিনিয়ত এদের

আচরণে নিজেই অতিষ্ঠ হয়ে যাচ্ছে। আবির আজ পর্যন্ত মেঘকে ভালোবেসে বেবি ডাকতে পারলো না, কোথাকার কোন ছেলে বেবি বলে সম্বোধন করছে। আবির বারান্দার গ্রিলে মাথা রেখে দাঁড়িয়ে আছে। ক্ষণে ক্ষণে রক্ত টগবগ করে উঠছে। ঘন্টাখানেক পর আবির আবারও নিচে আসছে। রাত ১২ টা নাগাদ সোফাতেই শুয়ে ছিল। ১২ টার পর রুমে গিয়ে ঘুমিয়েছে । একঘন্টাও হয় নি নিচে চিল্লা চিল্লির শব্দে আবির তাড়াহুড়ো করে ছুটে আসে । মেঘ, তানভির, ইকবাল খান, মোজাম্মেল খান সকলেই সজাগ হয়ে গেছেন। আবিরের আব্বুর শরীর খারাপ লাগছে। মাথা কেমন করছে। শরীর ঘামতেছে। ইকবাল খান আর মোজাম্মেল খান তড়িঘড়ি করে গাড়ি বের করতে চলে গেছেন। এদিকে মালিহা খানের কান্না বাকি দুজনেও থামাতে পারছেন না। হাসপাতালে যেতে চাচ্ছেন। আবির বুঝিয়ে শুনিয়ে মাকে রেখে গেছে। আবির আর তানভির আলী আহমদ খান কে বের করেছে। এদিকে মেঘকে অঝরে কাঁদছে, বড় আব্বুর সঙ্গে ও কে নিতেই হবে। ঘরে মায়ের কান্না থামাতে পারছে না। এদিকে মেঘ মেইন গেইট পেরিয়ে বাহিরে এসে কেঁদেই যাচ্ছে। রাত প্রায় দুটা বাজতেছে। আবির কয়েকবার মেঘকে ভেতরে যেতে বলেছে কিন্তু মেঘ জায়গা থেকে নড়ছেও না। বাধ্য হয়ে আবির এসে মেঘের দু চোখ মুছে। দুগালে হাত রেখে গুরুতর কণ্ঠে বলল, “কান্না করিস না, প্লিজ। আব্বুর কিছু হয়নি। মনে হচ্ছে অতিরিক্ত দুশ্চিন্তায় প্রেশার বেড়েছে। তোরা সবাই যদি এভাবে কান্না করিস আমি কিভাবে সবকিছু

সামলাবো বল? তুই আম্মুর কাছে যা, প্লিজ। আম্মুকে শান্ত করে ঔষধ খাইয়ে দিস। আর আম্মুর কাছেই থাকিস। ” মেঘ কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, “ঠিক আছে”আলী আহমদ খানকে হাসপাতালে নেয়া হয়েছে। ডাক্তার পরীক্ষা করে জানালেন সিরিয়াস কোনো সমস্যা নেই, অতিরিক্ত উৎকন্ঠায় প্রেশার বেড়েছে। প্রেশার স্বাভাবিক করার জন্য একটা ইনজেকশন আর স্যালাইন করা হয়েছে। আবির আলী আহমদ খানের বেডের পাশেই বসে আছে। ঘন্টাদুয়েক পর আবিরের আব্বু কিছুটা স্বাভাবিক হয়েছেন। ভোর ৪ টার দিকে ওনাকে বাসায় আনা হয়েছে। বাসার পরিস্থিতি বেশ শান্ত। আবির আগেই ফোন করে জানিয়েছিলো তেমন কোনো সমস্যা নেই। হালিমা খান, আকলিমা খান সোফায় বসে আছেন, মীম, আদি ঘুমে, মালিহা খান ঘুমাচ্ছেন, মেঘ ওনার চুলে তেল দিয়ে ম্যাসেজ করে দিচ্ছে। রুমে ঢুকতে গিয়ে সে দৃশ্য দেখে আবিরের ঠোঁটের কোনে হাসি ফুঁটলো। আলী আহমদ খান বিছানায় শুয়ে নিরুদ্যম কন্ঠে বললেন, “আবির, তোমার সাথে আমার কথা আছে।” আবির খুব ভালোকরেই বুঝতে পারছে তার আব্বু কোন বিষয়ে কথা বলতে চাচ্ছেন। কিন্তু এই অবস্থায় কথা বলা একদম ঠিক হবে না। তাড়াতাড়ি ডাক্তারের কাছে নেয়া তে বড়সড় কোনো সমস্যা হয় নি। আর একটু দেরি হলে হার্ট অ্যাটাক অথবা স্ট্রোক পর্যন্ত হতে পারতো। আবির অক্রূর স্বরে জানালো, ” আপনার এখন ঘুমানো দরকার। কথা পরেও শুনা যাবে।” আলী আহমদ খানের ভেরতটা ছটফট করছে। খুব অস্বস্তিতে ভুগছেন। আকুল কন্ঠে বললেন, “খুব

গুরুত্বপূর্ণ কথা। শুনো" আবির কিছুটা নিচু হয়ে আলী আহমদ খানের হাতটা শক্ত করে ধরে আব্বুর চোখে চোখ রেখে অক্লিষ্ট কণ্ঠে বলল, "আমি বললাম তো শুনবো। কিন্তু এখন না। আপনি ঠান্ডা মাথায় ঘুমান, আমি এখানেই আছি। আপনার যখন ঘুম ভাঙবে আমি তখনই শুনবো। " আবির একটা চেয়ার এনে বিছানার পাশে বসে আব্বুর মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। অন্যদিকে মেঘ বিছানার অপর পাশে বসে বড় আম্মুর মাথায় ম্যাসেজ করে দিচ্ছে। মালিহা খানকে ঘুমের ঔষধ খাওয়ানো হয়েছে তাই কিছুই টের পান নি। কিছুক্ষণের মধ্যেই আলী আহমদ খান ঘুমিয়ে পরেছেন। আবির তখনও মাথায় কাছেই বসে আছে। আচমকা আবিরের নজর পরে মেঘের দিকে। ছোট ছোট দুটা হাতে কত সুন্দর ভাবে চুলে ম্যাসেজ করে দিচ্ছে! আবিরের দৃষ্টি স্থির হলো, বাবা মায়ের একমাত্র ছেলে হিসেবে বাবা মাকে দেখে রাখার দায়িত্ব আবিরের। আবিরের জীবনসঙ্গী হিসেবে মেঘ নিজেও যত্নের সহিত আবিরের আম্মুকে ঘুম পাড়াচ্ছে। না চাইতেও আবিরের ঠোঁটে হাসি ফুটলো। মেঘের এদিকে মনোযোগ নেই। বড় আব্বু ঘুমাচ্ছে দেখে সেও আর সেদিকে তাকাচ্ছে না। আবির হাসি আড়াল করে শ্লথগতিতে বলল, "তুই ঘুমাতে যা। আমি আছি, সমস্যা নেই।" " আমার ঘুম পাই নি, ঘুম পেলে না হয় চলে যাব।" "সকাল হতে চললো। তোর ঘুমানো উচিত। " মেঘ ধীরেসুস্থে বলল, "ঘুমানো তো আপনারও উচিত। এত রাত পর্যন্ত সোফায় শুয়ে ছিলেন, রুমে গিয়ে আদো ঘুমিয়েছেন কি না কে জানে! আপনার চোখ লাল হয়ে আছে।

স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে ঘুম প্রয়োজন। কই আপনি তো ঘুমাতে যাচ্ছেন না!" আবির নিরবে হেসে সাবলীল ভঙ্গিতে বলল, "বাহ! এত সূক্ষ্ম নজরদারি কবে থেকে শুরু করলি?" মেঘ বিড়বিড় করে বলল, "আপনি দেশে ফেরার পর থেকেই" আবিরের ফোন ভাইব্রেট হচ্ছে। পকেট থেকে ফোন বের করতেই দেখলো ফুপ্পি কল দিচ্ছে। আবির যেই উঠতে যাবে খেয়াল হলো আলী আহমদ খান আবিরের হাতে ধরে রেখেছেন। আবির হাতের দিকে তাকালো, আব্বুর হাত ছাড়িয়ে বের হওয়ার সাধ্যি তার নেই। তাই মেঘের দিকে ফোন এগিয়ে দিয়ে তপ্ত স্বরে বলল, "সাবধানে কথা বলিস" মেঘ ফোন হাতে নিতেই স্ক্রিনে ফুপ্পি লেখা দেখে তড়িঘড়ি করে বিছানা থেকে নেমে রুম থেকে বেরিয়ে গেলো। আবিরের আব্বুকে হাসপাতালে নেয়ার সময় আবিরের ফুপ্পি আবিরকে কল দিয়েছিলেন কিন্তু আবির রিসিভ করতে পারে নি। হাসপাতালে যাওয়ার পর তানভিরকে কল দেয়ায় তানভির আব্বু, কাকামনির আড়ালে গিয়ে শুধু জানিয়েছিল," বড় আব্বু অসুস্থ। হাসপাতালে আনা হয়েছে।" এরপর আর কথা হয় নি। তানভির বাসায় এসে ফোন চার্জে দিয়ে শুতেই ঘুমিয়ে পরেছে, মেঘ ফোন রুমে ফেলে নিচে আসছিলো আর রুমে যায় নি। অবশেষে বাধ্য হয়েই আবিরকে কল দিয়েছেন। মেঘ রুম থেকে বের হতে হতে কল রিসিভ করল, ফুপ্পি আর্তনাদ করে বললেন, "ভাইজান এখন কেমন আছে বাবা?" মেঘ নরম স্বরে বলল, " বড় আব্বু মোটামুটি সুস্থ আছেন। বাসায় নিয়ে আসছে। এখন ঘুমাচ্ছেন। তুমি টেনশন করো না, ফুপ্পি।"

“মেঘ?” “হ্যাঁ ফুপ্পি।” “আবির কোথায়?” “আবির ভাই বড় আব্বুর কাছে বসে আছে। তাই আমাকে ফোন দিয়েছেন।” “বাসার সবাই ঠিক আছে তো?” “আলহামদুলিল্লাহ ঠিক আছেন। বড় আব্বু বাসায় আসার পর সবাই বড় আব্বুকে দেখে ঘুমাতে গেছেন।” “তোর আব্বু কেমন আছে?” “আব্বুর কথা কি বলবো! সেই যে চুপ করেছেন এখন পর্যন্ত কারো সাথে কথা বলছেন না। আম্মুর সঙ্গেও কথা বলছেন না। তুমি চিন্তা করো না ফুপ্পি, নিজের যত্ন নিও, এখন ঘুমিয়ে পরো।” “আচ্ছা তোরাও সাবধানে থাকিস। সম্ভব হলে আবিরের একটু যত্ন নিস। ছেলেটা মাত্রাতিরিক্ত দুশ্চিন্তা করে। ” “আমার কথা শুনবে নাকি, এক ধমক দিয়ে ১০ হাত দূরে ফেলে দিবে। ” মাহমুদা খান মৃদু হেসে বললেন, “তুই বুঝাইয়া বলিস। ” “আচ্ছা। বলবো। এখন রাখছি, আল্লাহ হাফেজ। ” “আল্লাহ হাফেজ।” মেঘ কথা শেষ করে আবিরের কাছে ফোন নিয়ে গেল। আবির ফোন নিয়ে শীতল কণ্ঠে বলল, ” ঘুমাতে যা।” মেঘ মাথা নিচু করে ধীর কণ্ঠে বলল, “আমি থাকি এখানে!” আবির কপাল কুঁচকে তাকালো, মেঘ চোখ তুলতেই দুজনের চোখাচোখি হলো। আবির গম্ভীর কণ্ঠে বলল, ” রাত জেগে শরীর খারাপ করার কোনো প্রয়োজন নেই। রুমে যা। ” মেঘ আবিরের পানে চেয়েই গাল ফুলিয়ে ওষ্ঠ উল্টালো। বড় আব্বু, বড় আম্মুকে রেখে যেতে ইচ্ছে করছে না, চোখে ঘুমও নেই তাছাড়া এখানে থাকলে আবির ভাইয়ের কাছাকাছি থাকতে পারতো। অভিমান জমেছে মনের কোণে। আবির কণ্ঠ দ্বিগুণ ভারী করে বলল, ” কথা বললে একটু

মানিস। প্লিজ!” মেঘ আর কিছু বললো না। আবির ভাইয়ের শান্ত অথচ শক্ত কণ্ঠের কথাতে আবেগ, অনুভূতি, তীব্র অধিকারবোধ লুকিয়ে আছে তা বুঝতে পেরেই মেঘ চুপচাপ রুমে চলে গেছে। হাতমুখ ধৌয়ে ওজু করে নামাজ পরে একেবারে শুয়েছে। কিন্তু চোখে বিন্দুমাত্র ঘুম নেই। গতকালের ঘটনাগুলো বার বার মাথায় ঘুরছে। গোমড়া মুখো আবির ভাইয়ের পরিবর্তনটা আজ মেঘের মনে বার বার খোঁচা দিচ্ছে। আবির দেশে আসার পর মেঘের সঙ্গে তেমন কথায় বলতো না, বললেও চোখে মুখে সবসময় রাগ, ক্রোধ থাকতো, হুটহাট ধমক দিয়ে বসতো। অথচ ধীরে ধীরে আবির কেমন যেন পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। এখন আর আগের মতো রাগ দেখায় না, মেঘের উপর শুধুশুধু চেঁচায় না, কিছু জিজ্ঞেস করলে শীতল কণ্ঠে উত্তর দেয়। আর যত্ন তো কয়েকগুণ বেড়েছে। আবিরকে নিয়ে ভাবতে ভাবতেই মেঘ ঘুমিয়ে পরেছে। প্রায় ৮ টা নাগাদ মালিহা খান সজাগ হয়েছেন। আবির তখনও চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আছে। মালিহা খান শুয়া থেকে তাড়াতাড়ি উঠে বসলেন। উদ্বিগ্ন কণ্ঠে আবিরকে প্রশ্ন করলেন, “তোর আব্বুকে নিয়ে কখন বাসায় আসছিস? ডাকিস নি কেনো আমায়?” “৪ টার দিকে আসছি। তুমি ঘুমাচ্ছিলে তাই ডাকি নি।” “তোর আব্বু ঠিক আছে তো?” “আলহামদুলিল্লাহ। একদম সুস্থ আছে। শুধু প্রেশার টা একটু বাড়তি। আজেবাজে চিন্তাভাবনা বাদ দিতে বলছেন ” মালিহা খান করুণ দৃষ্টিতে আবিরের মুখের পানে তাকিয়ে আছে তারপর মোলায়েম কণ্ঠে শুধালেন, “সারারাত ঘুমাস নি?” “নাহ” “রুমে গিয়ে

একটু ঘুমিয়ে নে। আমি আছি তোর আব্বুর কাছে। ” ” সমস্যা নেই। আব্বু উঠুক পরে যাব। ” মালিহা খান তেমন জোর করলেন না। বাবার অসুস্থতায় ছেলে পাশে থাক এটা সব মায়েরাই চাইবে। মালিহা খান ওঠে ফ্রেশ হয়ে রান্নাঘরের দিকে চলে গেলেন। ততক্ষণে সকালের নাস্তা প্রায় রেডি হয়ে গেছে। বাড়িতে একজন হেল্পিং হ্যান্ড আছেন যিনি প্রায় ১৫ বছর যাবৎ এই বাড়িতেই থাকেন। ওনার নাম খোদেজা। ওনার হাসবেন্ড এই বাড়ির দারোয়ান, বাড়ির দেখাশোনা ওনারা দুজন মিলেই করেন। ওনাদের ২ জন মেয়ে। বড় মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। ছোট মেয়েটা এবার ক্লাস ৬ এ পড়ে। তাদের খাওয়াদাওয়া থেকে শুরু করে, মেয়ের পড়াশোনার খরচ সহ সব দায়িত্বই আবিরের আব্বুর। আবিরদের মেইন গেইটের পাশেই ওনাদের থাকার জন্য দুটা রুম করে দিয়েছেন। ওনি সব কাটা-বাছা করে দেন। কিন্তু রান্না বেশিরভাগ সময় মালিহা খান নিজেই করেন। মালিহা খানের রান্না ছাড়া আবিরের আব্বু খেতে পারেন না। অসুস্থতার কারণে সব রান্না করতে না পারলেও আলী আহমদ খানের জন্য অল্পস্বল্প রান্না মালিহা খান ই করেন। এখন বেশিরভাগ রান্না হালিমা খান করেন। রান্না করাটা হালিমা খানের শখ। নতুন নতুন রেসিপি বানানো, বাড়ির সবাইকে তা খাওয়াতে ওনার বেশ ভালো লাগে। অন্যদিকে আকলিমা খান রান্না পারেন না বললেই চলে। মালিহা খান বা হালিমা খান রান্না করলে ওনি শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেন মাঝে মাঝে লবণ চেক করেন। বড় দুই বউ অসুস্থ থাকলে বাধ্য হয়ে খোদেজা আফার সহযোগিতায় রান্না

করেন তবে তা খাওয়ার যোগ্য হবে কি না সে বিষয়ে সবসময় চিন্তিত থাকেন। আবির আসার পর আরেকজন হেল্পিং হ্যান্ড এনেছে। ওনি ২-৩ ঘন্টার জন্য এসে ঝাড়ামোছা, কাপড় ধৌয়া সাথে অন্যান্য কিছু কাজ করে দিয়ে যান। আজ মালিহা খান, হালিমা খান দুজনেই উঠতে দেরি করেছেন । তাই আকলিমা খান আর খোদেজা আফা মিলে নাস্তা রেডি করেছেন। মালিহা খান রান্নাঘরে এসে আবিরের জন্য হালকা নাস্তা নিয়ে রুমে চলে গেছেন। আম্মুর কর্মকাণ্ডে আবির বিরক্ত হয়ে বলল, "তোমাকে নাস্তা আনতে কে বলছে? ভালো না লাগলে শুয়ে ঘুমাও।" "তোর আব্বুর জন্য রান্না করতে হবে।" " এই অবস্থায় রান্না করতে যাবে?" "ওরা সব রেডি করে রেখেছে, শুধু রান্নাটা করবো " আবির রাগান্বিত কণ্ঠে বলল, "যা খুশি করো। তোমাদের কাউকে কথা মানাতে পারলাম না! " আবির দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো। মালিহা খান খানিক হেসে বেড়িয়ে গেলেন। মালিহা খান ড্রয়িং রুম পর্যন্ত যেতেই মেঘ নেমে আসলো। মালিহা খানের আগে রান্নাঘরে ছুটে গেলো। সবাই আলী আহমদ খানের রান্নার বিষয়েই কথা বলছিলো। মেঘ উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, "বড় আব্বুর জন্য আজ আমি রান্না করবো। " আকলিমা খান হেসে বললেন, "মেঘ, তুই রান্না কবে শিখলি। " "আজকে শিখবো। তারপর রান্না করবো!" মালিহা খান তটস্থ হয়ে বললেন, "না রে মা। তোর রান্না করতে হবে না। তোর বড় আব্বু এমনিতেই অসুস্থ। রান্না ভালো না হলে খেতে পারবে না।" "রান্না একবারে ভালো না হলে প্রয়োজনে ৫ বার করবো। তবুও আমিই রান্না করবো। তুমি

শুধু বসে বসে আমায় দিক নির্দেশনা দিবে। ” “মা রে পাগলামি করিস না। ” মেঘ শক্ত কণ্ঠে বলা শুরু করল, “ডিসিশন ফাইনাল। রান্না আমিই করবো। আমি এই বিষয়ে আর কোনো কথা শুনতে চাই না। তোমরা সবাই রান্নাঘর থেকে যাও। ডাইনিং থেকে নির্দেশনা দিলেই চলবে।” বড় আব্বু, আব্বু, আবির ভাই যেভাবে নিজের মর্জি চালান মেঘও আজ ঠিক সেভাবেই বলেছে। মালিহা খান সহ বাকিরাও আশ্চর্য নয়নে মেঘকে দেখছে। সামান্য নুডলস করতে গেলে যে মেয়ে ১০ বার আম্মু, বড় আম্মু অথবা কাকিয়াকে ডাকতে থাকে সে আজ রান্নার জন্য সবাইকে রান্নাঘর থেকে বের করে দিচ্ছে। ভাবা যায়! মালিহা খান ডাইনিং এ বসেই মেঘকে নির্দেশনা দিচ্ছে মেঘ সে অনুযায়ী রান্না করছে। ১ বারের জায়গায় ১০ বার লবণ চেক করছে, তরকারি হয়েছে কি না সেটাও বুঝতে পারছে না। আবার কাউকে কাছেও আসতে দিচ্ছে না। মালিহা খানের কথা মতো বড় আব্বুর জন্য দুটা তরকারি রান্না করেছে। রান্না শেষে ছুটে গেলো বড় আব্বুর রুমে বড় আব্বু উঠেছে কি না দেখার জন্য। ৩ দিনের অনিদ্রায় আবিরের চোখ ঘুমে টানছিল তাই চেয়ারে হেলান দিয়েই ঘুমিয়ে পরেছিলো। মেঘের নুপুরের শব্দে সহসা ঘুম ভেঙে গেছে। ক্ষুদ্র পরিসরে তাকাতেই চোখে পরলো মেঘের নাজেহাল অবস্থা। গ্যাসের তাপে ঘেমে একাকার অবস্থা হয়ে গেছে, যে মেয়ে আজ পর্যন্ত টানা ১০ মিনিট চুলার পাশে দাঁড়িয়ে থাকে নি সে আজ প্রায় ১-১.৩০ ঘন্টা যাবৎ রান্না করেছে। চোখ-মুখ লাল হয়ে আছে। আবির সূক্ষ্ম নেত্রে মেঘকে দেখে মৃদুগামী কণ্ঠে বলল,

“তোর এই অবস্থা কেন?” মেঘ উত্তর না দিয়ে উল্টে প্রশ্ন করল, “বড় আব্বু এখনও উঠে নি?” “নাহ।” “আচ্ছা ” মেঘ চলে যাচ্ছে। আবির পেছন থেকে গম্ভীর কণ্ঠে আবারও প্রশ্ন করল, “আমি কি জিজ্ঞেস করছি?” “এমনি।” বলেই মেঘ চলে গেছে। আবিরের দুশ্চিন্তার কমতি নেই। আব্বু,আম্মু, মেঘ, ফুপ্পি প্রত্যেকের চিন্তা এক আবিরের মাথায় সেই সঙ্গে নিজের ব্যবসা, আব্বুর ব্যবসা, তানভিরের চিন্তা তো আছেই। একা একজনের পক্ষে কতদিন সামলানো সম্ভব! ৯ টার দিকে আলী আহমদ খানের ঘুম ভাঙে। সজাগ হয়ে আবিরের দিকে ঘুম ঘুম চোখে তাকাতেই আবির কোমল কণ্ঠে প্রশ্ন করল, ” এখন কেমন লাগছে?” “কিছুটা স্বাভাবিক মনে হচ্ছে। তুমি ঘুমাও নি?” আবির মলিন হাসলো। আব্বুকে ধরে বিছানা থেকে উঠিয়ে ওয়াশরুম পর্যন্ত এগিয়ে দিলো। আলী আহমদ খান অনেকটায় সুস্থ। একায় চলতে পারবেন তবুও আবির রিস্ক নিতে চাই না। আলী আহমদ খান ফ্রেশ হয়ে বিছানায় এসে বসতেই আবির প্রেশার মাপার যন্ত্র নিয়ে আসলো। প্রেশার এখন আগের থেকে অনেকটায় স্বাভাবিক হয়েছে। আলী আহমদ খান গুরুভার কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, “তানভির কোথায়? ওঠেনি এখনও?” “বলতে পারছি না। দেখতে হবে। ” “তানভিরকে ডাকো। তোমাদের দু’ভাইয়ের সাথে আমার কথা আছে ” আবির ভ্রু কুঁচকে বলল, “আগে খাবার খেয়ে ঔষধ খাবেন তারপর কথা শুনবো।” আলী আহমদ খান গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, “তুমি আমার কথা গুরুত্ব দিচ্ছো না, আবির!” আবির ঠোঁটে হালকা হাসি রেখে বলল, “আপনার

সুস্থতার থেকে আশা করি কথাটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ না। আপনি সুস্থ থাকলে একটা কেনো লক্ষকোটি কথা বলতে পারবেন।” আলী আহমদ খান নিশ্চুপ। আবির রুম থেকেই উচ্চস্বরে বলল, “আম্মু, আব্বুর জন্য খাবার পাঠাও। ” একটু পরই মেঘ খাবার নিয়ে রুমে ঢুকলো। আবির কপাল গুটিয়ে চেয়ে আছে। মেঘ ভাতের প্লেট রেখে আবারও ছুটলো একে একে সব নিয়ে আসছে। মালিহা খান রুমে এসে বিছানার পাশে বসে আবিরের আব্বুর সাথে কথা বলছে। এই সুযোগে আবির মেঘের দিকে তাকিয়ে ভ্রু নাঁচালো। মেঘ শুধু মুচকি হাসলো। আবিরের মাথায় কিছুই ঢুকছে না। মালিহা খান এবার খাবারের প্লেট এগিয়ে দিয়ে উদ্দীপ্ত স্বরে বলল, “নিন খেয়ে বলুন, রান্না কেমন হয়েছে” আলী আহমদ খান অল্প খেয়ে কপাল খানিকটা কুঁচকালো। সে দৃশ্য দেখে ভয়ে মেঘের বুক কেঁপে উঠেছে। স্বয়ং আবির ভাই এখানে উপস্থিত, রান্না খারাপ হলে আজ খবরই আছে। আলী আহমদ খান আর একটু খেয়ে হাসিমুখে বললেন, “আজকের রান্নার স্বাদ অন্যরকম। এ রান্না তো তোমার না। কে রান্না করেছে?” মালিহা খান চোখের ইশারায় মেঘকে দেখালো। আলী আহমদ খান অবাক চোখে মেঘের দিকে তাকালো। আলী আহমদ খানের থেকেও কয়েকগুণ বেশি অবাক হয়েছে আবির। বিপুল চোখে তাকিয়ে আছে মেঘের দিকে। মেঘ লজ্জায় মাথা নিচু করে রেখেছে। আলী আহমদ খান খেতে খেতে মেঘের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তা শুনে মেঘ লজ্জায় লাজুকলতায় ন্যায় নুইয়ে পড়ছে। আবিরের বৃহৎ আঁখি যুগল মেঘেতে স্থির হয়ে আছে।

মেঘ রান্না করেছে এটা আবিরের কাছে অবিশ্বাস্য ঘটনা। সহসা আবিরের মনে দুশ্চিন্তা হানা দিলো। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মেঘকে আপাদমস্তক পরখ করতে লাগলো। রান্না করতে গিয়ে কোনো সমস্যা হয়েছে কি না তাই দেখে নিলো। আবিরের হৃদয় খুঁড়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস বেড়িয়ে আসলো। মনের ভেতর অন্যরকম ভালোলাগা কাজ করছে। প্রতিনিয়ত মেঘের বিষ্ময়কর কর্মকাণ্ডে আবির অভিভূত হয়ে যাচ্ছে। মেঘের দায়িত্ববোধ, চলাফেরাতে আমূল পরিবর্তন, আচরণ কথাবার্তাতেও আকাশপাতাল পার্থক্য। ছটফটে, অল্পবয়স্ক মেয়েটা কদিনেই কেমন যেন দায়িত্বশীল মেয়ে হয়ে উঠেছে। কথায় পূর্ণ ম্যাচিউরিটি, হুটহাট রেগে যায় না, রাগলেও তা নিয়ন্ত্রণ করতে শিখে যাচ্ছে। আবিরের আব্বু আম্মুর প্রতি যত্ন দেখে আবির নবরূপে অষ্টাদশীর প্রেমে পড়ছে। আবির ভাবতেও পারে নি তার ছোট্ট চড়ুইপাখি এত দ্রুত বদলে যাবে। প্রেমিকা সুলভ আচরণের মেয়েটা দিনকে দিনকে বৌয়ের ন্যায় আচরণ করছে। অষ্টাদশীর উষ্ণ আত্ততায় আবিরের বক্ষ অনুষঙ্গে আন্দোলিত হয়। আলী আহমদ খানের খাওয়া প্রায় শেষের দিকে। আবির গলা খাঁকারি দিয়ে মেঘকে উদ্দেশ্য করে বলল, “তানভির উঠেছে কি না দেখে আয়, উঠলে বলিস রুমে আসতে। ” মেঘ ‘আচ্ছা’ বলে চলে গেছে। এরমধ্যে মোজাম্মেল খান রুমে আসছে। ভোর বেলা এবার দরজা পর্যন্ত এসেছিল। বড় ভাই ভাবির রুম, তাই ভেতরে আসে নি। দরজার বাহির থেকেই আবিরের সঙ্গে কথা বলে চলে গেছিলো। মোজাম্মেল খান আসতেই আলী আহমদ খান শান্ত স্বরে বললেন, ”

আয়, ভেতরে এসে বস। ” এরিমধ্যে তানভির আসলো। খাবার শেষ হতেই মেঘ প্লেট নিয়ে চলে গেছে। আবির আব্বুকে ওষুধ এগিয়ে দিয়ে পুনরায় চেয়ারে বসেছে। তানভির আবিরের পেছনে দাঁড়ানো, মালিহা খান আলী আহমদ খানের পাশেই বসা। মোজাম্মেল খান বিছানা থেকে কিছুটা দূরে চেয়ার নিয়ে বসেছেন। মেঘ দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। পরিবেশ কেমন যেন স্তব্ধ। আলী আহমদ খান হঠাৎ ই দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে তপ্ত স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, “গতকাল রমনা পার্কে মহিলাকে দেখেছিলে তোমরা?” আবির তানভির দুজনেই একসঙ্গে উপর নিচ মাথা নাড়লো। আবির মৃদুস্বরে বললো, “জ্বি” আলী আহমদ খান ঢোক গিলে অনুষ্ণ স্বরে বললেন, ” ওনি তোমাদের ফুপ্পি হয়। আমাদের একমাত্র বোন।” আবির আর তানভির দুজনেই নিরুদ্বেগ। কেউ কোনো কথা বলছে না। দরজার পাশে মেঘও নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে আছে। আলী আহমদ খান একে একে সম্পূর্ণ ঘটনা খুলে বললেন। তানভির, আবির আগে ফুপ্পির দিক থেকে ফুপ্পির সব ঘটনা শুনেছে আর আজ আলী আহমদ খানের মুখ থেকে সব শুনেছে। তারা আগে থেকেই ঘটনা জানে এরকম কোনো রিয়াকশন ই দেখায় নি। আবার কোনো প্রকার এক্সাইটমেন্টও প্রকাশ করে নি। আলী আহমদ খান ও মোজাম্মেল খান বোনের প্রতি নিজের আবেগ অনুভূতি প্রকাশ করেছে। আলী আহমদ খান সবশেষে একটা কথায় বলেছেন, ” এই খানবাড়ি আমার অক্লান্ত পরিশ্রমে গড়ে উঠেছে। সে শুধু আমার বোনকে নেয় নি, আমার পরিবারের সুখ শান্তি কেড়ে নিয়েছে। আমি তাকে

কোনোদিনও ক্ষমা করব না।” আবির ভারী কণ্ঠে শুধালো, ” ২৮ বছরেও আপনার পরিবার পরিপূর্ণ হয় নি? আমরা কি তবে আপনার শান্তির কারণ নয়?” আবিরের মুখে এমন কথা শুনে সকলেই আশ্চর্য নয়নে তাকিয়ে আছে। আবির এমন কথা বলার ছেলেই না। আলী আহমদ খান হেসে বললেন, “তা কেনো হবে! এখন তোমরায় আমার সব। তোমাদেরকে ঘিরেই আমার সব আশা ভরসা।” “তাহলে এত বছর আগের ক্ষোভ এখনও কেনো পুষে রেখেছেন? আর আমাদেরকে কেনই বা বলছেন? সেই ক্ষোভ আমাদের মধ্যেও ঢুকাতে চাচ্ছেন?” আলী আহমদ খান নিরুপায় হয়ে তাকিয়ে আছে। কি বলবে কিছুই বুঝতে পারছে না। এত বছর পর বোনকে দেখাতে নিজের আবেগ, অনুভূতি, রাগ,ক্ষোভ সব যেন একসাথে মিশে গেছে। মোজাম্মেল খান ধীর কণ্ঠে বললেন, “তোমাদের একজন ফুপ্পি আছে তা তোমাদের জানা দরকার সেজন্য জানানো হয়েছে। ” আবির মৃদু হেসে বলল, ” আপনারা যদি নিজের ক্রোধ কমাতে না পারেন, আর ওনাকে এই বাড়ির চৌকাঠ পেরুতেই না দেন তবে আমাদের ফুপ্পি আছে কি নেই সেই কথা জেনে আমাদের কি কাজ?” তানভির সন্দিহান চোখে চেয়ে প্রশ্ন করল, “ফুপ্পি কে এই বাড়িতে আনা যায় না?” “সেটা সময় বলে দিবে। ” আরও কিছুক্ষণ চললো এই কথোপকথন। আবির বাবা চাচাকে ইচ্ছেকৃত খোঁচা দিয়ে কথা বলছে। যেন ওনাদের ভেতরের রাগ, ক্ষোভ কমে আসে। আবির রা ওনাদের সাপোর্ট করলে সেই রাগ কমার বদলে উল্টো বেড়ে যাবে। কথা শেষ করে আবির নিজের রুমে

গিয়ে ফ্রেশ হয়ে শুয়ে পরেছে। তিনদিনের ক্লান্তিতে চোখে ঘুম আঁচড়ে পরছে। অফিসে যাওয়ার বিন্দুমাত্র শক্তি নেই। রাকিবকে জানিয়ে দিয়েছে। সেই যে সকাল দিকে ঘুমিয়েছিল সেই ঘুম ভেঙেছে সন্ধ্যার আগে আগে। হাতমুখ ধৌয়ে তাড়াতাড়ি নিচে আসছে। সারাদিন ঘুমের কারণে আব্বুর খোঁজ নিতে পারে নি। রুমে ঢুকতে গিয়েই দেখলো আলী আহমদ খান বিছানায় হেলান দিয়ে চোখ বন্ধ করে বসে আছেন। মেঘ পাশের চেয়ারে বসে বড় আব্বুকে পত্রিকা পড়ে শুনাচ্ছে। আবির তা দেখে রীতিমতো ভীমড়ি খেলো। মেঘের প্রতি দূর্বলতা ক্রমশ বাড়ছে। আবির ধীর গতিতে রুমে ঢুকে আব্বুর পায়ের কাছে বসলো। আস্তে করে ডাকল, "আব্বু" আলী আহমদ খান চোখ মেলে তাকালেন সঙ্গে সঙ্গে মেঘের পত্রিকা পড়াও বন্ধ হয়ে গেছে। আবির ধীরস্থির ভাবে জিজ্ঞেস করল, " এখন শরীর কেমন?" "আলহামদুলিল্লাহ ভালো।" আবির উদ্বিগ্ন কণ্ঠে শুধালো, " ঔষধ ?" আলী আহমদ খান মেঘের দিকে তাকিয়ে বললেন, " আমার মা ই খাইয়ে দিয়েছে। সারাদিন ধরেই এখানে বসে আছে, রুমেই যাচ্ছে না। " আবির কপাল কুঁচকে মনে মনে বিড়বিড় করে বলল, " তোর ম্যাচিউরি আমায় প্রতিনিয়ত উন্মাদ করে তুলছে। এত ম্যাচিউর হয়ে যাচ্ছিস কেন তুই? সম্পূর্ণাঙ্গ বউ তো আমি চাই নি। আমার উগ্র, বদমেজাজি, উশৃংখল বউটাকে কি তবে হারিয়ে ফেলছি?"আলী আহমদ খান চোখ বন্ধ করে বসে আছেন। মেঘ ২-১ বার আবিরের দিকে তাকিয়ে আবারও পত্রিকা পড়া শুরু করলো। আবিরের শাণিত দৃষ্টি যতবার নজরে পড়ছে

ততবার ই মেঘের পড়া আঁটকে আসছে। ক্ষণে ক্ষণে আবিরের কুঁচকানো ভ্রু যুগল আরও কুঁচকে আসে। গভীর কোনো উদ্বেগ মস্তিষ্কে ঘুরপাক খাচ্ছে। আবির দীর্ঘসময় স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো মেঘের অভিমুখে। আবিরের হিমায়িত দৃষ্টিতে অষ্টাদশীর শান্ত হৃদয়ে আচমকা অশান্ত বাতাস বইতে শুরু করলো। পড়া থামিয়ে প্রখর নেত্রে তাকালো আবিরের দিকে। সরাসরি চোখে চোখ পরায় আবির পলক ফেলে চিবুক নামিয়ে রুম থেকে চলে গেছে। আবিরের নিস্তব্ধতা মেঘকে খানিক ভাবালো, তারপর আবারও পত্রিকা পড়ায় মনোযোগ দিল। মালিহা খান ছাদে হাঁটাহাঁটি করে সন্ধ্যায় রুমে আসছে। মেঘকে পত্রিকা পড়তে দেখে ঠান্ডা কণ্ঠে বললেন, "তুই এখনও পত্রিকা পড়তেছিস?" মেঘ নিরবে হেসে পড়াতে মনোযোগ দিল। মালিহা খান বিছানার পাশে বসতে বসতে শক্ত কণ্ঠে বললেন, "অনেক পড়েছিস এখন পত্রিকাটা রেখে একটু বাহিরে বের হ। দীর্ঘসময় এভাবে পড়লে চোখে ঝাপসা দেখবি" "কিছু হবে না। " আলী আহমদ খান এবার স্বাভাবিক কণ্ঠে বললেন, "আর পড়তে না আম্মু। তুমি এখন রুমে যাও" বড় আব্বুর মুখের উপর কথা বলা মেঘের পক্ষে সম্ভব না। তাই পত্রিকা ভাঁজ করে টেবিলের উপর রেখে রুম থেকে বেরিয়ে গেছে। সোফায় বসে হালিমা খান আর আকলিমা খান গল্প করছিলেন। মেঘ ওনাদের পাশের সোফায় হেলান দিয়ে বসছে। হালিমা খান মেঘকে দেখে মৃদুগামী কণ্ঠে বললেন, "তোর বড় আব্বু এখন কেমন আছে?" "আলহামদুলিল্লাহ ভালো। " ঠোঁটে হাসি রেখে হালিমা খান বললেন,

“তোর রান্না খুব ভালো হয়েছে। বড় আব্বুর উছিলায় আমার মেয়ে রান্না যে করছে সেই অনেক।” মেঘ প্রশ্ন করে, “তুমি খেয়েছো?” “শুধু আমি কেন, তোর আব্বু, বড় আম্মু, কাকিয়া, আবির, তানভির সহ সবাই টেস্ট করেছে। তোর প্রথম রান্না বলে কথা!” আম্মুর কথা শুনে মেঘ চমকে উঠে। সবাই মেঘের রান্না টেস্ট করেছে এটা ভাবতেই মেঘের মন আনন্দে ভরে উঠেছে। অকস্মাৎ মেঘের ভ্রু কুঁচকে আসে। মেঘ উতলা হয়ে শুধালো, “আবির ভাইও টেস্ট করেছেন?” “হ্যাঁ। আবির সবার আগে টেস্ট করছে।” “আবির ভাই না সারাদিন ঘুমাইছে। আমার রান্না কখন টেস্ট করলো?” ” সকালে টেস্ট করে তারপরই ঘুমাতে গেছে। তোর রান্নার তারিফ করছিলো। ” “আবির ভাই নিজে থেকে আমার রান্নার প্রশংসা করেছেন?” আকলিমা খান ঠোঁট বেঁকিয়ে মৃদুস্বরে বললেন, ” আবির কি সহজে কিছু বলে নাকি? বার বার জিজ্ঞেস করতেছিলাম তাই বাধ্য হয়ে বলছে খুব ভালো হয়েছে। ” মেঘ মৃদু হাসলো। এরমধ্যে হালিমা খান বলে উঠলেন, “তোর বড় আম্মু কিন্তু সারাদিন যাবৎ ই তোর প্রশংসা করছে। কম করে হলেও ১৫-২০ বার বলছে, তুই বড় হয়ে গেছিস, বিয়ের বয়স হয়ে গেছে। তোকে নাকি বিয়ে দিয়ে দিবে” মেঘ মনে মনে বিড়বিড় করে বলছে, “বড় আম্মু আমাকে বড় ভাবলে কি হবে! ওনার ছেলের চোখে তো আমি পিপীলিকার মতো। ওনার নজরে আমি পড়িই না। ” আকলিমা খান উপরে বেলকনির দিকে তাকিয়ে হঠাৎ উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললেন, “আবির উঠেছে দেখলাম। কফি খাবেই কি না! করে দিব?”

হালিমা খান কিছু বলার আগে মেঘ বসা থেকে উঠতে উঠতে বলল, ” আমি কফি নিয়ে যাচ্ছি। তোমরা গল্প করো।” আকলিমা খান আর হালিমা খান দুজনেই আশ্চর্যান্বিত নয়নে তাকিয়ে আছেন। মেঘ সেসবে পাত্তা না দিয়ে রান্নাঘরে গেল কফি করার জন্য। দুই ঝা নিষ্পলক তাকিয়ে আছে মেঘের দিকে। মেঘ খুব সাবধানতার সহিত আবিরের জন্য কফি বানিয়ে নিজেই নিয়ে যাচ্ছে। কফি হাতে আবিরের রুমে ঢুকলো, আবির কোথাও নেই, টেবিলের উপর কফির কাপ রেখে সম্পূর্ণ রুমে চোখ বুলালো, আবির কোথাও নেই। হঠাৎ বারান্দার কথা মনে হতেই এগিয়ে গেল সেদিকে। আবির চেয়ারে বসে রেলিং এ পা ঠেসে চোখ বন্ধ করে বসে আছে। মেঘ অনুচ্চ কণ্ঠে বলল, “আপনার জন্য কফি নিয়ে আসছি।” মেঘের কণ্ঠস্বর স্নায়ুতন্ত্রে প্রবেশ মাত্রই আবির চোখ মেলল, অপাঙ্গে তাকালো মেঘের দিকে। মেঘ পুনরায় অচঞ্চল স্বরে প্রশ্ন করল, “কফি টা এখানে নিয়ে আসব?” আবির ভ্রু কুঁচকে সূক্ষ্ম নেত্রে তাকিয়ে বিরক্তি ভরা কণ্ঠে বলল, “কি হয়ছে তোর?” মেঘ এদিক সেদিক তাকিয়ে শমিত স্বরে জানালো, “আমার আবার কি হবে! ” “কিছু না হলে এত ম্যাচিউর ব্যবহার কেন করতেছিস? কাকে কি বুঝাতে চাচ্ছিস?” মেঘ কপালে ভাঁজ ফেলে মন খারাপ করে বলল, “আমি কাউকে কিছু বুঝাতে চাচ্ছি না। কাকিয়া, আম্মু আপনার কফির কথা বলছিল তাই আমি নিয়ে আসছি। আমার কাজ আছে,আসছি। ” মেঘ মাথা নিচু করে যেতে নিলে আবির চেয়ার থেকে উঠে একপা এগিয়ে মেঘের ডানহাতের কব্জিতে শক্ত করে

ধরে। অকস্মাৎ কান্ডে মেঘ ভড়কে গেছে। ঘাড় ঘুরিয়ে আবিরের দিকে তাকাতেই চোখে পরে একজোড়া রক্তাভ আঁখি। সহসা মেঘ ঢোক গিলল। আবির ভাইয়ের রাগের কারণ মেঘের অজানা, কি ভুল করেছে তাও বুঝতে পারছে না। চিবুক নামিয়ে ধীর কণ্ঠে বলল, "ছাড়ুন প্লিজ, হাতে ব্যথা লাগছে" হাত ছাড়ার বদলে আবির আরও শক্ত করে ধরে নিরেট কণ্ঠে বলল, "কি কাজ আছে তোর?" আবিরের রাগী স্বর বুঝতে পেরে মেঘ ধীরস্থির গতিতে বলল, " বড় আব্বুর কাছে যাব।" "কোনো প্রয়োজন নেই। " "মানে?" "আব্বু যথেষ্ট সুস্থ আছেন তোকে আব্বুর দেখাশোনা করতে হবে না। " "কেনো?" আবির রাগান্বিত কণ্ঠে বলল, "কারণ আমি চাই না তুই আমার আব্বু আম্মুর এত যত্ন নেস। আমি আমার বাবা মাকে দেখে রাখতে পারবো। আর আমার প্রতিও তোর কোনো প্রকার আহ্লাদী ভাব দেখাতে হবে না। কফি আমি করে খেতে পারবো, কাউকে কফি করে দেয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। " মেঘ এবার চোখ তুলে আবিরের দিকে তাকায়। হাতের ব্যথার থেকে কয়েকগুণ বেশি ব্যথা বুকে করছে। আবিরের নিষ্ঠুরতা দেখে মেঘের মনের কোণ মেঘে ঢেকে গেছে। মেঘ করুণ স্বরে বলল, "আপনার আম্মু- আব্বু বলে কি আমি যত্ন নিতে পারবো না? ওনারা তো আমার বড় আব্বু-বড় আম্মু। আমার কি ওনাদের যত্ন নেয়ার অধিকার নেই?" আবিরের রাগ দ্বিগুণ বেড়ে গেছে। রাগে কটমট করতে করতে বলল, "নাহ নেই। কোনো অধিকার নেই।" মেঘের কণ্ঠস্বর ভারী হয়ে আসে। অকস্মাৎ দুর্বহ কণ্ঠে বলে উঠে, "আপনি

বললেই হলো! আমি যত্ন নিবই। ছাড়ুন যা..” হাত না ছাড়া স্বত্তেও মেঘ চলে যাওয়ার জন্য পা বাড়ায়। আবির সহসা মেঘের হাতের কব্জিতে টান দিতেই মেঘ আবিরের বুকের কাছে চলে আসে। আবির সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়ে মেঘকে বারান্দার দেয়ালের সঙ্গে চেপে ধরে। মেঘ স্থির হতে পারছে না, মাথা ঘুরছে। আবির আরেক হাতে মেঘের নামানো চিবুক উপরে উঠায়। আবির তখনও অগ্নিদৃষ্টিতেই তাকিয়ে আছে। কণ্ঠ তিনগুণ ভারী করে আবির বলল, “আমার কথা না মানলে এর ফল খুব ভয়ানক হবে। তুই যদি ভেবে থাকিস তুই সব বিষয়ে ছাড় পেয়ে যাবি তাহলে তুই ভুল ভাবছিস।” মেঘ শীতল চোখে তাকিয়ে বিড়বিড় করে বলল, “আপনি এত নিষ্ঠুর কেনো?” “নিষ্ঠুর পৃথিবীতে প্রতিটা মানুষকেই প্রয়োজনে নিষ্ঠুর হতে হয়।” মেঘ তপ্ত স্বরে বলল, ” বড় আব্বু বা বড় আম্মুর যত্ন কেন নিতে পারবো না এর একটা কারণ বলুন। ” আবির গম্ভীর কণ্ঠে জানালো, ” আমার আব্বু আম্মুর ব্যাপারে আমি কি সিদ্ধান্ত নিব তার কারণ তোকে বলতে হবে? আমার বাবামাকে আমি যেভাবে খুশি দেখে রাখবো, একা না পারলে কয়েকজন নার্স নিয়োগ করবো। তবুও তোকে যেনো ওনাদের আশেপাশে সর্বক্ষণ ঘুরঘুর করতে না দেখি। ” মেঘ আগপাছ না ভেবেই বলে উঠল, “আমি কি আপনাদের খুব বিরক্ত করি?” “হ্যাঁ অনেক বিরক্ত করিস। এইযে এখন করতেছিস। ” মেঘের চোখ টলমল করছে। হৃদয় খুঁড়ে দীর্ঘশ্বাস বেড়িয়ে আসে। মেঘ কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে বলল, ” ঠিক আছে। আজকের পর আমি আপনাদের কারো জীবনে

বিরক্তির কারণ হবো না।” আবির ঠাস করে মেঘের হাত ছেড়ে গজগজ করতে করতে বলল, “বেশি বুঝলে এমন ই হবে। ” মেঘ ছলছল নয়নে কিছুক্ষণ নিজের হাতের দিকে তাকিয়ে থেকে মাথা নিচু করে চলে গেছে। আবির ধপ করে চেয়ারে বসে পরেছে। চোখ বন্ধ করে দুহাতে মাথা চেপে ধরেছে। মেঘের সঙ্গে রাগ দেখাতে বড্ড কষ্ট হয় কিন্তু মেঘের এই ম্যাচিউর আচরণে আবির আতঙ্কে আছে। অষ্টাদশীর পরিপক্কতা দেখে বাড়ির মানুষ কোনোভাবে যদি মেঘের জন্য সম্বন্ধ দেখা শুরু করে তখন আবির কি করবে! কিভাবে আটকাবে আব্বু চাচ্চুকে। মেঘ অবুঝের মতো বড় আব্বুর যত্ন করছে, কিন্তু তারা তো এটাকে সেভাবে নিবে না। হুট করে এমন কোনো ঘটনা ঘটলে আবির সম্পূর্ণরূপে চূর্ণ হয়ে যাবে। আব্বু, চাচ্চুর সামনে দাঁড়ানোর মতো মিনিমাম যোগ্যতাও তার হয় নি! এজন্য আবির সর্বক্ষণ চাই মেঘ সবার চোখে পিচ্চি থাকুক। মেঘের বাচ্চামিতে মেতে থাকুক এই বাড়ি। গুণা ক্ষুরেও কারো চোখে যেন মেঘের ম্যাচিউরিটি না পড়ে। আবির তার সুপ্ত অনুভূতি চেপে, মেঘকে যা তা বলেছে। মেঘ কষ্ট পাবে এটা খুব স্বাভাবিক কিন্তু মেঘের জন্য অন্য ছেলে দেখা হলে আবির,মেঘ দুজনেই কষ্ট পাবে। তখন সেই কষ্টের মাত্রা বর্তমান থেকেও কয়েকগুণ বেশি হবে। আবির বেলকনিতে প্রায় দেড় দুই ঘন্টা বসে রইল, মেঘের আনা কফি টেবিলেই ঠান্ডা হয়েছে। ঘন্টাদুয়েক পর তানভির এসে কিছুক্ষণ কথা বলে আবার বেড়িয়ে গেছে। আবিরের আচরণে মেঘ অনেক বেশি কষ্ট পেরেছে যার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে

মেঘের রুমে। রাগে ঘরের প্রতিটা জিনিস এলোমেলো করে বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে পরেছে। বার বার কানে বাজছে, “আমার কথা না মানলে এর ফল খুব ভয়ানক হবে। বড় আব্বুর উপর কোনো অধিকার নেই।” মেঘ যখন ই ভাবে আবিরের কাছাকাছি আসবে, আবিরকে নিজের মনের কথা বলবে, আবিরের অনুভূতি বুঝবে তখনই আবির মেঘকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দেয়। দীর্ঘ চেষ্টায় দূরত্ব খানিকটা হ্রাস হয় কি না আবির আবারও দূরত্ব বাড়িয়ে নিজের হাতেই সেখানে দেয়াল তুলে দেয়। অষ্টাদশীর অবুঝ মনে আবিরের কর্মকান্ড ক্রমে ক্রমে দাগ কেটে যাচ্ছে। ভালোবাসার অনুভূতিগুলো কেমন জানি ছন্নছাড়া হয়ে যাচ্ছে। বেশকিছুক্ষণ পর মেঘের ফোনে কল বাজতেছে। কয়েকবার রিং হওয়ার পর মেঘ হাত বাড়িয়ে ফোনটা কাছে এনে দেখে বন্যা কল দিচ্ছে। দুদিন যাবৎ বন্যা কল দিয়েই যাচ্ছে কিন্তু মেঘ রিসিভ করছে না। ইচ্ছে না থাকা সত্ত্বেও মেঘ কল রিসিভ করল। কল রিসিভ হওয়া মাত্রই ওপাশ থেকে বন্যা বলে উঠল, “কিরে কি হয়ছে তোর? কোন দুনিয়ায় হারাইছিলি?” মেঘ শ্বাস ছেড়ে গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর দিল, “হারাতে পারলে বোধহয় ভালো হতো।” “কেন? কি হয়ছে?” “কিছু না। বাদ দে” ইচ্ছে করেই বন্যাকে কিছু বলে নি। দুদিন পর পর আবির ভাইয়ের আচরণে মেঘ নিজেই কনফিউশনে পরে যায়। সেখানে বন্যা তো আবির ভাইকে সামনাসামনি দেখেই না, আচরণ কিভাবে বুঝবে। বন্যা চিন্তিত কণ্ঠে প্রশ্ন করল, “তোদের বাসায় কি সমস্যা রে?” “তোকে কে বলছে?” “তানভির ভাই।” মেঘ একে একে

সব ঘটনা বিস্তারিত বলেছে। খুব প্রয়োজনীয় কথা ব্যতীত মেঘ পারিবারিক ঝামেলা বন্যাকে খুব একটা শেয়ার করে না। তবে মানসিক পীড়ন সহ্য করতে না পেরে এখন কম বেশি শেয়ার করে। মনের ভেতর কত কথা জমিয়ে রাখা সম্ভব! বন্যা মনোযোগের সহিত সব ঘটনা শুনেছে। এখানে বন্যার কিছুই বলার নেই এমনকি মেঘকে সান্ত্বনা দেয়ার কোনো ভাষাও নেই। ঘন্টাখানেক দুই বান্ধবীর কথোপকথন চলেছে তারপর মেঘ ফোন রেখে ঘুমিয়ে পরেছে। দু-তিনদিন কেটে গেছে মেঘ আর আগের মতো বড় আব্বু-আম্মুর কাছে যায় না। ওনাদের সঙ্গে কথাও বলে না। ভুলেও আবির মুখোমুখি হয় না। ক্লাসের সময় ক্লাসে যায়, চুপচাপ ক্লাস করে বাসায় চলে আসে। বাকি সময় দরজা বন্ধ করে রুমে শুয়ে থাকে না হয় বই নিয়ে বেলকনিতে বসে থাকে। গুনে গুনে দিন কাটাচ্ছে, এই বাসায় থাকতে এখন মেঘের দম বন্ধ হয়ে আসছে। চুপিচুপি গিয়ে বড় আম্মু আব্বুকে দেখে আসে, ওনাদের সঙ্গে কথা বলতে পারে না, এদিকে মীম আদির সঙ্গেও কথা বলতে ইচ্ছে করে না। ফোন চাপতেও ভালো লাগে না। মন খারাপ থাকলে যেমন সবকিছুই অসহ্য লাগে, মেঘের অবস্থাও এখন তেমন। রাতের বেলা মোজাম্মেল খান বাসায় ফেরার কিছুক্ষণ পরেই মেঘ আব্বুর রুমের সামনে হাজির হলো। অনুমতি নিয়ে রুমে প্রবেশ করলো। হালিমা খান মেঘের মলিন মুখ দেখে প্রশ্ন করলেন, “কি হয়েছে তোর? মন খারাপ কেন?” মোজাম্মেল খানও এবার চোখ তুলে মেয়ের দিকে তাকালেন, ভ্রু কুঁচকে প্রশ্ন করলেন, “কিছু বলবা?”

“কতদিন হয়ে গেছে আমরা নানুবাড়িতে যায় না। চলুন না নানু বাড়ি থেকে ঘুরে আসি!” হালিমা খান উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলল, ” তুই তো কখনো নানু বাড়ি যেতেই চাস না। আজ হঠাৎ নানু বাড়ি যেতে চাচ্ছিস যে” “যেতে ইচ্ছে করছে। তোমরা যাবে কি না বলো” মোজাম্মেল খান নিরুদ্বেগ কণ্ঠে বলল, ” ভাইজান অসুস্থ। এ অবস্থায় আমি যেতে পারবো না। তুমি আর তোমার আম্মু বরং ঘুরে আসো, ফেরার সময় জানিয়ো, তানভির গিয়ে নিয়ে আসবে। ” হালিমা খান প্রশ্ন করলেন, “কবে যাবি?” “কালকেই” “ক্লাস আছে না?” “আছে, করব না।আমার ঘুরতে যেতে ইচ্ছে করছে।” মোজাম্মেল খান ভারী কণ্ঠে বললেন, ” ক্লাস করতে হবে না, ওর যেহেতু যেতে ইচ্ছে করছে নিয়ে যাও।” সকাল থেকেই খান বাড়ির পরিবেশ অন্য রকম। আবিরের কড়া নিষেধের জন্য আলী আহমদ খান অফিসে যেতে পারছেন না। আবির আর মোজাম্মেল খান একায় সামলাচ্ছেন সবদিক। ইকবাল খান গতকাল ভোরবেলা সিলেটে চলে গেছেন। খাবার টেবিলে বসে আবির, মোজাম্মেল খান, আলী আহমদ খানের সঙ্গে কোনো এক বিষয়ে আলোচনা করায় ব্যস্ত। মীম, আদি নিজেদের মতো খাবার খাচ্ছে। তানভির তাড়াহুড়ো করে খেয়ে বেড়িয়ে গেছে। খাবার টেবিলে মেঘ নেই দেখে মোজাম্মেল খান শুধালেন, “মেঘ খাবে না?” মীম আস্তে করে বলল, ” আপু শাওয়ার নিচ্ছে, পরে খাবে বলল।” “আচ্ছা। ” আবিরও তেমন মনোযোগ দেয় নি। মেঘকে বকা দিলে সে ২-৪ দিন রাগ-অভিমানে ভোতা মেরে থাকে এটা আবির খুব ভালো মতোই

জানে। কিন্তু এখন মেঘের রাগকে প্রাধান্য দিতে গেলে ভবিষ্যতে বড়সড় বিপদের সম্মুখীন হতে হবে ভেবেই আবির মুখ বুঝে সব সহ্য করছে। আবির আর মোজাম্মেল খান অফিসে চলে গেছেন। তার কিছুক্ষণ পরেই মেঘ একেবারে রেডি হয়ে নিচে নেমেছে। ভেজা চুল মাঝখানে সিঁথি করে দু পাশে দুটা ছোট ক্লিপ দিয়ে পেছনের চুল ছেড়ে রেখেছে, সঙ্গে পছন্দের একটা জামা পরেছে। খাওয়াদাওয়া করে ১ ঘন্টার মধ্যে নানু বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছে। প্রায় বছর খানেক পর নানু বাড়িতে আসছে মেঘ। বাড়িতে এসে মেঘ ব্যাগ রেখেই ঘুরতে চলে গেছে। হালিমা খান ফোন করে বাসায় জানিয়েছে, মেঘ নানা-নানুর সঙ্গে গল্পগুজব করে, দুই মামার বাড়িতে ঘুরছে। এতদিন পর মামাতো ভাই বোন মেঘকে পেয়েছে, খুশিতে আত্মহারা হয়ে গেছে। ২ বোন, ৩ ভাই সবাই মেঘের থেকে বয়সে ছোট। মেঘ মামা বাড়িতে গেলে কাজিনদের ঈদ ঈদ লাগে। মেঘের মামা খালাদের মধ্যে মেঘের আম্মু ই সবার বড়। তারপর দুই মামা, সবার ছোট আরেক খালা। মেঘ বিকেল বেলা আম্মুর ফোন থেকে খালামনিকে কল দিয়ে ভাইবোনের সাথে কথা বলেছে, খালামনিকে আসতে বলেছে। খালামনির দুই মেয়ে এক ছেলে। বড় মেয়েটা মেঘের প্রায় সমবয়সী, এখন ইন্টারমিডিয়েট এ পড়তেছে। ছোট মেয়ে ক্লাস ৬ এ পড়ে, ছেলেটার বয়স সবে ৫ বছর। মেঘ যতবারই নানুবাড়ি আসে ততবারই খালামনিকেও আসতে হয়। সারাদিন হৈ হুল্লোড়ে থেকে মেঘ বাসার কথা প্রায় ভুলেই গেছে। এদিকে আবির সন্ধ্যার কিছুক্ষণ পরেই বাসায় আসছে। গেইটের বাহির

থেকে মেঘের বেলকনির দিকে তাকিয়েছে। মেঘের রুমের লাইট অফ দেখেই আবির কপাল গুটায়। বাড়ির পরিবেশ বরাবরের মতোই ঠান্ডা। আকলিমা খান আজ আদিকে সোফায় বসে পড়াচ্ছেন, মালিহা খান আলী আহমদ খানের কাছে বসে আছেন, মীম তার রুমে পড়তেছে। আবির রুমে গিয়ে ফ্রেশ হয়ে কিছুক্ষণ পর আলী আহমদ খানের রুমে গেল, আব্বুর রুম থেকে বেরিয়ে আসতেই আকলিমা খান শুধালেন, "তোমাকে খেতে দিব?" "দাও।" আকলিমা খান আবিরকে খেতে দিয়েছেন। আবিরের সাথে মীম আর আদিও কিছুক্ষণ পর খেতে বসছে। আবির আশেপাশে তাকাচ্ছে, বার বার উপরে তাকাচ্ছে, মনে মনে মেঘকে খোঁজছে। সচরাচর এত তাড়াতাড়ি আবির খায় না আজ মেঘকে দেখার জন্য ই অসময়ে খেতে এসেছে। মামনিকেও দেখতে পাচ্ছে না, জিজ্ঞেস করতেও কেমন জানি লাগছে। আবির তাড়াহুড়ো করে খাওয়া শেষ করে সিঁড়ি দিয়ে উঠছে, মেঘের রুম পেরিয়ে গিয়েও থমকে দাঁড়িয়েছে। মনের ভেতর কেমন জানি খুঁতখুঁত করছে। দু কদম পিছিয়ে দরজায় হাত রেখেও ধাক্কা দেয় নি, নিজের রুমে গিয়ে শুয়ে পরেছে। সকালে ঘুম ভাঙে আদির ডাকে। আদি দরজা থেকে ডেকে জিজ্ঞেস করছে, "আম্মু বলছে, কি খাবে বলতে!" আবির ঘুমের মধ্যেই বলছে, "কাকিয়ার রান্না করতে হবে না, মামনি কে বল, যা খুশি রান্না করতে।" "তোমার মামনি বাসায় নেই!" আবির সহসা চোখ মেলে ক্ষুদ্র পরিসরে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, "কোথায় গেছে?" "মেঘাপুর নানু বাড়ি গেছে।" "একা?" "না মেঘাপুও গেছে। " আবির সঙ্গে সঙ্গে শুয়া থেকে

উঠে বসল। মেঘ বাসায় নেই অথচ সে কিছুই জানে না। আদি চলে যেতেই আবির সঙ্গে সঙ্গে মেঘের নাম্বারে কল দিয়েছে কিন্তু মেঘের ফোন বন্ধ। মেঘ রাগ করে বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে অথচ আবির কিছুই টের পায় নি, ভাবতেই আবিরের বুক কাঁপছে। এদিকে মেঘের ফোন বন্ধ পেয়ে আবির রীতিমতো ঘামতে শুরু করেছে। বাধ্য হয়ে মামনিকে কল দিয়ে কথা বলেছে, মেঘের কথাও জিজ্ঞেস করেছে, মেঘ ভোরবেলা উঠেই কোথায় ফুল আনতে চলে গেছে। আবির মামনির সাথে কথা শেষ করে সহসা তানভিরের রুমে গেছে। তানভির তখনও ঘুমে বিভোর হয়ে আছে। গতকাল রাতে প্রায় ১ টার দিকে বাসায় আসছে, সকালেও তাড়াতাড়ি করে চলে গেছিল। মা, বোনের খবর ই নেয়া হয় নি। হালিমা খান যাওয়ার আগে তানভিরকে কল দিয়েছিল কিন্তু তানভির ব্যস্ততার কারণে কথা বলতে পারে নি। কল রিসিভ করে শুধু বলেছিল, “পরে ফোন দিচ্ছি। “পরে আর সময় হয়ে উঠে নি, বাসায় ফিরতে দেরি হয়ে গেছে বলে এত রাতে আম্মুকে ডাকে নি। তানভির ঘুমাচ্ছে দেখে আবিরও আর ডাকে নি। আবির দুপুরের দিকে আবারও মেঘের নাম্বারে কল দিয়েছে কিন্তু মেঘের নাম্বার তখনও বন্ধ। বিকেলে বাসায় ফিরে কি যেন ভেবে মেঘের রুমের দরজা ধাক্কা দিয়েছে। বিকেলের অল্প রোদে রুমের দেয়ালগুলো আলোকিত হয়ে আছে, আবিরের চোখ পরে বিছানার দিকে, বিছানার উপর আবিরের দেয়া সব গিফট সুন্দর করে গুছিয়ে রেখেছে। আবির ভ্রু কুঁচকে সূক্ষ্ম নেত্রে তাকায়। হঠাৎ আবিরের চোখ পড়ে টেবিলের

উপর রাখা ফোনের দিকে। আবির এগিয়ে গিয়ে ফোন হাতে নিয়ে দেখলো। মেঘ ফোন বন্ধ করে টেবিলের উপর রেখে চলে গেছে। অভিমানী মেঘ আবিরের রাগ সহ্য করতে না পেরে আবিরের স্মৃতি রেখে দূরে চলে গেছে। এদিকে মেঘের ফোন বন্ধ পেয়ে তামিম, মিনহাজ, মিষ্টি সবাই বন্যাকে কল দিচ্ছে। মেঘ যে নানার বাড়ি যাবে এটা বন্যাকেও বলে নি। ২ দিন হয়ে যাচ্ছে মেঘের ফোন বন্ধ পেয়ে বন্যা তানভিরকে কল দিল, তানভির তখন বাইকে। বন্যার দ্বিতীয় কল টের পেয়ে বাইক সাইড করে কল রিসিভ করল, বন্যা সালাম দিয়ে প্রশ্ন করল, " মেঘ কোথায় আছে?" "বনু নানু বাড়ি গেছে।" " কবে গেছে?" "২ দিন হলো।" "আমার সঙ্গে তো ঐদিন রাতেই কথা হলো। বললো না তো" "তোমার বান্ধবী আমাকেও বলে নি, আমিই পরের দিন শুনছি " "মেঘের ফোন বন্ধ কেন?" ফোন বাসায় রেখে চলে গেছে। " "কেন?" "আমি কি করে বলবো?" "কবে আসবে?" "জানি না" "আপনি না ওর ভাই, জানেন না কেন?" " আমাকে না বললে আমি কিভাবে জানবো, আম্মুও জানে না। বনুর যেদিন ইচ্ছে হবে সেদিন আসবে। " "ওহ আচ্ছা। রাখি তাহলে" "শুনো" "জ্বি" "তোমার হাতের কি অবস্থা? " "এখন কিছুটা ঠিক হয়ছে।" "ঔষধ গুলো খাচ্ছো সময়মতো?" "জ্বি। আপনি কেমন আছেন? " তানভির ভ্রু উঁচিয়ে মৃদু হেসে বলল, "আলহামদুলিল্লাহ ভালো " "কোথায় আছেন?" "রাস্তায়, বাইকে" "সরি অসময়ে কল দিলাম" "সমস্যা নেই। বলো" "আর কিছু বলবো না। রাখি এখন" "আচ্ছা। কি আর করা।" এক

সপ্তাহ পেরিয়ে গেছে মেঘের সঙ্গে কারো যোগাযোগ নেই। তানভির, আবির, মীমরা যখনই কল দেয়, মেঘ আশেপাশে কোথাও থাকে না, কাছে থাকলেও আবিরের কথা শুনলেই মেঘ নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। হালিমা খান সারাবাড়ি খোঁজেও মেঘকে পান না। ৪-৫ দিন হলো মেঘের খালামনি আসছে। নানু বাড়িতে মেঘকে নিয়ে মোট ৯ জন কাজিন। তানভির আসলে পরিপূর্ণ হতো। রাত ১২-১ টা পর্যন্ত আড্ডা দিয়ে ঘুমায়, সকাল থেকে উঠে হৈ-হুল্লোড় খেলাধুলা, নানার সঙ্গে ঘুরাঘুরি, নানুর হাতের পিঠা খাওয়াতে ব্যস্ত থাকে। এই কয়েকদিনে মেঘের মন অনেকটায় হালকা হয়ে গেছে। হালিমা খানকে দিয়ে প্রতিদিনই মালিহা খানকে কল দিয়ে মেঘ বড় আব্বু আর বড় আম্মুর খবর নেয় কিন্তু নিজে কথা বলে না এমনকি তানভিরের সঙ্গেও কথা বলে না। মেঘের সঙ্গে কথা বলতে না পেরে এদিকে আবিরের মাথা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, প্রতিদিন ই মামনিকে কল দেয় কিন্তু মেঘকে একবারও কাছে পায় না। আজ ইচ্ছে করে ই আবির রাত ১১ টায় কল দিয়েছে। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় বার কল দেয়ার পর অবশেষে কল রিসিভ হলো। কিন্তু কোনো কথা বলছে না। আবির প্রখর তপ্ত স্বরে ডাকলো, “মেঘ” মেঘ নিশ্চুপ, কোনো কথা বলছে না। আবির পুনরায় মোলায়েম কণ্ঠে বলল, “কথা বলবি না?” মেঘ ঢোক গিলে শান্ত স্বরে বলল, ” বলুন।” “কি করছিস?” “ঘুমাবো।” “রাতে খাইছিস?” “জ্বি। ” “বাসায় আসবি কবে?” “জানি না।” “ক্লাস মিস হচ্ছে না?” “হওক।” “তবুও আসবি না?” “নাহ” “বাসার মানুষদের

মিস করিস না?” “নাহ। আর কিছু বলবেন?” “কেনো? বিরক্তবোধ করছিস?” মেঘ স্ব শব্দে হেসে আস্তে বলে বলল, “নাহ! হয়তো আমি কারো বিরক্তির কারণ হচ্ছি। ভালো থাকুন। আল্লাহ হাফেজ। ” মেঘের তীব্র অভিমান বুঝতে পেরে আবির আর কিছুই বলতে পারলো না। মেঘ কল কেটে দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়লো। এর আগে কখনো আবিরের সঙ্গে এত অভিমান নিয়ে কথা বলে নি মেঘ। আবির কল দিলেই রাগ অভিমান সব মিলিয়ে যায় অথচ এবার মেঘের মন পাথরের ন্যায় শক্ত হয়ে গেছে। আবিরের মোলায়েম, কোমল কণ্ঠস্বর অষ্টাদশীর অভিমানের পাহাড় ভাঙতে ব্যর্থ হলো। এরপর থেকে প্রতিদিন ই আবির রাত ১১ টার পরে মামনির নাম্বারে কল দেয়। হালিমা খান ১০-১০.৩০ নাগাদ ঘুমিয়ে পরেন। তারপর মেঘ আম্মুর ফোন দিয়ে গেইম খেলে। আবিরের কল কাটার সাধ্যি হয় না বলে বাধ্য হয়ে রিসিভ করে, প্রতিদিন ই ২-১ টা কথা বলে মেঘ কল কেটে দেয়। আজ শুক্রবার। গতরাতে মেঘের সঙ্গে কথা বলেই আবির ঘুমিয়েছে। ১০ টা বাজে, এখনও আবির ঘুমাচ্ছে। মামনির নাম্বার থেকে কল আসতেই আবির ঘুমের মধ্যে কল রিসিভ করল। ঘুমন্ত অবস্থায় বলল, “মামনি” “নাহ। আমি মেঘ ” “হুমমমমমম ম্যাম, বলুন।” “ঘুমাচ্ছেন? পরে কল দিব? ” ” বলুন, আমার ঘুম শেষ। ” মেঘ মলিন হেসে বলল, “ভাইয়াকে কল দিচ্ছি, ভাইয়া কল ধরছে না।” “কেনো? কোনো দরকার? ” “নানুমনি ভাইয়াকে আসতে বলতেছে। আর আমরাও চলে যাব আজ।” “আচ্ছা আমি তানভিরকে বলে দিব। ” “আর একটা

কথা। ” “বলুন ” “আম্মু বলতেছিল, ভাইয়ার সঙ্গে আপনিও আসার জন্য। ” “মামনি বলছে, তারমানে আপনি চান না আমি আসি।” “আপনার ইচ্ছে হলে, সুযোগ থাকলে আসবেন। আমি কাউকে জোর করে তার বিরক্তির কারণ হতে চাই না। রাখছি। ” আবির মুচকি হেসে তাড়াতাড়ি উঠে তানভিরের রুমে ছুটে গেল। তানভির সকালে খেয়ে আবার শুয়েছে। আবির তপ্ত স্বরে ডাকলো, “তানভির, উঠ ” আবিরের কণ্ঠস্বর শুনামাত্র তানভির হকচকিয়ে উঠল। গলা খাঁকারি দিয়ে প্রশ্ন করল, “কি হলো ভাইয়া?” আবির মুচকি হেসে বলল, “বউ কল দিছে তাকে আনতে যেতে হবে। তাড়াতাড়ি রেডি হ” “বাপরে বাপ। এত খুশি?” “বউটাকে কতদিন ধরে দেখি না। বুকের ভেতর শূন্যতা অনুভব করছি। তুই বুঝবি না। ” “আহাগো” “ভন্ডামি না করে তাড়াতাড়ি উঠে রেডি হ।” তানভির রেডি হতে হতে আম্মুকে কল দিয়েছে। গাড়ি নিয়ে বাড়ি পর্যন্ত যাওয়া যাবে কি না জানার জন্য। মেঘদের নানুর বাড়ির এদিকে রাস্তা করতেছে, গাড়ি বাড়ি পর্যন্ত যাবে না। যাওয়ার দিনই অনেকটা পথ হেঁটে যেতে হয়েছে । এজন্য তানভির আর আবির বাইক নিয়ে বেরিয়েছে। আবির আজ সাদা রঙের পাঞ্জাবি পরেছে আর তানভির ধূসর রঙের। পাশাপাশি দুই ভাই বাইক চালিয়ে যাচ্ছে। তানভির হঠাৎ ই ডাকলো, “ভাইয়া!” “বল” “একটা গান গায়?” “তোর মন চাইলে গা, আমার বলছিস কেন?” “এই গান টা শুধু তোমার জন্য। তুমি রাজি থাকলে শুরু করব। গাইবো?” “গা” তানভির গলা খাঁকারি দিয়ে গাইতে শুরু করল, “এসেছি তোকে নিয়ে

ফিরবো বলে মনেরই পথ চিনে আয়না চলে তোর ছেড়ে জ্বর বুকে ছাড়ে না পারছে তোকে ছাড়া না রে না!”তানভিরের গান শুনে আবির ঘাড় ঘুরিয়ে তাকিয়েছে। হেলমেটের আড়ালে আবিরের অভিব্যক্তি বুঝার উপায় নেই তবুও তানভির গান বন্ধ করে দিয়েছে। ফাঁকা রাস্তা, নিরিবিলি পরিবেশ, দুপাশে সারি সারি গাছ। আবির আচমকা একহাতে হেলমেট খুলে সাইডে রেখে গাইতে শুরু করল, “এসেছি তোকে নিয়ে ফিরবো বলে মনেরেই পথ চিনে আয়না চলে তোর ছেড়ে জ্বর বুকে ছাড়ে না পারছে তোকে ছাড়া না রে না” আবিরের কণ্ঠে গান শুনে তানভির আশ্চর্য নয়নে তাকিয়ে আছে। তানভিরের বাইকের গতি কমে গেছে। তানভির ভাবছিল আবির রাগ করবে অথচ আবিরও গান গাইছে। তৎক্ষনাৎ তানভির নিজের হেলমেট ও খুলে ফেলছে। বাইকের স্প্রীড বাড়িয়ে আবারও আবিরের সমান্তরালে গিয়ে আবিরের সমস্বরে গান ধরলো। অনেক টা পথ দু ভাই একের পর এক গান গাইতে গাইতে অবশেষে তানভিরের নানাবাড়ি পর্যন্ত চলে আসছে। বাইকের শব্দে মেঘ সহ বাকি কাজিনরাও বাড়ির ভেতর থেকে দৌড়ে বেড়িয়ে আসছে। তানভিরকে দেখেই মেঘ আহ্লাদী কণ্ঠে ডাকল, ” ভাইয়া” “ইহহহ আসছে এখন ঢং করতে! ৭ দিনে একবারও ভাইয়ের কথা মনে হয় নি? নিষ্ঠুর কোথাকার! ” মেঘ হেসে বলল, “কেমন আছো ভাইয়া?” “আলহামদুলিল্লাহ ভালো। তুই কেমন আছিস?” “আলহামদুলিল্লাহ ভালো।” তানভির বাকি কাজিনদের সঙ্গে গল্প করতে করতে বাড়ির ভেতরে চলে গেছে। কাজিনদের পছন্দ মতো খাবার

নিয়ে আসছে তানভির, সেগুলোই সবাইকে দিচ্ছে। মেঘ মনের বিরুদ্ধে গিয়েও একবার পিছন ফিরে দেখলো আবির আসছে কি না! আবিরকে দেখতে না পেয়ে চিবুক নামিয়ে বাড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করল। আবির ভাইকে বলার পরও আসলো না, ভাবতেই মেঘের মন বিষন্নতায় ছেয়ে গেছে। একটু সামনে এগুতেই পুরুষালি কণ্ঠ ভেসে আসে, "কেমন আছেন, ম্যাম?" সুপরিচিত প্রিয় কণ্ঠস্বর মস্তিষ্কের সঙ্গে সঙ্গে অষ্টাদশীর হৃদয়কেও আন্দোলিত করেছে। মেঘ অকস্মাৎ পেছন ফিরে তাকাতেই সরাসরি নজর পরে আবিরের মলিন মুখমন্ডলে। নিজের প্রতি করা বেধক অবহেলা আবিরের চোখেমুখে লেপ্টে আছে। অষ্টাদশী নিষ্পলক চেয়ে থেকে খানিকক্ষণ পরখ করলো আবিরকে। আবিরের পরিশ্রান্ত চেহারা দেখে অষ্টাদশীর বুকের ভেতর চিনচিন ব্যথা অনুভব হলো। হৃদয়ের ক্লেশ উপেক্ষা করে মেঘ মাথা নিচু করে নিরেট কণ্ঠে বলল, "আলহামদুলিল্লাহ। " কথা টা বলতে দেরি হয়েছে অথচ মেঘের বাড়ির ভেতরে যেতে দেরি হয় নি। মেঘ ভেতরে চলে গেলেও আবির পূর্বের জায়গাতেই নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে আছে। এই কয়েকদিনের এলোপাতাড়ি চলাচলে আবিরের কাদম্বিনীর চেহারার লাবণ্য অনেকটায় কমে গেছে। দেখেই বুঝা যাচ্ছে অযত্নে কাটছে তার প্রেয়সীর দিন। নানুবাড়িতে বাঁধা দেয়ার কেউ নেই, হালিমা খান বকা দিলে মামারা, খালামনি, নানা নানু আহ্লাদে মেঘকে মাথায় তুলে রাখে। তাদের অতিরিক্ত আদরে এ কয়দিন খেয়ে না খেয়ে ছুটোছুটি করেছে। আবির চোখ বন্ধ করে সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকলো। সবার

সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করে নানার রুমে গিয়ে বসলো। কিছুক্ষণের মধ্যে মেঘের খালামনি আর দুই মামি নাস্তা নিয়ে আসছে। আবির, তানভিরের পছন্দ মতো পিঠা আরও অন্যান্য খাবার। হালিমা খান কয়েকবার এসে দেখে গেছেন। ওনি ব্যাগ গুছানোতে ব্যস্ত। নাস্তা খেয়ে তানভির, আবির, আরও ২-৩ জন কাজিন মিলে ঘুরতে গেছে। সবার নানুর বাড়িতেই অপ্রকাশিত অনেক স্মৃতি জড়িয়ে থাকে। তানভির আশেপাশে ঘুরছে, ছোটবেলার বন্ধুদের মধ্যে যারা বাড়িতে ছিল তাদের সঙ্গে গল্পগুজব করেছে। তারপর বাড়িতে এসে হাতমুখ ধৌয়ে খেতে বসেছে। আবিরদের উদ্দেশ্যে দুই মামি মিলে এলাহি আয়োজন করেছেন। অবশ্য এত আয়োজনের পেছনে মেঘের ই হাত। ছোটবেলা আবির মেঘের নানুবাড়িতে আসছিল কি না তা মেঘ জানে না। মেঘের কাছে মনে হচ্ছে, এটায় আবিরের প্রথম আগমন। নানুবাড়িতে আবির ভাইয়ের খাবারদাবারে যেন কোনোরকম ত্রুটি না থাকে তাই মেঘ নিজে সব লিস্ট করে দিয়েছে, রান্নার তদারকিও মেঘই করেছে। আবিরের পছন্দের তালিকার যতটুকু মেঘ জানে সবটাই করিয়েছে। বেশকয়েকটা রেসিপি মেঘ নিজেই রান্না করেছে। সঙ্গে তানভিরের পছন্দ মতো রান্নাও হয়েছে। সালাদ থেকে শুরু করে যা যা মেঘের পক্ষে করা সম্ভব সেসবই সে করেছে। ওরা আসতেই দেখা করে মেঘ লুকিয়ে পরেছে। একবারের জন্যও ওদের সামনে আসছে না ।
তানভির আবিরের সঙ্গে অন্যান্য কাজিনরাও খেতে বসেছে। তানভির আচমকা আবিরের দিকে তাকিয়ে ডাকল, “ভাইয়া” “কি?” “আবেগে

বেশি খেয়ে ফেলল না আবার!” আবির আড়চোখে তানভিরের দিকে তাকালো। তানভিরের মুখে রহস্যময় হাসি। আবির ভ্রু গুটাতেই তানভির বিড়বিড় করে বলল, “আমি খবর পেয়েছি, তোমার জন্য আজকে স্পেশালি আমার বোন নিজে হাতে রান্না করেছে। ” আবির ভ্রু উঁচিয়ে ওষ্ঠ বেঁকিয়ে তানভিরের দিকে তাকিয়ে আছে। তানভির মুচকি হেসে বলল, ” এভাবে আমায় না দেখে আমার বনুটাকে দেখলেও তো পারো।” আবির গলা খাঁকারি দিয়ে বিড়বিড় করে বলল, ” সময় হওক তখন দেখবি, তোর বোন ব্যতীত কোনো দিকে তাকাবোই না।” তানভির নিঃশব্দে হাসলো সাথে আবিরও। খাওয়াদাওয়া শেষ করে সবার সঙ্গে আরও কিছুক্ষণ গল্প করে বাসার উদ্দেশ্যে বের হলো। মেঘ আর হালিমা খানও সবার থেকে বিদায় নিয়ে বেড়িয়েছে। মেঘের কাজিনরাও মেঘদের সঙ্গে কিছুটা এগিয়ে আসছে। মেঘ তানভিরকে উদ্দেশ্য করে গম্ভীর কণ্ঠে বলল, “ভাইয়া আমি তোমার সাথে যাব ” তানভির সহসা জানাল, “আমি তোকে নিতে পারব না।” “কেনো?” তানভির স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, “আব্বু কি বলছিল মনে নাই? আমি যেন তোকে নিয়ে বাইক না চালায়।” মেঘ ঠোঁট ফুলিয়ে বলল, “কেনো? আমাকে নিয়ে চালালে কি হবে?” তানভির আকাশের পানে তাকিয়ে বলল, “আব্বুর আমাদেরকে নিয়ে টেনশন হয়, তুই আমি একসঙ্গে গেলে বাই চান্স এক্সিডেন্ট হলে আর আমাদের কিছু হয়ে গেলে কি হবে! সেই ভেবেই আব্বু ভয় পায়। তুই ভাইয়ার সঙ্গে যা, আমি আম্মুকে নিয়ে যাচ্ছি। ” ” এক্সিডেন্ট করলে করব, মরে গেলে

যাব। তবুও আমি তোমার সাথেই যাব!” তানভির শক্ত কণ্ঠে বলল, “বনু। বাজে কথা একদম বলবি না। আমার কিছু হলেও সমস্যা নাই কিন্তু আমার কারণে তোর কিছু হলে আমাকে আব্বু মা*র্ডার করে ফেলবে।” মেঘ ভ্রু কুঁচকে বলল, “ওনার সাথে গেলে যে আমার কিছু হবে না তার কি গ্যারেন্টি আছে?” “গ্যারেন্টি আমি তোকে দিচ্ছি। কিছু হবে না তোর। ” মেঘ রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে বলল, “তবুও তুমি আমায় নিয়ে যাবে না?” “আব্বুর কথা অমান্য করলে আমায় বাড়িতে জায়গা দিবে না বইন। তুই কি চাস তোর এই হতভাগা ভাই টা অকালে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাক?” মেঘ রাগে কটকট করে বলল, “হয়ছে আর ইমোশনাল ব্যাকমেইল করতে হবে না। নিয়ে যাও আম্মুকে। আমিও বাসায় গিয়ে আব্বুকে বিচার দিব।” তানভির হেসে আম্মুকে গাড়িতে বসতে বলল। হালিমা খান উঠতেই তানভির বাইক স্টার্ট দিল। এদিকে আবির এতক্ষণ যাবৎ কোনো কোথায় বলে নি। ওরা কিছুদূর যেতেই আবির বাইক স্টার্ট দিতে দিতে বলল, “কেউ কি আমার সঙ্গে বাইকে যেতে বিরক্তবোধ করছে?” মেঘ ফোঁস করে শ্বাস ছেড়ে নিজের ব্যাগ টা মাঝখানে রেখে ১ সেকেন্ডের মধ্যে বাইকে উঠে বসছে। আবির লুকিং গ্লাসে তাকিয়ে প্রেয়সীর রাগান্বিত মুখবিবর দেখে মৃদু হেসে বাইক স্টার্ট দিল। মেঘের রাগ অতিসহজে কমবে না এটা আবির বেশ বুঝতে পারছে। মেঘের ছোট থেকেই এই স্বভাব। নিজের পছন্দের কোনো জিনিস কাউকে দিতে চায় না, এমনকি মীমকেও না। আর যদি কারো উপর রাগ উঠে তাহলে এত সহজে রাগ কমে না।

কথা বললেও রাগে কটকট করতে করতেই বলে। বড় হয়েছে ঠিকই তবে এখনও আগের স্বভাব ই আছে। তানভির ওর আম্মুকে নিয়ে অনেকটা সামনে চলে গেছে, ওদের আর দেখা যাচ্ছে না। আবির একটা চায়ের স্টল দেখে বাইক থামিয়ে দুকাপ চা নিয়ে আসছে। মেঘ প্রথমে নিতে না চাইলেও আবিরের জোরাজোরিতে নিয়েছে। আবির রাস্তার পাশে একটা গাছের সাথে হেলান দিয়ে চা খাচ্ছে আর অভিভূতের ন্যায় মেঘকে দেখছে। রাগের কারণে মেঘের মুখ ফুলে আছে, থুঁতনিতে কেমন যেন ভাঁজ হয়ে গেছে। আবির চুল থেকে শুরু করে পায়ের কনিষ্ঠা আঙুল পর্যন্ত নিরীক্ষণ করতে করতে চা শেষ করল। টাকা পরিশোধ করে বাইকের কাছে এসে শান্ত স্বরে বলল, "এখনও রাগ কমেনি তোর?" "কিসের রাগ? আমার কারো উপর কোনো রাগ নেই। " "তা তোর চোখেই ভাসতেছে" মেঘ চোখ তুলে তাকাতেই আবির মুচকি হাসলো। কিন্তু মেঘের চেহারা অপরিবর্তিত। মেঘ চিবুক নামিয়ে কর্কশ গলায় বলল, " আপনি কি আমায় বাসা পর্যন্ত নিয়ে যাবেন?" "যদি না নিয়ে যায়। তাহলে কি করবি?" "বাস বা অন্য কিছু দিয়ে চলে যাব।" "সত্যি? " "সত্যি। " "তুই আমায় একা ফেলে চলে যাবি?" "আপনি তো আর অবুঝ না। যেভাবে এসেছেন সেভাবে বাসা পর্যন্ত যেতে পারবেন।" আবির হঠাৎ ই দু আঙুলে মেঘের থুতনি উঠালো, আচমকা আবিরের স্পর্শে মেঘের দেহ শিউরে ওঠে। সহসা চোখ বন্ধ করে ফেলেছে। আবির গুরুতর কণ্ঠে বলল, "তাকা" মেঘ নিভু নিভু চোখে তাকাতেই আবিরের গভীর নেত্রে

দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়। সঙ্গে সঙ্গে মেঘের ভ্রু যুগল কুঁচকে আসে। এই এক জোড়া চোখ মেঘকে কি যেন বলতে চাচ্ছে, চোখের ভাষা বুঝার সাধ্যি ছোট্ট অষ্টাদশীর নেই তবে দৃষ্টির গভীরতা প্রখর তা বুঝতে সময় লাগে নি। ইদানীং আবিরের নজরের অস্বাভাবিকতা মেঘ প্রায় ই খেয়াল করে। মেঘ তাকালে, চোখে চোখ পরলেই নিজেকে কেমন যেন আড়াল করে নেয় আবির । আজও আবিরের দৃষ্টি প্রখর। অষ্টাদশীর আঁখি জোড়াও আবিরের চোখে নিস্তব্ধ হয়ে আছে। পলক ফেলছে না কেউই। আবির হঠাৎ ই নমনীয় কণ্ঠে বলা শুরু করল, "I am Sorry Megh. দিনকে দিন আমি মানুষটা বড্ড পাষাণ হয়ে যাচ্ছি, মাঝে মাঝে নিজের স্বার্থ ছাড়া কিছুই ভাবতে পারি না। মানুষ মন থেকে খুব করে কিছু চেয়ে যখন সেটা পায় না তখন ই তার দুনিয়া এলোমেলো হয়ে যায়। সেই জিনিসটা পাওয়ার জন্য আবেগ, অনুভূতি বিসর্জন দিতেও দুবার ভাবে না। আমার অবস্থা এখন তেমনই। আমি জানি, তুই এসবের কিছুই বুঝবি না, তবুও কেন জানি তোকে বলতে ইচ্ছে করছে। তোর সাথে সেদিন একটু বেশিই বাড়াবাড়ি করে ফেলছি, যদি সম্ভব হয় আমায় ক্ষমা করে দিস। আমি তোর খারাপ চাই না কখনো, কিন্তু আমার ভালো চাওয়াগুলোও কেমন যেন খারাপ হয়ে যায়।" আবিরের প্রথম কথাগুলো শান্ত স্বরের হলেও শেষ কথাগুলো বলতে গিয়ে আবিরের গলা ভিজে আসছিল। এদিকে আবির ভাইয়ের স্পর্শ, শীতল কণ্ঠে বলা কথাগুলো অষ্টাদশীর হৃদয়ে সাতদিন যাবৎ জ্বলজ্বল করা তীব্র অনলকে মুহুর্তেই নিভিয়ে দিয়েছে। আবিরের বলা প্রতিটা কথা

অষ্টাদশীর হৃদয় স্পর্শ করেছে। আবির কোনো বিষয়ে আপসেট এটা বুঝতে বাকি নেই মেঘের। আবির ভাই কিছু চেয়ে পান নি এটা খুব স্পষ্ট। তবে কি চেয়েছিলেন তিনি? কেনোই বা পান নি? সেই ক্ষোভ কেন মেঘের উপর ঝাড়েন! সব প্রশ্নের উত্তর ই অজানা। আবিরের চোখ লাল হয়ে যাচ্ছে, চোখে পানি জমতে শুরু করেছে। আবির ঢোক গিলে মেঘের থুতনিতে রাখা নিজের আঙুল সরিয়ে অন্যদিকে তাকিয়ে ঠান্ডা কণ্ঠে বলল, "আমি আসছি একটু। " মেঘ স্তব্ধ হয়ে আছে। আবির কোথায় যেন গেছে। মেঘের মনে প্রশ্নেরা ঘুরপাক খাচ্ছে। একবার ভাবছে জিজ্ঞেস করবে। আবার মনে হলো, আবির ভাই কিছু বলার পাত্র নয়। জিজ্ঞেস করলেও আশানুরূপ উত্তর পাবে না। তাই অষ্টাদশীর মনের গহীনে উদিত প্রশ্নগুলোকে সেখানেই চাপা দিয়ে দিয়েছে। তবে আবির ভাইয়ের একটা জিনিস বরাবরই অষ্টাদশীকে আকৃষ্ট করে। আবির যেমন রাগ দেখায় একটা সময় পর মেঘকে নিজেই সরি বলে। তবে এবার অষ্টাদশীর মন এত সহজে গলবে না। আবিরের রাগ দেখাতে পারলে অষ্টাদশীও রাগ দেখাতে পারে। তবে সম্পূর্ণ অন্যভাবে। কিছুক্ষণ পর আবির আসছে। ভেজা চুল ঝেড়ে হেলমেট পড়ে নিয়েছে। কথা না বলে বাইক স্টার্ট দিল, মেঘ পূর্বের ন্যায় বাইকে বসছে। সম্পূর্ণ রাস্তা কেউ কোনো কথা বলল না। বাসায় এসেও যে যার মতো রুমে চলে গেছে। সময় চলছে নিজের মতো সেই সাথে সবাই সবার মতোই দিন কাটাচ্ছে। নানুবাড়ি থেকে ঘুরে আসার পর থেকে মেঘ অনেকটায় স্বাভাবিক হয়ে গেছে। আবিরের

কথা ভেবে মন খারাপ করে ঘরে বসে থাকে না। মীম,আদির সঙ্গে আড্ডা, ছাদের গাছগুলোর যত্ন নেয়া, ভার্সিটি,ক্লাস, বন্ধুদের সাথে গল্প সব নিয়েই ব্যস্ত থাকে মেঘ । আবির ও নিজের কাজে ব্যস্ত। আলী আহমদ খান কিছুদিন যাবৎ অফিসে যাচ্ছেন। তবে মিটিং থেকে শুরু করে বেশিরভাগ কাজ আবিরই করে তাছাড়া মোজাম্মেল খান বাকি কাজ করেন। তানভিরও নিজের মতো ব্যস্ত হয়ে গেছে। আবির মেঘের সঙ্গে কথা বলতে চাইলেও মেঘ কোনো কথায় তেমন সাড়া দেয় না। বাড়ির বাকি সদস্যদের সঙ্গে আড্ডা দেয়ার মাঝে আবির আসলেই মেঘ নিশ্চুপ হয়ে যায়। একটা কথায় মেঘের মাথায় সর্বক্ষণ মাথায় ঘুরপাক খায়, “আমি কখনো আবির ভাইয়ের বিরক্তির কারণ হবো না।” মেঘদের সঙ্গে তামিম আর মিনহাজদের সম্পর্ক আগের থেকেও ভালো হয়েছে। তামিম বন্যাকে আর কোনো দিন উল্টাপাল্টা কথা বলবে না বলে প্রমিস করেছে। মিনহাজ দিন দিন মেঘের প্রতি একটু বেশিই কেয়ার দেখায়। মেঘের সেসব ভালো না লাগলেও বন্ধু ভেবে তেমন কিছুই বলে না এসব বিষয় ইগ্নোর করে চলে। দু তিনদিন যাবৎ আবির খুব চেষ্টা করছে মেঘের সঙ্গে কথা বলার কিন্তু কোনোভাবেই পারছে না। সবার সামনে তেমন কিছু বলতে পারে না, মেঘ রুমে থাকলেও দরজা বন্ধ করে রাখে। দরজায় ডাকলে মেঘ দরজা খুলবে কি না, বাড়ির মানুষ দেখলে কি ভাববে এসব ভেবেই আবির কুল কিনারা পাচ্ছে না। এদিকে প্রেয়সীর রাগান্বিত মুখবিবর আবির আর সহ্য করতে পারছে না। কতদিন হয়ে গেছে আবির

মেয়েটার মুখের হাসি দেখতে পারছে না। সর্বক্ষণ মেঘের দুশ্চিন্তায় থাকতে থাকতে কাজেও ঠিকমতো মনোযোগ দিতে পারে না। এক কাজ দুবার – তিনবার করতে হয়। আজকে বিকেলে মীম, আদি, হালিমা খান, আকলিমা খান শপিং এ যাবেন। মেঘকেও বলেছিল কিন্তু মেঘ যাবে না বলেছে। মালিহা খান অসুস্থতার কারণে ইচ্ছে করেই যান নি। আবির আজ ২ টার দিকে অফিস থেকে বাসায় আসছে। বিকেলের দিকে আবির রেডি হয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামছে। মেঘ তখন সোফায় বসে কার্টুন দেখছিল। ঘাড় ফিরিয়ে সিঁড়িতে আবিরকে দেখে টিভির সাউন্ড কমাতে লাগলো। আবির সোফার কাছে দাঁড়িয়ে গম্ভীর কণ্ঠে বলল, "কার্টুন দেখা শেষ হলে একটু ছাদে যাস। " মেঘ কপাল গুটিয়ে ধীর কণ্ঠে শুধালো, "কেনো?" আবির পূর্বের ন্যায় ভারী কণ্ঠে উত্তর দিল, "গেলেই বুঝবি। " আবির বাসা থেকে বেড়িয়ে গেছে। মেঘ আবিরের যাওয়ার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো, পুনরায় কার্টুন দেখায় মনোযোগ দিল। মনের ভেতর খুঁতখুঁত করছে। আবির ভাই ছাদে যেতে বললেন কেন? একবার ভাবছে যাবে আবার ভাবছে যাবে না। যার সঙ্গে আড়ি তার কথায় ছাদে যাওয়ার কোনো মানে হয় না! কিন্তু অবুঝ মনকে মানাতে পারলো না। ১০-১৫ মিনিট পর টিভি বন্ধ করে ছাদের উদ্দেশ্যে রওনা দিল। ছাদের দরজায় একটা চিরকুটে লেখা- "Welcome " মেঘ কপাল কুঁচকে দরজা থেকে চিরকুট তুলে হাতে নিয়ে দরজা খুলতেই আশ্চর্য বনে গেল। দৃষ্টির সীমানা জুড়ে বড় ছোট চিরকুটের ছড়াছড়ি। সাদা, হলুদ, লাল, গোলাপী, নীল প্রতিটা

চিরকুটেই লেখা, “I am Sorry Megh.” “Please forgive me.” “Sorry.” “I feel regret and guilt” এরমতো অসংখ্য বাক্যের চিরকুটে সম্পূর্ণ ছাদ, ছাদের গাছের ঢাল,পাতা রঙিন হয়ে আছে। মেঘ গুটিগুটি পায়ে হেঁটে প্রতিটা চিরকুটে লেখা লাইনগুলো পড়ছে। নিজের অজান্তেই অষ্টাদশীর ঠোঁটে হাসি ফুটেছে। প্রায় ৪০ মিনিট যাবৎ অষ্টাদশী ছাদে হাঁটছে আর চিরকুট পড়েছে। সবগুলো চিরকুট পড়ে পড়ে নিজের হাতে জমা করছে।মেঘের মনের আকাশ জুড়ে শুধু একটা কথায় বিচরণ করছে, “আপনি মানুষটা অত্যধিক রহস্যময়, কৌশলে যেমন কষ্ট দেয়ায় পটু তেমনি নিপুণ দক্ষতায় সেই ক্লেশ দূরীকরণেও সক্ষম।” মেঘ মুচকি হেসে বলল, “তবে আপনার চড়ুইও কম না। আপনি সবসময় কৌশলে আমার মন ভালো করে দিলেও এবার আর আমার মন ভালো হচ্ছে না। আপনি আমার কোমল হৃদয়ে যে আঘাতটা করেছেন তার জন্য একটু ভোগান্তি তো আপনাকে ভুগতেই হবে।” মেঘ চিরকুট গুলো নিয়ে রুমে চলে গেছে। মন টা আজ খুব ভালো কিন্তু সেটা আবির ভাইকে বুঝানো যাবে না। রাতে খাবার টেবিলে আবিরের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই মেঘ গাল ফুলিয়ে চোখ নামিয়ে নিলো। আবির কপাল গুটিয়ে মেঘকে কয়েক মুহুর্ত দেখল। এতকিছুর পরও মেয়েটার মুখে একটু হাসি ফুটলো না। ভাবতেই আবিরের মাথায় ব্যথা অনুভব হচ্ছে। তাহলে কি মেঘ ছাদে যায় নি? আবির কোনোরকমে খাওয়া শেষ করে তাড়াতাড়ি ছাদে গেল। ছাদে একটা চিরকুট ও নেই। তারমানে মেঘ ছাদে আসছিল আর

চিরকুট নিয়েও গিয়েছে। আবির তার কাদম্বিনীর রাগ ভাঙাতে ব্যর্থ হয়েছে ভেবেই আকাশের ন্যায় কোমল দৃষ্টিতে তাকালো।হৃদপিণ্ডটা অবিরাম কাঁপছে। মনের ভেতর অজানা ভয় কাজ করছে। চোখ বন্ধ করতেই ৯ বছর আগের স্মৃতি একের পর এক চোখের সামনে ভেসে আসছে। আচমকা ধপ করে ছাদের ফ্লোরেই বসে পরেছে। কি হচ্ছে আর কি হবে তা ভেবেই ক্লান্ত হয়ে পরেছে। আজ মার্চের ৩ তারিখ। মেঘের জন্মদিন। অষ্টাদশী আজ উনিশ বছরে পা দিয়েছে। বাড়ির পরিবেশ ঠান্ডা। এই বাড়িতে কখনোই জন্মদিন পালন করা হয় না। সামান্য উইশ টুকুও কেউ করে না। তাই কারোর জন্মদিনের কথা মনেই থাকে না। আবির গত রাতে দেরি করে বাসায় ফেরার কারণে সকালে ঘুম থেকে উঠতে পারে নি। আবির ১২ টার দিকে অফিসে যেতে চাইলে আলী আহমদ খান অফিসে তেমন চাপ নেই বলে যেতে নিষেধ করেন। এজন্য আবির দুপুরের দিকে সোফায় বসে আদিকে পড়াচ্ছিল। কিছুক্ষণ পর মেঘ ভার্সিটি থেকে বাসায় আসছে। ফ্রেশ হয়ে খেতে বসেছে। হঠাৎ দরজায় কলিং বেলের শব্দ হতেই আবির গিয়ে দরজা খুলে দিল। ডেলিভারি বয় জিজ্ঞেস করলেন, “এখানে মাহদিবা খান নামের কেউ আছেন?” মেঘ খাবার খাওয়া বন্ধ করে দরজার দিকে তাকালো। আবির তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, “কেনো?” “ওনার নামে পার্সেল আসছে।” আবির গম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন করল, “কোথা থেকে?” “সরি ভাইয়া, সেটা বলতে পারছি না । ” পার্সেলের কথা শুনে মেঘ তাড়াতাড়ি খাবার শেষ করে হাত ধৌয়ে দৌড়ে আসছে।

উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, “আমি মাহদিবা” ছেলেটা মেঘের সাইন নিয়ে পার্সেল দিয়ে চলে গেছে। মেঘ পার্সেল ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে দেখতে চলে যাচ্ছে। আবির স্তব্ধ হয়ে গেছে। আবির দরজা বন্ধ করে সিঁড়ি পর্যন্ত আসতেই তানভির নামছে। মেঘকে হাস্যোজ্জল চেহারা দেখে আবিরের দিকে তাকিয়ে ছোট করে বলল, “কি হয়ছে?” আবির উত্তর না দিয়ে তানভিরকে পাশ কাটিয়ে মেঘের রুমে চলে গেছে। মেঘ টেবিলের উপর পার্সেল রেখে কাঁচি আনতে ড্রেসিং টেবিলের কাছে গেছে। আবির রুমে ঢুকে পার্সেল হাতে নিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন করল, “পার্সেল কে পাঠাইছে?” মেঘ হেসে উত্তর দিল, “আমি কি করে বলবো?” “তাহলে পার্সেল পেয়ে এত খুশি কেন?” “গিফট পেলে সবাই খুশি হয় সেটা যেই দেক না কেন! আমার পার্সেল দিন। ” “কে পাঠিয়ে না বললে পার্সেল দিব না” “আজব তো! আমি জানি না কে পাঠাইছে।” “তাহলে পার্সেল দেখার দরকার নেই।” বলেই আবির পার্সেল নিয়ে চলে গেছে। মেঘ আহাম্মকের মতো চেয়ে আছে। মনে মনে বিড়বিড় করে বলছে, ” নিজে সামান্য উইশ ও করবে না আবার কেউ পার্সেল দিলে নিতেও দিবে না। এ কেমন মানুষ রে বাবা!” আবির পার্সেল নিয়ে রুমে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। আবিরের মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে হয়তো মিনহাজ গিফট পাঠিয়েছে। মেঘ কি করবে ভেবে না পেয়ে একে একে বন্যা, মিনহাজ, তামিম, মিষ্টি সবাইকে কল দিয়েছে, কেউ পার্সেল পাঠিয়েছে কি না জিজ্ঞেস করেছে। কিন্তু কেউ ই কিছু জানে না। মিনহাজকে জিজ্ঞেস করায়, মিনহাজ বলেছে, “তোদের

বাসার ঠিকানা জানলে আমি নিজেই পার্সেল নিয়ে হাজির হইতাম ” মেঘ প্রথমে ভেবেছিল বন্ধুদের মধ্যেই কেউ পাঠিয়েছিল কিন্তু ওদের কথা শুনে এখন মেঘ নিজেই চিন্তায় পরে গেছে। তবে কে দিল পার্সেল? দুপুরের পর পর আবির বাসা থেকে বেরিয়ে গেছে। কিছুক্ষণ পর তানভির একটা ড্রেস মেঘকে দিয়ে বলল, “এটা পড়ে রেডি হয়ে নে, তোকে নিয়ে বের হবো” “কেন?” তানভির মুচকি হেসে বলল, “এমনি” মেঘও সঙ্গে সঙ্গে হাসলো। সবার মধ্যে তার ভাই যে তার জন্মদিন মনে রেখে ঘুরতে যাওয়ার জন্য বলছে সেই অনেক। মেঘ ঝটপট রেডি হয়ে বের হয়েছে। তানভির ড্রয়িংরুমেই বসে ছিল। হালিমা খানকে বলেই মেঘকে নিয়ে বের হচ্ছে। মেঘ তানভিরের পিছু পিছু যেতে যেতে বলল, “আজ দুজনে বাইকে গেলে কিছু হবে না?” “হতেও পারে। তারজন্য ই গাড়ি নিয়ে যাব” মেঘ ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে নিরবে ভেঙচি কাটলো। মেঘ ভেবেছিল তানভির কে কথা শুনাবে তা না হয়ে উল্টো নিজেই বোকা হয়ে গেছে। তানভির মেঘকে নিয়ে সন্ধ্যার ঠিক আগে আগে একটা রেস্টুরেন্টে ঢুকলো। রেস্টুরেন্টে পা দিতেই মেঘের চক্ষু ছানাবড়া হয়ে গেছে। সম্পূর্ণ রেস্টুরেন্ট বার্থডের জন্য সুন্দর করে সাজানো । তানভির মুখে হাসি রেখে বলল, “Happy birthday Bonu” মেঘ আহ্লাদী কণ্ঠে বলল, “Thank you vaiya” মেঘ আশ্চর্য নয়নে তাকিয়ে দেখছে। কিছু ভাবার বা বলার আগেই আচমকা কেউ মেঘের দু চোখে চেপে ধরে। মেঘ সঙ্গে সঙ্গে হাত স্পর্শ করেই উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, “বন্যা” হাত ছাড়তেই মেঘ

পিছনে ঘুরে বন্যাকে জড়িয়ে ধরেছে। বন্যাও জড়িয়ে ধরে বলল, “Happy Birthday baby. ” মেঘ হেসে বলল, “Thank you baby” এবার মিনহাজ, তামিন, মিষ্টিরা সমস্বরে বলে উঠল, “Happy birthday Megh” মেঘ অবাক চোখে সবাইকে দেখছে। বার বার তাকাচ্ছে তানভিরের দিকে। তানভিরের ঠোঁটে হাসি। মেঘ কি বলবে কিছুই বুঝতে পারছে না। জীবনে প্রথমবার কেউ মেঘের জন্মদিন পালন করছে তাও আবার এত ঝাঁজ জমক ভাবে। সবাই একে একে মেঘকে গিফট দিচ্ছে। মেঘ সেসব গিফট টেবিলের উপর রেখে দৌড়ে গেল তানভিরের দিকে। কোমল দৃষ্টিতে তাকিয়ে মোলায়েম কণ্ঠে বলল, “এতকিছু করার কি দরকার ছিল।” তানভির মৃদুস্বরে বলল, “এগুলো কিছুই না। একটু অপেক্ষা কর দেখবি।” মেঘ তানভিরের দিকে অবাক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। ২-৩ মিনিট পর প্রায় ৩০ জনের মতো পথশিশু রেস্টুরেন্টের ভেতর থেকে বেড়িয়ে এসে একজোট হয়ে মেঘকে উইশ করলো। মেঘ নিজের চোখ কে কোনো মতেই বিশ্বাস করতে পারছে না। তানভির মেঘের মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, “আজ তোর জন্মদিন উপলক্ষে ওদের সবাইকে নিজের হাতে খাওয়াবি। পারবি না?” মেঘের চোখ ছলছল করছে। কিছু বলার ভাষা হারিয়ে ফেলেছে। অকস্মাৎ ফুপ্পিকে দেখে মেঘ চোখের পানি ধরে রাখতে পারে নি। ফুপ্পি, আইরিনরা সবাই আসছে। মেঘ ফুপ্পিকে জড়িয়ে ধরেই কান্না করে দিয়েছে। প্রায় ১০-১৫ মিনিট পর তানভির শক্ত কণ্ঠে বলল, “আর কতক্ষণ কাঁদবি? ” মেঘ চোখ মুছতে মুছতে তানভিরকে জিজ্ঞেস

করল, “এত আয়োজন তুমি করেছো?” তানভির বিপুল চোখে তাকিয়ে বলল, “আমার এত সামর্থ্য এখনও হয় নি বনু। এসব ভাইয়া করেছে” মেঘের হাসি মিলিয়ে গেছে। আশেপাশে চোখ বুলায়। আবিরের কোনো অস্তিত্ব না পেয়ে অন্ধকারে ছেয়ে গেছে মেঘের মুখ। উদ্বিগ্ন কণ্ঠে শুধায় “ওনি কোথায়?” “জানি না” “ওনি আসবেন না?” “বোধহয় নাহ।” মেঘ এবার তপ্ত স্বরে বলল, “কেনো?” “তুই নাকি ভাইয়ার উপর রেগে আছিস তাই। ” “তাহলে এসব করেছেন কেন?” “তুই ভাইয়ার জন্মদিন করেছিলি তাই ভাইয়াও তোর জন্মদিনের আয়োজন করেছেন।” মেঘ আশেপাশে তাকিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে বলল, “ওখানে আসতে বলো।” তানভির পকেট থেকে ফোন বের করে আবিরকে কল দিল, আসার কথা বলায় আবির শীতল কণ্ঠে বলল, “তোরা কেক কেটে ফেল, আমি আসব না।” সাউন্ড বেশি থাকায় মেঘ পাশ থেকে আবিরের কথা শুনে ফেলছে। হাত বাড়িয়ে তানভিরের থেকে ফোন নিয়ে মেঘ রাগী স্বরে বলল, “আপনি না আসা পর্যন্ত আমি কেক কাটবো না। এবার আপনি ভাবুন, আসবেন কি না!” বলেই মেঘ কল কেটে দিয়েছে। মেঘ ফোঁস করে শ্বাস ছাড়লো। বন্যা হা হয়ে মেঘকে দেখছে। যে আবির ভাইকে মেঘ বাঘের মতো ভয় পেতো আজ কি সুন্দর ভাবে ওনার উপর অধিকার দেখাচ্ছেন। মিনহাজ তামিম শুধু মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে। তানভিরের সামনের মেঘকে আলাদা ভাবে কিছু বলার সাহস নেই ওদের। মেঘ আইরিনদের সঙ্গে গল্প করছে। বন্যাকেও ওদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে। কিছুক্ষণ পর আবির

আসছে, কালো শার্ট, কালো প্যান্ট, ব্লেজার বুকের উপর সানগ্লাস ঝুলানো, আবির ঢুকতেই সবার নজর পরে আবিরের দিকে।আবিরকে দেখেই মেঘের ঠোঁটে হাসি ফুটেছে। বন্যা, মিনহাজ, তামিমও হা হয়ে তাকিয়ে আছে আবিরের দিকে। মিষ্টিরা আবিরের গেটআপ দেখে ফিদা হয়ে গেছে। আবির আসার কিছুক্ষণের মধ্যেই কেক কাটা হয়েছে। ফুপ্পির থেকে শুরু করে আবির,তানভির সহ যতজন পথশিশু ছিল সবাইকে মেঘ নিজের হাতে কেক খাইয়ে দিয়েছে। কেক কাটার পর্ব শেষ হতেই আবির পকেট থেকে একটা বক্স বের করে মেঘকে দিয়ে বলল, “Happy birthday dear sparrow. ” মেঘ “Thank you ” বলে বক্স খুলতেই বিষ্ময়কর দৃষ্টিতে আবিরের দিকে তাকায়। আবিরের নিরুদ্বেগ ভাব দেখে মেঘ একে একে সবার দিকে তাকাচ্ছে। বক্সে জ্বলজ্বল করছে ডায়মন্ডের আংটি। তা দেখে মেঘের হাত কাঁপছে। মেঘের ভাবভঙ্গি দেখে আবির থমথমে কন্ঠে বিড়বিড় করে বলল, ” আংটির দিকে এভাবে তাকিয়ে থাকিস না, তোর ফ্রেন্ডরা ভাববে জীবনে ডায়মন্ড দেখিস নি। তাড়াতাড়ি আংটিটা পড়, আমাকে আংটি পড়াতে বাধ্য করিস না। আমি আংটি পড়ালে এখানে কাহিনী হয়ে যাবে। ” মেঘ একপলক আবিরকে দেখে আস্তে করে গলা খাঁকারি দিয়ে টেবিলের উপর বক্স রেখে আংটি টা নিয়ে নিজেই নিজের অনামিকা আঙ্গুলে ঢুকালো। নিজের হাতের দিকে বিস্মিত চোখে তাকিয়ে আছে মেঘ, জীবনে প্রথমবার ডায়মন্ডের আংটি পরেছে হাতে। মেঘ খুশিতে ফুপ্পি সহ সবাইকে সেই আংটি দেখাচ্ছে। উপস্থিত

প্রত্যেকের মুখে হাসি থাকলেও মিনহাজ আর তামিম নিস্তব্ধ হয়ে আছে। দুজন দুজনের দিকে তাকাচ্ছে। কিছুই বলতে পারছে না। শুধু চোখে ইশারা দিচ্ছে। সবটা যে আবিরের পরিকল্পনা তা বুঝার ক্ষমতাও তাদের নেই। মেঘের জন্মদিনে ছোটখাটো সারপ্রাইজ দিবে এটা আগে থেকেই ভেবে রেখেছিল আবির। কিন্তু আজ মেঘের নামে পার্সেল আসার পর সেই চিন্তা মুহুর্তেই বদলে গেছে। বাসায় বসেই সব পরিকল্পনা করেছে। দুপরের পর মার্কেটে গিয়ে মেঘের জন্য ড্রেস কিনে তানভিরকে দিয়ে পাঠিয়েছে। তানভিরকে দিয়ে বন্যাকে কল দিয়ে ইনভাইট করেছে। সেই সঙ্গে বন্যাকে দায়িত্ব দিয়েছে মিনহাজদের বলার জন্য এবং অবশ্যই যেন সবাই আসে। বন্যাও তানভিরের কথামতো সবাইকে বলেছে। ফুপ্পিদের আবিরই জানিয়েছে। মিনহাজ আর তামিমকে নিজের অবস্থান বুঝানোর জন্যই আবির ইচ্ছে করে মেঘের জন্মদিনে সম্পূর্ণ রেস্টুরেন্ট বুকিং দিয়েছে, সেই সঙ্গে মেঘের জন্য নিজে পছন্দ করে ডায়মন্ডের আংটি নিয়ে আসছে। যেখানে মা*রপিট আর কথায় কিছু বুঝানো অসম্ভব হয়ে পরে সেখানে কিছু কৌশল খাটাতেই হয়।খাওয়াদাওয়া শেষে ফুপ্পিরা বিদায় নিয়ে চলে গেছেন। পথশিশুদের খাওয়া শেষে আবির নিজেই এগিয়ে দিতে গেছে এই সুযোগে মেঘ আর তার বন্ধু বান্ধবীরা মিলে আড্ডা দিচ্ছে। তানভির পাশের টেবিলে বসে ফোন চাপছে আর একটু পর পর মেঘদের দেখছে। পাশে বসাতে ওদের সব কথোপকথন ই তানভিরের কানে যাচ্ছে। তামিম দু একটা কথা বললেও মিনহাজ তেমন কথায়

বলছে না। দু একবার এদিক সেদিক তাকাতে গিয়ে তানভিরের সঙ্গে চোখাচোখি হয়েছে। তানভিরের গুরুগম্ভীর চেহারা আর ক্রোধিত আঁখি দেখেই মিনহাজ দৃষ্টি নামিয়ে নিয়েছে। তানভিরের ভয়ে কিছুই বলতে পারছে না। মিনহাজ গিফটের পাশাপাশি মেঘের জন্য একটা ব্রেসলেট এনেছিল যেটার ঠিক মাঝখানে M অক্ষর ছিল। মিনহাজ আর মেঘ দুজনের নামের প্রথম অক্ষরই M সেই সুবাদে মিনহাজ এটা এনেছে। মেঘ তেমন কিছু না ভাবলেও মিনহাজ নিজের কথায় ভাববে। কিন্তু তানভিরের ভয়ে প্রথম থেকেই মিনহাজ সিটিয়ে আছে। আবির আসার পর তো মিনহাজের স্বাভাবিক নিঃশ্বাস ই বন্ধ হয়ে গেছে। আবিরের দেয়া সুবৃহৎ সারপ্রাইজ, মেঘকে দেয়া ডায়মন্ডের আংটি, তানভিরের দেয়া গোল্ডের ব্রেসলেট, ফুপ্পিদের দেয়া দামি গিফটের ভিড়ে মিনহাজের গিফট কিছুই না। তানভির কিছুক্ষণ পর নরম স্বরে বলল, " তোমরা আর কি কি খাবে বলো, আনাচ্ছি।" মিষ্টিরা সকলেই সমস্বরে বলল, " কিছু লাগবে না ভাইয়া, অনেক ধন্যবাদ। " তানভির মৃদু হাসল, কিছুই বলল না। এই ফাঁকে বন্যাকে খানিক দেখে নিল। বন্যা আজ নেভি ব্লু রঙের একটা মোটামুটি গর্জিয়াছ গাউন পরেছে সাথে গর্জিয়াছ গোল্ডেন হিজাব, ঠোঁটে কড়া লিপস্টিক, চোখে গাঢ় কাজল। বন্যা সচরাচর সাজে না আজ বন্যার এত সাজ দেখে তানভিরের হৃদয়ে ভূমিকম্প শুরু হয়েছিল। বন্যা আসার পর থেকে তানভির একটু পর পর আড়চোখে বন্যাকেই দেখছিল। সবার সামনে সরাসরি তাকাতেও পারছিল না আবার না তাকিয়েও থাকতে পারছিল

না। তানভিরের ভূকম্প এখন অনেকটায় কমে এসেছে। তবে মস্তিষ্কের প্রতিটা নিউরন জানান দিচ্ছে, " তাহার মোহমায়ায় জর্জরিত তানভিরের অন্তরতম অঁচল। তাহার দৃষ্টি শান্ত হৃদয়ে অশান্তির তোলপাড় চালাচ্ছে।" তবুও তানভির সব কিছু উপেক্ষা করে মায়াভরা সেই গভীর কূয়োতে ঝাপিয়ে পড়তে চায়। নিজেকে সংহার করতে চায় । কিছুক্ষণ পর আবির আসছে। রেস্টুরেন্টের বিল পরিশোধ করে মেঘদের কাছে এসে মিনহাজ আর তামিমের দিকে তাকিয়ে সচেতন কণ্ঠে শুধালো, "তোমরা কি যেতে পারবে?" তামিম উপর- নিচ মাথা নেড়ে ভদ্রতার সহিত বলল, "জ্বি ভাইয়া। যেতে পারবো।" আবির এবার মেঘের পানে তাকিয়ে স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, " আড্ডা দেয়া শেষ হলে আসুন, যেতে হবে।" আবিরের আপনি সম্বোধনে বন্যা কপাল কুঁচকালো। বন্যা যতবার আবিরকে দেখেছে ততবারই মেঘকে তুই বলে সম্বোধন করতে শুনেছে। আজ হঠাৎ আপনি বলছে! বন্যা ভুল শুনলো কি না তাই ভাবছে! মেঘ বান্ধবীদের থেকে বিদায় নিয়ে উঠলো। তানভির মেঘের গিফটগুলো নিয়ে সামনে এগিয়ে গেছে। তানভিরের কিছুটা পিছনেই আবির, আবিরের থেকে একটু দূরে মেঘ, মেঘের পেছনে বন্যারা, সবশেষে তামিম আর মিনহাজ। রেস্টুরেন্টের দরজার কাছাকাছি যেতেই মেঘের গাউন থেকে বের হওয়া সুতার সঙ্গে জুতার স্টোন আঁটকে গেছে। ড্রেসে টান পরতেই মেঘের সম্পূর্ণ শরীর সামনের দিকে ঝুঁকে আসে সেই সঙ্গে মুখ দিয়ে অকস্মাৎ বেড়িয়ে আসে, "উফফফফ" শব্দটা আবিরের কানে পৌঁছানো মাত্রই, আবির

ঘুরে দীর্ঘ দুকদম এগিয়ে এসে মেঘের দু কাঁধে ধরে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করা শুরু করে, “কি হয়েছে তোর? কোথায় ব্যথা পাইছিস?” বন্যা,মিষ্টি, মিনহাজ সবাই একসঙ্গে স্তব্ধ হয়ে গেছে। মেঘের কি হয়েছে তা বুঝে উঠার আগেই আবির মেঘকে ধরে ফেলেছে। আবির নিজেও বুঝতে পারে নি মেঘের কি হয়েছে! আবিরের চিন্তিত কণ্ঠের একের পর এক প্রশ্নের প্রতিত্তোরে মেঘ ধীর কণ্ঠে বলল, ” মনে হয় জুতায় সুতা আঁটকেছে।” এরমধ্যে বন্যা এগিয়ে এসে মেঘের হাত ধরল। আবির সঙ্গে সঙ্গে হাঁটু গেড়ে বসে পরেছে। এক মুহুর্ত দেরি না করে জুতা সহ মেঘের পা আবিরের হাঁটুর উপর তুলে নিল। শরীরের ব্যালেন্স হারাতে নিলে মেঘ তাড়াতাড়ি আবিরের মাথায় হাত রাখে। পা উপরে উঠানোতে মেঘও কিছুটা সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে। মিনহাজ, তামিম, মিষ্টি বিস্ময়কর দৃষ্টিতে আবিরের দিকে তাকিয়ে আছে। আবির সুস্থির হস্তে জুতা থেকে মেঘের ড্রেসের সুতা খুলে দিচ্ছে। তানভিরের এতক্ষণে পেছন ফিরে তাকিয়েছে। সহসা উচ্চস্বরে বলল, “কি হয়েছে বনুর?” আবির বসা অবস্থাতেই বলল, “কিছু না, তুই যা।” তানভির কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে পরিস্থিতি স্বাভাবিক দেখে চলে গেছে। আবির মেঘের পা নামিয়ে, দাঁড়িয়ে অত্যন্ত নমনীয় কণ্ঠে শুধালো, “শুধু সুতায় আঁটকেছিল নাকি পায়েও ব্যথা পেয়েছিস?” মেঘ আস্তে করে বলল, “পায়ে ব্যথা পায় নি।” “সত্যি তো?” “হ্যাঁ” আবির দাঁতে দাঁত চেপে অতি ধীর কণ্ঠে বলল, ” দেখেশুনে হাঁটবি তো নাকি! আর একটু হলেই মাথায় লাগতো ” বন্যা অবাক চোখে আবিরকেই দেখছে,

আবিরের হাঁটুতে ময়লা লেগে আছে অথচ সেদিকে তার বিন্দুমাত্র মনোযোগ নেই। বন্যার সঙ্গে সঙ্গে মেঘও আশ্চর্য নয়নে আবিরকে দেখছে। এতগুলো চোখ অবাক দৃষ্টিতে আবিরকে দেখছে তা বুঝতে পেরে আবির চোখ নামিয়ে মৃদুস্বরে বলল, "হাঁটতে পারবি?" "পারবো।" মেঘ আবারও ডাকলো, "আবির ভাই" "হুমমমমমমম" "আপনার চুলগুলো এলোমেলো হয়ে গেছে। " "কোনো ব্যাপার না" মেঘের হাতের পার্টস, ফোন, আবিরের দেয়া আংটির খালি বক্স আবির নিজের হাতে নিয়ে মোলায়েম কণ্ঠে বলল, "ড্রেসটা একটু উঠিয়ে হাঁটিস।" মেঘও আবিরের কথামতো দুহাতে ড্রেসটা হালকা উঠিয়ে পা বাড়ালো। আবির সামনের দিকে থাকা সত্ত্বেও দৃষ্টি তার পেছনে। মেঘের হাঁটতে সমস্যা হচ্ছে কি না, জুতায় সুতা আটকাচ্ছে কি না তাই দেখছে। আবির উদ্বিগ্ন কণ্ঠে আবারও শুধালো, "ব্যথা পাচ্ছিস না তো?" মেঘ এপাশ ওপাশ মাথা নেড়ে বলল," নাহ।" বন্যা প্রখর নেত্রে আবিরকে পরখ করছে। তামিম মিনহাজকে উদ্দেশ্য করে বিড়বিড় করে বলল, "কিছু কি বুঝতে পারছিস? " তানভির চোখের ইশারায় প্রশ্ন করল," কি?" "মেঘের যেকোনো সমস্যায় এগিয়ে যাওয়ার কথা তোর, অথচ তুই বুঝার আগেই আরেকজন দায়িত্ব পালন করে ফেলছে।" মিনহাজ তামিমের দিকে তাকিয়ে ভ্রু গুটালো। তামিমের কথাটা তার ভালো লাগে নি তাই বুঝালো। নিচে আসতেই আবির স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, "তুই দাঁড়া এখানে, আমি বাইক টা নিয়ে আসি।" আবির যেতেই বন্যা মেঘের কাছাকাছি এসে উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, "Baby,I

am shocked.” মেঘ চোখ ঘুরিয়ে বন্যার দিকে তাকিয়েই লাজুক হাসলো। বন্যা পুনরায় বলল, “আমার কিন্তু আবির ভাইয়ার উপর সন্দেহ হচ্ছে। তোর হচ্ছে না?” মেঘ মুচকি হেসে বলল, “সন্দেহ আমি বেশকিছুদিন যাবৎ ই করছি। কিন্তু কিছু বুঝতে পারছি না। কারণ ওনার আচরণ কেমন জানি, একদম অদ্ভুত। এইযে দেখলি এত যত্ন নিচ্ছে একটু পরেই দেখা যাবে রাগে যা তা বলছে।” বন্যার উত্তেজিত চেহারায় চিন্তার ছাপ পরে গেছে। চিন্তিত কণ্ঠে বলল, “থাক, এত ভাবিস না। দোয়া করি ওনি অদ্ভুত হলেও বহুরূপী যেন না হয়!” মেঘ ভ্রু কুঁচকে বন্যার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, “বহুরূপী মানে?” ” মানে বুঝতে হবে না বেবি। আমি চাই তোর ওনার মনে তুই না থাকলেও অন্য কোনো নারীর অস্তিত্ব যেন না থাকে।” মেঘ ঠোঁট বেঁকিয়ে ভেঙচি কেটে বলল, “অন্য নারীর অস্তিত্ব থাকলেও আমি চিরতরে সেই অস্তিত্ব মুছে দিব। ওনি আমার মানে আমারই। ওনি আমার প্রথম এবং একমাত্র ভালোবাসা, ওনাকে এত সহজে ছাড়ছি না। বাস্তব জীবনে ওনাকে না পেলে ম*রে পে*ত্নী হয়ে ওনাকে মে*রে ফেলবো। তারপর ভূত আর পেত্নী মিলে সংসার করবো। তবুও ওনাকেই আমার লাগবে।” বন্যা হাসতে হাসতে বলল, ” তোদের সংসারে আমায় দাওয়াত দিবি না?” “কেন দিব না! তুই আমার একমাত্র বেস্টু বলে কথা! তোকেও মে*রে আমাদের কাছে নিয়ে যাব চিন্তা করিস না।” বন্যা মেঘের বাহুতে আস্তে করে থাপ্পড় মেরে বলল, “পাগলি একটা” মেঘ হঠাৎ ই বন্যার দিকে কেমন করে তাকালো,

বন্যা আস্তে করে বলল, “কি হয়ছে?” “আবির ভাই আমার প্রেমে পাগল হবে কবে?” “কেন?” “আমি তো অলরেডি পাগলি হয়ে গেছি, আবির ভাই পাগল হলেই পাবনা গিয়ে সংসার টা শুরু করবো।” বন্যা হাসতে হাসতে ক্লান্ত হয়ে পরেছে। মুখে হাসি রেখেই বলল, “আল্লাহ আমায় বাঁচাও। বিয়ের খবর নাই, এদিকে কোথায় সংসার করবে তা ভেবে ফেলছে।” মিনহাজ, মিষ্টিরা মেঘদের একটু পেছনে ছিল। বন্যার এত হাসি দেখে মিনহাজ বিরক্তির স্বরে বলল, ” এত হাসছিস কেন?” “ভাল্লাগছে তাই হাসছি। তোর কোনো সমস্যা? ” “হ্যাঁ আমার কানে লাগছে। ” “তাহলে কানে আঙুল দিয়ে রাখ ” মিনহাজের রাগ আরও বেড়ে গেছে। একদিকে মেঘের প্রতি আবিরের কেয়ার অন্যদিকে বন্যার হাসিতে মিনহাজ রীতিমতো রাগে কটমট করছে। এরমধ্যে আবির আর তানভির দুজনেই হাজির হলো। আবির তানভিরকে উদ্দেশ্য করে বলল, “তুই ওদের বাসা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসবি। আমি মেঘকে নিয়ে বাসায় যাচ্ছি। ” “আচ্ছা ভাইয়া। ” আবির মেঘের দিকে তাকিয়ে বলল, ” তোর পার্টস গাড়িতে রেখেছি আর ফোন আমার পকেটে লাগলে বলিস। চল এখন” মেঘ বাইক পর্যন্ত যেতেই আবির বাইক থেকে একটা হেলমেট নিয়ে প্রতিদিনের মতই মেঘকে পরিয়ে দিচ্ছে। বন্যা এসব ঘটনা দেখে অভ্যস্ত। কিন্তু মিষ্টিরা প্রথমবার দেখছে। এতদিন শুধু মেঘের মুখেই আবিরের প্রশংসা শুনে আসছে, আজ তার খানিকটা নিজের চোখেই দেখছে। মেঘ বাইকে বসার পরও আবির কয়েকবার পেছনে ঘুরে মেঘের ড্রেস ঠিক করে দিচ্ছে, যাতে

জুতা বা বাইকে কোনোভাবে না আটকায়। আবির মেঘকে নিয়ে চলে গেছে। তানভির তামিমদের উদ্দেশ্য বলল, ” তোমাদের রিক্সা ঠিক করে দিয়েছি। যাও। ” বন্যাদের দিকে তাকিয়ে স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, “তোমরা গাড়িতে বসো।” ওরা কিছু বলতে গেলে বন্যা চোখে ইশারা দিলো। সন্ধ্যার পর হয়ে গেছে এ অবস্থায় তানভির নিজেই ওদের এগিয়ে দিয়ে আসতো তারউপর আবিরও বলে গেছে। এখন মিষ্টিরা কিছু বললেই তানভিরের ধমক শুনবে তাই বন্যা ওদের আঁটকিয়েছে। মিষ্টিরা দুজনকে নামিয়ে তানভির বন্যাকে নিয়ে যাচ্ছে। কিছুদূর যাওয়ার পর তানভির একটু ভেবে প্রশ্ন করল, “ফুচকা খাবে?” “নাহ। ” “কেন? তোমার না ফুচকা প্রিয়?” “অনেক খেয়ে ফেলছি। পেটে জায়গা নেই ” তানভির হেসে বলল, “ফুচকার জন্য পেটে নয় মনে জায়গা দরকার।” তানভির রাস্তার পাশে গাড়ি সাইড করে নামলো। তানভিরের দেখাদেখি বন্যাও নেমেছে। বন্যা ঠান্ডা কণ্ঠে বলল, “আমি এখন সত্যিই ফুচকা খেতে পারবো না। ” “সমস্যা নেই, একটু হাঁটবে যখন খেতে ইচ্ছে করে খেয়ে তারপর যাব ” বন্যা মাথা নিচু করে গম্ভীর কণ্ঠে বলল, “এটা ঠিক না।” “ঠিক বেঠিক আমি কম বুঝি!” বন্যা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তানভিরের দিকে তাকিয়ে আছে। মেঘরা একেকটা ভাইবোন ঘাড়ত্যাড়ার সেরা। ওরা যা বলবে তাই করবে। বন্যা হাল ছাড়লো না। অত্যন্ত নমনীয় কণ্ঠে বলল, “রাত হয়ে যাচ্ছে। বাসায় যেতে হবে।” তানভির আড়চোখে তাকিয়ে তপ্ত স্বরে বলল, “এই মেয়ে, তুমি কি আমাকে ভয় পাচ্ছো?” “নাহ, তেমন না।

কিন্তু.. ” “তাহলে কিন্তু কিসের? তোমার বাসার মানুষ জানে তুমি কোথায় গিয়েছো। আর আমি তোমাকে এগিয়ে দিয়ে যাব সেটাও জানে তারপরও এত টেনশন কিসের তোমার?” “এমনি ” আশেপাশে মানুষের ভিড়ে তানভির হাঁটছে সঙ্গে বন্যাও হাঁটছে। কিছুটা সামনে যেতেই দুটা ছেলে তানভিরকে সালাম দিল। তানভির সালাম উত্তর দিতেই দুজনের মধ্যে একজন মুচকি হেসে শুধালো, “ভাই, ওনি কি ভাবি নাকি?” তানভির সহসা বন্যার দিকে তাকালো। বন্যা ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে আছে তানভিরের দিকে। তানভির ছেলেগুলোর দিকে তাকিয়ে জ্বিভ দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে ধমকের স্বরে বলল, ” কখন কি প্রশ্ন করতে হয় তোরা এটাও জানিস না। যা এখান থেকে।” ছেলে দুটা সরি বলে মাথা নিচু করে চলে গেছে। তানভির বন্যার দিকে না তাকিয়েই বলল, “Don’t mind, please. ” বন্যা শক্ত কণ্ঠে বলল, “আমি বাসায় যাব” “কেন?” “ভালো লাগছে না।” “ওহ” “ওহ মানে?” “তোমার যখন ভালো লাগবে তখন ফুচকা খাবে তারপর বাসায় যাবে ” বন্যা রাগে বলল, “আজব , আমি বললাম তো আমার ভালো লাগছে না। ” তানভিরও এবার রাগী স্বরে প্রশ্ন করল, “তো আমি কি করব? নদীতে ফেলে দিয়ে আসবো?” “মানে?” তানভিরের হঠাৎ আবিরের বলা কথাটা মনে পরছে। রাগ উঠলেও বন্যাকে রাগ দেখানো ঠিক হবে না। তানভির কপাল গুটিয়ে বলল, ” মন খারাপ করে বাসায় গেলে সবাই ভাববে আমরা তোমার সাথে খারাপ ব্যবহার করেছি। সত্যি ই কি তাই?” “কেউ কিছু ভাববে না। ” তানভির

মৃদুস্বরে শুধালো, ” ছেলেগুলোর কথায় মাইন্ড করছো?” “নাহ। ” “তো?” “এমনি। চলে যাব।” তানভির নিজের রাগ আর নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না। রেগে বলল, ” তোমার সময় নষ্ট করার জন্য আন্তরিকভাবে দুঃখিত। চলো তোমাকে বাসায় নামিয়ে দিয়ে আসি। আর কখনো এমন কাজ করবো না। ” তানভিরের প্রবল রাগ বুঝতে পেরে বন্যা শান্ত হয়ে গেছে। কোমল কণ্ঠে বলল, “আমি ফুচকা খেয়ে যাব।” “খেতে হবে না ফুচকা। মনের বিরুদ্ধে কোনো কাজ করতে হবে না। চলো” “আমার খেতে ইচ্ছে করছে।” তানভির তীব্র আক্রোশ কণ্ঠে ঢেলে বলল, “ঠিক আছে।খেয়ে আসো আমি গাড়িতে আছি ” বন্যা মৃদুস্বরে বলল, “আমার একা থাকতে ভয় লাগছে” তানভির এবার বিরক্ত হয়ে বন্যার দিকে তাকালো। বন্যার মায়াবী দৃষ্টি চোখে পরতেই তানভিরের অভিব্যক্তি বদলে গেল। স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, ” এখানেই বসো, আমি অর্ডার দিয়ে আসছি। ” তানভির চেয়েছিল রাতের শীতল পরিবেশে বন্যার সাথে একান্তে কিছুটা সময় কাটাবে। তানভিরের ভেতর জুড়ে সর্বদা বন্যায় ঘুরপাক খায়। বিকেল থেকে বন্যাকে দেখার, একান্তে কথা বলার তীব্র ইচ্ছে জেগেছিল তানভিরের মনে তাই ফুচকার কথা বলে নিয়ে আসছিল। ফুচকা খেয়ে কিছুক্ষণ বসে, বাসার উদ্দেশ্য রওনা দিল। বন্যার বাসার সবার জন্য আবির রেস্টুরেন্ট থেকেই খাবার পার্সেল করে দিয়েছে। তারপরও বন্যা ওর বোনের জন্য ফুচকা নিয়েছে। এদিকে আবির মেঘকে বাসার কাছে পর্যন্ত নামিয়ে দিয়েছে। মেঘ নেমে গম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন করল, “আপনার

আংটি টা দিয়ে দেই?” “কেন?” “আমার আংটি লাগবে না। আপনার জিনিস আপনার কাছেই রেখে দেন ” “কেন? আবার কি হয়ছে?” মেঘ মনে মনে আওড়াল, “দামী গিফট দিয়ে আমি কি করব। আপনিই যদি আমার না হোন।” মেঘের নিরবতা বুঝতে পেরে আবির রাগান্বিত কণ্ঠে বলল, “আংটি যদি হাত থেকে খুলিস তাহলে খবর আছে। বাসায় যা ” “খুললে কি করবেন? ” “সেটা এখন কেন বলবো, খুললে বুঝাবো” মেঘ ডানহাত দিয়ে একটানে অনামিকা আঙুল থেকে আংটি খুলে হাতের তালুতে নিতে আবিরের সামনে ধরে বলল, “এই নিন।” আবির আংটি টা হাতে নিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন করল, “তোর এই আংটির প্রয়োজন নেই?” “নাহ!” “ফেলে দিলে আপসোস থাকবে না তো?” আবির বাইকে বসে আংটি ফেলে দেয়ার জন্য হাত তোলা মাত্র মেঘ দুহাতে আবিরের হাত আঁকড়ে ধরে বলল, “প্লিজ, ফেলবেন না। আমি পড়বো আমায় দিন।” “তুই যেহেতু পড়তে চাস না থাক বাদ দে। অপছন্দের জিনিস না পড়ায় ভালো।” মেঘ আবিরের হাত আরও শক্ত করে ধরে বলল, “আমি কখন বললাম অপছন্দের জিনিস! আমার আংটি আমায় দিন।” “দুদিন পর পর খুলে ফেলার থেকে ভালো আমি এনেছি আমিই ফেলে দেয়। ” মেঘ তপ্ত স্বরে বলল, ” আর ফেলব না। ” “সত্যি তো?” “সত্যি ” আবির আংটি টা হাতে নিয়ে এক সেকেন্ড দেরি না করে মেঘের বামহাতের অনামিকা আঙুলে পরিয়ে দিয়েছে। মেঘের হৃৎস্পন্দন সঙ্গে সঙ্গে জোড়ালো হয়ে গেছে। মেঘের নিস্তব্ধ আঁখি যুগল স্তব্ধ হয়ে আছে হাতের অনামিকা আঙুলে। অকস্মাৎ

বিপুল চোখে তাকালো আবিরের দিকে। আবির নিরুদ্বেগ ভঙ্গিতে পকেট থেকে মেঘের ফোন বের করছে। ফোন মেঘের দিকে এগিয়ে দিয়ে স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, "বাসায় যাহ।" আবির চলে গেছে। কিন্তু মেঘের পা থেমে আছে। আঙুলের দিকে তাকাতেই আবির ভাইয়ের আংটি পড়ানোর দৃশ্য চোখের সামনে ভেসে উঠছে আর প্রতিবার ই গা শিউরে উঠছে। রেস্টুরেন্টে ডায়মন্ডের আংটি দেখে এক মুহুর্তের জন্য মেঘের মনে অদম্য ইচ্ছে জেগেছিল আবির ভাইয়ের হাত থেকে আংটি টা পরবে। কিন্তু ফুপ্পিরা, তানভির ভাইয়া, বন্যারা সবার সামনে নিজের ম্যাচিউরিটির প্রমাণ দিতে নিজেই আংটি পরে নিয়েছিল। অথচ মেঘের সুপ্ত ইচ্ছে কোনো না কোনোভাবে পূরণ হয়েই গেছে। এদিকে রুমে ঢুকেই মিনহাজ লম্বা হয়ে বিছানায় শুয়ে পরেছে। তামিম হাতমুখ ধৌয়ে রুমে এসে মিনহাজের এ অবস্থা দেখে প্রশ্ন করে, "কিরে তোর আবার কি হয়ছে?" "ভালো লাগছে না " "ভালো না লাগাটাই স্বাভাবিক। " মিনহাজ রাগান্বিত দৃষ্টিতে তামিমের দিকে তাকিয়ে আছে। তামিম কিছুক্ষণ নিরব থেকে আবারও বলল, "আমার সাথে রাগ দেখালে কি হবে? তুই নিজেই সব দেখে আসছিস। মেঘ যদি রাজকুমারী হয় তাহলে মেঘের আবির ভাই রাজকুমার। ওদের ব্যাপার স্যাপার ই আলাদা লেবেলের। মেঘ আমাদের সাথে সিম্পলভাবে মিশে বলে, এই না তারা আমাদের মতো সাধারণ। আজ তানভির ভাইয়া আর আবির ভাইয়া ইন্ডাইরেক্টলি তাদের অবস্থান বুঝিয়ে দিয়েছেন। সম্পূর্ণ রেস্টুরেন্ট বুকিং করে, আনলিমিটেড খাবার, ডায়মন্ড, গোল্ডের

গিফটের ভিড়ে তোর আমার অবস্থান ঠিক কোথায় বুঝতে পারছিস?” মিনহাজ চোখ নামিয়ে ধীর কণ্ঠে বলল, “আমি মেঘকে পছন্দ করি।” “তুই পছন্দ করিস কিন্তু আমার মনে হয়ছে আবির ভাইয়া মেঘকে ভালোবাসে। মেঘের প্রতি ওনার কনসার্ন দেখছিস? মেঘ উফ করতে দেরি হয়ছে কিন্তু ওনার একশান নিতে দেরি হয় নি। তাছাড়া খাওয়ার সময় দেখছিলি? মেঘকে নিজের হাতে খাবার পরিবেশন করে দিচ্ছিলো। তাছাড়া মেঘ চাওয়ার আগেই সব হাজির। ওদের সাথে আমরা নিজেদের ভাবতেই পারবো না। বন্যা মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে হয়েই আমায় রিজেক্ট করতে একবার ভাবে নি। আর তুই মেঘকে নিয়ে ভাবছিস! তোর কপালে শনি আছে। ” “শনি থাকলেও আমি এর শেষ দেখে ছাড়বো।” “শা*লা নিজেও ম*রবি আমাকেও মা*রবি। ” আজ মেঘ ভার্সিটিতে আসার পর থেকে মিষ্টিরা মেঘকে রাগাচ্ছে। মিষ্টি আবির ভাইয়ের লুক আর ব্যবহারের উপর ক্রাশ খাইছে একথা বলামাত্র মেঘ তেলে বেগুনে জ্বলে উঠেছে। মিনহাজ ও সেই সঙ্গে বলছে, “মিষ্টি তোর পছন্দ হলে প্রেম করতে পারিস।” মেঘ রাগে গজগজ করতে করতে বলল, ” তোর মা*থাটা আগে ফা*টিয়ে তারপর মিষ্টির মা*থা ফা*টাবো বলে দিলাম।” মিনহাজ হেসে বলল, “বললেই হলো, তুই বারণ করার কে? মিষ্টি তুই এগিয়ে যা আমি তোর পাশে আছি।” মেঘ মিষ্টির হাত থেকে মিষ্টির সানগ্লাস টা একটানে নিয়ে নিজের চোখে দিয়ে গলা খাঁকারি দিয়ে ভাব নিয়ে বলল, “আমি কিন্তু আবির ভাইয়ের হবু বউ” “মানে?” “আবির ভাই আমায় আংটি পরিয়ে

দিয়েছেন। তাহলে আমি কি ওনার হবু বউ হবো না?" মিনহাজ কপাল কুঁচকে তাকিয়ে আছে। তামিম হাসতে হাসতে বলল, "নিশ্চিত রাতে স্বপ্ন দেখছিস। কাল আমাদের সামনে নিজের হাতে নিজে আংটি পরলি এখন আসছিস ভাব নিতে?" মেঘ ঠান্ডা কণ্ঠে বলল, "ভাব কেন নিবো। ওনি বাসার সামনে গিয়ে আংটি নিজের হাতে পরিয়ে দিয়েছেন। " ওরা কেউ ই বিশ্বাস করছে না। বন্যা মেঘের ভাব ভঙ্গি দেখে আস্তে করে বলল, "সত্যি পরাইছেন?" মেঘ উচ্চস্বরে চেঁচিয়ে বলে, "১০০% সত্যি। " মিনহাজ বিরক্তির স্বরে বলল, "কোন হাতে পড়াইছেন?" মেঘ স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, "বাম হাতে" মিনহাজ মাথা নিচু করে মাটির দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে হঠাৎ হাসতে হাসতে বলল, "বাম হাতে আংটি পড়ালে বিয়ে হয় না" মেঘ ভেঙছি কেটে বলল, "আমায় এত কিছু বুঝাতে হবে না। বিয়ে হয়ছে মানে হয়ছে। তোদের মানতে হবে না। আমি মানলেই হলো।" তামিম বিড়বিড় করে বলল, "তোর মাথা পুরা গেছে।" মেঘদের দিনকাল ভালোই যাচ্ছে। কিন্তু আবিরের ক্রোধ কোনোমতেই কমছে না। আশেপাশে সব খোঁজ নিয়েছে। মেঘকে পার্সেলটা কে দিয়েছিল তার কোনো খবর পাচ্ছে না। শুক্রবার সন্ধ্যার পর আবির ছাদের সোফায় হেলান দিয়ে বসে ছিল। তানভির আবিরকে সারা বাড়ি খুঁজে অবশেষে ছাদে আসছে। আবিরের রাগান্বিত মুখবিবর দেখে মোলায়েম কণ্ঠে শুধালো, "কি হয়ছে ভাইয়া? আজ আড্ডা দিতে যাও নি?" "না। ভালো লাগছে না।" "কেন ভাইয়া?" আবির ভারী কণ্ঠে বলল, "ও রে পার্সেল টা কে পাঠাইছে এখনও জানতে পারলাম

না। তোর বোনকে যতবার জিজ্ঞেস করি ও কেমন যেন উল্টা পাল্টা উত্তর দেয়। ভালো লাগছে না আমার।” তানভির একপা একপা করে পেছাতে লাগলো, তানভিরের ভাব দেখে আবির থমথমে কণ্ঠে প্রশ্ন করে, “তোর আবার কি হয়ছে?” তানভির আবিরের থেকে ৮-১০ হাত দূরে গিয়ে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, “আসলে পার্সেল টা আমিই পাঠাইছিলাম।” “কি?” বলে আবির দাঁড়াতেই তানভির দৌড়াতে শুরু করে। তানভিরের পেছনে আবিরও ছুটছে। তানভির দৌড়াতে দৌড়াতে নিচে আসছে, এদিকে সোফায় বাড়ির মহিলারা সহ মেঘ, মীম, আদি বসে ছিল। তানভিরকে দৌড়ে নামতে দেখে সবাই আতঙ্কিত হয়ে গেছে। তানভিরের পেছনে আবিরকে দেখে সহসা বসা থেকে দাঁড়িয়ে পরেছে। তানভির সোজা মেইন গেইট পর্যন্ত চলে গেছে, দরজা খুলার চেষ্টা করছে যেন বাসা থেকে বেরিয়ে যেতে পারে। কিন্তু দরজা খুলার আগেই আবির চলে আসছে। আবির তানভিরের পিঠে ২-৩ থা*প্পড় মেরেছে। তানভির সঙ্গে সঙ্গে বসে পরেছে। যতটা ব্যথা পেয়েছে তার থেকেও বেশি চিৎকার করছে, “আল্লাহ আমি শেষ” হালিমা খান, মালিহা খান দুজনেই ছুটে এসে উত্তেজিত কণ্ঠে শুধান, “এই কি হয়ছে তোদের? তানভিরকে মার*তেছিস কেন?” মেঘ মীমরাও ছুটে আসছে। মেঘ গম্ভীর কণ্ঠে বলল, “ভাইয়াকে এভাবে মারছেন কেন? ব্যথা পাচ্ছে না?” আবির ঠাট্টার স্বরে বলল, “আহাগো! আসছে তাহার দরদী বোন। তোর ভাই যে অপরাধ করছে তারজন্য ওরে সারাদিন পেটানো দরকার। ” “কি করছে?” “তোদের বলা যাবে না। ” হালিমা খান

করুণ কণ্ঠে বললেন, “তানভির কি করছে? খুব বড় অপরাধ করে ফেলছে?” মামনির করুণ স্বর শুনে আবির তানভিরকে ছেড়ে দিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে বলল, ” তোমাদের কাছে কিছুই না কিন্তু আমার কাছে অনেক কিছু। ” হালিমা খান তানভিরকে উদ্দেশ্য করে বললেন, “কিরে? কি করছিস তুই?” তানভির দাঁড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে বলল, “তেমন কিছুই না, ভাইয়ার কলিজার হাত দিছিলাম” বলেই তানভির রুমের দিকে ছুটে গেছে। আবির নিচে দাঁড়িয়ে রাগান্বিত কণ্ঠে বলল, ” রুম থেকে বের হইস শুধু, তোর খবর আছে। ” মালিহা খান সচেতন কণ্ঠে বললেন, “আবির কি হচ্ছে এসব ?” “কিছু না।” “তানভিরের পেছনে লাগছিস কেন?” আবির ভারী কণ্ঠে বলল, “আমি ওর পেছনে লাগি নাই আম্মু। ও আমার পেছনে লাগছে। আর আমাদের দুই ভাইয়ের মধ্যে তোমরা ঢুইকো না প্লিজ।” “ঠিক আছে ঢুকলাম না। তোদের যা মন চাই কর।” “ধন্যবাদ। ” আবির নিজের রুমে চলে গেছে। তানভির কিছুক্ষণ পর রুম থেকে বের হয়েছে। বেলকনিতে মেঘকে পেয়ে ধীর কণ্ঠে শুধালো, “ভাইয়া কোথায় রে?” “রুমে। কেন?” “একটু দেখা করে আসি।” “ভাইয়া, তুমি যাইয়ো না। আবির ভাই তোমাকে মা*রবে।” “আরে না। কিছু করবে না। ” মেঘ বিড়বিড় করে বলল, “যাও, মা-ইর খাওয়ার শখ লাগছে যখন খেয়ে আসো।” তানভির হেসে চলে গেছে । আবির দরজা থেকে গলা পর্যন্ত ঢুকিয়ে ডাকল, “ভাইয়া....!” আবির বই পড়তেছে। তানভির আবারও ডাকলো, “ও ভাইয়া...!” “কি

হয়ছে?” “আসবো?” “কেন?” “একটু আসি” “আয়।” তানভির দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, ” আমার সাথে রাগ করার মতো আমি কিছু করি নি।” আবির গুরুতর কণ্ঠে বলল, ” পার্সেলের টেনশনে আমার মাথা পুরা নষ্ট হয়ে গেছে। ১০-১২ দিন ধরে তন্নতন্ন করে মানুষটাকে খোঁজছি আর তুই রিলাক্সে বসে আছিস ” “তুমি আমায় বলতা” “জানিস তো, আমার কাউকে দুশ্চিন্তায় ফেলতে ভালো লাগে না!” “আচ্ছা সরি। আমি ভাবছি তুমি পার্সেলের বিষয় ভুলে গেছো।” “তোর বোনকে ঘিরে সামান্যতম বিষয়ও আমি ভুলতে পারি না।” “এত যত্ন, এত ভালোবাসা থাকা স্বত্তেও রাগ দেখাও কেন? দিনের পর দিন দু’জনে গাল ফুলিয়ে রাখো কেন?আর ঐদিন পার্সেল পাঠাইছিলাম বলেই তো বনুতে এত সুন্দর সারপ্রাইজ দিয়েছো। ” আবির হঠাৎ ই সিক্ত আঁখিতে তাকিয়ে বলল, ” হ্যাঁ। কিন্তু আমার খুব ভয় হয়। ও কে হারানোর ভয় সর্বক্ষণ আমার মনে ঘুরপাক খায়। কি করি না করি নিজেই বুঝি না। ” তানভির শান্ত স্বরে বলল, “টেনশন করো না। ইনশাআল্লাহ সবকিছু ঠিক থাকবে।” মেঘ দরজায় দাঁড়িয়ে মৃদু হেসে বলল, “আসব?” তানভির আবিরের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে বলল, ” আমার বোন এখন এই রুমে আসতে অনুমতি নিচ্ছে, অথচ কয়দিন পরে তোমাকেই রুম থেকে বের করে দিবে। ভাবতেই ভাল্লাগছে।” এতক্ষণে আবিরের মুখে হাসি ফুটলো। ঠোঁটে হাসি রেখেই মেঘকে বলল, “আসেন।” মেঘ রুমে ঢুকে ভ্রু কুঁচকে শুধালো, “আপনাদের দুই ভাইয়ের মান-অভিমান ভাঙছে?” তানভির উত্তেজিত

কণ্ঠে বলল, “আমরা দুই ভাই কখনো অভিমান করিই না। ” মেঘ কপাল গুটিয়ে রাগী স্বরে বলল, “খুঁটা দিলা?” তানভির থমথমে কণ্ঠে বলল, “ছিঃ আমার বোনকে আমি খুঁটা দিতে পারি?” মেঘ শীতল কণ্ঠে জানালো, “আমি কিন্তু যার তার সাথে অভিমান করি না। যে আমার সাথে উল্টাপাল্টা আচরণ করে তার সাথেই অভিমান করি।” তানভির হেসে বলল, ” তোর অভিমান নিয়ে আমি কিছু বলি না আর বলবোও না। তোর ইচ্ছে হলে ২৪ ঘন্টা অভিমান করে বসে থাকবি। আর মানুষ তোর অভিমান ভাঙাবে। ” আবির গম্ভীর মুখ করে তানভির কে উদ্দেশ্য করে বলল, “আজ অভিমান করতে পারি না বলে কারো কাছে পাত্তা পায় না। ” তানভির রাশভারি কণ্ঠে বলল, “হইছে তোমার আর অভিমান করতে হবে না। একেকজনের ঢং দেখলে বাঁচি না।” দুদিন পর আবির মেঘকে পার্সেলটা দিয়েছে। পার্সেল দেয়ায় মেঘ সরু নেত্রে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, “পার্সেল দিয়ে দিচ্ছেন যে! কে পাঠাইছে? ” “তা জেনে তোর কাজ কি? নিলে নে না নিলে নাই” মেঘ পার্সেল নিয়ে রুমে চলে গেছে। পার্সেলে বই, চকলেট, ছোট ছোট গিফটে বরা একটা বক্স ছিল। এক সপ্তাহ কেটে গেছে। আজ মেঘের মন টা খারাপ, ক্লাসে আসতে একটু দেরি হয়ে গেছে তাই বন্যার সাথে বসতেও পারে নি। একা একা মন খারাপ করে ক্লাস শেষ করে বেড়িয়ে আসছে। সেমিনারে বন্যা আর মিষ্টির সঙ্গে হাঁটছিল আচমকা মিনহাজ পেছন থেকে মেঘের মাথায় গাট্টা দিয়ে বলল, “এই পঁচা মেয়ে ” মেঘ মাথায় হাত বুলিয়ে পেছনে তাকাতেই মিনহাজ প্রখর তপ্ত

স্বরে বলল, “তুই আমায় ব্লক দিছিস কেন?” মেঘের এমনিতেই মেজাজ খারাপ তারউপর মিনহাজের উল্টাপাল্টা কথা শুনে মেঘের মেজাজ আরও বেশি খারাপ হচ্ছে। মেঘ অদম্য কণ্ঠে বলল, ” আমি তোকে ব্লক দিব কেন? আর কোথা থেকেই বা দিব?” “তুই আমাকে ফে*সবুকে ব্লক দিছিস ” “দূর, আমি ব্লক দেয় নি। জ্বালাস না আমায়। এমনিতেই মন ভালো না” “তুই ব্লক দিছিস। বিশ্বাস না করলে চেক কর।” “ইশশশ আমি গত দুইদিন যাবৎ ফেসবুকে ঢুকি না। তোকে ব্লক দিব কিভাবে?” “আমি গতকাল রাতে তোকে মেসেজ দিছি তার কিছুক্ষণ পর দেখি তুই আমায় ব্লক মারছিস।” “বাজে কথা বলিস না মিনহাজ। ” “তুই তোর ফোন বের কর, ব্লকলিস্ট চেক কর তাহলেই হবে।” মেঘ ফোন বের করে বন্যাকে দিয়ে সাইডে চলে গেছে। মন খারাপ থাকলে কারো সাথে কথা বলতেই ইচ্ছে করে না সেখানে হাঙ্গামা করা তো দূরের বিষয়। বন্যা ফে*সবুকে ঢুকেই মেঘের ব্লকলিস্টে ঢুকলো। ব্লকলিস্টের প্রথম আইডিটায় মিনহাজের। বন্যা উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলল, “মেঘ, সত্যি সত্যি মিনহাজকে ব্লক দেয়া। ” মেঘ বিরক্তির স্বরে বলল, “আমি কাল ফে*সবুকে ঢুকিই নাই” বন্যা এবার শান্ত স্বরে প্রশ্ন করল, “মিনহাজ, কি হয়ছিল পুরো ঘটনা বল” মিনহাজ বলা শুরু করল, ” মেঘকে মাঝে মাঝেই আমি মেসেজ দেয়। ওর মন চাইলে রিপ্লাই করে না মন চাইলে করে না। দুদিন ভার্সিটি বন্ধ ছিল। ভাবলাম একটু স্মরণ করি। গত পরশু দিন মেসেজ দিছি নেটে আসে নি। গতকাল মজার ছলে মেসেজ দিছিলাম, “Baby, I

miss you” তারপর নেট থেকে বেরিয়ে খেতে গেছি। খেয়ে এসে নেটে ঢুকতেই দেখি মেঘের আইডি থেকে ব্লক দেয়া। ” মেঘ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে জানাল, “আমি নেটে ঢুকিও নি আর এমন কোনো মেসেজ দেখিও নি” বন্যা একটু ভেবে প্রশ্ন করল, “তোর আইডির পাসওয়ার্ড কেউ জানে?” “না তো। কে জানবে?” “তোর আইডি কে খুলে দিছিল?” মেঘ সহসা বলল, “ভাইয়া” “পাসওয়ার্ড পাল্টাইছিলি পরে?” “নাহ” “তাহলে তানভির ভাই..” মেঘ আচমকা চটপটে স্বরে বলল, “না না! ভাইয়া না, আবির ভাই আইডি খুলে দিছিলো।” বন্যা, মিষ্টি, মিনহাজ সবাই নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। মিষ্টি একটু পর মৃদু হেসে বলল, “মেঘরে তুই শেষ! মিনহাজকে ৩০ মিনিটের মধ্যে ব্লক দিয়ে দিছে মানে তোর আবির ভাই সর্বক্ষণ তোকে চোখে চোখে রাখছে। যাহ তুই সাকসেস! সাথে তোর ভালোবাসাও।”মিষ্টির কথা শুনে মেঘের চোখের তারাগুলো ঝলমল করছে। চোখের সামনে আবিরের হাস্যোজ্জল চেহারা ভেসে উঠেছে। ওমনি মেঘ চোখ বন্ধ করে ফেলেছে। চোখ বন্ধ করা মাত্র আবিরের ধারালো ছু*রির ন্যায় দৃষ্টি চোখে লাগল। বক্ষপিঞ্জরে আবদ্ধ হৃদপিণ্ডটা ছুটে পালাতে চাচ্ছে, সহসা অনুভব হলো উষ্ণ হাওয়া মেঘের কানের লতি ছুঁয়ে গেছে। মেঘের লুকানো অনুভূতিগুলো আজ আকাশে ডানা মেলে উড়তে চাচ্ছে, আনন্দ সাথে লজ্জায় মেঘের চোখ-মুখ লাল হয়ে গেছে। বন্যা সুনিপুণ নজরে খেয়াল করল তা, বন্যার ঠোঁটে সহসা হাসি ফুটলো। হাসিমুখে মেঘকে উদ্দেশ্য করে বলল, ” কেউ আবির ভাইয়াকে খবর দে, বান্ধবী আমার

নববধূর মতো লজ্জায় নুইয়ে পড়ছে। আবির ভাইয়া না আসলে বোধহয় চোখ তুলে তাকাবেই না।” বন্যার কথায় মেঘের হুঁশ ফিরে। স্পষ্ট চোখে তাকায় বন্যার দিকে। বন্যার হাস্যোজ্জল মুখ দেখে মেঘ এগিয়ে এসে বন্যাকে জড়িয়ে ধরে লজ্জায় ওড়না দিয়ে মুখ লুকালো। বন্যা ক্ষীণ স্বরে বলল, “বেবি! থাক এত লজ্জা পাইতে হবে না। আমরা তো আর আবির ভাইয়া নয়!” মিষ্টি বলল, ” মেঘ তুই ওনাকে পেলে সত্যি ই অনেক ভালো থাকবি । আমি মাত্র কয়েক ঘন্টা ওনার দায়িত্বশীলতা আর যত্ন দেখেই ক্রাশ খেয়ে ফেলছি সেখানে তুই তো নিজে সর্বক্ষণ সবকিছু অনুভব করিস।” মিনহাজ শক্ত গলায় বলে উঠল, “তোদের আহ্লাদ দেখে বাঁচি না। এই বন্যা মেঘের ফোনটা দে, আমার আইডি আনব্লক করি।” মেঘ সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বন্যার থেকে নিজের ফোন নিয়ে ব্যাগে রাখতে রাখতে স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, ” কোনো প্রয়োজন নেই। তুই ব্লকলিস্টেই থাক।” “কেনো?” “আবির ভাই নিজের হাতে ব্লক দিছেন, আমার পক্ষে আনব্লক করা দুরূহ বিষয়। তাছাড়া আমাকে বেবি বলতে বারণ করা স্বত্তেও তুই বেবি ডাকছিস। আমি কিছুই করতে পারবো না। ” ” এত পাথর মন কেন তোর? আনব্লক করে দে। আর বলব না। ” “সম্ভব না। আমি বাসায় যাব। টা টা। ” মেঘ খুশিতে গদগদ হয়ে সবাইরে রেখে চলে গেছে । গাড়িতে বসে ভাবছে, “আবির ভাই কি সত্যিই আমায় পছন্দ করেন? নাকি আমি একটু বেশিই ভাবছি!” মেঘ বাসায় এসে হাতমুখ ধৌয়ে নিচে আসছে। মালিহা খান সোফায় বসে কি যেন পড়তেছিলেন।

মেঘকে ঘুরঘুর করতে দেখে ডাকলেন, “মেঘ, এদিয়ে আয়” বড় আম্মুর ডাক শুনে মেঘ সোফায় এসে বসতেই মালিহা খান মৃদু স্বরে বললেন, “খাবি কিছু?” “না খিদে নেই।” “তাহলে ঘুরতেছিস যে” “আম্মুরা কোথায়?” “তোর আম্মু, কাকিয়ারা শপিং এ গেছে।” মেঘ ফোঁস করে শ্বাস ছেড়ে বলল, ” আমায় নিয়ে গেল না কেন?” ” তুই যেতিস নাকি?” “হ্যাঁ” “আজকে আর কিভাবে যাবি। তুই বরং অন্যদিন যাস। আমি খেতে দিচ্ছি তুই ঠান্ডা মাথায় খেয়ে নে।” মেঘ স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, ” তোমার খেতে দিতে হবে না। আমি একায় খেতে পারবো। ” মেঘ মন খারাপ করে রান্না ঘরে চলে গেছে। রাস্তায় আসতে আসতে মেঘ ভাবছিল শপিং এ গিয়ে আবিরের জন্য নিজে পছন্দ করে পাঞ্জাবি কিনে নিয়ে আসবে কিন্তু আম্মুরা মেঘকে না বলেই চলে গেছে। মেঘ খাবার খেয়ে রুমে এসে শুয়ে আছে। মাথায় শুধু আবির ভাই ঘুরছে। শুয়ে বসে কোনোভাবেই ভালো লাগছে না। কয়েকবার ফোনে আবিরের নাম্বার বের করেছে কিন্তু কল দেয়ার সাহস পাচ্ছে না। কোনোভাবেই যখন ঘুম আসছিল না তখন মেঘ উঠে চুপিচুপি আবিরের রুমে চলে গেছে। রুম জুড়ে মাতাল করা এক সুগন্ধ যা মেঘের মস্তিষ্কের নিউরনে অনুরণন তুলছে। চারপাশে তাকাতে গিয়ে হঠাৎ নজর পরে আবিরের স্কাই ব্লু রঙের এক শার্টের দিকে। মেঘ নিঃশব্দে হেসে এগিয়ে গেল শার্টের কাছে। শার্ট টা কাছে আনতেই আবিরের গায়ের গন্ধ স্পষ্ট নাকে লাগলো। আবেশে মেঘের চোখ বন্ধ হয়ে আসছে। প্রিয় মানুষের স্পর্শ যেমন দেহ আর মন উভয়কে

আন্দোলিত করে তেমনি প্রিয় মানুষের গায়ের গন্ধেও তীব্র আকর্ষণ কাজ করে। মেঘ কিছুক্ষণ শার্টটাকে জড়িয়ে ধরে অকস্মাৎ জামার উপরে শার্ট টা পড়ে নিল। আবিরের শার্ট মেঘের গায়ে অনেকরা পাঞ্জাবির মতো লাগছে, যেমন মোটা তেমনি লম্বা। মেঘ ড্রেসিং টেবিলের সামনে গিয়ে চোখ তুলে তাকাতেই লজ্জায় দুহাত দিয়ে মুখ ঢেকে ফেলেছে। খানিক বাদে দু আঙুল ফাঁক করে এক চোখে তাকিয়ে নিজেকে দেখতে লাগলো। খুশিতে দুহাত মেলে রুমে ঘুরতে লাগলো, ঘুরতে ঘুরতে ধপ করে বিছানায় এসে বসে পরেছে। দুহাতে শার্টের কলার ঠিক করে হাতা টেনে বিছানায় শুয়ে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে চোখ বন্ধ করল। চোখে ভাসছে গত ৯ মাসে আবিরের সঙ্গে কাটানো একের পর এক অপরূপ মুহুর্ত। এসব ভাবতে ভাবতে কখন যে ঘুমিয়ে পরেছে মেঘ নিজেও জানে না। আবির বিকেলের দিকে বাসায় আসছে। রুমে ঢুকতেই থমকে দাঁড়ালো, নিজের বিছানায় মেঘকে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালো। আশেপাশে তাকিয়ে সম্পূর্ণ রুম ভালোভাবে নিরীক্ষণ করল। ব্যাগ টা রেখে কয়েক মুহুর্ত প্রখর নেত্রে রইলো প্রেয়সীর অভিমুখে। ঘুমের মধ্যেও মেঘের ঠোঁটের কোণে হাসি লেগেই আছে। মেঘের পরনে নিজের শার্ট দেখে মুচকি হাসলো । আবিরের নিষ্পলক দৃষ্টি আঁটকে আছে মেঘের ঘুমন্ত চেহারায়। আনমনে অনেককিছু ভেবে নিয়েছে। মেঘকে ডাকার জন্য একবার এগিয়ে গেল কিন্তু মেঘের গভীর ঘুম দেখে ডাকতে ইচ্ছে করে নি। তাই শাওয়ার নিতে ওয়াশরুমে চলে গেছে। শাওয়ার নিয়ে বেরিয়েও দেখল মেঘ

ঘুমে নিমগ্ন হয়ে আছে। কি করবে কিছুই বুঝতে পারছে না। মনের ভেতর অস্থিরতা, মস্তিষ্কে বিচরণ করছে নানান রঙবেরঙের নিষিদ্ধ প্রেমানুভূতি। ইচ্ছে করছে প্রেয়সীর চাঁদের ন্যায় মুখবিবরে ভালোবাসার পরশ একেঁ দিতে কিন্তু কিভাবে সম্ভব! আবিরের প্রেয়সী যে এখনও অবুঝ। আবির ঠোঁটে হাসি রেখে মেঘের দিকে ঝুঁকে এসে চুল ঝাড়তেই, পানির ছিটা মেঘের চোখেমুখে পরে। মেঘ ঘুমের মধ্যেই ভ্রু কুঁচকালো কিন্তু সজাগ হওয়ার কোনো নাম ই নিল না। আবির রুম থেকে বেরিয়ে বেলকনিতে গেল, বাসার পরিস্থিতি বুঝার চেষ্টা করলো। মীমরা এখনও ফিরে নি, মালিহা খান নিজের রুমে। আবির আবারও রুমে আসছে। মেঘের দিকে ভালোভাবে তাকাতে পারছে না আবার না তাকিয়েও থাকতে পারছে না। অন্যদিকে বাসার মানুষের চিন্তা তো আছেই। হুট করে কেউ চলে আসলে আর মেঘ কে এ ভাবে আবিরের রুমে দেখলে কি হবে তাই ভেবে পাচ্ছে না। বাধ্য হয়ে শেষ পর্যন্ত মেঘের মাথার কাছে বসে, মেঘের চুলে আলতোভাবে হাত বুলিয়ে মোলায়েম কণ্ঠে ডাকলো, “মেঘ” মেঘ ঘুমে বিভোর হয়ে আছে। আবির পুনরায় ডাকলো, “মেঘ” মেঘ ঘুমের মধ্যেই বলবো, “ওমমমমম” “উঠ” মেঘ এবার ঠাস করে চোখ মেলল। আবিরের চোখে চোখ পরতেই আশেপাশে চোখ ঘুরালো। এটা আবিরের রুম বুঝতে পেরেই তাড়াহুড়ো করে উঠে বসলো। আবির ভাইয়ের বিছানায় ঘুমিয়ে পরেছিল ভেবেই লজ্জায় মেঘ চোখ তুলে তাকাতে পারছে না। মেঘের আকাশচুম্বী লজ্জা দেখে আবির থমথমে কণ্ঠে বিড়বিড় করল, ” রাগ

উঠতে এই লজ্জা কোথায় হারায় যায়? " মেঘ উঠে চলে যেতে নিলে আবির মেঘের বাহু চেপে ধরে। সদ্য ঘুম ভাঙায় মেঘ কথাও বলতে পারছে না। আবির দাঁড়িয়ে মেঘের কাছে এগিয়ে এসে শুধালো, "এসবের মানে কি?" মেঘ আবিরের দৃষ্টি খেয়াল করে নিচে তাকাতেই রীতিমতো কেঁপে উঠলো। পরনে আবিরের শার্ট দেখে মেঘের শরীর ঘামতে শুরু করেছে। ভয় আর লজ্জায় মেঘ আড়ষ্ট হয়ে যাচ্ছে। চিবুক নামিয়েছে গলায়। কিছু বলার ভাষা নেই। মেঘের অস্বাভাবিকতা বুঝতে পেরে আবির মেঘকে ছেড়ে দিয়েছে। মেঘ সঙ্গে সঙ্গে দরজার দিকে ছুটলো। বেলকনিতে গিয়ে শার্ট খুলে পুনরায় আবিরের রুমের দরজা পর্যন্ত এসে শার্ট বিছানার দিকে ছুঁড়ে ফেলে নিজের রুমে চলে গেছে। আবির ঠোঁটে হাসি রেখে দরজার দিকে তাকিয়ে রইলো। কিছুক্ষণ পরেই মীমরা শপিং করে বাসায় আসছে। এসেই মেঘকে ডাক শুরু করলো। মেঘের জন্য জুতা, থ্রিপিস আরও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস নিয়ে আসছে। মেঘ শপিং খুলে দেখছে। একটা শপিং দেখিয়ে বলল, "ঐটাতে কি আছে আম্মু? " হালিমা খান শপিং ব্যাগটা মেঘের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, " আবির আর তানভিরের জন্য শার্ট আছে এটাতে! " মেঘ গম্ভীর গলায় বলে, "পাঞ্জাবি আনো নি?" "পাঞ্জাবি তেমন ভালো লাগে নাই তাই আনি নি। " "ওহ।" হালিমা খান আদিকে পাঠালেন আবিরকে ডাকার জন্য। আবির নিচে আসতেই মেঘ লজ্জায় মীমের পেছনে গিয়ে লুকিয়ে পরেছে। আকলিমা খান আবিরকে ২ টা শার্ট দিয়ে বলল, "দেখো পছন্দ হয় কি না!" আবির দাঁত বের

করে হাসলো। তারপর স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, “তোমাদের পছন্দ কে আমি কখনো খারাপ বলছি?” “তা বলো নি। কিন্তু খুব ভালো লাগছে সেটাও কখনো বলো না। তুমি এত বছর বাহিরে ছিলে, তোমার পছন্দ অপছন্দ সম্পর্কে তেমন ধারণা নেই। তাই একটু চিন্তায় থাকি। ” আবির হেসে বলল, “তোমরা মাঝে মাঝে এমনভাবে কথা বলো যেন আমি ভিনগ্রহে ছিলাম। নতুন নতুন পৃথিবীতে পা রাখছি। ” আবিরের কথা শুনে সবাই একসঙ্গে হেসে উঠলো। আবির নিরব দর্শকের মতো সব দেখল। আর মেঘ মীমের আড়াল থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে আবিরকে দেখছে । আবির যতক্ষণ নিচে ছিল, মেঘ সামনেই আসে নি। আবির নিজের শার্ট নিয়ে চলে যেতেই মেঘ আবারও সোফায় বসে শুধালো, “আম্মু তোমরা আবার শপিং এ যাবে কবে?” “জানি না। কেন মা?” “আমিও শপিং এ যেতাম।” “তোর ড্রেস পছন্দ হয় নি?” “হয়ছে। আমার অন্য কাজ আছে। কবে যাবে বলো।” “আমরা আবার যেতে যেতে ঈদের সময় যাবো। তখন গেলে হবে?” “না আমার ইমার্জেন্সি যেতে হবে। ” “তাহলে তানভির না হয় আবিরের সঙ্গে চলে যাস। ” আবির এরমধ্যে রুমে শার্ট দুটা রেখে নিচে নামতে নামতে গম্ভীর কণ্ঠে শুধালো, “কোথায় যেতে বলছে?’ “ওর নাকি কি শপিং করতে হবে। তাই বলছিলাম তুই না হয় তানভির নিয়ে যাস। ” “এখন যাবি? ” মেঘ এপাশ ওপাশ মাথা নেড়ে না করল। মেঘ মনে মনে বিড়বিড় করে বলল, “ওনাদের নিয়ে শপিং এ যাওয়ার চেয়ে না যাওয়ায় ভালো।” আবির স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, “আমি বাহিরে যাচ্ছি ফিরতে

দেরি হতে পারে। ” বলে আবির চলে গেছে। মেঘ রুমে যেতেই দেখল ফোনে মিনহাজ একের পর এক কল দিচ্ছে। মেঘ ফোন রিসিভ করতেই মিনহাজ বলল, “তুই কি আমায় আনব্লক করবি না মেঘ?” “আমি পারব না।সেটা তোকে আগেই বলেছি। আর এতবার কল দিলে ফোন নাম্বারও ব্লক করে দিব বলে দিলাম।” “থ্রেট দিচ্ছিস মেঘ?” “মনে কর দিচ্ছি। ” “ঠিক আছে, ভালো থাকিস। রাখছি। ” বাসায় ভালো লাগছিল না বলে আবির আজ রাসেল, রাকিব আর লিমনের সাথে দেখা করতে আসছে। ওরা তিনজনই সিগারেট খাচ্ছিলো। আবির আসতেই লিমন একটা সিগারেট আবিরের দিকে এগিয়ে দিল। আবির শক্ত কণ্ঠে বলল, “আমি সিগারেট খায় না।” রাসেল ফিক করে হেসে বলল, ” মজা করছিস নাকি?” “মজা করার কি হলো?” লিমন সিগারেট টা আরও এগিয়ে বলল, “আমাদের সাথে ফরমালিটি করতে হবে না। নে খা” “আমি সত্যি খাই না। ” “কবে থেকে?” “অনেকদিন হবে।” “ছাড়লি কেন?” “আমার কাদম্বিনী চাই না আমি সিগারেট খায় ” রাকিব এবার উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলল, “তুই যেন কার জন্য সিগারেট খাওয়া শুরু করছিলি?” “যার ধরেছিলাম তারজন্যই ছেড়েছি। সমস্যা আছে কোনো?” “নাহ। একদম ই না।” রাকিব শুধালো, “বাসার সবাই কেমন আছেন?” “আলহামদুলিল্লাহ ভালো। ” রাসেল গলা উঁচু করে বলল, ” আংকেল ঠিক আছেন? ” ” আলহামদুলিল্লাহ ” লিমন কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে বলল, ” তোর এত পরিবর্তনের রহস্য কি?” আবির গম্ভীর গলায় বলে, ” বাবা মায়ের একমাত্র ছেলে হলে এসব পরিবর্তন নিজে

থেকেই চলে আসে। চোখে সামনে আব্বু আম্মুর অসুস্থতা, বুকের ভেতর প্রেয়সীর গভীর অনুরক্তি সব আড়াল করতে নিজের সঙ্গে প্রতিনিয়ত লড়াই করতে হয় এই আর কি!" রাসেল শীতল কণ্ঠে বলল, "মেঘের কথা বাসায় জানাবি না?" "কিভাবে জানাবো? আব্বু হার্ট অ্যাটাকের হাত থেকে কোনোরকমে বেঁচে ফিরেছেন। এ অবস্থায় আব্বুকে প্রেশার দেয়ার মতো পরিস্থিতি কোনোভাবেই তৈরি করা যাবে না। আর আমার শ্বশুর যে মানুষ, আমার মুখে নিজের মেয়ের নাম শুনলেই আগুনে ঘি ঢালার মতো চেঁতবেন। আবির পুনরায় নিরুদ্বেগ কণ্ঠে বলল, "আজ একমাত্র ছেলে না হইতাম। আর একটা ভাই থাকতো তাহলে আমাকে কখনো কোনো কাজে পিছপা হতে হতো না। " রাকিব করুণ স্বরে শুধালো, "ফুপ্পির বিষয়ে বাসায় কোনো সিদ্ধান্ত হয় নি?" আবির বিরক্তি নিয়ে বলল, "এখনও কিছুই হচ্ছে না। আমি আব্বু চাচ্চুকে ইন্ডাইরেক্টলি বলেছি কিন্তু তাদের দিকে থেকে তেমন রেসপন্স পাচ্ছি না। " "কি ভাবছিস? কি ভাবে কি করবি?" "আমি জানি না। " আবির অনেক রাত পর্যন্ত আড্ডা দিয়ে বাসায় আসছে। মেঘ বেলকনিতে দাঁড়িয়ে বরাবরের মতো আবিরের জন্য অপেক্ষা করছিল।আবির বাসায় ঢুকতেই দেখল আলী আহমদ খান সোফায় বসে ছিলেন। আবিরকে আসতে দেখে শক্ত কণ্ঠে বললেন, "তোমার সাথে একটু দরকার আছে।" আবির সহসা দাঁড়িয়ে পরেছে। স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, "জ্বি বলুন।" "তোমার ফুপ্পির বিষয়ে কিছু ভেবেছো?" মুখে হাসি নিয়ে আবির বলল, "আমি কি ভাববো?"

“তোমার ফুপ্পির বিষয়ে তুমি ভাববে না?এ বাড়ির বড় ছেলে হিসেবে তোমার তো কিছু দায়িত্ব আছে। ” আবির মলিন হেসে বলল, “আপনারা যা সিদ্ধান্ত নিবেন তাই হবে।” আলী আহমদ খান শান্ত স্বরে বললেন, “ঠিক আছে। রুমে যাও তুমি।” আজ মেঘ ভার্সিটিতে আসতেই মিষ্টি উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, “কিরে মেঘ আবির ভাইয়ের সঙ্গে কথা হলো?” “কি কথা বলবো?” “মিনহাজকে ব্লক করার কারণ জিজ্ঞেস করিস নি?” মেঘ আমতা আমতা করে বলল, “এত সাহস আমার নেই।” “সাহস না দেখালে কিছু জানতেও পারবি না।” মেঘের হঠাৎ ধীর কণ্ঠে প্রশ্ন করল, ” ওনি আমায় ভালো না বাসলে কি করব?” তামিম হেসে বলল, ” ওনাকে ভুলে যাবি।” মেঘ ভ্রু কুঁচকে কঠিন স্বরে বলল, “তোরে ভুলে যাব। দূর হ হা*রামী। মিনহাজ অভিভূতের ন্যায় নিষ্পলক মেঘের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, “তোরা অনুমতি দিলে আমি একটা প্ল্যান দিতে পারি।” বন্যা শক্ত কণ্ঠে বলল, “কিসের প্ল্যান?” মিনহাজ ধীর স্থির কণ্ঠে সবটা প্ল্যান বলেছে। মিষ্টিরা বলার সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেছে। মিষ্টিদের উত্তেজনা দেখে মেঘও মোটামুটি রাজি হয়েছে । কিন্তু বন্যা কোনো ভাবেই রাজি হচ্ছে না। মেঘকে বুঝানোর চেষ্টা করছে। কিন্তু মিষ্টি, মিনহাজ আর তামিমের কথা শুনতে শুনতে বন্যার কথা মেঘ পাত্তায় দিচ্ছে না। রাতে খাবার টেবিলে বড়দের খাওয়া শেষে আবির, তানভির, মীম, মেঘ বসে খাবার খাচ্ছিল। তানভির উঠে যেতেই মেঘ মীমকে উদ্দেশ্য করে বলল, ” মীম,তোর সাথে আমার অনেক কথা আছে। ” “কি কথা

আপু।” মেঘ বিড়বিড় করে বলল, “আমার ভার্সিটির ফ্রেন্ডদের কথা বলছিলাম না তোকে। ” “হ্যাঁ। এখন কি হয়ছে?” আবির দীর্ঘ মনোযোগ দিয়ে মেঘের কথা শুনছে। মেঘ ঢোক গিলে ধীর কণ্ঠে বলল, “আমার এক ফ্রেন্ড মনে হয় আমাকে পছন্দ করে। তোকে ছবি দেখাব নে। খেয়ে রুমে আসিস। ” মীম “আচ্ছা” বলে চোখ তুলতেই নজর পরে আবিরের দিকে। আবির অগ্নিদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মেঘের দিকে। মীম সে দৃশ্য দেখে টেবিলের নিচ দিয়ে মেঘকে চিমটি কেটে বিড়বিড় করে বলল, “আপু চুপ করো। ভাইয়া তোমার কথা শুনে ফেলছে।” মেঘ মীমের কথায় তেমন পাত্তা না দিয়ে আবারও বলল, “ওরা তোর কথা খুব বলে। তোকে নিয়ে একদিন ওদের সাথে দেখা করতে যাব নে। ঠিক আছে? ” ভয়ে মীমের কন্ঠ ভিজে এলো, দাঁতে দাঁত চেপে বলল, “সময় হলে যাব এখন চুপ করো তুমি” মেঘ উত্তেজিত কণ্ঠে পুনরায় বলল, ” জানিস মীম, ওর নামের প্রথম অক্ষরও M” আবির সঙ্গে সঙ্গে খাবার রেখে দাঁড়িয়ে পরেছে। হালিমা খান উদ্বিগ্ন কণ্ঠে শুধালেন, “কিরে খাবার শেষ না করে উঠে পরলি যে?” “খেতে ইচ্ছে করছে না।” “কেন? কি হয়েছে তোর?” “কিছু না।” আবির রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে রুমে চলে গেছে। মেঘ এবার দীর্ঘ শ্বাস ছেড়ে চোখ তুলে তাকালো। মেঘের নেত্র দ্বয় টলমল করছে, আবিরের সামনে এভাবে কথা বলা মেঘের কাছে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমতুল্য। ভয়ে মেঘের হাত-পা কাঁপছিল, নিচ দিকে তাকিয়ে কোনোরকমে কথাগুলো বলেছে মেঘ। আবির কোনোদিকে না তাকিয়ে

রুমে চলে গেছে। মেঘ গভীর রাত পর্যন্ত টিভি দেখেছে আর আবিরের জন্য অপেক্ষা করেছে। প্রায় ১ টা নাগাদ মেঘ রুমে গিয়ে শুয়ে পরেছে। পরদিন সকালে আবার খাবার টেবিলে আবিরের সঙ্গে দেখা। মেঘ কোনোভাবেই আবিরের চোখের দিকে তাকায় না। কারণ আবির ভাইয়ের চোখে চোখ রাখলেই মেঘের সবকিছু গুলিয়ে যাবে। বড়দের কথার মাঝখানে মীম কি একটা কথা বলেছে কিন্তু কেউ মীমের কথা কানে ই নেয় নি। মেঘ মীমকে উদ্দেশ্য করে উচ্চস্বরে সচেতন কণ্ঠে বলল, "শুন মীম, যেখানে গুরুত্ব পাবি না সেখানে কখনো কোনো কথা বলবি না।যেখানে গুরুত্ব পাবি সেখানেই নিজের মতামত দিবি।" মেঘের বিজ্ঞের ন্যায় কথা শুনে মীম আহাম্মকের মতো তাকিয়ে আছে।মেঘের অধিবিদ্যের ন্যায় কথা শুনে তানভির আশ্চর্য নয়নে তাকিয়ে শুধালো, "বনু, তুই এভাবে কথা বলছিস কেন? কে তোকে প্রাধান্য দেয় নি বল শুধু! " মোজাম্মেল খান ভারী কণ্ঠে বললেন, " কেনো তাকে কি করবা?" তানভির ধীর কণ্ঠে বলল, " কিছু করব না। " মেঘ তানভিরের দিকে তাকিয়ে তটস্থ হয়ে বলল, "এমনি, মীমকে বুঝাচ্ছি। " আবিরের আঁখি জোড়া মেঘের পানে গভীরভাবে অনুবন্ধী হয়ে আছে। মেঘ তানভিরের থেকে নজর সরিয়ে মাথা নিচু করে ফেলল। মিনহাজের পরিকল্পনায় মেঘ এমন টা করছে যাতে আবিরের মনের ভাব বুঝতে পারে। খাবার টেবিলে যে যার মতো খাবার খাচ্ছে অথচ আবিরের দৃষ্টি মেঘেতে স্থির। মেঘ যে ইন্ডাইরেক্টলি আবিরকে খোঁচা দিচ্ছে এটা আবিরের বুঝতে বাকি নেই। মেঘ খাবার

খেয়ে চুপচাপ উঠে গেছে। আবির কিছুক্ষণ নিবিড় চিন্তায় মগ্ন থেকে খাওয়া শেষ করে অফিসে চলে গেছে। আবির আজ অফিসের কাজে কোনোভাবেই মনোযোগ দিতে পারছে না। আবিরের বুকের ভেতর অধৃষ্য হাওয়া বইছে, হৃদয়ের তোলপাড় চলছে। এসিতে বসেও শরীর ঘামছে, দুশ্চিন্তায় আবিরের শ্যামবর্ণের চেহারা কালচে বর্ণ ধারণ করেছে। ফাইল এলোমেলো অবস্থায় ফেলে টেবিলের উপর মাথা রেখে শুয়ে আছে। রাকিব একটা ফাইল নিয়ে রুমে ঢুকে আবিরকে দেখেই তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে বলল, "কি হয়ছে আবির? অসুস্থ লাগছে?" আবির টেবিল থেকে মাথা তুলতেই আবিরের অসহায় মুখ দেখে রাকিব ভ্রু কুঁচকে বলল, " কোনো কিছু নিয়ে দুশ্চিন্তায় আছিস?" "মেঘ ইদানীং কেমন জানি ব্যবহার করছে। " "কেমন করতেছে?" " ডিরেক্ট কিছু বলে না তবে কেমন জানি ঠ্যাস দিয়ে কথা বলে।" রাকিব মৃদু হেসে বলল, "তোকে পরীক্ষা করছে হয়তো।" "তা বুঝার বয়স আমার হয়ছে।" "তাহলে দুশ্চিন্তা কি নিয়ে করছিস?" "খোঁচাখোঁচি টা যদি সিরিয়াল রূপ নেয় তার জন্য ভয় হচ্ছে। আমি সেদিন ওর আইডি থেকে মিনহাজ ছেলেটা কে ব্লক করছি। ও তেমন কোনো রিয়াকশন দেখায় নি, আনব্লক ও করে নি। ঠিকই ভার্সিটিতে ঘন্টার পর ঘন্টা ঐ ছেলেগুলোর সাথে আড্ডা দেয়।" রাকিব গম্ভীর কণ্ঠে বলল, "তুই যে এই বিষয় কোনো না কোনোদিন দুশ্চিন্তায় পরবি সেটা আমার অজানা নয়। তোকে কম করে হলেও হাজার বার বলছি। তুই একবার ওদের সাথে পার্সোনালালি দেখা করলে এত কাহিনীর কিছুই হতো না। "

“আমি রাগ কন্ট্রোল করতে পারি না জানিস তো। এখন পর্যন্ত যে কয়জনকে নিজের হাতে মেরেছি সব কয়টা ত্যাড়ামির জন্য মা*র খেয়েছে। ভালোভাবে কথা বলতে গেলে তারা মানতে চাই না, গায়ের জোর, এলাকার দাপট দেখায়। সহ্য করতে না পেরে আমার তাদের মা*রতে হয়। মিনহাজদের সাথে দেখা করতে গেলে তারা যে সেইম কাজটা করবে না তার কি গ্যারেন্টি আছে? তীব্র আক্রোশ থেকে দিব মাই-র। কোনো না কোনোভাবে সে কথা মেঘের কানে যাবে। আর মেঘ ভাববে আমি ইচ্ছেকৃত ওর বন্ধুদের মেরেছি আর তা নিয়ে তুলকালাম কান্ড ঘটাবে। এমনিতেই ওর সাথে রাগারাগির শেষ নেই এই ঘটনার জের ধরে দেখা যাবে কথা বলায় বন্ধ করে দিয়েছে। ” “তানভির বা আমি তো বলতেই পারতাম। ” “হ্যাঁ পারতি। কিন্তু মেঘ ঘুরেফিরে আমাকেই ভুল বুঝতো। কারণ প্রাইমারি স্কুলে থাকাকালীন জয় নামের ছেলেটার জন্য ও কে মে-রেছিলাম। এত বছর পর ভার্সিটিতে উঠে দুটা ছেলে বন্ধু হয়েছে এখন মেঘেকে না মেরে ওদেরকে মারা হয়েছে। মেঘ কি এতটায় বোকা যে কিছুই বুঝবে না! তোরা মারলে ছেলেগুলো মেঘকে ডিটেইলসে বলবে, আর কাউকে দিয়ে মারালে সেটাও বলবে। সবভাবেই দোষ গিয়ে আবির আর তানভিরের উপর ই পরবে। ” “তোর এই সুদূর প্রসারি চিন্তা ভাবনার জন্যই নিজের মনোবল হারাচ্ছিস, দিনকে দিন বদমেজাজি হয়ে যাচ্ছিস, মেঘের সাথে কারণে অকারণে রাগ দেখাচ্ছিস আর এই সুযোগে ছেলেগুলোরও অতি বার বাড়তেছে।” আবির কিছুক্ষণ নিশ্চুপ

থেকে আড়চোখে রাকিবের দিকে তাকিয়ে শুধালো, “কেনো আসছিলি?” রাকিব সঙ্গে সঙ্গে ফাইল এগিয়ে দিল। বাড়তি কথা বাদ দিয়ে কাজে মনোযোগ দিল। অফিস শেষে আবির কিছু স্ট্রিট ফুড আর ২ টা আইসক্রিমের বক্স নিয়ে বাসায় আসছে। মেঘ সোফায় লম্বা হয়ে শুয়ে টিভি দেখছিল, আবিরকে ঢুকতে দেখে তাড়াতাড়ি উঠে বসতে বসতে কাকে কল দিল। অপর পাশে কল রিসিভ করা মাত্রই মেঘ হাসিমুখে রাজ্যের গল্প শুরু করেছে। আবির খাবার গুলো ডাইনিং এ রাখতেই মীম আর আদি ছুটে গেল। আবির তির্যকভাবে মেঘের দিকে তাকালো। আবির বাসায় আসছে বা খাবার নিয়ে আসছে সেদিকে মেঘের বিন্দুমাত্র খেয়াল নেই। সে তার কথা বলায় এতটায় মগ্ন যে আশেপাশে তাকানোর সময় ই নেই। আবির কপাল গুটিয়ে সিঁড়ি কাছে চলে গেছে। বাসায় যে যায় আনুক না কেন প্রথম ডাক টা মেঘকেই দেয় আর মেঘ খাবার পরিবেশন করে মীম আর আদিকে নিয়ে খায়। আজ মেঘ কথা বলছে দেখে মীম মেঘের জন্য খাবার নিয়ে আসছে। মেঘের দিকে এগিয়ে দিয়ে কিছুটা উঁচু স্বরে বলল, “আপু নাও।” মেঘ অন্যদিকে তাকিয়ে ধমকের স্বরে বলল, “দেখছিস না কথা বলছি। এখন আমার এসব খাওয়ার সময় নেই” আবির সিঁড়ি থেকে সে দৃশ্য দেখে রাগে ধপাধপ পা ফেলে রুমে চলে গেছে। মেঘ ধমকটা মীম কে দিলেও সেটা যেন আবিরের হৃদয়ে গিয়ে লাগছে। মেঘ আজ পর্যন্ত এমন কাজ কখনও করে নি। বন্যারা কারো সাথে কথা বললেও আবির, তানভির আসলে কথা শেষ করে কল কেটে দিত অথচ আজ

তার ভিন্ন রূপ। আবির চলে যেতেই মেঘ গম্ভীর কণ্ঠে বলল, “ফোন রাখ, এখন খাবো আমি।” মীম ধমক খেয়ে মন খারাপ করে মেঘের জন্য আনা খাবার আবার নিয়ে গেছে। মেঘ তপ্ত স্বরে বলল, “এই মীম, আমার ভাগ আমায় দিয়ে যা। ” মীম মন খারাপ করে বলল, “তুমি না বললে, তোমার এসব খাওয়ার সময় না” “সময় ছিল না। এখন আমার অফুরন্ত সময়, সবগুলো আমার কাছে নিয়ে আয়।” মীম খাবার গুলো মেঘের কাছে গিয়ে চলে যেতে নিলে মেঘ মীমের হাতে টান দিয়ে মেঘের পাশে বসিয়ে হেসে বলল, “রাগ করছিস? সরি বাবু ” মীম কিছু বলছে না দেখে মেঘ দুহাতে মীমকে কাতুকুতু দেয়া শুরু করল। সহসা মীমের ছোট্ট দেহ কম্পিত হলো। নড়তে নড়তে বলল, “আপু ছাড়ো।” মেঘ হাসতে হাসতে বলল, “তুই যতক্ষণ না হাসবি ততক্ষণ ছাড়বো না। ” কাতুকুতু সহ্য করতে না পেরে মীম হাসতে শুরু করলো। মেঘ সঙ্গে সঙ্গে কাতুকুতু দেয়া থামিয়ে দিয়েছে। দু-বোন গল্প করতে করতে আবিরের আনা খাবার গুলো খেয়েছে। আদি নিজের ভাগের খাবার নিয়ে আগেই রুমে চলে গিয়েছিলো। কিছুক্ষণ পর গল্প করতে করতে মেঘ মীমের উরুতে মাথা রেখে শুয়ে পরেছে। মীম মেঘের চুলে হাত বুলিয়ে মৃদুস্বরে বলল, “কি হলো আপু?” মেঘ লাজুক হাসলো আর বলল, “জানিস, আমি একজনের প্রেমে পরেছি!” মীম উত্তেজিত কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল, “সত্যি? কার?” মেঘ দুহাতে মুখ লুকিয়ে বলল, “বলা যাবে না।” “প্লিজ আপু বলো। কে সে?” “আছে কেউ একজন। ” “পছন্দ করো?” “না। ভালোবাসি”

“আপু বলো না প্লিজ।” “খুব শীঘ্রই বলবো। দোয়া কর যেন খুব তাড়াতাড়ি সফল হতে পারি।” “ফি আমানিল্লাহ। ” আবির রুমে ঢুকে ডিরেক্ট ওয়াশরুমে চলে গেছে। প্রায় ১ ঘন্টা যাবৎ ওয়াশরুমের ঝরনার নিচে দাঁড়িয়ে আছে। ক্রোধে দু চোখ রক্তাভ হয়ে আছে, মনে হচ্ছে শরীরের রক্ত টগবগ করে ফুটছে, কপালের দুপাশের রগ দুটা অবিরাম কাঁপছে, মস্তিষ্কে রক্ত সঞ্চালন বেড়ে গেছে। ঘন্টাখানেক পর ওয়াশরুম থেকে বেড়িয়ে ভেজা শরীরেই একটা টাওজার আর টিশার্ট পরে নিচে আসছে। মেঘ তখনও মীমের কোলে মাথা রেখে খুশগল্পে মেতে আছে। আবিরকে নামতে দেখে মেঘ তৎক্ষনাৎ উঠে বসলো। আবির নিচে এসে ওদের পাশের সোফায় বসেছে, আবিরকে দেখে মীম নড়েচড়ে বসল। আবির দুহাত দুদিকে ছড়িয়ে সোফায় হেলান দিয়ে বসলো। হাতের লোমের গুঁড়ায় এখনও বিন্দু বিন্দু পানি জমে আছে। ভেজা চুল গুলো কপাল ঢেকে ভ্রু থেকেও নেমে পরেছে, চুলের আগা থেকে অবিরত মুক্তার মতো পানির বিন্দু আবিরের টিশার্টে পরছে। মেঘ একপলকের জন্য তাকাতেই সর্বাঙ্গে কারেন্টের ন্যায় শক লাগলো, সঙ্গে সঙ্গে বুকের ভেতর ধুকপুক শুরু হয়ে গেছে। মেঘ চোখ সরিয়ে নিয়েছে। আবির মীমকে উদ্দেশ্য করে বলল, “রুম থেকে আমার ফোনটা নিয়ে আয় ” কথাটা বলা মাত্র মীম উঠে গেছে। মেঘ সোফায় কর্ণারে গুটিসুটি মেরে বসে আছে। মীম যেতেই মেঘ তাড়াতাড়ি করে ফোন হাতে নিয়ে কি যেন করতে লাগলো। আবির নিরেট দৃষ্টিতে মেঘের পানে চেয়ে আছে। মেঘ ফোন চাপতে পারছে না, ভয়ে হাত

কাঁপছে। আবির গম্ভীর কণ্ঠে বলল, " তোর কি মনে হচ্ছে না, তুই প্রাপ্ত স্বাধীনতার অপব্যবহার করছিস?" মেঘ চিবুক নামিয়ে চুপচাপ বসে আছে। মেঘের নিস্তব্ধতা আবিরের রাগ দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। আবির রেগে বলল, "কথা বলছিস না কেন?" মেঘ কিছু না বলে উঠে যেতে নিলে আবির রাগান্বিত কণ্ঠে হুংকার দিল, "আমি তোকে কিছু জিজ্ঞেস করছি মেঘ! কথা কানে যায় না তোর?" মেঘ কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে বলল, "আমার একটা ইম্পর্ট্যান্ট কল আসছে। " বলেই মেঘ কল রিসিভ করে কানে ধরতে ধরতে সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেছে। মেঘের কথাটা আবিরের মনে আগুনে ঘি ঢালার মতো কাজ করেছে। আবির ভ্রু যুগল নাকের গুঁড়ায় টেনে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মেঘের গমনপথে তাকিয়ে রইলো। অকস্মাৎ পাশে রাখা একটা ফুলদানি দেয়ালে একপ্রকার ছুড়ে মারল। শব্দে মেঘের পা সেকেন্ডের জন্য থমকে গেছে, তবুও তা বুঝতে না দিয়ে রুমের দিকে চলে গেছে। মীম ফোন নিয়ে নিচে আসছে, ফোন আবিরকে দিতে গিয়ে আবিরের রক্তলাল আঁখি যুগল দেখে ভয়ে ঢোক গিলল। কোনোরকমে ফোন দিয়ে দৌড়ে আম্মুর রুমে চলে গেছে। আবির সেই যে বেড়িয়েছে সারারাতেও বাসায় ফেরে নি । মেঘ অপেক্ষা করতে করতে বেলকনিতেই ঘুমিয়ে পরেছিল। ভোরবেলা হঠাৎ ঘুম ভাঙতে মেঘ থতমত খেয়ে উঠে। তাড়াতাড়ি রুম থেকে বেরিয়ে আবিরের রুমে গেল। আবির রুমে নেই দেখেই মেঘের বুক কেঁপে উঠেছে। ভোর বেলায় বাসার বাহিরের গিয়ে দেখে আসছে আবিরের বাইক আছে কি না! এত সকালে কি করবে কিছুই বুঝতে

পারছে না।আবিরকে কল দেয়ার মতো সাহস ও পাচ্ছে না। সকাল ৭ টা থেকেই মেঘ খাবার টেবিলে বসে আছে, আবির ফিরলে যেন দেখতে পারে। কিন্তু আবিরের ফেরার নামগন্ধ নেই। সবাই খেতে বসছে, আবির নেই দেখে আলী আহমদ খান প্রশ্ন করলেন, "আবির কোথায়? উঠে নি?" তানভির গলা খাঁকারি দিয়ে ধীর কণ্ঠে বলল, "ভাইয়া রাকিব ভাইয়াদের বাসায়। " "কেন?" "অফিসের কাজে গেছিলো, রাতে আর ফেরে নি।" আলী আহমদ খান ভারী কণ্ঠে বললেন, "কাজ কাজের জায়গায় থাকবে তার সাথে বাসায় না ফেরার কি সম্পর্ক?" তানভির আর কিছু বলল না। বড় আব্বুর সাথে যুক্তিতে সে কুলাতে পারবে না তার থেকে কথা না বলায় শ্রেয়। মেঘ নিস্তব্ধ আঁখিতে তানভিরের দিকে তাকিয়ে আছে। মেঘ স্পষ্ট বুঝতে পারছে আবির ভাই তারউপর রাগ করেই বাসা থেকে চলে গেছেন। বাসায় মানুষ যাতে চিন্তা না করে তারজন্য তানভির ভাইয়া কাজের কথা বলেছেন। মেঘ অল্প খেয়ে রেডি হয়ে ভার্সিটিতে চলে গেছে। রাতে ঠিকমতো ঘুম না হওয়ায় মেঘের চোখ ঘুমে টলছে। অর্ধ ঘুমে থেকেই ক্লাসগুলো শেষ করেছে। ক্লাস শেষ হতেই বন্যা শুধালো, "কিরে তুই কি রাতে ঘুমাস নি? চোখ ফুলে আছে কেন?" "ঘুমাইছি, অল্প।" লিজা এসে উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, "কিরে বান্ধবী কি অবস্থা? " "কি অবস্থা হবে?" এরমধ্যে মিনহাজ, তামিম, সাদিয়া, মিষ্টিও আসছে। মেঘ নিরেট কণ্ঠে জানালো, "আমি তোদের কথা আর শুনতে পারবো না।" সাদিয়া ভ্রু কুঁচকে বলল, "কেন?" মেঘ ধমকের স্বরে বলল, "আজকে তোদের

কথামতো কাজ করতে গিয়ে আমার আবির ভাই বাসা থেকে চলে গেছেন। সারা রাত বাসায় ফিরে নি, আমি বেলকনিতে বসে থাকতে থাকতে ওখানেই ঘুমিয়ে পরেছি। " বন্যা ধীর কণ্ঠে বলল, " মেঘ তোকে আগেই সাবধান করেছি। তুই আমার কথা কানেই তুলছিস না। আবির ভাইকে তুই চিনিস না? ওরা নাচতাছে আর তুই ও তাতে তাল দিচ্ছিস! এখনও সময় আছে এসব বাদ দে। ওনি মনের ভাব প্রকাশ করতে না চাইলে শুধু শুধু ওনাকে জোর করিস না, প্লিজ। পরে দেখবি ভালোর বদলে উল্টো খারাপ হবে। " মেঘ কিছু বলার আগে মিনহাজ গম্ভীর কণ্ঠে বলল, "এই বন্যা, তুই থামবি। মেঘ তুই একদম ঠিকঠাক রাস্তায় যাচ্ছিস। বন্যার কথায় কান দিস না। ওনি যদি তোকে পছন্দ করে তাহলে ওনি প্রকাশ করবে আর পছন্দ না করলে ডিরেক্ট চাপ্টার ক্লোজ। এভাবে ঝুলে থাকার কোনো মানে হয় না বুঝলি! " সাদিয়াও সঙ্গে তাল দিল, "হ্যাঁ সত্যিই তো। মেঘ ওনাকে এত পছন্দ করে ওনি কি এসব বুঝে না? নাকি বুঝেও না বুঝার ভাব নেয়। সবটা ক্লিয়ার করা প্রয়োজন। ওনার মনে কি চলে তা জানলে মেঘ সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারবে।" বন্যা ভরা গলায় বলল, " তোরা বুঝার চেষ্টা কর, মেঘ তোদের মতো এত বুঝদার আর স্ট্রং না। উল্টাপাল্টা আচরণ করলে আবির ভাই মেঘকে মে*রেই ফেলবে।" মিনহাজ রাগী স্বরে বলল, "কোন অধিকারে মারবে? কার এত সাহস যে মেঘের গায়ে হাত তুলবে ।মেঘ তোকে কিছু বললে তুই শুধু আমায় বলবি, বুঝলি।" বন্যা উপহাসের স্বরে বলল, " তোকে দাপট দেখাতে আগেই নিষেধ

করেছিলাম। তুই আবির ভাইয়া সম্পর্কে জানিস না তাই দয়া করে চুপ থাক। মেঘ তুই তো ওনাকে চিনিস। প্লিজ আমার কথা মান, ওদের কথামতো এমন কাজ করিস না প্লিজ। ” মেঘ নিরুপায় হয়ে সবার দিকে তাকালো। একদিকে বন্যা বারণ করছে। অন্যদিকে বাকি সবাই বলছে মেঘ যা করছে একদম ঠিক করছে। অন্যদিকে আবির ভাই রাগে বাসা থেকে চলে গেছেন। মেঘ এখন কি করবে! মিনহাজ ফটাফট বলা শুরু করল, “দেখ মেঘ, ওনি তোর আচরণে রেগে বাসা থেকে চলে গেছে মানে ওনার মনে কিছু একটা আছে। এখন সেটা আমাদের প্রকাশ করাতে হবে। মাঝপথে ছেড়ে দিলে তুই জীবনেও তোর কাঙ্ক্ষিত কথা জানতে পারবি না। এখন তুই ভাব, বন্যার কথা মেনে এভাবেই চলবি নাকি আমাদের কথা মেনে তোর আবির ভাইয়ের মনের কথা শুনবি। ” মেঘ বোকার মতো তাকিয়ে আছে। লিজা পুনরায় বলল, “তোর প্রেম রোগের বছর হয়ে যাচ্ছে। আর কতদিন ওনার পিছুপিছু ঘুরবি বলতো? ওনি ভালো না বাসলে ওনার চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে অন্য কারো সাথে সম্পর্কে যাবি। প্রয়োজনে ছেলে আমরা ঠিক করে দিব তবুও ওনার মোহে এভাবে পরে থাকিস না।” প্রায় ১ ঘন্টা সবাই মিলে মেঘকে জ্ঞান দিয়েছে। বন্যা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ডিরেক্ট না। মেঘ যাতে এমন কাজ কোনোভাবেই না করে। অথচ মেঘ বাকিদের কথা শুনে রাজি হয়ে গেছে। বন্যা যেতে যেতে আরও কিছুক্ষণ মেঘকে বুঝালো কিন্তু মেঘের মাথায় কিছুই ঢুকলো না। মেঘের মনে- মস্তিষ্কে শুধু একটায় চিন্তা, আবির ভাইয়ের মুখে

“ভালোবাসি” শব্দটা শুনা সেটা যেকোনো মূল্যেই হোক। মেঘরা চলে যেতেই তামিম মিনহাজকে প্রশ্ন করল, “তোর মনে কি চলছে বল তো!” মিনহাজ উল্টো প্রশ্ন করল, “কেন?” “তুই মেঘকে উস্কাচ্ছিস যাতে আবির ভাইয়ার মনের ভাব জানতে পারে। কাহিনী কি?” মিনহাজ গলা খাঁকারি দিয়ে বলল, “আমি মেঘকে পছন্দ করি, ওর প্রতি বেধক অনুভূতিও আছে কিন্তু ওর মনে আমার জন্য বিন্দুমাত্র কিছু নেই। ওর মস্তিষ্কে আবির ভাইয়া ছাড়া কিছুই নেই। এ অবস্থায় আমি যত চেষ্টায় করি ওর মনে আমার জায়গা করতে পারবো না। দেখলি তো আবির ভাইয়া আমায় ব্লক দিয়েছে এই খুশিতে সেদিন সবাইকে চকলেট দিল। এমতাবস্থায় আমি কোনোকিছু আশায় করতে পারি না।” তামিম বিস্ময় সমেত তাকিয়ে বলল, “তাহলে তুই তোর অনূভুতি কোরবান করে মেঘকে আবির ভাইয়ার সঙ্গে মিলিয়ে দিতে চাচ্ছিস?” মিনহাজ রাশভারি কণ্ঠে পুনরায় বলল, “হতে পারে তাই আবার উল্টোটাও হতে পারে। ” “যেমন?” মিনহাজ লম্বা করে শ্বাস টেনে বলা শুরু করল, “দেখ, মেঘ প্রায় ৯ মাস যাবৎ আবির ভাইয়াকে পছন্দ করে। আমাদের সাথে ওর বন্ধুত্ব প্রায় ৪-৫ মাসের। তারমানে আমাদের সাথে পরিচয়ের আরও ৪-৫ মাস আগে থেকে মেঘ ওনাকে পছন্দ করে। মেঘ যথেষ্ট কিউট আর লক্ষী একটা মেয়ে। যে কেউ এক দেখায় ওর প্রেমে পরবে। সেখানে ওনি তো এক বাড়িতে থাকেন। এই ৯ মাসেও কি ওনি মেঘকে খেয়াল করেন নি? অবশ্যই করেছেন এবং মেঘের অনুভূতিও বুঝেছেন। তবে প্রকাশ করছেন না! কেনো? হতে

পারে ওনার জীবনে অন্য কেউ আছে। ওনি তার সাথে কমিটেড আবার মেঘের প্রতিও ওনার সফ্ট কর্নার আছে। এজন্য আমি মেঘের মাধ্যমে আবির ভাইয়াকে উস্কাচ্ছি। এই সুযোগে মেঘের সাথে আমার রেগুলার কথা হচ্ছে এবং সম্পর্ক গাঢ় হচ্ছে। বাই চান্স আবির ভাই রেগে মেঘের উপর রিয়েক্ট করলে মেঘ আমাকেই বলতে আসবে। তখন আমি ওকে বুঝিয়ে শুনিয়ে আমার দিকে আকৃষ্ট করবো।" তামিম শুকনো ঢোক গিলে বলল, "ভাবতে অবাক লাগছে তুই আমার বন্ধু! এত চিকন বুদ্ধি নিয়ে ঘুমাস কিভাবে? " মিনহাজ খিকখিক করে হেসে উঠলো, হাসতে হাসতে বলল, "তুই ই বলছিলি ওনারা ইচ্ছেকৃত ওনাদের অবস্থান বুঝাতে আমাদের মেঘের বার্থডে তে ডেকেছিল। আবির ভাইয়া প্ল্যান করতে পারলে আমি কেন পারব না " "আর যদি আবির ভাই মেঘকে ভালোবাসি বলে দেন। তখন কি করবি?" "তখন মেঘের চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলবো। তবুও বিষয়টার সমাধান হওয়া দরকার। " সপ্তাহ কেটে যাচ্ছে অথচ মেঘের ব্যবহার অপরিবর্তিত। আবিরকে এড়িয়ে চলা, আবির কে দেখিয়ে দেখিয়ে ফোনে কথা বলা, ইচ্ছেকৃত খোঁচানো সবই চালাচ্ছে। আবির দু একবার মেঘের সঙ্গে কথাও বলতে চেয়েছে কিন্তু মেঘের ব্যস্ততা আর পাত্তা না দেয়ায় আবির আর কিছু বলে নি। মেঘকে মেঘের মতোই ছেড়ে দিয়েছে। তানভির আজ এমপির সাথে একটা পোগ্রামে ব্যস্ত। সকালে না খেয়ে বেড়িয়েছিল। আবির দুপুর পর্যন্ত আব্বুর অফিসের কাজ শেষ করে বিকেলে নিজের অফিসে আসছে। গুরুত্বপূর্ণ একটা

মিটিং আছে, সকালে থাকতে পারবে না বলে মিটিং বিকেলে রেখেছিল। ইদানীং মেঘের উড়নচণ্ডী চলাচলে আবিরের মনের সাথে সাথে কাজেও তার প্রভাব পরছে। মিটিং গত সপ্তাহে হওয়ার কথা ছিল আবির সেটা পেছাতে পেছাতে আজ পর্যন্ত টেনে এনেছে। আব্বু চাচ্চুর সামনে স্ট্রং ভাবে কাজ করলেও নিজের অফিসে এসেই সম্পূর্ণ ভেঙে পরে। আজ নিজেকে শক্ত রাখতে ফোন বন্ধ করে ড্রয়ারে রেখে দিয়েছে। নিজের রুম ছেড়ে ল্যাপটপ নিয়ে রাকিবের রুমে কাজ করছে। রাসেল দুপুর পর্যন্ত অফিস করেছে। আজ তার গার্লফ্রেন্ডের জন্মদিন তাই দুপুরের দিকে চলে গেছে। প্রায় ২ ঘন্টা আবিরদের মিটিং চলল। মিটিং শেষে রাকিব বের হতে হতে পকেটে থেকে ফোন বের করতেই দেখলো রাসেল ১০ বার কল দিয়েছে। রাকিব কল ব্যাক করতেই রাসেল আতঙ্কিত কণ্ঠে বলল, “ঐ আবির কই। আবির কে তাড়াতাড়ি নেটে আসতে বল। ” “কেন কি হয়ছে। ” “তুই আবিরকে বল” বলেই রাসেল কল কেটে দিয়েছে। রাকিব আবিরকে বলা মাত্র আবির রুমে গিয়ে ফোন খুলে নেটে ঢুকতেই রাসেলের মেসেজ আসছে সাথে ছবিও । ছবিতে চাপ দিতেই দেখল, মিনহাজ বেশকয়েকটা লাল গোলাপ হাতে হাঁটু গেড়ে বসে মেঘের সামনে ফুল ধরে রেখেছে। মেঘ ফুলগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে। বন্যা, মিষ্টি, সাদিয়া, লিজা, তামিম সবাই পাশে দাঁড়ানো। ছবি টা দেখা মাত্র আবির ধপ করে চেয়ারে বসে পরেছে। রাকিব ক্লাইন্ডদের সাথে কথা বলায় ব্যস্ত। আবির কয়েক মুহুর্তের মধ্যে বাইকের চাবি নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। রাকিব

পেছন থেকে ডেকে বলল, “কোথায় যাচ্ছিস?” আবির উত্তর না দিয়ে বেড়িয়ে গেছে। রাসেলকে কল দিয়ে জায়গা টা জেনে দ্রুত পৌঁছালো সেখানে। মেঘদের কাছাকাছি গিয়ে বাইকের ব্রেক কষল। মেঘরা সবাই গোল মিটিং করে বসে চা খাচ্ছিলো। মিনহাজের হাতে এখনও একগুচ্ছ লাল গোলাপ। রাসেল আর তার গার্লফ্রেন্ড কিছুটা দূরেই বসে ছিল। আবির মেঘদের কাছে আসতেই সবাই মাথা উঁচু তাকালো। চায়ের কাপ সাইডে রেখে সবাই একসঙ্গে দাঁড়ালো। মেঘ আবিরের শ্যামবর্ণের চেহারার পানে চেয়ে আছে, সহসা হৃদপিণ্ডের ধুকপুকানি বেড়ে গেছে সাথে মনের ভেতরের খুঁচখুঁচ লেগেই আছে। আবির চোখ বুঁজে দীর্ঘ শ্বাস ছেড়ে দু কদম এগিয়ে মেঘের ঠিক সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। মেঘ কিয়ৎক্ষণ আহাম্মকের মতো চেয়েই রইলো কিছুই বললো না। আবির প্রখর নেত্রে মেঘের চোখের দিকে তাকিয়ে বাজখাঁই কণ্ঠে প্রশ্ন করল, “এখানে কেন আসছিস?” মেঘের অনিচ্ছা সত্বেও ঠোঁটে মিষ্টি হাসি রেখে স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, “আড্ডা দিতে।” আবির পুনরায় প্রশ্ন করল, “শুধুই আড্ডা দিতে?” “জ্বি” মেঘের কণ্ঠস্বরে নিরুত্তাপ ভাব দেখে আবিরের মেজাজ চরম লেবেলের খারাপ হচ্ছে। বার বার চোখে সেই ছবিটা ভাসছে। আবির রাগান্বিত কণ্ঠে বলল, “সত্যি কথা বল মেঘ। ” মেঘ নিরুত্তর। মিনহাজ স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, “ভাইয়া, মেঘ কিছু বলবেন না” আবির ঘাড় ফিরিয়ে রক্তাভ চোখে তাকালো মিনহাজের দিকে। কণ্ঠে অগ্নি ঢেলে হুঙ্কার দিয়ে উঠলো, ” Stop your mouth. আমি তোমার সঙ্গে কথা বলতে

এখানে আসি নি। আজ আমার আর মেঘের মাঝে কেউ একটা টু শব্দ করলে তার লা*শ পরবে এখানে।” আবিরের লাল চোঁখ জোড়া দেখে মিনহাজ দৃষ্টি নামিয়ে নিল। বন্যাসহ সবাই মাটির দিকে তাকিয়ে আছে। আবিরের হুঙ্কারে ভয়ে সবকটা কাঁপছে। ওদের অবস্থা দেখে আবির নিজেকে শান্ত করার ব্যর্থ চেষ্টা করল। কিন্তু ভেতরের ক্রোধের কাছে হার মানতো বাধ্য হলো। আবিরের এমন কান্ডে মেঘ অবাক চোখে তাকিয়ে আছে, তিরতির করে কাঁপছে ঠোঁট, বুকের ভেতর হৃদপিণ্ডটা দিগবিদিক ছুটছে, ভয়ে ঢোক গিলল। আবির মেঘের চোখে চোখ রেখে কন্ঠ চারগুণ ভারী করে শুধালো, “তুই ঐ ছেলেকে পছন্দ করিস? হ্যাঁ কি না?” মেঘ নিরেট দৃষ্টিতে আবিরের দিকে তাকিয়ে আছে। বার বার ঢোক গিলছে। কিছু বলতে পারছে না। মেঘ সহসা তাকালো ওদের দিকে। মিষ্টিরা চোখে ইশারা দিয়ে হ্যাঁ বলতে বলল। আবির ভাইয়ের মনের কথা জানার এর চেয়ে উত্তম উপায় আর নেই। মেঘের শ্বাস আঁটকে যাচ্ছে। শ্বাসনালীতে তুফান চলছে। কি করে বলবে এত বড় মিথ্যাটা। আবির মেঘের বাহুতে চেপে ধরে বাজখাঁই কন্ঠে চিৎকার করল, “তাকা এদিকে।” মেঘের দেহ আবারও কম্পিত হলো সঙ্গে সঙ্গে তাকালো আবিরের চোখের দিকে। রক্তাভ দু চোখ থেকে যেন আগুন বের হচ্ছে, সেই আগুনের মেঘের হৃদয় পুড়ে ছারখার হয়ে যাচ্ছে। মিনহাজদের শেখানো প্রতিটা কথা মেঘের মাথায় ঘুরছে। আবির ভাইয়ের মনের কথা জানতে হলে মিথ্যাটা বলতেই হবে। মেঘ ঢোক গিলে ফোঁস করে শ্বাস ছেড়ে গম্ভীর কণ্ঠে বলল,

“হ্যাঁ” আবির সহসা মেঘের বাহু ছেড়ে দিয়েছে। কয়েক মুহুর্ত মেঘের চোখের দিকে তাকিয়ে রইলো। কপাল ঘামছে, আবির হাত দিয়ে কপালোর ঘাম মুছে ঘুরে গিয়ে বাইকে বসে বাইক স্টার্ট দিল। রাসেল আবিরকে থামানোর অনেক চেষ্টা করেছে কিন্তু আবির বাইক থামানোর অবস্থায় নেই। আবির চলে গেছে, মেঘ অকস্মাৎ মাথা ঘুরে পরতে নিলে বন্যা তাড়াতাড়ি মেঘ কে জড়িয়ে ধরে। আবিরের সামনে মেঘ যতই শক্ত কণ্ঠে কথা বলুক না কেন ভেতরের কম্পনের কাছে সব হার মানতে বাধ্য। মেঘ অজ্ঞান হয়ে বন্যার কোলে শুয়ে আছে। মিষ্টিরা পানি এনে মেঘের চোখেমুখে পানি ছেটাচ্ছে। এরমধ্যে রাকিব আসছে, আবির কল না ধরায় রাকিব রাসেলকে কল দিয়েছিল রাসেল সবটা বলাতে রাকিব সঙ্গে সঙ্গে অফিস ছুটি দিয়ে রওনা দিয়েছে। তানভিরকেও সব জানিয়েছে। রাকিব বাইক থাকিয়ে আতঙ্কিত কণ্ঠে শুধালো, “আবির কোথায়?” “আবির চলে গেছে।” “কোথায়?” “জানি না।” রাকিব উদ্বিগ্ন কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল, “তুই ওকে আটকাতে পারলি না।” “ও কি আমার কথা শুনার মানুষ? চেষ্টা তো করেছি ” ওদের কথোপকথনের মধ্যেই তানভির বাইক থেকে নেমে রাগান্বিত কণ্ঠে বলল, “ভাইয়া কোথায়?” রাকিব মৃদু স্বরে বলল “ও বাইক নিয়ে চলে গেছে। ” তানভির আগপাছ না ভেবে মিনহাজকে এলোপাতাড়ি মাইর শুরু করলো। তামিম বাঁচাতে আসলে তামিমের গায়েও বেশ কিছু মাইর পরেছে। রাকিব, রাসেল তাড়াতাড়ি গিয়ে তানভিরকে টেনে হিঁচড়ে সরিয়ে আনলো। দুজনে মিলেও তানভির কে আঁটকে রাখতে

পারছে না। মাইরের চুটে মিনহাজের হাতের ফুলগুলো মাটিতে পরে গেছে। মিনহাজের নাক দিয়ে রক্ত বের হচ্ছে। রাকিব আর রাসেল তানভিরকে শান্ত করে গম্ভীর কণ্ঠে বলল, "তুই মেঘকে নিয়ে বাসায় যা। তানভির মেঘকে ধমক দিতে গেলে রাকিব সঙ্গে সঙ্গে ভারী কণ্ঠে বলল, "তানভির, মেঘকে কিছু বলবি না।চুপচাপ বাসায় নিয়ে যা।" তানভির দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বন্যার দিকে একপলক তাকালো। রাগ আর ক্রোধ যেন বেড়িয়ে আসতে চাইছে। ঘুরে যেতে নিলে ফুলগুলোর দিকে তানভিরের নজর পরে। সঙ্গে সঙ্গে পায়ের জুতা দিয়ে টকটকে গাল গোলাপ গুলো পিষে ফেলেছে। মিষ্টিরা চোখ নামিয়ে সেই দৃশ্য দেখলো। কেউ চোখ তুলে তানভিরের মুখের দিকে তাকাতে পারছে না কেউ। তানভির বাইকের কাছে যেতে যেতে মিনহাজদের দিকে তাকিয়ে রাগান্বিত কণ্ঠে হুঙ্কার দিল, " আমি এখন চলে যাচ্ছি ঠিকই কিন্তু আমার ভাইয়ের কিছু হলে তোদের খবর আছে বলে দিলাম।" তানভির বাইকে স্টার্ট দিয়ে মেঘকে উদ্দেশ্য করে ভারী কণ্ঠে বলল, "উঠ।" রাকিব আবারও বলল, "মেঘকে চুপচাপ বাসায় নামাইয়া দিবি। রাগ দেখাবি না বললাম।" তানভির মিনহাজদের দিকে একবার তাকালো। গম্ভীর কণ্ঠে রাকিববের উপর চেঁচিয়ে উঠল, "আমার ভাইকে তাড়াতাড়ি খোঁজে বের করো। না হয় লা*শ ঘোম করার ব্যবস্থা করো। আমি আসছি।"আবিরকে, রাকিব আর রাসেল মিলে কলের পর কল দিচ্ছে কিন্তু আবির একবারের জন্যও কল ধরছে না। প্রথম দিকে আবিরের ফোনে কল ঢুকলেও কিছুক্ষণ পরই আবির ফোন বন্ধ করে

ফেলেছে। মিষ্টি, সাদিয়া আর লিজা একে অপরের দিকে অসহায়ের মতো তাকিয়ে আছে। বন্যা বিড়বিড় করে বলল, " তোদের সাবধান করেছিলাম, একবারের জন্যও কথা শুনলি না। " ওরা একসঙ্গে বলল, "সরি দোস্ত। " রাকিব, মিনহাজ আর তামিমের দিকে তাকিয়েই দেখছে না। পাবলিক প্লেসে মারছিল বলে বাধ্য হয় তানভিরকে তখন আঁটকিয়েছিল রাকিব। না হয় তানভিরের সাথে সাথে রাকিবও দুটাকে পিটাইতো।ওদের প্রতি প্রায় ৫ মাসের ক্ষোভ জমে আছে রাকিবের মনে । রাকিবের কলিজার বন্ধু আবির, আবিরের সবকিছুতে রাকিব যেমন সবার আগে এগিয়ে আসে তেমনি আবিরও তাই। ছোট বেলা থেকেই ওদের ফ্রেন্ডশিপ অনেক স্ট্রং। সচরাচর দেখা যায় এক বন্ধু ঝগড়া লাগলে আরেক বন্ধু থামায় অথচ ওদের মধ্যে এমন সম্পর্ক যে একজন ঝগড়া লাগলে আরেকজন সঙ্গ দেয়। দুজন মিলে ঐ ছেলেকে মারে। কলেজ জীবনে রাকিব টুকিটাকি রাজনীতি করতো, কিন্তু আবিরের সেসবে কোনো ইন্টারেস্ট ছিল না। তবে রাকিবের সাথে যে ই লাগতে আসতো দুই বন্ধু মিলে ঐটার অবস্থা খারাপ করে ফেলতো। পরবর্তীতে কলেজের পরীক্ষায় রাকিবের রেজাল্ট খারাপ হওয়ায় আবির বুঝিয়ে শুনিয়ে রাকিবকে রাজনীতি থেকে সরিয়ে এনেছিল। এখনও কলেজের অনেক বন্ধুরা রাকিবকে লিডার বলে ডাকে। রাকিব আবিরকে কল দিয়েই যাচ্ছে, এই সুযোগে রাসেল চোখের ইশারায় মিনহাজ আর তামিমকে চলে যেতে বলল। কারণ তানভির যদি বাই চান্স আবার এখানে আসে আর মিনহাজদের সামনে পায় তাহলে এবার

আর ওদের বাঁচানো যাবে না। তামিম মিনহাজকে নিয়ে চলে গেছে। রাকিব কিছুক্ষণ পর বিষয়টা খেয়াল করেছে তবুও রাসেলকে কিছু বলে নি। রাকিবের সব টেনশন এখন আবিরকে নিয়ে। শহরের আশেপাশে যত বন্ধু আছে একে একে সবাইকে কল দিয়ে জানিয়েছে। যাদের বাইক আছে তারা বাইক নিয়ে বেরিয়ে পরেছে। রাকিব এগিয়ে গিয়ে একটা রিক্সা ঠিক করে বন্যাকে বললো, "তুমি বাসায় চলে যাও" বন্যা "আচ্ছা" বলে চলে গেছে। রাকিব বাকিদের উদ্দেশ্যে রেগে বলল, "তোমরা যাও এখন" রাকিবের রাগী স্বর শুনে ওরাও মাথা নিচু করে চলে গেছে। পরিস্থিতি অস্বাভাবিক দেখে রাসেলের গার্লফ্রেন্ড চলে গেছে। রাকিব রাসেলকে নিয়ে বাইক স্টার্ট দিল। তানভির মেঘকে বাসার সামনে নামিয়ে দিয়েই চলে গেছে, একটা কথাও বলে নি। রাকিবরা প্রায় ১ ঘন্টা যাবৎ আনাচে কানাচে ঘুরছে অথচ আবির একেবারে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। কেউ আবিরের কোনো খোঁজ পাচ্ছে না। বন্যা বাসায় গিয়েই মেঘকে কল দিল। মেঘ রিসিভ করতেই বলল, "কিরে তুই ঠিক আছিস?" মেঘ মৃদুস্বরে বলল, "আমি ঠিক আছি কিন্তু আবির ভাইয়ের কোনো খোঁজ পাচ্ছি না। " "তুই আবির ভাইয়া কে কল দে" "আমার ভয় লাগতেছে।" "এখন ভয় লাগে কেন? এতদিন বারণ করার পরও তো একটু ভয় লাগলো না" "আমি এখন কি করবো?" " আবির ভাইয়াকে কল দে আর কিছু করতে হবে না। " " ওনি কি কল ধরবেন?" "ধরবেন কি না সেটা দিলেই বুঝবি। তুই ওনাকে রাগাইছিস তোকেই শান্ত করতে হবে। " "আমি পারবো

না। ভয় লাগতেছে। ” “আর একটা কথা বললে তোর খবর আছে বলে দিলাম। মিনহাজ, মিষ্টিদের কথায় লাফানির সময় ভয় ডর কোথায় ছিল তোর?” “আচ্ছা দিচ্ছি কল।” বন্যার কল কেটেই মেঘ আবিরের নাম্বার বের করল। ভয়ে বুক কাঁপছে অবিরাম। ৫ মিনিট অপেক্ষার পর বুকে সাহস নিয়ে আবিরের নাম্বারে ডায়াল করল। আবিরের ফোন বন্ধ পেয়ে আঁতকে উঠলো মেঘ। বার বার কল দিতে লাগলো। ভয় আর দুশ্চিন্তা তিনগুণ বেড়ে গেছে। রাকিব, রাসেল, তানভির এদিকে মেঘ সবার একাধারে কল দেয়ার কারণে একবার নেটওয়ার্ক বিজি বলছে আবার বন্ধ বলছে। মেঘ আজ পর্যন্ত যতবার আবিরকে কল দিয়েছে কোনো সময় ফোন বন্ধ পায় নি আজই প্রথম আবিরের ফোন বন্ধ। মেঘ রাগের চোটে কান্না শুরু করে দিয়েছে। প্রায় ১৫ মিনিট একের পর এক কল করতে করতে অবশেষে একটু থামলো। ভয়ে ভয়ে কল করলো তানভিরকে। তানভির কল রিসিভ করতেই মেঘ উদ্বিগ্ন কণ্ঠে শুধালো, ” আবির ভাইয়ের কোনো খোঁজ পেয়েছো ভাইয়া?” তানভির ঢোক গিলে নিজেকে ধাতস্থ করে স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, ” না, বাসায় আপাতত কিছু বলিস না।” “আচ্ছা” তানভির কল কেটে দিয়েছে। মেঘের টেনশনে হাত পা ঠান্ডা হয়ে আসছে। সন্ধ্যা হয়ে গেছে অথচ এখনও আবিরের কোনো খবর নেই। আজ বাসায় তেমন মানুষও নেই। মীমের নানু খুব অসুস্থ তাই মীমরা দুদিন হলো ওদের নানুবাড়িতে গেছে। ইকবাল খান মীমদের নিয়ে গেছেন এখনও বাসায় আসেন নি। হালিমা খান আর মালিহা খান

বাসায় আছেন। আলী আহমদ খান অফিসে। মোজাম্মেল খান আজ সকালেই রাজশাহী গেছেন। মেঘ উপুড় হয়ে শুয়ে ফোনে আবিরের ছবি দেখছে আর অঝোরে কাঁদছে। মেঘের বর্তমান বয়সটায় দোষের। এই বয়সে এমন ঘটনা ঘটানো অস্বাভাবিক কিছু না। আবির ভাইয়ের প্রতি বেধক আবেগ, ভালোবাসি শুনার তীব্র আকাঙ্খায় যে যা বলেছে সব শুনেছে। নিজের করা ভুলের জন্য এখন খুব প্রস্তাচ্ছে। সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত হতে চললো কিন্তু আবিরের কোনো হদিস নেই। আলী আহমদ খান ৭ টার দিকে বাসায় ফিরেছেন। আলী আহমদ খান নিজেও আবিরকে ২-৩ বার কল দিয়েছেন। আবিরের ফোন বন্ধ পেয়ে বাসায় এসে মালিহা খানকে শুধালেন, "আবির কি বাসায় আসছে?" "এখনও আসে নি " "ওর ফোন বন্ধ কেন? তোমার সাথে কথা হয়েছে?" "নাহ। হয়তো ফোনের চার্জ শেষ। তুমি দুশ্চিন্তা করো না" আলী আহমদ খান অল্প নাস্তা করে শুয়ে পরেছেন। একটু পর মেঘের ফোনে আননোন নাম্বার থেকে কল আসলো। প্রথম বার রিসিভ করল না। দ্বিতীয় বার রিসিভ করতেই ওপাশ থেকে রাকিব আতঙ্কিত কণ্ঠে প্রশ্ন করল, "আবির, কোথায় তুই?" মেঘ স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, " আমি মেঘ। " "মেঘ আমি তোমার রাকিব ভাইয়া" "জ্বি ভাইয়া, চিনতে পারছি। " রাকিব কিছুটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে জিজ্ঞেস করল, "আবির কি বাসায় গেছে?" মেঘ আকুল স্বরে বলল, "এখনও আসে নি। ওনি কোথায় আছে ভাইয়া?" রাকিব তটস্থ হয়ে বলল, " আবির বাসায় যায় নি? তাহলে এই নাম্বার? " 'এটা আমার নাম্বার। ভাইয়া সীমটা আমায়

দিয়েছিল " রাকিব শান্ত স্বরে বলল, "ওহ আমি জানতাম না, সরি। আসলে এই সীম টা আগে আবির ইউজ করতো। দেশের বাহিরে যাওয়ার আগ পর্যন্ত এটায় ওর নাম্বার ছিল। পরে নতুন সীম নিয়েছে। এত বছর যাবৎ নতুন সীম গুলোতেই যোগাযোগ করে আসছি। আজ ওর ফোন বন্ধ পেয়ে অনেক খোঁজে এই নাম্বার টা পেয়েছি। এই সীম তাহলে তোমায় দিয়ে দিছে!" মেঘের মাথায় এবার আকাশ ভেঙে পরেছে। প্রায় ২-৩ বছর যাবৎ মেঘ এই সীম ইউজ করছে। ভেবেছে তানভিরের সীম তাই তেমন মাথাও ঘামায় নি। অথচ এই সীম আবির ভাইয়ের। এক মুহূর্তেই মেঘের চোখ অন্ধকার হয়ে আসছে। নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না। সামান্য ভালোবাসার কথা শুনার জন্য মেঘ এতটা উতলা হয়ে ছিল অথচ মেঘের সবকিছু জুড়েই আবিরের স্মৃতি জড়িয়ে আছে। আবির ভাই তাকে সবদিক থেকে আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে রেখেছে। মেঘ করুণ স্বরে বলল, "ওনার খোঁজ পেলে আমায় জানাবেন, প্লিজ। " "অবশ্যই। রাখছি " রাকিব কল কেটে দিতেই মেঘ ফোন বিছানায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। নিজের উপর এত রাগ হচ্ছে যে কি করতে কি করবে কিছুই বুঝতে পারছে না। ফ্লোরে বসে দু'হাতে নিজের চুল মুষ্টিবদ্ধ করে ধরে অপরিচ্ছিন্নভাবে কেঁদেই চলেছে। রাত প্রায় ৯ টার পর তানভির হঠাৎ হালিমা খানকে কল দিল। তানভিরের কথা শুনে হালিমা খান আর্তনাদ করে উঠলেন। তানভির কল কাটতেই হালিমা খান ছুটে গেলেন মালিহা খানের কাছে, মেঘকে অবিরত ডাকতে লাগলেন। মেঘ চোখ মুছে বেলকনিতে

আসতেই দেখল বড় আব্বু, বড় আম্মু বাসা থেকে বেড়িয়ে যাচ্ছেন। হালিমা খান উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললেন, “মেঘ তাড়াতাড়ি আয়, আমাদের বের হতে হবে।” “কোথায়?” “তুই আয় আগে।” মেঘ চিন্তিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, “রেডি হতে হবে না? ” “না। যেভাবে আছিস সেভাবেই চল।” মেঘ দ্রুত নেমে আসলো। হালিমা খান বাসা তালা দিয়ে গাড়িতে বসলেন। মালিহা খান শীতল কণ্ঠে শুধালো, “কে অসুস্থ? বললে না তো!” মেঘ বুকটা ছ্যাত করে উঠল। বুকের ভেতরটা কেমন যেন মোচড় দিচ্ছে। ফোন টাও বাসায় ফেলে আসছে। আবির ভাইয়ের খোঁজ পায় নি এখনও। মেঘের গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে। কথা বের হচ্ছে না গলা দিয়ে। হালিমা খান স্বাভাবিক কণ্ঠে বললেন, ” হাসপাতালে গিয়ে দেখি। ” মালিহা খান আর্তনাদ করে উঠলেন, “আমাদের কারো কিছু হয়েছে?” হালিমা খান তানভিরকে কল দিয়ে হাসপাতালের ডিটেইলস নিয়েছে। মালিহা খানের কথার কোনো উত্তর দেন নি। জ্যাম পেরিয়ে হাসপাতালে আসতে আসতে ১০ টার উপরে বেজে গেছে। হাসপাতালের সামনেই রাকিব দাঁড়ানো ছিল। সবাই নামতেই রাকিব রাস্তা দেখিয়ে ভেতরে নিয়ে যাচ্ছে। মেঘ হাঁটছে ঠিকই তবে হাঁটায় কোনো গতি নেই। অক্লিষ্ট আঁখিতে মেঘ রাকিব ভাইয়াকে দেখছে। রাকিবের শার্টে ছোপ ছোপ রক্তের দাগ লেগে আছে। দেখে বুঝা যাচ্ছে শার্ট টা ভেজা। মেঘের পা চলছে না, ভয়ে হাত-পা কাঁপছে। মাথা ঘুরছে, চোখে ঝাপসা দেখছে। কোনোরকমে ওদের পেছন পেছন একটা রুমের দরজা পর্যন্ত এসেই সবাই থমকে

দাঁড়ালো। প্রাইভেট ক্লিনিকের একটা ছিমছাম রুমের বেডে বেহুঁশ অবস্থায় শুয়ে আছে আবির। মাথায় সাদা ব্যান্ডেজ, ডান হাতে, ডানপায়ে ব্যান্ডেজ করা। আবিরকে এ অবস্থায় দেখে ছুটে গিয়ে মালিহা খান আবিরকে ধরে বিলাপ শুরু করে দিয়েছেন। আলী আহমদ খান করুণ দৃষ্টিতে ছেলেকে কিছুক্ষণ দেখে আশপাশে নজর দিলেন। তারপর ভারী কণ্ঠে রাকিবকে শুধালেন, "কি হয়ছিল?" "বাইক এক্সিডেন্ট করেছে।" আলী আহমদ খান সঙ্গে সঙ্গে হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, " বাইক কিনার সময় ই বলছিলাম, এক বারের জন্যও আমার কথা মানলো না। " আলী আহমদ খান আবারও হুঙ্কার দিয়ে উঠল, "তানভির কোথায়?" রাকিব আস্তে করে বলল, "ইম্পর্ট্যান্ট কাজে গেছে।চলে আসবে।" "ওর কি এমন ইম্পর্ট্যান্ট কাজ? " রাকিব মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে। কিছুই বলছে না। এদিকে মেঘ নিস্তব্ধ হয়ে দাড়িয়ে আছে, এক চুল নড়ছে না। মেঘের অবিক্ষিপ্ত আঁখি যুগল আবিরের পরিশ্রান্ত চেহারায় আঁটকে আছে। হালিমা খান, মালিহা খান অঝোরে কেঁদেই চলেছেন কিন্তু মেঘের চোখে এক ফোঁটা পানি নেই, পাথরের ন্যায় দাঁড়িয়ে আছে, নেই কোনো অনুভূতি। তানভির হালিমা খানকে ফোন করে আগেই সবটা জানিয়েছিল,হালিমা খানকে শক্ত থেকে মেঘ সহ বড় আব্বু, বড় আম্মু কে নিয়ে আসতে বলছিল। তাই হালিমা খান বুকে পাথর চেপে স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করেছেন। আবিরের জ্ঞান ফিরছে না, ডাক্তার বলেছেন মাথায় চাপ খাওয়ায় ঘন্টা কয়েক সময় লাগবে। আপাতত হাসপাতালেই রাখতে বলেছেন।

এরমধ্যে তানভির আসছে। হালকা রঙের শার্ট টা রক্তের দাগে কালো খয়েরী রঙ ধারণ করেছে। দুহাতে, পায়ে, গায়েও রক্ত লেগে আছে। কিছু রক্তের দাগ শুকিয়ে গেছে আর কিছু দাগ এখনও ভেজা। এক্সিডেন্ট এর খবর শুনে তানভির সবার আগে আবিরের কাছে পৌছেছিল। রাস্তায় স্প্রীড ব্রেকারের কাছে আবিরের রক্তাক্ত দেহ নিথর হয়ে পরে ছিল। টকটকে লাল রক্তে অর্ধেক রাস্তা ভরে গিয়েছিলো। তানভির আবিরকে একায় এম্বুলেন্সে উঠিয়ে হাসপাতাল পর্যন্ত নিয়ে আসছে। হাসপাতালে রাকিব আর রাসেল আগে থেকেই উপস্থিত ছিল। রাকিব আর তানভির মিলে আবিরকে ইমার্জেন্সি ওয়ার্ডে নিয়ে গিয়েছিল। আবিরের চিকিৎসা শুরু করা মাত্র তানভির এই অবস্থাতেই হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে গেছে। আবিরকে রুমে দেয়ার পরপরই রাকিব রাসেলকে বাসায় পাঠিয়েছে, রাকিবের টিশার্ট আর অন্যান্য কিছু জিনিস নিয়ে আসছে। তানভির রুমে ঢুকতেই আলী আহমদ খান হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, “কোথায় ছিলে?” তানভির শার্টের হাতার ফোল্ড খুলতে খুলতে গম্ভীর স্বরে বলল, “কাজ ছিল।” “তোমার ভাইকে একা ফেলে যাওয়ার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল?” তানভির রাগী স্বরে বলল, “হয়তো।” তানভির হালিমা খানকে আগেই বাসা থেকে ড্রেস আনতে বলেছিল। তানভির ব্যাগ থেকে একটা টিশার্ট আর প্যান্ট বের করে ওয়াশরুমে চলে গেছে। আলী আহমদ খান পাশে একটা চেয়ারে দুহাতে মাথা চেপে ধরে বসে আছেন। একমাত্র ছেলে এক্সিডেন্ট করে হাসপাতালে অজ্ঞান অবস্থায় পরে থাকলে কোনো বাবা মা ই ঠিক

থাকতে পারেন না। এরমধ্যে মোজাম্মেল খান কল দিয়েছেন। আলী আহমদ খান ফোন রিসিভ করতেই মোজাম্মেল খান স্বাভাবিক কণ্ঠে বললেন, “ভাইজান, কেমন আছো?” “আলহামদুলিল্লাহ। তুই কেমন আছিস?” “আলহামদুলিল্লাহ। বাসার সবাই কেমন আছে?” “কেমন আর থাকবে। তোর ভাতিজা এক্সিডেন্ট করে হাসপাতালে পরে আছে। ” “কে আবির?” “হ্যাঁ” “কবে? কিভাবে?” “আজকেই,কিছুক্ষণ আগে। কিভাবে এক্সিডেন্ট করছে এটা ছেলের জ্ঞান ফিরলে বলতে পারবো। এখনও জ্ঞান ফিরে নি।” “আমি রওনা দিব এখন?” “নাহ। ডাক্তার বলছেন তেমন সমস্যা নেই। কয়েক ঘন্টার মধ্যে জ্ঞান ফিরবে। তাছাড়া কাল পরশু নাগাদ হয়তো বাসায় নিয়ে যেতে পারব। তুই কাজ শেষ করেই আয়।” “আচ্ছা। তানভিরের কি অবস্থা? ” “ওর অবস্থা আমি বলতে পারবো না। আবিরকে হাসপাতালে এনে কোথায় গেছিলো কে জানে মাত্র আসছে। ” “তোমরা সাবধানে থেকো। আর আমি তানভিরের সাথে কথা বলে নিব।” রাত ১২ টা বাজতে চললো আবিরের এখনও জ্ঞান ফিরে নি। তানভির আর রাকিব হাসপাতালের বেলকনিতে বসে আছে। মেঘ আবিরের পায়ের কাছে বসে আছে, হালিমা খান, মালিহা খান দুজনেই আবিরের পাশে বসে আছেন।তানভির রুমে এসে স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, “তোমাদের এখানে থাকতে হবে না। আমি আর রাকিব ভাইয়া আছি। কোনো সমস্যা হলে জানাবো।” মালিহা খান সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, “আমি যাব না এখানেই থাকবো। আবিরের জ্ঞান ফিরবে কখন?” “ডাক্তার বলছেন

একটু সময় লাগবে। অপেক্ষা করা ছাড়া আমাদের হাতে আর কোনো উপায় নেই। ” “জ্ঞান না ফিরলে আমি বাসায় যাব না। ” “বড় আম্মু প্লিজ এমন করো না। তুমি অসুস্থ তাছাড়া বড় আব্বুরও পর্যাপ্ত রেস্ট নেয়া দরকার। তোমরা বাসায় গিয়ে ঘুমাও। সকালে রান্না করে খাবার নিয়ে এসো।” মালিহা খানের আপত্তি স্বত্বেও তানভির হালিমা খানকে চোখের ইশারায় বুঝালো, ওনাদের নিয়ে যাওয়ার জন্য। মেঘ মাথা নিচু বসে আছে। তানভির মেঘকে উদ্দেশ্য করে ঠান্ডা কণ্ঠে বলল, “আম্মুরা বাসায় যাচ্ছে তুই ও বাসায় চলে যা। ” মেঘ মাথা নিচু করেই উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলল, “আমি কোথাও যাব না।” ” সমস্যা নেই, আমরা আছি, তুই বাসায় যা।” “আমিও থাকবো।” তানভির শক্ত কণ্ঠে বলল, “মেঘ” মেঘের চোখ টলমল করছে, চোখ তুলে তাকালো তানভিরের দিকে। করুণ স্বরে বলল, “প্লিজ ভাইয়া, আমি থাকি। ” তানভির গম্ভীর কণ্ঠে মেঘকে বুঝানোর চেষ্টা করল। কিন্তু মেঘ যাবে না মানে যাবেই না। বাধ্য হয়ে তানভির আম্মু, বড় আম্মু আর বড় আব্বুকে বুঝিয়ে শুনিয়ে গাড়ি পর্যন্ত দিয়ে আসছে। হালিমা খান মেঘকে নিয়ে যেতে চাইলে তানভির স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, “বনু থাকতে চাচ্ছে থাকুক। তাছাড়া তোমরা তো সকালে আসবেই। তুমি বড় আব্বু আর বড় আম্মুর খেয়াল রেখো। ” “ঠিক আছে। সাবধানে থাকিস। আর মেঘকে দেখে রাখিস। ” “আচ্ছা যাও তোমরা। ” ওরা চলে যেতেই বন্যার নাম্বার থেকে তানভিরের ফোনে কল আসছে। তানভির কল রিসিভ করতে করতে ভেতরে গেল। বন্যা উতলা হয়ে শুধালো, “আবির ভাইয়া কেমন

আছেন? ” “আমার ভাইয়ের খবর নেয়ার কি দরকার। চিন্তা করো না, তোমাদের আশা পূরণ হয়েছে।” “মানে?” “ভাইয়া এক্সিডেন্ট করে এখন হাসপাতালে ভর্তি আছে। ” “কি বলছেন এসব!” “তোমরা তো এটায় চাইছিলে।” বন্যা মলিন স্বরে বলল, “বিশ্বাস করুন আমি এমন কিছু চাই নি। ওরা মজা করছিল আর.. ” তানভির হুঙ্কার দিল, “তুমি ওখানে কি করছিলে? তুমি মেঘকে বারণ করতে পারলে না?” “ও আমার কথা শুনে নি। আমি বারণ..” “কিসের বেস্ট ফ্রেন্ড তুমি? বারণ করা স্বত্তেও বনু তোমার কথা অমান্য করে কিভাবে?” বন্যা আস্তে করে বলল, “মেঘ কোথায়?” “আছে। ” “ও কে একটু দেয়া যাবে?” ” কি দরকার? কথা যখন মানাতেই পারো নি তাহলে এখন আর কথা বলতে হবে না।” “একটু দরকার ছিল। ” “কি দরকার আমায় বলো।” “মিনহাজ আর তামিমকে ফোনে পাচ্ছি না। ওদের সাথে মেঘের কথা হয়েছে কি না জানতাম।” “মিনহাজ আর তামিম যেখানে থাকার সেখানেই আছে। বনুর সাথে কথা হয় নি। শান্তি?” “মানে? কি করেছেন ওদের?” “যা করার তাই করেছি। আগামী তিনদিন তাদের কোনো খোঁজ পাবে না। ” “কি বলছেন কি এসব? কি করেছেন ওদের? ওরা কোথায়?” “ওদের প্রতি ভীষণ দরদ দেখা যাচ্ছে! তোমার যদি দুদিনেই বন্ধুত্বের সম্পর্কের প্রতি দরদ উথলায় পড়ে তাহলে ভাবো ওদের জন্য আমার ভাই এক্সিডেন্ট করছে। যে ভাইয়ের সাথে আমার রক্তের সম্পর্ক, জন্মের পর ২৪ বছর যাবৎ ভাইয়ার ছায়ায় আমি বড় হয়েছি। ভাইয়া আমার জীবনে বন্ধুর থেকেও কয়েকগুণ

বেশি কিছু। ফারদার যদি বন্ধুদের খোঁজ নিতে আমায় কল করেছো তাহলে তোমার খবর আছে বলে রাখলাম” তানভির কল কেটে মেঘের কাছে আসছে। মেঘ তখনও আবিরের পায়ের কাছেই বসে ছিল। তানভির রুমে এসে তপ্ত স্বরে বলল, “তুই ভাইয়ার কাছে থাক। আমি আর রাকিব ভাইয়া বাহিরে আছি। কোনো ধরনের সমস্যা হলে ডাকিস। ” “আচ্ছা। ” তানভির রুমের লাইট অফ করে একটা ড্রিম লাইট জ্বালিয়ে দিয়ে যেতে নিয়ে আবার পেছন ফিরে তাকিয়ে বলল, “দরজা টা ভেতর থেকে বন্ধ করে দে।” তানভির চলে যেতেই মেঘ এগিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল। হালকা সবুজ রঙের আলোতে আবিরের মুখের পানে তাকিয়ে রইলো মেঘ। নিস্তব্ধ পরিবেশে আবিরকে দেখে ভেতর ফেটে কান্না আসছে মেঘের। আচমকা আবিরের পাশে বসে আবিরের বুকের উপর মাথা রেখে কাঁদতে শুরু করেছে। দীর্ঘসময় ধরে অঝোরে কাঁদছে, মেঘের চোখের পানিতে আবিরের বুক ভিজে গেছে। কত সময় ব্যাপী মেঘের গভীর ক্রন্দন চললো তা জানা নেই। শ্বাস ছেড়ে কান্নারত অবস্থায় বলতে শুরু করল, “আমি মিনহাজকে পছন্দ করি না। একটুও করি না। আপনাকে ছাড়া আমি কাউকে পছন্দ করি না। আপনি আমার জীবনের প্রথম এবং একমাত্র ভালোবাসা। আবির ভাই কে ছাড়া মেঘ একেবারে নিঃস্ব । বিশ্বাস করুন, আমি আপনাকে অনেক ভালোবাসি। আপনাকে আমি এভাবে দেখতে চাই নি। আমি শুধু আপনার মুখে ভালোবাসি শব্দটা শুনতে চেয়েছিলাম আর কিছুই চাই নি আমি। মিনহাজরা আমায়

বুঝিয়েছিল আমি এমন আচরণ করলে আপনি আমায় ভালোবাসি বলবেন, আপনার মনের কথা আমায় জানাবেন। ওদের কথা মেনে আমি আপনার সাথে উল্টাপাল্টা আচরণ করছি। আমায় মাফ করে দেন প্লিজ। আমি আর জীবনেও কারো কথা শুনবো না। আপনি ভালো না বাসলেও আমি কোনোদিন বাড়াবাড়ি করবো না। আমি সারাজীবন আপনাকে এক তরফা ভালোবাসবো। কোনোদিন কোনো অধিকার দেখাবো না। আপনি সুস্থ হয়ে উঠুন প্লিজ। আপনি অসুস্থ থাকলে আপনার চড়ুই এর কি হবে!" কিছুক্ষণ চুপ থেকে মেঘ আবার বলতে শুরু করলো, "ছোট বেলা আপনি আমায় একটা থাপ্পড় দিয়েছিলেন বলে আমি আপনার সাথে দিনের পর দিন কথা বলি নি। আপনি অনেক চেষ্টা করেছেন তবুও আমি বলি নি। আপনি তারপরও আমায় নিঃস্বার্থভাবে ভালোবেসেই গেছেন। দেশে ফেরার সময় সবচেয়ে বেশি গিফট আমার জন্যই নিয়ে আসছেন। আপনি বাইক কিনে বাসায় আসার পর প্রথমবার আপনাকে দেখে আমার হৃৎস্পন্দন থেমে গেছিলো। সেদিন আমি প্রথমবারের মতো আপনার প্রতি দূর্বলতা অনুভব করেছিলাম। তারপর থেকে প্রতিদিন প্রতিক্ষণে আপনার প্রতি দূর্বল হতে শুরু করি। দেখতে দেখতে সেই দূর্বলতা কখন ভালোবাসায় পরিণত হয়ে গেছে আমি বুঝতেই পারি নি। আপনি আমার কাছাকাছি থাকলে আমার আকাশে রংধনু উঠে, মনটা প্রজাপতির মতো ঘুরে বেড়ায়। আপনি দূরে চলে গেলেই মনের উঠোনে বৃষ্টি নামে। ক্ষণে ক্ষণে আপনি নিজের অজান্তেই আমায় নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করেছেন।

আপনি হয়তো জানেন ও না আপনাকে দেখার জন্য প্রতিদিন কত ঘন্টা বেলকনিতে অপেক্ষা করি, কত রাত নির্ঘুম কাটায়। আপনার এক ঝলক হাসি দেখার জন্য ঘন্টার পর ঘন্টা আপনার অভিমুখে চেয়ে থাকি। আপনার প্রতি এতবছরের ক্রোধ কয়েক মাসেই কিভাবে যেন প্রণয়ে রূপ নিয়েছে। এখন রাগ করলেও সেই রাগ বেশিসময় স্থির হয় না। আপনার একটু যত্নেই সব ভুলে যায়। কিন্তু সব ভুলে গেলেও আপনার আশেপাশে কোনো মেয়ের ছায়া আমি কোনোভাবেই সহ্য করতে পারি না। মালা আপু,এমপির মেয়ের আচরণে আমায় যতটা রাগিয়েছিল তার থেকে কয়েকগুণ বেশি কষ্ট পেয়েছিলাম, যেদিন আপনি বলেছিলেন আপনি বিবাহিত, একটা বাচ্চা আছে। তখন ২ রাত আমি শুধু কেঁদেই ছিলাম। আপনার অনাদেয় কর্মকাণ্ড আর কিছু অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণে ক্ষুদ্ধ হয়ে মিনহাজদের তালে তাল মিলিয়েছিলাম। আপনার অধিকারবোধ আমায় বরাবরই আকৃষ্ট করে। তবে আজ কেন অধিকার দেখান নি? আমি আপনার কথায় “হ্যাঁ” বলেছিলাম যাতে আপনি আপনার মনের ভাব প্রকাশ করতে পারেন। আপনি তখন আমায় দুটা থাপ্পড় দিয়ে কেন কিছু বললেন না। কেন আপনি নিশ্চুপ থেকে নিজের ক্ষতি করেছেন?” মেঘের কান্না ধীরে ধীরে কমে এসেছে তবে এখনও ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাদঁছে। আবিরের বুকে মাথা রেখেই দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল, ” আজকের পর আর কোনোদিন কোনোপ্রকার বাড়াবাড়ি করবো না। আপনি যেভাবে চান, আমি সেভাবেই চলবো। আপনার ভালোবাসা আদায় করতে আর

উঠেপড়ে লাগবো না। আপনি ভালোবাসলেও আমি আপনার, আপনি ভালো না বাসলেও আমি আপনার। তবুও প্লিজ সুস্থ হয়ে উঠুন। ”

গভীর রাত পর্যন্ত মেঘ আবোলতাবোল বলেই গেছে, আর আবিরকে ডেকেছে। ধীরে ধীরে মেঘ শান্ত হয়ে গেছে। ক্লান্তিতে আবিরের বুকে মাথা রেখে, দু’হাতে জড়িয়ে ধরা অবস্থাতেই ঘুমিয়ে পরেছে। ১ মিনিট, ২ মিনিট, ৫ মিনিট পর ঘুমের মধ্যে মেঘের নিঃশ্বাস ভারী হয়ে গেছে। সহসা পিটপিট করে চোখ মেলল আবির। জ্ঞান ফিরেছে অনেকক্ষণ আগে, প্রেয়সীর আবেগজড়িত অনুদ্বিগ্ন অনুভূতি শুনতে ইচ্ছে করেই চোখ বন্ধ করে রেখেছিল। আবির চোখ নামিয়ে তাকালো মেঘের ক্রন্দিত মুখের পানে। মৃদু আলোতে আবিরের প্রেয়সীকে দেখলো খানিকক্ষণ। সহসা চোখ বন্ধ করে লম্বা করে শ্বাস ছাড়লো। এটা প্রথমবার নয়। মেঘ আবিরের জন্য প্রথমবার যখন কেঁদেছিল তারপর ১ সপ্তাহ গলা দিয়ে কথা বের হয় নি মেঘের। তখন মেঘের বয়স ৫ কি ৬ আর আবিরের বয়স ১২ কি ১৩ চলে। আবির তখন হঠাৎ করে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পরেছিল। টানা ১৫ দিনে উপরে অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি ছিল। অবুঝ মেঘের জীবনে আবির তখন একমাত্র খেলার সঙ্গী ছিল। আবির আর তানভিরের বয়সের পার্থক্য ২ বছর হওয়ায় তানভিরের স্মৃতি আবিরের মাথায় ছিল না। তবে মেঘ জন্মের সময় আবির ৭-৮ বছরের ছিল বিদায় মোটামুটি বুঝতো। প্রথম বোন হওয়ায় মেঘকে সর্বোচ্চ আদরে রেখেছে আবির। মেঘের আদো আদো কণ্ঠের ডাক এড়িয়ে খেলতে যাওয়ার সাধ্যি ছিল না আবিরের।

সারাক্ষণ বাড়িতেই মেঘের সঙ্গে খেলতো। মেঘ ঘুমালে খেলতে বের হতো । ৭-৮ বছর বয়সের ছেলের চোখে মেঘ তখন বোন মানে বোন ই ছিল। মেঘকে বোন ব্যতীত অন্য কোনো নজরে দেখে নি আবির। ধীরে ধীরে আবির, মেঘ বড় হতে শুরু করেছে। আবিরের যত্নে মেঘ তখন থেকেই আবিরের প্রতি উন্মাদ ছিল। শিশুদের যারা বেশি আদর করে তারা তাদের সঙ্গেই বেশি সাচ্ছন্দ্য বোধ করে। হঠাৎ আবিরের অসুস্থতা ছোট্ট মেঘের মনেও গভীর আঘাত দিয়েছিল। আবির হাসপাতালে থাকাকালীন মেঘকে কেউ নিয়ে যায় নি । ১৫ দিন পর আবিরের শারীরিক অবস্থা এতটায় দূর্বল হয়ে পরেছিল যে ডাক্তার চিকিৎসা চালাতেও হিমসিম খাচ্ছিলো। আবির কোনোকিছুতেই রেসপন্স করছিল না। হার্টবিট একেবারে কমে গেছিলো। কোনোকারণে ব্রেইনে প্রেশার পরেছিল। মৃত্যুর সময় অতি সন্নিকটে চলে আসছিলো। ডাক্তার সঠিক রোগ ধরতে পারছিল না, কোনো চিকিৎসা চলছিল না। নিরুপায় হয়ে ডাক্তার বাড়িতে জানিয়েছিল, ” আবির যদি নিজ থেকে রেসপন্স না করে তবে তাকে বাঁচানো সম্ভব হবে না।” এই কথা শুনে বাড়ির সবাই হাসপাতালে হাজির হয়েছিল। সেদিন প্রথমবারের মতো ছোট্ট মেঘ আবিরের উপর উপুড় হয়ে পরে কেঁদেছিল। কাঁদতে কাঁদতে মেঘ বলছিল, “ভাইয়া উঠো, আমার সাথে খেলবে না?” মালিহা খান কেঁদে বলেছিলেন, “তোর ভাই হয়তো আর কোনোদিন তোর সাথে খেলতে পারবে না” ছোট্ট মেঘ তখনই হুঙ্কার দিয়ে উঠেছিল, “চুপ করো, ভাইয়ার কিছু হবে না।” আবিরকে শক্ত করে ঝাপ্টে ধরে আর্তনাদ

করে বলেছিল, “তোমার কিছু হলে আমার কি হবে! তুমি মরে গেলে কিন্তু আমিও মরে যাব। ভাইয়া উঠো। কথা বলো আমার সাথে।” সবাই টেনেও মেঘকে আবিরের বুকের উপর থেকে উঠাতে পারে নি। মেঘ কাঁদতে কাঁদতে একটা কথায় বার বার বলছিল, ” তুমি মরলে আমায় নিয়ে মরবা। আমি তোমাকে ছাড়া বাঁচবো না। আমিও মরে যাব।” মেঘের নিরন্তর কান্নায় হঠাৎ আবিরের জ্ঞান ফিরে, দীর্ঘ শ্বাস ছেড়ে পিটপিট করে তাকাতেই একে একে চোখে পরে বাবা, মা, চাচ্চু, মামনির কান্নারত মুখমণ্ডল সেই সাথে অনুভব করে পিচ্চি দুই হাতের স্পর্শ। আবিরের জ্ঞান ফেরায় সবাই যখন আবির কে ডাকছিল মেঘও দু’হাতে আবিরের দু গালে আলতোভাবে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলছি, “ভাইয়া, কথা বলো। ওরা বলছে তুমি নাকি মরে যাবে। তুমি একবার বলো তোমার কিছু হবে না। ” আবিরের কথা বলতে কষ্ট হচ্ছিল তবুও মেঘের কান্না দেখে মেঘের হাতে স্পর্শ করে অনেক কষ্টে বলেছিল, “আমার কিছু হবে না।” আলী আহমদ খান দ্রুত গিয়ে ডাক্তার নিয়ে আসছিলেন। ডাক্তার আবারও পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু করেন। আবিরের হার্টবিট আগের তুলনায় বেড়েছে দেখে ডাক্তার পুনরায় চিকিৎসা শুরু করেছেন। সেই থেকে আরও প্রায় ৭ দিন আবির হাসপাতালে ভর্তি ছিল। মেঘ একবারের জন্যও বাসায় যায় নি। সারাক্ষণ আবিরের মাথার কাছে বসে থাকতো।মেঘ ঘুমালে বাসায় নিয়ে যাবে বলে আবিরকে জরিয়ে ধরে ই ঘুমাতো। ৭ দিন পর আবিরকে বাসায় নিয়ে আসছে। আবির আগের তুলনায় অনেকটায় সুস্থ

হয়ে গিয়েছিল। বাসায় আসার পরও মেঘের আহ্লাদের কমতি ছিল না সারাক্ষণ আবিরকে দেখতো, আবির খেয়েছে কি না, ঔষধ খেয়েছে কি না, ঠিকমতো ঘুমাচ্ছে কি না সব নজর রাখায় যেন মেঘের একমাত্র দায়িত্ব ছিল। ১২-১৩ বছর বয়সের কিশোরের মনে হঠাৎ করেই মেঘের প্রতি অন্যরকম অনুভূতি জন্মাতে শুরু করল। জন্মের পর থেকে ৬-৭ বছর বয়স পর্যন্ত যাকে বোনের নজরে দেখে এসেছে হুট করেই তার প্রতি ভিন্ন এক টান অনুভব করতে শুরু করল। মেঘের আহ্লাদী কণ্ঠে বলা প্রতিটা কথা আবিরের হৃদয় ছুঁয়ে যেতো। কিছুদিন পর আবির মোটামুটি সুস্থ হওয়ার পর একদিন সোফায় বসে টিভি দেখছিল। তখন মেঘ ছুটে এসে আবিরের পাশে বসতে বসতে বলছিল, " ভাইয়া তুমি জানো তুমি সুস্থ হয়েছো কেন?" "কেন?" "আম্মুরা বলছে, তুমি শুধু আমার জন্য সুস্থ হয়েছো। আমি কান্না করছিলাম বলেই আল্লাহ তোমাকে সুস্থ করে দিয়েছেন। বুঝলা?" আবির মলিন হেসে বলেছিল, "এখন আমার কি করতে হবে?" "তুমি সবসময় আমার সাথে খেলবা, আমায় ঘুরতে নিয়ে যাবে, আমাকে অনেক আদর করবা, আর কখনো আমায় ছেড়ে যেতে পারবা না। " আবির সেদিন মেঘের হাতে হাত রেখে গুরুতরভাবে বলেছিল, "আজ,এই মুহুর্তে আবির মেঘকে কথা দিচ্ছে, আবির কোনোদিন তার মেঘকে ছাড়বে না। যাই হয়ে যাক না কেন, আবিরের প্রাণ মেঘেতেই সীমাবদ্ধ থাকবে।" মেঘ বলেছিল, "মনে থাকে যেন!" আবির হেসে বলেছিল, "তুই ভুলে গেলেও আমি কখনো ভুলবো না।" সেদিন থেকে

আবিরের মন মেঘেতে আঁটকে গেছে। আবির মেঘের টানে মৃত্যুর দুয়ার থেকে ফিরে এসেছিল। মেঘের আহ্লাদী আবদার আবিরকে মেঘের প্রতি সিরিয়াস করেছিল। ধীরে ধীরে আবির বড় হতে শুরু করেছে সেই সাথে মেঘের সাথে দূরত্ব বেড়েছে। মেঘও তার ছোটবেলার স্মৃতি ভুলতে শুরু করেছে। এত বছর পর আবিরের মেঘ দ্বিতীয়বারের মতো আবিরের অসুস্থতায় এভাবে কাঁদছে। আবির গভীর ভাবনা শেষে চোখ মেলে তাকিয়ে আছে মেঘের অভিমুখে। মেঘ গভীর ঘুমে বিভোর হয়ে আছে। চোখের পানি এখনও গাল বেয়ে গড়িয়ে পরছে। আবির বামহাতে মেঘের গাল মুছে, আলতো হাতে চুলগুলো ঠিক করে দিল। বাকি রাত আবিরের নির্ঘুম কেটেছে। আবিরের বুকে শুয়ে আছে আবিরের কাদম্বিনী, আবির অপলক দৃষ্টিতে ক্ষুদ্র আলোতে তার কাদম্বিনীকে দেখেই রাত কাটিয়ে দিয়েছে । ভোরের আলো ফুটতে শুরু করেছে এমন সময় আবির ঘুমিয়েছে। তার ঘন্টাখানেক পর আচমকা মেঘের ঘুম ভাঙে। নিজেকে আবিষ্কার করে আবির ভাইয়ে প্রশস্ত বুকে। চোখ তুলে তাকায় আবিরের মুখের পানে। আবিরকে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে উঠতে নিলে পিঠে ভারী কিছু অনুভব করে। ঘুমের মধ্যে চুলের খোঁপা খুলে এলোমেলো হয়ে গেছিলো, চুলের কারণে কিছু বুঝতে পারছে না। ঘাড় ঘুরিয়ে আড়চোখে তাকাতেই খেয়াল করলো, আবির বামহাতে মেঘের পিঠ বরাবর শক্ত করে ধরে রেখেছে যাতে ঘুমের মধ্যে মেঘ পড়ে না যায়। মেঘ বিপুল চোখে আবিরের হাতের দিকে তাকিয়ে আছে। নিজের

অজান্তেই মেঘের ঠোঁটে হাসি ফুটলোযাকে ঘিরে মেঘ লক্ষাধিক স্বপ্নের পাহাড় বুনেছে সেই আবির ভাইয়ের বুকে মাথা রেখে সারারাত কাটিয়েছে এটা ভেবেই মেঘের দু'চোখ আনন্দে ছলছল করছে। বুকের ভেতর অজানা অনুভূতি জেগে উঠছে। আবিরের হাতের দিকে তাকিয়ে মেঘের মন অধিকতর পুলকিত হচ্ছে। মেঘ আড়চোখে নিগূঢ় দৃষ্টিতে আবিরের সুষুপ্ত ধৃষ্টতায় কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো, চোখ সরানো বা পলক ফেলার কথা বেমালুম ভুলে গেল। অজান্তেই কাদম্বিনীর ঠোঁটে লেগে আছে ললিত হাসি। মেঘের স্বাভাবিক চেহারা মুহুর্তের মধ্যেই লজ্জায় লাল হয়ে গেছে, ক্ষণে ক্ষণে আবিরের অভিমুখে চেয়ে থাকার শক্তি হারিয়ে ফেলছে, দুর্ভেদ্য আবেশে মেঘের চোখ টানছে। মনের বিরুদ্ধে নিজেকে অক্লিষ্ট রাখার নিরবধি চেষ্টা চালাচ্ছে। আচমকা মেঘের নিঃশ্বাস থমকে গেছে মনের কোণে একটা গূঢ় প্রশ্ন উদ্গত হলো। মেঘ নিজেকে নিজে প্রশ্ন করল, " আবির ভাইয়ের জ্ঞান কখন ফিরেছে? আর ওনি কি সজ্ঞানে আমায় ধরেছেন নাকি ঘুমের ঘোরে?" মেঘ শুকনো ঢোক গিলল। হুর হুর করে বুক কাঁপছে সাথে লজ্জায় রাঙা হয়ে আছে কাদম্বিনীর উজ্জ্বল চেহারা। এভাবে আর থাকা সম্ভব হচ্ছে না। মেঘের হৃদপিণ্ডের কম্পনে আবির যেকোনো সময় সজাগ হয়ে যেতে পারে তাই মেঘ ঘুরে কাঁপা কাঁপা হাতে আবিরের হাত টা সরিয়ে কোনোরকমে উঠলো। চুল ঠিক করে ওয়াশরুম থেকে ফ্রেশ হয়ে বেড়িয়ে মাথায় ওড়না দিতে দিতে তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিল। হাতে ফোন নেই, নেই কোনো ঘড়ি, কত বেলা হয়েছে তা বুঝার

উপায়ও নেই। মেঘের দরজা খোলার শব্দে তানভির হকচকিয়ে উঠল। এসে ধীর কন্ঠে শুধালো, “ভাইয়ার জ্ঞান ফিরেছে?” মেঘ শান্ত স্বরে বলল, “মনে হয় ফিরেছে। এখন ঘুমাচ্ছেন। ” ভাই বোনের কথোপকথন শুনে রাকিবের ঘুম ভেঙে গেছে। তড়িঘড়ি করে উঠে উত্তেজিত কন্ঠে প্রশ্ন করল, “আবির উঠেছে?” মেঘ এপাশ ওপাশ মাথা নেড়ে বলল, “নাহ”। মেঘ সাইড হয়ে দাঁড়াতেই রাকিব আর তানভির রুমে ঢুকলো। ওদের হালকা পাতলা কথাতে আবিরের ঘুম ভেঙে গেছে। আবির চোখ পিটপিট করে একে একে তানভির, রাকিব আর মেঘের দিকে তাকালো। সম্পূর্ণ রুমে একবার চোখ বুলিয়ে আবির পুনরায় তানভির আর রাকিবের দিকে তাকিয়েছে। রাকিব ভ্রু কুঁচকে গম্ভীর মুখ করে আবিরের দিকে তাকিয়ে আছে। আবির এক মুহুর্ত চেয়ে থেকে অকস্মাৎ মলিন হাসলো। আবিরের হাসি দেখে রাকিবের মেজাজ গরম হচ্ছে।ফোঁস করে শ্বাস ছেড়ে রাকিব মেঘকে উদ্দেশ্য করে স্বাভাবিক কন্ঠে বলল, “মেঘ তুমি একটু বাহিরে যাও তো। ” মেঘ সরু নেত্রে রাকিবকে দেখে সাথে সাথে তানভিরের দিকে তাকালো। তানভির চোখ দিয়ে ইশারা করতেই মেঘ চুপচাপ রুম থেকে বেড়িয়ে গেছে। রাকিব রাগী স্বরে বলল, “তানভির দরজা টা বন্ধ কর” রাকিবের কথা মতো তানভির তাই করল। রাকিব আশেপাশে তাকিয়ে হঠাৎ ই এগিয়ে গিয়ে রুমের এক কর্ণার থেকে একটা পাইপ মাথার উপর তুলে দ্রুত আসতে নিলে, আবির চেঁচিয়ে উঠে, “এইইইই!” তানভির রাকিবের দিকে তাকিয়ে সহসা ছুটে গিয়ে

পেট বরাবর শক্ত করে ধরে বলল, “কি করছো তুমি!” রাকিব রাগান্বিত কণ্ঠে বলল, “ওর যে হাত আর পা টা ঠিক আছে ঐটাও ভেঙে ফেলবো। মরার যখন এত শখ তাহলে ভালো করেই মা*রি। ” তানভির ধীর কণ্ঠে রাকিবকে বলল, “থাক বাদ দাও। এমনিতেই ভাইয়ার অবস্থা খারাপ। ” রাকিব পাইপ হাতে নিয়ে আবিরের কাছে আসতে আসতে রাগে কটকট করে বলল, ” তোর ফা*টা মাথা আরও ফা*টিয়ে দিব?” আবিরের ঠোঁটে এখনও হাসি লেগেই আছে। আবির মৃদু স্বরে বলল, ” তোর ইচ্ছে হলে দে ফাটিয়ে।” রাকিব গম্ভীর মুখ করো বলল, “আবির! তোর সাহস দেখে আমি অবাক হয়ে গেছি। তুই কিভাবে পারলি এমন কাজ করতে?” আবির ভ্রু গুটিয়ে মুখ ফুলিয়ে বলল, “আমি ইচ্ছে করে করছি নাকি!” রাকিব পুনরায় বলল, ” মেঘ কি বলছে না বলছে তুই এতেই চটে গিয়ে মর-তে চলে গেলি? তুই কি ভাবছিলি, তুই মরে গেলেই সবকিছুর সমাধান হয়ে যাবে? আমাদের আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারতি ত! মেঘ বললেই হলো! প্রয়োজনে মেঘকে বিয়ের আসর থেকে উঠিয়ে এনে হলেও তোর সাথে বিয়ে দিব। আর কোন ছেলেকে সামান্য পছন্দ করে বলাতে তুই এমন কান্ড করে বসলি! মেঘের মনে যত যেই থাকুক সবগুলোকে মে*রে সেখানে তোর বসতি স্থাপন না করলে আমিও রাকিব না।” আবির মুচকি হেসে বলল, ” আমার মেঘ আমার ছিল, আমার আছে আর আমৃত্যু আমার ই থাকবে। ও কোনো ছেলেকে পছন্দ করা তো দূর, কোনো ছেলের দিকে ভালোভাবে তাকিয়েই দেখে না। ওর মন মস্তিষ্ক

জুড়ে এই আবির ব্যতীত অন্য কোনো পুরুষের অস্তিত্ব নেই। আর কোনোদিন কেউ আমার কাদম্বিনীর প্রিয় পুরুষ হতে পারবেও না। এই কনফিডেন্স আমার আছে। " "তাহলে মিনহাজের থেকে ফুল নিল যে?" "ফুল নিতে দেখছিস?" "নাহ। কিন্তু" "ছবি যা দেখছিস সবগুলোতে মিনহাজ ওকে ফুল অফার করছে। কিন্তু আমার মেঘ সেই ফুল ছুঁয়েও দেখে নি। " "তারপরও ঐ ছেলের সাহস কিভাবে হলো এভাবে মেঘকে ফুল দেয়ার?" "এটা ওদের প্ল্যান ছিল। ওরা ছবি তুলে ফেসবুকে পোস্ট করার প্ল্যান করেছিল যাতে সেটা আমার চোখে পরে। কিন্তু আমি ওখানে চলে যাওয়াতে ওরা থতমত খেয়ে ফেলছে। " "তুই এসব কিভাবে জানিস? মেঘ বলছে?" "আমি আগে থেকেই সব জানি তাছাড়া মেঘও কিছুটা বলছে। " "হারা*মী, তুই যদি আগে থেকেই সব জানতিস তাহলে এক্সিডেন্ট করতে গেছিলি কেন?" আবির গম্ভীর কণ্ঠে বলে উঠল, " আমি মেঘকে বেশি কিছুই বলতাম না। বরং ওদের সাথে আড্ডা দিয়ে আমি ওকে নিয়ে চলে আসতাম। কিন্তু ঐ ছেলের এক্সট্রা কেয়ার দেখে সঙ্গে সঙ্গে পায়ের রক্ত মাথায় উঠে গেছিল। না বুঝেই হুট করে প্রশ্ন করে বসি, মেঘ সেই ছেলেকে পছন্দ করে কি না! আমার ১০০% এর জায়গায় ১০০০% কনফিডেন্স ছিল মেঘ না বলবে। অন্তত আমার চোখের দিকে তাকিয়ে ও কোনোদিন মিথ্যা বলতে পারবে না। কিন্তু ও যখন আমার চোখে চোখ রেখে হ্যাঁ বললো তখন এক মুহুর্তের জন্য মনে হচ্ছিলো আকাশটা বোধহয় আমার মাথায় ভেঙে পরেছে। আমি দাঁড়িয়ে থাকার শক্তি পাচ্ছিলাম না। আমি

আগে থেকেই জানি এসব কিছু ওদের প্ল্যান, ওরা আমার মুখ থেকে কিছু শুনতে চাচ্ছে কিন্তু ওর "হ্যাঁ" শুনার পর নিজের উপর উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছিলাম। যখন বুঝতে পেরেছি এখানে থাকাটা রিস্ক তখন ই আমি সেখান থেকে চলে গেছি।" "একটু শান্ত থাকলেই মাথাটা ঠিক হয়ে যেত। তাহলে এভাবে এক্সিডেন্ট করতে হতো না! " "আরে বাবা, আমি ইচ্ছেকৃত এক্সিডেন্ট করি নি। আমি যেখানে জানি ও আমার, সেখানে এক্সিডেন্ট করে ম*রতে বসা বোকামি ছাড়া কিছুই না। " "তো করলি কিভাবে?" "ফাঁকা রাস্তা, মন খারাপ তাই আমি মোটামুটি ভালো স্প্রীডেই বাইক চালাচ্ছিলাম। প্রায় জনমানবশূন্য এক জায়গায় হুট করে এক পাগল বাইকের সামনে চলে আসছে। পাগলের অবস্থা তো জানিস ই, রাস্তার মাঝখানে এদিক সেদিক ছুটাছুটি করছে। যখন বুঝতে পারছি পাশ কেটে যাওয়া কষ্টকর হবে ততক্ষণে প্রায় কাছাকাছি চলে গেছি, পাগলের আলামত দেখতে দেখতে স্প্রীড ব্রেকার খেয়াল ই করি নি আচমকা ব্রেক করাতে স্প্রীড ব্রেকারে ধাক্কা লাগছে। এমনিতেই মাথা ভর্তি দুশ্চিন্তা, ধাক্কা খাওয়ায় বাইক কন্ট্রোল করার কথা ভুলেই গেছিলাম। এরপর কি হয়ছে জানি না।" তানভির তপ্ত স্বরে বলল, "বড় আব্বু কাল বেশি কিছু বলে নি। আজকে তোমার খবর ই আছে।" আবির মলিন হেসে হঠাৎ ই সূক্ষ্ম নেত্রে তানভিরের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, "তুই ওদের কিছু করিস নি তো?" রাকিব হেসে বলল, "বেশি কিছু করে নি। জাস্ট ২ দফায় হালকার উপর ঝাপসা আপ্যায়ন করেছে আর কি!" আবির সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাকিয়ে

পুনরায় শুধালো, “রাকিব যা বলছে সত্যি? কি করছিস তুই?” তানভির চোখ নামিয়ে মৃদুস্বরে বলল, ” যা করার তাই করেছি। তোমার তাদের নিয়ে ভাবতে হবে না।” “এখন কোথায় আছে?” “আছে কোনো এক জায়গায়। ” “তুই বন্যার সামনে মে-রেছিস?” “হ্যাঁ!” “তোরে আমি কি বুঝাইলাম তানভির! আর তুই এটা কি করলি?” “আমি এত মেপে চলতে পারবো না ভাইয়া। । ঐটা পাবলিক প্লেইস না হলে আর রাকিব ভাইয়ারা আমায় না আটকালে গতকাল ঐখানেই ঐ ছেলেকে খু**ন করতাম। ” আবির শান্ত স্বরে বলল, ” যুদ্ধ হয় সমানে সমানে। ওরা যতই লাফালাফি করুক না কেন, তোর, আমার কাছে ওরা এখনও অনেক ছোট। ” তানভির ফোঁস করে শ্বাস ছেড়ে গম্ভীর কণ্ঠে বলল, “ছোট হয়ে বড়দের মতো আচরণ করেছে তাই আমিও আমার রূপ দেখিয়েছি। ” “তোর আচরণে বন্যার তোর প্রতি বিদ্বেষ না চলে আসে!” “আসলে আসুক। আমার জীবনে আমার ভাই-বোনের সামনে বাকি সবকিছু গুরুত্বহীন। সে যদি এতটায় ম্যাচিউর হয় তাহলে আশা করি অবশ্যই বুঝবে।” আবির টুকটাকি কথা বলে হঠাৎ ই গুরুতর কণ্ঠে বলল, ” আমার জান টা বাহিরে একা আছে। তানভির দেখ তো, আমার ময়নাপাখি টা কি করছে!” রাকিব মৃদু হেসে বলল, “এত পিরিত দেখাতে হবে না। তোর বাসর করার ইচ্ছে ছিল আমাদের জানাতি। সম্পূর্ণ অফিস সাজিয়ে, প্রকাণ্ড আয়োজন করে তোদের বাসরের ব্যবস্থা করতাম।” আবিরের চোখ উজ্জ্বলতায় ঝলমল করছে, মুখে লাজুক হাসি। তানভির নিঃশব্দে হেসে পা বাড়াতেই রাকিব সহসা

উত্তেজিত কণ্ঠে শুধালো, “বাই দ্য ওয়ে, বাসর রাত কেমন কাটলো আবির?” আবির ঠোঁটের কোণে হাসি রেখে উদাসীন কণ্ঠে বলল, “ফুলের সুভাস ছাড়া বাসর রাতের সৌন্দর্য ফিকে মনে হচ্ছিলো। ফুল দিয়ে সাজাতে পারলি না ?” রাকিব আবারও চেচিয়ে উঠল, “বাঁশ কই রে। বাঁশটা আন কেউ। ” তানভির মেঘকে ডেকে নিয়ে আসছে। মেঘ নাকের ডগা পর্যন্ত ওড়না টেনে রেখেছে। মেঘ রুমে আসতেই আবির আড়চোখে মেঘের দিকে তাকিয়ে আছে । কিন্তু মেঘের দৃষ্টি নিচের দিকে। ঘুরে এসে কোনোরকমে আবিরের পায়ের কাছে মাথা নিচু করে বসলো। তানভির আর রাকিব নাস্তা আনতে বেড়িয়ে গেছে। রুমে শুধু আবির আর মেঘ। আবির এক দৃষ্টিতে মেঘকে দেখছে। পাতলা ওড়নার আড়ালে মেঘের কুণ্ঠ অভিমুখে আবির নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে আছে। তৎক্ষনাৎ রুমে আলী আহমদ খান সহ মালিহা খান এবং হালিমা খান ঢুকলেন। আলী আহমদ খান রাগী স্বরে বললেন, “জ্ঞান ফিরেছে তাহলে” আবির খানিক হাসলো আর কিছুই বলল না। আলী আহমদ খান গুরুতর কণ্ঠে শুধালেন, “তুমি কি ঠিক করেই নিয়েছো, তোমার আম্মু আর আমাকে শান্তিতে থাকতে দিবে না?” আবির কণ্ঠ খাদে নামিয়ে শান্ত স্বরে বিড়বিড় করে বলল, “আপনাদের শান্তির জন্য প্রয়োজনে নিজের মনকে পু*ড়িয়ে ছারখার করে দিব।” আলী আহমদ খান ভারী কণ্ঠে শুধালেন, “তানভির কোথায়?” “নাস্তা আনতে গেছে। ” আলী আহমদ খান হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, “তোমাদের মতো বয়সে বিজনেস করে একা হাতে সংসার সামলিয়েছি। আর তোমরা?

আজকে তুমি এক্সিডেন্ট করে পরে আছো, দুদিন পর তানভির এক্সিডেন্ট করবে। এই বয়সে এসেও তোমাদের জন্যই টেনশন করতে হবে নাকি?" আবির মৃদু হেসে ভারী কণ্ঠে বলল, "এই তানভির, তুই কিন্তু কোনোভাবেই এক্সিডেন্ট করিস না। " তানভির "আচ্ছা" বলতেই আলী আহমদ খান পেছন ফিরে তাকালেন। তানভির রুটি কলা আরও অন্যান্য খাবার নিয়ে আসছে। মালিহা খান শীতল কণ্ঠে আবিরকে বললেন, " সাবধানে গাড়ি চালাতে পারিস না? " হালিমা খান স্বাভাবিক কণ্ঠে বললেন, " খাবার নিয়ে আসছি। আগে খাবার খেয়ে নে।" মেঘ নিরব দর্শকের মতো মাথা নিচু করে চুপচাপ বসে আছে। মালিহা খান আবিরের হাত মুখ ধৌয়ে দিয়েছেন। কিছুক্ষণ পর ডাক্তার এসে দেখে গেছেন। ডাক্তার চলে যাওয়ার পর মালিহা খান নিজের হাতে আবিরকে খাইয়ে দিতে লাগলেন।তানভির, রাকিব ও খাচ্ছে। হালিমা খান স্বাভাবিক কণ্ঠে শুধালেন, "মেঘ তুই খাবি না?" "খিদা নেই। পরে খাবো।" আবির তানভিরের দিকে তাকিয়ে ইশারা দিতেই তানভির বসা থেকে উঠে এসে স্বাভাবিক কণ্ঠে মেঘকে বলল, "হা কর" মেঘ বলে, "খাবো না আমি।" "হা করতে বলছি। " মেঘ মাথা তুলে অল্প করে হা করলো। তানভির মেঘকে খাইয়ে নিজেও খেয়ে নিয়েছে। খাওয়া শেষ হওয়ার ১০ মিনিটের মধ্যে জান্নাত আর আবিরের ফুপ্পি রুমে ঢুকলো। ওনাদের দেখে সবাই আশ্চর্য নয়নে তাকিয়ে আছে। আলী আহমদ খান বোনের দিকে এক পলক তাকিয়ে ভারী কণ্ঠে বললেন, "তুই এখানে? তোদের কে খবর দিয়েছে?"

জান্নাত ধীর কণ্ঠে বলল, “আসসালামু ওয়ালাইকুম। আমার ভাইয়া আমাদের খবর দিয়েছেন।” মাহমুদা খান কোনো কথা বললেন না । ভেতরে এসে আবিরের দিকে তাকিয়ে তপ্ত স্বরে বললেন, “এখন শরীর কেমন?” আবির আড়চোখে মেঘের দিকে তাকালো সহসা স্বাভাবিক কণ্ঠে জবাব দিল, “আলহামদুলিল্লাহ ভালো। ” আলী আহমদ খান গম্ভীর কণ্ঠে শুধালেন, “তোমার ভাইয়া কে?” জান্নাত রাকিবের দিকে তাকিয়ে অল্প হেসে বলল, “রাকিব ভাইয়া। ” মালিহা খান বিস্ময় সমেত একবার রাকিবকে দেখল আবার জান্নাত কে। হুবহু চেহারার মিল না থাকলেও দুজনের চোখ দেখতে একই রকম। মালিহা খান কণ্ঠ ভারী করো প্রশ্ন করলেন, “তুমি রাকিবের কেমন বোন?” “আপন বোন।” আলী আহমদ খান রাকিবের দিকে তাকিয়ে প্রখর তপ্ত স্বরে শুধালেন, “জান্নাত তোমার বোন?” “জ্বি আংকেল। আমার একমাত্র বোন।” হালিমা খান আর মালিহা খান শুধু মুখ চাওয়া চাওয়ি করছেন। মালিহা খান প্রশ্ন করলেন, ” তুমি রাকিবের বোন সে কথা আগে বলো নি কেন?” “কখনো তেমন প্রয়োজন হয় নি সেজন্য আর বলা হয় নি। ” “আবির কে চিনতা না?” “জ্বি। মোটামুটি চিনতাম। ” আলী আহমদ খান জান্নাতকে প্রশ্ন করলেন, “কিন্তু তোমাকে তো তানভির বাসায় আনছিল। তানভিরকে তুমি কিভাবে চিনো?” “তানভির ভাইয়ার সাথে একটা পোগ্রামে দেখা হয়ছিল।। পরিচয় দেয়ায় চিনতে পারছি। তখন কথায় কথায় ওনি মেঘের কথা বলছেন। মেঘের জন্য টিচার খোঁজছিলেন। তখন ভাবলাম মেঘকে আমিই পড়ায়, সেভাবেই মেঘকে

পড়ানো শুরু। ” হালিমা খান , মালিহা খান ও আলী আহমদ খানের একের পর এক প্রশ্নের প্রতিত্তোরে জান্নাত প্রতিবার ই বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছে। কোনো প্রকার মিথ্যার আশ্রয় না নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সাবলীল ভঙ্গিতে সকল উত্তর দিয়েছেন। আলী আহমদ খান অফিসে চলে যাবেন। সবার থেকে বিদায় নিয়ে দরজা পর্যন্ত গিয়ে আবার থমকে দাঁড়িয়েছেন। মাহমুদা খানের দিকে তাকিয়ে ভারী কণ্ঠে বললেন, “বাসায় আসিস।” জান্নাত আলী আহমদ খানের দিকে তাকাতেই আলী আহমদ খান মৃদু হেসে বললেন, “তোমার শ্বাশুড়িকে নিয়ে আমাদের বাসায় এসো।” “জ্বি আচ্ছা। ”হাসপাতালের বেডে চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছে আবির। গতকাল এক্সিডেন্টের পর থেকে তানভিরের কাছেই আবিরের ফোন ছিল। তানভির আবিরের মাথার পাশে ফোনটা রেখে বেড়িয়ে গেছে। রাকিব ও চলে গেছে, বাসায় গিয়ে ফ্রেশ হয়ে অফিসের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছে। তানভির পার্টি অফিসের সামনে আসতেই দেখল, ভেতরে কয়েকজন কোনো বিষয় নিয়ে তর্কাতর্কি করছে। তানভির দ্রুত ভেতরে গেল। আজ থেকে ১৫ দিন আগে সংগঠিত এক পোগ্রামের ছোট খাটো ভুল ভ্রান্তি নিয়ে ২-৪ জন কথা বলছিল। সেটা এক পর্যায়ে তর্কে রূপ নিয়েছে। তানভির প্রথমে শান্ত থেকে থামানোর চেষ্টা করেছে কিন্তু কারো থামার নাম নেই। অল্প বয়সে সবার রক্ত ই গরম থাকে। কারো মুখ থেকে সামান্য তম কথাও কেউ সহ্য করতে পারে না। বেসামাল পরিস্থিতি বুঝতে পেরে তানভির উচ্চস্বরে ধমক দিতেই সকলে নিরব হয়ে গেছে। সময়টা যেন থমকে

গেছে। সবাই মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে, কারো মুখে কোনো শব্দ নেই। আবিরের বলা কথাগুলো মনে করে, তানভির দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সাবলীলভাবে বুঝানোর চেষ্টা করলো। সবাইকে থামিয়ে তানভির নিজের চেয়ারে মাথা চেপে ধরে বসে আছে। গতকাল থেকে তানভিরের মেজাজ এমনিতেই খুব গরম, মেঘের অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণ, আবিরের এক্সিডেন্ট, মিনহাজ আর তামিমের প্রতি তীব্র আক্রোশে তানভিরের মেজাজ তুঙ্গে। তানভিরের নিজের বোনের প্রতি যতটা না ক্ষোভ ছিল তার চেয়ে বেশি রাগ হয়েছিল বন্যাকে সেখানে উপস্থিত থাকতে দেখে। বন্যার ম্যাচিউরিটি তানভিরকে বরাবরই মুগ্ধ করে। মেয়েটা কখনোই উশৃংখল আচরণ করে না, করলেও সেটা নির্দিষ্ট গন্ডিতে সীমাবদ্ধ থাকে। যেমন – মেঘদের সাথে থাকলে বন্যা ওদের মতোই দুষ্টামি, ফাজলামো করে। আবার বাড়িতে থাকাকালীন ছোট ভাইয়ের সাথে খুনসুটিতে মেতে থাকে অথচ স্যার-ম্যাম, তানভির, আবির কিংবা বড়দের সামনে একদম শান্তশিষ্ট ভাবে কথা বলে। বন্যার কথা আর আচরণ কোথাও কোনো প্রকার অভদ্রতার ছোঁয়া নেই। মেয়েটার রাগ বুঝারও কোনো উপায় নেই। গতকালের ঘটনায় বন্যার উপস্থিতি দেখে তানভির নিজেকে কোনোভাবেই নিয়ন্ত্রণ করতে পারছিল না। আবির আর তানভির দুজনের দৃষ্টিতেই বন্যা মেঘের তুলনায় অনেকটায় পরিণত। কাউকে চোখ বন্ধ করে বিশ্বাস করলে, খুব করে কিছু আশা করে না পেলে তখন বুকের ভেতর যে আঘাত টা লাগে সেটা এত সহজে মুছে না। তানভিরের ক্ষেত্রেও এমনটায়

হয়েছে। বন্যার প্রতি তানভিরের অন্ধ বিশ্বাস ছিল, বন্যা মেঘের সাথে থাকলে মেঘ কখনো ভুল বা অন্যায় কিছু করবে না। সেই বিশ্বাসটা বন্যা নষ্ট করে দিয়েছে। নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পেরে বাধ্য হয়ে রাতে বন্যার উপর নিজের রাগ ঝেড়েছে। যদিও পরে সবটায় জেনেছে কিন্তু তখন কল দেয়ার মতো পরিস্থিতি ছিল না। বন্যাকে ফোন দিবে ভাবতেই, পকেটে থাকা ফোনটা ভাইব্রেট হতে শুরু করল। পকেট থেকে ফোন বের করতেই বন্যার নাম টা ভেসে উঠল। ওমনি তানভিরের ওষ্ঠপুট প্রশস্ত হলো। মাথা যন্ত্রণা, মনের অশান্তি যেন মুহুর্তেই গায়েব হয়ে গেছে। ফোন রিসিভ করে তানভির মোলায়েম কণ্ঠে বলল, "আসসালামু আলাইকুম " বন্যা ভয়ে ভয়ে বলল, "ওয়ালাইকুম আসসালাম। আবির ভাইয়া কেমন আছেন? " "আলহামদুলিল্লাহ ভালো। শুধু হাতে পায়ে আর মাথায় ব্যান্ডেজ করা তবে বিন্দাস আছে। " "Sorry" "ওমা, সরি বলছো কেন?" "এমনি। ভাইয়া কি এখনও হাসপাতালে? " "হ্যাঁ কালকে সম্ভবত বাসায় নিয়ে যেতে পারবো।" "মেঘ কোথায় ?" "হাসপাতালেই আছে। " "আপনি কোথায়?" "আমি পার্টি অফিসে আসছি। তুমি কি করতেছো?" "ভার্সিটিতে আসছি। মেঘ কি আজ বাসায় যাবে না? ও মনে হয় বাসায় ফোন রেখে আসছে। কথা বলতে পারছি না। " "আমি হাসপাতালে গিয়ে বনুকে ফোন দিব নে। তখন কথা বলে নিও। " "আচ্ছা। আর একটা কথা জিজ্ঞেস করবো? " "তোমার বন্ধুদের কথা বাদ দিয়ে যা ইচ্ছে জিজ্ঞেস করতে পারো। " বন্যার মুখ বন্ধ হয়ে গেছে। গতরাতেই

তানভির নিষেধ করেছিল । কিন্তু ভার্সিটিতে এসে দুই বন্ধুকে না পেয়ে বন্যার মনটা খুঁত খুঁত করছে। তাই তানভিরকে জিজ্ঞেস করবে ভেবেছিল, অথচ তানভির আগে থেকেই সাবধান করে ফেলছে। বন্যা ধীর কণ্ঠে বলল, " আচ্ছা রাখি এখন।" "কি যেন জিজ্ঞেস করতে চেয়েছিলে?" "কিছু না। ভালো থাকবেন।" তানভির মুচকি হেসে বলল, "তুমিও ভালো থেকো। আর কোনো সমস্যা হলে জানিয়ো।" বন্যা কল কাটতে কাটতেই ঘুরতে নিলে আচমকা এক ছেলের সঙ্গে ধাক্কা লাগতে যাচ্ছিলো। ছেলেটা দ্রুত সরে গিয়ে ভারী কণ্ঠে বলল, "এইযে খুকি, কানা নাকি? দেখে চলতে পারো না? " বন্যা ফোন কানে নিয়েই চোখ তুলে তাকালো। ছেলেটা বেশ ফর্সা, বন্যার তুলনায় হাইট অনেকটায় বেশি, চোখে সাদা গ্লাস, চুল গুলো গুছানো, পড়নে শার্ট তার উপর অ্যাপ্রন। বন্যা ছেলেটার দিকে তাকিয়ে কপাল কুঁচকালো। ছেলেটা বিপুল চোখে বন্যার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলো। তানভির ফোনের ওপাশ থেকে গম্ভীর কণ্ঠে শুধালো, " কে ধমক দিয়েছে?" বন্যা ঠান্ডা কণ্ঠে বলল, "চিনি না। রাখছি এখন।" ছেলেটা কয়েক মুহুর্ত স্থির থেকে বন্যার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে চলে যাচ্ছে। বন্যাও সূক্ষ্ম নেত্রে ছেলেটার দিকে তাকিয়ে আছে। ছেলেটার চাল চলনের হঠাৎ পরিবর্তন দেখে বন্যার মনে খটকা লাগছে। তাছাড়া বন্যা যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেখান দিয়ে সচরাচর কেউ হাঁটাচলাও করে না। তবে ঐ ছেলে কেন এদিকে আসবে। ছেলেটাকে দেখেই বুঝা যাচ্ছে ক্লাসের দিক থেকে সিনিয়র হবে, কিন্তু আগে কখনো এই ছেলেকে দেখেছে কি না সেটা

মনে করতে পারছে না। ছেলেটা অনেকটা দূরে চলে গেছে, বন্যা আবারও ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালো। বন্যার হঠাৎ ই মিনহাজের সাথে প্রথম দেখার ঘটনা মনে পরে গেছে। মিনহাজ ইচ্ছেকৃত ধাক্কা দিতে এসে নিজেই যেমন ভাব নিয়েছিল, তেমনি এই ছেলেও নিজে অন্য রাস্তায় এসে আবার ধমক দিয়ে বসলো। বন্যার এখন নিজের উপর বড্ড রাগ হচ্ছে। একটু আগে বিষয়টা খেয়াল করলে ছেলেটাকে অন্ততপক্ষে দুটা কথা বলতে পারতো। তানভির পুনরায় কল করছে। বন্যা কল রিসিভ করা মাত্রই তানভির আতঙ্কিত কণ্ঠে শুধাল, "কি হয়েছে? কে কি বলছে?" " তেমন কিছু না।" "সত্যি কথা বলো! আসবো আমি?" "আরে না। সত্যি কিছু হয় নি। আপনার আসতে হবে না। " "Are you sure?" "Yes. " "ঠিক আছে। ক্লাস শেষ করে বাসায় চলে যেও। " "জ্বি আচ্ছা। রাখছি।" বন্যা কল কেটে আবারও তাকালো, ততক্ষণে ছেলেটা কোথায় যেন চলে গেছে। এরমধ্যে লিজা আর মিষ্টি এসে বন্যার মাথায় গাট্টা মেরে উত্তেজিত কণ্ঠে প্রশ্ন করল, "কিরে তুইও কি লিফাত ভাইয়ার প্রেমে পরছিস?" বন্যা কপাল কুঁচকে রাশভারী কণ্ঠে শুধালো, "লিফাত ভাইয়া আবার কে?" লিজা হেসে উত্তর দিল, " এইযে একটু আগে যার সাথে কথা বলছিলি, যার দিকে এইমাত্রও তাকিয়ে ছিলি তিনি হচ্ছেন লিফাত ভাইয়া। ৪র্থ বর্ষের কেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টের ফার্স্ট বয়। ওনি যে কত মেয়ের ক্রাশ তার কোনো হিসেব নেই! এমনকি আমারও ক্রাশ। তা কি কথা বলছিলি রে?" বন্যা রেগে বলল, "কোনো কথায় বলি নি। তোর ক্রাশের সাথে

কথা বলতে আমার বয়েই গেছে। আর একটা কথা, তোর ক্রাশের ক্যারেক্টারে সমস্যা আছে, বুঝলি!” লিজা দাঁতে দাঁত চেপে কটকট করে বলল, “তুই আমার ক্রাশকে নিয়ে একদম বাজে কথা বলবি না। ”
“বলতে চাই ও না। এমনকি তোদের সাথেও কথা বলতে চাই না। বাই” বন্যা ক্লাসে চলে গেছে। বন্যার পিছু পিছু মিষ্টি আর লিজাও ছুটছে।এদিকে আলী আহমদ খান চলে যাওয়ার পর আরও ২-৩ ঘন্টা মাহমুদা খান হাসপাতালে ছিলেন, আবিরকে যতটা সম্ভব বুঝিয়েছেন। মালিহা খান আজ কম বেশি কথা বলেছেন, হালিমা খানের সাথেও পরিচিত হয়েছেন। প্রায় ১ টার দিকে ওনারা বাসার উদ্দেশ্যে চলে গেছেন। মালিহা খান আর হালিমা খান দুজনেই বাসায় যাওয়ার জন্য বলেছেন কিন্তু প্রতিত্তোরে মাহমুদা খান কিছুই বলেন নি। এত বছরের দূরত্বের পর হুট করে ঐ বাড়িতে চলে যাওয়া ওনার কাছেও স্বাভাবিক বিষয় না। এই বাড়ির সাথে জড়ানো আবেগগুলো কেমন যেন শক্ত পাথরে মুড়িয়ে আছে। সেই পাথর না গললে স্বাভাবিক সম্পর্ক গড়ে উঠা অসম্ভব ব্যাপার। আলী আহমদ খান মুখরক্ষার খাতিরে বোনকে বাসায় যেতে বললেও দুই ভাবি খুব আন্তরিকতার সহিত বাসায় যাওয়ার জন্য বলেছেন। দুপুরের পর পর ই ইকবাল খান, আকলিমা খান, মীম, আদি হাসপাতালে আসছে। আবিরের অসুস্থতার কথা তানভির বলতে চাই নি, তবে ইকবাল খান বার বার জোর করায় বাধ্য হয়ে বলেছেন। বলতে দেরি হলেও তাদের রওনা দিতে দেরি হয় নি। মীম আর আদি সারা রাস্তা কেঁদে কেঁদে এসেছে। আবিরের সাথে মীম

খুব কম কথা বলে, হুটহাট দেখা না হলে মীম ইচ্ছেকৃত সামনেও পরে না। তবে ভাইয়ের প্রতি ভালোবাসার কোনো কমতি নেই তার। অন্যদিকে আদির আবদার করার একমাত্র জায়গায় আবির। বাহিরে থাকাকালীন ও ভিডিও কল দিয়ে প্রতিনিয়ত বলতো, ভাইয়া এটা নিয়ে এসো, ওটা নিয়ে এসো, কবে আসবা! এখনও তাই করে। হাসপাতালে এসে আবিরের অবস্থা দেখে দুই ভাই বোন ই থ মেরে গেছে। মাথায়, হাতে, পায়ে ব্যান্ডেজ দেখে আঁতকে উঠল। এমন অবস্থায় বাস্তবে কাউকে দেখেনি তারা, এই প্রথমবার আবিরকে দেখছে। আকলিমা খান ও অনেক বেশি আতঙ্কিত হয়েছেন, আবিরকে দেখেই আর্তনাদ শুরু করেছেন। ইকবাল খান স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন কিছুই বলতে পারছেন না। ওনার চোখে ভেসে উঠেছে বহু বছর আগে আলী আহমদ খানের এক্সিডেন্টের পরের দৃশ্য। তখন আলী আহমদ খান এক্সিডেন্ট করে প্রায় ৬ মাস বিছানায় ছিলেন। একই রূপে নিজের ভাইপো কে কখনো দেখতে হবে এটা ইকবাল খান কখনো কল্পনাও করেন নি। ইকবাল খান তাড়াতাড়ি আবিরের রিপোর্ট চেক করতে লাগলেন, হাত পায়ের অবস্থা বুঝার জন্য। মাথায় চাপ বেশি খেলেও হাতে আর পায়ে খুব বেশি সমস্যা নেই। ২১ দিন বেডরেস্টে থাকলে আশা করা যায় ঠিক হয়ে যাবে। দুপুর পেরিয়ে সন্ধ্যে হতে চললো। দুপুরে সবাই অল্পস্বল্প খেয়েছে কিন্তু মেঘ কিছুই খায় নি। সেই যে আবিরের পায়ের কাছে বসেছিল সারাদিন যাবৎ সেখানেই বসে আছে। দু'হাতে দুই হাঁটু আঁকড়ে ধরে হাঁটুর উপর কাত করে মাথা রেখে অমত্ত আঁখিতে

আবিরের অভিমুখে চেয়ে আছে। নাক অব্দি ওড়না টানা, আঁখি যুগল স্থির, প্রয়োজনের বাহিরে একবারের জন্যও পলক ফেলছে না। কখনো কখনো চোখের কার্নিশ দিয়ে অনর্গল গড়িয়ে পড়ছে নোনাজল। অতি সন্তর্পণে চোখের পানি মুছে আবারও চেয়ে আছে আবিরের দিকে। সারাদিনে "খাব না" ব্যতীত মেঘের মুখ থেকে আর কোনো কথা বের হয় নি। সকাল থেকেই আবির ক্ষণে ক্ষণে মেঘকে দেখছে কিন্তু আজ তার কিছু বলার সামর্থ্য নেই। আম্মু, মামনির সামনে মেঘকে যে দুটা কথা বলবে সেই পরিস্থিতিও নেই। কেউ আবিরের পাশ থেকে উঠে যাচ্ছেও না। বিকেলে হালিমা খান , আকলিমা খানদের সাথে সাথে বাসায় গিয়ে রাতের জন্য রান্না করে সন্ধ্যায় আবারও হাসপাতালে আসছেন, ইকবাল খান সাথে আসছেন। আলী আহমদ খান ও অফিস থেকে সরাসরি হাসপাতালে আসছেন। মালিহা খান আর মেঘ দু'জনেই সারাদিন হাসপাতালে ছিল। আবির ঘুমাচ্ছে দেখে কেউ ডাকে নি। হালিমা খান এসে থেকে মেঘকে খাওয়ানোর চেষ্টা করেছেন। আলী আহমদ খান নিজেও ২ বার খাওয়ার কথা বলেছেন কিন্তু মেঘ নিশ্চুপ বসে আছে। বাধ্য হয়ে হালিমা খান তানভিরের নাম্বারে কল দিয়েছে। তানভির কল রিসিভ করতেই হামিলা খান বিরক্তি ভরা কণ্ঠে বললেন, "কোথায় তুই?" তানভির উত্তর দেয়ার আগেই হালিমা খান পুনরায় বলে উঠলেন, "যেখানেই থাকিস হাসপাতালে এসে তোর বোনকে খাইয়ে রেখে যা। আমি তোর বোনের সাথে আর পারব না!" "আচ্ছা আসতেছি। তুমি কিন্তু বনুর সাথে রাগারাগি করো না।" "তোর আর

তোর বাপের আদরে মেয়েটা দিন দিন আরও বেশি জেদি হইতেছে। ”
“আমি এখনি আসতেছি” ২০ মিনিটের মধ্যে তানভির হাসপাতালে আসছে। মেঘ তখনও গুটিশুটি মেরে বসে আছে। তানভির ঢুকতেই মেঘ নড়েচড়ে বসল। তানভির ভারী কণ্ঠে বলল, “খাচ্ছিস না কেন?” “খিদে নেই। ” “বললেই হলো” তানভির প্লেটে খাবার বেড়ে মেঘের সামনে ধরতেই মেঘ খাব না বলে তানভিরের দিকে তাকালো। তানভিরের অগ্নি দৃষ্টি দেখে মেঘ কিছু বলার সাহস পেল না। চুপচাপ খাওয়া শুরু করল। তানভিরও মেঘের সামনে চেয়ার নিয়ে বসে আছে। তানভির চাইলেও মেঘকে কিছু বলতে পারছে না, আবার না বলেও থাকতে পারছে না। কারণ মেঘের এরকম আচরণ বাসার মানুষের চোখে সন্দেহের সৃষ্টি করবে। সবাই যখন নিজেদের মধ্যে কথা বলছিল এই ফাঁকে তানভির দু একবার মেঘকে বাসায় যাওয়ার কথা বলেছে, ঠান্ডা মাথায় বুঝিয়েওছে কিন্তু মেঘ মাথা দিয়ে না করেই যাচ্ছে। তানভির যখন বুঝতে পেরেছে মেঘকে রাজি করানো সম্ভব না তখন বাধ্য হয়ে মালিহা খানকেও থাকতে বলেছে। মেঘ, মালিহা খান আর তানভির ছাড়া বাকিরা বাসায় চলে গেছে। রাকিব অফিস শেষে হাসপাতালে আসছে তবে মালিহা খান উপস্থিত থাকায় কেউ কোনোপ্রকার উল্টাপাল্টা কথা বলছে না। তানভির আর রাকিব কিছুক্ষণ বসে তারপর বেড়িয়ে গেছে। অনেকক্ষণ পর তানভির ২ কাপ চা নিয়ে রুমে আসছে। এককাপ মালিহা খান আরেক কাপ মেঘকে দিয়ে তানভির নিজের ফোনটা মেঘকে এগিয়ে দিয়ে স্বাভাবিক কণ্ঠে

বলল, " তোর বান্ধবীর সাথে একটু কথা বলিস" মেঘ চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে গতকালের ঘটনা গুলো ভাবছে আর মনে মনে নিজেকে বকা দিচ্ছে। গতকাল হাসপাতালে আসার পর থেকে মেঘের মস্তিষ্কে আবির ভাই ব্যতীত আর কেউ নেই। দু এক বার বন্যার কথা মনে হলেও ফোন বাসায় ফেলে আসায় কল দিতে পারছিল না। মেঘ চা শেষ করে রুম থেকে বেরিয়ে বন্যাকে কল দিয়েছে। মেঘ- আসসালামু আলাইকুম। বন্যা- ওয়ালাইকুম আসসালাম। কিরে কেমন আছিস? শুনলাম আবির ভাইয়া এক্সিডেন্ট করছেন, এখন কেমন আছেন? মেঘের গলা দিয়ে কথা বের হচ্ছে না। ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদছে। বন্যা শান্ত স্বরে বলল, "এই মেঘ, কাঁদছিস কেন?" মেঘ কাঁদতে কাঁদতে বলল, "আজ আমার জন্য আবির ভাইয়ের এই অবস্থা হয়েছে। আমি কেন এমন করলাম! আমি এত বোকা কেন, বন্যা? " বন্যা মোলায়েম কণ্ঠে বলে উঠল, "তুই বোকা না তোর মনটা খুব অস্থির। থাক কাঁদিস না। ভাইয়া এখন কেমন আছেন বল" "ডাক্তার ২১ দিন বেডরেস্টে থাকতে বলছেন। ২১ দিন পর আবার টেস্ট করলে বুঝা যাবে ঠিক হয়েছে কি না। " "কালকে নাকি বাসায় নিয়ে যাবে?" "হ্যাঁ। কিন্তু.. " "কিন্তু কি?" " ওনি গতকাল থেকে আমার সাথে কোনো কথা বলছেন না। হঠাৎ চোখে চোখ পরলেও সঙ্গে সঙ্গে চোখ সরিয়ে নেন। আমি কি করবো এখন" "ওনার রাগ করাটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। এক ছেলের সাথে খেলছিলি বলে ক্লাস ৫ এ থাকাকালীন যে লোক তোর গালে থাপ্পড় মারতে পারেন সেখানে তুই এক ছেলেকে ভালোবাসিস বলার

পর কিভাবে ভাবিস পরিস্থিতি শান্ত থাকবে।” “ওনি আমায় থাপ্পড় মারলেও আমি এতটা কষ্ট পেতাম না। যতটা কষ্ট এখন হচ্ছে। নিজের উপর আর মিনহাজদের উপর এত রাগ হচ্ছে... ” “এখন অন্ততপক্ষে শান্ত থাকিস প্লিজ, আর কোনো ভুল করিস না। তোর ভাই মিনহাজদের যা করার করে ফেলছে। ” “মানে?” “গতকাল থেকে মিনহাজদের কোনো খোঁজ নেই, ফোন বন্ধ, আজ ক্লাসেও আসে নি। তোর ভাই বলছে ৩ দিন পর নাকি ওদের খোঁজ পাবো। আমাকে এই বিষয়ে কিছু জিজ্ঞেস করতে নিষেধ করেছেন। ” “কি বলছিস এসব!” “ঠিকই বলছি। তুই ভুলেও এই প্রসঙ্গে কিছু বলিস না।গতকাল থেকে তোদের টেনশনে আমি ঘুমাতে পারছিলাম না। ” মেঘ আর বন্যা প্রায় ৩০-৪০ মিনিট কথা বলার পর ফোন রেখে তানভিরকে ফোন দিয়ে আসছে। কোনোরকমে রাত কাটিয়ে সকাল থেকেই আবিরকে বাসায় নিয়ে যাওয়ার তোড়জোড় লেগেছে। ডাক্তার চেকাপ করে রিলিজ দেয়া মাত্রই বাসার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছে। এ অবস্থায় সিঁড়ি দিয়ে উঠা নামা করতে সমস্যা হবে বিধায় আবিরের জন্য নিচের একটা গেস্ট রুম গুছানো হয়েছে। আপাতত কিছুদিন এখানেই থাকবে, পা ঠিক হলে উপরে চলে যাবে। মেঘও নিজের রুমে চলে গেছে। আবিরের দিকে যতবার তাকায় ততবারই মেঘের নিজের প্রতি ঘৃণা হয়। মেঘ বাসায় ফিরে সেই যে রুমে ঢুকেছে সন্ধ্যার পর হয়ে গেছে অথচ মেঘ একবারের জন্যও নিচে আসছে না। আদি ২-৩ বার দরজা পর্যন্ত গিয়ে মেঘকে ডেকে এসেছে, কিন্তু মেঘ আসে না। বাধ্য হয়ে মীম মেঘের

রুমে গেল। দরজার সামনে থেকে “আপু” বলে ডাকতে ডাকতে ভেতরে ঢুকলো। মেঘ টেবিলের উপর দু’হাতে মাথা ঠেকিয়ে বসে আছে। চুল এলোমেলো থাকার কারণে মেঘের মুখ দেখার অবস্থা নেই। মীম কাছে এসে ডাকল, “আপু!” মীম কয়েক মুহুর্ত পরই বুঝতো পারল মেঘ ফুঁপাচ্ছে। মীম যথাসাধ্য মেঘের চুলগুলো ঠিক করতে করতে মলিন স্বরে বলল, “আপু তোমার কি হয়েছে? কাঁদতেছো কেন?” মেঘের কান্নার তীব্রতা বাড়ছে। আরও বেশি ফুঁপাচ্ছে, মীম আতঙ্কিত কণ্ঠে মেঘকে ডাকতে লাগলো। মেঘ অনেকক্ষণ পর মুখ তুলে তাকালো। কান্নার তোপে মেঘের মুখ লাল টকটকে হয়ে গেছে। চোখ বেয়ে অনর্গল পানি পরছে। বাঁধহীন এই জলের ধারার কোনো অন্ত নেই। মীম অবুঝ মেয়ের মতো চেয়ে আছে, প্রশ্ন করার ভাষা হারিয়ে ফেলেছে। মেঘ আচমকা মীমকে জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কাঁদতে লাগলো। মীমের মন ব্যাকুল হয়ে আছে, অনেকক্ষণ পর মৃদুস্বরে শুধালো, “আপু কাঁদছো কেন? কি হয়েছে তোমার? প্লিজ বলো আমাকে ” মেঘ কাঁদতে কাঁদতে বলা শুরু করল, ” আমি আবির ভাইকে অনেক ভালোবাসি। আমার নিজের থেকেও বেশি ভালোবাসি। ওনার অস্তিত্ব ব্যতীত আমি আমার সত্তা কল্পনা করতে পারি না। আমার সামান্য ভুলের কারণে আজ আবির ভাইয়ের এই অবস্থা।আমি নিজকে ক্ষমা করতে পারবো না রে। ” বিস্ময়ে মীমের চোখ তিনগুণ বড় হয়ে গেছে। মীম আশ্চর্যান্বিত নয়নে তাকিয়ে ব্যস্ত কণ্ঠে বলল, “তুমি আবির ভাইয়াকে ভালোবাসো?” “হুমমমমমমম।” “কবে

থেকে?” “দেশে আসার পর থেকেই।” মীম আর্তনাদ করে উঠল, “তুমি আমাকে এতদিনে বলতেছো!” মেঘ কাঁদতে কাঁদতে বলল, “আমি এখন কি করব? ওনার সামনে যাওয়ার সাহস পাচ্ছি না। ” “কেন? তুমি কি ভাইয়ার মাথা ফাটাইছো নাকি?” “আমার জন্যই ওনি এক্সিডেন্ট করেছেন।” ” হ্যাঁ বলছে তোমায়! ভাইয়ার কপালে এক্সিডেন্ট লেখা ছিল তাই করেছেন। চলো তো!” “নাহ। আমি যাব না। ” মীম দুহাতে মেঘের চোখের পানি মুছে শক্ত কণ্ঠে বলল, “চলো আমার সঙ্গে। আমিও একটু দেখি ভাইয়ার সাথে তোমায় কেমন মানায়!” মেঘ সিক্ত আঁখিতে তাকিয়ে মলিন হাসলো। মীম টানতে টানতে মেঘকে নিয়ে যাচ্ছে। মীমের টানের কারণে মেঘের আধখোলা চুল সম্পূর্ণ খুলে গেছে। আদুরে রূপ কেমন যেন ফ্যাকাশে দেখা যাচ্ছে । মীম মেঘের হাত ধরে টানতে টানতে সিঁড়ি এসেই চিন্তিত কণ্ঠে বলল, “আপু একটা প্রশ্ন করি?” মেঘ স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, “কি?” “তোমার আর আবির ভাইয়ার বিয়ে হলে আমি তোমাকে কি ডাকবো? আর আবির ভাইয়াকেই বা কি.. ” কথা সম্পূর্ণ করার আগেই মেঘ একহাতে মীমের মুখ চেপে ধরে রাগী স্বরে বলল, “ভুলেও যদি বাসার কারো সামনে এ ধরনের কথা বলিস না, খু*ন করে ফেলবে আমায়।” “কেন?” “পরে বলবো।” “আচ্ছা ঠিক আছে।” মীম আর মেঘ আবিরকে দেখার জন্য ড্রয়িংরুম পেরিয়ে গেস্টরুমে আসছে। দরজায় দাঁড়িয়ে মীম হালকা করে কাশি দিল। আবির তখন পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে ফোন দেখছিল, ফোনের স্ক্রিন জুড়ে আবিরের কাদম্বিনীর এক

উজ্জ্বল ধৃষ্টতার বিচরণ । মুখে তার মিষ্টি হাসি, ডাগর ডাগর আঁখি জোড়া তাতে গাঢ় করে কাজল রেখা টানা, আবির নেশাক্ত দৃষ্টিতে সেই ছবিটা দেখছিল। ছবির মালিক বহুবছর আগেই আবিরের হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছে। অকস্মাৎ শব্দ হওয়ায় আবিরের ধ্যান ভেঙ্গেছে। মুহুর্তেই ফোন রেখে চোখ তুলে তাকালো। সরাসরি নজর পরে মীমের দিকে, সূক্ষ্ম নেত্রে তাকাতেই মীমের পেছনে মেঘকে দেখতে পেল। মীম দরজা থেকে বলল, "ভেতরে আসবো, ভাইয়া?" "আয়" মীম মেঘকে নিয়ে ভেতরে ঢুকলো। মেঘ চিবুক গলায় নামিয়ে রেখেছে। মীম টুকটাক কথা বলেছে কিন্তু মেঘ মাথা নিচু করেই দাঁড়িয়ে আছে। মেঘের নিরবতা আবিরেরও সহ্য হচ্ছে না তাই বাধ্য হয়ে মীমকে উদ্দেশ্য করে বলল, "আম্মুকে বল আমায় খাবার দিতে ।" মীম "আচ্ছা" বলে মেঘের হাত ছেড়ে রুম থেকে বেরিয়ে গেছে। আবির কয়েক মুহুর্ত মেঘের দিকে তাকিয়ে রইলো, কতক্ষণ যাবৎ মেঘকে দেখছে তার হিসেব নেই। হঠাৎ রাশভারি কণ্ঠে বলল, " সারাদিন শেষে এতক্ষণে আমার কথা মনে পরলো?" মেঘ মাথা নিচু করেই দাঁড়িয়ে আছে। থরথর করে হাতপা কাঁপছে। আবির বারবার সূক্ষ্ম নেত্রে মেঘের দিকে তাকাচ্ছে। হঠাৎ মোলায়েম কণ্ঠে শুধালো, "কি হয়েছে তোর?" মেঘ কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে বলল, "I am Sorry Abir Vai" "সরি কেন?" "আপনার এই অবস্থার জন্য আমি দায়ী!" আবির চোখ ঘুরিয়ে এদিক সেদিক তাকিয়ে ঠাট্টার স্বরে বলল, " কেন? তুই পেত্নী সেজে আমাকে ধাক্কা মারছিলি নাকি?" আবিরের এমন কথা

শুনে মেঘ সহসা চোখ তুলে তাকালো। আবিরের মুখে হাসি দেখে মেঘ কপাল কুঁচকে আহাম্মকের মতো চেয়ে আছে। আবির মৃদু হেসে বলল, "এখানে বস এসে" মেঘ চুপচাপ এসে বসলো। কিছুক্ষণ নিরব থেকে মেঘ আবারও কান্না শুরু করে দিয়েছে, মেঘের কান্না দেখে আবির থতমত খেয়ে গেছে। তড়িঘড়ি করে বলল, " এইইইই, আর কত কাঁদবি! দুদিন যাবৎ কেঁদেই যাচ্ছিস। এবার অন্তত থাম প্লিজ।" মেঘের কান্না থামার কোনো লক্ষণ না দেখে আবির গম্ভীর কণ্ঠে বলে উঠল, "এভাবে কেঁদে কি প্রমাণ করতে চাস?" "মানে?" " আমি তোকে মারি, তোকে কাঁদায় এসবই প্রমাণ করতে চাস? " "নাহ।" "তাহলে এভাবে কাঁদছিস কেন? আমি কি মরে গেছি?" মেঘ সঙ্গে সঙ্গে আবিরের মুখ চেপে ধরে হুঙ্কার দিয়ে উঠল, " আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি, ম*রার কথা কখনো মুখে নিবেন না।" আবির আলতো ভাবে মুখে রাখা মেঘের হাতের উপর হাত রেখে হাতটা কিছুটা সরিয়ে ঠোঁটে হাসি রেখে বলল, " আর তুই যে এভাবে কাঁদছিস সে বেলায়?" মেঘ কাঁদতে কাঁদতে আবারও বলতে শুরু করল, " আমি ভুল করেছি, আমায় মাফ করে দেন প্লিজ, আমি আর কখনও এমন কাজ করব না। মিনহাজদের সঙ্গে আর কখনো কথা বলবো না, কারো সাথেই মিশবো না। " আবির রাগান্বিত কণ্ঠে বলল, " ভুল তুই না বরং আমি করেছি। আমার সেদিন বড় ভাইয়ের দায়িত্ব পালন করা উচিত ছিল।" মেঘ চিৎকার করে উঠল, "মানে?" " আমার উচিত ছিল সামনে দাঁড়িয়ে মিনহাজের প্রপোজ করার স্টাইলটা দেখা। তাকে সাপোর্ট করা।

আমার আসলে ঐ ভাবে রিয়েক্ট করা ঠিক হয় নি। সরি। আমি সুস্থ হলে তাকে বলিস আবার তোকে প্রপোজ করতে।" "জীবনেও না। আমি আর কথায় বলবো না। আর আপনি প্লিজ আজেবাজে কথা বলবেন না।" "আজবাজে কথা কি বললাম?" "কিছু না।" এমনসময় মীম খাবার নিয়ে ভেতরে ঢুকলো। আবিরের হাতে মেঘের হাত দেখে মীম জোড়ে গলা খাঁকারি দিয়ে, "আমি কি আসতে পারি?" আবির তড়িঘড়ি করে মেঘের হাত ছেড়ে দিল, মেঘও কিছুটা নড়েচড়ে বসেছে। মীম খাবার টেবিলে রেখে যেতে যেতে ঠাট্টার স্বরে বলল, "আমি এখন চলে যাচ্ছি, পরে আবার আসবো কিন্তু। " মেঘ টেবিল থেকে প্লেট নিয়ে আবিরের দিকে এগিয়ে ধরল। খাইয়ে দিবে নাকি আবির ভাই নিজে নিজে খেতে পারবেন এ নিয়ে কনফিউশানে পরে গেছে। আবির ভ্রু কুঁচকে ভারী কণ্ঠে বলল, " খাইয়ে দে।" মেঘ ঢোক গিলে উষ্ণ স্বরে শুধালো, "আমি খাইয়ে দিব ?" " আশেপাশে কি আমার বউকে দেখতে পাচ্ছিস? পেলে আমার বউকে প্লেটটা দে, সে ই না হয় খাইয়ে দিবে। " মেঘ ফোঁস করে শ্বাস ছেড়ে রাগী স্বরে বলল, "হয়েছে। বউকে খোঁজতে পারব না। সারাদিন বউ বউ করলে আমি বড় আব্বুর কাছে বিচার দিব।" "কি বিচার দিবি?" "বলবো আপনি পাগল হয়ে গেছেন।" "বলিস, আমিও বলবো। " "কি বলবেন?" "তোকে যে রাস্তাঘাটে মানুষ প্রপোজ করে বেড়ায় সেটায় বলবো।" "আমাকে প্রপোজ করে নি, আর যদি করেও তাতে আপনার কি! আপনার মতো না তো! আপনি যে গোপনে বউ বাচ্চা রেখেছেন! "

“তারমানে আমার বউ, বাচ্চা আছে এটা তুই মেনে নিচ্ছিস?” “নাহ। জীবনেও মানবো না। ” আবির হেসে বলল, ” এখন কি খাওয়াবেন?” “হুমমমমম।” মেঘ আবিরকে মুখে তুলে খাইয়ে দিচ্ছে। ফাঁকে ফাঁকে আবির ফুপ্পির বিষয় নিয়ে টুকিটাকি কথা বলেছে। এখন বাসায় আনলে ঠিক হবে কি না, কিভাবে আনবে সেসব বিষয়েই কথা বলেছে।
মেঘের খাওয়ানো শেষে চলে যেতে নিলে মীম আবারও ছুটে আসছে। মিটিমিটি হেসে বলল, “এত তাড়াতাড়ি খাওয়ানো শেষ?” মেঘ মীমের মাথায় গাট্টা মেরে রাগী স্বরে বলল, “রুমে চল, তোর ঠোঁট দুটা সেলাই করতে হবে।” মীম হেসে আবিরকে উদ্দেশ্য করে বলল, “ভাইয়া এখন ঘুমাও তুমি। আমরা চলে যাচ্ছি।” মেঘরা যাওয়ার কিছুক্ষণ পর আলী আহমদ খান আবিরকে দেখতে রুমে আসছেন, সাথে মালিহা খানও এসেছেন। আবির আলী আহমদ খানকে উদ্দেশ্য করে বলল, “আব্বু একটা কথা বলব?” “বলো” ” আপনি কি ফুপ্পিকে বাসায় আনতে চাচ্ছেন?” “আমি আসতে বলেছি, তার ইচ্ছে হলে আসবে।” “এভাবে বললে ফুপ্পি কোনোদিনও আসবে না। ভুলে যাবেন না ওনি আপনার ই বোন। আপনি যদি সত্যি চান ফুপ্পি বাসায় আসুক, তাহলে ফোন দিয়ে ভালোভাবে দাওয়াত দেন। ফুপ্পিদের বাসার সবাইকে নিয়ে আসতে বলুন। আর যদি না চান তবে ভবিষ্যতে মুখ রক্ষার্থে কখনো দাওয়াত দিবেন না, প্লিজ। ”আলী আহমদ খান গুরুভার কণ্ঠে বললেন, “তোমার ফুপ্পিকে আসতে বলেছি প্রয়োজনে আবার বলবো কিন্তু তোমার ফুপাকে কিছু বলতে বলো না আমায়। এই একটা মানুষের

জন্য আমার পরিবারটা ধ্বংস হয়ে গেছে তাকে কখনো ক্ষমা করতে পারবো না আমি। ” মালিহা খান ঠান্ডা কণ্ঠে বললেন, “আর কতদিন মনের ভেতর বিদ্বেষ পুষে রাখবেন। এবার অন্ততঃ সবকিছু ঠিক করে নেন। ” “তোমরা কি চাইছো? আমি নিজে থেকে সব ভুলে ঐ লোকের সাথে কথা বলি?” আবির তপ্ত স্বরে বলল, “নাহ। মনের বিরুদ্ধে আপনাকে কিছু করতে বলছি না। আপনি ফুপ্পিকে সত্যিই বাসায় আনতে চাইলে ফুপ্পিকে কল দিয়ে ভালোমন্দ কথা বলে দাওয়াত দিবেন, বাসার সবাইকে নিয়ে আসতে বলবেন। এটুকুই। ” “আমার কাছে ওদের কারো নাম্বার নেই। ” “নাম্বার আমি সংগ্রহ করে দিচ্ছি।” “আচ্ছা ঠিক আছে দিও।” সকালবেলা খাবার টেবিলে আবির আর মোজাম্মেল খান ব্যতীত সবাই উপস্থিত। আলী আহমদ খান খাবার শেষ করে স্বাভাবিক কণ্ঠে শুধালেন, ” তোমাদের ফুপ্পিকে বাসায় দাওয়াত দিতে চাচ্ছি। এ ব্যাপারে তোমাদের কোনো মতামত থাকলে বলতে পারো। ” খুশিতে গদগদ হয়ে মেঘ বলল, “কোনো মতামত নেই। ফুপ্পি আসলেই হবে।” তানভিরের সরল স্বীকারোক্তি, “আপনার বোনকে আপনি বাসায় আনতে চাচ্ছেন এ ব্যাপারে আমাদের মতামতের থেকেও আপনাদের মতামত টা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আব্বু, আপনি, কাকামনি প্রয়োজনে আম্মুরা আছেন ওনাদের সাথে কথা বলে আপনারা যা সিদ্ধান্ত নেয়ার নিতে পারেন।” “আমরা আমাদের মতো সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তাছাড়া তোমার আব্বু আজ আসবে আবশ্যকতায় আবার আলোচনা করবো। কিন্তু আমার কথা হচ্ছে তারা আসলে

তোমরা তাদের সাথে কেমন আচরণ করবে?” তানভির মৃদু হেসে বলল, “সে বিষয়ে আপনার টেনশন করতে হবে না। আমি, আমার বোনেরা কিংবা আদি, ওনাদের মনে আঘাত দেয়ার মতো কোনোপ্রকার খারাপ আচরণ করবো না। আপনার এবং এই বাড়ির সম্মান রক্ষার্থে আমরা আমাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা করবো।” মীম আর আদিও তানভিরের সঙ্গে তাল মেলালো। মীম আর আদিকে মেঘ অনেকদিন আগে থেকেই ফুপ্পির কথা বলছে। ফুপাতো ভাইবোনদের কথাও বলেছে। তাদের সাথে পরিচিত হতে মীম আর আদিও খুব এক্সাইটেড। মোজাম্মেল খান দুপুরের পরপর বাসায় আসছেন, এসেই সরাসরি আবিরের রুমে চলে গেছেন। আলী আহমদ খানের ছেলের প্রতি অতিরিক্ত ভালোবাসার কারণে আবিরকে কিছু না বললেও মোজাম্মেল খান একায় সেই ঝাঁঝ মিটিয়েছেন। টানা ২ ঘন্টা আবিরের উপর রাগ ঝেড়েছেন, বহুবছর আগে আলী আহমদ খানের এক্সিডেন্টের ইতিহাস থেকে শুরু করে বর্তমান পর্যন্ত প্রতিটা ঘটনার নিগূঢ় বর্ণনা দিয়েছেন। হালিমা খান দু একবার থামানোর চেষ্টা করেছেন কিন্তু এতে লাভ হওয়ার বদলে উল্টো ক্ষতি হয়েছে । মোজাম্মেল খানের রাগ আরও কয়েক গুণ বেড়ে গেছে। তানভির যেমন আবিরের প্রতি কনসার্ন তেমনি মোজাম্মেল খানও বড় ভাইয়ের অতিশয় ভক্ত। আলী আহমদ খানের এত বছরের পরিশ্রম, এই পরিবারের প্রতি অগাধ ভালোবাসা সবটায় মোজাম্মেল খানের খুব কাছ থেকে দেখা। আবির আর তানভির দুজনের ছন্নছাড়া আচরণে আলী আহমদ খান আর মোজাম্মেল খান

দু'জনেই অনেক বেশি চিন্তিত। কাজের চাপে আবিরের একটু আধটু সিরিয়াসনেস দেখা গেলেও তানভির বরাবরই গা ছাড়া ভাবে চলে। তারউপর আবির ইচ্ছেকৃত তানভিরকে আরও বেশি আগলে রাখে যা মোজাম্মেল খানের একেবারেই পছন্দ না। আবিরের পাশাপাশি তানভিরও যদি পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে পারিবারিক ব্যবসাটা সামলাতো তাহলে এতদিনে তাদের অবস্থান আরও উপরে থাকতো। একমাত্র ছেলের প্রতি মোজাম্মেল খানের ভালোবাসা যেমন আছে তেমনি দুশ্চিন্তারও অন্ত নেই। আবির পড়াশোনায় ভালো, কাজেও খুব মনোযোগী কিন্তু তানভির সম্পূর্ণ উল্টো। বর্তমানে যা করছে তাতে ও যদি গুরুত্ব না থাকে তবে ছেলের ভবিষ্যৎ কি হবে সেই নিয়েই দুশ্চিন্তা করেন প্রতিনিয়ত। সবকিছুর বহিঃপ্রকাশ ঘটছে আজ আবিরের সামনে। আবির চুপচাপ মাথানিচু করে চাচ্চুর সব কথা শুনছে। আবির চাইলেও এখন কিছুই বলতে পারবে না। একটা কথা বলতে গেলে মোজাম্মেল খান আরও ১০ কথা শুনাবেন তার থেকে বরং চুপ থাকায় শ্রেয়। আবির নিজের মনকে বুঝাচ্ছে, "আবির আর যাই করিস না কেন, শ্বশুরের সাথে কখনো ত্যাড়ামি করিস না। আবির ধৈর্য রাখতে হবে, ২ ঘন্টা কেন আরও ৩ ঘন্টা বকলেও সহ্য করে নিতে হবে। শ্বশুরকে রাগালে বউকে আর নিজের করে পাবি না। সো বি কেয়ার ফুল আবির। " এরমধ্যে মেঘ আবিরের জন্য এক গ্লাস দুধ নিয়ে আসছে। আব্বুর রাগ দেখে মেঘের হাত পা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে। দুধ নিয়ে ভেতরে আসবে নাকি চলে যাবে বুঝতে পারছে না। চলে

যাওয়ার জন্য এক পা বাড়িয়ে আবারও দাঁড়িয়ে পরলো। মেঘ মনে মনে আওড়াল, “আজ আমার জন্য আবির ভাইয়ের এ অবস্থা। আব্বু ওনাকে একা বকবেন কেন, আমিও তো বকা খাওয়ার অর্ধেক অংশীদার। ” মেঘ জিভ দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে আবারও রুমের দিকে পা বাড়ালো। কারো উপস্থিতি বুঝতে পেরে মোজাম্মেল খান সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালেন। মেঘের হাতে দুধের গ্লাস থরথর করে কাঁপছে। মেঘ অন্য হাত দিয়ে শক্ত করে গ্লাসটা ধরে রেখেছেন। মোজাম্মেল খান মেঘকে দেখে একটু থামলেন। ফোঁস করে শ্বাস ছেড়ে রাগী স্বরে বললেন, ” তারা এক্সিডেন্ট করে একেক দিন একেকজন পরে থাকবে আর ঘর গুষ্টি মিলে তাদের সেবা করবে। করো করো, আরও বেশি করে সেবা করো। দুধের সাথে আপেল, আঙ্গুর, কলাও নিয়ে আসতা। ” মেঘ একগাল হেসে বলল, “সব রেডি করা আছে। দুধ খাওয়া শেষ হলেই ঐগুলা নিয়ে আসবো। ” মোজাম্মেল খান তীব্র বিরক্তি আর বিদ্রুপের স্বরে কথাটা বলেছিলেন অথচ মেঘ তা বুঝতে না পেরে উল্টো সাবলীল ভঙ্গিতে অচতুর স্বীকারোক্তি দিয়েছে। মেঘের উত্তর শুনে মোজাম্মেল খান কয়েক মুহুর্ত স্তব্ধ হয়ে রইলেন। মেঘ উত্তর দেয়ার পর নিজেই কনফিউশানে পরে গেছে, আব্বু কি ঠাট্টা করলো নাকি সিরিয়াসলি বলছে এটায় বুঝতে পারছে না । আবির মেঘের অবস্থা দেখে মিটিমিটি হাসছে। মোজাম্মেল খান পুনরায় গম্ভীর কণ্ঠে আবিরকে উদ্দেশ্য কি যেন বলেছেন। মেঘ সে কথা বুঝেছে কি বুঝে নি কে জানে! কপাল কুঁচকে গম্ভীর কণ্ঠে বিড়বিড় করে বলল, ”

এক্সিডেন্টের কারণে যে পরিমাণ রক্ত শরীর বেড়িয়েছে তা পূরণ করতে দুধ, ডিম, ফল খাওয়াবো না তো কি আপনার বকা খাওয়াবো? " মোজাম্মেল খান মেঘকে শুধালেন, "তানভির কোথায়?" মেঘের চোখ আবিরের দিকে পরতেই দেখল আবির মাথা দিয়ে না করতেছে। মেঘ সহসা মাথা নিচু করে উত্তর দিল, "জানি না।" এরমধ্যে হালিমা খান ফল, সাথে ডিম সিদ্ধ নিয়ে আসছেন। রুমে ঢুকতে ঢুকতে চড়া গলায় বললেন, "তানভির যেখানেই থাকুক অন্তত এখন এখানে তাকে ডাকবো না। ২ ঘন্টা যাবৎ ছেলেটাকে ইচ্ছেমতো কথা শুনাচ্ছেন। আর কত! আপনি এখন যান এখান থেকে। ফ্রেশ হয়ে আসুন আপনাকে খেতে দিচ্ছি। আর ছেলেটাকেও শান্তিতে খেতে দিন।" তানভির ঘন্টাখানেক আগেই বাসায় আসছে। আবিরের রুমে আসতেও চেয়েছিল কিন্তু হালিমা খান বারণ করেছেন। মোজাম্মেল খানের সামনে আবির আর তানভির দুজনেই গুরুতর আসামি। দোষ যেই করুক না কেন, শাস্তি দু'জনেরই প্রাপ্য। হালিমা খানের উদ্বেল কণ্ঠের কথাবার্তা শুনে মোজাম্মেল খান আর কথা বাড়ালেন না। নিজের রুমের দিকে চলে গেলেন। হালিমা খান আবিরের কাছে ফলের প্লেট টা রেখে মেঘকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "তুই বরং এখানে থাক। আমি তোর আব্বুর জন্য খাবার রেডি করি।" মেঘ ঘাড় কাত করে হ্যাঁ সূচক সম্মতি জানালো। হালিমা খান চলে যেতেই আবির ফলের প্লেটের দিকে তাকালো। হিমোগ্লোবিন বাড়ানোর জন্য যে যে ফল বেশি গুরুত্বপূর্ণ সে সব ফলে প্লেট ভর্তি করে নিয়ে আসছে। আবির

ভাবলেশহীন কণ্ঠে বলল, “এত ফল আনছিস কেন। কে খাবে?” “আপনি খাবেন ” ” এত ফল খাইয়ে একদিনে আমার শরীর ঠিক করার প্ল্যান করছিস নাকি?” ” একদিনে না পারি কিছুদিনেই ঠিক করে ফেলব ইনশাআল্লাহ।” আবির সুস্থির কণ্ঠে বলল, “এত খেতে পারবো না। যেটুকু পারবো সেটুকুই খাবো। ” মেঘ মুচকি মুচকি হাসছে। মেঘের রহস্যময় হাসি দেখে আবির ভ্রু যুগল নাকের গুঁড়ায় টেনে রাশভারি কণ্ঠে শুধালো, “এভাবে হাসার কারণ কি? মনের ভেতর কি চলছে, হুমমমমম?” মেঘের মুচকি হাসি প্রখর হলো। বেশকিছু সময় চলবো মেঘের অঁবাধ হাসি। আবির বিস্তীর্ণ আঁখিতে চেয়ে আছে তার কাদম্বিনীর দুটি নেত্রে। আজ কতদিন পর আবিরের প্রিয়তমার অকৃত্রিম হাসি দেখছে যাতে নেই কোনোরকম কৃপণতা। দীর্ঘ সময়ের হাসির নিমিত্তে মেঘের চোখ দুটা টলমল করছে। গাঢ় কমলা রঙের একটা জামার সাথে সাদার মধ্যে হ্যান্ডপ্রিন্টের একটা ওড়না মেঘের গায়ে জড়ানো। কমলা আর সাদার কম্বিনেশনে মেঘকে আজ অপরূপা লাগছে, সেই সাথে ঠোঁট গুলো আজ মাত্রাতিরিক্ত লাল দেখা যাচ্ছে, চোখের নিচে কাজল কিছুটা লেপ্টে আছে। নিরবধি হাসির কারণে ঘামে চিকচিক করছে নাকের ডগা। কোনো রমণীর প্রেমে পরার জন্য এরচেয়ে বড় কারণ বোধহয় আর হয় না। মুগ্ধতায় আবিরের দু চোখ আঁটকে আছে, নিঃশ্বাস ভারী হয়ে আসছে,বাস্তব আর কল্পনা গুলিয়ে যাচ্ছে। মেঘ চেষ্টা করেও নিজের হাসি থামাতে ব্যর্থ হচ্ছে । দিশাবিশা না পেয়ে বাধ্য হয়ে নিজের হাতে নিজের মুখ চেপে

ধরে হাসি থামানোর চেষ্টা করলো। আবির তখনও নিরেট দৃষ্টিতে চেয়েই আছে। দৃষ্টির গভীরতা জুড়েই অবিশ্রান্ত ভালোবাসার সুবাস। মেঘের মোহমায়ায় জর্জরিত আবিরের হৃদয়। মেঘ হাসি থামিয়ে আবিরের দিকে তাকাতেই আবির ভ্রু জোড়া নাচালো। মেঘ ঠোঁট বেঁকিয়ে মৃদুস্বরে বলল, " আপনি এগুলো খাওয়া শুরু করুন। আমি আসছি।" "কোথায় যাচ্ছিস?" "আসতেছি এখনি।" মেঘ কিছুক্ষণের মধ্যে দুটা প্লেট হাতে ফিরে আসলো। এক প্লেট ভর্তি ফল আরেক প্লেটে এক হালি সিদ্ধ ডিম। মেঘ ঠোঁটে হাসি রেখে প্লেট দুটা আবিরের সামনে রাখতেই আবির বিষম খেয়ে উঠল। কাশতে কাশতে আবিরের অবস্থা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। অলরেডি আবিরের সামনে ১ হালি ডিম, এক প্লেট ভর্তি ফল, তারউপর মেঘ আরও এক হালি ডিম আর এক প্লেট ফল নিয়ে আসছে। আবির কাশতে কাশতে বলল, " এইইই, এসবের মানে কি?" মেঘ হেসে বলল, "এই সবগুলো আপনি এখন খেয়ে শেষ করবেন। আর কোনো কথা আমি শুনতে চাই না। " আবির বিপুল চোখে মেঘের দিকে তাকিয়ে আছে। মেঘের যত্ন দেখে মনে হচ্ছে একদিনেই আবিরকে পুরোপুরি সুস্থ করে ফেলবে । শরীর থেকে যে পরিমাণ রক্ত বের হয়ছে তা একদিনেই পূরণ করে ছাড়বে। আবির মেঘের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে একগ্লাস দুধ, একহালি ডিম আর এক প্লেট ফল কোনোরকমে খেয়ে শেষ করেছে। মেঘ সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে আবিরকে পরখ করছে। খাওয়াতে কোনো প্রকার গাফিলতি যেন না করতে পারে। আবির দীর্ঘ শ্বাস ছেড়ে বলল, "ম্যাম, আমি কি একটু

রেস্ট নিতে পারবো?" " বেশি কষ্ট হচ্ছে? " "একটু তবে আপনি বললে শেষ করে ফেলব।" "থাক, পরে খেয়ে নিয়েন। এখন আমি আসছি। " আবির উদাসীন কণ্ঠে বলল, "আচ্ছা। " আলী আহমদ খান বাসায় ফিরেই আবিরের থেকে নাম্বার নিয়ে গেছেন। মোজাম্মেল খান সহ বাকিদের সাথে কথা বলে অবশেষে মাহমুদা খানের নাম্বারে কল দিলেন।মাহমুদা খানের ফোনে অলরেডি আলী আহমদ খানের নাম্বার ভাইজান লিখে সেইভ করা তাই চিনতে অসুবিধা হয় নি। কল দেয়ার পর প্রথমবারেই কল রিসিভ হলো। মাহমুদা খান কণ্ঠ খাদে নামিয়ে ধীর কণ্ঠে বললেন, "আসসালামু আলাইকুম ভাইজান।" "ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছিস?" "আলহামদুলিল্লাহ ভালো। তুমি কেমন আছ ?" "আলহামদুলিল্লাহ। কোথায় আছিস?" "বাসায়। আবির কেমন আছে?" "আগের থেকে কিছুটা সুস্থ।" "ভাবিরা কেমন আছে? বাকি সবাই কেমন আছে?" "আলহামদুলিল্লাহ ভালো। যে কারণে তোকে ফোন দেয়া, আগামীকাল তোদের বাসার সবাইকে আমাদের বাসায় দাওয়াত। সবাইকে নিয়ে সকাল সকাল বাসায় চলে আসিস। আমার যেন দ্বিতীয় বার ফোন দিতে না হয়। " "ঠিক আছে, ভাইজান।" মাহমুদা খান ফোন রেখেই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করেছেন, আইরিন আর আরিফ ও মায়ের সাথে সাথে কাঁদছে। জন্মের পর থেকে মা কে দেখে আসছে ভাইদের জন্য সবসময় কান্না করেন, ঈদ কিংবা কোনো উৎসব আসলেই তাদের মায়ের কান্না দেখতে হয়। ২৮ বছর পর খান বাড়িতে ঢুকার অনুমতি পেয়েছেন, সেই খুশিতে নিজের কান্না

আটকে রাখতে পারছেন না। আলী আহমদ খানের রাগ এত সহজে কমে যাবে এটা কেউ কল্পনাও করতে পারে নি। আবিরও ভেবেছিল অন্ততপক্ষে ১-২ বছর চেষ্টা করলে হয়তো বা আব্বুর রাগ নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব। কিন্তু বোনকে প্রথম দেখাতেই ওনি সবাইকে ডেকে জানিয়ে দিবে এটা কেউ ই ভাবে নি। আজ সকাল থেকে খান বাড়ির অন্দরমহলে কাজের ধুম পরেছে। দুজন হেল্পিং হ্যান্ড, বাড়ির তিন কর্তী সহ মেঘ, মীম আর আদিও কাজে ব্যস্ত। মেঘ কাজের ফাঁকে ফাঁকে আবিরকে দেখে আসে। আবিরের হাত অনেকেটায় ঠিক হয়েছে, তবে পায়ের ব্যথাটা এখনও অনেক বেশি। আজ তিনভাই একসঙ্গে বাজার করতে বেড়িয়েছেন। বোনের পছন্দ মতো মাছ থেকে শুরু করে সবজি, অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস নিয়ে আসছে। মীম, মেঘ মিলে চুপিচুপি একটা বরণডালাও সাজিয়েছে যেটা মীমের রুমে লুকিয়ে রেখেছে। আবির সুযোগ মতো মেঘকে ডেকে ঠান্ডা মাথায় সব বুঝিয়ে দিয়েছে, মেঘ যেন কোনো প্রকার উশৃংখল আচরণ না করে। আব্বু, চাচ্চুর প্রতি আবিরের বিন্দু পরিমাণ বিশ্বাস নেই, মেঘকে না আটকালে কখন কোন অঘটন ঘটবে তার আশঙ্কায় আছে। মেঘকে প্রটেক্ট করতে আজ আবিরও সামনে থাকতে পারবে না, তানভির কখন কোন কাজে ব্যস্ত থাকবে তাও বলা যায় না। যদি ফুপ্পির সাথে ফুপাকে দেখে আবিরের আব্বুর মাথা গরম হয়ে যায় তাহলেই সব ধ্বংস হয়ে যাবে। আবিরই বলেছিল ফুপ্পিকে বাসায় আনার কথা, কারণ এখন আবিরের অসুস্থতার কারণে আলী আহমদ খানের মন এমনিতেই খুব নরম, এমতাবস্থায়

ফুপ্পিকে না আনতে পারলে পরবর্তীতে কবে সুযোগ পাবে তা জানা নেই। প্রায় ১২ টার দিকে ফুপ্পিরা বাসায় আসছেন। মেঘ নিচ থেকে চিৎকার করে মীমকে ডাকছে। অথচ মীম রুমে সাজুগুজু করতে ব্যস্ত। মাহমুদা খান, ওনার হাসবেন্ড, আইরিন, আসিফ, জান্নাত সবাই এসেছে। আসিফ গতকাল ই দেশে ফিরেছে। আবিরদের সারপ্রাইজ দিবে ভেবেই কিছু জানায় নি। মীম বরণডালা নিয়ে আসছে না দেখে মেঘও ডাকাডাকি বন্ধ করে দিয়েছে। বাসায় ঢুকেই সবাই আবিরকে দেখার জন্য আবিরের রুমে চলে গেছে। মেঘ গ্লাস হাতে নিয়ে আবিরের রুমে যাচ্ছে এসময় মীম উপরের বেলকনিতে থেকে ডেকে জিজ্ঞেস করল, “আপু ওনারা কোথায়?” মেঘ রুষ্ট হয়ে বলল, “ওনারা চলে আসছে। ” মেঘ আবিরের রুমে চলে গেছে। মীম কি বুঝলো কে জানে। দ্রুত রুমে চলে গেছে। সহসা একহাতে বরণডালা নিয়ে অন্যহাতে পা অব্দি ঢাকা লং ড্রেসের এক পাশ উঠিয়ে ছুটছে। মীমের পড়নে গাঢ় জলপাই রঙের একটা গাউন ড্রেস, একপাশে ওড়না সেফটিপিন দিয়ে আটকানো, স্ট্রেইট চুলগুলো কাঁধের নিচ পর্যন্ত পৌঁছেছে, মেঘ নিজেই মীমের চোখে আইলাইনার আর কাজল দিয়ে দিয়েছে,মীম ঠোঁটে রঞ্জকও লাগিয়েছে। মীমের একহাতে কালো ফিতার ঘড়ি, অন্য হাতে কতগুলো চুড়ি, এক পায়ে পায়েল সাথে পুতুলওয়ালা নরম তুলতুলে স্যান্ডেল পড়নে। এলোপাতাড়ি দৌড়ের কারণে মীমের কাঁধ ছাড়ানো চুলগুলো রীতিমতো লাফাচ্ছে। আশপাশ কোনোদিকে তাকানোর মতো সময় নেই। বরণডালা হাতে নিয়ে মেইনগেইট পার

হতেই আচমকা একছেলের সাথে ধাক্কা লাগতেই সামনের ছেলেটা দ্রুত সরে গেছে। মীমের হাতের বরণডালা সহ ফুলের পাপড়ি সব পরে গেছে, সাথে সাথে মীমও ধপাস করে নিচে পরে গেছে। ব্যাথায় মীম চিৎকার করে উঠল, "ও মা গো।" চিকন লম্বা এক ছেলে দু কদম এগিয়ে এসে শুধালো, "ব্যথা পেয়েছো?" মীম রাগে কটকট করে বলল, " এই কে আপনি, আমার বাসায় এসে আমাকে ফেলে দিয়ে আবার জিজ্ঞেস করেন ব্যথা পাইছি কি না! আপনার সাহস তো কম না।" আবারও আর্তনাদ করতে করতে বলল, "উফফফ! আমি শেষ" ছেলেটাও খেপা স্বরে বলল, " নিজে দেখে চলতে পারো না আবার আমায় দোষারোপ করছো? আমি কি তোমায় ফেলছি নাকি? নিজের গায়ে জোর নাই আবার আমায় বলতে আসে।" মীম এখনও মাটিতে পরে আছে।মীমের রাগ মাথায় উঠে যাচ্ছে, রাগে কটকট করতে করতে বলল, "একদম গায়ের জোর নিয়ে কথা বলবেন না। আপনি ইচ্ছে করে আমায় ফেলছেন। আমি এখনি ভাইয়াকে ডাকবো।" এমন সময় মেঘ আসছে। দরজার সামনে মীমকে বসে থাকতে দেখে মেঘ কপাল কুঁচকে শুধালো, "কিরে তুই এখানে বসে আছিস কেন?" মীম ফোঁস করে উঠল। গাল ফুলিয়ে মেঘের দিকে তাকিয়ে অভিযোগের স্বরে বলা শুরু করল, "আমি এখানে শুধু শুধু বসে আছি না। এই ছেলে আমাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছে। " মেঘ ছেলের দিকে তাকাতেই ছেলেটা নিরুদ্বেগ কণ্ঠে বলল, "আপু বিশ্বাস করো, আমি ইচ্ছে করে ধাক্কা দেয় নি। ভেতর থেকে কে ছুটে আসছে আমি

কিভাবে বুঝবো! আমি ভেতরে ঢুকছি সে হুট করে সামনে চলে আসছে, আমি ভয় পেয়ে কিছুটা সরে গেছি আর সে পরে গেছে। ”
“নাহ আপু। ওনি ইচ্ছে করে ফেলছে। তুমি ভাইয়াকে এখনি ডাকো। এই ছেলের বিচার করতে হবে। উফফ আমার কোমর টা মনে হয় ভেঙেই গেছে। ” মেঘ মৃদু হেসে বলল, “আরিফ, তুমি ভেতরে যাও।” আরিফ ব্যস্ত কণ্ঠে বলল, “আপু সত্যিই আমি ইচ্ছে করে ফেলি নি।” মেঘ তপ্ত স্বরে বিড়বিড় করে বলল, “বুঝতে পেরেছি, তবে একটু সাবধানে থেকো। এসেই পাগলকে উস্কে দিয়েছো, এর পরিণাম কি হবে আমার জানা নেই। ভেতরে যাও।” আরিফ ভেতরে চলে গেছে। মীম রাগান্বিত কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল, “আপু ওনি ঐ ছেলেকে ভেতরে ঢুকতে দিলে কেন? ঐ ছেলে আমায় এত ব্যথা দিল তবুও তুমি তাকে ছেড়ে দিলে? তুমি আমার বোন হয়ে এটা করতে পারলে?” মেঘ হাত বাড়িয়ে গম্ভীর কণ্ঠে বলল, “মুখ টা বন্ধ করে ওঠ। কাজের কাজ কিছুই করতে পারিস না, তখন চিৎকার করে ডাকলাম, বরণডালা নিয়ে নামতে তুই নামিস নি। ওরা সবাই ভেতরে চলে গেছে এতক্ষণে তোর খবর হয়েছে। বরণ তো হলোই না বরং শুধু শুধু কোমড়ে ব্যথা টা পেয়েছিস। সাথে ড্রেস টাও নষ্ট করেছিস। ” মীম মেঘের হাত ধরে কোনো রকমে উঠলো। ঠিকমতো দাঁড়াতেও পারছে না। মেঘ মীমের হাতটা শক্ত করে ধরে বলল, ” পা টা শক্ত করে ঝাড়া দে, দেখবি ঠিক হয়ে গেছে।” মেঘের কথা মতো মীম দুই তিনবার চেষ্টা করলো। কিছুটা ঠিক হওয়ার পর মেঘকে ধরে ধরে ভেতরে ঢুকলো। আবিরের

রুমের দরজার সামনে আসতেই আকলিমা খান শুধালেন, “কিরে কি হলো তোর?” মীম রাগে বলতে নিল, “এই ছে..” মেঘ তাড়াতাড়ি মীমের মুখ চেপে স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, “এমনি ব্যথা পেয়েছে।” আকলিমা খান পুনরায় বললেন, “সারাদিন উল্টাপাল্টা দৌড়াবে, ব্যথা তো পাবেই। বেশি ব্যথা পাইছিস?” সিরিয়াস আলোচনায় মীমের ব্যথাটা আলোচনার মোড় ঘুরিয়ে ফেলছে, আবিরও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মেঘের দিকে তাকিয়ে আছে। মেঘ পরিস্থিতি বুঝতে পেরে তড়িঘড়ি করে বলল, “আরে বেশি কিছু হয় নি। আমি এখনি ঔষধ দিয়ে দিচ্ছি। তোমরা কথা বলো।” মেঘ মীমকে নিয়ে সেখান থেকে চলে গেছে। আবিরের রুমে আলী আহমদ খান ব্যতীত আর সবাই উপস্থিত। আলী আহমদ খান নিজের রুমেই বসে আছেন। বোনের প্রতি ক্রোধ কিছুটা কমলেও, বোনের হাসবেন্ডকে তিনি এখনও মন থেকে মানতে পারছেন না। তাই সামনেই আসছেন না। মোজাম্মেল খান, মালিহা খান, হালিমা খান আলোচনা করে মাহমুদা খান আর ওনার হাসবেন্ডকে আলী আহমদ খানের রুমে পাঠাচ্ছেন । ২৮-৩০ বছরের গড়ে ওঠা অদম্য অন্তরাল ভাঙতে মাহমুদা খান এবং ওনার হাসবেন্ড প্রয়োজনে আলী আহমদ খানের পায়ে ধরতেও রাজি।মেঘ মীমের সঙ্গে উপরে চলে গেছে। মীম কোমড়ের সাথে সাথে পায়েও অল্প ব্যথা পেয়েছে। আগে বুঝতে না পারলেও এখন মীমের পা জ্বলছে। কাটা স্থান থেকে রক্ত বেড়িয়ে পড়নের সেলোয়ারে দাগ হয়ে গেছে। মেঘ আগে ভেবেছিল সামান্য ব্যথা পেয়েছে তাই এত গুরুত্ব দেয় নি। মীমের অবস্থা দেখে

এখন মেঘ নিজেই ভয় পেয়ে গেছে। বাসার কাউকে জানালে তুলকালাম কান্ড হয়ে যাবে। মীম পায়ের দিকে তাকিয়ে কাঁদছে আর আরিফকে অনর্গল বকেই যাচ্ছে। মেঘ বুঝিয়ে শুনিয়ে মীমকে শান্ত রাখার চেষ্টা করছে। মেঘ কাটা স্থান জীবাণু মুক্ত করে একটা মলম লাগিয়ে ব্যথার ঔষধ খাইয়ে দিয়েছে। বেশকিছুক্ষণ বুঝানোর পর মীম কিছুটা শান্ত হয়েছে।মীম অন্য একটা ড্রেস পরেছে। কিছুক্ষণ পর দুইবোন একই সঙ্গে নিচে আসছে। পায়ে আর কোমড়ে ব্যথার জন্য মীম ঠিকমতো হাঁটতে পারছে না। ওরা নিচে আসতেই দেখল আলী আহমদ খানের রুমের সামনে ভিড়, মেঘ মীমকে সোফায় বসিয়ে এগিয়ে গেল বড় আব্বুর রুমের দিকে। রুমের বাহিরে মোজাম্মেল খান, ইকবাল খান, মালিহা খান, হালিমা খান, আকলিমা খান দাঁড়িয়ে আছে। মেঘ আম্মু আর কাকিয়ার পাশ কেটে দরজা পর্যন্ত আসতেই মেঘের পা যুগল থমকে গেছে সেই সাথে হৃদস্পন্দনও হঠাৎ থেমে গেল। মাহমুদা খান এবং ওনার হাসবেন্ড দুজনে আলী আহমদ খানের দু পা আঁকড়ে ধরে অবিচ্ছেদ্য ভাবে কেঁদেই চলেছেন। ব্যগ্র স্বরে নিজের ভুল স্বীকার করছেন আর আলী আহমদ খানের কাছে মাফ চাচ্ছেন। আলী আহমদ খান বোনকে অনেকদিন আগেই ক্ষমা করে দিয়েছেন, তবে আজ বোনের হাসবেন্ড কে সামনাসামনি দেখার পর নিজেকে কোনোভাবেই নিয়ন্ত্রণ করতে পারছেন না। পাথুরে মানবের ন্যায় আলী আহমদ খান বিছানার এক পাশে বসে আছেন। মোজাম্মেল খান ব্যতীত দরজার সামনে দাঁড়ানো প্রতিটা মানুষের চোখ টলমল

করছে। মেঘ কাতর বদনে ফুপ্পির দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল, মেঘের বুকের ভেতর অসহনীয় যন্ত্রনা হচ্ছে, হৃদয় খুঁড়ে আসা আর্তনাদ গুলো অবিক্ষিপ্ত গতিতে দুচোখ বেয়ে গড়িয়ে পরছে। ক্ষণিকের জন্য মেঘ নিজেকে ফুপ্পির জায়গায় কল্পনা করতেই মেঘের চারপাশ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। দাঁড়িয়ে থাকার সর্বশক্তি মুহুর্তেই বিলীন হয়ে গেছে। মেঘ দ্রুত স্থান ত্যাগ করলো। মীমের পাশে সোফায় গিয়ে বসে চোখ বন্ধ রেখে ঘনঘন শ্বাস নিয়ে নিজেকে স্বাভাবিক করার চেষ্টা করছে। মেঘের অস্থিরতা দেখে মীম অবাক চোখে চাইলো। আশপাশে চোখ বুলিয়ে মীম সন্ধিহান কণ্ঠে শুধালো, "আপু কি হয়েছে তোমার? এভাবে হাঁপাচ্ছো কেন?" মেঘ নিজেকে সামলে স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, "কিছু হয় নি।" অন্যদিকে আবিরের রুমে আসিফ, জান্নাত, তানভির, আরিফ, আইরিন সবাই খুনসুটিতে মেতে আছে। বেশকিছুক্ষণ খুশগল্প করার পর আসিফ হঠাৎ ই গম্ভীর কণ্ঠে আবিরকে উদ্দেশ্য করে বলল, "শুনলাম তুই নাকি মেঘের জন্য এক্সিডেন্ট করেছিস?" "মোটেই না। তোমরা শুধু শুধু আমার ওনাকে দোষারোপ করছো। ওনার কোনো দোষ ই নাই। ভাগ্যে ছিল তাই এক্সিডেন্ট করেছি। আসিফ কিঞ্চিৎ হেসে বললো, " এখনি তার পক্ষ নিচ্ছিস? বিয়ের পর কি করবি তাহলে?" আবির জিভ দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে, ঠোঁট বেঁকিয়ে হেসে মৃদুস্বরে বলল, "পরে বউ ভক্ত জামাই হবো। ও যা বলবে, যেভাবে বলবে আমি সেভাবেই চলবো। বাস্তবে কেন, স্বপ্নেও কোনোদিন ওকে আমার বিরুদ্ধে কোনো ধরনের

অভিযোগ তুলতে দিব না। ইনশাআল্লাহ। ” জান্নাত, আসিফ আর তানভির একসঙ্গে “ইনশাআল্লাহ” বলে উঠল। আইরিন হাসিমুখে শুধালো, “ভাইয়া তুমি বিয়েটা কবে করবা? আমরা কি বিয়ে খাবো না?” আবির ঠাট্টার স্বরে বলল, “তোকে বিয়ে দিয়ে তারপর ই করবো।” আইরিন মুখ ফুলিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে বলল, “আমার কি বিয়ের বয়স হয়ছে? মাত্র ১৬ বছর বয়স আমার। আমি এখনও শিশু।” তানভির হেসে বলল, ” এখনও কত কত গ্রামে ১২-১৪ বছর বয়সী মেয়েদের বিয়ে হয়ে যায়। সেখানে তুই তো তাদের থেকে ২ বছরের বড়। তোকে দিতে সমস্যা কি?” আইরিন গুরুগম্ভীর ভাব নিয়ে বলল, “তোমার বোন যে আমার থেকে আরও ৩ বছরের বড় সে বেলায়? তাকে বিয়ে দাও না কেন?” তানভির সত্বর জবাব দিল, “আমার বোনের জামাই ফিক্সড তাই কোনো টেনশন নাই কিন্তু তোর জন্য তো ছেলে খোঁজতে হবে এজন্য সবার টেনশন। ” আইরিন ভ্রু নাকের গুঁড়ায় টেনে রাশভারি কণ্ঠে বলল, “আমি বিয়েই করবো না। ” আইরিনের কথা শুনে সবাই উঁচু স্বরে হাসতে শুরু করেছে। আইরিন রাগে কটকট করতে করতে সবার দিকে তাকাচ্ছে। জান্নাত ঠোঁটে হাসি রেখেই বলল, ” তোমরা সবসময় আমার ননদিনী টাকে রাগাও। আমার ননদিনীকে বিয়েই দিব না, সারাজীবন আমাদের কাছে রেখে দিব। তাহলে আম্মুকেও মেয়ের জন্য কান্নাকাটি করতে হবে না। ” আইরিনের গাল ফুলানো দেখে আরিফ আইরিনের মাথায় গাট্টা মেরে বলল, “তুই এত বেক্কল কেন রে? মজাও বুঝিস না?” আইরিন মাথায়

ঘষতে ঘষতে অসহায় মুখ করে আরিফের দিকে চেয়ে আছে। আরিফ সবার সাথে অন্য বিষয়ে কথা বলায় ব্যস্ত । এরমধ্যে আকলিমা খান দরজা থেকে ডেকে বললেন, “তানভির, ওদের নিয়ে বাসা টা একটু ঘুরে দেখা। আর পারলে আবিরকে ধরে রুমটা থেকে বের কর। এক রুমে বন্দি থাকতে কত ভালো লাগে?” তানভির ধীর কণ্ঠে বলল, ” ঠিক আছে।তুমি যাও, আমি ভাইয়াকে নিয়ে যাচ্ছি। ” আইরিন, আরিফ, জান্নাত আগে বেড়িয়ে গেছে।তানভির আর আসিফ দুপাশ থেকে আবিরকে ধরে আস্তেধীরে নিয়ে যাচ্ছে। আবিরের হাত মোটামুটি ঠিক হয়ে গেছে, পায়ে ব্যথা রয়েছে। বাড়ির নিরিবিলি পরিবেশ দেখে জান্নাত এগিয়ে গিয়ে আকলিমা খানকে শ্বাশুড়ির কথা জিজ্ঞেস করতে লাগলো। মেঘ আর মীম দু’জন ই সোফায় হেলান দিয়ে বসে আছে। সবাইকে বের হতে দেখে হালিমা খান এগিয়ে এসে মেঘকে ডেকে বললেন, “ওদের নিয়ে ছাদ থেকে ঘুরে আয়। আমরা খাবার রেডি করছি।” এদিকে ওদিক নজর বুলিয়ে মেঘ উঠে নিজের মনকে সামলে মুখে হাসি নিয়ে বলল, “চলো।” মীমকে উদ্দেশ্য করে বলল, “কিরে তুই যেতে পারবি ?” মীম মেঘের দিকে এক পলকের জন্য তাকাতেই হঠাৎ আরিফের দিকে চোখ পরলো। ওমনি মীম রেগেমেগে আগুন হয়ে গেছে। রাগান্বিত কণ্ঠে বলল, “আমি যাব না। তুমি যাদের নিয়ে যাচ্ছিলে তাদের নিয়েই যাও।” মেঘ যথারীতি আইরিন আর আরিফকে নিয়ে উপরে চলে গেছে। এক এক করে মীম,তানভির, মেঘ, আবির সবার রুম ঘুরিয়ে ছাদে নিয়ে গেল। ছাদ ভর্তি এত এত গাছ দেখে

আইরিন খুশিতে লাফালাফি শুরু করে দিয়েছে। আইরিনের উইশলিস্টের প্রায় অনেক গাছ অলরেডি মেঘদের ছাদে আছে। আইরিন আপন মনে বকবক করেই যাচ্ছে, “এই গাছটা আমার আছে, ঐটা ছিল এখন নাই, এই গাছটা আমাদের বাসায় হয় না। তুমি আবার আমাদের বাসায় গেলে তোমাকে আমাদের বাসার ছাদে নিয়ে যাব। ” মেঘ মৃদু হেসে শুধু বলল, ” আচ্ছা ঠিক আছে। ” অনেকক্ষণ যাবৎ বকবক সহ্য করে অবশেষে আরিফ ক্ষুদ্ধ হয়ে বলল, “তোদের সাথে এসে আমার নিজেকে উন্মাদ মনে হচ্ছে। গাছগাছালি নিয়ে এত আলোচনা গবেষণাগারের গবেষকরাও বোধহয় করেন না। ” আইরিন ঠাট্টার স্বরে বলল, “তুই ভালো মানুষ ছিলি কবে?” আরিফ অগ্নি দৃষ্টিতে তাকাতেই আইরিন ভেঙচি কাটলো। মেঘ হেসে বলল, “আচ্ছা গাছ নিয়ে আর কথা বলব না। তোমার যে বিষয়ে কথা বলতে ইচ্ছে করে সেই বিষয়েই বলো।” আরিফের রাগ মুহুর্তেই গায়ের হয়ে গেছে। সহসা অস্ফুট কণ্ঠে বলল, “এই না হলে আমার ভা..” আইরিন সঙ্গে সঙ্গে আরিফের মুখ চেপে ধরে ফেলল। মেঘ আশ্চর্যান্বিত নয়নে তাকিয়ে আইরিনকে শুধালো, “আরিফের মুখ চেপে ধরেছো কেন?” পুনরায় আরিফকে শুধালো, “কি বলতে চাইছিলে বলো, ভা মানে কি?” আরিফ ঢোক গিলে উষ্ণ স্বরে বলল, “ভালো বোন।” মেঘ ভ্রু কুঁচকে সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকিয়ে শুধালো, “সত্যি? তাহলে আইরিন মুখ চেপে ধরেছে কেন?” “আইরিন খুব হিংসুটে, ও নিজেকে ছাড়া আর কাউকে ভালো বলতে দিবে না। তোমাকে ভালো বলে ফেলছি এটা ওর সহ্য

হচ্ছে না। ” আইরিন বিপুল চোখে আরিফের দিকে তাকিয়ে আছে আর ভেতরে ভেতরে ফুঁসতেছে। বিড়বিড় করে বলল, “আগে বাসায় চল, তারপর তোকে বুঝাবো।” মেঘ, আইরিন, আরিফ তাদের পড়াশোনা, ভার্সিটি লাইফ আর স্কুল লাইফ নিয়ে গল্প করছে। এদিকে আবির, তানভির, আসিফ সোফায় বসে বসে গল্প করছে। আবিরের ব্যবসা, তানভিরের রাজনীতি, আসিফের জব লাইফ নিয়েই নানান আলাপ আলোচনায় মগ্ন। জান্নাত, হালিমা খান ও আকলিমা খানের সাথে খাবার পরিবেশনে সাহায্য করছে। মাহমুদা খান, ওনার হাসবেন্ড এবং বাকিরা আলী আহমদ খানের রুমেই টুকটাক কথা বলছেন। মাহমুদা খানকে আলী আহমদ খান নতুন করে সবার পরিচয় দিচ্ছেন, যদিও মাহমুদা খান সবাইকে আগে থেকে চিনেন। আলী আহমদ খান হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, “তোর ছেলে মেয়ে কি তিনজন ই?” মাহমুদা খান মৃদুস্বরে বললেন, “নাহ। আমার আলহামদুলিল্লাহ দুই ছেলে আর দুই মেয়ে।” মোজাম্মেল খান শুধালেন, “আরেক মেয়ে কোথায়? নিয়ে আসলি না কেনো?” “বড় মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে,কানাডা থাকে।” ইকবাল খান আশ্চর্য নয়নে তাকিয়ে বললেন, “আফা, তোমার এক মেয়েকেও বিয়ে দিয়ে ফেলছো? ” মাহমুদা খান মলিন হেসে বললেন, “আলহামদুলিল্লাহ একবছরের একজন নাতিও আছে। ” মোজাম্মেল খান বোনের কথায় রীতিমতো ভীমড়ি খেলো। আলী আহমদ খান মালিহা খানের দিকে তাকিয়ে উদাসীন কণ্ঠে শুধালেন, ” আমার ছেলেকে এবার বিয়ে করানো দরকার। নাকি বলো?” মালিহা খান

কিছুটা তপ্ত স্বরে বললেন, “আবির ফেরার পর থেকে আপনার কাছে আমি এই কথা বলছি। কিন্তু আপনি তো আমার কথা গুরুত্বই দিচ্ছেন না। ” “এবার গুরুত্ব দিতেই হচ্ছে। আমার ছোট বোন নানি হয়ে গেছে আর আমি এখনও ছেলের বউ এর মুখে আব্বাজান ডাক ই শুনতে পারলাম না।” মোজাম্মেল খান চিন্তিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, ” কোনো মেয়ে কি পছন্দ হয়েছে ভাইজান? দেখেছো কি?” “হ্যাঁ। মেয়ে আমার পছন্দ করায় আছে। আবির শুধু হ্যাঁ বললেই হবে। ” মালিহা খান উদ্বিগ্ন কণ্ঠে শুধালেন, “মেয়ে কে? কি করে?” আলী আহমদ খান ঠাট্টার স্বরে বললেন, “মেয়ে তুমিও দেখেছিলে এবার আমিও দেখেছি। এখন দেখি ছেলে কি করে। ” মোজাম্মেল খান আবারও প্রশ্ন করলেন, “ভাইজান, তুমি কি শাকিল সাহেবের মেয়ের কথা ভাবতেছো?” মালিহা খান জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, “শাকিল সাহেব কে?” ইকবাল খান উত্তর দিলেন, “ভাইজানের ব্যবসায়িক বন্ধু।” “মেয়ে দেখতে কেমন?” “মাশাআল্লাহ ভাবি। মেয়ে দেখার মতো। আপনি দেখলে চোখ ফেরাতে পারবেন না যাকে বলে আগুন সুন্দরী। তারউপর বাবা মায়ের একমাত্র মেয়ে বলে কথা। ” মালিহা খান ঠান্ডা কণ্ঠে জানালেন, “নাহ। আমার ছেলের বউ হবে আমাদের মতো সাধারণ, অবশ্যই মিশুক হতে হবে। যে আগুনের আশেপাশে ভিড়তেই পারবো না সে আগুনে আমার ছেলেকে পুড়তে দিব না। ” আলী আহমদ খান গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, “তোমার ছেলে বিয়ের জন্য রাজি হলে তারপর অন্যান্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করা

যাবে। ” এদিকে মাহমুদা খানের বুকের ভেতর থাকা হৃদপিণ্ড কেঁপে উঠেছে। ওনি এতদিনে আবিরকে যতটুকু চিনেছেন, আবির মেঘকে না পেলে আবিরও বাঁ-চবে না। যেকোনো একটা বড় ধরনের এক্সিডেন্ট ঘটিয়ে ফেলবে। মাহমুদা খান আলী আহমদ খানের সামনে মুখ ফুটে কিছু বলতে পারছেন না, আবার চুপচাপ কথাগুলো হজমও করতে পারছেন না। অন্যদিকে মীম সোফায় বসে ছিল, আবির রা সা◌েফায় এসে বসতেই, মীম কিছু একটা ভেবে তড়িঘড়ি করে উঠে পায়ে ব্যথা নিয়েই দৌড়ে রান্নাঘরে গেল। উত্তেজিত কণ্ঠে শুধালো, “আম্মু, বাসায় কলা আছে?” “হ্যাঁ। কেনো?” “আমায় একটা কলা দাও। ” ” ভাত খাওয়ার সময় কলা দিয়ে কি করবি?” “খাবো। এখনি দাও। একটা না দুটা কলা দিও ” আকলিমা খান কপাল কুঁচকে মীমের দিকে তাকিয়ে কিছু না বলে দুটা কলা বের করে দিল। সঙ্গে সঙ্গে হালিমা খান মীমকে বললেন, ” মীম, ছাদ থেকে ওদের ডেকে নিয়ে আয় তো মা।” মীম ঠোঁট বেঁকিয়ে হেসে বলল, “অবশ্যই । এখনি যাচ্ছি।” মীম কলা খেতে খেতে সিঁড়ি দিয়ে উঠছে। মুহুর্তেই যেন পায়ের ব্যথার কথা সম্পূর্ণ ভুলে গেছে। ছাদের দরজা থেকে ডাকলো, “আপু, মামনি তোমাদের ডাকছে। ” মেঘ স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, “আচ্ছা যাচ্ছি। কিন্তু তুই এখানে আসলি কিভাবে?” “এভাবেই। ” মেঘ আর আইরিন গল্প করতে করতে সিঁড়ি দিয়ে নামছে। আরিফ মীমের শারীরিক অবস্থা বুঝার জন্য এক পলক মীমের দিকে তাকিয়ে সঙ্গে সঙ্গে চোখ সরিয়ে নিয়েছে। মীম যদি বুঝতে পারে আরিফ ইচ্ছেকৃত মীমের দিকে

তাকিয়েছে তাহলে এবার সিডর, আইলার মতো তান্ডব শুরু করে দিবে। আরিফ ফোনের দিকে মনোযোগ দিয়ে মীমকে পাশ কাটিয়ে চলে গেছে। আরিফ ৪-৫ সিঁড়ি নামতেই হঠাৎ স্লিপ কেটে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে কয়েক সিঁড়ি নেমে সামনে থাকা আইরিনের দু কাঁধে ধরার চেষ্টা করে। আরিফের ভর আইরিন নিতে না পেরে হুমড়ি খেয়ে পড়তে নেয়, মেঘ তাড়াতাড়ি আইরিনকে ধরে ফেলে, ততক্ষণে আরিফ ও নিজের শক্তি দিয়ে কোনোরকমে স্থির হয়েছে। পায়ের ২-৩ জায়গায় ঘষা খাওয়ায় আরিফের পা জ্বলছে, সেদিকে না তাকিয়ে আরিফ পেছন ফিরে তাকাতেই দেখল একটা সিঁড়িতে কলার বাকল অক্ষত অবস্থায় পরে আছে, এর আগের সিঁড়িটাতেই আরিফের পা পরেছিল। মীম দুটা কলা খেয়ে পরপর দুই সিঁড়িতে বাকল ফেলেছে, যেন যেকোনো একটাতে আরিফ স্লিপ খায়। মেঘ আর আইরিন আগে নেমে যাওয়ায় এবং আরিফের মনোযোগ ফোনে থাকায় মীমের কাজে বেশ সুবিধা হয়েছে। আরিফ চোখ তুলে মীমের দিকে তাকাতেই মীম নিজের দুহাত ঝেড়ে এমন ভাব নিলো যেন সে বিশাল কিছু করে ফেলেছে। আরিফের রাগ হলেও সে প্রকাশ করল না, আইরিন নিজের মতো করে আরিফকে বকছে, আইরিন ভেবেছে আরিফ ইচ্ছে করে আইরিনকে ধাক্কা দিয়েছে। আরিফ সেসবে পাত্তা না দিয়ে মেঘদের পাশ কাটিয়ে নিচে চলে গেছে। মীম নেমে এসে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে শুধালো, “আইরিন আপু, তুমি কি ব্যথা পেয়েছো?” মেঘ সন্দেহের দৃষ্টিতে মীমকে দেখেও কিছু বললো না। নিচে নামতেই দেখল সবাই খাবার

টেবিলে বসা। আজ ডাইনিং এ আরও ৫ টা চেয়ার এড করায় জায়গা তুলনামূলক কম। ফুপ্পিদের পাশে দুটা চেয়ার ফাঁকা, আবিরের পাশের একটা চেয়ারও ফাঁকা। আইরিন তার মায়ের পাশে গিয়ে বসলো, মীম ফুপ্পিদের পাশের চেয়ারে বসতে বসতে মেঘকে চোখে ইশারা করল, যেন আবিরের পাশে গিয়ে বসে। মেঘ কয়েক মুহুর্ত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। এরমধ্যে আবির দুবার তাকিয়েছে, কিন্তু মেঘের নজর অন্যদিকে। তানভির আবিরের পাশের চেয়ারটা ইশারা করে মোলায়েম কণ্ঠে মেঘকে বলল, "বনু, এখানে এসে বস। " সঙ্গে সঙ্গে আলী আহমদ খানও বললেন, "বসো বসো, খাওয়া শুরু করি।" মেঘ আগপাছ না ভেবে আবিরের পাশে গিয়ে বসলো। অজানা এক অনুভূতিতে মেঘের মন শিউরে উঠছে। তিরতির করে কাঁপছে মেঘের হাত, আবির মেঘের হাতের দিকে নজর বুলায়। আড়চোখে মেঘকে কয়েক মুহুর্ত পর্যবেক্ষণ করে। মেঘের কাঁপা কাঁপি দেখে আবির ব্যান্ডেজ করা হাত নিয়ে নিজেই মেঘের প্লেটে খাবার তুলে দিল। আচমকা মেঘের সঙ্গে হাতের স্পর্শ লাগতেই মেঘ কারেন্টে শক খাওয়ার মতো আঁতকে উঠে। মুহুর্তেই হাত ছিঁটকে সরিয়ে নিয়েছে। অকস্মাৎ মেঘের এরকম আচরণে আবির কপাল গুটিয়ে অবাক চোখে তাকালো কিন্তু কোনো কথা বলল না। খাওয়ার মাঝে প্রয়োজনের বাহিরে কেউই কোনো কথা বলে নি। মীমের সাথে দু একবার আরিফের চোখাচোখি হয়েছে, মীম প্রতিবার ই ভেংচি কেটে সহসা অন্যদিকে তাকিয়ে পরেছে। আলী আহমদ খান খাবার শেষ করে গলা

খাঁকারি দিয়ে ধীর কণ্ঠে বললেন, “আমি খান বাড়ির সবার উপস্থিতিতে আমার ছেলের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত জানাচ্ছি। আমার ছেলের সম্মতি থাকলে আমি সামনের ঈদ নাগাদ ছেলের বউ ঘরে তুলতে চাই। ” আলী আহমদ খানের কথাগুলো আবিরের মনে সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফোরিত হয়েছে। আবিরের চোখ মুখে অন্ধকার নেমেছে, কপালে কয়েক স্তর ভাঁজ পরে গেছে। এদিকে মেঘের নিঃশ্বাস গলায় আঁটকে গেছে, অবিরত ঢোক গিলে নিঃশ্বাস নেয়ার প্রবল চেষ্টা করছে। তানভির, আসিফ, আরিফ, জান্নাত, আইরিন, মীম সকলেই আশ্চর্য নয়নে তাকিয়ে আছে। সবার মনে উত্তেজনা আর ভয় একসঙ্গে কাজ করছে। আলী আহমদ খান পুনরায় শুধালেন, ” আবির, এখন বিয়ে করতে তোমার কোনো আপত্তি আছে?” শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতিতে আবিরের নিঃশ্বাস ভারী হয়ে গেছে, মস্তিষ্ক জুড়ে বিচরণ করা পরিকল্পনা গুলো এলোপাতাড়ি ছুটছে। পিঞ্জরে আবদ্ধ হৃদপিণ্ডটা দপদপ করে কাঁপছে। আব্বু, চাচ্চু সহ খান বাড়ির প্রায় সব সদস্য আজ এখানে উপস্থিত। বহু কাঠখড় পুড়িয়ে আবির ফুপ্পিকে প্রথমবারের মতো বাসায় আনতে সফল হয়েছে, আবির যতটা চেষ্টা প্রকাশ্যে করেছে তার থেকে অনেক বেশি চেষ্টা গোপনে করেছে। ফুপ্পির সাথে প্রথমবার দেখা হওয়ার পর থেকে, মালিহা খানকে দিয়ে আবির যথাসাধ্য আলী আহমদ খানকে বুঝানোর চেষ্টা করে আসছে। এতদিনে ভাই বোনের সম্পর্ক মোটামুটি ঠিক হতে শুরু করেছে। এমতাবস্থায় আবির কোনোভাবেই নতুন কোনো ঝামেলা চাচ্ছে না।

বর্তমানে আবিরের অবস্থান অনুসারে, মেঘের কথা বাসায় জানানো বা আব্বু, চাচ্চুর কাছে মেঘকে চাওয়ার মতো মিনিমাম যোগ্যতাও আবিরের নেই। আর যাই হোক, আবির মেঘের ব্যাপারে "নাহ" শব্দ শুনতে নারাজ। এদিকে টেনশনে মেঘের হাত পা ঠান্ডা হয়ে গেছে। আবির বিয়েতে রাজি হয়ে গেলে আর যে কোনো ক্রমে অন্য মেয়ের সাথে আবিরের বিয়ের কথা হলে মেঘের কি হবে সেটা ভেবেই মেঘ ডিপ্রেশনে চলে যাচ্ছে। পাশাপাশি বসায় আবিরের দিকে ঠিকমতো তাকাতে পারছে না,আবিরের রিয়াকশন ও বুঝতে পারছে না। কিছু মুহুর্তের জন্য খাবার টেবিলে পিনপতন নীরবতা চললো। অবশেষে আবির ছোট করে শ্বাস ছেড়ে গম্ভীর কণ্ঠে বলল, " আমি আপাতত বিয়ের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত না। " " আমি কি তোমাকে এখনই বিয়ে করতে বলছি নাকি? ঈদ পর্যন্ত সময় নাও, মানসিক ভাবে প্রস্তুত হও।" আবির আগপাছ না ভেবে বলে উঠল, "সরি আব্বু । ঈদ নাগাদ সময়ে আমি নিজেকে গুছাতে পারবো না। আমার আরও সময় লাগবে।" "কতদিন? " "আগামী ১ বছর আমি বিয়ে নিয়ে ভাবছি না।" " আরও একবছর? তুমি বাড়িতে আসছো প্রায় ১ বছর হতে চললো। তাছাড়া তোমার বিয়ের বয়সও হয়েছে, তোমার আম্মু অনেকদিন যাবৎ ই আমাকে বলছিল। আমার উচিত বাবা হিসেবে নিজের দায়িত্ব স্বীয় ভাবে পালন করা। " " কিন্তু আব্বু আমি এখন কোনো অবস্থাতেই বিয়ে করতে পারবো না। বিয়ে করার মতো যোগ্যতা আমার এখনও হয় নি। " "কেন হবে না? যদি ইনকামের

কথাও চিন্তা করি, তুমি প্রায় ৮-৯ মাস যাবৎ আমাদের পারিবারিক ব্যবসার পাশাপাশি নিজস্ব ব্যবসা সামলাচ্ছো। তোমার পার্সোনাল ইনকাম বাদ দিলাম, আমাদের কোম্পানি থেকে প্রতিমাসে তোমাকে যে স্যালারিটা দেয়া হয় আমি আশাবাদী তা দিয়ে তুমি তোমার বউ নিয়ে দিব্যি চলতে পারবে। প্রয়োজনে বিয়ের পর তোমার স্যালারি বাড়ানো হবে। ব্যবসার দায়িত্ব এখন তোমার কাছ, তোমার যা প্রয়োজন তার সবটায় তুমি নিতে পারো। এরপরও যদি সমস্যা মনে হয় তাহলে আমি তো আছিই। বিয়ের সম্পূর্ণ খরচ না হয় আমিই দিলাম। ”
আবির মলিন হেসে বলল, ” আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং আমি আন্তরিক ভাবে দুঃখিত। প্রয়োজনে ১ বছরের জায়গায় দুই বছর পর বিয়ে করবো তবুও বিয়ের জন্য আমি কারো কাছ থেকে এক পয়সাও নিব না। ” মোজাম্মেল খান রাশভারি কণ্ঠে বলে উঠল, ” যদি টাকার জন্য ই বিয়ে করতে সমস্যা হয় তাহলে তোমার আব্বুর বা আমার একাউন্ট থেকে চাইলে তুমি তোমার প্রয়োজনীয় এমাউন্ট ধার নিতে পারো। তারপর ধীরে ধীরে পরিশোধ করে দিও। তোমার আব্বু তোমাকে বিয়ে করাতে চাইছেন, তোমার রাজি হওয়া উচিত। ”
মোজাম্মেল খান একটু থেমে পুনরায় বললেন, ” আর মেয়েটা তোমার অপরিচিত কেউ না!” মোজাম্মেল খানের কথায় আবির আঁতকে উঠল। মুহুর্তেই মাথায় চিন্তারা ঘুরপাক খেতে শুরু করলো। সহসা হৃৎস্পন্দন জোড়ালো হয়ে গেছে। মনের গহীনে একটা চিন্তা বার বার উঁকি দিচ্ছে, “আব্বু- চাচ্চু কি কোনোভাবে মেঘের কথা বলতে চাচ্ছেন?”

অন্যমনস্কতায় আবিরের ওষ্ঠ যুগল কিছুটা প্রশস্ত হলো।নিপুন কৌশলে আবির নিজের অল্পবিস্তর হাসিটাকে আড়াল করে গুরুতর কণ্ঠে শুধালো, “কে সে?” মোজাম্মেল খান অবলীলায় বলতে শুরু করলেন, ” শাকিল সাহেবকে তো তুমি চিনোই । ওনার মেয়ে সারা কেও নিশ্চয়ই দেখেছো, মাঝে মাঝে অফিসেও আসে। গতকাল তোমার অসুস্থতার কথা শুনে শাকিল সাহেব অফিসে আসছিলেন, তারপর নিজে থেকেই সারা র সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধের কথা বলেছেন। যদিও ভাইজান তেমন কিছু বলে নি, বাসায় আলোচনা না করে ওনাকে কিছু জানানো ঠিক হবে না। বাসার সবার ও তোমার মতামত থাকলে ওনাদের বাসায় দাওয়াত করা হবে। মেয়ে অপছন্দ হওয়ার মতো কিছু নেই, তারা আসলে এনগেজমেন্ট টাও না হয় করে নেয়া যাবে। ” সারার কথা শুনে আবিরের মেজাজ চরম মাত্রায় খারাপ হয়ে গেছে। মনের কোণে যে একটুকরো সুখের আভাস উঁকি দিয়েছিল তা যেন মুহুর্তেই বিলুপ্ত হয়ে গেছে। পায়ের রক্ত মাথায় উঠে গেছে, গায়ের রক্ত টগবগ করে ফুটছে । মেঘ, তানভির দুই ভাই বোনই অসহায় মুখ করে আব্বুর অভিমুখে চেয়ে আছে। মেঘ পাশে তাকিয়ে একপলক আবির কে দেখছে পুনরায় একপলক আব্বুকে দেখছে। উপস্থিত সকলের মনে অস্থিরতা। এতক্ষণ যাবৎ একটুর জন্য হলেও মনে হয়েছিল, তারা আবিরের মতামত জানতে চাইবে। কিন্তু মোজাম্মেল খানের মুখে এনগেজমেন্টের কথা শুনে সকলেই থতমত খেয়ে গেছে। ফুপ্পিরা সকলে মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে। সবাই সবার দিকে তাকালেও

আবিরের দৃষ্টি প্লেটের দিকে স্থির। রাগে আবির দাঁতে দাঁত চেপে ধরেছে, কপালের দুপাশের শিরা-উপশিরা গুলো দ্রুতগতিতে লাফাচ্ছে, গলার রগ গুলো ফুলে উঠেছে। সারা মেয়েটা ইদানীং ঘনঘন অফিসে আসছিল, ওনাদের সাথে কোনো মিটিং বা যেকোনো আলোচনাতেই সারা শাকিল সাহেবের সঙ্গে আসতো। প্রথম দিন ফরমালিটি করে আবির সারার সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবে কথা বলেছিল, এক কাপ কফিও অফার করেছিল, মিটিং এ যাওয়ার আগে আবির কাউকে কফি দেয়ার কথা বলেও গিয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে ব্যস্ততার জন্য সারা র সঙ্গে আর কোনো কথা হয় নি। সেই থেকে সারা প্রায় ই অফিসে আসতো, যেচে আবিরের সাথে কথা বলার চেষ্টা করতো, আবির ব্যস্ততা দেখিয়ে সবসময় ইগ্নোর করতো। সারা বেশ কয়েকবার আবিরের নাম্বারও চেয়েছে, কিন্তু আবির দেয় নি। সেই মেয়ের সঙ্গে বাবা-চাচা আবিরের বিয়ের কথা ভাবছে এতেই আবিরের মেজাজ তুঙ্গে। আবির মুখ ফুলিয়ে শ্বাস টানলো, নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার শেষ চেষ্টা করল, দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে কণ্ঠ চারগুণ ভারী করে বলল, ” আমি বিয়ে করবো না মানে করবোই না। আগামী এক বছর এই বাড়িতে কোনো প্রকার বিয়ের আলোচনা শুনতে চাই না। শাকিল সাহেবের মেয়েই হোক আর যে সাহেবের মেয়েই হোক, আজকের পর থেকে অফিসিয়াল কার্যক্রমের সদস্য ব্যতীত অফিসে যেন কোনো মেয়ে না আসে। আর অনুগ্রহ করে আমার বিয়ে নিয়ে আপনারা আলোচনা বন্ধ করুন।” আলী আহমদ খান রাশভারি কণ্ঠে বললেন, “তুমি কথা শেষ করতে

তো দিবে। ” “আব্বু,আমি আর কোনো কথা শুনতে বা বলতে চাচ্ছি না। ” “তোমার কিছু বলার থাকলে বলতে পারো।” আবির রাগান্বিত কণ্ঠে বলে উঠল, “আপনারা আপনাদের সিদ্ধান্ত জানিয়ে, এনগেজমেন্ট পর্যন্ত ফিক্সড করে ফেলছেন আর এখন আমার মতামত জানতে চাচ্ছেন। বাহ! অসাধারণ। ” মালিহা খান শান্ত স্বরে বললেন, “আবির, আব্বুর সাথে এভাবে কথা বলছিস কেন? কথা বললেই তো বিয়ে হয়ে যায় না। ওনারা তে তোর সিদ্ধান্ত জানতেই চাচ্ছেন। ” “আম্মু এটাকে সিদ্ধান্ত জানতে চাওয়া বলে না। ওনারা ওনাদের মর্জি আমার উপর চাপালেই আমি ওনাদের সব সিদ্ধান্ত মানতে পারব না। আর যদি আমার সিদ্ধান্ত জানতেই চাও, তাহলে আমি আবারও বলছি আগামী এক বছর আমি বিয়ে করতে পারব না। এ ব্যাপারে আমার সামনে অথবা আড়ালে আর কোনো কথা যেন না হয়!” আলী আহমদ খান উঠে যেতে যেতে ভারী কণ্ঠে বললেন, ” ঠিক আছে, তোমার বিয়ে নিয়ে আর কোনো কথা হবে না। ” আবির গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দিল, “ধন্যবাদ।” মোজাম্মেল খান গুরুগম্ভীর কণ্ঠে বললেন, “ছেলেমেয়ে বড় হয়ে গেলে নিজের মর্জিতে চলতে চায়, বাবা-মায়ের অবাধ্য সন্তান হয়ে যায়, বড়দের সিদ্ধান্ত তখন তাদের কাছে মূল্যহীন মনে হয়। কাউকে পরোয়া করে না। ” আবির ঠোঁট বেঁকিয়ে মনে মনে বিড়বিড় করে বলল, “পারলে নিজের মেয়েকে আমার কাছে দেন বিয়ে, তারপর দেখুন আপনাদের সিদ্ধান্তের মূল্য দেয় কি না! নিজের মেয়ের কথা তো একবারও বললেন না! কোথাকার কোন মেয়েকে আমার ঘাড়ে গছিয়ে

দিতে উঠেপড়ে লেগেছেন, তাতে রাজি হয় নি বলে আমি অবাধ্য সন্তান হয়ে গেছি। বাহ! শ্বশুর আব্বু, বাহ! আপনার মেয়েকে বিয়ে দিলে ঈদ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে না, আজ, এই মুহুর্তেই বিয়ে করে ফেলবো। " মোজাম্মেল খান বিড়বিড় করতে করতে খাবার টেবিল ছেড়ে উঠে চলে গেছেন। আবির একপলক চাচ্চুর দিকে তাকালো, বিড়বিড় করে বলা কথার কিছুই আবির বুঝবো না। চোখ ঘুরাতেই তানভিরকে চোখে পরলো, আবির তানভিরকে দেখেই সিম্পলি স্মাইল দিল, তানভিরের মুখে গাম্ভীর্যতা লেগেই আছে। আবির ফুপ্পিদের দিকে তাকিয়ে স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, "তোমরা খাচ্ছো না কেনো? খাও খাও।" সবাই স্তব্ধ হয়ে বসে আছে, শুধু আশপাশে চোখ বুলাচ্ছে। ইকবাল খান, মালিহা খান, আকলিমা খান উপস্থিত আছে বিধায় কেউ কিছু বলতে পারছে না। সবার মনমরা ভাব দেখে আবির ঠাট্টার স্বরে বলল, "সামনের বছর আমার বিয়ে। তোমাদের সবার দাওয়াত, এখন থেকেই বিয়ের প্রিপারেশন শুরু করো। বিয়ে আমার ধুমধাম করেই হবে। " আইরিন আর মীমকে উদ্দেশ্য করে বলল, "তোরা ডান্স শেখা শুরু কর, আমার বিয়েতে ঠিকমতো নাচতে না পারলে তোদের খবরই আছে।" আবিরের কথা শুনে সবাই না চাইতেও হেসে ফেললো। নিজের বিয়ের দাওয়াত নিজেই দিচ্ছে, আবার নাচার জন্য বোনদের রীতিমতো থ্রেট দিচ্ছে। এমন কান্ড একমাত্র আবিরই করতে পারে। আরিফ মজা করে বলল, "ভাইয়া আমরা কি দোষ করেছি? ছেলে বলে কি আমরা নাচতে পারবো না?"

আবির হেসে বলল, ” অবশ্যই নাচবি। তোদের বেশকিছু লুঙ্গি কিনে দিব। তখন সবগুলো মিলে লুঙ্গি ডান্স দিস। ” মালিহা খান তপ্ত স্বরে বললেন, ” আবির, তোর আব্বুর কথা...” আবির গম্ভীর কণ্ঠে শুধু বলল, “আম্মু...!” মালিহা খান ঠান্ডা কণ্ঠে বললেন, “ঠিক আছে, ঠিক আছে। আমি আর কিছুই বলবো না। ” “এইতো আমার লক্ষ্মী আম্মু।” আলী আহমদ খান কিছুক্ষণ আগেই রুমে গেছেন, আলী আহমদ খানকে দেখতে মালিহা খানও এবার নিজের রুমে চলে গেছেন। আবির আড়চোখে নিজের প্রেয়সীর দিকে এক নজর তাকালো। মেঘ মাথা নিচু করে ভাতের প্লেটে আঙুল বুলাচ্ছে। বাকিদের মুখে হাসি থাকলেও মেঘের মনে কালবৈশাখী ঝড় বইছে। আব্বু আর বড় আব্বু যেভাবে বিয়ের কথা বলছিল, আবির ভাই রাজি হলেই বিয়ে হয়ে যেত। এদিকে আবির ভাইয়ের মনে মেঘ আছে কি না এ বিষয়েও মেঘের মনে সন্দেহ আছে। মেঘের প্রতি আবিরের মনে ভালোবাসা নাকি ভালো লাগা,এক বছর পর আদো আবির কি মেঘকে বিয়ে করবে? নাকি অন্য কোনো মেয়েকে বিয়ে করে ফেলবে সেসব ভেবেই মেঘের মন আরও বেশি খারাপ হয়ে যাচ্ছে। মেঘের বার বার শুধু মনে হয় অনিশ্চিত ভবিষ্যতের পেছনে ছুটছে সে। আবিরের মনের কথা জানতে করা এক কর্মকান্ডে আবিরের এই অবস্থা হয়েছে। এখন সে কি করবে! মেঘের হাবভাব দেখে আবির মেঘের দিকে সরাসরি তাকালো। কণ্ঠ খাদে নামিয়ে মোলায়েম কণ্ঠে শুধালো, ” ভাতের প্লেটে আবার কি চাষ করবি?” মেঘ বিস্ময় সমেত চোখ তুলে তাকালো।

মোহনীয় সেই দৃষ্টি। ফুপ্পিরা আসবে শুনে মেঘ সকাল সকাল গোসল করে সাজুগুজু করেছিল, এখন সেই সাজ অনেকটায় বিনত হয়ে গেছে তবুও আবির মেঘের চোখের গভীরে অক্লান্ত দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। আশপাশ থেকে অন্যদের কণ্ঠস্বর কানে আসতেই আবির নড়েচড়ে বসল, চোখে চোখ রেখেই শান্ত স্বরে বলল, " পারিপার্শ্বিক ব্যাপারে কান না দিয়ে, চুপচাপ খাবার শেষ কর।" মেঘ অসহায় দৃষ্টিতে আবিরকে পরখ করলো। মনে মনে নিজেকে আওড়ালো, "মানুষটা এমন কেন? এত কিছুর পরেও একটা মানুষ এতটা স্বাভাবিক কিভাবে থাকতে পারে?" মেঘ পুনরায় মাথা নিচু করে খাওয়ায় মনোযোগ দিলো। খাবার টেবিলে তেমন কোনো কথা হলো না। খাওয়াদাওয়া শেষ করে ফুপ্পিরা কিছুক্ষণ গল্প করে বিকেলের দিকে বাসায় চলে গেছেন। যাওয়ার সময় আলী আহমদ খান গিফটের পরিবর্তে সবাইকে টাকা দিয়ে দিয়েছেন। সন্ধ্যার পর পর মেঘ ঘুমিয়েছিল, সেই ঘুম ভেঙেছে রাত ১১.৩০ নাগাদ।মেঘের ঘুম ভাঙতেই দেখল, ফুপ্পির নাম্বার থেকে দুটা কল, আরিফ আর জান্নাত আপুর নাম্বার থেকেও বেশ কয়েকটা কল আসছে সেই সাথে আবিরের নাম্বার থেকে প্রায় দুই ঘন্টা আগে ৩ বার কল আসছিল। আবিরের নাম্বার টা চোখে ভাসতেই মেঘের বুকের ভেতর মোচড় দিয়ে উঠল, কানে বাজছে দুপুরে খাবার টেবিলের কথাগুলো সেই সঙ্গে চোখের সামনে ভেসে উঠেছে বড় আব্বুর পায়ে ধরে ফুপ্পিদের কান্নার দৃশ্য। মেঘ শুয়ে রুমের ছাদের দিকে তাকিয়ে আছে আর হাবিজাবি ভাবছে, বেশ কিছুক্ষণ পর শুয়া

অবস্থায় ফুপ্পিকে কল দিলো। ফুপ্পির সাথে কিছুক্ষণ কথা বলল, মনের অবস্থা ভালো না বলে বেশি কথাও বললো না। আরও ঘন্টাখানেক চুপচাপ বেলকনিতে দাঁড়িয়ে আকাশের পানে তাকিয়ে রইলো। কি ভাবছে, কেন ভাবছে তার সবটায় অজানা। এরমধ্যে দুএকবার রুম থেকে বেড়িয়ে বেলকনি পর্যন্ত গিয়েওছে। কিন্তু বাড়ির পরিবেশ বেশ নিরব, কেউ কোথাও নেই, প্রতিদিনের মতোই ড্রয়িংরুম শুধু একটা বাল্ব জ্বলছে। ড্রয়িংরুম পেরিয়ে আবিরকে দেখতে যাওয়ার সাহস ছোট্ট মেঘের হচ্ছে না। তাই দুবার ই রুমে ফিরে আসছে। আবিরের নাম্বারে একবার কলও দিয়েছিল, আবির কল রিসিভ করে নি। প্রায় ঘন্টাখানেক রুমে পায়চারি করার পর অবশেষে মেঘ বুকে সাহস নিয়ে আবিরের রুমের দিকে পা বাড়ালো। মেঘ উপরে থাকাকালীন এতবছরে আজ অবধি ভয়ে রাতের বেলা নিচে নামে নি। পানি সহ প্রয়োজনীয় সব জিনিস সন্ধ্যের আগেই রুমে নিয়ে আসে। আবিরকে দেখার জন্য মেঘ এত রাতে ভয়ে ভয়ে নিচে নামছে। রুমের দরজা ধাক্কা দিতেই মৃদু আলোতে আবিরের ঘুমন্ত ধৃষ্টতা ভেসে উঠল। মেঘ ধীর গতিতে রুমে প্রবেশ করল। নিস্তব্ধ আঁখিতে বেশকিছু সময় আবিরকে পরখ করল। বৈদ্যুতিক পাখার বাতাসে আবিরের চুল গুলো উড়ছে, গাল ভর্তি দাঁড়ি গুলো অনেকটায় বড় হয়ে গেছে সেই সাথে অতিরিক্ত দুশ্চিন্তার কারণে শ্যামবর্ণের চেহারা তামাটে বর্ণ ধারণ করেছে। মেঘ অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আচমকা বিছানার পাশে ধপ করে ফ্লোরে বসে পরলো। মাঝরাতে নিস্তব্ধ পরিবেশে বাসার পাশে

গাছের ঢালে দুটা পাখির কিচিরমিচির শব্দ ব্যতীত আর কোনো শব্দ নেই। অকস্মাৎ আবিরের ঘুম ভেঙে গেছে, অনুভব করে একজোড়া তুলতুলে হাত আবিরের একহাত আঁকড়ে ধরে রেখেছে, আবিরের হাতের আঙুল গুলো কোমল গাল স্পর্শ করে রেখেছে। আবিরের অনুভূতিরা জানান দিচ্ছে আবিরের প্রেয়সী আবিরের হাতকে আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে রেখেছে। সবই ঠিক ছিল, কিন্তু মেঘের হঠাৎ কান্না সবকিছু এলোমেলো করে দিয়েছে। প্রথম দিকে আস্তেধীরে কাঁদলেও ধীরে ধীরে মেঘ নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলছে। মেঘের নিরবচ্ছিন্ন কান্নায় চোখ বেয়ে গড়িয়ে পরা পানিতে মেঘের গালে রাখা আবিরের আঙুল গুলো ভিজে গেছে। মেঘের কান্নার শব্দে আবিরের বুকের ভেতর তোলপাড় চলছে। মাঝরাতে মেঘ কেন কাঁদছে, কেউ কিছু বললো কি না, আগে আবিরের কল কেন রিসিভ করল না সেসব ভেবে আবির অস্থির হয়ে যাচ্ছে। এদিকে মেঘের কান্না থামার কোনো নাম নেই। মেঘের হাতে থাকা আবিরের আঙুল গুলো তিরতির করে কাঁপছে, মেঘ কান্নার জন্য তা বুঝতেই পারছে না। আবির কাতর স্বরে মনে মনে বলল, ” মেঘ, তুই এভাবে কাঁদিস না প্লিজ। তোকে কিভাবে বুঝায়, তুই কাঁদলে যে আমার ভেতরটা পুড়ে ছারখার হয়ে যায়। তুই জানিস না, তোর চোখ থেকে এক ফোঁটা পানি ঝড়লে এই আবিরের হৃদয় থেকে কত ফোঁটা র- ক্ত ঝড়ে। তোর কান্না দেখলে খু-* ন না করেও নিজেকে খু*-নী মনে হয়। তোর কাছে থেকেও আজ আমি বহুদূরে, তোকে ছোঁয়ার অধিকার থাকা সত্ত্বেও আজ আমি বড্ড অসহায়। ”

মেঘ আপনমনে কেঁদেই চলেছে, মাঝরাতে আবির মেঘকে কি বলবে, মেঘকে ডাকলে মেঘ অস্বস্তিতে পরে যাবে। সেসব ভেবেই আবির মেঘকে ডাকার সাহস পাচ্ছে না। মেঘ কাঁদতে কাঁদতে আবিরের হাতে অধর ছুঁয়ে দিচ্ছে, পুনরায় গালে হাত চেপে ধরে ব্যগ্র কণ্ঠে বলল, ” আবির ভাই, আপনি আমার প্রাণচঁচল্যের একমাত্র শখের পুরুষ, আমার হৃদয়ের একান্ত ব্যাকুলতা। চিত্তচাঁচল্য নয় বরং আমি আপনার প্রণয়ের পরিণীতা হতে চাই।” মেঘের কান্না জড়িত কণ্ঠে বলা একেকটা কথা শুনে আবিরের হৃদস্পন্দন কয়েকগুণ বেড়ে গেছে। ইচ্ছে করছে সব প্রতিকূলতা উপেক্ষা করে কাদম্বিনীর দুচোখের পানি মুখে, মায়াবী দুচোখে চোখ রেখে অনুরক্ত কণ্ঠে বলতে, “মাহদিবা খান মেঘ, আপনিও আমার অস্তিত্বে নিবদ্ধ একমাত্র শখের নারী, আমার আত্মাকে প্রশান্ত করার অনন্য পন্থা। পৃথিবীর সব নারীকে অবহেলা করতে পারলেও মাহদিবাকে উপেক্ষা করার সাধ্যি এই আবিরের নেই। চিন্তা নেই ললনা, আপনি আমার প্রণয়ের একমাত্র পরিণীতা হবেন, শুধু সময়ের প্রতীক্ষা। ” মেঘ অতর্কিতে আবিরের হাত ছেড়ে নিস্তরজ আঁখিতে আবিরকে আপাদমস্তক পরখ করে, নিসাড় মাথা নিচু করে বেড়িয়ে যাচ্ছে। আবির অক্রুর দৃষ্টিতে মেঘকে দেখছে,চোখে উপচে পড়ছে প্রশান্তি। মেঘ অতি সন্তর্পণে হাঁটছে যেন কারো নজরে না পরে। ড্রয়িং রুম পার হয়ে দুটা সিঁড়ি উঠতেই পাশ থেকে ভারী পুরুষালি কণ্ঠস্বর ভেসে আসলো, “এত রাতে নিচে কি করছিস?” মেঘ আঁতকে উঠে পাশ ফিরে তাকাতেই দেখল ইকবাল খান সোফার পাশে

দাঁড়ানো। ভয় পেয়ে তড়িঘড়ি করে মেঘ জামার উপর দিয়েই বুকে থু থু দিল। দাঁত দিয়ে জিভ কেটে, চোখ নামিয়ে মেঘ ধীরস্থির কণ্ঠে আমতা আমতা করে বলল, " পা. পানি খেতে আসছিলাম।" ইকবাল খান গুরুভার কণ্ঠে বললেন, " অনেক রাত হয়েছে ঘুমাতে যা এখন।" মেঘ ঘাড় কাত করে "আচ্ছা" বলে গুটিগুটি পায়ে উপরে উঠে গেছে। সময় চলমান। মেঘ নিজের মতো ভার্সিটিতে যায়, বন্যার সাথে টুকিটাকি কথা বললেও মিনহাজ, তামিম, মিষ্টি কারো সঙ্গেই তেমন কথা বলে না,ওদের দেখলেই এড়িয়ে যায়। নিজের প্রতি তীব্র ক্ষোভ থেকেই মূলত মেঘের এই কাজ করা। তানভিরও নিজের কাজে ব্যস্ত, বাসায় ফিরে আবিরের সাথে টুকটাক কথা বলে খাওয়াদাওয়া করে ঘুমায়। দেখতে দেখতে ২১ দিন পেরিয়ে গেছে, আবিরের পা অনেকটায় ঠিক হয়ে গেছে। মোটামুটি হাঁটা চলাও করতে পারে। এরমধ্যে একদিন সন্ধ্যের দিকে সাকিল সাহেব আলী আহমদ খানকে কল ও দিয়েছেন। আবিরের খোঁজ খবর নেয়ার জন্য, তাছাড়া ওনারা খুব শীঘ্রই আবিরকে দেখতে আসতে চাচ্ছেন। কিন্তু আবিরের রাগ দেখে আলী আহমদ খান ডিরেক্ট নিষেধ করে দিয়েছেন। আবির কিছুটা সুস্থ হওয়ার পরেই নিজের রুমে চলে আসছে। এত দিনের মধ্যে মেঘ আবিরকে দেখতে যতবারই আবিরের রুমে যায় ততবার ই মীম মেঘকে নিয়ে মজা করে, মীমের দুষ্টামির জন্য এখন, আবির রুমে একা থাকলে মেঘ লজ্জায় রুমেই যায় না। অনেকদিন ধরে ছাদে যাওয়া হয় না, গাছ গুলোর তেমন যত্নও নেয়া হয় না। মীম আর আদি

মাঝে মাঝে গাছগুলোতে পানি দেয়। আজ বিকেলের দিকে মেঘ আর মীম ছাদে গেছে, গাছগুলোর আগাছা পরিষ্কার করছে আর দু বোন নিজেদের মতো গল্প করছে। মীম মেঘকে উদ্দেশ্য করে বলল, " আপু সামনে ঈদ, তুমি ভাইয়াকে কিছু দিবা না?" "একটা পাঞ্জাবিতে হ্যান্ডপ্রিন্ট করে দিব ভাবছিলাম। " "এটা তো খুব ভালো আইডিয়া। ডিজাইনের মাঝে তোমার নামটাও লিখে দিও। " "নাহ নাহ। এসব করা যাবে না। কেউ দেখে ফেললে সর্বনাশ হয়ে যাবে। " "তোমাকে বড় করে লিখতে বলছে কে? একদম ছোট ছোট অক্ষরে লিখবা। মানুষ কি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখবে নাকি?" "আমার ভয় লাগে। আবির ভাই দেখলে খুব বকা দিবেন।" "কে বকা দিবে? ভাইয়া?" "হ্যাঁ" "ভাইয়া দিবে তোমাকে বকা? এটাও আমাকে বিশ্বাস করতে হবে? শুনো আপু, আর যাই বলো আমি চোখ বন্ধ করে বিশ্বাস করে নিবো। কিন্তু ভাইয়া তোমাকে বকবে এটা আমি জীবনেও বিশ্বাস করব না। " মেঘ মুখ গোমড়া করে বলল, "সত্যি ই ওনি আমাকে বকা দেন। " "তুমি হয়তো খেয়াল করো না তবে আমি খেয়াল করেছি, বাসার মধ্যে ভাইয়া একমাত্র তোমার সাথে কথা বলার সময় ই মাধুর্য মিশিয়ে মনোরম কণ্ঠে কথা বলে, তোমাকে দেখলেই ভাইয়ার ঠোঁটে হাসি ফুটে উঠে। " "বলছে তোরে! " "আল্লাহ! বিশ্বাস করো না? তুমি আমাকে ভাইয়ার কথা বলছো পর থেকে আমি বিষয়টা গুরুত্ব দিয়ে খেয়াল করেছি। তোমার প্রতি ভাইয়ার অন্য লেবেলের টান আছে। ভাইয়াকে কিছু আনতে বললে ভাইয়া যতই ব্যস্ত থাকুক, তোমার কথা শুনা

মাত্রই সব ব্যস্ততা সাইডে রেখে সাথে সাথে নিয়ে আসে।” মেঘ কপাল কুঁচকিয়ে বলল, “ভাবের কথা বাদ দে। ” “আমার ভাইয়ার এত কেয়ার তোমার কাছে ভাব মনে হয়? এমন করলে তোমাকে আমার ভাইয়ার বউ বানাবো না বলে দিলাম।” “আর বউ! বাসার আর আবির ভাইয়ের যে অবস্থা, আমার ভালোবাসা কোনোদিন পূর্ণতা পাবে বলে মনে হয় না!” “বললেই হলো। সত্যিকারে ভালোবাসা থাকলে পূর্ণতা পাবেই, ইনশাআল্লাহ। এখন তোমাকে যা বলছি তা করো, ঈদে ভাইয়াকে একটা পাঞ্জাবি গিফট সেটাতে অবশ্যই তোমার নাম থাকতে হবে। আগে আমাকে দেখিয়ে নিবা, বুঝছো? ” “বুঝছি। কিন্তু পাঞ্জাবি কিনতে হবে তো, পাঞ্জাবির সাইজ জানি না তাছাড়া পাঞ্জাবি কিনবো কিভাবে? “ভাইয়াকে দেখেছিলাম নিচে গেছে, তুমি এখন ভাইয়ার রুমে যাও, ভাইয়ার পাঞ্জাবি থেকে সাইজ টা দেখে আসো, আমি বাহিরে পাহারা দিব। ভাইয়া আসলেই তোমাকে ডাকবো। পরে আম্মুকে নিয়ে শপিং এ গিয়ে পাঞ্জাবি কিনে নিয়ে আসবো।” “আচ্ছা, চল।” আবির নিচে সোফায় বসে কফি খাচ্ছে আর ল্যাপটপে কাজ করছে, ইকবাল খান পাশের সোফায় বসে আবিরের সাথে অফিসের বিভিন্ন টপিক নিয়ে কথা বলছেন। মীম বেলকনিতে দাঁড়িয়ে আবিরের দিকে নজর রাখছে, মেঘ আবিরের রুমে ঢুকে ওয়ারড্রবে পাঞ্জাবি খোঁজছে। আবির কাজের ফাঁকে হঠাৎ উপরে হালকা তাকাতেই মীম থতমত খেয়ে পেছনে সরে গেছে। মীমের এমন কান্ডে আবির কপাল কুঁচকে সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকালো। কিছু একটা ভেবেই আবির বসা

থেকে উঠে দাঁড়ালো। ইকবাল খান স্বাভাবিক কণ্ঠে বললেন, “কোথায় যাচ্ছিস?” “আসছি একটু।” “তাড়াতাড়ি আসিস, কাজ শেষ করতে হবে।” “হ্যাঁ হ্যাঁ আসছি এখনি ” আবির তড়িঘড়ি করে উপরে উঠছে। আবিরের ভয়ে মীম আর নিচে দেখতেই পারে নি। আচমকা আবিরকে বেলকনিতে দেখে মীম আঁতকে উঠল। গলা থেকে কোনো কথায় বের হচ্ছে না, মেঘকে ডাকতেও পারছে না। আবির বড় বড় কদম এগিয়ে এসে ভারী কণ্ঠে শুধালো, “এখানে কি করছিস?” মীম এপাশ ওপাশ মাথা নেড়ে বুঝালো,”কিছু না” আবির ফের বলে উঠল, ” যা এখান থেকে। ” মীম বার বার পেছন ফিরে তাকাচ্ছে, আবিরের তপ্ত দৃষ্টির ভয়ে মেঘকে আর ডাকতে পারছে না। আবির পুনরায় বলল, “কি হলো?” মীম মাথা নিচু করে দৌড়ে চলে গেছে। আবির রুমের দরজা চাপিয়ে নিচে গিয়েছিল, এখন দরজা কিছুটা খোলা দেখেই অনুমান করতে পারছে রুমে কেউ আছে। আবির দরজা থেকে রুমে চোখ বুলালো। হঠাৎ আবিরের নজর স্থির হলো, মেঘ আবিরের রুমের বেলকনিতে দাঁড়িয়ে আছে। আবির ভ্রু কুঁচকে এগিয়ে গেল সেদিকে। বেলকনিতে আবির আর মীমের কথোপকথন শুনেই মেঘ তাড়াতাড়ি পাঞ্জাবি লুকিয়ে কি করবে বুঝতে না পেরে বারান্দায় চলে গেছে। আবির গুরুতর কণ্ঠে শুধালো, ” আমার রুমে কি করছিস?” মেঘ নিশ্চুপ থেকেই আবিরের পাশ কেটে চলে যেতে নিল। আবির আবারও প্রশ্ন করল, ” আমার রুমে কেন আসছিলি? তাও আবার পাহারাদার রেখে?” মেঘ ভয়ে ঢোক গিলে ধীর কণ্ঠে বলল, “এমনি আসছিলাম। ”

মেঘ চলে যেতে নিলেই আবির মেঘের হাত চেপে ধরে। মেঘ আতঙ্কিত নয়নে তাকিয়ে বলল, “ছাড়ুন, যাবো।” ” রুমে কেন আসছিলি সেটা বল,তাহলে ছেড়ে দিবো।” মেঘ আমতা আমতা করে বলল, “আপনারা রুমে আসা কি নিষেধ? ” “নিষেধ কেন হবে, তোর যখন ইচ্ছে রুমে আসবি কিন্তু পাহারাদার কেন বাহিরে থাকবে? কি করতে আসছিলি বল” “চুরি করতে আসছিলাম, হয়েছে!” আবির অন্যমনস্ক হয়ে বলল, ” আর কি চুরি করার বাকি আছে?” “মানে?” আবির মেঘের হাত ছেড়ে মুচকি হেসে বলল, ” আমার রুমে কি এমন জিনিস আছে যা তোর চুরি করে নিতে হয়, তোর কি লাগবে নিয়ে যা। ” মেঘ মনে মনে বিড়বিড় করে বলল, “সম্পূর্ণ আপনি টা কেই আমার লাগবে, কিভাবে নিব বলুন।” আবির কিঞ্চিৎ হেসে বলল, ” কি হলো? কিছু খোঁজে পাচ্ছিস না?” মেঘ কপাল গুটিয়ে রিনিঝিনি হেসে আবিরের দিকে তাকিয়ে শীতল কণ্ঠে বলল, ” আমি যা নিতে চাই তা আপনাকে দেখিয়ে নিতে পারবো না। ” আবির চোখ বড় করে সম্পূর্ণ রুমে নজর বুলিয়ে উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, ” তাহলে কি আমি ঘুমালে নিতে পারবি?” মেঘ ছোট করে ভেংচি কেটে বিড়বিড় করতে করতে চলে যাচ্ছে, আবির ঠোঁট কামড়ে হাসছে। মেঘ দরজা পর্যন্ত গিয়ে থমকে দাঁড়ালো। কয়েক পা পিছিয়ে দরজার পাশে দেয়ালে তাকালো। দেয়ালে একটা হাতের ছাপ দেখে মেঘের নজর স্থির হলো, সরু নেত্রে খেয়াল করল, হঠাৎ মনে পরে গেল প্রায় ২-৩ মাস আগে রুমে রঙ করার ঘটনা। ভেজা রঙে মেঘের হাতের ছাপ পরেছিল, সেই ছাপ

শুকিয়েছে বহুদিন আগেই। দরজার আড়ালে ছিল বলে আজ পর্যন্ত মেঘের চোখে পরে নি। আজ দরজাটা চাপানো ছিল বিধায় মেঘের নজর আটকেছে। মেঘ আবিরের দিকে তাকিয়ে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলল, " এই দাগ টাতে রঙ করান নি কেন?" মেঘের কণ্ঠে আবির পেছন ফিরে তাকিয়েছে, মেঘের দৃষ্টি খেয়াল করে নিজেও সেদিকে তাকালো। আবির মুখের ভঙ্গি স্বাভাবিক রেখে বলল, " লোকের কি খেয়ে কাজ নেই, তুই নষ্ট করবি আর তারা বার বার রং করবে!" "বার বার করবে কেন? একবার ই তো নষ্ট করেছি তাও পরে গেছিলাম বলে ।" আবির উদাসীন কণ্ঠে বলল, " বেরঙিন জীবনে রুমে রঙ করে আর কি হবে?" মেঘ প্রখর নেত্রে আবিরের দিকে তাকিয়ে অকস্মাৎ বলে উঠল, " আমার কাছে রঙ আছে, আমি এখনি নিয়ে আসছি। হাতের ছাপ মুছে সুন্দর ডিজাইন করে দিব। " আবির বিরক্তি ভরা কণ্ঠে বলল, " যেভাবে রুমে আসছিলি সেভাবে বেড়িয়ে যা, আমার রুম যেমন আছে তেমনই থাকবে, মাতবরি করে নষ্ট করতে হবে না " মেঘ কণ্ঠ খাদে নামিয়ে মৃদুস্বরে বলল, "বিশ্বাস করুন নষ্ট করব না। সুন্দর লাগবে। " আবির রাগান্বিত কণ্ঠে বলল, "মেঘ, কথা বললে কথা শুনবি না?" "শুনবো। " "তাহলে যা এখান থেকে। আমার অনুমতি ব্যতীত আমার রুমের কোনো জিনিস যদি এদিকসেদিক হয়, সেই কাজ যেই করে থাকুক না কেন, তার দায়ভার কিন্তু তোর হবে। সো বি কেয়ার ফুল। " মেঘ মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে। নিচ থেকে ইকবাল খান আবিরকে ডাকছেন। আবির এগিয়ে গিয়ে মেঘের মাথায়

হাত বুলিয়ে অনুগ্র কণ্ঠে বলল, ” সারারাত ভাবেন, আগামীকাল আমার রুমের দুটা দেয়াল আপনাকে ডিজাইন করে দিতে হবে। ডিজাইন ভালো না হলে.... ” “....না হলে কি?” “সেটা না হয় কালকেই বুঝাবো। ” আবির রুম থেকে বেরিয়ে গেছে। মেঘ দেয়ালের হাতের ছাপের দিকে একবার তাকালো, আবার পাশের দুটা দেয়ালের দিকে তাকিয়ে দেখলো। তারপর রুম থেকে বেড়িয়ে সোজা মীমের রুমে ঢুকলো। মীম বিছানায় বসে চোখ বন্ধ করে, “আমাকে বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও” বলতেছে। মেঘ মীমকে আলতো চাপড় মেরে বলল, “আমাকে বিপদে ফেলে নিজে বাঁচাও বাঁচাও করছিস। লজ্জা লাগে না তোর?” ” লজ্জার যেমন বয়স নাই তেমনি মা-ইর খাওয়ারও বয়স নাই। ভাইয়া যেভাবে তাকাইছিল, ভয়েই আমার গলা শুকিয়ে গেছিল। তোমাকে কিভাবে ডাকবো! কথায় আছে, জান বাঁচানো ফরজ। ” মেঘ রাগী ভাব নিয়ে বলল, ” তুই বিপদে পড়লে আমিও বলল, জান বাঁচানো ফরজ। ” মীম আহ্লাদী কণ্ঠে বলল, “আপু..... সরি” মেঘ ভেঙচি কেটে চলে গেছে। মীম পেছন পেছন আপু আপু ডাকছে।তানভির বিড়বিড় করতে করতে নিজের রুম পর্যন্ত যেতেই ফোনে কল বেজে উঠল। তানভিরের বেস্ট ফ্রেন্ড সোহাগ কল দিচ্ছে। তানভির কল রিসিভ করতেই ওপাশ থেকে সোহাগ একদমে কতকি বলতে থাকলো। তানভির প্রখর তপ্ত স্বরে বলল, ” আমাকে এসব বলে কোনো লাভ নাই। আমি এখন আসতে পারবো না। এমপির সাথে একটা পোগ্রামে যেতে হবে। ” “প্লিজ দোস্ত। একটু আয়! ” “আরে ভাই আমার সময়

নাই। ” ” শুন তানভির, আমাকে যতই ব্যস্ততা দেখাস সমস্যা নাই। কিন্তু তোর গার্লফ্রেন্ড এর জন্য অন্তত আয়।” ” একদম ইমোশনাল ব্ল্যাকমেইল করবি না। তোর আমার মাঝখানে ও কে কেনো টানতেছিস?” “কারণ আমার কথা তুই গুরুত্ব দিচ্ছিস না। প্লিজ তানভির, জাস্ট ৫ মিনিট লাগবে, আয় তুই। ” তানভির ভারী কণ্ঠে শুধালো, “বন্যা কি এখনও ভার্সিটিতে? ” “আমি তোর কাছে সকাল থেকে চিল্লাচিল্লি করছি, তুই আমাকে পাত্তা দিচ্ছিস না। বন্যার নাম শুনতেই কণ্ঠস্বর পাল্টে গেছে। দাঁড়া, এখন থেকে তোকে ওর কসম দিয়ে সব কাজ করাবো।” তানভির রাগান্বিত কণ্ঠে বলল, ” আর যাই করিস, কোনোদিন ওর নাম নিয়ে কসম কাটতে বলবি না। পরিবারের বাহিরে ও আমার একমাত্র দূর্বলতা। তাছাড়া কসম কাটা ঠিক না। ” “আচ্ছা ঠিক আছে, কাটাবো না কসম। এখন বল আসবি ?” “বন্যা যদি সত্যি ই ভার্সিটিতে থাকে তাহলে আসবো।” “আরে আছে আছে। প্রয়োজনে আটকিয়ে রাখবো। তাও তুই আয়। আমার কাজ টা কিন্তু করে দিতে হবে। ” ” ভুলেও বন্যাকে কিছু বলতে যাইস না। আমি আসতেছি।” তানভির দ্রুত বেড়িয়ে পরেছে। এদিকে মেঘ আবিরের আড়ালে চুপটি করে দাঁড়িয়ে আছে। তানভির চলে গেছে অনেকক্ষণ আগে, মেঘ আতঙ্কে এখনও চোখ খুলতে পারছে না। আবির ঠোঁটের কোণে হাসি রেখে অপলক দৃষ্টিতে মেঘকে দেখছে। তিরতির করে কাঁপছে মেঘের ওষ্ঠদ্বয়, লজ্জা আর ভয়ে নাকের ডগা আর গাল পাকা টমেটোর মতো লাল হয়ে গেছে। নিস্তব্ধতা বুঝতে পেরে মেঘ ধীরে

ধীরে চোখ মেলল । সরাসরি চোখ পরল আবিরের চোখের দিকে। আবিরের নেশাক্ত দৃষ্টি দেখে মেঘ লজ্জায় মাথা নিচু করে ঘাড় কাত করে তানভিরকে দেখার চেষ্টা করলো। তানভিরকে রুমের কোথাও দেখতে না পেয়ে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে শুধালো, " ভাইয়া কোথায়?" "চলে গেছে " "কেন?" "সেটা আমি কিভাবে বলবো, তোর ভাইকে জিজ্ঞেস কর গিয়ে।" হঠাৎ দেয়ালের দিকে আবিরের নজর পরে। যে হাতটা দিয়ে নিজেকে আঁটকেছিল সেই হাতে যে রঙ ছিল আবিরের সেটা খেয়াল ই ছিল না। মেঘের চুল বাঁচাতে গিয়ে উল্টো দেয়াল নষ্ট করে ফেলেছে। আবিরের সাথে সাথে মেঘ ও চোখ ঘুড়িয়ে তাকালো। দেয়ালে আবিরের হাত দেখে আর্তনাদ করে উঠল, "এটা আপনি কি করলেন?" "আমি ইচ্ছে করে করছি নাকি? তোর চুল বাঁচাতেই তো করেছি। " মেঘ একটু দূরে সরে দেয়ালটাকে দেখে পুনরায় গম্ভীর কণ্ঠে বলল, " আমি এখানটায় এখন কিভাবে ডিজাইন করবো?" আবির মেঘের হাতের কব্জিতে শক্ত করে ধরে টেনে নিয়ে রঙের বক্সে চুবিয়ে সঙ্গে সঙ্গে দেয়ালে ছাপ দিল। যেখানে আবির হাতটা রেখেছিল ঠিক সেখানেই। মেঘ আটকানোর খুব চেষ্টা করেছে কিন্তু আবিরের শক্তির সামনে মেঘ অতি নগন্য একটা মানুষ। আবিরের হাতের রঙ অনেকটা শক্ত হয়ে যাওয়ায় ঠিকমতো বুঝা যাচ্ছিল না। কিন্তু মেঘের হাতের ছাপ স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে। ভালোভাবে খেয়াল করলে মেঘের ছোট্ট হাতকে ঘিরে আবিরের বড় হাতের অপ্রখর ছাপ টা ঠিকই চোখে পরে। মেঘ ক্ষুদ্ধ হয়ে বলল, " আপনি এমন করলেন কেন?" " কি

ডিজাইন করবি ভেবে পাচ্ছিস না তাহলে কি করব?” মেঘ শক্ত কণ্ঠে বলল, ” আমি কিন্তু সম্পূর্ণ দেয়াল টায় নষ্ট করে ফেলবো।” আবির মুচকি হেসে বলল, ” একদিনের জন্য রুম তোকে দিয়ে দিয়েছি, সাজাবি নাকি নষ্ট করবি পুরোটাই তোর উপর। আমি কিছুই বলবো না। ” মেঘ শীতল কণ্ঠে বলে উঠল, “মাঝখানে হাতের ছাপটার কারণে কি পঁচা লাগছে। আপনি এমনটা না করলেও পারতেন। ” আবির স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, “তুই তোর কাজ শেষ কর, তারপর দেখিস কত সুন্দর লাগে। ” মেঘ মুখ ভোঁতা করে ঠোঁট ভেঙে কাঁদো কাঁদো মুখ করে আবিরের দিকে তাকিয়ে আছে। আবির মুচকি হেসে দু আঙুলে মেঘের রাগে ফুলে উঠা নাকটা আলতোভাবে চেপে মোলায়েম কণ্ঠে বলল, ” দেয়াল জুড়ে এত সুন্দর পেইন্টিং থাকবে আর তাতে ডিজাইনারের হাতের ছাপ থাকবে না তা কি করে হয়! ছাপ টার নিচে তোর নামটাও লিখে দিস। ” “বাসার মানুষ দেখলে কি ভাববে!” ” বাসার মানুষ যখন জিজ্ঞেস করবে এই ডিজাইন কে করেছে? তখন আমি কি বলবো? শেওড়াপাড়ার পে*ত্নীটা ডিজাইন করে দিয়ে গেছে নাকি আমার কাল্পনিক বউটা এসে করেছে?” মেঘ ফোঁস করে শ্বাস ছেড়ে রাগী স্বরে বলল, “কথায় কথায় বউ বউ করবেন না। আমি কিন্তু বড় আব্বুকে বলে দিব ” “কি বলবি?” “বলবো আপনি সারাদিন বউ বউ করেন, অথচ বিয়ের কথা বললে ভাব নেন। আপনাকে ডাক্তার দেখাতে হবে! ” আবির নিঃশব্দে হেসে শুধালো, “তুই কি আমায় ইন্ডাইরেক্টলি পাগল বললি? ” “মুখের উপর

কিভাবে বলবো! ” “কিহ?” আবির এক পা এক পা করে এগুচ্ছে, মেঘ পেছাতে পেছাতে চেঁচিয়ে উঠল, “এমন করলে আমি কিন্তু চিৎকার করবো।” “কর চিৎকার। কাকে ডাকবি ডাক, দেখি তোকে কে বাঁচায়। ” মেঘ ভেঁজা কন্ঠে ডেকে উঠল, ” আম্মু বাঁচাও!” আবির মেঘের মুখ চেপে ধরে ঠাট্টার স্বরে বলল, “ছিঃ মেঘ! যেভাবে মামনিকে ডাকছিস, মামনি ভাববে আমি তোকে ধ*... ছিঃ ” মেঘ বিস্ময়কর দৃষ্টিতে আবিরের দিকে তাকিয়ে আছে। আবির মেঘের মুখ ছেড়ে কিছুটা গম্ভীর কণ্ঠে বলল, “সরি, তোকে আর ডিস্টার্ব করব না। তুই তোর কাজ শেষ কর। ” আবির টাওয়েল নিয়ে ওয়াশরুম চলে গেছে। মেঘ আহাম্মকের মতো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো। আবির ভাই যে রাগ করেছে এটা ওনার কথাতেই বুঝা গেছে। মেঘ কি করবে তাই ভাবছে। আচমকা ড্রেসিং টেবিলের আয়নার দিকে নজর পরতেই মেঘ সব ভুলে গেল। গালে আবিরের হাতের স্পর্শ, গলা আর ঘাড়েও আঙ্গুলের দাগ, নাক আর কপাল জুড়েও রঙ লেগে আছে। মেঘ লজ্জায় আড়ষ্ট হয়ে যাচ্ছে, কিছুক্ষণ আগে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো ভাবছে আর বার বার লজ্জায় ললিত হয়ে যাচ্ছে। মেঘ নিজের গালে হাত রেখে আবিরের স্পর্শ অনুভব করার চেষ্টা করছে ওমনি বুকের ভেতর কম্পন শুরু হয়ে গেছে । আচমকা মীম দরজায় দাঁড়াতেই মেঘ তাড়াহুড়ো করে দেয়ালের দিকে ঘুরে মাথায় ওড়না দিল যাতে রঙের দাগ মীম কোনোভাবেই না দেখে। মীম দৌড়ে এসে উত্তেজিত কন্ঠে শুধালো, “আপু তুমি আমায় দেখে কি লুকাইছো? দেখি এদিকে ঘুরো তো। ”

মেঘ দেয়ালে রঙ করতে করতে তপ্ত স্বরে বলল, “ডিস্টার্ব করিস না। রুমে যা ” “তুমি কি লুকাচ্ছো বলো, তাহলেই চলে যাব।” মেঘ হুঙ্কার দিয়ে উঠল, “আবির ভাই কিন্তু ওয়াশরুমে আছে। ডাকবো?” মীম উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলল, “ভাইয়া রুমে আগে বলবা না, আমি গেলাম। পরে এসে দেখবো তুমি কি লুকাইছো। ” মেঘ কিছুক্ষণ ভেবে পুনরায় কাজ শুরু করল। আবির ওয়াশরুম থেকে বেড়িয়ে ভেজা শরীরে টিশার্ট গায়ে দিয়ে ফোন নিয়ে চুপচাপ রুম থেকে বেড়িয়ে গেছে, মেঘের দিকে একবারের জন্য তাকিয়েও দেখে নি। মেঘ অসহায় মুখ করে আবিরের যাওয়ার দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে রইলো। চোখেমুখে বিষন্নতা ভর করেছে, তবুও সবকিছু একপাশে রেখে কাজে মনোযোগ দিল। আবির নিচে নামতেই মীম ছুটে গেল মেঘকে দেখতে। ততক্ষণে মেঘ রঙ দিয়ে গালে আর গলায় থাকা আঙুলের ছাপ গুলো মুছে ফেলেছে। মীম রুমে ঢুকেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, “তখন কি লুকাইছিলা?” মেঘ স্বাভাবিক ভাবে ঘুরে মীমের গালে রঙের দু আঙুল ছুঁইয়ে বলল, “তোর কাছ থেকে আমি কি লুকাবো বল?” “আপু তোমার গালে এত রঙ কেন?” “খেয়াল ছিল না, হুট করে গালে হাত দিয়ে ফেলছিলাম। ” দুটা দেয়াল ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করে মীম বলল, “আপু, দুটা ডিজাইন ই অনেক সুন্দর হয়েছে। ভাইয়ার রুমটা অন্যরকম সুন্দর লাগছে। ” মেঘ মৃদুস্বরে বলল, “সত্যি সুন্দর হয়েছে?” “১০০% সত্যি। ” “ওনার কি পছন্দ হবে? কিছুই তো বললেন না” “আমি বলছি ভাইয়ার পছন্দ হবেই হবে। তাছাড়া তুমি যা

এঁকে দিবা ভাইয়া সেটার ই প্রশংসা করবে দেইখো। সেটা যদি ব্যাঙের ছাতাও হয় তবুও বলবে অনেক সুন্দর হয়েছে। ” মীম বিছানার উপর বসে পা ঝুলাচ্ছে আর মেঘের সাথে গল্প করছে। মেঘ আবিরের কথা মতো নিজের হাতের ছাপটার নিচে নিজের নাম লিখেছে তাছাড়া একসাইডে ‘সাজ্জাদুল খান আবির’ নাম লিখে ডিজাইনও করে দিয়েছে। মীমকে কিছু জিনিস দিয়ে আগেই পাঠিয়ে দিয়েছে। বাকি গুলো নিয়ে মেঘ পেছন পেছন আসছে। এতক্ষণের মধ্যে আবির একবারও উপরে যায় নি। মীম নিচে আসতেই আবির প্রশ্ন করল, ” তোর বোনের কাজ শেষ হয়েছে? ” “হ্যাঁ। অনেকক্ষণ আগেই শেষ হয়েছে।” আবির কোনো কথা না বলেই নিজের রুমে চলে গেছে। দুটা দেয়ালের ডিজাইনের কারণে রুমটাকে চেনায় যাচ্ছে না। আবিরের রুম টা খান বাড়ির সবগুলো রুমের থেকে বড়। এক সময় এই রুমে আলী আহমদ খান আর মালিহা খান থাকতেন। ওনাদের জন্য ই মূলত বানানো হয়েছিল পরবর্তীতে বিভিন্ন সমস্যার কারণে আলী আহমদ খানরা নিচে চলে আসেন। আর রুমটা আবিরের দখলে চলে যায়। রুমটার ঠিক মাঝামাঝিতে দরজাটা অবস্থিত। ভেতরে একপাশে আবিরের ব্যবহার্য সব প্রয়োজনীয় সামগ্রী আর অন্য পাশে সব অপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র, ছোটবেলার সাইকেল থেকে শুরু করে, লাগেজ, ক্রিকেট, ফুটবল খেলার যাবতীয় জিনিসপত্র, পুরোনো একটা ওয়ারড্রব আরও অনেককিছু। ঐদিকের সব জিনিসপত্র বড় কাপড় দিয়ে ঢাকা। মালিহা খান বলেছিলেন পুরোনো জিনিসপত্র

স্টোররুমে রেখে দিতে কিন্তু আবির সেগুলো সরাতে রাজি হয় নি। রুমে আর্ট করায় এখন এক পাশ অতিরিক্ত সুন্দর হয়ে গেছে আর অন্যপাশ অগোছালো। তবে আবিরের সেদিকে মনোযোগ নেই। আবির উদ্রিত নয়নে দেয়ালের দিকে চেয়ে আছে। একবার চোখ পরছে নিজের নামের দিকে পুনরায় নজর আঁটকায় মেঘের হাতের ছাপে সেই সাথে লেখা 'Megh' নামটার উপর। অকস্মাৎ আবিরের মুখে হাসি ফুটে। অন্যদিকে তানভির ভার্সিটির সামনে আসতেই সোহাগ আর শিমুলকে দেখতে পেল। ওরা তানভিরকে দেখেই হাসিমুখে এগিয়ে আসলো। তানভির প্রশ্ন করল, "বন্যা কোথায়?" " চল,আমাদের কাজটা আগে শেষ করে আসি! ৫ মিনিটের কাজ। " "বন্যার সাথে আগে দেখা করবো তারপর তোদের ব্যাপারটা ভেবে দেখব।" "দুটা মেয়ের সাথে ঐদিকে গেল। " তানভির ওদের দেখানো পথে বাইক স্টার্ট দিল। থামলো ঠিক বন্যাদের পেছনে। বন্যারা পেছন ফিরে তাকিয়েও দেখল না। তানভির ঘনঘন হর্ন দিতে লাগলো। একপ্রকার বিরক্ত হয়ে বন্যা পেছন ফিরতেই দেখলো তানভির বাইক থেকে নিরেট দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। বন্যা চেহারা স্বাভাবিক করার চেষ্টা করলো। তানভির গম্ভীর কণ্ঠে বলল, "এদিকে আসো।" বন্যা বান্ধবীদের দিকে তাকিয়ে ধীর গতিতে এগিয়ে আসলো। তানভির প্রখর তপ্ত স্বরে বলল, "ফোন দিলে ফোন রিসিভ করার প্রয়োজন মনে করো না। ইদানীং ফোন বন্ধ করে রেখেছো। সমস্যা কি?" বন্যা স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, " আমার ফোন নষ্ট হয়ে গেছে, নতুন ফোন

কিনতে হবে। আব্বু বলছেন আগামী সপ্তাহে ফোন কিনে দিবেন।” “ওহ। আর কোনো কারণ নেই তো?” “আর কি কারণ থাকবে?” “ভাইয়া যখন এক্সিডেন্ট করেছিল তখন তোমাকে রাগে উল্টাপাল্টা কথা বলেছিলাম তারজন্য দুঃখিত। ভাইয়ার র*ক্তা*ক্ত দেহ দেখে আমি তখন মানসিকভাবে ভেঙে পরেছিলাম। বুঝে না বুঝে তোমার সাথে রাগ দেখিয়েছি। ” বন্যা মলিন হেসে বলল, ” কোনো ব্যাপার না। আমি কিছু মনে করি নি। আপনার জায়গায় আমি থাকলেও হয়তো এভাবেই রিয়েক্ট করতাম নয়তো আরও বেশি করতাম। ” “I am really Sorry, Bonna.” “এত ফরমালিটি করতে হবে না। আমি সত্যি ই কিছু মনে করি নি। আবির ভাইয়া এখন কেমন আছেন? মেঘ কেমন আছে?” “দুজনেই আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছে।” বন্যা হঠাৎ ই ঢোক গিলে উষ্ণ স্বরে শুধালো, “একটা কথা জিজ্ঞেস করব?” “হ্যাঁ অবশ্যই। ” “আপনি মিনহাজ আর তামিমকে কি করছিলেন?” “কেনো? কোনো সমস্যা? ” “না না। ওরা অনেকদিন ভার্সিটিতে আসে নি। এখন আসলেও অনেক চুপচাপ হয়ে গেছে তাই বলছিলাম..! ” “ওহ আচ্ছা। এসব কোনো বিষয় না। আমি বেশি কিছু করি নি। আমার জায়গায় ভাইয়া থাকলে ওদের আর কোনোদিন দেখতেও পারতা না। ” তানভির একটু থেমে আবার প্রশ্ন করল, “ওহ একটা কথা, ভার্সিটিতে কেউ তোমাকে ডিস্টার্ব করে?” বন্যা মনে মনে আওড়াল, “ডিস্টার্ব করলেও তো আপনাকে বলবো না।” স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, ” নাহ। ” “যদি মনে করো আমাকে না বললে আমি কিছু

জানতে পারবো না তাহলে এটা তোমার ভুল ধারণা, বরং তুমি নিজ থেকে জানালে তোমারই লাভ। ” বন্যা কপাল গুটিয়ে ধীর কণ্ঠে বলল, “এখন আসি। ” “যেতে বলছি তোমায়?” “আমার তাড়া আছে। ” “কেন?কেউ অপেক্ষা করছে?” “মানে..” “কিছু না।” “ভার্সিটিতে পরশুদিন পোগ্রাম আছে কষ্ট করে মেঘকে জানিয়ে দিয়েন। ” “ঠিক আছে। এখন চলো” “কোথায়?” “তোমায় কিছু খাওয়ায়। ” “আমি আজ কিছু খাবো না। অন্য কোনো দিন আমি আপনাদের খাওয়াবো।” তানভির ভারী কণ্ঠে বলল, “সেসব পরে দেখা যাবে, এখন বাইকে বসো। একগ্লাস আঁখের জুস হলেও খেতে হবে। না হয় আমি ধরে নিব, তুমি আমার উপর রাগ করে আছো। ” “আমি সত্যি রেগে নেই। বিশ্বাস করুন।” “মানলাম & বিশ্বাসও করলাম, এখন চলো।” বন্যা দাঁতে দাঁত চেপে বাইকে উঠে বসলো। ইচ্ছে না থাকা সত্ত্বেও তানভিরের সঙ্গে দু গ্লাস আঁখের জুস খেয়েছে। শুধুমাত্র মেঘের ভাই বলে বাধ্য হয়ে বন্যা তানভিরের সাথে কথা বলে, না হয় কোনোদিন বলতো না। মিনহাজ আর তামিমকে বন্যা দু একবার জিজ্ঞেস করেছিল, কি হয়েছিল বলতে কিন্তু ওরাও কিছু বলে না। বারবার কথা এড়িয়ে যায়, তারজন্য বন্যাও তেমন জোর করে না। তবে ভালো কিছু যে ঘটে নি, বন্যা ১০০% নিশ্চিত। আবিরের অসুস্থতার পর থেকে মেঘ মিনহাজদের কথা ভুলেও ভাবে না। বন্যা কিছু বললেও তেমন পাত্তা দেয় না, এমনকি রেগুলার ভার্সিটিও আসে না। বাড়ির কেউ কিছু বললে, শরীর খারাপ, মন খারাপ বলে নানান বাহানা দেয় আর বাকি

সব তানভির সামলায়। না বোনকে কিছু বলতে পারে আর না বাসায়। মেঘের চোখে তানভির সেরা ভাই হলেও বন্যার চোখে তানভির একজন রাজনীতিবিদ, দাপটী, ভি*লেন টাইপের ছেলে। এত বছর যাবৎ মেঘকে শাসন করা দেখে বন্যা তানভিরকে ভয় পেত, মিনহাজদের ঘটনার পর থেকে বন্যা আরও বেশি আতঙ্কে থাকে। দূরত্ব মেইনটেইন করে চলে। তানভির বন্যাকে রিক্সায় উঠিয়ে দিয়ে সোহাগ দের কাছে আসছে। সোহাগ ঠাট্টার স্বরে বলল, "আগে আসতেই চাইছিলি না আর এখন...." তানভির মুচকি হেসে বলল, " কতদিন পর মেয়েটাকে দেখলাম।" "আহা! কত আবেগ! " "কোথায় যাবি বলছিলি চল" বিকেল থেকেই মেঘ আর মীম শপিং এ যাবে বলে পাগলামি করছে। তানভিরকে যেতে বলা হয়েছিল কিন্তু তানভির পোগ্রামে ব্যস্ত বলে যেতে পারবে না । মেঘ আর মীম একা যেতে পাগলামি শুরু করেছে। ওদের হাউকাউ শুনে আবির নিচে আসছে। আবিরকে দেখেই দুই বোন চুপ করে গেছে। সদ্য ঘুম থেকে উঠে আসায় আবিরের চোখগুলো লাল টকটকে হয়ে আছে। আবির অস্ফুট কণ্ঠে শুধালো, "কি হয়েছে তোদের?" মেঘ, মীম কেউ কোনো কথা বলল না। আকলিমা খান বললেন, "ওরা শপিং এ যেতে চাচ্ছে।" "যেতে চাচ্ছে যাক, সমস্যা কি?" "একা যেতে চাচ্ছে! " আবির কপাল কুঁচকে তাকিয়ে বলল, "একা যেতে হবে কেন? তোমরা না গেলে আমি ওদের নিয়ে যাচ্ছি । " মেঘ আর মীম দুজনেই একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, "নাহ!" রাগে আবিরের চোখমুখ লাল হয়ে গেছে। কপাল কুঁচকে গম্ভীর

কণ্ঠে শুধালো, “সমস্যা কি তোদের?” মেঘ মাথা নিচু করে উত্তর দিল, “কোনো সমস্যা নাই” “সমস্যা না থাকলে কাকিয়াদের নিয়ে শপিং এ যা। বেশি ত্যাড়ামি করবি না। ঠিক আছে?” মেঘ একদৃষ্টিতে আবিরের দিকে তাকিয়ে উপর নিচ মাথা নাড়লো। অনুমতি ছাড়া একা শপিং এ যাওয়া অসম্ভব বিষয় এটা তাদের অজানা নয়, তবুও চেষ্টা করে দেখছিল, যদি অনুমতি পেয়ে যায়। আবির আগের ভাবমূর্তি বজায় রেখে দাঁড়িয়ে আছে, মেঘ আর মীম তাড়াহুড়ো করে নিজেদের রুমে চলে গেছে। হালিমা খান আর আকলিমা খানের সঙ্গে মীম আর মেঘ শপিং এ গেছে। মেঘ আর মীম সুযোগ বুঝে আবিরের জন্য ২-৩ টা সাদা টিশার্ট, আর দুজনের জন্য ৩ টা পাঞ্জাবি কিনে নিয়ে আসছে। মেঘরা বাসায় ফিরতেই তানভির ভার্সিটির পোগ্রামের কথা বলেছে। আবিরও সেখানেই উপস্থিত ছিল। মেঘ নিজের হাতের শপিং ব্যাগ গুলো লুকিয়ে নিজের রুমে নিয়ে গেছে। আবির বিষয়টা খেয়াল করেও কিছু বলে নি। আবির রাতে ঘুমানোর জন্য রুমে ঢুকে দরজা চাপাতেই রীতিমতো আশ্চর্য হয়ে গেছে। আবিরের দরজার আড়ালে মেঘের হাতের ছাপটা আগের মতো বেরঙিন নেই। মেঘ সেখানে নীল রঙের ছাপ দিয়েছে, এমনকি অন্য হাতের ছাপও দিয়েছে। পাশাপাশি মেঘের দু হাতের ছাপ দেখে আবির মুচকি হেসে বলল, ” পাগলি একটা। ” পোগ্রামের দিন ঠিক সময় মতো মেঘ ভার্সিটিতে চলে আসছে। মেঘকে দেখে মিনহাজ আর তামিম এগিয়ে এসে শুধালো, “কেমন আছিস? ” মেঘ অন্যদিকে মুখ করে বলল, “আলহামদুলিল্লাহ। ” মেঘ ওদের পাশ

কাটিয়ে চলে গেছে। বন্যা আর মেঘ দুজনেই আজ গাউন ড্রেসের সঙ্গে হিজাব পড়ে আসছে। মেঘ আর বন্যা কিছুটা সামনে এগুতেই লিফাত নামের ছেলেটার সাথে দেখা। লিফাতের হাতে সিগারেট, বন্যা আর মেঘকে দেখেই থতমত খেল। সিগারেট পেছনে ফেলে শান্ত স্বরে জিজ্ঞাসা করল, "কেমন আছো তোমরা?" বন্যা আর মেঘ দুজনেই কপাল কুঁচকে তাকিয়ে আছে। বন্যা ঠান্ডা কণ্ঠে বলল, "আলহামদুলিল্লাহ ভালো।" বন্যা মেঘের হাত ধরে বলল, "চল এখান থেকে।! মেঘ তখনও সরু নেত্রে লিফাতকে পরখ করছে। ছেলেটার মুখে রহস্যময় হাসি। লিফাত প্রশ্ন করল, " কেউ কেমন আছো জিজ্ঞেস করলে প্রতিত্তোরে তাকেও জিজ্ঞেস করতে হয় এটাও কি জানো না?" বন্যা শক্ত কণ্ঠে জবাব দিল, "নাহ। জানি না। " বন্যা মেঘকে টেনে নিয়ে চলে গেছে । মেঘ কপাল কুঁচকে শুধালো, "এই ছেলে আবার কে?" "রসায়ন ডিপার্টমেন্টের চতুর্থ বর্ষের এক বড় ভাই। " "তোর সাথে কথা বলতে আসছে কেন?" "আল্লাহ জানেন। তুই তো ইদানীং তেমন ক্লাসে আসিস না, একদিন আমি ফোনে কথা বলছিলাম, তখন এই ছেলে ইচ্ছে করেই আমার কাছে গেছে। আমি হঠাৎ ঘুরাতে প্রায় ধাক্কা লেগেই গেছিল, কথা বার্তা নেই হুট করে আমাকে ধমকিয়ে চলে গেছে। এরপর থেকে দেখলেই কেমন করে হাসে, এটা সেটা জিজ্ঞেস করে। ইচ্ছে করে মা*থাটা ফা*টিয়ে দেয়। " "ভাইয়াকে বলবো?" "না না না। তোর ভাই আরেক ডেঞ্জারাস পাবলিক। ঐদিন দেখা হয়ছিল পরেও জিজ্ঞেস করতেছিল, আমাকে কেউ ডিস্টার্ব করে কি না!" "তুই

কি বলছিস?” “আমি না করছি।” “কেনো?” “তোর ভাই মিনহাজদের যে অবস্থা করছে, আমি আর কাউকে বিপদে ফেলতে চাই না।” “তাহলে আবির ভাইকে বলি?” “ভুলেও না। তোর এই গু*ন্ডাপা*ন্ডা ভাইদেরকে আমার ব্যাপারে কিছু বলবি না।” “তুই গুন্ডাপান্ডা কাকে বলছিস? আমার আবির ভাই ভাই হিরো নট ভি*লেন ওকে?” “আর তোর ভাই?” “আমার ভাই ও হিরো। মিনহাজদের যদি মে*রেও থাকে, ভাইয়া কি শুধু শুধু মা*রছে নাকি? আমার কর্মকাণ্ডে তোর কি তখন আমাকে মা*রতে ইচ্ছে করে নি? বল করে নি?” “করেছে। ” “তুই আমার বেস্টফ্রেন্ড হয়েও আমার কাজে তুই আমার উপর বিরক্ত হয়ছিস। এমনকি আমি নিজেই আমার উপর বিরক্ত ছিলাম। সেখানে ভাইয়া না মিনহাজকে চিনে, আর না তামিমকে চিনে। আবির ভাই আর তানভির ভাইয়ার প্রাণ এক সুতোয় বাঁধা, ওদের একজনের কিছু হলে আরেকজন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে হলেও বাঁচাবে। সেখানে সামান্য মা*ইর আর এমন কি!” বন্যা উদাসীন কণ্ঠে বলল, “এখন চল, অনুষ্ঠান শুরু হয়ে যাবে ” মেঘ আর বন্যা ভেতরে ঢুকলো। পেছন দিকে বসতে যাবে এমন সময় ওদের একজন ক্লাসমেট সামনে থেকে ডেকে বলল, “মেঘ, তোরা এখানে আয়। তোদের জন্য সিট আছে।” মেঘ আর বন্যা এগিয়ে গেল। পাশাপাশি দুটা সিটে মেঘ আর বন্যা বসলো। ওদের সামনের সারিতেই লিফাতের বন্ধুরা বসা, কয়েক মুহুর্তের মধ্যেই লিফাত এসে বসলো। মেঘ আর বন্যা লিফাতকে দেখেই পেছনে চলে যাওয়ার জন্য ফিসফিস শুরু করল। লিফাত

পেছনে ঘুরে উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, “আরে তোমরা এখানে, কোনো কিছু লাগলে শুধু একবার বলবা, সাথে সাথে এনে দিব। ” বন্যা আর মেঘ দুজনেই রাগে ফুঁসছে। বন্যা কিছু বলতে যাবে তার আগেই কেউ একজন রাগান্বিত কণ্ঠে বলে উঠল, ” তোর কলিজাটা আমার লাগবে, দে এখন ” মেঘ আর বন্যা দুজনেই চমকে উঠে পাশ ফিরে তাকালো। লিফাত ও আঁতকে উঠে সেদিকে তাকালো। চোখ পর্যন্ত ঢেকে রাখা ক্যাপ টা সরাতেই তানভিরের মুখটা স্পষ্ট দেখা গেল। লিফাতের দিকে অগ্নিদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। তানভিরকে দেখে বন্যা আর মেঘ দু’জনেই ভয় পাচ্ছে। লিফাত বেশ কিছুক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে হঠাৎ ই হেসে ফেলল। তানভির চোখ মুখ কুঁচকে পুনরায় বলল, “কি হলো দিবি না? মেয়েদের প্রতি এত যত্ন, যা চাইবে সাথে সাথে এনে দিবি আর আমি সামান্য কলিজাটা চাইছি তুই সেটা দিতেই রাজি হচ্ছিস না! লিফাত, তোর থেকে এটা আশা করি নি।” লিফাত হঠাৎ ই অস্বাভাবিকভাবে হাসতে শুরু করল, হাসতে হাসতে বলল, ” আরে ভাই তুমি? তোমার কি লাগবে বলো শুধু! দেখো তোমার ভাই তোমার জন্য কি করে!” তানভিরের চোখে মুখে বিরক্তির ছাপ। বিরক্তি ভরা কণ্ঠে বলল, “আপাতত তোর কলিজাটা হলেই হবে। চাইলে তোর হার্টটাও দিতে পারিস, আমিও দেখি ঐখানে ঠিক কতজনকে জায়গা দিয়েছিস। ” লিফাত মুখে হাসি রেখেই বলল, এই সর সর, আমাকে সাইড দে। লিফাত এগিয়ে আসতেই তানভির বসা থেকে উঠে দাঁড়ালো । লিফাত তানভিরকে জড়িয়ে ধরে বিড়বিড় করে বলতে লাগলো, “প্লিজ ভাই,

এখানে অনেক জুনিয়র আছে। ওদের সামনে আমার মানসম্মান টা ডুবিয়ো না। প্লিজ।” তানভির রাগান্বিত কণ্ঠে গজগজ করতে করতে বলল, “তোর হিসাবের খাতায় এখন অব্দি ১০০০ খানের মেয়ের নাম উঠেছে। আর কত?” “সরি ভাই। তুমি এখানে কেন আসছো ওরা কি তোমার কিছু হয়? নাকি অন্য কারো জন্য আসছো?” “যেই বন্যার পিছনে ঘুরঘুর করছিস সে একান্ত ই আমার, তার পাশের জন আমার একমাত্র বোন আর আবির ভাইয়ার পার্সোনাল সম্পত্তি। তুই ভুল জায়গায় হাত বাড়িয়েছিস লিফাত, তোকে কি করা উচিত নিজেই বল। ” “সরি ভাইয়া। প্লিজ মাফ করে দাও। আমি জানতাম না ওরা তোমার কাছের লোক।” “তোকে লাস্ট ওয়ার্নিং দিচ্ছি লিফাত, ভবিষ্যতে কোনো মেয়ের দিকে কুনজর দিলে, সার্টিফিকেট নিয়ে বের হতে পারবি না বলে দিলাম। ” “প্লিজ তানভির ভাই, এমনটা করো না। প্রয়োজনে আমি তোমার পায়ে ধরে মাফ চাইবো। আবির ভাইয়া কোথায় আছেন, আমি ওনার পায়ে ধরে মাফ চেয়ে নিবো। তবুও এমন কিছু করো না ভাই। ” “ঠিক আছে। লাস্ট বারের মতো ছেড়ে দিচ্ছি। ” লিফাত একগাল হেসে বলল, “থ্যাংক ইউ ভাই। ” তানভির ভারী কণ্ঠে বলল, “মনে থাকে যেন।” “অবশ্যই। ” লিফাত নিজের চেয়ারে গিয়ে বসলো। পেছন ফেরা তো দূর ঘাড় পর্যন্ত কাত করছে না। তানভির মেঘ আর বন্যার জন্য কিছু খাবার আগেই কিনে নিয়ে আসছিল। সেগুলো দিয়ে ক্যাপ পড়তে পড়তে বলল, “আমি আসছি।” মেঘ হাসিমুখে বলল, “অনুষ্ঠান দেখবা না?” “আমি অনুষ্ঠান দেখতে

আসি নি। যে কাজে আসছিলাম তা শেষ । অনুষ্ঠান শেষে বাসায় চলে যাস, উল্টাপাল্টা ঘুরিস না। ” তানভির চলে গেছে। খুশিতে মেঘের চোখ চকচক করছে। বন্যার দিকে তাকিয়ে ঠোঁট বেঁকিয়ে হেসে বলল, “দেখেছিস, আমার ভাই সেরাদের সেরা। তুই না বললেও ঠিকই জেনে ফেলছে। ঐ ছেলে মাফ যে চাইছে দেখছিস! ” বন্যা ফোঁস করে শ্বাস ছেড়ে রাগী স্বরে বলল, “তুই গিয়ে শুনছিলি? মাফ নাও চাইতে পারে ” মেঘ ভ্রু কুঁচকে বলল, “এই তুই কি আমার ভাইয়ের পাওয়ার নিয়ে সন্দেহ করছিস? আমি সিউর এই ছেলে ভাইয়ার কাছে মাফ চাইছে। বিশ্বাস না হলে ছেলেকে ডাক দে, যদি স্বাভাবিক ভাবে কথা বলে তাহলে বুঝবো ভাইয়া কিছু বলে নি। আর যদি কণ্ঠস্বর বদলে যায় তাহলে বুঝবো ভাইয়া ঝাড়ছে। ” বন্যা ভাবলেশহীন জবাব দিল, “আমি পারব না। ” মেঘ ভেঙচি কেটে বলল, ” না পারলে নাই, আমার ভাই যে হিরো তার প্রমাণ আমার দিতেই হবে। ” মেঘ সামনের দিকে কিছুটা ঝুঁকে ডাকলো, “Excuse me vaiya.” ছেলেটা পেছনে না তাকিয়েই ঢোক গিলে ধীর কণ্ঠে জবাব দিল, “জ্বি আপু, কিছু বলবেন? আমাদের জন্য কি কোনো সমস্যা হচ্ছে? আমরা কি পেছনে চলে যাব?” মেঘ তাড়াহুড়ো করে বলল, “না পেছনে যেতে হবে না। আমাদের কোনো সমস্যা হচ্ছে না। ” মেঘ বন্যার দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বলল, “দেখলি?” এরমধ্যে রাজনীতিবিদদের আগমন ঘটলো। আশেপাশে বসা জুনিয়র রা সবাই দাঁড়িয়ে সালাম দিচ্ছে। মেঘ আর বন্যা স্বাভাবিক ভাবেই বসে রইলো। একজনের নজর মেঘদের দিকে

পরতেই সামনের দুতিন জনকে ডেকে বলল, অকস্মাৎ ওরা থমকে গেল। ঘুরে এসে মেঘদের কাছে দাঁড়ালো। মেঘ আর বন্যা মনে মনে ভয় পাচ্ছে। ভাবছে, দাঁড়ায় নি বলে হয়তো ওনারা বকা দিতে আসছেন। তাদের মধ্যে একজন মেঘকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠলেন, "আসসালামু আলাইকুম আপু।" "ওয়ালাইকুম আসসালাম।" "তোমরা এত পেছনে বসছো কেনো? আসো সামনে এসে বসো।" মেঘ আর বন্যা দুজনেই থতমত খেয়ে বলল, "না ভাইয়া, আমরা এখানেই ঠিক আছি। " "তা বললে হবে না আপু। আবির ভাইয়াকে এত করে রিকুয়েষ্ট করার পরও ওনি আমাদের পোগ্রামে আসেন নি। অবশ্য তার জন্য আমরায় দায়ী। ভাইয়া বারবার বলেছিল ওনাকে নিয়ে যেন কোনোরকম প্ল্যান না করি। কিন্তু আমাদের মন তাতে সায় দেয় নি, ভাইয়ার জন্য স্পেশাল আয়োজন করেছিলাম। ভাইয়া কোনোভাবে খবর পেয়েছে তারপর আর পোগ্রামেই আসে নি। সেসব পুরোনো কথা বাদ দেয়, এখন তোমরা যেহেতু আজকের পোগ্রামে আসছো, আমাদের উচিত তোমাদের সর্বোচ্চ আপ্যায়ন করা। প্লিজ তোমরা সামনে এসে বসো, প্লিজ " ৪-৫ একসঙ্গে রিকুয়েষ্ট করতে শুরু করেছে। ওনাদের এত রিকুয়েষ্ট করা দেখে মেঘ আর বন্যা ভীষণ লজ্জায় পরে গেছে। পুরো হলের মানুষ দাঁড়িয়ে তাকিয়ে আছে মেঘ আর বন্যার দিকে। যাদের দাপটে সবাই আতঙ্কে থেকে সেখানে তারা প্রথম বর্ষের দুই মেয়েকে এত রিকুয়েষ্ট করতেছে এটা সবার কল্পনার বাহিরে। মেঘ আর বন্যা বাধ্য হয়ে সামনে গিয়ে বসলো। এত সামনে বসে পোগ্রাম

দেখতে মেঘ আর বন্যা দু'জনের ই অস্বস্তি লাগছে। উঠে যেতেও পারছে না, একটু নড়লেই দুএকজন এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করে, "আপু কোনো সমস্যা? কিছু লাগবে?" তাই উঠে যেতেও পারছে না। পোগ্রামের বিরতিতে মেঘদের খাবার পর্যন্ত দিয়ে গেছে। তানভির নিজেও অনেক খাবার কিনে দিয়ে গেছিলো। মেঘ আর বন্যা শুধু মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে কিছুই খেতে পারছে না। মেঘ বাধ্য হয়ে আবিরকে কল দিল। আবির অফিসে কাজ করছিল। গতকাল থেকেই অফিসে আসছে। অফিসে আসলেও এখনও বাইক চালানোর অনুমতি পায় নি আবির। দুদিন যাবৎ আলী আহমদ খান নিজের সাথেই আবিরকে অফিসে নিয়ে যান, আবিরও বাধ্য ছেলের মতো আব্বুর সঙ্গেই যায়। মেঘ কল দিতেই আবির মুচকি হেসে কল রিসিভ করল, মেঘ সালাম দিলো। আবির সালামের উত্তর দিয়ে শুধালো, " কি ব্যাপার? তাদের আপ্যায়নে অতিষ্ঠ হয়ে যাচ্ছিস?" মেঘ উদ্বেগপূর্ণ কণ্ঠে জানতে চাইলো, "আপনি কিভাবে জানেন?" " তোর আশেপাশে কখন কি ঘটনা ঘটে সব আপডেট ই আমার কাছে থাকে। " "ওনারা কল দিয়েছিল?" "আমায় না জানিয়ে তোকে কিছু বললে ওদের যে কি অবস্থা হবে এটা তুই না জানলেও ওরা খুব ভালো করে জানে। খাবার খাইছিস?" "নাহ। " "খেয়ে নে। না হয় একটার পর একটা দিতেই থাকবে। ওদের অতিরিক্ত ভালোবাসায় অতিষ্ঠ হয়ে আমি যোগাযোগ কমিয়ে ফেলেছি। এতদিনে তোকে পেয়েছে, তোকে ঠিকঠাক আপ্যায়ন করতে না পারলে ওরা ঘুমিয়েও দুঃস্বপ্ন দেখবে। বুঝলি।" মেঘ মৃদু হেসে

বলল, “আমাদের পোগ্রাম দেখতে ভালো লাগছে না, সামনে এনে বসাইছে সব বিরক্ত লাগছে। ” “কিছুক্ষণ দেখে বেশি খারাপ লাগলে আমার কথা বলে বেড়িয়ে পরিস। ” “আচ্ছা। আপনি আসবেন?” “কেনো? অনুষ্ঠান দেখতে নাকি ওদের কর্মকান্ড দেখতে?” “নাহ নাহ, এমনি। আসবেন কি না জিজ্ঞেস করছি।” আবির মন খারাপ করে বলল, “জানিস ই তো আব্বু আমাকে বাইক নিয়ে বের হতে দেয় না। আব্বুর গাড়ি আমি নিব না, আসলে রিক্সা নিয়ে আসতে হবে। আসবো?” মেঘ খানিক ভাবল, এমনিতেই আবিরের শরীর দূর্বল, এ অবস্থায় যদি আবার কোনো এক্সিডেন্ট ঘটে সে ভয়ে মেঘ বলল, “নাহ, আপনার আসতে হবে না। ” “রাগ করছিস? আমি রিক্সা নিয়ে আসি, সমস্যা নেই। ” “সত্যি রাগ করি নি। আপনি পুরোপুরি সুস্থ হলে অনেক ঘুরতে পারবো। এখন না হয় বড় আব্বুর লক্ষ্মী ছেলে হয়েই থাকুন ” আবির নিঃশব্দে হেসে বলল, ” সাবধানে থাকিস আর কোনো সমস্যা হলে জানাইস। ” মেঘ ঠাট্টার স্বরে বলল, ” জানাবো না। ” “কেনো?” “কারণ আমি জানি, আমার কোনো সমস্যা হওয়ার আগেই কেউ বা কারা, কোনো না কোনো ভাবে আমাকে প্রটেক্ট করবেই। ” “এত কনফিডেন্ট?” “Yes, Sir” “Okay Mam. পাকনামি রেখে এখন খেয়ে নেন।” “আচ্ছা। আপনি খেয়েছেন?” “আব্বু আমাকে খাওয়ার উপরই রেখেছেন। ঘন্টায় ঘন্টায় খাবার পাঠাচ্ছেন। এখন মনে হচ্ছে অফিসে না এসে বাসায় থাকলেই ভালো হতো।” ” ঠিক আছে খান, রাখি তাহলে ” “ওকে।” মেঘ আবার

ডাকলো, “আবির ভাই....!” “হুমমমমমমম” “কিছু না। রাখছি।” মেঘ কল কেটে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লো। বন্যা কপাল কুঁচকে তাকিয়ে আছে। মেঘ ভ্রু নাচিয়ে শুধালো, ” এখন কি আমার ভাইয়া আর আবির ভাইয়ের ক্ষমতা সম্পর্কে আইডিয়া হয়ছে?” বন্যা অস্থির হয়ে বলল, “সেসব হয়েছে, কিন্তু তুই আগে এটা বল, তুই আর আবির ভাই কি রিলেশনে আছিস?” “হ্যাঁ” “সত্যি? ওনি কি তোকে প্রপোজ করে ফেলছেন?” “প্রপোজ করেন নি। তবে আমি মনে মনে এক্সেপ্ট করে নিয়েছি। কেন বল তো?” “তোদের এত সুন্দর কথোপকথন শুনে আমার নিজের ই শান্তি শান্তি লাগছে।” মেঘ মুচকি হাসলো, সাথে বন্যাও।চৈত্রের উত্তপ্ত আবহে নগর যেন মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে। শহর জুড়ে বৃষ্টির জন্য হাহাকার। আরোপিত শীতলতার আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত আবির, তবুও গাত্র ঘেমে নাজেহাল অবস্থা। পূর্বের তুলবায় কয়েক ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বেড়েছে। একফোঁটা বৃষ্টির আশায় সবাই অসহায়ের মতো আকাশের পানে চেয়ে আছে। অসহ্য গরমের জন্য আজ অফিস একটু তাড়াতাড়ি ই ছুটি হয়েছে। আবিরকে ফুপ্পি সকাল থেকে অনেকবার কল দিচ্ছিলো, আবির সুস্থ হয়েছে শুনে বার বার যেতে বলছিল কিন্তু আলী আহমদ খান আবিরকে কোনোমতেই যেতে দিবেন না, অন্ততপক্ষে এই ভর দুপুরে তো নয় ই। এমনকি বিকেলেও যেতে দেন নি। আবিরও বাবার মুখের উপর কিছু বলে নি। আবির বাসায় ফেরার পর থেকেই দেখছে মেঘ আর মীম মামনিদের পেছন পেছন ঘুরঘুর করছে। মামনিরা বারবার বারণ করছে দেখে

আবির এগিয়ে গিয়ে শুধালো, ” কি হয়েছে তোদের? ” মীম চট করে বলল, “ফুপ্পি কল দিয়েছিল, আমাদেরকে বাসায় যেতে বলেছেন কিন্তু আম্মুরা যেতে দিচ্ছে না।” আবিরের কপালে কয়েকস্তর ভাঁজ পড়েছে। উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলল, “ফুপ্পি সকাল থেকে আমাকেও বার বার কল দিচ্ছেন, কোনো সমস্যা ই হলো কি না!” আবির ফের জিজ্ঞেস করল, “মামনি, তোমাদের কিছু বলেছে?” “তেমন কিছু বলে নি। শুধু বলছেন তোরা যেন রাতে ওখানে খাওয়াদাওয়া করিস। ” “তোমাদের কিছু বলে নি?” “আমাদের শুক্রবারের দাওয়াত দিয়েছে। আবার বললো আসিফ আর আরিফকে পাঠিয়ে দাওয়াত দিবে। তোর আব্বুকেও কল দিয়ে বলবে বললো।” আবির স্বাভাবিক ভাবে বলল, “আমি ভেবেছিলাম শুধু আমাকেই কল দিচ্ছে। সকালে বলছি বিকালে আসতে পারি! কিন্তু গরমের জন্য আব্বু যেতে দেন নি, জোর করে বাসায় নিয়ে আসছে। ” ” রাতে ঝড় হতে পারে ভেবে, তোর চাচ্চুও ওদের পাঠাতে না করলো। এদিকে আফা বার বার কল দিয়েই যাচ্ছে। তানভিরও কল দিয়ে বলল ওদের পাঠাতে, তানভির নাকি কাজ শেষ করে ফুপ্পির বাসায় যাবে। ” “আচ্ছা, আমি ফুপ্পির সাথে কথা বলছি।শুক্রবারে সবাই গেলে আজ তাহলে কারো যাওয়ার প্রয়োজন নেই। ” “সেই বরং ভালো। তুই কথা বলে দেখ।” আবির ফোন হাতে নিয়ে চলে যাচ্ছে, মেঘ কপাল গুটিয়ে আবিরের দিকে তাকিয়ে আছে। আবির একটু দূরে যেতেই মেঘ দ্রুত আবিরের কাছে গিয়ে হাতে চিমটি কাটলো। আবির তাকাতেই মেঘ ফোঁস করে শ্বাস ছেড়ে তাকালো,

মেঘের চোখের পাপড়ি ঘনঘন কাঁপছে, হালিমা খান, আকলিমা খান আর মীম তিনজনের নজরই মেঘের দিকে। মেঘ তড়িঘড়ি করে আবিরের থেকে কিছুটা দূরে সরে দাঁড়ালো। মেঘ চোখ মুখ গুটিয়ে কিছু একটা বুঝাতে চাচ্ছে। মেঘের ইশারায় বুঝানো কথা আবিরের বোধগম্য হলো না। পরপর দুবার ভ্রু নাচিয়ে নিঃশব্দে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল। মেঘ চাপা স্বরে বিড়বিড় করে বলল, "আজ আইরিনের জন্মদিন। সে বায়না ধরেছে আজ আমাদের নিজে হাতে রান্না করে খাওয়াবে।তারজন্য ফুপ্পি বার বার কল দিচ্ছেন।" আবির মৃদু স্বরে প্রশ্ন করল, "তোকে কে বলছে?" "জান্নাত আপু।" "আচ্ছা দেখছি,কি করা যায়।" আবির আলী আহমদ খানের রুমে চলে গেছে। মেঘকে ডেকে আকলিমা খান জিজ্ঞেস করলেন, "আবিরকে কি বলছিস ?" মেঘ হাসিমুখে বলল, " দেখো কাকিয়া, ফুপ্পিরা সবাই আমাদের বাসায় আসছে, খাওয়াদাওয়া করেছে, সারাদিন সময় দিয়েছে। প্রথমবার ফুপ্পি আমাদের যেতে বলছেন, আমাদের কি যাওয়া উচিত না বলো?" "অবশ্যই উচিত। কিন্তু তোর আব্বু যে না করে গেল।" "আবির ভাই বড় আব্বুর সাথে কথা বলতে গেছেন। দেখবা বড় আব্বু রাজি হয়ে গেছে। তখন আব্বু আর কিছুই বলতে পারবে না। " আকলিমা খান হেসে বললেন, "তোদের মাথায় সারাক্ষণ শুধু দুষ্টু বুদ্ধি ঘুরে তাই না!" মেঘ আর মীম দুজনেই হাসছে। এরমধ্যে আবির বেড়িয়ে এসে বলল, " হাসাহাসি রেখে এখন রেডি হতে যা, কিছুক্ষণের মধ্যেই বের হতে হবে। " হালিমা খান প্রশ্ন করলেন, "আবির, তুই কি বাসা

চিনিস?” আচমকা এমন প্রশ্নে আবির থতমত খেল, নিরবে ঢোক গিলল। মেঘ শান্ত স্বরে বলল, “আজকাল বাড়িঘর চিনতে হয় না, বুঝছো আম্মু। ফোন নাম্বার আছে, গুগল ম্যাপ আছে কোনো না কোনোভাবে চলে যাওয়া যাবে। ” হালিমা খান আর কিছু বললেন না। মেঘ, মীম আর আদি কে উদ্দেশ্য করে বললেন, “চল চল রেডি হতে হবে। ” আদি আমতা আমতা করে বলল, “আমি আম্মুকে ছাড়া যাব না। তোমরা যাও। ” মেঘ কপাল গুটিয়ে বলল, ” তুই কবে বড় হবি! মীম চল আমরায় যায়। ” আবিরের সহজ স্বীকারোক্তি, “তোরা রেডি হয়ে আমাকে ডাকিস।” “ঠিক আছে । ” মেঘ আর মীম দুজনেই রুমে চলে গেছে। কিছুক্ষণের মধ্যে ই মেঘ রেডি হয়ে গেছে, যথারীতি আবিরকে আর মীম দরজা থেকে ডেকে নিচে চলে আসছে। আবিরও রেডি হয়ে নিচে আসছে। মীম এখনও নামছে না দেখে মেঘ আবিরের ভয়ে চিল্লিয়ে উঠল, “এই মীম, তাড়াতাড়ি আয়। ” মীম রুম থেকে বেড়িয়ে আসছে। পড়নে বাসার জামা দেখে মেঘ রাগী কণ্ঠে বলল, “এতক্ষণেও হয় নি তোর!” আবির ভারী কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, “এখনও রেডি হস নি কেন?” মীম মাথা নিচু করে বলল, “তোমরা যাও, আমি যাব না। ” আবির প্রশ্ন করল, “যাবি না কেন?আমরা অপেক্ষা করছি, যা রেডি হয়ে আয়। ” মীম চাপা স্বরে জানাল, “আমার যেতে ইচ্ছে করছে না, আমি যাব না।” আকলিমা খান রাগে কটকট করে বললেন, “এতক্ষণ তো যাওয়ার জন্য দুই বোন বাড়ি মাথায় তুলে ফেলছিলি, এখন কি হলো?” আবির মেঘের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল,

“তুই কিছু বলছিস?” মেঘ থমথমে কণ্ঠে বলল, “নাহ, আমি কিছুই বলি নি।” মেঘ মীমকে উদ্দেশ্য করে বলল, “এই মীম, কি হয়ছে তোর, চল না যাই। অনেক মজা হবে। ” “আপু তোমরা যাও, প্লিজ। আমার ভালো লাগছে না।” আকলিমা খান কিছুটা রেগে বললেন, ” থাক, ওরে আর তেল মারতে হবে না। তোরাই বরং যা। ” আবির গাড়ির চাবি মামনিকে দিয়ে বলল, “দুজন গেলে গাড়ি নেয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। চাবিটা রেখে দিও। ” “আবির গাড়ি নিয়ে যাহ। তোর আব্বু বা চাচ্চু শুনলে রাগ করবে।” আবির গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দিল, ” ফুপ্পিদের বাসা পর্যন্ত গাড়ি নাও যেতে পারে।” আবির বেড়িয়ে গেছে। মেঘ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে নিজেও ছুটলো। মীম মুচকি হেসে দরজার পানে তাকিয়ে মনে মনে বলল, “তোমাদের দু’জনের মাঝে আমি কাবাব মে হাড্ডি হতে চাই না। ” আবির রিক্সা ডেকে নিজে উঠে পরপর হাত বাড়িয়ে মেঘকে উঠালো। মেঘ ঘাড় ফিরিয়ে আবিরের দিকে তাকিয়ে আছে, দৃষ্টি তার নিরেট। পাশাপাশি বসাতে আবিরের হাতের সাথে বার বার ধাক্কা লাগছিল, অজান্তেই মেঘের বুকের বাম পাশে ব্যথা অনুভব হলো। আবিরের সংস্পর্শ পেয়ে মেঘের মন কল্পনায় ভাসতে শুরু করেছে। আবির তাকাতেই সরাসরি মেঘের চোখে নজর পরল, মেঘের গভীর চাউনি, রাস্তার পাশের কৃত্রিম আলোতে আবিরের কাদম্বিনীকে অতীব মায়াবী লাগছে। আবির টেনেহিঁচড়ে দৃষ্টি সরালো। এই চোখে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকলে আবির নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে, অন্য জগতে পাড়ি জমাতে ইচ্ছে করে। প্রায় অনেকটা

পথ অতিক্রম করে ফেলেছে, অথচ মেঘ ঘোরেই আঁটকে আছে। অবশেষে আবির গলা খাঁকারি দিয়ে ধীর কণ্ঠে প্রশ্ন করল, "আইরিনের জন্য কি নিবো?" আবিরের কণ্ঠ শুনে মেঘ চমকে উঠে, রিক্সার গতি আর নিজেকে একসঙ্গে সামাল দিতে না পেরে নড়ে ওঠে। আবির তৎক্ষনাৎ বামহাতে মেঘের কাঁধে হাত রেখে স্বাভাবিক কণ্ঠে প্রশ্ন করে, "ঠিক আছিস?" "হ্যাঁ" "আইরিনের জন্য কি নিবো?" " আপনার যা ইচ্ছে নিন।" " আমি আন্দাজি কি নিবো? মেয়েদের পছন্দ অপছন্দ সম্পর্কে আমার তেমন ধারণা নেই। তারজন্য ই তো তোর মতামত জানতে চাইছি। " মেঘ আড়চোখে আবিরের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, " আপনি আমার মতামত জানতে চাচ্ছেন? " "বাব্বাহ! মতামত জানতে চেয়ে অন্যায় করে ফেললাম নাকি?" "হ্যাঁ, করেছেন। অনেক বড় অন্যায় করেছেন। বাই দ্য ওয়ে, আপনি মেয়েদের পছন্দ- অপছন্দ জানেন না তাহলে আমাকে সুন্দর সুন্দর গিফট দেন কিভাবে?" "তুই সবকিছু নিজের সঙ্গে তুলনা করিস কেন বুঝলাম না! তোকে কিছু দিতে গেলে আমার একবারের জন্যও ভাবতে হয় না। আমি কনফিডেন্টলি বলতে পারি, আমার দেয়া ২০ টাকার একটা গোলাপ কিংবা ২০ হাজার টাকা দামের কোনো গিফট দুটায় তোর কাছে সমান গুরুত্বপূর্ণ। বাকিদের ক্ষেত্রে আমি তা পারবো না। " মেঘ বিপুল চোখে তাকিয়ে মনে মনে আওড়াল, "এই কনফিডেন্স টা নিয়ে আমায় প্রপোজ করতে পারেন না? আপনি তো জানেন আমি হ্যাঁ ই বলবো তাহলে কেনো করেন না প্রপোজ? " আবির মেঘের গাঢ় কালো পল্লবে চোখ

রেখে বলল, ” এভাবে তাকাইস না মেঘ, তছনছ হয়ে যাবো।” মেঘ সঙ্গে সঙ্গে চোখ নামিয়ে নিল, আবির ভাই নামক অসুখ টা ইদানীং মেঘকে আষ্টেপৃষ্টে ধরেছে। আবিরের বলা কথা, আচরণ সবেতেই অন্যরকম মাধুর্যতা মিশ্রিত। ধীরে ধীরে মেঘও বুঝতে পারছে আবির ভাই তার জীবনে বিশালাকৃতির গাছের ন্যায় ভূমিকা পালন করছে, গাছের শেকড় আর ঢাল পালার মতোই মেঘকে সকলপ্রকার অশুভ অঁচল থেকে আগলে রাখছে। আইরিনের জন্য গিফট কিনে যথাসময়ে বাসায় উপস্থিত হয়েছে, ততক্ষণে তানভিরও চলে আসছে। আড্ডা, খাওয়াদাওয়া শেষে প্রায় অনেক রাত করে ফুপ্পির বাসা থেকে বেড়িয়েছে। ততক্ষণে আকাশ ঘুটঘুটে অন্ধকার হয়ে গেছে, মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, সাথে মেঘের গর্জন। মেঘ উৎফুল্ল মেজাজে সামনে হাঁটছে। তানভির বাসা থেকে বেড়িয়ে তপ্ত স্বরে বলল, “ভাইয়া, অনেক রাত হয়ে গেছে তুমি বরং বনুকে নিয়ে বাইক দিয়ে চলে যাও। ” “বাসা থেকে অনুমতি নিয়ে প্রথমবারের মতো ও কে নিয়ে রাতের বেলা বেড়িয়েছি, এত তাড়াতাড়ি বাসায় চলে গেলে কিভাবে হবে! তাছাড়া আব্বু আমায় বাইক চালানোর অনুমতি দেন নি, হাজার হোক আমি আব্বুর বাধ্য সন্তান! আব্বুর অনুমতি ব্যতীত বাইক চালাতে পারি না। ” “দিনের অবস্থা ভালো না। কিছুক্ষণের মধ্যেই বৃষ্টি নামবে। তারপর ভিজে যেতে হবে। ” “ভিজলাম সমস্যা কি? জ্বর হলে না হয় দুজনের ই হলো। ” তানভির রাগী স্বরে বলল, “একবার জ্বরে ভোগে শিক্ষা হয় নি তোমাদের? ” আবির নাক কুঁচকে বলল, “তখন কি

একসাথে ভিজছিলাম নাকি? তাছাড়া মাঝে মাঝে বৃষ্টি বিলাস করা ভালো, এতে ভালোবাসা বাড়ে। বুঝছিস?" " হ্যাঁ, তোমার প্রেম বিষয়ক আজগুবি লজিক খুব ভালো ভাবেই বুঝতে পারছি। " আবির এগিয়ে যেতে যেতে বলল, "তুই কিন্তু একা বাসায় যাইস না।" তানভির চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, "হ্যাঁ,হ্যাঁ তোমাদের জন্য আমি এখন গাছতলায় বসে থাকি আর শুধু শুধু বৃষ্টিতে ভিজি। নাকি?" আবির ঘাড় ঘুরিয়ে মুচকি হেসে বলল, "ভাইও তোর, বোনও তোর তাই দায়িত্বটাও তোর ই। " আবির হাসতে হাসতে সামনে চলে গেছে। তানভির না চাইতেই মৃদু হাসলো। আবিরের যখন যা ইচ্ছে হয় তাই করে। এটা তানভিরের থেকে আর কেউ ই ভালো জানে না। আবিরের সব পাগলামির একমাত্র সাক্ষী তানভির। আবিরের বৃষ্টিতে ভিজতে ইচ্ছে হচ্ছে মানে এখন তাকে ভিজতেই হবে। তানভির বাইক স্টার্ট দিয়ে ওদের পাশ কাটিয়ে যেতে যেতে আবারও বলল, "তাড়াতাড়ি চলে এসো।" মেঘ আশেপাশে তাকাচ্ছে আর গুটিগুটি পায়ে হাঁটছে। কিছুক্ষণ রাস্তাটা ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করে হঠাৎ প্রশ্ন করল, "এই রাস্তা দিয়ে গাড়ি নিয়ে ঢুকায় যেত, তাহলে আনেন নি কেন গাড়ি?" "কেন আনি নি তার উত্তর এখন তোকে দিতে পারবো না। সময় হলে নিজেই বুঝতে পারবি। " মেঘ বলার মতো কথা খোঁজে পাচ্ছে না বলে চুপচাপ হাঁটছে। আবিরও নিশ্চুপ হাঁটছে । কোলাহলশূন্য নির্জন পথ, রাস্তা গুটিকয়েক বাইক আপন গতিতে ছুটছে। ফুপ্পিদের বাসার গলি থেকে বেড়িয়ে অনেকটা এগিয়ে মেঘ হঠাৎ ই আকুল কণ্ঠে শুধালো, " আমরা

বাসায় যাব কিভাবে?” “বাসায় না গেলে হবে না? ” মেঘ অবিশ্বাস্য দৃষ্টিতে আবিরের দিকে চেয়ে আছে। এমনিতেই অনেক রাত হয়ে গেছে। কোথায় তাড়াতাড়ি বাসায় যাওয়ার ব্যবস্থা করবেন তা না উল্টো মজা করছেন। ধীরে ধীরে বৃষ্টি পড়তে শুরু হয়েছে। মেঘের গর্জনের শব্দ আর বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটা দেখে মেঘ ভেতরে ভেতরে ভয় পাচ্ছে। দিনের বেলা বৃষ্টি তার খুব বেশি পছন্দ হলেও রাতের বেলা বিদ্যুৎ চমকালেই মেঘের কলিজা শুকিয়ে যায়। আতঙ্কে মেঘের হাঁটার গতি কমে গেছে, বার বার আকাশের পানে তাকাচ্ছে আর আর আস্তে আস্তে হাঁটছে। আবির বেশ কিছুক্ষণ যাবৎ মেঘের হাবভাব পর্যবেক্ষণ করে শুধালো, “কোনো সমস্যা? ” মেঘ কাঁদো কাঁদো মুখ করে বলল, “আপনি গাড়িটা নিয়ে আসেন নি কেন? আমার ভয় লাগতাছে। রাস্তায় একটা রিক্সাও নেই এখন কিভাবে বাসায় যাব?” আবিরের নির্লিপ্ত জবাব এলো, “আমি ভেবেছিলাম তুই অনেক সাহসী মেয়ে।” মেঘ ঠান্ডা কণ্ঠে বলল, ” আমি দিনের বেলা সাহসী কিন্তু রাতের বেলা ভিষণ ভীতু। ” আবির শান্ত চোখে চেয়ে মনে মনে কিছু একটা ভেবে মৃদু হাসলো। মেঘের সেদিকে মনোযোগ নেই, একবার বিদুৎ চমকাচ্ছে আর মেঘের গা কেঁপে উঠছে। আবির উদাসীন কণ্ঠে শুধালো, “আমি কাছে থাকা স্বত্তেও তুই এত ভয় পাচ্ছিস? তাহলে আমি থেকে কি লাভ হলো?” মেঘ নিশ্চুপ। ফুটপাত দিয়ে হাঁটছে দুজন, কারো মুখেই কোনো শব্দ নেই। আবির কিছু বলতে চেয়েও বার বার ঢোক গিলে কথা গিলছে । বৃষ্টিস্নাত পথে প্রেয়সীর হাতে হাত রেখে বুকের বাম

প্রকোষ্ঠে লুকায়িত কথাগুলো বলার সুপ্ত ইচ্ছে আবিরের মনে ঘুরপাক খাচ্ছে। কিন্তু অদ্ভুত এক দেয়াল বার বার আঁটকে দিচ্ছে আবিরকে। পরিবার নামক বেড়াজালে আবির আবদ্ধ হয়ে আছে, মেঘ আবিরকে ভালোবাসে, অনেক বেশিই ভালোবাসে কিন্তু আবিরকে পাওয়ার জন্য আদোও কি মেঘ পরিবারের সামনে দাঁড়াতে পারবে? যেখানে আবির নিজেই বাড়ির সবার মুখোমুখি হওয়ার জন্য নিজেকে যোগ্য ভাবতে পারছে না সেখানে মেঘ তো কিছুই না। ক্ষণে ক্ষণে বৃষ্টি বাড়ছে, সেই সাথে বিদ্যুৎ চমকানোর মাত্রাও বেড়েছে। দুজনেই কাকভেজা হয়ে গেছে, আবিরের পড়নে নেভিব্লু রঙের শার্টটা ভিজে গায়ের সঙ্গে একবারে লেপ্টে গেছে। ফোন আর ওয়ালেট টা ফুপ্পির বাসা থেকেই পলিথিনে পেঁচিয়ে নিয়ে আসছিলো। মেঘ আজ থ্রিপিস পড়েছিল, চুলে খোঁপা করে মাথায় ওড়না দিয়েছিল কিন্তু বৃষ্টিতে ভিজে নাজেহাল অবস্থা হয়ে গেছে। সরু রাস্তায় বড় বড় কদম ফেলায় আবির মেঘের থেকে কিছুটা এগিয়ে গেছে। প্রবল বৃষ্টিতে মেঘ হাঁটতেই পারছে না। আবির সামনে থেকে মেঘের দিকে তাকালেই মেঘ তেজঃপূর্ণ কণ্ঠে বলে উঠল, “আপনি আমায় ফেলে চলে যাচ্ছেন কেন? দেখছেন না আমি ভয় পাচ্ছি? ” আবিরের পদযুগল থমকে গেছে, একপলক সামনে তাকালো পুনরায় আড়চোখে চেয়ে গুরুগম্ভীর কণ্ঠে বলে উঠল, “কোলে নিতে হবে?” মেঘ শশব্যস্ত হয়ে আবিরের দিকে তাকালো। সহসা মনে পড়ে গেছে আবিরের সঙ্গে কোনো এক বিকেলে বৃষ্টিতে ভেজার ঘটনা। সেদিন হোঁচট খাওয়ার পরপর আবিরের কোলে তোলার ঘটনা মনে

পড়তেই মেঘ থতমত খেয়ে বলল, ‘নাহ নাহ, আপনি শুধু আমার কাছাকাছি থাকুন। ” আবির নিজের হাত বাড়ালো, মেঘ একহাতে আবিরের হাতটা ধরার চেষ্টা করল, কিন্তু মেঘের ছোট্ট হাত আবিরের মোটা হাতকে ঠিকমতো ধরতে না পেরে সহসা দু’হাতে আবিরের বাহু চেপে ধরেছে। আবির চাপা স্বরে বলল, ” মুরগির কলিজা নিয়ে রাতে ঘুমাস কিভাবে তুই?” মেঘ ঠোঁট উল্টিয়ে আবিরের দিকে তাকাতেই আবারও বিদ্যুৎ চমকালো, মেঘ ভয়ে দুহাতে আবিরের বাহু আরও শক্ত করে ধরেছে। আবিরের নিজের অন্য হাত মেঘের হাতের উপর রেখে কোমল কণ্ঠে বলল, “ভয় পাইস না, আমি আছি তো!” আবিরের স্পর্শ সেইসঙ্গে মোলায়েম কণ্ঠে বলা ছোট্ট একটা কথাতেই মেঘের মন থেকে ভয় ডর সব একেবারে চলে গেছে। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে আকাশের পানে চেয়ে মুচকি হেসে বলল, ” আমার আবির ভাই আমার পাশে থাকলে আর কিচ্ছু চাই না। যদি আজ আমার মৃ*ত্যুও হয় তবে যেন আবির ভাইয়ের বুকে মাথা রেখে ম*রতে পারি। ” আস্তে আস্তে মেঘের ভ*য় অনেকটায় কে*টে গেছে। আবিরের হাঁটার সাথে তাল মিলিয়ে মেঘও নিজের মতো হাঁটছে। তবে আবিরের হাত একবারের জন্যও ছাড়ছে না।মেঘ আর আবির ফুপ্পিদের বিষয়ে টুকিটাকি কথা বলছে। এতবছর আবিরকে নিয়ে তেমন মাথা না ঘামালেও এখন আবিরের ব্যাপারে মেঘের খুব চিন্তা। মেঘ আচমকা প্রশ্ন করে বসল, “আবির ভাই, আপনি কি এখনও সি*গারে*ট খান?” আবির ভ্রু গুটিয়ে বলল, “নাহ। কেনো?” “সত্যি করে বলুন, আপনি কবে থেকে

সি*গারে*ট খাওয়া শুরু করেছিলেন আর কবে শেষ করেছেন? নাকি এখনও খান?” রোমান্টিক আবহাওয়ায় মেঘের এমন প্রশ্ন আবিরের কাটা গায়ে নুনের ছিটার মতো লাগছে। আবির কড়া গলায় বলল, ” এখন এসব প্রশ্ন করার সময়?” মেঘ গাল ফুলিয়ে চোখ নামিয়ে ধীর কণ্ঠে বলল, “তারমানে আপনি এখনও সি*গা*রেট খান?” আবির বিরক্ত হয়ে মেঘের দিকে তাকালো পরপর এদিক সেদিক তাকিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে বলল, ” আমি মিথ্যা কথা বলি না মেঘ, তারপরও যদি তোর আমাকে বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় তাহলে আমার কিছুই বলার নেই। ” মেঘ হতবাক হয়ে গেছে। আবিরকে ইদানীং কিছু বললেই ছ্যাত করে উঠে। বিশেষ করে বিশ্বাস নিয়ে কথা বললে তো উপায় ই নেই। মেঘ মনোযোগ দিয়ে কতক্ষণ আবিরকে দেখে প্রশ্ন করল, “কি হয়েছে আপনার? এভাবে কথা বলছেন কেন?” আবির জোর গলায় বলা শুরু করল, ” আমি কখনো কারো বিশ্বাস ভঙ্গ করি নি। তোর তো নয় ই। সি*গা*রেট আমার নে*শা না, যখন কোনো বিষয়ে খুব বেশি রে*গে থাকি, দিশাবিশা পায় না তখন একটু আধটু সিগা*রেট খেতাম এটুকুই । তারপরও এত বছরে হাতে গুনা কয়েকটা সি*গারেট ই খেয়েছি। এসব এখন অতীত। সি*গারেট ছেড়েছি বহুদিন হলো, ছোঁয় ও না পর্যন্ত। সেদিনের পর তুই কোনোদিন আমার হাতে সিগা*রেট দেখেছিস? রুমে পেয়েছিস? নাকি আমার গায়ে সি*গারেটের গন্ধ পেয়েছিস? তবুও কেন এত অবিশ্বাস? তোর সন্দেহের তালিকায় কেনো সবসময় আমার নামটায় থাকে? এখনও

এই মানুষটাকে একেবারে বিশ্বাস করা যায় না? ” আবির একরাশ হতাশা নিয়ে কথাগুলো বলেছে। শেষ প্রশ্ন গুলো বলার সময় আবিরের গলা কাঁপছিল । অজানা এক ক্রোধে আবির আবার দগদগে স্বরে বলল, “তানভির কে কল দিয়ে তোকে নিয়ে যেতে বলি।” মেঘ আর্তনাদ করে উঠল, “কেনো?” “আর যাই হোক, আবির কখনো কাউকে জোর করবে না অন্ততপক্ষে তাকে বিশ্বাস করতে তো নয় ই। আমার সত্যিই গাড়িটা নিয়ে আসা উচিত ছিল। ” মেঘ মায়াবী দৃষ্টিতে চেয়ে শীতল কণ্ঠে বলল, “আপনি এভাবে কথা বলছেন কেন? আমি আপনাকে বিশ্বাস করি, অনেক বেশি বিশ্বাস করি। সত্যি বলছি। ভাইয়াকে কল দিবেন না, প্লিজ। আমি আপনার সাথেই যাব। ” আবির উদাসীন কণ্ঠে বলল, ” যেখানে তুই ই আমাকে বিশ্বাস করতে পারিস না সেখানে তোর বাবা মায়ের চোখে তো আমি মস্ত বড় অপরাধী হয়ে যাব। তোর জ্বর হলে কেউ আমায় ছেড়ে কথা বলবে না। ” আবির দু পা এগুতেই,মেঘ এক হাতে আবিরের আঙুল ধরার চেষ্টা করে কিন্তু আবির আঙুল ছাড়িয়ে এগিয়ে যেতেই মেঘ তড়িঘড়ি করে আবিরের সামনে গিয়ে সরাসরি আবিরের শার্ট আঁকড়ে ধরে সাফাই দেয়ার মতো করে আকুল কণ্ঠে বলে উঠল, ” আমি আর কোনোদিন আপনাকে এমন কথা বলব না, আপনাক কখনও অবিশ্বাস করব না। আপনি যা বলবেন, যে অবস্থাতেই বলবেন আমি সাথে সাথে বিশ্বাস করে ফেলবো। প্লিজ আপনি রাগ করবেন না, প্লিজ। আমি কানে ধরছি....” এতক্ষণ আবির শক্ত থাকলেও মেঘের শেষ বাক্যে আবির তৎক্ষনাৎ

মেঘের হাত চেপে ধরলো। মেঘের হাত তখনও আবিরের বুকেই ছিল, সবেমাত্র কানে ধরার জন্য হাত তুলতে যাচ্ছিলো। তার আগেই আবির আঁটকে দিয়েছে। আবিরের রাগ মুহুর্তেই দমে গেল। ভারী কণ্ঠে বলল, " অতি সামান্য কারণে আবির কাউকে এত বড় শাস্তি দিবে না!" মেঘ ফের বলে উঠল, "আপনি রাগ করলে আমার খুব ভয় হয়.." আবির অনুচিন্তন মনে শুধালো, "কিসের ভয়?" মেঘ বিড়বিড় করে বলল, "আপনাকে হারানোর। " ঝুম বৃষ্টিতে মেঘের বিড়বিড় করে বলা কথাটা আবির ঠিকমতো বুঝতে পারে নি। সিউর হতে আবির পুনরায় শুধালো, " কি বললি?" মেঘ কিছু না বলে আবিরের উপর মাথা ঠেকালো। অনেকক্ষণ যাবৎ বৃষ্টিতে ভেজার কারণে মেঘের শরীর ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে অকস্মাৎ ভয়ে আবিরের বুক কাঁপছে, মেঘের শরীর যদি আবার খারাপ হয়! আবির তড়িঘড়ি করে বলল, "শরীর খারাপ লাগছে?" মেঘ সহসা আবিরের থেকে দূরে সরে দাঁড়ালো। প্রিয় মানুষের সাহচর্য পেলে মানুষ সব ভুলে যায়। মেঘের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। ঘোরের মধ্যে কখন যে আবিরের বুকে মাথা রেখেছে সেটা খেয়াল ই করে নি। আবির ডাকতেই মেঘের ঘোর কেটে গেছে। লজ্জায় মাথা নিচু করে সামনে এগিয়ে যাচ্ছে। আবির পিছু পিছু ডাকছে, কিন্তু মেঘ তাকাতেই পারছে না। আবির এগিয়ে গিয়ে মেঘের মাথার কিছুটা উপরে দুহাত রাখলো। যেন সরাসরি বৃষ্টির পানি মেঘের মাথায় না পড়ে। মেঘ চোখ তুলে তাকিয়ে দেখল একবার, পুনরায় লজ্জায় চোখ নামিয়ে নিল। আবির ভাই মানুষটা কেমন জানি, এই রাগ

করেন,এই আবার ভালোবাসার চাদরে মুড়িয়ে নেন। ওনার মন বুঝার সাধ্যি পৃথিবীর কারোর নেই। কিছুটা এগুতেই মেঘ চা খাওয়ার জন্য বায়না ধরেছে অথচ আবির খোঁজছে মেডিকেল শপ। নিজের ইচ্ছেকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে অসময়ে মেঘকে নিয়ে বৃষ্টিতে ভিজে এখন নিজেই টেনশন করছে। মেঘের সেদিকে খেয়াল নেই, সে নিজের মতো ঘুরছে আর চায়ের দোকান খোঁজছে । জীবনে প্রথমবার গভীর রাতে বৃষ্টিতে ভিজছে, মেঘের মন এমনিতেই খুব উতলা হয়ে আছে তারউপর সাথে আবির ভাই। বাসার সব চিন্তা ভুলে বৃষ্টি উপভোগ করছে আর আবিরের সঙ্গে খুনসুটিতে মেতে আছে। অবশেষে একটা চায়ের দোকানে মেঘকে বসিয়ে আবির পকেট থেকে ফোন আর ওয়ালেট বের করছে। উপরে টিনের চালে টুপটাপ বৃষ্টির ফোঁটা পড়ছে। মেঘ আপনমনে বসা থেকে সেই চালের দিকে চেয়ে আছে। টিনের চালের মাতাল করা শব্দে মেঘের ভাবনারা ছন্নছাড়া হয়ে যাচ্ছে। মেঘ আবিরের দিকে তাকাতেই আবির বলে উঠল, " বৃষ্টির শব্দটা ভালো লাগছে?" "হ্যাঁ! আগে বর্ষাকালে নানা বাড়ি গেলে এই শব্দটা শুনতাম, অনেক ভালো লাগতো। কতবছর পর আবার শুনছি। " আবির প্রশ্ন করল, "লাল চা খাবি নাকি দুধ চা?" "লাল চা খাব।" "ঠিক আছে ম্যাম।" আবির চলে গেল। হঠাৎ ই মেঘের কানে আবিরের কণ্ঠ বেজে উঠলো, "মামা, আপনি বসুন। চা আমি বানাচ্ছি।" মেঘ আঁতকে উঠে পিছনে ঘুরলো। সত্যি সত্যি আবির চা বানাচ্ছে । মেঘ তৎক্ষনাৎ বসা থেকে উঠে দাঁড়ালো। ভেতরে থাকা হৃদপিণ্ড ছুটছে দিগবিদিক, ঠোঁটে

ফুটে উঠেছে প্রশান্তির হাসি। অকস্মাৎ মনে দুশ্চিন্তারাও ভর করেছে, নিজের অজান্তেই বলে উঠল, " এত সুখ আমার কপালে সইবে তো?" সঙ্গে সঙ্গে মেঘ নিজের মাথায় গাট্টা মেরে বলল, "কি সব বাজে কথা ভাবছিস!" আবির দুকাপ চা নিয়ে এগিয়ে আসলো। আদা, লেবু দিয়ে দুকাপ চা নিয়ে আসছে। আবিরকে দেখে মেঘ পুনরায় চেয়ারে বসলো। মেঘকে এককাপ চা দিয়ে আবির পাশের চেয়ারে বসে চায়ে চুমুক দিল। মেঘ একচুমুক চা খেয়ে মেঘ মুগ্ধ হয়ে আবিরের পানে চেয়ে জিজ্ঞেস করল, "আপনি আর ঠিক কি কি পারেন একটু বলবেন?" আবির নির্বিকার ভঙ্গিতে বলল, " বলতে পারবো না, তবে প্র্যাক্টিকেললি সব পারবো।" "বাহ! বড় আব্বু আর বড় আম্মুর একমাত্র ভদ্র ছেলে। আপনি ছেলে হয়ে যা পারেন আমি মেয়ে হয়েও তা পারি না।" আবির উদগ্রীব হয়ে বলল, "আমি কখনোই ভদ্র ছেলে ছিলাম না। আমি এক নাম্বারে অসভ্য আর অভদ্র একটা ছেলে। তাছাড়া তোকে কাজ শিখতে বলেছে কেউ? তোর যখন যা লাগবে শুধু অর্ডার করবি!" মেঘ প্রশ্ন করল, " আপনি অভদ্র এটা কে বলছে? " "তোর আব্বু। " মেঘ হেসে বলল, " আব্বুর চোখে দুনিয়ার সব ছেলেরায় অভদ্র। দেখবেন দুদিন পর থেকে আদিকেও এভাবেই কথা শুনাবে।" আবিরও মলিন হাসলো। নিষ্ঠুর এই পৃথিবীতে সবার প্রিয় হয়ে উঠা কারো পক্ষেই সম্ভব না। তবে আবিরের প্রচেষ্টা শুধুমাত্র নিজেকে প্রমাণ করা। আবির অভদ্র নয় তবে অসভ্য তো বটেই। মেঘকে কাছে পেলে আরও বেশি অসভ্য হয়ে যায়। এজন্য মেঘের দিকে ঠিকমতো

তাকাচ্ছেই না। আবির ফোন চেক করতেই দেখলো মোট ১৭ টা কল আসছে। বাসা থেকে ৮ টা কল আসছে, তানভিরও ৪-৫ বার কল দিয়েছে, ফুপ্পি, রাকিব ও কয়েকবার কল দিয়েছে। এখন ফোন দিলেই যে যার মতো কথা শুনাবে তারপর আবার মন খারাপ হবে সেই ভেবে কাউকেই কল ব্যাক করে নি। রাস্তায় একটা মেডিকেল শপ থেকে মেঘকে ঔষধ কিনে খাইয়েছে যাতে জ্বর না আসে। আবির আশেপাশে রিক্সা খোঁজছে, বাসার মানুষের থেকেও বেশি টেনশন হচ্ছে মেঘকে নিয়ে। কারণ মেঘকে সামাল দেয়ার মতো মানসিক অবস্থা আবিরের নেই। বৃষ্টির পানিতে চিকচিক করা মেঘের দু গাল, গোলাপের ভেজা পাপড়ির মতো লাল টকটকে দুই ঠোঁটে তাকানো মাত্রই আবিরের বুকে কম্পন অনুভব করে সঙ্গে সঙ্গে চোখ সরিয়ে নেয়। কিন্তু মেঘ নিজের মতো করে কথা বলছে, হুটহাট আজগুবি প্রশ্ন করতে শুরু করে যে প্রশ্নের উত্তর দেয়ার মতো পরিস্থিতি আবিরের নেই। তাই মেঘকে নিয়ে তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরতে চাচ্ছে। একটা ফুলের দোকান দেখে মেঘ বলে উঠল, “আবির ভাই, আমাকে একটা গোলাপ ফুল কিনে দিবেন?” “নাহ।” “কেনো?” ” গোলাপ ব্যতীত অন্য কোনো ফুল নে। ” “লাল গোলাপ গুলো খুব সুন্দর লাগছে। একটা নেয়?” “বললাম তো নাহ।” মেঘ মন খারাপ করে দুটা বেলীফুলের মালা নিয়েছে। আবির টাকা দিয়ে বেড়িয়ে এসে বলল, “দে পড়িয়ে দেই। ” “প্রয়োজন নেই।” “কেন?” “কারণ এগুলো মীমের জন্য নিয়েছি।” “ওয়েট আরও কয়েকটা নিয়ে আসি। ” “লাগবে না। আমার জন্য

আনলে লাল গোলাপ নিয়ে আসুন।” আবির গম্ভীর কণ্ঠে বলল, “চল সামনে যায়, সামনে হয়তো রিক্সা পাবো।” মেঘ উষ্ণ স্বরে বলল, “তবুও গোলাপ দিবেন না?” “নাহ।” মেঘ রাগে ফোঁসতে ফোঁসতে চলে যাচ্ছে। বৃষ্টি কমে এসেছে। তবে গাছ থেকে এখনও টুপটুপ করে পানি পড়ছে। আবির মেঘের গমনপথে চেয়ে ভারী কণ্ঠে বলল, “যেই ফুল তোকে অন্য কোনো ছেলে দিতে চেয়েছিল, সেই ফুল আমার চোখে বিষের মতো। আবির সেই বিষ ছুঁবে না। ” এদিকে তানভির বাসার কাছে গাছের নিচে বাইকে বসে আছে আর ওদের জন্য অপেক্ষা করছে। বৃষ্টি কমাতে আবিরকে কয়েকবার কল পর্যন্ত দিয়েছে কিন্তু আবির ফোন ই ধরছে না। হঠাৎ বন্যার কথা ভেবে কল দিল বন্যার নাম্বারে। অনেকদিন পর বন্যার ফোনে কল ঢুকছে। প্রথমবার রিসিভ হলো না। দ্বিতীয় বার রিসিভ করার সঙ্গে সঙ্গে বন্যা প্রশ্ন করল, “হ্যালো কে?” তানভির কপাল গুটিয়ে বলল, “বাহ! এত অপরিচিত হয়ে গেলাম?” বন্যা তৎক্ষনাৎ বলে উঠল, “আসসালামু আলাইকুম” “ওয়ালাইকুম আসসালাম।” “সরি তানভির ভাই। নতুন ফোন তাই নাম্বার টা সেইভ ছিল না। ” “ওহ আচ্ছা। ফোন কবে কিনলা?” “আজকেই কিনেছি। আপনি কি বাহিরে?” “হ্যাঁ। কেনো?” “বৃষ্টি, বাতাস এসবের শব্দ হচ্ছে মনে হয় ।” “ওহ আচ্ছা। গাছতলায় বসে আছি তাই এমন শব্দ হচ্ছে। ” “গাছতলায় কেন?” “এমনিতেই একটু কাজ ছিল। রাতে খেয়েছো?” “জ্বি। আপনি?” “হ্যাঁ ফুপ্পিদের বাসায় খেয়ে আসলাম।” “ফুপ্পিরা কেমন আছেন?” “আলহামদুলিল্লাহ

ভালো।” “আচ্ছা ভালো থাকুন, রাখি এখন।” “কেনো?” “ঘুমাবো।” “আচ্ছা ঘুমাও। ” তানভিরের কথা শেষ হওয়া মাত্রই আবির আর মেঘ আসছে। যথারীতি তিন জনেই কাকভেজা হয়ে বাসায় ফিরেছে। রাত ১১ টার উপরে বেজে গেছে, অথচ তিন ভাই ই সোফায় বসে আছে। কাঠগড়ায় মেঘ,আবির আর তানভির। মেঘ হাঁচি দিতেই আবির মাথা নিচু করে কপাল গুটিয়ে চোখ বন্ধ করে দাঁতে দাঁত চেপে ধরেছে। আজ একটা ঘূর্ণিঝড় হতে চলেছে যার সূচনা মেঘের একটা হাঁচিই করে দিল। আবির মাথা নিচু করে মেঘকে আস্তে করে বলল, “রুমে যা। ” মেঘ কোনোদিকে না তাকিয়ে ভেজা জামা নিয়েই নিজের রুমে দিকে ছুটছে। ড্রয়িং রুম, সিঁড়ি সব ভিজে গেছে। আলী আহমদ খান মেঘের দিকে একবার তাকিয়ে পুনরায় আবিরদের দেখলো। গম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন করল, “তোমাদের এই অবস্থা কেন?” আবির সাফাই দেয়ার স্বরে বলল, “আপনিই বলেছেন বাইক যেন না চালাই। আর রাস্তায় রিক্সা পায় নি।” “গাড়ি নাও নি কেন?” “ফুপ্পিদের বাসা পর্যন্ত গাড়ি ঢুকবে কি না সিউর ছিলাম না। ” “বাসা পর্যন্ত না যাক রাস্তা পর্যন্ত তো যেতো?” “রাস্তায় রাখবো, তারপর কোনো এক্সিডেন্ট হলে আই মিন চু*রি হলে গাড়ির দায় কে নিবে? আমি?” আলী আহমদ খান ভারী কণ্ঠে বললেন, “তুমি না নিলে তোমার বাপেই না হয় দায় নিতো। যত যাই হোক গাড়ি টা তো তোমার বাপের ই। ” আবির মৃদু হেসে বলল, ” আমার জন্য কাউকে কোনো দায় নিতে হবে না। আর আমিও অযথা কোনো দায় নিতে চাই না। ” মোজাম্মেল খান এবার

চেঁচিয়ে উঠলেন, ” তোমাদের ঘাড়ত্যাড়ামির জন্য আমার মেয়েটাকে কেন ভিজিয়েছো? ওর কিছু হলে! ” আবির রাশভারি কণ্ঠে বলল, “আপনার মেয়ের কিছু না হলেই তো হলো! ” এতরাতে এখানে কথা বাড়ালে ঝামেলা হবে ভেবেই মোজাম্মেল খান হুঙ্কার দিয়ে সোফা ছেড়ে উঠে চলে গেছেন। ইকবাল খান ও নিজের রুমে চলে গেছেন। আলী আহমদ খান কাজের মহিলাকে ডেকে ফ্লোর মুছার কথা বলে নিজেও ভেতরে চলে গেছেন। আবির ভেতরে ভেতরে ফুঁসছে। রুমে গিয়ে রাগে বিছানার উপর ফোন ছুঁড়ে ফেলে সোজা ওয়াশরুমে চলে গেছে। আবিরের রাগের একমাত্র কারণ সে নিজেই। আবির শাওয়ার নিয়ে আবার রান্নাঘরে এসে মেঘের জন্য স্যুপ আর কফি করে নিয়ে গেছে। মেঘকে ডাকতেই মেঘ দরজা খুলে স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, “ভেতরে আসুন ” আবির গুরুতর কণ্ঠে বলল, “নাহ থাক, কখন আবার চেঁচিয়ে তোর আব্বুকে ডাকবি। ” মেঘ আহাম্মকের মতো তাকিয়ে থেকে খাবার গুলো নিলো। আবির সঙ্গে সঙ্গে চলে গেছে। তানভির ফ্রেশ হয়ে আবিরের রুমে আসছে। মূলত মিনহাজদের ব্যাপারে কথা বলতেই এসেছে। আবিরের এক্সিডেন্টের পর থেকে মেঘের মতো আবিরও ওদের ব্যাপারে মাথা ঘামায় না। তানভিরকে প্রথম এক দুবার জিজ্ঞেস করলেও এরপর থেকে একবারের জন্যও তাদের কথা জিজ্ঞেস করে নি। তানভির আজ নিজ থেকেই কথা বলতে আসছে। আজ শুক্রবার। ফুপ্পির বাসাতে আজকে সবার দাওয়াত। নামাজ পড়েই সবাই রওনা দিয়েছে। আবির, তানভিররা, মেঘ, মীম,আদি ইকবাল খানের গাড়িতে

যাচ্ছে। বাকিরা আলী আহমদ খানের গাড়িতে। আরিফ আর আসিফ দুজনেই গলির মোড় থেকে ওনাদের এগিয়ে নিয়ে গেছে। মীম আরিফকে দেখেই বড় করে ভেঙছি কাটলো। আত্মীয়তার সম্পর্কের খাতিরে আরিফ মৃদুভাবে হাসলো। মেঘ মীমকে সারাদিন সামলে রেখেছে, যেন কোনোভাবেই কোনো অঘটন না ঘটায়। খাওয়া দাওয়ার পর্ব শেষ করে বিকেলের দিকে বাসার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছে ।
আগামী পরশু থেকে রমজান শুরু তাই ফুপ্পির জোরাজোরিতে আজই সবাইকে আসতে হলো। ফুপ্পির সাথে সবার ই খুব ফরমাল সম্পর্ক। আবিররা ফুপ্পিকে যতটা আপন করে নিয়েছে বড় ঠিক ততটা পারছে না। মাঝরাতে হঠাৎ ই আবিরের ফোনে কল বাজতেছে। আবির ঘুমের ঘোরে প্রথমে কেটে দিয়েছে। খানিকক্ষণ বাদে আবারও ফোনে কল বাজতেছে। আবির কল রিসিভ করে অর্ধ ঘুমন্ত অবস্থায় জিজ্ঞেস করল, “কে?” “পে*ত্নী।”আবির ঘুমের ঘোরেই মুচকি হাসলো। ঠোঁটের কোণে হাসি রেখে বিমোহিত কণ্ঠে জানতে চাইল, “আবির কি কোনো অন্যায় করেছে? তা না হলে, মাঝরাতে পরীর বদলে পে*ত্নী কেন কল দিবে আমায়?” “হ্যাঁ। আপনি মস্ত বড় অ*পরা*ধ করেছেন।”
আবিরের চোখ বন্ধ, এখনও ঘুমের রেশ লেগে আছে চোখে মুখে। আধঘুমে থেকেই আবির পুনরায় প্রশ্ন করল, ” সর্বনাশ! অপ*রা*ধ টা কি বলা যাবে?” মেঘ নিচু কণ্ঠে বলল, “আপনি আমার প্রথম কল টা ধরলেন না কেন?” আবির চোখ মেলে ফোনের দিকে তাকালো। তড়িঘড়ি করে কল লিস্ট চেক করল। ঘুমের ঘোরে কল কাটার ঘটনা

মনে পড়তেই মাথা চুলকে ঠান্ডা কণ্ঠে বলল, “Ops! Sorry. ঘুমের মধ্যে কিভাবে বুঝবো যে আপনি কল দিয়েছেন? সরি ” সদ্য ঘুম থেকে উঠা আবিরের ভাঙ্গা ভাঙ্গা কণ্ঠ শুনে মেঘের হৃৎস্পন্দন বেড়ে গেছে। মনে হচ্ছে কি যেন হৃদ*য়ে ছু*রি*র ন্যা*য় তোলপাড় চালাচ্ছে। সবকিছু যেন মুহুর্তেই ত*ছনছ করে দিবে। মেঘ বুকের বাম প্রকোষ্ঠে হাত রেখে নিজেকে সংযত করে ধীরস্থির কণ্ঠে প্রশ্ন করে, “সেহরি খাবেন না? উঠুন। ” আবির নীরস গলায় বলল, “না খেয়ে কত রমজান কাটিয়েছি! এখন না খেয়ে রোজা রাখা অভ্যাস হয়ে গেছে। ” মেঘ শক্ত কণ্ঠে বলল, ” না খেয়ে থাকতেন কেন? ” “তখন তো আর কেউ কল দিয়ে জাগিয়ে দিত না আমায়।” মেঘ চাপা স্বরে বলে উঠল, ” এখন যেহেতু জাগিয়ে দিচ্ছে, তারমানে বুঝতে হবে অভ্যাস পরিবর্তন করার সময় হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি ওঠেন, আমি রাখছি। ” আবির তপ্ত স্বরে ডাকল, “মেঘ...” “জ্বি। ” ” নিজেকে সবকিছুতে জড়িয়ে রাখিস। কোনো একটাকে কেন্দ্র করে চললে পরবর্তীতে তার ব্যথাটা সহ্য করতে পারবি না। ” মেঘ কপাল গুটিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে শুধালো, “রাত-বিরেতে এসব কি কথা বলছেন? উঠবেন নাকি উঠবেন না বলুন? ” “আরে বাবা এখনি উঠতেছি। হাত মুখটা ধৌয়ে আসছি। ” “ওকে।” মেঘ কল কেটে তাড়াতাড়ি নিচে আসছে। ততক্ষণে টেবিলে খাবার রেডি। প্রথম রোজা বলে আজ আদিও উঠেছে। আবির হাত মুখ ধৌয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই নিচে আসছে, আসার সময় তানভিরকেও ডেকে নিয়ে আসছে। মেঘের বিপরীতে

বসতে বসতে আবির অল্প করে ভ্রু নাচালো । মেঘ অপ্রখর হেসে চিবুক নামিয়ে নিল। খাওয়া শেষে যে যার মতো রুমে চলে গেছে। আবির নামাজে যাওয়ার জন্য রেডি হচ্ছে। মেঘ রেস্ট নেয়ার জন্য একটু শুয়েছে। বন্যাকে নেটে দেখে সঙ্গে সঙ্গে কল দিল। বন্যা কল রিসিভ করামাত্র মেঘ বলে উঠল, "আসসালামু আলাইকুম। সেহরি খেয়েছো জানু? " "মাত্রই খেয়ে আসলাম। তুমি খেয়েছো বেবি?" "হ্যাঁ খেয়েছি। এখন রেস্ট নিচ্ছি।" বন্যা ঠাট্টার স্বরে বলল, " সাবধান, রোজা রমজানের দিন। দিনের বেলা মন কে সংযত রাখিস। আবির ভাইয়াকে ঢ্যাবঢ্যাব করে দেখিস না আর ওনাকে নিয়ে বেশি ভাবিসও না। " মেঘ স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, "ওনাকে দেখব কিভাবে? ওনি সারাদিন অফিসেই থাকবেন। আচ্ছা একটা কথা বলবি?" "কি? " "আমি যদি রোজা রেখে পাঞ্জাবি বা টিশার্ট পেইন্ট করি তাহলে কি আমার রোজা হালকা হয়ে যাবে?" বন্যা হাসতে হাসতে বলল, "হ্যাঁ হয়ে যাবে কারণ তুই রঙ করতে করতে আবির ভাইয়ার কথা ভাববি। তাই দিনের বেলা জামা কাপড়ের দিকে ভুলেও তাকাবি না। বুঝলি?" "আচ্ছা ঠিক আছে। নামাজের সময় হয়ে যাচ্ছে। রাখছি। " বন্যা কল কাটতেই দেখল তানভিরের আইডি থেকে মেসেজ আসছে। ছোট করে লেখা, "সেহরি খেয়েছো?" বন্যা উত্তর দিল, "জ্বি, আলহামদুলিল্লাহ। আপনি খেয়েছেন?" "হ্যাঁ। " কোনো পাশ থেকেই আর কোনো মেসেজ আসলো না। তানভির ২-৩ বার কিছু লিখেও বার বার মুছে দিয়েছে। কিছু একটা বললে সেই মেসেজ মেঘকে দেখালে বোনের নজরে

তানভির ছোট হয়ে যাবে সেসব ভেবেই তানভির কিছু লিখতে পারছে না। প্রায় ৫ মিনিট পর বন্যার আইডি থেকে মেসেজ আসলো, “গুড নাইট। ” তানভির মলিন হেসে লিখল, “গুড নাইট & টেইক কেয়ার। ” সকালে মেঘের ঘুম ভাঙার আগেই আবির অফিসে চলে গেছে। বাড়ি সম্পূর্ণ নিরব। মেঘ একে একে সবার রুমেই চক্কর দিয়ে আসছে। মীম আর আদি টিউশনে গেছে, তানভির, আবির, আলী আহমদ খানরা কেউ বাসায় নেই। বাড়ির তিন কর্তী নিজেদের রুমে কুরআন শরীফ পড়ছেন। মেঘ ঘুরে ফিরে নিজের রুমে এসে শাওয়ার নিয়ে ওজু করে সেও কুরআন শরীফ পড়তে বসেছে। ইফতারের আগমুহূর্তে আবিররা বাসায় ফিরেছে। প্রথম রোজা তাই মালিহা খান বার বার সবাইকে বলে দিয়েছিলেন যেন ইফতারের আগেই চলে আসে। মেঘ শরবত বানাচ্ছে, মীম মেঘকে সাহায্য করছে। আর আদি দুপুর থেকেই সোফায় পরে আছে। ১০ মিনিট পর পর জিজ্ঞেস করে, “মেঘাপু, আর কতক্ষণ? ” “আপু আর কতক্ষণ পরে আজান দিবে?” মেঘ আর মীম আদি কে বুঝিয়ে রাখতে রাখতে নিজেরাই ক্লান্ত হয়ে গেছে। আদি এইযে শোফায় শুয়েছিল আর উঠতেই পারছে না। আবির ইফতারের আগে আগে এসে আদিকে কোলে করে চেয়ারে নিয়ে বসিয়েছে। চেয়ারে বসেও আদি হেলে পড়ে যাচ্ছে । আদির অবস্থা দেখা মীম মিটিমিটি হাসছে। আলী আহমদ খান ভারী কণ্ঠে বললেন, “এভাবে হেসো না, এমন দিন সবাই পার করে আসছে। ” সঙ্গে সঙ্গে মীমের হাসি থেমে গেছে। চুপচাপ ইফতার করতে বসে পরেছে। মেঘ

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শরবতে একটু পর পর চিনি দিচ্ছে। প্রথমবারের মতো শরবত বানানোর দায়িত্ব মেঘ নিয়েছে। যদি ঠিকঠাক না হয় তাহলে বাড়ির সবার সামনে নাক কাটা যাবে। এজন্য আরও বেশি ভয় পাচ্ছে। আবারও চিনি দিতে যাবে তখনই আবির মৃদু স্বরে বলল, "আর কত চিনি দিবি! থাম এবার। তোর চিনি দেয়া দেখে একদিনেই সবার ডায়াবেটিস হয়ে যাবে। " মেঘ কপাল গুটিয়ে তাকালো কিন্তু কিছু বলল না। তানভির বলে উঠল, "প্রথম বার শরবত বানাচ্ছে তাই এই অবস্থা। সপ্তাহ খানেক বানালেই অভ্যাস হয়ে যাবে। " আকলিমা খান রান্নাঘর থেকে আসতে আসতে প্রশ্ন করলেন, " তানভির, সবসময় তো তুমিই শরবত বানাও। এবার দায়িত্ব মেঘকে দিয়েছো কেনো?" তানভির মুচকি হেসে বলল, " সবসময় আমার শরবত খেয়েছো এবার আমার বোনের হাতের শরবত খাবে। সমস্যা কি?এই রমজান যেমন স্পেশাল তেমন শরবত টাও স্পেশাল হবে।" "রমজান স্পেশাল কেন?" "বাহ রে! কতবছর পর ভাইয়ার সাথে রমজান পালন করছি। তাছাড়া আমাদের ফুপ্পিকে পেয়েছি। স্পেশাল হবে না?" "হ্যাঁ, অবশ্যই। " ব্যস্ততার মধ্যেই রমজান কাটছে সবার। ঈদের ছুটির জন্য বেশিরভাগ কাজ আগেভাগে শেষ করে রাখছে। সময় করে ইকবাল খান সিলেট আর মোজাম্মেল খান কিছুদিনের জন্য রাজশাহী গেছেন। আলী আহমদ খান আর আবির মিলেই অফিস সামলাচ্ছে। আলী আহমদ খান ইফতারের আগে আগে বাসায় চলে গেলেও আবির প্রতিদিন ফিরতে পারে না। আব্বুর অফিসের কাজ শেষ করে নিজের

অফিসে যাওয়ার আগে, মাঝে মাঝে রাস্তাতেই মাগরিবের আজান পড়ে যায়, মাঝে মাঝে রাকিবদের সাথে ইফতার করে। কিন্তু প্রতিদিন মাগরিবের নামাজের পরপরই মেঘ কল দেয়। কল দিয়ে প্রথম প্রশ্ন টায় থাকে, "ইফতার করেছেন? কি কি খেয়েছেন?" দ্বিতীয় প্রশ্ন, "বাসায় কখন আসবেন?" প্রতিদিন ই মেঘের একই রুটিন। আবিরের বাসায় ফেরার সময় অনুসারে মেঘ নিজের কাজ শেষ করে। আবির বাসায় ইফতার করে বের হলে ফিরতে ফিরতে প্রায় ১-২ টা বেজে যায়। আর ইফতার বাহিরে করলে তারাবির নামাজ শেষে বাসায় চলে আসে। মেঘও সেই অনুযায়ী নামাজ শেষ করে পাঞ্জাবি ডিজাইন করতে থাকে। আবির ফিরলে একসঙ্গে খাওয়াদাওয়া করে। রাত ছাড়া এখন আবিরকে দেখা যায় না বললেই চলে। তাই রাতটায় আবিরকে দেখার উত্তম সময়। যেদিন আবির বেশি রাত করে বাসায় ফিরে সেদিন সেহরিতে আবির মেঘকে আগে কল দেয়। অন্যদিনগুলোতে মেঘ আবিরকে কল দিয়ে ঘুম ভাঙিয়ে দেয়। পাশাপাশি রুমে থেকেও সামনাসামনি কারো মুখে কোনো কথা নেই। আজ শুক্রবার অফিস বন্ধ থাকায় আবির সকাল থেকে জামাকাপড় ধৌয়তেছে। মেঘ কোনো কারণে ছাদে গিয়ে দেখে ছাদ ভরে আছে আবিরের শার্ট আর টিশার্টে। সবগুলোর মধ্যে সাদা শার্টের সংখ্যায় বেশি। সবগুলো গুনে শেষ করে মাথায় হাত দিয়ে বিড়বিড় করতে করতে মেঘ নিচে নামছে। আবির আরও কতগুলো শার্ট আর পাঞ্জাবি নিয়ে উপড়ে উঠছে। মেঘকে বিড়বিড় করে নামতে দেখে প্রশ্ন করল, " ভরদুপুরে ছাদে গেছিলি

কেন?” মেঘ উত্তর না দিয়ে উল্টো প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল, “একটা মানুষের ২৭ টা সাদা শার্ট কিভাবে থাকবে পারে?” আবির ভ্রু কুঁচকে স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, “আরও ৫ টা এখনও পড়িই নি।” “এত শার্ট দিয়ে কি করবেন?” “ধৌয়ে দিলাম, যেগুলো ছোট হবে সেগুলো দিয়ে দিব। ” মেঘ চাপা স্বরে আওড়াল, “আমাকে দুটা শার্ট দিয়েন।” আবির ভারী কণ্ঠে শুধালো, “তোর শার্ট লাগবে?” মেঘ বিপুল চোখে চেয়ে তাড়াতাড়ি এপাশ ওপাশ মাথা নাড়লো। মনে মনে বলল, “ইশশশ, ওনি শুনে ফেলল!” মেঘ দ্রুত নিজের রুমে চলে গেছে। আবির নামাজ পড়ে এসে সেই যে ঘুমিয়েছে এরমধ্যে রাকিব প্রায় ২২ টা কল দিয়েছে। আবির ঘুম থেকে উঠে এতগুলো কল দেখে ভয়ে ভয়ে কল দিল। রাকিব কল রিসিভ করেই হুঙ্কার দিল, “আজকে রোজা রাখছি বলে, তোকে বকতে পারছি না। কতগুলো কল দিলাম কই ছিলি?” “ফোন সাইলেন্ট করে ঘুমাইছিলাম। কেনো? ” “একটু ঝামেলা হয়ছে। একটু না বেশিই ঝামেলা। ” “ফোনে বলবি নাকি দেখা করবি?” “ইফতার করে বের হইস।” আবির উষ্ণ স্বরে জানালো, “শরীর টা খুব দূর্বল। তুই বাসায় আয়। এখনি চলে আয় সমস্যা নেই। ” “নাহ নাহ। এখন আসলে সবার সাথে ইফতার করতে হবে। তোর বাপেরে আমি বিরাট ভয় পায়। ওনি আমার দিকে তাকালেই মনে হয়, আমি গড়গড় করে সব বলে দিব।” ”কি বলে দিবি?” “তোর আর মেঘের ব্যাপারে যা জানি সব এমনিতেই মুখ ফঁসকে বলে দিব। তারচেয়ে বরং ইফতারের পরে আসি। ” “তোর ইচ্ছে। ” নামাজ শেষে আবির

বাসায় আসার ১০ মিনিট পর ই রাকিব বাসায় আসছে। মালিহা খানকে ভালোমন্দ জিজ্ঞেস করে সরাসরি আবিরের রুমে চলে গেছে। আবিরকে বিস্তারিত ঘটনা বলার পর আবির স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, " তুই এখন কি চাচ্ছিস?" "আমি রিয়াকে বিয়ে করতে চাচ্ছি।" "এখনি বিয়ে করবি?" "সব জানাজানি হয়ে গেছে। এ অবস্থায় বিয়ের সিদ্ধান্ত না নিলে পরবর্তীতে ঝামেলা আরও বাড়বে। " আবির স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, "তাহলে আন্টিকে তুই বুঝা।" 'গতকাল রাত থেকে আম্মু আমার সাথে কথা বলে না। প্রথমে ভাবছি ঠিক হয়ে যাবে। আজকে বিকাল নাগাদ যখন কথায় বলছে না তখন বাধ্য হয়ে বাসা থেকে চলে আসছি। " "এখন আমি কি করতে পারি সেটা বল।" রাকিব মলিন হেসে বলল, "তুই আম্মুকে বুঝাবি। " আবির হুঙ্কার দিয়ে উঠল, " আমি আমার পরিবার মানাতে পারছি না বলে বিয়েই করতে পারছি না। সেখানে তুই আসছিস আমাকে দিয়ে তোর পরিবার মানাতে? বাহ! রাকিব বাহ!" "প্লিজ বন্ধু, তুই ছাড়া আমার কে আছে বল?" "তুই আমার কাছে যেকোনো সমস্যার সমাধান চা আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করবো। কিন্তু যেই মারপ্যাচে আমি আঁটকে আছি সেটার সমাধান আমার কাছে চাইস না। " রাকিব আকুল কণ্ঠে বলে উঠল, "এতদিন আমার বাসায় সমস্যা ছিল না শুধু রিয়ার বাসায় সমস্যা ছিল। কিন্তু এখন ওদের বাসার সাথে সাথে আম্মুও প্যাঁচ ধরে বসে আছে। জান্নাত আম্মুকে বুঝানোর অনেক চেষ্টা করছে, কিন্তু আম্মু কথা মানার অবস্থাতেই নেই। " আবির রাশভারি কণ্ঠে বলল, "দেখ, এর সমাধান

আমার কাছে নেই। তুই যেমন আব্বুকে ভয় পাস আমিও তেমন আন্টিকে ভয় পায়। আমার এখনও মনে আছে, ছোটবেলা গণিত পরীক্ষায় তুই দুই নাম্বার কম পেয়েছিলি বলে রাস্তার মাঝখানে তোকে কি মাই*রটায় না দিয়েছিল। সেই থেকে আমি তোর বাসায় যায় না। ” “তুই না গেলে কি হবে। আম্মু তোকে খুব ভালোবাসে। তোর কথা বললে যেকোনো অনুমতি দিয়ে দেন। কিন্তু এই ব্যাপারটা সিরিয়াস তাই তোকে নিয়ে যেতে হবে।” “আমার পা টা ঠিক হয়ছে বেশিদিন হয় নি। আব্বু এখনও বাইক চালানোর অনুমতি দেন নি। রিক্সায় করে অফিসে যায় আমি। সেখানে তোর বিয়ের কথা বলতে তোদের বাসায় যায় আর আন্টির হাতে মা*ইর খেয়ে আবার বিছানায় পড়ি নাকি? গতবার আমার শ্বশুর বেশি না মাত্র ২ ঘন্টা ঝাড়ছিল, এবার কিছু হলে সোজা মা*র্ডা*র করে ফেলবে। তুই কি চাস না আমি বিয়ে করি? ২-১ টা পরী আমাদের সংসারে আসুক, তোকে চাচ্চু বলে ডাকুক? আর আমায় আব্বু! ” রাকিব গুরুগম্ভীর কণ্ঠে বলল, ” একটা প্রবাদ বাক্য আছে, অইবো পোলা ডাকবো বাপ তে যাইবো মনে পাপ। তোর অবস্থা হইছে এরকম।” আবির ঠোঁট বেঁকিয়ে হেসে বলল, “আমার পোলা লাগতো না। একটা মেয়ে হলেই হবে যাকে ঘিরে আমাদের ছোটখাটো একটা সংসার হবে। ” রাকিব রাগান্বিত কণ্ঠে বলল, ” আর কত কল্পনায় ভাসবি এবার বাস্তবে আয়। বাস্তবে এসে আমাকে বাঁচা। ” “আমি পারবো না, দুঃখিত।” মেঘ দরজা থেকে উঁচু স্বরে বলল, “আসবো?” আবির ঠোঁটে হাসি রেখে বলল, “হ্যাঁ, আসেন।” মেঘ

মোলায়েম কণ্ঠে বলল, “বড় আম্মু আপনাদের জন্য খাবার পাঠিয়েছেন।” রাকিব ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, “কেমন আছো আপু?” “আলহামদুলিল্লাহ ভালো। আপনি কেমন আছেন ভাইয়া?” “আমি ভালো নেই। আমার অবস্থা খুব খারাপ। ” “কেনো ভাইয়া? কি হয়েছে?” “তোমার আবির ভাইকে একটু বলো আমাকে সাহায্য করতে। ও ছাড়া আমি কাউকে ভরসা করতে পারবো না। তুমি একবার বলো মেঘ!” মেঘ ভ্রু কুঁচকে সরু নেত্রে চেয়ে আছে, আচমকা প্রশ্ন করল, “কি বলবো?” আবির গম্ভীর কণ্ঠে বলল, “কিছু না। তুই রুমে যা। ” “নাহ মেঘ। তুমি যাবে না। তুমি আবিরকে একবার বলো তারপর চলে যেও। ” মেঘ আবারও প্রশ্ন করল, “বলবো কি আমি?” “তুমি বলো আমাকে যেন আবির সাহায্য করে। ” মেঘ আবিরের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে মসৃণ কণ্ঠে বলল, “রাকিব ভাইয়া কিসের সাহায্য চাচ্ছেন। করে ফেলুন সাহায্য! ” আবির স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, “ঠিক আছে। তুই যা এখন।” রাকিব পুনরায় বলে উঠল, ” আপু, তুমি জিজ্ঞেস করো, আবির সাহায্য করবে কি না! হ্যাঁ অথবা না। ” আবির চেঁচিয়ে উঠে বলল, ” হ্যাঁ হ্যাঁ করব সাহায্য, হইছে? ” রাকিব স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে হাসিমুখে বলল, “এই না হলে আমার বেস্ট ফ্রেন্ড। ” আবির অগ্নিদৃষ্টিতে রাকিবের দিকে তাকিয়ে আছে। মেঘ চলে যেতে নিয়ে পুনরায় প্রশ্ন করল, “আচ্ছা কি হয়ছে?” রাকিব স্বাভাবিক ভাবে জিজ্ঞেস করল, “তুমি রিয়া কে চিনো?” “আপনার গার্লফ্রেন্ড রিয়া আপু?” রাকিব আবিরের দিকে তাকিয়ে বলল, “বাহ! আবির” পুনরায়

মেঘকে বলল, “হ্যাঁ। আমাদের বাসার সবাই রিয়ার ব্যাপারে মোটামুটি জানতো। বিয়া দু একবার আমাদের বাসায়ও আসছে। সবার সাথে আলাপ ও হয়েছে। রিয়া শারীরিক ভাবে একটু অসুস্থ, এটা আমার বাসায় কেউ জানতো না, গতকাল কথায় কথায় এটা বলেছি তারপর থেকে শুরু হয়ছে আম্মুর চিল্লাচিল্লি। বাড়ির বড় বউ হবে, রোগী হলে কিভাবে হবে? লোকে কি বলবে? সারাজীবন ডাক্তারের কাছে দৌড়াইতে দৌড়াইতে শেষ হয়ে যাব।আরও কত কি! আম্মু এখন আমার সাথে কথায় বলতেছে না। তাই তোমার আবির ভাইকে বলতেছি, আমাদের বাসায় যেতে, আম্মুকে একটু বুঝাতে। ” “বিয়া আপুর কি সমস্যা? ” “শ্বাসকষ্ট, এলার্জির সমস্যা আরও কিছু সমস্যা আছে।” মেঘ জানালা দিয়ে বাহিরে তাকিয়ে উদাসীন কণ্ঠে মনে মনে বলল, ” রিয়া আপুর সামান্য সমস্যার কারণে আন্টি কত বছরের সম্পর্ক মানছেন না।আর আমি যে তাড় ছিঁড়া এটা জানার পর আমার শ্বাশুড়ি কি আমাকে মেনে নিবেন?” আবির মেঘকে ডাকতেই মেঘ নড়েচড়ে উঠল,কথা শেষ করে দ্রুত রুম থেকে বেড়িয়ে গেছে। মেঘ যেতেই রাকিব বলল, “আজ মেঘ আসছিল বলে বেঁচে গেলাম।” আবির রাগান্বিত কণ্ঠে বলল, ” লোকে এজন্যই বলে কাউকে দূর্বল জায়গা চিনাতে নেই। ” “আমি নিজেই এখন আধমরা তাই তো মেঘকে দিয়ে সাহায্য চাইলাম। আচ্ছা, তুই না একবার বলছিলি মেঘ অসুস্থ। ঠিকই তো দেখলাম।” আবির কপাল গুটিয়ে গুরুভার কণ্ঠে বলল, ” অসুস্থ না রে, বৃষ্টিতে ভিজছিলাম। ধমকের হাত থেকে বাঁচতে

শ্বশুরের মুখের উপর বলছিলাম, “আপনার মেয়ের কিছু না হলেই তো হলো।” যেই কথা সেই কাজ, আমার শ্বশুর সকাল বিকাল দেখে মেয়ের জ্বর, সর্দি আসছে কি না! কারণ কিছু একটা হলেই আমায় ইচ্ছে মতো ঝাড়তে পারবে। ওনি যদি ঢালে ঢালে চলে তবে আমিও চলি পাতায় পাতায়। সপ্তাহ খানেক মেঘকে গরম পানির উপর রেখেছি, সারাক্ষণ গরম পানি খেয়েছে, অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়াইছি, প্রাকৃতিক ঔষধ সহ যতধরনের ঘরোয়া পদ্ধতি আছে সব চেষ্টা করে ফেলছি। আল্লাহ র রহমতে সর্দি-জ্বর কিছু হয় নি। ” “তোর জীবন এখন ডিসকভারি চ্যানেলের বাঘ আর হরিণের মতো হয়ে গেছে। জামাই শ্বশুরের চ্যালেঞ্জ। চাচ্চু যেদিন জানতে পারবে ওনার পরীর মতো মেয়ের পিছনে তোর মতো বানর ঘুরঘুর করছে। তখন ওনার কি অবস্থা হবে আবির?” “সেই দিন নিয়ে এখনও ভাবি নি। যা হবে সেদিনই হবে। বাঁচা আর ম*রা দু হাতে নিয়েই ওনাদের সম্মুখীন হবো। ” “আচ্ছা এখন চল, নামাজ পড়ে আমাদের বাসায় যাবি। ” আবির আচ্ছা বলার আগেই জান্নাত আবিরের নাম্বারে কল দিল। আবির রিসিভ করতেই জান্নাত বলল, “আবির ভাইয়া, রাকিব ভাইয়া বাসা থেকে চলে গেছে, ভাইয়ার ফোনও বন্ধ। আম্মু টেনশনে অসুস্থ হয়ে পরেছিল, এখন কিছুটা সুস্থ হয়েছে। ভাইয়ার সাথে কথা বলতে চাচ্ছেন। আপনি ভাইয়াকে খোঁজে নিয়ে তাড়াতাড়ি বাসায় আসুন, প্লিজ।” “আচ্ছা আসতেছি ” আবির আর রাকিব ঘন্টাখানেকের মধ্যে রাকিবদের বাসায় আসছে। আন্টি আংকেলের সাথে কথা বলে অনেক

কষ্টে রাজি করিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে রিয়াকে কল দিয়ে রিয়ার আম্মুর সাথেও কথা বলে। প্রায় ঘন্টাদুয়েক আলাপ-আলোচনা শেষে রাকিব আর রিয়ার বিয়ে ঠিক হয়েছে। ঈদের একদিন পরেই বিয়ে। রিয়ার পরিবার আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে অনেকেই এই বিয়েতে রাজি না তাই মোটামুটি ঘরোয়া ভাবে বাসাতেই পোগ্রাম করা হবে। আবির বাসায় ফিরতেই আলী আহমদ খান শুধালেন, "কোথায় ছিলে?" "রাকিবদের বাসায় গিয়েছিলাম। " "রাকিব দেখলাম সন্ধ্যায় আমাদের বাসায় আসলো আবার তুমি এখন ওদের বাসা থেকে ফিরছো। কোনো সমস্যা? " "নাহ আব্বু। তেমন কোনো সমস্যা না। রাকিবের বিয়ে ঠিক হয়েছে। ঈদের একদিন পর বিয়ে।" আলী আহমদ খান রাশভারি কণ্ঠে বললেন, " কোথায় ঈদের পর তোমার বিয়ে হওয়ার কথা ছিল। তা না হয়ে তোমার বন্ধুর বিয়ে করছে । ভালো ভালো। " আবির মনে মনে আওড়াল, "যাকে বিয়ে করতে চাই তাকে বিয়ে না দিলে এই ঈদ কেন, একেরপর এক ঈদ কেটে গেলেও আবির অন্য কাউকে বিয়ে করবে না। " দেখতে দেখতে সময় পেরিয়ে যাচ্ছে। এক সপ্তাহে পরেই ঈদুল ফিতর। খান বাড়িতে শপিং এর মেলা বসেছে। আলী আহমদ খান, ইকবাল খান, মোজাম্মেল খান তিনজনই আলাদা আলাদাভাবে সবার জন্য জামাকাপড় এনেছে। বছরে একবার ই ওনারা নিজে শপিং এ যান। তাছাড়া তানভিরও সবার জন্য জামাকাপড় এনেছে। বাড়ির ছোট দুই কর্তী একদিন মেঘদের শপিং এ নিয়ে গিয়ে সবার জন্য শপিং করিয়ে এনেছে। মেঘের অলরেডি ৫-৬ সেট ড্রেস

হয়ে গেছে। তবে কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তির থেকে এখনও কিছু পাওয়া হয় নি তাই মেঘের মন তেমন ভালো না। আবিরদের পাঞ্জাবি, টিশার্টের কাজ কমপ্লিট। এখন শুধু দেয়ার অপেক্ষা। আজ সকাল থেকে তানভির আবিরকে খোঁজছে।। আবির রাকিবের বিয়ের শপিং করতে বেড়িয়েছে। আবির দুপুরের দিকে বাসায় আসতেই তানভির ছুটে গেল। আবির নির্বিকার ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল, "কি হয়েছে তোর? " তানভির অনচ্ছ হেসে বলল, "ওর জন্য একটা ড্রেস কিনেছি। কিভাবে দিব বুঝতে পারছি না। হেল্প করো।" " আমার হেল্প করতে হয় কেন? সামনে যেতে না চাইলে নিজের বুদ্ধি কাজে লাগা। " "মানে?" "তোর বোনকে যেভাবে গিফট পাঠিয়েছিলি সেভাবে পাঠা। " "ও যদি না পড়ে?" "এত চিন্তা করলে অকালে চুল পেঁকে যাবে। তোর কাজ গিফট দেয়া, এক্সেপ্ট করবে কি না সেটা তার বিষয়। " "ঠিক আছে।" তানভির বন্যার ঠিকানা দিয়ে ড্রেস কুরিয়ারে পাঠিয়ে দিয়েছে। কুরিয়ার থেকে বক্স নিয়ে বন্যা রুমে গেল। সন্দেহ নিয়ে বক্স খুলতেই বিশাল গর্জিয়াছ এক ড্রেস বের হলো। ড্রেসের ওজনই বলে দিচ্ছে ড্রেসটা অনেক দামী। বন্যা সঙ্গে সঙ্গে মেঘকে কল দিয়ে সব ঘটনা খুলে বলল। মেঘ অচতুর কন্ঠে বলল, "গিফট কে পাঠালো সেটা বড় বিষয় না। গিফট পেয়েছিস এটা নিয়েই খুশি থাক।" "এত দামী ড্রেস কি করব আমি? কেউ হয়তো ভুলে পাঠাইছে।" মেঘ তাড়িত বেগে বলল, "আরে বোকা! ঠিকানা তোর বাসার, ফোন নাম্বার তোর মানে কেউ ইচ্ছে করেই তোকে পাঠিয়েছে।" "আমি এই ড্রেস পড়ব না। যেভাবে

আছে সেভাবেই রেখে দিব।” মেঘ সঙ্গিনভাবে ধমকে উঠে, “তুই ড্রেস না পড়লে মজা টা করবো কিভাবে?” “কিসের মজা?” “তুই ড্রেস টা পড়ে ছবি তুলে একটা ছবি ফেসবুকে পোস্ট করবি, তারপর দেখব পরিচিত মানুষের বাহিরে কে তোর ছবিতে রিয়েক্ট দেয়। সেখান থেকে খোঁজে নিব, মনে মনে কে তোকে পছন্দ করে। আর কোন বড়লোক বাপের ছেলে এত দামী ড্রেস তোর জন্য পাঠায়।” “আমি পারবো না।” “চুপ, আমি যা বলছি তাই হবে। এ ব্যাপারে আমি আর কোনো কথা শুনবোও না মানবোও না।” “কিরে? তোর আবার কি হলো?” “না দেখছিলাম, আবির ভাইয়ের স্টাইলে কথা বললে কেমন লাগে, রাখি এখন, টা টা। ” “আচ্ছা। টা টা। ” আগামীকাল ঈদ। মেঘ এখনও অপেক্ষায় আছে আবির তাকে একটা ড্রেস গিফট করছে। আর সেটা মেঘ ঈদের দিন সকালে পড়বে। অথচ আবির এখনও ড্রেস দিচ্ছে না। এদিকে দুপুর থেকে হালিমা খান মেঘদের পার্লারে যেতে বলছেন, মেহেদী দেয়ার জন্য বুকিং দিয়ে রেখেছে আরও ১ মাস আগে। কিন্তু মেঘের পার্লার যাওয়াতে মনোযোগ নেই। এক ফাঁকে মেঘ ছুটে গেল আবিরের রুমে। আবিরকে ডেকে বলল, “আবির ভাই আপনি আমায় মেহেদী দিয়ে দিবেন না?” “কেন? মেহেদী আর্টিস্ট কোথায়?” “আর্টিস্টের কাছে দিব না। আপনি রাতে দিয়ে দিবেন। ” “আমি পারব না। মীমকে নিয়ে তাড়াতাড়ি মেহেদী দিতে যা। ইফতারের আগে আগে চলে আসিস। ” মেঘ কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে বলল, “মাইশা আপুর বিয়েতে আপনি কত সুন্দর করে মেহেদী দিয়ে দিছিলেন, আজকে

একটু দিয়ে দেন না! প্লিজ” আবির রাগান্বিত কণ্ঠ বলল, “মেঘ, উল্টাপাল্টা বায়না ধরবি না। যা বলছি তা শুন।” মেঘ মন খারাপ করে নিজের রুমে চলে গেছে। মেহেদী দিবে না বলার পরও বাড়ির সবাই জোর করে পার্লারে পাঠিয়েছে। সন্ধ্যার দিকে বাসায় ফিরেই মেঘ দেখল তার বিছানার উপর একটা শপিং ব্যাগ রাখা। শপিং এ দুটা ড্রেস, একটা হলুদ রঙের আরেকটা গাঢ় নীল রঙের। দুটা ড্রেস ই খুব সুন্দর তবে মেঘের নীল ড্রেস টা বেশি পছন্দ হয়েছে। মেঘ ড্রেস দেখতে দেখতে আজান পড়ে গেছে। মেঘ দ্রুত ইফতার করতে চলে গেছে। ইফতার করে রুমে এসে নামাজ শেষে আবারও ড্রেস গুলো দেখছে। আবির ইশার নামাজ পড়তে বের হতেই মেঘ আবিরের জন্য ডিজাইন করা দুটা পাঞ্জাবি আর টিশার্ট গুলো আবিরের রুমে রেখে আসছে। তানভিরের রুমেও একটা পাঞ্জাবি আর একটা টিশার্ট রেখে আসছে। আবির কিছুক্ষণ পর রুমে এসে দেখলো পাঞ্জাবির উপর ছোট একটা চিরকুট। হাতে নিতেই দেখল এতে লেখা, ” আপনার Sparrow-র দেয়া প্রথম পাঞ্জাবি। ভালো লাগলে চোখ খুলে পড়বেন, ভালো না লাগলে চোখ বন্ধ করে পড়বেন, তবুও পড়তেই হবে। ” সাথে আরেকটা চিরকুটে লেখা, ” আপনি আমার কোমল মনে আঘাত দিয়েছেন তাই আমি রাগ করেছি, খুব রাগ করেছি। সামান্য একটু মেহেদী দিয়ে দিলে আপনার খুব বেশি ক্ষতি হয়ে যেত? আপনি আমার মনের ছোট ছোট অভিযোগে সৃষ্টি বিশালাকার পর্বত। আপনাকে ঘিরে আমার যত অভিযোগ ছিল সব ঈদের চাঁদের কাছে সঁপে

দিয়েছি। তবুও দোয়া করি আপনি ভালো থাকুন, পৃথিবীর সব সুখ আপনাকে ঘিরে রাখুক, ঈদ মোবারক। ” আবির চিরকুট টা পড়ে মুচকি হেসে বলল, “পৃথিবীর সব সুখ যদি আমায় ঘিরে রাখে তবে আমি সেই সুখের চাদর দিয়ে তোকে ঘিরে রাখবো। তোর মনের ঘরে চুল পরিমাণ অভিযোগ ঢুকার রাস্তাও রাখবো না। তোকে আমার ভালোবাসা দিয়ে ভরিয়ে রাখবো। একদিন কেন, সারাজীবন তোকে রাঙিয়ে রাখার দায়িত্ব আমি নিবো ইনশাআল্লাহ। ” মেঘ আজ তাড়াতাড়ি শুয়ে পরেছে। এলার্ম দিয়ে ঘুমিয়েছে। ঘুম ভাঙতেই তড়িঘড়ি করে উঠে শাওয়ার নিতে চলে গেছে। ফজরের নামাজ পড়ে ঘন্টাখানেক কুরআন শরীফ পড়েছে। তারপর বেলকনিতে দাঁড়িয়ে আকাশের পানে তাকিয়ে আছে। কয়েক মুহুর্তের মধ্যে মেঘের দুচোখ বেয়ে টুপটুপ করে পানি পড়তে শুরু করেছে। দাদা, দাদু সহ যত আত্মীয় মারা গেছেন তাদের কথা ভেবেই মেঘ কাঁদছে। নামাজ পড়েও তাদের দোয়া করেছে । ঘন্টাখানেক নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থেকে মেঘ ওয়াশরুম থেকে হাতমুখ ধৌয়ে রেডি হতে শুরু করলো। বিছানা ছড়ানো ৮ টা ড্রেস। সবগুলোই সুন্দর কিন্তু মেঘের নজর এক আবিরের ড্রেসেই আঁটকে গেছে। খুব ভেবে চিন্তে আবিরের দেয়া নীল রঙের ড্রেসটায় পরেছে। সাথে নীল রঙের বড় বড় কানের দুল, হাতে নীল চুড়ি। শুরুতেই চুল শুকিয়ে স্ট্রেইট করে নিয়েছিল সেই চুলে মাঝখানে সিঁথি করে দুপাশে দুটা কাঁকড়া বেন্ট দিয়ে ডিজাইন করে চুল বেঁধেছে। পেছন থেকে সব চুল ছাড়া, তবে স্ট্রেইট করার জন্য খুব

সুন্দর লাগছে। মুখে হালকা মেকাপ করে ঠোঁটে গোলাপি রঙের লিপস্টিক লাগিয়েছে। সাজা শেষে রুম থেকে বেড়িয়ে সেদিক সেদিক উঁকি দিচ্ছে, কোথাও কেউ নেই, আবিরের রুমেও দেখে এসেছে আবির নেই। হঠাৎ বড় আব্বুকে নামাজ থেকে ফিরতে দেখে মেঘ দৌড়ে নিজের রুমে চলে গেছে, আর আবিরের উপরে আসার অপেক্ষা করছে। কিছুক্ষণ পর আবির উপরে আসামাত্রই মেঘ রুম থেকে বেড়িয়ে সোজা আবিরের সামনে গিয়ে বসে পরেছে। মেঘের এমনকান্ডে আবির কিছুটা ভড়কে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে দু পা পিছিয়ে দাঁড়ালো । মেঘ উপরে তাকিয়ে দুহাতে আবিরের দু পা স্পর্শ করলো। ততক্ষণে আবির নিচু হয়ে মেঘের দু কাঁধ আলতোভাবে হাত রেখে বলল, “সালাম করতে হবে না, ওঠেন।” মেঘ সালাম করে ঠোঁটে প্রশান্তির হাসি নিয়ে উঠে দাঁড়ালো। আবিরের পড়নে মেঘের দেয়া সাদা পাঞ্জাবি। তা দেখে মেঘের ওষ্ঠ যুগল আরও বেশি প্রশস্ত হলো।মেঘের কল্পনায় আবির ভাইকে যতটা সুন্দর লেগেছিল বাস্তবে তার থেকে বহুগুণ বেশি সুন্দর লাগছে। আবিরও নির্বাক হয়ে মেঘকে দেখছে, নীল রঙ আবিরের খুব প্রিয় তবে সচরাচর নীল রঙের কিছু আবির কিনে না। কারণ প্রিয় মানুষকে প্রিয় রঙের ড্রেসে দেখলে মুগ্ধতায় চোখ সরাতে পারবে না ভেবেই এই রঙটাকে এড়িয়ে যায় । তবে দোকানে নীল রঙের জামাটা দেখে এত পছন্দ হয়েছিল যে না কিনে থাকতেই পারে নি। অকস্মাৎ আবির ভ্রু নাচিয়ে প্রশ্ন করল, “সালামি লাগবে?” মেঘ মুচকি হেসে বলল, ” আগে দোয়া করবেন

তারপর সালামি দিবেন।” আবির মেঘের মাথায় হাত রেখে সুমধুর কণ্ঠে বলল, ” দোয়া করি জীবনে অনেক বড়, সবসময় হাসি খুশি থাক” মেঘ নাক সিটকিয়ে বলল, “এসব দোয়া তো সবাই করে, আপনি বরং ইউনিক দোয়া করুন।” “দোয়াও আবার ইউনিক হয়?” “হ্যাঁ হয়। ” আবির মাথা থেকে হাত নামিয়ে দুহাতে মেঘের দুগালে আলতোভাবে হাত রাখলো। জিভ দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে স্নিগ্ধশীতল কণ্ঠে বলল, ” আমি দোয়া করি, তোর মনের সব ইচ্ছে পূরণ হোক। ছোট থেকে বড় ইনফেক্ট যেগুলো তুই মনে মনে ভাবিস কিংবা ঘুমের ঘোরে স্বপ্নে বা কল্পনায় দেখিস সেই সব ইচ্ছে পূরণ হোক। তুই যা চাস, যাকে চাস ঠিক যেভাবে চাস সেভাবেই যেন পেয়ে যাস। তোর আকাশ জুড়ে ভালোবাসার বৃষ্টি হোক, যেই বৃষ্টি তোর মনে জমে থাকা অভিযোগ, অভিমান গুলোকে ধৌয়ে মুছে বিলীন করে দিবে সেই সঙ্গে আগামী দিনগুলোতেও তোর মন ভালো রাখবে। প্রয়োজনে বৃষ্টির ফোঁটার সাথে সাথে দুটা হাঁসের বাচ্চাও আসুক। যেগুলো তোকে সারাদিন হাসাবে। মহিলা হাঁসটার নাম হবে মেঘ, পুরুষ হাঁসের নাম যা খুশি রেখে দিস। তারপর তাঁদের একটা সংসার হবে ।পরে ডিম হবে, বাচ্চা দিবে.. আরও বলবো?” মেঘ ঠোঁট উল্টিয়ে বলল, “এটা আপনার ইউনিক দোয়া?” “তো কি দোয়া চাস বল?” “থাক দোয়া করতে হবে না। সালামি দেন!” “কত লাগবে? ২ টাকা নাকি ৫ টাকা? ” “আপনার যত ইচ্ছে দেন । সালামি চাইতে নেই। ” “আবির পকেট থেকে একটা নতুন ৫০০ টাকার বান্ডেল বের করে দিল।” মেঘ

অবাক চোখে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, " এত টাকা নিয়ে কি করব?" "তোর বোধশক্তি হওয়ার পর প্রথমবার সালামি দিচ্ছি। কম কেনো দিব?" মেঘ আবিরের দিকে তাকিয়ে তপ্ত স্বরে বলল, "ধন্যবাদ। " "সালামি দিলে আবার ধন্যবাদও দেস?" "সালামির জন্য ধন্যবাদ দেয় নি। পাঞ্জাবির জন্য দিয়েছি। " "ওহ আচ্ছা। তাহলে আপনাকেও ধন্যবাদ, জামাটা পড়ার জন্য। " মেঘ রুমে যেতে যেতে হঠাৎ বলে উঠল, "আমি কিন্তু পুরুষ হাঁসের নাম ফিক্সড করে ফেলেছি। " আবির মুচকি হেসে বলল, "আমি জানি। " আবির নিজের রুমে চলে যাচ্ছে।মেঘ নিজের রুমে এসে টাকাগুলো ড্রয়ারে রেখে ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে ভাবছে, "পুরুষ হাঁস টা আবির আর মহিলা হাঁসটা মেঘ। একদিন তাদের বিয়ে হবে। তাদের সাজানো ছোট্ট একটা সংসার হবে। তারপর তাদের ঘর আলো করে একটা রাজকন্যা না হয় রাজপুত্র আসবে। উফফফ" বলেই মেঘ লজ্জায় দুহাতে নিজের মুখ ডেকে ফেলেছে। ব্লাশ দেয়ায় গাল দুটা যতটা লাল হয়েছিল এসব কথা ভেবে দু গাল তিনগুণ বেশি লাল হয়ে গেছে। কিছুক্ষণ পরেই মেঘ স্বাভাবিক হয়ে নিচে নামলো। মেঘের ড্রেস দেখে কাকিয়া বলল, " এই ড্রেসটা অনেক সুন্দর। তোকে খুব ভালো লাগছে। কিন্তু তুই যেটা পছন্দ করে কিনলি সেটা পরিস নি কেন?" মেঘ হাসিমুখে বলল, "ঈদ সাতদিন থাকে। সবার দেয়া ড্রেস ই পড়বো।" তানভির নামাজের সময় তাড়াহুড়ো করে গেছিল বলে মেঘের দেয়া পাঞ্জাবি টা পড়ে যেতে পারে নি। বাসায় এসে তাড়াতাড়ি করে মেঘের দেয়া পাঞ্জাবি পড়ে

নিচে আসছে। আবিরও ততক্ষণে নিচে আসছে। সবাই একবার আবিরকে দেখছে আবার তানভিরকে। হালিমা খান প্রশ্ন করলেন, “তোরা কি সেইম পাঞ্জাবি কিনছিস?” তানভির ঠোঁটে হাসি রেখে বলল, ” পাঞ্জাবি গিফট পেয়েছি। ” “কে দিল?” “বনু আমাকে আর ভাইয়াকে গিফট করেছে!” “ডিজাইন নিজে করেছিস?” মেঘ ছোট করে বলল, “হ্যাঁ!” “বাহ! খুব সুন্দর হয়েছে। তোর আব্বু চাচ্চুদেরও দিতি।” “ভালো লাগলে ইনশাআল্লাহ আগামী ঈদে সবাইকে দিব।” “ইনশাআল্লাহ। ” সবাই একসঙ্গে খাওয়াদাওয়া শেষ করে ৫ ভাইবোন মিলে ঘুরতে বেড়িয়েছে। তানভির ড্রাইভ করছে আবির তার পাশের সিটে বসে আছে। ফুপ্পির বাসা থেকে অলরেডি ঘুরে অল্প নাস্তা করে আসছে। রাস্তায় যেতে যেতে মেঘ হঠাৎ ই বলে উঠল, “ভাইয়া চলো না বন্যাদের বাসার এদিকে যায়।” আবির আর তানভির দুজনেই আঁতকে উঠল। তাদের প্ল্যান ছিল এদিক সেদিক ঘুরে শেষে বন্যাদের বাসার এদিকে যাবে । কিন্তু মেঘ শুরুতেই বলে ফেলল। তানভির মুখভঙ্গি স্বাভাবিক রেখে প্রশ্ন করল, “ঐদিকে কেন?” “বন্যা ঈদে কোথাও বের হয় না। আমরা যেহেতু বের হয়ছি ওকে দেখে আসি। ” আবির মৃদু হেসে বলল, “শুধু দেখে আসবি কেন? ওকে নিয়ে আসিস। সবাই এক সঙ্গে ঘুরবো।” “আচ্ছা। বলবো ওকে। ”তানভির বন্যাদের বাসার উদ্দেশ্যে রওনা দিল। আবির পাশে বসে ফোনে কিছু একটা করছে আর তানভিরের সাথে টুকিটাকি গল্প করছে। হুট করে আদি বলে উঠল, “আবির ভাইয়া, তুমি আমাকে সালামি দাও নি কেনো?”

আদির কথা শুনে মীম, মেঘ দুজনেই চমকে উঠেছে। মেঘ মনে মনে ভাবছে, “আপনি আমাকে এত এত টাকা সালামি দিলেন অথচ আদিদের দিলেন না? এটা কি ঠিক হলো?” আবির ভ্রু গুটিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে বলল, ” আমি নামাজে যাওয়ার আগেই তোদের সালামি কাকিয়ার কাছে রেখে গেছি। কাকিয়া ব্যস্ত তাই হয়তো মনে নেই। বাসায় গেলেই পেয়ে যাবি। তাছাড়া গতকাল তোদের রুমে ড্রেসও রেখে আসছি। দেখিস নি?” মীম তড়িৎ বেগে বলল, “হ্যাঁ। দেখেছি ড্রেস টা খুব সুন্দর হয়েছে। রাতে পড়বো।” আদিও বলে উঠল, “শার্ট টা রাতেই দেখেছি। থ্যাংক ইউ ভাইয়া। ” তানভির ঠাট্টার স্বরে বলল, “আদি তোর সালামি কত হলো?” আদি মুখ ফুলিয়ে বলল, ” তোমাকে কেন বলবো? আমি রাতে ঘুমালে তুমি নিয়ে যাইতা?” তানভির হেসে বলল, “সে আমি এখনই তোর থেকে নিতে পারি। নিবো?” আদি চিৎকার দিয়ে উঠল, “নাহ।” আবির মেকি স্বরে বলল, ” দূর, তানভির তোর সালামি নিয়ে কি করবে?” আদি মুখ ফুলিয়ে বলল, “একবার নিয়ে গেছিল।” আবির ভ্রু কুঁচকে সন্দেহের দৃষ্টিতে তানভিরের দিকে তাকালো। তানভির হেসে বলল, “আরে ভাইয়া, ব্যাপারটা তেমন না।” “তো কেমন?” “তখন আদি আরও ছোট ছিল। আদি আমার কাছে সালামি চাইছে। তো আমি বলছি তুই যত সালামি পেয়েছিস আমি একায় ততটা দিব, আদি যেন তার সালামি আমাকে দেখায়। তারপর আদি বের করে দিল সব। তখন মজা করে আমি একবার বলছিলাম, এখন যদি তোর সালামি আমি নিয়ে যাই তাহলে কেমন হবে? বলছি

না ম*রেছি, আদি কাঁদতে কাঁদতে ফ্লোরে গড়াগড়ি শুরু করেছে। আমার পকেটে যত টাকা ছিল আমি সব দিয়ে দিয়েছি । তবুও আদির কান্না থামে না। আব্বু, বড় আব্বু, বড় আম্মু ইচ্ছে মতো আমাকে ঝাড়ছে। তবুও আদিকে থামাতে পারে নি। প্রায় ৩০-৪০ মিনিট মাটিতে গড়াগড়ি করছে। আমি সেদিন ই মনে মনে কানে ধরছি আর যাই করি সালামি নিয়া কোনো মজা করব না। এরপর থেকে ঈদের দিন গোসল করে রেডি হওয়ার আগেই ওদের সালামি দিয়ে দেয়, হাতে যত থাকে ততই দেয়। ভালোবাসা আর দেখাতে যায় না। ” তানভিরের কথা শুনে সবাই হাসছে। ততক্ষণে বন্যাদের বাসার কাছে চলে আসছে। মেঘ গাড়ি থেকে নেমে বলল, “আমি যাই, তোমরা গাড়িতেই বসো।” মীম পিছন থেকে ডেকে বলল, “আপু আমি তোমার সাথে আসি? ” মেঘ আস্তে করে বলল, “আয়।” আদিও বলে উঠল, “আমিও আসি?” আবির এবার গম্ভীর কণ্ঠে ধমক দিল, “কি শুরু করছিস? মীম, আদি তোরা কেউ যাবি না। মেঘ তুই যাহ। ” মেঘ ভেতরে চলে গেছে। মীম আর আদি গাড়িতেই বসে আছে। বন্যাদের বাসায় কলিং বেল চাপতেই বন্যার ছোট ভাই এসে দরজা খুলে দিল। মেঘকে দেখেই উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, “ঈদ মোবারক আপু। সালামি দিবা না?” মেঘ হাসি মুখে একটা ৫০০ টাকার নোট বের করে দিল। আবিরের দেয়া বান্ডিল যেভাবে দিয়েছিল মেঘ সেটাকে সেভাবেই গুছিয়ে রেখে দিয়েছে। হাতে যা কিছু টাকা ছিল সেখান থেকে মীম আর আদিকে সালামি দিয়েছে। মেঘ বন্যার আব্বু আম্মুকে সালাম করে দ্রুত বন্যার রুমে চলে গেল।

বন্যা একা একা সেলফি তুলছে, পড়নে বন্যার আব্বুর দেয়া একটা থ্রি-পিস। বিছানার উপর তানভিরের দেয়া দামী ড্রেসটা পড়ে আছে। বন্যা মেঘকে দেখেই এগিয়ে এসে বলল, "ঈদ মোবারক বেবি। তুই আমাদের বাসায়? একা আসছিস?" মেঘ মুখ বেঁকিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে বলল, "ঈদ মোবারক। ঈদের দিন আমাকে একা বের হতে দিবে? তোর মনে হয়? আবির ভাই, ভাইয়া, মীম, আদি সবাই আসছে। ওরা নিচে গাড়িতে। " "ওনাদের ভেতরে নিয়ে আসিস নি কেন? চল ওনাদের ডেকে নিয়ে আসি।" "ওনাদের আসতে হবে না। তুই রেডি হ, তোকে নিয়ে ঘুরতে যাব।" "আমি তোর ভাইদের সাথে কোথাও যাব না। সরি।" মেঘ রাগী ভাব নিয়ে বলল, "কেন আমার ভাই রা কি বাঘ নাকি ভাল্লুক যে তোকে খেয়ে ফেলবে। চল, আর ঐ ড্রেসটা পড়ে যাবি। আমি তোকে সুন্দর করে ছবি তুলে দিব, তারপর যা বলছিলাম তাই করব। " বন্যা কপাল গুটিয়ে বলল, " ড্রেসের মালিককে খোঁজার আমার কোনো ইচ্ছে নেই। ড্রেস এমনেই পরে থাকুক। এখন নিচে চল, ওনাদের ডেকে নিয়ে আসি, আম্মু- আব্বু শুনলে বকা দিবে। চল।" "ওনাদের ডাকতে পারি তবে একটা শর্তে, তুই যদি বলিস তুই আমাদের সাথে ঘুরতে যাবি তবেই ওনাদের ডাকবো। আর ঘুরতে গেলে অবশ্যই এই ড্রেসটা পড়ে যেতে হবে।" "আমি এই ড্রেস পড়তে পারবো না।" "তাহলে আমিও চলে যাচ্ছি। যাওয়ার সময় কাঁদতে কাঁদতে আংকেল আন্টিকে বিচার দিয়ে যাব যে তুই আমার সাথে খুব বাজে আচরণ করেছিস, আর তোদের বাসায় আসতে নিষেধ

করেছিস। ” বন্যা মেঘের হাত ধরে আটকে দিল। গম্ভীর কণ্ঠে বলল, “এই ঢংগী মেয়ে। আমি তোকে কখন কি বললাম?” মেঘ দাঁত কেলিয়ে হেসে বলল, ” তুই বলিস নি তবে আমি ঠিকই বলবো। আমি ভাইয়াদের বলে তোদের বাসা পর্যন্ত নিয়ে আসলাম আর তুই আমাদের সাথে যেতে রাজি হচ্ছিস না? তুই এত নিষ্ঠুর বন্যা?” ” হইছে হইছে আর ঢং করতে হবে না, আমি যাব। শান্তি? এখন চল ওনাদের বাসায় নিয়ে আসি। ” মেঘ হাসিমুখে বলল, “তোকে যেতে হবে না। তুই ঐ ড্রেসটা পড়ে তাড়াতাড়ি রেডি হ। আমি নিয়ে আসছি ওনাদের। ” মেঘ চটজলদি নেমে আসলো। মেঘের ভাই বোন বাহিরে আছে শুনে বন্যার ছোট ভাই ওদের এগিয়ে আনতে গেল। মীম,আদি দ্রুত বেড়িয়ে গেছে। তানভির গুরুভার কণ্ঠে বলল, ” ও রেডি হয়ে চলে আসলেই তো হতো। আমাদের ভেতরে যাওয়ার কি দরকার ছিল?” আবির গাড়ির দরজা খুলতে খুলতে বলল, ” তোর একমাত্র শালা তোকে নিতে আসছে, যাবি না? শ্বশুর-শ্বাশুড়ি কে সালাম করতে হবে না?” তানভির দূর্বল কণ্ঠে বলে উঠল, ” ওদের বাসায় যেতে আমার অস্বস্তি লাগে।” “শ্বশুর বাড়িতে গেলে সব ছেলেদেরই এমন লাগে। এসব কোনো বিষয় না। চল।” মেঘ, মীমরা অনেকটা সামনে চলে গেছে, আবির আর তানভির পেছনে বিড়বিড় করতে করতে যাচ্ছে। বাসায় ঢুকেই সবাই বন্যার আব্বু আম্মুকে সালাম করলো। বন্যার বড় আপুর টুকিটাকি কথা বলে সবাই খাবার টেবিলে বসতে বলল। মেঘ বার বার বলে দিয়েছে যেন অল্প করে নাস্তা দেয়া হয়, কারণ কিছুক্ষণ আগেই

ফুপ্পিদের বাসা থেকে খেয়ে আসছে তারা। সবার নাস্তা প্রায় শেষদিকে এমন সময় বন্যা রেডি হয়ে উপর থেকে নামছে। তানভিরের দেয়া খয়েরী রঙের ড্রেসটাতে বন্যাকে অসম্ভব সুন্দর লাগছে। সাথে হিজাব পড়েছে, হাতে সিম্পল একটা পার্টস, ঠোঁটে লাল লিপস্টিক আর মুখে হালকা মেকাপে বন্যাকে আজ অপরূপা লাগছে। হঠাৎ বন্যাকে নামতে দেখে তানভিরের গলায় খাবার আঁটকে গেছে,বিস্ময় সমেত তাকিয়ে আছে বন্যার দিকে। ঢোক গিলতে পারছেনা। তানভিরের অবস্থা বুঝতে পরে আবির তাড়াতাড়ি এক গ্লাস পানি এগিয়ে দিল। তানভিরের হৃৎস্পন্দন বাহির থেকে শুনা যাচ্ছে। পানি খেয়ে সেই যে মাথা নিচু করেছে একবারের জন্যও তাকায় নি। বন্যা নিচে এসে সবার উদ্দেশ্যে 'ঈদ মোবারক' বলল। মীম, মেঘ,আদি একসঙ্গে ঈদ মোবারক বলল। তানভির কোনোরকমে প্লেটের নাস্তা শেষ করেই উঠে পরেছে। এরমধ্যে সবার খাওয়া প্রায় শেষ। বন্যার আব্বু আম্মুর থেকে বিদায় নিয়ে সবাই বেড়িয়ে পরেছে, আসার সময় ওনারা সবাইকে সালামিও দিয়ে দিয়েছে। আবির ইশারা দিতেই তানভির বন্যার ছোটভাইকে সালামি দিতে গেল। কিন্তু সে কিছুতেই নিবে না। মেঘের সাথে সে যতটা ফ্রী তানভিরের সাথে তেমন না। তাই সে নিতে চাচ্ছে না। তানভির জোরাজোরি করেই সালামি দিয়ে আসছে। তানভির বেড়িয়ে এসে বন্যার দিকে এক পলক তাকালো। সহসা দু চোখ আঁটকে গেছে। নিজে পছন্দ করে কেনা ড্রেস যখন প্রিয় জন পড়ে তখন মনে অন্য রকম প্রশান্তি কাজ করে। তানভির মুগ্ধ নয়নে বন্যার দিকে

তাকিয়ে আছে। বুকের ভেতরের ভূকম্পন কোনোমতেই সামাল দিতে পারছে না। আবির এগিয়ে এসে বলল, “চাবিটা দে, গাড়ি আমি চালাচ্ছি। ” তানভিরের বুক থেকে সানগ্লাস টা খুলে তানভিরের চোখে দিয়ে বলল, ” সাবধান, সে কিন্তু তোর বোনের থেকেও বেশি চতুর, মানসম্মান ডুবাইস না। হিরো হতে এসে ভিলেন হয়ে যাইস না।” আবিরের গাড়িতে বসে একবার পেছনে দেখে নিল। তানভির পাশের সীটে গিয়ে বসেছে, তার দৃষ্টি কোথায় কে জানে। আবির অতি সতর্কতার সহিত গাড়ি চালাচ্ছে। পেছনে মীম, মেঘ আর বন্যা নিজেদের মধ্যে গল্প করতে ব্যস্ত, মাঝে মাঝে আদিও তাতে সঙ্গ দিচ্ছে। সবাই ঘন্টাদুয়েক ঘুরাঘুরি করেছে, এই ফাঁকে মেঘ বন্যাকেও বেশ কিছু ছবি তুলে দিয়েছে। ঘুরাঘরি শেষে বন্যাদের বাসায় যাওয়ার সময় মেঘ বন্যার ছবি দেখে একটা ছবি সিলেক্ট করে দিল ফে*সবুকে পোস্ট করার জন্য। বন্যা আর মেঘ আস্তেধীরে কথা বললেও আবির সে কথা শুনে ফেলেছে। আবির সহসা ব্রেক কষল, পিছন ফিরে মেঘ আর বন্যার দিকে এক পলক দেখে গম্ভীর কণ্ঠে বলল, ” ফে*সবুক ছবি দেয়ার অভ্যাস ত্যাগ করো। আজকের পর ফে*সবুকে যেন কারো ছবি না দেখি। ” আবিরের কথা শুনে মেঘ ঠোঁট উল্টিয়ে কাঁদো কাঁদো মুখ করে তাকালো। আবির দেখেও না দেখার মতো করে সামনে তাকিয়ে আবারও গাড়ি স্টার্ট দিল। মেঘ আড়চোখে আবিরকে দেখছে। আবির মিনহাজকে ব্লক দেয়ার পর পর মেঘের ফেসবুক আইডি থেকে মেঘের সব ছবি ডিলিট করে ফেলেছে, মেঘ বিষয়টা তখনই খেয়াল

করেছে, বন্যাকেও জানিয়েছে। আবিরের জেলাসি দেখে সেদিন মেঘ আনমনে অনেকক্ষণ হেসেওছে । তবে আজকে শুধু মেঘকে বলেনি আবির বন্যাকে সহ ওয়ার্ন করেছে। আবির মেইন রোডে গাড়ি থামিয়ে তানভিরকে বলল, " তানভির, বন্যাকে বাসা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আয়।" বন্যা সঙ্গে সঙ্গে বলল, "আমাকে এগিয়ে দিতে হবে না। আমি যেতে পারবো।" আবির রাশভারি কণ্ঠে বলল, " জানি কিন্তু তুমি যেহেতু আমাদের সাথে বেড়িয়েছো তাই আমাদের উচিত তোমাকে বাসা পর্যন্ত পৌছে দেয়া । তানভির যা।" বন্যা আর কথা বাড়ালো না। সবার থেকে বিদায় নিয়ে নেমে গেলো। গলির রাস্তায় তানভির আর বন্যা হাঁটছে। তানভির শান্ত স্বরে বলল, "ঈদ মোবারক। " "ঈদ মোবারক। " কারো মুখে কোনো কথা নেই। বাসার কাছাকাছি আসতেই তানভির পকেট থেকে টাকা বের করে বন্যার দিকে এগিয়ে বলল, "এটা তোমার সালামি, নাও।" "আমার সালামি লাগবে না, ভাইয়া। " ভাইয়া ডাক শুনেই তানভির কপাল গুটিয়ে সূক্ষ্ম নেত্রে তাকিয়ে শক্ত কণ্ঠে বলল, " ভাইয়া ডাকছো আর সালামি নিবা না? মেঘ, মীমও আমায় এত সুন্দর করে ডাকে না।" তানভির বিরক্তি ভরা কণ্ঠে কথা বলায় বন্যা থতমত খেল। কিছু বলার আগেই তানভির আবার জিজ্ঞেস করল, "নিবে কি না?" বন্যা চুপচাপ সালামি নিয়ে তানভিরের দিকে তাকিয়ে মৃদুস্বরে বলল, "সালামি নিলে সালাম করতে হয়, আপনাকে সালাম করি?" বন্যা একটু নিচু হতেই তানভির এক লাফে কয়েক হাত পিছিয়ে গেল তৎক্ষনাৎ রাগী স্বরে বলল, "একদম

না। ” তানভিরের এমন কান্ডে বন্যা ভ্যাবাচেকা খেল। খানিক বাদে বন্যা হাসতে হাসতে এক পা এগুতেই তানভির গাড়ির দিকে ছুটলো। বন্যা দাঁড়িয়ে থেকে একা একায় কিছুক্ষণ হাসলো, তারপর বাসার দিকে চলে গেছে। তানভির কে দৌড়ে আসতে দেখে আবির গম্ভীর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, “কি হয়েছে তোর?” “কিছু না।” “বাসা পর্যন্ত দিয়ে আসছিস?” “নাহ।” আবির মেঘের দিকে তাকিয়ে বলল, “কল দিয়ে জিজ্ঞেস কর বাসায় পৌঁছেছে কি না” মেঘ বন্যাকে কল দিতেই বন্যা সালামি আর সালামের ঘটনা বললো। মেঘ হাসতে হাসতে ফোন কেটে দিয়েছে। তানভিরের স্বভাব ই এমন, সালামি দেয়া দায়িত্ব তাই সকাল বেলায় ছোটদের সালামি দিয়ে দেয়। তবে কেউ তাকে সালাম করতে আসলেই সে ছুটে পালায় । আগে প্রায় সময় ই মেঘ সালাম করার জন্য তানভিরের পিছুপিছু সারা বাড়ি ছুটতো, কিন্তু এখন আর তা করে না। বন্যা জানতো না কিন্তু তানভিরের এক্সপ্রেশন দেখে সে না হেসে থাকতে পারে নি। মেঘ কল কেটে হাসতে হাসতে বলল, “বাসায় পৌঁছেছে। ” “হাসছিস কেনো?” “এমনি। ” তানভির মনে মনে বিড়বিড় করে বলল, ” এই কথাটাও বনুকে বলে দিতে হয়?” আবারও আওড়ালো, ” বোনের বান্ধবীকে পটানোর আগে বোনকেই পটাতে হবে। ” আবির তানভিরের দিকে তাকালো। কিছু একটা কাহিনী করেছে সেটা ঠিকই বুঝেছে আবির তবে কি করেছে সেটা বুঝতে পারছে না। সেসবে তেমন পাত্তা না দিয়ে বাসায় আসছে। ফ্রেশ হয়ে সবার সাথে খেতে বসেছে। পেট যতই ভরা থাকুক, যতই

ঘুরাঘুরি করে আসুক না কেন, ঈদের দিন দুপুরে সবাই একসঙ্গে বসে খেতেই হবে, এটায় এই বাড়ির নিয়ম । আলী আহমদ খানরা আবিরদের জন্যই অপেক্ষা করছিল, আবিররা আসতেই খাওয়াদাওয়ার পর্ব শুরু হলো। অন্যান্য দিন বাড়ির বউ রা না বসলেও ঈদের দিন অন্ততপক্ষে সবার সাথে বসতে হয়। খাওয়া শেষে সবাই সবার মতো রেস্ট নিতে চলে গেছে। আজ রাতে ফুপ্পিদের খান বাড়িতে দাওয়াত দেয়া হয়েছে। বিকেলের পর থেকেই সেই আয়োজনে ব্যস্ত সবাই। আলী আহমদ খান আর মোজাম্মেল খান সোফায় বসে আছেন। ইকবাল খান বন্ধুদের সাথে দেখা করতে চলে গেছেন। আবির, তানভির দুজনেই বাড়িতে। ঈদের দিন তানভির সচরাচর বন্ধুদের সাথে দেখা করে না। মেঘ বিকেলের দিকে মোজাম্মেল খানের দেয়া ড্রেস টা পড়েছে। গাঢ় সবুজ রঙের গর্জিয়াছ ড্রেস, চুলে একটা স্টোনের মুকুট পড়েছে, পেছন দিকে চুলগুলো ছাড়া, একদম রানীর মতো লাগছে। আত্মীয়স্বজন বেড়াতে আসলে মেঘ মীম যথাসাধ্য কাজ করলেও আজ তারা কিছুই করছে না। বিশেষ করে মেঘ ডাইনিং থেকে একটা চেয়ার নিয়ে ড্রয়িং রুমের মাঝ খানে রেখে পায়ের উপর পা তুলে বসে আছে। দুহাতের কনুই অব্দি মেহেদী দেয়া, ম্যাচিং করা সবুজ কাঁচের চুড়িও পড়নে। এক হাতে একটু পর পর চুল ঠিক করছে আর মীম, আদির সাথে বকবক করছে। মেঘের খুদা লাগলে আদিকে এটা সেটা দিতে বলে কারণ সে এই ড্রেস পড়ে কোনোভাবেই রান্নাঘরে যাবে না। আবির ঘুম থেকে উঠে বারান্দা থেকে মেঘের ভাব

ভঙ্গি দেখে নিঃশব্দে হাসছে, অতঃপর শান্ত স্বরে বলল, “তোকে সারাজীবন রাজরানীর মতো যত্নে রাখার তৌফিক আল্লাহ যেন আমাকে দেন। ” আবির নিচে আসতেই আলী আহমদ খান ধীর কণ্ঠে ডাকলেন, “আবির” “জ্বি আব্বু ” “তুমি কি একাউন্ট থেকে টাকা তুলেছো?” “জ্বি” “কেনো?” “একটু দরকার ছিল। কিছুদিনের মধ্যে রেখে দিব।” আলী আহমদ খান তপ্ত স্বরে বললেন, ” আমি রাখার কথা বলি নি আবির, এটা তোমার একাউন্ট তোমার যখন ইচ্ছে টাকা তুলবে। কিন্তু টাকাটা কেনো তুলেছো সেটা আমার জানা প্রয়োজন। ” মীম আস্তে করে বলল, “ভাইয়া, আমাদের অনেক টাকা সালামি দিয়েছে বড় আব্বু। ” আলী আহমদ খান গুরুভার কণ্ঠে বললেন, “এখানে হাজারের কথা হচ্ছে না মা, লাখের কথা হচ্ছে। তাও ৪-৫ লাখ নয়। তুমি যাও এখান থেকে।” আবির নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে আছে। আবিরের নিস্তব্ধতা আলী আহমদ খান সহ্য করলেও মোজাম্মেল খান সহ্য করতে পারলেন না, রাগী স্বরে বললেন, ” ব্যবসায় লস খেলে সেখানে শুধু শুধু টাকা নষ্ট করো না আবির। তোমার যদি মনে হয়, তোমার পক্ষে ব্যবসা চালানো সম্ভব নয়, তবে ছেড়ে দাও। আমাদের ব্যবসাতে মনোযোগ দাও। একাউন্টে টাকা গুলো এমনি এমনি জমা হয়ে যায় না। তোমার আব্বুর কষ্টে জমানো টাকা এগুলো। ” আবির দু আঙুলে কপালে হাত রেখে মেঘের দিকে তাকালো, মনে মনে বিড়বিড় করে বলল, “তোকে পাওয়ার জন্য আর কত বকা আমার খেতে হবে সেটা একমাত্র আল্লাহ ই ভালো জানেন। ” আলী আহমদ খান পুনরায়

বললেন, " দেখো আবির, তুমি যথেষ্ট বড় হয়েছো। কি করলে ভালো হবে কি করলে ক্ষতি হবে সেটা তুমি খুব ভালো বুঝো। যাই করো বুঝে শুনে করবা।" আবির অনচ্ছ হেসে বলল, " আমি যা করি বুঝেই করি আর যা করবো তাও বুঝেই করবো, ইনশাআল্লাহ। " আবির রান্নাঘরের দিকে চলে গেছে।মোজাম্মেল খান রাগী স্বরে বললেন, " ভাইজান, এই ছেলে সত্যি তোমার তো? নাকি কোথাও থেকে তুলে আনছিলা? এমন ঘাড়ত্যাড়ামি করতে আমি আজ পর্যন্ত তোমাকেও দেখি নি। " আলী আহমদ খান মলিন হেসে বললেন, " তুই আবির কে রাগিয়ে দেস বলেই এমন করে " " আরও তুলো মাথায়, আজ নিজের একাউন্ট থেকে টাকা তুলছে, কাল তোমার একাউন্ট থেকে তুলবে। পরশু আমার একাউন্ট থেকে তুলবে। তখনও কিছু বলবা না?" আলী আহমদ খান হেসে বললেন, " আমার একাউন্ট থেকে তুললেও তোর একাউন্ট থেকে তোলার সাহস হবে না " তানভির সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে মনে মনে বলল, " আব্বু, তোমার একাউন্ট থেকে টাকা নিয়ে ভাইয়া কি করবে? তুমি যার নামে টাকা জমাচ্ছো সেই তো ভাইয়ার। " রাতে ফুপ্পিরা এসে খাওয়াদাওয়া করে গেছেন। আগামীকাল বিকেলে রাকিবের গায়ে হলুদ। খুব বড় অনুষ্ঠান না করলেও কাছের মানুষ, আত্মীয় স্বজন রা থাকবে। জান্নাতের শ্বশুর বাড়ির সবাই আগামীকাল দুপুর দিকেই রাকিবদের বাসায় চলে যাবে। এদিকে মেঘ আর মীমকে পাঠানোর জন্য জান্নাত, আইরিন দুজনেই খুব রিকুয়েষ্ট করছে । মোজাম্মেল খান প্রথম দিকে রাজি না হলেও

জান্নাতের জোরাজোরিতে বাধ্য হয়ে রাজি হয়েছেন। আজ সকালে খাবার টেবিলে সবাই উপস্থিত হতেই মোজাম্মেল খান নীরবতা ভেঙে বললেন, “তানভির, আবির আজ বিকেলে তোমরা বাসায় থেকো।” আবির ভ্রু কুঁচকে বলল, ” আমাকে দুপুরের পরে রাকিবের বাসায় যেতে হবে। কেনো চাচ্চু?” “আমার এক বন্ধু আসবে সাথে তার ছেলেও আসবে। ” আবির স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বলল, “আসলে আসবে। আমাকে থাকতে হবে কেনো?” “আসলে ওনারা মেঘকে দেখতে আসবে। যদি পছন্দ হয় তাহলে কথা আগাবে। ” মোজাম্মেল খানের কথায় আবির যেন আকাশ থেকে পড়েছে । তানভির বসা থেকে দাঁড়িয়ে বললো, ” বনুকে দেখতে আসবে মানে? কিসের দেখাদেখি? ” মেঘের মনের ভেতর কালবৈশাখী ঝড় শুরু হয়ে গেছে। আব্বু কি বলছেন, ছেলে দেখতে আসবে মানে, বিয়ে? নিরুদ্বেগ ভঙ্গিতে আবিরের দিকে চেয়ে আছে তবে আবিরের অভিব্যক্তি বুঝার উপায় নেই। বাহিরে আবির যতই শান্ত থাকার চেষ্টা করুক না কেন, রাগে আবিরের শিরা উপশিরা নীল হয়ে গেছে। চুল থেকে কানের পাশ দিয়ে ঘাম পড়ছে। আবির এক আঙুলে ঘাম মুছলো। মোজাম্মেল খান ধীর কণ্ঠে বললেন, ” রফিক, আমার পুরোনো বন্ধু, অনেকবছর পর দেশে আসছে। মেঘকে দেখতে চাচ্ছে তাই বাসায় আসতে বলছি। ” তানভির রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে বলল, ” আমার বোনের কি রূপ বের হয়ছে যে ও কে দেখতে আসবে? আপনি ওনাদের কল দিয়ে আসতে নিষেধ করেন। আমার বোনকে আমি কারো সামনে যেতে দিব না। ” আলী

আহমদ খান ঠান্ডা কণ্ঠে বললেন, “তানভির, মাথা ঠান্ডা করো। ওনারা আসতে চাচ্ছে আসুক। আমরা দেখি, তাদের কথা যদি ভালো না লাগে তাহলে মেঘকে আনবোই না। ” মেঘ আহাম্মক হয়ে বসে আছে। আবিরের দৃষ্টি প্লেটের দিকে। তানভির রাগে উল্টাপাল্টা আচরণ করলেও আবির কোনো কথা বলছে না। তানভিরের বাড়াবাড়ি বুঝতে পেরে আবির বামহাতে তানভিরের উরুতে হাত রাখলো যেন চুপ করে যায়। ইকবাল খানও তানভিরকে থামানোর চেষ্টা করছেন কিন্তু তানভিরের চিল্লাচিল্লি থামার নাম নেই। সে মেঘকে কারো সামনে আসতে দিবে না মানে দিবেই না। আবিরের ইঙ্গিত বুঝতে পেরে তানভিরের মেজাজ আরও তুঙ্গে উঠে গেছে, তানভির ভেবেছিল আবির তার আব্বুকে কিছু বলবে কিন্তু আবির উল্টো তানভিরকে থামতে বলছে। তানভির রাগে ভাতের প্লেট ধাক্কা মে*রে উঠে চলে যাচ্ছে। সবার দৃষ্টি তানভিরের দিকে। ইকবাল খান ভারী কণ্ঠে বললেন, “খাবার টা..! ” তানভির রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে উপরে চলে গেছে। তিনভাই টুকিটাকি আলাপ করছে। আবির কোনোদিকে না তাকিয়ে প্লেটের খাবার শেষ করেই উঠে গেছে। উঠার সময় মেঘের চোখে চোখ পরল। মেঘের চোখ ছলছল করছে, গভীর দৃষ্টিতে আবিরকে দেখছে। হয়তো আবিরের মন বুঝার চেষ্টা করছে। আবির সহসা চোখ সরিয়ে চলে গেছে। টানা ২-৩ ঘন্টা তানভিরকে ডাকার পরও তানভির দরজা খুলছে না। এদিকে মেঘ রুমে শুয়ে শুয়ে কান্না করছে। মীম মেঘের পাশে বসে মেঘকে বুঝানোর চেষ্টা করছে। আবির ছাদে

দাঁড়িয়ে আছে । দুপুরের দিকে তানভির রুম থেকে বেড়িয়ে ফোঁস ফোঁস করে সোজা ছাদে গেল। তানভিরকে দেখে দেখেই আবির নিঃশব্দে হেসে এগিয়ে আসলো। আবিরের হাসি দেখে তানভির রাগে কটকট করে বলল, " তুমি আমার বোনকে বিয়ে করবা নাকি করবা না?" আবির তানভিরকে আলতোভাবে জড়িয়ে ধরে পিঠে আস্তে করে চাপড় মেরে বলল, " এত মাথা গরম করলে কিভাবে হবে ভাই? তুই তো জানিস তোর বোনকে ছাড়া আমি চোখে ঝাপসা দেখি। " " আব্বু এসব কি শুরু করেছে? তুমি কিছু বলো নি কেন?" " তোর বাপের চোখে আমি বহুবছরের জে*লখা*টা আ*সা*মি। আমি যাই বলতে যাব ওনি তার উল্টো মিনিং বের করবেন। তার থেকে চুপ থাকায় শ্রেয়। " "তারমানে বিকেলে তারা বনুকে দেখতে আসবে?" আবির ঠোঁট বেঁকিয়ে হেসে বলল, " বাসায় কে আসলো কে গেলো তাতে আমার মাথা ব্যথা নেই। তবে আমার সম্পত্তির দিকে নজর দিতে গেলে আগে আমার সাথে তাকে বসতে হবে।" তানভির ভ্রু কুঁচকে তাকিয়ে আছে। আবির পকেট থেকে ফোন বের করে তানভিরকে একটা ছবি দেখালো। তানভির ছবি দেখে মুচকি হেসে বলল, " সাবাশ! তুমি আমার বোনের যোগ্য পাত্র।" আবির মেকি স্বরে বলল, " তোর বোনকে বলিস, যেন সাজুগুজু করে থাকে।" " কার জন্য? " "আমার জন্য।" তানভির ভ্রু কুঁচকে বলল, "ঠিক আছে বলল। এখন ফ্রেশ হয়ে তাড়াতাড়ি নিচে আসো। নাটক দেখতে হবে। " "তুই যা আমি আসছি।" আবির আর তানভির আজ সারাদিন বাসায়। তানভির

সোফায় বসে ফোনে গেইম খেলছে। মেঘকে তানভির সাজার জন্য বলেছে, মেঘ সাজা তো দূর চুল এলোমেলো করে পাগলের মতো রুমে শুয়ে আছে। আবিরের উপর রাগে মেঘের গা জ্বলছে। কিছুক্ষণের মধ্যে আবিরও নিচে আসলো। দুই ভাই ই পাঞ্জাবি পরে একেবারে পরিপাটি হয়ে বসেছে। তানভিরের দেখাদেখি আবিরও ফোনে গেইম খেলায় মনোযোগ দিল। মোজাম্মেল খান রুম থেকে বের হতেই তানভির জিজ্ঞেস করল, " আপনার মেহমান কখন আসবে? আমরা কতক্ষণ যাবৎ অপেক্ষা করছি। " মোজাম্মেল খান চোখ সরু করে দুজনকে দেখলো। হালিমা খানের দিকে তাকিয়ে চোখের ইশারায় কিছু জানতে চাইলো। কিন্তু ওনিও ঠিক বুঝতে পারছেন না কিছু। ইকবাল খান এসে আবিরের পাশে বসলেন। এরমধ্যে আলী আহমদ খান রেডি হয়ে রুম থেকে বেড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "ওনারা এখনও আসলো না?" সবাই টেনশন করছে এদিকে আবির, তানভিরের মনোযোগ ফোনে। মালিহা খান আবিরদের কাছে এগিয়ে এসে রাগী স্বরে বললেন, " কোথায় এগিয়ে গিয়ে তাদের নিয়ে আসবি তা না করে তোরা ঘরে বসে খেলছিস?" আবির উদাসীন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, " আমরা ওনাদের জন্য ঠিক কোথায় গিয়ে অপেক্ষা করবো আম্মু?" মোজাম্মেল খান রাশভারি কণ্ঠে বললেন, "যেতে হবে না কোথাও। আমি আগে কল দিয়ে দেখি।" তানভির ভাব নিয়ে বলল, "ঠিক আছে। " মোজাম্মেল খান পর পর ৩ বার কল দেয়ার পর রিসিভ হলো। মোজাম্মেল খান মিষ্টি করে হেসে জিজ্ঞেস করলেন, " তোমরা কখন

আসবে? আমরা তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছি। ” “আমরা আজ আসতে পারবো না বন্ধু। জরুরি কাজে আঁটকে গেছি। ” “কবে আসবা তাহলে?” “বলতে পারছি না। খুব শীঘ্রই আমেরিকা ফিরতে হবে আমাদের । তোমার সাথে পরে কথা হবে আল্লাহ হাফেজ। ” কল কাটতেই তানভির আবিরের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলো। আবিরের ওষ্ঠদ্বয় কিছুটা প্রশস্ত হলো। সহসা আবির স্বাভাবিক ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল, ” ওনাদের আনতে কোথায় যেতে হবে? ” মোজাম্মেল খান সন্দেহের দৃষ্টিতে আবির আর তানভিরের দিকে তাকিয়ে আছে। তাদের ব্যবহার খুব অদ্ভুত ঐদিকে রফিক সাহেবরাও আসবেন না। মোজাম্মেল খান কিছুক্ষণ ভেবে গুরুভার কণ্ঠে বললেন, “তোমরা যে যার কাজে যেতে পারো ” তানভির সোফা থেকে উঠতে উঠতে মীমকে বলল, “এই মীম, বনুকে বল তাড়াতাড়ি রেডি হতে আর তুইও তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে নে, রাকিব ভাইয়ার গায়ে হলুদে যেতে হবে।” আলী আহমদ খান আস্তে করে বললেন, ” রাতে থাকার দরকার নেই। পোগ্রাম শেষ হলে বাসায় চলে এসো।” “আচ্ছা। ” আবির কিছুক্ষণ আগে বেড়িয়েছে। প্রয়োজনীয় কিছু জিনিস কিনে রাস্তায় অপেক্ষা করছিল। তানভির রাস্তা থেকে আবিরকে নিয়ে গেছে। পেছনে মীম আর মেঘ বসা। মেঘ চোখ বন্ধ করে বসে আছে। আব্বুর প্রতি যতটা না রাগ উঠেছিল তার থেকে কয়েকগুণ বেশি রাগ আবিরের উপর। মেঘ নিজেকে নিজে প্রশ্ন করল, ” আবির ভাই কি সত্যিই আমাকে ভালোবাসেন?” রাকিবের বাসায় আসতেই রাকিব সূক্ষ্ম নেত্রে আবিরের

দিকে তাকিয়ে আছে। আবির ভ্রু নাচাতেই রাকিব গুরুতর কণ্ঠে বলল, " আমার কালকে বিয়ে এটা কি তোর মাথায় ছিল?" "থাকবে না কেন?" "জেনে শুনে এত বড় রিস্কে আমায় পাঠিয়ে দিলি যে। আমার কখনো কোনো কাজে ভয় লাগে নি অথচ আজ ভয় লাগছে। রিয়াটার কথা খুব মনে পরছিল, আমার কিছু হলে মেয়েটা বিয়ে ছাড়ায় বিধবা হয়ে যেতো।" আবির মুচকি হেসে বলল, " এত সহজে তোর কিছু হতে দিব না আমি। চিন্তা করিস না। আগে চাচ্চু হবি তারপর.. " এমন সময় মেঘ আসছে। মেঘকে দেখে রাকিব আবিরকে প্রশ্ন করল, "তারপর কি?" "ম*রে যাইস।" "বাহ! আবির বাহ! দেখেছো মেঘ তোমার আবির ভাই আমাকে ম*রে যেতে বলছে। " মেঘ রাশভারি কণ্ঠে বলল, " ওনি তো চান আমরা সবাই ম*রে যাই। তাহলেই ওনি মুক্তি পেয়ে যাবেন।" মেঘের মুখে এমন কথা শুনে আবির ভ্রু যুগল নাকের গুঁড়ায় টেনে নিল। মেঘের মনের এক আকাশ অভিমান যা তার কথাতেই ফুটে উঠছে। রাকিবও স্তব্ধ হয়ে গেছে। এরমধ্যে জান্নাত এসে বলল, "মেঘ চলো, তোমাকে শাড়ি পড়িয়ে দেয়। " "নাহ আপু, শাড়ি পড়ার মতো মন মানসিকতা আমার নেই। " "কেন? কি হয়ছে?" মেঘ ঢোক গিলে আকুল কণ্ঠে বলল, " হয়তো খুব শীঘ্রই আমার বিয়ের দাওয়াত পাবে। " জান্নাত ভ্রু কুঁচকে চেয়ে আছে। মেঘ চোখ মুছে মীমের পাশে সোফায় গিয়ে বসলো। রাকিব জান্নাতকে ইশারা দিতেই জান্নাত ভেতরে চলে চলে গেছে। আবির সোফার কাছে গিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে বলল, " মীম তুই ভেতরে যাহ।" মীম সঙ্গে সঙ্গে

উঠে গেছে। আবির মেঘের পাশে বসে মোলায়েম কণ্ঠে বলল, " কি হয়েছে তোর? এত অভিমান করেছিস কেন?" মেঘের চোখ দিয়ে টুপটুপ করে পানি পরছে। মেঘ দু হাতে বার বার চোখ মুছছে। আবির আবারও জিজ্ঞেস করল, " কথা বলবি না?" মেঘ কাঁদতে কাঁদতে বলল, " মেয়েদের আপন বলতে কেউ থাকে না, যদি কখনো কাউকে আপন মনে হয় তবে তার সঙ্গেই না হয় কথা বলবো। "আবির দু*র্বোধ্য দৃষ্টিতে মেঘের ক্র*ন্দনরত ধৃষ্টতায় চেয়ে আছে। মেঘের নিরন্তর কান্নায় আবিরের হৃ*দয় ভে*ঙেচু*রে ত*ছনছ হয়ে যাচ্ছে তবুও নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে শান্ত স্বরে বলল, "নিষ্করুণ এই পৃথিবীতে হয়তো কেউ আছে যে তোকে তার পৃথিবী মনে করে, তোর সামীপ্যে তার মন অনুরঁজিত হয় । খোঁজে দেখিস তোর আশেপাশে এমন কেউ আছে যে তোর কণ্ঠস্বর শুনার জন্য প্রতিনিয়ত ছটফট করে। চিৎকার করে বললেই কেউ কারো আপন হতে পারে না। " মেঘ কাঁদছে আর বিড়বিড় করে বলছে, "সেই কেউ টা কি সারাজীবন কেউ হয়েই থাকবে?" আবির মৃদু হেসে বলল, "হয়তো না। সময় হলে ঠিকই আপন করে নিবে।" মেঘ আড়চোখে আবিরকে দেখে তাচ্ছিল্যের স্বরে বলল, " হ্যাঁ, তবে আমাকে নয় হয়তো আমার লা**শ টাকে। " আবির তেজঃপূর্ণ কণ্ঠে চিৎকার করল, "একটা থা*প্প*ড় মারবো তোকে।" কথাটা বলতে বলতে হাত উপরে তুললো আবির। ক্রু*দ্ধ আঁখিতে চাইলো মেঘের অভিমুখে, ক্রোধে আবিরের নাকের ডগা ফুলে উঠেছে। মেঘ কিছুটা সরে গিয়ে তাকালো আবিরের দিকে, ভয়ে হাত

পা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে। আবির সঙ্গে সঙ্গে হাত নামিয়ে নিল। মেঘ ভ্রু কুঁচকে ভেজা কণ্ঠে বলল, “থামলেন কেনো? এখন থা*প্প*ড় দিলে অনুভব করতে পারবো লা**শ হয়ে গেলে তো আর পারবো না। দেন” আবির আবারও চিৎকার করল, “মেঘ।” আবির উঠে পাশে থাকা একটা কাঠের চেয়ারে শরীরের সর্বশক্তি দিয়ে লা*থি মেরে রুম থেকে বেড়িয়ে গেছে। মেঘ কিছুক্ষণ সে পথে নিশ্চুপ চেয়ে রইলো তারপর সোফার উপর দুই পা তুলে হাঁটুতে মুখ লুকিয়ে বসে আছে। মেঘ এখানে আসতে চাইছিল না কিন্তু তানভির জোর করে নিয়ে আসছে। এখানে আসার পর থেকে তানভির, আসিফ আর আরিফ আড্ডায় মগ্ন হয়ে আছে। ১০ মিনিটও হয় নি আবির এক গ্লাস শরবত নিয়ে আসছে। মেঘের মাথায় হাত রাখতেই মেঘ আঁতকে উঠে তাকালো। আবির পাশে বসে শান্ত স্বরে বলল, “শরবত টা খান। ” মেঘ শক্ত কণ্ঠে বলতে চাইলো, ” খাবো না।” কিন্তু আবিরের আ*গ্নে*য়গি*রির লা*ভা*র ন্যায় লা*ল বর্ণের দুচোখে চোখ পড়তেই ভ*য়ে আর কিছু বললো না। শরবতের গ্লাস নিয়ে ঢকঢক করে গ্লাস ভর্তি শরবত শেষ করে ফেলল। আবির ধীর হস্তে মেঘের দুচোখ মুছে ঠান্ডা কণ্ঠে বলল, ” গায়ে হলুদের পোগ্রামে এসে এভাবে কাঁদলে মানুষ উল্টাপাল্টা ভাববে। এখন শান্ত হ, কিছুক্ষণ রেস্ট নে পরে বাসায় গিয়ে আবার কাঁদিস। ” মেঘ আকুল কণ্ঠে শুধালো, ” আমি কাঁদলে আপনার বুঝি খুব ভালো লাগে?” আবির মনে মনে আওড়াল, ” তোর চোখে পানি দেখলে কলিজা ফেটে যায় আমার।” আবির একপলক মেঘের দিকে

তাকিয়ে উঠে চলে যাচ্ছে। মেঘ মলিন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, ” কিছু বললেন না?” আবির কোনো উত্তর না দিয়ে বেড়িয়ে গেছে। আবিরের এমন আচরণে মেঘের বড্ড অভিমান হলো। আবির বেড়িয়ে যেতেই জান্নাত, আইরিন, মীম একে একে ডেকে গেছে কিন্তু মেঘকে এক চুলও নাড়াতে পারে নি। আবির বাসা থেকে বেড়িয়ে কোথায় যেন চলে গেছে, রাকিব ফোনের পর ফোন দিচ্ছে। আগামীকাল রাকিবের বিয়ে কোথায় একটু আনন্দ করবে, কিন্তু বন্ধুর জন্য তারও উপায় নেই। এক ঘন্টা পেরিয়ে যাচ্ছে আবির ফোন ধরছে না, বাসায়ও ফিরছে না। রাকিব, আসিফ, তানভির একের পর এক কল দিয়েই যাচ্ছে। কারো কল ই রিসিভ করছে না আবির। মেঘ চুপচাপ বসে বসে সবার কর্মকাণ্ড দেখছে, মনের ভেতরে ভয় হচ্ছে ঠিকই কিন্তু সে কল দিবে না বলে জেদ ধরে বসে আছে। প্রায় দেড় ঘন্টা পর আবির বৃষ্টিতে অর্ধেক ভিজে বাসায় আসছে। আবিরকে দেখেই রাকিব হুঙ্কার দিয়ে উঠল, “কোথায় গেছিলি তুই?” “তোর গেস্টদের সাথে দেখা করতে। ” “ফোন ধরে বলা যাইতো না? তোর যন্ত্রণায় কি বিয়েটাও করতে পারবো না?” আবির মলিন হেসে বলল, “সরি। ” রাকিব এবার গলার স্বর নিচু করে জিজ্ঞেস করল, “কি হয়ছে আবির?” “আরে কিছু হয় নি।” আবির রুমে ঢুকতেই মেঘের দিকে এক পলক তাকালো, আবিরকে রুমে ঢুকতে দেখেই মেঘ পা নামিয়ে স্বাভাবিকভাবে বসেছে। আবির একটা চেয়ার টেনে একপাশে বসে পরেছে, আইরিন তাড়াতাড়ি করে একটা টাওয়েল নিয়ে আসছে। আবিরের অর্ধেক শরীর ভেজা।

আইরিন স্বাভাবিক স্বরে বলল, “নাও মাথাটা মুছো, আমি আসিফ ভাইয়ার একটা শার্ট নিয়ে আসি। ” আবির গম্ভীর কণ্ঠে বলল, “টাওয়েল, শার্ট কিছুই লাগবে না আমার। ” আইরিন ভ্রু কুঁচকে ভারী কণ্ঠে বলল, “এমনিতেই ভিজে আসছো আবার মাথাও মুছতেছো না। পরে কিন্তু সর্দি লেগে যাবে ” আবির ভাবুক স্বরে বলল, ” তারপর কি নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে ম*রে যাবো?” আইরিন কপট রাগ দেখিয়ে বলল, ” বাজে কথা বলো কেন, নাও মাথা মুছো ” আবির ভারী কণ্ঠে বলল, ” ম*রে গেলে মাথা মুছে কি করবো? নিয়ে যা টাওয়েল।” মেঘ তড়িৎ বেগে বসা থেকে উঠে এসে আইরিনের থেকে টাওয়েল নিয়ে শক্ত কণ্ঠে বলল, “আইরিন একটা শার্ট নিয়ে আসো।” আইরিন শার্ট আনতে চলে গেছে। মেঘ আবিরের চুল মুছতে মুছতে রাগী স্বরে বলল, ” আমি কাউকে ম*রে যেতে বলি নি।” এমন সময় রাকিব ওদের ডাকতে রুমে আসছে, এই দৃশ্য দেখে দুহাতে মুখ লুকিয়ে ঠাট্টার স্বরে বলল, ” আমি মনে হয় ভুল রুমে চলে আসছি। এখন কি করবো?” আবির তপ্ত স্বরে বলল, ” মাফ চা ।” মেঘ আবিরকে থামিয়ে স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, ” আপনি ঠিক রুমেই এসেছেন, ভেতরে আসুন।” রাকিব ঠাট্টার স্বরে আবারও বলল, ” বন্ধু আমার ভুল হয়ে গেছে। মাফ করে দিস।” রাকিব বিড়বিড় করতে করতে রুমে আসলো, ” যেই জীবনে এমন যত্ন পেলাম না সেই জীবনের প্রতি ধি*ক্কার জানায়।” মেঘ টাওয়েল সরিয়ে আবারও সোফায় গিয়ে বসলো। এই রুমে কোনো মানুষজন নেই। গায়ে হলুদের মঞ্চ ভেতরের

দিকে একটা বড় রুমে করা হয়েছে। আত্মীয় স্বজন এমনকি তানভিররাও মঞ্চের কাছেই আড্ডা দিচ্ছে। মেঘের ভালো লাগছিল না বলে এই রুমে এসে বসে ছিল, মেঘের জন্য আবিরও এই রুমেই এসে বসেছে। রাকিব মঞ্চে যায় আবার একটু পর পর আবির মেঘকে নিতে আসে। আইরিন আশিফের একটা শার্ট মেঘকে দিয়ে চলে গেছে। মেঘ শার্ট এগিয়ে দিয়ে স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, " এটা পড়ে আসুন।" " শার্ট পড়ে কি হবে? ম*রে গেলে তো লা*শ ই হয়ে যাব।" মেঘ এবার অগ্নিদৃষ্টিতে তাকালো, মেঘের ইচ্ছে করছিল আবিরের মুখ চেপে ধরতে কিন্তু পারলো না। রাকিব রুম থেকে বেড়িয়ে যেতে যেতে রাগী স্বরে বলল, " ৫ মিনিটের মধ্যে তোদের নাটক শেষ করে যদি ভেতরে না আসিস তাহলে তোদের দু'টাকে মে*রে আমি কা*ল জে*লে চলে যাব।" মেঘ মৃদু হেসে বলল, " তাহলে রিয়া আপু কি করবে?" " কি আর করবে? জে*লখা*না*র বাহিরে বসে কাঁ*দবে। তোমরা তো আর কোনো উপায় রাখতেছো না।" আবির গম্ভীর কণ্ঠে বলল, " মুখ টা বন্ধ করে যা, আমরা আসতেছি।" আবির পাঞ্জাবি খুলে সেকেন্ডের মধ্যে শার্ট পড়ে ফেলেছে। মেঘ আবিরের ভেজা পাঞ্জাবি হাতে নিয়ে কপাল গুটিয়ে প্রশ্ন করল, "আপনি কোথায় গেছিলেন? আর এত ভিজলেন কিভাবে ?" আবির সরু নেত্রে তাকিয়ে মৃদু হেসে বলল, "তোর না হওয়া শ্বশুর আর তার ছেলেটাকে দেখতে গেছিলাম।" আবির রুম থেকে বেড়িয়ে যাচ্ছে, মেঘ নিঃশব্দে হেসে প্রশ্ন করল, " পছন্দ হয়েছে?" আবির ঘাড় ঘুরিয়ে চাপা স্বরে বলল, " খুব।" মেঘ মিটিমিটি

হাসছে, এতক্ষণ যাবৎ মনের কোণে জমে থাকা অভিমান গুলো মুহুর্তেই গায়েব হয়ে গেছে। বিকেলে মেহমান না আসার কারণ টা মেঘ এখন খুব ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছে। চোখ- মুখ মুছে ঠোঁটে প্রশান্তির হাসি নিয়ে মঞ্চে গেল। মীম মেঘকে দেখেই জিজ্ঞেস করল, "মন ভালো হয়েছে তোমার?" "হুমমমমমম।" "এখন কিভাবে ভালো হলো?" মেঘ মীমের কানের কাছে বিড়বিড় করে বলল, " আমাকে আজ যাদের দেখতে আসার কথা ছিল আবির ভাই তাদের... " মীম আতঙ্কিত কণ্ঠে শুধালো, "কি করেছে?" মেঘ মেকি স্বরে বলল, " তেমন কিছু না, তুই বুঝবি না।" মেঘকে হাসিখুশি দেখে সবাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছে। ফুপ্পি আগেও কয়েকবার মেঘের কাছে যেতে চেয়েছিল কিন্তু জান্নাত যেতে দেয় নি।কারণ ফুপ্পি মেঘকে বুঝাতে গেলে দেখা যাবে দুজনেই কেঁদে একাকার অবস্থা করে ফেলবে। ছেলের শ্বশুর বাড়িতে এসে শ্বাশুড়ি কাঁদছে বিষয়টা আত্মীয়রা ভালো চোখে নিবে না তাই জান্নাত ওনাকে মেঘের কাছে যেতে দেন নি। প্রায় ২-৩ ঘন্টা গায়ে হলুদের প্রোগ্রাম চলেছে। বাহিরে ঝুম বৃষ্টি হচ্ছে সাথে বজ্রপাত। আলী আহমদ খান আবিরকে কল দিলেন। আবির রিসিভ করে বলল,"হ্যাঁ আব্বু, বলো।" "কি করছো?" " এখন খাবো, খেয়েই বের হবো।" আলী আহমদ খান ঠান্ডা কণ্ঠে বললেন, " যদি থাকার সমস্যা না থাকে তাহলে আজ রাত টা ওখানেই থাকো। দিনের অবস্থা খুব ই খারাপ কখন কোন অঘটন ঘটে বলা যায় না। আজ আসার দরকার নেই। " "আচ্ছা, ঠিক আছে। " আবির সবাইকে জানিয়ে

দিয়েছে। গভীর রাতে সবাই একসঙ্গে খেতে বসেছে। মেঘের প্রচন্ড মাথা ব্যথা করছে, সারাদিন যাবৎ কাঁদতে কাঁদতে এখন মাথা ব্যথায় চোখ মেলতে পারছে না। খেতেও ইচ্ছে করছে না আবিরের জোরাজোরিতে কোনো রকমে অল্প খাবার খেয়ে ঔষধ খেয়ে ঘুমিয়ে পরেছে। মেঘ, মীম, আইরিন সবাই এক রুমে শুয়েছে। মাঝরাতে কারো কান্নার শব্দে হঠাৎ করেই মেঘের ঘুম ভেঙে গেছে। একে অপরিচিত জায়গা, আশেপাশে সব অন্ধকার। কান্নার শব্দ ধীরে ধীরে বাড়ছে, মনে হচ্ছে কোনো ছেলে কাঁদছে। মেঘের মনে আতঙ্ক আর কৌতূহল দুটায় বাসা বেঁধেছে। ধীরে ধীরে শুয়া থেকে ফ্লোরে পা রাখতেই কোনো মানুষের পায়ে পা লাগলো ওমনি মেঘ লাফ দিয়ে উঠেছে । তারপর মনে পড়লো রাকিব ভাইয়ার ২-৩ টা কাজিন রাতে এই রুমে শুয়েছিল। মেঘ ভয়ে ভয়ে রুম থেকে বের হলো। দুটা রুম পরে একটা রুমে আলো জ্বলছে সেটা সোফার রুম আর সেই রুম থেকেই কান্নার শব্দ আসছে। মেঘ বুক ফুলিয়ে শ্বাস ছেড়ে নিজেকে ধাতস্থ করে পা বাড়ালো সেই রুমের উদ্দেশ্য। যত এগিয়ে যাচ্ছে, পুরুষালী কণ্ঠের কান্নার শব্দ তত বেশি তীব্র হচ্ছে। আশেপাশে দু একজনের চাপা স্বর ভেসে আসছে। মেঘ রুমের দরজায় দাঁড়াতেই চমকে উঠলো। ফুপ্পি সোফায় বসে আছেন, আবির ফ্লোরে হাঁটু গেড়ে বসে ফুপ্পির উরুতে মাথা রেখে হাউমাউ করে কাঁদছে। আবিরের একপাশে তানভির অন্যপাশে আসিফ ফ্লোরে বসে আবিরকে শান্ত করার চেষ্টা করছে। ফুপ্পি আবিরের মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে আর

আবির অঝোরে কাঁদছে। জান্নাত আশিফের পাশে সোফায় বসা। হঠাৎ দরজায় মেঘকে দাঁড়ানো দেখে জান্নাত হিমশীতল কণ্ঠে ডাকল, “মেঘ, তুমি এখানে?” মেঘের দৃষ্টি আবিরের পানে, মেঘের বুকের ভেতরটা ছলাৎ ছলাৎ করছে। আবির ভাইকে এভাবে কাঁদতে দেখে কাদম্বিনীর দম বন্ধ হয়ে আসছে, হৃৎস্পন্দন থেমে গেছে। জান্নাতের মুখে মেঘের নাম শুনে আবির সহ সবাই আঁতকে উঠল। মেঘ রুমে ঢুকতে ঢুকতে আর্তনাদ করে উঠল, “কি হয়েছে ওনার?” আবির চোখ মুছে সঙ্গে সঙ্গে রুম থেকে বেড়িয়ে গেছে। আবিরের পেছন পেছন তানভিরও বেড়িয়েছে। মেঘ আবারও জিজ্ঞেস করল, “আবির ভাইয়ের কি হয়েছে, ফুপ্পি? ওনি কাঁদছিলেন কেনো?” ফুপ্পিও ভেতরে ভেতরে কাঁদছেন। আসিফ স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, ” তেমন কিছু হয় নি, এমনি খারাপ লাগছিল। তোমার না মাথা ব্যথা? যাও, ঘুমাও গিয়ে। ” মেঘ একবার ফুপ্পিকে দেখছে আবার আসিফ ভাইয়াকে দেখছে আবার জান্নাত আপুকে দেখছে। আসিফ আবারও বলল, ” ঘুমাতে যাও, মেঘ।” জান্নাতের চোখে চোখ পড়তেই সেও ইশারা দিলো। মেঘ আবারও এসে রুমে শুয়েছে। কিন্তু কোনোভাবেই ঘুম আসছে না। চোখের সামনে বার বার আবিরের কান্নারত মুখমণ্ডল ভেসে উঠছে। মনের আকাশ অমাবস্যার ন্যায় ঘুটঘুটে অন্ধকার হয়ে গেছে, কোথাও এক বিন্দু আলোর ছিটেফোঁটাও নেই। আবির কেনো কাঁদছিল, কি হয়েছে কিছুই বুঝতে পারছে না। বুকের ভেতর ভীষণ রকমের যন্ত্রণা হচ্ছে। রুমে অফুরন্ত বাতাস থাকার স্বত্তেও মেঘ বুকভরে নিঃশ্বাস

নিতে পারছে না, মনে হচ্ছে কিছু একটা গলা চেপে ধরে আছে। এপাশ ওপাশ হাসফাস করতে করতে মেঘ আবারও ঘুমিয়ে পরেছে। সকালে নাস্তা করেই আবিররা বাসার উদ্দেশ্যে বেড়িয়ে পরেছে। তানভির গাড়ি চালাচ্ছে আবির চোখ বন্ধ করে পাশের সীটে বসে আছে। মেঘ আবিরকে জিজ্ঞেস করার সুযোগ খোঁজছে কিন্তু কোনোভাবেই পাচ্ছে না। আবির আর তানভির বাসায় এসে শাওয়ার নিয়ে রেডি হয়ে দুপুরের দিকে আবারও বেড়িয়েছে। রুমে শুয়ে বসে কোনোভাবেই মন টিকছে না মেঘের । বন্যাকে কল দিয়ে কিছুক্ষণ কথা বলেছে তবুও মন স্থির হচ্ছে না। মেঘ নিচে আসতেই আলী আহমদ খান জিজ্ঞেস করলেন, " তোমরা বিয়েতে যাও নি?" মেঘ আস্তে করে বলল, " যেতে ইচ্ছে করছিল না।" "শরীর খারাপ? " "নাহ।" আলী আহমদ খান মেঘকে খানিক দেখে মোলায়েম কণ্ঠে বলল, " কি নিয়ে এত দুশ্চিন্তা করো?" মেঘ মৃদু হেসে বলল, "দুশ্চিন্তা করি না বড় আব্বু। " আলী আহমদ খান ধীর কণ্ঠে বলল, "আম্মু, এক কাপ চা করে দিতে পারবে?" "এখনি নিয়ে আসছি। " "আমি চিনি কম খায়। " মেঘ মলিন হেসে বলল, " জানি, বড় আব্বু।" মেঘ কিছুক্ষণের মধ্যেই এককাপ চা নিয়ে আসছে। আলী আহমদ খান এক চুমুক চা খেয়ে হেসে বললেন, "মাশাআল্লাহ, চা খুব ভালো হয়েছে।" মেঘ মাথা নিচু করে বিড়বিড় করে বলল, " চা ভালো না লাগলে সত্যি কথা বলতে পারেন।আমি কিছু মনে করব না।" "বসো।" মেঘ চুপচাপ পাশের সোফায় মাথা নিচু করে বসেছে। আলী আহমদ খান ভারী কণ্ঠে

বলে উঠলেন, ” শুনো, কোনোকিছু ভালো না লাগলে আমি যেমন সরাসরি বলতে পারি তেমন ভালো হলে প্রশংসাও করতে পারি। চা টা সত্যিই ভালো হয়েছে। তার থেকেও বড় বিষয় তোমার বড় আম্মুর সাহায্য ছাড়া তুমি প্রথমবার আমার জন্য এত ভাল চা করেছো,তারজন্য ধন্যবাদ। ” ” আপনাকেও ধন্যবাদ, বড় আব্বু। ” আলী আহমদ খান ধীর কণ্ঠে শুধালেন, ” আম্মু, তোমার কি মন খারাপ?” বড় আব্বুর ধীর কণ্ঠে বলা কথাতে মেঘের মন গলে গেছে। চোখ ছলছল করছে, মাথা তুলে তাকাতে পারছে না। ঠোঁটে জোর করে ধরে রাখা মিথ্যা হাসিটা আর ধরে রাখতে পারছে না। মেঘ ঢোক গিলে শীতল কণ্ঠে বলল, “নাহ।” মেঘ আর বসে থাকতে পারলো না। চিবুক নামিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠে নিজের রুমে চলে গেছে। গত রাত থেকে অস্থির হয়ে থাকা মন টা ক্ষণে ক্ষণে কেঁপে উঠছে। আবির আর তানভির বেশ রাত করে বাসায় ফিরেছে ততক্ষণে সবাই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। আবির সকালে উঠেই কোথায় বেড়িয়েছে। আজ আবিরদের বাসার সবার দাওয়াত, মেঘ যেতে না চাইলেও সবার জোরাজোরিতে বাধ্য হয়ে যাচ্ছে। মেঘ দূর থেকে রিয়া আপুকে দেখছে। মেয়েটাকে জান্নাত আপুর বিয়েতে দেখেছিল তখন সে রাকিব ভাইয়ার প্রেমিকা ছিল আজ সে বউ বেশে বসে আছে। মেঘ মনে মনে আওড়াল, “পূর্ণতা পাওয়া ভালোবাসা গুলো একটু বেশিই সুন্দর। রাকিব ভাইয়ার ৭ বছরের ভালোবাসা আজ পূর্ণতা পেয়েছে। কত ঝড়-ঝাপটা পেরিয়ে ওনারা এক হতে পেরেছেন এটা শুধু ওনারাই জানেন। আমি তো এক

বছরের পরিশ্রান্ত হয়ে গেছি, ৭ বছর ধৈর্য রাখা আমার পক্ষে অসম্ভব। রাকিব ভাইয়া আর রিয়া আপু আপনাদের ভালোবাসা আজীবন বেঁচে থাকুক। " হঠাৎ মেঘের নজর পরলো রিয়া হাতের ইশারায় মেঘকে ডাকছে। মেঘ সহসা এগিয়ে গেল। রিয়া বসা থেকে উঠে মেঘকে জড়িয়ে ধরলো। আকস্মিক ঘটনায় মেঘ বেশ আশ্চর্য হলো। বিয়া শান্ত স্বরে বলল, " আবির ভাইয়া হেল্প না করলে আমাদের বিয়েটায় হতো না। ভাইয়াকে অনেক ধন্যবাদ ।" মেঘ কপালে ভাঁজ ফেলে জিজ্ঞেস করল, " ওনার ধন্যবাদ আমাকে কেনো দিচ্ছেন?" রিয়া মৃদু হেসে বলল, "ওনাকে তো জড়িয়ে ধরতে পারবো না তাই তোমাকে জড়িয়ে ধরলাম। " রিয়া অপ্রতিভ কন্ঠে আবারও শুধালো, " বাই দ্য ওয়ে, আবির ভাইয়াকে জড়িয়ে ধরার অনুমতি কি তুমি কোনো মেয়েকে দিবে?" মেঘ সঙ্গে সঙ্গে চোখ গোল করে তাকালো, বুকের ভেতরের ক্রোধ টা দীর্ঘনিঃশ্বাস হয়ে বেড়িয়ে আসলো। ক্রোধিত কন্ঠে বলল, "নাহ।" রিয়া মেঘের দু গালে হাত রেখে মোলায়েম কন্ঠে জানতে চাইলো, " আবির ভাইয়াকে খুব ভালোবাসো তাই না?" মেঘের বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠেছে, দুচোখ ছলছল করছে। মেঘ সঙ্গে সঙ্গে চোখ নামিয়ে নিয়েছে। রিয়া ঠোঁটে হাসি রেখে বলল, " এই মেঘ, একদম কাঁদবে না। তোমার আবির ভাই দেখলে আমার সর্বনাশ করে ফেলবে। " "কেনো?" রিয়া ঢোক গিলে নিজেকে সংযত করে বলল, "ভাববে আমি তোমাকে বাজে কথা বলেছি। " মেঘ হুট করে প্রশ্ন করে বসলো, " আপু, আবির ভাইয়া কোথায় জানেন? ওনার কি

হয়েছে বলতে পারবেন?" " কি হয়েছে সঠিক জানি না তবে ওদের কথোপকথন শুনে মনে হয়েছে ভাইয়া কোনো বিষয় নিয়ে খুব বেশি ডিপ্রেশনে আছেন। " "কি বিষয়?" "সেটা বলতে পারবো না গো। ওরা দুই বন্ধু এমন ধাতু দিয়ে তৈরি যা শেয়ার করবে না তা পেটে বো*ম্ব মারলেও বলবে না। তুমি সাবধানে থেকো, আর ভাইয়ার যত্ন নিও যদিও আমি জানি তুমি খুব কেয়ারিং। " মেঘ কপাল গুটালো। এমন সময় রাকিব এসে বলল, " কি ব্যাপার আমার অবর্তমানে আমাকে নিয়ে কি আলোচনা চলছে?" রিয়া ঠাট্টার স্বরে বলল, "আহ! আসছে আমার সেলিব্রিটি গো। তাকে নিয়ে আমাদের আলোচনা করতে হবে। " রাকিব সহাস্যে বলল, " আমকে নিয়ে আলোচনা না করলে কি হবে আমার বন্ধুকে নিয়ে ঠিকই করেছো। বলো করো নি?" রিয়া ভেংচি কেটে বলল, "হ্যাঁ করেছি। তো?" "আমার বন্ধু সেলিব্রিটি হলে তার বেস্টফ্রেন্ড হিসেবে আমিও সেলিব্রিটি। " "ওহ আচ্ছা। এই নিয়ম কবে থেকে চালু হলো?" "আজ এই মুহুর্ত থেকে।" মেঘ তাদের খুন শুঁটি দেখছে আর হাসছে। রাকিব হঠাৎ মেঘের দিকে তাকিয়ে বলল, "এই মেঘ, তুমি তো কিছুই খেলে না, তাড়াতাড়ি খেতে যাও। আবির তোমার জন্য না খেয়ে উপরে অপেক্ষা করছে। " মেঘ উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, "আবির ভাই কখন আসছেন?" "অনেকক্ষণ।" মেঘ দ্রুত ছুটছে। রিয়া রাকিবের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, " তুমি না কিছুক্ষণ আগে বলে গেলা ভাইয়া আসে নি। " "আরে মাত্রই আসছে।" "তাহলে মেঘকে অনেকক্ষণ বললা কেনো?" "আবিরের প্রতি মেঘের

এই উদগ্রীব টা দেখতে খুব ভালো লাগে। আবির বলতেই মেয়েটা অজ্ঞান।” রিয়া ফোঁস করে শ্বাস ছেড়ে গম্ভীর কণ্ঠে বলল, “তোমরা দুই বন্ধু শুধু মেয়েদের কষ্টই দিতে পারো। মেয়েটা আবির ভাইয়ার জন্য এত পাগল তারপরও ভাইয়া কিছু বলে না কেন?” “মেঘের এক বছরের ভালোবাসা দেখেই তুমি হতাশ অথচ আবির কতগুলো বছর যাবৎ নিজের সাথে নিজে লড়াই করে চলেছে সে বেলায়?” মেঘকে ছুটতে দেখে দেখে আবির কপাল গুটিয়ে ধীর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, “এভাবে ছুটছিস কেন?” “আপনি কোথায় ছিলেন?” “একটু কাজ ছিল। খাস নি শুনলাম। কেনো? খিদে পায় নি?” “নাহ। ” আবির কপট দুষ্টামির স্বরে বলল, “পেটের তিনভাগ যদি রাগ, জেদ আর অভিমানে ভরে থাকে বাকি একভাগে তো পানিই থাকে। তাহলে আর খিদা লাগবে কেন?” মেঘ ওষ্ঠ উল্টে বিড়বিড় করে বলল, ” মোটেই না।” ” সবাই খেয়েছে তুই খাস নি কেন?” “আপনি আসছিলেন না তাই।” ” কল দিয়ে বলছিলি একবার?” মেঘ চোখ পিটপিট করে তাকালো, ধীর কণ্ঠে বলল, ” মনে ছিল না। ” আবির তপ্ত স্বরে বলল, ” বাহ! খুব ভালো। ” ঈদের বেশ কিছুদিন কেটে গেছে। আবিরদের অফিস শুরু হয়ে গেছে, ভার্সিটিও খুলে গেছে। রাকিব আর রিয়া হানিমুনে গেছে তাই আবিরের একা সবকিছু সামলাতে হচ্ছে। দুই অফিস সামলে রীতিমতো হিমসিম খাচ্ছে আবির। এক বিকেলে মেঘকে কল দিল আবির। মেঘ কল রিসিভ করতেই আবির বলল, ” আমাকে দেয়ার মতো একটুখানি সময় কি হবে আপনার?” আবিরের

আহ্লাদী কণ্ঠে বলা কথা শুনে মেঘ মুচকি হেসে বলল, “কেনো হবে না? আপনি চাইলেই হবে।” “তাহলে রেডি হয়ে বের হন। ” মেঘ রেডি হয়ে বের হতেই দেখলো একটা রিক্সা দাঁড়ানো। মেঘ আশপাশে আবিরকে খোঁজছে কিন্তু আবির কোথাও নেই। অনেকটা সামনে যেতেই দেখল আবির একটা গাছের নিচে দাঁড়ানো। মেঘ ডাকতেই রিক্সায় উঠে বসলো। মেঘ আবিরের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, ” বড় আব্বু তো সেদিন আপনাকে বাইক চালানোর অনুমতি দিয়েছে তাহলে আপনার বাইক কোথায়?” “অফিসে।” “রিক্সা দিয়ে কোথায় যাচ্ছি?” “দেখি কোথায় যেতে পারি। ” অনেকটা পথ গিয়ে দুজনেই রিক্সা থেকে নামলো। কোলাহল শূন্য একটা রাস্তা। হঠাৎ দু একটা গাড়ি আপন গতিতে ছুটছে। আবির মেঘকে নিয়ে একটা কালো রঙের নতুন ঝকঝকে প্রাইভেট কারের কাছে গিয়ে থামলো। আবির মৃদু হেসে প্রশ্ন করল, “গাড়িটা কেমন?” মেঘ নিরুদ্বেগ ভঙ্গিতে বলল, ” ভালোই।” “পছন্দ হয় নি?” “কার না কার গাড়ি। আমি পছন্দ করে কি করবো?” আবির উদাস ভঙ্গিতে বলল, ” গাড়িটা আজ ই কিনেছি। কেমন হয়েছে?” মেঘের ভাবলেশহীন জবাব, ” আপনার সাথে ফাইজলামি মানায় না।” আবির ভ্রু গুটিয়ে বলল, ” আমি ফাইজলামি করতে যাব কেন? সত্যি সত্যি আমার গাড়ি। এই যে চাবি ” মেঘ অবিশ্বাস্য দৃষ্টিতে আবিরের হাতে থাকা চাবিটার দিকে তাকিয়ে রইলো। ঢোক গিলে উষ্ণ স্বরে জানতে চাইল, ” আপনি গাড়ি কিনেছেন?” “জ্বি, ম্যাডাম। ” “কিন্তু কেন?” আবির ভারী কণ্ঠে বলল, “গাড়ি পছন্দ হয়েছে কি না

সেটা বল?” মেঘের গাড়ির দিকে মনোযোগ নেই। রাগী স্বরে বলল, ” গাড়ি আমি দুচোখে সহ্য করতে পারি না।” আবির মুচকি হাসলো। মেঘ উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, ” আপনার বাইক কোথায়?” “অফিসে। কেন?” মেঘ কাঁদো কাঁদো মুখ করে আবারও শুধালো, ” আপনি গাড়ি কেনো কিনলেন?” আবির মৃদু হেসে বলল, ” মাঝে মাঝে নিজের অবস্থান বুঝাতে তীব্র অপছন্দের জিনিসকেও পছন্দের তালিকায় যুক্ত করতে হয়। ” মেঘ শীতল কণ্ঠে বলল, ” আপনি বাইক চালাবেন নাকি গাড়ি?” আবির মেকি স্বরে বলল, ” আমি বাইক চালাবো আর তুই গাড়ি। ” মেঘ স্ব শব্দে হেসে বলল, “আমি গাড়ি চালালে আপনার গাড়ি আহত হবে আর আমি নি...!” আবির অগ্নিদৃষ্টিতে তাকাতেই মেঘ মুখ বন্ধ করে ফেলেছে। আবির স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, “চল, ঘুরে আসি। ” মেঘ আবিরের পাশের সীটে বসে আবিরের দিকে তাকিয়ে আছে। আবির বাইক কেনাতে বাইকে উঠার জন্য মেঘ যতটা আগ্রহী ছিল, গাড়িতে উঠার জন্য সেই আগ্রহের এক অংশও নেই। ইট পাথরের শক্ত দেয়ালের মতোই খান বাড়ির প্রতিটা মানুষ পাষাণ হয়ে যাচ্ছে। সবাই সবার আপন হওয়া স্বত্তেও মাঝে মাঝে নিষ্ঠুর মানবের ন্যায় আচরণ করে। আলী আহমদ খান একায় দুটা গাড়ি কিনেছেন, ইকবাল খান নিজের টাকায় আলাদা গাড়ি কিনেছেন, অবশেষে আবিরও গাড়ি কিনেছে। এ যেন প্রতিযোগিতা চলছে, নিজেদের অবস্থান যাচাই এর প্রবল প্রতিযোগিতা। আবির হঠাৎ ই মেঘের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, ” গাড়ি কিনেছি বলে রাগ

করেছিস?” মেঘ মলিন হেসে বলল, ” নাহ, রাগ করি নি। আপনার ইচ্ছে হয়েছে তাই কিনেছেন এতে রাগ করার কি আছে?” মেঘ এবার ঠান্ডা কণ্ঠে বলল, “একটা কথা জিজ্ঞেস করি?” “হুমমম।” “রাকিব ভাইয়ার গায়ে হলুদের রাতে আপনি কাঁদছিলেন কেনো?” বেশকিছু সময় নিশ্চুপ থেকে আবির তপ্ত স্বরে বলল, ” নিজের করা ভ্রান্তিগুলো অতর্কিতে বুকের ভেতর প্রদীপ্ত আগুনের উত্তাপ সৃষ্টি করলে সহস্রবার চেষ্টার পরও নিজেকে অবিচল রাখা যায় না। ” মেঘ কিছুই বুঝতে পারে নি তাই প্রতিত্তোরে কিছু বলতেও পারলো না। ঘন্টাখানেক মেঘকে নিয়ে ঘুরে অবশেষে রাস্তার একপাশে গাড়ি থামালো আবির। আশেপাশে অনেক মানুষ। মেঘ আবিরের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, “আমরা এখানে কেনো আসছি?” এমন সময় মিনহাজ আর তামিম এগিয়ে আসছে। ওদের দেখেই মেঘ গম্ভীর কণ্ঠে বলল, “আমি এখানে থাকবো না।” আবির মেঘের হাত ধরে আঁটকে দিল। মিনহাজ আর তামিম এগিয়ে এসে কোমল কণ্ঠে বলল, “সরি ভাই।” আবির মৃদু হেসে দুজনের সাথে হ্যান্ডশেক করতে করতে বলল, “কোনো ব্যাপার না।” মেঘ রাগে কটমট করছে। আবির এত স্বাভাবিক ভাবে কথা বলছে দেখে মেঘের আরও বেশি রাগ হচ্ছে। মিনহাজ আর তামিম আবিরের সাথে টুকিটাকি কথা বলছে। আর মেঘ ভেতরে ভেতরে ফুঁসছে। হঠাৎ কেউ একজন পেছন থেকে মেঘের চোখে ধরে, মেঘ চোখে হাত রেখে বুঝার চেষ্টা করল। আনমনেই বলল, “বন্যা?” বন্যা চোখ ছেড়ে দিয়ে সামনে এসে বলল, “হ্যাঁ বেবি।” পেছন থেকে

মিষ্টিরাও বেড়িয়ে আসছে। সবাইকে দেখে মেঘের মন আবারও খারাপ হয়ে গেছে। আবির স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, “মেঘ, যা হয়েছে সব ভুলে যা। একটা সময় পর পরিবার থেকেও বন্ধুরা আপন হয়। তুই এখন সেই সময়ে আছিস। সামান্য বিষয় নিয়ে রাগ করে থাকিস না, প্লিজ।” মেঘ রাগে ফোঁস করে বলল, ” ঐটা সামান্য বিষয় ছিল না আর আমার কোনো বন্ধুর প্রয়োজন নেই। ” আবির শান্ত স্বরে বলল, ” প্লিজ মেঘ, এত রাগ করে থাকিস না। ” মিষ্টি, মিনহাজ, তামিম কানে ধরে সরি বলছে। মেঘ তবুও মুখ ফুলিয়ে রেখেছে। মেঘ রাগে কটকট করে বলল, “আপনি বাসায় না গেলে আমি একায় চলে যাব।” মিনহাজ আর তামিম কাঁদো কাঁদো মুখ করে বলল, ” তোর পায়ে ধরলে মাফ করবি আমাদের?” মেঘ রাগী স্বরে বলল, “নাহ। তোরা তোদের মতো থাক আমি আমার মতো থাকবো।” আবির মেঘকে নিজের দিকে ঘুরিয়ে মোলায়েম কণ্ঠে বলল, ” আমি চাই না আমার কারণে তুই তোর বন্ধুদের সাথে এমনভাবে সম্পর্ক নষ্ট করে দেস। ঐটা শুধুই একটা এক্সিডেন্ট ছিল আর কিছুই না। ওখানে কারো দায় ছিল না বুঝার চেষ্টা কর। তুই নিজেকে আর কষ্ট দিস না, প্লিজ।” “আমি পারবো না। আমি ভুল করেছি আমি আমার ভুলের শাস্তি হিসেবে নিজেকে একা করেছি। আমি একায় থাকবো। ” আবির ঠান্ডা কণ্ঠে বলল, ” আমার কথা মানবি না?” মেঘ এবার থামলো। চোখ ছোট করে আবিরের দিকে তাকিয়ে রাগী স্বরে বলল, ” আপনি ওদের সাথে মিশার জন্য এত জোর করছেন কেনো?” আবির মলিন হেসে

বলল, " জানি না। কিন্তু আমি চাই তুই ওদের সাথে আগের মতো চলাফেরা কর। তুই আমার কথা মানবি কি না বল?" মেঘ কিছুক্ষণ চুপ থেকে গম্ভীর কণ্ঠে বলল, " আমি ওদের সাথে কথা বললে আপনি যদি খুশি হোন তাহলে আমি কথা বলবো।" "ধন্যবাদ।" আবির সবার থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেছে। আড্ডা দেয়া শেষ হলে নিতে আসবে। মেঘরা কিছুটা এগিয়ে গিয়ে শান্তশিষ্ট জায়গা দেখে বসলো। মিষ্টি উদগ্রীব হয়ে বলল, " সরি মেঘ, আমাদের করা দুষ্টামি তে এত বড় বাঁশ খাবো ভাবতেই পারি নি। প্লিজ মাফ করে দে। " তামিম গম্ভীর কণ্ঠে বলল, "আসলে আমাদের জায়গা থেকে যেটাকে ঠিক মনে হয়েছিল আমরা সেটায় করেছি কিন্তু আমাদের করা কাজটা যে ভুল ছিল সেটা বুঝতেই পারি নি।" বন্যা গম্ভীর কণ্ঠে বলল, " আমি বহুবার তোদের সাবধান করেছিলাম, তোরা আমার কথা পাত্তায় দেস নি। তোদের জন্য তানভির ভাইয়ার কাছে কত বক খেতে হয়েছে আমার। এর দায় কে নিবে?" মিনহাজ গলা খাঁকারি দিয়ে বলল, " আসলেই আমাদের সেদিন তোর কথা শুনা উচিত ছিল। একমাত্র তুই ই ঠিক ছিলি।" মিষ্টি বলে উঠল, "বন্যা মেঘের ব্যাপারে বরাবর ই ঠিক থাকে, আমরাই বার বার ভুল প্রমাণিত হয়। আসলে আমরা মেঘের সত্যিকারের বন্ধু না। ডিপার্টমেন্টে পরিচয়, হয়তো ৪-৫ বছর একসঙ্গে পড়বো তারপর যে যার মতো সব ভুলে চলে যাব। কিন্তু বন্যা, সে কিন্তু সেই স্কুল জীবন থেকে মেঘের সাথে আছে। মেঘ কেমন, ওর ইচ্ছে, পছন্দ -অপছন্দ সবকিছু বন্যা সবচেয়ে বেশি জানে অথচ আমরা

বন্যার কথা না শুনে নিজেরা মায়া দেখিয়ে উল্টো বিপদে পড়লাম।” তামিম গম্ভীর কণ্ঠে বলল, “সত্যি ই বন্যার মতো বান্ধবী পাওয়া ভাগ্যের বিষয়।” মেঘ বলল, ” সেই ঘটনার পর আমিও বুঝেছি বন্যা ছাড়া আমার আর কোনো বন্ধু নেই যে সত্যি ই আমার ভালো চাই।” মিষ্টি খানিক থেমে আবারও বলল, “এই মেঘ, বন্যা তো তোর বেস্টফ্রেন্ড তাই না?” “হুমমমম। একমাত্র বেস্ট ফ্রেন্ড। ছোট থেকে অনেক বান্ধবী হারিয়েছি কিন্তু বন্যা সবসময় আমার পাশে ছিল আর এখনও আছে। আল্লাহ বোধহয় চান আমরা সবসময় একসাথে থাকি।” বন্যা হেসে বলল, “হ্যাঁ, এজন্যই তো দুজনে এক সাবজেক্টে চান্স পেয়েছি।” মিষ্টি মেঘের দিকে তাকিয়ে ধীর কণ্ঠে বলল, ” মেঘ তুই চাইলে তোদের সম্পর্কটা সারাজীবন এমন রাখতে পারবি।” “কিভাবে?” মিষ্টি মোলায়েম কণ্ঠে বলল, ” বন্যাকে তানভির ভাইয়ার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিলে বন্যা তোর ভাবি হয়ে যাবে তাহলে তোদের সম্পর্ক আজীবন এমনই থাকবে, ইনশাআল্লাহ।” বন্যা চেঁচিয়ে উঠলো, ” জীবনেও না, পা*গলের মতো কথা বলিস না।” মেঘ কিছুক্ষণ চুপ থেকে হঠাৎ বলল, “সত্যি ই তো। আমি এটা কোনোদিন ভাবি নি কেনো?” মেঘ বন্যার দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বলল, ” বেবি তুমি কি আমার ভা.....’ বন্যা মেঘের মুখ চেপে ধরে রাগী স্বরে বলল, ” আপনি যাকে অফারটা দিচ্ছেন সে আপনার তাড় ছিঁড়া অফার শুনার জন্য একদম প্রস্তুত নয়, সরি।”মেঘ নিজের মুখ থেকে বন্যার হাত সরিয়ে লম্বা করে শ্বাস নিয়ে বলল, ” আমি যা চাই তাই পাই,

তোকে আমার ভাবী হিসেবে চাইছি ইনশাআল্লাহ সেটাও পেয়ে যাব।” বন্যা হুঙ্কার দিয়ে উঠলো, “তোর আজগুবি ইচ্ছে পূরণ হওয়ার নয়। ” মেঘ মুখ ফুলিয়ে কপাল গুটিয়ে সূক্ষ্ম নেত্রে বন্যার দিকে তাকিয়ে আছে। সাদিয়া বলে উঠল, ” পূরণ হওয়ার নয় কেনো? তুই কি অন্য কাউকে পছন্দ করিস?” বন্যা কিছু বলার আগেই মেঘ গর্জে উঠে বলল, ” নাহ। বন্যা কাউকে পছন্দ করে না আর করবেও না। করলে শুধু আমার ভাইয়াকেই করবে।” এরমধ্যে মিনহাজ বলল, ” মেঘ তুই এতদিনে একটা সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছিস। আমরা আজ আছি কাল নেই, কিন্তু তোর ভাবি করে নিলে বন্যা সারাজীবন তোর পাশে থাকবে। ” বন্যার নাকের ডগা লাল বর্ণ ধারণ করেছে, রাগে চোখ মুখ আগুনের মতো হয়ে গেছে। চোয়াল শক্ত করে বন্যা বলল, ” তুই আর কথা বলিস না, ভন্ড কোথাকার। সেদিন তো খুব করে বলছিলি, কার এত সাহস যে মেঘের গায়ে হাত তুলবে। আমি দেখবো,মেঘকে বাঁচাবো। পরে কোথায় ছিল বাঁচানোর ক্ষমতা? আবির ভাইয়ার এক ধমক খেয়েই তো স্তব্ধ হয়ে গেছিলি। ” মিনহাজ ঢোক গিলে উষ্ণ স্বরে বলল, ” ধমক খেয়ে স্তব্ধ হয়নি, অন্য কারণে হয়ছিলাম।” সাদিয়া জিজ্ঞেস করল, “কি কারণে?” “তোদের বলা যাবে না কারণ তোরা ভয় পাবি।” মিষ্টি গম্ভীর কণ্ঠে বলল, “ভাব কম নিয়ে, বল। ” মিনহাজ কপাল চুলকিয়ে বিড়বিড় করে বলল, “সেদিন আবির ভাইয়ার কাছে কিছু একটা ছিল সেটা বুঝতে পেরেই আমি ভ*য়ে চুপ করে গেছিলাম।” মেঘ ভ্রু কুঁচকে তাকিয়ে আছে, দৃষ্টিতে তিক্ততা। বন্যাও

মুখ বেঁকিয়ে চেয়ে আছে। সাদিয়া আর মিষ্টি বেশ কৌতূহলী। সাদিয়া নিচু স্বরে জিজ্ঞেস করল, “কি ছিল?” “ভয় পাবি না তো?” “নাহ, বল।” মিনহাজ ঢোক গিলে ধীর কণ্ঠে বলল, “রি*ভল...” মেঘ সঙ্গে সঙ্গে গর্জে ওঠে, ” চুপ কর মিনহাজ। আবির ভাইকে কি তোর গু*ন্ডা মনে হয়?আমার আবির ভাইয়ের নামে আর একটা বাজে কথা বললে আমিই তোকে শেষ করে ফেলবো। ” মিনহাজ ভ্রু গুটিয়ে ভাবলেশহীন জবাব দিল, “আমি জানি তোরা বিশ্বাস করবি না তাই তোদের এতদিন কিছু বলিও নি। তাছাড়া মেঘ শুন, আবির ভাইকে গু**ন্ডা বলছি না আমি। শুধু বলছি ওনার কাছে এইরকম কিছু একটা আছে। ” বন্যা ফোঁস করে বলল, ” বাজে কথা বলিস না মিনহাজ। আবির ভাইয়াকে দেখেই তুই ভয় পেয়ে চুপসে গেছিস সেটা স্বীকার কর। ” মিনহাজ গম্ভীর কণ্ঠে বলল, ” ওনাকে দেখে ভয় পাইলে হয়তো ভ*য়ে পালাইতাম, না হয় শুরু থেকে চুপ করে স্ট্যাচুর মতো দাঁড়িয়ে থাকতাম। কিন্তু তোদের মনে আছে কি না জানি না আমি কিন্তু ঠিকই কথা বলতে এগিয়ে গেছিলাম । ওনার ধমক খেয়ে থামছি ঠিক আছে কিন্তু আমার নজর ছিল ওনার হাতের দিকে, ওনি বারবার পেছন থেকে কিছু একটা বের করতে চাইছিলেন কিন্তু ওনার বন্ধু হাত চেপে ধরে বার বার বারণ করছিল। আমি যতক্ষণ মাথা নিচু করে দাঁড়িয়েছিলাম ততক্ষণ শুধু সেদিকেই তাকিয়ে ছিলাম।” মেঘ অবিশ্বাস্য কণ্ঠে বলল, ” তুই বললি আর আমি বিশ্বাস করে ফেলবো। জীবনেও না।” “বিশ্বাস করতে হবে না যেদিন সচক্ষে দেখবি সেদিন আমার এই

কথাটা মনে করিস তাহলেই হবে । অবশ্য তোর সামনে ওনার ঐ রূপটা আসার সম্ভাবনা খুবই কম।” সাদিয়া নম্রভাবে জিজ্ঞেস করল, “কেনো?” মিনহাজ ফের বলল, ” মেঘের সামনে আবির ভাইয়া খুব ফর্মাল অথচ আড়ালে....” মেঘ ভারী কণ্ঠে শুধালো, ” আবির ভাইয়ের কাছে যদি সত্যিই কিছু থাকতো ওনি এক্সিডেন্ট করার পর কোথায় হওয়া হয়ে গেছিল? হাসপাতালে তো আমি সর্বক্ষণ ওনার সাথে ছিলাম। দেখি নি কেন?” মিনহাজ স্ব শব্দে হেসে বলল, “ওনাকে হাসপাতালে যে আনছিল এই কথাটা তাকে জিজ্ঞেস করিস। ” মেঘ কপাল কুঁচকে ভাবছে। সেদিন মেঘরা হাসপাতালে যাওয়ার আগেই আবিরকে রুমে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিল তাছাড়া তানভির ভাইয়াও সেখানে ছিল না। তাহলে কি মিনহাজের বলা কথায় সত্যি? মেঘ নিজের মাথায় নিজে গাট্টা মেরে মনে মনে বিড়বিড় করল, “আমি কি ভাবছি এসব?” বন্যা মেঘকে এক পলক দেখে ধমকের স্বরে বলল, “চুপ করবি? তোদের আজেবাজে কথা শুনে ইচ্ছে করতেছে ঐ লাঠি টা দিয়ে তোর মা*থায় মা*রি।” তামিম এবার করুণ স্বরে বলল, ” হ্যাঁ, একেবারে মে*রে ফেল। কপালের কোন ফেরে যে তোদের দুটার সাথে বন্ধুত্ব হয়ছিল একমাত্র আল্লাহ ভালো জানেন। একজন তিনদিন বন্দি..” মিনহাজ তামিমকে গুতা দিতেই তামিম চুপ করে গেছে। বন্যা তৎক্ষনাৎ জিজ্ঞেস করল, “এই মিনহাজ, তখন তিনদিন তোরা কোথায় ছিলি? কি হয়ছিল তোদের সাথে?” “সেসব বলা বারণ।” সাদিয়া ঠাট্টা করে বলল, “মা*ইর কেমন খাইছিলি?” তামিম আস্তে করে বলল,

“শুরুটা অশুভ হলেও শেষটা খুব উৎকৃষ্ট ছিল, মনের রাখার মতো। ” মিষ্টি হালকা ধমকের স্বরে বলল, ” আগের কাহিনী বাদ দে। আজকের দিনে আয়। বন্যা এবার তুই কিছু বল।” বন্যা রাগী কণ্ঠে বলল, ” আমি নতুন করে কিছু বলতে চাই না। মেঘ আমার বেস্ট ফ্রেন্ড আমি সারাজীবন বেস্ট ফ্রেন্ড হিসেবেই ওকে সাপোর্ট করবো, ইনশাআল্লাহ। ” মেঘ রাগান্বিত কণ্ঠে বলল, ” এমন বহু বেস্ট ফ্রেন্ড দেখেছি যারা শুরুর দিকে একে অপরকে ছাড়া বাঁচে না, প্রয়োজন শেষে কিংবা দুজনের দূরত্ব বেড়ে গেলে যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়। চোখের আড়াল থেকে ধীরে ধীরে মনের আড়ালও হয়ে যায় আমি তেমন সম্পর্ক চাই না। আল্লাহ যেহেতু আমাদের এতবছর একসাথে রেখেছেন আশা করবো বাকি জীবনও রাখবেন। আজ এই মুহুর্তে তোদের সাক্ষী রেখে বন্যাকে আমি আমার ভাবি হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে দিচ্ছি। বন্যা এখন চাইলেও আমার ভাইকে ছাড়া কাউকে ভালোবাসতে পারবে না। বন্যা আমার ভাবি, আজ থেকে আমি বন্যাকে ভাবি ডাকবো এটায় ফাইনাল। ” বন্যা গম্ভীর কণ্ঠে বলল, ” সব বিষয়ে পা*গলা*মি করিস না,এটা সম্ভব না মেঘ। ” মেঘ শক্ত কণ্ঠে বলল, ” সম্ভব অসম্ভব আমায় বলতে হবে না। আমি এতকিছু শুনতেও চাই না। তুই আমার ভাবি মানে ভাবি ই । এ বিষয়ে আমি আর একটা কথাও শুনতে চাই না। ” বন্যা কপাল গুটিয়ে মেঘকে দেখছে। মেয়েটা একদমে কথাগুলো বলে শেষ করে ঘনঘন নিঃশ্বাস ছাড়ছে। মেঘ ইদানীং শান্ত স্বরে কথা বলে কাউকে মানাতে না পারলে তৎক্ষনাৎ

আবিরের মতো শক্ত আর সাবলীল ভঙ্গিতে নিজের ইচ্ছেকে অন্যের উপর চাপিয়ে দেয়, আজও তাই করছে। মেঘের এমন পাগলামিতে বন্যা বরাবরই অভ্যস্ত। কিছুদিন আগেই আবিরের মুখে ভালোবাসি শুনতে উঠেপড়ে লেগেছিল, সেই ঝামেলা মিটলো কি না আবারও আরেক পাগলামিতে মেতেছে। মেঘকে যে যা বলে যদি ওর সেটাকে ঠিক মনে হয় তাহলে সেটা নিয়েই হৈচৈ শুরু করে। এতদিন যা কিছু নিয়েই হৈ-হুল্লোড় করুক না কেনো আজ মেঘের পাগলামির মূল কেন্দ্রবিন্দু বন্যা। তানভিরের প্রতি বন্যার কোনোকালেই তেমন আগ্রহ ছিল না। মেঘকে করা শাসন দেখেই বন্যা ভীত হয়ে থাকতো। তানভির বাসায় থাকলে কখনো মেঘদের বাসায়ও যেতো না, কথা বলা তো দূরের বিষয়। বছরখানেক যাবৎ ফোনে মাঝেমধ্যেই কথা হয় তানভির আর বন্যার তবে সেখানেও থাকে বিশাল এক সীমাবদ্ধতা। প্রয়োজনের বাহিরে তানভির দু একটা কথা জিজ্ঞেস করলেও বুক কাঁপে বন্যার। বন্যা বরাবরই স্পষ্টভাষী একটা মেয়ে, কোনোকিছু ভালো না লাগলে মুখের উপর না বলতে দুবার ভাবে না। কিন্তু মেঘের সাথে সেভাবে কথা বলতে পারে না, কারণ মেঘ খুব অভিমানী। একবার মন খারাপ করে ফেললে এত সহজে ঠিক হয় না। আবিরের কথায় হয়তো মিনহাজদের সাথে কথা বলছে ঠিকই তবে পূর্বের মতো স্বাভাবিক বন্ধন আর কখনও হবে না। তবে মেঘের আজকের পাগলামি বন্যাও স্বাভাবিকভাবে নিতে পারছে না। বন্যা ভ্রু কুঁচকে তাকিয়ে আছে, মেঘকে কিভাবে থামাবে সেসব ভেবেই বুক কাঁপছে বন্যার, অসহনীয়

ব্যথা অনুভব হচ্ছে বুকে। মিনহাজ হুট করে বলে ফেলল, " আজ থেকে সবাই মেঘ আর বন্যা দুজনকেই ভাবি ডাকবি। বুঝলি?" মেঘ, বন্যা,সাদিয়ারা সবাই একসঙ্গে শুধালো, "কেনো?" মিনহাজ মুখে হাসি রেখে বলল, "মেঘ আবির ভাইয়ার বউ তারমানে আমাদের ভাবি আর বন্যা তানভির ভাইয়ার বউ..." বন্যা ধমক দিয়ে বলল, "মেঘকে ডাকতে ইচ্ছে হলে ডাক। আমায় কিছু ডাকতে আসবি না।" তামিম লম্বা করে শ্বাস টেনে ফোঁস করে ছেড়ে উদাসীন ভঙ্গিতে বলল, "থাক ভাই আমরা কোনো রিস্ক নিতে চাই না। আজ থেকে মেঘও ভাবি, তুইও ভাবি।" মেঘ গম্ভীর কণ্ঠে বলল, " আবির ভাইয়ের সাথে আমার বিয়ে হয় কি না সন্দেহ। ভাবি ডেকে আমার কোমল মনে আর আঘাত দিস না।" মিনহাজ মুখে হাসি রেখে বলল, " আমরা এতকিছু জেনে কি করবো, বাঁচতে হলে ভাবি ডাকা ছাড়া উপায় নাই। আর ভাবি প্লিজ আমাদের মাফ করে দিবেন। আর বন্যা ভাবি প্লিজ আপনিও আমাদের মাফ করে দিবেন।" বন্যা রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে বলল, " আমাকে একদম ভাবি ডাকবি না। মেঘ পাগলামি করছে, সাথে তোরাও শুরু করছিস?" তামিম মৃদুস্বরে বলল, " মেঘের ভাবি অথবা অন্য কারো বউ যাই হোস না কেন ঘুরে ফিরে আমাদের ভাবিই হবি। তাই তোরা দুজনেই আমাদের ভাবি। " মেঘ নিজের হাঁটুর উপর হাত রেখে মেকি স্বরে বন্যাকে ডাকল, " ভাবি..... ঐ ভাবি। " বন্যা অগ্নিদৃষ্টিতে মেঘের দিকে তাকাতেই মেঘ আতঙ্কে কিছুটা পিছিয়ে ওষ্ঠ উল্টে বিড়বিড় করে বলল, " দেখো ভাবি, তুমি আমার সাথে এমন ব্যবহার করতে পারো

না। আমি কিন্তু ভাইয়াকে বিচার দিব। আমি না তোমার একমাত্র ননদিনি, একটু সুশ্রীর মতো তাকাও, মিষ্টি করে হাসো তবেই না মনে শান্তি লাগবে। " বন্যার মুখটা মলিন হয়ে আছে। নাক মুখ দেখেই বুঝা যাচ্ছে ভেতরে ভেতরে রাগ পুষছে। দাঁতে দাঁত চেপে ধরে মেঘের পাগলামিগুলো সহ্য করছিল কিন্তু আর পারছে না। বন্যা রাগী স্বরে বলতে শুরু করল, "মেঘ, তোর এই পাগলামির কোনো ভিত্তি নেই । তুই আমার বেস্ট ফ্রেন্ড তোর সাথে আমার ভালো সম্পর্ক আছে সেটা ভিন্ন কথা। সেখানে পরিবার টানা একদম ই উচিত না। তোর ভাই যেই রাগী হঠাৎ প্রয়োজন ২ টা কথা বলতেই আমার ১০ বার ভাবতে হয় সেখানে ওনার প্রতি অন্য কিছু আমি কখনো ভাবতে পারি না। আমি তোর পাগলামির মানে ঠিকই বুঝতে পেরেছি কিন্তু তোর এই ইচ্ছে পূরণ করার সাধ্য আমার নেই।" মেঘ প্রশ্ন করল, "আমার ভাইকে অপছন্দ করার একমাত্র কারণ টায় কি রাগ নাকি অন্যকিছু?" "অন্যকিছু মানে?" "কিছু না।" বন্যা ঢোক গিলে চুপচাপ বসে আছে। আরও ৩০ মিনিটের মতো চললো এই নিরব যুদ্ধ । মিনহাজ, তামিম, মিষ্টি, সাদিয়াও বন্যাকে বুঝানোর চেষ্টা করছে কিন্তু বন্যা নিজের জায়গায় অনড়। মেঘ কিছুক্ষণ জোর গলায় চেচামেচি করে হঠাৎ ই শান্ত হয়ে গেছে। প্রায় ১৫ মিনিট যাবৎ মেঘ নিশ্চুপ হয়ে বসে আছে, বন্যা বেশ কয়েকবার খেয়াল করেছে। মেঘের অভিমান বুঝেও বন্যা কিছু বললো না। মেঘ হঠাৎ ই ধীর স্বরে বলল, " প্লিজ তোরা এবার থাম। সরি বন্যা।" বন্যার সাথে সাথে সবাই ভ্রু কুঁচকে মেঘের দিকে

তাকালো। মেঘের চোখ মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। বন্যা রাজি হয় নি বলে মেঘের মন এত তাড়াতাড়ি খারাপ হয়ে যাবে এমন মেয়ে মেঘ নয়, মেঘের গাম্ভীর্যতা দেখে বন্যার ভয় হচ্ছে। কোন কথা থেকে কোন মানে বের করে গাল ফুলিয়েছে এটা বুঝা দুষ্কর। বন্যা এবার আদুরে ভঙ্গিতে বলল, "কি হয়েছে,বেবি?" মেঘ বন্যার দিকে এক পলক তাকালো তবে দৃষ্টিতে বিন্দুমাত্র উত্তাপ নেই। বন্যা মলিন মুখ করে আবারও বলল, "বেবি, তুমি কি রাগ করেছো?" মেঘ জিভ দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে অনুষ্ণ কণ্ঠে বলল, ' নাহ, রাগ করি নি।" মিনহাজ জিজ্ঞেস করল, " তো কি হয়েছে ভাবি?" মেঘ মিনহাজের দিকে তাকিয়ে মলিন হাসলো। এভাবে বাহিরের কারো মুখে ভাবি শুনতে মেঘের বেশ ভালোই লাগছে। সহসা বন্যার দিকে এক নজর তাকিয়ে মিনমিনে স্বরে বলল, " মানুষ নিরন্তর সুখের নীড় খুঁজে, কষ্ট আড়াল করে প্রতিনিয়ত স্বভাবসিদ্ধ হাসে। " মেঘের বলা কাব্যিক কথার মানে কেউ ই বুঝলো না। তামিম ধীর কণ্ঠে জানতে চাইলো, " কি হয়েছে মেঘ?" মেঘ কণ্ঠ খাদে নামিয়ে বলল, "সরি বন্যা, আমার ঐরকম ভাবে জোর করা একদম ই উচিত হয় নি। " বন্যা তপ্ত স্বরে বলল, "কি হয়েছে তোর? প্লিজ বল।" মেঘ ঢোক গিলে গলা খাঁকারি দিয়ে বলতে শুরু করল, " আমার পরিবার যেমন ছোট থেকেই আমার ব্যাপারে খুব সিরিয়াস তেমনি আমিও আমার পরিবারের ব্যাপারে সিরিয়াস। প্রতিটা মানুষের মতো আমার মনেও পরিবারের প্রতি সফ্ট কর্নার আছে যা হয়তো সারাজীবন থাকবে। আমার পরিবারের অভ্যন্তরীণ সমস্যার কথা আমি

এত সহজে কাউকে বলি না এমনকি বন্যাকেও না। আমার মন খারাপের সময় টা নিজেকে গুটিয়ে রাখি তবুও বন্ধুদের ফ্যামিলি প্রবলেম শেয়ার করি না। আবির ভাই ব্যতীত বাসার সবার সাথেই আমার খুব ভালো সম্পর্ক। এমনকি যেই তানভির ভাইয়া আমায় ছোট থেকে কড়া শাসনে রেখে আমাকে বড় করেছে তাকে আমি খুব ভালোবাসি। " শেষ কথাটা বলতেই মেঘের চোখ বেয়ে দু ফোঁটা পানি গাল বেয়ে গড়িয়ে পরলো। সাদিয়া জিজ্ঞেস করল, " তোর পরিবারে কি সমস্যা? কিছু হয়েছে?" মেঘ চোখের পানি মুছে ভেজা কণ্ঠে আবারও বলতে শুরু করল, "একটা সময় পর্যন্ত ভাইয়ার প্রতি আমার ক্ষোভের অন্ত ছিল না, সবকিছু অসহ্য লাগতো কিন্তু হঠাৎ সবকিছু কেমন যেনো বদলে গেছে। একদিন আমি স্কুল থেকে ফিরে দেখি ভাইয়া ড্রয়িংরুমের ফ্লোরে বসে দুহাতে মাথা চেপে ধরে কাঁদছে। আম্মু আর বড় আম্মু ভাইয়াকে বুঝানোর চেষ্টা করছে। অন্যদিকে আব্বু আর বড় আব্বু যা তা বলে চিৎকার করছে। আমার ছোট্ট মস্তিষ্কে তখন কিছুই ঢুকছিল না। ভাইয়া তখন উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী ছিল, কিছুদিন পর পরীক্ষা অথচ ভাইয়ার অবস্থা নাজেহাল হয়ে পরছিল। আমি আম্মুকে অনেকবার জিজ্ঞেস করেও সঠিক তথ্য জানতে পারি নি। বড়রা আমার থেকে কিছু একটা লুকাতে প্রতিনিয়ত ব্যস্ত থাকতো। আমিও কৌতূহলী হয়ে জানতে চেষ্টা করলাম, তারপর মোটামুটি যা বুঝেছি, ভাইয়া কলেজে পড়াকালীন এক মেয়ের সাথে পরিচয় হয়েছিল, মূলত মেয়েটা নিজে থেকেই ভাইয়ার সাথে বন্ধুত্ব করেছিল

তাও প্রায় ১ বছর ভাইয়ার পিছু পিছু ঘুরে। ১ বছর পর থেকে ভাইয়া মেয়েটার সাথে টুকিটাকি কথা বলা শুরু করে যা একপর্যায়ে সম্পর্কের দিকে এগোয়। ভাইয়ার টেস্ট পরীক্ষার আগে আগে মেয়েটা হঠাৎ ভাইয়াকে প্রপোজ করে বসে। যেহেতু মেয়েটার সাথে ভাইয়ার ভালো সম্পর্ক ছিল তাই ভাইয়াও রাজি হয়ে গেছিলো। পরীক্ষার ব্যস্ততায় প্রায় এক মাস কেটে যায় এরপর ভাইয়ার এক ফ্রেন্ড ভাইয়াকে মেয়েটার ব্যাপারে কিছু তথ্য দেয়, ভাইয়া প্রথমে একদমই বিশ্বাস করে নি কিন্তু পরবর্তীতে খোঁজ নিয়ে জানতে পারে ভাইয়ার বন্ধুর বলা প্রতিটা কথায় সত্যি ছিল। তারপর থেকেই ভাইয়ার অবস্থা খারাপ হয়ে গেছিলো, একের পর এক অসুস্থতা লেগেই ছিল। প্রায় ৬ মাস ভাইয়া দুনিয়ার কোনো খবর বলতে পারে নি, ইয়ার লস গেছে। তারপর ধীরে ধীরে কিছুটা সুস্থ হয়েছে। পড়াশোনায় ই-রেগুলার হওয়ার পর থেকে আব্বুর সাথে ভাইয়ার সম্পর্কের বিশাল ফাটল ধরেছে। বড় আব্বুও তেমন কথা বলতো না। শরীর সুস্থ হলেও ভাইয়ার মন তখনও অসুস্থই ছিল। তারপর থেকে আবির ভাই আর ভাইয়ার সম্পর্ক গভীর হতে শুরু করলো। ভাইয়ার সব আবদারের মাধ্যম হয়ে উঠে আবির ভাই। ভাইয়ার মনের অবস্থা ঠিক রাখতে আবির ভাই ভাইয়াকে সব বিষয়ে সাপোর্ট করতে শুরু করে। ভাইয়া হুট করে সিদ্ধান্ত নেয় যে সে রাজনীতি করবে। আম্মুদের বলেছে কিন্তু আম্মুরা কেউ রাজি না, আব্বুরা তো আরও রাজি না। শুনেছিলাম আবির ভাইও রাজি ছিল না কিন্তু ভাইয়ার খুশির জন্য বাধ্য হয়ে ভাইয়াকে সাপোর্ট করেছে আর

এখন পর্যন্ত প্রতিনিয়ত করেই যাচ্ছে। এসব ঘটনা দেখতে দেখতে তানভির ভাইয়ার প্রতি আমার চিন্তাধারা বদলাতে শুরু করে সেই সাথে আবির ভাইয়ের প্রতিও। আমার ভাইয়ের যখন মানসিক সাপোর্ট দরকার ছিল তখন আবির ভাই সেই সাপোর্ট টা দিয়েছিল। তাই আমিও ধীরে ধীরে আবির ভাইয়ের প্রতি মনের ভেতর পুষে রাখা আক্রোশ ভুলতে শুরু করি কিন্তু কখনো আবির ভাইয়ের সাথে কথা বলার চেষ্টা করি নি।" বন্যা ভ্রু কুঁচকে তাকিয়ে আছে। সাদিয়া প্রশ্ন করল, " মেয়েটা কি করেছিল?" " আমি বিস্তারিত জানি না তবে শুনেছি মেয়েটা তার গ্রামের স্কুলে পড়াশোনা করাকালীন স্থানীয় এক ছেলের সাথে সম্পর্কে জড়িয়েছিল যা মোটামুটি ৪-৫ বছরের। তারপর এখানে এসে ভর্তি হয়। তখন ভাইয়াকে দেখেছে মোটামুটি পরিচিত আর ছেলে এলাকার স্থানীয় তাছাড়া তখন ভাইয়া দেখতে শুনতে অনেক কিউট ছিল সব মিলিয়ে ঐ মেয়ে ভাইয়াকে পছন্দ করে ফেলে। আগের প্রেমিক এসব জানার পর তাদের মধ্যে কি ঝামেলা হয়, এরপর মেয়েটা জেদ করে ভাইয়ার সাথে সম্পর্কে জরায়। ঐ ছেলেও কম ছিল না, যখন নিজে মেয়ের সাথে পারছিল না তখন মেয়ের বাড়িতে জানিয়ে দেয়। মেয়েকে নিয়ে ঝামেলা শুরু হয় সেই ঝামেলায় আমার ভাই ফেঁসে গেছিলো। কথা নাই বার্তা নেই মেয়ের বাবা একদিন আমাদের বাসায় এসে যা তা বলেছে। যা আব্বু আর বড় আব্বু সহ্য করতে পারে নি। সেই থেকে আমাদের বাসার মূল ঝামেলার শুরু হয়েছিল।" মিষ্টি চাপা স্বরে বলল, " তোর ভাই এখন

ঠিক আছে তো?” মেঘ মৃদু হেসে বলল, ” এখন ভাইয়া একদম ঠিক আছে। জানি না ভাইয়ার মনের কি অবস্থা, কখনো এই বিষয়ে বিস্তারিত জানতে চাইনি আমি। ভাইয়া সুস্থ হওয়ার পর থেকে আম্মুরা বা আমাদের সাথে কখনো খারাপ ব্যবহার করে নি। সেই ঘটনার পর থেকে ভাইয়ার মুখে কোনো মেয়ের কথা ভুলেও শুনি নি। কখনো কারো সাথে তেমন কথা বলতেও দেখি নি।” মেঘ একটু থেমে আবারও বলল, ” সরি বন্যা, তোর সাথে খুব ভালো সম্পর্কের জন্য আমি তোকে ভাবি হিসেবে চাইছি আর কিছুই না। আমি চাই না আমার পাগলামির জন্য তুই আমার ভাইকে ভুল বুঝিস। ভাইয়া যেহেতু আমার আর তুইও আমার বেস্ট ফ্রেন্ড তাই আমি কাউকেই কষ্ট দিতে পারবো না। আমি চাই আমার ভাইয়ের জীবনে এমন কেউ আসুক যে আমার ভাইয়ের অতীত জেনে তাকে ভালোবাসবে। মিথ্যা মায়ায় নয় বরং সত্যিকারের ভালোবাসার বন্ধনে জড়াবে। যেখানে কোনো মিথ্যের দেয়াল থাকবে না, নিজেকে বিশ্বস্ত প্রমাণ করার চেষ্টা থাকবে না। আমার ভাই ছন্নছাড়া, নির্লিপ্ত কিংবা রাগী সবকিছু জেনেশুনে যে আমার ভাইকে ভালোবাসবে আমি সারাজীবন তাকে আগলে রাখবো।” হঠাৎ পেছন থেকে তানভির ডাকল, “বনু, বাসায় যাবি না?” মেঘ চোখ মুছে ঘাড় ঘুরিয়ে স্বাভাবিক কণ্ঠে বলে, “আসছি।” মেঘ বসা থেকে উঠতে উঠতে শীতল কণ্ঠে বলল, “সরি বন্যা, প্লিজ কিছু মনে করিস না। ” বন্যা কিছু বলার আগেই মেঘ চলে গেছে। বন্যা তাকাতেই তানভিরের চোখে চোখ পড়লো। তানভির বন্যাকে উদ্দেশ্য করে বলল, ” সন্ধ্যা

হয়ে যাচ্ছে। বাসায় যাও।” বন্যা সঙ্গে সঙ্গে চোখ নামিয়ে নিয়েছে। মিনহাজ বলে উঠল, “আপনারা যান, আমি এখনি রিক্সা ঠিক করে দিচ্ছি।” তানভির এক পলক ওদের দেখল। মেঘ ততক্ষণে তানভিরের কাছাকাছি চলে আসছে। মেঘের চোখ এখনও ছলছল করছে। পশ্চিমা আকাশে হেলে পড়া সূর্যের রক্তিম আলোতে মেঘের অশ্রু সিক্ত চোখ চিকচিক করছে। তানভির তপ্ত স্বরে জিজ্ঞেস করল, “কাঁদছিস কেনো?” মেঘ অবিলম্বে চোখ মুছে ভেজা কণ্ঠে বলল, ” চলো যাই।” তানভির আবারও প্রশ্ন করল, ” এতক্ষণ যাবৎ এখানেই বসে আছিস, খাস নি কিছু?” মেঘের তড়িৎ জবাব, “নাহ।” মেঘের হঠাৎ মাথায় আসছে আবির ভাই নতুন গাড়ি কিনেছে। মিনহাজরা যেহেতু তাকে আবির ভাইয়ের বউ ভাবে তাই ভাবি হিসেবে মেঘের ওদেরকে ট্রিট দেয়া উচিত। মেঘ থমকে দাঁড়িয়ে উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, ” আমি আগামীকাল তোদের ট্রিট দিব, চলে আসিস। ” তারপর তানভিরের সাথে চলে গেছে। মেঘের মুখে হাসি আছে তবে চোখের পাপড়িগুলো এখনও ভেজা। আবির ড্রাইভিং সীটে বসে ছিল, মেঘের শুকনো মুখ আর ভেজা চোখ দেখেই কপাল গুটালো। তানভিরের দিকে তাকিয়ে ইশারায় জানতে চাইলো কিন্তু তানভিরও জানে না। আবির শীতল কণ্ঠে প্রশ্ন করল, ” কেউ কিছু বলছে?” মেঘ ফিক করে হেসে উল্টো প্রশ্ন করল, ” আমাকে কেউ কিছু বলার সাহস আছে? ” আবির আর তানভির দুজনেই নিঃশব্দে হেসে গাড়ি স্টার্ট দিল। টুকটাক খাওয়াদাওয়া করে বাসার মানুষদের জন্য খাবার নিয়ে বাসায় ফিরতে

ফিরতে সন্ধ্যে হয়ে গেছে। আলী আহমদ খান আর মোজাম্মেল খান নামাজের জন্য কেবলই বাসা থেকে বের হচ্ছিলেন। নতুন গাড়ি থেকে আবিরদের নামতে দেখে ওখানেই থমতে দাঁড়ালেন। মেঘ, আবির, তানভির তিনজনই গাড়ি থেকে নেমেছে। মোজাম্মেল খান মেঘকে প্রশ্ন করলেন, "কোথায় গিয়েছিলে তুমি?" "বন্ধুদের সাথে দেখা করতে তারপর ভাইয়ারা নিয়ে আসছে। আলী আহমদ খান আবিরকে উদ্দেশ্য করে জিজ্ঞেস করলেন, "গাড়ি কি তুমি কিনেছো নাকি অন্য কারোর?" "আমি কিনেছি।" মোজাম্মেল খান গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, " বাড়িতে তিনটা গাড়ি থাকা স্বত্তেও একাউন্ট থেকে টাকা তুলে নিজস্ব গাড়ি কেনার কোনো মানে নেই। " আবির মাথা নিচু করে দাঁতে দাঁত চেপে ধরে নিজের রাগ সংযত করার চেষ্টা করলো। ছোট করে শ্বাস ছেড়ে মাথা তুলে নিরেট কণ্ঠে বলল, " চেক করে দেখবেন, একাউন্ট থেকে যে টাকাটা তুলেছিলাম সেটা রেখে দিয়েছি আর আমি আমার টাকা দিয়ে গাড়িটা কিনেছি। " আলী আহমদ খান গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, " আবির, তোমাকে একাউন্টে টাকা রাখতে একবারও বলা হয় নি। তোমার একাউন্ট তুমি যখন খুশি টাকা তুলবে। আমি সেদিন শুধু জানতে চেয়েছিলাম। " আবির মৃদু হেসে বলল, "সেদিন কারণ জানতে চেয়েছেন, আজ বলছিলেন আপনাদের জমানো টাকা দিয়ে গাড়ি কিনেছি। দুদিন পর আমি অন্য কিছু করলে দেখা যাবে সেখানেও আপনাদের জমানো টাকার কথাটায় উঠবে। তার থেকে ভালো আপনাদের টাকা জমা রেখে দিলাম।" আলী আহমদ খান ভারী কণ্ঠে

শুধালেন, “নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করছো?” আবির মলিন হেসে বলল, ” হয়তো।” মোজাম্মেল খান কিছু বলতে চেয়েও থেমে গেলেন। পাশ কাটিয়ে নামাজের জন্য চলে গেছেন। আবির,তানভির নিজেদের রুমে চলে গেছে। মেঘ আম্মু, বড় আম্মু, কাকিয়া, মীম, আদিকে ডেকে এনে আবিরের গাড়ি দেখাচ্ছে। বিকেল বেলা গাড়িটা দেখে মেঘের সত্যি খুব রাগ হয়েছিল। তবে এখন আর সেই রাগ টা নেই। ঈদের দিনের মতো এত সুন্দর একটা দিনেও যেখানে আব্বু আর বড় আব্বু টাকার হিসেব চাইতে পারে সেখানে আবির ভাইয়ের গাড়ি কিনে নিজের অবস্থান প্রমাণ করাটা দোষের কিছু না। আবিরের জন্য এখন অন্যরকম ভালো লাগা কাজ করছে। মেঘ রুমে এসে চোখ বন্ধ করলো, ওমনি আবিরের কণ্ঠস্বর মেঘের কানে বাজছে, আবিরের গায়ের গন্ধ অনুভব করে আচমকা চোখ মেললো মেঘ। মস্তিষ্কে সর্বক্ষণ এক আবির ভাই তোলপাড় চালাচ্ছে, শয়নেস্বপনে শুধু আবির ভাইয়ের সত্তাকে উপলব্ধি করে। পরদিন ভার্সিটিতে যেতেই বন্যার সাথে দেখা, বন্যা মেঘের জন্যই বাহিরে অপেক্ষা করছিল। মেঘকে দেখেই ঠোঁটে হাসি রেখে বলল, ” তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে।” মেঘ স্বাভাবিক কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, “কি?” ” আগে ক্লাস শেষ করি পরে বলবো।” “আচ্ছা। ” বন্যা আর মেঘ ক্লাসে ঢুকতেই পেছন দিক থেকে মিনহাজ আর তামিমরা চেঁচিয়ে উঠল, ” হাই ভাবিরা। ” আশপাশের কয়েকজন জিজ্ঞেস করল, “ভাবিরা আবার কে?” তামিম গম্ভীর কণ্ঠে বিড়বিড় করে বলল, ” রমনী তোমার হলে প্রেমিকা আর অন্যের হলে

ভাবি বুঝছো? প্রেমিকা হওয়ার বদলে ভাবি হওয়ার ফিলিংস টা জোশ।” আশেপাশের ছেলেগুলো হাসতে হাসতে গড়িয়ে পরছে। মেঘ আর বন্যা রাগে কটমট করে তাকাতেই ছেলেগুলো হাসি থামিয়ে দিয়েছে। ক্লাস করে বের হতেই বন্যা বলল, “জানিস আপুর সরকারি জব হয়েছে। ” “সত্যি?” “হ্যাঁ। তোকে রাতে কল দিয়েছিলাম কিন্তু তুই রাগে কল ই ধরিস নি।” মেঘ মৃদু হেসে বলল, ” নাহ রাগ করি নি। আসলে আমার ই ভুল।” বন্যা কপট রাগ দেখিয়ে বলল, “হয়েছে এখন আর মন খারাপ করে বসে থাকতে হবে না। আমি তোকে না বুঝলে আর কে বুঝবে শুনি?” মিনহাজরাও বেড়িয়ে আসছে। মিষ্টি হেসে বলল, “মেঘ কাল তুই চলে যাওয়ার পর আমরা সবগুলো মিলে তোর পক্ষ থেকে আরও ৩০ মিনিট লেকচার দিয়েছি। তুই আর মন খারাপ করিস না। এখন বল কে ট্রিট দিবি।” বন্যা আর মেঘ দুজনেই একসঙ্গে বলল, “আমি” মেঘ বলছে সে দিবে, বন্যা বলছে বন্যা দিবে। হঠাৎ মিনহাজ আর তামিম বলে উঠল, “ভারি আমরা কিন্তু দু’জনের ট্রিট ই খেতে পারবো তবুও আপনারা নিজেদের মধ্যে মনোমালিন্য করবেন না, প্লিজ।” মেঘ আর বন্যা ওদের সবাইকে ট্রিট দিয়েছে। কিন্তু আবির তানভিরকে বলা হয় নি। বন্যা বারবার বলছে, ওনারা আমাকে অনেকবার ট্রিট দিয়েছে আমারও ট্রিট দেয়া উচিত। মেঘ কিছুই বলছে না। কারণ গতকালের বলা কথাগুলো এখনও ভুলতে পারে নি মেঘ। এ অবস্থায় বন্যা আর তানভিরকে একসাথে দেখলে মেঘের আবারও ভাবি ডাকার স্বাদ জাগবে। বন্যা খানিক থেমে

জিজ্ঞেস করল, “মেঘ তোর কি মন খারাপ? ” মেঘ মলিন হেসে বলল, “কই না তো।” এমন সময় আবির কল দিয়েছে। মেঘ কল রিসিভ করে খুব ধীরে সুস্থে ফিসফিস করে কথা বলছে। মিষ্টি সবার উদ্দেশ্যে বিড়বিড় করে বলল, “মন খারাপ হওয়ার আগেই যদি প্রিয় মানুষের কল চলে আসে তখন মন খারাপ হওয়ার সুযোগ ই থাকে না। বন্যা সময় আছে ভেবে দেখ, আবির ভাইয়া যেমন মেঘের কেয়ার করে তানভির ভাইয়াও কিন্তু তেমন কেয়ার ই করবে যতই হোক দুজনের গায়ের রক্ত তো এক। ” বন্যা কপাল গুটিয়ে তাকালো আর কিছুই বলল না।মেঘ খাওয়াদাওয়া করে বাসায় চলে আসছে। গতকাল ইকবাল খান বাসায় ছিল না। আজ বিকেলেই ফিরেছে। আবিরের গাড়ি দেখে ওনি রীতিমতো আশ্চর্য হয়েছেন। সেই থেকে আবিরের বাড়ি ফেরার অপেক্ষা করছেন। আবির বাসায় ফেরার ২০ মিনিট পর ইকবাল খান আবিরের রুমে গেলেন। কাকামনিকে দেখেই আবির শুয়া থেকে উঠে বসলো। ইকবাল খান ঠান্ডা কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, “ফ্রি আছিস?” “হ্যাঁ। কেনো?” “ছাদে চল। কথা আছে।” “কি হয়েছে কাকামনি?” “চল আগে।” আবিরকে নিয়ে ছাদে চলে আসছেন। ছাদের মাঝবরাবর বসে ইকবাল খান ধীর কণ্ঠে জানতে চাইলেন, “তুই যা করছিস তা কি বুঝেশুনে করছিস?” আবির কপাল গুটিয়ে শুধালো, “মানে?” “তোকে গাড়ি কেনার জন্য নিষেধ করেছিলাম আমি, বার বার বলেছি আমার গাড়িটায় তোর তারপরও তুই গাড়ি কিনলি কেনো?” “আমার কারো কথা শুনতে ভালো লাগে না। ” “তুই যে

ধ্বংসলীলায় মেতেছিস এর ফলাফল খুব ভয়ানক হবে। ” আবির নিশ্চুপ। মাথা নিচু করে বসে আছে। ইকবাল খান ধীর কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, “তুই কি জেনে-বুঝে মেঘকে ভালোবেসেছিস?” ইকবাল খানের দিকে আশ্চর্য নয়নে তাকিয়ে আছে আবির। কাকামনি মেঘের কথা কিভাবে জানতে পারলো? আবির আনমনে বলল, ” যখন ভালোবেসেছি তখন বাসার সিচুয়েশন জানা বা বুঝার বয়স আমার ছিল না। ” ইকবাল খান মেকি স্বরে বললেন, ” এখন তো বুঝতেছিস? ছেড়ে দিতে পারবি?” আবির গর্জে উঠে বলল, “নাহ। আমি ও কে ছাড়া বাঁচবো না। ” “আমি তো দিব্যি বেঁচে আছি আর ভালোও আছি।” আবির নিরেট কণ্ঠে বলল, “আমি তোমার মতো শক্ত খোলসে নিজেকে আবদ্ধ করে সারাজীবন কাটাতে পারবো না কাকামনি। বাসার পরিস্থিতি বুঝার পর থেকে এখন পর্যন্ত নিজের অনুভূতি গুলো বন্দি করে রাখতে রাখতে আর পারছি না। তবুও মনের কোণে ক্ষীণ আলো জ্বলছে, মনে হচ্ছে হয়তো সবকিছু ঠিক করতে পারবো।” “যদি ঠিক না হয় তখন?” আবির মৃদু হেসে বলল, ” যা কিছু হতে পারে।” ইকবাল খান শান্ত স্বরে বললেন, “তোদের অপ্রকাশিত আবেগগুলো দেখে মাঝেমধ্যে আমার ই ভয় হয়। মেয়েটার মুখের দিকে তাকানো যায় না। আমার হাতে ক্ষমতা থাকলে আমি ধুমধাম করে তোদের বিয়ে দিয়ে দিতাম। ” আবির মুচকি হেসে বলল, ” কখনো প্রয়োজন হলে পাশে থেকো, প্লিজ।” ইকবাল খান শক্ত কণ্ঠে বললেন, “ইনশাআল্লাহ, আমি সবসময় তোর পাশে আছি। আর পাশে আছি বলেই তোকে

গাড়ি কিনতে নিষেধ করেছিলাম। টাকা খরচ করতে বার বার নিষেধ করি। কখন কোন পরিস্থিতি সামনে আসে বলা যায় না।” “সমস্যা নেই, তুমি চিন্তা করো না।” আবির আর ইকবাল খান বেশকিছুক্ষণ ছাদে কথা বললো। আবির হঠাৎ প্রশ্ন করল, “আচ্ছা কাকামনি, আমি মেঘকে পছন্দ করি এটা তুমি কিভাবে জানো?” ইকবাল খান শান্ত স্বরে বললেন, ” আমি আরও ৬ মাস আগে থেকেই তোদের খেয়াল করছি। প্রথম প্রথম এতটা বুঝতে না পারলেও ধীরে ধীরে বুঝতে পেরেছি। শুন, বাসায় একটু সাবধানে থাকিস। ” “আচ্ছা।” আবির নিজের রুমে চলে গেছে। দেখতে দেখতে আরও ১৫ দিন কেটে গেছে। এরমধ্যে বন্যা একদিন মীম, মেঘ,আদি, তানভির, আবির সবাইকে ট্রিট দিয়েছে। আজ ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে না খেয়েই তানভির বেড়িয়ে গেছে। আবির ও তাড়াহুড়ো করে নাস্তা করে বেড়িয়েছে। আবির আজ আব্বুর অফিসে যায় নি,সরাসরি নিজের অফিসে চলে আসছে। দুপুরের দিকে আবির ল্যাপটপের কাজ শেষ করে চেয়ারে হেলান দিয়ে সবেমাত্র চোখ বন্ধ করেছে। এমন সময় কাকিয়ার নাম্বার থেকে কল আসছে। আবির কপাল গুটিয়ে তাকালো। সচরাচর কাকিয়া আবিরকে কল দেয় না বললেই চলে। আবির কল রিসিভ করে ধীর কণ্ঠে বলল, “হ্যাঁ কাকিয়া, বলো।” “ভাইয়া আমি মীম।” মীমের গলা কাঁপছে। ফিসফিস করে কথা বলছে। আবির ভারী কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, “কি হয়েছে? বাসায় কোনো সমস্যা? ” মীম কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে বলল, ” আপুকে দেখতে আসা মানুষগুলোকে

আগেরবার আপনারা বাসায় আসতে দেন নি এটা চাচ্চু বুঝে গেছেন। তাই আপনাদের না জানিয়ে আজ আরেকটা ফ্যামিলিকে বাসায় আসতে বলেছেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা চলে আসবে। প্লিজ ভাইয়া,আপনি কিছু করুন ।"মীমের মুখে অকল্পনীয় কথাটা শুনতেই আবিরের শরীর ঝাঁকুনি দিয়ে উঠেছে অকস্মাৎ মেরুদণ্ড সোজা হয়ে গেছে,নিঃশ্বাস আঁটকে আছে গলায়, শ্বাসনালীতে তুফান। মুহুর্তের মধ্যে চোখের শিরা উপশিরা রক্তাভ বর্ণ ধারণ করেছে, বক্ষস্পন্দন বেড়ে আকাশ ছোঁয়ার পথে। আবির নিজের সর্বোচ্চ অনুবলে মেঘকে যতই আগলে রাখতে চাইছে প্রতিনিয়ত ততই বিপাকে পড়ে যাচ্ছে। মেঘের মুখে নিরন্তর হাসি ফুটাতে আবির নিজের সাথে একের পর এক নিগূঢ় বিগ্রহ করেই চলেছে তারপরও কোনো কিনারা পাচ্ছে না। কন্ঠস্বরে তেজ ঢেলে আবির শক্ত কন্ঠে জিজ্ঞেস করল, " মেঘ কোথায়?" " আম্মুরা সবাই আপুর রুমে বসে আছে আর আপুকে সাজুগুজু করতে বলছে কিন্তু আপু চুপচাপ বসে আছে। " আবির চোখ বন্ধ জোরে শ্বাস টেনে পরপর সর্বশক্তি দিয়ে নিঃশ্বাস ছেড়ে নিজেকে নিরূদ্ধ করার চেষ্টা করলো। অতঃপর নিরেট কন্ঠে বলল, " ওকে বলিস সাজুগুজু করতে হবে না আর দেখিস ঐদিনের মতো কান্নাকাটি যেন না করে। আমি দেখছি।" মীম আতঙ্কিত কন্ঠে বলল, " আপনি এখন বাসায় আসলে সমস্যা হবে।" আবির অদম্য কন্ঠে বলল, "বাসায় আসবো না। শুন, তোর দায়িত্ব হলো যত দ্রুত সম্ভব তুই ছেলের বাবার নাম টা জেনে আমায় কোনোভাবে টেক্সট করে জানাবি।" মীম শীতল কন্ঠে বলল, "

আচ্ছা। ” আবির কল কেটে দিয়েছে। মীমের সাথে আবির শান্ত স্বরে কথা বলেছে ঠিকই কিন্তু আবিরের ভেতর টা রাগ আর দুশ্চিন্তায় ফেটে যাচ্ছে। মেঘ বাসায় অল্প সাজুগুজু করলেই আবিরের কলিজায় আঘাত লাগে, নিজের দৃষ্টি সামলে একের পর এক দোয়া পড়তে থাকে যাতে মেঘের উপর শয়*তানের কুনজর না পড়ে। সেখানে কোথাকার কোন পরিবার মেঘকে দেখতে আসবে এটা আবির বেঁচে থাকতে কোনোভাবেই সহ্য করতে পারবে না। তানভিরকে কল দিতে দিতে আবির দ্রুত অফিস থেকে বেড়িয়ে গেছে। রাকিব, রাসেল কারো সাথেই দেখা হয় নি। এদিকে মেঘ বিছানায় হেলান দিয়ে বসে, আশেপাশে আম্মু, বড় আম্মু, কাকিয়া সবাই মেঘকে বুঝাচ্ছে, রেডি হতে বলছে। মেঘের সেসবে মনোযোগ নেই, আজ মেঘের চোখে এক ফোঁটা পানিও নেই। সেদিন প্রথমবারের মতো কেউ বা কারা দেখতে আসবে কথাটা শুনে মেঘ নিজেকে শান্ত রাখতে পারে নি তারউপর আবিরের উদাসীনতা মেঘকে আরও বেশি কাঁদিয়েছিল। কিন্তু রাতের বেলা আবিরের কথা শুনে মেঘ সবটায় বুঝেছিল আর নিজেই নিজেকে বকেওছিল। তাই আজ মেঘের মনে আতঙ্কের রেশ মাত্র নেই, দিব্যি বিছানায় হেলান দিয়ে বসে আঙ্গুর খাচ্ছে। হালিমা খান চাপা স্বরে বললেন, “এই মেঘ, আর কতক্ষণ এভাবে বসে থাকবি? উঠে রেডি হ। ওনারা কখন জানি চলে আসেন। তখন তোর আব্বু রাগারাগি করবে।” মেঘ স্তম্ভিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে ঠান্ডা কণ্ঠে বলল, ” আম্মু, আমি শান্তি করে খাচ্ছি এটা কি তোমার সহ্য হচ্ছে না?” “সহ্য হবে না কেন? তুই

রেডি হস নি শুনে তোর আব্বু যে চিল্লাচিল্লি করবে। তখন আমি কি করব? ওনারা চলে গেলে না হয় আবার খাইস। " আকলিমা খান শান্ত স্বরে বললেন, " তোমার আব্বু আর বড় আব্বুকে তো চিনোই। সময়ের কাজ সময়ে না হলে মেজাজ গরম হয়ে যায়।" এমন সময় মীম রুমে আসছে, নিচে আব্বু চাচ্চুর কথোপকথনে ছেলে আর তার বাবার নাম শুনে আম্মুর নাম্বার থেকে আবিরকে মেসেজ দিয়ে জানিয়ে অতঃপর উপরে আসছে। আলী আহমদ খান বাসায় নেই, ইকবাল খানকে আকলিমা খান জানানোর পরপর ই তিনি বাসায় চলে আসছে। মোজাম্মেল খানকে বার বার বুঝানোর চেষ্টা করছেন। অথচ মোজাম্মেল খান কিছু বুঝতেই চাইছে নাম। আবিরকে কল দিয়ে বললে আবির উল্টাপাল্টা কিছু করে ফেলবে এই ভয়ে ইকবাল খান নিজেই বুঝানোর চেষ্টা করছেন। মীম মেঘের রুমে ঢুকতেই মেঘ খাওয়া বন্ধ করে চোখ তুলে তাকালো, সহসা মীম চোখের ইশারায় আবিরকে জানানোর কথাটা বুঝিয়ে দিয়েছে। মেঘ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে আম্মুদের দিকে এক পলক তাকিয়ে শীতল কণ্ঠে বলল, " তোমরা থামো। আগে ওনারা আসুক তারপর আমি সাজবো।" মালিহা খান শান্ত স্বরে মেঘকে বুঝানোর চেষ্টা করলেন কিন্তু মেঘের এক কথা, দেখতে আসলে তবেই সে সাজবে। এমনকি তাদের দেখানোর জন্য মেঘ সবকিছু রেডিও করে রেখেছে। ঘন্টা পেরিয়ে যাচ্ছে কিন্তু বাসায় মেহমান আসছে না। মালিহা খান আর আকলিমা খান মেঘের রুমে বসে আছেন তবে সেদিকে মীম, মেঘের কোনো মনোযোগ নেই। মীম

মেঘের উপর হেলান দিয়ে শুয়ে তার স্কুলের গল্প করছে আর মেঘ মীমের মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে আর গল্প শুনছে। মোজাম্মেল খান আর ইকবাল খান অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলেন কিন্তু কেউ ই আসছে না। প্রথমে ভেবেছিলেন হয়তো জ্যামে আঁটকে আছে এজন্য কল দেন নি কিন্তু অপেক্ষা করতে করতে একপ্রকার বিরক্ত হয়ে কল দিলেন সেই লোকের নাম্বারে। প্রথমবারেই কল রিসিভ হলো। মোজাম্মেল খান তপ্ত স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনারা কোথায় আছেন?" লোকটা কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, " আমি অফিসে আছি। " মোজাম্মেল খান বিরক্তভরা কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, " আমাদের বাসায় আসার কথা কি ভুলে গেছেন?" লোকটা ঢোক গিলে কিছুক্ষণ থেমে অতঃপর বললেন, " নাহ ভাই ভুলি নাই কিন্তু একটা সমস্যা হয়ে গেছে।" "কি সমস্যা? " লোকটা আরও কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো। মোজাম্মেল খান এবার হালকা রাগী স্বরে বললেন, " কি হলো?" "আসলে ভাই কিভাবে বলল, আমার ছেলে অন্য এক মেয়েকে পছন্দ করে তাকে ছাড়া অন্য কাউকে বিয়ে করবে না বলছে। তাই শুধু শুধু... " মোজাম্মেল খান রাগে কটমট করে বললেন, " আপনার ছেলে অন্য কাউকে পছন্দ করে কি না সে কথা কি আগে জানা উচিত ছিল না? আর সেদিন আপনার ছেলে তো সামনেই ছিল, আপনারা আগ্রহ না দেখালে আমি তো আপনাদের কখনোই জোর করতাম না। " লোকটা ভাঙ্গা ভাঙ্গা কণ্ঠে বললেন, " আমাদের মাফ করে দিবেন ভাই আর পারলে দোয়া করবেন। " মোজাম্মেল খান রাগে কল কেটে দিয়েছেন। নিজে দায়িত্ব

নিয়ে বাসায় এত এত আয়োজন করিয়েছেন সেখানে তারা আসবে না এটা তিনি মানতেই পারছেন না। আগের বার তানভিররা কিছু একটা করেছিল ভেবে এবার আবির তানভিরকে কিছু জানান ই নি। অথচ এবারও একই সমস্যা। মোজাম্মেল খান মনে মনে ভাবছেন, "ছেলের যদি অন্য কোথাও পছন্দই থাকতো তাহলে সেদিন আমার মেয়ের ব্যাপারে এত আগ্রহ দেখিয়েছিল কেন? আমার মেয়েকে দেখার জন্য এত উতলা হয়ে গেছিল কেন?" ইকবাল খান মিটিমিটি হেসে বললেন, " থাক ভাইয়া, মন খারাপ করো না।" মোজাম্মেল খান ভেতরে ভেতরে রাগে ফুঁসছেন, চোখ বন্ধ করে সোফায় হেলান দিয়ে বসে আছেন।ইকবাল খান উপরে গিয়ে মেঘের রুমের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, "তোমরা যে যার রুমে যাও, ওনারা আসবেন না। " মালিহা খান উদ্বিগ্ন কণ্ঠে শুধালেন, " আসবেন না কেন?" "ছেলের অন্য কাউকে পছন্দ। " মেঘ ফিক করে হেসে ফেলল, মেঘের দেখাদেখি মীম ও হাসছে। মালিহা খান রাগী স্বরে বললেন, " এই মেঘ হাসছিস কেন?" আবারও বললেন, "তোর আব্বু কোথায় কি ছেলে দেখে বলতো? আগের বার কি সব অজুহাত দেখালো এবার বলে ছেলে অন্য মেয়েকে পছন্দ করে। সকালেও তো শুনলাম ছেলে তোকে দেখার জন্য খুব আগ্রহী। এখন এসবের মানে কি?" মেঘ বড় আম্মুর দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে মনে মনে আওড়ালো, " শ্বাশুড়ি আম্মু, ঐ ছেলের আমাকে দেখার আগ্রহ থাকলে কি হবে তোমার ছেলের তো বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। তোমার ছেলে সবার সামনে যতই স্বাভাবিক

থাকুক না কেন আড়ালে ঠিকই আমাকে নিয়ে ভাবে। আর আমি সিউর ঐ ছেলের গার্লফ্রেন্ড আজই আবিষ্কৃত হয়েছে আর সেটা তোমার ছেলেই করেছে। " মালিহা খান শীতল কণ্ঠে বললেন, "কিরে কি ভাবছিস? ওনারা আসে নি বলে মন খারাপ করছিস?" মেঘ স্ব শব্দে হেসে বলল, " নাহ গো। আমি ভাবছি তোমরা কত কষ্ট করে সারাদিন রান্না করলে এই খাবারগুলো কিভাবে খেয়ে শেষ করবো। " মালিহা খান আর আকলিমা খান ভ্রু কুঁচকে তাকিয়ে আছেন। ইকবাল খান নিঃশব্দে হেসে রুম থেকে বেড়িয়ে গেছেন। মেঘ মীমকে উদ্দেশ্য করে বলল, " আমার ফোনটা দে তো, ভাইয়া আর আবির ভাইকে কল দিয়ে আসতে বলি, একসাথে খাবো। " মীম ড্রেসিং টেবিলের সামনে থেকে ফোন এনে মেঘকে দিল। মেঘ তানভির আর আবির দুজনকেই কল দিয়েছে তবে ছেলের ব্যাপারে কিছু বলে নি শুধু খাবার খেতে দাওয়াত দিয়েছে। মেঘের ফাজলামো দেখে মালিহা খান আর আকলিমা খান দুজনেই চুপচাপ বেড়িয়ে গেছেন। ওনারা চলে যেতেই মেঘ আর মীম নিজেদের মধ্যে ফিসফিস শুরু করে দিয়েছে। সন্ধ্যের আগে আগে আবির বাসায় আসছে। পড়নে ছাই রঙের শার্টের হাতা কনুই অব্দি ফোল্ট করা, বুকের উপরের বোতাম টা খুলা, চুলগুলো অগোছালো, শ্যাম বর্ণের চেহারা ঘামে চিকচিক করছে, এক হাত পকেটে, অন্য হাত স্বাভাবিক রেখে বাসার ভেতরে ঢুকছে। সোফায় মোজাম্মেল খান বসে আছেন, ওনার পাশেই হালিমা খান দাঁড়িয়ে আছেন।মোজাম্মেল খান অতর্কিতে নিজের মনের ভেতরের ক্ষোভ প্রকাশ করছেন আর

হালিমা খান চুপচাপ দাঁড়িয়ে সেসব শুনছেন। মালিহা খানরা যে যার রুমে, ইকবাল খান একটা কাজে বেড়িয়েছেন। আবির স্বাভাবিক ভঙ্গিতেই সিঁড়ি পর্যন্ত এগিয়ে গেল। এক পলক মামনির দিকে তাকিয়ে কোমল কণ্ঠে বলল, " মামনি, এককাপ কফি করে দিবা প্লিজ?" হালিমা খান আবিরকে খানিক দেখে সঙ্গে সঙ্গে বললেন, "তুই ফ্রেশ হয়ে নে, আমি কফি বানিয়ে পাঠাচ্ছি।" "পাঠাতে হবে না। আমি ফ্রেশ হয়ে নিচে আসতেছি।" আবির সচরাচর নিজের কফি নিজেই করে, সকালে মাঝে মধ্যে মালিহা খান নয়তো হালিমা খান করে দেন। আজ মূলত মোজাম্মেল খানের জন্যই অসময়ে মামনির কাছে কফি চাইছে আবির যাতে মোজাম্মেল খানের চিল্লাচিল্লি টা কমে। আবির দুটা সিঁড়ি উঠতেই মোজাম্মেল খান আড়চোখে আবিরকে দেখে গম্ভীর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, " কোথায় ছিলে?" আবির স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, "অফিসে। কেনো?" "তানভির কোথায়?" আবিরের ভাবলেশহীন জবাব, "আমি কি জানি!" মোজাম্মেল খান সূক্ষ্ম নেত্রে আবিরের দিকে তাকিয়ে আছেন। আবির মৃদু হেসে বলল, "আমি কি যাব, চাচ্চু?" "যাও।" হালিমা খান কফি করতে রান্নাঘরে চলে গেছেন। মোজাম্মেল খান সোফায় চোখ বন্ধ করে বসে আছেন। আবিরের কথা বার্তা খুব স্বাভাবিক, সন্দেহজনক কিছুই চোখে পড়ে নি। তানভির জানলে এতক্ষণে সে অবশ্যই রিয়েক্ট করতো, অথচ তানভিরও এখন পর্যন্ত শান্ত। সারাদিন বাসায় ফেরে নি, বাসার কারো সাথে ফোনে কথা বলতেও তিনি দেখেন নি। তারমানে তানভিরও কিছু জানে না।

মোজাম্মেল খান দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে মনে মনে বললেন, “তানভির, আবির কিছু না জানলে এমনটা হলো কিভাবে? তাহলে কি সত্যিই ঐ ছেলের অন্য জায়গায় পছন্দ আছে? ” আবির কিছুক্ষণের মধ্যে ফ্রেশ হয়ে শার্ট পাল্টিয়ে টিশার্ট আর ট্রাউজার পড়ে নিচে আসছে। মোজাম্মেল খান তখনও সোফায় বসা। তাই আবির সোফায় না বসে সরাসরি রান্নাঘরে চলে গেছে, কফির কাপ নিতে নিতে ধীর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, ” কিছু হয়েছে নাকি?” হালিমা খান তপ্ত স্বরে বললেন, “নাহ। তেমন কিছু না। ” মোজাম্মেল খানের কড়া নিষেধ আবির কিংবা তানভিরের সামনে মেঘের বিয়ে সম্পর্কিত কোনো আলোচনা যেন না হয়। আবির সবটায় জানে তবুও নিজেকে স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করছে। আবির মোজাম্মেল খানকে খানিকক্ষণ পরখ করে শক্ত কণ্ঠে বলল, ” চাচ্চুকে অতিরিক্ত টেনশন করতে বারণ করো। মেয়ের বিয়েই হলো না এখনি চুল পাকিয়ে ফেলতেছেন। লোকে কি বলবে? ” আবিরের দুষ্টামী বুঝতে পেরে হালিমা খান মৃদু হেসে বললেন, ” আমাকে বলছিস কেনো? তুই গিয়ে বল।” আবির হাতে কফির কাপ নিয়ে এগিয়ে যেতে যেতে ডাকলো, “চাচ্চু।” মোজাম্মেল খান আবিরের দিকে সরাসরি তাকিয়ে আস্তে করে বললেন, “বলো। ” আবির ঠোঁট বেঁকিয়ে হেসে বলল, ” মামনি বলতেছে আপনার চুল নাকি পেকে যাচ্ছে। আপনাকে এখন আর আগের মতো ভালো লাগে না। ” মোজাম্মেল খান অনচ্ছ হেসে বললেন, ” তাই নাকি?” এরমধ্যে হালিমা খান রান্নাঘর থেকে তেড়ে এসে আবিরের হাতে আস্তে করে

থা*প্প*ড় দিয়ে বললেন, " এই ফাজিল, আমি কখন এই কথা বললাম?" আবির অনিশ্চয়তার স্বরে জবাব দিল, "তুমি মনে মনে ভাবছিলে। ঐটাই চাচ্চুকে জানালাম।" হালিমা খান রাগী রাগী মুখ করে আবিরের দিকে তাকিয়ে আছে। মোজাম্মেল খান আবির আর হালিমা খান দুজনকেই কিছুক্ষণ দেখে গুরুভার কণ্ঠে বলল, " তাহলে আমার এখন কি করতে হবে?" আবির ঢোক গিলে উষ্ণ স্বরে বলল, "সবসময় হাসিখুশি থাকবেন, সবার সাথে স্বাভাবিক ভাবে কথা বলবেন। নিজেকে সময় দিবেন সাথে মামনিকেও । বাকিটা মামনি বলবে, আমি এখন পালায়" আবির টেবিলের উপর কাপ রেখে সিঁড়ি দিকে ছুটছে। মোজাম্মেল খান ঠোঁটে অস্পৃশ্য হাসি রেখেই হালিমা খানের দিকে তাকালেন। আবিরের অকপটে বলা কথাগুলো হালিমা খানের মনের অন্তরালে লুকানো অব্যক্ত অনুভূতি। হালিমা খান স্বচ্ছ দৃষ্টিতে আবিরের দৌড় দেখছেন। ২-৩ সিঁড়ি ফাঁক দিয়ে দিয়ে দ্রুত উঠছে ছেলেটা, ওর উপরে ওঠার তাড়া দেখে মনে হচ্ছে, "সবেমাত্র কাউকে আ*হত কিংবা নি*হত করে আসছে। " আশপাশের মসজিদে মাগরিবের আজান পড়ছে। মোজাম্মেল খান বসা থেকে উঠে উচ্চ স্বরে ডাকল, "আবির, নামাজে যাবে না?" আবির নিজের রুমে যেতে যেতে বলল, "টুপি নিয়ে আসছি।" মোজাম্মেল খান ওজু করে আবিরের জন্য অপেক্ষা করছেন, আবিরও ওজু করে মাথায় টুপি দিতে দিতে নিচে আসছে। বাসায় আর কেউ নেই তাই আবির আর মোজাম্মেল খান একসঙ্গে নামাজের জন্য বেড়িয়েছেন। মোজাম্মেল খান যেতে যেতে

হঠাৎ ই গম্ভীর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, “তানভির কি নামাজ পড়ে? ফজরে না হয় উঠতে পারে না বাকি ওয়াক্ত কি পড়ে?” আবির নিরুদ্বেগ কণ্ঠে বলল, ” আমি সমসময় নামাজের কথা বলি কিন্তু বাহিরে ঠিকমতো নামাজ পড়ে কি না জানি না।” মোজাম্মেল খান ভারী কণ্ঠে বললেন, ” তুমি একটু বুঝিয়ে বলো।” মোজাম্মেল খানের ভারী কণ্ঠে বলা কথাতে আবির কপাল কুঁচকালো। মোজাম্মেল খানের মস্তিষ্কে যখন যা আসে তাই। এতক্ষণ মেঘের ব্যাপারে ভাবছিল এখন সেই ভাবনায় এসেছে তানভির, তাও আবার তানভিরের নামাজ নিয়ে দুশ্চিন্তা করছেন। আবির মনে মনে আওড়ালো, ” তানভিরকে নামাজে নিয়মিত করার ঔষধ আমার জানা আছে। খুব শীঘ্রই ঔষধ দিতে হবে।” মোজাম্মেল খানের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে আবির বলল, ” আপনি চিন্তা করবেন না, ফজর থেকে তানভিরও আমাদের সাথেই নামাজে যাবে।” “দেখো, যদি উঠাতে পারো।” আবির মুচকি হেসে বলল, ” প্রয়োজনে সারারাত না ঘুমিয়ে ফজরের নামাজ পড়ে একেবারে ঘুমাবে।” মোজাম্মেল খান আবিরের কথা শুনে ক্ষীণ হাসলেন। নামাজ শেষে অফিসের কিছু কিছু বিষয় নিয়ে কথা বলতে বলতে বাসায় আসছে দুজন। ততক্ষণে মেঘরা সবাই নামাজ শেষ করে নিচে চলে আসছে। তানভিরও বাসায় ফিরেছে। চার ভাই-বোন মিলে সিরিয়াস কোনো আলোচনায় ব্যস্ত তবে সেই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হলো খাবার। আবির আর মোজাম্মেল খানকে একসঙ্গে বাসায় ঢুকতে দেখে তানভির ভ্রু কুঁচকালো। সচরাচর সবাই একসঙ্গে নামাজে গেলে

আলী আহমদ খান আর মোজাম্মেল খান সামনে গল্প করতে করতে চলে যান, পেছনে আবির, তানভির আর ইকবাল খান টুকাটুকি কথা বলে। তানভির না থাকলে আবির আর ইকবাল খান একসঙ্গে যান। তবে এই প্রথমবার বাসায় কেউ না থাকাতে আবির আর তানভিরের আব্বু একসঙ্গে বাসায় আসছে তবুও এমন একটা দিনে। আবিররা আসতেই মেঘ ঘাড় ঘুরিয়ে আবিরকে দেখে নিল, আবিরের মাথায় টুপি, সাবলীল ভঙ্গিতে আব্বুর সাথে কথা বলছে তা দেখে মেঘের হৃদয়ের ধুকপুকানি তীব্র হতে শুরু করেছে। মালিহা খান খেতে ডাকছেন তাই আলী আহমদ খান আর ইকবাল খান ব্যতীত বাকি সবাই গিয়ে খেতে বসেছে। রাকিবের নাম্বার থেকে তানভিরের ফোনে বার বার কল আসতেছে। তানভির রিসিভ করে স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, " হ্যাঁ রাকিব ভাইয়া,বলো।" "আবির কোথায় রে?" "আছে পাশেই। খেতে বসছে।" "আবির বিকালে কাউকে না বলে হুট করে অফিস থেকে চলে গেছে। তারপর থেকে কল ধরছে না। কি হয়ছে? সবকিছু ঠিক আছে?" " হ্যাঁ একদম। ভাইয়ার ফোন রুমে, মাত্র নামাজ থেকে এসে খেতে বসেছে।" "তাহলে অফিস থেকে হুট করে চলে গেছিলো কেনো?" "খাওয়াদাওয়া শেষ করি তারপর তোমার সাথে দেখা করে বলব। " "আচ্ছা ঠিক আছে। " সবাই সবার মতো খাচ্ছে। কারো মুখেই প্রয়োজনের বাহিরে কোনো কথা নেই। তানভির একটু পর পর আবিরকে ইশারায় এটা সেটা বুঝাচ্ছে আবার প্রশ্নও করছে তবে মোজাম্মেল খান তাকালেই চুপ হয়ে যায়।খাওয়াদাওয়া শেষ করে

আবির আর তানভির বেড়িয়েছে যদিও আবির যেতে চাচ্ছিলো না কিন্তু তানভির একপ্রকার জোর করেই নিয়ে গেছে। রাকিব আর রাসেল অফিস থেকে বেড়িয়ে প্রতি সপ্তাহের সেই সুপরিচিত আড্ডাখানায় আবিরদের জন্য অপেক্ষা করছে। আবির এসেই চুপচাপ বসে পরেছে, মালিহা খান জোর করে একটু বেশিই খাইয়েছেন তাই এত নড়াচড়া করতে ভালো লাগছে না। এমনকি আবির বাইকও নিয়ে আসে নি। তানভিরের বাইকে এসেছে। রাকিব আবিরকে দেখেই উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, "কিরে কি হয়েছে তোর? অফিস থেকে কোথায় চলে গেছিলি?" আবির ঠান্ডা কণ্ঠে বলল, " আজ ও কে আবার দেখতে আসার কথা ছিল।" রাকিব চেঁচিয়ে উঠল, "কি? তারপর?" এরমধ্যে তানভির বাইক পার্ক করে চলে আসছে। এসেই রাকিবের সামনে রাখা একটা চেয়ারের উপর নিজের ডান পা তুলে, ডানহাতের তিন আঙুল ভাঁজ করে বাকি দুই আঙুল রাকিবের কপালের কিছুটা উপরে মাথায় ধরে রাগান্বিত কণ্ঠে চিৎকার করল, " হারামীর বাচ্চা, বিয়ে করার খুব শখ তোর? তাও আবার আমার Sparrow কে? বিয়ে তো বহু দূর তুই আমার মেঘকে কল্পনাতেও দেখতে পারবি না।"তানভিরের গতিবিধি দেখে রাকিব থ হয়ে গেছে,চা বিক্রেতা মামাও আঁতকে উঠেছেন। আশেপাশের কয়েকজন বিস্ময় সমেত তাকিয়ে আছে। আবির চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে মিটিমিটি হাসছে। রাকিব ঢোক গিলে কিছু বলতে যাবে তার আগেই তানভির বাজখাঁই কণ্ঠে আবারও বলে উঠল, " Don't say anything. I don't want to hear anything from

your mouth. যদি তোর মুখ থেকে একটা শব্দ বের হয় তবে তোর বাপ এখানে এসে শুধু তোর লা**শ টায় পাবে।” রাকিব নিষ্পলক দৃষ্টিতে তানভিরের ক্রোধিত চেহারার পানে চেয়ে আছে। তানভিরের চোখে মুখে হাসি উপচে পড়ছে তবুও নিজেকে শক্ত রাখার চেষ্টা করছে। রাসেল অবাক চোখে সে-সব দেখছে। অকস্মাৎ রাকিব হাসতে শুরু করলো, তানভির তখনও রাগী লুক করে চেয়ে আছে। আবির গুরুভার কণ্ঠে বলল, ” তোর নাটক দেখানোর জন্যই জোর করে আমায় নিয়ে আসছিস, তাই না?” রাকিব হাসতে হাসতে বলল, “চিন্তা করিস না, সেরা অভিনেতার পুরস্কার এবার তুই ই পাবি।” ওদের হাসি দেখে তানভির নিজের হাসি আঁটকে রাখতে পারলো না। হাসতে হাসতে রাকিবের মাথা থেকে হাত সরিয়ে, চেয়ার থেকে পা নামিয়ে টিস্যু দিয়ে চেয়ার টা মুছে বসলো। শুকনো গলায় ঢোক গিলে আহত স্বরে বলল, ” ইসস, থামালে কেন আমাকে?” রাকিব তখনও হেসেই যাচ্ছে। হাসি কিছুটা কমিয়ে বলল, “পেছনে তাকিয়ে দেখ, মানুষ যেভাবে তোকে দেখছে মনে হচ্ছে পুলিশ আসতে বেশি দেরি নেই। ” তানভির অকস্মাৎ পেছন ফিরে তাকালো। প্রায় ১৫-২০ জন লোক দাঁড়ানো, দৃষ্টিতে আতঙ্ক । তানভির থতমত খেয়ে বলল, ” এ ভাই, আমি কিছু করি নাই।” লোকজন এখনও নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে আছে। তানভির ভ্রু কুঁচকে উষ্ণ স্বরে বলল, ” বিশ্বাস করুন আমি কিছু করি নি। দেখুন, আমার হাতে কিচ্ছু নাই।” আবির আর রাকিব হাসতে হাসতে ক্লান্ত হয়ে যাচ্ছে। চা বিক্রেতা মামা মৃদুস্বরে বললেন, “আরে

কোনো সমস্যা নাই। ওরা সবাই ভাই ভাই, এমনিতেই মজা করছে। আপনারা যান।” আস্তে আস্তে মানুষ চলে যাচ্ছে, যেতে যেতেও বার বার তানভিরকে দেখছে। কয়েকজন এখনও ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। তানভির তাদের দেখে বিড়বিড় করে বলল, ” আমাকে দেখেই এত ভয় পাচ্ছে ভাবছি ভাইয়াকে দেখলে তাদের কি হতো!” রাসেল চোখ মুখ কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, ” আবির কি আজ নিজের রূপ দেখিয়েই ফেলছে? মিনহাজদের ঘটনায় আমি কত কষ্টে আবিরকে আটকাইছিলাম তারপরও পারলাম না। সেই তো গিয়ে এক্সিডেন্ট করলো। ” রাকিব শান্ত স্বরে জিজ্ঞেস করল, “আবির কি এভাবেই হুমকি দিছিলো, তানভির?” তানভির মেকি স্বরে বলল, “দূর! এটা তো শুধু ট্রেইলার ছিল।” রাকিব আর রাসেল বিস্ময়কর দৃষ্টিতে আবিরের দিকে তাকিয়ে আছে। আবির স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, ” আমাকে এভাবে দেখার কি আছে? ” “দেখছি তুই ঠিকঠাক আছিস কি না! ” “আমার আবার কি হবে?” “নাহ। কিছু না। তা এভাবে আর কতদিন?” “জানি না।” রাকিব ঠাট্টা কণ্ঠে বলল, ” তোদের জন্য প্রতিনিয়ত আমার সংসারে ঝগড়া হয় ” আবির ভ্রু কুঁচকে বলল, ” আমরা কি করলাম?” “তুই কি করিস নাই। মেঘকে তুই ইচ্ছে করে কষ্ট দিচ্ছিস, মেঘের ভালোবাসা বুঝতেছিস না। সেদিন তো রিয়া রাগে বলতাছে মেঘকে তার কোন কাজিনের বউ করে নিয়ে যাবে।” আবির অগ্নিদৃষ্টিতে তাকিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে বলল, ” রাকিব তোর বউকে সামলে রাখিস। উল্টাপাল্টা কথা বললে তোর বউকে মে* রে তোকে বিপত্নীক করে

ফেলবো।” রাকিব মৃদুস্বরে বলল, “এমন করিস না ভাই। আমার একটায় বউ।” তানভির স্ব শব্দে হেসে বলল, ” তোমাদের তো একটা হলেও আছে অন্তত বলতে পারো, সে আমার। এদিকে আমার যে একটাও নেই।” আবির গম্ভীর কণ্ঠে বলল, ” থাকবে কিভাবে নির্বোধের মতো কোথাকার কোন মেয়ের প্রস্তাবে রাজি হওয়ার সময় মনে ছিল না? খোঁজ খবর না নিয়ে ধুম করে প্রেমে পড়ে গেছে। আসছে আমার প্রেমিক পুরুষ। ” তানভির মন খারাপ করে বলল, ” তখন না হয় আমি নির্বোধ ছিলাম। এখন তো বোধ হয়েছে আমার। আর ঠিকঠাক কাউকে পছন্দও করেছি। তাহলে তাকে কেন পাচ্ছি না?” আবির শক্ত কণ্ঠে বলল, “নামাজ পড়িস কয় ওয়াক্ত? আল্লাহ র কাছে কতবার তাকে চাস?” “মাঝে মাঝে চাই।” “তাহলে আর কি, মাঝে মাঝেই আসবে।” তানভির কপাল গুটিয়ে ফোঁস করে শ্বাস ছাড়লো। আবির ভারী কণ্ঠে বলল, ” দেখ তানভির, তুই ফজর থেকে আমার সাথে নামাজে যাবি। কাল থেকে যদি এক ওয়াক্ত নামাজ মিস করিস তাহলে তোর না হওয়া প্রেমিকার কাছে তোর নামে অপপ্রচার করবো।” তানভির নিরেট কণ্ঠে বলল, “কি?” আবির খানিক হেসে বলল, “তাছাড়া আমি আমার শ্বশুর আব্বাকে কথা দিয়েছি। সেই কথা তো আমার রাখতেই হবে। প্রয়োজনে তোকে কানে ধরে নিয়ে যেতেও আমার কোনো সমস্যা নেই। ” তানভির ঠাট্টার স্বরে বলল, ” বাহ! শ্বশুর কে পটানোর ধান্দা নাকি?” আবির নিঃশব্দে হাসলো। রাকিব তানভিরের দিকে তাকিয়ে বলল, ” ঐ খানের ঝামেলা সমাধান

হয়েছে? নাকি বেঁধে রেখে আসছিস?" "ভাইয়া গেলে বাঁধার প্রয়োজন পড়ে না। সবকিছু একদম সমাধান করেই আসছি। " রাসেল বলল, " ঝামেলা কি বেশি হয়ছিল?" "তোমরা তো ভাইয়াকে চিনোই। বনুর ব্যাপারে সামান্যতম বিষয়েই যে পরিমাণ ক্ষিপ্ত হয় সেখানে বনুর বিয়ের বিষয় উঠে গেছে। কি হতে পারে ভাবো! সিচুয়েশন এতই খারাপ হয়ে গেছিলো যে হয় এসপার নয় উসপার হয়েই যেতো। তখন ছেলের বাবা আসছে, ঐ অবস্থায় ছেলেকে বাঁচাতে ডিরেক্ট ভাইয়ার পায়ে ধরতে ফেলতেছিল। তারপর তাড়াতাড়ি সরিয়ে সবকিছু মোটামুটি নরমাল করেছি এমন সময় আব্বু কল দিয়েছে। তখন আর কি, ভাইয়া যা যা শিখিয়ে দিয়েছে ওনিও তাই তাই বলছে। এইসবই। " রাকিব তপ্ত স্বরে বলল, " আমাকে একটা কল দিতে পারতি। " " আমি নিজেও জানতাম না। ভাইয়া আমায় ঠিকানা দিয়ে শুধু আসতে বলেছে।" আবির ঠান্ডা কন্ঠে বলল, "সেসব কথা বাদ দে। এখন বল কাজটা শেষ হয়েছে?" রাকিব ধীর কন্ঠে বলল, "আমি যতটা সম্ভব চেষ্টা করেছি তুই রাতে সময় করে একটু দেখে নিস,প্লিজ।" "আচ্ছা। " ওরা চারজন বেশ কিছুক্ষণ আড্ডা দিয়েছে । তবে আজ বেশিরভাগ আলোচনা হয়েছে রাকিবের বিবাহিত জীবন নিয়ে। ঘন্টাখানেক পর আবিররা বাসার উদ্দেশ্যে চলে গেছে। আলী আহমদ খান নিজের কাজ শেষ করে বাসায় ফিরেই মোজাম্মেল খানকে ডেকেছেন। মোজাম্মেল খান আসতেই জিজ্ঞেস করলেন, "ওনারা আসছিলেন?" "নাহ ভাইজান।" "আসেনি কেনো?" "সঠিক

জানি না তবে বলেছেন ছেলের অন্য মেয়েকে পছন্দ। ” “তাহলে আর কি, আপাতত ছেলে দেখা বন্ধ করে কাজে মনোযোগ দে। সামনে ঈদ আসতে চললো।” “এবারের ঈদে আমি কিছু করতে পারবো না। যা করার সব আবির আর তানভির করবে।” আলী আহমদ খান চিন্তিত কণ্ঠে শুধালেন, “ওরা কি পারবে?” “পারবে না কেনো? বড় হয়েছে দায়িত্ব নিতে হবে না?” ‘আচ্ছা বলে দেখিস। কিন্তু আপাতত ছেলে দেখা বন্ধ রাখ। ” মোজাম্মেল খান গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, “ঠিক আছে, রাখলাম বন্ধ। কিন্তু ভালো ছেলে পেলে অবশ্যই বাসায় নিয়ে আসবো।” “আগে দেখ, ভালো ছেলে পাস কি না।” মোজাম্মেল খান রাশভারি কণ্ঠে শুধালেন, ” তুমি কি আমার সাথে ঠাট্টা করছো ভাইজান? ” আলী আহমদ খান মেকি স্বরে বললেন, ” ঠাট্টা করবো না তো কি করবো? এই বলিস ছেলে ভালো, পরিবার ভালো অথচ ছেলে বাসা পর্যন্ত আসেই না। আমি কিভাবে বুঝবো ভালো নাকি খারাপ?” মোজাম্মেল খান প্রখর তপ্ত স্বরে বললেন, ” ঠিক আছে, এর পর আমি গিয়ে ছেলেকে বাসায় নিয়ে আসবো।” আলী আহমদ খান উদাসীন কণ্ঠে বললেন, “আচ্ছা। আসলে আমাকে খবর দিস। ” এদিকে মেঘ একটু পর পর বেলকনিতে যাচ্ছে, আবিরের জন্য অপেক্ষা করছে। হঠাৎ বাইকের শব্দ শুনতেই বেলকনিতে ছুটলো। তানভিরের পেছনে আবির বসা, আবিরকে দেখেই মেঘের মুখে হাসি ফুটলো। আবির রুমে গিয়ে ফ্রেশ হয়েই বিছানায় ল্যাপটপ নিয়ে বসেছে। প্রায় ১৫-২০ মিনিট পর মেঘ আসছে। ভেতরে না ঢুকে দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে

আবিরকে দেখছে। আবির পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে কাজ করছে, হঠাৎ নিজের ফোন নিতে হাত বাড়াতেই মেঘকে নজরে পড়লো। মেঘের চোখে মুখে প্রশান্তির হাসি, আবেশিত দৃষ্টিতে আবিরকে দেখছে। আবির মেঘকে আপাদমস্তক দেখে উষ্ণ স্বরে বলল, "কি ব্যাপার ম্যাম, বাহিরে দাঁড়িয়ে আছেন কেনো? রুমে আসার জন্য কি আপনাকে আলাদাভাবে আমন্ত্রণ জানাতে হবে?" মেঘ মুচকি হাসলো। উত্তর না দিয়ে উল্টো প্রশ্ন করল, " আজকের ছেলে টা কেমন ছিল?" আবির নিঃশব্দে হেসে বলল, " আপনি কেমন আশা করেছিলেন?" "রাজপুত্রের মতো।" আবিরের আঁখি যুগল খানিক প্রশস্ত হলো। সহসা ঠোঁটের কোণে সহসা হাসি ফুটে উঠেছে। অতঃপর আবির স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, " রুমে আসুন, ম্যাম। " "নাহ। আপনি কাজ করুন।" আবির ল্যাপটপের দিকে একপলক তাকিয়ে চাপা স্বরে বলল, " রাত অনেক হয়েছে, ঘুমাতে যান।" মেঘ শান্ত স্বরে বলল, "ঘুম আসতেছে না।" আবির অকস্মাৎ ভ্রু কুঁচকে সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, "কেনো?" আবিরের অভিপ্রায় বুঝতে পেরে ঠোঁটে হাসি রেখে মেঘ অত্যন্ত গুরুতর কণ্ঠে জবাব দিল, " হবু জামাই টাকে খুব মিস করছি। " আবির সঙ্গে সঙ্গে ল্যাপটপ বিছানায় ফেলে দাঁড়িয়ে হুঙ্কার দিয়ে উঠল, "কি?" মেঘ স্ব শব্দে হেসে এক দৌড়ে নিজের রুমে চলে গেছে। আবির এগিয়ে গিয়ে রুমের দরজায় কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো। মেঘের করা ছোট ছোট দুষ্টামি গুলো আবিরের বরাবর ই খুব প্রিয়। আবির রুমে এসে আবারও কাজে মনোযোগ দিল। ঘন্টাখানেক পর

মেঘের নাম্বার থেকে একটা মেসেজ আসছে, ” Miss You অনেকটা নিচে লেখা হবু জামাই। ” আবির মেসেজ টা দেখে আবারও হাসলো। ঘড়িতে তখন ১২ টার উপরে বাজে। আবির রিপ্লাই দিল, ” ঘুম না আসলে ছাদে চলুন তাঁনাদের সাথে আড্ডা দিয়ে আসি।” দুমিনিট বাদেই মেঘ মেসেজ দিল, ” আমি ছাদেই আছি।” আবির এক লাফে বিছানা থেকে নেমে দ্রুত দৌড়ে ছাদে গেল। তাঁনাদের প্রতি মেঘের এক আকাশ সমান ভয়, যার জন্য সন্ধ্যার পরে আবিরের রুমটাও পার হয় না। আবিরের উপর রাগ করে একদিন রাতে ছাদে এসে বৃষ্টিতে ভিজেছিল আর আজ দ্বিতীয় দিন। আবির ছাদে আসতেই মেঘ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে গম্ভীর কণ্ঠে বলল, ” আমি কি আপনাকে বিরক্ত করেছি?” মেঘের মাথা থেকে পরে যাওয়া ওড়নাটা আবির দুহাতে আবারও মাথায় তুলে দিল। লোকে বলে রাত বিরাতে ছাদে তাঁনারা ঘুরাফেরা করে। তাঁনাদের নজর যেন মেঘের উপর না পড়ে সেই ভয়েই আবির মেঘের কপাল পর্যন্ত ওড়না টেনে দিয়েছে। চিরচেনা গায়ের গন্ধ নাসারন্ধ্রে প্রবেশ মাত্রই মেঘের অন্তঃস্থলে শিহরণ জাগে। মৃদু আলোতে মেঘের দিকে তাকিয়ে আবির মোলায়েম কণ্ঠে বলল, ” মাঝে মাঝে বিরক্ত কি জিনিস বুঝতেই পারি না। ” মেঘ নিজেকে সামলে উত্তেজিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, “ঐ ছেলেটার সাথে দেখা করেছিলেন আপনি? ” আবির কপট রাগ দেখিয়ে বলল, “ঐ ছেলের ব্যাপারে কথা বলার জন্য আমার কাছে কোনো সময় নেই। চলে যাচ্ছি আমি।” আবির ঘুরতেই মেঘ আবিরের হাত চেপে ধরলো। আবির

আড়চোখে তাকাতেই মেঘ সঙ্গে সঙ্গে হাত ছেড়ে ধীর কণ্ঠে বলল, " আপনি বলেছিলেন তাঁনাদের সাথে গল্প করবেন।" আবির মনে মনে আওড়াল, "আমার যে আপনার সাথে কথা বলতে ইচ্ছে করছিল। তাঁনারা তো বাহানা মাত্র। " মেঘ আর আবির মুখোমুখি দুটা সিঙ্গেল সোফায় বসা। কারো মুখেই কোনো কথা নেই। মেঘ নীরবে বসে নিজের হৃদয়ের প্রবল ধুকপুকানি সহ্য করছে, ক্ষণে ক্ষণে আবিরের দিকে তাকাচ্ছে তবে আবিরের নিগূঢ় দৃষ্টি দেখে স্থির থাকতে পারছে না। কথা বলতে গিয়ে বার বার কথা গিলছে। ধীরে ধীরে শরীর ঘামতে শুরু করেছে। শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি সামলে মেঘ আচমকা ডাকলো, " আবির ভাই..." সুপরিচিত কণ্ঠস্বরের চিরচেনা জবাব, "হুমমমমমমম" আবিরের মোহমায়ায় জড়ানো মেঘ বিমোহিত নয়নে আবিরকে দেখে ঢোক গিলে উষ্ণ স্বরে জানতে চাইলো, " আব্বু এমন করছেন কেনো?" মেঘের আকুল কণ্ঠে বলা কথাটায় আবির নড়েচড়ে বসলো। ধীর কণ্ঠে বলল, " জানি না। " "আপনি এভাবে আর কতদিন আমাকে বাঁচাবেন?" "জানি না।" মেঘ একটু রাগী স্বরে বলল, " আপনি কি কিছুই জানেন না?" আবির মেঘের দিকে তাকিয়ে মলিন হেসে বলল, "তোর কাছে একটা জিনিস চাইবো। দিবি?" ওমনি মেঘের হৃৎস্পন্দন বাড়তে শুরু করেছে। আবিরের আকুল আবেদনে মেঘের ভেতর তোলপাড় শুরু হয়ে গেছে। মেঘ তপ্ত স্বরে বলল, " কি চান?" " সাহস। " আবিরের কথা শুনে মেঘ আনমনেই হেসে ফেলল। লজ্জায় চিবুক খানিক নামিয়ে বলল, "আপনি আমার কাছে সাহস

চাচ্ছেন? ” আবির ঢোক গিলে শান্ত স্বরে বলল, ” হ্যাঁ চাইছি। ” “কেনো?” “নিজের করা ভুলগুলো প্রতিনিয়ত তাড়া করে আমায়, জানি না কখন কি হবে। যদি পারিস একটু সাহায্য করিস। ” “কিসের ভুল? কি করেছেন আপনি? কিসের সাহায্য চাইছেন?” আবিরের শাণিত চাহনি মেঘের হৃদয়ের তোলপাড় আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে। আবিরের কথার মানে বুঝতে পারছে না। বুকটা ধড়াস ধড়াস করে কাঁপছে। মেঘ প্রখর নেত্রে দীর্ঘ সময় আবিরকে নিরীক্ষণ করলো, একবারের জন্য পল্লব ফেললো না । আবির দু’হাতে নিজের মুখ ঢেকে বসে আছে। ভেতরে ভেতরে কাঁদছে এটা বুঝতে পেরেই মেঘ তড়িৎ বেগে আবিরের কাছে এগিয়ে গেলো। আবিরের মাথায় হাত রেখে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে শুধালো, “আবির ভাই, কি হয়েছে আপনার?” মেঘের স্পর্শ পেয়ে আবিরের ভেতরের কান্না কিছুটা প্রকাশিত হলো। আবিরের কান্না দেখে মেঘের রাকিবের গায়ে হলুদের রাতের কথা মনে পড়ে গেছে। মেঘ আর্তনাদ করে উঠলো, “আপনি কাঁদছেন কেনো? কি হয়েছে বলুন আমায়, প্লিজ।” “প্লিজ বলুন।” আবির হঠাৎ ই মেঘের হাতটা শক্ত করে ধরলো। আকস্মিক ঘটনায় মেঘের শরীর ঝাঁকুনি দিয়ে উঠেছে। ক্রন্দনরত অবস্থায় আবির কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে বলল, “I am Sorry, Megh. I am really sorry.”আবিরের ক্রন্দিত কণ্ঠে বলা কথাটা মেঘের কর্ণকুহরে প্রবেশ মাত্রই মেঘ কিংকর্তব্যবিমুঢ় হয়ে গেছে। মেঘের বুক ধড়ফড় করছে, গাত্র জুড়ে রক্ত সঞ্চালন তীব্র থেকেও তীব্র হতে শুরু করেছে, বুকের বাম প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ হৃদপিণ্ডে বেধক

নাভিশ্বাস অনুভূত হচ্ছে। আবির ভাইয়ের সংগুপ্ত প্রণয়ের অনলে বারংবার আহত হওয়া মেয়েটার হৃদয় আজ আবিরের আর্তনাদে সম্পূর্ণ তছনছ হয়ে গেছে। ভীতিকর, অযাচিত পরিস্থিতি সামলানোর অণুমাত্র সামর্থ্য মেঘের নেই। মেঘ ক্ষুদ্র আলোতে আশ্চর্য নয়নে চেয়ে আছে আবিরের পরিশ্রান্ত ধৃষ্টতায়, আবিরের হাতে থাকা মেঘের হাতটা থরথর করে কাঁপছে, ক্ষণিকের ব্যবধানে মেঘের অক্ষিপট ভিজে এসেছে। আবির ভাই সরি বলছেন, কিন্তু কেনো? চোখের সামনে ঘটা সবকিছু অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে। কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তির মুখে অনাকাঙ্ক্ষিত শব্দ অবসহন করতে মেঘের নিজের সাথে নিজেকে প্রভূত বিগ্রহ করতে হয়েছে। মনের আস্তিনের টালমাটাল হাল সামলে মেঘ ভয়ার্ত গলায় জানতে চাইল, ” আপনার কি হয়েছে? ” কান্নার তোপে আবিরের কপালের পাশের শিরা উপশিরাগুলো দপ দপ করছে, রক্ত বর্ণের আঁখি যুগল আরও বেশি রক্তাভ হয়ে গেছে। আবিরের লাগামহীন ক্রন্দনের সমাপ্তির রেশ মাত্র নেই। মেঘের চোখ ছলছল করছে, দুহাত বরফের ন্যায় ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে। বুকের ভেতরের ঘনীভূত নভশ্চর সরিয়ে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে মেঘ ভেজা কণ্ঠে আবারও প্রশ্ন করল, “আবির ভাই, আপনি কাঁদছেন কেনো?” আবির ঢোক গিলে মুখ তুলে মেঘের অভিমুখে চাইলো। আবিরের চোখ মুখের ধরণ অত্যন্ত গুরুগম্ভীর, চেহারায় বিন্দুমাত্র লাবন্য নেই। মেঘের তুষারের মতন ঠান্ডা দুহাত আবির অতর্কিতেই নিজের গালে রাখলো, সহসা আবিরের চওড়া দুহাত দিয়ে মেঘের ছোট ছোট হাতকে সম্পূর্ণ ঢেকে ফেলেছে।

আবিরের গালের খোঁচা খোঁচা দাঁড়ি সেই সাথে গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়া নোনাজলের স্পর্শে মেঘের সর্বাঙ্গে শীতল হাওয়া বইছে। প্রণয়ের পূর্ণতা পাওয়ার শাণিত আক্ষেপে যে ধ্বংসের খেলায় নেমেছিল সেই ধ্বংসলীলা প্রতিনিয়ত ব*ধ করছে মেঘের নিষ্কলুষ হৃদয়কে। মনের গহীনে এক বছরে আত্মগোপনে মন্থর গতিতে বেড়ে ওঠা অভিমানের ভাপগুলো আজ আবিরের নিগূঢ় সংস্পর্শে অনুযোগে রূপ নিতে উঠেপড়ে লেগেছে। নিদারুণ ভীতিপ্রদ পরিস্থিতিতে মেঘ হতবিহ্বল হয়ে আছে, লুকোচুরি প্রেমগুলো মনের অন্তরালেই নিথর হয়ে গেছে। আবিরের নিরেট দৃষ্টিতে উদ্বেগ স্পষ্ট, আবির আস্তে করে গলা খাঁকারি দিয়ে অত্যন্ত নমনীয় কণ্ঠে বলল, " অপ্রসন্নতায় ঘেরা জনপদে আমি না চাইতেও বিশল্যকরণীর কবলে পড়ে গেছি। পুঁথিগত শব্দে তোকে বুঝাতে আজ আমি অক্ষম। প্রয়োজনে সমস্ত বিপর্যয় নিরবতায় সয়ে যাব, তবুও ব্যর্থতা সইতে পারবো না। " মেঘ শান্ত স্বরে নির্দ্বিধায় বলল, "আপনাকে ব্যর্থতা সইতে হবে না। আমি সবসময় দোয়া করি যেনো আপনি সবকিছুতে সফল হতে পারেন। আমার বিশ্বাস আপনি সফল হবেন, ইনশাআল্লাহ। এবার অন্তত থামুন,প্লিজ। " আবির ভেজা চোখেই মুচকি হেসে বলল, " তবে যে কাউকে অনেকবেশি সহিষ্ণু হতে হবে।" মেঘ উদ্বেলহীন কণ্ঠে জানাল, " কারো সহিষ্ণুতায় যদি আপনার সাফল্য অর্জিত হয়, তবে সে অমেয় সহিষ্ণু হবে।" আবির মেঘের হাতের উপর থেকে নিজের হাত সরিয়ে মলিন হেসে ঠান্ডা কণ্ঠে বলল, "অনেক রাত হয়েছে, ঘুমাতে যান এখন। " মেঘ চিন্তিত

কণ্ঠে শুধালো, “আর আপনি?” “একটু পর যাব।” মেঘ নিজের ওড়নার একপাশ টেনে আলতোভাবে আবিরের চোখ-মুখ মুছে দিচ্ছে। আবির চোখ বন্ধ করে মেঘের স্নিগ্ধতা অনুভব করছে। এতক্ষণ কান্নার কারণে বুঝতে না পারলেও এখন মেঘের গায়ের গন্ধে আবির মত্ত হয়ে যাচ্ছে। মায়াবতীকে ছুঁতে চাওয়ার উন্মাদনা আঁকড়ে ধরেছে আবিরকে। হৃদয়ের ক্ষত প্রতিহত করার ক্ষমতা আবিরের থাকলেও মেঘের প্রতি অগাধ অনুরক্তি লুকিয়ে রাখার সামর্থ্য আবিরের নেই। মেঘের অনাবশ্যক যত্নে আবিরের বুকে অদ্ভুত শিহরণ জাগছে। আবিরের মনে মেঘকে নিয়ে সর্বদায় সংশয় কাজ করে। মেঘ যেদিন আবিরের চোখে চোখ রেখে আবিরের অনুভূতি জানতে চাইবে সেদিনই আবিরের সবকিছু ছারখার হয়ে যাবে। কারণ ঐ চোখে চোখ রেখে আবির কখনো মিথ্যা বলতে পারবে না। অন্যদিকে নিজেকে নিজে কথা দিয়েছে, “মেঘকে প্রতিশ্রুতি দিবে না,বউ করে নিজের অঢেল ভালোবাসার সমক্ষ প্রমাণ দিবে।মেঘের কান্না চিরতরে মুছে দেয়ার প্রতিজ্ঞা করেছে।” সেসব কিছু ভেবেই বারংবার আহত হয় আবির। মেঘকে সম্পূর্ণ নিজের করে নিতে পারছে না, পরিবার নাম বেড়াজালে বাঁধা পড়ে আছে। এদিকে মেঘের কান্না কমার বিপরীতে দিনকে দিন বেড়েই চলেছে। আবির প্রতিনিয়ত নিজেকে দায়ী করছে আর অন্তরের উত্তাপে নিজেই ঝলসে যাচ্ছে। মেঘ আবিরের চোখ-মুখ মুছে শীতল কণ্ঠে বলল, ” আমাকে রুম পর্যন্ত দিয়ে আসুন।” আবির ভ্রু কুঁচকে ক্ষীণ স্বরে বলল, ” আসছিলেন কিভাবে? ” মেঘ চট করে বলে

ফেলল, " যেভাবেই আসি না কেন, তাতে আপনার কি? এখন আমাকে দিয়ে আসবেন, চলুন।" আবির আড়চোখে মেঘের পানে তাকালো, ক্ষুদ্র আলোতেও মেয়েটার ক্রোধিত মুখশ্রী জ্বলজ্বল করছে। আবির মৃদু হাসলো, আবিরের হাসি দেখে মেঘ হতাশ হয়ে ভারী নিঃশ্বাস ছেড়ে আকুল কণ্ঠে বিড়বিড় করে বলল, " ঐ যে দেখুন, দরজায় দাঁড়িয়ে তাঁনারা আমাকে দেখে কেমন করে হাসছে।" মেঘের আজগুবি কথা শুনে আবির না হেসে থাকতে পারলো না । অকস্মাৎ জোরে শব্দ করে হাসতে শুরু করেছে। আবিরের মুখে হাসি ফুটাতে পেরেছে বলে মেঘ আহ্লাদে গলে যাচ্ছে। আবিরের হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে মনে মনে আওড়ালো, " আপনি যতবার নিরাশ হবেন, আমি ঠিক ততবার আপনার মনে আশার আলো জ্বালাবো। আমৃত্যু আপনার পাশে হিতৈষীর ছায়া হয়ে থাকবো।" আবেগে আপ্লুত মেঘের রঙিন ধৃষ্টতার অন্ধকার মুহূর্তেই সরে গেছে। রঙ বেরঙের স্বপ্নে সেজে ওঠেছে মনের আঙিনা। আবিরের নজর মেঘের দিকে পড়তেই জিভ দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে ভ্রু নাঁচালো। মেঘ লজ্জায় চিবুক নামিয়ে বিড়বিড় করে বলল, " আপনার হৃদয়ে অনূভুতি সমাপ্তির পূর্বেই নবরূপে সৃজন করবো তৃপ্তির নিকেতন। " আবির বসা থেকে দাঁড়িয়ে মোলায়েম কণ্ঠে বলল, "ম্যাম,চলুন।" আবির হাঁটছে মেঘও আবিরের পিছুপিছু হাঁটছে। কিছুটা আলোকিত ছাদ পেরিয়ে দরজার কাছে আসতেই মেঘ চোখে অন্ধকার দেখছে। হঠাৎ মনে পড়ে গেল, সত্যি সত্যি যদি তাঁনারা এখানে থাকে।মেঘ ভয়ে আবিরের শার্ট খামচে ধরেছে। মেঘের

অধীরতা বুঝতে পেরে আবির একটু থেমে মেঘের পিঠ পেরিয়ে অন্যপাশের কাঁধে আলতোভাবে হাত রেখেছে। অকস্মাৎ মেঘ চিৎকার দিয়ে উঠেছে, “আ.....” আবির তড়িৎ বেগে মেঘের মুখ চেপে শক্ত কণ্ঠে বলল, ” আরে পাগল, আমি ধরেছি। তাঁনারা ধরে নি।” মেঘ আতঙ্কিত কণ্ঠে বলে উঠল, “আপনি এভাবে ধরেছেন কেনো? আমি ভয় পেয়ে গেছি। বলে ধরবেন না?” আবির নাক মুখ কুঁচকে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, “আপনাকে ছুঁতে গেলে অনুমতি নিতে হবে?” মেঘ মন মরা হয়ে বলল, ” অন্ধকারে ভয় লাগে।” আবির কিছুটা সরে গিয়ে শক্ত কণ্ঠে বলল, “তোর কাছে ফোন আছে না? ফ্ল্যাশ জ্বালা।” “No need.” “কেনো?” মেঘ দু’হাতে আবিরের বাহু চেপে ধরে বলল, “আপনিই আছেন। ” আবির নিঃশব্দে হেসে সিঁড়ি দিয়ে নামছে। মেঘের রুমের সামনে আসতেই মেঘ শান্ত স্বরে বলল, ” আপনি কিন্তু এখন আর ছাদে যাবেন না। ” “কেনো?” “আপনি রুমে না থাকলে আমার ভয় লাগে। ” আবির কপাল গুটিয়ে বলল, ” আমার রুমে আমি থাকার সাথে আপনার ভয় পাওয়া না পাওয়ার কি সম্পর্ক?” মেঘ সাফাই দেয়ার স্বরে বিড়বিড় করে বলল, ” মন কে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য পাশের রুমে মানুষ থাকা আবশ্যক। আপনার রুম ফাঁকা থাকলে তাঁনারা আমাকে ভয় দেখানোর সুযোগ পেয়ে যাবে।” আবির নিঃশব্দে হেসে বলল, ” এত বছর যে আমার রুম ফাঁকা ছিল। তখন মনকে কিভাবে সান্ত্বনা দিতেন?” মেঘ একরাশ বিরক্তি নিয়ে বলে উঠল, ” আপনি এত কথা বলেন কেন? ছাদে যেতে বারণ করেছি মানে যাবেন

না।” কথাটা বলেই মেঘ ফোঁস করে শ্বাস ছাড়লো। আবির ভ্রু কুঁচকে দু আঙুলে মেঘের নাকে আলতোভাবে চেপে মোলায়েম কণ্ঠে বলল, ” সরাসরি নিষেধাজ্ঞা দিলেই হয়, মিথ্যা অজুহাত দেখানোর কি প্রয়োজন? হুমমমমম।” মেঘ সঙ্গে সঙ্গে মাথা নিচু ফেলেছে। আবির স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, “ঘুমান আপনি, আমিও ঘুমাতে যাচ্ছি। ” মেঘ ঘাড় কাত করে সম্মতি দিল। সময় চলছে নিজস্ব গতিতে। আরও একটা ঈদ কেটে গেছে। মোজাম্মেল খানের কথামতো এবার সব দায়িত্ব আবির আর তানভির একায় সামলিয়েছে। গত ঈদে মেঘ শুধু আবির, তানভিরকে পাঞ্জাবি দিলেও এই ঈদে সবার জন্য পাঞ্জাবি ডিজাইন করেছে। আর পাঞ্জাবিগুলো মোজাম্মেল খান নিজে গিয়ে পছন্দ করে নিয়ে আসছিলেন। মেঘের পরীক্ষার জন্য আপাতত বিয়ের ব্যাপারে মোজাম্মেল খান কোনো কথাবার্তা বলছেন না তাই আবির আর তানভির দুজনেই বেশ নিশ্চিন্ত। বাসার সবাই নিজেদের মতো বেশ শান্তিতে আছে। ইকবাল খান মাঝে মাঝেই আবিরের রুমে গিয়ে আবিরকে আলাদাভাবে বুঝিয়ে আসেন। আবিরের সাথে মেঘের সম্পর্কও আগের থেকে বেশ ভালো হয়েছে। দুজনের মধ্যে ছোটখাটো খুনসুটি সর্বক্ষণ লেগেই থাকে। একে অপরকে ভালোবাসে, দু’জন দু’জনের ভালোবাসা উপলব্ধি করতে পারে তবুও মুখ ফোটে কেউ কাউকে ভালোবাসি বলতে পারে না। আবির যেমন নিজের গন্ডিতে বাঁধা তেমনি মেঘও নিজের গণ্ডিতে বন্দি হয়ে আছে। মিনহাজের ঘটনার পরপর মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিল, ” যতদিন পর্যন্ত আবিরের

প্রণয়ের প্রমাণ পাবে না ততদিন পর্যন্ত মেঘ আবিরকে কিছুই বলবে না।” ধীরে ধীরে মিনহাজদের সাথেও মেঘের সম্পর্ক কিছুটা উন্নত হয়েছে। তানভির নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে গেছে তবে সময় পেলে আবিরের গাড়ি নিয়ে ভাই বোনদের সঙ্গে নিয়ে ঘুরাঘুরি করে। ফুপ্পিদের বাসার সাথেও যোগাযোগ ভালো হয়েছে। ১৫ দিন কিংবা মাসে একবার হলেও যাতায়াত হয় । সবার সম্পর্ক ভালো থাকলেও মীম আর আরিফের সম্পর্ক এখনও টম & জেরির মতো। মেঘ একটুর জন্য চোখের আড়াল হলেই মীম কোনো এক অঘটন ঘটিয়ে ফেলে। আরিফ প্রথম প্রথম আম্মুর কথা ভেবে মীমের দুষ্টামি সহ্য করলেও এখন আর করে না। সুযোগে দুটায় দুটার পিছনে লাগে। আজ সকাল থেকেই শিমুল আর সোহাগ তানভিরকে কল দিচ্ছে। অনেকদিন যাবৎ বন্ধুদের সাথে দেখা হচ্ছে না। তাই তানভির বিকেলের দিকে বন্ধুদের সাথে দেখা করতে বেড়িয়েছে। শিমুল আর সোহাগ দু’জনেই আগে থেকে উপস্থিত। একসঙ্গে ঘুরাঘুরি করে আড্ডা দিচ্ছিলো আর চা খাচ্ছিলো। তানভির চায়ে চুমুক দিয়ে রাস্তার দিকে তাকাতেই সহসা ভ্রু কুঁচকালো। বন্যা কিছু জিনিসপত্র নিয়ে একা একা হনহন করে যাচ্ছে। তানভির চায়ের কাপ রেখে তড়িঘড়ি করে উঠে বলল, “তোরা বস, আমি আসতেছি।” সোহাগ ধীর কণ্ঠে শুধালো, “কোথায় যাচ্ছিস?” তানভির মেকি স্বরে জবাব দিল, “প্রেম করতে।” তানভির যেতে যেতে বন্যা অনেকটায় সামনে চলে গেছে। তানভির পেছন থেকে ডাকলো, ‘বন্যা। ‘ আচমকা পুরুষালি কণ্ঠে নিজের নাম শুনে বন্যা ফিরে

তাকালো। তানভিরকে দেখে কিছুটা স্বস্তি পেল। স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, “আসসালামু আলাইকুম। ” “ওয়ালাইকুম আসসালাম। পরীক্ষা কেমন হলো?” “আলহামদুলিল্লাহ ভালো।” কোথায় গিয়েছিলে?” “একটা ফ্রেন্ডের বাসায় গিয়েছিলাম আর কিছু কেনাকাটা করেছি।” তানভির হাত বাড়িয়ে বলল, “ব্যাগ টা আমাকে দাও। আমি এগিয়ে দিয়ে আসছি। ” বন্যা তড়িৎ বেগে বলল, “নাহ। আমি নিতে পারবো। ” “বিশ্বাস রাখতে পারো, তোমার ব্যাগ নিয়ে পালাবো না আমি।” বন্যা ভ্রু কুঁচকে গম্ভীর কণ্ঠে বলল, ” আমি কি একবারও বলেছি আপনি পালাবেন?” “তাহলে ব্যাগটা দাও। ” ব্যাগ নিতে গিয়ে বন্যার হাতে তানভিরের হাত লাগতেই বন্যা তৎক্ষনাৎ ব্যাগ ছেড়ে হাত সরিয়ে ফেলেছে। তানভিরের তপ্ত স্পর্শ অনুভব হতেই বন্যার বুক কেঁপে উঠছে। তানভির ব্যাগ ধরে বিস্ময় সমেত তাকিয়ে প্রশ্ন করল, “কোনো সমস্যা? ” “নাহ।” তানভিরকে কে বুঝাবে, বন্যার কাছে তানভির মানুষটায় সমস্যা। বন্যা যতটা সম্ভব তানভিরের থেকে নিজেকে গুটিয়ে রাখে তবুও ততটা পারে না। কোনো না কোনোভাবে মানুষটার সাথে দেখা হয়েই যায়। বন্যা স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, “আপনি এখানে কেনো আসছিলেন?” “বন্ধুরা দেখা করার জন্য বার নার কল দিচ্ছিলো। তাই আসছি।” “এখানে চলে আসছেন যে। বন্ধুরা খোঁজবে না? আমাকে ব্যাগটা দিয়ে বন্ধুদের কাছে যান, আমি নিতে পারবো।” “এত কথা বলো কেনো তুমি? আমি সাথে যাচ্ছি এটা ভালো লাগছে না?” তানভিরের ধমকে বন্যা কিছুটা কেঁপে উঠল। তানভির সহসা কৌতুক

স্বরে বলল, “আরে মজা করছিলাম। চলো, তোমাকে এককাপ চা খাইয়ে রিক্সায় উঠিয়ে দিচ্ছি।” বন্যা নাক কুঁচকে বলল, “চা খাবো না, ধন্যবাদ। ” তানভির শব্দ করে হেসে বলল, “আমি তো জানতাম তোমার চা খুব পছন্দ। এখন আমি বলছি বলে খাবে না?” বন্যা কিছুটা উদ্বেল কণ্ঠে শুধালো, ” আপনাকে কে বলছে? মেঘ?” ” সেটা তুমি জেনে কি করবা? খাবে কি না বলো।” বন্যা আস্তে করে বলল, “ঠিক আছে।” অনেকটা সামনে এগিয়ে রাস্তার পাশে একটা চায়ের দোকানে দুজনেই চা খেতে দাঁড়িয়েছে। আশপাশে তেমন মানুষজন নেই। চায়ের দোকানে ৪-৫ জন লোক চা খাচ্ছে যার মধ্যে দু’জন সিগারেট টানছে। বন্যা গোল গোল চোখে সেই লোকদের দিকে তাকিয়ে আছে। তাদের হাবভাব দেখে বন্যার ভ্রু যুগল আরও কুঁচকে আসে। তানভির সে দৃশ্য দেখে বলল, “তুমি বরং এ পাশে দাঁড়াও তাহলে ধোঁয়া আসবে না। ” বন্যা অতর্কিতে তানভিরের পানে তাকালো। কিছু একটা জিজ্ঞেস করতে গিয়েও থেমে গেলো। তানভির তপ্ত স্বরে বলল, “কিছু বলবে?” বন্যা এপাশ ওপাশ মাথা নেড়ে না করলো।তানভির পুনরায় প্রশ্ন করল, ” তুমি কি কোনো কারণে আপসেট? ” বন্যা চোখ তুলে তাকালো তবে কিছু বললো না। বন্যা রাস্তার দিকে মুখ করে দাঁড়ানো আর তানভির রাস্তার পাশে দাঁড়ানো। এদিকে সচরাচর গাড়ি চলাচল করে না। হঠাৎ দু একটা গাড়ি আসে। বন্যার সঙ্গে সরাসরি চোখাচোখি হতেই তানভির বন্যার মাদকের ন্যায় চোখে গহীনে ডুবে গেছে। আশপাশ ভুলে নিরেট দৃষ্টিতে বন্যাকে দেখছে। আচমকা বন্যা এগিয়ে

এসে তানভিরের পেট বরাবর শার্ট আঁকড়ে ধরে শক্ত করে টান দিতেই তানভির বেসামাল হয়ে বন্যার সঙ্গে ধাক্কা খেলো। তানভিরের ঘোর কাটতেই খেয়াল করলো একটা পিক-আপ নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে তানভিরের পাশ কেটে স্প্রীডে চলে গেছে। তানভির সঙ্গে সঙ্গে আশপাশে দেখলো। এদিকে বন্যার দু-হাত এখনও তানভিরের পেটে। কয়েক মুহুর্তে তানভির স্বাভাবিক হলো, বন্যার স্পর্শ অনুভব করা মাত্রই তানভিরের সারা শরীরে ঝাঁকুনি দিয়ে উঠেছে। নিজেকে সামলে তানভির সঙ্গে সঙ্গে সরে দাঁড়িয়েছে। বন্যা রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে বলল, " আপনাকে এতবার ডাকলাম। কথা কানে যায় নি?" তানভির বন্যার ক্রোধিত চোখ মুখ দেখে মৃদু হাসলো। তানভিরের মস্তিষ্ক এখনও বন্যার স্পর্শে অনুভবে মেতে আছে। কি হয়েছে বা কি হতে যাচ্ছিলো এসবে তানভিরের বিশেষ মনোযোগ নেই। তানভিরের ঠোঁটে হাসি দেখে বন্যার মেজাজ আরও বেশি খারাপ হলো। রাগে কটমট করে বলল, " আপনি হাসতেছেন? এখন যদি গাড়িটা আপনার উপর দিয়ে যেতো। তখন কি হতো?" তানভির মৃদুস্বরে বলল, " জানি না। " বন্যা ফের বলে উঠল, " রাস্তাঘাটে এভাবেই চলাফেরা করেন?" তানভির কপাল গুটিয়ে প্রশ্ন করলো, "কিভাবে চলাফেরা করি?" "অসাবধানতায়। " "ওহ।" বন্যা ফোঁস করে উঠলো, "ওহ কি? আপনার কিছু একটা হয়ে গেলে বাসার অবস্থা কি হতো একবার ভেবেছেন?" তানভির কপাল কুঁচকে বলল, " কি হতো?" তানভিরের দুষ্টামি বুঝতে পেরে বন্যা রাগে আরও বেশি ফুঁসছে। রাগের কারণে

বন্যার ঠোঁট দুটা স্বাভাবিকের তুলনায় বেশ সরু হয়ে গেছে। গোলাপী লিপস্টিকে সরু ওষ্ঠদ্বয়ে তানভিরের নজর স্থির হয়ে আছে। বন্যা রাগে একের পর এক কথা বলছে। তানভির অবাক লোচনে শুধু ঠোঁটেই চেয়ে আছে। বন্যা অকস্মাৎ বলে উঠল, "আমি এখনই মেঘকে কল দিয়ে সব বলব ।" মেঘের নাম শুনে তানভিরের এবার টনক নড়ে উঠলো। তৎক্ষনাৎ বলল, "প্লিজ, বনুকে কিছু বলো না।" বন্যা ভারী কণ্ঠে বলল, " আপনি কতটা কেয়ারলেস এটা তো ওর জানা দরকার। আমি এখনি কল দিচ্ছি। " বন্যা মেঘকে কল দেয়ার জন্য নাম্বার বের করতে লাগলো। তানভির বন্যার হাত থেকে ফোন নিয়ে নিজের পকেটে রেখে গম্ভীর কণ্ঠে বলল, " আর যাই করো সমস্যা নেই কিন্তু বনুকে আজকের ঘটনা বলো না, প্লিজ।" "কোনো? " তানভির মনে মনে বিড়বিড় করল, " ভাইয়া যদি জানতে পারে আমার জন্য বনু কান্না করছে, তাহলে সবার রাগ আমার একার উপর ঝাড়বে। ওমা আমি নাই!" তানভির ঢোক গিলে উষ্ণ স্বরে বলল, " বনুকে বললে বাসার সবাই জেনে যাবে। বনু কান্নাকাটি করে নাজেহাল অবস্থা করে ফেলবে। বাসার মানুষের বকাও খেতে হবে। " বন্যা চাপা স্বরে বলল, "মেঘকে খুব ভালোবাসেন তাই না?" তানভির কপাল কুঁচকে মৃদু হেসে জবাব দিল, " হ্যাঁ খুব ভালোবাসি। " তানভির মনে মনে আওড়াল, "বনুর বেস্ট ফ্রেন্ডকেও খুব ভালোবাসি। " বন্যা ধীর কণ্ঠে বলল, "মেঘও আপনাকে অনেক ভালোবাসে। ওর জন্য আর বাসার সবার জন্য হলেও একটু সাবধানে চলাফেরা করবেন। আপনার একটু

উদাসীনতায় পুরো পরিবারকে কাঁদতে হবে। তাই প্লিজ, সাবধানে চলাফেরা করবেন।” তানভির নেশাক্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে মোলায়েম কণ্ঠে বলল, “ইনশাআল্লাহ, চেষ্টা করবো।” চায়ের দোকানের মামা কোথায় চলে গেছিলেন। এতক্ষণে কোথা থেকে এসেই জিজ্ঞেস করলেন, “মামা, আপনাদের কি চা দিবো?” তানভির উচ্চ স্বরে বলল, “একটা আদা চা আরেকটা লেবু চা। লেবু চা তে চিনি একটু বেশি দিবেন।” বন্যা অবাক চোখে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, “আপনি কিভাবে জানেন আমি লেবু চা খাই আর চিনি বেশি খাই?” তানভির আড়চোখে আকাশের পানে তাকিয়ে অকস্মাৎ বলে উঠল, “ঠিকই তো। আমি কিভাবে জানি?” বন্যা গম্ভীর কণ্ঠে বলল, “প্রশ্ন টা আমি আপনাকে করেছি।” তানভির মেকি স্বরে বলল, “উত্তর ভাবতে সময় দিবে তো নাকি ?” বন্যা তানভিরের হাবভাব দেখে প্রখর তপ্ত স্বরে বলল, “থাক, আর উত্তর দিতে হবে না।” “বাঁচা গেলো।” বন্যা সূক্ষ্ম নেত্রে তাকালো ততক্ষণে তানভির চা আনতে চলে গেছে। চা খেতে খেতে বন্যা বেশ কয়েকবার তানভিরের দিকে তাকিয়েছে। তানভির সেটা বুঝতে পেরে আগে থেকেই সাবধান হয়ে গেছে। চা খাওয়া শেষে চায়ের বিল দিয়ে কিছুটা সামনে গিয়ে বন্যাকে একটা রিক্সায় উঠিয়ে দিল। যাওয়ার আগে পকেট থেকে বন্যার ফোনটা বের করে দিতে দিতে আবারও বলল, “প্লিজ, বনুকে কিছু বলো না।” তানভির আবারও সোহাগদের কাছে গেল। খান বাড়িতে আজ মেঘ আর মীম হৈ-হুল্লোড়ে মেতেছে। গতকালই মেঘদের প্রথম বর্ষের ফাইনাল পরীক্ষা শেষ হয়েছে।

প্র্যাক্টিকেল এখনও বাকি। তবে প্র্যাক্টিকেল নিয়ে মেঘের তেমন কোনো টেনশন নেই। কারণ তামিম আর মিনহাজ দু'জনে মেঘ আর বন্যার প্র্যাক্টিকেলের সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিয়েছে। যদিও দায়িত্বটা আবিরের থেকে মাফ পাওয়ার জন্যই নিয়েছে। মেঘ, বন্যা সেসব কিছু জানে না। পরীক্ষা শেষ হওয়ার খুশিতে মেঘ আজ রাতের বেলা বাসার মানুষদের রান্না করে খাওয়াবে। রান্না ভালো হলে পরবর্তীতে অন্য একদিন ফুপ্পিদেরও দাওয়াত দিবে। বিকেলের দিকে মেঘ আবিরের নাম্বারে কল দিল। আবির কল রিসিভ করে মোলায়েম কণ্ঠে বলল, " বলুন।" মেঘ ভ্রু কুঁচকে বলল, "আপনি আমাকে সবসময় আপনি বলে সম্বোধন করেন কেনো?" "ভালো লাগে তাই। " মেঘ চাপা স্বরে বলল, " সেসব বাদ দেন। রাতে কি খাবেন বলুন?" মেঘের কথা শুনে আবির নিঃশব্দে হেসে রাকিবের দিকে তাকালো। রাকিব আস্তে করে বলল, "কি হয়েছে?" আবির ফোনটা একটু দূরে সরিয়ে বিড়বিড় করে বলল, " নিজেকে আজ বিবাহিত মনে হচ্ছে।" পুনরায় ফোন কানে ধরে বলল, " যা রান্না হবে তাই খাবো।" মেঘ কপট রাগ দেখিয়ে বলল, " আপনি যা বলবেন তাই করবো।" "আপনি রান্না করবেন?" "জ্বি স্যার।" আবির ভারী কণ্ঠে বলল, " রান্না করার কোনো প্রয়োজন নেই। আমি বাসায় আসার সময় সবার জন্য খাবার নিয়ে আসবো। আপনি সবাইকে দিয়ে দিয়েন।" মেঘ রাগী স্বরে বলল, "নাহ। আমি রান্না করবো।" আবির উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলল, " শরীরে যদি আবার তেল পড়ে?" মেঘ অদম্য কণ্ঠে বলে উঠল, " কিছু হবে না। আপনি শুধু

বলুন কি খাবেন?” “পোলাও। ” “আচ্ছা ঠিক আছে। সাবধানে আসবেন। আল্লাহ হাফেজ।” “আল্লাহ হাফেজ। ” কল কাটতেই রাকিব বলল, ” আমি একটা বিষয় সবসময় খেয়াল করি। তুই মেঘকে রান্না করতে দিতেই চাস না। সমস্যা কি তোর? তোর বউ কালো হয়ে যাবে এই ভয়ে রান্না ঘরে ঢুকতে দেস না?” আবির গুরুভার কণ্ঠে বলল, ” ও আমার মানে সম্পূর্ণ আমার। ফর্সা হলেও আমার, কালো হলেও আমার ই থাকবে। ও সবেতেই আমার। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে বাসার মানুষ। বিয়ের দেয়ার ভয়ে আমি আগে থেকেই ও কে রান্না করতে দিতাম না। অথচ চাচ্চু সেই বিয়ে দিতেই উঠেপড়ে লেগেছে। এখন একটু শান্ত আছে ঠিকই তবে যদি একবার রান্নাবান্না শিখে ফেলে তাহলে আর ওনাকে আটকানো যাবে না।” রাকিব ঠাট্টার স্বরে বলল, “ভালোই হবে, মেঘের বিয়েতে আবির দিওয়ানা। বাবুর বাবা হতে গিয়ে হয়ে যাবে মামা।” আবির অগ্নিদৃষ্টিতে তাকিয়ে রাগান্বিত কণ্ঠে বলল, ” নিজের মুখ টা বন্ধ রাখ শা*লা, নয়তো তোর মা*থা ফা*টিয়ে আমি চলে যাবো থা*না। ” রাকিব মৃদুস্বরে বলল, “আমি কি তোর শা*লা?” ” তুই শা*লা না হলেও তোর কর্মকাণ্ড শা*লার মতোই। ভুলেও যদি উল্টাপাল্টা কথা বলবি তাহলে তোর খবর আছে। ” রাকিব হাসতে হাসতে বলল, ” আমি ভাবছি মেঘের বিয়েতে.... ” আবির কপাল কুঁচকে রক্তাভ চোখে তাকাতেই রাকিব থতমত খেয়ে বলল, “তোর আর মেঘের বিযের কথায় বলছি আমি।” “কিছু বলতে হবে না। আমি বাসায় চলে যাচ্ছি, তুই সামলে নিস।” “আচ্ছা।”

আবির মাগরিবের নামাজের কিছুক্ষণ পর বাসায় আসছে। রান্নাঘরে মেঘ আর মীম রান্না করছে। বাড়ির তিন কর্তী সোফায় বসে চা খাচ্ছেন আর গল্প করছেন। আবির বাসায় ঢুকে এই দৃশ্য দেখে ভ্রু কুঁচকালো। কিছু বলতে গিলেও বলল না। নিজের রুমে গিয়ে ফ্রেশ হয়ে কিছুক্ষণ পর নিচে আসছে। আবিরকে দেখেই মালিহা খান বললেন, "কিরে আবির, কফি করে দিব?" "নাহ তোমরা গল্প করো। আমি করছি।" "তুই রান্নাঘরে যাবি?" আবির গম্ভীর কণ্ঠে বলল, "কেনো? রান্নাঘরে যাওয়া কি বারণ?" "আমাদের জন্য বারণ। মেঘ ফোন নিয়ে রান্না করতে গেছে। আমাদের আশেপাশে ভিড়তেও নিষেধ করেছে। দেখ তোকে অনুমতি দেয় কি না।" আবির রান্নাঘরের কাছে যেতেই মেঘ চেঁচিয়ে উঠলো, "আপনি রান্নাঘরে আসবেন না।" "কেনো?" "আপনার কি লাগবে বলুন। আজ রান্নাঘরের দায়িত্ব আমার। " আবির উষ্ণ স্বরে বলল, "আর তোকে দেখে রাখার দায়িত্ব আমার। " আবিরের কথা শুনে মেঘের থেকেও বেশি মীম লজ্জা পেয়েছে। দুজন প্রেমিক-প্রেমিকার মাঝে তৃতীয় পক্ষ হিসেবে থাকতে চাই না সে। তাই মাথা নিচু করে চুপচাপ বেড়িয়ে যাচ্ছে। আবির রাগী স্বরে বলল, "তুই কোথায় যাচ্ছিস?" মীম আস্তে করে বলল, "রেস্ট নিয়ে আসতেছি।" আবির গ্যাসে গরম পানি বসিয়ে মেঘের রান্না গুলো চেক করছে। পোলাও, ডিম ভুনা ছাড়াও আরও ২-৩ আইটেম অলরেডি করে ফেলেছে। রান্নাঘরের এক পাশে রান্নার ভিডিও চলছে। আবির সবগুলো একটু একটু করে টেস্ট করছে আদোও খাওয়ার

যোগ্য হয়েছে কি না বুঝার জন্য। মেঘকে রান্না করতে দিতে চাই না ঠিকই কিন্তু রান্না করার পর সেই রান্না কেউ মুখে তুলতে না পারলে এটাও আবিরের জন্য অপমানজনক বিষয়। সবগুলো চেক করে আবির টুকটাক বলে দিচ্ছে, পরিশেষে পোলাও মুখে দিয়ে আবির থ হয়ে গেছে। মেঘও আহাম্মকের মতো আবিরকে দেখছে। আবির কোনোরকমে গিলে ধীর কণ্ঠে শুধালো, "লবণ দেস নি?" "নাহ।" "কেনো? রেসিপিতে লবণ দেয় নি তারা?" "দিয়েছিল।" "তাহলে তুই দেস নি কেনো?" মেঘ উত্তর না দিয়ে উল্টো প্রশ্ন করলো, " ভাতে কেউ লবণ দেয়?" মেঘের কথা শুনে আবির বেকুব বনে গেল। এমন সময় আলী আহমদ খান আর মোজাম্মেল খান বাসায় আসছেন। আবির তাড়াতাড়ি কফি করে রান্নাঘর থেকে বেড়িয়ে এসে মালিহা খানকে ইশারায় রান্নাঘরে যেতে বললো। মালিহা খান গেলেও মেঘের জেদের কারণে তিনি বিশেষ কোনো সাহায্য করতে পারেন নি। ঘন্টাখানেক পর সবাই খাবার টেবিলে বসেছে। মেঘ আজ নিজের হাতে সবাইকে খেতে দিচ্ছে। মালিহা খান দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বলে দিচ্ছেন কোনটাতে লবণ কম হয়েছে, কোনটাতে বেশি হয়েছে। আবির আর তানভির মিটিমিটি হাসছে। মোজাম্মেল খানের নজরে পড়তেই ফোঁস করে উঠলেন, " এত হাসাহাসি করো না। তোমরা যাও, এতগুলো আইটেম রান্না করে নিয়ে আসো তারপর দেখি কেমন হয়।" তানভির ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল, "আমরা সেজন্য হাসছি না। আপনি যে এ অবস্থায় বনুকে বিয়ে দেয়ার কথা ভাবেন। তারজন্য হাসছি। "

মোজাম্মেল খান গুরুগম্ভীর কণ্ঠে বলে উঠলেন, “এমন বাড়িতেই মেয়ে বিয়ে দিব যেখানে আমার মেয়েকে রাঁধুনি নয় রাজরানী হয়ে থাকবে।” তানভির মাথা নিচু করে মনে মনে আওড়াল, “আর সেটা এই খান বাড়ি। এখানেই আমার বোন রাজরানী হয়ে থাকবে। অথচ আপনি বুঝতে পারছেন না।” রাত ১০ টার পরে মেঘ আবার রান্না করতে গেছে। এবার আর কোনো রেসিপি চেষ্টা করে নি। সবার জন্য নুডলস রান্না করে মীম, তানভির কে রুমে দিয়ে কিছুটা আবিরের জন্য নিয়ে গেছে আর বাকিটা বাসার সবার জন্য রেখে গেছে। মেঘ দরজায় দাঁড়িয়ে আস্তে করে বলল, “আসবো?” আবির ওয়ারড্রবে জামাকাপড় রাখছিল। ঘাড় ঘুরিয়ে মেঘের অন্ধকারাচ্ছন্ন চেহারা দেখে থমকে দাঁড়ালো। হতবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, “কি হয়েছে ?” মেঘ চিবুক নামিয়ে মৃদুস্বরে বলল, ” আমার রান্না ভালো হয় নি হয়তো পেট ভরে নি। তাই নুডলস নিয়ে আসছি।” আবির মৃদু হেসে বলল, ” বি*ষ নিহিত জেনেও প্রতিনিয়ত আমরা কত কি খাচ্ছি সেখানে আপনার লবণ কম, মসলা বেশি খাবার আর এমন কি” মেঘ কাঁদো কাঁদো মুখ করে বলল, “আমি কিছুই ঠিকমতো পারি না। ” আবির কোমল কণ্ঠে ডাকলো, “ম্যাম” মেঘ আস্তে করে বলল, “হুম।” “আপনাকে আগেও বলেছি আজ আবারও বলছি রান্নার বিষয় নিয়ে ভুলেও মন খারাপ করবেন না। পৃথিবীতে কেউ ই পারফেক্ট হয় না, মেনে নেয়া আর মানিয়ে নেয়ার মধ্য দিয়েই সারা জীবন কাটাতে হয়। ” মেঘ মুখ ফুলিয়ে আবিরের দিকে তাকিয়ে আছে। আবির আবারও বলল,

“আপনার জন্য দুটা শার্ট রেখেছিলাম, দেয়া হয় নি আর। পুরাতন শার্ট নিবেন নাকি নতুন কিনে দিব?” আবির ইস্ত্রি করা দুটা শার্ট বের করে মেঘের দিকে এগিয়ে দিল। একটা সাদা আরেকটা কফি কালার। মেঘ শার্ট দুটা দেখে সহসা আবিরের দিকে তাকালো। আবিরের পড়নেও শুভ্র রঙের একটা শার্ট। মেঘ মনে মনে সাহস অর্জন করে হঠাৎ বলে ফেলল, ” পুরাতন ই নিব কিন্তু আমি এই সাদা শার্ট নিব না। আপনার পড়নের টা নিব।” আবির স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বলল, “আচ্ছা, ঐ ২ টা আপাতত নিয়ে যান। কালকে এটা ধৌয়ে তারপর দিয়ে আসবো নে।” মেঘ শ্বাস ছেড়ে নিরেট কণ্ঠে বলল, “শার্ট আমি ধৌয়তে পারবো। দিলে এখনি দেন নয়তো লাগবে না। ” আবির সঙ্গে সঙ্গে শার্ট খুলে একটা টিশার্ট পড়ে সাদা শার্ট মেঘকে দিয়ে দিলো। মেঘ তিনটা শার্ট নিয়ে যেতে যেতে বলল, “নুডলস টা খেয়ে নিয়েন।” রুমে এসেই দরজা বন্ধ করে আবিরের পড়নের সাদা শার্টটা মেঘ জামার উপর দিয়েই পড়ে নিয়েছে। শার্ট লম্বায় হাঁটুর কিছুটা উপর পর্যন্ত পৌঁছেছে তবে সেসবে মেঘের মনোযোগ নেই। মেঘ চোখ বন্ধ করে আপন মনে আবিরের গায়ের গন্ধ উপলব্ধি করছে। কল্পনাতে আবিরকে নিয়ে শতাব্দী পেরিয়ে যাচ্ছে। অজানা অনুভূতি মেঘের মনকে আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে নিয়েছে। মেঘ পুরো ঘরে ছুটোছুটি করে ড্রেসিংটেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। লজ্জায় মেঘের নাক মুখ লাল হয়ে যাচ্ছে। বার বার হাত দিয়ে মুখ ডাকছে আবার আঙুল ফাঁকা করে নিজেকে দেখছে। অকস্মাৎ আবির ভাইয়ের মতো হাতা ফোল্ড করতে শুরু

করলো। আবিরের মতো সুন্দর না হলেও মেঘ সেভাবেই কোমড়ে হাত রেখে ফ্যাশন করছে, একটু পরপর শার্টের গন্ধ শুঁকছে। প্রায় ২০ মিনিট পর মেঘ বিছানায় শুয়ে দুচোখ বন্ধ করে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়লো।দেখতে দেখতে মাসখানেক কেটে গেছে। এরমধ্যে মেঘের প্র্যাক্টিকেল পরীক্ষাও শেষ হয়ে গেছে। অন্যদিকে আবিরের ব্যস্ততা দ্বিগুণ বেড়েছে, সকালে নাস্তা করে বাসা থেকে বের হয় ফিরতে ফিরতে প্রায় ১০/১১ টা বেজে যায়। মেঘ প্রায় প্রতি রাতেই বেলকনিতে দাঁড়িয়ে আবিরের জন্য অপেক্ষা করে। প্রিয় মানুষটার জন্য অপেক্ষা করতে কখনও ক্লান্ত হয় না মেয়েটা। আজ শুক্রবার। স্নিগ্ধ শীতল পরিবেশ।মেঘের ঘুম ভাঙে প্রায় ১০ টার দিকে। ফ্রেশ হয়ে আপন মনেই নিচে যাচ্ছিলো। আচমকা সিঁড়ির কাছে এসে থমকে দাঁড়ালো। তানভিরের রুমের ভেতর থেকে আসা পড়ার শব্দে মেঘ সহসা ভ্রু কুঁচকে তানভিরের রুমের দিকে তাকালো। এক সেকেন্ড দেরি না করে তানভিরের রুমের দরজা ঠেলে ভেতরে দেখলো। মেঘকে দেখে তানভির পড়া থামিয়ে শান্ত স্বরে জিজ্ঞেস করল, “কিছু বলবি?” মেঘ হা করে দুহাতে মুখ ঢেকে উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, “তুমি পড়তে বসছো?” তানভির নম্র স্বরে বলল, ” সামনে পরীক্ষা।” মেঘ বিস্ময় সমেত তানভিরকে দেখছে। বাসায় মেয়ে সংগঠিত ঘটনার পর থেকে বাবা ছেলের সম্পর্কে যেমন ফাটল ধরেছে তেমনই ফাটল ধরেছে পড়াশোনার সাথেও । রাজনীতিতে জড়ানোর পর পড়াশোনাটা কেবল সার্টিফিকেটের জন্য ই চালিয়ে গেছে। পরীক্ষা ব্যতীত কখনো

কলেজের গন্ডিও পার হয় না। এত বছর পর হঠাৎ তানভিরকে পড়তে বসতে দেখে মেঘের বিস্ময় যেন কমছেই না, এক ছুটে গেল হালিমা খানের কাছে। একে একে সবাইকে তানভিরের পড়ার কথা বলেছে,সেসব শুনে মীম আর আদিও তানভিরকে এক নজর দেখে গেছে। মেঘ রুমে এসেই দেখে বন্যা কল দিচ্ছে। বন্যার কল রিসিভ করেই মেঘ উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, " জানিস কি হয়েছে?" বন্যা আতঙ্কিত কণ্ঠে বলল, "কি হয়েছে?" "ভাইয়া পড়তে বসছে।" বন্যা ভ্রু কুঁচকে গম্ভীর কণ্ঠে বলল, "এমনভাবে বলছিস, আমি তো মনে করছিলাম কাউকে মা**র্ডা*র করে ফেলছেন। অবশ্য বলা যায় না,করতেও পারেন।" মেঘের হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় মুহুর্তেই বেদনার ছাপ স্পষ্ট প্রতীয়মান হচ্ছে। উজ্জ্বল ধৃষ্টতা অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। মুখ ফুলিয়ে শ্বাস ছেড়ে ভারী কণ্ঠে বলল, " সরি, আমি ভাইয়ার ব্যাপারে তোকে কিছু বলবো না ভেবেছিলাম তারপরও মুখ ফস্কে বেরিয়ে গেছে। কিছু মনে করিস না, প্লিজ। " বন্যা ভাব নিয়ে বলল, "অনেক রাগ দেখানো হয়েছে, থাক বেবি আর রাগ করতে হবে না। আর আমিও সরি, আসলে এভাবে তোর কলিজার টুকরা ভাইকে নিয়ে কথা বলা উচিত হয় নি। " মেঘ মৃদু হেসে বলল, " বাদ দে এসব কথা। এখন তুই বল, কেনো কল দিয়েছিলি?" " শুনলাম মিনহাজের পা ভেঙ্গে গেছে...।" বন্যা কথা শেষ করার আগেই মেঘ ফোঁস করে উঠে রাগী স্বরে বলল, "তুই কি বলতে চাচ্ছিস, আমার ভাই ওর পা ভেঙ্গে ফেলছে?" বন্যা রাশভারি কণ্ঠে বলল, " আমি এ কথা বলবো

কেন? বুঝলাম ভাইকে খুব ভালোবাসিস তাই বলে আমার কথা শেষ করার আগেই চিৎকার দিয়ে উঠবি?" "ঠিক আছে, বল।" "ফুটবল খেলতে গিয়ে কিভাবে যেন পা ভেঙ্গে গেছে। এখন হাসপাতালে ভর্তি আছে। মিষ্টিরা সবাই দেখতে যেতে চাচ্ছে। তুই তাদের নাম্বার ব্লক করে রাখছিস তাই আমাকে বার বার কল দিচ্ছে। তুই কি যাবি?" মেঘ ধীর কণ্ঠে বলল, "আজ শুক্রবার, আব্বু, বড় আব্বু সবাই বাসায়। দেখি যেতে দেন কি না। " "আচ্ছা আমাকে জানাইস।" "ঠিক আছে। " মেঘ নিচে আসতেই আব্বুর সাথে দেখা, মেঘ ভয়ে ভয়ে বলল, "আব্বু, আমার একটা ফ্রেন্ড পায়ে ব্যথা পেয়েছে। সবাই দেখতে যাবে। আমিও যাই?" মোজাম্মেল খান মেয়ের দিকে তাকিয়ে মলিন হেসে বললেন, "ঠিক আছে যাও। তানভিরকে নিয়ে যেতে বলো।" "ভাইয়া পড়তেছে।" মোজাম্মেল খান আশ্চর্যান্বিত নয়নে তাকিয়ে বললেন, " কি? তোমার ভাই পড়তে বসছে?" মেঘ নিঃশব্দে হেসে বলল, "হ্যাঁ। অনেকক্ষণ যাবৎ পড়তেছে।" " হঠাৎ পড়তে বসার কারণ কি?" "জানি না। ভাইয়াকে ডাকবো?" মোজাম্মেল খান ধীর কণ্ঠে বললেন, "না থাক। পড়তে যেহেতু বসেছে পড়ুক। তুমি বরং আবিরকে বলো নিয়ে যেতে।" আবিরের নাম শুনেই মেঘ আতঙ্কিত কণ্ঠে বলল, " নাহ। আমি একায় যেতে পারবো। " মেঘ মনে মনে ভাবছে, "আবির ভাই যদি জানতে পারে আমি মিনহাজকে দেখতে যেতে চাচ্ছি তাহলে তো তেলে বেগুনে জ্বলে উঠবে।" মোজাম্মেল খান হালকা ধমকের স্বরে বললেন, " একা যেতে হবে না আবিরকে নিয়ে

যাও। ” “আবির ভাই ঘুমাচ্ছেন।” “এত বেলা হয়ে গেছে এখনও ঘুমাচ্ছে। আবিরের ঘুম ভাঙিয়ে তোমাকে নিয়ে যেতে বলো । আর আবির রাজি না হলে আমিই নিয়ে যাবো।” মেঘ বিড়বিড় করতে করতে আবিরের রুমের সামনে এসে দাঁড়ালো। বুক ফুলিয়ে শ্বাস টেনে ফোঁস করে শ্বাস ছেড়ে ভেতরে ঢুকলো। আবিরের মায়াময় ঘুমন্ত চেহারায় কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে, আস্তে করে ডাকলো, “আবির ভাই..” আবির ঘুমের মধ্যেই জবাব দিল, “হুমমমম।” মেঘ খানিক থেমে, মৃদুস্বরে আবারও ডাকলো, “আবির ভাই..” আবির ঘুম ঘুম চোখে তাকিয়ে মেঘকে দেখেই মুচকি হাসলো। আবিরের সদ্য ভাঙা স্বপ্ন টা আবারও চোখের সামনে ভেসে উঠেছে। মেঘের মায়াবী আদলে তাকিয়ে মোলায়েম কণ্ঠে বলল, “জ্বি ম্যাম, বলুন।” মিনহাজের কথা শুনে কি না কি করে বসবে। সেসব ভেবেই ভয়ে মেঘের বুক কাঁপছে। তবুও সাহস নিয়ে বলল, “আব্বু বলছেন আমাকে নিয়ে একটু বাহিরে যেতে।” আবির শুয়া থেকে এক লাফে বসে উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, “চাচ্চু বলেছে?” “জ্বি। ” “কোথায়?” “মিনহাজ পায়ে ব্যথা পেয়েছে। দেখতে যাব।” আবির ভ্রু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলো, ” পায়ে ব্যথা কিভাবে পেয়েছে?” “ফুটবল খেলতে গিয়ে। আপনি যাবেন?” “যাব না কেন? চাচ্চু বলেছেন যেতে তো হবেই।” আবির রেডি হয়ে নিচে নামতেই মোজাম্মেল খানের সাথে দেখা। মোজাম্মেল খান শান্ত স্বরে বললেন, ” যাওয়ার সময় ফলমূল কিনে নিয়ে যেও ” “জ্বি আচ্ছা। ” “আর হ্যাঁ, নাস্তা করে বের হও। ” আবির বলতে নিলো, “পড়ে

খাবো।” কিন্তু বলতে পারলো না। মেঘ রেডি হয়ে নামতে নামতে আবির অল্প নাস্তা করে নিয়েছে। রাস্তা থেকে ফল আর কিছু খাবার নিয়ে মিনহাজকে দেখতে গেল। আবির কে দেখেই মিনহাজ শুয়া থেকে উঠতে নিলো। আবির তাকে থামিয়ে ধীর কণ্ঠে বলল, ” এত চাপ নিও না। শুয়ে থাকো।” বন্যা, মিষ্টিরাও পাশে দাঁড়ানো। আবির মিনহাজের সাথে স্বাভাবিক ভঙ্গিতে কথা বলছে। তামিমও তাতে সঙ্গ দিচ্ছে কন্তু মেঘের বিষয়টা একদম ভালো লাগছে না। মেঘ এখন পর্যন্ত আবিরকে যতটা চিনেছে, আবির মোটেই এরকম নয়। মিনহাজদের সাথে আবিরের কথোপকথন শুনে মনেই হচ্ছে না যে দুদিন আগে তাদের ভেতরে এত বিদ্বেষ ছিল। মেঘ বন্যার হাতে চিমটি কেটে বিড়বিড় করে বলল, ” আবির ভাইয়ের হঠাৎ মিনহাজদের প্রতি এত উদার কেন হলো বলতো? রাস্তায় এক ছেলে আমার হাত ধরেছিল বলে যা তা অবস্থা করছিল। আর এখন এত বড় ঘটনার পরও ওনি এত স্বাভাবিক কেনো?” বন্যা গম্ভীর কণ্ঠে বলল, ” আবির ভাইয়া কি আমার নাকি তোর? আমি কিভাবে জানবো?” আবির কিছুক্ষণ কথা বলে বেড়িয়ে গেছে। মেঘরা বেশকিছু সময় কথাবার্তা বললো। এরমধ্যে মিনহাজের বাড়ি থেকে মানুষ আসছে, এ অবস্থায় হোস্টেলে থাকতে কষ্ট হয়ে যাবে তাই কিছুদিনের জন্য ও কে বাড়িতে নিয়ে যাবে। মিনহাজকে বিদায় দিয়ে মেঘ, বন্যারা বিভিন্ন বিষয়ে কতক্ষণ আলোচনা করলো। আবিরকে কল দেয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই আবির চলে আসছে। মেঘ স্বাভাবিক কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, “কোথায়

গিয়েছিলেন?” “একটু কাজ ছিল।” “একটা কথা বলবো?” “হুমমম।” “আপনার এত পরিবর্তনের কারণ কি?” আবির ভ্রু গুটিয়ে ধীর কণ্ঠে শুধালো, “কিসের পরিবর্তন? ” “আপনি তো আগে এমন ছিলেন না। তাহলে এখন এমন হয়ে যাচ্ছেন কেনো?” আবির মলিন হেসে বলল, ” আপনার ভালোর জন্য। ” “আমার ভালো মানে?” আবির বাইক স্টার্ট দিতে দিতে বলল, ” সময় হলে বুঝবেন।” মেঘ শঙ্কায় আর কিছুই বলতে পারলো না। চুপচাপ দুজনেই বাসায় ফিরেছে। তিনদিন কেটে গেছে। তানভির গতকালই বন্ধুদের সাথে ট্যুরে গেছে ফিরতে আরও এক-দুদিন লাগবে। আজ মীমের স্কুলে পোগ্রাম তাই সকাল থেকে মেঘের কাছে বায়না ধরেছে, পোগ্রামে মেঘের ফোনটা নেয়ার জন্য। মেঘও তেমন আপত্তি করে নি, মীমকে ফোন দিয়ে দিয়েছে। বিকেল দিকে মেঘ ঘুমিয়ে ছিল, হঠাৎ হালিমা খান আর আকলিমা খান এসে ডাকতে শুরু করেছেন। মেঘ ঘুমের মধ্যেই কোনোরকমে বলল, “ডাকছো কোনো আম্মু?” “তোকে দেখতে মানুষ আসছে। তাড়াতাড়ি উঠ।” সেকেন্ডের মধ্যেই মেঘের ঘুম উধাও। তড়িৎ বেগে উঠে বসে চেঁচিয়ে উঠল, “কি?” আকলিমা খান চাপা স্বরে বললেন, “আস্তে কথা বল, নিচে লোকজন বসে আছেন।” মেঘ অবিশ্বাস্য চোখে তাকিয়ে আবারও চেঁচালো, ” আমি কোথাও যাব না।” মেঘ আশেপাশে ফোন খোঁজতে নিলো হঠাৎ মনে পড়েছে মীমের ফোন নিয়ে যাওয়ার কথা। হুট করে ঘটা ঘটনাগুলো মেঘের মস্তিষ্ক অকেজো করে তুলেছে কি করবে তার দিশাবিশা পাচ্ছে না। আজ বাসায়

তানভির, মীম কেউ নেই। কে বাঁচাবে মেঘকে? কিভাবে যাবে পাত্রপক্ষের সামনে? আবির ব্যতীত কাউকেই পাত্র হিসেবে দেখতেই চাই না মেঘ। যেভাবেই হোক আবির ভাইকে জানাতে হবে। মেঘ হুট করে বিছানা থেকে নেমেই দরজার দিকে ছুটলো, আম্মু বা কাকিয়া কারোর নাম্বার থেকে কল দিয়ে হলেও আবিরকে জানাতে হবে। দরজা পর্যন্ত যেতেই মোজাম্মেল খানকে দাঁড়ানো দেখে আতঙ্কে মেঘের পা যুগল থেমে গেছে। হালিমা খান আর আকলিমা খান দুজনেই হতবাক হয়ে চেয়ে আছেন। মোজাম্মেল খান গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, " চুপচাপ রেডি হয়ে নিচে আসো। ওনারা তোমার জন্য সারাদিন বসে থাকবেন না। " মোজাম্মেল খান আবারও নিচে চলে গেছেন। মেঘকে দেখতে ছেলে, ছেলের বাবা আর ছেলের মা আসছে। ছেলে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক দেখতে শুনতে খুব ই ভালো। মোজাম্মেল খানের পরিচিত একজন এই সম্বন্ধের কথা বলেছেন। বাবা মায়ের একমাত্র ছেলে, উত্তরাতে নিজস্ব বাসা আছে, এলাকায় বেশ নামডাকও আছে। ওনাদের একটাই ইচ্ছে মেয়েকে হতে হবে সুন্দরী যাতে ছেলের সঙ্গে মানায়। বাড়িতে কোনো কাজ করতে হবে না,যখন যা ইচ্ছে করতে পারবে। এসব শুনেই মোজাম্মেল খান মোটামুটি রাজি হয়ে গেছেন। মোজাম্মেল খান একায় ছেলের বাড়িতে গিয়ে ছেলে দেখে আবার তাদের নিজের সাথে করে বাসায়ও নিয়ে আসছেন। মোজাম্মেল খান ছেলের বাসায় থাকতেই আলী আহমদ খানকে কল দিয়ে বাসায় আসতে বলছেন। মালিহা খান আর বাড়ির হেল্পিং হ্যান্ডরা

মিলে তাদের জন্য নাস্তা রেডি করছেন। উপরে হালিমা খান আর আকলিমা খান মেঘকে শাড়ি পড়ার জন্য জোরাজোরি করছেন। মেঘ শাড়ি ছুঁড়ে ফেলে চিৎকার করে বলছে, " তোমরা আমার সাথে এমন কেনো করছো? তোমরা কি চাও আমি ম*রে যায়?" হালিমা খান মেঘের মুখ চেপে ধরে আর্তনাদ করে বললেন, " আজেবাজে কথা একদম বলবি না। ছেলে দেখা বিষয়ে আমি কিছুই জানি না। তোর আব্বু হুট করে তাদের নিয়ে বাসায় হাজির হয়েছেন। এখন তুই রেডি না হলে বাড়িতে তুলকালাম কান্ড শুরু হয়ে যাবে। মা রে আমার কথা মান একটু।" মেঘ কাঁদতে কাঁদতে বলল, " আমি বিয়ে করবো না আম্মু।" আকলিমা খান মেঘের চোখ মুছে শীতল কণ্ঠে বললেন, "ছেলে পছন্দ না হলে তোকে বিয়ে করতে হবে না। তুই শুধু রেডি হয়ে নিচে যাবি আর আসবি। ঠিক আছে? " মেঘ আবারও বলল, " আব্বুর দেখানো কোনো ছেলেকেই আমার পছন্দ হবে না। আমি বিয়ে করবো না। " মোজাম্মেল খান নিচ থেকেই উচ্চস্বরে ডাকলেন, "কি হলো? তোমাদের আর কতক্ষণ লাগবে?" হালিমা খান আর আকলিমা খান দুজনে মেঘের চোখ মুখ মুছে মেঘকে সাজাতে শুরু করেছেন। মেঘের দু চোখ বেয়ে অনর্গল পানি পরছে, বাকরুদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে মেঘ। আবির ই মেঘের জীবনের একমাত্র স্বপ্ন পুরুষ, আবির ব্যতীত এই দেড় বছরে কাউকে নিয়ে এক সেকেন্ডের জন্যও ভাবে নি। অথচ আজ সবকিছু তছনছ হয়ে যাচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই মেঘকে এক কঠিন পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে হবে। ভেতরে ভেতরে মেয়েটা চিৎকার

করে বলছে, " আমি আবির ভাইকে ছাড়া কাউকে বিয়ে করবো না।" অথচ মুখ ফুটে কিছুই বলতে পারছে না। কান্না গলায় আঁটকে মেঘের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। কাশতে কাশতে চোখ লাল হয়ে গেছে তবুও কান্না থামছেই না। ২০-২৫ মিনিট পর মোজাম্মেল খান আবারও উপরে আসছেন। ততক্ষণে মেহমানদের নাস্তা খাওয়া শেষ। আলী আহমদ খান বাসায় ফিরে কেবলই ফ্রেশ হতে গেছেন। মালিহা খানও নিজের রুমেই বসা। মেঘকে অনেক জোরাজোরি করেও শাড়ি পড়াতে পারে নি তাই সবুজ রঙের একটা থ্রিপিস পড়িয়ে আকলিমা খান মোটামুটি সাজিয়ে দিয়েছেন। চোখে কাজল আর ঠোঁটে লিপস্টিক দিলেই মেয়েটাকে অসম্ভব সুন্দর লাগে। আকলিমা খানও সেটায় করেছেন। মোজাম্মেল খান খান দরজা থেকে মেঘকে দেখেই কপাল গুটালো। ভেতরে এসে গম্ভীর কণ্ঠে বলল, " কি শুরু করেছো তুমি? আর কতক্ষণ ওনাদের বসিয়ে রাখবো?" মেঘ মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে। মোজাম্মেল খান ভারী কণ্ঠে বললেন, " আমাকে ভাইজান বলেছিলো পাত্রপক্ষ বাসায় এনে তারপর কথা বলতে। আমি তাই করেছি। এখন দেখি কে আটকায়।" মেঘ মনে মনে আওড়াল, " আমার আবির ভাই আসলে এক মুহুর্তেই সবকিছু ছারখার করে দিবে তারপর বুঝবা কে আটকায়। " অকস্মাৎ নিচ থেকে আবিরের চিৎকারের শব্দ ভেসে আসছে। আবিরের কণ্ঠ কানে বাজতেই মেঘ সহসা বিপুল চোখে তাকালো। সর্বাঙ্গে হিমশীতল হাওয়া বয়ে যাচ্ছে, দুচোখ চিকচিক করছে।আবিরের কণ্ঠে একের পর এক হুঙ্কার

আসছে। মোজাম্মেল খান দ্রুত রুম থেকে বেড়িয়ে গেলেন। ওনার পেছন পেছন হালিমা খান ও আকলিমা খানও ছুটলেন। মেঘের দুচোখ বেয়ে তখনও পানি পড়ছে কিন্তু ঠোঁট জুড়ে প্রশান্তির হাসি ফুটেছে। মেঘ দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বলল, " আপনি আমার অভয়, আপনিই আমার প্রণয়। তাইতো দণ্ডে দণ্ডে আপনার অনুষঙ্গে ডুবে যেতে চাই।" মোজাম্মেল খান রুম থেকে বের হয়ে বেলকনি থেকে নিচে তাকাতেই চোখে পরলো আবির একটা ফুলদানি ফ্লোরে ছুঁড়ে চিৎকার করে বলছে, " আর কোনোদিন যদি এই বাসার চৌকাঠ পার করার চেষ্টা করেন তাহলে জীবন নিয়ে ফিরতে পারবেন না।" পাত্রপক্ষ ভয়ে একপ্রকার জীবন বাঁচাতে পালিয়েছে। মোজাম্মেল খান সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে চিৎকার করে বললেন, " সমস্যাটা কি তোমার?" "আমার কোনো সমস্যা নেই।" "তুমি বিয়ে করবে না বলে কি এই বাড়ির কারো বিয়ে হবে না?" আবির উচ্চ স্বরে চেঁচিয়ে উঠল, "নাহ, হবে না। আগামী ছয় মাস এই বাড়িতে কোনো বিয়ে হবে না। " " তোমার কথায় শেষ কথা?" আবির রাগান্বিত কণ্ঠে পুনরায় বলল, "হ্যাঁ, এই ব্যাপারে আমার সিদ্ধান্তই শেষ সিদ্ধান্ত। " মোজাম্মেল খান রাগে ফোঁস ফোঁস করছেন। অতিরিক্ত রাগে আবিরের চোখ মুখ লাল টকটকে হয়ে গেছে। মালিহা খান, আকলিমা খান আর হালিমা খান তিনজনেই আবিরকে থামানোর চেষ্টা করছেন। আজ আবির কে থামানো সম্ভব না। মোজাম্মেল খানও রাগের চোটে যা তা বলছে, আবিরও প্রতিত্তোরে নিজের ক্ষোভ প্রকাশ করেই চলেছে। আবির রাগে

সবার পাশ কাটিয়ে উপরে যেতে যেতে বিড়বিড় করে বলল, " এরপর পাত্রী দেখার নাম করে কেউ এই বাসায় আসলে চৌকাঠ পার হওয়ার আগেই দু'পা ভেঙে দিব।" অতিরিক্ত রাগে আবিরের শরীর ঘেমে একাকার অবস্থা। শার্টের বোতাম খুলতে খুলতে একটু এগুতেই মেঘের সঙ্গে দেখা। ডাগর ডাগর দু চোখে গাঢ় কাজল আর ঠোঁট ভর্তি লিপস্টিক দেখে আবিরের মেজাজ তুঙ্গে। মেঘ ছলছল নয়নে তাকিয়ে আছে। এমন সময় আলী আহমদ খান নিজের রুম থেকে বের হয়েছেন। মোজাম্মেল খান তখনও নিজের মতো বকবক করেই যাচ্ছেন। আবির দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে দু হাতের বৃদ্ধাঙ্গুল দিয়ে মেঘের দু চোখের কাজল লেপ্টে দিয়েছে, সাথে সাথে ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলে মেঘের ঠোঁটে ঘষা দিয়ে লাল টকটকে লিপস্টিক গাল পর্যন্ত ছড়িয়ে দিয়েছে। মেঘ আহাম্মকের মতো তাকিয়ে আছে। আবির গম্ভীর কণ্ঠে বলল, " নিচে তোর শ্বশুর অপেক্ষা করছে যা নিজের রূপটা দেখিয়ে আয়।" আবির ফোঁস ফোঁস করে নিজের রুমে চলে গেছে। মেঘ ঘাড় ঘুরিয়ে কতক্ষণ আবিরের দিকে তাকিয়ে রইলো। নিচ থেকে আলী আহমদ খানের ধমকের শব্দে মেঘ লাফ দিয়ে উঠে। সঙ্গে সঙ্গে নিজের রুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। ড্রেসিং টেবিলে নজর পড়তেই মেঘ গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে গেল। লেপ্টে যাওয়া কাজল আর গাল পর্যন্ত ছড়ানো লিপস্টিক দেখে মেঘ মুচকি হেসে বলল, " আবির ভাই, আপনি বড্ড হিংসুটে। তবে এই হিংসুটে মানুষটাকেই আমি ভালোবাসি।" নিচ থেকে চিৎকার চেঁচামেচির শব্দ আসছে। মেঘ ভয়ে

গুটিসুটি মেরে বিছানার এক কর্ণারে বসে আছে। দু একবার উঠে দরজা পর্যন্ত গিয়েও ফিরে এসেছে। আবিরের প্রতি মেঘের অগাধ বিশ্বাস,নআবির একায় সবকিছু সামলে নিতে পারবে। কিন্তু আজ আর তা হলো না। দুই ভাই এর পীড়নে আবির আঁটকে গেল। আলী আহমদ খান হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, " তোমাদের জন্য কি এলাকায় মানসম্মান নিয়ে বাঁচতে পারবো না?" আবির শার্টের বোতাম লাগাতে লাগাতে ভাবলেশহীন জবাব দিল, " মান সম্মান যাওয়ার মতো কাজ না করলেই হয়।" আলী আহমদ খান আবারও চেঁচালেন, " আমরা কি করবো কি করবো না তা কি তোমাদেরকে বলে করতে হবে?" আবির নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে আছে। মোজাম্মেল খান দু হাতে মাথা চেপে ধরে বসে আছেন। আলী আহমদ খান আবারও বলতে শুরু করলেন, " শুধু হাতে পায়ে বড় ই হয়েছো কিন্তু মানুষের সাথে কেমন আচরণ করতে হয় তা শিখো নি। এই মানুষগুলো যখন বাহিরে আমার উপর আঙুল তুলবে তখন কি জবাব দিব আমি? আমার ছেলে হয়ে তোমার এই আচরণ কিভাবে হতে পারে? তোমরা প্রতিনিয়ত প্রমাণ করছো, তোমরা কারো ভরসার যোগ্য নও। তোমাদের উপর ভরসা করলে একদিনে ই আমার সাম্রাজ্য ধ্বংস করে ফেলবে।" আবির দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে ধীর কণ্ঠে বলল, " আব্বু, প্লিজ মাথা ঠান্ডা করুন। আপনি অসুস্থ.. " "আমার অসুস্থতা নিয়ে তোমার ভাবতে হবে না। তোমার আচরণ ই সবকিছু বুঝিয়ে দিয়েছে।" আবির ভেতরের ক্রোধ কোনোভাবেই আটকাতে পারছে না। রাগী স্বরে বলল, " ঠিক আছে।

আমিই যেহেতু আপনার সাম্রাজ্যের একমাত্র সমস্যা, সেই সাম্রাজ্য আর কলঙ্কিত না করি। ” আবির দীর্ঘ কদম ফেলে বাসা থেকে বেড়িয়ে যাচ্ছে। আলী আহমদ খান পেছন থেকে আবারও হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, ” এটা ভদ্রলোকের বাড়ি। এই বাড়িতে কোনো গু*ন্ডা বদ-মা* শের জায়গা নেই।” আবির কথাটা শুনেও ফিরে তাকায় নি। বাড়ির তিন কর্তী এক কোণায় চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন। আলী আহমদ খান আর মোজাম্মেল খানের রাগে তারা বরাবরই চুপ থাকে। আবির বেড়িয়ে গেলেও দুই ভাই এখনও থামতে পারছে না। বুকের ভেতরের ক্রোধ থেমে থাকার নয়। কোনো ব্যক্তি আলী আহমদ খানের যতই প্রিয় হোক না কেনো খান বাড়ির মান সম্মানে আঘাত করলে আলী আহমদ খান তাকে কখনোই ছেড়ে দেন না। হোক সেটা আবির কিংবা ২৮ বছর পূর্বে আবিরের ফুপ্পি। প্রিয় এর চেয়েও প্রিয় মানুষকেও ক্ষণিকের ব্যবধানে অপ্রিয় করে তুলতে সক্ষম। ঘন্টা খানেকের মধ্যে খান বাড়ির পরিবেশ নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। যে যার রুমে চলে গেছেন। আলী আহমদ খান প্রেশারের ঔষধ খেয়ে শুয়ে পরেছেন। মালিহা খান ওনার পাশে বসে আস্তে করে বললেন, “ছেলে টাকে এভাবে কথা বলা আপনার ঠিক হয় নি। আপনি ভাববেন না যে, আমি আপনাকে জ্ঞান দিচ্ছি। আবির, তানভির দু’জনেই মেঘকে অনেক বেশি আদর করে। তাই মেঘের বিয়ের ব্যাপারটা ওরা কিছুতেই মানতে পারছে না। এদিকে মেঘের আব্বু একের পর এক ছেলে দেখেই যাচ্ছে।ওদের কি দোষ?” আলী আহমদ খান গম্ভীর কণ্ঠে

বললেন, “ছেলেকে কল দিয়ে বাসায় আসতে বলো।” মালিহা খান সঙ্গে সঙ্গে নিজের ফোন থেকে আবিরের নাম্বারে কল দিলো। কিন্তু আবিরের ফোন বন্ধ। টানা দু-তিনবার কল দেয়ার পরও বন্ধ পেয়ে মালিহা খান ভয়ে সিটিয়ে পরেছেন। ততক্ষণে আলী আহমদ খান ঘুমিয়ে পরেছেন। মালিহা খান রুম থেকে বেড়িয়ে দ্রুত হালিমা খানকে ডাকলেন। মোজাম্মেল খান রুমেই বসা। ভাবির আতঙ্কিত কণ্ঠ শুনে জিজ্ঞেস করলেন, “কি হয়েছে ভাবি? ভাইজানের কিছু হয়েছে?” “নাহ। আবিরের ফোন বন্ধ, কল দিয়ে পাচ্ছি না।” মোজাম্মেল খান নিজের ফোন থেকেও একবার চেষ্টা করলেন। বন্ধ পেয়ে স্বাভাবিক কণ্ঠে বললেন, ” রাগ করে বেড়িয়েছে তাই হয়তো ফোন বন্ধ। খুলে ফেলবে কিছুক্ষণের মধ্যে। আপনি রেস্ট নিন।” হালিমা খানও বেশকিছুক্ষণ বুঝিয়েছেন কিন্তু মালিহা খানের আতঙ্ক কমছেই না। তানভিরকে কল দিয়েছে বলেছে। তানভির ওখানে থেকেই পরিচিত সবার সাথে যোগাযোগ করেছে কিন্তু আবিরের সাথে কারো কথা হয় নি। রাকিবকে কল দেয়ায় রাকিব বলল, ” আবির যাওয়ার সময় আমাকে বলেছে, প্রয়োজনে আজই আব্বু-চাচ্চুকে সব বলে দিব। তবুও এত প্যারা নিতে পারবো না।” তানভির বাসার ঘটনা যা জানে সবটায় রাকিবকে জানিয়েছে। সব জায়গায় খোঁজখবর নিতে বলেছে। এত ঘটনার মাঝে মেঘের কোনো হদিস নেই। ইকবাল খান সন্ধ্যার দিকে অফিস থেকে ফেরার পথে মীমকে পোগ্রাম থেকে নিয়ে আসছে। বাসায় এসে এসব ঘটনা শুনে ইকবাল খান স্তব্ধ হয়ে গেছেন। মীম

সঙ্গে সঙ্গে ছুটলো মেঘের রুমের দিকে। মেঘের রুমের দরজা বন্ধ, অনেকক্ষণ ডাকার পর মেঘ ঘুম থেকে উঠে দরজা খুলে দিয়েছে। মেঘের চোখ আর ঠোঁট এখনও আগের মতোই আছে। মীম ভ্রু কুঁচকে বলল, "তোমার এই অবস্থা কেনো?" মেঘ আয়নায় নিজের মুখটা দেখে মুচকি হেসে বলল, " এমনি। " মীম মেঘের ফোন মেঘকে দিয়ে আতঙ্কিত কণ্ঠে বলল, " তুমি হাসছো? ভাইয়া যে রাগ করে বাসা থেকে বেড়িয়ে গেছে তা কি তুমি জানো? এমনকি ভাইয়ার ফোনও নাকি বন্ধ। " মেঘ আঁতকে উঠে বলল, "কি? " মেঘ তাড়াতাড়ি আবিরের নাম্বারে ডায়াল করলো, সত্যি সত্যি নাম্বার বন্ধ। ইন্টারনেটে সব জায়গা থেকে মেসেজ দিয়েছে কিন্তু আবির কোথাও নেই। মেঘের চোখ মুখ মুহুর্তেই অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে গেছে।বুকের ভেতর আতঙ্ক বাসা বেঁধেছে। মেঘের এখন নিজের উপর খুব রাগ হচ্ছে, না ঘুমিয়ে তখন রুম থেকে বের হলেই পরিস্থিতি বুঝতে পারতো। অন্তত আব্বু আর বড় আব্বুর সামনে কিছু একটা বলতে পারতো। মীম শীতল কণ্ঠে বলল, " আজ তোমার ফোনটা নেয়া একেবারেই উচিত হয় নি। সরি আপু।" মেঘ মৃদু হেসে বলল, " তোর কোনো দোষ নাই। সব দোষ আমার কপালের। তুই রুমে যা। " মেঘ অনবরত আবিরের নাম্বারে কল দিয়েই যাচ্ছে। ফুপ্পি, জান্নাত আপু, আসিফ ভাইয়া সবার সাথে কথা বলেছে কিন্তু কেউ কিছু জানে না। মেঘ নিচে নামতে পারছে না কারণ আজকের এই ঘটনার জন্য মেঘ নিজেকেই দায়ী করছে। মেঘ উপায় না পেয়ে বন্যাকে কল দিল। বন্যা কল রিসিভ করতেই মেঘ

একে একে সব বর্ণনা করেছে। বন্যা শান্ত স্বরে বলল, “আচ্ছা রাত পর্যন্ত অপেক্ষা কর। দেখ ওনি আসেন কি না। ” ফোন বন্ধ জেনেও মেঘ একের পর এক কল দিয়েই যাচ্ছে। রাত ৯ টার দিকে তানভির মেঘকে কল দিল। মেঘ কান্না ভেজা কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, “ভাইয়া, আবির ভাই কোথায়?” তানভির মোলায়েম কণ্ঠে বলল, “আমি খোঁজ নিচ্ছি, যোগাযোগ হলে জানাবো। তাছাড়া আগামীকাল আমি বাসায় ফিরবো। তুই মন খারাপ করে থাকিস না। ” মেঘ কাঁদতে কাঁদতে বলল, ” আমার জন্যই তোমাদের এত ঝামেলা আমি যেদিকে দুচোখ যায় সেদিকে চলে যাব। ” তানভির ঠান্ডা কণ্ঠে বলল, ” পাগলামি করিস না বনু। একটু বুঝার চেষ্টা কর। ” মেঘ কল কেটে দিয়েছে। রাতে কারো খাওয়াদাওয়া নেই। যে যার মতো আবিরকে কল দিচ্ছে, পরিচিত সবার সাথে বার বার যোগাযোগ করেছে কিন্তু কেউ কিছুই জানে না। বন্যা রাতে আবারও কল দিয়ে খোঁজ নিয়েছে। দু’দিন কেটে গেছে, আবির এখনও বাসায় ফিরে নি। দুদিন ধরে কোনো অফিসেও যাচ্ছে না। আলী আহমদ খান, মোজাম্মেল খান, ইকবাল খান নিজেদের মতো খোঁজখবর নিয়েই যাচ্ছেন কিন্তু আশানুরূপ ফলাফল পাচ্ছেন না। আজ বিকেলে বন্যা মেঘদের বাসায় আসছে। মেঘকে রুমে না পেয়ে সরাসরি ছাদে গেল। মেঘ চোখ বন্ধ করে সোফায় হেলান দিয়ে বসে ছিল। বন্যা মৃদু স্বরে ডাকলো, “মেঘ। ” মেঘ বন্যাকে দেখেই বসা থেকে উঠে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলল, “আমার জীবনে এত কষ্ট কেন?” বন্যা মেঘের মাথায় হাত বুলিয়ে

শান্ত স্বরে বলল, “কষ্ট সবার জীবনেই থাকে কেউ মনের মধ্যে চেপে রাখতে পারে আবার কেউ পারে না। মন খারাপ করিস না। দোয়া করি আবির ভাইয়া যেন তাড়াতাড়ি ফিরে আসেন।” মেঘকে বেশকিছু ক্ষণ বুঝানোর পর মেঘ শান্ত হয়েছে। দুই বান্ধবী পাশাপাশি বসা। বন্যা হঠাৎ ধীর কণ্ঠে বলল, ” একদিক থেকে তুই খুব ভাগ্যবতী।” “কোন দিকে?” “এইযে আবির ভাইয়ার প্রেয়সী হিসেবে। দুনিয়া উল্টে যাক আর যা ই হয়ে যাক তোর বিপদে ওনি ঠিকই তোকে বাঁচিয়ে নেন। এমন মানুষ পাওয়া ভাগ্যের বিষয়।” “সেই ভাগ্য টাকে তো কোনোভাবেই ধরে রাখতে পারছি না আর নিজেকে শক্তও রাখতে পারছি না। তুই কিভাবে এত শক্ত থাকিস ? ” বন্যা মলিন হেসে বলল, “শক্ত থাকি না তবে শক্ত থাকার চেষ্টা করি। ” “কিভাবে?” “তুই একদিন বলেছিলি, মানুষ নিরন্তর সুখের নীড় খুঁজে, কষ্ট আড়াল করে প্রতিনিয়ত স্বভাবসিদ্ধ হাসে। সত্যি বলতে এটায় বাস্তবতা। জীবনে চলার পথে প্রতিটা মানুষ ই মানসিক শান্তি খোঁজে যেখানে সে সর্বোচ্চ ভালো থাকতে পারবে কিন্তু সেই সুখের স্থান সবার ভাগ্যে জুটে না। তখন বাধ্য হয়ে ভালো থাকার অভিনয় করতে হয়।” মেঘ ভ্রু কুঁচকে প্রশ্ন করলো, “তোর আবার কি হয়েছে যে তোকে অভিনয় করতে হয়?” বন্যা মলিন হেসে বলল, ” তেমন কিছু না। বাদ দে। ” মেঘ ভারী কণ্ঠে বলল, “আমি বাদ দিব না। তোকে আজ বলতেই হবে। আমি প্রায় ই খেয়াল করি তুই মাঝে মাঝে মন মরা হয়ে থাকিস। জিজ্ঞেস করলে ইগ্নোর করিস। আজকে তোকে বলতেই

হবে।” ” জানি কথাগুলো শুনলে তোর কষ্ট লাগছে, কারণ আমি তোর বেস্ট ফ্রেন্ড হয়েও তোর কাছে এত বড় সত্যিটা লুকিয়েছি। ” মেঘ ভ্রু কুঁচকে আতঙ্কিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলো, “কি হয়েছে তোর?” বন্যা ঢোক গিলে উষ্ণ স্বরে বলতে শুরু করলো, ” আমাদের এসএসসি পরীক্ষার পর অনেকদিন তোর সাথে আমার যোগাযোগ ছিল না তখন হাতে ফোন ও ছিল না। ঐ সময় মামা বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলাম। ওখানে এক মামাতো ভাইয়ের সাথে মোটামুটি ভালো মিল হয়েছিল। ভাইয়া তখন রাবিতে পড়তো, ছুটিতে বাড়ি আসছিলো।আর যেহেতু ভাইয়াদের বাসাতেই আমরা বেড়াতে গিয়েছিলাম সেই সুবাদে দুষ্টামি, ফাজলামো করতাম। একদিন আম্মু, মামা, মামি কথা বলছিল, কথার মাঝখানে আমাদের দু’জনের কথা উঠে আর মোটামুটি বিয়ের আলোচনা শুরু হয়ে যায় । তখন আমি আর ভাইয়া দুজনেই রুমে উপস্থিত। আমি ফাজলামো করলেও সেটা ভাই হিসেবে করতাম কিন্তু আম্মুদের আলোচনায় তা সম্পূর্ণ বদলে গেছে। ভাইয়ার সাথে আমার ঐরকম কিছু নেই এটা আম্মুকে বলার পর আম্মু বলছে, এই বিয়ের আলোচনা আরও একবছর আগেই হয়েছিল যেটা এতদিনে প্রকাশ পেয়েছে। মূলকথা তারা দেখতে চেয়েছিল আমার আর ভাইয়ার বন্ডিং টা কেমন হয়। এসব জানার পর আমি আরও বেশি হতাশ হয়ে গেছিলাম বাধ্য হয়ে সুযোগে ভাইয়াকে সবকিছু খুলে বলি। ভাইয়া সাহায্য করার বদলে আমায় প্রপোজ করে বসেন। তখন রাগ করে মামা বাড়ি থেকে চলে আসি। এরপর থেকে ভাইয়া মাঝে মাঝে আম্মুর নাম্বারে কল

দিতো, যেহেতু প্রাথমিকভাবে বিয়ের আলোচনা হয়েই ছিল তাই আম্মুও আমাকে ফোন দিতেন, আমি না চাইতেও ওনার সাথে কথা বলতাম। ধীরে ধীরে আমিও মানসিকভাবে সেই মানুষটার সাথে জড়াতে শুরু করি। আমার যেহেতু আলাদা ফোন ছিল না ঐ ভাবে কথাও হতো না। একদিন আপুর ফোন থেকে ফেসবুকে ওনার আইডি চেক করি যা দেখে আমি রীতিমতো টাশকি খেয়েছিলাম। ওনার আইডিতে একের পর মেয়ের ছবি। ওনার বন্ধু তালিকায় ছেলে নেই বললেই চলে। তারমধ্যে একজনের সাথে বেশ কিছু ছবিও পোস্ট করা যার সবগুলোতেই রোমান্টিক ক্যাপশন দেয়া। আমি সেসব সহ্য করতে না পেরে ওনাকে কল দিয়ে রাগারাগি করি। এক পর্যায়ে ওনি স্বীকার করেন যে সেই মেয়ে তার গার্লফ্রেন্ড শুধুমাত্র পরিবারের মানুষের সামনে ভালো সাজার জন্য এমন কাজটা করেছে। তাছাড়া ওনি আমার চেয়ে ভালো কাউকে ডিজার্ভ করেন। আরও কত কি!” বন্যা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে আবারও বলল, “সেদিনের পর একটা কথায় মাথায় ঢুকেছে জীবনে বহুরূপী মানুষের চেয়ে একজন অতি সাধারণ মানুষও ঢের ভালো। মানুষটা নিষ্ঠুর কিংবা পাষাণ হোক তবুও একান্ত আমার হোক।”মেঘ বন্যার গুরুগম্ভীর চেহারায় খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে হঠাৎ মুখভার করে বলে উঠল, ” এত বড় ঘটনা টা আমাকে না জানিয়ে তুই কিভাবে ছিলি ?” বন্যা ইতস্ততভাবে জবাব দিল, “অপ্রত্যাশিত ঘটনায় আমি নিজেই হতভম্ব হয়ে গেছিলাম তখন অনীস্পিত ব্যাপারটা ভুলে যাওয়ায় ছিল আমার একমাত্র লক্ষ্য। তাছাড়া আমি তো তোকে

খুব ভালো করে চিনি, এই রকম একটা ঘটনা শুনলে তুই নিজেই মানসিক ভাবে ভেঙে পরতি। যে আঘাত আমি পেয়েছি সেটা ইচ্ছেকৃত তোকে দিব এতটা নিষ্ঠুর আমি নয়।" মেঘ ভরাট কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, " তারপর কি বিয়ে ভেঙে গেছে? " "আমি ভেঙে দিয়েছি যার কারণে আম্মু মামার বাড়িতে গেলে এখনও অনেক কথা শুনতে হয়। ওনাদের নজরে ওনাদের ছেলে একদম নিষ্পাপ, চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেও তারা না দেখার মতো আচরণ করে। তাই আমি নিজেকে অপকৃষ্ট মেনে নিয়েই মামার বাড়ির সাথে যোগাযোগ বন্ধ করেছি। " "বাসায় কেউ কিছু বলে নি?" "আমার বাসার মানুষ সবটায় জানে বরং ঐ সময়টাতে আপু আর আম্মু ই আমাকে সাপোর্ট করেছে। তাছাড়া আব্বু আগে থেকেই এই সম্পর্কে তেমন আগ্রহী ছিলেন না। " মেঘ শীতল স্বরে জিজ্ঞেস করল, "তুই কি ওনাকে এখনও মিস করিস?" বন্যা মেঘের দিকে তাকিয়ে ফিক করে হেসে বলল, " প্রয়োজনে দূর্বাঘাসে ফাঁ* স নিবো তবুও দুশ্চরিত্রা ব্যাটাকে মিস করবো না। " মেঘ আর বন্যা দুজনেই হাসছে। এরমধ্যে মীম পেছন থেকে শক্তপোক্ত গলায় বলে উঠল, "বন্যাপু তুমি দূর্বাঘাসে ফাঁ *স নিবা কেনো?" মেঘ আর বন্যা দু'জনে একসঙ্গে ঘুরে তাকালো। বন্যা হেসে বলল, "আরে মজা করছিলাম।" মীম বলল, "আম্মু তোমাদের ডাকছে, চলো।" তিনজনই একসঙ্গে নিচে আসছে। বন্যা সচরাচর মেঘদের বাসায় আসে না। হঠাৎ আসলে তার জন্য বাহারি নাস্তার আয়োজন করা হয় আজও তার ব্যতিক্রম হয় নি। বন্যা অল্প

নাস্তা করে মেঘের সাথে সোফায় বসে গল্প করছে এমন সময় তানভির বাসায় আসছে।বন্যাকে দেখেই ভ্রু কুঁচকে সূক্ষ্ম নেত্রে তাকিয়ে সোজা নিজের রুমের উদ্দেশ্যে হাঁটা দিল। কয়েকটা সিঁড়ি উঠতেই মেঘ ডাকল, " ভাইয়া।" তানভির আড়চোখে তাকিয়ে বলল, "বল।" "খেয়েছো কিছু?" "না।" "খেতে দেয়?" "নাহ। খিদে নেই।" তানভির যথারীতি উপরে চলে গেছে। বন্যা ভ্রু কুঁচকে ভারী কণ্ঠে বলল, "তোরা এসব কিভাবে সহ্য করিস?" "কিসব?" "এত অনিয়ম।" মেঘ স্বাভাবিক স্বরে বলল, "আসলে এখন তুই আছিস যে তাই লজ্জা পেয়েছে। " বন্যা দৃঢ় কণ্ঠে শুধালো, " তোর ভাই লজ্জাও পায়?" মেঘ কপালে কয়েক স্তর ভাঁজ ফেলে গম্ভীর কণ্ঠে বলল, " তোর কি আমার ভাই কে ছ্যাঁচড়া মনে হয়?" বন্যা রাশভারি কণ্ঠে বলল, " আমার ভুল হয়ে গেছে। তোর ভাইকে নিয়ে কথা বলে বড্ড অন্যায় করে ফেলছি। আমায় মাফ করে দে।" মেঘ মুচকি হেসে বলল, " করতে পারি তবে একটা শর্তে। " "কি শর্ত?" "তুই আমার ভা..." এটুকু বলেই মেঘ থেমে গেছে। ঢোক গিলে উষ্ণ স্বরে বলল, "কিছু না। " বন্যা আরও কিছুক্ষণ গল্প করে বেড়িয়ে গেছে। মেঘ উপরে যেতেই তানভির ধীর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, "বন্যা কোথায়?" "চলে গেছে। " তানভির আস্তে করে বলল, "আমায় ডাকতে পারতি, এগিয়ে দিয়ে আসতাম।" মেঘ মৃদুস্বরে বলল, " আমি বন্যাকে বলেছিলাম কিন্তু ও বারণ করলো।" "ওহ।" মেঘ চলে যাওয়ার জন্য পা বাড়িয়ে আবারও থমকে দাঁড়ালো। বন্যার সামনে মেঘ কিছু না বললেও বন্যাকে ভাবি বানানোর সুপ্ত ইচ্ছে

এখনও মেঘের মনে বর্তমান। তানভিরের অভিব্যক্তি বুঝার জন্য মেঘ ধীর কণ্ঠে বলল, “ভাইয়া জানো, বন্যার মনটা আজ ভীষণ খারাপ। ” তানভির ভ্রু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, ” কেনো?” মেঘ জোরে নিঃশ্বাস ছেড়ে বুকে সাহস নিয়ে বলল, “বন্যাকে একটা ছেলে খুব কষ্ট দিয়েছে।” তানভিরের সহসা কপাল গুটিয়ে সূক্ষ্ম নেত্রে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, ” ছেলের নাম কি? করে কি?” “নাম ঠিকানা জানি না। বন্যার মামাতো ভাই। ওদের মধ্যে বিয়ের কথাও হয়েছিল। তারপর জানতে পারছে ছেলেটা ভালো না। তাই বিয়ে ভেঙে দিছে। ” তানভির গুরুগম্ভীর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে, ” কবে ভাঙছে?” মেঘ আনমনে বলল, “৩-৪ বছর আগে। ” তানভির বিরক্তি ভরা কণ্ঠে বলল, “৪ বছর আগের ঘটনায় আজ মন খারাপ করার কি আছে? অতীত নিয়ে পড়ে থাকলে জীবনে এগোবে কেমন করে?” মেঘ মাথা নিচু করে বিড়বিড় করে বলল, ” আমাকে আজ ই শেয়ার করেছে। ” তানভির স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, ” ৪ বছর যেহেতু তোকে শেয়ার করে নি তাহলে তোর ও বুঝতে হবে সে এই বিষয়টা ভুলে যেতে চাচ্ছে। তুই এটা নিয়ে কথা বলিস না। অতীত সবার জীবনেই থাকে, আমার জীবনেও আছে। তাই বলে আমি কি এখনও সেসব নিয়ে বসে আছি?” মেঘ হুট করে জিজ্ঞেস করল, “ভাইয়া, তুমি কি এখন কাউকে পছন্দ করো?” তানভির চাপা স্বরে বলল, ” সময় হলে তোকে জানাবো।” মেঘ নিঃশব্দে হেসে করিডোরে হাঁটছে আর মনে মনে ভাবছে, ” তুমি কিংবা বন্যা দুজনেই আমার খুব প্রিয় আর আমি কাউকে ঠকাবো না। তোমার

অতীত যেমন বন্যাকে জানিয়েছি তেমন বন্যার অতীতও তোমাকে জানালাম। এখন তোমাদের মন পরীক্ষার পালা। তোমাদের মনে অনুভূতি জাগলেই এক করে দিব দু'জনকে। কিন্তু কিভাবে করবো? আমার আবির ভাই কই?" মেঘের শান্ত মন আবারও অশান্ত হয়ে উঠেছে। অস্পষ্ট অভিমান বুকের ভেতর বাসা বাঁধতে শুরু করেছে। সকাল থেকে শুরু করে রাতে ঘুমানোর আগ মুহুর্ত পর্যন্ত অসংখ্যবার আবিরের নাম্বারে কল দেয়। রাতের বেলা মেঘ মীমের রুমে গেল, মীম তখন পড়ছিল। মেঘ বিছানায় হেলান দিয়ে বসে জিজ্ঞেস করল, " আচ্ছা মীম বন্যাকে তোর কেমন লাগে?" "বন্যাকে আপুকে আমার অনেক ভালো লাগে। এটা নতুন করে বলার কি আছে?" মেঘ ধীর কণ্ঠে বলল, "এভাবে না। অন্যভাবে।" মীম ভ্রু কুঁচকে প্রশ্ন করল, "অন্যভাবে আবার কিভাবে?" "আমাদের ভাবি হিসেবে কেমন লাগবে?" মীম আঁতকে উঠে বলল, "আবির ভাইয়ার..." মেঘ মীমের মাথায় গাট্টা মেরে রাগান্বিত কণ্ঠে বলল, "আবির ভাই আমার।" মীম মাথায় ঘষতে ঘষতে বলল, "তানভির ভাইয়া?" "হ্যাঁ।" মীম মাথা চুলকে আনমনে ভাবছে। মেঘ ফোঁস করে উঠে বলল, "এত কি গবেষণা করছিস?" মীম চিন্তিত কণ্ঠে বলল, "বন্যা আপুকে কি ভাইয়া পছন্দ করবে?" মেঘ মৃদুস্বরে বলল, "জানি না রে। তবে আমার মনে হচ্ছে কিছু একটা হতেও পারে।" মীম উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, "হলে খুব ভালো হবে আপু। বন্যা আপুকে আমার খুব ভালো লাগে। কত সুন্দর করে কথা বলে, আমাদের সাথে মিশে তাছাড়া ভাইয়ার পাশে

দুজনকে মানাবেও ভালো।” আবির বাসায় নেই এক সপ্তাহ হতে চললো। বাড়ির পরিবেশ থমথমে। কেউ কারো সাথে তেমন কথা বলে না, সবার ভেতরেই চাপা কষ্ট লুকিয়ে আছে। বিকেল দিকে হালিমা খান সোফায় বসে ছিলেন ওনাকে দেখে মালিহা খানও এসে বসলেন। হালিমা খানকে এক পলক দেখে শীতল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, “তোর কি শরীর খারাপ? ” হালিমা খান মলিন হেসে জবাব দিলেন, ” মনটা খুব খারাপ। আবির এখনও বাসায় ফিরছে না। কোথায় আছে কি অবস্থায় আছে আল্লাহ ভালো জানেন।” মালিহা খান শ্বাস ছেড়ে ভারী কণ্ঠে বললেন, ” ওদের বাবা ছেলের কর্মকাণ্ডে আমি আর কুলাতে পারছি না। মেঘের আব্বু যেভাবে রাগ দেখায়, আবিরের আব্বুও তেমন রাগ দেখায়। কেউ কিছু বুঝার চেষ্টা করে না। ছেলেটা এসব কত সহ্য করবে।” হালিমা খান গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, “মেঘের আব্বু কিছুদিন যাবৎ রাতে ঘুমায় ই না। সারাক্ষণ দুশ্চিন্তা করে। যত বন্ধু আর পরিচিত মানুষ আছে সবাইকে কল দিয়ে আবিরের কথা জিজ্ঞেস করে। ” মালিহা খান মলিন হেসে বললেন, ” মেঘের আব্বুকে তো আমি চিনি। রাগ দেখানোর সময় কোনো কিছু ভাববে না অথচ পরে নিজেই সবচেয়ে বেশি দুশ্চিন্তা করবে। অন্যদিকে আবিরের আব্বু সম্পূর্ণ উল্টো। ওনার নিয়ম নীতির বাহিরে গেলেই ওনার সবকিছু এলোমেলো হয়ে যায়। ছেলে, বউ,ভাই-বোন কিছুই দেখে না। সেদিন মেঘের আব্বু চিল্লাচিল্লি করার পরও আবির বেশ শান্ত ছিল কিন্তু হুট করে ওর আব্বু যখন শুরু করলো তখন আর সহ্য করতে পারলো

না। ” হালিমা খান অনেকটা সময় নিশ্চুপ থেকে মালিহা খানের দিকে এক পলক তাকিয়ে নীরবতা ভেঙে বললেন, “আফা, একটা কথা বলি?” মালিহা খান ভ্রু কুঁচকে বললেন, ” কথার মধ্যে মাপামাপি কবে থেকে শুরু করলি? বল কি বলবি। ” হালিমা খান কিছু বলতে চেয়েও থেমে গেলেন সহসা মৃদু হেসে বললেন, “না থাক। কিছু না।” “কি বলতে চাইছিলি বল ” ” বাসার নিয়ম নীতি ভুলে অলীক কল্পনায় ডুবে ছিলাম। যা কখনো সম্ভব না তা নিয়ে ভেবেছিলাম। ” ঢোক গিলে শান্ত স্বরে আবারও বললেন, “রাতে কি রান্না করবো?” এরমধ্যে আলী আহমদ খান আর মোজাম্মেল খান বাসায় ফিরেছেন। মালিহা খান বসা থেকে উঠতে উঠতে আচমকা মেঘ হুড়মুড় করে সিঁড়ি দিয়ে নামছে, চোখ মুখ লাল টকটকে হয়ে আছে। পেছন থেকে তানভির ডাকছে, “বনু শুন। কি হয়েছে বল আমাকে।” মেঘের হাতে তানভিরের ফোন। মেঘ নামতে নামতে আলী আহমদ খান ও মোজাম্মেল খান মেঘের সামনে হাজির। মোজাম্মেল খান গম্ভীর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, ” কি হয়েছে তোর ?” তানভির বলতে বলতে নামছে, “কে কল দিছিলো বলবি তো?” আব্বুকে দেখেই তানভিরের গতি কমে গেছে। সদ্য শাওয়ার নিয়ে বেড়িয়েছে। তানভিরের পড়নে লুঙ্গি আর গলায় একটা গামছা ঝুলানো, সম্পূর্ণ শরীর ভেজা। আব্বু আর বড় আব্বুকে দেখেই তানভির গামছা দিয়ে মাথা মুছতে শুরু করেছে। একটু আগে মেঘ আবিরের খোঁজ নিতে তানভিরের রুমে গিয়েছিলো। তানভির ওয়াশরুমে থাকায় কিছু জিজ্ঞেস করতে পারে নি। হঠাৎ তানভিরের

ফোনে কল বাজতে শুরু করে। মেঘ উচ্চ স্বরে ডাকে, “ভাইয়া, তোমার ফোনে কল আসতেছে। ” ” দেখ, কে কল দিয়েছে। ” মেঘ ফোনের স্ক্রিনে তাকায়। অপরিচিত নাম্বার দেখে তেমন পাত্তা দেয় নি। একবার রিং বন্ধ হয়ে গেছে। মেঘ দরজা পর্যন্ত যেতেই আবারও কল বাজতেছে। ওয়াশরুম থেকে তানভির বলছে, “রিসিভ করে বল আমি ব্যস্ত।” মেঘও যথারীতি কল রিসিভ করে বলতে নিলো, “ভাইয়া ব্য..” এটুকু বলতেই ওপাশ থেকে সুপরিচিত কণ্ঠস্বর ভেসে আসলো, “তানভির, আমি আবির। ” মেঘ আর আবির দুজন একসঙ্গে কথা বলে অকস্মাৎ দু’জনই থেমে গেছে। মেঘ উত্তপ্ত কণ্ঠে ডেকে উঠলো, “আবির ভাই। ” ততক্ষণে আবির কল কেটে দিয়েছে। এমন সময় তানভিরও ওয়াশরুম থেকে বের হয়েছে। মেঘের হাতের কম্পন দেখে ধীর কণ্ঠে শুধালো, “কে কল দিছিলো?” মেঘ উত্তর না দিয়েই রুম থেকে দৌড়ে বেড়িয়ে আসছে। মেঘের চোখ মুখ দেখে আলী আহমদ খান প্রশ্ন করলেন, ” কিছু হয়েছে? ” মেঘ অতর্কিতে ভেঁজা কণ্ঠে বলে উঠল, ” এইমাত্র ভাইয়ার ফোনে আবির ভাই কল দিয়েছিল। আমার কণ্ঠ শুনে কল কেটে দিয়েছে। ” তানভির ভারী কণ্ঠে শুধালো, “কি? ভাইয়া কল দিয়েছিল?” আলী আহমদ খান সহ সবাই তানভিরের দিকে সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। তানভির সবাইকে এক পলক দেখে সহসা বললো, “আমার সাথে ভাইয়ার সত্যিই যোগাযোগ নেই। আমি জানি না কিছু।” তানভির নেমে এসে মেঘের হাত থেকে ফোন নিয়ে নাম্বার টা চেক করতে লাগলো। মেঘ দুই সিঁড়ি উঠে তানভিরের

ফোনের দিকে তাকিয়ে আছে। তানভির কল ডিটেইলস বের করে মেঘকে উদ্দেশ্য করে বলল, " দেখ তো আমার সাথে কথা হয়েছে কি না। তাছাড়া আমার সাথে যদি ভাইয়ার যোগাযোগ থাকতো ই তাহলে আমি এত খোঁজাখুঁজি কেনো করতাম?" আলী আহমদ খান ভারী কণ্ঠে বললেন, "তোমার সাথে আবিরের যোগাযোগ আছে কি নেই সেটা আমার জানার প্রয়োজন নেই। তুমি এই মুহুর্তে আমাদের সামনে আবিরকে কল দিবা। " তানভিরের হাত কাঁপছে, ভয়ে ভয়ে ডায়াল করল সেই নাম্বারে। মোজাম্মেল খানের কথা মতো কল লাউডস্পিকারে দিয়েছে। প্রথমবার কল রিসিভ হয় নি। দ্বিতীয়বার কল রিসিভ করে আবির গুরুভার কণ্ঠে বলল, " কিছু বলবি?" আবিরের কণ্ঠস্বর শুনেই মেঘের বুক কাঁপছে, দু চোখ ছলছল করছে। আব্বু, বড় আব্বু, আম্মুরা সামনে দাঁড়ানো। তাই বার বার ঢোক গিলে মেঘ নিজেকে শান্ত রাখার চেষ্টা করছে। তানভির সহসা বললো, "ভাইয়া, কোথায় তুমি?" তানভিরের কণ্ঠ শুনে আবির কিছুটা থতমত খেলো। কয়েক মুহুর্ত পর দৃঢ় কণ্ঠে উত্তর দিল, " আছি। " আলী আহমদ খান অত্যন্ত গুরুতর কণ্ঠে বলে উঠলেন, " ও কে বলে দাও, যেখানেই আছে আজকের মধ্যে বাসায় ফিরতে। প্রজেক্টের দায়িত্ব যেমন নিয়েছে সেই দায়িত্ব সঠিকভাবে পালনও তাকেই করতে হবে। রাগ,জেদ দেখিয়ে আমার কোম্পানির ক্ষতি করবে তা আমি কখনোই সহ্য করবো না। " তানভির শক্ত কণ্ঠে বলল, "শুনেছো?" "হ্যাঁ।" মোজাম্মেল খান এবার রাশভারি কণ্ঠে বললেন, " শুধু শুনলেই হবে

না। যেখানেই আছো রাত ১০ টার মধ্যে বাসায় আসবে। ” “আচ্ছা। ” আলী আহমদ খান ও মোজাম্মেল খান নিজেদের রুমে চলে গেছেন। মালিহা খান আর হালিমা খান তানভিরের ফোন নিয়ে হাহাকার শুরু করে দিয়েছেন। মেঘ সিঁড়ির সাথে ঠেস দিয়ে নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আবিরের সাথে কথা শেষ করেই মালিহা খান নিজের রুমে গেলেন। আলী আহমদ খান বিছানায় হেলান দিয়ে বসে আছেন। মালিহা খান কপট রাগ দেখিয়ে বললেন, ” ছেলেটা রাগ করে বাসা থেকে চলে গেছে, এক সপ্তাহ ধরে বাসায় ফিরছে না। তার সাথে আপনার এই ব্যবহার টা না করলে হতো না? ” আলী আহমদ খান রাশভারি কণ্ঠে বললেন, ” শুনো, সে কোম্পানির দায়িত্বে আছে মানে এই নয় যে আমি আমার নিয়ম নীতি থেকে সরে যাব। তোমার ছেলে অফিসে মেইল করেছে। কিন্তু সে হয়তো জানে না আমার অফিসে মেইলের মাধ্যমে নেয়া ছুটির পরিমাণ মাত্র তিনদিন। এর বেশি ছুটি লাগলে সশরীরে উপস্থিত থেকে আবেদন করে তারপর নিতে হয়। কিন্তু তোমার ছেলে সেই কাজ করে নি। তারপরও আমি আরও তিনদিন ছাড় দিলাম। কিন্তু সে নিজে দায়িত্ব নিয়ে যে প্রজেক্টগুলো শুরু করেছে, সেগুলোর কি হবে? প্রজেক্ট নেয়ার সময় যেমন রাগ, জেদের কথা মনে ছিল না, প্রজেক্ট শেষ করার ক্ষেত্রে আমিও এখন তার রাগ, জেদকে প্রাধান্য দিতে পারবো না। ” “সারাজীবন শুধু ব্যবসা আর নিয়মনীতি ই করলেন। কখনো ছেলেটার সাথে একা বসে পাঁচ মিনিট কথা বলেছেন? ছেলেটা কি চায় না চায় জানতে চেয়েছেন?” আলী

আহমদ খান ভ্রু কুঁচকে শীতল চোখে তাকিয়ে ঈষৎ হেসে বললেন, “তুমি তো মা। তোমার কাছে কখনো কিছু চেয়েছে?” মালিহা খান ঠান্ডা কণ্ঠে বললেন, “নাহ।” “তাহলে বুঝো কেমন ছেলে তোমার।” মালিহা খান হালকা রাগী স্বরে বললেন, “আপনার জন্যই তো এমন হয়েছে।” আলী আহমদ খান স্ব শব্দে হেসে বললেন, ” মন মতো কিছু হলেই আমার দোষ নাকি?” মালিহা খান রেগেমেগে রুম থেকে বেড়িয়ে গেছেন।খান বাড়ির মানুষদের মন বুঝা দুষ্কর, এই ভালো এই খারাপ। মালিহা খান আবিরের পছন্দ মতো খাবার রান্না করতে ব্যস্ত। মেঘ সোফায় বসে আছে, সামনে টিভি চলছে তবে মেঘের নজর মেইন গেইটে। অনেকক্ষণ পর আবির বাসায় আসছে। আবিরকে দেখেই মেঘ টিভি বন্ধ করে উঠে দাঁড়িয়েছে। মালিহা খান রান্নাঘর থেকে বেড়িয়ে আসছেন। আবির আম্মুর সাথে কথা বলার ফাঁকে মেঘকেও এক পলক দেখে নিলো। মেঘও নিরেট দৃষ্টিতে আবিরকে পরখ করছে। এই এক সপ্তাহেই আবিরের মুখটা শুকিয়ে গেছে, চোখগুলো ফুলা ফুলা। আবির বেশি কথা না বলেই ফ্রেশ হতে উপরে চলে গেছে। কিছুক্ষণ পর নিচ থেকে আলী আহমদ খান ডাকলেন, আবির নিচে আসতেই আলী আহমদ খান জিজ্ঞেস করলেন, “কোথায় গিয়েছিলে?” ” কাছেই। ” “কেনো?” “কাজ ছিলো।” আলী আহমদ খান গম্ভীর কণ্ঠে শুধালেন, ” নিজেকে কি মনে করো তুমি? ” আবির মৃদু হেসে বলল, “আপাতত আপনার অযোগ্য সন্তান। ” “মজা করতেছো?” আবির তপ্ত স্বরে বলল, “সরি আব্বু,আপনার সাথে মজা করার মতো যোগ্যতা আমার

নেই।” ” তা এই এক সপ্তাহে কি নিরীক্ষণ করলে?” “নিজের আদতে লাগাম দেয়া। আমার ব্যবহারে আপনারা কষ্ট পেয়ে থাকলে অনুগ্রহ করে আমাকে মাফ করবেন। আর তিনটা প্রজেক্ট এর কাজ মোটামুটি শেষ, আগামী তিনদিনে সম্পূর্ণ কমপ্লিট হয়ে যাবে ”
“আলহামদুলিল্লাহ। ” মোজাম্মেল খান ভারী কণ্ঠে বললেন, ” ভাইজান তোমার মাথা কি ঠিক আছে? ছেলেটা এক সপ্তাহ পরে বাসায় ফিরেছে। কোথায় আগে খাওয়া দাওয়া করাবে তা না ব্যবসা নিয়ে আলোচনা শুরু করেছো। ” মোজাম্মেল খান আবিরের কাঁধে হাত রেখে শান্ত স্বরে বললেন, “তোমার আব্বুর কথায় কিছু মনে করো না। চলো, খাবে চলো। ” আবির ঢোক গিলে উষ্ণ স্বরে বলল, “সরি চাচ্চু। সেদিন আপনার সাথে ঐরকম ব্যবহার করা আমার একদম ই উচিত হয় নি। প্লিজ কিছু মনে রাখবেন না। ” “দূর বোকা ছেলে। তুমি আমার সন্তান সমতুল্য। সন্তানরা ভুল করবে এটায় স্বাভাবিক। যা হয়েছে সব ভুলে যাও। চলো খাবে এসো।” মেঘ আর মীম ড্রয়িং রুমের এক কর্ণারে দাঁড়িয়ে সব দেখছে। তানভির বাসায় নেই, ফিরতে একটু দেরি হবে বলেছে। ইকবাল খান দুদিন হলো সিলেট গেছেন। আদিও ঘুমিয়ে পরেছে। খাবার টেবিলে এখন আলী আহমদ খান, মোজাম্মেল খান, আবির, মীম আর মেঘ। মেঘ আবিরের বিপরীতে বসায় স্বাভাবিক ভাবেই বার বার আবিরের দিকে তাকাচ্ছে। কিন্তু আবির প্রতিবার নিজের নজর সরিয়ে নিচ্ছে। আবিরের কর্মকাণ্ডে মেঘ একদিকে যেমন বিরক্ত হয়ে যাচ্ছে অন্যদিকে আব্বুর আচরণে বেশ অবাকও হচ্ছে।

আলী আহমদ খান আজ অল্প বিস্তর রাগ দেখালেও মোজাম্মেল খান একবারের জন্য মুখ কালো করেও কথা বলেন নি। মেঘ খাবার শেষ করে এক মুহুর্ত দেরি না করেই নিজের রুমে চলে গেছে। বন্যাকে কল দিয়ে আবিরের ফেরার কথা বলেছে তারপর ফোন রেখে বেলকনিতে দাঁড়িয়ে আকাশের পানে তাকিয়ে কিছু ভাবছে। আচমকা পেছন থেকে আবির ডাকলো, "ম্যাম" মেঘ আঁতকে উঠে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালো তবে কিছুই বললো না। আবির আবারও বলল, " নিজেকে কষ্ট দেয়া ছাড়া আপনার আর কোনো কাজ নেই তাই না?" মেঘ আড়চোখে আবিরকে খানিক দেখে গম্ভীর কণ্ঠে বলল, " নাহ।" আবির মলিন কণ্ঠে বলল, " ভালো।" মেঘ নিরেট কণ্ঠে বলতে শুরু করল, " বাসা থেকে চলে যাওয়ার আগে কেউ কি একবারের জন্য আমার কথা ভেবেছিল? আর যাওয়ার পরও একটা বারের জন্য কল দিয়ে নিজের অবস্থা জানানোর প্রয়োজন মনে করলো না। এত নিষ্ঠুর কিভাবে হয় মানুষ? " আবির তপ্ত স্বরে জিজ্ঞেস করলো, "কেমন আছেন? " "বেঁচে আছি।" আবির মলিন হেসে বলল, " ঠিক আছে। " আবির চলে যেতে নিলেই মেঘ আবারও ডাকলো, "আবির ভাই" আবিরের চিরচেনা জবাব, "হুমম।" তবে আজ উত্তরে তেমন প্রাণ নেই। মেঘ ধীর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, " আপনি কোথায় ছিলেন?" "ছিলাম কোনো এক জায়গায়। " মেঘ হঠাৎ ই ভেঁজা কণ্ঠে বলে উঠল, "এক সপ্তাহ নিখোঁজ হয়ে কিভাবে ছিলেন আপনি ? আমি আপনাকে কতশত বার কল দিয়েছি। আর একটু হলে ম*রেই যেতাম। " আবির দরজায় হেলান

দিয়ে দাঁড়িয়ে মনমরা হয়ে বলল, ” এক সপ্তাহে ই এত ক্লান্ত হয়ে পরেছেন? মনে জোর না থাকলে সামনের ঝড়টা কিভাবে সামলাবেন, ম্যাম?”আবিরের কথা শুনে মেঘের কোমলপ্রাণ হৃদয় মুষড়ে উঠলো, সহসা উদাস চোখে তাকালো আবিরের পরিশ্রান্ত ধৃষ্টতায়। আবিরের দুচোখ বন্ধ, ব্যর্থতার গ্লানি মুখে ফুটে উঠেছে। কোনো এক অজ্ঞাত ক্লেশে আবিরের বুকের ভেতরটা ভারী হয়ে আছে। মেঘ রাশভারি কণ্ঠে বিড়বিড় করল, “আপনি পাশে থাকলে আমি সব ঝড় নিরবে সয়ে যাব।” আবির দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে চোখ খুললো। একপলক মেঘের দিকে তাকিয়ে কোমল কণ্ঠে বলল, “নগর জুড়ে বৃষ্টি নামুক, আমায় সুরে ভাসিয়ে ফেলুক। তবুও সহিষ্ণুতায় তোকে পরিপূর্ণ রাখুক।” আবির মাথা নিচু করে চলে যাচ্ছে। মেঘ মুখ ভার করে বারান্দায় দাঁড়িয়ে জানালা দিয়ে আবিরের দিকে তাকিয়ে রইলো। সময় যত এগুচ্ছে পরিস্থিতি ততই বেসামাল হচ্ছে। মনের আড়ালে জমে থাকা সুপ্ত অনুভূতিগুলো বি*ষা*ক্ত হতে শুরু করেছে। সপ্তাহ কেটে যাচ্ছে, আবিরের ভাব-গতিকে এসেছে বিশাল পরিবর্তন। বাসায় ফেরার পর থেকে আবির একদম নিশ্চুপ হয়ে গেছে। আব্বু, চাচ্চুদের সাথে কোনো প্রকার কথা বলে না। এমনকি ঠিকমতো বাসায়ও ফিরে না। তিনটা প্রজেক্ট শেষ হয়েছে বাকি দুটার কাজ একা হাতে সামলাচ্ছে। কখনো রাত ২-৩ টায় বাসায় ফিরে কখনো বা ফিরেও না। মেঘ দিনে কয়েকবার করে কল দিয়ে আবিরের খোঁজ নেয় তবে ইদানীং আবির মেঘের সাথেও তেমন কথা বলে না। সবসময় দায়সারা ভাব নিয়ে

কথা বলে। মেঘ কিছু জিজ্ঞেস করলে শুধু উত্তর দেয়, নিজ থেকে কিছুই বলে না। মেঘও কিছুদিন যাবৎ বিষয়টা খেয়াল করছে। আবিরকে জিজ্ঞেসও করেছে কিন্তু আশানুরূপ কোনো উত্তর পায় নি। আবিরের নিস্তব্ধতা আর সহ্য করতে পারছে না মেয়েটা । মোজাম্মেল খানও ইদানীং আবিরের সাথে বেশ শান্ত স্বরে কথা বলেন। কিন্তু আলী আহমদ খানের মনে আবিরের প্রতি ক্ষোভের অন্ত নেই। আজ সকালে খাবার টেবিলে সবার উপস্থিতিতে আলী আহমদ খান আবিরকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠলেন, " তোমার যে আগামীকাল ফ্লাইট এটা কি সবাই জানে?" বড় আব্বুর মুখ থেকে এমন প্রশ্ন শুনে মেঘ অতর্কিতে চোখ বড় করে তাকালো। আবির এক নজর মেঘকে দেখে গম্ভীর স্বরে বলল, "নাহ। বলা হয় নি এখনও।" মালিহা খান কথাটা শুনামাত্রই রান্নাঘর থেকে বেড়িয়ে আসতে আসতে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, "কিসের ফ্লাইট? " আলী আহমদ খান মেকি স্বরে বললেন, "কেনো তোমার আদরের ছেলে তোমাকে কিছু জানায় নি?" মালিহা খান ভারী কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, "আবির, কিছু বলছিস না কেনো?" আবির মাথা নিচু করে গাম্ভীর্যের স্বরে জবাব দিল, " একটা প্রজেক্টের কাজে কয়েকমাসের জন্য দেশের বাহিরে যেতে হবে।" অপ্রত্যাশিত বাক্য কর্ণকুহরে প্রবৃত্ত হওয়া মাত্রই মেঘের সবকিছু এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে, আঁখি যুগল পূর্বের তুলনায় আরও বেশি প্রশস্ত হয়ে গেছে। বুকের ভেতর কালবৈশাখী ঝড় শুরু হয়েছে। মনে হচ্ছে, মেঘের হৃদয়ের উষ্ণ অনুভূতিরা মেঘের গলা চেপে ধরেছে, নিঃশ্বাস নিতে পারছে না।

বুকের ভেতরের তোলপাড় চোখে মুখে ফোটে উঠতে বেশি সময় লাগলো না। মেঘের দৃষ্টি নিরেট, চোখে নেই কোনো লুকোচুরি, ভ্রু যুগল কুঁচকে আছে। দৃষ্টি জুড়ে আহাজারি, দুচোখ ছলছল করছে। মালিহা খান আর্তনাদ করে উঠলেন, " পড়াশোনার নাম করে ৭ টা বছর দূরে ছিলি কিচ্ছু বলি নি আমি। আর সহ্য করতে পারবো না, কোথাও যাবি না তুই।" মালিহা খান আলী আহমদ খানের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে উঠলেন, " আপনারা কি শুরু করেছেন? ব্যবসার নাম করে প্রতিনিয়ত আমার ছেলেটার সাথে যা তা আচরণ করছেন। আমার ছেলে কোথাও যাবে না। টাকা পয়সার প্রয়োজন নেই, আমি চাই আমার ছেলে আমার চোখের সামনে থাকুক।" আলী আহমদ খান রাশভারি কণ্ঠে বললেন, " আমি তোমার ছেলেকে জোর করি নি, তোমার ছেলে নিজে বুঝে শুনে প্রজেক্ট নিয়েছে। তাছাড়া এই সিদ্ধান্ত আরও ৪-৫ মাস আগেই নেয়া হয়েছে। তোমার ছেলে বাসায় কাউকে বলতে বারণ করেছিলো তাই বলি নি। আগামীকাল ফ্লাইট এজন্য বাধ্য হয়ে বলতে হচ্ছে। " মালিহা খান রাগান্বিত কণ্ঠে বলে উঠলেন, " তোর আব্বু কি বলছে আবির? " আবির মায়ের হাতে হাত রেখে শীতল কণ্ঠে বলল, " মাত্র কয়েক মাসের ব্যাপার আম্মু। এবার তোমার অপেক্ষা দীর্ঘ হবে না,কথা দিচ্ছি।" আবিরের ভেজা কণ্ঠের কথা শুনেও মালিহা খান নিজেকে সামলে নিতে পারলেন না। কান্নারত কণ্ঠে বললেন, " তোদের যা ইচ্ছে কর। আমি আর কিছুই বলবো না। " মালিহা খান নিজের রুমে চলে গেছেন। হালিমা খান আর

আকলিমা খানও সেদিকেই ছুটলেন। সবাই ঘাড় ঘুরিয়ে মালিহা খানের রুমের দিকে তাকিয়ে আছে অথচ মেঘের নজর আবিরের অভিমুখে। আশপাশের ভ্যাপসা গরমে মেঘের শরীর ঘেমে যাচ্ছে তবুও ভাতের প্লেটে হাত রেখে নিস্তব্ধ হয়ে চেয়ে আছে। আবির মেঘকে দেখে সেকেন্ডের মধ্যে চোখ নামিয়ে নিয়েছে। গত এক সপ্তাহ যাবৎ আবির মেঘের চোখে চোখ রাখে না, সামনাসামনি দেখা হলেও মাথা নিচু করে পাশ কাটিয়ে চলে যায়। তাছাড়া যথাসম্ভব বাসা থেকে দূরেই থেকেছে। আজও আবির সেই চোখে তাকাতে পারছে না। ঐ দুচোখে তাকালেই আবির বিধ্বস্ত হয়ে যাবে। যখন থেকে প্রজেক্ট বিষয়ে কথা হয়েছে তখন থেকেই আবির মেঘকে অল্প বিস্তর বুঝাতে শুরু করেছে। সরাসরি না বললেও কৌশলে অনেকবার ই বুঝিয়েছে। যেই মিনহাজের প্রতি আবিরের এক রাশ আক্রোশ ছিল, যারা মেঘের আশেপাশে ভিড়লেও আবিরের মেজাজ গরম হয়ে যেতো সেই মিনহাজদের সাথে জোরপূর্বক মেঘের সম্পর্ক ঠিক করার চেষ্টা করেছে। যাতে আবিরের অবর্তমানে নিজেকে নিঃসঙ্গ মনে না হয়। মেঘকে সর্বক্ষণ সহিষ্ণু আর ধৈর্যের কথায় বলে এসেছে। আলী আহমদ খান হঠাৎ ভণিতা না করেই জিজ্ঞেস কেন, ” আবির, তুমি কি কোনো বিষয়ে কিছু বলতে চাও?” আবির সটান দাঁড়িয়ে চোয়াল শক্ত করে জবাব দিল, ” নাহ, আমার কিছুই বলার নেই। ” আবির বেসিন থেকে হাত ধৌয়ে সরাসরি আম্মুর রুমে চলে গেছে। একে একে সবাই খাওয়া শেষ করে উঠে যাচ্ছে অথচ মেঘ তখনও থম মেরে বসে

আছে। মেঘের নিরবতায় চারপাশ স্তব্ধ হয়ে আছে। তানভির এক পলক মেঘকে দখে কিছু না বলেই উঠে গেছে। মীম দু-তিন বার মেঘকে ডেকেছে কিন্তু মেঘ পাথরের মতো শক্ত হয়ে আছে। এতক্ষণ যাবৎ বুকের ভেতরে যে তোলপাড় চলছিল এখন তার ছিটেফোঁটাও বাহিরে প্রকাশ পাচ্ছে না। ছলছল করা দু চোখের পানি শুকিয়ে গেছে, গলায় আঁটকে যাওয়া নিঃশ্বাসটা দীর্ঘশ্বাস হয়ে বেরিয়ে গেছে। আবির, আলী আহমদ খানরা সবাই অফিসের উদ্দেশ্যে বেড়িয়ে গেছে। মেঘ নিজের রুমের দরজা বন্ধ করে সেই যে দেয়াল ঘেঁষে বেলকনিতে বসেছিল সারাদিনে এক ইঞ্চিও নড়ে নি। সূর্যের প্রখর উত্তাপ নিরবে সহ্য করে নিয়েছে আর মনে মনে আবিরের কথা ভাবছে। আবির বলেছিল, “কাউকে অনেক বেশি সহিষ্ণু হতে হবে।” মেঘ সেদিনই কোনো এক ঝড়ের আশঙ্কা করেছিল তবে সেই ঝড় টা যে তাকে প্রস্তরে পরিণত করে ফেলবে সেটা বুঝতে পারে নি। মেঘের ফোনে একের পর এক কল বাজতেছে, মীম কিছুক্ষণ পর পর দরজায় এসে ডাকছে কিন্তু মেঘ বেলকনি থেকে একবারের জন্যও উঠছে না। সরাসরি রোদের প্রখরতা কখনই সহ্য করতে পারে না মেয়েটা, অল্পতেই মাথা ব্যথা শুরু হয়ে যায় অথচ আজ দিব্যি ঘন্টার পর ঘন্টা বসে আছে। মাথা ব্যথা অনুভব করার মতো শক্তি পর্যন্ত অবশিষ্ট নেই। রুমে এসে ফোন হাতে নিতেই দেখলো আবিরের নাম্বার থেকে অনেকগুলো কল আসছে। অন্য সময় আবিরের নাম্বার থেকে একটা কল আসলেই আনন্দে মেঘের মন নেচে উঠতো অথচ আজ এতগুলো

কল আসার পরও চোখে কোনো উজ্জ্বলতা নেই, শুকনো ঠোঁটে হাসির রেশ মাত্র নেই। কান্নায় মেঘের বুক ভেঙে আসছে তবুও কাঁদতে পারছে না। এমন সময় আবির আবারও কল দিয়েছে। মেঘ কাঁপা কাঁপা হাতে রিসিভ করে কানে ধরতেই ওপাশ থেকে আবিরের হুঙ্কার আসলো, " তুই কি আমাকে বাঁচতে দিবি না?" আবিরের এমন হুঙ্কারে মেঘ অপ্রস্তুত হয়ে গেছে। দীর্ঘসময় নিশ্চুপ থাকায় মেঘের গলা দিয়ে কোনো আওয়াজ বের হচ্ছে না। আবির গম্ভীর কণ্ঠে আবারও বলল, " আমি মা*রা গেলে শান্তি পাবি?" মেঘ গলা খাঁকারি দিয়ে আর্তনাদ করে উঠলো, " বাজে কথা বলবেন না, প্লিজ। " আবির নিচু স্বরে বলল, "এতগুলো কল দিলাম একবারের জন্য রিসিভ করার প্রয়োজন মনে করলি না। এটা কি ঠিক?" মেঘ আমতা আমতা করে বলল, " ফোনের কাছে ছিলাম না। " "কোথায় ছিলি?" মেঘ নিশ্চুপ। আবির কিছুক্ষণ নিরব থেকে আবারও প্রশ্ন করলো, " দুপুরে খেয়েছিস?" "নাহ।" আবির শক্ত কণ্ঠে বলল, " তোকে ১ ঘন্টা সময় দিচ্ছি এরমধ্যে যাবতীয় কাজ শেষ করে একেবারে রেডি হয়ে বাসা থেকে বের হবি। আমার যেন অপেক্ষা করতে না হয়।" মেঘ ভণিতা ছাড়াই বলল, "আমি বের হবো না।" আবির খানিকটা রাগী স্বরে বলে উঠল, " আমি সিদ্ধান্ত চাই নি মেঘ, তোকে এক ঘন্টার মধ্যে আমার সামনে দেখছে চাইছি।" মেঘ আর কিছুই বলতে পারলো না। তীব্র অনিচ্ছা সত্ত্বেও এক ঘন্টার আগেই বাসা থেকে বেড়িয়ে রিক্সায় করে রওনা দিল। বাসায় একমাত্র মীম কে বলে বেড়িয়েছে। মালিহা খান

সারাদিন কান্নাকাটি করে ঘুমিয়েছেন, হালিমা খান সেখানেই বসে আছেন। আকলিমা খান আদিকে ঘুম পাড়িয়ে নিজেও ঘুমিয়েছেন। মেঘ কিছুটা সামনে এগুতেই আবিরকে দেখলো। মেঘকে দেখেই আবির জিজ্ঞেস করল, " খেয়ে আসছিস?" মেঘ উপর নিচ মাথা নাড়ালো। পশ্চিমা আকাশ সূর্যের রক্তিম আভায় ছেঁয়ে আছে, আবির যথারীতি মেঘের পাশে রিক্সাতে বসলো। ব্যস্ততম শহরে স্বস্তির নিঃশ্বাস নেয়ার কোনো স্থান নেই। উদ্দেশ্যহীন গন্তব্যে রিক্সা চলছে, কারো মুখে কোনো কথা নেই। কিছুটা নির্জন জায়গায় আবির রিক্সা থামাতে বলল। রিক্সা থেকে নেমে দু'জনেই হাঁটতে শুরু করলো।মেঘের চিবুক নামানো। কিছুটা এগুতেই আবির খুব ঠান্ডা গলায় বলল, " সবাই শুনলে কষ্ট পেতো তাই আমি আগে কাউকে কিছু বলি নি। কিন্তু আমার এখন যাওয়াটা খুব প্রয়োজন। আশা করি তুই অন্ততপক্ষে বুঝবি।" মেঘ জিভ দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে নিচু স্বরে বলল, " প্রয়োজন হলে অবশ্যই যাবেন। " আবির ভ্রু কুঁচকে ব্যস্ত ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল, "তুই কি এখনও রেগে আছিস?" মেঘ হালকা হেসে বলল, "নাহ। " সামনাসামনি দুটা চেয়ারে দুজন বসেছে, দুকাপ চাও অর্ডার করেছে। আবিরের চোখ মাটিতে স্থির হয়ে আছে। মেঘের চোখের দিকে এক সেকেন্ডের জন্যও তাকাতে পারছে না। মেঘ এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে শান্ত স্বরে জিজ্ঞেস করল, "আপনার কি শরীর খারাপ? " আবির চোখ মুখ মুছে ঠিক করে বসলো। ধীরে ধীরে এপাশ ওপাশ মাথা নেড়ে কাঁধ উঁচিয়ে শীতল কণ্ঠে বলল, " চল উঠি। " আবিরের অস্বস্তি বুঝতে

পেরে মেঘ আর কিছু বলল না। কাপে তখনও অর্ধেক চা আছে, সেভাবেই কাপ রেখে দিয়েছে। মেঘের মন ভালো করতে বাসা থেকে বের করে এনেছিলো আবির অথচ বুকের ভেতরের হাহাকারে নিজেই অস্বস্তিতে পরে গেছে। সময় নষ্ট না করে মেঘকে নিয়ে সরাসরি শপিং করতে গেল। বেশ কয়েকটা শপ ঘুরে মেঘের জন্য একটা স্মার্ট ওয়াচ নিয়েছে। ফোনের সাথে কানেক্ট করে মেঘের হাতে পড়িয়ে দিতে দিতে গুরুভার কণ্ঠে বলল, "আজকের পর থেকে ঘুম আর গোসল ব্যতীত সর্বক্ষণ এটা পড়ে রাখবি। তোর অবহেলায় আমার একটা কল যদি মিস হয় তারপর বুঝাবো।" মেঘ নীরবে চোখ তুলে তাকাতেই আবিরের সাথে দৃষ্টি বিনিময় হলো। অতর্কিতেই আবির নিজের চোখ নামিয়ে নিয়েছে। মেঘ ভ্রু কুঁচকে বলল, " ওখানে গেলে কি আপনার আমার কথা মনে থাকবে?" আবির চটজলদি বলে উঠল, "মনে থাকবে না কেনো?" মেঘ উত্তর না দিয়ে উল্টো প্রশ্ন ছুড়লো, " বাসায় যাব না?" আবির ভ্রু কুঁচকে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, " কেবল আজকের রাতটায়, কাল থেকে হুটহাট জোর করার মতো কেউ থাকবে না। তুই তোর মতো থাকতে পারবি। " মেঘ চোখ গোল গোল করে তাকালো ততক্ষণে আবির সামনে চলে গেছে, মেঘও পিছু পিছু হাঁটতে শুরু করলো। টুকিটাকি কেনাকাটা শেষে বেড়িয়েছে। আজ কারো মুখেই তেমন কোনো কথা নেই। অনেকটা সামনে এগুতেই দেখলো মেলা চলছে। সন্ধ্যার পর পর রাস্তায় বেশ ভিড় জমেছে। আবির মেঘের ডানহাতটা শক্ত করে ধরে রেখেছে। মেঘ উদাস ভঙ্গিতে আশপাশের

মানুষজন দেখছে, কত কত কাপল ম্যাচিং শাড়ি পাঞ্জাবি পড়ে ঘুরছে, একসঙ্গে বসে খাচ্ছে। এসব দেখে মেঘের বুক খুঁড়ে দীর্ঘ নিঃশ্বাস বেড়িয়ে আসলো। আচমকা তাকালো হাতের দিকে। নিজের অজান্তেই মুচকি হেসে বলল, " নিয়তির নির্দয়তার নিমিত্তে এই মানুষটা আমার হয়েও আমার নয়।" মেঘের আনমনে আশপাশে তাকানো দেখে আবির স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, " মেলায় যাবি?" মেঘ ডানে বামে মাথা নেড়ে সঙ্গে সঙ্গে মুখেও বলল, "যাব না।" আবির মৃদু হেসে সামনে থেকে দুটা টিকিট কেটে মেঘকে নিয়ে ভেতরে ঢুকলো। মানুষের ভিড়ে পা ফেলার জায়গা নেই। আবির অতি সন্তপর্ণে মেঘকে নিয়ে ভেতরে ঢুকলো। বাসায় এত এত কাঁচের চুড়ি থাকা স্বত্তেও মেঘ একটা দোকানে দাঁড়িয়ে নতুন ডিজাইনের কাঁচের চুড়ি দেখছে। মেঘের চুড়ির প্রতি কৌতূহল দেখে আবির খুব যত্ন সহকারে চুড়ির ভেতর তিন আঙুল ঢুকিয়ে ঢুকিয়ে পরীক্ষা করে সুন্দর ডিজাইনের তিনসেট চুড়ি মেঘের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, "এগুলো দেখ।" মেঘের হাতে অলরেডি সেইম ডিজাইনের এক সেট চুড়ি। আবির সেটা হাতে নিয়ে পরীক্ষা করে বলল, "এগুলো তোর হাতে বড় হবে। ঐগুলো পড়।" মেঘ অবিশ্বাস্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে তপ্ত স্বরে বলল, "কে বলছে বড় হবে? এগুলো ঠিকঠাক মতো লাগবে।" আবির মলিন হেসে বলল, " ওয়েট। " আবির দুই সেট চুড়ি খুলে আলতোভাবে মেঘের দু'হাতে পড়িয়ে দিচ্ছে। বড় চুড়িগুলো ডানহাতে পড়িয়েছে। মেঘ অপলক দৃষ্টিতে নিজের হাতের দিকে তাকিয়ে আছে। আবির চুড়ি আগে গিফট

করলেও এই প্রথমবার নিজের হাতে পড়িয়ে দিচ্ছে। চুড়ি পড়ানো শেষে মেঘ দুহাত নাড়িয়ে দেখতে লাগলো। আবিরের দেয়া চুড়ির সেট খুব সুন্দর মতো লেগেছে অন্যটা একটু বড় হওয়ায় মনে হচ্ছে খুলে পড়ে যাবে। মেঘ আশ্চর্য নয়নে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, " আমার হাতে ঐ চুড়িটায় লাগবে এটা আপনি কিভাবে বুঝছেন?" আবির দুচোখ ছোট করে হাসল। কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেল। আশপাশে তাকিয়ে মেকি স্বরে বলল, " থাক, এখানে কিছু না বলি। " আবিরের মুখে দুষ্টু হাসি দেখেই মেঘ ভ্রু কুঁচকালো। সঙ্গে সঙ্গে তাকালো দোকানের ছেলেটার দিকে, ছেলেটাও কেমন করে হাসছে। বিরক্তিতে মেঘ বলল, "চলুন এখান থেকে।" "আর কিছু নিবি না?" "এই দোকান থেকে নিব না।" ছেলেটা সঙ্গে সঙ্গে মন খারাপ করে বলল, " সরি ভাবি, আমি আর হাসবো না। আপনার যা পছন্দ হয় নিন।" অপরিচিত এক ছেলের মুখে ভাবি ডাক শুনে মেঘ অপ্রত্যাশিতভাবে তাকালো, পরপর চোখ তুলে তাকালো আবিরের মুখের পানে। আবিরের ঠোঁটে তখনও হাসি লেগেই আছে। মেঘ এক মুহুর্তের জন্য আবিরের যাওয়ার ঘটনা বেমালুম ভুলে গেল। আবিরের হাস্যোজ্জ্বল মুখের পানে তাকিয়ে নিজেও হাসলো তারপর আদুরে ভঙ্গিতে শুধালো, "আর কি নিবো?" আবির ওষ্ঠ যুগল আরও প্রশস্ত করে বলল, " হায়রে মেয়ে মানুষ! এক সেকেন্ডেই সব ক্রোধ গায়েব।" মেঘ ফোঁস করে শ্বাস ছেড়ে গম্ভীর কণ্ঠে বলল, "ঠিক আছে। চলে যাচ্ছি। " আবির সঙ্গে সঙ্গে মেঘের বাহু চেপে ধরে মোলায়েম কণ্ঠে বলল, " এই নাহ। তোর যা ভালো

লাগে সব নিতে পারিস। ” আবিরের হাতে থাকা মেঘের বাহু দুই আঙুলে পরখ করে মেঘের হাতটা উপরে তুলে মেঘকে দেখিয়ে আবির অকস্মাৎ শক্ত কণ্ঠে বলল, ” এখন যেমন রেখে যাচ্ছি ফিরে এসে যেন তেমনই পায়। এক ইঞ্চি এদিক-সেদিক হলে সোজা বুড়িগঙ্গায় ফেলে দিয়ে আসবো।” মেঘ ওষ্ঠ উল্টে বিড়বিড় করে বলল, “কেনো?” আবির নিরেট কণ্ঠে বলল, ” আমার বাড়িতে কোনো কংকালের জায়গা হবে না। ” মেঘ মুখ ফুলিয়ে আবিরের দিকে চেয়ে আছে। আবির দোকান থেকে দুটা টিকলি হাতে নিয়ে খুব মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা করে একটা মেঘের কপালে ধরে মৃদু হেসে বলল, “এটা একদম ঠিকঠাক। ” বেশ কয়েকটা আংটিও দেখে নিল। মেঘের আঙুলে পড়িয়ে পড়িয়ে দেখছে। মেঘ বিস্ময়কর দৃষ্টিতে আবিরের কর্মকাণ্ড দেখছে। আবির খুব যত্ন নিয়ে প্রতিটা জিনিস পর্যবেক্ষণ করছে। একটা মেয়ের জীবনে এর থেকে বেশি চাওয়া বোধহয় আর কিছুই হতে পারে না। স্বর্ণ কিংবা হীরার চেয়েও অধিক মূল্যবান প্রিয় মানুষের থেকে প্রাপ্ত সময়, তার মনোযোগ আর ভালোবাসা। মেলা থেকে কেনা প্রতিটা জিনিসের মূল্য অতি নগন্য অথচ মেঘের কাছে সেগুলোই খুব মূল্যবান। মেঘের জন্য কেনাকাটা শেষ করে, মীম আর আদির জন্যও মেলা থেকে কিছু কিছু জিনিস নিয়েছে। মেলা থেকে বেড়িয়ে দু’জন আবারও হাঁটতে শুরু করলো। এরমধ্যে তানভিরকে কল দিয়ে একটা রেস্টুরেন্টে আসতে বলেছে। ভিড় ঠেলে আবির মেঘের হাত ধরে হাঁটছে, আবির অবশ্য রিক্সা নিতে চেয়েছিল কিন্তু মেঘের আবিরের

সঙ্গে হাঁটতে খুব ইচ্ছে করছিল তাই রিক্সায় উঠে নি। এইযে আবির মেঘের হাতটা শক্ত করে ধরে আছে এতেই মেঘের বিষাদে ঢাকা মন ভালো হয়ে গেছে। কিন্তু রিক্সায় উঠলে আবারও সেই কোমল মনে বিষাদ ভরে যাবে তাই সে কোনোভাবেই রিক্সায় উঠবে না। আবির আর মেঘ একটা রেস্টুরেন্টে ঢুকলো। মেঘকে একটা টেবিল দেখিয়ে আবির স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বলল, "তুই একটু বস, আমি ফ্রেশ হয়ে আসছি।" আবির চলে যেতেই তিনটা মেয়ে মেঘের সামনে হাজির হলো। মেয়েগুলো দেখতে মাশাআল্লাহ বেশ সুন্দরী আবার সাজুগুজুও করেছে তবে বয়সে মেঘের থেকে অনেক বড় হবে। মেঘ ভ্রু কুঁচকে তাকিয়ে আছে। তিনটা মেয়ের মধ্যে একজন বলে উঠলো, " তোমার পাশে ছেলেটা আবির ছিল না?" মেঘ সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকিয়ে নিরেট কণ্ঠে বলল, "হ্যাঁ। কেনো?" আরেকটা মেয়ে আহ্লাদী কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, "তুমি বুঝি আবিরের গার্লফ্রেন্ড? " মেঘ ঢোক গিলল। আবিরের প্রতি মেঘের তীব্র প্রেমানুভূতি সেই সাথে আবিরের যত্নে দুজনের সুপ্ত প্রেমের সম্পর্ক অস্বীকার করার উপায় নেই। আবির মুখ ফুটে এখনও কিছু না বললেও মেঘ মেয়েগুলোর সামনে শান্ত স্বরে বলল, "জ্বি।" মেয়ে গুলো একজন আরেকজকে ধাক্কা দিয়ে বলল, "বলছিলাম না গার্লফ্রেন্ড। দেখলি তো?" মেঘ উদ্বিগ্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করল, "আপনারা কারা? আর আবির ভাইকে কিভাবে চিনেন?" একটা মেয়ে কপাল গুটিয়ে বলল, " আবিরকে ভাই ডাকছো কেনো? বয়ফ্রেন্ড কে কেউ ভাই ডাকে?" মেঘ চিবুক নামিয়ে মৃদুস্বরে বলল, "ওনি আমার চাচাতো

ভাই। কিন্তু আপনারা কারা?" এবার মেয়েগুলোর ধাক্কাধাক্কি বেড়ে গেছে। তাদের মধ্যে একজন মিষ্টি করে হেসে বলল, " ওহ আচ্ছা। তুমিই তবে সে যার জন্য আবির কলেজে কোনোদিন কোনো মেয়ের দিকে তাকিয়েও দেখে নি? বাড়িতে পরী থাকলে বাহিরে পেত্নী দেখার তো প্রশ্নই আসে না।" মেঘ অবাক চোখে তাকিয়ে আছে। আরেকটা মেয়ে বলে উঠল, "আমরা তোমার বয়ফ্রেন্ডের সাথে একই কলেজে পড়তাম। আজ এতবছর পর হঠাৎ মেলার মধ্যে আবিরকে দেখলাম তারপাশে তুমি ছিলে। আবিরের যত্ন দেখেই সন্দেহ করেছিলাম তুমি নিশ্চয় আবিরের প্রেমিকা হবে। তাই সিউর হতে তোমাদের ফলো করে এখান পর্যন্ত এসেছি। বাই দ্য ওয়ে, তুমি খুব লাকি যে আবিরের মতো একজন মানুষ পেয়েছো।" আরেকটা মেয়ে চাপা স্বরে বলল, "যত্নে রেখো আমার অতীতের ক্রাশকে।" মেঘ মোলায়েম কণ্ঠে বলল, " জ্বি ইনশাআল্লাহ। আপনারা দোয়া করবেন।" "ফি আমানিল্লাহ। এখন আসি।" মেঘ উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলল, "চলে যাবেন কেনো? ওনি এখনি চলে আসবে, বসুন আপনারা। আমাদের সাথে ডিনার করুন।" মেয়েগুলো উদাস ভঙ্গিতে বলল, "আবির যদি এসে আমাদের এখানে দেখে নিশ্চিত ভাবতে তোমার কাছে উল্টাপাল্টা কথা লাগাচ্ছি। থাক তোমরা আনন্দ করো,আসি।" পাশের মেয়েটা আবারও বিড়বিড় করে বলল, " ক্রাশের প্রেমিকাকে দেখেই পেট ভরে গেছে। আজ রাতে কিছু না খেলেও চলবে। " যেতে যেতে পাশের জন ধমক দিল, " মুখ টা বন্ধ রাখ তোর, মেয়েটা কি ভাবছে কে জানে।"

মেয়েগুলো রেস্টুরেন্ট থেকে বেড়িয়ে গেছে। এরমধ্যে আবির হাত মুখ ধৌয়ে চলে আসছে। টিস্যু দিয়ে হাত মুছতে মুছতে মেঘের দিকে তাকালো। মেঘ তখনও সেদিকে তাকিয়ে আনমনে হাসছে। আবির পেছনে ঘুরে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, "কি হয়েছে?এভাবে হাসছিস কেনো?পরিচিত কেউ আসছিলো?" মেঘ হেলান দিয়ে বসে আবিরের দিকে তাকিয়ে ঠাট্টার স্বরে বলল, "আপনার গার্লফ্রেন্ড আসছিলো।" আবির কপালে কয়েক স্তর ভাঁজ ফেলে প্রখর তপ্ত স্বরে শুধালো, "আমার গার্লফ্রেন্ড মানে?" মেঘ হেসে আবারও বলল, "আহারে মেয়েটা আপনাকে কত ভালো.." বলতেই আবিরের চোখে চোখ পরলো। আবির অগ্নিদৃষ্টিতে তাকিয়ে শাণিত কণ্ঠে বলল, " আজেবাজে কথা একদম বলবি না।" এমন সময় তানভির এসে রাগান্বিত কণ্ঠে বলল, "সমস্যা কি তোমার? আমার বনুটাকে বকা দেয়া ছাড়া আর কোনো কাজ নেই তোমার? " আবির মুখে পূর্বের মতো গাম্ভীর্যতা রেখে আবারও বলল, " আমাকে বলছিস কেন, তোর বোনকে জিজ্ঞেস কর।" তানভির স্বাভাবিক কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, " কি হয়েছে বনু?" মেঘ সাফাই দেয়ার স্বরে বলল, " এক মেয়ে বলছে আবির ভাই নাকি তার ক্রাশ ছিল তাই আমি মজা করছিলাম।" তানভির সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, " কোনটা আসছিলো?" মেঘ চোখ বড় করে বিস্ময় সমেত তাকিয়ে বলল, "কোনটা মানে? কয়জনের ক্রাশ ওনি?" আবির অকস্মাৎ টেবিলের নিচে তানভিরের পায়ে পা চেপে ধরে অগ্নিদৃষ্টিতে তাকালো। তানভির মজার ছলে বলল, "আসলে

ভাইয়াকে তো অনেক মেয়েই পছন্দ করে কিন্তু ভাইয়া কাউকে পাত্তা দেয় না। " মেঘ মুচকি হেসে বলল, "হ্যাঁ, জানি। " আবির আর তানভির দুজনেই মেঘের দিকে সূক্ষ্ম নেত্রে তাকিয়ে আছে। কোন মেয়ে আসছিল, কি বলছে এসব ভেবেই দুই ভাই আঁতকে উঠছে। তানভিরের সাথে ইদানীং সম্পর্ক ভালো হওয়ায় মেঘ অনেক কথায় তানভিরের সামনে বলে দেয় কিন্তু তাই বলে এই না যে প্রেমিকের এক্স ফ্যানের কথাও অতর্কিতে ভাইয়ের সামনে বলতে থাকবে। তিনজন একসাথে খাওয়াদাওয়া করে বেড়িয়েছে। আবির তানভিরকে উদ্দেশ্য করে বলল, "তুই ও কে নিয়ে বাসায় যা।" মেঘ সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞেস করল, " আপনি বাসায় যাবেন না?" তানভির মিটিমিটি হেসে বাইক স্টার্ট দিতে চলে গেছে। আবির মলিন হেসে বলল, "রাকিবদের সাথে দেখা করে বাসায় ফিরবো।" মেঘ আস্তে করে বলল, "তাড়াতাড়ি ফিরবেন।" মেঘ বাসার মেইন গেইট পার হতেই সবাই এক দৃষ্টিতে মেঘের দিকে তাকালো। জিজ্ঞেস করতে যাবে এমন সময় পেছন থেকে তানভির এসে বলল, "কিরে বনু, এখানে দাঁড়িয়ে আছিস কেনো? তুই না মীম আর আদির জন্য জিনিস কিনলি। ওদের দে।" মেঘ সঙ্গে সঙ্গে আদিকে নিয়ে মীমের রুমে চলে গেছে। আলী আহমদ খান ভারী কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, "কোথায় গিয়েছিলে?" তানভির তড়িৎ বেগে জবাব দিল, " মেলা হইতেছে তাই বনুকে নিয়ে মেলায় গিয়েছিলাম।" মোজাম্মেল খান গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, " তোমরা দুই ভাইবোন একসঙ্গে বের হতে না বারণ করেছিলাম" তানভির ভ্রু

কুঁচকে গম্ভীর কণ্ঠে বলল, " মনে ছিল না, এরপর থেকে বনুকে রিক্সায় পাঠিয়ে আমি বাইকে আসবো। তাহলে হবে তো?" আলী আহমদ খান হেসে বললেন, " বোনকে একা নিয়ে গেলে। মীম আর আদিকে নিলে না কেনো?" তানভির মেকি স্বরে বলল, " তিনজনকে একা সামলানো সম্ভব না। পরবর্তীতে বাসার সবাই মিলে একদিন যাব।" আলী আহমদ খান আবারও প্রশ্ন করলেন, "আবির কোথায়?" তানভিরের স্বাভাবিক জবাব, "রাকিব ভাইয়াদের সাথে অফিসিয়াল মিটিং করছে। " মোজাম্মেল খান ভ্রু উঁচিয়ে বললেন, " অফিসিয়াল মিটিং। " তানভির রাশভারি কণ্ঠে বলল, "ভাইয়া চলে গেলে সম্পূর্ণ দায়িত্ব তো রাকিব ভাইয়া আর রাসেল ভাইয়াকেই নিতে হবে। তারজন্য মিটিং প্রয়োজন না?" "হ্যাঁ, অবশ্যই প্রয়োজন। বাসায় কখন ফিরবে?" "মিটিং শেষ হলে।" "ঠিক আছে তুমি রুমে যাও।" তানভির স্বাভাবিক ভাবেই রুমে চলে গেছে। মীমদের জিনিস পত্র দিয়ে মেঘ নিজের রুমে এসে ফ্রেশ হয়ে চুল খুলে মাথায় টিকলি, নতুন কেনা বড় বড় ঝুমকা, হাত ভর্তি চুড়ি, কোমরে বিছা পড়ে ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখছে। আজকের পড়া প্রতিটা জিনিস ই আবির ভাইয়ের পছন্দ করে কেনা। মেঘ একবার ওড়না দিয়ে ঘোমটা দিচ্ছে আবার ঘোমটা তুলে নিজের লাজুক মুখখানা দেখছে। আচমকা মেঘের মনে বিষাদের ছায়া নেমে আসলো, মনে পড়ে গেল আবির ভাইয়ের চলে যাওয়ার কথা। ঠোঁটে লেগে থাকা হাসি মুহুর্তেই বিলীন হয়ে গেছে, সঙ্গে সঙ্গে সব খুলে ফেলেছে, চুলে হাত খোঁপা করে

বিছানার এক কোণে চুপটি করে বসে পরেছে। মনে মনে ভাবছে ছোট থেকে ফেলে আসা সব স্মৃতি। অকস্মাৎ মেঘের মনে পড়লো, আজ থেকে প্রায় ৯ বছর আগের কথা যখন প্রথমবারের মতো আবিরের দেশ ছাড়ার কথা হচ্ছিলো। আবির আকুল কণ্ঠে বার বার মেঘকে জিজ্ঞেস করেছিল, " তুই কি চাস আমি তোকে ছেড়ে চলে যাই? প্লিজ মেঘ, তুই একবার বল যেতে হবে না। আমি সত্যি সত্যি যাব না। কিছু তো বল, প্লিজ।" অথচ মেঘ সেদিন একবারের জন্যও মুখ খুলে নি। এমনকি আবিরের আকুল কণ্ঠে বলা কথাগুলোর মানেও বুঝার চেষ্টা করে নি। তীব্র অভিমান বুকে জমিয়ে রেখেছিল, যার জন্য বাধ্য হয়ে সেদিন আবিরকে কাঁটা বেছানো পথকেই বেছে নিতে হয়েছিলো। তখন আবির বাড়ি ছাড়ায় সবচেয়ে বেশি খুশি হয়েছিল মেঘ অথচ আজ সম্পূর্ণ উল্টো। আজ সবচেয়ে বেশি কষ্ট মেঘ ই পাচ্ছে। মালিহা খানকে বুঝানোর পর ওনিই মেনে নিয়েছেন কিন্তু মেঘ কোনোকিছু বুঝার অবস্থাতেই নেই। আবিরের উপস্থিতি ছাড়া মাত্র ৭ দিনেই মেয়েটা আধমরা হয়ে গিয়েছিলো। সেখানে সাত সমুদ্র পার হয়ে আবির চলে যাবে এটা সে কোনোভাবেই মানতে পারছে না। ঘন্টা দুয়েক যাবৎ মেঘ এলোপাতাড়ি ভাবনায় মগ্ন। হঠাৎ ভাবনার মাঝে আগমন ঘটে আবিরের তিন বান্ধবী। যাদের মধ্যে একজন বলেছিল, "তুমিই তবে সে যার জন্য আবির কলেজে কোনোদিন কোনো মেয়ের দিকে তাকিয়েও দেখে নি? বাড়িতে পরী থাকলে বাহিরে পেত্নী দেখার তো প্রশ্নই আসে না।" এটুকু মনে পড়তেই মেঘ অকস্মাৎ সোজা হয়ে

বসলো। রেস্টুরেন্টে বিষয়টা সেভাবে ভেবে দেখে নি তবে এখন এটার মানে বেশ বুঝতে পারছে। মেঘ নিজেকে নিজে প্রশ্ন করল, “তবে কি আবির ভাই আমাকে তখন থেকেই ভালোবাসতেন?” মেঘের হৃৎস্পন্দন জোড়ালো হতে শুরু করেছে, আচমকা বুকের বা পাশে তীব্র শূন্যতা অনুভব হচ্ছে। ৯ বছর যাবৎ আবির ভাইকে কত কষ্ট দিয়েছে সেসব ভেবেই মেঘের কলিজা কাঁপছে। যদিও মেঘ সিউর না এটা কেবল সন্দেহ তবুও মেঘ স্তব্ধ হয়ে গেছে। কোনো কিছু ভেবে না পেয়ে দ্রুত রুম থেকে প্রস্থান নিয়ে ছুটলো আবিরের রুমের দিকে। ততক্ষণে রাত গভীর হয়ে গেছে। ঘড়ির কাটা ১১-১২ টার ঘরে। আবিরের রুমের দরজা চাপানো তবুও ইতস্তততা ছাড়াই মেঘ দরজা ধাক্কা দিল। ছুটে গেলো রুমের ভেতর কিন্তু আবির রুমে নেই। রুমে লাগেজ সাথে প্রয়োজনীয় সবকিছু গুছানো দেখেই মেঘের বুকটা আবারও ছ্যাৎ করে উঠলো। রুমে ফোন দেখে সিউর হলো আবির বাসায় ই আছে। রুমে আবিরকে না পেয়ে সোজা ছুটলো ছাদের দিকে। ছাদের কার্নিশে মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়িয়ে আছে আবির। দৃষ্টি আকাশের পানে। মেঘ দরজায় দাঁড়িয়ে ঘন ঘন শ্বাস ফেলে তাকালো আবিরের দিকে। আবিরের পেছন সাইড দেখেই মেঘ বুঝতে পেরেছে । বুকের ভেতরে আঁটকে থাকা সবটুকু নিঃশ্বাস ছেড়ে মেঘ আবারও ছুটলো। আবির গভীর মনোযোগ সহকারে অসীম আকাশে তাকিয়ে আছে। মেঘের নুপুরের শব্দ আবিরের কর্ণকুহরে প্রবেশের আগেই মেঘ পেছন থেকে আবিরকে ঝাপটে ধরে হাউমাউ করে কান্না

শুরু করে দিয়েছে। আকস্মিক ঘটনায় আবির এক পা সামনে এগিয়ে ছাদের সাইডের দেয়ালে হাত চেপে ধরে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করল। মেঘের ছোট্ট ছোট্ট দুটা হাত আবিরের বুকের উপর। মেঘের অবাধ কান্নায় আবিরের পিঠের দিকে টিশার্ট ভিজে যাচ্ছে। আবির এক হাতে নিজের দুচোখ মুছে মেঘকে খানিকটা ছাড়িয়ে সামনে ঘুরল। মেঘ এবার অতর্কিতে আবিরের প্রশস্ত বুকে ঝাপিয়ে পড়েছে। মেঘের গগন বিদায়ী কান্নায় প্রকৃতি স্তব্ধ হয়ে গেছে, ছাদে বয়ে যাওয়া হিমশীতল হাওয়াও থেমে গেছে। পূর্ণিমার চাঁদে আলোকিত ছাদে আবির আর মেঘ ব্যতীত কোথাও প্রাণের অস্তিত্ব নেই। ধীরে ধীরে মেঘের কান্নার মাত্রা বেড়েই চলেছে। আবিরের গলা দিয়েও কোনো আওয়াজ বের হচ্ছে না, মেঘকে সান্ত্বনা দেয়ার মতো কোনো ভাষাও খোঁজে পাচ্ছে না। কয়েক মুহুর্ত নিস্তব্ধ থেকে আবির আচমকা নিজের একহাত মেঘের কোমরের কিছুটা উপরে, আরেক হাতে পিঠ বরাবর রেখে মেঘকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরলো। আবিরের স্পর্শ অনুভব করা মাত্র মেঘ আবিরকে আরও শক্ত করে জড়িয়ে ধরে, জোরে শব্দ করে কাকুতি শুরু করেছে। এই প্রথমবার আবির মেঘকে ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ করেছে, প্রশস্ত হাতের সবটুকু সামর্থ্য দিয়ে তার প্রেয়সীকে আলিঙ্গন করেছে। এর আগে যে কয়বার ধরেছে ততবারই আবির দূরে থেকেছে। তবে আজ দুজনের মাঝে এক ইঞ্চির দূরত্বও নেই, দুটা নিষ্কলুষ হৃদয়ের মানুষের কান্নাতেই একে অন্যের হৃদয়ের ক্লেশ উপলব্ধি করছে। আবির কিছুটা নিচু হয়ে মেঘের মাথার উপর

আলতোভাবে নিজের গাল ছোঁয়াতেই আবিরের চোখের কার্ণিশ ঘেঁষে এক ফোঁটা অশ্রু মেঘের কেশরাজ ভেদ করে ভেতরে চলে গেছে। কান্নার তোপে মেঘ সেই নোনাজল উপলব্ধিও করতে পারে নি। আবির সঙ্গোপনে দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে মেঘের মাথায় নিজের মাথা কাত করে রাখতেই মেঘ আবিরের প্রশস্ত বুকে নিজের মুখ চেপে ধরেছে। অকস্মাৎ মেঘের খোঁপার বাঁধন খুলে আবিরের দুহাত ঢেকে মেঘের ঘন কালো চুল পৌছে গেছে হাঁটুর উপর পর্যন্ত। আবিরের সুপ্ত অনুরাগের মতো কেশরাজরাও যেন লুকিয়ে ফেলেছে আবিরের ভালোবাসার বন্ধনকে। মেঘ আবিরের বুকের বা পাশে মাথা রেখে অবাঁধে কাঁদছে, আবির নিরবে মেঘের কান্নার গভীরতা মাপছে। প্রায় ৪৫ মিনিট পেরিয়ে গেছে অথচ মেঘ থামছেই না। আবির বাধ্য হয়ে কান্নাভেজা কণ্ঠে বলল, " এবার একটু থাম, প্লিজ।" মেঘ আরও কিছুক্ষণ কেঁদে কয়েক সেকেন্ডের জন্য থামলো তবে তখনও ফুপিয়ে ফুপিয়ে কেঁদেই যাচ্ছে। খানিক স্থির হওয়ায় আবিরের বুকের বাম প্রকোষ্ঠে থাকা হৃদপিণ্ডের প্রবল স্পন্দন অনুভব করছে যা বাহির থেকে স্পষ্ট শুনা যাচ্ছে। মেঘের কান্না থেমে গেছে, দুচোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়া নোনাজলও থমকে গেছে। মেঘ ফোঁপানো কণ্ঠে বলে উঠলো, " আবির ভাই, আপনি ব্যতীত আমি একেবারে নিঃস্ব হয়ে যাবো। আমাকে ছেড়ে যাবেন না, প্লিজ। " আবির একহাতে মেঘের মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে মোলায়েম কণ্ঠে বলল, " এই বিস্তৃত নক্ষত্রমন্ডলকে সাক্ষী রেখে আবির মেঘকে কথা দিচ্ছে, আজ থেকে ঠিক পাঁচ মাস পর মেঘ

যা চাইবে, ঠিক যেভাবে চাইবে সেভাবেই পাবে। মেঘের কোনো ইচ্ছে আমি আবির অপূর্ণ রাখবো না, কথা দিলাম। শুধু একটু ধৈর্য রাখ, প্লিজ।" মেঘ কাঁদতে কাঁদতে বলল, "আমি এর বেশি ধৈর্য রাখতে পারছি না, আবির ভাই। আমার মনে হচ্ছে আমি আর বাঁচবো না। " আবির সহসা মেঘকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে আর্তনাদ করে উঠল, " তোর কিছু হলে আমি বাঁচতে পারবো না। "আবিরের আর্তনাদ শুনে মেঘ আবিরের বুক থেকে মাথা উঠিয়ে বিস্মিত নয়নে আবিরের মুখের পানে তাকিয়েছে। পূর্ণিমার চাঁদের আলোতে মেঘের দুধে-আলতা আদলে গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়া পানির দাগগুলো মুক্তার ন্যায় চকচক করছে। মেঘের বিষন্ন চিত্তে নৈসর্গিক পুলক নিরূপণ হচ্ছে, উদ্বিগ্ন আদল মুহুর্তেই বদলে গেছে মনোমুগ্ধতায়। আবিরের অন্তরের মর্মভেদী প্রদাহে প্রতিনিয়ত বিধ্বস্ত হওয়া অবসন্ন ধৃষ্টতায় মুহুর্তেই স্তম্ভিত ফিরলো। আবিরের অচঁচল চাহনি ছোট্ট মেঘের বুকের ভেতর আবদ্ধ হৃদপিণ্ডটা কে ক্ষতবিক্ষত করে দিচ্ছে। মেঘের পিঠ থেকে হাত সরিয়ে আবির অতীব আত্ততায় মেঘের দুচোখ মুছে দিয়েছে। মেঘ তখনও ছোট্ট হাতের সর্বশক্তি দিয়ে আবিরকে জড়িয়ে ধরে আছে। আবির গালের পানি মুছে দুহাতে মেঘের দুগালে হাত রেখে নিরেট দৃষ্টিতে তাকিয়ে পূর্বের ন্যায় আবারও জিজ্ঞেস করল, " ম্যাম, আমাকে কি পাঁচটা মাস সময় দেয়া যাবে?" আবিরের আজ্ঞাসূচক প্রশ্ন শোনামাত্র মেঘের চোখ থেকে এক ফোঁটা অশ্রু গাল পর্যন্ত নামতেই আবির নিজের বৃদ্ধাঙ্গুলের সহিত সেই গতি থামিয়ে দিয়ে মুখে গম্ভীর ভাব

বজায় রেখে বলল, " মাস বাদ দিলাম মাত্র ১৫০ দিন হলেই চলবে। ঘুম ভাঙলেই ১৪৯ দিন। চলবে?" মেঘের মুগ্ধ চাহনিতে আবারও বিষাদ নেমেছে, বুকের ভেতর তীব্র অভিমান জমেছে, অভিমানী মুখ খানা দেখে আবিরের বুকের যন্ত্রণা তীব্র হতে শুরু করেছে। গত দিনগুলোতে মেয়েটাকে অবহেলা করে নিজেকে যতটা শক্ত রাখার চেষ্টা করেছিলো সেই সবকিছু মুহূর্তেই পরিবর্তন হয়ে গেছে। আবির নিজেকে নিরূদ্ধ করতে আকাশের পানে তাকিয়ে দুচোখ বন্ধ করে সঙ্গোপনে দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়লো। হঠাৎ অনুভব করলো আবিরের পিঠ থেকে মেঘের দু হাত সরে গেছে, আবির তৎক্ষনাৎ চোখ মেললো। ততক্ষণে মেঘের শরীর হেলে পড়ছে আবির তড়িৎ বেগে মেঘকে দু'হাতে আঁকড়ে ধরে আর্তনাদ করে উঠল, "এই মেঘ, কি হয়েছে তোর?" মেঘের নিস্তেজ দেহ আবিরের গায়ে পড়ে আছে। আবির অনর্গল ডাকছে কিন্তু মেঘের হুঁশ নেই। মেঘকে কোলে নিয়ে সোফায় হেলান দিয়ে বসিয়ে দ্রুত পানি এনে মেঘের চোখে মুখে ছিটিয়ে দিচ্ছে আর অবিরত ডেকে যাচ্ছে। সকাল থেকে করা একের পর এক অনিয়ম, মনের বিরুদ্ধে সারাদিন উত্তপ্ত ক্ষিপ্রতায় নিজেকে প্রহত করার তীব্র প্রচেষ্টা, বুকের ভেতর কষ্ট চেপে রাখার উদ্যম তার সঙ্গে অনাবশ্যক কান্নার ফলে মেঘের দেহ নিস্তেজ হয়ে পরেছে। মিনিট দশেকের মধ্যে মেঘ পিটপিট করে চোখ মেললো, আবির ছাদের ফ্লোরে বসে মেঘের দুহাত আঁকড়ে ধরে আকুল কণ্ঠে ডেকেই যাচ্ছে। আবিরের বিধ্বস্ত চেহারা দেখে মেঘের বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে

উঠেছে। মনের অন্তরালে চলছে একের পর এক প্রশ্নের ছুটোছুটি কিন্তু তার একটাও শ্বাসনালী পেরিয়ে মুখ পর্যন্ত আসতে পারছে না। আবির আকুল কণ্ঠে শুধালো, " কি হয়েছে তোর?" আবিরের প্রশ্নে মেঘের ধ্যান ভাঙ্গে, চিবুক নামিয়ে আস্তে করে বলল, "আমার মাথা কেমন করছে। " আবির শ্বাস ছেড়ে নিজেকে ধাতস্থ করে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলে উঠল, " এতো পাগলামি কেনো করিস? তুই তো জানিস কাঁদলে তোর মাথা ব্যথা করে, শ্বাসকষ্ট হয় তবে কেনো এমন করিস? নিজের প্রতি যত্নশীল কবে হবি?" আবিরের আদরমাখা একের পর এক প্রশ্ন শুনে মেঘের অভিমানী মনে রাশি রাশি অভিমান ভর করছে। মুখটা আগের থেকেও বেশি চুপসে গেছে। মেঘ আবিরের দিকে তাকিয়ে উদাস ভঙ্গিতে বলল, " আমি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ অনুৎকণ্ঠিত হবো, নিজেকে প্রতিহত করে নিজেই আশাহত হবো। " আবির মলিন হেসে বলল, "আমাকে জ্বালাতে তোর খুব ভালো লাগে। তাই না?" মেঘ না চাইতেও ক্ষীণ হাসতো, তবে হাসিটা পূবের ন্যায় প্রাণহীন। আবির ঠান্ডা কণ্ঠে হুমকি দিল, " আমি যাওয়ার পর যদি কোনোভাবে শুনতে পারি যে তুই স্ব ইচ্ছায় নিজেকে নিজে আহত করেছিস তাহলে এই আবিরকে আর পাবি না। চুপচাপ রুমে যা।" মেঘ নিরাশ হয়ে বলল, " আমি রুমে যাব না। " আবির ফ্লোর থেকে উঠে ট্রাউজারের ধূলো ঝেড়ে ব্যস্ত ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল, " রুম পর্যন্ত দিয়ে আসতে হবে?" মেঘ আকাশের পানে তাকিয়ে উষ্ণ স্বরে বলল, " চাঁদটা খুব সুন্দর তাই না?" আবির আড়চোখে চাঁদের পানে তাকিয়ে মুখের গম্ভীর ভাব

সরিয়ে মেকি স্বরে বলল, " তোর থেকে বেশি না। " মেঘ মলিন হেসে স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, " যে অনলের উত্তাপে সদাই ঝলসে যাচ্ছি সেই অনলে ঘি না ই বা ঢাললেন! আমি উন্মাদ হতে পারি তবে বিবশ নয়। " আবির মেঘের পাশে সোফায় বসে নিজের হাঁটুতে দুহাতের ভর ফেলে মাথা নিচু করে ফ্লোরের দিকে তাকিয়ে তপ্ত স্বরে বলে উঠলো, " এজন্যই আমি বাসায় কিছু বলতে চাই নি। ভেবেছিলাম ঐখানে পৌঁছে ফোন করে জানাবো কিন্তু আব্বু জানিয়ে দিয়ে সবকিছু এলোমেলো করে দিয়েছে। " মেঘ কপাল গুটিয়ে সূক্ষ্ম নেত্রে আবিরের দিকে তাকিয়ে আর্তনাদ করে উঠল, "আপনি আমায় না জানিয়ে চলে যেতে পারতেন? " "হয়তো।" মেঘ দু'হাতে আবিরের বাহু শক্ত করে ধরে আবিরের শক্তপোক্ত বাইসেপে মাথা এলিয়ে মিনমিন করে বলে, "আপনি বড্ড নিষ্ঠুর।" আবির আড়চোখে চেয়ে বলল, " তাহলে নিষ্ঠুর মানুষটার পাশে বসে আছিস কেনো? রুমে চলে যা। " মেঘ অনুষ্ণ কণ্ঠে জবাব দিল, " নিষ্ঠুর মানবের নিষ্ঠুরতা আমায় বন্দি করে ফেলেছে। আমি এখন কি করবো?" আবির মোলায়েম কণ্ঠে বলল, " নিষ্ঠুর মানবের জন্য প্রতীক্ষা করবি।" আবির একটু থেমে আবারও বলল, " শুন, আমি চাই না আমার অবর্তমানে তুই নিজের উন্মুক্ত মনটাকে বন্দি করে নিজেকে কষ্ট দেস। তোর জীবন যেভাবে চলছিল সেভাবেই চলবে, বন্ধু, আড্ডা, পড়াশোনা তাছাড়া যা যা করতে ভালো লাগে সব করতে পারিস। যদি ঘুরতে ইচ্ছে করে তানভিরকে বললেই নিয়ে যাবে, মন খারাপ লাগলে ফুপ্পির সাথে দেখা করে আসিস।

সবথেকে বড় কথা যদি কখনো আমার সাথে কথা বলতে ইচ্ছে করে তাহলে নির্দ্বিধায় কল দিস । হোক রাত ২ টা কিংবা দুপুর ১২ টা তোর যখন ইচ্ছে হবে তখন ই কল দিবি, যা ইচ্ছে তাই বলতে পারবি। যদি মাঝরাতে টিকটিকি কিংবা ব্যাঙের স্বপ্নে ঘুম ভাঙে আর সেই স্বপ্নের কথা শেয়ার করতে ইচ্ছে হয় তবে সঙ্গে সঙ্গে আমায় কল দিবি। সবসময় মনে রাখবি, কোথাও কেউ একজন তোর চিন্তায় নিরন্তর মগ্ন আছে। ” মেঘ নিশ্চুপ বসে আছে। আবির গলা খাঁকারি দিয়ে আস্তে করে বলল, “সেই সাথে লাস্ট ওয়ার্নিং দিচ্ছি, আমি চলে যাওয়ার পর আমার নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে যদি নিজেকে কষ্ট দেস তবে আমি আবির তোকে চিনি না। মাইন্ড ইট।” মেঘ আবিরের হাত ছেড়ে সোজা হয়ে বসেছে। প্রিয় মানুষের সঙ্গ পেতে মনে সায় দিলেও আজ শরীরটা সায় দিচ্ছে না। সারাদিনের উদ্দামতা মেঘের চোখে মুখে ফুটে উঠেছে। মাথা অনবরত ঘুরছে, চোখে ঝাপসা দেখছে, নিজের সাথে নিজে বিগ্রহ করেও ঠিক থাকতে পারছে না, একবার মাথা চেপে ধরছে, একবার আকাশের পানে তাকাচ্ছে, আবার আবিরকে দেখছে। মেঘের অস্থিরতা বুঝতে পেরে আবির শান্ত স্বরে শুধালো, “শরীর কি বেশি খারাপ লাগছে?” মেঘ উপর নিচ মাথা নেড়ে বলল, “হ্যাঁ।” “ঘুমালে হয়তো ঠিক হয়ে যাবে। চল তোকে রুমে দিয়ে আসি।” মেঘ শক্ত কণ্ঠে বলে উঠলো, “আমি রুমে যাব না। এখানেই থাকবো। ” আবির নড়েচড়ে পায়ের উপর পা তুলে বসে মেঘকে কাছে টেনে আবিরের উরুতে শুইয়ে দিয়েছে। আকস্মিক ঘটনায় মেঘের সর্বাঙ্গ

শিহরিত হচ্ছে, বুকের ভেতরের টালমাটাল অবস্থা সামলাতে বারংবার ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। আচমকা আবিরের সংস্পর্শ মেঘকে নাজেহাল করে তুলছে তবে আবিরের সেদিকে বিশেষ মনোযোগ নেই। আবির ব্যস্ত মেঘের লম্বা চুল সামলাতে। মেঘের বুকের বা পাশের হৃদপিণ্ডের কম্পন বাহির থেকে শুনা যাচ্ছে, লজ্জায় আড়ষ্ট হয়ে চোখ ই খুলতে পারছে না। সেই সঙ্গে শরীরের দূর্বলতার জন্য উঠার চেষ্টাও করতে পারছে না। আবিরের একহাত মেঘের চুলে, খুব যত্ন সহকারে মেঘের মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। মেঘ ভেতরে ভেতরে আবিরের কোল থেকে উঠার চেষ্টা করছে, আস্তে আস্তে সাইডে সরে যাচ্ছে আচমকা আবির অন্য হাতে মেঘের পেটের পাশে হাত রেখে মেঘের শরীর সোফার মাঝ বরাবর এনে উষ্ণ স্বরে বলল, ” কথা না শুনলে সোজা রুমে ফেলে দিয়ে আসবো। তারপর কান্নাকাটি করবি না বলে দিলাম।”
আবিরের উষ্ণ স্পর্শে মেঘের নিঃশ্বাস আঁটকে গেছে সেই সঙ্গে ভারী কণ্ঠের হুমকিতে মেঘ সম্পূর্ণ শান্ত হয়ে গেছে। চোখ বন্ধ করে ঘন ঘন শ্বাস ছাড়ছে। আবির মেঘের মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে সেই সঙ্গে মেঘকে শীতল কণ্ঠে বুঝাচ্ছে। আবিরের বিস্তর আলাপচারিতার পর মেঘ ধীরে ধীরে চোখ মেললো। উজ্জ্বল আলোতে আবিরের মায়াময় মুখখানায় তাকিয়ে মনে মনে আওড়াল, ” এত কথা বলতে পারছেন অথচ একবারের জন্য কি ভালোবাসি শব্দটা বলা যায় না?
সারাজীবনের জন্য আমাকে আপনার ভালোবাসার চাদরে মুড়িয়ে নেয়া যায় না?” আবির শান্ত স্বরে জিজ্ঞেস করল, “কি ভাবছেন? ” মেঘ

চোখ সরিয়ে মুচকি হেসে বলল, “কিছু না। ” মেঘ অসীম আকাশে জ্বলজ্বল করা চাঁদের পানে চেয়ে আছে আর আবিরের নেশাক্ত দৃষ্টি তাকিয়ে আছে মেঘের মায়াবী আদলে। আবিরের বুকের বা পাশে যেই চাঁদের অবস্থান সেই চাঁদ আজ আবিরের কোলে শুয়ে আছে। আবির না চাইতেও আজ তার একান্ত চাঁদের রূপ আর মায়ায় নিজেকে জাহির করতে বাধ্য হয়েছে। বেসামাল দশার কত সময় পেরিয়েছে সেদিকে কারোর হুঁশ নেই। আবিরের আত্ততায় একসময় মেঘ আবিরের কোলে শুয়েই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। আবির তখনও মায়াবী দৃষ্টিতে মেঘের ঘুমন্ত মুখখানা দেখছে। প্রায় শেষরাতের দিকে আবির মেঘকে তার রুমে নিয়ে গেছে। আবির মেঘের মাথায় হাত বুলিয়ে আলতোভাবে মেঘের কপালে একটা চুমু খেয়ে ভেজা কণ্ঠে বলল, ” খুব মিস করবো তোকে।” আবির উঠে যেতে নিলে মেঘ ঘুমের ঘোরেই আবিরের টিশার্ট খামছে ধরেছে। আবির উঠতে চেয়েও থমকে গেছে। এই হাত ছাড়িয়ে চলে যাওয়া আবিরের পক্ষে অসম্ভব তাই চুপচাপ মেঘের পাশে বসে পরেছে। সকাল হয়ে গেছে। মেঘ আধ ঘুমে থেকেই আশপাশে তাকিয়ে নিজেকে রুমে আবিষ্কার করল। তৎক্ষনাৎ ঘড়ির কাটা টিক টিক করে উঠলো। মেঘ চোখ ঘুরিয়ে ঘড়ির দিকে তাকাতেই দেখলো ঘন্টার কাটা ঠিক ১১ টায়। মেঘ এক লাফে শুয়া থেকে উঠে আগপাছ না ভেবেই বিছানা থেকে নেমে ছুটতে শুরু করল। মাথা ঘুরছে, চোখ অন্ধকার হয়ে আসছে তবুও মেঘ থামছে না। রুম থেকে বেড়িয়ে বেলকনি পেরিয়ে আবিরের রুমের সামনে এসে

থমকে দাঁড়ালো, রুমের দরজা আটকানো, দরজার বাহিরে জ্বলজ্বল করছে একটা সিলভার রঙের তালা। মেঘ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বুকে হাত রেখে এক পা এক পা করে পেছাতে শুরু করলো, দু চোখ ছলছল করছে। সদ্য ঘুম ভাঙায় ঠিকমতো তাকাতে পারছে না। আচমকা আবারও ছুটতে শুরু করেছে, পাবে না জেনেও তানভির, মীম সহ নিচের প্রতিটা রুমে আবিরকে খোঁজছে। এমনকি বাড়ির মেইন গেইট পর্যন্ত ছুটে গেছে। বাসায় তেমন কোনো মানুষ ই নেই। মীম, আদি স্কুলে, তানভির নিজের কাজে ব্যস্ত, মোজাম্মেল খানরা অফিসে। হালিমা খান আর মালিহা খান ডাক্তারের কাছে গেছেন, আকলিমা খান নিজের রুমে ঘুমাচ্ছেন। মেঘ মেইনগেইট থেকে এক দৌড়ে ছাদে গিয়ে সোফার কাছে গিয়ে থামলো। গতরাতে যে সোফায় আবিরের কোলে মাথা রেখে শুয়েছিলো সেই সোফার সামনে ফ্লোরে বসে হাউমাউ করে কান্না শুরু করেছে। সূর্যের প্রখর আলো মাথার উপরে চলে এসেছে। গতকালের রেশ টায় ঠিকমতো কাটে নি তারমধ্যে আজও তাই করছে। মেঘকে থামানোর জন্য আবির, তানভির, মীম কেউই আজ উপস্থিত নেই। মেঘ চিৎকার করে কাঁদছে, কাঁদতে কাঁদতে বার বার দম আঁটকে যাচ্ছে তবুও থামছে না। রোদের তাপে সারাশরীর ঘেমে একাকার অবস্থা তারউপর চুল ছড়িয়ে বসে আছে। ঘন্টাদুয়েক পর মেঘ আবারও দৌড়ে রুমে গেছে, রুমে ঢুকতেই চোখ পরে টেবিলের উপর একটা চিরকুটে। চিরকুটে ছোট করে লেখা, ” ভোরের স্বপ্নের মতোই সত্যি হয়ে ফিরবো কোনো এক অবসন্ন

অপরাহ্নে। অপেক্ষায় থেকো, My Dear Sparrow. ” ওয়ারড্রব থেকে আবিরের সেই সাদা শার্টটা বের করে চিরকুট হাতে ধপ করে ফ্লোরে বসে দুহাতে শার্ট জড়িয়ে ধরে আবারও কাঁদতে শুরু করেছে। গতরাতে আবিরের এতকরে বুঝানো সব কথা ভুলে গগন কাঁপানো কান্নায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। ২ টার দিকে তানভির বাসায় আসছে, কাকিয়াকে জিজ্ঞেস করে সরাসরি রান্নাঘর থেকে খাবার নিয়ে মেঘের রুমের সামনে হাজির হয়েছে। দরজায় ডাকতেই মেঘ আবিরের শার্টটা বালিশের নিচে লুকিয়ে চোখেমুখে পানি দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে ব্রাশ হাতে নিয়ে দরজা খুলে দিল। তানভির ভ্রু কুঁচকে গম্ভীর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, “মাত্র উঠছিস?” “হ্যাঁ।” “ঠিক আছে।ফ্রেশ হয়ে আয়।” মেঘ হাত মুখ ধৌয়ে আসতেই তানভির ভাতের প্লেট এগিয়ে দিয়ে বলল, “খেয়ে নে।” “খিদে নেই। পরে খাবো।” তানভির চোখ গোল গোল করে তাকাতেই মেঘ চিবুক নামিয়ে ফেলেছে। তানভির শক্ত গলায় আবারও বলল, “তোর মুখে না শুনতে সব কাজ ফেলে বাসায় আসি নি আমি। দেখি হা কর।” খাওয়ানো শেষে যাওয়ার সময় মেঘ উদ্বিগ্ন কণ্ঠে শুধালো, “আবির ভাই কখন গেছেন?” “সকালে। ” মেঘ স্তব্ধ হয়ে বসে আছে, তানভির চলে গেছে। মেঘ কিছুক্ষণ বসে থেকে দরজা বন্ধ করে বালিশের নিচ থেকে আবিরের শার্ট বের করে আবারও কান্না শুরু করেছে। মীম স্কুল থেকে ফিরেই মেঘেকে দেখতে আসছে। মেঘ তখনও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। প্রচন্ড মাথা ব্যথায় মেঘের চেহারা ঘুটঘুটে অন্ধকার হয়ে গেছে, চোখ মেলে ঠিকমতো তাকাতেও পারছে

না। মীমকে জড়িয়ে ধরে আবারও কাঁদতে শুরু করেছে। সেই ১১ টা থেকে চলছে মেঘের নিরবধি কান্না। কখনো বেশি কখনো বা কম। ঘড়ির কাটা থমকে আছে সূর্যাস্তের পূর্ব মুহুর্তে। কিছু অনুভূতিহীন শব্দ এখনও বুকের ভেতর চাপা পড়ে আছে। যা কান্না রূপে প্রতিনিয়ত বুক খুঁড়ে বেরিয়ে আসছে। বেলকনির দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে নিরেট দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে দূর আকাশের পানে। দু চোখ রক্তাভ হয়ে আছে, শরীরের ভেতরে ধীরে ধীরে বাসা বাঁধছে এক অজ্ঞাত অতুষ্টি। গত কাল থেকে আজ অব্দি যে ঝড় মেঘের মনের উপর দিয়ে চলছে তার কোনো অন্ত নেই। রাত পেরিয়ে সকাল হয়ে গেছে। আবির ঠিকঠাক মতো পৌছেই মেসেজ করে জানিয়েছে। গভীর রাত ছিল বলে কাউকে কল দেয় নি। সকাল দিকে একের পর এক কল দিচ্ছে কিন্তু বাসার কেউ কল রিসিভ করছে না, এমনকি তানভিরও কল রিসিভ করছে না। কিছুক্ষণের মধ্যেই আবিরের শরীর ঘামতে শুরু করেছে। বুকের ভেতর অজানা ভয় কাজ করছে। আগপাছ না ভেবেই কল দিলো আলী আহমদ খানের নাম্বারে। আলী আহমদ খান কল রিসিভ করে শান্ত স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, ” কখন পৌঁছালে? সবকিছু ঠিকঠাক আছে? তুমি সুস্থ আছো?” ” রাতে আসছি। জ্বি আলহামদুলিল্লাহ। কিন্তু বাসার কেউ আমার কল রিসিভ করছে না কেনো? ” আলী আহমদ খান গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দিলেন, “বাসায় কেউ না থাকলে কল রিসিভ করবে কিভাবে?” “কোথায় গেছে সবাই?” “হাসপাতালে। ” আবির উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলল, “কেনো? কার কি হয়ছে?” আলী আহমদ উদাস

ভঙ্গিতে বললেন, “গতকাল রাত থেকে মেঘ মামনির জ্বর, মাথা ব্যথা। একপর্যায়ে প্রচন্ড শ্বাসকষ্ট শুরু হয়েছে তাই বাধ্য হয়ে রাত ২ টার দিকে হাসপাতালে নিয়ে গেছে। বাসার সবাই এখনও হাসপাতালেই। ” অভিশঙ্কায় আবিরের আঁখি যুগল রক্তাভ হয়ে উঠেছে, উদ্বিগ্ন আদল বদলে মুহুর্তেই রুদ্রমূর্তি ধারণ করেছে। বুকের ভেতর অবস্থিত হৃদপিণ্ডটা ভয়ঙ্কর রকমে কাঁপছে। কপাল গুটিয়ে রুমের ছাদের দিকে তাকিয়ে সবটুকু শক্তি দিয়ে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়লো, আবিরের অক্ষিপট ভিজে আসছে। আলী আহমদ খান কোমল কণ্ঠে বললেন, ” আমি আসার সময় দেখে আসছি ঘুমাচ্ছে। তুমি বরং তানভিরকে কল দাও। ” আবির আস্তে করে গলা খাঁকারি দিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে বলল, ” ঠিক আছে, রাখছি। ” আবির কল কেটে সঙ্গে সঙ্গে তানভিরের নাম্বারে কল দিলো। আগেও বেশ কয়েকবার দিয়েছে কিন্তু তানভির কল রিসিভ করে নি। ভেতরের ক্রোধ আবিরের তামাটে চেহারায় স্পষ্ট ভেসে উঠছে। তিনবারের মাথায় তানভির কল রিসিভ করলো। তানভির কিছু বলার আগেই আবির রাগান্বিত কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল, ” তোরা দুই ভাই বোন কি শুরু করছিস?” আবিরের রাগান্বিত কন্ঠ শুনেই তানভিরের অন্তরাত্মা শুকিয়ে যাচ্ছে, ঢোক গিলে ভীতু গলায় বলল, ” সরি ভাইয়া, একটু ব্যস্ত ছিলাম। ” আবির পূর্বের ন্যায় আবারও বলে উঠল, ” কিসের ব্যস্ততা দেখাচ্ছিস? তোর বোন হাসপাতালে ভর্তি এটা আমাকে জানানোর মতো সময় তোর নেই? এত ব্যস্ততা তোর?” তানভির ব্যস্ত ভঙ্গিতে জানতে চাইল, ” তোমাকে

কে বলছে?” আবির ক্রোধে ফুঁসে উঠলো। বিরক্তি নিয়ে বলল, ” বাহ! তারমানে তুই আমাকে জানাতেই চাইছিলি না?” তানভির আমতা আমতা করে বলতে শুরু করল, “বিষয়টা এমন না। তুমি এতটা জার্নি করে গেলে ঐ অবস্থায় রাতে তোমাকে জানালে তুমি শুধু শুধু দুশ্চিন্তা করতে সেজন্য বলি নি।” আবির গম্ভীর স্বরে বলল, “ওহ আচ্ছা। তোর বোন অসুস্থ এমনকি হাসপাতালে ভর্তি এটা আমার জন্য খামাকা দুশ্চিন্তার বিষয়? খুব ভালো বলছিস।” তানভির খুব শান্ত গলায় বলল, “ভাইয়া প্লিজ তুমি মাথাটা ঠান্ডা করো। বনুর শ্বাসকষ্ট এখন অনেকটায় কমেছে। মানসিক প্রেশার আর অতিরিক্ত কান্নাকাটি করায় এমনটা হয়েছে। ডাক্তার বলেছেন সিরিয়াস কিছু না তবে..” আবির হুঙ্কার দিয়ে উঠল, “তবে কি?” “ডাক্তার আশঙ্কা করছেন, এভাবে চলতে থাকলে বড় কোনো রোগের সম্ভাবনা আছে।” আবির দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে রাশভারি কণ্ঠে বলে উঠল, ” তোরা দুই ভাই বোন মিলে আমায় খু*ন করে ফেললে আজ এই দিনটা দেখতে হতো না। তোর বোনকে এতটা সময় নিয়ে বুঝিয়েছি, বার বার ওয়ার্নিং দিয়েছি অথচ তোর বোন আমার কথার কি প্রতিদান দিলো? আসার আগে তোকে ১০০ বার বলেছি ও কে একা ছাড়িস না, ছাড়িস না তারপরও তুই একা ছেড়ে দিলি। আব্বু, চাচ্চুর মতো তোরাও প্রমাণ করে দিলি আমি মানুষটা অপচিত আর আমার অভীপ্সাগুলো বড্ড ঠুনকো। তোদের আচরণে নিজেকে আজ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ অপকৃষ্ট মানব মনে হচ্ছে। যেখানে সামান্যতম মূল্য আমার নেই সেখানে কথা বলা আমার শোভা পায় না।

ভালো থাকিস আর তোর বোনকে যত্নে রাখিস। আল্লাহ হাফেজ। ”
এক আকাশ সম অভিমান নিয়ে আবির কথাগুলো বলেছে। তানভির কিছু বলার আগেই আবির কল কেটে দিয়েছে। কল ব্যাক করতে করতে আবির ফোন বন্ধ করে ফেলেছে। এদিকে মেঘের শরীরের অবস্থা এখনও অনেকটায় খারাপ। আবির যাতে দুশ্চিন্তা না করে তারজন্য তানভির ইচ্ছেকৃত কোনোকিছু বলতে চাই নি অথচ তাই হলো। আবির, মেঘ আর তানভির দুজনকেই ভুল বুঝে কল কেটে দিয়েছে। মেঘের এই সমস্যা ছোট থেকেই ছিল, বাসায় কোনো বিষয়ে খুব বেশি বকা খাওয়া,কিংবা পরীক্ষায় রেজাল্ট খারাপ হওয়া, ছোটবেলা আবিরের হাতে থাপ্পড় খাওয়ার পর সপ্তাহ খানেক জ্বরে ভোগা এগুলো হরহামেশায় হয়ে থাকে কিন্তু ইদানীং তারসাথে যোগ হচ্ছে শ্বাসকষ্ট নামক এক গুরুতর সমস্যা। আবির কাছ থেকে রিয়াকে না দেখলেও রাকিবের মুখে বরাবরই রিয়ার অসুস্থতার কথা শুনে এসেছে। সেই আতঙ্কে মেঘকে সবসময় দূরে দূরে রাখতে চেয়েছে। কিন্তু মেঘের অপরিমেয় আত্ততা আর অনুরাগে ধীরে ধীরে নিজেকে জাহির করতে বাধ্য হয়েছে। যার ফলশ্রুতিতে আজ এই দিনটার মুখোমুখি হতে হয়েছে। তানভির রুমে এসে মেঘের পাশে একটা চেয়ারে বসে অনুষ্ণ দৃষ্টিতে মেঘের ঘুমন্ত আদলে চেয়ে আছে। হালিমা খান মেঘের মাথায় অনবরত জলপট্টি দিচ্ছেন, মুখে অক্সিজেন মাস্ক লাগানো। মালিহা খান হাতে পায়ে মালিশ করছেন। মোজাম্মেল খান কাছেই একটা চেয়ারে চুপচাপ বসে আছেন। তানভির মেঘের দিকে তাকিয়ে থেকেই মনে

মনে বলল, ” চোখের সামনে বোনের স্বপ্নময় জীবনটাকে প্রতিনিয়ত ধ্বংস হতে দেখছি, হাসির আড়ালে কষ্ট লুকাতে দেখছি। এ অবস্থায় আমি তাকে ঠিক কি বলে সান্ত্বনা দিতাম? মুখের উপর ধমক দিতে গেলে আগে নিজের কলিজায় আঘাত লাগে। আমি তো সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি কিন্তু তবুও ঠিক রাখতে পারি নি। আমি সত্যিই দুঃখিত ভাইয়া। ” তানভির চেয়ারে বসে আবিরকে একের পর এক মেসেজ দিচ্ছে। বিস্তারিত সব ঘটনা বলেছে কিন্তু আবিরের কোনো রেসপন্স নেই। মোজাম্মেল খান তানভিরকে উদ্দেশ্য করে হঠাৎ ই তপ্ত স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, “আবিরের সাথে কথা হয়েছে? ও কি ঠিকমতো পৌঁছেছে? ” তানভির মাথা নিচু করে ধীর কণ্ঠে বলল, “হ্যাঁ।” “মেঘের অসুস্থতার কথা জানিয়ে দিয়েছো?” তানভির ভারী কণ্ঠ জবাব দিল, ” আমি জানায় নি তবে হয়তো বড় আব্বু জানিয়েছে।” মোজাম্মেল খান কপাল গুটিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, ” ভাইজানের কি দরকার ছিল ছেলেটাকে জানানোর? শুধু শুধু দুশ্চিন্তা করবে।” আব্বুর চিন্তাভাবনার সাথে তানভিরের চিন্তাভাবনা মিলে গেছে দেখে তানভির মাথা নিচু রেখেই নিঃশব্দে হাসলো। এক সায়াহ্নে মেঘ বেলকনিতে দাঁড়িয়ে বিষন্ন চিত্তে দূরের একটা ল্যামপোস্টের ক্ষুদ্র পরিসরের আলোর পানে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে, এক সেকেন্ডের জন্য পলক ফেলতেও বেমালুম ভুলে গেছে। পাঁচ দিনের প্রখর অসুস্থতা অবসহন করে আজ মেঘের শরীরের অবস্থা কিছুটা ভালো হয়েছে তবে মনের অবস্থা এখনও দূর্বিষহ। এই পাঁচদিনে জ্বরের ঘোরে দুনিয়াবি কোনো হদিস

ছিল না মেঘের। আজ সন্ধ্যের আগে আগে বিছানা থেকে উঠে বেলকনিতে এসে দাঁড়িয়েছে। গত পাঁচদিনে না দেখেছে সূর্য উদয় আর না সূর্যাস্ত। আবির বাড়ি নেই ৬ দিন হলো, এরমধ্যে আবিরের কণ্ঠস্বর পর্যন্ত শুনে নি। দীর্ঘ সময়ের ঘোর কাটিয়ে ক্লান্ত শরীর নিয়ে গুটিগুটি পায়ে রুমে গেল। টেবিলের উপর ফোনটা বন্ধ অবস্থায় পড়ে আছে। মেঘ ফোনটা চার্জে দিয়ে আবারও শুয়েছে। কিছুক্ষণ পরেই হালিমা খান রুমে আসছেন ওনার খানিক বাদে মোজাম্মেল খানও মেয়ের পছন্দ মতো বেশকিছু খাবার নিয়ে আসছেন। মেঘ মোটামুটি সুস্থ হয়েছে শুনে একে একে সবাই রুমে হাজির হয়েছে। সবার দৃষ্টি এক মেঘেতে স্থির হয়ে আছে। ইদানীং তানভিরও বেশিরভাগ সময় বাসায় থাকার চেষ্টা করে। মোজাম্মেল খান আহ্লাদী কণ্ঠে মেয়েকে একের পর এক খাবার সাধছেন। আলী আহমদ খান টুকিটাকি কথা বলছেন ওনাদের সঙ্গে মালিহা খানও এটা সেটা বলছেন। হালিমা খান মেঘের মাথার পাশে বসে চুপচাপ মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। তানভির দরজার পাশে দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। গত কয়েকদিনে আবিরের মাথা ঠান্ডা করতে তানভির সহ রাকিব, রাসেল, লিমনরা সবাই যতটা সম্ভব চেষ্টা করছে। কিন্তু আবিরের রাগ কমার বদলে উল্টো বেড়েই চলেছে। তাদের একের পর এক আহ্লাদী কথা শুনে মেঘ মুগ্ধ নয়নে তাকিয়ে আছে। পুরো রাজ্যের কথার ভিড়ে কারো মুখে একবারের জন্যও আবিরের নামটা উঠছে না। মেঘ সবাইকে এক নজর দেখে মলিন হেসে মনে মনে আওড়াল, “ওরা এ

মন কেমন বুঝে না, ওরা আসল কারণ খোঁজে না।” মেঘের দু-চোখ ছলছল করছে, চোখের কার্নিশ ঘেঁষে এক ফোঁটা অশ্রু কানের লতি পেরিয়ে গেছে। হালিমা খান উদ্বিগ্ন কণ্ঠে শুধালো, ” কাঁদছিস কেনো? ” মেঘ দুই আঙুলে চোখের পাশের পানির দাগ মুছে একগাল হেসে বলল, “কই? কাঁদছি না তো!” সবাই সবার মতো চলে গেছে। হালিমা খান মেঘের পাশে বসে আছেন, তানভির একটু পর পর এসে দেখে যাচ্ছে। চার্জ থেকে ফোন খুলে মেঘ ফোন ওপেন করল। হালিমা খান তখনও মেয়ের পাশেই বসা। মেঘ একে একে কল লিস্ট, সোশ্যাল মিডিয়া সব চেক করলো কিন্তু কোথাও আবিরের কোনো মেসেজ নেই। এমনকি আবির কোথাও সক্রিয়ও নেই। এক রাশ আশা নিয়ে মেঘ ফোনটা হাতে নিয়েছিল অথচ রেখেছে এক রাশ হতাশা নিয়ে। বুকের ভেতর ছোটাছুটি করা অদৃষ্ট অনুভূতিরা প্রতিনিয়ত কোমল হৃদয়ে তীরের ন্যায় আঘাত করছে, তীব্র অভিঘাত সহ্য করতে না পেরে মেঘ মায়ের কোলে মাথা রেখে নিঃশব্দে কাঁদতে শুরু করেছে। পাঁচ মিনিট পরেই মোজাম্মেল খান হাতে ফোন নিয়ে রুমে আসছেন।ফোনটা হালিমা খানের হাতে দিয়ে স্বাভাবিক কণ্ঠে বললেন, “আবিরের সাথে কথা বলো।” হালিমা খান ফোন কানে নিতেই ওপাশ থেকে আবিরের কণ্ঠস্বর কানে বাজলো, “আসসালামু আলাইকুম। ” আবিরের কণ্ঠ শুনামাত্র মেঘ চোখ মেলে আম্মুর মুখের দিকে তাকালো। হালিমা খান শীতল কণ্ঠে বললেন, “ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছিস?” “আলহামদুলিল্লাহ ভালো। তোমরা কেমন আছো?” “আমরা

আর কেমন থাকবো, ৫ দিন পর আজকে মেঘের একটু হুঁশ আসছে। এই মেয়েকে নিয়ে কি করবো না করবো কিছুই বুঝতে পারছি না। তোর কি অবস্থা?তোকে কল দিলে পাওয়া যায় না। ওখানে গিয়ে আমাদের কথা মনেই পড়ে না নাকি?" আবির মৃদুস্বরে বলল, " সবকিছু গুছাতে একটু সময় লাগছে।" মেঘের ভেজা চোখের নিরেট দৃষ্টি দেখে হালিমা খান মোলায়েম কণ্ঠে বললেন, " মেঘের সাথে কথা বলবি? ফোন দিব ও কে?" আবির ভারী কণ্ঠে বলল, " এখন একটু ব্যস্ত আছি, পরে কথা বলবো। রাখছি, আল্লাহ হাফেজ। " আবির সঙ্গে সঙ্গে কল কেটে দিয়েছে। মেঘ অবাক লোচনে আম্মুর মুখের পানে চেয়ে আছে। মোজাম্মেল খান স্বাভাবিক কণ্ঠে বললেন, "মেয়েকে খাইয়ে দাও। ঔষধ খাওয়াতে হবে তো!" হালিমা খান খাবার আনতে নিচে গেছেন। এই সুযোগে মেঘ ফোন হাতে নিয়ে আবিরের নাম্বারে কল দিল। একবার দু'বার নয় টানা ৬ বার কল দিয়েছে অথচ কল রিসিভ হচ্ছে না। আজ পর্যন্ত এমন ঘটনা কখনো হয় নি। আবিরের ফোন খোলা থাকলে আর ফোনের কাছে থাকলে মেঘের কল কখনো মিস হয় না অথচ আজই তার ব্যতিক্রম ঘটছে। মেঘের বুকের ভেতর অজানা ভয় হানা দিচ্ছে। একটু পরেই বন্যা কল দিলো। বন্যার সাথে ২-৩ মিনিট কথা বলেছে এরমধ্যে হালিমা খান খাবার নিয়ে চলে আসছেন। হালিমা খান স্বাভাবিক কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, "কে কল দিয়েছে?" "বন্যা।" "ওহ। মেয়েটা ঐদিন তোকে দেখতে হাসপাতালে গিয়েছিল কিন্তু তোর অবস্থা খারাপ ছিল তাই হয়তো বুঝতেই পারিস

নি।” মেঘ উদাস ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল, “বন্যা হাসপাতালে গেছিলো?” “হ্যাঁ।” মেঘ আস্তে করে বলল, “ওহ।” মেঘ রাতে ঘুমানোর আগ পর্যন্ত বেশ কয়েকবার আবিরকে কল দিয়েছে। অনেকগুলো মেসেজও দিয়েছে কিন্তু আবির মেসেজ, কল কোনো কিছুতেই রেসপন্স করছে না। বন্যা ভার্সিটি থেকে বাসায় গিয়ে ফ্রেশ হয়ে অল্প খেয়েই মেঘকে দেখার জন্য বাসায় আসছে। মূলত তামিম, মিষ্টিরা সবার ই আসার কথা ছিল কিন্তু তানভিরের ভয়ে ওরা আর সাহস করতে পারে নি। বন্যা কিছু ফল আর মেঘের পছন্দের টুকিটাকি জিনিসপত্র নিয়ে আসছে। আজ তানভির আগে থেকেই বাসায় ছিল, বন্যাকে ঢুকতে দেখেই সোফা থেকে উঠে এগিয়ে গেলো। বন্যা শান্ত স্বরে সালাম দিয়ে জিজ্ঞেস করল, “মেঘ কোথায়?” তানভির সালামের উত্তর দিয়ে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল। বন্যা উপরে চলে গেছে। বাসায় আজ তেমন মানুষজন নেই। আকলিমা খান মীম আর আদিকে নিয়ে ওনার এক আত্মীয়ের বাসায় বেড়াতে গেছেন। দুপুরের পর হওয়ায় হালিমা খান ও মালিহা খান দু’জনেই ঘুমে। তানভির কিছুক্ষণ সোফায় বসে হঠাৎ উঠে রান্না ঘরে চলে গেছে। চা, নুডলস সাথে ফল কেটে প্লেটে সাজিয়ে নিয়েছে। মেঘের রুমের সামনে এসে গলা খাঁকারি দিয়ে বলল, “আসবো?” “আসো।” তানভিরের হাতে নাস্তা দেখে মেঘ আহাম্মকের মতো তাকিয়ে আছে। বন্যা চেয়ার থেকে উঠে হাত বাড়িয়ে একটা ট্রে নিয়ে টেবিলের উপর রাখলো। আরেকটা তানভির নিজে ই রেখেছে। মেঘ আশ্চর্যান্বিত নয়নে তাকিয়ে শুধালো,

“নাস্তা তুমি নিয়ে আসছো?” তানভির আস্তে করে বলল, “হ্যাঁ” মেঘ দু চোখ প্রশস্ত করে জানতে চাইলো, “সত্যি?” তানভির ভ্রু কুঁচকে কিছুটা ভারী কণ্ঠে বলল, “জ্বি।” বন্যাও কপাল গুটিয়ে তাকিয়ে আছে। মেঘ আস্তে করে জিজ্ঞেস করল, “আম্মু কোথায়?” “আম্মু, বড় আম্মু ঘুমাচ্ছেন তাই ডাকি নি।” তানভির চায়ের কাপ বন্যার দিকে এগিয়ে দিয়ে চাপা স্বরে জিজ্ঞেস করল, “চিনি হয়েছে কি না দেখো। ” বন্যা চায়ে চুমুক দিতে দিতে মেঘ বলে উঠল, “বন্যা চায়ে চিনি বেশি খায়।” তানভির মুখের উপর জবাব দিল, “জানি।” বলেই তানভির থতমত খেয়ে উঠল। বন্যা মৃদু হেসে বলল, “চিনি ঠিক আছে, ধন্যবাদ।” মেঘ তানভিরের দিকে সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। বন্যার সামনে কিছু জিজ্ঞেস করবে কি না তাই ভাবছে। তানভির মেঘের নজর খেয়াল করে ধীর কণ্ঠে বলল, ” আমি আসি, নাস্তা ভালো না লাগলে আমার কিছু করার নেই। আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত। আম্মু উঠলে আবার নাস্তা পাঠাবো নে।” তানভির তড়িঘড়ি করে রুম থেকে বেড়িয়ে গেছে। মেঘ তখনও সন্দেহের দৃষ্টিতে দরজার পানে তাকিয়ে আছে। বন্যা কপাল গুটিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, “তোর ভাই রান্নাও পারে?” মেঘের ঠোঁট জুড়ে মুচকি হাসি। মাথা দুলিয়ে মেকি স্বরে বলল, “নুডলস আর চা টায় কোনোরকমে করতে পারে।” বন্যা মৃদু হেসে স্বাভাবিক কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, “আবির ভাইয়ার সাথে কথা হয়েছে তোর?” “নাহ।” “কেনো?” “ওনি আমার কল রিসিভ করেন না। গতকাল আব্বু- আম্মুর সাথে কথা বলেছে।আম্মু আমাকে ফোন দিতেও

চাইছিলো কিন্তু ওনি কথা বলেন নি। " বন্যা তপ্ত স্বরে বলল, "ওনার সমস্যা কি?" " আমাকে ওয়ার্নিং দিয়েছিল আমি যেন ইচ্ছেকৃত নিজের ক্ষতি না করি। হয়তো সেজন্যই রাগ করে কথা বলছেন না। " বন্যা গম্ভীর কণ্ঠে বলল, " ভালো হয়েছে। তোর সাথে এমন করায় উচিত। " মেঘ মন খারাপ করে বলল, "তুই আমাকে এভাবে বলতে পারলি?" "তো কিভাবে বলবো, আগে ওনি পাত্তাই দিতো না তবুও ওনার পেছন পেছন ঘুরতি অথচ এখন ওনি তোকে প্রাধান্য দিচ্ছে তবুও তুই অনিয়ম করছিস। " মেঘ জিভ দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে শীতল কণ্ঠে বলল, "আবির ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে আমার মনের ভেতর যেই ঝড় চলছে তা আমি তোকে কিভাবে বুঝাবো। মাথায় ২৪ ঘন্টা একটা অজ্ঞাত শঙ্কা ঘুরঘুর করছে। আমি কেনো ভাবেই শান্ত থাকতে পারছি না। " বন্যা ঘন্টাদুয়েক মেঘের সাথে গল্প করেছে। এরমধ্যে মিষ্টিরাও বন্যার ফোনে ভিডিও কল দিয়ে মেঘের সাথে কথা বলেছে। কিছুক্ষণ পর হালিমা খান আবারও নাস্তা নিয়ে আসছেন। বন্যা বিপুল চোখে তাকিয়ে ধীর কণ্ঠে বলল, "আন্টি, আমি নাস্তা খেয়েছি। আপনি প্লিজ এগুলো নিয়ে যান।" হালিমা খান শক্ত কণ্ঠে বললেন, "তানভির হাবিজাবি কি দিছে ঐগুলা খাইছো? নাও এগুলো খাও।" বন্যা অনুষ্ণ কণ্ঠে বলল, " ওনার রান্না খারাপ হয় নি।" মেঘ আহ্লাদী কণ্ঠে বলল, " আম্মু, ভাইয়া যেহেতু রান্না পারে চলো ভাইয়াকে বিয়ে দিয়ে দেয়।" হালিমা খান প্রখর তপ্ত স্বরে বললেন, "এই বাড়িতে বিয়ের নাম ভুলেও মুখে নিবি না। " মেঘ ভ্রু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, "কেনো?" "এমনি।"

হালিমা খান চলে গেছেন। বন্যা আরও কিছুক্ষণ বসে চলে যাওয়ার জন্য নিচে নামতেই মোজাম্মেল খানের সাথে দেখা। বন্যা ওনাকে দেখেই সালাম দিলো। মোজাম্মেল খান মিষ্টি করে হেসে সালামের উত্তর দিয়ে বললেন, "বাসায় চলে যাচ্ছো?" "জ্বি আংকেল।" "সন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে, একা কিভাবে যাবে?" "যেতে পারবো। সন্ধ্যার আগেই পৌঁছে যাব। সমস্যা নেই।" মোজাম্মেল খান গুরুভার কণ্ঠে বললেন, " সমস্যা আছে। মেঘ যেমন আমার মেয়ে তুমিও আমার মেয়ের মতো। এই সন্ধ্যে বেলা আমি আমার মেয়েকে যেমন একা ছাড়তে পারবো না তেমনি তোমাকেও একা ছাড়তে পারবো না।" মোজাম্মেল খান উচ্চস্বরে ডাকলেন, "তানভির" বন্যা খানিকটা ইতস্ততবোধ করছে। তানভির নিজের রুম থেকে বেড়িয়ে স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, "জ্বি আব্বু। " "বন্যাকে ওদের বাসা পর্যন্ত দিয়ে আসো।" তানভির আশ্চর্য নয়নে তাকিয়ে শুকনো গলায় ঢোক গিলল। মোজাম্মেল খান আবারও বললেন, "নিয়ে যাবে কি না?" তানভির স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, "চাবি টা নিয়ে আসি।"মোজাম্মেল খান গুরুগম্ভীর কণ্ঠে বলে উঠলেন, "বাইক নিতে হবে না। তোমাকে আমি একটুও বিশ্বাস করি না। এক্সিডেন্ট করবা একা করো, আমার কোনো আপত্তি নেই কিন্তু তোমার অসাবধানতার জন্য অন্য কারো হাত-পা ভা*ঙবে এসব আমি সহ্য করব না। গাড়ি নিয়ে যাও।" মোজাম্মেল খানের কথা শুনে বন্যা না চাইতেও হেসে ফেলল। তানভির ভ্রু গুটিয়ে চাবি আনতে চলে গেছে। মোজাম্মেল খান বন্যার দিকে তাকিয়ে চাপা স্বরে বললেন, "তুমি কিছু

মনে করো না, আমাদের বাবা ছেলের সম্পর্কটাই এমন। এখন কিছু না বললে ওর বেপরোয়া স্বভাব কখনো ঠিক হবে না।” বন্যা মৃদু হেসে বলল, “আমি কিছু মনে করি নি আংকেল।” “ঠিক আছে। সময় করে মাঝে মাঝে বেড়াতে এসো।” “জ্বি আচ্ছা আংকেল।” বন্যা তানভিরের পিছন পিছন বাসা থেকে বেড়িয়ে ধীর কণ্ঠে বলল, “আমি গাড়িতে যাব না।” তানভির স্বাভাবিক কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, “বাইকে যাবে?” “নাহ।” “তো?” “আমি রিক্সায় চলে যেতে পারবো আপনার যেতে হবে না।” তানভির মুখ ফুলিয়ে শ্বাস ছেড়ে গম্ভীর কণ্ঠে বলল, “তোমাকে বাসায় পৌঁছে দেয়া আমার দায়িত্ব আর সেই দায়িত্ব টা স্বয়ং মোজাম্মেল খান আমাকে দিয়েছেন। ওনার কথা অমান্য করলে আমাকে বাসায় জায়গা দিবেন না। তুমি কি তাই চাও?” বন্যা তৎক্ষনাৎ উত্তর দিল, “না, আমার জন্য আপনার কোনো সমস্যা হোক তা আমি কখনোই চাইবো না। কিন্তু....” “কোনো কিন্তু নেই। তুমি রিক্সায় যেতে চাইলে তাই যাব। চলো।” “আংকেল যে গাড়ি নিতে বললো..” “তোমার আংকেল নিশ্চয় এও বলছেন, আমি দায়িত্বজ্ঞানহীন, বেপরোয়া স্বভাবের ছেলে। গাড়ি না নেয়ার অপরাধে না হয় ২-১ টা বকা খেয়ে নিবো।” বন্যা আড়চোখে তানভিরের দিকে তাকিয়ে মলিন হেসে বলল, “সব বুঝেন তাহলে বেপরোয়া চলাফেরা কেনো করেন?” তানভির উত্তর না দিয়ে উল্টো প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলো, “আব্বুর মতো তোমারও কি তাই মনে হয়?” তানভির সামনে চলে গেছে। বন্যা অবাক লোচনে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো। কি বলবে তার উত্তর খোঁজে

পেল না, খানিক বাদে মেইনগেইটের দিকে এগিয়ে গেল। প্রথমবারের মতো এক রিক্সায় দুজন পাশাপাশি বসেছে। স্বভাবতই বন্যা এক সাইড হয়ে বসেছে তবুও চলন্ত রিক্সায় তানভিরের শক্তপোক্ত বাহু বারবার বন্যার কাঁধের সাথে ধাক্কা খাচ্ছে। আচমকা বন্যার হৃদয়ে তোলপাড় শুরু হয়ে গেছে। শুকনো গলায় বার বার ঢোক গিলছে, নিজেকে যতটা সম্ভব এক পাশে সরিয়ে নিচ্ছে যেনো কোনোভাবেই তানভিরের সঙ্গে ধাক্কা না খায়। বন্যা ভেতরে ভেতরে নিজের প্রতি ক্ষুব্ধ হচ্ছে, ভেবেছিল রিক্সায় একা চলে যাবে তাহলে বাইক, গাড়ির ঝামেলাও পোহাতে হবে না। গাড়িতে চলাচল করতে বন্যার একদম ই ভালো লাগে না। তারউপর মাঝেমধ্যে গলির রাস্তায় গাড়ি থেকে নামলে আশেপাশের মানুষজন কেমন করে চেয়ে থাকে, নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করে এগুলো বন্যার সহ্য হয় না তাই সবসময় সাদামাটা চলতেই পছন্দ করে। বন্যার অস্বাভাবিক কর্মকাণ্ড দেখে তানভির আচমকা নিজের হাত বন্যার পেছন দিকে ঘুরিয়ে বন্যার কাঁধ বরাবর রিক্সাতে রেখেছে। একবার তানভিরের হাতের স্পর্শ অনুভব হওয়ামাত্র বন্যা সঙ্গে সঙ্গে তানভিরের হাতের দিকে তাকিয়ে কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে বলল, “হাতটা সরান, প্লিজ।” তানভির স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বলল, “যেভাবে সাইডে যাচ্ছ, কখন জানি রিক্সা থেকে পরে যাও। আমার আব্বাজান বাইক আনতে নিষেধ করেছেন যাতে তুমি ব্যথা না পাও সেখানে রিক্সা থেকে পরে যদি ব্যথা পাও, আব্বু কি আমাকে আস্ত রাখবেন? তুমিই বলো।” বন্যা পূর্বের ন্যায় আবারও বলল, “আমি

পড়বো না, প্লিজ হাতটা সরান। আমার অস্বস্তি লাগছে।” তানভির উদাস ভঙ্গিতে বলল, “আমার পাশে বসে কেউ এমন আচরণ করলে আমারও অস্বস্তি লাগে।” মেঘের মতো তানভিরও খুব জেদী এটা বন্যার অজানা নয়। তানভির হাত সরাবে না এটা বুঝতে পেরে বন্যা দুহাতে নিজের ব্যাগটাকে শক্ত করে ধরে গুটিশুটি মেরে বসে বুকের বা পাশে অবস্থিত হৃদপিণ্ডের ধুকপুকানি অনুভব করছে। ইদানীং বন্যার মাথায় হুটহাট তানভিরের চিন্তা চলে আসে। বিশেষ করে তানভিরের জীবন কাহিনী শুনার পর থেকে বন্যা মাঝে মাঝেই সেই ভাবনায় মগ্ন থাকে। না চাইতেও তানভিরের প্রতি অন্যরকম অনুভূতি কাজ করে। তানভির সামনে আসলে নিজের অজান্তেই সেই অবিদিত অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ ঘটতে থাকে। বন্যা বার বার ঘড়ি দেখছে আর রাস্তা কতদূর বুঝার চেষ্টা করছে। তানভির কপাল গুটিয়ে বন্যার দিকে তাকিয়ে আছে। তানভির আচমকা মৃদুস্বরে ডাকল, “বন্যা।” বন্যা তৎক্ষনাৎ চোখ বড় করে তানভিরের দিকে তাকালো। বাতাসে চুল এলোমেলো উড়ছে, ভ্রু যুগল কুঁচকানো, নাক স্বাভাবিকের তুলনায় কিছুটা ফোলা, জিভ দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে তানভির প্রশ্ন করল, “তোমার জীবনের একমাত্র অস্বস্তিকর ব্যক্তি টা কি আমি ই?” বন্যা তখনও নিরেট দৃষ্টিতে তানভিরের দিকে তাকিয়ে আছে। তানভির বন্যার পাশ থেকে হাত সরিয়ে এনে চোখ নামিয়ে আবারও বলল, “যদি তাই হয় তবে আজকের পর তোমার অস্বস্তির কারণ আমি হবো না।” তানভির পকেট থেকে ফোন বের করে কারো সাথে কথা বলায় ব্যস্ত হয়ে

গেছে। বন্যা অবাক চোখে তানভিরকে দেখছে। তানভিরের মনোযোগ ফোনে, অন্যদিকে তাকিয়ে গুরুগম্ভীর কণ্ঠে কথা বলেই চলেছে। বন্যার নজর আঁটকে আছে তানভিরের গাল ভর্তি কিছুটা লম্বা দাঁড়িতে, সেই সঙ্গে বাতাসের সাথে সাথে চুলের নড়াচড়াও খেয়াল করছে। বন্যার শরীর জুড়ে অদ্ভুত শিহরণ বয়ে চলেছে। বাকি রাস্তা তানভির একবারের জন্যও বন্যার দিকে তাকায় নি। অথচ বন্যা পুরো রাস্তা তানভিরের ঘোরে বন্দি ছিল। গলির মোড় পর্যন্ত আসতেই মাগরিবের আজান পড়ছে। তানভির চাপা স্বরে বলল, "মামা রিক্সা থামান।" তানভির রিক্সা থেকে নেমে ওয়ালেট থেকে টাকা বের করে রিক্সা ভাড়া দিয়ে এক পলক বন্যার দিকে তাকিয়ে ঠান্ডা কণ্ঠে বলল, "সাবধানে যেও।" তানভির মাথা নিচু করে হাঁটতে শুরু করল। বন্যা থম মেরে রিক্সায় বসে আছে। তানভিরের আকস্মিক পরিবর্তন বন্যার মনে বিশেষ প্রভাব ফেলেছে। এদিকে মেঘ দিনে কম করে হলেও আবিরকে ১০০ মেসেজ পাঠায়। আজও তার ব্যতিক্রম হয় নি। কিন্তু আবিরের কোনো রিপ্লাই আসে না। সন্ধ্যা থেকে একের পর এক কল দিচ্ছে আবির কল রিসিভও করছে না। মনের ভেতরে জমে থাকা অভিমানে মেঘের চোখ মুখ লাল হয়ে গেছে। কাঁদো কাঁদো মুখ করে আবিরকে চিঠি লিখছে, "প্রিয় নিষ্ঠুর মানব, কেমন আছেন? আমি জানি খুব ভালো আছেন। অবশ্য ভালো থাকার ই কথা কারণ মেঘ নামক এক উন্মাদের থেকে মুক্তি পেয়ে গেছেন। কিন্তু আমি ভালো নেই, একটুও ভালো নেই। আজ থেকে দেড় বছর আগ পর্যন্ত আমি খুব

ভালো ছিলাম। কারণ তখন আবির নামক কোনো ব্যক্তির অস্তিত্ব আমার হৃদয়ে ছিল না। কিন্তু এই দেড় বছরে সবকিছু বদলে গেছে, সেই সঙ্গে বদলে গেছে আমার অভিপ্রায়ও। আবির নামক নিষ্ঠুর মানবের প্রতি আমার তীব্র আসক্তি জন্মেছে। প্রতিনিয়ত ওনাকে দেখার জন্য উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছি। ওনার আকস্মিক দূরত্ব মেনে নেয়া আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তারউপর আমার অবিদ্যমানতায় ওনার চলে যাওয়াটা কোনোভাবেই সহ্য করতে পারি নি। তাই ওনার আদেশ মেনে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয়েছি।ওনাকে জানিয়ে দিয়েন, আমি এখন আলহামদুলিল্লাহ সুস্থ আছি। খাওয়াদাওয়া, ঔষধ সবকিছু ঠিকমতো খাচ্ছি। যদি সম্ভব হয় তবে আমায় যেন ক্ষমা করে দেন। ওনি আমার মেসেজের রিপ্লাই করছেন না তাই বাধ্য হয়ে চিঠি লিখছি। আমার একটা কবুতর থাকলে তার পায়ে বেঁধেই চিঠিটা পাঠাতাম। কিন্তু আপসোস আমার এমন কোনো মাধ্যম নেই তাই বাধ্য হয়ে চিঠিটা ইনবক্সে পাঠাতে হচ্ছে। ওনার গুরুত্বপূর্ণ সময় নষ্ট করার জন্য আন্তরিকভাবে দুঃখিত। আজ আর কোনো মেসেজ দিব না। ওনাকে সাবধানে থাকতে বলবেন। ইতি ওনার অবাধ্য ডোনা, মেঘ আবির ল্যাপটপে কাজ করছিলো। মেঘের আইডি থেকে মেসেজটা আসা মাত্রই ফোন হাতে নিয়ে মেসেজ টা পড়েছে। দুচোখ বন্ধ করে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে তানভিরকে কল দিল। তানভির কল রিসিভ করে একদমে সরি সরি সরি সরি বলেই যাচ্ছে। আবির ঠান্ডা কণ্ঠে ধমক দিল, ” হয়েছে থাম। এখন সরি বললে আর কি হবে?” তানভির

মৃদুস্বরে জিজ্ঞেস করল, “বনুর সাথে কথা হয়েছে?” “না।” “রাগটা সাইডে সরিয়ে বনুর সাথে একটু কথা বলো। ওর মনের অবস্থা খুব খারাপ।” আবির কণ্ঠ খাদে নামিয়ে বলল, “এত সহজে তোর বোনকে ছাড় দিচ্ছি না। ওর জন্য কি পরিমাণ কষ্ট প্রতিনিয়ত আমি অনুভব করি কমপক্ষে তার একাংশ উপলব্ধি করুক তারপর না হয় ভেবে দেখবো।” তানভির গম্ভীর কণ্ঠে বলল, “আমার বোনের চোখে তোমার জন্য আর এক ফোঁটা অশ্রুও দেখতে চাই না আমি।” আবির মেকি স্বরে বলল, “আপসোস, আজ একটা বোন নেই বলে আমার পক্ষ ধরে কেউ কথা বলতে পারে না।” তানভির মুচকি হেসে শুধালো, “বড় আব্বুকে কি বলবো?” আবির আহ্লাদী কণ্ঠে বলে উঠল, “আপাতত দাদা-দাদু হওয়ার জন্য মানসিক প্রস্তুতি নিতে বলিস। এখন আর বোন লাগবে না আমার মেয়ে বড় হয়েই আমার পক্ষে কথা বলবে।” “আহাগো। শখ কত!” আবির হাসি থামিয়ে ধীর কণ্ঠে বলল, “শুন, তোর বোন সুস্থ হলে ভার্সিটিতে যেতে বলিস। সারাদিন বাসায় থেকে উল্টাপাল্টা চিন্তা করার কোনো প্রয়োজন নেই।” “তুমি কি বনুর সাথে কথা বলবাই না?” আবির মুচকি হেসে বলল, “তোর বোনের সাথে কথা না বলে থাকতেই পারবো না আমি। শুধু কয়েকটা দিন দেখব, এই আর কি! রাখছি এখন, সাবধানে থাকিস।” “তুমিও সাবধানে থেকো, আল্লাহ হাফেজ।” প্রতিদিনের ন্যায় আজ বিকেলেও মেঘ ঘুম থেকে উঠে ছাদে আসছে। কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটি করে এক জায়গায় স্থির দাঁড়িয়ে আকাশের পানে চেয়ে আনমনে কিছু ভাবছে। হঠাৎ পেছন

থেকে তানভির ডাকল, " বনু, তোর কি মন খারাপ?" মেঘ থতমত খেয়ে তাড়াতাড়ি চোখ মুখ মুছে ভেজা কণ্ঠে বলল, "কই না তো।" তানভির মেঘের থেকে কিছুটা দূরে ছাদের কার্নিশ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে মৃদুস্বরে বলল, "কাঁদলেই যদি সব পাওয়া যেতো তবে সবাই তাদের ইচ্ছে পূরণ করতে দিনরাত এক করে কাঁদতো। বুঝলি?" মেঘ উপর-নিচ মাথা নাড়লো। মেঘ কেন কাদঁছে তা জিজ্ঞেস করার প্রয়োজনবোধ করল না। মেঘও কিছু বুঝানোর চেষ্টা করল না। তানভির মলিন হেসে বলল, "জানিস তো আল্লাহ ধৈর্যশীল ব্যক্তিকে অনেক বেশি পছন্দ করেন। ধৈর্য রাখ, ইনশাআল্লাহ ভালো ফলাফল পাবি।" মেঘ ভেজা চোখে তানভিরের দিকে তাকিয়ে করুণ স্বরে জিজ্ঞেস করল, "ভাইয়া, আবির ভাই কেমন আছেন?" "আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছেন।" "তোমার সাথে রেগুলার কথা হয়?" "না। ভাইয়া একটু ব্যস্ত আছে।" "ওহ।" তানভির স্বাভাবিক কণ্ঠে শুধালো, "তুই ঠিক আছিস?" "আলহামদুলিল্লাহ।" "ভার্সিটিতে যাচ্ছিস না কোনো?' মেঘ মন খারাপ করে উত্তর দিল, "ভালো লাগে না।" তানভির মুচকি হেসে বলল, "ক্লাসে গেলেই মন ভালো হয়ে যাবে। সকালে রেডি থাকিস, তোকে নিয়ে বের হবো।" মেঘ ঘাড় কাত করে সম্মতি জানালো। তানভির পকেট থেকে একটা চকলেট বের করে মেঘের সামনে রেখে ধীর কণ্ঠে বলল, "সন্ধ্যের আগে রুমে চলে যাস।" তানভির চলে গেছে। একটু পরেই মেঘকে খোঁজে মীম ছাদে আসছে। মেঘ নিজের চকলেট থেকে অর্ধেকটা ভেঙে মীমকে দিয়েছে। মীম উদ্বিগ্ন কণ্ঠে শুধালো,

“আবির ভাইয়া কি তোমার সাথে এখনও কথা বলেন না?” “না।” “কিন্তু কেনো?” “জানি না।” “এখন কি করবা?” মেঘ খানিক ভেবে হঠাৎ নিঃশব্দে হেসে বলল, “কাল পরশু শাড়ি পড়ব। আমায় ছবি তুলে দিস।” “আচ্ছা।” দিন কাটছে শম্বুকগতিতে। প্রতিদিন সন্ধ্যার পরপর মালিহা খান অথবা হালিমা খানের ফোনে আবিবের কল আসে। একে একে সবার সাথেই ভিডিও কলে কথা বলে কিন্তু মেঘের কণ্ঠস্বর শোনামাত্রই ব্যস্ততার ভান করে কল কেটে দেয়। প্রথম প্রথম মেঘ কথা বলতে চাইলেও আবির কথা বলতো না। এখন মেঘও তেমন আগ্রহ দেখায় না। আজ সন্ধ্যার পরপর মীম, আদি আর মেঘ সোফায় বসে গল্প করছে আর স্যুপ খাচ্ছে। এমন সময় মালিহা খানের ফোনে আবিরের নাম্বার থেকে ভিডিও কল আসছে। মেঘ উচ্চস্বরে চেঁচিয়ে উঠলো, “বড় আম্মু, তোমার বাবু কান্না করছে।” মালিহা খান রান্নাঘর থেকে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, “কে কান্না করছে?” মেঘ ফিক করে হেসে উত্তর দিল, “তোমার ছেলে কল দিচ্ছে।” “তুই রিসিভ করতে পারিস না?” মেঘ উদাস ভঙ্গিতে বলল, “তোমার বাবুর কি আমার সাথে কথা বলার মতো সময় আছে নাকি? কত ব্যস্ত মানুষ। তুমি ই কথা বলো।” দ্বিতীয়বার কল বাজতেছে। মেঘ ফোন নিয়ে রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে গেল। মালিহা খান রান্নাঘর থেকে বেড়িয়ে এসে কল রিসিভ করে মেকি স্বরে প্রশ্ন করলেন, “কি হয়েছে বাবু? কান্না করছিস কেনো?” আবির কি বলতে চেয়েও থেমে গেছে। ঢোক গিলে উষ্ণ স্বরে শুধালো, “কান্না করলাম কোথায়? আর হঠাৎ বাবু ই

বা ডাকছো কেনো?” “আমি নিজে থেকে ডাকি নি। মেঘ বলতাছে আমার বাবু নাকি কান্না করছে তাই জিজ্ঞেস করলাম।” আবির গম্ভীর কণ্ঠে বলল, “তোমাদের আদরের মেয়েকে বাড়াবাড়ি কম করতে বলো।” মেঘ ঠোঁট উল্টিয়ে কাঁদো কাঁদো মুখ করে তাকিয়ে আছে। মালিহা খান মেঘকে এক নজর দেখে সহসা রান্নাঘরের দিকে তাকালেন। মেঘের হাতে ফোন দিতে দিতে আতঙ্কিত কণ্ঠে বলে উঠলেন, “নে মেঘের সাথে কথা বল, তরকারি পুড়ে যাচ্ছে মনে হয়। আসছি আমি।” তাৎক্ষণিক ঘটনায় মেঘ থতমত খেয়ে কোনোরকমে ফোন মুখের সামনে ধরেছে। আবিরের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই আবির চোখ নামিয়ে নিয়েছে। টেবিলের উপর ফোন রেখে পাশে ল্যাপটপে কাজ করছে। মেঘ অপলক দৃষ্টিতে আবিরকে দেখছে, সহসা ঠোঁটের কোণে ক্ষীণ হাসি ফুটেছে। কতদিন পর প্রিয় মানুষটাকে দেখছে, আজ মুখের উপর কলও কাটছে না। মেঘ ঠোঁটের কোণে হাসি রেখে আহ্লাদী কণ্ঠে ডাকল, “বাবু” আবির অগ্নিদৃষ্টিতে তাকিয়ে মেঘের হাসি দেখে সঙ্গে সঙ্গে চোখ সরিয়ে নিয়েছে। মেঘ দুষ্টামির ছলে আবারও ডাকল, “বাবু.....” আবির এবার ফোন কাছে নিয়ে বিড়বিড় করে বলল, “এইযে বাবু বাবু ডাকছেন। বাবুর মতো আচরণ করলে সামলাতে পারবেন?” আবিরের মুখে এমন কথা শুনে মেঘের আঁখি যুগল স্বাভাবিকের তুলনায় অনেক বেশি প্রশস্ত হয়ে গেছে। নিষ্পলক চোখে আবিরের মুখের পানে তাকিয়ে আছে। ফোন আগের জায়গায় রেখে আবির আবারও কাজে মনোযোগ দিয়েছে। তবে মুখে গাম্ভীর্যতার

বদলে ক্ষীণ হাসি ফুটেছে। মালিহা খান এগিয়ে এসে বিরক্তি ভরা কণ্ঠে বলে উঠলেন, “বাসায় থাকাকালীন সারাক্ষণ ই বকবক করতিস আর এখন মুখ দিয়ে কথা বের হয় না। আগের রূপে ফিরে গেছিস? দেখি দে ফোন।” মেঘ বড় আম্মুকে ফোন দিয়ে আহাম্মকের মতো কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো। খানিক বাদে মাথা নিচু করে রুমের দিকে হাঁটতে শুরু করেছে। মালিহা খান সোফার কাছে আসতেই মীম আর আদিও আবিরের সাথে কথা বলতে শুরু করেছে। এরমধ্যে হালিমা খানও রুম থেকে বেড়িয়ে এসেছেন। মেঘ নিজের রুমে গিয়ে আবিরের একটা ছবি বের করে কিছুক্ষণ পরখ করে চোখ জোড়া বন্ধ করে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল, “আই মিস ইউ।” আজ সকাল সকাল মেঘ শাওয়ার নিয়ে একেবারে রেডি হয়ে নিচে নেমেছে। নাস্তা করে তানভিরের সাথে বেড়িয়েছে। মোজাম্মেল খানের নির্দেশ মতই বোনকে গাড়ি দিয়ে নিয়ে গেছে। অনিবার্য কারণ বশত প্রথম ক্লাস হবে না তাই মিনহাজ, তামিম, মিষ্টি, বন্যা চারজন চা খেতে বেড়িয়েছে। মেঘ ওদের দেখেই উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, “ভাইয়া, গাড়ি থামাও। বন্যারা চা খাচ্ছে।” তানভির ওদের দিকে একবার তাকিয়ে পর পর মেঘের হাস্যোজ্জ্বল মুখের পানে তাকিয়ে হেসে বলল, “কে জানি বলছিলো ভার্সিটিতে আসতে ভালো লাগে না?” মেঘ তানভিরের দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে হেসে বলল, “কে জানি বলছিলো, মনে নেই।” তানভির মুখে হাসি রেখেই বলল, “ঠিক আছে যা। ক্লাস শেষে কল দিস। ফ্রি থাকলে এসে নিয়ে যাব।” মেঘ কোমল কণ্ঠে বলল, “ভাইয়া, আসো। এক

কাপ চা খেয়ে যাও।” “আজ না। অন্য কোনো দিন।” “প্লিজ ভাইয়া, চলো।” মিনহাজ, তামিম মেঘকে দেখেই এগিয়ে আসছে। তানভিরকে রিকুয়েষ্ট করে চা খেতে নিয়ে গেছে। বন্যা চোখ তোলে তানভিরকে দেখেই চোখ সরিয়ে নিয়েছে। মাথা নিচু করে মেঘের সাথে আস্তে আস্তে কথা বলছে। তানভির, মিনহাজ আর তামিমের সাথে টুকটাক কথা বলতে বলতে এক কাপ চা খেয়েছে। বন্যার দিকে এক বারের জন্যও তাকায় নি। মিনহাজ বন্যাকে উদ্দেশ্য করে বলল, “ভাবি, আজকের ট্রিট যে আপনার পক্ষ থেকে এটা ভাইকে বললেন না?” বন্যা রাগী স্বরে বলল, ” ভাবি ডাকটা বন্ধ করবি?” তানভির টাকা বের করে বিল পরিশোধ করতে যাবে ওমনি বন্যা তানভিরের হাত ধরে থামিয়ে দিয়ে শমিত কণ্ঠে বলল, “আজকের বিল আমি দিব।” তানভির উষ্ণ স্বরে জানাল, “তোমার লিস্টে নিশ্চয় আমি ছিলাম না। আমার বিল টা আমি দিয়ে দিচ্ছি।’ বন্যা এবার শক্ত কণ্ঠে বলল, ” বললাম তো আমি বিল দিব।” মিষ্টি আর মেঘ কানে কানে ফিসফিস করে কথা বলছে। মেঘ একহাতে মুখ চেপে হাসছে আর দুজনকে দেখছে। মিনহাজ আর তামিমও তাদের দেখছে। মিনহাজ ইচ্ছেকৃত গলা খাঁকারি দিতেই তানভির সেদিকে তাকালো। বন্যা তখনও তানভিরের হাত ধরে আছে। বন্যার নজর মেঘদের দিকে পড়তেই তড়িৎ বেগে হাত সরিয়ে দূরে সরে দাঁড়িয়েছে। তানভির টাকা পকেটে রেখে স্বাভাবিক ভাবে মেঘের থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেছে। বন্যা টাকা পরিশোধ করে সামনে চলে গেছে। মেঘ আর মিষ্টি পেছন পেছন

যাচ্ছে। মেঘ পেছন থেকে সর্বশক্তি দিয়ে বলে উঠলো, “তোর সাহস তো কম না, তুই আমার ভাইয়ের সাথে উচ্চস্বরে কথা বলিস।” বন্যা থেমে ক্ষীণ ক্রোধ দেখিয়ে বলল, “সামান্য এক কাপ চায়ের জন্য যে তোর ভাই টাকার গরিমা দেখালো সে বেলায়।” “আমার ভাই টাকার গরিমা দেখায় নি। মিনহাজ, তামিম এমনকি আমি ভাইয়াকে ডেকে নিয়ে আসছি। আসার পর তুই ভাইয়ার সাথে কোনো কথা বলিস নি, কথা না ই বলতে পারিস। চা পর্যন্ত খেতে বলিস নি অথচ ট্রিট তুই দিচ্ছিস। ভাইয়ার নিজের বিল পরিশোধ করাটা কি অন্যায় ছিল?” “তুই তো তোর ভাইয়ের পক্ষ ই নিবি।” মেঘ এক গাল হেসে বিড়বিড় করে বলল, “তুই আমার ভাবি হলে, তোর পক্ষ ই নিতাম।” বন্যা রাগী স্বরে বলল, “বিড়বিড় করে কি বলছিস?” “কিছু না।” মেঘ বিকেলে একা একায় শাড়ি পড়ে মীমকে নিয়ে ছাদে গেছে। মাথায় ঘোমটা দেয়া ছবি থেকে শুরু করে, স্টাইল করে বেশ কিছু ছবি তুলেছে। রুমে বসে বসে ছবিগুলো দেখছে। একা একা শাড়ি পড়ায় কুঁচির যাচ্ছেতাই অবস্থা। তবুও অনেক খোঁজাখুঁজি করে ৩ টা ছবি আবিরকে পাঠিয়েছে। প্রথম ২ টা ঘোমটা ছাড়া ছবি, তৃতীয় টা মাথায় ঘোমটা দেয়া ছবি। কয়েক মুহুর্তের মধ্যেই আবির মেসেজ সীন করেছে। ছবিগুলো দেখামাত্র আবিরের ঠোঁটে হাসি ফুটে উঠেছে। মেঘের মায়াবী আদলে তাকিয়ে আবির মোলায়েম কণ্ঠে বলে উঠল, “মাশাআল্লাহ। দেখি, আবিরের দরুন তার প্রেয়সীর মন ঠিক কতখানি উত্তপ্ত হতে পারে।” কাছে টেনে ছবিগুলো দেখতে দেখতে আবির হঠাৎ ই কপাল গুটালো।

শাড়ির কুঁচিতে নজর আটকে আছে। আবির মুচকি হেসে আকুল কণ্ঠে বলল, “ইশশ, আমি কাছে থাকলে কুঁচির বেহাল দশা হতেই দিতাম না।” আবিরের রিপ্লাই পাবার আশায় মেঘ নিষ্পলক দৃষ্টিতে ফোনের দিকে তাকিয়ে আছে। ৫ মিনিট, ১০ মিনিট, ১৫ মিনিট হয়ে গেছে অথচ কোনো রিপ্লাই আসছে না। মেঘের ব্যাকুল মন কোনোভাবেই শান্ত হচ্ছে না। ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে বেশকিছুক্ষণ ভেবে হঠাৎ ই মুচকি হেসে বলল, “কথায় আছে, সোজা আঙুলে ঘি না উঠলে আঙুল বাঁকাতে হয়। এতদিন আপনার বহু তালবাহানা সহ্য করেছি এবার আমার ভিন্ন রূপ দেখাবো।” মেঘ নিজের তোলা শাড়ি পড়া ছবিগুলো থেকে ২ টা ছবি ফেসবুকে ডে পোস্ট দিয়ে অপেক্ষা করছে। যেই ভাবনা সেই কাজ। পোস্ট করার ১০ মিনিটের মধ্যে আবির পোস্ট সীন করেছে। মেঘ মিটিমিটি হাসছে, আবিরকে জ্বালানোর এর থেকে উত্তম উপায় আর নেই। হাতে গুনা ২ মিনিটের মধ্যে মেঘের আইডি থেকে ছবিগুলো ডিলিট হয়ে গেছে। মেঘ নিঃশব্দে হেসে বিড়বিড় করল, “মি. খান আপনি ধরা পরে গেছেন। আপনার রাগ, জেদের আড়ালে লুকানো অনুভূতি প্রকাশিত হয়ে গেছে। আপনি সবকিছু আড়াল করতে পারলেও আপনার অন্তরের হিংসুটে মনোভাবকে কোনোভাবেই আড়াল করতে পারলেন না।” একদিনের ব্যবধানে আবিরকে পাঠানো মেসেজের পরিমাণ কমে এসেছে। ছবি পাঠানোর পর ২ দিনে আবিরকে একটাও মেসেজ করে নি। এমনকি একবারের জন্য কলও করে নি। সন্ধ্যায় কল দিলে আবিরকে শুনিয়ে

শুনিয়ে মেঘ ইচ্ছেকৃত ব্যস্ততার ভান করে। আবিরের বড় মামী অসুস্থ তাই আজ সকাল সকাল আলী আহমদ খান আর মালিহা খান ত্রিশালের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছেন। বিকেল দিকে মেঘ কল দিয়ে মামির খোঁজ নিয়েছে। মালিহা খানরা এক রাত থাকবেন সেই সুবাদে নিশ্চিতভাবে বলা যায় আজ আবির হালিমা খানের নাম্বারে কল দিবেই দিবে। এজন্য সন্ধ্যার পর পর মেঘ নিজের নাম্বার থেকে হালিমা খানের নাম্বারে কল দিয়ে দুই ফোন বিছানার উপর রেখে বেলকনিতে দাঁড়িয়ে গুনগুন করে গান গাইতেছে। মীমকে আগে থেকেই সবকিছু শিখিয়ে দিয়েছে। মামনির নাম্বার ওয়েটিং পেয়ে আবির বাধ্য হয়ে কাকিয়ার নাম্বারে কল দিয়েছে। যথারীতি মীম কল রিসিভ করে মেঘের শেখানো কথাগুলো বলতে শুরু করেছে। আবির সেসব কথায় পাত্তা না দিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, “মামনি কি বেশি ব্যস্ত?” মীমের সরল স্বীকারোক্তি, “মামনি সম্পূর্ণ ফ্রী। আম্মুর সঙ্গে গল্প করছেন। কেনো ভাইয়া?” আবির ভ্রু গুটিয়ে ভারী কণ্ঠে প্রশ্ন করল, “মামনির ফোন ওয়েটিং কেনো?” “ওহ আচ্ছা। মামনির ফোন দিয়ে আপু কার সঙ্গে যেন কথা বলতেছে।” আবির তড়িৎ গতিতে বলে উঠল, “৩০ মিনিট যাবৎ ওয়েটিং। এতসময় ধরে কার সাথে কথা বলছে?” “আমি জানি না। আমাকে বিরক্ত করতে নিষেধ করেছে।” আবিরের কপাল কুঁচকানো। মুহুর্তেই চেহারা অন্ধকার হয়ে গেছে। ঢোক গিলে নিজেকে সংযত করে ধীর কণ্ঠে বলল, “ফোনটা মামনি না হয় কাকিয়াকে দে।” “ঠিক আছে।” মীম ফোন দিয়ে দৌড়ে মেঘের

রুমে চলে গেছে। মেঘকে ঘটনা বলতেই মেঘ শুধু মুচকি হাসলো। মামনি আর কাকিয়ার সাথে কথা শেষ করে আবির তৎক্ষনাৎ তানভিরকে কল দিয়েছে। যথারীতি তানভিরও মিনহাজ, তামিমকে কল দিয়ে পরপর বন্যাকে কল দিয়েছে। বন্যা কল রিসিভ করতেই তানভির প্রশ্ন করল, "সন্ধ্যার পর বনুর সাথে কথা হয়েছে তোমার?" বন্যা স্বাভাবিক কণ্ঠে উত্তর দিল, "আজ ফোনে কথা হয় নি।" "কথা হয়নি?" "নাহ। কেনো?" "তেমন কিছু না, রাখছি।" তানভির বাসায় ফিরে আম্মুর ফোনও চেক করেছে অথচ কারো নাম্বার নেই। মেঘকে সরাসরি কিছু জিজ্ঞেসও করতে পারছে না। আলী আহমদ খান আর মালিহা খান একরাত থেকে পরদিন ই বাসায় চলে আসছেন। আলী আহমদ খান বাসায় ফিরে বিকেল থেকে মন খারাপ করে সোফায় বসে আছেন। মালিহা খান শান্ত স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার কি শরীর খারাপ?" আলী আহমদ খান এপাশ ওপাশ মাথা নাড়লেন। মোজাম্মেল খান নিজের রুম থেকে বেড়িয়ে আসতে আসতে বললেন, "ভাবি, ভাইজানের শরীর নয়, মন খারাপ। এই মন আর ভালো হবে না।" মালিহা খান উদ্বিগ্ন কণ্ঠে শুধালেন, "কেনো? কি হয়েছে?" মোজাম্মেল খান ঠাট্টার স্বরে বললেন, "ভাইজান, ভাবিকে বলবো?" আলী আহমদ খান গম্ভীর কণ্ঠে হুঙ্কার দিতেই মোজাম্মেল খান থেমে গেছেন। মোজাম্মেল খান হালিমা খানকে উদ্দেশ্য করে বললেন, " দু'কাপ চা দিও।" মেঘ সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে আহ্লাদী কণ্ঠে বলল, "আব্বু, চা আমি করি?" মোজাম্মেল খান আর আলী আহমদ খান দু'জনেই

একসঙ্গে মেঘের দিকে তাকালেন। আলী আহমদ খান ঠান্ডা কণ্ঠে বললেন, “চা করতে পারবা?” “পারবো।” মোজাম্মেল খান রাশভারি কণ্ঠে বলে উঠলেন, “আমার মেয়ের হাতের রান্না খাওয়ার পর, সামান্য চা নিয়ে ডাউট করা শোভা পায় না। আমার মেয়ে সব পারবে, প্রয়োজনে আমি শিখিয়ে দিব।” আলী আহমদ খান শুকনো গলায় কেশে উঠলেন। আব্বুর ওভার কনফিডেন্স দেখে মেঘ মৃদু হেসে রান্নাঘরে চলে গেছে। আলী আহমদ খান মেকি স্বরে বললেন, “তুই রান্না শেখাবি?” “হ্যাঁ।” “ঠিক আছে। তাহলে আগে তুই ই বল, চিংড়ি মাছের মালাইকারি কিভাবে রান্না করে?” মোজাম্মেল খান ঝটপট উত্তর দিলেন, “জানি না।” আলী আহমদ খান আবারও প্রশ্ন করলেন, “পায়েস তো রান্না করতে পারবি নাকি?” “পারবো না।” আলী আহমদ খান তপ্ত স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, “এই জীবনে শখেও কোনোদিন রান্নাঘরে পা রাখছিলি?” মোজাম্মেল খান মুখ ফুলিয়ে শ্বাস ছেড়ে বললেন, “আমি না হয় জীবনেও পা রাখি নি। গত ২০ বছরে তুমি পা রেখেছো?” এরমধ্যে মেঘ দুই কাপ চা নিয়ে আসছে। আলী আহমদ খান চায়ে চুমুক দিয়ে ভারী কণ্ঠে বললেন, “আমাকে তো তোর ভাবি রান্নাঘরে ঢুকতে দেয় না। তাছাড়া আমি গত ২০ বছর পা না রাখলেও রান্না সম্পর্কে তোর মতো অজ্ঞ না। খুব তো বলছিস তোর মেয়েকে তুই রান্না শিখাবি। সামান্য পায়েসের রেসিপি বলতে পারছিস না আবার সব শেখাবি।” মোজাম্মেল খান রাগী স্বরে বললেন, “তুমি বলো তাহলে।” আলী আহমদ খান গুরুভার কণ্ঠে বলে উঠলেন, “তুই কি

কোনোভাবে আমায় চ্যালেঞ্জ করছিস?” “হ্যাঁ করছি।” আব্বু আর বড় আব্বুর কথোপকথনের মাঝে মেঘ থ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দুই-তিনবার থামানোর চেষ্টাও করেছে কিন্তু থামাতে পারে নি। মালিহা খান নিজেও ব্যর্থ হয়েছেন। আলী আহমদ খান আচমকা বসা থেকে উঠে মোজাম্মেল খানকে উদ্দেশ্য করে বললেন, “আমি মুখের কথায় বিশ্বাসী না। তুই অপেক্ষা কর, রান্না করে তোর সামনে হাজির করবো।” হালিমা খান, মালিহা খান আর মেঘ তিনজনই আশ্চর্য নয়নে তাকিয়ে আছে। আলী আহমদ খান মেঘকে উদ্দেশ্য করে বললেন, “চলো, আজ আমি তোমাকে দিক নির্দেশনা দিব। যেভাবেই হোক তোমার আব্বুকে চ্যালেঞ্জে হারাতেই হবে।” মালিহা খান উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলে উঠলেন, ” দয়া করে আমার সাজানো রান্নাঘরটাকে ছেড়ে দেন। পায়েস আমি করে দিচ্ছি।” আলী আহমদ খান উদাসীন কণ্ঠে বলে উঠলেন, “তুমিও আমায় ভরসা করো না?” মালিহা খান উত্তর খোঁজে পেলেন না। একবার উপর নিচ মাথা নাড়ছেন আবার এপাশ ওপাশ মাথা নাড়ছেন। যত যাই হোক পুরুষ মানুষ রান্নাঘরে গেলে সেই রান্নাঘরের নাজেহাল অবস্থা হতে বাধ্য। আবিবের জন্মের আগে-পরে আলী আহমদ খান মাঝে মাঝে শখ করে রান্না করতেন। রান্না যেমন তেমন, কিন্তু পরবর্তীতে রান্নাঘরে ঢোকার মতো অবস্থা থাকতো না। তারজন্য একপর্যায়ে বিরক্ত হয়ে মালিহা খান খুব করে অনুরোধ করেছেন যাতে আলী আহমদ খান রান্নাঘরে পা না রাখেন। সেই থেকে আলী আহমদ খান রান্নাঘরে পা রাখেন না। এত বছর পর ছোট ভাইয়ের সাথে

চ্যালেঞ্জ নিয়ে রান্নাঘরে ঢুকছেন। তবে আজ রান্না মেঘ করবে, ওনি কেবল মেঘকে সাহায্য করবেন। এরমধ্যে হালিমা খান তানভিরকে কল দিয়ে জানিয়েছে। আলী আহমদ খান নিজেই ফ্রিজ থেকে চিংড়ি মাছ, দুধ সহ প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম বের করছেন। এদিকে ভয়ে মেঘের হাত পা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে। আলী আহমদ খান মানেই আতঙ্ক, আব্বুর থেকেও মেঘ বড় আব্বুকে বেশি ভয় পায়। রান্নায় গন্ডগোল করলে আজ মেঘের খবর ই আছে, এই ভয়ে বার বার ঢোক গিলছে। কিছুক্ষণের মধ্যে তানভির আসছে। হালিমা খান, মালিহা খান দূরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মেঘদের কর্মকাণ্ড দেখছেন। তানভির রান্নাঘরের সামনে দাঁড়িয়ে মৃদুস্বরে বলল, “আমি কি কোনোভাবে সাহায্য করতে পারি?” আলী আহমদ খান রাগী স্বরে বললেন, “তোমার আব্বু পাঠিয়েছে নাকি?” “না না।” “সাহায্য লাগবে না।” তানভির ঠোঁট চেপে হাসছে আর ফোন দিয়ে ভিডিও করছে। মোজাম্মেল খান সোফায় বসে আছেন। ঘন্টাখানেক পর আবির কল দিয়েছে। কল রিসিভ করতেই আবির বলে উঠল, “আসসালামু আলাইকুম চাচ্চু। প্রজেক্টের কিছু ডিটেইলস লাগতো। আগামীকাল সকালের মধ্যে দিলে ভালো হতো।” মোজাম্মেল খান ঠাট্টার স্বরে বললেন, ” ওয়ালাইকুম আসসালাম। প্রজেক্ট নিয়ে পরে ভাবা যাবে। আপাতত ভিডিও কল দাও।” আবির ভ্রু কুঁচকে ভারী কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, “ভিডিও কল কেনো?’ “আরে দাও আগে।” সচরাচর মোজাম্মেল খানের সাথে ভিডিও কলে কথা হয় না বললেই চলে। প্রয়োজনে ২-৪ মিনিট

ফোনেই কথা বলে। আবির ভয়ে ভয়ে ভিডিও কল দিল। মোজাম্মেল খান কল রিসিভ করে হাসতে হাসতে বললেন, “তোমার আব্বুর মাথা নষ্ট হয়ে গেছে। দাঁড়াও দেখাচ্ছি।” আবির ভ্রু কুঁচকে সূক্ষ্ম নেত্রে তাকিয়ে আছে। চাচ্চুর কথার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছে না। মোজাম্মেল খান রান্নাঘরের কাছে গিয়ে ফোন ওদের দিকে ঘুরিয়ে হাসতে শুরু করেছেন। আলী আহমদ খান আবিরকে এক নজর দেখে শক্ত কণ্ঠে বললেন, “তোমার চাচ্চু আমায় চ্যালেঞ্জ দিয়েছে আমি নাকি রান্না পারি না।” আবির শুকনো গলায় ঢোক গিলে ধীর কণ্ঠে বলল, “আপনার শরীরের অবস্থা খুব একটা ভালো না। তারমধ্যে আজ ই এতটা পথ জার্নি করে আসছেন।এই অবস্থায় এসব চ্যালেঞ্জের কোনো মানে হয় না।” আলী আহমদ খান স্বাভাবিক কণ্ঠে বললেন, “আমি বেশি কিছু করছি না। মেঘ মামনিই সবটা দেখছে।” মেঘের দিকে ফোন ঘুরাতেই আবিরের চোখ কপালে উঠার অবস্থা। মেঘের কপালে কাপড় বাঁধা, চুল গুলো শক্ত করে খোঁপা করা, ওড়না পেঁচিয়ে কোমড়ে বেঁধে রেখেছে। মেঘকে এ অবস্থায় দেখে আবির শুকনো মুখেই বিষম খেয়ে উঠেছে। আতঙ্কিত কণ্ঠে বলে উঠল, “এই পাগ...” আবির মুখে আসা কথাটা গিলে দু চোখ বন্ধ করে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে উষ্ণ স্বরে বলল, “ও এখানে কি করে?” মোজাম্মেল খান মেকি ভঙ্গিতে বললেন, “তোমার আব্বু আমার মেয়েকে রান্না শেখাচ্ছে।” আবির মনে মনে বিড়বিড় করল, “তোমাদের পাগলামির মাঝে আমার অবুঝ বউটাকে কেনো টানো?” আলী আহমদ খান মৃদুস্বরে বললেন, “আবির, তুমি

আমার স্পেশাল রেসিপিগুলো মিস করবে।” আবির না চাইতেও মলিন হেসে শুধালো, “তা কি কি রান্না হচ্ছে?” “চিংড়ি মাছের মালাইকারি, বেগুন ভর্তা, পাবদা মাছ ভুনা, আমার স্পেশাল ডালের রেসিপি সাথে পায়েস।” আবির উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলে উঠল, “এত কিছু করার কি দরকার। আর আম্মু কোথায়?” মীম মালিহা খানের কাছে ফোন নিয়ে গেছে। আবির রাগান্বিত কণ্ঠে বলে উঠল, “আম্মু, এসব কি হচ্ছে? তুমি কিছু বলছো না কেনো?” “আমি অনেকবার বারণ করেছি। তোর আব্বু কি কথা শোনার মানুষ নাকি?” আবির রাগান্বিত কণ্ঠে বলল, “আব্বুর এই শরীর নিয়ে রান্নাঘরে ঢুকতে দিলে কেনো? আর তোমরা কি এটুকু বুঝো না, মেঘ কি বেগুন পুড়াতে পারবে নাকি? হাত পা পুড়ে নাজেহাল অবস্থা করে ফেলবে। ওনাদের উল্টাপাল্টা চ্যালেঞ্জকে তোমরা কিভাবে সাপোর্ট করছো?” মালিহা খান শান্ত স্বরে বললেন, “কারো কিছু হবে না তুই মাথা ঠান্ডা রাখ। তাছাড়া ওদের রান্না প্রায় শেষ দিকে।” আবির রাগী স্বরে বলল, “যা ইচ্ছে করো আমার কি!” আবির রাগে কল কেটে দিয়েছে। মেঘদের রান্না প্রায় শেষ দিকে। তানভির ছবি তুলে আবিরকে পাঠিয়েছে। আবির ছবিগুলো দেখে সঙ্গে সঙ্গে রাগী ইমোজি পাঠিয়েছে। খাবার টেবিলে মুখোমুখি দুই ভাই বসা। মেঘ দু’জনকেই খাবার বেড়ে দিচ্ছে। মোজাম্মেল খান চুপচাপ খাবার শেষ করে উঠে যেতে যেতে বললেন, “ভাইজান, তুমি জিতেছো। এবার মন ভালো হয়েছে?” আলী আহমদ খান গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, “আমার মন ভালো করার অযথা উদ্যমটা খুব ভালো ছিল, ধন্যবাদ।”

আবির প্রজেক্টের কাজে অত্যধিক ব্যস্ত। মোজাম্মেল খানের সাথে কাজের ব্যাপারে প্রতিনিয়ত কথা হয় তবে ইদানীং আলী আহমদ খানের মন ভীষণ খারাপ। বাড়িতে কিংবা অফিসে কোথাও কারো সাথে বেশি কথা বলেন না। তানভির নিজের কাজের পাশাপাশি সময় পেলে মাঝেমধ্যেই আবিরের অফিসে যায়। রাকিব আর রাসেলকে যতটা সম্ভব সহযোগিতা করে। বিগত সাত বছরের ন্যায় বর্তমানে আবির ব্যতীত খান বাড়ির পরিবেশ ততটা নিস্তব্ধ নয়। দেড় বছরেরও বেশি সময় আবির বাসায় থাকাতে সবার সঙ্গে সম্পর্ক বেশ মজবুত হয়েছে। আবির নিজের কাজ শেষ করে রুমে এসে ফ্রেশ হয়েই বাসায় কল দেয়। সারাদিনে ২-৪ মিনিট কথা হোক বা না হোক নিয়ম করে সন্ধ্যার পর ঘন্টাখানেক কথা বলাটা অভ্যাস হয়ে গেছে। আবিরের অনুপস্থিতিতে ১৭ দিন কেটে গেছে অথচ এতদিনেও মেঘের সাথে সম্পর্কের উন্নতি হচ্ছে না। প্রথম ৮-১০ দিনের মতো মেঘ আর কান্নাকাটি করে না বরং প্রতিনিয়ত আবিরকে জ্বালানোর নতুন নতুন পরিকল্পনা করে। আবির কাজের ফাঁকে মেঘের এসব কর্মকান্ড দেখে একা একায় হাসে। আবিরের হাসি দেখে কেউ কেউ হয়তোবা আবিরকে উন্মাদ ভাবে তবে আবিরের সেদিকে বিশেষ মনোযোগ নেই। প্রজেক্ট আর মেঘ ব্যতীত আপাতত আবিরের মস্তিষ্কে অন্য কিছুই নেই। প্রাত্যহিক সকালে ঘুম ভাঙার পর মেঘের প্রথম কাজ ক্যালেন্ডারে গত হওয়া এক একটা দিন মার্ক করা। মেঘের মতো আবিরও প্রেয়সীর ক্রন্দনরত আদলে হাসি ফুটানোর তাগিদে সর্বক্ষণ দিন গুনছে। আজ

সকাল থেকে মালিহা খান আর হালিমা খান রান্নাঘরে ব্যস্ত। আবিরের বড় মামিকে ডাক্তার দেখাতে ঢাকায় নিয়ে আসবে সাথে বড় মামা আর মালাও আসবে। তাছাড়া মাইশা আর তার হাসবেন্ডকেও দাওয়াত দেয়া হয়েছে। ইকবাল খান বেশকিছু দিন যাবৎ চট্টগ্রামে আছেন তাই মীম, আদিকে নিয়ে আকলিমা খান নিজেই স্কুলের মিটিং এ গেছেন। মেঘ ভার্সিটি থেকে বাসায় ফিরে ফ্রেশ হয়ে কেবল শুয়েছে এরমধ্যে বড় মামি আর মালা বাসায় আসছে। ওনাদের কণ্ঠ শুনে মেঘ তাড়াতাড়ি নিচে আসছে। সালাম দিয়ে ভালো মন্দ জিজ্ঞেস করছে। মামি হাসিমুখে কথা বললেও মালা মুখ ফুলিয়ে রেখেছে। মেঘ মালার দিকে তাকিয়ে জোরপূর্বক জিজ্ঞেস করল, " আপু কেমন আছেন?" মালা এবার বাধ্য হয়ে উত্তর দিল, "ভালো। তুমি?" মেঘ মুচকি হেসে উত্তর দিল, "আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালো।" মেঘ মালাদের পাশের সোফায় বসে চোখ বন্ধ করতেই গতবছর মাইশা আপুর বিয়ের প্রতিটা ঘটনা চোখের সামনে জ্বলজ্বল করছে। তখন মালাকে নিয়ে মেঘের মনে অভিযোগের কমতি ছিল না। আবির একজন দায়িত্বশীল প্রেমিক হিসেবে কত সুন্দর ভাবে সবগুলো ঘটনার সমাধান করেছিলো। বোকা মেঘ আবিরের উদ্বীগ্নতা তখন বুঝতেই পারে নি। মাইশা আপুর গায়ে হলুদের দিন সকালে মেঘের উন্মুক্ত পৃষ্ঠে আবিরের হাতের স্পর্শের কথা মনে পড়তেই মেঘের শরীরের সব লোম দাঁড়িয়ে গেছে, সেই সঙ্গে শরীর ঝাঁকুনি দিয়ে উঠেছে। আবিরকে দেখার জন্য মনটা আনচান করছে। মেঘ চোখ মেলে দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়লো। মালা

আড়চোখে মেঘকে দেখছে, মেঘের পড়নে একটা সাদামাটা থ্রিপিস, বিনুনি করা চুলগুলোও কোমড় ছাড়িয়েছে, সামনের দিকের ছোট ছোট চুলে কপাল ঢেকে আছে। ক্লাসে যাওয়ার আগে দেয়া গোলাপি রঙের লিপস্টিকের অল্পস্বল্প এখনও ঠোঁটে লেগে আছে। মালা অবাক চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে মনে মনে ভাবছে, "মেঘের মধ্যে স্পেশাল কি গুণ আছে যা আমার মধ্যে নেই। আমি কি তোমার প্রেমিকা হতে পারতাম না? এই বাড়ির বড় বউ হওয়ার জন্য আমি কি একেবারেই যোগ্য ছিলাম না?" হালিমা খান রান্নাঘর থেকে উচ্চস্বরে ডাকলেন, "এই মেঘ, তুই ও কি মেহমান হয়ে গেছিস?" মেঘ তড়িঘড়ি করে উঠে রান্নাঘরে গেলো। বড় মামা এখনও আসে নি। মাইশা আপু আর ওনার হাসবেন্ড কে নিয়ে আসবেন। তাই আপাতত মামি আর মালার জন্য শরবত করা হয়েছে। মালাকে শরবত সাধতেই মালা বিরক্তি ভরা কণ্ঠে বলল, "শরবত খাবো না আমি।" মেঘ স্বাভাবিক ভাবেই শরবত রেখে দিয়েছে। মালিহা খান আর আবিরের বড় মামি নিজেদের মধ্যে কথা বলছেন। মালা সোফা থেকে উঠে সারা বাড়ি ঘুরে দেখছে, হয়তো আবিরের রুমে যেতে চেয়েছিল কিন্তু তালা দেখে আবারও নিচে আসছে। মেঘকে উদ্দেশ্য করে ঠাট্টার স্বরে জিজ্ঞেস করল, "আবির ভাইয়ার রুমে তালা কেনো? তোমার জন্য নাকি?" অতি সামান্য কথাতেই অভিমানী মেঘের মনে ভীষণ ক্ষোভ জমেছে। গম্ভীরমুখের গাম্ভীর্যতা সরিয়ে ক্ষীণ হেসে ধীর কণ্ঠে বলল, " উফফ, ভাবতেই ভালো লাগছে যে ওনি আমার জন্য এতটা উদ্বিগ্ন। আমার ভয়ে ওনি

নিজের রুমে তালা দিয়ে গেছেন। আবির ভাই আমাকে এত ভয় পায়। ওয়াও!” মেঘের মুখে উল্টাপাল্টা কথা শুনে মালা বেশ বিরক্ত হলো। মেঘ ঢোক গিলে উষ্ণ স্বরে ফের বলল, “রুমে তালা থাকুক কিংবা না থাকুক, ওনার শূন্য রুমের পূর্ণতা ওনাকে ছাড়া অসম্ভব। তাছাড়া রুমে তালা দিয়ে ভিনদেশে পাড়ি দিলেও ওনার মনটা তো আমার কাছেই রেখে গেছেন।” মালা রাগান্বিত কণ্ঠে বলে উঠল, “মানে?” “নাথিং।” ইদানীং আবিরকে জ্বালাতে জ্বালাতে মেঘের স্বভাব খারাপ হয়ে গেছে। মালাকে দেখেও খুব জ্বালাতে ইচ্ছে করছে। যেই ভাবনা সেই কাজ। মেঘ সোফায় বসে দুহাতে মালিহা খানের বাহু আঁকড়ে ধরে কাঁধ বরাবর মাথা এলিয়ে দিয়েছে। মালিহা খান কথা থামিয়ে ডানহাতে মেঘের কপালে হাত রেখে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে শুধালেন, “কিরে শরীর খারাপ নাকি?” মেঘ আহ্লাদী কণ্ঠে বলল, “নাহ। তোমার আদর খেতে খুব ইচ্ছে করছে।” মালা ভেতরে ভেতরে রাগে কটকট করছে। মালিহা খান মেঘকে নিজের কাছে টেনে নিয়ে মেঘের মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন আর আবিরের মামীর সঙ্গে কথা বলছেন। অন্যান্য কথোপকথন শেষে দুজনেই আবিরের ব্যাপারে কথা বলতে শুরু করেছেন। আবিরের মামি ঠান্ডা কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, “আবিরের জন্য মেয়ে কি পছন্দ করে রাখছো?” মালিহা খান মলিন হেসে বললেন, “মেয়ে কিভাবে পছন্দ করবো। ছেলে তো বিয়ের জন্য রাজি ই হয় না।” “আবিরের পছন্দ আছে নাকি?” মালিহা খান উদাস ভঙ্গিতে বললেন, “আমি আবিরকে জিজ্ঞেস করেছি ভাবি। আবিরের

আব্বু সরাসরি কিছু না বললেও ছেলের পছন্দ আছে কি না এ বিষয়ে ওনি নিজেও কয়েকবার জানতে চেয়েছেন কিন্তু আবির কিছুই বলে নি। উল্টো দুই ভাইয়ের মধ্যে ঝামেলা সৃষ্টি করছে।" "কি করেছে?" "একদিকে আবির বিয়েতে রাজি হয় না, অন্যদিকে মেঘের আব্বু মেঘের জন্য সম্বন্ধ দেখছে এসব নিয়ে আবিরের আব্বু আর মেঘের আব্বুর মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়ছে। এরপর থেকে দুই ভাই ই নিরব। বিয়ে বিষয়ক আলোচনা বন্ধ।" মেঘ বড় আম্মুর দিকে তাকিয়ে শক্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করল, "বড় আব্বু আর আব্বুর মধ্যে ঝগড়া হয়েছে? কবে? আমি কোথায় ছিলাম?" "তেমন সিরিয়াস ঝগড়া না। কথা কাটাকাটি হয়ছিল। তোরা বাহিরে ছিলি। আমিও বিস্তারিত শুনি নি আর তোর বড় আব্বু আমাকে তেমন কিছু বলেও নি।" মেঘ বোকার মতো কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো। মনে মনে ভাবছে, "এজন্যই কি আম্মু সেদিন বিয়ের কথা বলতে নিষেধ করেছিলো?" আবিরের আম্মু আর মামি আবারও নিজেদের মতো গল্প করছেন। মেঘ সোফার পাশ থেকে নিজের ফোনটা হাতে নিয়ে লুকিয়ে আবিরকে মেসেজ লিখেছে, " বড় মামি আর মালা আপু আমাদের বাসায় আসছেন। বড় মামি আপনার বিয়ের....." লেখা অসমাপ্ত রেখেই মেসেজ পাঠিয়ে দিয়েছে। ফোন উল্টিয়ে রেখে পূর্বের ন্যায় আবারও বড় আম্মুর গা ঘেঁষে বসেছে। মালিহা খান ধীরেসুস্থে মেঘের চুলে হাত বুলাচ্ছেন। ৪ থেকে ৫ মিনিট পরেই মেঘের হাতে থাকা ঘড়ি কম্পিত হচ্ছে। ঘড়ির স্ক্রিনে ভেসে উঠেছে, You received 1 message from Amar Abir..... মেঘ

বুঝে উঠার আগেই মালার নজর ঘড়িতে পড়লো। মালা কপাল গুটিয়ে রাগান্বিত দৃষ্টিতে মেঘের ঘড়ির স্ক্রিনে তাকিয়ে আছে। মেঘ ঘড়ির স্ক্রিনে তাকিয়ে নিজের অজান্তেই লাফিয়ে উঠেছে। আজ ১৭ দিন পর আবির মেসেজের রিপ্লাই করেছে মহানন্দে মেঘের বুকের ভেতর হৃদপিণ্ডটা ছটফট করছে। খুশিতে চোখের কোণে পানি চলে এসেছে। প্রিয় মানুষটার নিজের হাতে কিনে পড়িয়ে দেয়া ঘড়িটায় আজ সেই মানুষটার নাম ভেসে ওঠায় মেঘের উজ্জ্বল মুখশ্রী আরও বেশি ঝলমল করছে। মেঘ ফোন হাতে নিয়ে এলোমেলো পায়ে সিঁড়ি পেরিয়ে নিজের রুমের দিকে ছুটছে। মালা নির্বাক চোখে মেঘকে দেখছে। মালিহা খান তপ্ত স্বরে বললেন, "আস্তে যা। পড়ে যাবি তো।" আবিরের মামি কপাল গুটিয়ে চিন্তিত কণ্ঠে বললেন, "মেঘের হঠাৎ কি হলো? এভাবে ছুটছে কেনো?" মালিহা খান মৃদু হেসে বললেন, "ও এমনই। ওর ছোটাছুটির কারণ লাগে না। হয়তো কিছু একটা মনে পড়ছে এজন্য এভাবে ছুটছে। একটু পরেই চলে আসবে।" মেঘ রুমে ঢুকেই উত্তেজিত হস্তে মেসেজ সীন করলো। আবিরের ছোট রিপ্লাই আসছে, "আমার বিয়ের ব্যাপারে কি বলছে?" মেঘের শরীর রীতিমতো কাঁপছে, ঠোঁটে স্মিথ হাসি ফুটে উঠেছে, দুচোখ জ্বলজ্বল করছে। মেঘ গলা খাঁকারি দিয়ে আস্তে করে বলল, "মি. খান আমি ঠিক জানতাম, এই কথা বললে আপনার রিপ্লাই আসবেই আসবে।" মেঘ কাঁপা কাঁপা হাতে মেসেজ লিখছে, "আপনার বিয়ের জন্য মেয়ে দেখার কথা বলছে। তাছাড়া মালা আপু....." আবিরের তৎক্ষনাৎ রিপ্লাই, "মালা

কি করছে?” “আপনাকে মিস করছে।” আবির রাগী ইমোজি পাঠিয়ে পরপর মেসেজ পাঠালো, “ফাজলামো করবি না। মালা কি আজেবাজে কিছু বলছে?” “হুমমমম।” “কি বলছে?” মেঘের আর কোনো রিপ্লাই নেই। আবির পর পর মেসেজ দিচ্ছে, মেঘ রিপ্লাই করছে না। বাধ্য হয়ে আবির কল দিয়েছে। মেঘের বামহাতে থাকা ঘড়ি আর ডানহাতে থাকা ফোন একসঙ্গে ভাইব্রেশন হচ্ছে। আবিরের কল দেখে মেঘ কিছু সময়ের জন্য থমকালো। বুকের বা পাশের তীব্র কম্পন উপেক্ষা করে চোখ পিটপিট করে কল রিসিভ। সঙ্গে সঙ্গে ওপাশ থেকে আবিরের রাগান্বিত কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে, “সমস্যা কি তোর? ত্যাড়ামি করাটা কি তোর স্বভাব হয়ে গেছে? আমার অপছন্দ জেনেও অনবরত এই কাজগুলো করেই যাচ্ছিস। কথা অসম্পূর্ণ রাখার অভ্যাস টা কবে ত্যাগ করবি?” মেঘ মোলায়েম কণ্ঠে শুধালো, “কেমন আছেন?” আবির রাগান্বিত কণ্ঠে হুঙ্কার দিল, “তুই কি ভালো থাকতে দিচ্ছিস?” মেঘ অভিমানী কণ্ঠে বলল, “আমি কি আপনাকে খুব বেশি জ্বালাতন করি?” আবির উত্তর না দিয়ে উল্টো প্রশ্ন করল, “মালা কি বলছে?” মেঘ ঢোক গিলে ভেজা কণ্ঠে বলল, “আমি আপনাকে খুব বেশি জ্বালায়। আমার অত্যাচারে আপনি নিজের রুমে তালা দিয়ে গেছেন। এমনটায় বুঝিয়েছে।” আবির দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে রাশভারি কণ্ঠে বলতে শুরু করল, “রুমে প্রয়োজনীয় অনেক জিনিসপত্র এলোমেলো করে রেখে আসছি। রুম খোলা রেখে আসলে যে যার মতো ঢুকে কাগজপত্র নষ্ট করে ফেলতো। আর হ্যাঁ তানভিরের কাছে চাবি আছে যখন ইচ্ছে

রুমে যাস তবুও দয়া করে মানুষের কথায় গাল ফুলিয়ে কান্না করিস না, প্লিজ।” মেঘ আকুল কণ্ঠে বলে উঠল, “আমার কান্না নিয়ে আপনার এত চিন্তা তাহলে এতদিন কথা কেনো বলেন নি?” “তোকে বারবার বারণ করা স্বত্তেও আমার কথা অমান্য করেছিলি কেনো? তুই ভালোভাবেই জানিস, আমি যা বলি তাই করি। তোকে এত বুঝানোর পরও যেহেতু আমার কথা অমান্য করেছিস তাই আমিও কথা বলি নি।” মেঘ কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে বলল, “আপনি যাওয়ার সময় আমায় ডাকলেন না কেনো? আমায় ঘুমের মধ্যে রেখে কেনো চলে গিয়েছিলেন? এতটা হৃদয়হীন কিভাবে হতে পারলেন? আপনার বুক কি একটুও কাঁপলো না?” আবির ঢোক গিলে শীতল কণ্ঠে জবাব দিল, “কেউ কি জানে, তার একজোড়া ক্রন্দিত নেত্র আমার সুস্থির ব্রহ্মাণ্ডে তোলপাড় চালাতে সক্ষম। কান্নাভেজা ঐ আঁখি যুগলের মুখোমুখি হওয়ার সামর্থ্য আমার ছিল না। তাই বাধ্য হয়ে হৃদয়হীনের মতো ই পালিয়ে এসেছি।” আবিরের ভেজা কন্ঠস্বর কানে বাজতেই মেঘ নিজের চোখ মুছে আহ্লাদী কণ্ঠে বলে উঠল, “কেউ কি জানে, তার জন্য আমি কি পরিমাণ কান্না করেছি?” “কান্নারও পরিমাণ হয় বুঝি? তা কত বালতি পানি জমেছিল?” মেঘ তড়িৎ বেগে জবাব দিল, “৯ বালতি।” আবির মলিন হেসে বলল, ” ইসস আর এক বালতি হলে ভালো হতো।” মেঘ আচমকা কান্না শুরু করেছে। আবির অতর্কিতে প্রশ্ন করল, “এই কি হয়েছে? কান্না করছিস কেনো?” মেঘ কাঁদতে কাঁদতে অস্পষ্ট কণ্ঠে বলে উঠল, “আপনি না বললেন, আর এক বালতি পানি

জমালে ভালো হতো।” আবির শক্ত কণ্ঠে ধমক দিল, “এ বেলায় কথা মানতে উঠেপড়ে লাগিস। অন্য বেলায় কি হয়?” মেঘ ভেজা চোখে ফিক করে হেসে উত্তর দিল, “ভূ*তে পায়।” “আমারও তাই মনে হয়। বাসায় ফিরে আগে আপনার ভূ*ত টাকে বিদায় করতে হবে। মামির শরীর কেমন?” “এখন আলহামদুলিল্লাহ ভালো। সিরিয়াস কোনো সমস্যা নেই। আপাতত ডাক্তার কিছু ঔষধ লিখে দিয়েছেন।” আবির ঠান্ডা কণ্ঠে শুধালো, “আপনার শরীর কেমন?” মেঘের ঠোঁটে আবারও হাসি ফুটলো। আদুরে ভঙ্গিতে বলল, “আলহামদুলিল্লাহ, ভালো ছিল তবে এখন খুব ভালো।” “সাবধানে থাকবেন। আর একটা কথা।” “জ্বি বলুন।” “মালা পর্যন্ত আমার নাম্বারটা যেন না পৌঁছায়।” “পৌঁছালে কি হবে?” “তেমন কিছু না। হোয়াটসঅ্যাপে দিনে কমপক্ষে ১০-১৫ বার কল আসবে, আমি বসে বসে কল রিসিভ করবো। প্রতিবার ১ ঘন্টা করে কথা বললে জাস্ট ১০ থেকে ১৫ ঘন্টা কথা হবে। তারপর ৮ ঘন্টা ঘুমাবো আর ১ থেকে ২ ঘন্টা অন্যান্য কাজ করব।” মেঘ দাঁতে দাঁত চেপে বিড়বিড় করে বলল, “আর আমি পেঁয়াজ, মরিচ দিয়ে আপনাদের কলিজা ভুনা করে এলাকার কুকুরগুলোকে খাওয়াবো।” আবির নিঃশব্দে হেসে শুধালো, “কিছু বলছেন?” মেঘ দাঁতে দাঁত চেপে রাগী স্বরে জবাব দিল, “বলছিলাম মাত্র ১৫ ঘন্টা কেনো কথা বলবেন, বললে পুরো ২৪ ঘন্টায় কথা বলিয়েন। ঠিক আছে?” আবির এবার শব্দ করে হাসলো। পরপর উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলে উঠল, ” মনে হচ্ছে কিছু পুড়তেছে। আমি এখান

থেকেও পুড়া পুড়া গন্ধ পাচ্ছি। কি পুড়ছে?” মেঘ রাগান্বিত কণ্ঠে জবাব দিল, “আপনার নাক একটু বেশিই এডভান্স। কলিজা ভুনা এখনও বসায় নি, ওয়েট একটু পর বসাবো।” জিভ দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে আবির মৃদুস্বরে বলল, “ম্যাম, কলিজা ভুনায় মনে করে লবণ দিয়েন।” মেঘ ফোঁস করে উঠল, “আরও বেশি টেস্টি করতে একটু বিষও দিব নে।” বলেই মেঘ কল কেটে দিয়েছে, রাগে ফোঁস ফোঁস করছে। আবিরের হাসি থামছেই না, হাসতে হাসতে বিছানায় হেলান দিয়ে বসেছে। আজ অফ ডে বলে আবিরের কাজের তেমন চাপ নেই। নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে খানিক বাদে আবারও মেঘকে কল দিল। কল বাজতে বাজতে শেষ পর্যায়ে মেঘ কল রিসিভ করল সঙ্গে সঙ্গে আবির মোলায়েম কণ্ঠে ডাকলো, “ম্যাম।” মেঘ নিশ্চুপ। আবির আদুরে কণ্ঠে আবারও ডাকল, “ম্যা....ম” আবিরের কণ্ঠে আদুরে ডাক শুনে মেঘের বুকের ভেতরের ধুকপুকানি বেড়ে গেছে। মন খারাপ, রাগ, অভিমান, খারাপ লাগা মুহুর্তেই সব উধাও। অনুভূতিদের পাশ কাটিয়ে মেঘ কাঠকাঠ গলায় প্রশ্ন করল, “কিছু বলবেন?” “হুমমমমম।” “বলুন।” “বলছিলাম, রান্নার টেস্ট বাড়াতে বি*ষ টা ব্যবহার না করলে হয় না?” “বি*ষ ব্যবহার করলে কি হবে?” “না মানে, কেউ লবণ চেক করতে গেলে তো সাড়ে সর্বনাশ হয়ে যাবে।” মেঘ রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে বলল, “আপনি এসব বলতে আবারও কল দিয়েছেন? রাখছি আমি। ” আবির তড়িৎ বেগে ডাকলো, “শুনো...!” আবিরের মুখে তুমি সম্বোধন শুনামাত্রই মেঘের দু চোখ প্রশস্ত হয়ে গেছে। মুহুর্তেই শ্বাস থেমে

গেছে,হতভম্ব মেঘের মস্তিষ্কে অনুভূতিদের তোলপাড় চলছে। চোখের পাতায় জ্বলজ্বল করছে আবিরের হাস্যোজ্জ্বল আদলখানা। । দুরুদুরু কাঁপছে বুক, চোখে মুখে রাগের রেশ মাত্র নেই। আবির তৎক্ষনাৎ ঠান্ডা কণ্ঠে বলল, "অতি সামান্য কারণে যেভাবে রেগে যান ভবিষ্যতে কি হবে, ম্যাম? " মেঘ চোখ কুঁচকে জানতে চাইলো, "কি হবে?" "সদা আশঙ্কাজনক পরিস্থিতিতে থাকতে হবে।" আবির চটজলদি গম্ভীর কণ্ঠে বলে উঠল, " আবারও বলছি, মালা পর্যন্ত আমার নাম্বার পৌঁছালে সব দায়ভার আপনার। মনে থাকে যেনো।" মেঘ চিন্তিত কণ্ঠে শুধালো, "বড় আম্মুর থেকে নাম্বার নিয়ে নিলে?" "আমি আম্মুকে বারণ করেছি আম্মু কাউকে নাম্বার দিবে না। অন্য কারো কাছে নাম্বার চাওয়ার সাহস মালার হবে না। একমাত্র আপনি আছেন, অনুগ্রহ করে আপনিও দিবেন না।" "ওহ আচ্ছা। এজন্যই বড় আম্মু আমাকে নাম্বার দিচ্ছিলো না। তাতে কি আমি তো নাম্বার দেখেই মুখস্থ করে ফেলেছি।" "আমি কারো নাম উল্লেখ করি নি তাই আম্মুও বুঝতে পারে নি। আপনি যে নাম্বার মুখস্থ করার পাবলিক এটা আমি জানি। তাছাড়া আমি নিজেই আপনাকে কল দিতাম। কিন্তু আপনার অসুস্থতার কথা শুনে... " "কোনো ব্যাপার না। কিন্তু মালা আপু আমার কাছে নাম্বার চাইলে কি বলবো?" "এটাও আমার শিখিয়ে দিতে হবে?" "না, একদম না। এখন রাখি?" " আচ্ছা।" মেঘ ফের বলল, "শুনুন। " "জ্বি ম্যাম, বলুন" "রাতে কল দিলে রিসিভ করবেন? নাকি আবারও রাগ করে বসে থাকবেন ?" আবির কপাল গুটিয়ে মৃদুস্বরে বলল, "ফ্রী হয়ে

মেসেজ দিয়েন। ” “আর একটা কথা। ” “হুমমমমম।” মেঘ কাঁপা কাঁপা গলায় আস্তে করে বলল, “মিস ইউ।” বলেই কল কেটে দিয়েছে। আবির মলিন হেসে ফোনের স্ক্রিনে তাকালো। মেঘের শাড়ি পড়া একটা ছবি ফোনের ওয়ালপেপার দেয়া, আবির অপলক দৃষ্টিতে ছবিটার দিকে তাকিয়ে আছে। অতর্কিতে হাসি থামিয়ে কম্পিত কণ্ঠে বলল, “My dear sparrow, I feel empty without you.” কথা শেষ করে মেঘ আবারও নিচে নামলো। ততক্ষণে মাইশারা চলে আসছে। মাইশাকে দেখেই মেঘ ছুটে গেল। মাইশা হালকা রঙের একটা জামদানি শাড়ি পড়ে এসেছে, ৪ মাসের অন্ত:সত্ত্বা হওয়ায় আগের থেকেও বেশ কিউট লাগছে। মেঘ আপুকে ভালোভাবে পরখ করে আহ্লাদী কণ্ঠে বলল, “ভাইয়া- আপু, ভাইগ্না অথবা ভাগ্নীকে সর্বপ্রথম আমি কোলে নিতে চাই। আদির পরে আমি এখনও কোনো ছোট বাবু কাছ থেকে দেখি নি। আমাকে জানাবেন, প্লিজ।” মাইশা আর তার হাসবেন্ড একসঙ্গে হেসে উঠলো। ভাইয়া বললেন, “ইনশাআল্লাহ, বাবুকে প্রথমেই তোমার কোলে দিব। ” ” ইনশাআল্লাহ। ” মাইশারা সারাদিন শেষে বিকেল দিকে বাসার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছে। মামা, মামিরাও বাড়িতে চলে যাবেন। আলী আহমদ খান আর মোজাম্মেল খান অফিসে থাকলেও দুপুরে বাসায় এসে সবার সঙ্গে খাওয়াদাওয়া করেছেন। যাওয়ার আগে আগে মালা হঠাৎ মেঘকে ডেকে শক্ত কণ্ঠে বলল, “আবির ভাইয়ার নাম্বারটা দাও তো।” মেঘ কপাল গুটিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে বলল, ” ওনার নাম্বার দিয়ে

আপনি কি করবেন?” “কথা বলবো।” মেঘ ফোঁস করে শ্বাস ছেড়ে স্বাভাবিক স্বরে বলল, “ওনি প্রজেক্টের কাজে ব্যস্ত আছেন। আপাতত আত্মীয় স্বজনদের সাথে কথা বলার সময় নেই ওনার।” মালা বিরক্ত হয়ে শুধালো, “তোমার সাথে কথা বলার সময় আছে?” মেঘ কপালের মাঝ বরাবর ভাজ ফেলে মেকি স্বরে বলল, ” আমার সাথে কথা না বললে ওনার রাতে ঘুম ই হয় না।” মেঘ যে ইচ্ছেকৃত রাগানোর জন্য এসব বলছে এটা বুঝতে মালার বেশি সময় লাগলো না। মালা তৎক্ষনাৎ রাগান্বিত কণ্ঠে বলল, ” যত যাই বলো, ভাইয়ার নাম্বার আমি সংগ্রহ করেই নিব। আগেও কত রাত ভাইয়ার সাথে আনলিমিটেড কথা বলেছি তার হিসেব নেই, এবারও তাই হবে। ঘুম পাড়ানোর জন্য প্রয়োজনে ভাইয়াকে ঘুমের ঔষধ সাজেস্ট করবো।” মেঘ ভেতরে ভেতরে রাগলেও রাগটা প্রকাশ করল না। ফিক করে হেসে বলল, “চেষ্টা করে দেখতে পারেন। হতেও পারে ওনার হার্টবিট আপনার দেয়া ঘুমের ঔষধের পাওয়ারকেও হার মানিয়ে দিল।” মালা কটমট করে বলল, “তুমি যে কোন ভরসায় এসব বলো আল্লাহ ই ভালো জানেন। ” অকস্মাৎ মেঘের ঘড়িতে আবিরের মেসেজ আসছে, “All okay? ” মেঘ মালার দিকে ঘড়ি টা এগিয়ে দিয়ে মোলায়েম কণ্ঠে জবাব দিল, “এই ভরসায়।” নামের জায়গায় শুধু Amar Abir লেখাটায় ভাসছে। মালা কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে মিনমিন করে বলল, “ফোনে আমার আবির লিখে রাখলেই আবির ভাইয়া তোমার হয়ে যাবে না।” আরও কি কি বিড়বিড় করতে করতে মালা বেড়িয়ে গেছে। মেঘ

মুখ ফুলিয়ে সেদিকে তাকিয়ে আছে। সত্যিই তো, ফোনে আমার আবির..... ভাই নামটা গত দের বছর যাবৎ ই সেইভ করে রেখেছে। নতুন নাম্বারটাও একই নামে সেইভ করেছে কিন্তু তাতে সম্পর্কের কোনো উন্নতি হচ্ছে না। আবিরের অন্তর্নিহিত অনুভূতি বুঝার সক্ষমতা মেঘের হয়েছে ঠিকই কিন্তু আবির যতদিন না নিজের অনুভূতি প্রকাশ করছে ততদিন মেঘের আত্মবিশ্বাস আসবে না। জোর গলায় নিজেকে যতই আবিরের প্রেমিকা বলুক না কেনো, দিনশেষে এটায় সত্যি আবির তাকে কোনো প্রকার প্রতিশ্রুতি দেয় নি। মেঘ মুখ ফুলিয়ে রুমে চলে গেছে। শেষ বিকেলের দিকে একটা হ্যান্ড পার্টস আর সাথে দুটা ফাইল আর কিছু কাগজপত্র নিয়ে বন্যা আপনমনে হাঁটছে। আচমকা নজর পরে অনেকটা সামনে তানভিরের মতো কেউ একজন ফোনে কথা বলতে বলতে যাচ্ছে। সিউর হওয়ার জন্য বন্যা দ্রুত পায়ে এগিয়ে যাচ্ছে। ছেলেদের হাঁটার স্বাভাবিক গতির সাথে মেয়েদের দৌড়ের গতি মোটামুটি সমান ধরা যায়। রাস্তায় দৌড়াতে পারছে না তবে যথাসাধ্য দ্রুত হেঁটে তানভিরের বেশ কাছাকাছি চলে এসেছে। পেছন থেকে ২-৪ বার ডেকেওছে কিন্তু সেই ডাক তানভিরের কর্ণকুহরে পৌছায় নি। বন্যা এবার থেমে শ্বাস টেনে উচ্চস্বরে ডাকল, ” ঐ ভিলেন। ” মেয়েলী কণ্ঠস্বর কানে বাজতেই তানভির উদ্দেশ্যহীনভাবে পেছনে ঘুরলো। বন্যাকে দেখেই থমকে দাঁড়ালো। ভ্রু কুঁচকে কল কেটে কপট রাগী স্বরে জানতে চাইল, “কোনদিক থেকে ভিলেন মনে হয় আমায়?” “কখন থেকে ডাকছিলাম, আপনি শুনছিলেন

ই না। তাই বাধ্য হয়ে ডাকলাম।” “হঠাৎ আমাকে ডাকার কারণ?” “এমনি। আপনার বাইক কোথায়?” “একটা ছোটভাই নিয়ে গেছে। কোনো?” “এমনি। জিজ্ঞেস করতে পারি না?” তানভির মলিন হাসলো। কিছু একটা ভেবে গম্ভীর কণ্ঠে বলল, ” সন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে, বাসায় চলে যেও। আসছি।” তানভিরের এমন ব্যবহারের আগামাথাও বন্যা বুঝলো না। কিছুক্ষণ ভাবার পর হঠাৎ পূর্বের ঘটনাগুলো মনে পড়লো। বন্যা সহসা ডাকল, “এইযে” তানভির ঘাড় ঘুরিয়ে বিমুঢ় দৃষ্টিতে বন্যার দিকে তাকালো। বন্যার মুখের মায়াবী হাসিতেই তানভিরের হৃদয় দুরুদুরু কাঁপছে। তানভির উত্তর না দিয়ে খানিক ভ্রু নাচালো। বন্যা এক গাল হেসে বলল, “ঝালমুড়ি খাবেন?” তানভিরের তাৎক্ষণিক উত্তর, “নাহ।” “তাহলে ফুচকা?” “না।” “চটপটি?” “না।” “চা?” “না।” বন্যা এবার খানিক রেগে গেছে। চোখের পাতা ঝাপটে আনমনেই বলে উঠল, “তাহলে কি সিগারেট খাবেন?” তানভির প্রশস্ত নেত্রে বন্যার দিকে তাকিয়ে শক্ত কণ্ঠে শুধালো, “কি বললে?” বন্যা উত্তর না দিয়ে অন্যপাশে তাকিয়ে লজ্জায় আর আতঙ্কে নিজের মুখ চেপে ধরেছে। নিজের প্রতি অতিষ্ঠ হয়ে ঘনঘন নিঃশ্বাস ছাড়ছে। তানভির স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে আছে, বন্যাকে আপাদমস্তক দেখে মুচকি হেসে বলল, ” সিগারেট খেতে পারি যদি তুমি আমার সঙ্গে খাও।” অপ্রত্যাশিত কথায় বন্যা স্যাট করে তানভিরের অভিমুখে তাকালো। চোখ স্বাভাবিকের তুলনায় বেশ বড় আকার ধারণ করেছে, গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। বেসামাল পরিস্থিতি সামলে বন্যা দৃঢ় কণ্ঠে

শুধালো, “ছিঃ! আপনি সিগারেটও খান?” “তুমি খাওয়াতে চাচ্ছো তাহলে আমার খেতে সমস্যা কোথায়?” বন্যা মাথা নিচু করে জড়সড় হয়ে বলল, ” মুখ ফস্কে বেরিয়ে গেছে, সরি। ” “এতদিন মানুষকে মুখ ফস্কে অনেককিছু বলতে শুনেছি। আজ প্রথমবার কোনো মেয়ে মুখ ফস্কে সিগারেট অফার করছে। বিষয়টা বেশ ইন্টারেস্টিং। চলো, সামনে থেকে দুটা সিগারেট নিচ্ছি। ” বন্যা আতঙ্কিত কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল, “নাহ, আমি যাব না।” বন্যার চেঁচানোর শব্দে তানভির আঁতকে উঠে বুকে হাত রেখে আশেপাশে তাকিয়ে ঠান্ডা কণ্ঠে বলল, “যেভাবে চিৎকার করছো, মানুষ তো অন্যকিছু ভাববে।” বন্যা আস্তে করে বলল, “যার যা খুশি ভাবুক, আমি সিগারেট খাব না।” তানভির স্ব শব্দে হেসে বলল, “ঠিক আছে। এবারের মতো ছেড়ে দিলাম। এরপর মুখ ফস্কে সিগারেটের কথা বললে সত্যি সত্যি টেস্ট করাবো।” “এগুলো ঠিক না। আপনি এসব করতে পারেন না।” “বাহ রে! ডাকবা ভিলেন আর কিছু বললে ই ন্যায়-অন্যায়ের জ্ঞান দিবা তা তো মানবো না।” বন্যা বিরক্ত হয়ে বলল, “দেখুন, আমি আপনাকে ট্রিট দিতে ডেকেছিলাম। আপনি ইচ্ছেকৃত আমার সাথে এমন ব্যবহার করছেন। ” তানভির সূক্ষ্ম নেত্রে তাকিয়ে দৃঢ় কণ্ঠে শুধালো, “আমি আবার কি করলাম?” ” যাই অফার করছি শুধু না ই করে যাচ্ছেন।” ” আমার সাথে চলাচলে যার অস্বস্তিবোধ হয়, আমাকে যার অসহ্য লাগে। আমি তার থেকে দূরত্ব বজায় রেখে চলার চেষ্টা করি।” বন্যা উদ্বিগ্ন কণ্ঠে শুধালো, “আমি কি একবারও বলেছি আপনাকে

অসহ্য লাগে? নাকি বলেছি আপনি আমার অস্বস্তির কারণ?” তানভির স্থির দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে অকস্মাৎ হেসে বলল, ” চলো।” “কোথায়?” “বাহ! ট্রিট না দিবা বললা। এখন এটা বলো না যে মুড নেই বা সময় নেই। ” বন্যা ঠিক এই কথাটায় বলতে চেয়েছিল। মুখের কথাটা গিলে শান্ত স্বরে বলল, ” কি খাবেন?” “ঝালমুড়ি, ফুচকা, চটপটি এনিথিং।” বন্যা ভ্রু গুটিয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো। মনে মনে তানভিরকে অল্পস্বল্প বকেও নিলো। মেঘ আর তার ভাইয়ের স্বভাবে বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই। দুজনই বেশ অভিমানী, মেঘ মেয়ে বলে অভিমান টা একটু বেশিই প্রকাশ পায়। ঝালমুড়ি হাতে দুজনেই পাশাপাশি দুটা চেয়ারে বসা। এক প্লেট ফুচকা আর একটা চটপটিও অর্ডারও দিয়েছে। তানভির ঠান্ডা কণ্ঠে শুধালো, “হঠাৎ আমাকে ট্রিট দেয়ার কারণ কি?” বন্যা ঢোক গিলে আস্তে করে বলল, ” সেদিন আপনাকে চা খেতে বলি নি বলে আপনার বোন আমায় কতগুলো কথা শুনিয়েছে তাই আজ...” তানভির ভ্রু গুটিয়ে ধীর কণ্ঠে জানতে চাইল, ” বনু তোমায় কথা শুনিয়েছে? কি বলেছে?” তানভির নিরেট দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। তানভিরের দৃষ্টি দেখে বন্যা থতমত খেয়ে হাসার চেষ্টা করল। হাসিমুখে বলল, “তেমন কিছু না। আসলে সেদিন আমার তরফ থেকে সবাইকে চায়ের ট্রিট ছিল তাই স্বাভাবিকভাবেই আমার আপনাকে চা অফার করা উচিত ছিল।কিন্তু আমি সেটা করি নি তাছাড়া বিল দেয়ার বিষয়টা নিয়ে মেঘ একটু রেগে গেছিলো।” “বনুর কথায় কিছু মনে করো না, প্লিজ।” বন্যা ঠোঁট

উল্টিয়ে বিদ্রূপের ভঙ্গিতে বলে উঠল, " ওহ আচ্ছা। ঠিক আছে। কিছু মনে করলাম না। ওকে?" "কি সমস্যা? এভাবে কথা বলছো কেন?" " এমনি। " তানভির সূক্ষ্ম নেত্রে তাকিয়ে শুধালো, "এমনি বলাটা কি তোমার স্বভাব? " বন্যা উপর নিচ মাথা নাড়লো। তখনি বন্যার বড় আপুর কল আসছে। বন্যা স্বাভাবিকভাবেই কল রিসিভ করে কথা বলছে। ইতিমধ্যে ফুচকা আর চটপটি দিয়ে গেছে। বন্যা কথা শেষ করে চটজলদি ২-৩ টা শিট বের করে তানভিরের হাতে দিয়ে বলল, "এগুলো মেঘকে দিয়ে দিয়েন। কাল ভার্সিটি বন্ধ, পরশু একটা ক্লাস টেস্ট আছে। পড়ে নিতে বলবেন।" তানভির গাল ফুলিয়ে নির্বোধের মতো বন্যাকে খানিক দেখে গম্ভীর কণ্ঠে বলে উঠল, " এত সমাদরের রহস্য তবে এই ছিল? স্বার্থপর মেয়ে কোথাকার। " বন্যা ফুচকা খেতে খেতে আড়চোখে তানভিরের দিকে তাকিয়ে বলতে শুরু করল, " একদম স্বার্থপর বলবেন না। নিজের বোনকে তো ঠিকই যত্নে রাখেন, প্রয়োজন ছাড়া বাসা থেকে বের ই হতে দেন না। ২-৩ টা শিটের জন্য এতটা রাস্তা পেরিয়ে আমাকেই আপনাদের বাসায় যেতে হতো আর নয়তো পিডিএফ দিতে হতো। সেই পিডিএফ আবার আপনাকেই প্রিন্ট আউট করে আনতে হতো। যেহেতু আপনাকে পেয়েছি, তাই আপনাকে দিয়ে দেয়াটায় বেস্ট অপশন ছিল। আমি চাইলেই রাস্তায় ডেকে ২ টা শিট আপনাকে ধরিয়ে দিয়ে চলে যেতে পারতাম। যদি সেই কাজটা করতাম তবে স্বার্থপর বলতে পারতেন। আমি আপনাকে ট্রিট অফার করলাম, ৪০ মিনিট সময় দিলাম অতঃপর সেই শিটগুলো দিচ্ছি।

তারথেকেও বড় কথা শিটগুলো আপনার বনুর প্রয়োজন। তাহলে আমি স্বার্থপর কিভাবে হলাম?" "যেভাবে যুক্তি দেখিয়ে ঝগড়া করছ, আমার মনে হচ্ছে তোমার উদ্ভিদবিজ্ঞান সাবজেক্ট না নিয়ে দর্শন সাবজেক্টে অনার্স করা উচিত ছিল।" বন্যা ভ্রু কুঁচকে প্রশ্ন করল, "আমি ঝগড়া করছি?" তানভির ঠোঁট চেপে হেসে বলল, "এটাকে অবশ্য ঝগড়া বলে না তবে তর্কের বিবাদ বলা যায়।" বন্যা সেসবে পাত্তা না দিয়ে ফুচকা খাচ্ছে। তানভির টুকটাক ফুচকা খেতে পারলেও আজ চটপটি নিয়েছে। কারণ এক প্লেট ফুচকা একা শেষ করা তানভিরের পক্ষে সম্ভব না। মেঘদের সাথে বের হলে, মেঘ, মীম আর আদির থেকে অল্প কয়টা খায়। আজ আগেভাগেই চটপটিটা বেছে নিয়েছে। বন্যা ফুচকা শেষ করে উঠতে উঠতে বলল, "আপুদের জন্য একটা পার্সেল নিয়ে বিলটা দিয়ে আসছি, আপনি বসুন।" তানভির তৎক্ষনাৎ বলে উঠল, "বিলটা আমি দেয়?" বন্যা রাগী রাগী মুখ করে তাকাতেই তানভির ঢোক গিলে শান্ত কণ্ঠে বলল, " ঠিক আছে। আমি বসছি, বিলটা তুমিই দিয়ে আসো।" বন্যা মুচকি হেসে চলে গেছে। বিল দিয়ে এসে তানভিরের হাতের শিটগুলো আবারও দেখে নিল। পার্টস আর শিটগুলো হাতে নিতে নিতে শীতল কণ্ঠে বলল, " সরি,সময়ের অভাবে চা খাওয়াতে পারছি না। অন্য কোনোদিন খাওয়াবো, ইনশাআল্লাহ।" তানভির মুচকি হেসে বলল বলল, " চা কিন্তু তোমার হাতের বানানো হতে হবে।" "দেখা যাক। আসছি।" "আমি এগিয়ে দিয়ে আসি?" " তার কোনো দরকার নেই। আপু নিয়ে যাবে আমাকে।" "সাবধানে যেও।"

“আচ্ছা,আপনিও।” বন্যা রাগ করেছে ভেবে, সেদিনের ঘটনা জানতে মেঘকে জিজ্ঞেস করার জন্য মেঘের রুমের সামনে আসতেই তানভির থমকে দাঁড়ালো। মেঘ আপনমনে বন্যার সাথে ফোনে কথা বলছে, দুজনের আবোলতাবোল কথা আর হাসির শব্দে তানভির থম মেরে দাঁড়িয়ে পরেছে। কোথায় ভেবেছিল মেঘ আর বন্যার মধ্যে মান অভিমান চলছে, মেঘের থেকে কারণ জেনে সমাধান করার চেষ্টা করবে কিন্তু ঘটনা সম্পূর্ণ উল্টো। তানভির আস্তে করে গলা খাঁকারি দিয়ে রুমে এসে শিট রেখে চলে যাচ্ছে। মেঘ ঠান্ডা কণ্ঠে শুধালো, “ভাইয়া, কিছু বলবা?” “না” তানভির বিড়বিড় করতে করতে যাচ্ছে, “মায়ের কাছে মাসির গল্প বলে আর কি হবে!” রাত ৯ টা বেজে গেছে। মেঘ আবিরকে কোনো মেসেজ করে নি। কিছুক্ষণ পর আবির ই মেসেজ দিল, “Busy?” মেঘের ছোট রিপ্লাই, “No” তৎক্ষনাৎ আবিরের কল আসছে। মেঘ কল রিসিভ করে চুপচাপ বসে আছে। ওপাশ থেকে আবির বলছে, ” ফ্রী হয়ে মেসেজ দিতে বলছিলাম। বিকেল থেকে মুখ ফুলিয়ে রুমে বসে আছেন, কিছু খানও নি শুনলাম, একটা টেক্সট পর্যন্ত করেন নি। কি সমস্যা? ” “কোনো সমস্যা নেই।” “মালা কি আবারও আজেবাজে কথা বলছে?” মেঘ মুখ ফস্কে বলে ফেলল, “চরিত্রের সমস্যা আপনার, মালা আপু কি বলবে?” আবির উত্তেজিত কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল, “কি? আমার চরিত্রে সমস্যা?কে বলছে? প্রমাণ কি?”মেঘ খানিক চুপ থেকে সন্ধিহান কণ্ঠে বলে উঠল, “মালা আপুর সাথে কত রাত আনলিমিটেড কথা বলেছেন বলতে পারবেন?

মালা আপুর মতো আর কত মেয়ের জীবন নষ্ট করেছেন?” আবির গম্ভীর কণ্ঠে বলল, “রাতভর আনলিমিটেড কথা তাও আবার মালার সাথে? আল্লাহ কোথায় আছো? আমায় উঠায় নেও। এই অবিশ্বাসের দুনিয়ায় আমি আর থাকতে চাই না।” ” ঢং করতেছেন কেনো?বলেন নি কথা? অস্বীকার করতে পারবেন?” “হ্যাঁ বলেছি। তবে শুধুমাত্র মামা,মামি আর মাইশা আপুর সাথে। যেহেতু ফোন মালার ছিল তাই রিসিভ করলে Hi/ hello এটুকু কথায় হতো। এমনকি এই মালার যন্ত্রণায় রাতের বেলা ফোন বন্ধ করে ঘুমাইতাম। বিশ্বাস না হলে বাসার সবাইকে জিজ্ঞেস করতে পারেন। একপর্যায়ে বাধ্য হয়ে নতুন ফোনও নিয়েছিলাম এটা শুধুমাত্র তানভির জানতো।” “আপনি কি বলতে চাচ্ছেন? আপনি নিষ্পাপ? দুধে ধৌয়া তুলসীপাতা?” আবির মৃদুস্বরে বলল, “একদম ই না। আমি নচ্ছার, বদমাশ, ধৃষ্ট, লুচ্চা অথবা লম্পট তবে সেটা শুধুমাত্র একজনের জন্য। সে ব্যতীত পৃথিবীর কেউ আমার দিকে আঙুল তুলে বলতে পারবে না আমি তার দিকে কুনজর দিয়েছি কিংবা তার সাথে বেহুদা কার্যকলাপ করেছি।” “কে সে?” ” কেনো বলবো? কোন এক বৃষ্টিস্নাত রাতে কেউ একজন আমাকে বলেছিল ‘আপনি যা বলবেন, যে অবস্থাতেই বলবেন আমি সাথে সাথে বিশ্বাস করে ফেলবো।’ তার বিশ্বাস এতটায় ঠুনকো যে কেউ কিছু বললেই তার বিশ্বাসের ঘরের বাতি নিভে যায়। তাকে আমি আমার মনের কথা কিভাবে বলবো? সে বরং তার মনের ঘরে অবিশ্বাসই পুষতে থাকুক।” মেঘ আশাহত কণ্ঠে বলল, ” আচ্ছা সরি।” “আজ

সরি বলছেন দু'দিন পর ভুলে যাবেন। দেখা গেল আজ থেকে তিন মাস পর কেউ একজন এসে বলল সে দু মাসের প্রেগন্যান্ট আর তার বাচ্চার বাবা আবির। আপনিও নাচতে নাচতে সে কথা বিশ্বাস করে ফেলবেন। অথচ আবির চারমাস যাবৎ দেশের বাহিরে।" " আমি এতটাও নির্বোধ নয়।" "তা ঠিক কতটুকু চতুর আপনি? আপনাকে রাগানোর জন্য কেউ ইচ্ছেকৃত আজেবাজে কথা বলছে আর আপনি সবকিছু বুঝতে পেরেও রাগ করে বসে আছেন। বাহ! একটা সময় পর্যন্ত মালা আমাকে খুব জ্বালিয়েছে এটা আমি অস্বীকার করছি না। কিন্তু গত ছয়মাসের উপরে মালার সাথে আমার কোনো যোগাযোগ ই হয় নি। এখন বিশ্বাস করা না করা আপনার উপর। " "বললাম তো সরি।" "ঠিক আছে। এখন খেতে যান।" "আপনি খেয়েছেন?" "না খাবো।" "আচ্ছা, আল্লাহ হাফেজ।" "আল্লাহ হাফেজ।" দিন কাটছে দ্রুতগতিতে। প্রত্যেকে নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত। আবির না থাকায় অফিসের কাজের চাপ আলী আহমদ খানকে একা সামলাতে হচ্ছে। মোজাম্মেল খানকে ঢাকা আর রাজশাহীতে দৌড়াদৌড়ি করতে হচ্ছে। তানভির নিজেও প্রচুর ব্যস্ত হয়ে গেছে। পুরোদমে পরীক্ষার প্রিপারেশন নিচ্ছে সাথে আবিরের অফিসের কিছু কাজকর্মও সামলাতে হচ্ছে। তবে মেঘ একদম রিলাক্সে আছে। সকালবেলা আবিরের কলে ই ঘুম ভাঙে তার। টুকটাক কথা বলে উঠে ফ্রেশ হয়ে নামাজ পড়েই পড়তে বসে। সারাদিন ভার্সিটি, ঘুরাঘুরির ফাঁকেও আবিরকে মেসেজের পর মেসেজ করে। আবিরও যথাসম্ভব মেঘের মেসেজের রিপ্লাই দেয়ার

চেষ্টা করে। সারাক্ষণ মেসেজে আর অডিও কলে কথা বললেও কেউ কাউকে ভিডিও কল দেয় না। সন্ধ্যায় বাসার সবার সাথে ভিডিও কলে কথা বললেও মেঘের সাথে তেমন কথা হয় না। মেসেজে করা দুষ্টামির জন্য মেঘ লজ্জায় ভিডিও কলে আবিরের দিকে তাকাতেই পারে না অন্যদিকে আবির কথা বলতে গেলে তুই, তুমি আর আপনি মিক্সড করে ফেলে। আশেপাশে মা -কাকিয়া, মীম, আদি থাকে মাঝে মাঝে আলী আহমদ খানও থাকেন। সবার সামনে এভাবে কথা আঁটকে যাওয়া, মেঘের লাজুক চেহারা দেখে নিজেকে সংযত রাখতে না পারা সবকিছুর জন্য ভিডিও কলে মেঘের সঙ্গে কথা বলতেই চায় না। মাস খানেক কেটে গেছে। তানভিরের ফাইনাল ইয়ারের পরীক্ষা চলছে। আজও পরীক্ষা আছে তাই সময়মতো পরীক্ষা দিতে গেছে। মীমরা কেউ বাসায় নেই। সারাদিন একা একা কিছুই ভালো লাগছে না মেঘের। আবিরের সঙ্গে দুপুরেই কথা হয়েছে, একটু পর মিটিং আছে বলে ঠিকমতো কথাও বলতে পারে নি। মেঘ ফোন হাতে নিয়ে নিচে যাচ্ছিলো, তানভিরের রুম পর্যন্ত এসে হঠাৎ ই থেমে গেছে। রুমের দরজাটা খোলা। মেঘ দরজা থেকে রুমে উঁকি দিতেই দেখল, রুম এলোমেলো হয়ে আছে। সচরাচর মেঘ তানভিরের রুমে যায় ই না, রুম গুছানোর তো প্রশ্ন ই আসে না। রুমের বেহাল অবস্থা দেখে নিজের ই ইচ্ছে হলো রুমটা গুছিয়ে দেয়ার। টেবিল আর বিছানায় বই খাতার ছড়াছড়ি। গতকালের ধৌয়া শার্টগুলোও এমনিই পড়ে আছে। মেঘ গুন গুন করে গান গাইতেছে আর একটা একটা করে শার্ট ইস্ত্রি

করছে। প্রায় ঘন্টা দুয়েক সময় নিয়ে সবকিছু গুছিয়ে শার্টগুলো ওয়ারড্রবে রাখতে গিয়ে দেখল ওয়ারড্রবের অবস্থা আরও খারাপ। শার্ট, প্যান্ট আর টিশার্ট যাচ্ছেতাই অবস্থায় ফেলে রেখেছে। এ পর্যায়ে এসে মেঘের রাগ উঠে গেছে। একটা মানুষ এতটা অযত্নশীল হয় কেমন করে। মেঘ রাগে গজগজ করতে করতে ওয়ারড্রব গোছাচ্ছে। আচমকা একটা ক্যাটালগ দেখে মেঘ থমকে গেল। মেয়েদের ড্রেসের ক্যাটালগ, হাতে নিয়ে ভালোভাবে দেখতেই দুই চোখ প্রসারিত হয়ে গেছে। মেঘ সঙ্গে সঙ্গে নিজের ফোন বের করে ছবি খোঁজতে লাগলো। কিন্তু এত এত ছবির ভিড়ে কাঙ্ক্ষিত ছবি খোঁজে পেলো না তাই ক্যাটালগ টা একপাশে রেখে দ্রুত জামাকাপড় গোছাতে শুরু করলো। কোনোরকমে সব গুছিয়ে ক্যাটালগ আর ফোন নিয়ে নিজের রুমে ছুটলো। ফ্রেশ হয়ে ১৫ মিনিটের মধ্যে রেডি হয়ে বাসা থেকে বেরিয়ে গেছে। হালিমা খান ঘুমাচ্ছিলেন তাই মালিহা খানকেই আপাতত বলে বেড়িয়েছে। রিক্সা নিয়ে সরাসরি বন্যাদের বাসায় আসছে। বন্যাদের বাসায় ও তেমন কেউ নেই। আপু আর আংকেল অফিসে, বন্যার ভাইও খেলতে বেরিয়েছে। অনেকক্ষণ দরজায় ডাকার পর বন্যার আম্মু এসে দরজা খুলে দিয়েছে। মেঘ সালাম দিয়ে ভালোমন্দ জিজ্ঞেস করেই বন্যার রুমের দিকে ছুটলো। বন্যা বেঘোরে ঘুমাচ্ছে। পরপর দুবার ডাকতেই বন্যার ঘুম ভেঙেছে। মেঘকে দেখে বন্যা এক লাফে শুয়া থেকে উঠে বসছে। কথা নেই বার্তা নেই হুট করে বাসায় চলে আসছে এটা যেন অবিশ্বাস্য ঘটনা। বন্যা থতমত খেয়ে জিজ্ঞেস করল, “তুই হঠাৎ

আমাদের বাসায়?” “তোকে দেখতে মন চাচ্ছিলো তাই আসছি।” “সকালেই না দেখা হলো।” ” তাতে কি হয়ছে? আসতে পারি না? এখন কি চলে যাব?” “এই না না। আমি এমনি বললাম। কল দিয়ে জানালিও না হুট করে আসছিস তারজন্য। তোর ভাই জানে?” “না। ভাইয়া পরীক্ষা দিতে গেছে। আচ্ছা শুন, তোর ঈদের ড্রেসটা একটু বের কর তো। যেটা গিফট পাইছিলি। ” “কেনো?” “দেখব একটু।” “ঐ ড্রেস দেখতে বাসায় আসছিস? বললেই ছবি পাঠিয়ে দিতাম।” “তুই বড্ড বেশি কথা বলিস। চুপচাপ ড্রেস বের করে দে। ” বন্যা উঠে ওয়ারড্রব থেকে ড্রেস বের করে মেঘের হাতে দিয়ে ওয়াশরুমে চলে গেছে। মেঘ প্যাকেট থেকে ড্রেস টা বের করতে করতে বন্যা এসে শান্ত কণ্ঠে শুধালো, “কি হয়েছে বলবি?” মেঘ কপট রাগী স্বরে বলল, ” আমার জন্য সেমাই এর বরফি নিয়ে আয়।” ” আছেই কি না কি জানি!” “না থাকলে বানিয়ে নিয়ে আসবি যা এখন।” মেঘের এমন আচরণের মানে বুঝলো না বন্যা। তবুও মেঘের কথা মতো বরফি আনতে নিচে চলে গেল। গতকাল বিকেলে আপু আর বন্যা মিলে সেমাই এর বরফি বানিয়েছিলো। সকালে সেখান থেকেই কয়েকটা মেঘের জন্য নিয়েছিল। কিন্তু মিষ্টি আর মিনহাজ দেখে ফেলায় মেঘের ভাগ থেকে ওদেরকেও ভাগ দিতে হয়েছিল।এদিকে মেঘ ড্রেসটা বিছানার উপর ছড়িয়ে রেখে ব্যাগ থেকে সেই ক্যাটালগ টা বের করে ভালোভাবে পরখ করতে লাগতো। ক্যাটালগ আর ড্রেসে কালার ব্যতীত বিন্দুমাত্র পার্থক্য নেই। মেঘের ঠোঁট জুড়ে মুচকি হাসি, দীর্ঘনিঃশ্বাস

ছেড়ে স্পষ্ট স্বরে বলে উঠল, " ওহ আচ্ছা, বড়লোক বাপের ছেলেটা তবে আমার একমাত্র ভাই তানভির খান ছিল! আমার চোখ ফাঁকি দিয়ে আমার বেস্ট ফ্রেন্ডকে গিফট পাঠানো। দাঁড়াও দেখাচ্ছি!" মেঘ ক্যাটালগ ব্যাগে রেখে ড্রেস টা ভাঁজ করছে আর একা একায় বিড়বিড় করছে। এরমধ্যে বন্যা বরফি আর পিঠা নিয়ে আসছে। বন্যাকে দেখেই মেঘ চুপ হয়ে গেছে। বন্যা ড্রেস ওয়াড্রবে রাখতে রাখতে বলল, "তোর কি হয়েছে আজ?" উত্তর না দিয়ে মেঘ প্রশ্ন করল, "এই ড্রেসের মালিকের সন্ধ্যান পেয়েছিলি?" "নাহ। সন্ধ্যান পেলে তোকে অবশ্যই জানাতাম।" মেঘ খাচ্ছে আর আনমনে হাবিজাবি ভাবছে। বন্যা একা একায় কথা বলছে কিন্তু সেসব কথা মেঘের মস্তিষ্কে ঢুকছেই না। বন্যার আম্মু ডাকছে শুনে বন্যা আবারও নিচে গেল। মেঘের মস্তিষ্কে দ্বিধাদ্বন্দের আনাগোনা চলছে। এই ড্রেস তানভির পাঠিয়েছে এটা ১০০% সিউর। বন্যার প্রতি কেয়ার দেখে মেঘের আগেও সন্দেহ হয়েছিল তবে আজ মোটামুটি নিশ্চিত হয়ে গেছে। কিন্তু বন্যার মনে কি চলছে এখনও বুঝা যাচ্ছে না। এরমধ্যে আবির কল দিয়েছে। মেঘ কল রিসিভ করে উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, "আসসালামু আলাইকুম" "ওয়ালাইকুম আসসালাম।কি ব্যাপার? কোথায় আপনি?" "বন্যাদের বাসায় আসছি।" "কেনো?" "গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল।" "কি কাজ বলা যাবে?" "আপনি জানেন...." এটুকু বলতেই বন্যা রুমে আসছে। মেঘ কথাটা গিলে স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, " আপনার মিটিং শেষ?" "হুমমমম। কি বলতে চাইছিলেন?" "কিছু না। এখন রাখছি পরে কথা

বলব।” মেঘ কল কাটতেই বন্যা চাপা স্বরে বলল, “আজ একটা ‘আপনি’ নেই বলে কেউ ফোন দিয়ে খোঁজও নেয় না। আমাদের বাসায় আসছিল ২০ মিনিটও হয় নি এরমধ্যে ফোন দিয়ে ফেলেছে। এত প্রেম!” মেঘ মেকি স্বরে বলল, ” আমি তোর মতো অনুভূতি চাপিয়ে রাখতে পারি না। তুই কাউকে পছন্দ করলে বল, আপনির ব্যবস্থা না হয় আমিই করে দিব।” “আমার পছন্দের কেউ নেই। এমনি মজা করলাম তোর সাথে। ” “সত্যিই কেউ নেই?” বন্যা সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকিয়ে রাগী স্বরে বলল, “থাকলে কি তোকে বলতাম না?” “কি জানি! নাও বলতে পারিস।” “তোর আজ হয়ছে কি বলবি আমাকে? ত্যাড়া ত্যাড়া কথা কেনো বলছিস?” “কিছু হয় নি।” বন্যা আর মেঘের আরও কিছুক্ষণ আলাপচারিতা চলল। মেঘ আজ তেমন কিছু বলতেই পারছে না। বন্যাকে ভাবি বানানোর চিন্তা একান্তই মেঘের ছিল। কিন্তু তানভির বন্যাকে পছন্দ করে এটা ভেবেই মেঘ আশ্চর্য হচ্ছে। তার থেকেও বড় কষ্ট এটায় যে তানভির আজ পর্যন্ত মেঘকে একটাবার বলার প্রয়োজনও মনে করে নি। তানভির পরীক্ষা শেষে বাসায় ফিরে মেঘকে না পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে কল দিয়েছে। মেঘ ওয়াশরুমে ছিল তাই বন্যা কল রিসিভ করেছে। তানভির উদ্বিগ্ন কণ্ঠে শুধালো, “কোথায় তুই?” “মেঘ আমাদের বাসায় আসছে।” বন্যার কণ্ঠ শুনে তানভির গলা ঝেড়ে বলল, ” আশেপাশে বনু থাকলে ফোনটা দাও।” “আপনার বনু আশেপাশে থাকলে নিশ্চয়ই আমি ফোনটা রিসিভ করতাম না। মেঘ ওয়াশরুমে। ” “ওহ। বের হলে আমাকে কল দিতে বলো।” বন্যা

পরীক্ষার কথা জিজ্ঞেস করতে যাবে তারমধ্যে কল কেটে দিয়েছে। মেঘ আসতেই বন্যা জানিয়েছে। মেঘ কল দিতে গিয়ে খেয়াল করল ফোনে ব্যালেন্স শেষ। ততক্ষণে বন্যা নাস্তার প্লেটগুলো নিয়ে নিচে চলে গেছে। বন্যার ফোনের লক মেঘের জানায় আছে। মেঘ স্বাভাবিকভাবেই বন্যার ফোন হাতে নিয়ে লক খুলে তানভিরের নাম্বার লিখতে শুরু করল। ৫-৬ ডিজিট লিখতেই 'Villain' নামে সেইভ করা তানভিরের নাম্বার ভেসে উঠেছে । মেঘ ভাবলেশহীন চোখে চেয়ে আছে। হাসবে নাকি রাগ করবে সেটাও বুঝতে পারছে না। ভাইয়ের প্রতি অতিরিক্ত ভালোবাসায় রাগটায় প্রকাশ পেলো। বন্যা রুমে আসতেই মেঘ বাজখাঁই কণ্ঠে বলে উঠল, " ভাইয়ার নাম্বার ভিলেন দিয়ে সেইভ করেছিস কেনো?" "এমনি।" "আমার ভাই তোর সাথে কি এমন করেছে?" "কিছুই করে নি।" "তো?" "তো কি আবার? মন চাইছে তাই এই নামে সেইভ করেছি।" মেঘ আনমনে কিছু ভেবে শক্ত কণ্ঠে শুধালো, " আমার ভাই কে কি তোর সহ্য হয় না?ভাইয়ার আচরণে বিরক্ত ? ভাইয়া কি তোর সাথে বাজে ব্যবহার করেছে?" মেঘ প্রশ্নের পিঠে প্রশ্ন করাতে বন্যার কুঞ্চিত ভ্রু যুগল আরও বেশি কুঞ্চিত হলো। কিয়ৎক্ষণ চুপ থেকে বন্যা সুগভীর কণ্ঠে বলল, " তোর ভাইকে সহ্য না হবার মতো কোনো কারণ ই নেই আর না ওনি আমার সাথে বাজে ব্যবহার করেছেন। সেদিন একটা মুভি দেখছিলাম, নায়ককে ভিলেন বলে ডাকে। নায়কটা তোর ভাইয়ের মতো দেখতে তারজন্য এই নামে সেইভ করেছিলাম। ফোন দে ডিলিট করে দিচ্ছি।" মেঘের

ঠোঁট জুড়ে বিশ্বজয়ের হাসি ফুটলো। চক্ষুপল্লব ঝাপ্টে হাস্যোজ্জ্বল মুখে অবিশ্বাস্য কণ্ঠে বলে উঠল, “No problem Baby. ভালোবেসে দিয়েছো যখন পাল্টাতে হবে না। আমার ভাই ভিলেনরূপী নায়ক হলে আমার কোনো আপত্তি নেই।” বন্যা চাপা স্বরে বলল, ” আমি এতকিছু ভেবে দেয় নি। মাথায় আসছে এমনি দিয়েছি। ভালোবাসা আবার কোথা থেকে আসলো।” মেঘ নির্বিকার ভঙ্গিতে শুধালো, “তুই আমার ভাইকে ভালোবাসিস না?” আচমকা মেঘের এমন প্রশ্নে বন্যা কেঁপে উঠলো। পূর্ণ মনোযোগে মেঘের অভিমুখে তাকালো। কোনো উত্তর দিতে পারছে না। শরীর জুড়ে অজানা শিহরণ, মস্তিষ্কের প্রতিটা নিউরনে তোলপাড় চলছে। দাঁতে দাঁত পিষে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছে। আগে হলে মুখের উপর বলে দিত, “না, ভালোবাসি না।” আজ চাইলেও এই দুটা শব্দ বলতে পারছে না। মনে হচ্ছে কেউ মুখ চেপে ধরে আছে। বুকের ভেতর পিনপিন ব্যথা হচ্ছে। মেঘ স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে চোখের পাতা পিটপিট করছে, ঠোঁটে মৃদু হাসি লেগেই আছে।বন্যা কাচুমাচু করে বলে উঠল, ” আমি ওনাকে নিয়ে এমন কিছু ভাবি না।” মেঘ ঠোঁট চেপে হাসি থামিয়ে কিছুটা গম্ভীর কণ্ঠে বলল, “তাহলে কাকে নিয়ে ভাবো সোনা? গলির মোড়ের মোখলেস মিয়াকে নিয়ে?” “মোখলেস মিয়া আবার কে?” ” মনে নেই? সেদিন যে বলল ব্যাটায় তোমাকে ভালোবাসে। বিয়ে করতে চায়!” “What?” “কী?” “কিসের কী?” “ওয়াট অর্থ কী। ” বন্যা মুখ ফুলিয়ে শ্বাস ছেড়ে বলল, “ফাজলামো করছিস?” “তুই ও তো আমার ভাইয়ের জীবন নিয়ে

ফাজলামো করছিস ” “মানে?” “কিছু না। ভাইয়াকে কল দিচ্ছি চুপ কর।” বন্যার ফোন থেকে কল দেয়ায় তানভির রিসিভ করে ধীর কণ্ঠে বলল, “বলো।” “ভাইয়া আমি মেঘ।” “হ্যাঁ, বল।” “তোমার কি মন খারাপ? পরীক্ষা ভালো হয় নি?” “হয়েছে মোটামুটি। তুই যে আম্মুকে না বলে চলে গেলি। আম্মু টেনশন করছিল।” “বড় আম্মুকে বলে আসছি। বড় আম্মু বলে নি?” “বড় আম্মু বাসায় ছিল না। আম্মু কল দিয়েছে তুই নাকি রিসিভ করিস নি।” “আমি ভাবছি আম্মু বকা দিতে কল দিয়েছে তাই রিসিভ করি নি।” “বাসায় কখন আসবি?” মেঘ বন্যার দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বলল, “তুমি এসে নিয়ে যাও।” “আমি চারঘন্টা পরীক্ষা দিয়ে বাসায় আসছি কিছুক্ষণ হলো। এখন বের হওয়ার মতো এনার্জি নেই। তুই রিক্সা করে চলে আয়।” “আমি না হয় চলে আসবো। কিন্তু একজন যে কত কষ্ট করে তোমার জন্য রান্না করছে। তুমি আসলে খাওয়াবে বলে।” বন্যা তড়িৎ বেগে মেঘের মুখ চেপে ধরেছে। তানভির ভ্রু কুঁচকে প্রশ্ন করল, “কে?” মেঘ বন্যার হাত সরিয়ে আস্তে করে বলল, “বন্যা।” “ওহ। তাকে রান্না করতে বারণ কর আর তুই তাড়াতাড়ি বাসায় আয়।” ” আমি কিছু বলতে পারব না। বন্যা এত কষ্ট করে রান্না করছে আর তুমি এমন আচরণ করছ? তুমি এসে আমায় নিয়ে যাবে এটায় ফাইনাল। আর না হয় আমি এখানেই থাকবো। বাই।” বন্যা অগ্নিদৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, “আমি তোর ভাইয়ের জন্য রান্না করছি?” “নাহ।কিন্তু এখন করবি।” “আমি পারবো না।” “আমার একমাত্র ভাই আসতেছে। যত্নের কোনো

ত্রুটি থাকলে তোর আব্বু আম্মু আর বড় আপুকে ইচ্ছেমতো বিচার দিবো সাথে আমার স্পেশাল নাটক ফ্রী। ” “এমনভাবে বলছিস যেন আমি ওনার স্পেশাল কেউ আর ওনার যত্ন নিতে আমি বাধ্য।” মেঘ ব্যাগ নিয়ে বের হতে হতে বলল, “হয়ে যা স্পেশাল কেউ। কে বারণ করেছে?” মেঘ ড্রয়িং রুমে বসে বন্যার আম্মুর সঙ্গে গল্প করছে।আর বার বার বন্যাকে ডেকে বলছে, “ভাইয়ার কিন্তু ডিম বেশি দেয়া নুডলস পছন্দ।” “মশলা চা করিস। এটাও ভাইয়ার পছন্দ। বাকি তোর মর্জি।” বন্যা হাতের কাছে যা যা পেয়েছে তা ই রেডি করছে। অনেকক্ষণ পর তানভির আসছে। কলিং বেল বাজতেই মেঘ ড্রয়িং রুম থেকে ডেকে উঠল, “বন্যা দেখ কে আসছে। ” বন্যার মা বলল, “আমি দেখছি।” “না না আন্টি। আপনি বসুন। বন্যা যাচ্ছে।” অন্য সময় হলে মেঘ নিজেই দরজা খুলতে ছুটতো। কারণ বন্যাদের বাসার সবার সঙ্গে মেঘের সম্পর্ক খুব ভালো। বাসায় আসলে বন্যার থেকেও বেশি বাকিদের সাথে আড্ডা দেয়। বন্যা আর তানভিরকে পরীক্ষা করতে আজ মেঘ ইচ্ছে করেই তানভিরকে বাসায় ডেকেছে। দরজা খুলে বন্যা মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে আছে। তানভির ভ্রু নাচাতেই বন্যা রীতিমতো বিষম খেয়ে উঠলো। তানভির নেভি ব্লু রঙের শার্ট- কালো প্যান্ট পড়ে ফরমাল গেটআপ নিয়ে আসছে। বন্যা কাশতে কাশতে সালাম দিতেই ভুলে গেছে। তানভির কপাল গুটিয়ে বলল, “পানি খাও। ঠিক হয়ে যাবে। ” বন্যা দ্রুত ভেতরে চলে গেছে। মেঘ আড়চোখে ভাইকে দেখেই ভড়কালো। ভাইয়ের এমন গেটআপ দেখে আশ্চর্যের চূড়ায়

পৌছে গেছে। তানভির বন্যার আম্মুর সঙ্গে কথা শেষ করে খাবারগুলো ওনার হাতে দিল। ওনি খাবার নিয়ে রান্নাঘরে চলে গেছেন। তানভির মেঘের পাশে সোফায় বসলো। মেঘ ভ্রু কুঁচকে তানভিরকে দেখেই যাচ্ছে। মেঘ বিস্ময় সমেত জানতে চাইল, "আমরা কি বউ দেখতে আসছি?" তানভির ভ্রু কুঁচকে সূক্ষ্ম নেত্রে তাকিয়ে বলল, " কেনো?" "এভাবে আসছো কেনো?" "ভালো লাগছে না?" "অনেক বেশি ভালো লাগছে। কিন্তু এই গেটআপে কেনো আসছো?" "ধৌয়া শার্টগুলো সব ইস্ত্রি করে রেখেছিস। তাই ভাবলাম ফরমাল গেটআপে আসলে তোর ভালো লাগবে।" মেঘ সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকিয়ে মেকি স্বরে বলল, "আমার ভালো লাগবে তাই? অন্য কোনো কারণ নাই?" "আর কি কারণ থাকবে?" এরমধ্যে বন্যা দুকাপ চা নিয়ে আসছে। মেঘ একটা কাপ হাতে নিতে নিতে ঝটপট বলল, " ভাইয়া চিনি কম খায়। তোকে বলতে মনে নেই। " বন্যা মৃদু হেসে বলল, "চিনি কম ই দিয়েছি।" মেঘ এবার দ্বিতীয় দফায় আশ্চর্য হলো। কি হচ্ছে এসব? মেঘ নিজেই নিজের কপাল চাপড়ে মনে মনে বলল, " ছিঃ এত বেকুব মানুষও হয়? আবির ভাই ঠিকই বলে আমি আসলেই নির্বোধ। আমি তাদের মেলানোর জন্য ঝড় তুফানের সঙ্গে যুদ্ধ করছি এদিকে তারা অলরেডি মনে মনে দুজনের প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে। বাহ! অসাধারণ।" তানভির চা খাচ্ছে বন্যা রান্নাঘরের দরজা থেকে নিপুণ দৃষ্টিতে তানভিরকে দেখছে। ফরমাল ড্রেসে সব ছেলেদের অন্যরকম সুন্দর লাগে। বন্যা না চাইতেও বার বার তানভিরের প্রতি দৃষ্টি আটকাচ্ছে। বুকের ভেতর

হৃদপিণ্ডটা প্রচন্ড বেগে উঠানামা করছে। কানের লতি গরম হয়ে গেছে। মেঘ চা শেষ করে কাপ রাখতে গিয়ে বন্যার দিকে নজর পরলো। মেঘ মনে মনে বিড়বিড় করল, " আর একবার বলিস শুধু আমার ভাইকে ভালোবাসিস না। এমন মাইর দিবো কাঁদতে কাঁদতে বলবি, I love Tanvir." তানভির তাকাতেই বন্যার সঙ্গে চোখাচোখি হলো। বন্যা থতমত খেয়ে চোখ নামিয়ে সরে গেছে। তানভির আড়চোখে চেয়ে আছে ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি ফুটলো। মেঘ সারাবেলা বন্যা আর তানভিরের কর্মকাণ্ড দেখল আর একা একায় বিড়বিড় করলো। খাওয়াদাওয়া শেষে আন্টির থেকে বিদায় নিয়ে মেঘ আর তানভির বেরিয়ে পরেছে। বন্যাও পেছন পেছন যাচ্ছে। তানভির কিছুটা সামনে গিয়ে হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো। পেছন ফিরে সরাসরি বন্যার দিকে নিরেট দৃষ্টিতে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, "তখন আমার দিকে এভাবে তাকিয়ে ছিলে কেনো?" "কই তাকায় নি তো।" বন্যার গলার স্বর কাঁপছে। চোখ মুখ দেখেই বুঝা যাচ্ছে যে মিথ্যা বলছে। বন্যা চোখ নামিয়ে নিয়েছে। তানভির জানতে চাইল, "আমি কি দেখতে এতই খারাপ? তাকাতেও ইচ্ছে হয় না?" গমগমে পুরুষালী স্বর কানে বাজতেই বন্যা উৎকণ্ঠিত কণ্ঠে বলল, "কে বলেছে আপনি দেখতে খারাপ? মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর লাগছে আপনাকে। কারো নজর না লাগে।" কথাটা বলেই বন্যা নিজের মুখ চেপে ধরেছে। বাতাসে উড়তে থাকা বন্যার চুলগুলো চোখ মুখ ঢেকে দিচ্ছে। তানভিরের হৃদয়ে অদ্ভুত অনুভূতি কাজ করছে। বন্যার চোখ বন্ধ, মুখ থেকে চুল সরাতে তানভির হাত বাড়ালো। পেছন

থেকে মেঘের ডাকে তানভিরের ঘোর কাটলো। তানভির হাত নামিয়ে আস্তে করে বলল, “নিজের হাতে চা করে খাওয়ানোর জন্য অনেক ধন্যবাদ।আসছি।” মেঘের সামনে আসতেই মেঘ ভ্রু নাচিয়ে শুধালো, “বাসায় যাওয়ায় ইচ্ছে নেই?” “চল।” অন্য সময় হলে তানভির দুটা কথা শুনাতো বা একটু রাগ হলেও দেখাতো। আজ কোনো রিয়াকশন নেই দেখে মেঘ হা হয়ে তাকিয়ে আছে। গাড়িতে বসেও একদৃষ্টিতে তানভিরকে পরখ করছে। তানভির মুচকি মুচকি হাসছে আর আস্তে করে গাড়ি চালাচ্ছে। মেঘ রাগে ফোঁস ফোঁস করতে করতে মনে মনে বলল, “তোমার মিটিমিটি হাসি বের করছি। ওয়েট” গলির মোড় পর্যন্ত আসতেই একটা সিঙ্গারার দোকান দেখিয়ে মেঘ উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, “ভাইয়া ঐ ছেলেটাকে দেখছো। ” তানভির এক সেকেন্ডের জন্য তাকিয়ে আস্তে করে বলল, ” হু। কে?” “বন্যার বয়ফ্রেন্ড। ” কথাটা কর্ণকুহরে প্রবেশ মাত্রই তানভির অকস্মাৎ গাড়ির ব্রেক কষল। আচমকা ব্রেক কষায় আর একটুর জন্য মাথায় বারি খেতে নিছিলো। তানভিরের পূর্ণ মনোযোগ দোকানে। আগে এক সেকেন্ডের জন্য তাকানোতে ঠিকমতো খেয়াল করে নি। দোকানে অল্প বয়স্ক কোনো ছেলেই নেই। দু’জন দোকানদার আছে যার মধ্যে একজনের বয়স ৬০ + আরেকজন বয়স ৩৫+ হবে। তানভির ভ্রু কুঁচকে শক্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, “কোনটা?” “লাল শার্ট পড়নে।” তানভির আবারও দোকানের দিকে তাকালো। ৬০+ বয়সের লোকের পড়নে লালের মতো একটা শার্ট। হয়তো ওনার ছেলে বা নাতির শার্ট হবে। তানভির ভারী কণ্ঠে

বলল, “ওনি ছেলে? আর বন্যার বয়ফ্রেন্ড?” “অবশ্যই। তুমি বিশ্বাস করো না? চলো। আমাকে দেখলেই শালী শালী ডাকবে দেইখো । এমনকি সিঙ্গারার দাম ও নিবে না।” “কেনো?” “বাহ রে! বন্যাকে ওনার ভালো লাগে। বিয়ে করতে চায়। আমি বন্যার বেস্ট ফ্রেন্ড শুনে আমাকেও ফ্রি-তে সিঙ্গারা খাইয়েছে। ওনার নাম মোখলেস মিয়া, বয়স ৬৭। ওনার দুই বউ আর ৬ ছেলেমেয়ে আছে। ” তানভির মেঘের দিকে আশ্চর্য নয়নে তাকিয়ে শুধালো, ” এতকিছু তুই কিভাবে জানিস? “জানি জানি। বেস্টু আমার, আমি জানবো না তো কে জানবে হুম? এখন চলো বিয়ের ঘটকালি টা করে আসি। ” “ভাইয়া যদি এসব কর্মকাণ্ডের কথা জানতে পারে তাহলে তোর খবর ই আছে। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে তুই মোখলেস মিয়ার বিয়ার ঘটকালি করিস?” মেঘ কাঁদো কাঁদো মুখ করে বলল, “আমার বেস্টুর বিয়ে হওক তুমি কি চাও না?” “তাই বলে ওনি?” “ওনার চোখে বন্যার প্রতি ভালোবাসা দেখেছি আমি।” তানভির গাড়ি স্টার্ট দিতে দিতে বিড়বিড় করল, “বন্যার প্রতি কারো চোখে ভালোবাসা উতলে পড়লে সেই চোখ ই কানা করে ফেলব।” মেঘ বলে উঠল, “বিড়বিড় করে কি বলো। ” “কিছু না।” “বন্যার বিয়েতে আমি কিন্তু লেহেঙ্গা পড়বো। আর লেহেঙ্গা টা তুমি কিনে দিবা।” তানভির গাল ফুলিয়ে শ্বাস ছেড়ে তপ্ত স্বরে বলল, “মুখ টা বন্ধ রাখ নয়তো রাস্তায় ফেলে চলে যাব।” মেঘ ঠোঁট বেঁকিয়ে হাসছে আর মনে মনে বলছে, “লাগছে লাগছে। একদম কলিজায় লাগছে। ”তানভির পুরো রাস্তা গাল ফুলিয়ে রেখেছে। মেঘ তানভিরকে

জ্বালানোর জন্য বন্যাকে কল দিল। বন্যা কল রিসিভ করতেই মেঘ বলল, " দুলাভাই এর মনটা বোধহয় খারাপ। তুই একটু দেখা করে যাস।" তানভির আবারও ব্রেক কষল। অগ্নিদৃষ্টিতে মেঘের দিকে তাকিয়ে আছে। মেঘ আড়চোখে তানভিরের ভাব দেখে অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে। বন্যা হুঙ্কার দিয়ে উঠল, "দুলাভাই কে আবার?" "মোখলেস দুলাভাই এর কথা বলছি।" "রাখ ফোন।" বন্যা কল কেটে দিয়েছে। মেঘ তানভিরের দিকে তাকিয়ে দাঁত কেলিয়ে হেসে বলল, " যাবে।" তানভিরের রক্তাভ দু চোখ। শ্বাস ছেড়ে বলিষ্ঠ কণ্ঠে বলল, "ডাফার" (মাথামোটা/মূর্খ মানুষ) মেঘ ঠোঁট বেঁকিয়ে ভেঙছি কেটে শান্ত স্বরে জবাব দিল, "আর তুমি ডাফারের ভাই।" তানভির নিজের রাগ নিয়ন্ত্রণ করে আবারও গাড়ি চালানোতে মনোযোগ দিল। দু মিনিট পর মেঘ তানভিরকে শুনিয়ে শুনিয়ে গান গাচ্ছে, "ফুল ফোটে শাখায় শাখায় ব্যথা ধরে বুকে কি প্রেমেতে মন মাতাইলা অশ্রু ঝরে চোখে আমার আসমান করে আন্ধার সুখের নিদ্রা হবে কি তোমার বন্ধু আমায় ছাড়া।" তানভির রাগান্বিত কণ্ঠে হুঙ্কার দিল, "চুপ থাকতে বলছি।" "আমার বন্ধুর বিয়ে হয়ে গেলে আমায় ছেড়ে চলে যাবে। আমি কি কাঁদবো না? একটু গানও গাইবো না? এত খারাপ কেনো তুমি?" "দেখ, ৪ ঘন্টা পরীক্ষা দিয়ে আসছি। মাথা এমনিতেই গরম আছে। বেশি কথা বলবি না।" "ঠিক আছে।" "মেঘের মতোন উড়ে উড়ে অন্তরটারে খালি করে করলা দিশাহারা " তানভির তাকাতেই মেঘ মুখ চেপে বলল, "আমার কোনো দোষ নাই। নিজে থেকেই গান বের

হচ্ছে। ” তানভির কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থেকে ভগ্ন হৃদয় নিয়ে গাড়ি চালানোতে মনোযোগ দিল। বাসায় ঢুকতেই আলী আহমদ খানের সঙ্গে দেখা। আলী আহমদ খান হাসিমুখে জিজ্ঞেস করলেন, ” দুই ভাই-বোন সেজেগুজে কোথায় গিয়েছিলে?” “আমার বান্ধবীর বাসায় গিয়েছিলাম আর ভাইয়া আমাকে আনতে গিয়েছিল।” “ঠিক আছে যাও।” মেঘ ব্যাগ ঘুরাতে ঘুরাতে ভেতরে চলে গেছে। তানভির চাবি রেখে সরাসরি নিজের রুমে চলে গেছে। মাগরিবের পর পর ই আবিরের কল আসছে। মেঘ কল রিসিভ করতেই আবির জিজ্ঞেস করল, “বাসায় আসছিস?” “জ্বি।” “কি করছিস?” ” আপনাকে একটা কথা বলার ছিল।” “হ্যাঁ বল। ” কিছু একটা ভেবে মেঘ আবারও থেমে গেল। আস্তে করে বলল, ” কিছু না।” “কোনো সমস্যা?” “নাহ।পরে জানাবো আপনাকে। ” “অপেক্ষায় রইলাম।” মেঘ ঘন্টাদুয়েক পর নিচে আসছে। মীমরা না থাকায় বাসাটা ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। আলী আহমদ খান আজ একটু তাড়াতাড়ি শুয়ে পরেছেন। হালিমা খান আর মালিহা খান সোফায় বসে গল্প করছেন। মেঘ হালিমা খানের কোলে মাথা রেখে শুয়ে শুয়ে টিভি দেখছে। তানভির সন্ধ্যা থেকে বাসায় নেই। বেশকিছুক্ষণ যাবৎ আবির মেঘকে মেসেজ-কল দিচ্ছে, মেঘের হাতে ঘড়ি নেই,ফোনও সাইলেন্ট করা তাই বুঝতে পারে নি। হালিমা খানরা উঠে রান্নাঘরের দিকে চলে গেছে। মেঘ আনমনে ফোনের পাওয়ার বাটন চাপতেই আবিরের ৭ টা কল আর অনেকগুলো মেসেজ চোখে পড়লো। মেঘ লাফিয়ে উঠে তড়িঘড়ি করে আবিরকে কল দিল।

বারবার ওয়ার্নিং দেয়া সত্ত্বেও ঘড়ি রুমে রেখে নিচে এসে রিলাক্সে টিভি দেখছে।সবার ভয়ে ফোন সাইলেন্ট করে রাখাটাও ইদানীং অভ্যাস হয়ে গেছে। আবির রাগান্বিত কণ্ঠে বলল, " তুই কি ভালো হবি না?" " হবো।" "কবে?" "পরশুদিন।" "আজ কি সমস্যা? " মেঘ মলিন হেসে বলল, " ভালো হলে একবারে হতে হবে না? তাই একদিন রেস্ট নিয়ে তারপর ভালো হবো।" "দিনদিন তুই বড্ড ফাজিল হয়ে যাচ্ছিস।" "জ্বি। আর আমার গুরু স্বয়ং সাজ্জাদুল খান আবির।" আবির না চাইতেও হেসে ফেলল। মুখের গম্ভীর ভাব মুহুর্তেই সরে গেছে। ধীর কণ্ঠে বলল, " তানভির কোথায়?" "জানি না।" "সমস্যা কোনো? " "আমি কি জানি? কার মনে কি চলে সেটা দেখার দায়িত্ব কি আমার?" "না। কিন্তু তোর নামে বিচার দিলো কেন?" মেঘ এপর্যায়ে আঁতকে উঠল।মনে মনে প্রচুর ভয় পাচ্ছে। যদি সত্যি সত্যি মোখলেস মিয়ার কথা বলে দেয় তখন কি হবে! মোখলেস মিয়া সম্পর্কে বন্যার দাদা হয়। রক্তের সম্পর্ক না থাকলেও বন্যার আব্বুর সাথে মোটামুটি ভালো সম্পর্ক আছে। কিছুদিন আগে মেঘ এমনিতেই বন্যাদের বাসায় গিয়েছিলো। তখন মোখলেস মিয়া ওদের ডেকে সিঙ্গারা আর পিঁয়াজু খাইয়েছিল। সেখানেই মজার ছলে বন্যাকে বিয়ের কথা বলেছিল। বন্যা আর মেঘ সে কথা বেমালুম ভুলে গিয়েছিল। তবে আজ বন্যাদের বাসায় যাওয়ার সময় আবারও সেই মোখলেস মিয়ার সাথে দেখা। শালী শালী ডেকে রিক্সা থামিয়ে মেঘের খোঁজ-খবর নিয়েছে। ওনার কথা মাথায় ছিল বলে তানভিরকে রাগানোর জন্য

ইচ্ছে করেই ওনার বিয়ের ঘটকালির ব্যাপারে বলেছে। আবিরের কানে এসব গেলে আস্ত রাখবে না। মেঘ ভয়ে ভয়ে জানতে চাইল, “কি বিচার দিয়েছে? ” “সেসব বাদ দে। ও আছে কোথায়? ফোন দিচ্ছি রিসিভও করছে না। কি হয়েছে একটু বলবি?” মেঘ নাক টেনে কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে বলল, “ওহ! আপনি এতগুলো কল ভাইয়ার জন্য দিচ্ছিলেন। আমি আরও ভাবছিলাম আমার জন্য। ভাইয়া বাসায় আসলে জানাবো আপনাকে। বাই।” “কল কাটলে স্বপ্নে এসে থাপ্পড় দিব বলে রাখলাম।” “স্বপ্নে আমায় থাপ্পড় না দিয়ে টর্চ লাইট নিয়ে নিজের ভাই কে খুঁজতে থাকুন। সেটা বেশি কাজে দিবে। এই বাড়ির সবাই স্বার্থপর। শুধু নিজের স্বার্থ বুঝে। ” “আপনার লেকচার হলে অনুগ্রহ করে বলুন কি হয়েছে? বন্যার কিছু হয়েছে?” “বাহ! বাহ! অসাধারণ। এখন বন্যার খোঁজও নিচ্ছেন। অথচ আমি জলজ্যান্ত একটা মানুষ ৮ মিনিট ৪২ সেকেন্ড যাবৎ কথা বলছি আমাকে একটা বার জিজ্ঞেস করলেন না আমি ঠিক আছি কি না! আল্লাহ ওনার আগে আমায় উঠায় নেও। স্বার্থপর দুনিয়ায় আমিও আর থাকতে চাই না।” আবির শ্বাস ছেড়ে গম্ভীর কণ্ঠে বলতে শুরু করল, ” আর যাই করিস না কেন, তানভিরের পরীক্ষা চলছে বিষয়টা মাথায় রাখিস। এমনিতেই পড়াশোনা করে না, পরীক্ষাগুলো ভালোভাবে শেষ করতে পারলে অন্ততপক্ষে অনার্স পাশ তো করতে পারবে। ” “যার ভাই তার খবর নাই আরেকজনের চিন্তায় ঘুম আসছে না। এত দুশ্চিন্তা করে কি করবেন শুনি? কেজি দরে দুশ্চিন্তা বিক্রি করবেন? তার থেকে বরং

আমার উপর ছেড়ে দেন। আমি সবকিছু দেখে নিব। রিলাক্সে ঘুমান আপনি।” আবির শুকনো মুখেই বিষম খেলো। কাশতে কাশতে বলল, ” আমার দুশ্চিন্তার গুরু স্বয়ং মাহদিবা খান মেঘ।” মালিহা খান খেতে ডাকছে তাই তাড়াতাড়ি কল কেটে মেঘ খেতে চলে গেছে। খাবার টেবিলে কেবল তিনজন। মেঘ কোনোরকমে অল্প খাবার খেয়ে একটা আচারের বক্স নিয়ে সোফায় বসে টিভি দেখছে আর আচার খাচ্ছে। মালিহা খান রুমে চলে গেছেন। হালিমা খান রান্নাঘরে টুকটাক কাজ করছেন। এমন সময় তানভির বাসায় আসছে। অন্তরের জ্বালাপোড়া চোখেমুখে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। মেঘের করা দুষ্টামি বুঝতে পেরেও তানভির শান্ত থাকতে পারছে না। তানভিরকে দেখেই হালিমা খান রান্নাঘর থেকে বলে উঠলেন, ” তুই কি একটু শান্তি দিবি না আমাকে? পরীক্ষা দিয়ে আসছিস কিছু খাস ও নি। তোদের নিয়ে আর কত টেনশন করবো?” তানভির এক পলক তাকিয়ে মাথা নিচু করে চলে যাচ্ছে। মেঘ তানভিরকে দেখেই উচ্চস্বরে বলে উঠল, “আম্মু তুমি রিলাক্সে থাকতে পারো।” সঙ্গে সঙ্গে তানভিরকে শুনিয়ে শুনিয়ে আস্তে করে বলল, “কারণ ভাইয়ার জন্য চিন্তা করার মানুষ আছে।” তানভির সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে ফিরে তাকাল। চিবিয়ে চিবিয়ে বিড়বিড় করতে করতে রুমে চলে গেছে। এক সময় তানভির নিজেই মালিহা খানকে রিলাক্সে থাকতে বলেছিল। আবিরের জন্য চিন্তা করার মানুষ আছে শুনে সেদিন মেঘের মনের আকাশে মেঘ জমেছিল। তাই আজ মেঘ ইচ্ছে করেই ভাইকে রাগাচ্ছে। সকাল ১১ টার উপরে বেজে গেছে

অথচ তানভিরের খবর নেই। শুক্রবার বলে কেউ তেমন কিছু বলছেও না। মেঘ দুবার খেতে গিয়েও ফিরে আসছে। ভাই কে রাগিয়ে একা খেতেও ইচ্ছে করছে না। তানভির গতরাতও খায় নি। অনেকক্ষণ ডাকার পর তানভির রুমের দরজা খুলে দিয়েছে। মেঘ ভ্রু গুটিয়ে আহ্লাদী কণ্ঠে বলল, " বিরিয়ানি খাবা? " "না। " "আমি রান্না করেছি। " "খিদে নেই। " "আমার আছে। সকাল থেকে খায় নি। চলো" রাত থেকে খাওয়া নেই। ঝগড়া করার মতো এত এনার্জিও নেই। তাই তানভির শান্ত স্বরে বলল, "ফ্রেশ হয়ে আসছি। " "তোমার ফোনের লকটা খুলে দিয়ে যাও।" "কেনো?" "আমার ফোনে ব্যালেন্স নেই।" তানভির ফোনের লক খুলে মেঘকে ফোন দিয়ে ওয়াশরুমে চলে গেছে। মেঘ তড়িঘড়ি করে বন্যার নাম্বার খুঁজতে লাগলো। Bonna, Megh's Friend, Bonu's Friend সব নামে খোঁজে ফেলেছে। তবুও পাচ্ছে না। বন্যার নাম্বার পুরোটা মুখস্থও নেই। মেঘ চটজলদি নিজের রুমে গিয়ে ফোন থেকে বন্যার নাম্বার বের করে কয়েকটা ডিজিট লিখতেই "Miss Egoistic" নাম আসছে। এমন নাম দেখে মেঘ নিজের অজান্তেই হেসে ফেলল। মেঘ আনমনে বলে উঠল, "আবির ভাইয়ের ফোনে আমার নাম্বার কি নামে সেইভ করা?" মেঘ রুম থেকে বের হতে হতে বন্যাকে কল দিল। বন্যা রিসিভ করে স্বাভাবিকভাবে সালাম দিল। মেঘ মুড নিয়ে বলল, "ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন?" "জ্বি ভালো। তুই ওনার নাম্বার থেকে ফোন কেন দিয়েছিস?" মেঘ শীতল কণ্ঠে বলল, "ভাইয়া অসুস্থ হয়ে

গেছে। ” বন্যা উদ্বিগ্ন কণ্ঠে শুধালো, “কি হয়েছে ওনার?” “তোদের বাসায় চা খেতে গিয়ে একটা ১ গ্রামের পিঁপড়া খেয়ে ফেলছিল। পিঁপড়াটা যেতে যেতে গলায় একটা কামড়ও দিয়েছে। আমি বার বার বলেছি বেশি করে পানি খেতে কিন্তু ভাইয়া পানি না খেয়ে অপলক দৃষ্টিতে কোনদিকে তাকিয়ে হা করে বসে ছিল যাতে পিঁপড়া টা হেঁটে হেঁটে বেড়িয়ে আছে। কিন্তু এত ফাজিল পিঁপড়া বের তো হলোই না উল্টো ভাইয়ার হৃদয়ে গিয়ে ঢুকে পরেছে। গতকাল বিকেল থেকে হৃদয়ে অনবরত কামড়াচ্ছে। আমার ভাইয়ের কোমল হৃদয়টাকে কামড়ে ছিদ্র করে ফেলতেছে। দেশে বন্যা হোক বা না হোক, আমার ভাইয়ার হৃদয়ে বন্যা নিশ্চিত।” (পিঁপড়া বলতে বন্যার প্রতি তানভিরের প্রেমানুভূতি বুঝানো হয়েছে🤭) “কি আবোলতাবোল কথা বলছিস। এটা আবার কেমন রোগ?” ” আবোলতাবোল না রে ভাইয়া রাতে মাথা ঘুরে বিছানায় পড়ে গেছিল। ১২ ঘন্টা বেহুঁশ ছিল, I mean ঘুমে ছিল। মাত্র হুঁশ আসছে, I mean সজাগ হয়ছে।” “এগুলো রোগ লক্ষণ ?” ” ১৬ ঘন্টা না খেয়ে থাকা, টানা ১২ ঘন্টা ঘুমানো কি স্বাভাবিক মনে হচ্ছে তোর?” “তো এখন কি করবি?” “এই রোগের চিকিৎসা মনে হয় এখনও আবিষ্কৃত হয় নি। কারো হৃদয়ে.....” তানভির বেড়িয়ে এসে ভ্রু কুঁচকে প্রশ্ন করল, “কোন রোগের চিকিৎসা আবিষ্কৃত হয় নি?” মেঘ তাড়াতাড়ি কল কেটে দিয়েছে। তানভির এক দৃষ্টিতে মেঘকে দেখছে। মেঘ ঠোঁট ভিজিয়ে, ঘন ঘন পল্লব ঝাপ্টে বলতে শুরু করল, ” ঐসব বাদ দাও। ভাবছি বন্যার বিয়েটা ভেঙে

দিব।” “কিসের বিয়ে?” “মোখলেস মিয়ার কথা কাল বললাম না তোমায়। সারারাত ভেবে দেখলাম ওনার কাছে বিয়ে দেয়া ঠিক হবে না। ” “হঠাৎ মাথায় সুবুদ্ধি উদয় হলো কেমন করে? ” “দেখো, মোখলেস মিয়ার চোখে ভালোবাসা থাকলেও হৃদয়ে একটুও জায়গা নেই। দুই বউ, ৬ ছেলে-মেয়ে, ১০-১২ জন নাতি-নাতনীর ভিড়ে আমার বেবিটাকে খোঁজেও পাওয়া যাবে না। এজন্য ভাবলাম আরও কিছুদিন সময় নিয়ে ভালোভাবে পরীক্ষা করে একজনের সঙ্গে বিয়ে দিব। তুমি কি বলো?” “আমিও তাই বলি। ওর বড় বোনের বিয়ে হোক তারপর না হয় ভেবে দেখবো।” মেঘ আড়চোখে চেয়ে আহ্লাদী কণ্ঠে বলল, ” বন্যার বিয়ের ঘটকালি করতে তুমি কিন্তু আমায় সাহায্য করবা। ঠিক আছে? ” মেঘের কথা শুনে তানভির কেশে উঠল। ঘুরেফিরে মেঘ সেই একই কাহিনীতেই আটকাচ্ছে। তানভির মুখ ফুলিয়ে উত্তর দিল, “আমার সময় নেই। ” “ঠিক আছে। প্রয়োজন নেই। লেহেঙ্গা কিন্তু তোমার কিনে দিতে হবে এটা মনে রেখো। আর যেই সেই লেহেঙ্গা কিনবো না। বন্যার আর আমার লেহেঙ্গার ডিজাইন সেইম হতে হবে।” “আচ্ছা। ” “এখন চলো খেতে যায়।” “চল।” আলো আঁধারে কাটছে দিন। কেবল এক সপ্তাহের মধ্যে মেঘের পরীক্ষা করা শেষ। তানভির যে বন্যাকে ভালোবাসে এটা তানভিরের আচরণ আর কথাতেই স্পষ্ট বুঝা যায়। কিন্তু বন্যা এখনও দ্বিধাদ্বন্দ্বে আছে। তানভিরের প্রতি হৃদয়ে উদিত উষ্ণ অনুভূতিকে পুরোপুরি স্বীকারও করতে পারছে না আবার মন থেকে বাদ ও দিতে পারছে না। মেঘ

তবুও হাল ছাড়ছে না। আবিরের বেঁধে দেয়া সময়ের ৫০ দিন কেটে গেছে। আগামীকাল ১০ অক্টোবর, আবিরের জন্মদিন। মেঘ সন্ধ্যার পর থেকে কথা বলার জন্য রেডি হয়ে বসে আছে। আবিরের নিষেধাজ্ঞার কথা মাথায় রেখে তেমন কোনো আয়োজন করে নি। প্রতিদিনের মতো আজও রাত ১০.৩০ নাগাদ আবিরের কল আসছে। সব কাজ শেষ করে শুয়ে মেঘের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলে ঘুমানো টা আবিরের বাজে স্বভাব হয়ে গেছে। অন্যদিন কিছুক্ষণ কথা বলেই মেঘ কল কেটে দেয় তবে আজ তার ব্যতিক্রম। ২ মিনিট কথা বলে দুজনেই ৫ মিনিট নিরবতা পালন করে কিন্তু কেউ কল কাটে না। মেঘের মন খারাপ হবে ভেবে আবির হাজার ব্যস্ত থাকলেও সচরাচর মেঘের কল কাটে না। এমনকি মুখ ফুটে বলেও না যে "ব্যস্ত আছি"। আজও তেমনটায় ঘটছে। বাংলাদেশের সঙ্গে সময়ের পার্থক্য মোটামুটি ২ ঘন্টা হওয়ায় এখানে ১১:৪৫ বাজায় সেখানে স্বাভাবিক ভাবেই রাত ০১:৪৫ বেজে গেছে। মেঘ আপন মনে গল্প করছে আর আবির মনোযোগী শ্রোতার মতো মেঘের সব কথা শুনছে। প্রয়োজনে নিজেও অল্পস্বল্প উত্তর দিচ্ছে। রাত ঠিক ১২ টা বাজতেই মেঘ মোলায়েম কণ্ঠে বলতে শুরু করলো, "আপনি আমার চঞ্চল হৃদয়ের এক টুকরো সিদ্ধি, পরিত্যক্ত শ্বাপদসংকুলের মোহগ্রস্ত দিনলিপি। চরাঞ্চলে জন্মানো শরতের শুভ্রতার প্রতীক, ভোরের শিশির ভেজা ঘাসে শিউলি ফুলের বৈচিত্র্যময় কম্রের মতোন আপনার জন্মদিন অনুষঙ্গের উষ্ণতায় ছেয়ে যাক। আপনার সকল অপূর্ণ ইচ্ছে পূর্ণতা পাক।" 'শুভ জন্মদিন ' আবির একদম স্তব্ধ

হয়ে গেছে। নিজের জন্মদিনের কথা মনেই ছিল না তার। মেঘের মায়াভরা কান্না জড়িত কণ্ঠ শুনে আবিরের দৃষ্টি ঘোলাটে হয়ে গেছে। মেঘ উবু হয়ে শুয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। মেঘের কান্নার শব্দে আবিরের অন্তরাত্মা শুকিয়ে যাওয়ার অবস্থা। মাসখানেক মেঘের আচরণে বিন্দুমাত্র খারাপ লাগা প্রকাশ পায় নি। সারাক্ষণ উল্লাস আর খুনসুটিতেই মেতে থাকতো। অপ্রসন্ন হৃদয়ের ভাঁজে জমতে থাকা অজস্র অভিমানগুলো জাহির করতে একটা পুরুষ্টু বক্ষঃস্থল প্রয়োজন। মোহমায়ায় জড়ানো একটা বিশ্বস্ত বুক। মেঘের কান্নার শব্দে দিশেহারা আবির। শীতল কণ্ঠে শুধালো, " এই স্প্যারো, এভাবে কাঁদছিস কেনো?" মেঘ বালিশে মুখ গুঁজে কান্না আড়াল করার চেষ্টা করছে। আবিরের নেশাক্ত কণ্ঠের আবদার, "ভিডিও কল দেয়?" মেঘ তড়িঘড়ি করে শুয়া থেকে উঠে বসে ভেজা কণ্ঠে কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, "না।" "আমার জন্মদিনে সামান্যতম আবদার করার অধিকার যদি আমার না থাকে তাহলে এই জন্মদিনকে আমি সারাজীবনের জন্য ব্যান করবো।" মেঘ আস্তে করে বলল, "ব্যান করতে হবে না, দিচ্ছি কল।" আবির ঠোঁট কামড়ে মুচকি হাসলো। মেঘ চোখ মুছতে মুছতে ভিডিও কল দিল। রুম অন্ধকার থাকায় স্পষ্ট দেখা না গেলেও ফোনের ক্ষুদ্র আলোতে মেঘের ধবধবে ফর্সা মুখ, ঝলমল করা ভেজা চোখ আর লাল হয়ে থাকা নাকের ডগা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। আবির নিরেট দৃষ্টিতে তাকিয়ে আদরমাখা কণ্ঠে বলল, "এবার বলুন, আমার আবেদনময়ীর আবদার কি?" আবিরের ছুরির ন্যায় সূক্ষ্ম নেত্রের চাহনিতেই মেঘ

ঘায়েল হয়ে যাচ্ছে। বুকের ভেতর তান্ডব চলছে, শ্বাসপ্রশ্বাস এলোমেলো। মেঘের দুচোখ পানিতে টইটম্বুর হয়ে আছে, কেবল অশ্রু গড়িয়ে পড়ার অপেক্ষা। বুক খুঁড়ে আসা কান্না গিলে মেঘ দূর্বল কন্ঠে জানাল, " আপনাকে আমার সামনে দেখতে চাই।" আবির মুচকি হেসে বলল, "তারপর? " "আপনি কবে আসবেন? আর কতদিন? আপনার কি একবারের জন্যও আমার কথা মনে হয় না? কেনো বুঝেন না আপনি, খুব মিস করছি আপনাক।" কঠিন বাস্তবতায় খোলস বন্দি করে রাখা নিজের অনুভূতিগুলো দীর্ঘনিশ্বাসের আড়ালে লুকিয়ে আবির কোমল কন্ঠে বলল, " আমি অবুঝ নয়, মেঘ।" মেঘ আকুল কন্ঠে আবারও শুধালো, " আসবেন কবে আপনি? " "সেটা আমার থেকে ভালো আপনার জানার কথা। আপনিই বলুন।" "আরও ১০০ দিন। আমি বোধহয় মরেই যাব।" আবির অগ্নিদৃষ্টিতে তাকাতেই মেঘ ভয়ে চোখ নামিয়ে নিয়েছে। আবিরের রুমে আলো জ্বলছে, এয়ারকন্ডিশন অন থাকা সত্ত্বেও আবিরের শরীর ঘামছে। টেবিল থেকে একটা অপ্রয়োজনীয় কার্ড হাতে নিয়ে বাতাস করছে। মেঘ গভীর মনোযোগ দিয়ে আবিরকে দেখে। হাত দিয়ে বাতাস করার কারণে ফোন কিছুটা দূরে সরিয়েছে, মেঘের নজর নগ্ন লোমশ বুকে পড়তেই লজ্জায় চোখ সরিয়ে নিয়েছে। আবির রুমের ছাদের দিকে তাকিয়ে আনমনে কিছু ভাবছে। মেঘ পল্লব ঝাপ্টে আবারও তাকালো। এবার নজর পরে থুতনির নিচে থাকা একটা কালো তিলের দিকে। সেইভ করার কারণে দাঁড়ির আড়ালে লুকিয়ে থাকা তিলটা আজ একটু বেশিই ঝলমল

করছে। মেঘ সেদিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে ঘোরে ডুবে গেছে। আবির নেশাক্ত কণ্ঠে ডাকল, “এইযে প্রলয়ংকরী কতবার বলল এভাবে তাকালে, কুচ কুচ হোতা হে তুম নেহি সামঝো গে।” মেঘ লাজুক হেসে চোখ ঘুরাতেই চেঁচিয়ে উঠল, “আপনার পেছনে কে?” মেঘের চেঁচানোতে আবিরও লাফিয়ে উঠেছে। আশেপাশে তাকিয়ে শক্ত কণ্ঠে বলল, “কোথায় কে?” “আমি দেখেছি, কে জানি চলে গেছে এখান থেকে। ” “রুমে কেউ নেই। পর্দা নড়ছে সম্ভবত এটায় চোখে পড়ছে।” “আপনি আমায় মিথ্যা কথা বলছেন। রুমে নিশ্চিত কেউ আছে। আপনি যে একদিন বলেছিলেন আপনার বউ আছে। সে কি আপনার রুমে?” “ঐ ঐ একদম চুপ। কথায় কথায় চরিত্রে দাগ দিবি না বলে দিলাম। আমার চরিত্র বেলীফুলের মতো সুগন্ধময় আর পবিত্র। ক্যামেরা ঘুরাচ্ছি নিজের চোখে দেখ।” আবির ক্যামেরা ঘুরিয়ে সম্পূর্ণ রুম ঘুরিয়ে দেখিয়েছে। সবশেষে মেঘ মলিন হেসে বলল, “আচ্ছা মানছি।” “মনের ভেতর শুধু সন্দেহ আর সন্দেহ। গরম পানি খেয়ে অবিশ্বাসের চারাগুলো মেরে অন্ততপক্ষে কিছুসংখ্যাক বিশ্বাসের চারা রোপণ করিয়েন।” “হুমমমম। ঘুম পাচ্ছে।” “ঘুমান।” বেশকিছু দিন কেটে গেছে। মেঘ আজ সকাল সকাল ভার্সিটিতে এসে বসে আছে। বন্যা আসতেই ছুটে গিয়ে খুশিতে গদগদ হয়ে একটা কিটকেট চকলেট ধরিয়ে দিল। বন্যা অবাক চোখে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, ” এত খুশি কেনো আজ?” মেঘ একটা চকলেট ছিঁড়ে খাচ্ছে। মেঘের দেখাদেখি বন্যার নিজের চকলেটটা খেতে শুরু করলো। মেঘ আর

বন্যা পাশাপাশি হাঁটছে। মেঘ আচমকা বলে উঠল, " শুক্রবারে ভাইয়ার জন্য বউ দেখতে যাব।" সঙ্গে সঙ্গে বন্যার পা থেমে গেছে। গলায় চকলেট আঁটকে গেছে। নির্বাক চোখে তাকিয়ে আছে। মেঘ পিছনে ঘুরে স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, "ক্লাসে চল, মেয়ে দেখাচ্ছি।" বন্যা চেহারায় বিষন্নতার ছাপ। অর্ধেক খাওয়া চকলেট পুনরায় মেঘকে ফেরত দিয়ে দিয়েছে। ব্রেঞ্চে বসতেই মেঘ একটা মেয়ের ছবি বের করে দিয়েছে। বন্যা না তাকিয়ে চাপা স্বরে বলল, "আমাকে দেখাচ্ছিস কেনো?" "তুই আমার বেস্ট ফ্রেন্ড। তুই দেখবি না?" "দরকার নেই।" "দেখ না।" বন্যা এবার ছবির দিকে তাকালো। মেয়েটা দেখতে তানভিরের থেকেও অনেক বেশি গুলুমুলু। গালে টুলও পড়ে। দেখতো বেশ সুন্দরী। বন্যা ঢোক গিলে ছোট করে বলল, "ভালো।" "শুধু ভালো? আমার কিন্তু অনেক বেশি পছন্দ হয়েছে। আজ আবির ভাইকে দেখাবো। ওনারও ঠিক পছন্দ হবে।" বন্যা অন্যদিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, "তোর ভাইয়ের পছন্দ হয়েছে?" "ভাইয়া তো একদম পাগল হয়ে গেছে। আজ বললে আজ ই বিয়ে করে ফেলবে। তাছাড়া ছবিটাও ভাইয়ায় দিয়েছে আমাকে।" মেঘ মনে মনে বলল, "আল্লাহ মিথ্যা বলছি বলে মাফ করো, প্লিজ।" বন্যা ভ্রু কুঁচকে মেঘের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে গলা খাঁকারি দিয়ে বলল, " ভালোই হলো তুই তোর ভাবি পেয়ে গেছিস।" "হ্যাঁ। আগামী শুক্রবার দেখতে যাবো। তারপর বিকেলে তোর সঙ্গে দেখা করবো। ঠিক আছে? " "আমার সঙ্গে দেখা করতে হবে কেনো?" "মেয়ে পছন্দ হয়েছে কি হয় নি তা জানাতে হবে না?"

“তার প্রয়োজন নেই। বিয়ে হলে নিশ্চয় শুনবো। ” বন্যার গলা কাঁপছে। কথা বলতে পারছে না। মেঘ আড়চোখে তাকিয়ে বন্যার হাবভাব দেখে উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, “তুই বস, আমি আবির ভাইয়ের সাথে কথা বলে আসছি।” বন্যা ব্যাগে মুখ গুঁজে বসে আছে। মেঘ ফোন নিয়ে বেড়িয়ে গেছে। ১০ থেকে ১৫ মিনিট পর মিষ্টি, মিনহাজদের সঙ্গে রুমে আসছে। বন্যা তখনও মুখ গুঁজেই বসে আছে। মিষ্টি ডাকতেই বন্যা মুখ তুলে তাকালো। চোখ মুখ লাল হয়ে আছে। বন্যা বরাবরই আবেগ চেপে রাখে। তার রাগ অভিমানের বহিঃপ্রকাশও তেমন ঘটে না। কিন্তু আজ যেন বন্যার অন্য রূপ ভেসে উঠেছে। মিষ্টি মাঝখানে বসেছে। মেঘ আর বন্যা দু-পাশে। বন্যার দৃষ্টি জানালার দিকে, এক দৃষ্টিতে বাহিরে তাকিয়ে আছে। মেঘ মিষ্টিকে একটা একটা করে ড্রেস দেখাচ্ছে। তানভিরের বিয়ের উপলক্ষে অনলাইনে লেহেঙ্গা, শাড়ি পছন্দ করছে। বন্যা সেসব না দেখলেও সবকিছু ঠিকই কানে যাচ্ছে। এক পর্যায়ে মিষ্টি বলল, “আবির ভাই না বড়। আবির ভাইয়ের বিয়ে রেখে তানভির ভাইকে বিয়ে করাবে?” “আবির ভাইয়ের বউ ফিক্সড মানে আমি তো ফিক্সড ই। এখন শুধু দেশে ফেরার অপেক্ষা। এরমধ্যে ভাইয়ার জন্য মেয়ে ঠিক করে রাখবো। প্রয়োজনে আংটি পড়িয়ে রাখবো তারপর দুই ভাই-বোন একসঙ্গে বিয়ে করবো। আমিও বাসাতেই থাকবো, ভাইয়াও বাসায় থাকবে। শুধু নতুন ভাবির আগমন ঘটবে।” মিষ্টি বন্যার দিকে তাকিয়ে বলল, ” তুই না বলছিলি বন্যাকে ভাবি বানাবি” “তখন মজা করে বলছিলাম। কোথায় আমাদের

ব্রিলিয়ান্ট বন্যা আর কোথায় আমার বেপরোয়া, ভন্ড ভাই তানভির। দু'জনকে মানাবে নাকি? " "কিন্তু... " "কোনো কিন্তু না। বন্যার সামনে আবার এসব কথা বলছিস? তুই জানিস না বন্যার এসব শুনতে ভালো লাগে না। আমার ভাইকে বন্যা দুচোখের এক চোখেও সহ্য করতে পারে না। সেখানে আমার ভাইকে বিয়ে করার প্রশ্নই আসে না। চুপ কর।" বন্যা নির্বাক চোখে মেঘের দিকে তাকিয়ে আছে। মেঘের চোখে মুখে উজ্জ্বলতার ছিটেফোঁটাও নেই । সিরিয়াস মুডে কথাগুলো বলেছে। বন্যার অন্তর জ্বলছে, চোখ রক্তাভ হয়ে আছে, টলমল করছে চোখ। যেকোনো মুহুর্তে বাঁধ ভাঙা কান্না শুরু হবে। বন্যা দাঁড়িয়ে আস্তে করে বলল, "সাইড দে।" "কোথায় যাবি?" "ওয়াশরুমে।" ক্লাস শেষে বেড়িয়ে আসতেই তানভিরের সঙ্গে দেখা। মেঘই মেসেজ করে আসতে বলেছে। ইদানীং অফিসে যাওয়ার কারণে তানভিরের ড্রেসআপেও বেশ পরিবর্তন এসেছে। আজ একটা চেক শার্ট ইন করে পড়েছে,চোখে সানগ্লাস হাতে বন্যার দেয়া সেই ঘড়িটা। বন্যা একপলক তাকিয়ে সঙ্গে সঙ্গে চোখ সরিয়ে নিয়েছে। আজ সালাম পর্যন্ত দিচ্ছে না। কাছাকাছি আসতেই তানভির সালাম দিল। বন্যা উত্তর দিচ্ছে না দেখে মেঘ ই সালামের উত্তর দিল। তানভির বন্যাকে উদ্দেশ্য করে প্রশ্ন করল, "কেমন আছো?" বন্যা নির্বিকার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে। মেঘ নিজের ব্যাগটা গাড়িতে রেখে আহ্লাদী কন্ঠে বলল, "ভাইয়া আমি ওদের সঙ্গে একটু কথা বলে আসি। তোমরা দাঁড়াও।" মেঘ দ্রুত সরে গেছে। তানভির এক দৃষ্টিতে বন্যাকে দেখছে। বন্যার উত্তর না পেয়ে দ্বিতীয়

বার প্রশ্ন করল, “তোমার কি কানে সমস্যা? কথা শুনো না?” বন্যা চোখ তুলে তাকাতেই তানভির বুকের ভেতরটা ছ্যাত করে উঠেছে। বন্যার ফ্যাকাশে চোখ মুখ দেখে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে শুধালো, “কি হয়েছে তোমার? তুমি কি অসুস্থ? ” “না। ঠিক আছি।” “তোমাকে দেখে একদম ঠিক লাগছে না। ডাক্তার দেখিয়েছো?” ” আমি চলে যাচ্ছি, মেঘকে বলে দিয়েন।” বন্যা পা বাড়াতেই তানভির বন্যার বাহু চেপে ধরে শক্ত কণ্ঠে বলল, “এক পা বাড়ালে এর ফলাফল খুব খারাপ হবে।” মেঘকে আসতে দেখেই তানভির হাত ছেড়ে রাগী স্বরে বলল, “চুপচাপ গাড়িতে বসো।” মেঘ এসে স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, “ভাইয়া বন্যাকে মোখলেস দুলাভাই এর দোকান পর্যন্ত নামিয়ে দিও, প্লিজ।” তানভির আর বন্যা দু’জনেই অগ্নিদৃষ্টিতে তাকালো। মেঘ ফিক করে হেসে বলল, “উপস, সরি। মোখলেস দুলাভাই না মোখলেস দাদা।” তানভির আবারও বলল, “বন্যা গাড়িতে বসো।” মেঘও বলল, ” তাড়াতাড়ি আয়।” তানভির গাড়ি চালাচ্ছে। মেঘ বন্যাকে এক এক করে জামা দেখাচ্ছে। শুক্রবারে কি পড়বে সেসব ভেবে মেঘ ক্লান্ত হয়ে যাচ্ছে। বন্যা না পারতেও মেঘের এসব পাগলামি সহ্য করছে। তানভির গাড়ি চালানোর ফাঁকে ফাঁকে মিররে বন্যাকে দেখছে। কিছুদূর যেতেই মেঘ বলল, “ভাইয়া আমাকে দুটা ড্রেস কিনে দিবা?” “দিব নে।” “দিব নে না। আজ ই দিতে হবে।” “আজ ই?” “হ্যাঁ। তোমাকে না বলছিলাম শুক্রবারে পড়ার জন্য ড্রেস লাগবে। আজ বন্যাও সাথে আছে পছন্দ করতে সমস্যা হবে না। ” তানভির ঘাড় ঘুরিয়ে বন্যার দিকে

তাকিয়ে প্রশ্ন করল, " তোমার শরীর ঠিক আছে? শপিং এ যেতে পারবে?" বন্যা উত্তর দেয়ার আগে মেঘ বলল, "কেন যেতে পারবে না? আমি বলছি মানে যেতেই হবে। তুমি মনোযোগ দিয়ে গাড়ি চালাও। আব্বুর দুই ডায়মন্ড গাড়িতে বসা। যদি কিছু হয় তাহলে আব্বু তোমার হাড্ডি মাংস আলাদা করে ফেলবে। সামনে তাকাও।" ২ টা শোরুম ঘুরে মেঘের জন্য দুটা ড্রেস নিয়েছে আর মীমের জন্য একটা। তানভিরের এক পরিচিত ভাইয়ের ক্লিনিক থেকে বন্যার প্রেশার, হিমোগ্লোবিন টেস্ট করে বন্যাকে বাসা পর্যন্ত নিয়ে গেছে। মেঘ বার বার বলছিল মোখলেস দাদার দোকানের সামনে নামিয়ে দিতে কিন্তু তানভির সোজা বাসার সামনে পর্যন্ত নিয়ে গেছে। যাওয়ার সময় মেঘ জোর করে একটা ড্রেস বন্যাকে দিয়ে শুক্রবারে পড়ার জন্য বলেছে। বন্যা নিতে না চাইলেও তানভির আর মেঘের জোরাজোরিতে বাধ্য হয়েই নিয়েছে। বন্যা বাসায় ঢুকা পর্যন্ত অপেক্ষা করে তারপর মেঘকে নিয়ে তানভির বাসার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছে। যেতে যেতে তানভির প্রশ্ন করল, "তোর বেস্টুর আজ কি হয়েছে? উল্টাপাল্টা আচরণ করছিল কেন?" " টিকটিকি খামছি মারছে এজন্য মাথা ঠিক নেই।" "টিকটিকি খামছি দেয়?" মেঘ ভ্রু কুঁচকে উত্তর দিল, "আরে বাবা স্বপ্নে দিছে। স্বপ্নে সব সম্ভব। বুঝছো?" " ভাইয়া ঠিক ই বলে। এক তাড় ছিঁড়া তুই আরেক তাড় ছিঁড়া তোর বান্ধবী। তোদের যন্ত্রণায় আমরা পাগল হয়ে যাচ্ছি।" "পাবনা যাবা?" "মরতে?" "না ঘুরতে।" তানভির চোখ রাঙাতেই মেঘ দাঁত বের করে হাসলো। আজ শুক্রবার।

সকাল থেকে মেঘ একায় বাড়িঘর মাতিয়ে রেখেছে। এই ফেসিয়াল করছে, এই চোখে শসা লাগিয়ে বসে আছে, চুলের যত্ন নিচ্ছে। তানভির ঘন্টাখানেক সোফায় বসে মেঘের কর্মকাণ্ড দেখছে। একপর্যায়ে মীমকেও টেনে নিয়ে আসছে। দু'জন ফিসফিস করে কথা বলছে আর রূপচর্চা করছে। তানভির অনেকক্ষণ খেয়াল করে হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, "এত সাজুগুজু করার কারণ কি? কোথায় যাবি তোরা?" "ঘুরতে।" "একা যাওয়া যাবে না। যেখানেই যাস আমি নিয়ে যাব।" মেঘ আঁতকে উঠে বলল, " আজকে অন্ততপক্ষে তোমাকে নিতে পারবো না। " "তাহলে অনুমতিও আমি দিতে পারবো না। আব্বুকে বলে অনুমতি নিও। আমি ডিরেক্ট ভেটো দিব।" মেঘ কপালে কয়েকস্তর ভাঁজ ফেলে গুরুতর কণ্ঠে বলল, " আজ যেতে না দিলে তুমিই পস্তাবে । আর কিছুই বলব না আমি।"তানভির চোখ ছোট করে গম্ভীর কণ্ঠে জানতে চাইল, "আমি পস্তাবো কেনো?" মেঘ এপাশ ওপাশ মাথা দুলিয়ে আস্তে করে বলল, "বলবো না।" "না বললে যেতে দিব না কিন্তু। " মেঘ চুল উড়িয়ে সিঁড়ি দিয়ে যেতে মেকি স্বরে বলল, "তুমি যে ভেটো দিবে এটা আমি আগে থেকেই জানতাম। তাই গতকাল রাতেই বড় আব্বু, আব্বু, কাকামনি, বড় আম্মু, আম্মু, কাকিয়া এমনকি আবির ভাইয়ের থেকেও অনুমতি নিয়ে ফেলেছি। কোথায় বিচার দিতে যাবে, যাও।" মেঘ এক প্রকার নাচতে নাচতে রুমে চলে গেছে। মীম ও তার পিছু পিছু ছুটলো। তানভির রাগে কটমট করছে। ইদানীং মেঘের দুষ্টামির মাত্রা অনেক বেড়ে গেছে, একা সামলানো

যাচ্ছে না। মেঘ আগেও দুষ্টামি করতো তবে লিমিটেড। আবির আসার পর মেঘ অনেকটায় শান্ত হয়ে গিয়েছিল। আবিরের সাথে মনোমালিন্যের কারণে ৮-৯ বছর কথা হয় নি বলে সেই দূরত্ব টা কমাতে একটু সময় লেগেছে। এডমিশন টেস্ট আর আবিরের প্রেমে হাবুডুবু খেতে খেতে দুষ্টামির চিন্তা মাথায় ই আসে নি। এখন সেই দুষ্টামির ভূত টা আবারও মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। আবির কোনো কারণে অভিমান করলেও মেঘের সামনে সেই অভিমান ১ মিনিটের বেশি টিকতেই পারে না। আবির যতক্ষণ না হাসবে ততক্ষণ পর্যন্ত মেঘের আজগুবি কথাবার্তা চলতেই থাকে। গতকালও তেমনটায় ঘটেছে। মেঘের একা ঘুরতে যাওয়ার ব্যাপারে আবির রাজি ছিল না তাই আবিরকে রাজি করাতে মেঘকে বহু কাঠখড় পুড়াতে হয়েছে। এক পর্যায়ে "তেলাপোকার আর্তনাদ" গল্প শুনিয়ে আবিরকে পটিয়ে ঘুরতে যাওয়ার অনুমতি নিয়েছে। তবে অবশ্যই শর্তসাপেক্ষে। আবির মেসেজে তিন পাতার এক লিস্ট পাঠিয়েছে যেখানে কি করা যাবে না, কি করা যাবে, কিভাবে চলতে হবে সব নির্দেশনা দেয়া। মেঘ সব শর্ত মেনেই রাজি হয়েছে। মেঘ আর মীম রেডি হতে রুমে চলে গেছে। তানভির আবিরকে কল দিয়ে রাগান্বিত কণ্ঠে বলল, "ভাইয়া, তোমার কলিজাকে আমি আর সামলাতে পারছি না। সে এখন আমার কলিজা ছিদ্র করে ফেলতেছে।" আবির মৃদু হেসে বলল, "আর তো কয়েকটা দিন। একটু সহ্য করে নে।" "তুমি নাকি ঘুরতে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছো?" "কি করবো বল! এমন ভাবে আবদার করে যে না করতে

পারি না।” “কোথায় যাবে কিছু বলছে?” ” বন্যা, মিনহাজ ওদের সাথেই বের হবে বললো।” ” আমি নিয়ে গেলে কি হতো? ইদানীং মনে হয় দুই বান্ধবীর মধ্যে মনোমালিন্য চলছে। ভার্সিটিতে কেউ কারো সাথে কথা বলে না। গত দুদিন বন্যা ভার্সিটিতেও আসে নি। কল দিলাম রিসিভও করে নি। আজ আবার ঘুরতে যাচ্ছে বিষয়টা ঠিক ভালো লাগছে না।” ” তুই ওদের চিনিস না? মনোমালিন্য থাকলেও দেখবি আজকে ঠিক মিলে গেছে। ” “সেটাও ঠিক। আচ্ছা, পরে কথা হবে। ” “ওকে। ” ৩ টার দিকে মেঘ আর মীম সেদিনের কেনা ড্রেস পড়ে সেজেগুজে বেরিয়েছে। তানভির সূক্ষ্ম নেত্রে তাকিয়ে আছে কিন্তু কিছু বলছে না। মেঘ যেতে যেতে তানভিরের দিকে তাকিয়ে জিভ বের করে ভেঙচি কাটলো। তানভির চোখ রাঙাতেই মেঘ দাঁত কেলিয়ে চলে গেছে। বাসার সামনে থেকে রিক্সা করে দুই বোন গন্তব্যের উদ্দেশে রওনা দিল। ফোনের লোকেশন দেখে মিনহাজদের দেয়া ঠিকানা পর্যন্ত পৌঁছেছে। বন্যারা আগে থেকেই সেখানে উপস্থিত। মিনহাজ আর তামিম কাছেই একটা বাসায় থাকে। সেখান থেকে একটা টেবিল এনে একটা খালি জায়গায় রেখে তারউপর কেক এর বক্স রেখেছে। আজ তামিমের মিথ্যা জন্মদিন, সেই উপলক্ষে ই এই আয়োজন। গত পাঁচদিনে বন্যার সাথে মেঘের ফোনে কথা হয় নি বললেই চলে। ক্লাসে দেখা হলেও মেঘ সারাক্ষণ শুধু ভাইয়ের বিয়ে নিয়েই বকবক করেছে। গত দুদিন বন্যা ক্লাসেও আসে নি। বন্যার ব্যাপারে কথা বলার জন্য গত পরশুদিন বন্যার অনুপস্থিতিতে মিনহাজদের সাথে আলোচনায়

বসেছিল মেঘ। মেঘের প্ল্যান জানিয়ে সবার মতামত নিয়ে সবকিছু রেডি করেছে। এমনকি মিনহাজদের থ্রেট ও দিয়েছে যেন আবির বা তানভির কিছু জানতে না পারে। সেদিন ই মিনহাজদের আনব্লক করে ফেসবুকে এড করে ওদের দিয়ে একটা গ্রুপ খুলিয়েছে। সেখানে গত দুদিনে মেঘ আর মীম যা যা করেছে সব আপডেট দিয়েছে। এমনকি গতকাল বিকেলে মীম, আদি আর মেঘ মিলে তানভিরকে জোর করে ফেসিয়াল করিয়েছে সেই ছবি তুলেও গ্রুপে দিয়েছে। বন্যা সব মেসেজ দেখলেও কোনো রিপ্লাই করে নি। তানভিরের ফেসিয়ালের ছবি দেয়ার পর থেকে বন্যা নেটেও নেই। মেঘ সন্ধ্যার পর মিষ্টিকে দিয়ে বন্যার নাম্বারে কল দিয়েছিল। ২-৩ বার কল দেয়ার পর বন্যার বোন কল রিসিভ করে জানিয়েছে বন্যার ১০৪□ ফা জ্বর। রাতে মিষ্টি আরও ২-৩ বার কল দিয়ে খোঁজ নিয়েছে কিন্তু মেঘ একবারও কল দেয় নি। আজ দুপুরে মিনহাজ বন্যাকে কল দিয়ে খোঁজ খবর নিয়েছে। বন্যার শরীরে তখনও জ্বর ছিলই তবে কম। মিনহাজ তামিমের জন্মদিনের কথা জানিয়ে খুব জোরাজোরি করে রাজি করেছে সাথে এটাও বলেছে যেন মেঘের দেয়া ড্রেস টা পড়ে আসে। বন্যা তখন জিজ্ঞেস করেছিল, “আমি যে অসুস্থ এটা কি মেঘ জানে?” মিনহাজ স্বাভাবিক কণ্ঠে উত্তর দিয়েছিল, “জানলেই বা কি মেঘের এখন তোর কথা ভাবার সময় আছে নাকি। সে তার ভাবিকে নিয়ে ব্যস্ত। ” বন্যা আর কিছু না বলেই কল কেটে দিয়েছিল। শুধুমাত্র বন্ধুদের কথা ভেবে শরীরে জ্বর নিয়েও বন্যা আসছে। মেঘ দু’হাত পেছনে রেখে সোজা টেবিলের কাছে

দাঁড়ালো। মীম মেঘের পাশে দাঁড়িয়ে সবাইকে সালাম দিয়ে বন্যাকে উদ্দেশ্য করে জিজ্ঞেস করল, “বন্যাপু তুমি কি অসুস্থ?” বন্যা উত্তর দেয়ার আগেই মেঘ মীমের দিকে তাকিয়ে রাগী স্বরে বলল, ” তুই কি বন্যার খোঁজ নিতে আসছিস? যার জন্মদিন তাকে উইশ কর।” মীম আস্তে করে বলল, “সরি। ” মীম পরপর মিনহাজের দিকে তাকিয়ে বলল, “Happy birthday Tamim Vaiya” মিনহাজ হেসে বলল, “আমি তামিম না, মিনহাজ।” “জানি। এখন আমি কি করব? ” “না মানে আমার দিকে তাকিয়ে উইশ করলা তাই বললাম। ” “ইচ্ছে করেই করেছি।” “মানে?” মীম মেকি স্বরে শুধালো, “আজ কার জন্মদিন ?” মীম মনে মনে বিড়বিড় করল, “জন্মদিনের নামগন্ধ নেই উইশ নিয়ে পড়ে আছে।” তামিম কথা কাটিয়ে বলল, “আরে বাদ দে। জন্মদিন যার ই হোক কেক সবাই মিলে খাবো।” বন্যা চাপা স্বরে বলল, “তাড়াতাড়ি কর। বাসায় যেতে হবে।” তামিম তপ্ত স্বরে বলল, “বাইকে আসার সময় ছু*রি টা রাস্তায় পরে ভেঙে গেছে। মেঘকে বলছিলাম ছু*রি নিয়ে আসতে।” মেঘকে উদ্দেশ্য করে শুধালো, “ছু*রি আনছিস?” মেঘ বন্যার দিকে তাকিয়ে পেছন থেকে এক হাত সামনে এনে টেবিলে রাখতেই মিনহাজ চেঁচিয়ে উঠলো, “তোকে কেক কাঁটার প্লাস্টিকের ছু*রি আনতে বলেছিলাম। তুই মানুষ কাঁ*টার ছু*রি নিয়ে আসলি কেন?” মেঘ বন্যার দিকে তাকিয়ে থেকেই উত্তর দিল, “কোন কাজে লাগে বলা যায় না।” তামিম চোখ বড় করে বলল, “ভাবি আমাদের সেই মুডে আছে। আজ এসপারওসপার করেই ছাড়বে।”

বন্যা ঢোক গিলে শান্ত স্বরে বলল, “ওর মুডে থাকার দিন, ও তো মুডেই থাকবে। কেক কাটলে কাট না হয় আমি চলে যাব।” মেঘ ছু*রি টা এপাশ ওপাশ ঘুরিয়ে কাঠের টেবিলের মাঝ বরাবর ছু*রিটা কুপতে কুপতে রাগান্বিত কণ্ঠে হুঙ্কার দিল, “আজ এখানে আমি ছাড়া কারো কথা চলবে না।” মেঘের এমন আচরণে বন্যা সহ সবাই কেঁপে উঠলো। মেঘ বন্যার দিকে তাকিয়ে ধীর কণ্ঠে বলল, ” তোকে লাস্ট ওয়ার্নিং দিচ্ছি, আমার সাথে নাটক করার চেষ্টাও করবি না। তালবাহানা করলে একদম মে*রে গাছতলায় ফেলে চলে যাব।” বন্যা ভ্রু গুটিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, “কি হয়েছে তোর?” স্নিগ্ধ শীতল হাওয়া বইছে, মেঘ টেবিলের পাশ কাটিয়ে বন্যার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। মেঘের দু হাত পেছনে। মিষ্টি ফোন বের করে ভিডিও অন করলো। বাকিরা উৎসুক দৃষ্টিতে মেঘকে দেখছে। মেঘের বিধ্বংসী মনোভাব দেখে বন্যা কিছুটা ভীত হয়ে আছে। মেঘ রক্তিম আকাশের পানে তাকিয়ে উষ্ণ নিঃশ্বাস ছেড়ে বন্যার অভিমুখে তাকিয়ে বলতে শুরু করলো, “আমার হৃদয়ের সবটুকু জুড়ে যাদের অস্তিত্ব আছে তাদের মধ্যে তুই একজন। আমার প্রাণচঁচল্যে তোর অবস্থান রক্তিম অরুণের মতোন। তুই পাশে আছিস বলে আমি বারংবার ভেঙেচুরে নবরূপে রাঙিয়েছি নিজেকে। তোর প্রতি আমার বিশ্বাস সুবিশাল সমুদ্রের গভীরতায় ন্যায় দৃঢ়। তোকে বন্ধু হিসেবে পেয়ে আমার প্রাপ্তির খাতা পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। আমি জানি, তুই নিজের থেকেও বেশি আমায় ভালোবাসিস আর আমার থেকেও বেশি ভালোবাসিস আমার

ভাইকে। তুই বুঝতেও পারছিস না, তানভির ভাইয়ার জন্য তোর বুকের বা পাশে বিদ্যমান ৩০০ গ্রামের হৃদপিণ্ডটা প্রতিনিয়ত ঠিক কতটা অস্বাভাবিকভাবে স্পন্দিত হচ্ছে। ভাইয়ার তমসাচ্ছন্ন ক্ষয়িষ্ণু হৃদয়ের একগুচ্ছ আতশবাজি তুই, বিষাদে ন্যস্ত অভিপ্রায়ের একমাত্র প্রণয়িনী তুই।ভাইয়ার বেপরোয়া জীবন নবলব্ধে সাজানোর উত্তমা উপদেষ্টা হবি তুই। কথা দিচ্ছি, ভাইয়ার জীবনে অদ্বিতীয়া হয়ে থাকবি সারাজীবন।" বন্যা হতবিহ্বল। দৃষ্টি নিরেট। বন্যার নিস্তব্ধ আঁখি যুগল মেঘের অভিমুখে স্তব্ধ হয়ে আছে। মেঘ হাঁটু গেড়ে বসে পেছন থেকে গোলাপ ভর্তি হাত সামনে এনে বন্যার দিকে ধরে জিভ দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে মোলায়েম কণ্ঠে শুধালো, " তুই কি ভাইয়ার কল্পনার রাজ্যের কল্পতরু হবি? তার সঙ্কীর্ণ সাম্রাজ্যের মহারানী হবি?" বন্যার চোখ টলমল করছে। জ্বরের ঘোরে ভার হয়ে থাকা মাথাটা অনবরত ঘুরছে। মসৃণ গাল বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পরতে বেশি সময় লাগল না। গত পাঁচদিন গুমরে গুমরে অনেক কেঁদেছে যেটা বন্যার চোখ মুখ দেখলেই বুঝা যায়। বন্যার দুচোখ বেয়ে অনর্গল পানি পরছে। মেঘ মীমের দিকে তাকিয়ে গুরুভার কণ্ঠে বলল, "তোকে কি দাওয়াত দিয়ে আনতে হবে?" মীম থতমত খেয়ে বলল, "সরি, সরি। তোমার কথা শুনে টাশকি খেয়ে ফেলছিলাম।" মীম এগিয়ে এসে মেঘের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে সেই ফুলের তোড়ায় হাত রেখে দু'জন একসঙ্গে উচ্চস্বরে বলে উঠল, "আপনি কি আমাদের ভাবি হবেন? তানভির খানের একমাত্র বউ হবেন?" বন্যার শরীর কাঁপছে। ভেজা চোখে মেঘ আর মীমের

দিকে তাকিয়ে আছে। তামিম রাশভারি কণ্ঠে বলল, “বন্যা ভাবি তাড়াতাড়ি রাজি হোন, নয়তো মেঘ ভাবির মাথা আবারও গরম হয়ে যাবে।” বন্যা সবার দিকে তাকালো। মিনহাজ, তামিম, সাদিয়া একসঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে। মিষ্টি একায় ভিডিও করছে। বন্যা পুনরায় মেঘদের দিকে তাকালো। মেঘ স্ট্রং থাকলেও মীম এক পায়ের উপর নিজের ভর রাখতে না পেরে মেঘের উপর হেলে পড়ছে। মেঘ তড়িঘড়ি করে চেঁচিয়ে উঠল, “আরে বেডি তাড়াতাড়ি হ্যাঁ বল, পড়ে যাচ্ছি তো।” বন্যা ফুল ধরতে ধরতে বিহ্বলতায় উত্তর দিল, ” ইনশাআল্লাহ, তোমাদের ভাবি হবো আমি।” ততক্ষণে মীমের শরীরের ভরে মেঘ মাটিতে পরে গেছে, মীম মেঘের উপর পরছে। বন্যার একহাতে ফুল অন্যহাতে মেঘের ঘাড়ে ধরে আটকাতে গিয়ে নিজের ওড়নায় টান খেয়ে বন্যাও মেঘদের উপর পরছে। বন্যা তখনও একহাতে মেঘের কাঁধ আঁকড়ে ধরে আছে যেন মাথায় চাপ না খায়। মিষ্টির ভিডিও তখনও চলমান। সাদিয়া, তামিম দ্রুত এগিয়ে গেছে। সাদিয়া মীমকে টেনে তুলেছে। মীমের পায়ে অল্প চাপ খেয়েছে তাই ব্যথায় আর্তনাদ করছে। মিষ্টি মিনহাজকে ফোন দিয়ে তাড়াতাড়ি মেঘ আর বন্যাকে টেনে তুলেছে। ব্যথা পেয়েছে যেমন তেমন নতুন জামাগুলোতে মাটি আর ময়লা লেগে যাচ্ছেতাই অবস্থা হয়ে গেছে। মিনহাজ, তামিম আর সাদিয়া হাসতে হাসতে একদম বসে পরেছে। মিনহাজ হাসতে হাসতে বলল, “আমার জীবনে দেখা সেরা প্রপোজ। সারাজীবন মনে থাকবে। দেখবি তোদের ননদ ভাবির সম্পর্ক

সারাজীবন এমনই থাকবে। যাই করতে যাবি একটা করে অঘটন ঘটাবি। ” মেঘ হুঙ্কার দিয়ে উঠল, ” চুপ থাক নয়তো তোর মুখে কসটেপ লাগায় দিব।” মেঘ বন্যার দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বলল, “সরি, তুই ভাইয়াকে ভালোবাসিস এটা তোকে বুঝাতে পাঁচদিন তোর সঙ্গে খুব বাজে ব্যবহার করেছি। সরি বেবি ” বন্যা কোনো কিছু না বলে আচমকা মেঘকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরলো। কান্না ভেজা দুচোখ বেয়ে আবারও পানি ঝরছে। মেঘও বন্যার পিঠ বরাবর দুহাত পেঁচিয়ে ধরেছে। বন্যা এবার হাউমাউ করে কান্না শুরু করেছে। এত বছরের বন্ধুত্বে বন্যাকে কখনো এভাবে কাঁদতে দেখেনি মেঘ। বরাবরই চুপচাপ আর শান্তশিষ্ট থাকে, কাঁদলেও কখনো কারো সামনে কাঁদে না অথচ আজ সেই মেয়ে খোলা আকাশের নিচে অবাধে কেঁদে চলেছে। মেঘ শীতল কণ্ঠে বলল, ” সরি তো। প্লিজ এভাবে কান্না করিস না। আমি জানতাম তুই ভাইয়াকে ভালোবাসিস কিন্তু তোকে সরাসরি জিজ্ঞেস করলে তুই কখনোই স্বীকার করতি না তারজন্য আমাকে এসব করতে হয়েছে। প্লিজ সরি।” বন্যা কাঁদতে কাঁদতে অস্পষ্ট কণ্ঠে বলতে শুরু করল, “আমি বুঝতেও পারি নি কবে আমি ওনাকে এত বেশি ভালোবেসে ফেলেছি। তুই সেদিন ঐ মেয়ের ছবি দেখানোর পর থেকে এখন পর্যন্ত আমি ঠিকমতো ঘুমাতে পারি নি, খেতে পর্যন্ত পারি নি। আমার নিঃশ্বাস নিতে পর্যন্ত কষ্ট হচ্ছিলো। সারাক্ষণ মনে হচ্ছিল আমি সব হারিয়ে ফেলছি। কি যেন নেই আমার। চারপাশ শূন্য লাগছিল আমার। আমি ওনাকে অনেক ভালোবাসি বেবি। ” মেঘ বন্যাকে নিজের

কাছ থেকে সরিয়ে দুচোখ মুছে শান্ত কণ্ঠে বলল, " আমার ভাবি হতে তুই সত্যি রাজি তো ? " বন্যা মলিন হেসে বলল, "রাজি। কিন্তু... " মেঘ স্বাভাবিক কণ্ঠে জানতে চাইল, "কিন্তু কি?" "তুই যে বলছিলি আজ মেয়ে দেখতে যাবি?" " লে হালুয়া! তুই কি ছেলে নাকি?" বন্যা শ্বাস ছেড়ে রাগী স্বরে বলল, "দূর ফাজলামো করিস না। ঐ মেয়েটা কে ছিল?" "আমি চিনি না। ফেসবুকে পেয়েছিলাম। " "ফাজিল মেয়ে। কিন্তু বললি যে তোর ভাই রাজি?" "ওমা। ভাইয়া তোকে লাভ করলে রাজি হবে না?" "তোর ভাই আমায় পছন্দ করে?" "নাহ। ডিরেক্ট ভালোবাসে। " "তোকে বলছে?" মেঘ বিষন্ন চিত্তে তাকিয়ে বলল, "বললে আজ আমাদের জায়গায় ভাইয়া থাকতো আর আমরা ক্যামেরাম্যান থাকতাম। বুঝলি? অনেক চেষ্টা করার পরও ভাইয়া যখন কিছু বলছিল না তখন বাধ্য হয়ে আমাকে এই পথ বেঁচে নিতে হয়েছে। ভাইয়া কবে বলবে সে আশায় থাকলে আমি মরে ভূ*ত হয়ে যেতাম। তার থেকে নিজের মনের ভাব প্রকাশ করে ফেললাম।" মেঘ একটু থেমে আবার বলে উঠল, "আবির ভাইয়ের মতো ডায়লগ দেয়, তোকে বৌমনি ডাকার জন্য যদি অধিকারনামায় স্বাক্ষর করতে হয় তবে আমি সেই অধিকারনামায় স্বাক্ষর করে হলেও তোকে বৌমনি ডাকবো। তুই আমার ভাবি মানে আমার ই ভাবি। পৃথিবীর কেউ তোকে আমার ভাবি হওয়া থেকে আটকাতে পারবে না, ইনশাআল্লাহ। " বন্যা আনমনে হেসে বলল, "ইনশাআল্লাহ। " মীম এক পা ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে মেঘদের কাছে আসতে আসতে বলল, " বন্যাপু, আমি যে তোমার

ছোট ননদ এটা কি তোমার মনে আছে?” বন্যা আলতোভাবে মীমকে জড়িয়ে ধরে আহ্লাদী কণ্ঠে বলল, “ওলে সোনা। তুমি আমার কিউট ননদী, তোমাকে আমি কিভাবে ভুলবো বলো। ” মেঘ ভেঙচি কেটে বিড়বিড় করে বলল, “আজ কিউট না বলে।” মিনহাজ ঠাট্টার স্বরে বলে উঠল, ” আপনি কিউট না বলেই একজন নিজের জান জীবন দিয়ে আপনাকে আগলে রাখে। আপনার দিকে কেউ নজর দেয়ার আগেই আধমরা করে ফেলে। আপনাদের মুখে এসব সাজে না ভাবি। বরং আমি আর তামিম এসব বললে মানা যেতো। ” তামিম পাশ থেকে বলল, “সহমত বন্ধু।” বন্যা হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, “তামিমের না জন্মদিন? কেক কাটব না?” মেঘ ভেঙচি কেটে বলল, ” আমার ভাইয়ের সাথে যুদ্ধ করে আসছি কি তামিমের জন্মদিন করতে নাকি?” মেঘ নিজের হাতে বক্স থেকে কেক বের করল। কেক এর উপর লেখা, প্রিয় বন্যা, “ভাবি হবি?” হ্যাঁ/হ্যাঁ মেঘ বলল, ” দুটা অপশন দিলাম যেকোনো একটা বেছে নিতে পারিস। ” “এখানে দুটা অপশন? ” ” অবশ্যই। একটা আমার অপশন আরেকটা মীমের অপশন। ” কেক কেটে খেয়ে সবাইকে নিয়ে রেস্টুরেন্টের উদ্দেশ্যে রওনা দিল। সন্ধ্যার আগে আগে বাসায় না গেলে নিশ্চিত বকা খাবে। রেস্টুরেন্টে বন্যা আর মেঘ পাশাপাশি বসে খাচ্ছে আর ফিসফিস করে গল্প করছে। মেঘ সবার উদ্দেশ্যে হুঙ্কার দিল, ” আমার ভাই কিংবা আমার ওনার কানে যদি আজকের ঘটনার একাংশ যায় তাহলে তোদের সাথে চিরদিনের জন্য বন্ধুত্ব ভেঙে দিব। আর বন্যা, তোকেও

সাবধান করছি। তুই আমাদের ভাবি কিন্তু তানভির ভাই এর প্রেমিকা না। ভাইয়া প্রপোজ না করা পর্যন্ত তুই যদি কোনো প্রকার আলগা পিরিত দেখাস তাহলে তোকেও দেখে নিব।" "ঠিক আছে। তাড়াতাড়ি কর। জ্বর বাড়তেছে, শরীর খারাপ লাগছে। বাসায় চলে যাব।" "রিক্সা দিয়ে এতদূর গেলে আরও বেশি কষ্ট হবে। দাঁড়া ভাইয়াকে কল দিচ্ছি।" "এই না না, প্লিজ। ওনাকে কল দিস না।" "চুপ করে বসে থাক। আমার বেস্ট ফ্রেন্ডকে বউ বানানোর যোগ্যতা না থাকলে বিয়ে কিভাবে দিব?" মেঘ তানভিরকে কল দিয়ে আসতে বলেছে। তানভিরও চটজলদি রেডি হয়ে রওনা দিয়েছে। ওদের খাওয়া শেষ হতে হতে তানভির চলে আসছে। সবার থেকে বিদায় নিয়ে তানভিরের সামনে আসতেই তানভির পর পর তিনজনের দিকে তাকালো। তিনজনের জামার অবস্থা দেখে তানভির গম্ভীর কণ্ঠে শুধালো, "তোরা কি ফুটবল খেলতে গেছিলি?" মেঘ একটা বক্সে "হ্যাঁ" লেখা একটুকরো কেক তানভিরের মুখের সামনে ধরে বলল, "এটা পুরস্কার। এবার হা করো" "কিসের পুরস্কার? আর কেকে হ্যাঁ লেখা কেনো?" "তুমি আমাদের ভালোবাসো না?" "হ্যাঁ" "এটায় লেখা। এখন হা করো।" তানভির হা করতেই মেঘ কেক মুখে দিয়ে অস্থির হয়ে বলল, "এখন চলো আমার বেবি অসুস্থ। " মেঘ আর মীম দ্রুত গাড়ির দিকে চলে গেছে। বন্যার মাথা ঘুরছে তবুও আস্তে করে পা বাড়ালো। তানভির উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জানতে চাইলো, "কি হয়েছে তোমার?" "জ্বর।" জ্বর শব্দটা কানে বাজতেই তানভির এগিয়ে এসে বন্যার কপালে হাত

রাখলো। সঙ্গে সঙ্গে বন্যার শরীর ঝাঁকুনি দিয়ে উঠেছে। মেঘ আর মীম দূর থেকে এই দৃশ্য দেখে মেঘ দ্রুত দু হাতে মীমের চোখ ঢেকে মেকি স্বরে বলল, " রোমান্টিক সীন দেখার বয়স হয় নি তোর। "
তানভিরের পেশিবহুল হাতে নজর পড়তেই বন্যা চোখ নামিয়ে আতঙ্কিত কণ্ঠে বলল, "হাত সরান।" "হাত সরাবো কেনো? এত জ্বর নিয়ে বাহিরে ঘুরছো কোন সাহসে? আর হাতে এত ফুল কেনো? কে দিয়েছে? কেক ই বা কিসের ছিল?" বন্যা কি বলবে বুঝতে না পেরে আস্তে করে বলতে নিল, "তামিমের.." এটুকু বলতেই তানভির কপাল থেকে হাত সরিয়ে চিৎকার করল, "তামিম তোমায় ফুল দিয়েছে? " "না না।" "তাহলে কে দিয়েছে?" "মেঘ। " "সত্যি তো?" "বিশ্বাস না হলে মেঘকে জিজ্ঞেস করুন।" "বনুকে জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন নেই। ডাক্তার দেখিয়েছিলে?" "না। ঔষধ খেলেই কমে যাবে।" তানভির অগ্নিদৃষ্টিতে তাকিয়ে শক্ত কণ্ঠে বলল, " এই মেয়ে তুমি এত কেয়ারলেস কেনো? সেদিন যে বললাম প্রেশার কম, খাওয়াদাওয়া করতে ঠিক মতো। কথা মানলে না কেনো? উল্টো জ্বর বাঁধিয়েছো। " বন্যা কিছু না বলে মাথা নিচু করে চলে যাচ্ছে। তানভির পেছন পেছন গজগজ করতে করতে যাচ্ছে, "কল দিলে কল রিসিভ করে না, কিছু জিজ্ঞেস করলে উত্তর দেয়ার প্রয়োজন মনে করে না, নিজের যত্ন পর্যন্ত নেয় না। এর থেকে রোবটও শতগুণে ভালো। " বন্যা সামনে যেতে যেতে তানভিরের কথা শুনে মুচকি হাসলো। বন্যাকে ডাক্তার দেখিয়ে, ঔষধ আর কিছু ফল কিনে বাসা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে তারপর

ওরা বাসায় আসছে। সারাদিনের ক্লান্তিতে মেঘ মাগরিবের নামাজ পড়েই ঘুমিয়ে পরেছে। ফোন টেবিলের উপর সাইলেন্ট অবস্থায় পড়ে আছে। আবির সন্ধ্যার পর সবার সাথে কথা বলার সময় মেঘের সাথে কথা বলতে চেয়েছিল, কিন্তু মেঘ আশেপাশে নেই শুনে তেমন জোরও করে নি। কিন্তু মেঘের সঙ্গে কথা বলার জন্য মনটা ছটফট করছে। মেঘদের বাসায় পৌঁছে দিয়ে তানভির একটা কাজে শহরের বাহিরে গেছে আগামীকাল ফিরবে। মেঘের সাথে কথা বলার জন্য দুই তিনবার আম্মু, মামনির নাম্বারে কল দিয়েছে কিন্তু মেঘের কথা বলতে পারছে না। কাকিয়ার ফোন প্রায় সময় মীমের কাছে থাকে সেই ভেবে কাকিয়াকেও কল দিয়েছে কিন্তু আজ ফোন কাকিয়ার কাছেই। আবির এক পর্যায়ে বাধ্য হয়ে ফুপ্পিকে কল দিল। ফুপ্পি এশার নামাজ পড়ছেন তাই জান্নাত ফোন রিসিভ করে সালাম দিল। জান্নাতের কণ্ঠ বুঝতে পেরে আবির সালামের উত্তর দিয়ে স্বাভাবিক কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, ” কেমন আছো?” “আলহামদুলিল্লাহ ভালো তবে রেগে আছি। ” “কেনো আপু?” “ভাইয়া, আজ আমি তোমার ভাবি হিসেবে কথা বলছি।” “জ্বি ভাবি বলুন।” জান্নাত মনমরা হয়ে বলল, “আমাদের বিবাহ বার্ষিকীতে মেঘকে আসতে দিলে না কেনো? আম্মুকে দিয়ে তোমাকে কতগুলো কল দিলাম, আমি নিজে দিলাম, তানভির ভাইকে পর্যন্ত কতগুলো কল দিয়েছি। এটা কি তুমি ঠিক করলে?” আবির মুচকি হেসে বলল, “আমি চিন্তা করেছি, আমার বউকে এখন থেকে একা কারো বাসায় যেতে দিব না। একা একা ঘুরলে আমার কথা ভুলে যাবে। এইযে

আজ, বন্ধুদের সাথে ঘুরতে বেড়িয়ে সারাদিনেও আমার খোঁজ নেয় নি।” “একদম ঠিক করেছে। এত বউ পাগল যেহেতু বউকে নিয়েই চলে যাইতা।” “আমি তো নিয়ে আসতাম ই। কিন্তু আপনার মামা শ্বশুর মানে আমার আব্বাজান শুনলে হার্ট অ্যাটাক করে ফেলবেন এই ভয়ে আনতে পারি নি। ” “মেঘের আব্বু শুনলে মনে হয় হার্ট অ্যাটাক করতো না?” “জ্বি না। আমার শ্বশুর অনেক স্ট্রং আর ওনাকে যদি আজ বলি মেয়েকে পাঠিয়ে দিতে ওনি এক কথায় রাজি হয়ে যাবেন। ” জান্নাত উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, ” সত্যি? মেজো মামা জানে? তুমি বলে ফেলছো?” “আমি বলি নি কিন্তু ওনি রাজি। ” “এটা আবার কেমন কথা?” “এটা এমন ই কথা। সেসব বাদ দেন। এখন আমার বাসায় ফোন দিয়ে আমার বউটাকে ঘুম থেকে উঠিয়ে আমাকে কল দিতে বলুন। বউকে খুব মিস করছি। ” “আমাকে এসব বলতে তোমার লজ্জা লাগছে না?” “আপনি বললেন আজ আপনি আমার ভাবি। তাই দেবর হিসেবে ভাবির কাছে আবদার করায় যায়। রাখছি এখন।” “আচ্ছা। ” জান্নাত যথারীতি হালিমা খানকে কল দিয়ে মেঘের সাথে কথা বলার নাম করে মেঘকে ঘুম থেকে তুলে আবিরের কথা বলেছে। মেঘ তড়িৎ বেগে উঠে ওয়াশরুম থেকে চোখমুখে পানি দিয়ে এসে আবিরকে কল দিল। আবির অডিও কল কেটে ডিরেক্ট ভিডিও কল দিল। মেঘ ঘুম ঘুম চোখে তাকিয়ে সালাম দিল। আবির সালামের উত্তর দিয়ে তপ্ত স্বরে বলল, ” কারো কি আমার জন্য বিন্দুমাত্র চিন্তা হয়?” “সরি ঘুমিয়ে পরেছিলাম।” “আমিও সরি। ঘুম ভাঙানোর

জন্য। ” মেঘ মুচকি হেসে বলল, ” আপনার এই পরিবর্তনের পেছনে নিশ্চিত কোনো রহস্য আছে। কি রহস্য বলুন তো। ” আবির লাজুক হেসে বলল, ” আমি বলুম না আমার শরম করে।” মেঘ চক্ষু যুগল প্রশস্ত করে বলল, “আপনার শরমও আছে?” আবির উত্তর না দিয়ে মেঘের দিকে নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে আছে। মেঘ বার বার ডাকছে কিন্তু আবিরের নজর স্থির। মেঘ এবার রাগী স্বরে বলল, ” এভাবে তাকিয়ে আছেন কেনো?” ” আপনার যেহেতু মনে হয় আমি নির্লজ্জ তাই আজ থেকে আমি নির্লজ্জের মতো আচরণ করব।” মেঘ আহাম্মকের মতো তাকিয়ে আছে। আবিরের দৃষ্টি মেঘকে বরাবরই নাজেহাল করে সেই সঙ্গে আবিরের উল্টাপাল্টা কথাতে মেঘ এখন হতবিহ্বল। আবির খানিক চুপ থেকে মোলায়েম কণ্ঠে শুধালো, ” শুনলাম কোথায় পরে গিয়ে জামাকাপড় নষ্ট করে আসছিস। শরীরে ব্যথা পেয়েছিস?” “না। তেমন ব্যথা পায় নি। কোমড়ে একটু লাগছে।” “কি করতে গেছিলি?” “একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে গেছিলাম। কাউকে বলা যাবে না।” “আমাকেও বলা যাবে না?” “আপনাকে অবশ্যই বলবো। কিন্তু এখন না প্লিজ। আপনি দেশে ফিরলে আপনাকে সারপ্রাইজ দিব।” ” এখন কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে।” আবিরের মুখের অপ্রত্যাশিত কথা শুনে মেঘ বাগাড়ম্বরপূর্ণ হয়ে গেছে। গলা খাঁকারি দিয়ে আস্তে করে বলল, ” ওহ নো। আপনি আমায় ভয় পান? কতটা?” আবির ভ্রু কুঁচকে চাপা স্বরে বলল, ” আপনাকে না আপনার কর্মকাণ্ডকে ভয় পায়।”আবিরের আদুরে ভঙ্গির কথোপকথন শুনে মেঘ

লজ্জায় নুইয়ে পড়ছে মুখ দিয়ে আর কোনো কথায় বের হচ্ছে না। মেঘের দুগাল লাল হয়ে গেছে, নাকের ডগায় ঘাম জমে চিকচিক করছে। অডিও কলে আর মেসেজে মেঘের কথার রাজত্ব চললেও ভিডিও কলে আবিরের সাথে কথা বলতে মেঘের হিমসিম খেতে হয়। গত দেড় বছরে আবির যতটা ভদ্র থাকার চেষ্টা করেছে, এই দুই তিনমাসে ভদ্রতার সেই মুখোশ সরে গেছে। সব বিধিনিষেধ ভুলে মেঘকে আপন করার এক বিচিত্র প্রচেষ্টা চলছে। আবিরের অব্যক্ত দৃষ্টি সর্বক্ষণ কিছু ব্যক্ত করতে চাই। আর সেই অবাঁচ্ছিত দৃষ্টিতেই মেঘ বারংবার ঘায়েল হয়। আবিরের সাথে যতবার কথা হয় কল কাটার আগে মেঘের শেষ কথা থাকে, “I Miss You” আবিরকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই কল কাটে প্রতিবার। মেঘের এমন কর্মকাণ্ডে নিঃশব্দে হাসা ছাড়া আবিরের আর কিছুই করার থাকে না। রাত ১১ টার দিকে তানভির বন্যার নাম্বারে কল দিল। আজ প্রথম কলটায় রিসিভ হলো। বন্যা মৃদু স্বরে বলল, “আসসালামু আলাইকুম ” “ওয়ালাইকুম আসসালাম। জ্বর কমেছে?” “কিছুটা।” ” ঔষধ খেয়েছো?” “জ্বি। আপনি খেয়েছেন?” “না।” বন্যা উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলে উঠল, “এত রাত হয়ে গেছে এখনও খান নি কেনো?” “একটা কাজে শহরের বাহিরে আসছিলাম। অনেক রাত হয়ে গেছে তেমন দোকানপাট খোলা নেই। দু-একটা খোলা আছে কিন্তু খাবারের মান তেমন ভালো না। তাই খেতে ইচ্ছে করে নি।” “সারারাত না খেয়ে থাকবেন?” ” তুমি হঠাৎ আমার খাবার নিয়ে এত চিন্তা করছো কেন?

ঘটনা কি?” “আমার সামান্য জ্বর দেখেই আপনি সন্ধ্যায় যেভাবে ডাক্তার দেখাতে উতলা হয়ে গিয়েছিলেন। তখন কি আমি কিছু বলেছি?” “এটাকে সামান্য জ্বর বলে না বন্যা। ১০৩-১০৪□ ফা জ্বর কখনোই স্বাভাবিক না। তার থেকেও বড় কথা এত জ্বর নিয়ে তুমি ঘুরতে বের হলে কোন বিবেকে? এই তোমার ম্যাচিউরিটি?” “আমি কখন বললাম আমি ম্যাচিউর? তাছাড়া আজ না বের হলে হয়তো জীবনের সেরা মুহুর্তটা মিস করতাম। ” “মানে? কিসের সেরা মুহুর্ত?” “তেমন কিছু না তবে অনেক কিছু।” ” বনুর মতো তুমিও শুরু করো না প্লিজ। এমনিতেই খায় নি মাথা ঘুরছে তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে এখন ই বেহুঁশ হয়ে যাব। কি হয়েছে বলো, প্লিজ।” বন্যা ফিসফিস করে বলল, “আপু আসছে, বাই।” বন্যা কল কেটে দিয়েছে। তানভির থম মেরে বসে আছে। একটু পর আবিরকে মেসেজ দিল, খানিক বাদেই আবিরের কল আসছে। রিসিভ করতেই আবির বলল, ” তোকে আমি একটা কাজ দিয়েছিলাম তা না করে এত রাতে কার সাথে কথা বলছিস?” তানভির স্বাভাবিক কণ্ঠে জানালো, ” বন্যার সাথে কথা বলছিলাম আর তোমার কাজ শেষ করেই কথা বলছি। আমি তো তোমার মতো না যে সব কাজ ফেলে বউয়ের সঙ্গে প্রেম করতে লেগে যাব। দূর! বেশি কিছু বলতেও পারি না কারণ বোনটাও আমার ই।” আবির ঠাট্টার স্বরে শুধালো, “এত রেগে আছিস কেন? কি হয়েছে ভাই..! ” “রেগে থাকব না? একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনায় বসছি, সবকিছু ফাইনাল। তোমার সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য জাস্ট কল

দিয়েছি। দুমিনিটের আলাপ সেখানে তুমি আমার কল তো রিসিভ করলাই না উল্টো আমায় ব্লক করে দিলা? এখন আবার আমায় বলতে আসছো, আমি কাজ ফেলে কার সঙ্গে কথা বলি? বাহ ভাই!" আবির স্বভাব-সুলভ গম্ভীর কণ্ঠে বলল, "প্রেমের সময় যারা বাগড়া দেয় তারা মানুষরূপী আগাছা। বুঝলি?" "আমি আগাছা হলে তুমিও আগাছা। আমার প্রেমের সময় তুমিও বাগড়া দিয়েছো।" "একদম না। আমি একবার কল দিয়ে ওয়েটিং পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে কল কেটে দিয়েছি। আর একটা কলও দেয় নি। তুই কথা শেষ করে মেসেজ দিয়েছিস তারপর আমি কল দিয়েছি। আর তুই? আমি বার বার কল কেটে দিচ্ছিলাম তারপরও তুই কল দিয়েই যাচ্ছিলি।" "হয়েছে হয়েছে! আমি মানছি আমি আগাছা। শুধু তুমি না, সবার জীবনেরই আগাছা আমি। বেকুবের মতো এক মেয়ের প্রেমের প্রস্তাবে রাজি হয়ে বাসার সবার চোখে আগাছা হয়েছি, ঐ মেয়ের জন্য নিজের পড়াশোনা ধ্বংস করেছি। রাজনীতির নামে মুখোশধারী মানুষের সাথে প্রতিনিয়ত বাকবিতন্ডায় জড়াচ্ছি। এখন একজনকে মন থেকে ভালোবাসি কিন্তু তার জীবনেও আমি ভিলেন পদে আছি। আহারে! আগাছাময় জীবন আমার।" আবির মোলায়েম কণ্ঠে বেশ কিছুক্ষণ বুঝানোর চেষ্টা করলো। তানভিরের সভাপতি নির্বাচনের এক বছর কেটে গেছে। তিনবছরের কমিটি এই এক বছরেই তছনছ হয়ে গেছে। কমিটির সদস্যের ঐক্যবদ্ধ জোট ভেঙেছে আরও ৩-৪ মাস আগে। সহ সভাপতি, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আর সাংগঠনিক সম্পাদকদের একের পর এক দ্বন্দ্বে প্রতিনিয়ত

হিমসিম খাচ্ছে তানভির। স্থানীয় নেতা সহ এমপি, মন্ত্রীরাও সমস্যা সমাধান করতে পারছেন না। মিটিং এ সব মেনে নিলেও সুযোগে একজন আরেকজনের মা*থা ফা*টাতে ব্যস্ত। তানভিরের সঙ্গে কারো পার্সোনাল শত্রুতা নেই ঠিকই কিন্তু চোখের সামনে নীতিবিরোধী কর্মকাণ্ড সহ্যও করতে পারছে না। সেই সঙ্গে বন্যাকে নিয়ে আছে তার সুদূর চিন্তাভাবনা। বন্যার পরিবারে বন্যার বাবা সরকারি চাকরিজীবী, বড় বোনও তাই। এমনকি বন্যার আত্মীয়স্বজন বেশিরভাগ ই সরকারি চাকরিজীবী। বন্যার আপুর জন্য সরকারি চাকরিজীবী ছেলে খোঁজা হচ্ছে। সেখানে বন্যা তার বোনের থেকেও বেশি ব্রিলিয়ান্ট, দেখতে শুনতে মাশাআল্লাহ তাই স্বাভাবিকভাবেই বলা যায় বন্যাকে বিয়ে করার জন্য তানভিরের বিন্দুমাত্র যোগ্যতাও নেই। বন্যাদের বংশের কেউ কখনো রাজনীতি করে নি। সেখানে তানভিরদের বাসায় স্বয়ং আলী আহমদ খান এককালে এলাকার সুপরিচিত রাজনীতিবিদ ছিলেন। গ্রামের বাড়িতে এখনও অনেকে ওনাকে নেতা হিসেবেই চিনেন। পারিবারিক ও ব্যক্তিগত শত্রুতার কারণে একসময় রাজনীতি ছেড়ে, গ্রামের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে ঢাকায় চলে আসেন। হয়তো বাবার রক্তের টানে কলেজ জীবনে আবিরও টুকটাক রাজনীতিতে জড়িয়েছিল তবে পুরোপুরি জড়ানোর আগেই কলেজের এক স্যার আবিরকে বুঝিয়ে রাজনীতির চিন্তা ছাড়িয়ে পড়াশোনার প্রতি মনোযোগী করেন। আব্বু আর স্যারের কথা মেনে আবিরও রাজনীতি নিয়ে তেমন ভাবে নি। কিন্তু তানভির আবিরের মতো না, ঐ মেয়ের কারণে বাসায় যখন

ঝামেলা হয়েছিল তখন ২-৩ নেতা আলী আহমদ খান ও মোজাম্মেল খানকে বাজে কথা বলেছিলেন। সেখান থেকেই তানভিরের ভেতর জেদ কাজ করে আর সে রাজনীতি করার সিদ্ধান্ত নেয়। রাজনীতি করতে না দিলে পড়াশোনা করবে না বলে হুমকি পর্যন্ত দিয়েছিল।তখন বয়স কম ছিল আর তানভির এতটায় জেদি ছিল যে আবিরও তাকে মানাতে পারে নি তাই বাধ্য হয়ে তানভিরকে বেশ কিছু শর্ত দিয়ে আবির রাজি হয়েছিল। কয়েকবছরেই তানভিরের মন উঠে গেছে। একদিন কথায় কথায় মেঘের মুখে শুনেছে বন্যার রাজনীতি একদম পছন্দ না তাই ইদানীং তানভিরের মাথায় ভূত চেপেছে সে রাজনীতি ছেড়ে পড়াশোনা করবে, চাকরি নিয়ে বন্যাকে বিয়ে করবে। একটা সময় তানভিরের রাজনীতির জন্য আবিরকে প্রচুর বকা খেতে হয়েছিল তবে এখন সবাই মোটামুটি স্বাভাবিক। তানভিরকে নিয়েও কারো কোনো মাথা ব্যথা নেই অথচ তানভির হুট করে সিদ্ধান্ত নিয়েছে সে এই অমার্জিত রাজনীতি আর করবে না। যেখানে এক কমিটির অন্তর্ভুক্ত সদস্যরা নৈতিকতা ভুলে একে অপরের সঙ্গে দাঙ্গায় জড়াতে পারে সেই নোংরা রাজনীতিতে তানভির থাকবে না। এমপি তানভিরের সঙ্গে কথা বলে বুঝানোর চেষ্টা করেছেন কিন্তু সে তার জেদ থেকে এক চুলও নড়বে না। আবিরকে কল দেয়ায় আবিরও নিরেট কণ্ঠে বলেছিল, ” আমার ভাই যা বলবে তাই হবে। আমি আমার ভাইকে খুব ভালোবাসি। ও যখন যা চেয়েছে আমি তাই দিয়েছি, ও রাজনীতি করতে চেয়েছে আমি তাতেও সাপোর্ট করেছি আর এখন সে যে

সিদ্ধান্ত নিয়েছে তাতেও সাপোর্ট করবো। কারণ আমি আমার ভাইকে কারোর প্রতিহিংসার আগুনে জ্বলতে দেখতে পারবো না। অতি সামান্য একটা বিষয় নিয়ে কমিটিতে যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়েছে তার প্রভাব যে আমার ভাইয়ের উপর পরবে না তার কি গ্যারেন্টি আছে? আজ নয়তো কাল কেউ যে আমার ভাইয়ের উপর অ্যাটাক করবে না তার কি নিশ্চয়তা আছে?" এমপি আবিরকে বুঝাতেও ব্যর্থ হয়েছেন। ওনাদের ইচ্ছে ছিল তানভিরকে সভাপতি পদে রেখে, বাকি কিছু সদস্য যুক্ত করে জেলাভিত্তিক নতুন করে কমিটি গঠন করে ফেলা। কিন্তু তানভির রাজি না থাকায় নতুন করে আবারও সবকিছু করতে হবে সেসব ভেবেই সবাই কিছুটা চিন্তিত। আগামী সপ্তাহে মিটিং ডাকা হয়েছে, সেদিন সবকিছু ঠিকঠাক হলে কমিটি ঠিক থাকবে না হয় অফিসিয়ালি কমিটি বাতিল করা হবে।তানভিরের সেসবে চিন্তা নেই। আর তানভিরকে ব্যস্ত রাখতে আবির ইচ্ছে করেই অফিসের কাজ সহ বেশকিছু কাজের জন্য তানভিরকে চাপে রাখছে। দুপুর থেকে রাকিবের ফোনে রিয়া আর জান্নাত এক নাগাড়ে কল দিয়েই চলেছে। বাধ্য হয়ে ৪ টা নাগাদ রাকিব অফিস থেকে বেড়িয়ে বাসার উদ্দেশ্যে রওনা দিল। রিয়া আজ সারাদিন ধরে মেঘের জন্য রান্না করেছে। সেগুলোই রাকিবকে দিয়ে পাঠাবে। রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে জান্নাতও বায়না ধরেছে মেঘের জন্য খাবার পাঠাবে। রাকিব এর কিছুই জানতো না। অফিস থেকে এসে এতো আয়োজন দেখে হতভম্ব হয়ে গেছে। কারণ জিজ্ঞেস করায় রিয়া বলেছে মেঘের আব্বু বিয়েতে রাজি সেই খুশি

তাদের সামান্য আয়োজন। আবিরের আব্বু রাজি হলে বিশাল আয়োজন করবে। রিয়ার কথা শুনে রাকিব রীতিমতো আশ্চর্যান্বিত হয়েছে। মেঘের আব্বু আবির-মেঘের সম্পর্কে রাজি এটা রাকিব জানে না অথচ রিয়া -জান্নাত জানে এটা ভেবেই হতাশ হচ্ছে। ফ্রেশ হয়ে আবিরকে কল দিল। আবির কল রিসিভ করতেই রাকিব বলল, " ভালোই তো। আজ শ্বশুরকে রাজি করিয়ে ফেলেছিস কাল বাপকেও রাজি করিয়ে ফেলবি। পরশু বউকে নিয়ে বিদেশে পাড়ি জমাবি। এদিকে তোর যে রাকিব নামের একটা বন্ধু ছিল সেটা বেমালুম ভুলে যাবি। বন্ধুত্বের সম্পর্কও ভেঙে দিবি।" আবির দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললো, " ৭ বছরের দূরত্বে যে বন্ধুত্ব ভাঙে নি, ৫ মাসে সে বন্ধুত্ব কি ভাঙবে? আর শ্বশুর রাজি এটা তোকে কে বলছে?" "জান্নাত আর রিয়া বললো। তারা এই খুশিতে সারাদিন ব্যাপী রান্না করছে তোর বউকে খাওয়ানোর জন্য। " "মানে কি এসবের?" "মানে রাখ। আগে বল তোর শ্বশুর কি আসলেই রাজি? কথা বলছিস তুই?" "তুই কি পাগল হয়ছিস? এখন কথা বললে উপায় আছে? একদিন রিয়েক্ট করেই চিন্তায় আছি, রাগে ৬ মাসের হুমকি তো দিয়েছি ঠিকই কিন্তু মানলে বিশ্বাস। কবে না সব ভুলে বিয়ের আলোচনা শুরু করে দেন। আর এখন যদি এখান থেকে আমি এই কথা তুলি দেখা যাবে কাল সকালেই মেয়ের বিয়ের জন্য তোরজোর শুরু করে দিবেন। " "জান্নাতকে কি বলছিস তাহলে?" "জান্নাতের সাথে মজা করছি। সে কাল ভাবির মতো আচরণ করেছে তাই আমিও দেবরের মতো দুষ্টামি

করেছি। পুরোটা দুষ্টামি ছিল এমনটা নয় কারণ আমার শ্বশুরের এমন আচরণ আমাকেও বেশ ভাবাচ্ছে। ” “কেনো কি হয়েছে?” ” আমি রাগ করে বাসা থেকে চলে যাওয়ার পর থেকে চাচ্চু অনেক শান্ত হয়ে গেছেন। মেঘের বিয়ের জন্য নিজেই উঠেপড়ে লেগেছিলেন আবার নিজেই চুপ হয়ে গেছেন। এমন কেনো করল আমি জানি না তবে সন্দেহ করছি। এত বছর আব্বুর সাথে আমার রেগুলার কথা হতো। চাচ্চুর সাথে ৭ দিনে ১ দিন কিংবা ১৫ দিনে একদিন ২ মিনিটের জন্য কথা হতো। অথচ এবার আমি এখানে আসার পর থেকে আব্বুর থেকে বেশি চাচ্চুর সাথে কথা হচ্ছে। রেগুলার দু’বেলা করে ওনি নিজেই ফোন দেন। এমন না যে শুধু প্রজেক্টের জন্য ওনি চিন্তিত। এমনিতেই খোঁজ নেন, কি করছি, খাচ্ছি কি না ঠিকমতো, কবে ফিরব, শরীর ঠিক আছে কি আরও অনেককিছু। আগে যেসব কথা আব্বু বলতো সে সব কথা এখন চাচ্চু বলেন। ওনার এমন আচরণে মাঝে মাঝে মনে হয়, আমি আসার সময় ওনার মেয়েকে সাথে নিয়ে আসছি। ওনার মেয়েকে যেন সুখে রাখি, তার সাথে যেন ভালো ব্যবহার করি সেজন্য দুবার করে ফোন দিয়ে এলার্ট করেন। ” “ভালোই তো। ওনি রাজি থাকলে তোর টেনশন ই করতে হবে না।” আবির কন্ঠ দ্বিগুণ ভারী করে বলতে শুরু করল, “ভাই ওনাকে আমি বিন্দুমাত্র বিশ্বাস করি না। হতেও পারে ৬ মাসের হুমকির জন্য এখন কিছুটা শান্ত আছেন। শুনেছি আব্বুর সাথে ঝামেলা হয়েছে, তারজন্য হয়তো কিছুদিন চুপচাপ আছেন। যতদিন না বাসর করতে পারছি ততদিন

পর্যন্ত আমি কাউকে বিশ্বাস করি না। বাসর রাতের পরদিন বলতে পারব, আমার শ্বশুর আমাকে মেনে নিয়েছে কি না!” রাকিব মুখ ফুলিয়ে শ্বাস ছেড়ে বলল, “রিয়া আর জান্নাত যে খুশির ঠ্যালায় এতকিছু রান্না করল এখন কি আমিই খেয়ে ফেলব এসব?” “সোজা আমাদের বাসায় নিয়ে দিয়ে আসবি। আমার বৌয়ের ভাগ থেকে একটা কিছু কমলে তোর কপালে শনি আছে। ” রাকিব মুচকি হেসে বলল, ” তুই এখনও আগের মতোই আছিস। মেঘকে নিয়ে সামান্য একটু মজা করলেও যেভাবে রিয়েক্ট করিস আমার ভয় ই হয়। যেদিন বাসায় মেঘের কথা বলবি সেদিন ঠিক কি হবে!” “কি আর হবে। আব্বুরা উল্টাপাল্টা করলে মেঘের হাত টা ধরে সোজা বাসা থেকে বেরিয়ে যাব।” “মেঘ যেতে না চাইলে?” “কোলে নিয়ে চলে যাব।” ” এটায় তো চাই। মেঘকে নিয়ে সোজা আমাদের বাসায় চলে আসিস।” “সেসব পরে দেখা যাবে। এখন রাখি। বের হতে হবে। ” “আচ্ছা ঠিক আছে। ” রাকিব আর আরিফ খাবার নিয়ে একসঙ্গে মেঘদের বাসার উদ্দেশ্যে রওনা দিল। গেইটের ভেতর খোলা জায়গায় মীম আর আদি ক্রিকেট খেলছিল। মেঘও এতক্ষণ এখানেই ছিল কেবল ই ভেতরে গেছে। আদি বোলিং করছে আর মীম ব্যাটিং করছে। রাকিবের হাতে সব খাবার, ভেতরে ঢুকে আদিদের খেলতে দেখে তাড়াতাড়ি চলে গেছে। পেছনে ছিল আরিফ। গেইটের ভেতরে পা রাখতেই বল এসে ঠাস করে ঠোঁটে উপর লাগছে। একটুর জন্য নাকটা বেঁচে গেছে। আরিফ ব্যথায় আর্তনাদ করে উঠল, মাথা চক্কর দিয়ে উঠেছে। এদিকে

মীম ব্যাট ফেলে দৌড়। আদি কি করবে বুঝতে না পেরে মেঘকে ডাকতে ছুটলো। আরিফ চোখে অন্ধকার দেখছে, ব্যথা সহ্য করতে না পেরে এখানেই বসে পরেছে। রাকিব ভেতর থেকে আরিফকে দুবার ডেকেওছে। কিন্তু মালিহা খানের সাথে কথা বলায় ব্যস্ত হয়ে যাওয়ায় বেড়িয়ে এসে দেখতে পারে নি। আদি মেঘকে বলতেই মেঘ দ্রুত ছুটে আসছে। ততক্ষণে আরিফ কিছুটা স্বাভাবিক হয়েছে। কিন্তু দাঁতে আর মাড়িতে চাপ খাওয়ায় রক্ত বের হচ্ছে । মেঘ দৌড়ে এসে আরিফকে তুলে সাপ্লাই এর কাছে নিয়ে গেছে। চোখে-মুখে পানি দিয়ে আরিফকে ভেতরে নিয়ে গেছে। মেঘ ফ্রিজ থেকে বরফ বের করে ঠোঁটের উপর লাগাচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই জায়গাটা ফুলে গেছে। মীম বেশকিছুক্ষণ পর নিচে আসছে। শীতল চোখে আরিফের দিকে তাকিয়ে আছে। অন্য সময় ইচ্ছেকৃত ব্যথা দিলেও মীম আজ ইচ্ছেকরে কিছু করে নি। মীম ভেবেছিল রাকিব ভাইয়া একায় এসেছেন তাই রাকিব ভেতরে চলে যাওয়ায় আবার খেলতে শুরু করেছিল। মীম আর আদি চুপচাপ মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে, রাকিব আরিফের পাশে সোফায় বসে আছে। আলী আহমদ খান বাসায় ফিরে আরিফের অবস্থা দেখে চিন্তিত স্বরে জানতে চাইলেন, “কি হয়েছে তোমার?” আরিফ সত্যি কথা বলতে গিয়েও থেকে গেল। মীমের শীতল চোখদুটো আর অসহায়ের মতো চাহনি দেখে আরিফ আস্তে করে বলল, “তেমন কিছু না বড় মামা।” আলী আহমদ খান ভারী কণ্ঠে বললেন, ” বসো। আমি আসছি।” মীম ভয়ে আরও বেশি সিঁটিয়ে গেছে। বড় আব্বু জোর গলায় জিজ্ঞেস

করলেই আরিফ বলে দিবে। বড় আব্বু জানতে পারলে ওদের যে কি হাল করবে সেই ভেবেই মীমের হাত পা কাঁপছে। কিছুক্ষণ পর তানভির আসছে। রাকিব তানভিরের সাথে কথা বলতে তানভিরের রুমে চলে গেছে। মেঘ রান্নাঘরে শরবত করছে আর মালিহা খান ওদের জন্য নাস্তা রেডি করছেন। মীম সেখান থেকে এক গ্লাস শরবত নিয়ে আরিফের কাছে গেল। মীম চোখ নামিয়ে শীতল কণ্ঠে বলল, "সরি, আমি আপনাকে সত্যি দেখি নি। হুট করে এসে ঢুকেছেন আর বলটাও সেসময় ই লেগেছে।" আরিফ অগ্নিদৃষ্টিতে তাকিয়ে রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে বলল, " আমি জানি তুমি ইচ্ছে করে এমন করেছো। আমি তোমার কি ক্ষতি করেছি যে তুমি সবসময় আমার সাথে এমন আচরণ করো।" মীম ধীর কণ্ঠে বলল, " আপনি বিশ্বাস করুন, আমি ইচ্ছে করে এমনটা করি নি। " "মিথ্যাবাদী মেয়ে। চুপ করো। বড় মামা আসলে আমি সব বলে দিব।" মীমের এবার রাগ উঠে গেছে। হাতে থাকা গ্লাসের সবটা শরবত শেষ করে গ্লাস রাখতে রাখতে রাগান্বিত স্বরে বলে, "আপনি আমায় ভয় দেখাচ্ছেন? কি ভাবছেন আমি খুব ভীতু? একদম না। আমি কাউকে ভয় পায় না। আমার কারণে ব্যথা পেয়েছেন তাই মানবতার খাতিরে সরি বলতে আসছিলাম। এখন বুঝতে পারছি আপনি এই সরির যোগ্য ই না। " মীম রাগে গজগজ করতে করতে নিজের রুমে চলে গেছে। আরিফ আর রাকিব নাস্তা করে সন্ধ্যার আগে আগে বেরিয়েছে। এরমধ্যে রাকিবের ফোন দিয়ে রিয়ার সাথে ভিডিও কলে কথাও বলেছে মেঘ।

সন্ধ্যা পর আবিরকে একটা ছেলের ছবি পাঠিয়ে মেঘ মেসেজ দিয়েছে, “ছেলেটা কেমন?” “ভালো। কে?” মেঘ পরপর একটা বিয়ের কার্ডের ছবি পাঠিয়ে মেসেজ দিল, “আগামী শুক্রবার বিয়ে। আপনার দাওয়াত রইলো। চলে আসবেন। ” “মানে? কার বিয়ে?” মেঘ মুচকি হেসে লিখল, “আমার।” “মা*র্ডার করে ফেলবো।” মেঘ কতগুলোর হাসির ইমোজি পাঠিয়ে লিখল, “মা*র্ডার করতে হলেও আপনাকে আমার সামনে আসতে হবে। বিয়ের দিন দেখা হচ্ছে তাহলে।” আবির এবার কল দিল। মেঘ ভয়ে কল রিসিভ করছে না কারণ কল রিসিভ করলেই বকা খেতে হবে। তিনবারের মাথায় বাধ্য হয়ে কল রিসিভ করল। আবির রাগান্বিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, “ছেলেটা কে?” “বয়ফ্রেন্ড।” “কার?” “আমা...” “রাগাবি না আমায়। ছেলেটা কে বল।” “বললাম তো বয়ফ্রেন্ড। ” “কার?” “আমার বান্ধবী মায়ার বয়ফ্রেন্ড। ” ” কার্ড কার?” “মায়ার বিয়ে শুক্রবারে। সেটার ই কার্ড।” ” বার বার নিজের কথা বলছিলি কেনো?” ” আমার বিয়ের কথা শুনে কতটা খুশি হোন তাই দেখছিলাম।” আবির জিভ দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে মোলায়েম কণ্ঠে বলল, “বিয়ে করার খুব ইচ্ছে তোর?” “হ্যাঁ। অনেক ইচ্ছে। বিয়ে করলে সাজতে পারবো, ছবি তুলতে পারবো, অনেকগুলো শাড়ি হবে, ড্রেস হবে, কত কত গিফট পাবো। আহ! সবগুলো নিয়ে পালায় যাব।” “মানে? কোথায় পালাবি?” মেঘ ফিসফিস করে বলল, “আমি তো বিয়ে করবো শুধু গিফট গুলোর জন্য। যা যা পাবো সব নিয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যাব।” “বাহ! অসাধারণ

চিন্তাভাবনা আপনার। টাকা পাঠায় বিয়ের শপিং করতে করতে রুম ভরে ফেলুন তবুও মানুষের গিফটের আশায় বসে থাকিয়েন না। ” “আপনি বুঝতে পারছেন না। বিয়ের জিনিসপত্র নিয়ে পালানোর মজায় আলাদা। ” আবির দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে মনে মনে বিড়বিড় করল, ” জিনিসপত্র না নিলেও আপনাকে নিয়ে আমি পালাবো, এটা নিশ্চিত। ” আবির কিছু বলছে না দেখে মেঘ মোলায়েম কণ্ঠে বলল, “একটা কথা বলি?” “হুমমম।” ” বলছিলাম... না থাক।” “কি হয়েছে? বিয়েতে যেতে চাচ্ছিস? ” মেঘ চোখ বড় করে ভীত কণ্ঠে বলল, ” আসলে মায়া খুব জোর করছে। না করে দিব?” “না করতে হবে না। যাস সমস্যা নেই।আর কে কে যাবে?” “বন্যা ভা, মানে বন্যা, আমি, মীম, আর পাখি। তানভির ভাইয়া যেতে চাইলে যাবে। ভাইয়াকে আর আপনাকেও দাওয়াত দিয়েছে। ” “সে আমাকে চিনে?” “হুম।” “আচ্ছা। যেখানেই যান সাবধানে থাকবেন।” “জ্বি অবশ্যই। আল্লাহ হাফেজ।” শুক্রবার মীম, মেঘ, বন্যাকে নিয়ে বিয়ে খেতে গেছে। পাখি আলাদাভাবে ওর হাসবেন্ডের সাথে গিয়েছে। মেঘ তানভিরকে যেতে বলেছিল এমনকি মায়া নিজেও ফোন দিয়ে তানভিরকে বলেছে কিন্তু তানভির যেতে রাজি হয় নি। ছোট বোনের বান্ধবীর বিয়েতে যাওয়াটা তানভিরের কাছে কেমন যেন লাগে। পাখির বিয়েতেও তানভির যায় নি। মেঘ, মীম আর বন্যা বিয়ে বাড়ি থেকে খাওয়াদাওয়া করে ঘুরে ফিরে বন্যাকে বাসায় দিয়ে সন্ধ্যার দিকে বাসায় পৌঁছেছে। আজ বাড়ির পরিবেশ অন্যরকম। আবির যাওয়ার এতদিন পর তিন ভাই একসঙ্গে

বাড়িতে উপস্থিত হয়েছেন। তিনভাই সোফায় বসে চা খাচ্ছেন আর গল্প করছেন। মেঘ আর মীম একসঙ্গে সালাম দিল। মোজাম্মেল খান উঠে গিয়ে দু'জনের মাথায় হাত বুলিয়ে ঠান্ডা কণ্ঠে শুধালেন, "কেমন আছিস তোরা?" "আলহামদুলিল্লাহ। আপনি কেমন আছেন?"
"আলহামদুলিল্লাহ ভালো। তোদের জন্য জামা নিয়ে আসছি। দেখ পছন্দ হয় কি না।" মেঘ আর মীম জামা পেয়ে খুশিতে গদগদ হয়ে রুমে চলে গেছে। ফ্রেশ হয়ে কিছুক্ষণ পর নিচে এসে সবার সঙ্গে গল্প করতে বসেছে। গল্প কিছুই না। ওনারা কথা বলছেন মেঘ আর মীম বসে বসে শুনছে। তানভির ছাড়া এখানে সবাই উপস্থিত আছে। কিছুক্ষণ বাদে তানভিরও নিচে আসছে। অনেকদিন পর ভাইদের পেয়ে আলী আহমদ খান মন খুলে কথা বলছেন। মোজাম্মেল খান তানভিরের উদ্দেশ্যে শান্ত কণ্ঠে শুধালেন, "শুনলাম তুমি নাকি রাজনীতি করবে না?" "জ্বি। " "হঠাৎ এই চিন্তা মাথায় ঢুকলো কিভাবে?"
"এমনিতেই। " মোজাম্মেল খান এবার হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, "লক্ষ্য স্থির না করলে জীবনেও কিছু করতে পারবে না। এইযে ভাই ভাই করো, ভাই এর থেকে কিছু তো শিখতে পারো। আমাদের কোম্পানির বেশিরভাগ দায়িত্ব একা সামলিয়েও নিজের কোম্পানি দাঁড় করে ফেলেছে। শুধু তাই নয় এই যে গত দুইমাস রাজশাহী আর চট্টগ্রাম ছিলাম। আমার তেমন কোনো কাজ ই করতে হয় নি। আবির অলরেডি সবকিছু গুছিয়ে রেখে গেছে। এমনকি ওখানে থেকেও প্রতিনিয়ত এখানের খোঁজ নিচ্ছে। আর তুমি কি করছো? একবার

পড়াশোনা ছেড়ে দিছো, আবিরের কথায় এখনও নামমাত্র পড়াশোনা করছো, হুট করে রাজনীতির ভূত চাপছে মাথায় এখন আবার বলছো রাজনীতি করবা না। তুমি আসতে কি চাও? কি করবা জীবনে? এমন করলে কোনো মেয়ের বাবা তোমার কাছে মেয়ে বিয়ে দিবে?" তানভির মনে মনে বিড়বিড় করছে, " কোনো মেয়ের প্রয়োজন নেই আমার। শুধু বন্যা হলেই হবে। আমি পড়াশোনা করে সরকারি চাকরি নিয়ে বন্যাকে বিয়ে করবো।" কিন্তু মুখ ফোটে কিছুই বলতে পারলো না। মোজাম্মেল খান গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, " যদি কিছু করতে না পারো কাল থেকে আমাদের অফিসেই যেও। বাবা-চাচার ব্যবসা যেহেতু আছে সেটার ই হাল ধরো। " আব্বুর কথা বলার ধরন মেঘের একদম সুবিধা লাগছে না। মেঘ তানভিরকে এক পলক দেখে নিল। তানভির মাথা নিচু করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। আব্বু, বড় আব্বুর সামনে কথা বলার স্বভাব আবির, তানভির কারোরই নেই। মেঘ কপট রাগী স্বরে বলল, "ভাইয়া অফিসে যাবে না। পড়াশোনা করে চাকরি নিবে।" মোজাম্মেল খান মেকি স্বরে বললেন, "তোমার ভাই করবে চাকরি! " মেঘের মন খারাপ হয়ে গেছে। তানভিরের দিকে তাকিয়ে আছে। নিজের উপর কনফিডেন্স নিয়ে বন্যাকে প্রপোজ করেছে মেঘ । বন্যার ইচ্ছা অনিচ্ছা সবটায় মেঘ জানে। বন্যার আব্বু স্ট্রং মেন্টালিটির মানুষ। ওনি যদি একবার মন স্থির করেন চাকরিজীবী ছাড়া মেয়ে বিয়ে দিব না তাহলে আর কোনোদিন ওনাকে রাজি করানো সম্ভব না। তাই আগে থেকেই ভাইকে প্রস্তুত করতে হবে। মেঘ তানভিরের দিকে

তাকিয়ে কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে বলল, " ভাইয়া চাকরিই করবে। ভাইয়াকে কেউ কিছু বলবা না। ভাইয়া ব্যবসা করবে না, চাকরিই করবে।" তানভির বিস্ময় চোখে মেঘের দিকে চেয়ে আছে। মেঘ ফোপাঁতে ফোপাঁতে রুমে চলে গেছে। মনের বিরুদ্ধে কিছু ঘটলেই অভিমানী মেঘের বুক খুঁড়ে কান্না আসে। মোজাম্মেল খান তানভির এর দিকে তাকিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, "তোমাকে নিয়ে ওরা তোমার থেকেও বেশি কনফিডেন্ট। অথচ তুমি কি দাম দিচ্ছো? আবির নিজের কারণে আজ পর্যন্ত যতবার কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে তার থেকে কয়েক হাজার গুণ বেশি তোমার জন্য দাঁড়িয়েছে। আমার এই টুকু মেয়েটা পর্যন্ত তোমার জন্য কান্না করছে। তুমি কি এগুলো বুঝো? তোমার কি উচিত না ওদের মুখে একটু হাসি ফুটানো? " আলী আহমদ খান কোমল কণ্ঠে বললেন, "বাদ দে। বাসায় ফিরে ছেলেটাকে না বকলে কি তোর শান্তি লাগে না?" মোজাম্মেল খান চিন্তিত স্বরে বললেন, " তোমার তো চিন্তা নাই। একমাত্র ছেলে তাও আবার প্রতিষ্ঠিত। " "আবির কি তোর ছেলে না?" "আবির আমার ছেলের মতো কিন্তু তানভির আমার ছেলে। ওর ভবিষ্যৎ নিয়ে আমাকেই ভাবতে হবে।" আলী আহমদ খান হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, "ছেলেমেয়েদের মাঝে বিবাদ সৃষ্টি করিস না। আবির, তানভির, মেঘ, মীম,আদি প্রত্যেকে আমাদের সন্তান। কেউ কারোর থেকে বেশি আদরের না, সবাই সমান।" বাকবিতন্ডা চললো বেশকিছুক্ষণ।আলী আহমদ খান তানভিরকে রুমে চলে যেতে বলেছেন।। এদিকে মেঘ কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পরেছে। তানভির

ডাকতে এসে ঘুমাচ্ছে দেখে চলে গেছে, আবিরকেও জানিয়ে দিয়েছে। রাত ১.৩০ নাগাদ মেঘের ফোন ভাইব্রেশন হচ্ছে। দুবার বাজতেই মেঘ ঘুমের মধ্যে কল রিসিভ করল। অপর পাশ থেকে আবিরের আতঙ্কিত কণ্ঠস্বর আসলো, "মেঘ" "এই মেঘ, তুই ঠিক আছিস?" আবিরের গলা কাঁপছে, কণ্ঠস্বর ভেজা। মেঘ থতমত খেয়ে বলল, "হ্যাঁ। আপনার কি হয়েছে?" আবির কথা বলতে পারছে না। চাপা কান্নার শব্দ আসছে। মেঘ শুয়া থেকে উঠে বসে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে ডাকল, "আবির ভাই। " একটু থেমে আবারও শুধালো, "কি হয়েছে আপনার? কাঁদছেন কেনো?" আবির কিছু না বলে কল কেটে দিয়েছে। মেঘ দ্রুত ওয়াশরুম থেকে মুখ ধৌয়ে এসে নেট অন করে তাড়াতাড়ি আবিরকে ভিডিও কল দিল। খানিক বাদে আবির কল রিসিভ করল। বৈদ্যুতিক বাতির আলোতে আবিরের রক্তাভ চোখে চোখ পড়তেই মেঘের শরীর কম্পিত হলো। ফ্যাকাশে চোহারা, গালে পানির দাগ, চোখের নিচ ভিজে আছে এখনও। লাইটের আলোতে চিক চিক করছে। মেঘ আর্তনাদ করে উঠল, "কি হয়েছে আপনার?" "জানি না।" "ঘুমাইছিলেন?" "হুমম।" "বাজে স্বপ্ন দেখেছেন?" "হুমমমম।" "ভয় পাইছেন?" আবির ভ্রু কুঁচকে মেঘের দিকে তাকিয়ে শীতল কণ্ঠে উত্তর দিল, "আর একটু হলে আত্মা টা বেড়িয়ে যেত।" মেঘ নির্বোধের মতো আবিরের দিকে তাকিয়ে আছে। হঠাৎ ঠোঁট বেঁকিয়ে মুচকি হেসে বলল, " আপনি না খুব সাহসী। এত ভয় পেলে হবে?" আবির চোখ মুখে রাশভারি কণ্ঠে জবাব দিল, " পৃথিবীর সবার কাছে আমি সাহসী হলেও আমার মন

জানে একজনের জন্য আমার হৃদপিণ্ড ঠিক কতটা দূর্বল। তার কিছু হলে আমি সত্যি ম*রে যাব।”আবিরের নিগূঢ় আঁখি যুগলে অসহায়ত্বের ছাপ। মেঘ অভিনিবিষ্টের ন্যায় আবিরের জলসিক্ত নয়নের পানে তাকিয়ে আছে। হৃদপিণ্ডের তীব্র কম্পনে মেঘের গায়ের রক্ত প্রবল বেগে টগবগ করছে। আবিরের নিঃশ্বাস ভারী হয়ে গেছে, অনবরত তিরতির করে ঠোঁট কাঁপছে। মাথা থেকে ঘামের রেখা কপালের পাশ বেয়ে গড়িয়ে পরছে। আবিরের শীতল দুচোখ মেঘের অভিমুখে। মেঘ আনমনে কতকিছু ভেবে হঠাৎ পল্লব ঝাপ্টে প্রশ্ন করল, “কি স্বপ্ন দেখেছেন?” সংকটাপন্ন পরিস্থিতিতে মেঘের প্রশ্ন শুনে নড়ে উঠল আবির তবে তখনও গভীর দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। থমথমে গলায় উত্তর দিল, ” দুঃস্বপ্নের কথা বলতে নেই। আর আমি ম*রে গেলেও এই স্বপ্ন সত্যি হতে দিব না। ” মেঘ ঠোঁট উল্টে চোখ গোল গোল করে অসহায় মুখ করে চেয়ে আছে। আবির পরক্ষণেই বলে উঠল, “আচ্ছা শুন” “জ্বি। ” “তোর শরীর কেমন এখন?” “আলহামদুলিল্লাহ ভালো।” “এখনও শ্বাসকষ্ট হয়? বা অন্য কোনো সমস্যা? ” “শ্বাসকষ্ট হয় না তবে অন্য সমস্যা আছে।” আবির উদ্বিগ্ন কণ্ঠে শুধালো, “কি সমস্যা? বলিস নি কেনো আগে?” একটু থেমে আবারও বলে উঠল, “আমি তানভিরকে বলে রাখবো কাল সকালে মামনিকে নিয়ে ডাক্তারের....” এরমধ্যে মেঘ আবেগময় কণ্ঠে বলল, “কাউকে অতিরিক্ত মিস করার সমস্যা। কোন ডাক্তার দেখাবো বলুন..” আবিরের কথা বন্ধ হয়ে গেছে। মেঘের এমন কথায় আবিরের চোখে মুখে খানিক উজ্জ্বলতা

ফুটে উঠেছে। নিদারুণ অনুভূতিরা বক্ষস্পন্দন বাড়াতে ব্যস্ত। আবির নিশ্চুপ হয়ে চেয়ে আছে অপরূপ সেই মুখমণ্ডলে। মেঘ আহ্লাদী কণ্ঠে আবারও শুধালো, "বলুন না, কোন ডাক্তার দেখাবো?" আবির ভ্রু কুঁচকে গুরুভার কণ্ঠে বলল, " সব বিষয় নিয়ে মজা করিস না, মেঘ। শারীরিক কোনো সমস্যা মনে হলে ডাক্তার দেখাস প্লিজ। " অভিমানের দমকা হাওয়া বয়ে গেল মেঘের মনে। মেঘ ঠোঁট উল্টিয়ে কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে জানতে চাইল, "মানসিক সমস্যা হলে কি করব?" "তোর মানসিক সমস্যা শুনার জন্য তো আমিই আছি। এই ডাক্তার চলবে না? " মেঘ ফিক করে হেসে বলল, " আপনি ডাক্তার? সার্টিফিকেট টা দেখাবেন প্লিজ।" আবির চোখ সরু করে বলে উঠল, " সার্টিফিকেট টা না হয় দেশে ফিরেই দেখালাম।" টুকটাক কথা চলল কিছুক্ষণ। আবিরের মন ভালো করতে অল্পস্বল্প দুষ্টামিও করেছে মেঘ। কিন্তু আবিরের মন ভালো হওয়ার বিন্দুমাত্র লক্ষণ পরিলক্ষিত হচ্ছে না। এদিকে রাত গভীর হচ্ছে, ঘুমে মেঘের চোখ বন্ধ হয়ে আসছে। মেঘ নিজের প্রতি খুব ক্ষুদ্ধ হচ্ছে। আবির আজ খুব মনোযোগী। মেঘ যা জিজ্ঞেস করছে সবেতেই তার আদরমাখা উত্তর রেডি। এই অপরুপ মুহুর্ত রেখে ঘুমানোর বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই মেঘের কিন্তু চোখ যেন মেঘের ইচ্ছেকে পাত্তায় দিচ্ছে না। আবিরের কথার মাঝে ঘুমের আবেশে বার বার চোখ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। বিষয়টা খেয়াল করে আবির অত্যন্ত নমনীয় স্বরে জিজ্ঞেস করল, "ঘুম পাচ্ছে?" মেঘ চোখ বড় করে তাকিয়ে জবাব দিল, " কই না তো।" আবির মলিন হেসে বলল,

“জোর করে কথা বলতে হবে না। আমি পালিয়ে যাচ্ছি না, ঘুমান।” ” ঘুম চলে গেছে। ” “কে চলে গেছে কে যায় নি সেটা পরে দেখছি। আপাতত কল না কেটে ফোনটা পাশে রেখে চোখ বন্ধ করুন। ” মেঘ আঁতকে উঠে চাইল আবিরের অভিমুখে। হৃদপিণ্ড ছুটছে দ্বিকবিদিক, হৃদপিণ্ডের পিটপিট শব্দ বেড়েই চলেছে। “কল না কেটে” কথাটা যেন মস্তিষ্কে ঘুরপাক খাচ্ছে। মেঘ থমথমে কণ্ঠে বলল, “কল না কাটলে ঘুম আসবে না।” আবির গুরুভার কণ্ঠে জানাল, “সেটা আমি বুঝবো। এখন যা বলছি করুন।” আবিরের ক্ষিপ্ত নয়ন জোড়া দেখে মেঘ ঢোক গিলে বালিশের পাশে ফোন হেলান দিয়ে রেখে গায়ে পাতলা কাঁথা জরিয়ে শুয়ে পরেছে। মেঘ মুখ ফুলিয়ে শ্বাস ছেড়ে শীতল কণ্ঠে বলল, ” কল কাটবেন কখন? আমার লজ্জা লাগছে।” আবিরের নিরুদ্যম কণ্ঠের জবাব, ” লজ্জা লাগছে যেহেতু চোখ বন্ধ করে রাখ। বেশরমের মতো তাকিয়ে থাকতে কে বলছে? ” মেঘ চোখমুখ কুঁচকে কণ্ঠ ভারী করে বলল, “আপনি এটা বলতে পারলেন!” আবির গম্ভীর গলায় বলল, “চোখ বন্ধ। আর একবার চোখ খুললে খবর আছে। ” মেঘ চোখ বন্ধ করে কাটকাট গলায় জানাল, “আপনি কিন্তু নিজ দায়িত্বে কল কেটে দিবেন।” আবিরের আর কোনো জবাব এলো না। বৈদ্যুতিক বাতির আলোতে আলোকিত রুমে ফ্যানের বাতাসে মেঘের চুলগুলো অনবরত উড়ছে, আবির অবাক লোচনে সেই দৃশ্য দেখতে ব্যস্ত । মেঘের মুখের প্রতিটা পশম সূক্ষ্ম নেত্রে পরখ করছে আবির। মেঘের ফর্সা কপোলের নিকষ কালো তিলটা খুব বেশি আকৃষ্ট করছে।

আবিরের হৃদয় কেঁপে উঠেছে, শরীরজুড়ে অজানা শিহরণ। কিছু সময়ের মধ্যে মেঘের নিশ্বাসের শব্দ জোড়ালো হলো। রাত ২ টা বেজে ১৭ মিনিট, মেঘ গভীর ঘুমে নিমগ্ন আবির ফোনের অপর পাশ থেকে গভীর মনোযোগ দিয়ে তার প্রেয়সীকে দেখতে ব্যস্ত। ভোরের মৃদু আলো আর বৈদ্যুতিক বাতির আলোতে মেঘের রুম ঝলমল করছে। চোখে আলো লাগছে, মেঘ ঘুমের মধ্যেই ভ্রু কুঁচকে নড়ে উঠল। কপালে হাত রেখে চোখ ঢাকার চেষ্টা করল কিন্তু পারল না। দীপ্ত আলোর চিত্তদাহে বিরক্ত হয়ে কপালে কয়েকস্তর ভাঁজ ফেলে অল্পবিস্তর চোখ মেলল মেঘ। ঘুম ঘুম চোখের কোণে ফোনে নড়ে ওঠা কারো অবয়ব ভেসে উঠল। মেঘ তৎক্ষনাৎ ঘাড় কাত করে স্পষ্ট চোখে তাকালো সেদিক।সঙ্গে সঙ্গে মেঘের সমস্ত শরীর শিউরে উঠলো। বালিশে হাত রেখে তারউপর মাথা রেখে আবির নিগূঢ় দৃষ্টিতে মেঘের দিকে চেয়ে আছে, ঠোঁটে লেগে আছে মায়াবী হাসি। আবিরের উষ্কখুষ্ক চুল, গাল ভর্তি ছাপ দাঁড়ি আর নেশাক্ত দৃষ্টি দেখে শোভিত পুরুষের সুষুপ্ত আদলের মোহে ডুবে গেছে। আবির ভাঙ্গা ভাঙ্গা কণ্ঠে বলল, “Good Morning,Sparrow.” আবিরের ভাঙ্গা ভাঙ্গা কণ্ঠস্বর কানে বাজতেই দুর্ভেদ্য আবেশে চোখ বন্ধ করে ফেলল মেঘ। এই দৃষ্টি, কণ্ঠস্বরে মেঘের অন্তরাত্মা পর্যন্ত কেঁপে উঠেছে। চোখ খুলে রাখার বিন্দু পরিমাণ শক্তি অবশিষ্ট নেই। আবির তখনও নিষ্পলক চোখে তাকিয়েই আছে। আবির একগাল হেসে শান্ত কণ্ঠে শুধালো, “ঘুম ভালো হয় নি? আমি এসে পর্দা টেনে দিয়ে যাবো?” মেঘ এবার সর্বশক্তি দিয়ে সাফ

তাকিয়ে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে শুধালো, “আপনি কি সারারাত ঘুমান নি?” “না।” “কেনো?” “ঘুম আসছিল না।” মেঘ কণ্ঠ খাদে নামিয়ে কাঁপা কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করল, “কল কাটতে বলছিলাম কাটেন নি কেনো?” ” কল কাটতে ইচ্ছে করে নি তাই কাটি নি।” মেঘ ভ্রু কুঁচকে প্রশ্ন করল, ” অফিস নেই?” “আছে।” মেঘ সময় দেখে পুনরায় শক্ত কণ্ঠে বলল, “সময় হয়ে যাচ্ছে। উঠছেন না কেনো এখনও?” “যেতে ইচ্ছে করছে না।” আবিরের নিরুদ্বেগ কণ্ঠের একেকটা উত্তর শুনে মেঘ আশ্চর্য বনে যাচ্ছে। যে মানুষটাকে এতদিন গুরু-গম্ভীর,অনুভূতিহীন আর নিষ্ঠুর ভেবে এসেছে সেই আবির ভাইয়ের আকস্মিক পরিবর্তন মেঘের মনে বিশাল প্রভাব ফেলছে। মেঘ রাশভারী কণ্ঠে শুধালো, “সমস্যা কি আপনার? ” আবির মুচকি হেসে উত্তর দিল, ” বহুত সমস্যা। এদের কোনো সমাধানও নেই।” নিজের অজান্তেই মেঘের ঠোঁট জুড়ে ললিত হাসি ফুটলো। লজ্জায় লাল হওয়া দু গাল চিকচিক করছে। মেঘ শক্ত কণ্ঠে বলল, ” থাক ভাই বুঝছি আপনার সমস্যা। প্লিজ, এখন উঠে অফিসে যান।” “আমি তোর ভাই?” ” ভাই না তো কি?” মেঘের মুখে এমন প্রশ্ন শুনে আবির ভেতরে ভেতরে জ্বলে উঠলো। গম্ভীর মুখ করে সূক্ষ্ম নেত্রে তাকিয়ে অগ্নিকণ্ঠে বলল, “আমি তোর বাবার দাদুর নাতির ছেলে হতে পারি কিন্তু তোর ভাই না, বাই।” আবির কল কেটে দিয়েছে। মেঘ আহাম্মকের মতো বসে আছে। আবির যে ভাই ডাকার ক্ষোভে রাগ করে ফোন কেটেছে এটা বুঝতে সময় লাগলো না মেঘের। কিন্তু এটাও বুঝতে পারছে না, আবির ভাই

আর শুধু ভাই এর মধ্যে পার্থক্য টা কি! বেশকিছুক্ষণ বসে থেকে চটজলদি উঠে রুম গুছিয়ে ফ্রেশ হতে চলে গেল। ওজু করে ফজরের নামাজ পড়ে ছাদে গিয়ে কিছুক্ষণ হাটাহাটি করে রুমে আসলো। এরমধ্যে আবিরের আর কোনো কল আসলো না। মেঘের মনে বেশকিছু প্রশ্ন উদ্গত হচ্ছে। রুমে কিছুক্ষণ পায়চারি করে এক বুক সাহস নিয়ে অডিও কল দিল । কল বাজতে বাজতে কেটে গেছে। মেঘ এবার চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে ভিডিও কল দিল। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে রিসিভ হলো। দেখেই বুঝা যাচ্ছে সদ্য শাওয়ার নিয়ে বেড়িয়ে কোনোরকমে কল টা রিসিভ করেছে আবির । এখনও ঘন ঘন শ্বাস ফেলছে। আবিরের জলসিক্ত উন্মুক্ত শরীর, কোমড়ে বাঁধা সাদা টাওয়েল। আবিরের ভেজা চুল, লোমশ বুকে আর নির্মেদ পেট দেখে মেঘ যত্রতত্র দৃষ্টি সরিয়ে নিল। ঢোক গিলে উষ্ণ শ্বাস ছেড়ে বলল, “সরি সরি। অসময়ে কল দিয়ে ফেলছি। ” আবির মেকি স্বরে বলল, ” সরি বললেই কি আমার মানইজ্জত ফিরে পাবো? ” মেঘ চোখ নামিয়ে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলল, ” আমি বুঝতে পারি নি, সরি। ” আবির মুচকি হেসে অন্য একটা টাওয়েল দিয়ে মাথা মুছতে মুছতে বলল, ” দূর পাগলি, এসব কোনো ব্যাপার না। তাছাড়া আমি আপনার কলের অপেক্ষায় ছিলাম।” “কেনো?” “আজ প্রজেক্টের ফাইনাল মিটিং কি পড়ে যাব বুঝতে পারছিলাম না। আবার করেছি রাগ তাই নিজে থেকে কলও দিতে পারছিলাম না।” মেঘ লাজুক হেসে বলল, ” আপনি এমন ঢং করা কোথা থেকে শিখছেন?” “আপনার থেকেই শিখেছি।” মেঘ

ভেঙচি কাটলো। আবির মুচকি হেসে ২-৩ টা শার্ট ফোনের সামনে ধরে চিন্তিত স্বরে জিজ্ঞেস করল, "কোনটা পড়ব?" মেঘ কয়েক সেকেন্ডেই একটা শার্ট সিলেক্ট করে দিল, আবির ১০-১৫ মিনিটের মধ্যে একদম ইন করে শার্ট পড়ে, ব্লেজার-টাই সঙ্গে সু জুতা পড়ে সম্পূর্ণ রেডি হয়ে গেছে। ফোন থেকে খানিকটা দূরে সরে উঁচু গলায় জিজ্ঞেস করল, "কেমন লাগছে?" মেঘ আপাদমস্তক দেখে মোলায়েম কণ্ঠে বলল, "মাশাআল্লাহ কিন্তু... " "কিন্তু কি?" "How do I bite the pinky finger now?" (আমি এখন কনিষ্ঠা আঙুলে কিভাবে কামড় দিব?) "In a dream" (স্বপ্নে) আবির টেবিল থেকে সানগ্লাস টা নিয়ে চোখে দিয়ে শেষবারের মতো ফাইল গুলো দেখে নিচ্ছে। এদিকে সানগ্লাস চোখে দেখায় মেঘ গুনগুন করে গান গাইতে শুরু করল, "কালো সানগ্লাসটাই কেন এতো সুখ, হে যুবক।" আবির ফোন কাছে নিয়ে বলল, "দৃষ্টিতে যেন সে রাসপুতিন, খু*ন হয়ে যাই আমি প্রতিদিন। এটা বলবেন না?" মেঘ নিজের মাথায় গাট্টা মেরে, মুখ চেপে ধরেছে। আবির জিভ দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে মলিন হেসে বলল, " শুনলাম আপনি ইদানীং খুব বেশি গান গাইতেছেন। কই আমাকে তো শুনালেন না!" মেঘ বিড়বিড় করে বলল, " আপনার অফিস কখন? যান না কেনো?" "যাবই তো। আগে কথা শেষ করি। " "আপনার সাথে আর কোনো কথা নেই। গুরুত্বপূর্ণ মিটিং থাকা সত্ত্বেও সারারাত নির্ঘুম কাটিয়েছেন। এখন আবার ঢং করতেছেন। এদিকে আব্বু শুধু আমার ভাইয়ের দোষ ই দেখে আপনার দোষ দেখে না। আপনি যে

সারারাত ঘুমান নি এটা কি ঠিক করেছেন? এর প্রভাব মিটিং এ পড়বে না?" "জ্বি না ম্যাম। বরং আজকের মিটিং বেস্ট হবে। আপনি শুধু দোয়া করবেন। মিটিং শেষ করেই কল দিব। ঠিক আছে? " "ফি আমানিল্লাহ। বেস্ট অফ লাক।" "থ্যাংক ইউ।" বিকেলের দিকে আবিরের সাথে কথা হয়েছে। আজকের মিটিং ঠিকঠাক মতো শেষ হয়েছে। এক সপ্তাহের মধ্যে প্রজেক্ট কমপ্লিট হয়ে যাবে। মোজাম্মেল খান আর আলী আহমদ খান আবিরকে বাসায় ফিরতে বলছেন। কিন্তু আবির বলেছে আরও ২ মাসের মতো সময় লাগবে। কারণ জিজ্ঞেস করায় বিস্তারিত কিছুই বলে নি। এদিকে মেঘও বেশ উদ্বিগ্ন। বন্যার সাথে আগে থেকে প্ল্যান করা ছিল আজ বিকেলে মেলায় যাবে। বন্যা রেডি হয়ে বিকেলের দিকে বেরিয়েছে ঠিকই কিন্তু মেঘ আবিরের উপর অভিমান করে ফোন বন্ধ করে ঘুমিয়ে পরেছে। বন্যা বেশ কয়েকবার কল দিয়েছে, বন্ধ পেয়ে একা একায় হাঁটছে। অন্যসময় হলে মেঘকে বাসা থেকে নিয়ে আসতো কিন্তু ইদানীং মেঘদের বাসায় যাওয়ার কথা মাথায় আসলেই লজ্জায় আড়ষ্ট হয়ে যায়। ঘন্টাখানেক পর তানভিরের কল আসছে। অসময়ে তানভিরের কল দেখে বন্যা খানিকটা অবাক হয়ে আশেপাশে তাকালো। কোথাও পরিচিত কাউকে নজর পড়ছে না। ভয়ে ভয়ে কল রিসিভ করল। তানভির স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, " একা একা ঘুরছো কেনো?" " আপনার বোন আমাকে বাসা থেকে বের করে এখন ফোন বন্ধ করে ফেলেছে।" "তুমি আমাকে কল দিতে পারতা না?" "এত ইমার্জেন্সি ছিল না তাই দেয় নি।" "কোথায় আছো? বলো

আমি আসতেছি।” “আপনার আসতে হবে না।” “বলো।” বন্যা জায়গার নাম বলতেই তানভির বলল, “আমি কাছেই আছি। ১০ মিনিট অপেক্ষা করো। ” ৮ থেকে ১০ মিনিটের মধ্যে তানভির বাইক সমেত হাজির হলো। বন্যা তানভিরকে দেখে আস্তে করে বলল, “আপনার আসার কোনো দরকার ছিল না। আমি এখনি চলে যেতাম।” ” রেগে আছো? ” বন্যা শ্বাস ছেড়ে শান্ত কণ্ঠে বলল, “নাহ।” ” বনু ঘুমাচ্ছে। তুমি বাসায় গেলে না কেনো? আর নয়তো আমাকে আগে কল দিতে। আমি বনুকে নিয়ে আসতাম।” “আমি বাহিরে আছি এটা আপনাকে কে বলছে?” “বনু কল দিয়েছিল। বলছে ওর বের হওয়ার মুড নেই। তোমাকে যেন মেলায় নিয়ে যায়।” বন্যা কপাল গুটিয়ে ধীর কণ্ঠে বলল, “আমি মেলায় যাব না।” মনে মনে মেঘকে কিছুক্ষণ বকে নিল। তানভির সবসময়ের মতো গম্ভীর কণ্ঠে বলল, “বনুর কথা অমান্য করলে বাসায় তুলকালাম কান্ড করে ফেলবে। এমনিতেই বাসায় আমাকে কেউ সহ্য করতে পারে না এ অবস্থায় বনুকে রাগালে আমায় নিশ্চিত বাসা থেকে বের করে দিবে। ” বন্যা কিছু বলল না। চুপচাপ দাঁড়িয়ে পশ্চিমা আকাশের পানে তাকিয়ে আছে। সূর্য আপন গতিতে নিজ গন্তব্যে ছুটছে। আজকের আকাশ অন্যান্য দিনের থেকেও অনেক বেশি সুন্দর। তানভির বন্যার দিকে তাকিয়ে মৃদুস্বরে বলল, “যাবে না?” বন্যা রক্তিম আকাশের পানে তাকিয়ে থেকে উত্তর দিল, “আজকের আকাশটা খুব বেশি সুন্দর। কোথাও যেতে ইচ্ছে করছে না। ” বন্যার দৃষ্টি লক্ষ্য করে তানভিরও আকাশের পানে তাকালো।

গাঢ় নীল রঙের আকাশে মেঘেদের আনাগোনা, পাখিরা আপন গতিতে উড়ে যাচ্ছে। দেখে মনে হচ্ছে তাদের বাড়ি ফেয়ার বড্ড তাড়া। গোধূলি লগ্নের সূর্যটা বরাবরের মতোই রক্তিম। তানভির কয়েক মুহুর্ত আকাশ দেখে আচমকা ঘুরে দাঁড়িয়েছে। বন্যার কাছাকাছি স্টিলের বেষ্টনীতে মৃদুভাবে হেলান দিয়ে বন্যার অভিমুখে তাকালো। সূর্যের বিক্ষিপ্ত আলোকরশ্মিতে বন্যার মুখ লাল হয়ে আছে। তানভির বন্যার দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বেশ সময় নিয়ে অত্যন্ত নমনীয় কণ্ঠে বলল, "নীল অম্বরের ভাঁজে ভাঁজে, তোমার নামে সন্ধ্যা সাজে।" বন্যা অকস্মাৎ আড়চোখে তাকাতেই তানভির নড়ে উঠল। কাজল পরিহিতা টানাটানা চোখদুটা যেন দৃষ্টিতেই তানভিরের মতো শক্তপোক্ত ছেলের সত্তাকে বিলীন করে ফেলবে। বন্যা কোন কথা না বলে পরপর দুবার ভ্রু নাচালো। তানভির মুচকি হেসে এপাশ ওপাশ মাথা নেড়ে অন্যদিকে মুখ করে তাকালো। বন্যা তানভিরের দিকে লাজুক হাসলো। ফোন ভাইব্রেট হতেই বন্যা ফোনের দিকে তাকালো। মেঘের মেসেজ আসছে, "আমার ভাইকে দিয়ে দিলাম, দেখে রেখো।" বন্যা ছোট করে মেসেজ পাঠালো, " ওকে ননদিনী।" অকস্মাৎ পেছন থেকে একটা মেয়েলী কণ্ঠস্বর কানে বাজলো। মায়াবী কণ্ঠের ডাক, "তানভির। " তানভিরের সঙ্গে সঙ্গে বন্যাও ঘুরে দাঁড়ালো। বোরকা পড়া এক মেয়ে। চোখ, হাত-পা ছাড়া কিছুই দেখা যাচ্ছে না। বন্যা ভ্রুক্ষেপহীন, নির্বিকার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েটা একটু এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, "কেমন আছো?" তানভির কপালে কয়েকস্তর ভাঁজ ফেলে বন্যাকে এক

পলক দেখে ভারী কণ্ঠে প্রশ্ন করল, “কে আপনি?” “আমাকে চিনতে পারছো না?” “আপনাকে চেনার কথা ছিল নাকি?” মেয়েটা এবার চোখ নামিয়ে শীতল কণ্ঠে বলল, “আমি আয়েশা। চিনতে পেরেছো?” অকস্মাৎ তানভিরের চোয়াল শক্ত হয়ে গেছে। কপালে আরও কয়েকটা ভাঁজ পড়লো, দুচোখ আগ্নেয়গিরির লাভার ন্যায় টগবগ করছে, অক্ষিপটে ব্যথা অনুভব হচ্ছে। বন্যা তখনও স্বাভাবিক দৃষ্টিতে তানভির আর সেই মেয়েকে দেখছে। বন্যা বুঝতেই পারছে না কে এই মেয়ে! সে ভেবেছে পরিচিত, বান্ধবী বা অন্য কেউ হতে পারে। আয়েশা কণ্ঠ খাদে নামিয়ে নমনীয় কণ্ঠে বলল, ” তোমাকে অনেকদিন পর দেখলাম।” তানভির মুখ ফুলিয়ে ঘন ঘন শ্বাস ছাড়ছে। চোখ মুখে তীব্র আক্রোশ। আয়েশা আবারও বলল, “তোমার সাথে আমার কিছু কথা ছিল।” বন্যার দিকে তাকিয়ে বলল, “পার্সোনাল।” বন্যার এতক্ষণ কোনোকিছু অনুভব না হলেও এবার কিছুটা রেগে গেছে। মনের ভেতর প্রশ্ন জাগছে, “কে এই মেয়ে?” তানভির অন্যদিকে তাকিয়ে রাগান্বিত কণ্ঠে বলল, “কথা বলার মতো সময় আর ইচ্ছে কোনোটায় আমার নেই।” তানভির পাশ কাটিয়ে যেতে যেতে হুঙ্কার দিল, “বন্যা, আসো। যেতে হবে।” বন্যা ঐ মেয়েকে দেখে দেখে এগুচ্ছে। তানভির বাইক পর্যন্ত যেতে যেতে ঐ মেয়ে উচ্চস্বরে বলে উঠল, “তানভির, আমি তোমাকে এখনও ভালোবাসি।” তানভির শুনেও যেন কথাটা শুনলো না। রাগে হাত-পা কাঁপছে। মেয়ে বলে পারছে না শুধু গায়ে হাত তুলতে। মেয়ের কথা শুনে বন্যা থমকে দাঁড়ালো। বুকের ভেতরটা

অকস্মাৎ মোচড় দিয়ে উঠেছে। বুঝতে বাকি রইলো না যে এই মেয়েই তানভিরের এক্স গার্লফ্রেন্ড। তানভির বাইক স্টার্ট দিয়ে অগ্নি কণ্ঠে চিৎকার করল, "বন্যা, আসতে বলছি তোমায়।" বন্যা থতমত খেয়ে ছুটে গেল। চুপচাপ বসে পড়ল বাইকের পেছনের সিটে। তবে বরাবরের মতো এবারও তানভিরের সঙ্গে দূরত্ব রেখে বসেছে। কিছুক্ষণ আগেও আকাশের পানে তাকিয়ে ভাবছিল, আজ থেকে বাইকে বসলে তানভিরকে ধরে বসবে কিন্তু তা আর হলো কই! দুজনের বুকের ভেতর যে ঘূর্ণিঝড় বয়ে যাচ্ছে সে খবর কেউ জানে না। মেলার কাছাকাছি এসে বাইক থামালো। বন্যার মেলায় যাওয়ার মতো বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই আর না আছে তানভিরের। তবুও মেঘের কথা মেনে ঢুকলো মেলায়। বন্যা চুপচাপ ঘুরে দেখছে। মেঘের সঙ্গে অনেককিছু কেনার প্ল্যান করেছিল ঠিকই তবে এখন আর ইচ্ছে নেই। কিছুক্ষণ ঘুরে বন্যা চাপা স্বরে বলল, " আমার বাসায় যেতে হবে।" তানভির ঘড়িতে সময় দেখে নিল। বন্যা দ্রুত হেঁটে গেইটের দিকে যাচ্ছে। বন্যা দু-তিনটা দোকান পেরিয়ে হঠাৎ খেয়াল করল আশেপাশে তানভির নেই। থমকে দাঁড়িয়ে পেছন তাকিয়ে দেখল তানভির দোকানে কি কিনতেছে। বন্যাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে দ্রুত এগিয়ে এসে বলল, "তোমাকে ডাকছিলাম, তুমি শুনো নি। সরি।" বন্যা আবারও হাঁটা শুরু করল। তানভির ঠান্ডা কণ্ঠে বলল, "এগুলো তোমার। " "আমার কিছু লাগবে না, ধন্যবাদ।" বন্যা বেড়িয়ে পরেছে। অন্যান্য দিনের মতো তানভির আজ জোর গলায় কিছু বলতেও পারছে না।

দ্রুত এগিয়ে গেল বন্যার কাছে। বন্যার চোখ মুখ স্বাভাবিক, যেন কিছুই হয় নি। শান্ত কণ্ঠে বলল, " আমি এখান থেকে রিক্সা নিয়ে যেতে পারব।" "কিন্তু আমি তোমাকে একা ছাড়তে পারবো না।" বন্যা মলিন হেসে মনে মনে আওড়ালো, " আপনার অতীত বর্তমান হলে আপনার জীবনে এই বন্যার অস্তিত্ব থাকবে না।" তানভির বাইক স্টার্ট দিয়ে উঠতে বলল, বন্যাও বাধ্য হয়ে উঠে বসল। কারো মুখে কোনো কথা নেই। মোখলেস মিয়ার দোকানের সামনে আসতেই মোসলেম মিয়া বন্যাকে ডাকতে শুরু করলেন। বন্যা নামাতে বলায় তানভিরের অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাইক থাকালো। তানভিরের থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছে। তানভির শক্ত কণ্ঠে বলল, "যদি গিফট না নাও তাহলে আমি এখানেই বসে থাকব।" বন্যা কিছু না বলে দোকানের দিকে এগিয়ে গেল। মোখলেস মিয়ার পাশের দোকানে বন্যার আব্বু কাপড় ইস্ত্রি করতে দিয়েছিল। ইমার্জেন্সি কাজে ওনাকে এক জায়গায় যেতে হয়েছে তাই ইস্ত্রি করে জামাকাপড় মোখলেস মিয়ার দোকানে রেখে গেছে। মোখলেস মিয়া কাপড় আর কিছু খাবার দিয়েছেন। বন্যা না করা সত্ত্বেও ওনি জোর করেই দিয়েছেন। বন্যারা সচরাচর বাসা থেকে বের হয় না, বন্যাদের কিছু খেতে ইচ্ছে হলে বন্যার ছোট ভাই রিদ ই নিয়ে যায়। মাস শেষে বন্যার আব্বু টাকা দিয়ে দেন। তানভির বাইক থেকে ঘাড় ঘুরিয়ে রাগী চোখে সেদিকে তাকিয়ে আছে। হঠাৎ মোখলেস মিয়ার নজর পড়ে তানভিরের দিকে। তানভিরের তাকানো দেখে মোখলেস মিয়া বন্যাকে জিজ্ঞেস করলেন, " পোলায় এমনে তাকায়

আছে কেন? ভাড়া দাও নি?” বন্যা কিছু বলার আগেই মোখলেস মিয়া দোকান থেকে বের হতে হতে উচ্চস্বরে শুধালো, “এই ছেলে তোমার ভাড়া কত? আমি ভাড়া দিয়ে দিচ্ছি তবুও আমার বউ এর দিকে এভাবে তাকায় থাইকো না।” তানভিরের মেজাজ চরম মাত্রায় খারাপ হয়ে গেছে। রাগে দাঁত কটমট করছে। দু’চোখ লাল হয়ে গেছে। বন্যা দ্রুত বেড়িয়ে যেতে যেতে বলল, “দাদা, আমি কথা বলছি।” বন্যা তানভিরের কাছে গিয়ে বিড়বিড় করে বলল, “এখানে এভাবে দাঁড়িয়ে আছেন কেন? বাসায় যান, প্লিজ।” “তুমি গিফট না নিলে আমি এক পাও নড়বো না।” বন্যা আস্তে করে কপাল চাপড়ালো। মেঘের ভাই বলে কথা, সে তো মেঘের মতোই জেদি হবে। এটা বন্যা ভুলে গেছিল ভেবেই রাগ লাগছে। মোখলেস মিয়া দোকান থেকে ডাকলেন, ” সমস্যা কোনো?” “নাহ দাদা।” বন্যা তানভিরের হাত থেকে গিফটের ব্যাগটা নিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে বলল, “এবার এখান থেকে যান, প্লিজ। আব্বু দেখলে সমস্যা হবে।” তানভির কথা না বাড়িয়ে মোখলেস মিয়ার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে গলি থেকে বেড়িয়ে চলে গেছে। এদিকে মেঘ আবিরের উপর রাগ করে ফোন আর অন ই করে নি। আম্মুর ফোন থেকে তানভিরকে কল দিয়েছিল। সন্ধ্যার পর নিচে এসে নুডলসের পাকোড়া বানাতে শুরু করল। মীম আর আদি আগে থেকেই রেডি হয়ে বসে আছে। আবির বাসার সবার সঙ্গে কথা বলতে বলতে মেঘের কথাও জিজ্ঞেস করল। আকলিমা খান রান্নাঘরে এসে মেঘের দিকে ফোন ধরে একগাল হেসে বললেন, “সে এখন রেসিপি শিখতে

ব্যস্ত। ৮-১০ পদের পাকোড়া বানানো শিখে ফেলছে। ” আবির মেঘের দিকে তাকিয়ে ঠোঁট কামড়ে হেসে বলল, “পাকোড়াতে লবণ দেয় তো?” মেঘ ফোঁস করে উঠল। আকলিমা খান কপট রাগী স্বরে বললেন, ” মেয়েটাকে কেনো রাগাচ্ছো বলো তো।” আবির শান্ত কণ্ঠে বলল, “কেউ যদি বিজ্ঞ হয়েও অজ্ঞের মতো আচরণ করে তো আমি কি করবো? রাখি।” কাকিয়া লবণের বিষয়ে আঁটকে থাকলেও আবিরের কথার মিনিং মেঘ ঠিকই বুঝেছে। তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করছে যেন রুমে গিয়ে আবিরকে কল দিতে পারে। এরমধ্যে তানভির বাসায় আসছে। চোখ-মুখ কালো হয়ে আছে। মেঘকে রান্নাঘরে দেখে শান্ত কণ্ঠে বলল, “বনু, এককাপ কফি করে দিবি?” “আনছি ” মেঘ কফি আর পাকোড়া নিয়ে খুশিতে গদগদ হয়ে হাজির হলো। তানভির চোখ মুখ দেখে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, “কি হয়েছে ভাইয়া? কোনো সমস্যা? ” “না।” মেঘের ভয়ে বুক কাঁপছে। বন্যার সাথে যদি ঝগড়া করে তাহলে কি হবে? মেঘ শক্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, “ভাইয়া বলো কি হয়েছে? বন্যা কোথায়?” “ওকে বাসার কাছে দিয়ে আসছি। ” “তাহলে আর কি হয়ছে? তুমি এত রেগে আছো কেনো?” তানভির কফির কাপে চুমুক দিয়ে কাপ সামনে রেখে আস্তে করে বলল, “আজ আয়েশার সঙ্গে দেখা হয়েছিল।” আয়েশা নাম শুনেই চমকে উঠল মেঘ। প্রশস্ত আঁখি যুগল আরও বেশি প্রশস্ত করে গম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন করল, ” থা*প্পড় দিয়েছো? ” “না।” মেঘ অকস্মাৎ সোফায় ঘুষি শুরু করল। পরপর বেশ কয়েকটা ঘুষি দিতে দিতে চেঁচিয়ে উঠল,

“তোমাকে আমি বলেছি সামনে পেলে চোখ বন্ধ করে থা*প্পড় দিবে। তুমি থা*প্পড় দিলে না কেনো?” তানভির তড়িৎ বেগে উঠে মেঘের দু-হাত শক্ত করে ধরে বলল, ” একটু ঠান্ডা হয়ে কথা তো শুনবি।” “তুমি থা*প্পড় দাও নি কেনো?” “পাবলিক প্লেসে মেয়েদের গায়ে হাত তোলাটা শোভা পায় না। ” “ইসস আমি কেন গেলাম না আজ। ঐ মেয়েকে কয়েকটা থাপ্প*ড় দিয়েই আসতাম। বন্যা কোথায় ছিল? বন্যাও দেখেছে?” “বন্যা সাথেই ছিল। কিন্তু কিছু জিজ্ঞেস করে নি।” মেঘ দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বিড়বিড় করে বলল, ” শেষ! আমার সব শেষ। ” তানভির সূক্ষ্ম নেত্রে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, “বিড়বিড় করছিস কি?” “কিছু না। হাত ছাড়ো রুমে যাব।” “ঘুষাঘুষি করবি না তো?” “ঘুষাঘুষি করে নিজের হাত ভেঙে কি করব। যার নাকমুখ ভাঙা দরকার তার টায় যদি না ভাঙতে পারি। বুঝছি, তুমি কিছু পারবা না। আবির ভাই কে বলতে হবে।” তানভির হাত ছেড়ে ভীত কণ্ঠে বলল, “প্লিজ, ভাইয়াকে এখন কিছু বলিস না। এই ঘটনা ভাইয়া শুনতে পারলে আমার কপালে বহুত দূর্গতি আছে। ” “ঠিক আছে বলবো না। ” মেঘ রুমে এসে ফোন অন করতেই বন্যার কল আসলো। বন্যা একে একে সব ঘটনা খুলে বললো। মেঘ যতটা সম্ভব বুঝানোর চেষ্টা করেছে। পর পর আবিরকে কল দিল। আবির কল রিসিভ করে শক্ত কণ্ঠে ধমক দিল, “এই মেয়ে, এত নির্বোধ কেন তুই?” “আমি কি করেছি। ” “কথা না শুনে, না বুঝেই ফোন বন্ধ করে বসে আছিস।” “কি শুনবো আর কি বুঝবো? আপনি যেই কাজে গিয়েছিলেন সেই

কাজ শেষ তবুও আপনি বাসায় ফিরবেন না। এটাতে কি বুঝবো আমি?" "আমি শুধুমাত্র প্রজেক্টের কাজে এতদিনের জন্য এতদূর আসি নি। বাংলাদেশে টানা তিন প্রজেক্ট করলেই এটার সমান বেনিফিট পেতাম। সব ছেড়ে এখানে এসে পড়ে থাকতাম না। আমি আমার প্রয়োজনে আসছি আর প্রজেক্টটা শুধুমাত্র আমার বাহানা ছিল। যে প্রজেক্ট ১৫ দিনে শেষ করতে পারতাম সেটা কমপ্লিট করতে ৩ মাসের উপরে সময় নিচ্ছি যেন আব্বু, চাচ্চু কিছু বুঝতে না পারে। " "আপনি কেনো গিয়েছেন? কি প্রয়োজন আপনার?" "আমার টাকার প্রয়োজন।" মেঘ কপাল কুঁচকে বলল, "আপনার কত টাকা প্রয়োজন? আপনি আমাকে একটা ক্রেডিট কার্ড দিয়েছিলেন মনে নেই? ঐটাকে অনেক টাকা আছে। আপনি এখান থেকে টাকা নিতে পারতেন। আমার এত টাকা লাগেই না। " আবির মুচকি হেসে বলল, "ঐটা শুধুমাত্র তোর আর ওখানে প্রতিমাসে একটা নির্দিষ্ট এমাউন্ট পাঠানো হচ্ছে শুধু তোর জন্য। তোর যা ইচ্ছে হয় তা কিনিস, আরও বেশি প্রয়োজন হলে একবার জানাস শুধু।" "আমার টাকার বিশেষ কোনো প্রয়োজন নেই। আপনি এগুলো নিয়ে যান। তবুও চলে আসেন প্লিজ।" আবির শ্বাস ছেড়ে শীতল কণ্ঠে বলল, "কেনো বুঝতে পারছিস না, আমার লাখ টাকার প্রয়োজন না। আরও বেশি প্রয়োজন।" "তাহলে কত প্রয়োজন?" "কোটি।" "What? কোটি টাকা দিয়ে আপনি কি করবেন?" "দরকার আছে।" "এত টাকা কে দিবে আপনাকে?" "আমার টাকা আমি নিতে আসছি। কে দিবে আবার কি? এখানের

স্থানীয় এক ফ্রেন্ডের বাবা বড় বিজনেসম্যান। ওনার কথা মতো আমরা দুজন স্টুডেন্ট থাকাকালীন ছোট ছোট বেশ কয়েকটা কোম্পানিতে শেয়ার কিনেছিলাম। যদিও সবকিছু ওনিই ম্যানেজ করে দিয়েছিল। আমি দেশে যাওয়ার আগে সবগুলো শেয়ারের এমাউন্ট একসাথে করে আংকেলের কোম্পানিতে কিছুটা শেয়ার কিনে গিয়েছিলাম। কারণ আমার কাছে ওনারায় একমাত্র বিশস্ত মানুষ ছিলেন। এখন আমার টাকার প্রয়োজন, আংকেলকে জানানোর পর আংকেল এখানে আসতে বলেন। কোম্পানির বেশকিছু কাজ প্যান্ডিং আছে সেগুলো কমপ্লিট করতে পারলে আমি যত আশা করেছি তার থেকেও অনেক বেশি দামে শেয়ারটা বিক্রি করতে পারবো। তানভির আর রাকিব ব্যতীত এই কথা আর কেউ জানে না। আজ তোকে বলছি। আব্বু- চাচ্চু এসব জানতে পারলে কিভাবে রিয়েক্ট করবেন আমি জানি না। তাই প্রজেক্টের নাম করে এখানে আসছি।” মেঘ সবকথা শুনে রাশভারি কণ্ঠে বলল, “শেয়ারটা বিক্রি না করলে হয় না? আপনার এত কি প্রয়োজন?” ” প্রতিনিয়ত মানুষকে যোগ্যতার প্রমাণ দিয়ে বাঁচতে পারবো না। আমি সব মায়াজাল কাটিয়ে একটা স্বচ্ছ জীবন কাটাতে চাই। জীবন চালাতে ঠিক যতটা প্রয়োজন ততটা ইনকাম করতে পারলেই হবে। আমি শুধু মানসিক শান্তি চাই।” মেঘ চুপ করে বসে আছে। কিছু বলার মতো শব্দ খোঁজে পাচ্ছে না। আবির মোলায়েম কণ্ঠে শুধালো, ” রাগ করেছিস?” “না। রাগ করবো কেন! আপনি যা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তা অবশ্যই ভেবেচিন্তেই নিয়েছেন।” “বাসার কাউকে এ ব্যাপারে কিছু

বলিস না ।” “আচ্ছা ঠিক আছে। রাখি এখন।” “আচ্ছা।” আজ সকাল থেকে আলী আহমদ খান ও মোজাম্মেল খানের মধ্যে মনোমালিন্য চলছে। সারাদিন খাওয়া নেই। যে যার রুমে শুয়ে আছেন। বাসার সবাই চেষ্টা করেও রাগ ভাঙাতে পারে নি। দুপুরের পর পর ফুপ্পি, জান্নাত আপু, আইরিন আর আসিফ ভাইয়া আসছে। আজ ইচ্ছে করেই আরিফ আসে নি। প্রতিনিয়ত মীমের সাথে ঝগড়া করতে ভালো লাগে না তার। মেঘের ফুপ্পি প্রথমেই মোজাম্মেল খানের রুমে গেলেন। মোজাম্মেল খান বোনকে দেখে শুয়া থেকে উঠে বসে ভারী কণ্ঠে বললেন, “কেমন আছিস?” “কেমন থাকবো? এই বয়সে এসে তোমরা ভাইয়ে ভাইয়ে কোন দ্বন্দ্বে মেতেছো?” “আমি কি বলব, ভাইজানের যা মন চাই তাই করছেন। কিছু বললেও ওনি রেগে যান। বুঝার চেষ্টা পর্যন্ত করেন না। জানিস ই তো ওনার স্বভাব। যা বলবে তাই করবে।” “সমস্যা কি নিয়ে?” “সমস্যা তো অনেক কিছু নিয়েই। আমার ছেলেকে শাসন করলেও দোষ, না করলেও দোষ। মেয়েকে কিছু বললেও দোষ, না বললেও দোষ। আগে আবির অফিস সামলে নিতো তাই অফিসের বিষয়ে এত কথা আমায় শুনতে হতো না। এখন আবির নেই, কাজের একটু এদিকসেদিক হলেই রাগ। আমরা নাকি গুরুত্ব দেয় না, ওনি একা পরিশ্রম করে সবকিছু করেছেন। ওনি যা বলবেন তাই হবে। আরও অনেককিছু। ” “ভাইজান কি কোনোভাবে সংসার ভাঙার কথা বুঝাতে চাচ্ছেন?” “এই কথা ভুলেও ভাইজানের সামনে বলিস না। আমি সেদিন রাগে বলে ফেলছিলাম, তুমি বললে

সংসার ভাগ করে ফেলি। বলেছি না মরেছি, আমার সাথে কথা তো বলেনই না এমনকি এটাও বলেছেন, আমার ছেলে, আমার মেয়ে দুজন ই ওনার। ছেলেমেয়ের ব্যাপারে কিছু বলার অধিকার পর্যন্ত আমার নেই। ইকবাল ই ভালো। তার এসব বিষয়ে কোনো চিন্তাভাবনায় নেই। " "তানভির, আবির কি বলে?" "আবিরের সঙ্গেও ঝামেলা। " মাহমুদা খান চিন্তিত স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, "আবিরের সঙ্গে আবার কিসের ঝামেলা? " " প্রজেক্ট শেষ তবুও আবির দেশে আসছে না। তাছাড়া সেদিন আবির আমার পক্ষে দুটা কথা বলেছিল সেই রাগে আবিরের সঙ্গেও কথা বলেন না।" "এখন করণীয় কি?" "দেখ তুই মানাতে পারিস কি না?" মাহমুদা খান মোজাম্মেল খানের রুম থেকে বেরিয়ে আলী আহমদ খানের রুমে গেলেন। রুমে ঢুকতেই আলী আহমদ খান গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, " তুই ও কি তার পক্ষে কথা বলতে আসছিস?" "নাহ ভাইজান। আমি আপনার মুখে শুনতে চাই। ঘটনা কি?" "ঘটনা কিছুই না। মোজাম্মেলের অত্যাচার আর সহ্য হচ্ছে না। " "কেনো? ভাই কি করেছেন?" "তানভিরের সাথে ওর কি শত্রুতা আমি জানি না। কথায় কথায় ছেলেকে বকাবকি করে। আমি কিছু বলতে গেলে আমার ছেলের সাথে তুলনা দেয়। আমার ছেলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে ওর ছেলে বেকার। কিছুই ঠিকমতো করতে পারছে না। কোথায় আমি আমার ছেলে নিয়ে গর্ব করব উল্টো সে গর্ব করে। সে সারাক্ষণ আমার পিছনে লাগে। এই যে ছেলেমেয়ে গুলোর মধ্যে দ্বন্দ্ব লাগাচ্ছে ওরা কি সারাজীবন একসাথে থাকতে পারবে?

আমি এজন্য সেদিন রাগে বলেছিলাম, ওর মতো চিন্তাভাবনা আমার থাকলে আমি একা এই সংসার টাকে এতদূর টানতে পারতাম না। এই সংসার আমার, এখানে আমার অধিকার সবচেয়ে বেশি, আমি যা বলবো তাই হবে। আমি বুঝাতে চেয়েছি, ওর উল্টাপাল্টা আচরণ গুলো যেন পরিবর্তন করে। অথচ সে বুঝেছে আমি সংসার ভাঙতে চাচ্ছি। এজন্য আমিও বলেছি ও যদি চায় বাড়ি থেকে চলে যেতে পারে। কিন্তু তানভির, মেঘ আর ওদের মা আমার বাড়িতেই থাকবে। ওদের উপর বাবার অধিকার খাটাতে যেন না আসে।”আলী আহমদ খানের কথা শুনে মাহমুদা খান আনমনেই হেসে উঠলেন। বোনের হাসি দেখে আলী আহমদ খান রাগী স্বরে বললেন, “এভাবে হাসছিস কেনো? আমি কি হাসির কথা বলেছি?” মাহমুদা খান হাসি থামিয়ে মৃদুস্বরে বললেন, “তোমরা এখনও ছোটবেলার মতো অভিমান করো, এটা দেখেই হাসি পাচ্ছে। তোমার জায়গা থেকে তুমি নিজেকে ঠিক মনে করছো, ওদিকে ভাইয়ের জায়গা থেকে ভাই নিজেকে ঠিক মনে করছে। এসব দেখে ছোটবেলার একটা ঘটনা খুব মনে পড়ছে।” “কোন ঘটনা?” “একবার তোমার ক্রিকেট ব্যাট ভেঙ্গে ফেলায় তুমি আর ভাই বাড়িতে তুমুল ঝগড়া শুরু করেছিলে। তুমি বলছিলা মোজাম্মেল ভাই ভাঙছে আর ভাই বলছিল সে ভাঙে নি। সেই নিয়ে একপর্যায়ে তোমাদের মধ্যে হাতাহাতি শুরু হয়ে গিয়েছিল, আমি আর আম্মা কোনোভাবেই তোমাদের থামাতে পারছিলাম না। আব্বা বাড়িতে এসে তোমাদের এই মারামারি দেখে রাগে কু*ড়াল নিয়ে মা* রতে আসছিল। দুই ভাই সেই

যে পালিয়েছিলে, রাত ১০ টার উপরে বেজে গেছিলো বাড়িয়েই আসছিলে না। আমি আর আব্বা তোমাদের খোঁজতে খোঁজতে হয়রান হয়ে যাচ্ছিলাম। তারপর নদীর ধারে একটা গাছের নিচে পেয়েছিলাম তাও দুজন একসাথে। তুমি গাছে হেলান দিয়ে ঘুমাচ্ছিলে আর ভাই তোমার কোলে ঘুমাচ্ছিলো। মনে আছে ভাইজান? " আলী আহমদ খান একগাল হেসে বললেন, " হ্যাঁ, মনে আছে। সেদিন বাড়ি থেকে পালিয়ে রাস্তার মাঝখানে গিয়ে দুই ভাই আবার ঝগড়া লাগছিলাম। বেশ কয়েকজন মিলে আমাদের থামিয়ে কি হয়েছে জিজ্ঞেস করেছিল, তখন আমরা সব ঘটনা খুলে বলছি। তারপর এক ছোটভাই বলছিল, ইকবাল আমার ব্যাট নিয়ে খেলত গেছিল আর ঐখানে গাছের সাথে বারি খেয়ে ব্যাট ভেঙে গেছে। আমরা দুই ভাই তখন অসহায়ের মতো তাকিয়ে ছিলাম। সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত আমি ওর গায়ে হাত দেয় নি। আমি মোজাম্মেল কে অনেক ভালোবাসি, সে আমার ভাইয়ের থেকে বন্ধু বেশি। যখন গ্রাম ছেড়ে, সবকিছু ছেড়ে শহরে আসছিলাম তখন মোজাম্মেল ছাড়া আমার আর কেউ ছিল না। সে বন্ধুর মতো সবসময় আমার পাশে থেকে সাহস দিয়েছে। ওর সাথে আমার সম্পর্ক আজীবন এমনই থাকবে, ইনশাআল্লাহ। কিন্তু ওর কিছু কিছু কাজ আমার সত্যিই খারাপ লাগে। আমি মানছি তানভির একটু বেখেয়ালি, ওর নিজের লক্ষ্য স্থির করে তারপর কিছু করা উচিত। তাই বলে এটা না সারাক্ষণ উঠতে বসতে ছেলেকে বকবে। তারথেকেও বড় কথা তানভির কে বুঝানোর জন্য তানভিরের সামনে প্রতিনিয়ত আবিরের

প্রশংসা করাটা আমার পছন্দ নয়। তানভিরের বয়স কম, রগচটা, জেদি সে একমাত্র আবিরের কথা একটু আধটু মানে। ওর মনে যদি একবার উল্টাপাল্টা কিছু ঢুকে যায় তখন কি আবিরের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কটা থাকবে?" মাহমুদা খান চাপা স্বরে বললেন, "তানভির আর আবিরের সম্পর্ক তোমাদের থেকেও অনেক বেশি স্ট্রং। ওরা এসব সামান্য বিষয়ে মাথায় ঘামায় না। তারপরও আমি ভাইকে বলে দিব যেন তানভিরের সাথে বাজে ব্যবহার না করে। শুনলাম আবিরের সাথেও কথা বলছো না, কেনো? ও আবার কি করছে?" "অনেক কিছু করছে কয়টা শুনবি? আমার বাধ্য ছেলে অবাধ্য হয়ে গেছে এটায় মূল কথা। তার কাজ শেষ দেশে আসতে বলছি, এখন আসতে পারবে না। রমজানের আগে থেকে বিয়ের কথা বলতেছি কিন্তু সে বিয়েও করবে না। কি ভাবে, কি করে একমাত্র সে আর আল্লাহ ই ভালো জানেন। আমার ছেলে আগে এমন ছিল না। এতগুলো বছর যাবৎ আমি যা বলেছি তাই করেছে, এমনকি আবিরের কিছু লাগলে, কিছু চাওয়ার থাকলে দ্বিধাহীন ভাবে আমার কাছে চেয়েছে, ও যা বলেছে আমি তাতেই রাজি হয়েছি, সব অনুমতি দিয়ে দিয়েছি। তাহলে এখন এত দূরত্ব কেন হচ্ছে? গত তিনবছরে কি এমন হলো যে আমার ছেলের মধ্যে এত পরিবর্তন চলে এসেছে?" মাহমুদা খান শ্বাস ছেড়ে উষ্ণ স্বরে বললেন, "ছেলে বড় হচ্ছে, প্রতিনিয়ত মাথায় কত কত প্রেশার ঢুকছে। হয়তো আবেগের বশবর্তী হয়ে করা ভ্রান্তিগুলোর জন্য ভেতরে ভেতরে পুড়ছে, নিজেই নিজের বিবেকের সম্মুখীন হতে পারছে

না।ভাইজান, এমনও হতে পারে আবির তোমাকে কিছু বলতে চায়। তুমি রাগারাগি না করে ওকে একটু সময় দিও, আবিরকে বুঝার চেষ্টা করো। ও কি বলতে চায় শুনো।" আলী আহমদ খান গুরুগম্ভীর কণ্ঠে বলে উঠলেন, " আমার এখন আর কিছু শুনার নেই। অনেকবার তার মতামত জানতে চেয়েছি, ও কি চাই না চাই সব জানতে চেয়েছি, কোনো সমস্যা কি না তাও জানতে চেয়েছি, আমাকে কিছু বলতে চায় কি না সেটাও জিজ্ঞেস করেছি এমনকি তার মাকে দিয়েও জিজ্ঞেস করিয়েছি। কিন্তু আবির প্রতিবার আমার কথা এড়িয়ে গেছে, ওর মাকে পর্যন্ত কিছু বলে নি। এখন ওর মনের কথা জানার আর কোনো আগ্রহ আমার নেই। আলী আহমদ খান কাউকে কোনো ব্যাপারে এত সুযোগ দেন না, সে আমার ছেলে বলে আমি তাকে অনেক ছাড় দিয়েছি কিন্তু আর সম্ভব না।" এমন সময় মোজাম্মেল খান দরজায় দাঁড়িয়ে মোলায়েম কণ্ঠে বললেন, "ভাইজান আসবো?" আলী আহমদ খান সেদিকে তাকিয়ে ধীর কণ্ঠে বললেন, "চলে যাচ্ছিস নাকি?" " আমি কোথাও যাচ্ছি না। খিদা লাগছে খাবো তাই তোমাকে নিতে আসছি। আর হ্যা আমি সত্যি দুঃখিত ভাইজান। তোমাকে ঐভাবে কথাটা বলি নি। আমার মনে আসছিল তাই মুখ ফস্কে বেড়িয়ে গেছিল।" "খিদা লাগছে খেতে যা আমাকে বলার কি আছে?" "বলছি কারণ আজ দুপুরের রান্না স্পেশাল মানুষজন করেছেন। আসিফের বউ, আইরিন আর আমার মেয়ে তো আছেই। তোমাকে রেখে একা খেলে আবার দশটা কথা শুনাবা। তার থেকে বরং তুমিও চলো।" আলী আহমদ খান

হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, " আমি যেতে পারি তবে একটায় শর্তে, আজকে থেকে তানভির, মেঘ দু'জনের ব্যাপারে তুই আর কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারবি না। আমি যা বলবো, যেভাবে বলবো কোনো দ্বিমত ছাড়ায় মেনে নিতে হবে। বল রাজি?" মোজাম্মেল খান একগাল হেসে বললেন, " আমি রাজি। তোমার প্রতি আমার অগাধ আস্থা আছে। আমি ভুল করলেও আমার ভাই কখনো ভুল করতে পারে না।আর হ্যাঁ আমি কিন্তু আমার চ্যালেঞ্জে জিতেই গেছি তাই বাসা ছাড়ার প্রশ্ন ই আসে না। " আলী আহমদ খান গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, "তুই জিতেছিস ঠিকই তবে আমি হেরে যায় নি। কথাটা মাথায় রাখিস। এই বাড়িতে আমার কথায় শেষ কথা, এটা ভুলে যাস না।" "ঠিক আছে। তাড়াতাড়ি আসো।" "যা আসছি।" মাহমুদা খান দীর্ঘ মনোযোগ দিয়ে দুই ভাইয়ের কথোপকথন শুনছিলো। মোজাম্মেল খান বেড়িয়ে যেতেই প্রশ্ন করলেন, " ভাই হার জিতের কথা বলছিল কেন?" " ওর তো সারাদিন কাজ ই এটা। আমার কোন কথা ঠিক হয়েছে কোনটা ঠিক হয় নি এসব নিয়েই তার গবেষণা। কয়দিন যাবৎ এক প্রজেক্ট নিয়ে লাগছে, আমি বলেছিলাম শেষ করতে পারবে না। এখন শেষ করে ফেলছে তাই জিতছে বলে খুশি হচ্ছে। অথচ সেই প্রজেক্টেও আমার ছেলেই হেল্প করেছে। এটা এখন বললে আবার রাগ করে বসে থাকবে। তার থেকে খুশি হচ্ছে হোক। তোরা আসছিস অনেকক্ষণ হয়েছে, চল খেতে যায়।" মাহমুদা খান বসা থেকে উঠতে উঠতে বললেন, "ভাইজান, আবিরের সাথে একটু কথা বলিয়েন।" "আচ্ছা।"

ইদানীং বন্যার মন ভীষণ খারাপ। তানভিরের ফোন রিসিভ করে না বেশকিছুদিন হলো। তানভির প্রায় ই বন্যাদের বাসার এদিকে আসে। দু-একদিন মোখলেস মিয়ার সাথে দেখা হয়েছে ঠিকই কিন্তু বন্যার সাথে একদিনও দেখা হয় নি। তানভিরের ঘনঘন যাতায়াত মোখলেস মিয়া ভালোই পর্যবেক্ষণ করছেন। আজ বিকেলে মোখলেস মিয়া জোরপূর্বক তানভিরকে বাইক থামাতে বলেন। তানভিরও একপ্রকার বাধ্য হয়ে বাইক থামায়। তানভিরকে নিয়ে কাছেই এক চায়ের দোকানে বসে জিজ্ঞেস করলেন, "ঐ পোলা, তুমি কি আমার বউকে পছন্দ করো?" আচমকা মোখলেস মিয়ার এমন প্রশ্নে তানভির কিছুটা ইতস্তত বোধ করে। দৃষ্টি মাটিতে নামিয়ে দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো। মোখলেস মিয়া আবারও বললেন, " দেখো ভাই, বয়স আমার কম হয়ছে না। চোখ দেইখা মানুষের মনের কথা বুঝবার পারি। সেদিন বন্যার সাথে তোমারে দেইখাই সন্দেহ হয়ছিল। আর ইদানীং তোমার এই গলিতে আসা যাওয়ায় নিশ্চিত হইয়া গেলাম। " তানভির এখনও চুপ করে বসে আছে। বলার মতো কিছুই নেই তার। মোখলেস মিয়া তানভিরের কাঁধে হাত রেখে শান্ত কণ্ঠে বললেন, " পছন্দ করো ভালো কথা কিন্তু শুধু বাইক চালাইয়া কি ঢাকা শহরে বউ পালতে পারবা? আর বন্যার আব্বা কিন্তু মোটরসাইকেলের ড্রাইভারের কাছে মেয়ে বিয়া দিতো না। সময় থাকতে ভাবো আর নাইলে আমার বউরে ভুইলা যাও। " ভুইলা যাও শব্দটা যেন তানভিরের মস্তিষ্কে গুরুতরভাবে আঘাত করেছে। তানভির কাঁধ থেকে হাত সরিয়ে বসা থেকে উঠে শক্ত হাতে চায়ের

কাপ রাখতে রাখতে হুঙ্কার দিল, " ভুইলা যাইতে পারবো না। প্রয়োজনে আপনার এই বন্যা বউকে ভাগাইয়া নিয়ে যাবো। যেতে না চাইলে কি*ডন্যা*প করে নিয়ে যাব, তবুও ভুলতে পারব না। আর আপনি যদি উল্টাপাল্টা কথা বলেন তাহলে আপনাকেও কি*ডন্যাপ করে পঞ্চগড় পাঠায় দিব। ওখানে তিন নাম্বার বিয়ে করে সংসার কইরেন।" তানভির রাগে কটমট করতে করতে বাইকে উঠে গেছে। মোখলেস মিয়া হাসতে হাসতে বললেন, "সাব্বাস! ব্যাটার তেজ আছে ভালো।" আজ ভার্সিটির ক্লাস একটু তাড়াতাড়ি শেষ হয়েছে। তাই সবাই একসঙ্গে ঘুরতে বেড়িয়েছে। ড্রাইভারকে আগেই জানিয়ে দিয়েছে। পার্কে বসে সবাই আড্ডা দিচ্ছে। মিনহাজ হঠাৎ বলে উঠল, " সবাই শুন, মেঘ আর বন্যাকে ডাকতে গেলে আমাদের বেশ কিছু সমস্যায় পড়তে হয়। প্রথমত স্যার ম্যামদের সামনে ভাবি বলে ফেললে ১০ টা প্রশ্ন করে, শুধু শুধু বকাও খেতে হয়। তাই সিদ্ধান্ত নিয়ে এখন থেকে ভাবি ডাকবো না। যেহেতু খান বাড়ির বড় ছেলে আবির ভাইয়া তাই স্বাভাবিক ভাবে মেঘ হবে সেই বাড়ির বড় বউ। আর বন্যা হবে মেজো বউ। তাই আমরা এখন থেকে সেই অনুসারে ডাকবো। মেঘকে ডাকবো V1 মানে ভাবি-১ আর বন্যাকে ডাকব ভাবি-২ মানে V2, ঠিক আছে?" সাদিয়া, মিষ্টি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো, " একদম ঠিক আছে" মেঘের মুখে হাসি থাকলেও বন্যা মুখ ফুলিয়ে রাগী স্বরে বলল, "আমাকে ভাবি/ V2 / V3 কিছুই ডাকতে হবে না।" মেঘ ভ্রু কুঁচকে প্রশ্ন করল, "কি হয়েছে বেবি? এখনও

রেগে আছো?” “না কিন্তু ভাবি ডাক শুনার ইচ্ছে নেই।” মেঘ ন্যাকামির স্বরে বলল, “না.... এ হতে পারে না। আমার হৃদপিণ্ড চিঁড়ে ছোট ছোট অনুভূতি একত্রিত করে তোমাকে ভাবি বানানোর জন্য প্রপোজ করলাম। আর তুমি এখন এসে নাটক করছো, ভাবি ডাক শুনার ইচ্ছে নেই? তাঁর ছিঁড়া মার্কা কথা বললে সত্যি সত্যি বুড়িগঙ্গায় ফেলে দিয়ে যাব। আর ভাইয়াকে গিয়ে বলল, তোর এই জীবন ভালো লাগে না, তুই নিজের জীবনের প্রতি অতিষ্ঠ হয়ে বুড়িগঙ্গা ঝাপ দিয়েছিস। তখন কেমন হবে?” বন্যা মলিন হেসে বলল, ” ভালোই হবে। তোর থেকে বেশি তোর ভাই খুশি হবে।” ” খুশি হবে না ছাই! চোখ বন্ধ করে নিজেও বুড়িগঙ্গায় ঝাপ দিবে দেখিস। ” “বাজে কথা বলিস না মেঘ। ওনার অতীত ফিরে আসছে, ওনার জীবনে বন্যা এখন কেউ না। ” মেঘ রাগান্বিত কণ্ঠে বলল, ” শুন ভাইয়ার অতীত যদি ভাইয়ার জীবনে আবারও ফিরতে চায় আর আমার ভাই যদি নির্লজ্জের মতো ঐ মেয়েকে এক্সেপ্ট করে নেয় তাহলে তোকে কিছু করবো না। আবির ভাই আর আমি মিলে বাসার পেছনের বাগানে ভাইয়াকে কু*পে দিয়ে আসবো। ” বন্যার দুচোখ ছলছল করছে। ঠোঁট কামড়ে মাথা নিচু করে বসে বসে কান্না গিলছে। মেঘ শক্ত কণ্ঠে শুধালো, “ভাইয়া তোকে ভালোবাসে, এটা কি তুই বিশ্বাস করিস?” বন্যা অসহায় দৃষ্টি তাকিয়ে আছে। মেঘ ঠান্ডা কণ্ঠে বলল, “আমি এখন ভাইয়াকে কল দিব। জাস্ট সামান্য একটা কথা বলব দেখবি ভাইয়া পাগলের মতো ছুটে আসবে।” “কোনো দরকার নেই।” “তোর দরকার না থাকলেও আমার দরকার

আছে। আমি আমার ভাবির চোখে পানি দেখতে চাই না। ” মেঘ সঙ্গে সঙ্গে তানভিরের নাম্বারে কল দিল। লাউডস্পিকার দিয়ে রেখেছে। আশেপাশে সবাই বসা। তানভির পার্টি অফিসে মিটিং করছে। মিটিং প্রায় শেষ পর্যায়ে। সবার বুঝানোর পরও তানভির নিজের সিদ্ধান্তে অনড় থাকায় কমিটি বাতিল করা ছাড়া আর কোনো অপশন নেই। এরমধ্যে মেঘের কল আসায় তানভির মিটিং থেকে বেরিয়ে কল রিসিভ করতেই মেঘ কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে ডাকল, “ভাইয়া..” তানভির আঁতকে উঠে বলল, “কি হয়েছে বনু? কোনো সমস্যা?” মেঘ নাক টানতে টানতে বলল, ” আমার কোনো সমস্যা না কিন্তু বন্যা..... ” “কি হয়েছে বন্যার? ” “বন্যা.....” মেঘ আর কিছুই বলছে না। তানভির আতঙ্কিত কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল, ” বন্যার কি হয়েছে?” “জানি না। বন্যা কেমন জানি করছে।” “কোথায় আছিস তোরা?” মেঘ জায়গার নাম বলতেই তানভির ঝটপট বলল, “আমি এখনি আসতেছি।” “ভাইয়া শুনো” ততক্ষণে তানভির কল কেটে দিয়েছে। মেঘ বন্যার দিকে তাকিয়ে ভেঙচি কেটে বলল, ” দেখ কেমনে আসতেছে। তুই বসে বসে দোয়া কর যেন দ্রুত আসতে গিয়ে কোনো সমস্যা না হয়।” তামিম প্রশ্ন করল, “এই V1, তুই গ্রুপ থেকে বেড়িয়ে গেলি কেন? তুই ছাড়া গ্রুপটা ভালো লাগে না। সবাই খুব বোরিং আর তোর ভাবি তো আরও বেশি বোরিং।” মেঘ হেসে উত্তর দিল, ” আমার ওনি যদি গ্রুপের চ্যাটিং দেখে আমাকে সোজা চান্দে পাঠায় দিবে। তাছাড়া আমি যে কাজে গ্রুপ খুলতে বলছিলাম সেই কাজ শেষ তাই এখন আমার গ্রুপ

আর প্রয়োজন নেই। ” সাদিয়া শান্ত কণ্ঠে শুধালো, “তুই যে কিছুদিন গ্রুপে এত এত মেসেজ দিলি, নাটক করলি সেসব তোর ওনি দেখে নি?” “প্রথমত গ্রুপে কথা শেষে আমি সঙ্গে সঙ্গে গ্রুপ সমেত সব মেসেজ ডিলিট করে দিতাম। দ্বিতীয়ত আমি সারাক্ষণ আমার আইডির Login Activity চেক করতাম যেন আমার ওনি আমার আইডিতে লগ ইন করলেই আমি এলার্ট হতে পারি। আমার ওনি এই কয়দিনে আমার আইডিতে একবারের জন্যও ঢুকে নি তাই সুযোগের সৎ ব্যবহার করে গ্রুপ থেকে বেড়িয়ে পরেছি যাতে ওনি কিছুই বুঝতে না পারেন।” বন্যা মেঘের দিকে তাকিয়ে উদাসীন কণ্ঠে শুধালো, “তুই এত চালাক হইলি কবে?” “কিছুদিন যাবৎ অনলাইনে চালাক হওয়ার ট্রেনিং করছি। বুঝলি?” বন্যা মলিন হাসলো সাথে বাকিরাও। হঠাৎ মেঘের নজর পড়ে কিছুটা দূরে দাঁড়ানো এক ছেলের দিকে। লম্বাচওড়া ছেলেটার দুহাত পেছনে হাতে বেশ কিছু ফুল। দেখেই বুঝা যাচ্ছে কাউকে প্রপোজ করতে এসেছে। কিন্তু আশেপাশে কোনো মেয়ে নেই। মেঘ স্থির দৃষ্টিতে ছেলেটার হাতের ফুলগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে। বেশ কিছুক্ষণ পর শাড়ি পড়া এক মেয়ে আসলো, বেশ সুন্দর করে সেজেগুজে এসেছে। মেয়েটা এসে ছেলেটার সামনে দাঁড়াতেই ছেলেটা হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো। পেছন থেকে ফুল গুলো বের কয়ে মেয়েটার সামনে ধরলো। এভাবে ফুল দেয়ার বিষয়টা কমন হলেও সবার আবেগ গুলো ভিন্ন ভিন্ন। সেদিন মেঘ নিজেই বন্যার জন্য কতটা আবেগ নিয়ে ঠিক এভাবে হাঁটু গেড়ে বসে প্রপোজ করেছিল তবে

সেটায় অন্যরকম অনুভূতি ছিল। আজ এই দৃশ্য দেখে মেঘের বুকের ভেতরটা হাহাকার করছে। আচমকা আবিরকে বড্ড বেশি মিস করছে। লম্বাচওড়া আর দেখতে ছেলেটা অনেকটায় আবিরের মতো তাই হয়তো মেঘের একটু বেশিই মনে পড়ছে। মেঘ আনমনে ভাবছে, " আবির ভাই কি কখনো এভাবে প্রপোজ করবেন আমায়? সামান্য একটা লাল গোলাপ চেয়েছিলাম তবুও দেন নি, ওনার কাছে ফুল সমেত প্রপোজ আশা করা বড্ড বেমানান।" বন্যা ডাকতেই মেঘের হুঁশ ফিরলো। কোনো কথা না বলে ফেসবুকে ঢুকে পোস্ট করল, "সাত সাগর আর তের নদী পার হয়ে তুমি আসতে যদি রূপকথার রাজকুমার হয়ে আমায় তুমি ভালবাসতে যদি।" পোস্ট আপলোড হওয়া মাত্রই তানভির উপস্থিত হলো। দ্রুত এগিয়ে এসে আতঙ্কিত কণ্ঠে শুধালো, "কি হয়েছে তোমার?" বন্যা থতমত খেয়ে তানভিরের দিকে তাকালো। বন্যা একদম স্বাভাবিক, চোখে মুখে অসুস্থতার রেশ মাত্র নেই। বন্যা কি বলবে এটায় বুঝতে পারছে না। তানভির একের পর এক প্রশ্ন করেই যাচ্ছে। বন্যা শুধু মেঘকে দেখছে কিন্তু মেঘের মনে যে রাজ্যের দুঃখ। মন খারাপের পাহাড় সরিয়ে গলা খাঁকারি দিয়ে মেঘ আস্তে করে বলল, "তেমন কিছু হয় নি ভাইয়া । বরই খেতে গিয়ে বরই এর একটা বিচি গিলে ফেলছিল। যদি পেটে গাছ হয়ে যায় এই আতঙ্কে বন্যা সহ আমরা সবাই ভয় পাচ্ছিলাম। তারপর এক আন্টি বলছে কোনো সমস্যা হবে না। " তানভির হাতের উল্টোপিট দিয়ে নিজের চোখ মুখ মুছে আকাশের পানে তাকিয়ে দীর্ঘ নিঃশ্বাস

ছেড়ে অত্যন্ত নমনীয় কণ্ঠে প্রশ্ন করল, “এটায় সত্যি ঘটনা? নাকি অন্য কোনো কারণ আছে যা কিন্তু এখন বলছিস না।” মেঘ ঘনঘন এপাশ ওপাশ মাথা নেড়ে বলল, “আর কোনো কারণ নেই। ” মেঘ একটু থেমে আবার বলল, “আসলে বন্যার কয়েকটা বই কেনা দরকার কিন্তু আমাদের কারো সেদিকে যেতে ইচ্ছে করছে না। তুমি যেহেতু চলেই আসছো, বন্যাকে নিয়ে যাবা, প্লিজ।” বন্যা অগ্নি চোখে মেঘের দিকে তাকিয়ে আছে। কারণ তানভিরের সঙ্গে একা কোথাও যাওয়ার বিন্দুমাত্র আগ্রহ বন্যার নেই। আয়েশাকে দেখার পর থেকে বন্যার আতঙ্ক কয়েকগুণ বেড়ে গেছে। রাতবিরেতে ঘুম ভেঙে যায়, ঘন্টার পর ঘন্টা বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকে। প্রায় রাতেই আপু সজাগ হয়ে বন্যাকে ডেকে নিয়ে ঘুম পাড়ায়। তানভিরের কল রিসিভ করে না, বেশকিছু দিন ক্লাসে পর্যন্ত আসে নি। তানভির রাশভারি কণ্ঠে শুধালো, “তুই কিভাবে যাবি?” “মিষ্টি ওর ফুপ্পির বাসায় যাবে। ওনাদের বাসা আমাদের বাসার এদিকে। আমি মিষ্টির সাথে চলে যাবো।” “ঠিক আছে। সাবধানে যাস।” “আচ্ছা। তুমি বন্যাকে নিয়ে যাও আর হ্যাঁ বন্যাকে মোখলেস দুলাভাই এর দোকান পর্যন্ত দিয়ে এসো।” তানভির নির্বাক চোখে মেঘকে দেখে নিল। মেঘের ঠোঁট জুড়ে হাসির ঝলক। তানভির চাইলেও বোনকে কিছু বলতে পারছে না। বন্যার দিকে তাকিয়ে আস্তে করে বলল, “চলো” বন্যা তখনও মেঘের দিকে তাকিয়ে আছে। চোখের ভাষায় বুঝাচ্ছে সে তানভিরের সঙ্গে যাবে না। কিন্তু মেঘ সেই ভাষাকে পাত্তা না দিয়ে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলল, “কিরে যাচ্ছিস না

কেনো? ভাইয়া কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে বলতো! ” বন্যা বিড়বিড় করতে করতে উঠে গেল। মেঘ, মিষ্টি, সাদিয়া, মিনহাজ, তামিম তখনও বসা। তানভির যাওয়ার আগে বোনকে সতর্ক করে গেলো যেন তাড়াতাড়ি বাসায় চলে যায়। মিষ্টিরা টুকিটাকি বিষয় নিয়ে দুষ্টামি করছে। অথচ মেঘের মনোযোগ কাপল টার দিকে। দু’জন পাশাপাশি বসে কি সুন্দর ভাবে গল্প করছে। আবিরের জন্য মেঘের মনটা খুব বেশি ছটফট করছে। আগপাছ না ভেবেই সবার মধ্যে থেকে উঠে গেলো। কিছুটা দূরে গিয়ে আবিরকে কল করল। এদিকে আবির অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে প্রেজেন্টেশন দিচ্ছে। সচরাচর দিনের বেলা আবিরকে কেউ কল দেয় না তাই ফোন সাইলেন্ট করতেও ভুলে গেছে। আচমকা কল বাজতেই একজন বয়স্ক ব্যক্তি বিরক্তির স্বরে বললেন, “Silence your phone.” আবির তড়িৎ বেগে ফোন সাইলেন্ট করতে টেবিলে কাছে এগিয়ে আসলো। ফোনের স্ক্রিনে নজর পড়তেই থমকালো। অসময়ে মেঘের কল দেখে ভেতরটা কেঁপে উঠলো। উপস্থিত সবার দিকে এক পলক তাকিয়ে বলল, “I’m Sorry. I can’t cut this call. Excuse me.” আবির কল রিসিভ করে কিছুটা সাইডে সরে দাঁড়িয়েছে। রিসিভ হওয়ামাত্রই মেঘ আর্তনাদ করে উঠল, “আবির ভাই..... ” আবির বরাবরের মতো শান্ত আর আবেশিত কণ্ঠে জবাব দিল, “হুমমমমমম।” “আপনি কবে আসবেন?” “আসবো।” মেঘ শীতল কণ্ঠে শুধালো, “কবে আসবেন?” আবির এবার আস্তে আস্তে বলল, “আমি কবে আসবো এটা তো

আপনি তো খুব ভালোভাবে জানেন। আপনিই বলুন, আর কতদিন বাকি?" মেঘ মৃদু হেসে উত্তর দিল, "২৭ দিন। " "Very Good. এখন বলুন আপনার কি হয়েছে?" "কিছু হয় নি। এমনিতেই ভালো লাগছিল না। খেয়েছেন আপনি?" "এখনও খাওয়া হয় নি একটু পর খাবো। আপনি খেয়েছেন?" " বাহিরে খেয়েছি। বাসায় যায় নি এখনও।" আবির ভ্রু কুঁচকে প্রশ্ন করল, "এখনও বাসায় যান কি কেনো? সাথে কে?" "মিষ্টিরা সবাই আছে।" মেঘ আবারও ডাকল, "আবির ভাই..." আবির পূর্বের ন্যায় জবাব দিল, "হুমমমমমম।" মেঘ ঢোক গিলে উষ্ণ স্বরে বলল, "I Miss You Abir Vai. Miss You a lot. " সহসা আবিরের ওষ্ঠ যুগল প্রশস্ত হলো। সবার দিকে এক নজর দেখলো। রুমে উপস্থিত সবার নজর আবিরের দিকে। আবির সঙ্গে সঙ্গে নজর সরিয়ে আস্তে করে গলা খাঁকারি দিয়ে মুচকি হেসে বলে উঠল, "আচ্ছা, তারপর। " মেঘ এবার আহ্লাদী কণ্ঠে বলে উঠল, "I Miss You Infinity. Do you miss me?" আবিরের মোলায়েম কণ্ঠের ছোট জবাব, "হুম।" মেঘ এবার ঠোঁট উল্টালো। সবসময় মিস ইউ বলে মেঘ কল কেটে দিলেও আজ সে কল কাটছে বা বরং আবিরকে প্রশ্ন করছে অথচ আবির হুমম, আচ্ছা বলে কথা কাটাচ্ছে। মেঘ মনে মনে ক্ষুদ্ধ হলো। বুক ভরে শ্বাস টেনে রাশভারি কণ্ঠে শুধালো, "আপনি কি ব্যস্ত?" "প্রেজেন্টেশন দিচ্ছিলাম। " মেঘ আতঙ্কিত কণ্ঠে বলতে শুরু করল, "সরি সরি সরি, আমি বুঝতে পারি নি। আপনি কল কেটে দিলেই পারতেন। রাখি এখন।" আবির শান্ত

কণ্ঠে বলল, “দ্রুত বাসায় যান। আমি প্রেজেন্টেশন শেষ করে কল দিচ্ছি। ওকে?” “আচ্ছা। ” মেঘ কল কেটে মোবাইল দিয়ে নিজের কপালে আস্তে করে গাট্টা দিতে দিতে নিজেকে বকতে লাগলো। মানুষ কল দিয়ে প্রথমে জিজ্ঞেস করে কেমন আছেন, কি করেন অথচ মেঘ সেই প্রশ্ন সবার শেষে জিজ্ঞেস করেছে। প্রথমে জিজ্ঞেস করলে এমন একটা ঘটনা কখনোই ঘটতো না। মেঘ নিজেকে বকতে ব্যস্ত। আবির ফোন সাইলেন্ট করে টেবিলের উপর রাখতে রাখতে বলল, “Sorry for wasting your time.” সবার মধ্য থেকে মোটামুটি বয়স্ক একজন জিজ্ঞেস করলেন, “Is she your lover?” আবির নিঃশব্দে হেসে মোলায়েম কণ্ঠে উত্তর দিল, “She is my everything. I’m nothing without her. ” মধ্যবয়স্ক লোক এবার একগাল হেসে বললেন, “She is truly lucky to have a life partner like you. Best of luck.” আবির অনুষ্ণ কণ্ঠে জানাল, “No,Sir. I am more lucky to have someone like her in my life. Pray for us & Again Sorry.” তানভির বন্যাকে নিয়ে একটা লাইব্রেরিতে গেল। বন্যা আশেপাশে তাকিয়ে ভাবতে লাগলো। আপাতত কোনো বই কেনার ই প্ল্যান ছিল না তার, তবুও অনেক দেখেশুনে ২-৩ টা বই নিল। তানভির বন্যাকে কিছু বলতে চাচ্ছে কিন্তু বন্যা খুব ব্যস্ততা দেখাচ্ছে এমনকি তানভিরের দিকে তাকাচ্ছেও না। কাজ শেষে তানভিরকে উদ্দেশ্য করে বলল, “আপনি চলে যান আমার আরও কিছু কাজ আছে।” ” কাজ অন্যদিন করো আজ চলো,

একজায়গায় যাব। ” বন্যা ঠান্ডা কণ্ঠে বলল, “আমার শরীর ভালো না।” তানভির মলিন হেসে বলল, “বরই এর বিচি খেলে কিছু হয় না বোকা। ” বন্যা তানভিরের দিকে স্পষ্ট চোখে তাকিয়ে বলল, “আমি বোকা না।” ” তাহলে কি? চালাক? কতটা? ” বন্যা তখনও তানভিরের দিকে তাকিয়ে আছে। তানভির রাশভারি কণ্ঠে বলল, “কল দিলে কল রিসিভ করো না কেনো?” বন্যা ঢোক গিলে ভেতরের কষ্ট চেপে রেখে আস্তে করে বলল, ” সবসময় ফোনের কাছে থাকি না।” “পরে তো দেখো। তখন একটা কল দিতে পারো না?” বন্যা আর কিছু বলল না। তানভির এবার শক্ত কণ্ঠে জানতে চাইলো, ” তুমি কি আমার উপর বিরক্ত?” বন্যা এপাশ-ওপাশ মাথা নেড়ে নিচু স্বরে বলল, ” আমি বাসায় যাব।” বন্যার ভেতরে ঠিক কতটা যন্ত্রনা হচ্ছে এটা সে তানভিরকে বুঝাতেই পারছে না। তানভির বন্যাকে নিয়ে একটা চায়ের দোকানে বসলো। যদিও বন্যার ইচ্ছে ছিল না, তানভির জোর করেই এনেছে। দু’জনে দু কাপ বুলেট চা নিয়েছে। বন্যা দ্রুত চা খাচ্ছে যেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাসায় চলে যেতে পারে। তানভির বন্যার এমন কর্মকাণ্ড দেখে হতবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। আচমকা বলে উঠল, “সেদিনের মেয়েটার কথা মনে আছে?” বন্যা বুঝেও অবুঝের মতো প্রশ্ন করলশ “কোন মেয়ে?” “আয়েশা।” নামটা কর্ণকুহরে প্রবেশ মাত্রই বন্যা বিষম খেয়ে উঠল। টক আর কাঁচা মরিচের ঝাঁজে কাশতে কাশতে বন্যার শ্বাস আঁটকে যাচ্ছে। দুচোখ বেয়ে পানি পরছে, তানভির তড়িঘড়ি করে এক গ্লাস পানি নিয়ে

আসলো। শ্বাস আঁটকে যাওয়ায় পানিটা পর্যন্ত খেতে পারছে না। তানভির কি করবে বুঝতে না পেরে বন্যার মাথায় অনবরত ফুঁ দিচ্ছে। বন্যার স্বাভাবিক হতে বেশকিছুটা সময় লাগলো। তানভির তখনও বন্যা পাশে দাঁড়ানো। বিষয়টা খেয়াল করে বন্যা আস্তে করে বলল, "আমি ঠিক আছি। আপনি বসুন।" তানভির "সরি" বলে দূরে সরে বসেছে। বন্যা বলল, "তখন কি যেন বলছিলেন, বলুন।" তানভির মনে মনে বিড়বিড় করল, "যে শাঁকচুন্নির নাম নেয়াতে তোমার এই অবস্থা হয়েছে এই শাঁকচুন্নির নাম আর জীবনেও মুখে নিবো না। " বন্যা আবারও বলল, "কি হলো, বলুন।" "কিছু না,চলো তোমাকে বাসা পর্যন্ত দিয়ে আসি।" আবির প্রেজেন্টেশন শেষ করেই মেঘকে কল দিয়েছে ততক্ষণে মেঘ বাসায় চলে গেছে। কথা শেষ করে ফেসবুকে ঢুকা মাত্র মেঘের পোস্ট সামনে আসছে। পোস্ট দেখে আবির জিভ দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে অনুগ্র কণ্ঠে বলল, "রূপকথার রাজকুমার না হলেও মাহদিবার রাজকুমার হয়ে খুব শীঘ্রই আসবো, ইনশাআল্লাহ।" নিত্যদিনের মতো রাত ১০:৩০ নাগাদ আবিরের কল আসছে। মেঘ যেন প্রতিদিন এই সময় টায় জন্যই অপেক্ষা করে। আবির কল দিয়েই ধীর কণ্ঠে শুধালো, "কি অবস্থা? " "কিসের কি অবস্থা? " "শপিং কতদূর?" "কিসের শপিং?" "বিয়ের।" "কার বিয়ে?" "তোর।" "আমার বিয়ে! কবে?" " সেসব জেনে তোর কাজ কি? তুই না বলছিলি বিয়ের জিনিসপত্র নিয়ে পালানোর শখ তোর। টাকা পাঠিয়েছি কি কি লাগে সব কিনে নিস। " মেঘ আহাম্মকের মতো তাকিয়ে বলল,

“আমি আপনাকে এটা বলি নি।” “সেসব বাদ দে, এখন বল তোর কি লাগবে?” মেঘ মনে মনে বিড়বিড় করল, “আপনাকে লাগবে। এখন দিয়ে দেন আমায়।” “কি হলো বল!” “আমার কিছু লাগবে না।” আবির গম্ভীর কন্ঠে বলল, “আগামীকাল শপিং এ যাব। সারারাত লিস্ট করে পাঠাবেন। মনে থাকবে?” “হুমমম।” তানভির রাজনীতি ছেড়ে পড়াশোনায় মনোযোগী হয়েছে। সেই সঙ্গে আপাতত আবিরের অফিসের টুকটাক দেখাশোনা করতে হচ্ছে। এছাড়াও আরও কিছু কাজ আছে। এরমধ্যে আয়েশার সঙ্গে আর দেখা হয় নি। তানভিরও ভুলে গেছে সেই মেয়ের কথা। বন্যা ইদানীং একটা টিউশন শুরু করেছে। মূলত বন্যার বড় আপু মেয়েটাকে পড়াতো। কিন্তু এখন চাকরির চাপে টিউশন পড়ানো টা কষ্ট হয়ে যায় তাই বন্যা পড়াচ্ছে। বিকেল দিকে বন্যা টিউশন থেকে বেড়িয়ে হেঁটে মেইনরোড পর্যন্ত যাচ্ছিলো। অনেকটা যাওয়ার পর হঠাৎ পাশ থেকে একজন ডাকলো, “বন্যা।” মেয়েলী কন্ঠস্বরে নিজের নাম শুনে বন্যা থমকে দাঁড়িয়ে পাশে তাকালো। থ্রিপিস পড়া এক মেয়ে মাথায় ওড়না দেয়া, এগিয়ে আসলো বন্যার কাছে। বন্যা সূক্ষ্ম নেত্রে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, “কে আপনি? আমাকে কিভাবে চিনেন?” “আমি আয়েশা। সেদিন দেখা হলো মনে নেই? তানভিরের সাথে ছিলে তুমি।” বন্যা শ্বাস ছেড়ে শান্ত কন্ঠে বলল, “কিছু বলবেন?” “হ্যাঁ। তুমি মেঘের ফ্রেন্ড বন্যা না?” “জ্বি। কেনো?” “আসলে তোমাকে সেদিন তানভিরের সাথে দেখার পর কেন যেন মনে হচ্ছিল তুমি ওর গার্লফ্রেন্ড। অনেক ভাবার পর মনে হয়েছে।

তুমি তো মেঘের ফ্রেন্ড। অনেক আগে তোমাকে দেখেছিলাম। তখন তোমরা অনেক ছোট ছিলে। ” বন্যা নিজের ভেতরে ক্রোধ চেপে রেখে শান্ত স্বরে জিজ্ঞেস করল, “আমাকে কি কোনো দরকারে ডেকেছেন? আমার কিছু কাজ আছে, যেতে হবে। ” “তানভিরের বিষয়ে জিজ্ঞেস করতেই ডেকেছিলাম। তুমি জানো কি না জানি না, তানভিরের সাথে আমার প্রেমের সম্পর্ক ছিল। পারিবারিক সমস্যার কারণে অনেকদিন যোগাযোগ ছিল না। মূলত তানভিরের জন্য আমার ঢাকায় আসা। মাস্টার্স আর চাকরির প্রস্তুতি কেবল বাহানা। আচ্ছা, তানভির কি বর্তমানে কোনো সম্পর্কে আছে? জানো তুমি?” “আমি কিভাবে জানবো?” “তোমার সাথে কিছু নেই তো?” বন্যা কপাল কুঁচকে প্রশ্ন করল, “থাকলে কি করবেন?” আয়েশা ফিক করে হেসে বলল, “মজা করতেছো? তোমাকে তানভির ছোট বোনের চোখে দেখে। তাই তোমার প্রতি ওর কোনো অনুভূতি আসবেই না।” বন্যা ফোঁস করে বলল, “তাহলে তো আপনি ই ভালো জানেন। আসছি” বন্যা চলে যাচ্ছে। মেয়েটা পেছন থেকে জিজ্ঞেস করল, “তোমার কাছে তানভিরের নাম্বার আছে?” বন্যা কোনো উত্তর দিল না। মেয়েটা আবারও বলল, “তানভিরের সাথে দেখা হলে আমার কথা বইলো।” ইদানীং আবিরের আব্বুর অফিসে বেশ চাপ যাচ্ছে। মোজাম্মেল খানও ঢাকায় নেই। আলী আহমদ খান একা সব সামলে হিমসিম খাচ্ছেন। তারমধ্যে কয়েকজন নতুন জয়েন করেছে। তাদেরকে সবকিছু বুঝিয়ে দিতে হচ্ছে। আবির সকাল থেকে বেশ কয়েকবার কল দিয়েছে, আলী

আহমদ খান ফোনের কাছে নেই তাই রিসিভ করতে পারেন নি। অনেকক্ষণ পর ফোন দেখে আবিরকে কল ব্যাক করলেন। আবির সালাম দিয়ে শান্ত কণ্ঠে বলল, “আব্বু, সিফাতের ব্যাপারে আপনি যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সেটা কি ভেবেচিন্তে নিয়েছেন?” “হ্যাঁ। কেনো?” “কিন্তু আমার মনে হচ্ছে আপনার এই সিদ্ধান্তটা নিয়ে আবারও ভাবা উচিত।” “তোমার চাচ্চু তোমার কাছে বিচার দিয়েছে?” “না আব্বু। চাচ্চু শুধু জানিয়েছেন। এটা একান্ত ই আমার মতামত। তারপরও যদি মনে হয় আপনি তাকে জয়েন করাবেন, তাহলে অন্ততপক্ষে কিছুদিন সময় নিন। আমি কিছুদিনের মধ্যেই চলে আসবো। চাচ্চু, কাকামনি ঢাকায় ফিরলে সবার সাথে কথা বলে সিদ্ধান্তটা নিলে ভালো হতো না?” ” কি বলতে চাচ্ছো, আমার নেয়া সিদ্ধান্ত ভুল? তোমরা যা ঠিক মনে করবে শুধুমাত্র তাই ঠিক?” “আব্বু প্লিজ আপনি মাথা ঠান্ডা করে একবার ভাবুন, যেখানে ২৫-৩০ বছর যাবৎ গ্রামের মানুষের সাথে আপনার কোনো সম্পর্ক নেই। ভুলকরেও কখনো গ্রামে যান না, সেখানে সেই গ্রামের এক ছেলেকে গুরুত্বপূর্ণ পোস্টে জব দিচ্ছেন। সেটা কি আদোঃ যুক্তিপূর্ণ? ১৫ দিনের মধ্যে আমি চলে আসবো। তাছাড়া খুব সমস্যা হলে তানভিরকে বললেই অফিসে আসবে। এরপরও যদি নিতে চান আরও অনেক মানুষ আছে। প্লিজ একবার অন্তত ভাবুন।” আলী আহমদ খান গুরুতর কণ্ঠে বলতে শুরু করলেন, “দেখো, মানুষ সারাজীবন খারাপ থাকে না। তার পরিবার আমাদের সাথে যে অন্যায় টা করেছে সেটা অনেক বছর আগের ঘটনা।

এতবছর পর সে বিপদে পড়ে জবের জন্য আমার কাছে এসেছে। এখন আমিও যদি তাদের মতো খারাপ ব্যবহার করি তাহলে তাদের আর আমাদের মধ্যে কি পার্থক্য রইলো? দ্বিতীয়বার সুযোগ পেলে মানুষ নিজের প্রথম ভুলগুলোকেও শুধরাতে পারে। দেখা যাক সে কি করে!" আবির কন্ঠ দ্বিগুণ ভারি করে বলল, " আমার মন কোনোভাবেই সায় দিচ্ছে না। আপনার ভালোমানুষির সুযোগ নিয়ে অনেকেই অনেককিছু করতে পারে।" " তুমি দুশ্চিন্তা করো না। সাবধানে থেকো আর যত তাড়াতাড়ি চলে এসো। যদি তোমার ইচ্ছে হয়!" আবির মলিন হেসে বলল, "সরি, আব্বু।" "সরি বলছো কেনো?" "বলতে ইচ্ছে করলো তাই বললাম।" আরও এক সপ্তাহ কেটে গেছে। আবিরের বাড়ি ফেরার কেবল এক সপ্তাহ বাকি। খান বাড়ির আমেজ বদলে গেছে। মালিহা খান, হালিমা খান বিভিন্ন জাতের পিঠা তৈরিতে ব্যস্ত। আকলিমা খানও তাদের কাজে সহযোগিতা করছে। মেঘ সকাল থেকে আম্মুদের বিশাল আয়োজন দেখছে। আজ ভার্সিটি যেতে একদম ইচ্ছে করছে না। তারপরও কি মনে করে ভার্সিটিতে এসেছে। একটা ক্লাস শেষ হয়ে আরেকটা ক্লাস শুরু হয়েছে কেবল ১৫ মিনিট হবে। এরমধ্যে মেঘের মাথা ঘুরছে, চোখে অন্ধকার দেখছে। একবার ওয়াশরুমে গিয়ে চোখে মুখে পানি দিয়ে এসেছে তারপরও ঠিক হচ্ছে না। মেঘের অবস্থা দেখে বন্যাও ভয় পাচ্ছে তানভিরকে ফোন দিতে চাচ্ছে কিন্তু মেঘ বার বার আটকে দিচ্ছে । প্রায় ১০-১৫ মিনিট পর মেঘ আচমকা সেন্স হারিয়ে বন্যার গায়ের

উপর ঢলে পড়েছে।মেঘের অসুস্থতার কথা শুনামাত্র তানভির আঁতকে উঠে। তার অক্লিষ্ট মন দৌর্মনস্যে ছেয়ে গেছে। দ্রুত রওনা দিল। ততক্ষণে বন্যারা মেঘকে নিয়ে হাসপাতালে চলে গেছে। তানভিরকেও জানিয়ে দিয়েছে। ডাক্তার মেঘকে চেক করছেন, বন্যা মেঘের পাশে বসে আছে। তারমধ্যে তানভির ছুটে এসে রুমে ঢুকে ডাক্তারকে দেখেই থমকালো। দরজার সামনে মিনহাজরা থাকায় রুমটা চিনতে অসুবিধা হয় নি। ডাক্তার বেরিয়ে যেতেই তানভির মেঘের কাছে বসে মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে শীতল কণ্ঠে আর্তনাদ করে বোনকে ডাকতে শুরু করল। বন্যা চোখ নামিয়ে চুপচাপ বসে আছে। অকস্মাৎ তানভিরের ফোনে কল আসছে। তানভির পকেট থেকে ফোন বের করে আঁতকে উঠে বলল, “সর্বনাশ!” বন্যা চোখ সরু করে তানভিরের দিকে তাকালো। তানভির নিজের চোখমুখ মুছে গলা খাঁকারি দিয়ে কল রিসিভ করে কানে ধরলো। ওপাশ থেকে আবির উদ্বিগ্ন কণ্ঠে শুধালো, “আমার বউ কোথায়? কতগুলো কল দিচ্ছি, কল রিসিভ করছে না কেনো?” তানভির কি বলবে বুঝতে পারছে না। চোখের সামনে বোনের নিথর দেহ পড়ে আছে এ অবস্থায় ফোনের অপর পাশের মানুষটাকে মিথ্যা বলার সাধ্যও তার নেই। আগের বার অসুস্থতার কথা লুকাতে গিয়ে বড়সড় ধাক্কা খেতে হয়েছে। এবার সে সত্যি নিরুপায়। তানভির অত্যন্ত নমনীয় কণ্ঠে আস্তে করে জবাব দিল, “বনু আমার সামনেই আছে।” আবির স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, “ফোনটা ও কে দে। ” পরপর ঢোক গিলে তানভির শীতল কণ্ঠে বলল, ” বনু কথা বলার

অবস্থাতে নেই। ” আবির আর্তনাদ করে উঠল, “কেনো? কি হয়েছে ওর?” “সেন্স হারিয়ে ফেলছিল। এখনও....” এটুকু বলার আগেই আবিরের হুঙ্কার শুরু হলো। মুহূর্তেই মাত্রাতিরিক্ত রেগে গেছে, আবিরের মেজাজ তুঙ্গে। রাগে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। তানভির কপালে কয়েকস্তর ভাঁজ ফেলে, শক্ত করে চোখ বন্ধ করে নাকে মুখে হাত চেপে আবিরের ঝারি খাচ্ছে। বন্যা নির্বাক চোখে তানভিরের অভিমুখে তাকিয়ে আছে। ফোনের অপর পাশের মানুষটা আবির ভাইয়া এটা বুঝতে বন্যার খুব বেশি সময় লাগলো না । মেঘের অসুস্থতার কথা শুনে টানা ১৭ দিন মেঘের সাথে কোনো কথা বলেনি। অনেক চেষ্টার পর সম্পর্ক কিছুটা স্বাভাবিক হয়েছে এখন আবারও অসুস্থতার কথা শুনলে, আবির ঠিক কি করবে এটা ভেবেই বন্যা ভয় পাচ্ছে। আবির যদি আবারও কথা বন্ধ করে দেয় তখন মেঘের ই বা কি হবে! তানভির আর একটা শব্দও বলে নি। আবির নিজের মতো বেশকিছুক্ষণ চেঁচিয়ে কল কেটে দিয়েছে। এ অবস্থায় আবিরের করণীয় কিছুই নেই। তানভির চোখ মুখ মুছে স্বাভাবিক কণ্ঠে শুধালো, “বনুর কি হয়েছিলো? ” বন্যা শান্ত স্বরে সব বলল। কিছুক্ষণ পর মেঘের জ্ঞান ফিরেছে। চোখ ঘুরিয়ে আশেপাশে দেখে নিল। তবে তানভিরকে দেখেই আতঙ্কিত হলো। তানভির আবিরকে বললে আবির আর কথা বলবে না এই ভয়ে মেঘও সিঁটিয়ে গেছে। তানভির কণ্ঠ খাদে নামিয়ে শুধালো, “এখন শরীর কেমন? ঠিক আছিস?” মেঘ আস্তে করে বলল, “হ্যাঁ” কিছুক্ষণের মধ্যে মিনহাজ রিপোর্ট নিয়ে আসছে। তানভির

রিপোর্ট টা হাতে নিয়ে ভালোভাবে পড়তে লাগলো। প্রেশার স্বাভাবিকের তুলনায় অনেক কমে গেছে। সিস্টোলিক রক্তচাপ ১২০ মিলিমিটার মার্কারি থাকার জায়গায় ১০০ তে নেমে গেছে অন্যদিকে ডায়াস্টোলিক রক্তচাপ ৮০ মিলিমিটার মার্কারির পরিবর্তে ৬০ এ চলে আসছে। শরীরে হিমোগ্লোবিনও স্বাভাবিকের তুলনায় কিছুটা কমে গেছে। খাওয়া দাওয়ার অনিয়ম, শরীরের প্রতি অযত্ন তার সাথে অতিরিক্ত মানসিক চাপ তো লেগেই আছে। সবকিছুর চাপেই সেন্স হারিয়ে ফেলেছিল। তানভির মেঘকে এক পলক দেখে গম্ভীর কণ্ঠে বলল, " তোকে আমার আর কিছুই বলার নেই।" মেঘ ঠোঁট উল্টিয়ে কাঁদো কাঁদো মুখ করে তাকিয়ে আছে। মেঘ শান্ত কণ্ঠে বলল, "বাসায় কাউকে কিছু বলো না, প্লিজ।" তানভির রাগী স্বরে বলল, " আমার তো ইচ্ছে করছে...." এটুকু বলেই থেমে গেল। সামান্য কথাতেই মেঘের দুচোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পরছে। তানভির মেঘের চোখ মুখে তপ্ত স্বরে বলল, "ঠিক আছে। বাসায় বলবো না। কিন্তু তোকেও ঠিকমতো খাওয়াদাওয়া করতে হবে। করবি তো?" "করবো।" মেঘের শরীর কিছুটা স্বাভাবিক হওয়ার পর মেঘকে নিয়ে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে গেছে। তানভির আর বন্যা দুজন মেঘের দু'পাশে হাঁটছে। মিনহাজ, তামিম আর সাদিয়া তাদের পেছনে। ক্লিনিকের সামনে এসে তানভির মিনহাজ আর তামিমকে উদ্দেশ্য করে স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, "বাইকটা বাসায় দিয়ে আসতে পারবে?" "জ্বি ভাইয়া।" তানভির পকেট থেকে চাবি বের করে মিনহাজকে দিয়ে দিল। বন্যা উদ্বিগ্ন কণ্ঠে

শুধালো, “আপনারা কিভাবে যাবেন?” “আমরা রিক্সায় চলে যাব, সমস্যা নেই। ” আচমকা আয়েশার সঙ্গে দেখা। আয়েশা এদিকেই যাচ্ছিল। তানভিরের কন্ঠ শুনে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, “কি হয়েছে তানভির? ” মিনহাজরা বাইকের কাছে যেতে গিয়েও থমকালো। মেঘ কপাল গুটিয়ে মেয়েটাকে দেখছে। প্রথমদিন কেবল চোখ আর হাত-পা দেখা গেলেও আজ তার মুখও খোলা। অনেক বছর পর দেখায় আয়েশাকে চিনতে মেঘের বেশ কিছুটা সময় লাগলো। বন্যা নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে আছে, মুখে গাম্ভীর্যের ভাব। আয়েশা নিজের মতো কত কি বলছে, মেঘের খোঁজ নিচ্ছে। এদিকে মেঘ তেলে বেগুনে জ্বলছে। গায়ের জোরের অভাবে কিছু করতেও পারছে না। আয়েশা ধীর কন্ঠে বলল, “কার কি হয়েছে?” তানভির গম্ভীর কণ্ঠে বলল, “বনু অসুস্থ।” এই কথা শুনে মেয়েটা একদম উতলা হয়ে গেছে। মেঘের কাছে এগিয়ে আসতে আসতে বলল, “হায় হায়, আমার ননদের আবার কি হয়েছে?” মেঘ রাগে ফোঁস করে উঠল, “আমাকে একদম ননদ বলবেন না। এর পরিণাম ভালো হবে না বলে দিলাম। ” মেয়েটা আর একটু এগুতেই তানভির হুঙ্কার দিল, “আমার বোনকে ছোঁয়ার চেষ্টাও করবে না। ” বন্যা মুখ গোমড়া করে নিরেট দৃষ্টিতে দুই ভাই বোনের কর্মকাণ্ড দেখছে। আয়েশা এবার মোলায়েম কন্ঠে বলে উঠল, ” আমি মেঘকে ধরলে কি হবে? জান.....!” শব্দটা বলতে দেরি হয়েছে আয়েশার গালে তানভিরের শক্তপোক্ত হাতের থা*প্পড় পড়তে দেরি হয় নি। থা*প্পড়ের শব্দে উপস্থিত সবাই খানিকটা কেঁপে উঠেছে।

তানভির রাগান্বিত কণ্ঠে চিৎকার করল, " আজকের পর আর কোনোদিন আমার সামনে নাটক করতে আসবা না। শুধুমাত্র মেয়ে বলে আর আমি মেয়েদের সম্মান করি বলে আজ পর্যন্ত তোমার কোনো ক্ষতি করি নি, নয়তো বহু আগেই তানভিরের ভয়ঙ্কর রূপ দেখিয়ে দিতাম। আমায় খারাপ হতে বাধ্য করো না।" আয়েশার গালে রক্তের ছোপ ছোপ দাগ হয়ে গেছে। গালে হাত ঘষতে ঘষতে মাথা নিচু করে চলে যাচ্ছে। তামিম মিনহাজের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করল, " মেয়েটার আজ খবর আছে। তানভির ভাইয়ার হাতের থা*প্পড় যে একবার খেয়েছে একমাত্র সেই বুঝে। তুই কি বলিস?" মিনহাজ কপালে কয়েকস্তর ভাঁজ ফেলে তপ্ত স্বরে বলল, "অতীত খুব ভয়ানক জিনিস, মনে করাতে যাস না। তার থেকে বরং চল।" তানভির রিক্সার জন্য কিছুটা সামনে চলে গেছে। মেঘ ঠান্ডা কণ্ঠে বলল, " খুব তো গাল ফুলাইয়া রাখছিলি, এখন দেখছিস আমার ভাইকে? ভাইয়ার জীবনে জলজ্যান্ত এক ডানাকাটা পরী থাকতে ভাইয়া ডানাকাটা পেত্নীর প্রেমে পড়বে? জীবনেও না।" বন্যা মুচকি হেসে বলল, "এখন এত কথা না বলে নিজের যত্ন নিয়েন। আবির ভাইয়া কিন্তু ওনাকে খুব ঝাড়ছে।" মেঘ আতঙ্কিত কণ্ঠে শুধালো, " আমার অসুস্থতার কথা আবির ভাই শুনে ফেলছেন? আমি আরও না করছি যেন বাসার কাউকে না বলে। " "আবির ভাইয়া যখন কল দিয়েছে তখন তোর সেন্স ছিল না। " "আমি শেষ। আর একটা সপ্তাহ পরে সেন্স হারালে কি এমন ক্ষতি হতো। উফফফ! ভালো লাগে না।" এরমধ্যে তানভির

রিক্সা নিয়ে হাজির। বন্যার থেকে বিদায় নিয়ে তানভিরের সাথে বাসার দিকে চলে গেছে। মালিহা খানরা তখনও ড্রয়িংরুমে বসে পিঠা বানাতে ব্যস্ত। মেঘকে দেখে হাসিমুখে বললেন, "মেঘ, ফ্রেশ হয়ে তাড়াতাড়ি নিচে আয়। পিঠা বানাতে হবে। " মেঘ কিছু বলার আগেই তানভির পেছন থেকে বলল, "বনুকে পিঠা বানাতে বলো না বড় আম্মু। ওর এখন ঘুমানো প্রয়োজন। " আকলিমা খান প্রশ্ন করলেন, "তোমার হাতে কি তানভির? " তানভির স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, " তেমন কিছু না। ফল আর কিছু খাবার।" "ফল তো বাসায় আছে।" "এগুলো শুধু বনুর। এখানে কেউ যেন হাত না দেয়। আর হ্যাঁ এগুলো যেন দুদিনের মধ্যে শেষ হয়।" শেষ কথাটা মেঘের দিকে তাকিয়ে বলেছে। মেঘ চোখ সরিয়ে নিজের রুমে গিয়ে ফ্রেশ হয়েই শুয়ে পরেছে। শরীর এখনও বেশ দূর্বল। সারাক্ষণই মাথা ঘুরাচ্ছে। ফোন হাতে নিয়ে আবিরকে কল দিতে গিয়েও থেমে গেছে। ২-৩ ঘন্টা ঘুমিয়ে প্রায় ৪ টার দিকে সজাগ হয়েছে। ঘুম ভাঙতেই সবার আগে ফোন চেক করল কিন্তু আবিরের মেসেজ,কল কিছুই আসে নি। মেঘ বুক ফুলিয়ে শ্বাস টেনে ভয়ে ভয়ে কল দিল। ১০ থেকে ১২ সেকেন্ড রিং হওয়ার পর আবির কল রিসিভ করল। মেঘ অত্যন্ত মৃদু স্বরে বলল, "আসসালামু আলাইকুম। " "ওয়ালাইকুম আসসালাম।" "কি করছেন?" "কিছু না।" "খেয়েছেন?" "না।" "কেনো?" "খেতে ইচ্ছে হয় নি।" "আপনি কি রাগ করেছেন?" "জানি না।" " বিশ্বাস করুন, আমি ইচ্ছে করে সেন্স হারায় নি। " "জানি।" "তাহলে এমন করছেন কেনো?" "এমনি।"

মেঘ এবার শীতল কণ্ঠে শুধালো, “আবির ভাই, আপনি কবে আসবেন?” “জানি না।” মেঘ ঠান্ডা কণ্ঠে বলল, “ঠিক আছে, রাখি।” আবিরের নিরুদ্বেগ জবাব, “ইচ্ছে।” বন্যা বিকেলে টিউশন শেষ করেই তানভিরকে কল দিল। অনেকদিন যাবৎ তানভিরের সাথে ঠিকমতো কথায় হয় না বন্যার। দেখা হলেও রেগে থাকে সবসময়। আজ আয়েশার প্রতি তানভিরের এমন আচরণ দেখে বন্যার মনে কিছুটা আশার আলো ফুটেছে। বন্যা এতদিন পর নিজে থেকে কল দিয়েছে এই খুশিতে তানভির শুয়া থেকে লাফিয়ে উঠেছে। তৎক্ষনাৎ কল রিসিভ করল। বন্যা স্বাভাবিক কণ্ঠে প্রশ্ন করল, “এইযে ভিলেন, আপনি কি ফ্রী আছেন?” তানভির নিঃশব্দে হেসে বলল, “৫০০% ফ্রী আছি। বলো..” বন্যা মুচকি হেসে বলল, ” আপনার বোনকে ফোনে পাচ্ছি না। তার খোঁজ নিতে কল দিয়েছি।” তানভিরের হাসিমুখ পুনরায় গম্ভীর হয়ে গেছে। শ্বাস ছেড়ে বলল, ” এজন্যই কল দিয়েছো?” বন্যা ঠোঁটে হাসি রেখে উল্টো প্রশ্ন করল, ” কল দেয়ার আর কোনো কারণ আছে নাকি?” তানভির গুরুতর কণ্ঠে জবাব দিল, “না, আচ্ছা বাদ দাও। ওয়েট বনুকে ডেকে দিচ্ছি।” “আপনি কি করছিলেন?” তানভির মৃদু হেসে ঠাট্টার স্বরে বলল, ” কল্পনা করছিলাম।” “কি?” ” বলা যাবে না। নাও বনুর সাথে কথা বলো।” মেঘকে ফোন দিয়ে তানভির চলে গেছে। ২-৩ দিন যাবৎ আবিরের সঙ্গে মেঘের তেমন কথায় হয় না। মেসেজ দিলে আবির হ্যাঁ,হু, আচ্ছা, জানি না বলেই রিপ্লাই করে। কল দিলে এমনভাবে কথা বলে যেন

তার কথা বলার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই। মন খারাপ করে মেঘও তেমন কল দেয় না। সারাদিন খাওয়া আর ঘুম ছাড়া মেঘের আর কোনো কাজ ই নেই। মাঝে মাঝে বন্যার সাথে একটুআধটু দুষ্টামি করে। সন্ধ্যার দিকে তানভির বাসা থেকে বের হলেই মেঘ রান্না করতে চলে যায়। টুকটাক রেপিসি ট্রাই করে আর মীম, আদিকে নিয়ে খায়। আজ সকাল থেকে আবিরকে বেশ কয়েকবার কল দিয়েছে কিন্তু আবির নেটে নেই, ফোনও বন্ধ। এদিকে তানভিরও বাসায় নেই। মেঘ একে একে সবার নাম্বার থেকেই চেষ্টা করেছে কিন্তু আবিরের নাম্বার বার বার বন্ধ বলছে। ঘড়িতে তখন বিকেল ৪ টা বেজে ২৬ মিনিট। মেঘ গভীর ঘুমে নিমগ্ন, নিঃশ্বাস এলোমেলো। বুকের উপর রাখা ফোনটাকে জড়িয়ে ধরে স্বপ্নদেশে পারি দিয়েছে। মলিন চেহারা, চোখের কার্নিশে স্পষ্ট পানির দাগ দেখা যাচ্ছে। আবির মায়াবী দৃষ্টিতে মেঘের ঘুমন্ত আদলে চেয়ে আছে, বুকের ভেতর অনবরত ধ্রিম ধ্রিম কম্পন হচ্ছে। প্রায় পাঁচ মাস পর আবিরের বক্ষপিঞ্জরে আবদ্ধ হৃদয়টা স্বস্তি পেয়েছে। এতদিন পর নিজের প্রেয়সীকে এত কাছে পেয়েছে। আবির এক দৃষ্টিতে মেঘকে পরখ করছে, আপাদমস্তক দেখে ঘুমন্ত মেঘের পাশে বসে অতি সন্তর্পণে বুকের উপর থেকে আলতোভাবে ফোনটা তুলে নিল। হোম স্ক্রিনে নিজের ছবিটা দেখে মলিন হেসে ফোনটা এক পাশে রেখে দিয়েছে। চোখের কার্নিশে জমে থাকা অশ্রু মোলায়েম হাতে মুছে পরপর মেঘের কপালে, গলায় হাত রেখে জ্বর পরীক্ষা করছে। কিছুটা সময় নিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিল। হৃদয়ের অন্তঃস্থলে জাগ্রত

প্রেমানুভূতিতে আর চাপিয়ে রাখতে পারছে না। আনমনে মেঘের অদৃষ্টে ঠোঁট ছোঁয়াল। গাল ভর্তি আবিরের খোঁচা খোঁচা দাঁড়ির স্পর্শে মেঘের ঘুমন্ত শরীর ঝাঁকুনি দিয়ে উঠেছে। সদ্য শাওয়ার নিয়ে আসায় আবিরের গা থেকে এক অন্যরকম সুঘ্রাণ মেঘের নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করছে। মেঘ ঘুমের মধ্যেই নড়েচড়ে উঠল। আবির সঙ্গে সঙ্গে সরে গেছে, বসা থেকে উঠে কিছুটা দূরে সরে দাঁড়ালো। আবির দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে সুস্থির কণ্ঠে ডাকল, "মেঘ..." মেঘের উত্তর না পেয়ে আবির ঠোঁট কামড়ে হেসে আবারও ডাকল, " স্প্যারো...." ঘুমন্ত মেঘ আদো আদো কণ্ঠে বলল, "হুমমম!" আবিরের আঁখি যুগল প্রশস্ত হলো। ঠোঁটে হাসি রেখে এবার শক্ত কণ্ঠে বলল, " এইযে ম্যাডাম....!" মেঘ ঘুম ঘুম চোখে তাকাতেই তার স্বপ্নের রাজকুমারকে চেখের সামনে আবিষ্কার করল।আবিরকে দেখেই স্তব্ধ হয়ে গেছে। দু-চোখ যেন এখনি কোটর ছেড়ে বেড়িয়ে আসবে। মেঘ মুগ্ধ আঁখিতে প্রিয়মানুষটার মুখের পানে তাকিয়ে আছে। বরাবরের মতো হৃদয়ে তোলপাড় শুরু হয়ে গেছে। সত্যি কি কল্পনা বুঝার আগেই শুয়া থেকে এক লাফে উঠে বসলো।অকস্মাৎ এমন কান্ডে আবিরের নিঃশ্বাস আঁটকে গেছে, পরপর বুকটান করে সোজা হয়ে দাঁড়ালো। ঘুমের ঘোরে মেঘ অবাক চোখে আবিরকে দেখছে। আচমকা বসা থেকে এক লাফে আবিরকে জড়িয়ে ধরলো। ঠিক জড়িয়ে ধরা বলেনা এটাকে। মেঘের দু পা মাটি থেকে প্রায় এক হাত উপরে। আকস্মিক ঘটনায় আবির এক পা পিছিয়ে সহসা সর্বশক্তি দিয়ে মেঘকে আঁকড়ে ধরল।

আবিরের একহাত মেঘের পিঠে আরেক হাত কোমড়ের উপরে, শক্ত করে ধরে আছে। মেঘ অর্ধ ঘুমে থাকলেও আবির পুরোপুরি সজ্ঞানে আছে। আবিরের শিরা-উপশিরায় তুফান চলছে, উষ্ণ শ্বাস মেঘের উন্মুক্ত ঘাড়ে পড়ছে। দু'জনের হৃদপিণ্ডের ধুকপুকানি তীব্র থেকে তীব্র হতে শুরু করেছে, গাত্র জুড়ে অদ্ভুত শিহরণ জাগছে। মেঘের দুচোখ ছলছল করছে। ঘন ঘন শ্বাস ছেড়ে অকস্মাৎ কাঁদতে শুরু করেছে। আবির তখনও শক্ত হস্তে মেঘকে জড়িয়ে ধরে রেখেছে। মেঘ কোন ঘোরে আঁটকে আছে সে নিজেও বুঝতে পারছে না। কাঁদতে কাঁদতে নিজের মনিকোঠায় জমে থাকা অভিযোগগুলো ব্যস্ত কণ্ঠে জাহির করছে। মেঘ কাঁদতে কাঁদতে আর্তনাদ করে উঠল, " আপনি এত নিষ্ঠুর কেনো?" মেঘ কি ভেবে হঠাৎ আবিরকে ছেড়ে দিয়েছে। আবিরও আস্তে আস্তে ছাড়লো। মেঘের দুপা আবিরের বৃহৎ পদযুগলের উপর পরলো। আবির মেঘকে জড়িয়ে ধরে রেখেই সম্পূর্ণ ঘুরিয়ে মেঘকে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড় করালো। তাৎক্ষণিক ঘটনায় মেঘের মস্তিষ্ক পর্যন্ত এলোমেলো হয়ে গেছে। আবির ডানহাতের বৃদ্ধাঙ্গুল দিয়ে মেঘের চোখের পানি মুছে কণ্ঠ খাদে নামিয়ে আস্তে করে বলল, " সরি, আর কখনো নিষ্ঠুরের মতো আচরণ করব না।" কাঙ্খিত ব্যক্তি কোমল কণ্ঠের জবার শুনে মেঘ নিশ্চুপ হয়ে গেছে। মেঘের পা তখনও আবিরের পায়ের উপর। আবির এগুতেই মেঘ পেছাতে চেষ্টা করল। কিন্তু কয়েক ইঞ্চির গ্যাপ মুহুর্তেই ফুরিয়ে গেল। আবির মাথা নিচু করে মেঘের কানের কাছে মুখ নামিয়ে এনে পাতলা অধর নেড়ে বিড়বিড়

করে বলল, " খুব তো মিস ইউ, মিস ইউ করছিলেন । তা ঠিক কতটুকু মিস করেছেন দেখি?" মেঘের ঠোঁট কাঁপছে ফিনফিন করে, মুখ দিয়ে কোনো কথায় বের হচ্ছে না। ক্ষণিকের জন্য ভেতরটা অনুভূতিশূন্য হয়ে গেছে। আবিরের উষ্ণ শ্বাস প্রশ্বাস মেঘের ঘাড়ে পড়ছে। আবির মুখ তুলে মেঘের নিরুদ্বেগ চেহারার পানে তাকালো। আবিরের এক হাত তখনও মেঘের পিঠ আঁকড়ে ধরে আছে। অন্য হাতে দিয়ে মেঘের এলোমেলো চুলগুলো ঠিক করে, মেঘের ডানহাতটা আবিরের বুকের বা পাশে শক্ত করে চেপে ধরে বলল, " তোর শূন্যতায় আমার অনুভূতির দেয়াল ভেঙেচুরে তছনছ হয়ে গেছে। আমার ভগ্ন হৃদয়ের কম্পন কি তুই টের পাচ্ছিস? বুঝতে পারছিস কতটা মিস করেছি তোকে?" আবিরের হৃৎস্পন্দন অস্বাভাবিক তীব্র, আবিরের বক্ষঃস্থলে হাত রাখায় মেঘের সর্বাঙ্গে কম্পন শুরু হয়ে গেছে। চিরচেনা মানুষটার গায়ের গন্ধ, স্পর্শ, মায়াবী কণ্ঠ, নেশাক্ত দৃষ্টি সবেতে মেঘ মাতাল প্রায়। কয়েক মুহুর্তের মধ্যে ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ের হাহাকার অশ্রু রূপে গড়িয়ে পরলো। মেঘের হাত আর পিঠ ছেড়ে আবির এবার শান্ত হস্তে মেঘের দু'চোখ মুখে কণ্ঠ দ্বিগুণ ভারি করে বলল, "আজকের পর আমার কারণে তোর চোখ থেকে এক ফোঁটা পানিও পড়তে দিব না আমি, প্রমিস।" কথাটা বলতে বলতে মেঘের কপালে দীর্ঘ এক চুমু দিল। ওমনি মেঘ পাথর বনে গেছে। আবিরের পায়ের উপর থেকে মেঘের পা সরে গেছে। অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনায় মেঘের শ্বাসনালীতে তুফান শুরু হয়ে গেছে। দুচোখ পূর্বের তুলনায়

দ্বিগুণ প্রশস্ত হয়ে গেছে। প্রায় দুই বছরের জমে থাকা অনুভূতিগুলো এলোপাতাড়ি ছুটছে। মেঘের এলোমেলো নিঃশ্বাস আবিরের বুকে লাগছে। প্রায় মিনিট খানেক পর আবির কিছুটা সরে দাঁড়ালো। মেঘ নিস্তব্ধ হয়েই দাঁড়িয়ে আছে। আবির শেষবারের মতো মেঘের চোখ মুখ মুছতে মুছতে শক্ত কণ্ঠে বলল, " আজ এই মুহূর্ত থেকে তোর চোখে সুখের অশ্রু ব্যতীত আমি আর কিছুই দেখতে চাই না। " মেঘকে ছেড়ে চলে যেতে নিয়ে আবার থমকালো। কোমল কণ্ঠে বলল, "তোর গিফট টেবিলে রাখা আছে।" আবির মেঘের দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হেসে গুনগুন করতে করতে বেড়িয়ে গেছে, "সাত সাগর আর তের নদী পার হয়ে তুমি আসতে যদি রূপকথার রাজকুমার হয়ে আমায় তুমি ভালবাসতে যদি।" মেঘ নির্বাক চোখে আবিরের পানে তাকিয়ে আছে। মেঘ দেয়ালে গা এলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এগুলো স্বপ্ন, কল্পনা নাকি বাস্তব কিছুই বুঝতে পারছে না। কয়েক মুহূর্ত হতবাক থেকে আচমকা বিছানায় শুয়ে পরলো। শরীরের দূর্বলতার কারণে কিছু সময়ের মধ্যে আবারও ঘুমিয়ে পরেছে। ঘন্টাখানেক পর হঠাৎ হৈচৈ এর শব্দে মেঘের ঘুম ভাঙে। শুয়া থেকে উঠে আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে চোখ পরে টেবিলের দিকে। টেবিলের উপর একটা গিফ্ট বক্স রাখা। মেঘ হকচকিয়ে উঠে বক্সটার কাছে এগিয়ে গেল। তৎক্ষনাৎ এক ঘন্টা আগের ঘটনাগুলো মনে পড়তে লাগলো। মেঘ আনমনে বলে উঠল, "আবির ভাই কি সত্যি চলে আসছেন?" এক দৌড়ে ওয়াশরুম থেকে চোখে মুখে পানি দিয়ে, মুখ ঠিকমতো না মুছেই ছুটলো।

আশপাশ না তাকিয়ে অন্তহীন পায়ে ছুটে আচমকা সিঁড়ি এসে থামলো।আবির নিচ থেকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। আবিরের এমন দৃষ্টি দেখে মেঘ হতভম্ব হয়ে গেছে। চোখ নামিয়ে ধীর গতিতে নামতে শুরু করল।মীম আর আদি গিফট নিয়ে কাড়াকাড়ি করছে। মেঘ কাছাকাছি আসতেই আবির সস্নেহে জিজ্ঞেস করল, " কেমন আছিস?" কিছুটা দূরেই হালিমা খান আর মালিহা খান দাঁড়ানো। মেঘ চোখ তুলে তাকাতেই চোখাচোখি হলো দুজনের। আবিরের দুচোখে শাণিত প্রেমানুভূতি, যা লুকাতে অক্ষম সে। মেঘ মায়াবী দৃষ্টিতে তাকিয়ে মোলায়েম কণ্ঠে বলল, "আলহামদুলিল্লাহ ভালো। আপনি কেমন আছেন?" "আলহামদুলিল্লাহ। " হালিমা খান বলে উঠলেন, "সেই কখন আসছিস, এখনও কিছু খাস নি। আগে থেকে জানিয়েও আসিস নি।। কি খাবি বল" আবির মেঘের দিকে তাকিয়ে থেকেই শান্ত স্বরে বলল, " শুনলাম তোমার মেয়ে পাকোড়া বানাতে এক্সপার্ট। জিজ্ঞেস করো আমাকে বানিয়ে খাওয়াবে কি না!" হালিমা খান হেসে বললেন, "এ আবার কেমন কথা, তোকে খাওয়াবে না কেনো! এই মেঘ আয়।" মালিহা খান তপ্ত স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, " রাতে কি খাবি?" আবির সরল কণ্ঠে বলল, "তোমার যা ইচ্ছে তাই রান্না করো। " মালিহা খান আবারও বললেন, "তুই আসবি এটা আগে জানাস নি কেনো?তোর রুমটা পরিষ্কার করা হয় নি। সেদিন তানভির দেখলাম কোনোমতে পরিষ্কার করেছে।" আবির মলিন হেসে বলল, "সমস্যা নেই। আমি সবকিছু পরিষ্কার করেছি।" আবির সোফায় হেলান

দিয়ে বসে আছে। মেঘকে পাকোড়া নিয়ে আসতে দেখে ইচ্ছেকৃত গান শুরু করল, “সাত সাগর আর তের নদী পার হয়ে তুমি আসতে যদি...” মেঘ মুখ ফুলিয়ে সূক্ষ্ম নেত্রে তাকাতেই আবির অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে। মেঘ মুখ ফুলিয়ে শ্বাস ছেড়ে বলল, ” আজ আসবেন এটা আগে জানালেন না কেনো?” “জানালে কি সারপ্রাইজ থাকতো?” মেঘ ভেঙচি কেটে বিড়বিড় করে বলল, ” সারপ্রাইজ দিতে কে বলছিল আপনাকে?” আবির গম্ভীর কণ্ঠে শুধালো, “দুদিন পর পর অসুখ বাঁধাতে কে বলছিল আপনাকে?” এরমধ্যে আলী আহমদ খান বাসায় আসছেন। ওনাকে দেখেই মেঘ দ্রুত রান্নাঘরে চলে গেছে। আবির এগিয়ে গিয়ে আব্বুকে সালাম করল। ঘন্টাখানেক পর তানভির আসছে। আবিরকে দেখেই জড়িয়ে ধরে বলল, “ভাই আমি ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত। ” আবির মুচকি হেসে জানাল, ” অফিসিয়ালি দায়িত্ব নেয়ার আগ পর্যন্ত আর একটু সহ্য করে নে।” আজ অনেকদিন পর সবাই একসঙ্গে খেতে বসেছে। যদিও মোজাম্মেল খান বাসায় নেই। ইকবাল খান আজই বাসায় এসেছেন। আলী আহমদ খান ভারী কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, “তোমার না আরও তিনদিন পর আসার কথা ছিল?” “জ্বি আব্বু। কিন্তু কাজ শেষ হয়ে গেছে তাই চলে আসছি। ” “সব কাজ শেষ নাকি আবারও যেতে হবে?” “শেষ।” আবির প্রশ্ন করল, “সিফাতের ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত নিয়েছেন?” ” আগামীকাল জয়েন করবে। ” আবির উদ্বিগ্ন কণ্ঠে শুধালো, ” আপনি কি আপনার সিদ্ধান্তে অটল থাকবেন?” কাকামনি আবিরের দিকে একপলক তাকিয়ে

শান্তস্বরে বললেন, “ভাইজান, আমারও মনে হচ্ছে এই কাজটা করা ঠিক হচ্ছে না। ” আলী আহমদ খান খাওয়া শেষ করে উঠে যেতে যেতে বললেন, ” মানুষকে ভালো হওয়ার সুযোগ করে দিতে হয়।” আবির এবার ঠান্ডা কণ্ঠে হুঙ্কার দিল, ” যদি তার কারণে কখনো কোম্পানির উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে তখন কেউ আমাকে বাঁধা দিতে আসবেন না। ” আলী আহমদ খান চলে গেছেন। ইকবাল খান দু একটা কথা বলে নিজেও ওঠে গেছেন। আবির আর তানভির নিজেদের মধ্যে টুকটাক কথা বলছে। মেঘ খেতে খেতে বার বার আবিরকে দেখছে। আগের তুলনায় আবির একটু মোটা হয়েছে। দেখতেও কিছুটা ফর্সা লাগছে। মেঘ মিটিমিটি হাসছে আর খাচ্ছে। হঠাৎ আবিরের নজর পড়তেই ভ্রু নাচালো। মেঘ থতমত খেয়ে চোখ নামিয়ে নিল। খাওয়াদাওয়া শেষ করেই আবির ঘুমাতে চলে গেছে। আজ সিফাত নামক ছেলেটা জয়েন করবে। আবির, আলী আহমদ খান আর ইকবাল খান তিনজন ই অফিসে আছে। সিফাত এসে আলী আহমদ খান আর ইকবাল খানের সাথে কথা বলে আবিরের মুখোমুখি হলো। আবির কপাল কুঁচকে সূক্ষ্ম নেত্রে তাকিয়ে আছে। সিফাত গুরুগম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন করলো, “আপনি ই তাহলে সাজ্জাদুল খান আবির?” “জ্বি। কোনো সমস্যা? ” সিফাত হেসে বলল, ” না। আংকেলের মুখে আপনার কথা অনেক শুনেছি তাই জিজ্ঞেস করলাম।” আবির গম্ভীর কণ্ঠে বলল, “অফিসে স্যার বলতে শিখুন।” “সরি, স্যার।” আবির ভ্রু কুঁচকে বলল, ” নিজের কাজে মনোযোগ দেন।”

আবির চলে গেছে। সিফাত নিরেট দৃষ্টিতে আবিরের দিকে তাকিয়ে আছে। এদিকে মোজাম্মেল খান একের পর এক কল দিয়েই যাচ্ছেন। আবির নিজের কেবিনে গিয়ে কল রিসিভ করতেই মোজাম্মেল খান রাশভারি কণ্ঠে শুধালেন, "আটকাতে পেরেছো?" "না।" "আমি জানতাম। তোমার আব্বুকে আমি খুব ভালোভাবে চিনি। ওনি যা বলবেন তাই করবেন। কিন্তু তাই বলে শত্রুর সাথে হাত মেলাবেন?" আবির নিরুদ্বেগ কণ্ঠে জবাব দিল, "কিছু করার নেই চাচ্চু। এখন আমাদেরকেই সাবধানে থাকতে হবে। " আবির বিকেল দিকে নিজের অফিসে আসছে। রাকিব, রাসেলের সাথে অনেকদিন পর দেখা। অফিসের কাজ শেষে সবাইকে ছুটি দিয়ে তিন বন্ধু গল্প করতে বসেছে। অনেকদিনের জমানো কথা, অফিসের বিভিন্ন কাজ, পার্সোনাল লাইফ সব বিষয়েই গল্প চলছে। রাসেল হঠাৎ প্রশ্ন করল, "আবির, বিয়ে কবে করছিস?" আবির মলিন হেসে জবাব দিল, " করবো করবো।" "সেটা কবে? আর তোর শ্বশুর আসবে কবে?" "আমার শ্বশুর আসলেই ধামাকা হবে।" "কোনো? " "৬ মাস সময় যে ঘনিয়ে আসছে।" রাকিব উদ্বিগ্ন কণ্ঠে শুধালো, "তুই কি ভেবেছিস? বাসায় আগে কথা বলবি? নাকি মেঘকে আগে জানাবি?" " মেঘকে জানিয়ে তারপর বাসায় বলব। তবে সেটা একই দিনে। আমি ওকে কোনো প্রতিশ্রুতি দিব না। ডিরেক্ট বিয়ের অফার দিব আর ঘুম থেকে উঠলেই বাড়িতে বিয়ের আমেজ থাকবে। " এরমধ্যে মেঘের কল আসছে। রাসেল উঁকি দিয়ে নামটা দেখে একগাল হেসে বলল, "ওনার নাম

নিতেই কল চলে আসছে। ওনি অনেকদিন বাঁচবেন। ” আবির মুচকি হেসে উত্তর দিল, “বাঁচতে তো হবেই। ওর কিছু হলে আমি যে বেঁচে থেকেও ম*রে যাব। ” আবির কল রিসিভ করে মৃদুস্বরে বলল, “সারাদিনে এই মনে পড়ল?” মেঘ গাল ফুলিয়ে শ্বাস ছেড়ে বলল, “আপনিও তো কল দেন নি। ফুপ্পিরা বাসায় এসে আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন। আপনার কি আসতে দেরি হবে?” “না। এখনি আসতেছি।” আবির তাদের থেকে বিদায় নিয়ে যেই উঠতে যাবে রাকিব আনমনে ডাকল, “আবির..” “বল” “তোর আব্বু যদি সত্যি সত্যি মেনে না নেয় তখন কি করবি?” আবির দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে রাশভারি কণ্ঠে জবাব দিল, ” ম*রে যাব।” রাসেল বলল, “ফাজলামি করিস না। সিরিয়াসলি বল” আবির অগ্নিদৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, “তোদের কি মনে হচ্ছে আমি ফাজলামি করতেছি? আব্বু চাচ্চু সহজে মেনে নিলে ভালো, যদি বলে মেঘকে নিয়ে বাড়ি থেকে চলে যেতে তাহলে আরও ভালো। কিন্তু যদি বলে মেঘকে রেখে একা বেড়িয়ে যেতে তারপর কি হবে আমি জানি না। তবে এটায় সত্যি যে মেঘকে না পেলে, আমি ম*রে যাব।” আবির বাসায় ফিরতেই আবিরের ফুপ্পি আবিরকে ডেকে নিয়ে গেছেন। মাহমুদা খান চিন্তিত স্বরে জানতে চাইলেন, “কি সিদ্ধান্ত নিয়েছিস? বাসায় কবে বলবি?” “৮-১০ দিনের মধ্যেই বলল।” “তোর আব্বু কিন্তু তোর উপর ভীষণ রেগে আছেন। সেদিন অনেককিছু বলতেছিল, সাবধান।” “তুমি কিসের জন্য এত ভয় পাচ্ছো? বাড়ি থেকে বের করে দিবে এই ভয়?” “সম্পর্ক ছিন্ন করার ভয় পাচ্ছি।”

আবির মলিন হেসে বলল, ” ওনি যতবার সম্পর্ক ছিন্ন করবেন আমি ততবার নতুন করে সম্পর্ক মজবুত করব। প্রয়োজনে সুপার গ্লু দিয়ে সম্পর্ক জোড়া লাগাবো। যাই হয়ে যাক না কেন, গ্লু নষ্ট হবে না।” “সিরিয়াস বিষয় নিয়েও তুই মজা করছিস?” আবির ফুপ্পির দিকে তাকিয়ে গুরুভার কণ্ঠে ডাকল, “ফুপ্পি” “হ্যাঁ বল।” “আমি যদি মা*রা যায় তুমি কি আমায় মিস করবা?” মাহমুদা খান আবিরের কান চেপে ধরে রাগান্বিত কণ্ঠে বললেন, “তোর সাহস কতটুকু হয়ছে যে তুই আমার সামনে দাঁড়িয়ে মরা*র কথা বলিস।” আবির আর্তনাদ করে উঠল, “সরি ফুপ্পি, সরি। আর বলবো না।” আবির বাসায় ফিরেছে তিনদিন হলো। মোজাম্মেল খান এখনও বাসায় ফিরেন নি। আজ শুক্রবার হওয়ায় তানভির, আবির দু’জনেই বাসায়। গত ৫ মাসে মেঘের সাথে কথা বলতে বলতে বৃহস্পতিবারের রাত জাগার অভ্যাস টা একদম কেটে গেছে। আবির সকালের নাস্তা করে সেই যে রুমে গেছে, আর বের হওয়ার নাম নেই। বাড়িতে আসার পর থেকে মেঘের সাথে কথাও কমে এসেছে। চোখের ইশারায় টুকটাক দুষ্টামি করলেও মুখে কিছুই প্রকাশ করে না। ১১ টার দিকে মেঘ আবিরের রুমের সামনে আসছে। আবির দুচোখ বন্ধ চুপচাপ শুয়ে আছে। মেঘ পা টিপে টিপে রুমে ঢুকে আবিরের বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে অপলক দৃষ্টিতে আবিরকে দেখছে। অকস্মাৎ আবির বলে উঠল, ” একটা অবোধ বালকের দিকে কুনজর দিতে আপনার লজ্জা লাগে না?” মেঘ ভেঙচি কেটে জবাব দিল, “কে অবোধ? আপনি?” “তা নয়তো কে? কেনো

আসছিলেন?” মেঘ ঠান্ডা কণ্ঠে বলল, ” আসার পর থেকে দেখছি যতক্ষণ বাসায় থাকেন ততক্ষণ আপনি রুম থেকে বের ই হোন না, কারো সাথে কথা পর্যন্ত বলেন না। কি হয়েছে আপনার?” আবির শুয়া থেকে উঠে বসে মুচকি হেসে বলল, ” ভাবছি ঘরে বসে থেকে কয়েকদিনেই আপনার মতো একটু সুন্দর হয়ে যাব।” মেঘ স্ব শব্দে হেসে বলল, ” পারবেন না। ” “কেনো?” “এমনি।” আবির বসা থেকে উঠে রুম থেকে বের হতে হতে বলল, “ওয়েট, আজ রূপচর্চা করে হলেও সুন্দর হয়েই ছাড়বো । ” মেঘ হাসতে হাসতে বলল, “আপনাকে সুন্দর হতে হবে না। আপনি এমনেই সুন্দর আছেন।” আবির ঠোঁট চেপে হেসে বেড়িয়ে গেছে। তানভিরের রুম থেকে তানভিরকেও টেনে নিয়ে গেছে। ফ্রিজ থেকে দুটা শসা বের করে ঠান্ডা শসায় কেটে চোখে দিয়ে বসেছে। সাথে একটা ন্যাচারাল প্যাক বানিয়েও মুখের লাগিয়েছে। সামনে প্লেটে আবির আরও কিছু শসা কেটে রেখেছে। তানভির চোখের শসা রেখেই হাত বাড়িয়ে একটা একটা করে সব খেয়ে ফেলছে।ওদের কান্ড দেখে মেঘ আর মীম হাসতে হাসতে ক্লান্ত হয়ে যাচ্ছে। ভিডিও করে বন্যাকেও পাঠিয়েছে। এরমধ্যে আদি আসছে। ওদের চোখ মুখ দেখে আদিও উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, “ভাইয়া তোমরা কি দিয়েছো? আমিও দিব।” মেঘ শান্ত কণ্ঠে বলল, “আয়, আমি তোকে দিয়ে দিচ্ছি।” আবির উদাসীন কণ্ঠে বলল, “আজ আমাদের যত্ন নেয়ার কেউ নেই বলে। ” মেঘ ঠান্ডা কণ্ঠে বলল, ” আপনারা চাইলে আমি আপনাদের ফেসিয়াল করে দিতে

পারি। ” হঠাৎ বাহিরে আলী আহমদ খানের কণ্ঠ শুনে আবির আর তানভির উঠে যে যার মতো দৌড়। যেতে যেতে তানভির বলল, ” থাক বাবা, আরেকদিন। আজকের মতো পালায়।”তানভির নিজের রুমে পড়তেছে, যদিও পড়াশোনার প্রতি তার প্রবল বিতৃষ্ণা কিন্তু কিছু করার নেই। আবিরের সাপোর্ট, মেঘের জেদ, বন্যাকে নিজের করে পাওয়ার ইচ্ছে, আর এই সবকিছু পূরণ করতে পড়াশোনার কোনো বিকল্প নেই। আগামী সপ্তাহে কোচিং এ ভর্তি হবে তাই আগে থেকেই বই গুলো একটু দেখে নিচ্ছে। হঠাৎ আবির দরজায় দাঁড়িয়ে মৃদুস্বরে বলল, “আসবো?” “আসো। তোমার আবার অনুমতি নিতে হয় নাকি!” আবির দরজা চাপিয়ে বিছানায় বসে গম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন করল, ” এই পড়াশোনা কতদিন চলবে? ” তানভির চোখ নামিয়ে শান্ত কণ্ঠে বলল, ” আমি সরকারি চাকরি করতে চাই।” “চাকরি করতে তোকে বারণ করছি না। কিন্তু চাকরি পেতে গেলে যতটা শ্রম আর চেষ্টা করতে হবে, ততটা পরিশ্রম করার ধৈর্য কি তোর আছে?” “আমি চেষ্টা করব।” আবির চাপা স্বরে বলতে শুরু করল, “দেখ তানভির, আমি আজ পর্যন্ত তোকে কোনোকিছুতে বারণ করি নি। তুই যখন যা চেয়েছিস নিজের সামর্থ্য না থাকলেও কোনো না কোনোভাবে ম্যানেজ করে দিয়েছি। রাজনীতি করতে চেয়েছিস আমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও তোর খুশির জন্য রাজি হয়েছিলাম। ইদানীং তুই সিদ্ধান্ত নিয়েছিস রাজনীতি করবি না, আমি তাতেও সম্মতি দিয়েছি। এখন তুই পড়াশোনা করতে চাচ্ছিস, আমার এতেও কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু কথা হলো তোর

নিজের উপর কনফিডেন্স আনতে হবে। যতবার ভেঙে পরবি ততবার নিজেকে নিজের সাহস দিতে হবে। পারি না, মনে থাকে না, পারবো না এগুলো কমন কথা কিন্তু এগুলোর সাথে আরেকটা কথা আছে,' আমাকে পারতেই হবে' যদি এই কথাটা মাথায় রাখিস তবেই তুই সফল হতে পারবি। ধৈর্য আর পরিশ্রম একদিন সফলতা এনে দিবেই। " তানভির গুরুভার কণ্ঠে বলল, " আমার সিদ্ধান্ত আর নড়চড় হবে না। আল্লাহ সহায় থাকলে আমি সরকারি চাকরি নিয়েই ছাড়বো, ইনশাআল্লাহ। " "ইনশাআল্লাহ। আরেকটা কথা বলব?" "বলো।" "বন্যার প্রতি তোর ইমোশন কি সত্যি নাকি এতেও দুটানা আছে? এখনও সময় আছে তুই ভেবে দেখতে পারিস। পড়াশোনা, রাজনীতি, ক্যারিয়ার, জব এগুলো তোর মন পছন্দে পরিবর্তন করতে পারলেও ভালোবাসা, ইমোশন কখনো পরিবর্তন করা যায় না। বন্যার প্রতি প্রেমানুভূতি যদি না থাকে তাহলে আগেই দূরে সরে যা। নষ্ট করলে নিজের জীবনটায় নষ্ট করিস, আরেকটা নিষ্পাপ জীবনকে জরিয়ে তাকে কষ্ট দিস না। " তানভির চিবুক নামিয়ে তপ্ত স্বরে বলল, "আমি সত্যি সত্যি বন্যাকে ভালোবাসি। তুমি বিশ্বাস করো। হয়তো তোমার মতো এত ভালোবাসতে পারি না কিন্তু আমার জায়গা থেকে আমি ওকে সবটুকু দিয়ে ভালোবাসতে চাই।" আবির কণ্ঠ দ্বিগুণ ভারি করে বলল, " অতীত এসে মানসিকভাবে বিরক্ত করবে না তো?" "আমার জীবনে অতীত বলতে কিছু নেই। আমি বর্তমান নিয়ে ভালো আছি আর আমি বর্তমান নিয়েই ভালো থাকতে চাই। " "গুড। শুনলাম

সেদিন তোর এক্সকে থা*প্পড় মে*রেছিস। তারপর কি দেখা হয়েছিল?” তানভির আঁতকে উঠে বলল, “তুমি কিভাবে জানো? আমি তো বনুকে জানাতে বারণ করেছিলাম। বলে দিয়েছে তোমায়?” “ওহ আচ্ছা। তাহলে তোর বোনও জানে? এখন থেকেই আমার কাছে কথা লুকানো শেখাচ্ছিস?” “তুমি ভুল বুঝো না প্লিজ। ঐ মেয়ের কথা শুনলে তুমি রাগ করতা তাই বলি নি। আর আমি নিজেও এই বিষয়টাকে পাত্তা দিতে চায় নি। কিন্তু সেদিন হাসপাতালে বন্যার সামনে জান ডাকছিল, তাই রাগে থা*প্পড় মেরেছিলাম।” আবির ভ্রু কুঁচকে সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে উঠল, “জান..! সম্পর্ক এতদূর চলে গেছিলো?” “ছিঃ নাহ। এই মেয়ে জীবনেও জান ডাকে নি আমায়। তুই তোকারি করেই সময় কাটতো না আবার জান।। বন্যাকে দু’দিন আমার সাথে দেখেছে হয়তো সন্দেহ করছে তাই এমনভাবে কথা বলছিল। ” আবির শান্ত স্বরে বলল, “তুই কি জানিস বন্যাকে রাস্তায় ডেকে ঐ মেয়ে একদিন তোর সম্পর্কে কথা বলেছে?” “কি? কবে? আমি কিছু শুনি নি তো। বন্যাও কিছু বলে নি। তুমি কিভাবে জানো?” “বন্যা কেনো তোকে বলবে? বন্যা কি তোর গার্লফ্রেন্ড? প্রপোজ করেছিস ওকে?” “সাহস ই পায় না। যদি রিজেক্ট করে দেয়। কিন্তু তোমাকে ঐ কথা কে বলছে?” “সানি বলছে। সানির বাসার কাছেই বন্যা টিউশন পড়াতে যায়। বন্যার সাথে ঐ মেয়ে কথা বলার সময় সানি পাশ দিয়ে যাচ্ছিলো তখন তোর কথা শুনে দাঁড়িয়েছে আর যতটা শুনেছে সবটায় আমায় বলেছে। ” “এটা তুমি আমায় আগে

বললা না কেনো? ঐ মাইরারে এখন মাটিতে কু*পতে ইচ্ছে করছে। একেই বন্যাকে মানাতে পারছি না তারউপর আরেক যন্ত্রণা হাজির। আমি এখন কি বলবো?" "তোর এক্সের কথা জানে সে?" "বনু বলেছে কি না জানিনা কিন্তু আমি এখনও কিছু বলি নি।" "তোর উচিত বন্যাকে সবকিছু জানানো। তারপর তোর প্রতি তার কি অনুভূতি প্রকাশ পায় সেটায় দেখার বিষয়। " "আচ্ছা, ঠিক আছে।" আবির উঠে যেতে যেতে আবারও বলল, "লাস্ট বার বলছি, ডিসিশন নেয়ার আগে আবারও ভাব। একটা মেয়ের জীবন সম্পূর্ণ তোর হাতে। তুই ভালো হলে মেয়েটা সুখী হবে আর তুই খারাপ মেয়ে দুঃখী। ভাব ভাব সারারাত ভাব, প্রয়োজনে দুরাত না ঘুমিয়ে তারপর ভাব।" আজ শনিবার, মোজাম্মেল খান বাসায় ফিরেছেন। চাচ্চুর সাথে দেখা করতে আবির আজ একটু তাড়াতাড়িই বাসায় ফিরেছে। মূলত চাচ্চুর মনের অবস্থা বুঝতেই আগেভাগে এসেছে আবির। কিন্তু মোজাম্মেল খান তেমন কোনো বিষয়ে আলোচনায় করেন নি। ওনার আলোচনার টপিক প্রজেক্ট, লাভ-লস আর সিফাত। চাচ্চুর সাথে কথা শেষ করে আবির নিজের রুমে চলে গেছে। এই সময়ে অফিসে গেলেও তেমন কোনো কাজে আসবে না তাই আর বের হয় নি। নিজের রুমে বসে ল্যাপটপে কাজ করছিলো। কিছুক্ষণ কাজ করার পর বেশ ক্লান্ত লাগছে। তাই কফি করতে নিচে যাচ্ছিলো। মেঘের রুমের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় মেঘের ফোনের রিংটোনের শব্দ শুনতে পায়। বিশেষ মনোযোগ না দিয়ে আবির নিচে চলে গেছে। কফি করে নিয়ে আসার সময়

আবারও শুনতে পেল, মেঘের ফোনে কল বেজেই যাচ্ছে। আবির মেঘের রুম পেরিয়ে গেছে কিন্তু অনবরত ফোনের শব্দে আবির অবচেতন মনে ঘুরে আসলো। মেঘ রুমে আছে কি না দেখার জন্য উঁকি দিল। রুম সম্পূর্ণ ফাঁকা, টেবিলের উপর ফোনটা আপন গতিতে বেজেই চলেছে। আবির রুমে ঢুকে ফোনের দিকে তাকাতেই স্ক্রিনে বন্যার ছবি আর Baby লিখে সেইভ করা নাম্বারটা ভাসলো। আবির ভাবলো রিসিভ করে বলবে যে, মেঘ রুমে নেই। আবির স্বাভাবিক ভাবে কল রিসিভ করে বলতে নিলো তার আগেই বন্যা উত্তেজিত কণ্ঠে বলতে শুরু করল, "হাই ননদীনি, কি করতেছো তুমি? কতগুলো কল দিচ্ছি রিসিভ করছিলা না কেনো? আমার ছোট ননদ আর দেবর কি করছে?" আবির উষ্ণ স্বরে বলল, "তোমার ননদীনি সম্ভবত ছাদে, আমি তোমার ভাসুর বলছি।" বন্যা থতমত খেয়ে কাঁপা কাঁপা গলায় বলে উঠল, "আ.. আবির ভাইয়া" "জ্বি।" বন্যা নিজের কপাল চাপড়াচ্ছে। মুখের উপর কল কাটতে পারছে না আবার কিছু বলতেও পারছে না। বন্যা উদাসীন কণ্ঠে বলল, "আসসালামু আলাইকুম, ভাইয়া।" "ওয়ালাইকুম আসসালাম।" "ভালো আছেন ভাইয়া?" "আমি ভালো আছি তবে অন্য কারোর টা জানি না। ননদীনির খোঁজ খবর নেও ভালো কথা। কিন্তু মাঝে মাঝে নিজের বেপরোয়া জামাইয়ের খোঁজ খবরও একটু নিও।" বন্যা মনে মনে নিজেকে ইচ্ছেমতো বকছে। প্রকাশ্যে অত্যন্ত নমনীয় কণ্ঠে বলল, " ভাইয়া আসলে ঐরকম কিছু না।" আবির শ্বাস ছেড়ে শান্ত কণ্ঠে বলল, " ভালোবাসলে নিজের

মানুষের যত্ন নিতে শিখতে হয়। আর হ্যাঁ তোমাদের ননদ-ভাবির সম্পর্কের মাঝে ঢুকে পড়ার জন্য সরি। আল্লাহ হাফেজ। ” “আল্লাহ হাফেজ। ” আবির কল কেটে সরাসরি ছাদে গেল। মেঘ গান গাইতে গাইতে গাছের ঘাস পরিষ্কার করছে। আবির কিছুটা পেছনে দাঁড়িয়ে আস্তে করে গলা খাঁকারি দিয়ে বলল, ” কেউ একজন বলেছিল আমি ফিরলে আমাকে সারপ্রাইজ দিবে। কিন্তু আজও দিল না! সে কি ভুলে গেছে?” মেঘ গম্ভীর কণ্ঠে বলল, “সে ভুলে যায় নি কিন্তু... ” “কিন্তু কি?” “আপনি যদি কিছু মনে করেন” “আমি কিছু মনে করব না। বলুন...” মেঘ চিন্তিত কণ্ঠে শুধালো, “আগে এটা বলুন, ভাইয়া যে বন্যাকে পছন্দ করে এটা কি আপনি জানেন?” আবিরের চিরচেনা কণ্ঠস্বরের জবাব, “জানি।” মেঘ আঁতকে উঠে প্রশ্ন করল, “কবে থেকে জানেন?” “প্রায় আড়াই বছর হতে চললো।” মেঘ হতবার হয়ে তাকিয়ে থেকে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলল, “ভাইয়া এতবছর যাবৎ বন্যাকে পছন্দ করে?” “হ্যাঁ। এখন বল কি করেছিস?” “আমি তেমন কিছু করি নি। ভাইয়া বন্যাকে পছন্দ করে এটা কয়েকমাস হলো আমি জানতে পেরেছি। তাই বোন হিসেবে আমি আমার দায়িত্ব পালন করেছি।” আবির রাশভারি কণ্ঠে শুধালো, “কি দায়িত্ব? ” মেঘ আস্তে করে বলল, “আমি আর মীম বন্যাকে ভাবি হওয়ার জন্য প্রপোজ করেছি আর ভাগ্যক্রমে বন্যাও রাজি হয়ে গেছে। আপনাকে ভিডিও দেখাবো নে।” আবির নিরেট কণ্ঠে বলল, “এজন্যই ফোনে এত যত্নের সহিত ননদীনি বলে ডাকছিল। ” মেঘ ভারী কণ্ঠে বলল, “আপনি

কিভাবে জানেন?” আবির স্ব শব্দে হেসে বলল, “তোকে কল দিয়েছিল। আমি কল রিসিভ করে শুধু বলতে চেয়েছিলাম, তুই ছাদে। কিন্তু তার আগেই সে সব বলে ফেলছে। ” “তারপর? ” “তারপর আর কি, সে যেহেতু ননদ-দেবরের খোঁজ নিচ্ছে তাই ভাসুর হিসেবে আমারও তো পরিচয় টা দিতে হয়। তাই দিয়ে আসছি পরিচয়। ” “এটা কি করলেন আপনি?” আবির ঠাট্টার স্বরে বলল, “আমি তো কিছু করলাম ই না।” মেঘ কপাল গুটিয়ে সূক্ষ্ম নেত্রে তাকাতেই আবির মুচকি হেসে নিচে চলে গেছে। দু’দিন কেটে গেছে। আবির বন্যার ব্যাপারে তানভিরকে কিছুই জানায় নি কারণ তানভিরকে ভাবার জন্য দুদিন সময় দিয়েছিল। তানভির দুদিন পর সুন্দর ভাবে তার মতামত জানিয়েছে, সে বন্যাকে ছাড়া সে আর কাউকে পছন্দ কিংবা ভালোবাসতে পারবে না। বন্যার জন্য সে সবকিছু করতে পারে আরও অনেক কিছু বলেছে। আবির সব শুনে শান্ত কণ্ঠে বলল, ” তুই চাইলে বন্যাকে তোর মনের কথা বলতে পারিস।” তানভিরকে বিস্তারিত কিছু না বললেও কিছু কথাতে টুকটাক বুঝিয়েছে। আজ সকাল থেকে খান বাড়ির পরিবেশ অন্যরকম। মোজাম্মেল খানের শরীর খারাপ তাই অফিসে যাবেন না। তানভির একটা কাজে বেড়িয়েছে। আবিরের আব্বুর অফিসে ছোটখাটো একটা মিটিং আছে তাই আবিরও দ্রুত রেডি হয়ে বেড়িয়ে গেছে। মেঘ খেতে গিয়ে দেখে টেবিল সম্পূর্ণ ফাঁকা তাই না খেয়ে আবিরকে দেখতে গেল। আবির রুমে নেই দেখে মেঘের মন কিছুটা খারাপ হয়ে গেছে। আজ সকালে কল পর্যন্ত দেয় নি

আবির। আবিরের খোঁজ নিতে মেঘ বেলকনিতে দাঁড়িয়েই আবিরের নাম্বারে কল দিল। আচমকা রুমের ভেতর থেকে রিংটোন বাজছে। “পাগল তোর জন্যে রে পাগল এ মন, পাগল মুখে বলি, দূরে যা মন বলে, থেকে যা দূরে গেলে মন বোঝে তুই কত আপন।” কল বাজতে বাজতে কেটে গেছে। আবির রিসিভ করে নি। মেঘ দ্বিতীয়বার আবিরের নাম্বারে কল দিল। পূর্বের ন্যায় রুম থেকে একই গান বাজতেছে। মেঘ কপালে ভাঁজ ফেলে আনমনে রুমে দিকে এগিয়ে গেল। বিছানার উপর আবিরের ফোনটা পড়ে আছে। সেই ফোনেই এই গান বাজতেছে। মেঘ এগিয়ে গিয়ে ফোনের স্ক্রিনে তাকাতেই রীতিমতো আশ্চর্য বনে গেল। মেঘ আর আবির একসঙ্গে বৃষ্টিতে ভিজছে এমন একটা ছবি ভাসছে সাথে ❤Soulmate❤ নামে সেইভ করা নাম্বার। মেঘ আশ্চর্যান্বিত হয়ে তাকিয়ে আছে। মস্তিষ্কের নিউরন গুলো ছুটছে দ্বিকবিদিক। বুকের বা পাশটা অদ্ভুত অনুভূতিতে মেতেছে। অনেকদিন আগে আবিরের ফোনে নিজের নাম দেখার ইচ্ছে হয়েছিল মেঘের তবে সেটা কেবলমাত্র ইচ্ছেই ছিল। এখন তার এক বিন্দুও মনে ছিল না। গত পরশুদিন রাতেও মেঘ বন্যাকে কল দিয়ে মন খারাপ করে বলছিলো, আবির ভাই দেশে ফিরেছে তবুও তাকে ভালোবাসার কথা বলছে না, প্রপোজ পর্যন্ত করছে না। বন্যা অনেক বুঝিয়ে শুনিয়ে ঘুমাতে বলেছে। আজ সেই আবির ভাইয়ের ফোনে নিজের নাম, ছবি আর গানের রিংটোন শুনে মেঘ নিজের চোখ আর কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না।আনন্দে মেঘের দুচোখ টলমল

করছে, ভেতরটা আনন্দে ভরে গেছে। প্রকাশ করার ভাষা হারিয়ে ফেলেছে। আচমকা আবিরের বাইকের শব্দ শুনে ফোন ফেলে মেঘ দ্রুত নিজের রুমে গেছে। আবির নিজের রুম থেকে ফোন নিয়ে মেঘের রুমের সামনে এসে থমকালো। দরজা থেকে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে শুধালো, "কল দিয়েছিলি কেনো?" মেঘের দুচোখ ভেজা, চিকচিক করছে পানি। মেঘ আবিরের দিকে না তাকিয়েই কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, " খেয়েছেন কি না জিজ্ঞেস করতে কল দিয়েছিলাম।" "সত্যি? নাকি অন্য কিছু বলতে কল দিয়েছিলি?" মেঘ স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, " এমনিতেই কল দিয়েছিলাম। অন্য কোনো কারণ নেই।" আবির মেঘের দিকে ভালোভাবে তাকালো। মাথায় ওড়না দিয়ে মুখ ঢেকে বসে আছে। আবির মৃদু হেসে বলল, "হঠাৎ লাজুকলতা সাজার কারণ কি?" "এমনি। আপনি অফিসে যান।" এদিকে আলী আহমদ খান বার বার কল দিচ্ছেন। ১১ টায় মিটিং টাইম। যত দ্রুত সম্ভব যেতে হবে। আবির মেঘের থেকে বিদায় নিয়ে দ্রুত চলে গেছে। আবির বাসা থেকে বের হতেই মেঘ বন্যার নাম্বারে কল দিলো। প্রথমবার রিসিভ হয় নি, এরপর থেকে নেটওয়ার্ক বিজি, ব্যস্ত বলছে। অনেকক্ষণ ট্রাই করার পর একবার কল ঢুকেছে। বন্যা কল রিসিভ করে উত্তেজিত কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল, "বেবি, তুই জিতে গেছিস।" এপাশ থেকে মেঘও বলে উঠল, "বেবি, আমি ওনার ভালোবাসার প্রমাণ পেয়ে গেছি।" বন্যা আর মেঘ একসঙ্গে চিল্লাচিল্লি শুরু করেছে। মেঘ বলছে সে আগে বলবে ওদিকে বন্যা বলছে বন্যা আগে বলবে। বাধ্য হয়ে মেঘের কথায় আগে

শুনতে হলো। মেঘের কথা শেষ হতেই বন্যা বলে উঠল, “তুই একবার বলছিলি না,হয়তো আবির ভাইয়া বিদেশে যাওয়ার আগে থেকে তোকে ভালোবাসে? এটা মিথ্যা না, একদম সত্যি। আবির ভাইয়া তোকে তখন থেকেই ভালোবাসেন।” “তোকে কে বলছে?” “তোর ভাই গতকাল রাতে কল দিয়েছিল। আপু বাসায় নেই তাই এই সুযোগে ওনার সাথে অনেকক্ষণ কথা বলতে পেরেছি। তোকে বিস্তারিত ঘটনা পরে বলল। সবচেয়ে বড় কথা হলো, তোর ভাই সবকিছু জানতো।” মেঘ শক্ত কণ্ঠে বলল, ” আমি এতদিন যে প্রমাণ খোঁজছিলাম আজ সেই সব প্রমাণ পেয়ে গেছি।” “এখন কি করবি?” মেঘ একটু ভেবে শান্ত কণ্ঠে বলল, ” এই জীবনে ওনার প্রপোজ আশা করাটা বোকামি ছাড়া কিছুই হবে না। যেহেতু আমি প্রমাণ পেয়ে গেছি তাই আমি আজই ওনাকে প্রপোজ করব।” “কিভাবে?” মেঘ মুচকি হেসে বলল, “তুই একটা হেল্প করতে পারবি?” “কি হেল্প?” “আমার জন্য একটা নীল শাড়ি কিনে আনতে পারবি? ” “তুই ওনাকে প্রপোজ করতে যাবি?” “হ্যাঁ যাব। আমি এতদিন প্রমাণ খোঁজেছিলাম। কিন্তু শক্তপোক্ত কোনো প্রমাণ পায় নি তবে আজ পেয়েছি। তাই আর ছাড়তে পারবো না। ওনি বলেছিলেন, ওনি বাসায় ফিরলে আমি যা চাই তাই হবে। আমি আজ ওনাকে চাইবো। আশা করি ওনি আমাকে ফেরাবেন না। তুই শুধু শাড়িটা কিনে নিয়ে আয়, প্লিজ। ” “আচ্ছা, ঠিক আছে। আসতেছি।” “লাভ ইউ বেবি ” “লাভ ইউ আমায় না বলে আমার ভাসুর কে বলিয়ো।” মেঘ লাজুক হেসে বলল, “উফ! আমার না ভাবতেই লজ্জা

লজ্জা লাগছে। ” বন্যা হেসে বলল, “তুই রেডি হ, আমি শাড়ি কিনে নিয়ে আসছি।”মেঘের হৃদয়ের অন্তঃস্থল অনবরত কম্পিত হচ্ছে। হৃদপিণ্ডের দিগবিদিক ছুটাছুটিতে শরীর জুড়ে অস্থিরতা কাজ করছে। চোখের সামনে জ্বলজ্বল করছে আবিরের ফোনের স্ক্রিনে দেখা নাম আর শ্রাবণের বৃষ্টিতে জলসিক্ত দুজনার ছবিটা। গত দুবছরে জমে থাকা প্রেমানুভূতিগুলো আজ যেন স্বস্তি পেল। মেঘ ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে আনমনে ভেবে যাচ্ছে, ঠোঁটজুড়ে তার লাজুক হাসি লেগেই আছে। বন্যা মেঘদের বাসায় আসতে আসতে দুপুর হয়ে গেছে । অনেক দোকান ঘুরে মেঘের জন্য একটা নীল রঙের শাড়ি নিয়ে আসছে। বন্যা আসতেই মেঘ হুটোপুটি করে শাড়ি বের করে দেখতে লাগলো। মূলত সেদিন পার্কে শাড়ি পড়া মেয়েটাকে দেখার পর থেকেই মেঘের মনে সেটা স্থির হয়ে আছে। মেয়েটা অন্য রঙের শাড়ি পড়লেও মেঘ নীল রঙের শাড়ি পড়ছে। কারণ সাদা, কালো ব্যতীত আবিরের প্রিয় রঙের তালিকায় নীল রঙটায় আসে। তাছাড়া মেঘ আগেও খেয়াল করেছে, সে নীল রঙের জামা পড়লে আবিরের অভিপ্রায় সম্পূর্ণ বদলে যায়, অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। তাই আজ ইচ্ছে করে নীল রঙের শাড়ি পড়ছে যেন আবির ভাই মেঘকে দেখে ফিদা হয়ে যায় আর মেঘ যা বলে সব মেনে নেয়।বন্যায় মেঘকে সাজিয়ে দিচ্ছে বিশেষ করে শাড়িটা বন্যায় পড়িয়ে দিচ্ছে। খুব ভালো না পারলেও বন্যা টুকটাক শাড়ি পড়াতে পারে। মেঘ হঠাৎ প্রশ্ন করল, “ভাইয়া কল দিয়ে তোকে কি বলছে রে?” “তোর ভাই তো অনেককিছু

বলতে চাইছিল কিন্তু আমি সেসবে পাত্তা দেয় নি।” “কেনো?” “সেদিন আমার কল আবির ভাইয়া রিসিভ করার পরেই বুঝেছিলাম, আবির ভাইয়া তোর ভাইকে বলবে আর তোর ভাই আমাকে কল দিবেই দিবে। তাই আমি মনে মনে প্রশ্ন সাজিয়ে রেখেছিলাম। তোর সঙ্গে এত বছর যাবৎ চলছি আমি, আজ পর্যন্ত তোর ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত ওনাকে একা নিতে দেখি নি। প্রথম প্রথম ভাবতাম আবির ভাইয়া ওনার বেস্ট ফ্রেন্ডের মতো, বড় ভাইও তাই হয়তো বলেন বা জিজ্ঞেস করেন। কিন্তু ধীরে ধীরে সেটা বাড়লো, আবির ভাইয়ার প্রতি তোর ক্ষোভ ছিল এতবছর তাই আমি তোকেও ঐভাবে কিছু বলি নি। তবে ইদানীং ওনার সাথে আমার বেশ কয়েকবার আলাদাভাবে দেখা হয়েছে, বিভিন্ন টপিকে কথা হয়েছে কিন্তু তোর টপিক আসলে ওনার মুখে আবির ভাইয়ার নাম এমনিতেই চলে আসে। ভাইয়া বলেছে এটা করতে, ভাইয়া এটা করতে বারণ করেছে, ভাইয়াকে বলে দেখি । হয়তো মুখ ফস্কে বলে ফেলেন পরে বুঝতে পেরে কথা কাটিয়ে বলেন, বাসায় কথা বলতে হবে। তুই একদিন আবির ভাইয়ার কলেজ ফ্রেন্ডদের বিষয়ে বলেছিলি এই সবগুলো বিষয়ই আমায় মাথায় ছিল। সবচেয়ে বড় বিষয় সেদিন হাসপাতালে তুই যখন অজ্ঞান ছিলি তখন আবির ভাইয়া ফোনে ওনাকে যেভাবে ঝারছে, তুই বিশ্বাস করবি না ওনার চোখ-মুখ একদম অন্ধকার হয়ে গেছিল। তারপরও ওনি একটা টু শব্দ পর্যন্ত করেন নি। সেদিন ই সিউর হয়েছিলাম ওনি কিছু না কিছু হলেও জানেন । আমি শুধু ওনাকে জিজ্ঞেস করার সুযোগ

খোঁজছিলাম। গতকাল ওনি কল দিলেন, আপুও বাসায় নেই এই সুযোগে রাত ৩ টার উপরে পর্যন্ত শুধু তোর বিষয়েই কথা বলেছি। তোকে কথাগুলো জানানোর জন্য আমার ভেতরটা ছটফট করছিল, কিন্তু ঘুমে চোখও টানতেছিল। ওনার সাথে কথা বলতে বলতে কখন জানি ঘুমিয়ে পরছিলাম। সকালে সজাগ হয়েই আগে তোকে কল দিয়েছি।" মেঘ উত্তেজিত কণ্ঠে শুধালো, "ভাইয়া কি বলছে?" "আমি প্রথমেই ওনাকে জিজ্ঞেস করেছি, সেদিন হাসপাতালে কি আবির ভাইয়া কল দিয়েছিলেন? ওনি উত্তরে 'হ্যাঁ' বলেছেন। আমি আবারও জিজ্ঞেস করেছি, "আবির ভাইয়া কি মেঘকে পছন্দ করেন?" ওনি এর উত্তরেও "হ্যাঁ" ই বলেছেন। তখন আমি সরাসরি জিজ্ঞেস করি, 'আবির ভাইয়া কি বাহিরে পড়তে যাওয়ার আগে থেকেই মেঘকে পছন্দ করেন? হ্যাঁ কি না।' ওনি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিয়েছেন 'হ্যাঁ' তারপর আরও কয়েকটা প্রশ্ন করেছি, ওনি সবগুলোতেই ঠিকঠাক উত্তর দিয়েছেন।" "তুই জিজ্ঞেস করিস নি ভাইয়া কবে থেকে জানে?" "জিজ্ঞেস করেছি, ওনি বলেছেন ওনি অনেক আগে থেকেই সবকিছু জানেন।" মেঘ চেঁচিয়ে উঠল, "হোয়াট? ভাইয়া আমার সাথে এত বড় ধোঁকাবাজি টা করতে পারলো?" বন্যা শান্ত স্বরে বলল, "গতকাল রাতে এই কথা শুনামাত্র আমিও চিৎকার করেছিলাম। রাগে কটমট করে বলেছিলাম, আপনি সবকিছু জানার পরও মেঘকে এত কষ্ট কেনো দিচ্ছেন? আপনি জানেন মেঘ আপনাকে পাগলের মতো ভালোবাসে তারপরও আপনি এটা কিভাবে করতে পারলেন? তখন

ওনি বলছেন, ওনি আবির ভাইয়ার কথার উপর কিছু বলতে পারতেন না আর কখনো পারবেনও না। আমার মেজাজ আরও বেশি খারাপ হয়ে গেছিল, আমি মুখ ফস্কে বলে ফেলছিলাম, "আবির ভাইয়ার মধ্যে যদি বিন্দুমাত্র মনুষ্যত্ববোধ থাকতো তাহলে মেঘকে এত কষ্ট দিতো না। " মেঘ শান্ত স্বরে জিজ্ঞেস করল, "ভাইয়া ধমক দেয় নি তোকে?" "না ধমক দেন নি তবে রাগে রাগে বলছেন, তুমি ভাইয়ার সম্পর্কে কতটা জানো যে ভাইয়াকে নিয়ে এসব কথা বলছো। ভাইয়া বনুকে যতটা ভালোবাসে আর বনুর ব্যাপারে যে পরিমাণ পসেসিভ আমি সারাজীবনেও তার একাংশ হতে পারব না।" মেঘ মুখ ফুলিয়ে শ্বাস ছেড়ে বলল, " এই অফুরন্ত ভালোবাসা কোথায় ছিল এতদিন?" বন্যা মুচকি হেসে বলল, "তারথেকেও বড় শকিং নিউজ শুনবি?" "কি?" " আবির ভাইয়ার অবর্তমানে ৭ বছর তুই যে রিলাক্স জীবন কাটিয়েছিস সেই সবটায় ছিল আবির ভাইয়ার প্ল্যান। তুই হয়তো প্রকাশ্যে বা স্বইচ্ছায় আবির ভাইয়ার সঙ্গে কোনোদিন কথা বলিস নি কিন্তু ওনি ঠিকই তোর কথা শুনেছে। এমন একটা দিন বাদ যায় নি যে তোর কণ্ঠ না শুনে ভাইয়া ঘুমিয়েছেন। তুই রাগ করলে মাঝরাতে তোর ভাই ঘুম থেকে ডেকে নিজে রান্না করে বা তোর পছন্দের খাবার এনে তোকে সামনে বসিয়ে খাইয়ে তোর রাগ ভাঙানোর চেষ্টা করতো ঠিকই কিন্তু তখন ফোনের ওপাশে আবির ভাইয়া থাকতেন। শুধুমাত্র তোর কথা শুনার জন্য ওনি আলাদা ফোন ইউজ করতেন, ঘন্টার পর ঘন্টা তোর ভাইয়ের সঙ্গে অডিও কলে থাকতেন। তোর ভাইয়া আরও যা যা

বলেছেন তা শুনে আমি রীতিমতো আকাশ থেকে পড়েছি। তোর অভিমানের তোপে পড়ে একপ্রকার বাধ্য হয়ে বাড়ি ছেড়েছিলেন ওনি, অথচ দূরে থেকেও পাগলের মতো ভালোবেসে গেছেন। তুই বোন অনেক লাকি। দোয়া করি, যেন সারাজীবন আবির ভাইয়ার স্প্যারো হয়ে থাকতে পারিস।" মেঘ মিষ্টি করে হেসে শাড়ির আঁচল ছড়িয়ে ড্রেসিং টেবিলের দিকে তাকিয়ে বলল, " ইনশাআল্লাহ। এখন বল আমায় কেমন লাগছে? ওনাকে পাগল করার জন্য যথেষ্ট না?" বন্যা হিজাব ঠিক করে দিতে দিতে বলল, " মাশাআল্লাহ, তোকে খুব সুন্দর লাগছে। আবির ভাইয়া ছাড়া আর কারো নজর যেন না লাগে।"

দুপুরের পর থেকে ড্রয়িং রুম ফাঁকায় থাকে তবুও মেঘ আর বন্যা চুপি চুপি বাসা থেকে বেড়িয়েছে। মেঘের আব্বু আজ বাসায় আছেন। মেয়ে এত সেজেগুজে বের হচ্ছে দেখলে নিশ্চিত শখানেক প্রশ্ন করতে শুরু করবেন। মুহুর্তেই তানভির, আবির সবাইকে জড়ো করে ফেলবেন। এই ভয়ে লুকিয়ে বের হতে হয়েছে। বাসা থেকে বেড়িয়ে দুজন দুই রিক্সা নিয়ে আলাদা আলাদা গন্তব্যে রওনা দিল। বন্যা সরাসরি বাসায় যাচ্ছে। মেঘ পার্কে যাচ্ছে, যাওয়ার সময় একগুচ্ছ লাল আর হলুদ গোলাপও সঙ্গে নিয়েছে। জ্যাম পার করে পার্ক পর্যন্ত আসতে মেঘের অনেকটায় সময় লেগেছে। আজ অফিস ডে হওয়ায় পার্কে খুব বেশি মানুষের ভিড় নেই আবার একেবারে ফাঁকাও না। শাড়ি পড়ে একা একা হাঁটতেও খুব বিরক্ত লাগছে, কিছুদূর গিয়ে গাছের নিচে একটা ব্রেঞ্চে বসলো। ফুলগুলো পাশে রেখে ফোনটা হাতে নিলো। আবিরকে

ফোন দেয়ার খুব চেষ্টা করছে কিন্তু ভয়ে হাত কাঁপছে। বাসা থেকে খুব সাহস নিয়ে বের হলেও পার্ক পর্যন্ত আসতে আসতে সাহসের ছিটেফোঁটাও বেঁচে নেই। হাতের কম্পনের কারণে কাঁচের চুড়ি গুলো একে অন্যের সঙ্গে বারি খাচ্ছে। মেঘ সঙ্গে সঙ্গে ফোন পাশে রেখে চুড়ি খুলতে শুরু করলো। নিজের উপর প্রচন্ড রাগ হচ্ছে, শরীর ঘামছে, লাল টকটকে রঙের লিপস্টিকে রাঙা ওষ্ঠদ্বয় তিরতির করে কাঁপছে। অকস্মাৎ বন্যার কল আসছে। কল রিসিভ করতেই বন্যা বলল, "আবির ভাইয়াকে কল দিয়েছিস?" "সাহস পাচ্ছি না ।" "আমি জানতাম তুই এমন কান্ড করবি। জোরে নিঃশ্বাস নিয়ে কল দে ওনাকে। যা হওয়ার হবে।" মেঘ কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, "ঠিক আছে, দেখছি।" মেঘ পার্কে এসেছে প্রায় ২০ মিনিট হয়ে গেছে। এখনও আবিরকে কলই দিতে পারছে না। বারবার ফোন হাতে নিচ্ছে আবার রেখে দিচ্ছে। সূর্য পশ্চিমা আকাশে অনেকটায় হেলে পড়েছে। পল্লবিত আঁখিতে তাকিয়ে সেই দৃশ্য দেখছে। মেঘ আচমকা নড়েচড়ে বসলো। এরমধ্যে মেঘের থেকে কিছুটা দূরে একটা বাইক এসে থামলো কিন্তু মেঘের সেদিকে নজর নেই। মেঘ দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে ফোন হাতে নিয়ে আবিরের নাম্বারে কল দিল। হাঁটুর উপর হাত রেখে ঝুঁকে ফোনের স্ক্রিনে তাকিয়ে মেঘ বারবার ঢোক গিলছে। আবির কল রিসিভ করলে কি বলবে মনে মনে তাই সাজাচ্ছে। অকস্মাৎ মেঘের ঠিক সামনে কেউ একজন দাঁড়াতেই মেঘ আঁতকে উঠল, নীল রঙের একটা আবছায়া চোখে লাগতেই মেঘ মেরুদণ্ড সোজা করে বসতে

বসতে সূক্ষ্ম নেত্রে তাকাতে নিল। ততক্ষণে আবির মেঘের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে পরেছে। আবিরকে দেখেই চমকে উঠল মেঘ। মেঘের অবিশ্বাস্য চাহনি দেখে আবির মুচকি হাসলো। আবিরের পড়নে নীল পাঞ্জাবি, সানগ্লাসটা বুকের উপর পাঞ্জাবিতে ঝুলানো, চুল দেখে বুঝায় যাচ্ছে বাইক থেকে নেমে হাতেই ঠিক করেছেন, ঠোঁটে লেগে আছে মায়াবী হাসি। আবির একমুহূর্ত দেরি না করে মেঘের সামনে একগুচ্ছ সাদা গোলাপ ধরে নেশাক্ত কণ্ঠে বলতে শুরু করল, "তুই আমার মন পিঞ্জরে নিপট অপ্রমাদীতে থাকা এক অন্ত:শীল ক্ষীণত্ব, অনুভূতির রাজ্যের তৃষ্ণার্ত কাব্য। এলোকেশীর এলো চুল, উত্তাল উদধির তরঙ্গের ন্যায় কুহকিনী হাসি, প্রণয়ীনীর নিখুঁত আত্ততা, মৃগনয়নার মতো বিমুগ্ধ চোখে বারংবার হারিয়ে খোঁজেছি নিজেকে। তুই আমার প্রণয়ের প্রদাহের সেই পূর্ণতা, অপ্রমেয় নীলাম্বরের অসীমত্ব ছাড়ানো স্নিগ্ধতা। তুই কি আবিরের হৃদয় রাজ্যের রাজ্ঞী হবি?" মেঘ দু'হাতে মুখ চেপে ডাগর ডাগর চোখে আবিরের অভিমুখে তাকিয়ে ছিল। হার্টবিট বেড়েছে কয়েকগুণ, সেদিকে কোনো খেয়াল নেই। আবিরের প্রশ্নে চক্ষুদ্বয় প্রশস্ত করে অবচেতন মনে চেঁচিয়ে উঠল, "না। আমি মানি না। "
মেঘের চোখে মুখে অল্প বিস্তর ক্রোধের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। আশেপাশে বসা ২-৪ জন মেঘ- আবিরের দিকে এমনভাবে তাকিয়ে আছে যেন মেঘ আর একটা চিৎকার দিলেই ছুটে আসবে। আবির আশেপাশে তাকিয়ে পরিস্থিতি বুঝে নিল। মেঘের মায়াবী দুই আঁখি আবিরের চোখে মুখে নিবদ্ধ। সকাল থেকে নেয়া মানসিক প্রিপারেশন,

সাজগোজ সব যেন বৃথা হয়ে গেল। মেঘ মুখ ফুলিয়ে শ্বাস ছেড়ে বলল, " আপনি আমার সব প্ল্যান ধ্বংস করে দিতে পারলেন?" আবির তখনও হাঁটু গেড়ে বসে আছে। হাতে থাকা সাদা গোলাপগুলোর দিকে তাকিয়ে গলা খাঁকারি দিয়ে আস্তে করে আবারও বলল, " আমি রূপকথার রাজকুমার হতে চাই না, শুধু তোর মনের রাজ্যের রাজা হতে চাই। Will you be my queen? " মেঘ কাঁদো কাঁদো মুখ করে তাকিয়ে আছে। আবির বিরক্ত হয়ে ঠান্ডা কণ্ঠে হুমকি দিল, " No problem. If you don't take the flowers, I will give them to another girl. Will I?" কথাটা বলতে দেরি হয়েছে কিন্তু আবিরের হাত থেকে মেঘের ফুল টেনে নিতে দেরি হয় নি। ফুলগুলো আলতোভাবে জড়িয়ে ধরে মেঘ হুঙ্কার দিয়ে উঠল, "ফুলও আমার আর আপনি সহ আপনার রাজ্যও আমার। আপনার মনের রাজ্যে কেউ উঁকিও দিতে পারবে না। এই আমি বলে রাখলাম। " মেঘ রাগে ফোঁস ফোঁস করছে, মাথা নিচু করে ঘন ঘন শ্বাস ফেলছে। আবির নিঃশব্দে হেসে নিজের দুই হাঁটুতে ভর দিয়ে মেঘের উরুতে মাথা রেখে মেঘের চোখের দিকে তাকালো। মুহুর্তেই মেঘের রাগ আর অভিমান উধাও হয়ে গেছে, মেঘের হৃদপিণ্ডের গতি অস্বাভাবিক, জোরালো হৃৎস্পন্দনের শব্দ বাহির থেকে শুনা যাচ্ছে। আনমনেই হাতের ফুলগুলো বুকের সঙ্গে চেপে ধরে আবিরের দিকে তাকালো। আবিরের নেশাক্ত হাসিতেই মন্ত্রমুগ্ধ মেঘ। আবির অত্যন্ত মায়াবী কণ্ঠে বলল, " মনের রাজ্যে উঁকি দেয়া তো দূর, আমার দিকে কেউ তাকানোর

আগেই বলে দিব, প্লিজ খালা, আমার দিকে তাকাবেন না। আমার ঘরে একটা পরী মতো বউ আছে। বউটা যেমন কিউট তেমন হিংসুটে।” আবিরের মুখে বউ শব্দটা শুনে মেঘ আশ্চর্য নয়নে তাকিয়ে আছে। অজানা শিহরণে মন উড়ুউড়ু করছে। বার বার কানে বাজছে, “আমার ঘরে একটা পরীর মতো বউ আছে।” অদ্ভুত অনুভূতি মনকে রাঙিয়ে দিচ্ছে। লজ্জায় আবিরের চোখ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়েছে অনেক আগেই তবুও বক্ষস্থলের ইতস্ততা কাটাতে পারছে না। আবির মেঘের উরু থেকে উঠে মেঘের ডানহাতটা নিজের কাছে টেনে নিল। আবিরের অনাকাঙ্ক্ষিত স্পর্শে মেঘের হাত সহ সম্পূর্ণ শরীর কম্পিত হচ্ছে। আবির হাতটাকে শক্ত করে ধরে মৃদুভাবে চুমু খেয়ে মোলায়েম কণ্ঠে বলল, “আজ থেকে আমি শুধু তোর। আমার উপর তোর অধিকার সবচেয়ে বেশি। তুই যখন যা বলবি তাই হবে। খুশি?” আবিরের চুমুতে মেঘের শরীর ঝাঁকুনি দিয়ে উঠেছে। সেদিন অর্ধ ঘুমে থাকায় আবিরের কপালে দেয়া চুমুটা সেভাবে উপলব্ধি করতে পারে নি। তবে আজ মেঘ সম্পূর্ণ সজ্ঞানে আছে। মেঘ নির্বাক হয়ে বসে আছে, বহু চেষ্টা করেও গলা দিয়ে কথা বের করতে পারছে না। যেই আবির ভাইয়ের প্রণয়ের স্রোতে সর্বক্ষণ ভেসে যেতে চাই সেই আবিরের প্রেমিক সুলভ আচরণ, আবেগময় কথার কোনো প্রতিত্তোর করতে পারছে না। মেঘ আকাশের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়লো। চোখ নামাতেই নিজের কেনা লাল আর হলুদ গোলাপের দিকে নজর পরলো। সহসা মনে পড়ে গেছে নিজের করা পরিকল্পনার কথা। মেঘ

গুরুতর কণ্ঠে বলে উঠল, ” আপনি এটা কেন করলেন? আমি সকাল থেকে প্ল্যান করে ভাবিকে দিয়ে শাড়ি কিনিয়ে সেজেগুজে আসছি আর আপনি আমার সব পরিকল্পনা নষ্ট করে দিয়েছেন। আপনি খুব পঁচা। ” আবির মেঘের হাত ছেড়ে বসা থেকে উঠে সরাসরি মেঘের দুপাশের ব্রেঞ্চে হাত রেখে মেঘের দিকে ঝুঁকে দাঁড়ালো। মেঘ ঠোঁট উল্টে মনমরা হয়ে আবিরের দিকে চেয়ে আছে। আবির প্রশস্ত আঁখিতে তাকিয়ে নিরেট কণ্ঠে বলল, ” আমার এতবছরের অনুভূতি, আসক্তি আর সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা আপনি কেবল কয়েক ঘন্টায় তছনছ করে দিয়েছেন। তবুও আমি চুপচাপ বসে দেখবো? আপনি ভাবলেন কিভাবে?” মেঘ নিরেট দৃষ্টিতে তাকিয়ে শক্ত কণ্ঠে শুধালো, ” আমি এখানে আসছি এটা আপনি কিভাবে জানেন?” আবির মুচকি হেসে বলল, “সকালে আপনার হাবভাব দেখেই সন্দেহ হয়েছিল। তানভিরকে কলও দিয়েছিলাম কিন্তু ও ফোন রিসিভ করে নি। ২ বেজে ৩৭ মিনিটে আপনি শাড়ি পড়ে বাসা থেকে বের হতেই আমার কানে খবর চলে গেছিলো। তানভিরকে কল দিতে দিতে অতঃপর জানতে পারলাম যে, আমার সন্দেহ ঠিক ছিল। তানভির বন্যাকে বলে ফেলছে মানে আপনার কানে কথা চলে গেছে। ৩:১৬ তে ফুলের দোকানে ফুল কিনছিলেন আর আমি তখন শপিং মলে আপনার শাড়ির সঙ্গে ম্যাচিং পাঞ্জাবি খোঁজতে ব্যস্ত। আপনি এখানে এসে বসেছেন ঠিক ৪:২২ এ। তখন আমি রেডি হয়ে বেড়িয়ে ফুল কিনতে যাচ্ছি। ফুল নিয়ে আসতে আসতে তাই একটু দেরি হয়ে গেছে।” “আপনি এতকিছু কিভাবে

জানেন?” “ম্যাম, আপনাকে আগেই বলেছিলাম, আপনাকে ছাড় দিয়েছি কিন্তু ছেড়ে দেয় নি। তাছাড়া আপনি যার তার মনের মানুষ না। মনে রাখবেন, আবিরের পৃথিবী আপনি। আর সেই পৃথিবীকে আগলে রাখতে আবির সবকিছু করতে পারে। খান বাড়িত চারপাশ ঘিরে এমন কিছু ব্যক্তি আছে যারা নিজের কাজের পাশাপাশি সর্বক্ষণ বাসার দিকে নজর রাখে। খান বাড়িতে কখন কে আসছে, কে যাচ্ছে, কেনো আসছে সব আপডেট আমাকে পাঠায়। এমনকি এইযে আমি আপনি এখানে আছি, এখানেও আমার লোক আছে।” মেঘ কপাল কুঁচকে বলল, “অ্যাহ! বললেই হলো। মজা করেন আমার সাথে?” আবির মেঘের চোখে চোখ রেখে বলল, “আমার ডানপাশে কিছুটা দূরে কালো টিশার্ট পড়া ছেলেটাকে দেখ, তার পেছন দিকে কফি কালার শার্টের ছেলে আর ঐদিকে বাইকে বসা ছেলেটাকে দেখ।” মেঘ তিনজনকে এক পলক দেখে ভ্রু কুঁচকে প্রশ্ন করলো, “তারা আপনার লোক?” “হুমমমমম। বিশ্বাস হয় না?” “না।” “ওকে, ওয়েট।” আবির ফোন বের করে মেসেজ পাঠাতেই ছেলেগুলো যে যার মতো চলে যাচ্ছে। মেঘ অবাক চোখে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, “ওনারা সত্যি আপনার লোক? আপনার কথায় সেকেন্ডের মধ্যে চলে গেছে। কিভাবে সম্ভব?” “আপনার জন্য সব সম্ভব।” মেঘ চোখ বড় করে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, ” তারা এখানে কেনো আসছিল? ” “আমার অবর্তমানে কেউ যেন আমার স্প্যারোর দিকে চোখ তুলে তাকাতে না পারে তারজন্য।” “তাই বলে তিনজন? আর ওনারা আপনার কি হয়?” “দুজন ছোট

ভাই, একজন ফ্রেন্ড। তিনজনের বাসা কাছাকাছি তাই বলেছিলাম আমি আসার আগ পর্যন্ত কেউ যেন আশেপাশে থাকে। এসে দেখি তিনজন ই উপস্থিত। " মেঘ নিজের কেনা ফুল গুলোর দিকে তাকিয়ে শীতল কণ্ঠে বলল, " ওনাদের জন্য আজ আমার সব শেষ হয়ে গেল।" আবির ব্রেঞ্চ থেকে মেঘের খুলে রাখা চুড়িগুলো তুলে মেঘের হাতে পড়াতে পড়াতে বলল, " আর আপনার জন্য আপনার সব পরিকল্পনা নষ্ট হয়ে গেছে।" "মানে?" "কিছু না। চলুন।" মেঘ নিজের ফুলগুলো আবিরের সামনে ধরে হিমশীতল কণ্ঠে বলে উঠলো, " I Love You " আবির ফুলগুলোর দিকে তাকিয়ে শক্ত কণ্ঠে বলল, "লাল ফুল গুলো সরিয়ে শুধু হলুদ গোলাপগুলো দেন।" "কোনো?" "লাল গোলাপ ছুঁতে চাই না তাই।" মেঘ যথারীতি হলুদ গোলাপ গুলো আলাদা করে ধরতেই আবির ফুল গুলো হাতে নিয়ে শান্ত কণ্ঠে বলল, "থ্যাংক ইউ।" মেঘ আহাম্মকের মতো তাকিয়ে বিড়বিড় করে বলল, "কেউ আই লাভ ইউ বললে প্রতিত্তোরে থ্যাংক ইউ বলে না, আই লাভ ইউ টু বলতে হয়। " আবির কথাটা শুনলো কি না কে জানে। কয়েকটা পিচ্চি ছেলেকে ডেকে লাল গোলাপ গুলো দেখিয়ে নিয়ে যেতে বলল। পরপর মেঘকে নিয়ে বাইক স্টার্ট দিল, নিরুদ্দেশের পথে ছুটলো। মেঘ দু একবার জিজ্ঞেস করেছে, কিন্তু আবির তেমন কিছুই বলে নি। সন্ধ্যে হয়ে গেছে, মেঘ চুপচাপ বাইকে বসে আছে। আবির বাইকের স্প্রীড কমিয়ে হঠাৎ ডেকে উঠল, " ম্যাম...! " "জ্বি। " "এত চুপচাপ কেনো?" "এমনিতেই।" আবির রাস্তার পাশে বাইক থামিয়ে ঘাড় কাত

করে মেঘকে খানিক দেখে নিলো। আবির মেঘের দু'হাত এনে নিজের পেটের উপর রেখে রাশভারি কণ্ঠে বলল, " আজ থেকে এই হাতের অবস্থান এখানে।" মেঘ আনমনে হেসে আবিরের গা ঘেঁষে বসলো। পেছন থেকে আলতোভাবে আবিরের পেট আঁকড়ে ধরল। আবির যথারীতি আবারও বাইক স্টার্ট দিল, শহর থেকে বেড়িয়ে অনেকটা রাস্তা গিয়ে আবির বাইক থামালো। আশেপাশে কয়েকটা দোকান ছাড়া তেমন বাড়িঘর নেই। একদম কোলাহল শূন্য পরিবেশ। আবির মৃদু হেসে বলল, " ৫ মিনিটের জন্য আপনার চোখ বেঁধে দিলে আপনি কি রাগ করবেন?" "চোখ কেনো বাঁধবেন?" "সেটা ৫ মিনিট পর বুঝবেন, প্লিজ।" মেঘ আশেপাশে তাকিয়ে দেখছে। একে অপরিচিত জায়গা, তারউপর আশেপাশে মানুষও তেমন নেই। আবিরের মুখের দিকে তাকিয়ে চাপা স্বরে বলল, "ঠিক আছে। " আবির এক গাল হেসে মেঘের চোখ বেঁধে সঙ্গে সঙ্গে মেঘকে কোলে তুলে নিল। মেঘ আবিরের বুকে মাথা রেখে চুপ থেকে আবিরের হৃৎস্পন্দনের শব্দ শুনছে। ২-৩ মিনিট পর মেঘকে একটা জায়গায় নামালো।মেঘের চোখ তখনও বন্ধ। চোখ থেকে কাপড় সরতেই মেঘ আশ্চর্যান্বিত নয়নে তাকালো। এটা একটা বাসা, যার গেইটের উপরে লেখা, "Sparrow's Dreamhouse." আবির অনুচ্চ স্বরে বলল, " ম্যাম, আপনার গিফট। " মেঘের বিস্ময় যেন কমছেই না। আবির মেঘের হাত টা শক্ত করে ধরে দরজার সামনে দাঁড়ালো। আবির চোখের ইশারায় মেঘকে দরজা খুলতে বলল। মেঘ বাম হাতে আস্তে করে দরজা ধাক্কা দিতেই

দরজা খুলে গেছে। অকস্মাৎ বাড়ির ভেতরে সাউন্ড বক্সে গান বাজতে শুরু করল, ”শোন বলি তোমায় না বলা কথাগুলো আজ বলে দিতে চাই, বল কি বলতে চাও, সারাটি জীবন ধরে শুনে যেতে চাই ভালবাসি আমি যে তোমায় এই কথাটাই ছিল শুধু বলার ভালবাসি আমিও তোমায় সব কথা কি মুখে বলে দিতে হয়” দরজা খুলামাত্র মেঘের চোখ পরে ড্রয়িং রুম সাথে বিশালাকৃতির সিঁড়ির দিকে যা গাদাঁ ফুলে সজ্জিত, ফ্লোর জুড়ে গাঁদা ফুলের পাপড়িতে ছেয়ে আছে। সিঁড়ির উপর জ্বলমল করছে আবির আর মেঘের একটা ছবি যেটা কোন এক রেস্টুরেন্টে তোলা। ছবি দেখে মনে হচ্ছে যেন দুজন দু’জনের চোখে চোখ রেখে নিজেদের অব্যক্ত অনুরক্তি জাহির করছে। মেঘ চারপাশে চোখ ঘুরাতেই এমন আরও কয়েকটা ছবি চোখে পড়লো। দেয়ালে ছবি লাগানো টা খান বাড়ির কেউ ই তেমন পছন্দ করে না, তাই শখেও কেউ কখনো নিজের ছবি ফ্রেমবন্দি করে নি। মেঘ অবাক চোখে ছবিগুলো দেখছে আর ঘটনাগুলো মনে করার চেষ্টা করছে। কারণ ছবিগুলোর প্রায় সবই মেঘের অগোচরে তোলা হয়েছে। আবির মোলায়েম কণ্ঠে বলল, “চিন্তা করিস না, ছবিগুলো সরিয়ে দিব। এগুলো শুধু স্পেশাল দিনের জন্য করিয়েছি।” ছবিগুলোর থেকে মেঘের দৃষ্টি সরলো। আবির মেঘের হাতটা আর একটু শক্ত করে ধরে পা বাড়ালো। মেঘ আজ নির্বাক, এ জীবনের সেরা সারপ্রাইজটা পেয়েছে সে। বাকরুদ্ধ মেঘ এক হাতে আবিরের দেয়া গোলাপগুলো শক্ত করে ধরে আবিরের অভিমুখে চেয়ে তাকে অনুসরণ করল।

সাউন্ডবক্সে তখন গান বাজছে, “আকাশের ঐ নীল ঠিকানায় মেঘেরা সাদা ডানা ছড়ায় ও দেরি সেই ভালবাসা এ মনে আজ পেয়েছে ঠাই জড়াবো আদুরে তোমাকে অনুভবে আকাশের চেয়ে বেশী তোমাকে ভালবাসি” কিছুটা সামনে এগুতেই সিঁড়ি উপরে প্রায় ২০-৩০ জন হাতে ফুলের পাপড়ি সমেত উপস্থিত হলো। সবাই একসঙ্গে বলে উঠল, “Welcome to your dreamhouse, Madam.” আকস্মিক ঘটনায় মেঘ কিছুটা ভড়কালো, সঙ্গে সঙ্গে কেঁপে উঠল মেঘের ছোট্ট দেহ। মেঘ কয়েকজনকে মোটামোটি চিনে তবে বেশিরভাগই আবিরের অফিসের স্টাফ। মেঘ আনমনেই রাকিব ভাইয়া,রাসেল ভাইয়াদের খোঁজলো কিন্তু তারা এখানে নেই। আবিরের কর্মকাণ্ডে মেঘ পদে পদে আশ্চর্যের চূড়ায় পৌছে যাচ্ছে। মনের ভেতর চলমান অস্থিরতা এখন আরও বেশি কাজ করছে। আবির মেঘের হাত থেকে ফুলগুলো নিয়ে সিঁড়ির পাশে রেখে অকস্মাৎ মেঘকে কোলে তুলে নিল। ওমনি মেঘের নিঃশ্বাস আঁটকে গেছে, আতঙ্কিত হয়ে মেঘ অতর্কিতেই আবিরের পাঞ্জাবির কলার খামচে ধরলো, শক্ত করে চোখ বন্ধ করে নিল। আবির মুচকি হেসে সিঁড়ির দিকে পা বাড়ালো। মস্তিষ্ক ক্ষণিকের জন্য আবেগশূন্য হয়ে গেছে। গাঁদা ফুলের পাপড়ি মেঘের চোখে মুখে বারি খাচ্ছে, আকাশচুম্বী লজ্জা আর ইতস্তততায় মেঘ চোখ খুলতে পারছে না, ইচ্ছে করছে সবকিছু ছেড়ে ছুড়ে কোনো এক অন্ধকারাচ্ছন্ন ভূখন্ডে পদার্পণ করতে। আবির যেতে যেতে তার পিএসকে উদ্দেশ্য করে থমথমে কণ্ঠে বলল, “মিরাজ, সবার খাবারের ব্যবস্থা করো।” “জ্বি

ভাইয়া।” মেঘের হুট করে নেয়া সিদ্ধান্তে আবিরের সবকিছু এলোমেলো হয়ে গেছে। না পারতেছিল মেঘকে আটকাতে আর না পারছিল নিজের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে। তাই বাধ্য হয়ে অফিসের স্টাফদের দিয়েই সবকিছু গুছাতে হয়েছে। তাদের খুব ইচ্ছে ছিল মেঘকে ফুল ছিটিয়ে ওয়েলকাম করবে, তাই আবিরও তেমন আপত্তি করে নি। আবিরের নিষ্পলক দৃষ্টি আঁটকে আছে মেঘের লজ্জায় ললিত ধৃষ্টতায়। মেঘের চোখ তখনও বন্ধ, আবিরের উষ্ণ শ্বাস আঁচড়ে পড়ছে মেঘের গায়ে। আবির ছাদের দরজার পাশে এসে থামলো। মেঘকে নামিয়ে শান্ত কণ্ঠে বলল, ” চাইলে এবার তাকাতে পারেন।” মেঘ মিটমিট করে তাকালো। সঙ্গে সঙ্গে মেঘের আঁখি যুগল প্রশস্ত হয়ে গেছে। সম্পূর্ণ ছাদ লাইটিং করা, রঙবেরঙের আলোতে সজ্জিত সবকিছু। রাকিব এগিয়ে এসে মৃদু হেসে বলল, ” সরি ভাবি, সময়ের অভাবে আজ ঠিকমতো সাজাতে পারি নি। কিন্তু বিশ্বাস করুন, আপনাদের বাসরঘর আমি নিজের হাতে সাজাবো। এমনভাবে সাজাবো যেন বাসরঘর দেখতে দেখতেই রাত পেরিয়ে যায়।” রাকিবের মুখে ভাবি ডাক শুনে মেঘ খুশি হবে নাকি বাকি কথার জন্য লজ্জা পাবে সেটাও বুঝতে পারছে না। আবির শক্ত কণ্ঠে ধমক দিল, “শুধু শুধু আমার বউটাকে লজ্জা দিচ্ছিস কেনো?” “ওহ হো। আমরা কিছু বললেই লজ্জা দিচ্ছি। আর তুই যে এখানে বাসর করার প্ল্যান করছিলি এটা বললে কি হবে!” আবির চোখ রাঙিয়ে পরপর মেঘের দিকে তাকিয়ে শান্ত কণ্ঠে বলল, ” বিয়ে করে রাকিবের মাথা নষ্ট হয়ে গেছে,

তুই কিছু মনে করিস না। চল ঐদিকে ।” সাউন্ডবক্সে একই গান বার বার বাজতেছে, “সাত সাগর আর তের নদী পার হয়ে তুমি আসতে যদি রূপকথার রাজকুমার হয়ে আমায় তুমি ভালবাসতে যদি” ছাদের একপাশে যেতেই মেঘ আরেক দফায় বিস্মিত হলো। লাইটিং করা ইংরেজি বড় বড় অক্ষরে লেখা, ” Marry Me?” মেঘ দু’হাতে মুখ চেপে সেই লেখাটা দেখছে। রাসেল, লিমন, মোবারক ভাইয়া সহ আবিরের আরও ৪-৫ জন ফ্রেন্ড এখানে উপস্থিত। এই অপরূপ মুহুর্তের কথা মেঘ কল্পনাতেও ভাবতে পারে নি। ছাদের এই কর্ণার টা কাঁচা ফুল দিয়ে এমন সাজানো যা দেখে মেঘের চোখ ই সরছে না। রাসেলরা সবাই আতশবাজিসহ আরও কিছু জিনিসপত্র নিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। মেঘ আবিরকে দেখার জন্য আলতোভাবে চোখ ঘুরালো। আবির হাঁটু গেড়ে বসে মেঘের দিকে একটা আংটি ধরে ক্ষীণ স্বরে বলল, “তুই আমার অবসন্ন হৃদয়ের অস্ফুট প্রফুল্লতা, আমার প্রণয়ের একমাত্র পরিণীতা।” আবিরের ধারালো ছুরির ন্যায় চাহনি। পুনরায় নেশাক্ত কণ্ঠে বলল, “Will you be my soulmate?” মেঘ আবেগময় কণ্ঠে ঝটপট বলল, “Yes.” আশেপাশে রাকিব,রাসেলদের দিকে তাকানোর মতো অবস্থা নেই মেঘের। সে এখন অন্য দুনিয়ায় আছে। আজকের এই দিনটা মেঘের কাছে স্বপ্নের মতো। আবির হাত বাড়াতেই মেঘ নিজের ডানহাতটা আবিরের হাতের উপর রাখলো। আবির সেই হাত সরিয়ে মেঘের বামহাত সামনে এনে মৃদুগামী হস্তে খুব যত্ন নিয়ে আংটি টা পড়িয়ে দিল। মেঘ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে

আছে, মনের ভেতর একটা প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে। গতবছর মেঘের জন্মদিনে আবির বামহাতের আঙ্গুলে আংটি পড়িয়ে দিয়েছিল বলে মিনহাজরা কত কি বলেছিল। মেঘও সেসব কিছু মেনে নিয়েছিল, ভেবে নিয়েছিল বিয়ের আংটি ডানহাতে পড়তে হয়,সেজন্য ই আজ ডানহাত বাড়িয়েছিল। আবির আংটি পড়িয়ে মেঘের হাতে চুমু খেয়ে মোলায়েম কণ্ঠে বলল, "লোকে বলে, বামহাতের অনামিকা আঙুলের সঙ্গে নাকি হৃদয়ের সরাসরি যোগ রয়েছে। তাই বিয়ের আংটি বামহাতে পড়াতে হয়। " মেঘ আনমনে শক্ত কণ্ঠে শুধালো, " আপনি গতবছরও আমার বাম হাতে আংটি পড়িয়েছিলেন। তখন লোকের কথা জানতেন না?" "জানতাম। আর জানতাম বলেই বাম হাতে পড়িয়েছিলাম। কারণ তুই আমার প্রেমিকা নস আমার বউ তুই।" মেঘ অপলক দৃষ্টিতে আবিরের মুখের পানে তাকিয়ে আছে। কতটা শক্ত কণ্ঠে আবির বার বার মেঘকে বউ বলে সম্বোধন করছে অথচ গত দুই বছরে এই মানুষটার মুখ থেকে একটা টু শব্দ পর্যন্ত বের হয় নি। লিমন স্বাভাবিক কণ্ঠে শুধালো, "এখন কি আতশবাজি ফুটাতে পারি?" আবির ঘাড় কাত করে সম্মতি দিল। পরপর মেঘের দিকে তাকিয়ে মেঘের হাতটা উপরে তুলে মৃদুস্বরে বলল, "আংটিটা পছন্দ হয়েছে? " আংটির দিকে না তাকিয়েই মেঘ বলে দিল, "আপনার দেয়া প্রতিটা জিনিস আমার কাছে উত্তম আর অমূল্য।" আবির মুচকি হেসে বলল, " একটু দেখে তো নে।" মেঘ এবার আংটির দিকে তাকালো। স্বর্ণের আংটিটা খুব বেশি বড় না হলেও ডিজাইনটা খুব সুন্দর। আংটির ঠিক

মাঝ বরাবর অত্যন্ত নিখুঁত ভাবে A লেখা। আবির শান্ত কণ্ঠে বলল, “আংটিটা সবসময় হাতে রাখবি।” মেঘ তৎক্ষনাৎ আংটিতে চুমু খেয়ে বলে উঠল, “আমি এই আংটি কখনো খুলবোই না।” মেঘের কান্ড দেখে আবিরের ঠোঁট চেপে হাসছে। রাকিবরা ছাদের অন্যপাশে গিয়ে আতশবাজি ফুটাচ্ছে। বাজির শব্দে মেঘ সেদিকে তাকিয়ে উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, “আমিও বাজি ফুটাবো।” “ওকে। ” মেঘ দু-একটা ফুটানোর চেষ্টা করেছে। অতঃপর দূরে সরে এসেছে। দাঁড়িয়ে দাড়িয়ে তাদের হৈ-হুল্লোড় দেখছে আর হাসছে। এখনও আরও অনেক বাজি ফুটানো বাকি আবির আচমকা মুখ ফুলিয়ে শক্ত কণ্ঠে বলল, “তোরা এখন নিচে যা। আমার ওর সঙ্গে কথা আছে। ” মোবারক হেসে বলল, ” শেষ করেই চলে যাব।” ” কয়টা বাজে দেখছিস? এক্ষুনি যা।” তারাও আর কোনো কথা বলে নি। জিনিসপত্র নিয়ে নেমে যাচ্ছে। আবির ছাদের দরজা লাগাতে গেল। রাকিব আচমকা ঘুরে দরজায় উঁকি দিয়ে বলল, ” প্রয়োজনে রুম সাজিয়ে দিচ্ছি তবুও ছাদে বাসর করার প্ল্যান করিস না যেন!” আবির রাগান্বিত কণ্ঠে চেঁচাল, ” যাবি... ” রাকিব হাসতে হাসতে নেমে যাচ্ছে। আবির ছাদের দরজা বন্ধ করে মেঘের কাছে এগিয়ে আসলো। মেঘ ভ্রু কুঁচকে বলল, “ওনারা কত আনন্দ করছিল। আপনি ওনাদের ওভাবে তাড়িয়ে দিলেন কেনো?” আবির গম্ভীর কণ্ঠে বলল, “ওদের আনন্দের থেকেও তোর সাথে কথা বলাটা জরুরি। ” মেঘ সূক্ষ্ম নেত্রে তাকিয়ে ভয়ে ভয়ে শুধালো, “কি কথা?” ভয়ে মেঘের বুক কাঁপছে। বিকেল থেকে এখন

পর্যন্ত ঘটা প্রতিটা দৃশ্য চোখের সামনে ভাসছে। আনমনে বলে উঠল, " আপনি আবারও আমায় ছেড়ে চলে যাবেন না তো?" আজকের এই স্পেশাল দিনে মেঘের মুখে এমন আজগুবি প্রশ্নে আবির খুব বিরক্ত হলো। কপালে কয়েকস্তর ভাঁজ ফেলে চোখ ছোট করে বলল, " তোর চোখের পাতায় কি লাগছে? দেখি, চোখটা বন্ধ কর তো।" মেঘ সঙ্গে সঙ্গে চোখ বন্ধ করে শুধালো, "কি লাগছে?" আবির এক সেকেন্ড দেরি না করে মেঘের লাল রঞ্জকে সুশোভিত ওষ্ঠে নিজের অধর ছোঁয়াল। অনাকাঙ্ক্ষিত স্পর্শে সহসা চোখ মেলল মেঘ। স্বাভাবিকের তুলনায় দু'চোখ তিনগুণ প্রশস্ত হয়ে গেছে। মেঘের হৃদয়ে তোলপাড় করা রঙবেরঙের অনুভূতিগুলো নিস্তব্ধ হয়ে গেছে, শ্বাসনালীতে ভয়ানক ঝড় চলছে । আবিরের খোঁচা খোঁচা দাঁড়ির আমর্শে মেঘের শিরা-উপশিরার রক্ত সঞ্চালন পর্যন্ত বেড়ে গেছে। আবিরের উষ্ণ শ্বাস মেঘের নাকে-মুখে লাগছে। মেঘ দু'হাতে আবিরের বুকের ধাক্কা দিয়ে দূরে সরানোর চেষ্টা করলো। সরাতে তো পারলোই উল্টো আবির মেঘের উদর আঁকড়ে ধরে মেঘের আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়ালো। আবিরের ঘনিষ্ঠতায় মেঘের প্রশস্ত আঁখি আরও বেশি প্রশস্ত হলো। আবির অন্য হাত দিয়ে মেঘের দু'চোখ বন্ধ করে দিল। আবিরের নিগূঢ় সংস্পর্শে মেঘের গায়ে কাটা দিয়ে উঠছে। ঘামে জবজবে মেঘের শরীর বেয়ে অনর্গল পানি পরছে। নিজেকে ছাড়ানোর চেষ্টায় ব্যর্থ হচ্ছে বারবার, মেঘের এলোমেলো নিঃশ্বাস, কোনোকিছুই যেন আবিরের থেকে ছাড়াতে পারলো না মেঘকে। এভাবে কত মিনিট কেটেছে জানা

নেই। আবির মেঘের অধর থেকে অধর সরিয়ে শক্ত করে জড়িয়ে ধরল মেঘকে। মেঘের কানের কাছে মুখ এগিয়ে ফিসফিস করে বলল, “এখন থেকে বাজে কথা বললে এভাবেই শাস্তি দিব। মনে থাকবে?” মেঘ কণ্ঠ খাদে নামিয়ে আস্তে করে বলল, “হু।”অযাচিত পরিস্থিতিতে মেঘ সচকিত হয়ে আছে। নিষ্কলুষ মনে জমে থাকা ভয়, ভীতি আর অভিমানেরা অবিদিতে গুম হয়ে গেছে। আবির ভাইকে নিজের করে পাওয়ার যে উন্মাদনা এতদিন তাড়া করে বেড়াচ্ছিল সেই উন্মাদনার পরিসমাপ্তি ঘটেছে আজ। আবিরের অনুষঙ্গে নিজেকে হারাতে বসেছে। আবিরের অপলক দৃষ্টি, নেশাক্ত কণ্ঠ, হাস্যোজ্জ্বল চেহারা আর অনভিলাষিত ঘনিষ্ঠতা অবসহন করতে অনল্পে হিমসিম খেতে হচ্ছে। আবির মেঘকে ছেড়ে কিছুটা দূরে সরে দাঁড়িয়েছে ঠিকই তবে মেঘের মায়াবী আদলে নজর আঁটকে আছে, আবিরের অত্যুষ্ণ চাহনিতে মেঘের বুকের ভেতরটা লজ্জায় হাস ফাঁস করছে, অতর্কিতে চিবুক নামিয়ে নিলো। আবির সঙ্গে সঙ্গে দু আঙুলে পুনরায় মেঘের চিবুক উঠিয়ে মোলায়েম কণ্ঠে বলল, ” তুই জানিস তোকে আজ কতটা সুন্দর লাগছে?” মেঘ চোখ তুলে তাকিয়ে কাঁপা কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করল, “কতটা?” ” সমুদ্রের প্রভূত জলরাশি যতটা সুন্দর ঠিক ততটা। দেখতে প্রশান্ত হলেও সঙ্গিন।” মেঘ মলিন হাসলো। আবির পরপর শক্ত কণ্ঠে শুধালো, ” তোকে শাস্তিটা কেনো দিয়েছি জানিস?” “বাজে কথা বলেছি তাই।” “জ্বি না। আপনি আমার সাজানো পরিকল্পনা নষ্ট করেছেন তারজন্য। ” “আমি কি করেছি?” আবির শ্বাস ছেড়ে বলতে

শুরু করল, " ২ টা বছর ধৈর্য রাখতে পারলেন অথচ আর ২ টা দিন ধৈর্য রাখতে পারলেন না। আমি বলেছিলাম, আপনাকে আমি কোনো প্রকার প্রতিশ্রুতি দিব না,সরাসরি বিয়ে করব। মানে আজ আপনাকে বলব, কাল বিয়ে করব এমনটায় ভেবে রেখেছিলাম। আমার সবকিছু প্ল্যান করা, আজ থেকে দুদিন পর আপনাকে প্রপোজ করতাম, তার পরদিন গায়ে হলুদ আর সবশেষে বিয়ে। কিন্তু আপনি অধৈর্য হয়ে আজ ই চলে আসছেন। আপনাকে ফিরিয়ে দেয়ার সাধ্য আমার ছিল না, তাই নিজের সাজানো পরিকল্পনার কথা ভুলে আপনার ইচ্ছেকে প্রায়োরিটি দিলাম। আমার প্ল্যান ধ্বংস করার শাস্তি তো আপনাকে পেতেই হতো।" মেঘের চোখ নামিয়ে নিয়েছে, এখন কথা বলতে একদম ইচ্ছে করছে না। এতদিন আত্মগোপনে থাকা অনুভূতিরা বার বার জানান দিচ্ছে, সম্মুখে দাঁড়ানো ব্যক্তির চোখে চোখ রাখলেই নিজের অস্তিত্ব বিলীন হতে বাধ্য। আবির মেঘের দিকে তাকিয়ে শক্ত কণ্ঠে বলল, " তুই আমায় ভালোবাসিস?" মেঘ ক্ষীণ স্বরে বলল, "হ্যাঁ, অনেক ভালোবাসি। আর আপনি?" আবির উত্তর না দিয়ে উল্টো প্রশ্ন করল, "কতটা ভালোবাসিস?" "যতটা ভালোবাসলে আপনার হৃদয়ের প্রতিটা অনুনাদে আমার নাম শুনা যাবে ঠিক ততটা ভালোবাসি। " " আমার জন্য সব করতে পারবি?" মেঘ কপাল কুঁচকে বলল, "সব পারবো কিন্তু আপনাকে ছাড়তে পারবো না। " " আজ যদি আবির অথবা পরিবার দুটা থেকে যেকোনো একটাকে বেছে নিতে বলা হয়। তখন তুই কি করবি? বেছে নিতে পারবি আমাকে?" মেঘ শীতল

চোখে তাকিয়ে ভেজা কণ্ঠে বলল, " পারবো। " আবির মলিন হেসে শুধালো, " যদি বলা হয় আবিরকে ছাড়তে হবে তখন?" মেঘ অতর্কিতে আবিরকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলল, " আমি আপনাকে ছাড়তে পারবো না, প্লিজ। আর যাই বলেন আমি সব মেনে নিব, বাসায় মেনে না নিলে সারাজীবন আপনার সাথে থেকে যাব তবুও কারো কথায় আপনাকে ছাড়তে পারবো না।" আবির মেঘের চোখ মুছে ধীর কণ্ঠে বলল, " কাঁদতে বারণ করেছিনা তোকে?" মেঘ ভেজা কণ্ঠে বলল, " বাসায় কি কোনোভাবেই আমাদের মেনে নিবে না?" আবির দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলতে শুরু করল, " শুধুমাত্র বাসায় মানানোর চেষ্টায় গত তিনবছর যাবৎ অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছি। আমি আমার বাবা মায়ের একমাত্র ভরসা। ওনারা আমাকে অনেক ভালোবাসেন, একজন দায়িত্বশীল ছেলে হিসেবে আমাকেও আজীবন ওনাদের পাশে থাকতে হবে। আমি স্বইচ্ছায় কোনোদিন আব্বু আম্মুর সাথে সম্পর্ক নষ্ট করব না। তিনবছরে আমি আমার সবটুকু দিয়ে চেষ্টা করেছি এখনও করছি। শুধুমাত্র ওনাদের চোখে যোগ্য হওয়ার জন্য প্রাইভেট কার কিনেছি, আলাদা কোম্পানি দাঁড় করিয়েছি, বাসা পর্যন্ত করেছি। ওনারা যোগ্যতা চাইলে আমি আজ জোর গলায় বলতে পারব, হ্যাঁ আমি তোর জন্য যোগ্য। তোকে পাওয়ার জন্য ওনারা যদি শর্ত দেন, আমি আব্বু-চাচ্চুর দেয়া যেকোনো শর্ত মেনে নিতে রাজি। তবুও তোকে আমার লাগবে। কিন্তু ওনারা যদি আমাদের সম্পর্ক মেনে না নেয় বা তোকে ছাড়ার কথা বলে তখন আমি চুপ থাকতে

পারবো না। পরিস্থিতি যদি এমন হয় যে বাসা থেকে বেড়িয়ে আসতে হয় আমি চুপচাপ বাসা থেকে বেড়িয়ে আসবো কিন্তু তোকেও তখন আমার সঙ্গে বেড়িয়ে আসতে হবে। বিশ্বাস কর, আমি তোকে কষ্টে রাখবো না। আর তোকে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্নও করব না। কারণ আমি জানি আমার থেকেও তোর অনেক বেশি আবেগ জড়িয়ে আছে ঐ বাসায়। কিন্তু কি করব বল? আমার যে তোকে লাগবেই লাগবে। বাসায় মেনে না নিলে হয়তো কয়েকটা দিন একটু দূরে থাকতে হবে তারপর আমি সব ঠিক করে দিব। জাস্ট কয়েকটা দিন। ফুপ্পির মতো ২৮ বছর পরিবার ছেড়ে থাকতে হবে না তোকে। আব্বু ছাড়া বাকি সবাইকে মানিয়ে নিতে পারবো। হয়তো আব্বু একটু ঝামেলা করবেন। তবে যাই হোক, আজ তোকে আমার সাথে থাকতে হবে। থাকবি তো?" মেঘ ঠান্ডা কণ্ঠে বলল, "থাকবো।" প্রায় এক ঘন্টা সময় নিয়ে আবির মেঘকে বুঝিয়েছে। কি কি করতে হবে, কি বলতে হবে সব বুঝিয়ে দিয়েছে। ততক্ষণে এশার আজানের সময় হয়ে গেছে। আবির পকেট থেকে ফোন বের করে সময় দেখে নিল। বিকেল থেকে এই পর্যন্ত ২৪ টা কল আসছে। ফোন সাইলেন্ট থাকায় টের পায় নি, তানভির কলের পর কল দিচ্ছে। মেঘকে নিয়ে ফিরলে বাসায় যেতে হবে, এদিকে আলী আহমদ খান, মোজাম্মেল খান, ইকবাল খান তিনজন মিলে অনেকগুলো কল দিয়েছেন। দুপুরে মিটিং শেষে সিফাতের সঙ্গে আবিরের খুব রাগারাগি হয়েছে। আর একটুর জন্য হাতাহাতি হতে যাচ্ছিলো। সিফাতের চালচলন আবিরের একদম পছন্দ

না, ছেলেটা যতই ভালো সাজার নাটক করুক না কেন, আবিরের সামনে বার বার ধরা পরেছে। কিন্তু আলী আহমদ খানের চোখে সিফাত খুবই ভদ্র ছেলে। আজ সকালেই আলী আহমদ খান ল্যাপটপে সিফাতকে ফ্যামিলি ফটো দেখাচ্ছিলেন। আবির অফিসে ঢুকতেই সিফাতের কণ্ঠ কানে আসছে, " মেঘ তে মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর হয়েছে। বিয়ে দেন নি কেনো এখনও? একদিন সময় করে মেঘকে দেখতে যাব সাথে সবার সাথে পরিচয়ও হয়ে যাবে।" আলী আহমদ খান কথাটা তেমনভাবে গুরুত্ব না দিলেও আবিরের শরীর রাগে জ্বলছিল। আব্বুর সামনে কিছু বলতে পারছিল না আবার চুপ ও থাকতে পারছিল না। তারউপর মিটিং থেকে বের হতেই দেখল, সিফাতের ফোনের স্ক্রিনে আবিরদের ফ্যামিলি ফটোতে থাকা মেঘের ছবিটা বড় করে দেখছে। ঐ ছবি দেখে আবিরের মেজাজ তুঙ্গে। রাগে চিৎকার করতেই সিফাত ছবি কেটে দিয়েছে, ইকবাল খান দ্রুত ছুটে আসেন,ওনি কিছু না বুঝলেও আবিরের অগ্নিমূর্তি ধারণকৃত রূপ দেখে টেনে হিঁচড়ে আবিরকে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। আলী আহমদ খান তখনও নিশ্চুপ ছিলেন। সবকিছুতেই ওনার মনে হচ্ছিল, আবির সিফাতকে জব দিতে নিষেধ করেছিল আর সেই ক্ষোভেই সিফাতের সাথে রাগারাগি করে। তারউপর আলী আহমদ খান বলে বসেন, সিফাতকে বাসায় থাকার ব্যবস্থা করে দিবেন। এই কথা শুনে আবিরের রাগ তিনগুণ বেড়ে গেছিল। আলী আহমদ খানের সাথে রাগারাগি করে আবির তখনই অফিস থেকে বেড়িয়ে আসছিলো।

নিজের অফিসে এসে কেবিনে বসার ১০ মিনিটের মধ্যে কল আসে, মেঘ শাড়ি পড়ে বাসা থেকে বেড়িয়েছে। একে আব্বুর উপর মেজাজ খারাপ, সবকিছু মিলিয়ে বিরক্ত তারউপর মেঘের আকস্মিক কর্মকাণ্ডে অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রেয়সীর কথা ভেবে বেড়িয়েছিল। আর এখনও হাসিমুখে মেঘকে সময় দিচ্ছে। তবে সেই বিকেল থেকেই ফোন সাইলেন্ট করে রেখেছে। আজ যা হবে খান বাড়িতেই হবে। আবির মেঘের সাথে কথা শেষ করে মেঘকে নিয়ে নিচে আসলো। ততক্ষণে স্টাফদের প্রায় সবাই চলে গেছে। মিরাজ আর তার দু-তিনজন ফ্রেন্ড বসে আছে। আবিরদের নামতে দেখে শান্ত কণ্ঠে বলল, " ভাইয়া সবার খাওয়া শেষ। ওনারা যে যার মতো চলে গেছেন।" আবির ঠান্ডা কণ্ঠে বলল, " আচ্ছা, কিন্তু রাকিবরা কোথায়?" মিরাজ রাশভারি কণ্ঠে বলল, " রিয়া ভাবি কল দিয়েছিল, ওনি বোধহয় অসুস্থ। রাসেল ভাইয়াকে নিয়ে তাড়াহুড়ো করে গেছেন, কল দিয়েছিলাম রিসিভ করেন নি। " "ওহ। রাকিবরা খেয়েছে?" "হ্যাঁ হ্যাঁ, সবার খাওয়া হয়েছে। " "তোমরা খেয়েছো?" "না ভাইয়া, তোমরা খাওয়ার পর খাবো।" আবির স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, " খেয়ে নিলেই পারতে। " আবির মেঘকে খাবার রেডি করে দিচ্ছে। আজকের সব খাবার রেস্টুরেন্ট থেকে আনানো। সন্ধ্যার দিকে মিরাজের ফ্রেন্ডরায় খাবার নিয়ে আসছে, সাথে ওয়ান টাইম প্লেট আর গ্লাসও নিয়ে আসছিল। মেঘকেও সেই প্লেটেই খাবার দিয়েছে আবির। মিরাজ আর ওর ফ্রেন্ডরা ছাদে গেছে। মেঘ জিজ্ঞেস করল, "আপনি খাবেন না?"

“খেতে ইচ্ছে করছে না। যতক্ষণ না সবকিছু ঠিকঠাক হচ্ছে ততক্ষণ স্থির হতে পারছি না। ” মেঘ আবিরের চোখের দিকে তাকিয়ে মোলায়েম কণ্ঠে বলল, ” যা হবার হবে। সারাদিন খান নি, আগে খেয়ে নিন। আমি খাইয়ে দেয়?” আবির আড়চোখে তাকিয়ে মৃদু হেসে বলল, ” বাব্বাহ! বউ বউ ফিল এসে গেছে নাকি?” মেঘ ভেঙচি কেটে বলল, “দেখি, হা করেন। ” আবির কথা না বাড়িয়ে চুপচাপ খেয়ে নিল। খেতে খেতে তানভিরকে কল দিয়ে কথা বলে নিয়েছে। মিরাজকে আগেই বলেছিল আবির শার্ট আর প্যান্ট নিয়ে আসার জন্য। আবির পাঞ্জাবি, পায়জামা পাল্টে শার্ট প্যান্ট পড়ে মিরাজদের থেকে বিদায় নিয়ে রওনা দিল। আজ মিরাজরা এখানেই থাকবে আগামীকাল তানভির এসে সবকিছু গুছিয়ে রেখে যাবে। যাওয়ার আগে মেঘ হলুদ আর সাদা সবগুলো গোলাপ একসঙ্গে শপিং ব্যাগে করে নিয়ে গেছে। আসার সময় সময় কিছুটা দূরত্ব থাকলেও এখন বাইকে বসেই মেঘ পেছন থেকে আবিরকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরেছে। আবির মুচকি হেসে নিজের একহাত মেঘের দু’হাতের উপর রেখে উদ্বেলহীন কণ্ঠে বলল, ” বাসায় উল্টাপাল্টা কিছু বললে এভাবে জড়িয়ে ধরতে পারবেন তো?” মেঘ আস্তে করে বলল, “দেখা যাক। আপনি পারবেন?” আবির মৃদু হেসে বলব, ” অবশ্যই, আমি একদম কোলে নিয়ে চলে আসবো।” মেঘ মেকি স্বরে বলে উঠল, “আমিও দেখব আপনার কেমন সাহস।” “ওকে।” আবির বাইক স্টার্ট দিল। মেঘ আবিরের প্রশস্ত পিঠে মাথা এলিয়ে আবিরের গায়ের গন্ধ উপলব্ধি করছে। অনেকটা

পথ যাওয়ার পর মেঘ আচমকা ডাকল, “আবির ভাই... ” আবির তৎক্ষনাৎ ব্রেক কষল। বাইক থেকে নেমে মেঘের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গুরুতর কণ্ঠে বলল, ” কথায় কথায় ভাই বলার অভ্যাস টা ত্যাগ করুন। আমি আপনার ভাই না, ওকে?” মেঘ শান্ত স্বরে শুধালো, “ভাই না ডাকলে কি ডাকব?” “আবির ডাকবি।” মেঘ চোখ বড় করে তাকিয়ে বলল, “আমি পারব না।” “কেনো?” “স্বামীর নাম মুখে নিতে নেই আপনি জানেন না?” আবির হাসতে হাসতে বলল, ” হায় রে কুসংস্কার। গত দুই বছরে আবির ভাই, আবির ভাই ডাকতে ডাকতে কান তব্দা করে ফেলছিল। এখন বলতেছিস স্বামীর নাম মুখে নিতে নেই। ” মেঘ মুখ চেপে শক্ত কণ্ঠে বলল, “তখন আপনি আমার স্বামী ছিলেন না, চাচাতো ভাই ছিলেন। বুঝেছেন?” “বুঝেছি। কিন্তু আর একবার যদি আবির ভাই বলেছিস তাহলে বামহাতে কানের নিচে এমন থা*প্পড় দিব, তিনদিন বেহুঁশ থাকবি।” মেঘ হুঙ্কার দিয়ে উঠল, ” তাহলে ডাকব কি আমি?” আবির নির্দ্বিধায় বলল, “আহিয়ার আব্বু।” মেঘ উদ্বেগপূর্ণ কণ্ঠে প্রশ্ন করল, ” আহিয়া কে? ” আবির মুচকি হেসে বলল, “আমার মেয়ে।” “হোয়াট? আপনার মেয়ে আসলো কোথা থেকে? ” আবির দুষ্টামীর স্বরে বলল, “মেয়ে আমার একার না, আমাদের দু’জনের মেয়ে আহিয়া।” “মেঘ নিজের পেটে হাত রেখে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলল, “আমাদের মেয়ে মানে? আমার তো এখনও বিয়েই হয় নি। মেয়ে কোথা থেকে আসবে?” আবির নিঃশব্দে হেসে মেঘের মাথায় আস্তে করে গাট্টা দিয়ে বলল, “আরে বোকা মেয়ে, আমি

আমাদের অনাগত সন্তানের কথা বলছি।” মেঘ আহাম্মকের মতো তাকিয়ে বলল, ” ছিঃ আপনার কি লজ্জা লাগে না?” “ওমা, লজ্জা লাগবে কেনো?” “এইযে আজেবাজে কথা বলছেন। ” ” হবু সন্তানের কথা বউকে বলতে গেলে যদি লজ্জা পেয়ে হয় তাহলে এ নির্লজ্জময় জীবন আমি রাখবো না।” মেঘ বিরক্তি ভরা কণ্ঠে বলল, ” ফাজলামি রেখে তাড়াতাড়ি বাসায় চলুন। আজ বাসায় যে কি হবে! দেখা যাবে আমার, আপনার জীবনই ঘূর্ণিঝড়ে উড়ে যাবে। তখন এই আহিয়া, আবিহা হাজার কেঁদেও তার বাপকে পাবে না। ” আবির দু আঙুলে আলতোভাবে মেঘের নাক চেপে হেসে বলল, “তারমানে আপনি মেনে নিচ্ছেন, আহিয়া আমার মেয়ে আর আপনি তার মা। ” মেঘ ফোঁস করে উঠে আবিরের হাতে চিমটি কেটে বলল, “আপনি কি যাবেন?” আবির “উফফফ” করতে করতে বাইকে বসলো। বাইক স্টার্ট দিতে দিতে তপ্ত স্বরে বলল, ” অবোধ জামাইকে চিমটি কাটা মোটেই ভালো লক্ষণ না। ” “আল্লাহ! বিয়ের খবর নাই আর ওনি জামাই জামাই করে বেহুঁশ হয়ে যাচ্ছেন। ” আবির গম্ভীর কণ্ঠে বলল, “বাসায় মানলে বিয়ে দুই তিনদিন পরে হবে আর বাসায় না মানলে রাতেই আপনাকে নিয়ে পালাবো।” মেঘ আর কিছু না বলে আবারও আবিরকে জড়িয়ে ধরে বসলো। বুকের ভেতর চাপা কষ্টগুলো প্রকাশ করতে পারছে না, আজ বাসায় কি হতে চলেছে সেসব ভেবেই আঁতকে উঠছে বারবার। দীর্ঘসময় পর মেঘ আবিরের পিঠে মাথা রেখেই আস্তে করে ডাকল, “এইযে...” আবির নিরুত্তর। মেঘ আবারও ডাকল, “এইযে শুনছেন...”

আবির এবারও নিরুত্তর। মেঘ গলা খাঁকারি দিয়ে মায়াবী কণ্ঠে বলল, " আহিয়ার আব্বু..." "হুমমমম আহিয়ার আম্মু, বলো।" মেঘ উদাসীন কণ্ঠে শুধালো, " আমার জন্য এতকিছু করলেন অথচ একবারের জন্যও I Love You বা ভালোবাসি বললেন না। কেনো?" "ভালোবাসি না বললে কি ভালোবাসা যায় না? দুজন দু'জনের অনুভূতি বুঝতে পারাটা কি ভালোবাসা নয়? দু'জন দু'জনকে পাগলের মতো ভালোবাসতে চাইলে 'ভালোবাসি' শব্দটা কি বলতেই হবে?" মেঘ উত্তর খোঁজে পেল না। সত্যি ই তো, একজন আরেকজনের অনুভূতি বুঝা, পাশে থাকা, চাওয়া পাওয়ার মূল্যায়ন করা, দু'জন দু'জনকে সম্মান করা এগুলোই তো ভালোবাসার প্রতীক। মুখ ফোটে ভালোবাসি না বলেও বাবা মায়েরা আমৃত্যু সন্তানদের নিঃস্বার্থভাবে ভালোবেসে যান, স্বামী- স্ত্রী একে অপরের পরিপূরক হিসেবে সারাজীবন পাশে থাকেন, ভাই-বোনের সম্পর্কেও কেউ কাউকে ভালোবাসি বলে না অথচ কারো কোনো সমস্যা হলে সবার আগে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তবে কেনো ভালোবাসি কিংবা I Love You শোনার এত প্রবণতা সবার মাঝে। প্রতিনিয়ত 'ভালোবাসি' বললেই কি সত্যিকারের ভালোবাসা খোঁজে পাওয়া যায়? মেঘ আবিরকে আরও শক্ত করে জড়িয়ে ধরল। আর কিছু বলার বা শুনার ইচ্ছে নেই মেঘের। বাসার কাছাকাছি আসতে বেশ কিছুটা সময় লেগেছে। বাসা থেকে কিছুটা দূরে বাইক থামিয়ে দুজনেই নামল। পরপর কল দিল তানভিরকে। তানভির অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে কিছুক্ষণ হলো একটা কাজে গেছে। আসতে একটু সময় লাগবে।

কয়েক ঘন্টা শাড়ি পড়ে হাঁটা চলা করায় শাড়ির যাচ্ছেতাই অবস্থা হয়ে গেছে। আবির মেঘের শাড়ির কুঁচি ঠিক করতে করতে বলল, “একা যেতে পারবি নাকি তানভির আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করবি?” “যেতে পারব।” “শুন, কারো সঙ্গে কোনো কথা বলার প্রয়োজন নেই। সোজা নিজের রুমে গিয়ে ফ্রেশ হয়ে রেস্ট নিবি।” “আচ্ছা। যাবো এখন ?” “হুমমমম।” মেঘ গোলাপগুলো হাতে নিয়ে বাসার উদ্দেশ্যে যাচ্ছে। আবির নিষ্পলক দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে আছে। মেঘ কিছুদূর যেতেই আবির উচ্চস্বরে ডাকল, “মাহদিবা খান মেঘ” মেঘ সহসা থমকে দাঁড়িয়ে পেছন ফিরল। আবির পূর্বের ন্যায় আবারও বলল, ” সাজ্জাদুল খান আবিরের মিসেস হবার প্রস্তুতি নিন। খুব শীঘ্রই আপনি আমার বেগম হচ্ছেন।” মেঘ অবাক লোচনে তাকিয়ে নিঃশব্দে হাসলো। হাত নেড়ে বিদায় দিয়ে সামনে ঘুরলো। একপা বাড়াতেই আবির উদ্ধত কণ্ঠে আবার বলল, “I Love You Megh. I Love You Infinity. ” মেঘ অতর্কিতে ঘুরে দাঁড়ালো, আশ্চর্য নয়নে তাকালো আবিরের মুখের দিকে। I love you শুনার অণুমাত্র ইচ্ছেও মেঘের ছিল না। অনাকাঙ্ক্ষিত কথাটা শুনে নিজের আবেগ আঁটকে রাখতে পারলো না। এক ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরলো আবিরকে। আহ্লাদী কণ্ঠে বলল, “I Love You Infinity.” আবির মেঘের মুখটা তুলে কপাল বরাবর চুমু খেয়ে শান্ত স্বরে বলল, ” ভালোবাসি, ভালোবাসি, ভালোবাসি আমৃত্যু ভালোবাসি তোকে। ” মেঘের বিস্মিত আঁখি যুগল আবিরের চোখে নিবদ্ধ। ফাঁকা রাস্তা, কিছুটা দূরে থাকা ল্যামপোস্টের

আলো আবিরের শ্যামলা চেহারায় পড়ছে মেঘ সেই মায়াময় আদলে তাকিয়ে থেকে আনমনে বলে উঠল, " আপনি এত কিউট কেন?" আবির মৃদু হেসে বলল, " এখন কিন্তু শাস্তি দিব।" মেঘ তৎক্ষনাৎ আবিরকে ছেড়ে কিছুটা সরে দাঁড়ালো। পরপর থমথমে কন্ঠে শুধালো, "ভালোবাসি বলবেন না তো এখন বললেন কেনো?" আবির তপ্ত স্বরে বলল, " আমি তোর কোনো ইচ্ছে অপূর্ণ রাখব না তাই।" মেঘ অত্যন্ত নমনীয় কন্ঠে বলল, " আমার খুব ভয় হচ্ছে। " আবির হিজাবের উপর দিয়ে মেঘের দুগালে হাত রেখে চাপা স্বরে বলল, " আমি আছি তো তোর পাশে। ভয় কিসের? আমি বেঁচে থাকতে তোর উপর একটা আঁচড়ও পড়তে দিব না। " মেঘ আবিরের থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেছে। আবির কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে সেদিকে তাকিয়ে রইলো। মেঘের সামনে কিছু প্রকাশ করতে না পারলেও আবিরের বুকের ভেতর ভয়ংকর তোলপাড় চলছে। কি হবে বা হতে চলেছে সেসব ভেবেই গলা শুকিয়ে যাচ্ছে। মনে আতঙ্ক বাসা বেঁধেছে অনেক আগেই। তারউপর দুপুরে আব্বুর সাথে রাগারাগি করে অফিস থেকে বেড়িয়েছে, সারাদিন আব্বুর ফোনটা পর্যন্ত রিসিভ করে নি। মেঘ বাসায় ঢুকে গেছে। আবির পকেট থেকে ফোন বের করতেই দেখল আলী আহমদ খানের কল আসতেছে। আবির এবার দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে কলটা রিসিভ করল,আবির কিছু বলার আগেই আলী আহমদ খান উদ্বিগ্ন কন্ঠে বললেন, "আবির, তুমি কি শোধরাবে না? কলের পর কল দিতে দিতে ক্লান্ত হয়ে যাচ্ছি অথচ তোমার কোনো খবর নেই।

এত কিসের রাগ তোমার?” আবির শান্তস্বরে বলল, “বলুন।” “আমি কি বলব? কি বলতে বাকি রাখছো তুমি? রাজশাহীর অফিসে সমস্যা হয়েছে। বিকেলের দিকে খুব মারামারি হয়েছে। এখনও পরিস্থিতি ভালো না। তোমার চাচ্চুর শরীর খারাপ অফিসেই আসে নি। এদিকে তুমি সারাদিন ধরে রাগ করে বসে আছো। বাধ্য হয়ে এখন আমাকেই যেতে হচ্ছে। ” আবির উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, “আপনি যাচ্ছেন মানে? আপনাকে কোথাও যেতে হবে না। আমি এখনি আসছি। ” আলী আহমদ খান রাগান্বিত কণ্ঠে বললেন, ” ব্যবসা যেহেতু আমায় সব দায়ও তো আমার ই। মরি আর বাঁচি ব্যবসায় করে যাবো। তোমরা তোমাদের রাগ নিয়ে থাকো।” আবির কণ্ঠ খাদে নামিয়ে বলল, ” আপনি কোথায় আছেন? ” “বাসস্ট্যান্ডে।” “আমি আসতেছি এখনি।” “আসতে হবে না। ” “আসতেছি আমি।” এদিকে মেঘ শাড়ির আঁচলের নিচে ফুল আর আংটি পরিহিতা হাত লুকিয়ে বাসায় ঢুকলো। রান্নাঘরে মালিহা খান আর আকলিমা খান কাজ করছেন। আর কেউ নেই। এই সুযোগে মেঘ দ্রুত চলে যাচ্ছে। মালিহা খান অকস্মাৎ মেঘকে দেখে ডেকে উঠলেন, ” শাড়ি পরে কোথায় গিয়েছিলি তুই? এত রাত করে বাসায় আসছিস কেনো?” মেঘ ছোট করে বলল, “ঘুরতে গিয়েছিলাম।” মেঘ আর কোনো কথা না বলে দ্রুত নিজের রুমে চলে গেছে। একদম শাওয়ার শেষ করে বিছানায় শুয়েছে। বন্যার কথা মনে হতেৎ সঙ্গে সঙ্গে বন্যাকে কল দিল। আজকের সব ঘটনা একে একে বলছে। আবির দ্রুত বাসস্ট্যান্ড পৌছালো। আলী আহমদ

খান ব্যাগ নিয়ে ব্রেঞ্চে বসে বসে চা খাচ্ছেন। আবির সামনে গিয়ে ঠান্ডা কণ্ঠে বলল, " আব্বু, আপনি বাসায় যান, আমি যাচ্ছি।" "এভাবে কিভাবে যাবে? বিকেল থেকে অনবরত কল দিচ্ছি তোমাকে, ইকবাল এমনকি মোজাম্মেলকে দিয়েও কল দেয়ালাম । আর তুমি কি করলে? কল রিসিভ করার প্রয়োজন মনে করলে না। এখন এসে বলছো, তুমি যাবে। মজা করছো?" "সরি আব্বু, আর এমন হবে না।" আলী আহমদ খান রাগান্বিত কণ্ঠে হুঙ্কার দিলেন, " এখন সরি বলতে হবে না। যাও রাগ করে গাল ফুলিয়ে বসে থাকো, প্রয়োজনে ৭ দিন বসে থাকো। আমি চলে যাচ্ছি, তোমাকে আর কেউ বিরক্ত করবে না। " আবির শীতল কণ্ঠে বলল, "সরি, আব্বু। আর এমন করবো না। রিয়েলি সরি। এই আমি কানে ধরছি.." আলী আহমদ খান চায়ের কাপ রেখে বসা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে আবিরের হাত আঁটকে বললেন, " কানে ধরতে হবে না। বাবা মায়ের কাছে সন্তানের হাজারটা ভুলও কিছুই না। " আবির মলিন হেসে বলল, "রাজশাহী আমি যাচ্ছি, আপনার এই শরীর নিয়ে এতদূর যেতে হবে না।" "তুমি তো জামাকাপড় পর্যন্ত নিয়ে আসো নি। কিভাবে যাবে?" "দু একটা জামাকাপড় কিনে নিব। সমস্যা নেই।" "তোমার বাইক কি করবা?" "তানভির এসে বাইক আর আপনাকে নিয়ে যাবে। কোনো সমস্যা নেই। আমি ওকে কল দিচ্ছি।" "ঠিক আছে, যাও। কিন্তু আজকের ঘটনার মতো যদি ওখানেও কারো সাথে রাগারাগি করেছো আর আমার কানে খবর আসছে, তাহলে তুমি কানে ধরেও মাফ পাবে না। এই আমি বলে

দিলাম।” আবির ধীর কণ্ঠে বলল, “কারো সঙ্গে রাগারাগি করবো না কিন্তু আমি ফেরার পর আপনার সাথে আলাদাভাবে কথা বলতে চাই। ” আলী আহমদ খান ঠান্ডা কণ্ঠে বললেন, “হ্যাঁ। কি বলবা এখনি বলো।” আবির মৃদুস্বরে বলল, ” এখন না। রাজশাহী থেকে এসে বলল।” “আচ্ছা। তোমার ইচ্ছে । ওখানে যদি বেশি সমস্যা হয় তাহলে জানিয়ো। মোজাম্মেল এর শরীর ভালো হলে ওকে পাঠাবো । ” “আচ্ছা। ” বাস ছাড়ার সময় হয়ে যাচ্ছে। আবির টিকেট নিয়ে বাসে ওঠে বসেছে। তানভির এসেছে অনেকক্ষণ পর। আবির রাজশাহী যাচ্ছে দেখে তানভির থম মেরে দাঁড়িয়ে আছে। বড় আব্বুর সামনে মুখ ফোটে কিছু বলতেও পারছে না। কিছুক্ষণের মধ্যে বাস ছেড়ে দিয়েছে। আলী আহমদ খান তানভিরের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, “চলো, এখন।” তানভির ভারী কণ্ঠে বলল, “জ্বি। ” আবিরের বাস ছাড়ার কিছুক্ষণ পরেই আবির মেঘকে কল দিল। মেঘ বন্যার কল কেটে আবিরের কল রিসিভ করে চিন্তিত স্বরে জানতে চাইল, “কোথায় আপনি? আর কখন আসবেন?” আবির ধীর কণ্ঠে বলতে শুরু করল, ” আমাকে ইমার্জেন্সি কাজে রাজশাহী যেতে হচ্ছে, বাস অলরেডি ছেড়ে দিয়েছে। তোকে যা বলি একটু শুন, হাতের আংটি টা খুলে কোথাও লুকিয়ে রেখে দে। আমি আসলে আবার পড়িয়ে দিব। আর এই ২-৩ দিন খুব বেশি সাবধানে থাকবি। প্রয়োজনে সারাদিন ঘুমাস, তবুও বাসার কারো মুখোমুখি হোস না। বাসায় কোনো মেহমান আসলে বা তোকে দেখার নাম করে কেউ আসলে ভুলেও সামনে যাস না। আর

অবশ্যই আমাকে জানাবি। সামান্য কোনো বিষয়েও বাড়াবাড়ি করতে যাস না, সামান্য কোনো কারণে তোর গায়ে যেন কোনো আঁচড় না পড়ে। যেভাবে রেখে গেলাম তিনদিন পর যেন সেভাবেই পায়। একটা কথা মনে রাখিস, তোর কিছু হলে আমি সত্যি মরে যাব। আমি তোকে নিজের থেকেও বেশি ভালোবাসি।”ঢাকা-রাজশাহী মহাসড়কে প্রদীপ্ত সড়ক বাতির অতিশয় আলোর ভিড়েও আবির অন্তর্জ্ঞানীয় মনে উদ্দীপ্ত চাঁদের পানে চেয়ে আছে। অদৃষ্ট অভিশঙ্কায় আবিরের ভ্রু যুগল কুঁচকে আছে, চেহারার লাবণ্য ফিকে হয়ে গেছে। আকাশের ঔজ্জ্বল্য চাঁদে আনমনেই নিজের চাঁদকে খোঁজছে। হৃদয়ের মনিকোঠায় সঙ্গোপনে আত্ততায় রাখা প্রিয়তমাকে মনের কথা জানিয়ে এখন নিজেই কুণ্ঠিত হচ্ছে। মেঘকে আংটি খুলে রাখতে বলেছে ঠিকই, কিন্তু মেঘ যে আংটি খুলে রাখার মেয়ে না এটাও আবিরের অজানা নয়। গতবছরের দেয়া ডায়মন্ড রিং টা প্রথম প্রথম আঙুল থেকে খুলতেই চাইতো না মেঘ। আকলিমা খান, হালিমা খানরা কয়েকবার জিজ্ঞেস করেছেন এটা কিসের রিং, কে দিয়েছে, ডায়মন্ড কি না। আবির আর তানভির বহু কষ্টে ঐ সিচুয়েশন সামলেছিল। তখন অনেক মেঘকে বুঝিয়ে আংটি খুলিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছিল ঠিকই তবে এবার আর সেই সামর্থ্য নেই। মেঘের মনে এখন আর কোনো দ্বিধা নেই, নেই কোনো আতঙ্ক। অথচ আবিরের পরিশ্রান্ত মস্তিষ্কের আতঙ্ক ক্রমে ক্রমে বেড়েই চলেছে। ভেবেছিল আজ বাসায় কথা বলে যা হোক সিদ্ধান্ত নিয়ে নিবে কিন্তু পরিস্থিতি যে তার অনুকূলে ছিল না। আবিরের এখন সবচেয়ে বড় ভয়

সিফাত নামক ছেলেটাকে নিয়ে । নিজের গ্রামের ছেলে বলে আলী আহমদ খান তাকে একটু বেশিই প্রায়োরিটি দিচ্ছেন, তার ছোটখাটো ভুল, খারাপ দৃষ্টি, বাজে আচরণ কোনোকিছুই যেন চোখে পড়ে না ওনার। নির্ঘুম রাত কাটিয়ে ভোরের আলো ফুটতেই আবির রাজশাহী পৌঁছেছে। কিছুক্ষণ রেস্ট নিয়ে ৯ টার পর পর মেঘকে কল দিতে দিতে রেডি হতে লাগলো। পরপর দু'বার কল করেছে কিন্তু রিসিভ হয় নি। এদিকে আবির এসেছে শুনে অফিস থেকে বার বার কল আসতেছে। আবির তাড়াহুড়োয় অফিসে চলে গেছে। তানভির সকাল সকাল উঠে ফ্রেশ হয়েই "Sparrow's Dreamhouse" এর উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছে। গতকাল আবিররা যা কিছু অগোছালো রেখে আসছিল সব গুছাতে হবে, বাসা পরিষ্কার করাতে হবে তাছাড়া বাসার কিছু কাজও বাকি ছিল সেগুলোও করাতে হবে। কাজ শেষ করতে কমপক্ষে ১২-১ টা বেজে যাবে। এদিকে বন্যা ক্লাসে একা একা ঝিমাচ্ছে। মিষ্টি, সাদিয়া, মেঘ কেউ ই আজ ক্লাসে আসে নি তাই খুব বোরিং লাগছে। মিনহাজদের সাথে কথা বলতেও ইচ্ছে করছে না। ক্লাস শেষে সবার আগে বের হয়ে কিছুদূর এগোতেই একটা ছেলেকে দেখলো। পেছন থেকে দেখতে অবিকল তানভিরের মতো। বন্যা আনমনে হেসে এগিয়ে গেল সেদিকে। পরশুদিন রাতে প্রায় ৩ টা পর্যন্ত তানভিরের সাথে কথা হয়েছিল বন্যার, পুরোটা সময় মেঘ আর আবিরকে নিয়েই কথা হয়েছিল। ওদের কথা শেষ করে তানভির যেই বন্যাকে নিজের কথা বলতে যাবে ততক্ষণে বন্যা অর্ধ ঘুমে তলিয়ে গেছে। তানভির দু

একবার মৃদুস্বরে ডেকেছে, বন্যা ঘুমের ঘোরে শুধু হু হু করছিল। তারপর বন্যার আর কিছুই মনে নেই। গতকাল সারাদিনে একবার তানভিরের সাথে কথা হয়েছিল,সেটাও মেঘের ব্যাপারে। মেঘকে সবকিছু বলে দিয়েছে কি না সেটায় শুধু জিজ্ঞেস করেছিল। বন্যা "হ্যাঁ" বলায় তানভির রাগী স্বরে বলেছিল, " আমি শুধু তোমাকে জানিয়েছি আর তুমি না বুঝে সেটা বনুকে বলে দিলা? সকালে উঠে আমাকে একবার জিজ্ঞেস করতে পারতে। " সেই যে কল কেটেছিল এখন অব্দি তানভিরের কোনো কল বা মেসেজ আসে নি। বন্যা ভেতরে ভেতরে কষ্ট পেলেও সেটা প্রকাশ করতে পারছে না। তানভিরকে কল দেয়ার সাহসও পাচ্ছে না। বন্যা ছেলেটার কাছাকাছি গিয়ে পেছন থেকে ডাকল, "শুনছেন?" ছেলেটা পেছনে ঘুরতেই বন্যা রীতিমতো বিষম খেয়ে উঠেছে। ছেলেটা মলিন হেসে বলল, "জ্বি বলুন।" বন্যা কাশতে কাশতে বলে উঠল, " সরি ভাই, সরি সরি। আমি অন্য কেউ ভেবেছিলাম। " সেই ছেলেটার পাশ থেকে আরেকটা ছেলে একটু রাগী স্বরে জিজ্ঞেস করল, " কোন ইয়ার? কোন ডিপার্টমেন্ট? বড় ভাইদের ডেকে আবার সরি বলছো? " বন্যা ঠান্ডা কণ্ঠে বলল, " বোটানি, সেকেন্ড ইয়ার। কোথাও কি লেখা আছে বড় ভাইদের ডাকা যাবে না? আমি অন্য একজন ভেবে ডেকেছিলাম যেহেতু ওনি সে না তাই সরি বলেছি। ইচ্ছেকৃত ভাই ডেকে সরি বলতে আসি নি।" "মুখে মুখে কথা বলছো আবার। এজন্যই বলি মেয়ে মানুষ আসলেই ভেজাল।" বন্যা একটু রাগী স্বরে বলল, " আজব মানুষ তো।" বন্যা যেই ছেলেকে

ডেকেছিল ঐ ছেলে এবার দু'জনকে থামিয়ে বন্যাকে উদ্দেশ্য করে বলল, " সরি, ওর কথায় কিছু মনে করো না আপু। বেচারার তিনদিন হলো ব্রেকাপ হয়েছে সেই কষ্টে এমন করতেছে।" বন্যা মুখ ফস্কে বলে ফেলল, " ঠিকই আছে। মেয়েদের সাথে এমন আচরণ করলে ব্রেকাপ হবেই। " দু'জনই কপাল কুঁচকে রাগী রাগী ভাব নিয়ে বন্যার দিকে তাকিয়ে আছে। বন্যার মনের কথা মুখ ফস্কে বেরিয়ে গেছে এটা বুঝতে কিছুটা সময় লাগলো, সঙ্গে সঙ্গে বন্যা মুখ চেপে পালালো। মিনহাজ আর তামিম এগিয়ে এসে চিন্তিত স্বরে জানতে চাইল, " এভাবে ছুটছিস কেনো? আর ছেলেগুলোই বা কে?" বন্যা নিজের কপাল চাপড়ে থমথমে কণ্ঠে বলল, "আমি ভাবছিলাম ওনি।" মিনহাজ কিছুটা ভাব নিয়ে জিজ্ঞেস করল, " ওনি টা আবার কে?" বন্যা লাজুক হেসে বলল, " আমার ননদের একমাত্র ভাই।" দু'জন মেকি স্বরে একসঙ্গে বলে উঠল, "ওওওওওওওওও" বন্যা রাগী স্বরে বলল, "ফাজলামো করিস না।" মিনহাজ হেসে জিজ্ঞেস করল, "তানভির ভাইয়াকে মিস করছিস?" বন্যা এপাশ ওপাশ মাথা নাড়ল, মুখে কিছুই বলল না। তামিম স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, " মিস করছিস না বলেই তো চোখের সামনে শুধু ভাইয়াকে দেখিস।" বন্যা আস্তে করে বলল, " আমার মনে হয়েছিল ওনি।" মিনহাজ ধীর কণ্ঠে বলল, " প্যারা নিও না V2. ভাইয়া আসতেছে।" বন্যা উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠল, "ওনি আসবে, সত্যি? " তামিম মিনহাজের দিকে তাকিয়ে শক্ত কণ্ঠে বলল, " দেখছিস, এই বলছে মিস করে না। যেই আসছে শুনছে ওমনি লাফায়

উঠছে। মেয়ে মানুষ, বুক ফাটবে তবুও মুখ ফুটবে না।” বন্যা ঠোঁট ফুলিয়ে বলল, ” এখন বল ওনি সত্যি আসবেন কি না। ওনি না আসলে আমি বাসায় চলে যাব। বিকেলে টিউশন আছে ।” তামিম ঠোঁট বেঁকিয়ে নিরেট কণ্ঠে বলল, ” আমরা এতকিছু জানি না, নিজের দরকার নিজে কল দিয়ে দেখেন। আমাদের কাজ আছে, আসছি।” মিনহাজ আর তামিম চলে যাচ্ছে । বন্যা আশপাশ তাকিয়ে দেখল, ঐ ছেলেগুলোকেও আর দেখা যাচ্ছে না। এদিকে তানভির আসবে কি না এটাও বুঝতে পারছে না। বন্যা এক জায়গায় বসে সাহস করে তানভিরের নাম্বারে কল দিল। তানভির কল রিসিভ করে শান্ত কণ্ঠে জানতে চাইল, ” কি করছো?” বন্যা শীতল কণ্ঠে বলল, “অপেক্ষা। ” তানভির হেসে বলল, “আর একটু অপেক্ষা করুন রাস্তায় আছি। ” বন্যা নিঃশব্দে হেসে কল কেটে দিয়েছে। প্রায় ৩০ মিনিট হয়ে গেছে বন্যা অপেক্ষায় করছে। বার বার ফোন বের করছে কিন্তু কল দিতে পারছে না। অকস্মাৎ আগে দেখা হওয়া দুটা ছেলের মধ্যে এক ছেলে হাতে জবা ফুল নিয়ে এসে বন্যার সামনে ধরলো। বন্যা কপাল কুঁচকে বলল, ” আমাকে ফুল দিচ্ছেন কেনো?” ছেলেটার ঠোঁট খানিক প্রশস্ত হলো। মৃদুস্বরে বলল, ” আগে নাও তারপর বলছি।” বন্যা রাগান্বিত কণ্ঠে বলে উঠল, ” আজব তো, আমি কোনো ফুল নিব” এরমধ্যে তানভির এসে ঐ ছেলের হাত থেকে ফুলটা টেনে নিয়ে হুঙ্কার দিয়ে উঠল, ” ওকে ফুল দেয়ার সাহস কিভাবে হলো আপনার?” ছেলেটা থতমত খেয়ে কিছুটা দূরে সরে দাঁড়ালো। বন্যা নিভু নিভু চোখে

তানভিরকে দেখছে, তানভিরের রাগান্বিত চেহারার পানে তাকানো যাচ্ছে না। বন্যা বার বার পল্লব ঝাপ্টে ঘন ঘন শ্বাস ফেলছে। তানভিরের মতো দেখতে ছেলেটা কোথা থেকে দৌড়ে এসে বলল, " সরি ভাইয়া, কিছু মনে করবেন না প্লিজ। আসলে কিছুক্ষণ আগেই আপু আমার বন্ধুকে বদদোয়া দিয়েছিল। আপুর বদদোয়ার উল্টো ফলে গেছে এই খুশিতে ও ফুল দিতে আসছে।" তানভির কণ্ঠস্বর তিনগুণ ভারী করে জানতে চাইল, " কিসের বদদোয়া?" ছেলেটা ধীর কণ্ঠে বলল, " আপু বলছিল আমার আচরণের জন্য আমার ব্রেকাপ হবেই। আপু কথাটা বলছে এক ঘন্টাও হয় নি তারমধ্যে আমার গার্লফ্রেন্ড নিজে থেকে এসে আমার সাথে কথা বলছে। গত তিনদিনে যে মেয়ে আমার দিকে তাকিয়েও দেখে নি সে আজ নিজেই চলে আসছে। সেই খুশিতে আপুকে ধন্যবাদ দিতে আসছি। ঐ যে আমার গার্লফ্রেন্ড দাঁড়িয়ে আছে। " তানভির অর্ধেক নষ্ট হওয়া ফুলটা ছেলেটার হাতে দিয়ে কটমট করে বলল, " ফুল দিতে মন চাইলে নিজের গার্লফ্রেন্ডকে দিন। অন্য কাউকে দিতে আসবেন না। " তানভির বন্যার হাতটা শক্ত করে ধরে গম্ভীর কণ্ঠে বলল, "চলো।" বন্যা অনিমেষ আঁখিতে একবার তানভিরকে দেখছে আবার নিজের হাতের দিকে তাকাচ্ছে। বাইকের সামনে গিয়ে থেমে বন্যার হাত ছেড়ে গুরুতর কণ্ঠে বলল, " ভার্সিটিতে কি এসব করতে আসো? মানুষকে ব্রেকাপ নিয়ে বদদোয়া দাও?" "না। ওনি বাড়াবাড়ি করছিলেন তাই... " তানভির অগ্নিদৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, " কি করেছে তোমার সাথে?" বন্যা তড়িৎ

বেগে বলে উঠল, “না না। ঐরকম কিছু না। ওনি মেয়েদের নিয়ে আজেবাজে কথা বলছিল তাই রাগ উঠে গেছিলো।” তানভির তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, “তোমার রাগও হয়?” বন্যা নিরুদ্বেগ ভাব নিয়ে বলল, “নাহ। আমার আবার কিসের রাগ? রাগ তো সব আপনাদের। আপনার বোনের রাগ দেখতে এত বড় হয়েছি। তার মন মতো কিছু না হলেই ফোঁস করে উঠে। ইদানীং আপনাদের দেখছি।” তানভির গলা খাঁকারি দিয়ে মোলায়েম কণ্ঠে বলল, ” তুমি যেমন ভাবছো আসলে তেমন না। আমি খুব ভদ্র ছেলে।” কথাটা বলেই তানভির মৃদু হাসলো। বন্যা ভ্রু উঁচিয়ে ওষ্ঠ বেঁকিয়ে নিরেট কণ্ঠে বলল, “ওহ আচ্ছা। তাই নাকি? আমি তো জানতাম ই না।” বন্যার ভাবভঙ্গি দেখে তানভির উদাসীন কণ্ঠে বলল, ” তুমি তো আমার সম্পর্কে কিছু জানোই না আর জানতে চাও ও না।” বন্যা বিপুল চোখে তাকিয়ে পরপর জিজ্ঞেস করল, ” মেঘ কোথায়?” “এইযে দেখেছো? আমি বুঝাতে চাই ‘অ’ আর তুমি বুঝো ‘ক’।” তানভির অন্যদিকে তাকিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে বলল, ” আমি শুধু শুধু এতটা পথ পেরিয়ে আসছি। ” বন্যা মুচকি হেসে বলল, “আসলেই। আপনি না আসলে কি সুন্দর জবা ফুলটা এখন আমার হাতে থাকতো।” তানভির কপাল কুঁচকে বাইকে বসে রাগান্বিত কণ্ঠে বলল, ” বসো” “কেনো?” “বসতে বলছি।” বন্যা চুপচাপ উঠে বসলো। তানভিরের কাঁধে হাত রাখতে গিয়েও লজ্জায় হাত রাখতে পারল না। তানভির মিরবে সেই দৃশ্য দেখে মুচকি হাসলো। জনশূন্য একটা রোডে এসে বাইক থামালো। বন্যাকে দাঁড়

করিয়ে তানভির একটা গলিতে ঢুকলো। পাঁচ মিনিটের মধ্যে জবা গাছের ঢাল সমেত অনেক গুলো লাল টকটকে জবা ফুল নিয়ে হাজির হলো। বন্যা বিপুল চোখে তাকিয়ে আছে, নিরুদ্বেগ সেই চাহনি, এই চোখের ভাষা বুঝার সাধ্যি কারো নেই, এভাবে তাকানোতে বন্যার থুঁতনিতেও ভাঁজ হয়ে আছে। তানভির গভীর নেত্রে বন্যার দিকে তাকিয়ে বরাবরের মতো ভারী কণ্ঠে বলল, " এই নাও তোমার জবা ফুল।" বন্যার দৃষ্টি তখনও তানভিরের চোখের দিকে। বন্যা ভ্রু কুঁচকে বলল, "আমি কি আপনার কাছে ফুল চেয়েছি?" "চাও নি কিন্তু মানুষের থেকে নিতে পারো নি বলে আপসোস তো ঠিকই করছিলে।" " আমি তখন মজা করেছিলাম।" তানভির মুখ ফুলিয়ে শ্বাস ছেড়ে তপ্ত স্বরে বলল, "এমন মজা কখনো করো না যেটা অপর মানুষের হৃদয়ে আঘাত করে।" তানভিরের হঠাৎ পরিবর্তন দেখে বন্যা সূক্ষ্ম নেত্রে তাকিয়ে রইল। নিজেই হাত বাড়িয়ে ঢালগুলো হাতে নিলো। পরপর বাইকে বসে বরাবরের মতো সুপরিচিত জায়গায় এসে বসলো। তানভিরের সাথে একা বের হলে, তানভির সবসময় এখানেই নিয়ে আসে। দুজন মুখোমুখি বসা, কারো মুখে কোনো শব্দ নেই। বন্যা শান্ত কণ্ঠে শুধালো, " আপনি কি রেগে আছেন?" "না।" বন্যা ঠাট্টার স্বরে বলল, " মিথ্যা কথা বললে আপনাকে খুব সুন্দর লাগে।" তানভির ভ্রু কুঁচকে চোখ ছোট করে তাকিয়ে বললো, " ওহ। তারমানে এমনিতে ভালো লাগে না?" বন্যা ঢোক গিলে কথা কাটানোর জন্য উষ্ণ স্বরে জিজ্ঞেস করল, "মেঘ কোথায়?" "বাসায়। " " কি করে?" "ঘুমাচ্ছে

বোধহয়। ” “আবির ভাইয়া কোথায়?” “রাজশাহী। ” বন্যা আঁতকে উঠে জিজ্ঞেস করল, “রাজশাহী কেনো?” “অফিসে কিছু সমস্যা হয়েছে তাই যেতে হয়েছে। ” “একটা কথা জিজ্ঞেস করি?” “করো।” “আবির ভাইয়া মেঘকে কবে বিয়ে করবেন?” তানভির উত্তর না দিয়ে চোখ নামিয়ে নিল। বন্যা পরপর আবার প্রশ্ন করল, “কি হলো? বলুন” তানভির পকেট থেকে ফোন বের করে ধীর কণ্ঠে বলল, “ভাইয়া কল দিচ্ছে, ওয়েট।” তানভির কল রিসিভ করে শান্ত কণ্ঠে বলল, “হ্যাঁ ভাইয়া, বলো।” আবির শক্ত কণ্ঠে শুধালো, ” কোথায় আছিস?” “বন্যার সাথে দেখা করতে আসছিলাম।” “তোর বোন কোথায়? ভার্সিটিতে আসে নি?” “না। ” “কি করে ও? সারাদিনে কতগুলো কল দিলাম রিসিভ করার নাম নেই। নেটে পর্যন্ত আসছে না।” “ঘুমাচ্ছে বোধহয়। তুমি বলো, বড় আব্বু যে ঝগড়ার কথা বলছিল, সেটা কি মিটছে?” “ধ্যাত, কিসের ঝগড়া! দুই স্টাফে ঝগড়া লাগছে তাও আবার ফুটবল খেলা নিয়ে। আব্বুর কানে কে খবর পাঠাইছে যেন বিশাল কিছু হয়ে গেছে। ” তানভির মলিন হেসে জিজ্ঞেস করল, ” কবে আসবে?” ” আসছি যেহেতু এখন বললেও কাল চলে যেতে পারব না। চাচ্চু আগেই আসতে বলছিল আমায়। আমিই পাত্তা দেয় নি। এখন এমন সিচুয়েশনে আসতে হয়েছে, যে চাইলেও কিছু বলতে পারছি না। ২-৩ দিনের মধ্যে কাগজপত্রের ঝামেলা মিটিয়ে চলে আসবো।” “আচ্ছা, সাবধানে থেকো।” আবির শীতল কণ্ঠে বলল, “তানভির শুন, বাসায় গিয়ে সবার আগে তোর বোনকে বলবি আমায়

কল দিতে। রাত থেকে কথা বলতে পারছি না, কল রিসিভ করছে না, কষ্ট লাগতেছে ভাই। ” তানভির কিছু বলার আগেই আবির বলল, “তোদের বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত। ” তানভির বন্যার সাথে কিছুক্ষণ কথা বলে বন্যাকে বাসা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসছে। আজও মোখলেস মিয়ার সাথে দেখা হয়েছে। ইদানীং তানভিরকে গলিতে ঢুকতে দেখলেই ওনি রাস্তায় দাঁড়িয়ে তানভিরের জন্য অপেক্ষা করেন। তানভির আসলে রাস্তা আঁটকে তানভিরকে নামিয়ে নিয়ে গিয়ে চা খেতে খেতে গল্প করেন। প্রথম প্রথম তানভিরের বিরক্ত লাগলেও এখন ব্যাপারটা বেশ ভালো লাগে। আবির সারাদিন অফিস শেষ করে টুকিটাকি শপিং করে বাসায় ফিরতে প্রায় ১০ টা বেজে গেছে। এরমধ্যে মেঘকে অনেকবার কল দিয়েছে কিন্তু মেঘ কল রিসিভ করছে না, তানভিরও বাহিরে। হালিমা খানকে কল দিয়ে কিছুক্ষণ কথা বলেছে, মেঘের কথা জিজ্ঞেস করায় ওনি শান্ত গলায় বলেছেন, ” খেয়ে ঘুমিয়ে পরেছে।” কথাটা শুনামাত্র আবিরের মন আরও বেশি খারাপ হয়ে গেছে। একটা মানুষ সারাদিন কিভাবে ঘুমাতে পারে? আবির ফ্রেশ হয়ে শুয়ে মেঘের ছবি দেখছে আর একটু পর পর কল দিচ্ছে। এমন করতে করতে একসময় আবিরও ঘুমিয়ে পরেছে। গতকালের মতো আজও ঘুম ভাঙার পর মেঘের নাম্বারে কল দিল কিন্তু এবারও রিসিভ হলো না। বাসায় কল দিয়েও আশানুরূপ উত্তর পায় নি। হালিমা খান বলছেন জানেন না, মালিহা খান বলছেন হয়তো ভার্সিটিতে গেছে। এদিকে তানভিরকে কল দিচ্ছে, তানভির সকাল

থেকেই ব্যস্ত। তানভিরের ফ্রেন্ডের আম্মু অসুস্থ সেখানেই দৌড়াদৌড়ি করছে। আবির রাজশাহী এসেছে ঠিকই কিন্তু তার মন পড়ে আছে খান বাড়িতে। মেঘের সঙ্গে কথা বলতে পারছে না, ও কি করছে, কেমন আছে কিছুই জানতে পারছে না দেখে আবিরের মনের অবস্থা খুব খারাপ হয়ে আছে। অফিসের কাজেও বিশেষ মনোযোগ দিতে পারছে না,টেবিলে কাগজপত্র ছড়িয়ে আনমনে ভাবছে, " আমি এখানে আসায় মেঘ কি রেগে গেছে? এজন্যই কি আমার কল রিসিভ করে না? কিন্তু মেঘ তো এমন না। ও রাগ করলেও আমার কল টা তো রিসিভ করতো।" বিকেল দিকে অফিস থেকে বের হয়েই মেঘকে কল দিল। বরাবরের মতো এবারও রিসিভ হলো না। পরপর তানভিরকে কল দিল। তানভির কল রিসিভ করতেই আবির ঠান্ডা কণ্ঠে শুধালো, " কোথায় তুই?" "বাহিরে। কেনো?" "বাসার কেউ কল রিসিভ করছে না, তোর বোনও রাগ করে বসে আছে, আব্বু পর্যন্ত রিসিভ করছেন না। আমি আর অপেক্ষা করতে পারতেছি না। আমি আব্বুকে ফোনেই সব বলে দিব। তুই বাসায় গিয়ে আব্বুকে ফোনটা দে।" তানভির রাশভারি কণ্ঠে বলল, " বড় আব্বু এখন কথা বলার অবস্থায় নেই।" "কেনো? কি হয়েছে?" " সিফাত ভাইয়া বাসায় আসছেন।" " হোয়াট? হোয়াই?" "আমি জানি না।" আবির রাগে বলল, " আব্বু গিয়ে নিয়ে আসছে?" "না না। বড় আব্বু কিছু জানেন না। হুট করেই চলে আসছে। এখন আর কি, রান্না করা হচ্ছে খাইয়ে বিদায় দিবে বোধহয়। " আবির কণ্ঠ তিনগুণ ভারী করে বলল, " সিফাত বাসায়

আসছে অথচ আমায় কেউ জানায় নি কিছু। তুই ই বা বাহিরে কি করছিস? মেঘ কোথায়?” “আমি বনুকে নিয়ে বের হয়ছি।” “বের হয়ছিস মানে? কোথায় বের হয়ছিস? আর ফোনটা ও কে দে।” “বনু আমার পাশে নেই। ও পার্লারে গেছে, আর আমি একটা কাজে একটু দূরে চলে আসছি।” “বাসার পরিস্থিতি কি? আর হঠাৎ ও কে নিয়ে বের হতে হলো কে? সব ঠিক আছে তো?” আবিরের একের পর এক প্রশ্নে নাজেহাল তানভির। ঢোক গিলে ছোট করে বলল, ” সিফাত ভাইয়ার হাবভাব আমার সুবিধার লাগে নি। কি হয় বলা যায় না তাই আগেভাগেই বনুকে নিয়ে বাসা থেকে বেড়িয়ে আসছি। এখন ফোন সাইলেন্ট করে রেখে দিব।” আবির দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল, ” তোর বোনের যেন কিছু না হয়।” “হু।” আবির বাসায় নেই আজ তিনদিন হতে চলল। এই তিনদিনে মেঘের নিঃশ্বাসের শব্দ পর্যন্ত শুনতে পায় নি আবির। তানভিরকে কল দিলে বেশির ভাগ সময় বাহিরেই পাওয়া যায়। আম্মুকে কল দিলে শুনে মেঘ ঘুমাচ্ছে, ছাদে, বাসায় নেই। মোজাম্মেল খানের সাথে টুকটাক কথা হলেও তেমন কিছুই বলেন না ওনি।এই তিনদিন কাটাতে আবিরের দম বন্ধ হয়ে আসছে। মেঘকে দেখার জন্য ভেতরটা ছটফট করছে। আবির এতদিন পর রাজশাহী আসায় গত ছয় মাসের জমে থাকা মিটিং, প্রজেক্ট সহ সব ফাইল দেখতে হচ্ছে। হুট করে চলেও যেতে পারছে না। সবকিছু ঠিক থাকলে আজকে মেঘকে প্রপোজ করতো আবির। প্রপোজ করেই বাসায় সবার সামনে বিয়ের প্রস্তাব রাখতো। কিন্তু এগুলোর কিছুই হলো না।

মেঘকে ছোটখাটো ভাবে প্রপোজ করতে পারলেও বাসায় এখনও কিছু বলে উঠতে পারে নি। এদিকে মেঘেরও কোনো খোঁজ পাচ্ছে না। সারাদিন কল দিতে দিতে আবির ক্লান্ত হয়ে যাচ্ছে। গতকাল রাত থেকে তানভিরের সাথেও কথা হয় নি আবিরের। তানভিরের প্রচন্ড মাথা ব্যথা, ঔষধ খেয়ে সেই যে রাতে ঘুমিয়েছিল এখনও উঠে নি। সিফাত কেন আসছিল, কি বলেছে এগুলো জানতে আম্মু, মামনি,আব্বু, চাচ্চু সবাইকে কল দিচ্ছে আবির অথচ কেউ কিছু বলছে না। মালিহা খান বলেছেন, ওনি কিছু শুনেন নি। আলী আহমদ খানকে জিজ্ঞেস করায় ওনি বরাবরের মতো বেশ কিছুটা সময় নিয়ে সিফাতের প্রশংসা করেছেন। বাসার এলোমেলো অবস্থা দেখে আবির ফুপ্পিকে পর্যন্ত কল দিয়েছে।কিন্তু ওনিও বিশেষ কোনো সমাধান দিতে পারলেন না। কারণ সিফাত নামক ছেলের ব্যাপারে আলী আহমদ খানকে কিছু বললেই ওনি রেগে যান। আবির অফিস থেকে সন্ধ্যার পর পর রুমে আসছে। সকালে মেঘ কল ধরছিল না দেখে রাগে রুম তছনছ করে রেখে গেছিলো। সেসব ই এখন গুছাতে হচ্ছে। দিশাবিশা না পেয়ে কল দিল রাকিবকে। রাকিব কল রিসিভ করে শান্ত কণ্ঠে বলল, ” ঢাকা চলে আসছিস?” “না। ভাবছিলাম বিকেলে চলে যাব তারমধ্যে ৩-৪ টা পুরোনো ফাইল বের করে দিয়েছে। এখন এগুলো না দেখে চলে গেলে আব্বু আবার রেগে যাবেন। আসার সময় এমনিতেই সরি টরি বলে আসছি। তাই ওনাকে রাগানোর মতো কাজ আর করা যাবে না।” “ওহ আচ্ছা। ” “রাকিব, শুন” “হ্যাঁ বল।” “আমাদের বাসায় যাবি একটু?

বাসার কি অবস্থা কিছু বুঝতে পারছি না। কারো সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলতে পারছি না। তুই যাবি একটু?" " আমি কিভাবে যাব? তোর আব্বুকে আমি এমনিতেই খুব ভয় পায়। গেলেই ১০ টা কথা জিজ্ঞেস করবে, উত্তর দিতে পারবো না তখন উল্টো বাঁশ খাবো। তার থেকে ভালো হয় তুই রাতটা কাটিয়ে ভোরে রওনা দিস। তুই বাসায় আসার আগেই আমি সেখানে উপস্থিত থাকব।" আবির কিছু বলতে পারল না। মুখের উপর কল কেটে দিয়েছে। তিনদিন পর আবির ঢাকায় ফিরেছে। বেলা ১১ টা বেজে ৪৭ মিনিট। বাসার মানুষের সাথে ১৯ ঘন্টা যাবৎ কথা হয় না। আবির বাসস্ট্যান্ড থেকে রিক্সা নিয়ে সরাসরি বাসার উদ্দেশ্যে রওনা দিল। বাসার সামনে এসে রিক্সা থেকে নেমে বাড়ির দিকে তাকিয়ে থমকে দাঁড়ালো। পুরো বাড়ি আলোকসজ্জায় সজ্জিত। ৪-৫ টা ছেলে খুব তাড়াহুড়োতে সেই সাজানো আলোকসজ্জা খুলতে ব্যস্ত। মাটিতে জিনিসপত্রের নাজেহাল অবস্থা। আবির গেইটের সামনে আসতেই দারোয়ান আংকেল মলিন হেসে জিজ্ঞেস করলেন, " বাবা, ভালো আছো?" আবির কোনোরকমে 'ভালো' বলেই ভেতরে চলে গেল। ড্রয়িং রুমে কোনো মানুষ নেই। হালিমা খান রান্নাঘরে কি যেন করছেন। আবির আশেপাশে কাউকে না পেয়ে ব্যাগ ফেলে ছুটলো মেঘের রুমের দিকে। ব্যস্ত হাতে ধাক্কা দিল মেঘের রুমের চাপানো দরজা। রুম সম্পূর্ণ ফাঁকা, বিছানা টানটান করে বিছানো, এত গুছানো মেঘের রুম কখনো দেখে নি আবির। আবির একে একে সবগুলো রুম দেখতে লাগলো। তানভির, মীম কেউ নেই। ছাদ পর্যন্ত ছুটে গেল

আবির। কোথাও কারো অস্তিত্ব নেই। আবিরের নিঃশ্বাস এলোমেলো, চোখ জ্বলছে, ঠোঁট কাঁপছে। আবারও দৌড়ে নিচে আসলো। ততক্ষণে আলী আহমদ খান আর মোজাম্মেল খান সোফায় এসে বসেছেন। আলী আহমদ খান আবিরকে আড়চোখে দেখে স্বাভাবিক কণ্ঠে বললেন, " কখন আসছো?" আবির কন্ঠ দ্বিগুণ ভারি করে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, " মেঘ কোথায়?" আলী আহমদ খান কপাল কুঁচকে ভারী কণ্ঠে বললেন, "তুমি কি আমার কথা বুঝো নি? আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছি তুমি কখন আসছো?" আবিরের শরীর ঘামছে, সারাবাড়ি ছুটে এসে এখন স্থির হতে পারছে না। ঘনঘন শ্বাস ছেড়ে পূর্বের তুলনায় আরও ভারী কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, " আমি জিজ্ঞেস করছি মেঘ কোথায়?" " ও যেখানে থাকার সেখানেই আছে।" "মানে? কোথায় ও?" মোজাম্মেল খান এবার মৃদুস্বরে বললেন, " শ্বশুরবাড়িতে। " কথাটা কর্ণকুহরে প্রবেশ মাত্রই আবিরের মাথা চক্কর দিয়ে উঠেছে। মনে হচ্ছে মাথায় পুরো আকাশ ভেঙে পরেছে। চোখে সবকিছু অন্ধকার দেখছে। আবির রাগান্বিত কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল, " আপনারা কি ফাজলামি করছেন আমার সাথে?" মোজাম্মেল খান তপ্ত স্বরে বললেন, " গলা নামিয়ে কথা বলো, তোমার সাথে কি আমাদের ফাজলামো করার সম্পর্ক?" আবিরের কানে কিছুই ঢুকছে না। অনবরত মাথা ঘুরছে আবিরের। রাগে গজগজ করতে করতে বলল, " মেঘের বিয়ে হতে পারে না। আমার মেঘ কোথায়? " মোজাম্মেল খান ধীর কণ্ঠে বললেন, " কেন হতে পারে না? তুমি আমাকে ছয় মাস

সময় দিয়েছিলে সেই ছয় মাস পেরিয়ে গেছে তাই আমি আমার মেয়েকে বিয়ে দিয়ে দিয়েছি।” আবিরের দু-চোখ টকটকে লাল হয়ে আছে, কান দিয়ে গরম বাতাস বের হচ্ছে, পড়নের শার্ট ভিজে একাকার অবস্থা। আবির দু’হাতে চোখ-মুখ মুছে গুরুতর কণ্ঠে শুধালো, “তানভির কোথায়?” মোজাম্মেল খান ঠান্ডা কণ্ঠে বললেন, ” মেঘের সঙ্গে গেছে।”আবির দু*র্বোধ্য দৃষ্টিতে আলী আহমদ খান ও মোজাম্মেল খানকে দেখছে। ওনাদের স্বাভাবিক মুখো ভঙ্গি দেখে আবিরের কৃশ লাল চোখ দুটা আ*গ্নে*য়গি*রির লা*ভা*র ন্যায় রক্তাভ বর্ণ ধারণ করেছে। বুকের বাম পাশে বক্ষপিঞ্জরে আবদ্ধ প্রায় ৩০০ গ্রামের হৃদপিণ্ডটা দুমড়ে মুচড়ে ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে। আচমকা দুঃস্বপ্নগুলো মস্তিষ্কে হুমকি খেয়ে পরেছে, এলোপাতাড়ি ছুটছে ভয়ংকর সব নিষিদ্ধ চিন্তা। চোখের সামনে বারবার মেঘের আদুরে আদলখানা ভাসতেছে। ১৯ ঘন্টা ধরে ঠিকমতো খাওয়া নেই আবিরের, বাসার কারো সাথে কোনো যোগাযোগও ছিল না। তানভিরকে শ খানেক কল দিয়েছে কিন্তু রিসিভ হয় নি একটা কলও। বাসার এই শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি দেখে প্রচন্ড মানসিক যন্ত্রণায় ভুগছে। আবির দুহাতে মাথা চেপে অগ্নি ঝরা কণ্ঠে চিৎকার করল, ” আমি কিচ্ছু বিশ্বাস করি না। সত্যি করে বলুন, মেঘ কোথায়?” মোজাম্মেল খান রাগী স্বরে বললেন, ” এক কথা তোমাকে কতবার বলতে হবে?” হালিমা খান ডাইনিং টেবিলের সামনে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছেন। বাড়িতে আর একটা মানুষও নেই। বাহিরে ডেকোরেশনের লোকজনদের

হাউকাউ শুনা যাচ্ছে। আবির ঠিকমতো নিঃশ্বাস নিতে পারছে না, আশেপাশে তাকিয়ে জোরে শ্বাস টেনে শক্ত কণ্ঠে বলল, " যতক্ষণ না আপনারা সত্যি কথা বলছেন ততক্ষণ আমি এক কথায় জিজ্ঞেস করবো।" " সত্যি এটায়, আমার মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে আর আমার মেয়ে সুখে আছে। " আবিরের হৃৎস্পন্দন থেমে গেছে, পরপর অপ্রতিভ কণ্ঠে বলে উঠল, "কোন সুখে কথা বলছেন আপনি? ওর জীবনের সব সুখ জড়িয়ে আছে আমার সাথে। মেঘ শুধু আমার। ওকে আমার থেকে কেউ আলাদা করতে পারবে না। আপনারা যে মিথ্যা নাটক টা সাজিয়েছেন সেই নাটকের মঞ্চ ভেঙে আমি আমার মেঘকে ঠিক আমার করে নিব।" মোজাম্মেল খান আর কিছু বললেন না। ওনি সোফায় হেলান দিয়ে বসে আছেন। আলী আহমদ গুরুভার কণ্ঠে বলে উঠলেন, " কি সব আবোলতাবোল কথা বলছো। তোমার মাথা কি নষ্ট হয়ে গেছে? " আবির ভেজা কণ্ঠে বলে উঠল, " হ্যাঁ। আমার মাথা নষ্ট হয়ে গেছে। আপনাদের এই তালবাহানা আমি আর নিতে পারছি নি। আব্বু- চাচ্চু আমি আপনাদের দু'জনকেই বলছি, আমি মেঘকে ভালোবাসি, খুব বেশি ভালোবাসি। আমার জীবনের সবটুকু জুড়ে শুধু মেঘের অবস্থান। ও কে ছাড়া আমি আমার পৃথিবী কল্পনাও করতে পারবো না। আপনাদের কাছে আমার একটায় রিকুয়েষ্ট প্লিজ মেঘকে আমায় দিয়ে দেন। আমি ও কে রানী বানিয়ে রাখবো আমি, ওর গায়ে কোনোদিন কোনো আঁচড়ও পড়তে দিব না, প্লিজ।" আলী আহমদ খান কপাল গুটিয়ে ঠান্ডা কণ্ঠে বললেন, "তুমি মেঘ মামনিকে ভালোবাসো

এটা কোনোদিন বলেছো আমাদের? এখন এসব বলে কোনো লাভ নেই। তুমি তোমার জীবনে ফোকাস করো, মেঘ মামনি তার জীবন নিয়ে খুব ভালো আছে। ” প্রায় ৫-৭ মিনিট আবির আর আলী আহমদ খানের কথোপকথন চললো। আবিরের রাগ নিয়ন্ত্রণের বাহিরে তবুও বার বার নিজেকে সান্ত্বনা দিচ্ছে, মন কে বুঝাচ্ছে, মেঘের কিছু হয় নি, সব ঠিক আছে, মেঘের বিয়ে হতেই পারে না, তানভির সবকিছু সামলে নিয়েছে। আবির শান্ত থাকলেও আলী আহমদ খান বেশ ক্ষুব্ধ। মোজাম্মেল খান ফোন হাতে নিয়ে নিশ্চুপ বসে আছেন। আলী আহমদ খান একায় আবিরের সাথে কথা কাটাকাটি করছেন। বাবা- ছেলের মাঝে হালিমা খানও কিছু বলতে পারছেন না। আবির এক পর্যায়ে হালিমা খানের কাছে ছুটে গেল। শীতল চোখে হালিমা খানের দিকে তাকিয়ে হিমশীতল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, ” মামনি, তুমি তো জানো, মেঘ কোথায় প্লিজ বলো। বিশ্বাস করো আমি তোমার মেয়েকে ছাড়া বাঁচতে পারবো না।” আবিরের চোখে পানি জমে আছে, হালিমা খান আবিরের কব্জিতে হাত রেখে শীতল চোখে তাকালেন। কিছু বলার আগেই আলী আহমদ খান হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, ” তুমি কি আমাদের ম*রার ভয় দেখাচ্ছো? এক মেয়ের জন্য তুমি ম*রে যাবে?” আবির রাগান্বিত কণ্ঠে চেঁচাল, ” আব্বু, মেঘ এক মেয়ে না। ও আমার জীবনে আসা একমাত্র মেয়ে যার জন্য আমি যা খুশি করতে পারি। আজ আমি যে অবস্থানে আছি সবটায় তার জন্য। গত ৯ টা বছর বুকের উপর পাথর রেখে নিজের আবেগকে চেপে রেখে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছি

শুধুমাত্র আপনাদের চোখে নিজেকে যোগ্য প্রমাণ করার জন্য । আর সেই যোগ্যতা দিয়ে মেঘকে আমার করে নেয়ার জন্য।” আলী আহমদ খান গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, ” এখন এগুলো বললে আর কি হবে। তার থেকে বরং ফ্রেশ হয়ে খাওয়াদাওয়া করো। তোমার এই অবস্থা চোখে দেখা যাচ্ছে না।” আবির দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে শরীরের সবটুকু শক্তি দিয়ে চিৎকার করল, ” আমি অন্যকিছু শুনতে চাচ্ছি না, শুধু বলুন আমার মেঘ কোথায়?” আলী আহমদ খান রাশভারি কণ্ঠে বললেন, ” মেঘ এখন আর তোমার নেই।” কথাটা কানে ঢুকামাত্র আবির ডানহাতের কব্জি দিয়ে টেবিলের উপর থাকা কাঁচের জগে শক্ত করে ধাক্কা মেরে মাত্রাতিরিক্ত রাগে চিৎকার করল, ” মেঘ আমার মানে আমার ই। আমৃত্যু মেঘ আমার ই থাকবে।” আবিরের শক্ত হাতের ধাক্কায় পানি ভর্তি কাঁচে জগ সাথে থাকা দুটা গ্লাস ফ্লোরে পড়ে ভেঙে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে। আলী আহমদ খান ঠান্ডা কণ্ঠে হুমকি দিলেন, ” জিনিসপত্র ভাঙচুর করছো কেনো? তুমি কি..” আবিরের অগ্নি ঝরা দুচোখ দেখে থেমে গেলেন স্বয়ং আলী আহমদ খান।আবিরের হৃদয় ভেঙেচুরে তছনছ হয়ে যাচ্ছে। প্রথমদিকে বিষয়টা সেভাবে গুরুত্ব দেয় নি আবির। কিন্তু আব্বুর অনবরত অসন্তোষজনক কথায় আবির আর টিকতে পারছে না। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে, গতকাল থেকে খাওয়া নেই, শরীরে তেমন জোরও পাচ্ছে না। ঠিকমতো কথাও বলতে পারছে না। আবওর আলী আহমদ খান আর মোজাম্মেল খানের দিকে স্তব্ধ চোখে তাকিয়ে আছে। মোজাম্মেল খান এখন নির্বাক, যেন এখানে

কিছুই ঘটে নি বা ঘটছে না। ওনি গভীর মনোযোগ দিয়ে ফোন দেখছেন। আলী আহমদ খান কপালে ভাজ ফেলে আবিরকে দেখছেন।আবির কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেল। অকস্মাৎ এলোপাতাড়ি ছুটলো নিজের রুমের দিকে। ১ মিনিটের মধ্যে পুনরায় নিচে নামলো। দু'হাত পেছনে রেখে মেরুদণ্ড সোজা করে দাড়িয়ে গুরুগম্ভীর কণ্ঠে বলল, " আমি শেষবারের মতো জিজ্ঞেস করছি, মেঘ কোথায় বলুন, নয়তো..." মোজাম্মেল খান ফোন থেকে চোখ সরিয়ে আবিরের দিকে তাকালেন। আলী আহমদ খান গম্ভীর কণ্ঠে জানতে চাইলেন, " নয়তো কি? ম*রে যাবে?" "জ্বি।" মোজাম্মেল খান দীর্ঘসময় পর মুখ খুললেন। ছোট করে বললেন, " আবির, মাথা ঠান্ডা করো।" "আমি পারছি না, চাচ্চু। মেঘকে...." আবিরের কথা সম্পন্ন হবার আগেই আলী আহমদ খান রাগী স্বরে বললেন, " ঠিক আছে। ম*রে যাও। " মোজাম্মেল খান তপ্ত স্বরে বলে উঠলেন, " কি বলছো কি ভাইজান।" আবির নিরেট দৃষ্টিতে আব্বুর মুখের পানে চেয়ে আছে। আলী আহমদ খানও বরাবরের ন্যায় কঠোর রূপে বসে আছেন। অপ্রত্যাশিতভাবে আবির পেছন থেকে হাত সামনে এনে কপালের পার্শ্বদেশে রি*ভ*ল*ভর ধরে মুখ ফুলিয়ে শ্বাস ছেড়ে তেজঃপূর্ণ কণ্ঠে বলল, "১০ মিনিটের মধ্যে মেঘ আমার সামনে না আসলে...." বাকি কথা বলার আগেই আলী আহমদ খান আঁতকে উঠে বললেন, "কি হচ্ছে কি ! তুমি কি পাগল হয়ে গেছো?" আবিরের হাতে রি*ভ*ল*ভর দেখে আলী আহমদ খান, মোজাম্মেল খান আর হালিমা খান একসঙ্গে

কেঁপে উঠলেন। সবার চোখে আতঙ্ক। “হ্যাঁ, আমি পাগল হয়ে গেছি। এতগুলো বছর যাকে নিজের থেকেও বেশি ভালোবেসেছি, যাকে নিজের সবটুকু সামর্থ্য দিয়ে আগলে রেখেছি তাকে ছেড়ে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব না। হয় মেঘকে এনে দিবেন নয়তো আমার লা*শ দাফনের ব্যবস্থা করবেন।” মোজাম্মেল খান মেরুদণ্ড সোজা করে বসে চটজলদি তানভিরকে কল দিচ্ছেন আর উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলছেন, ” আবির, প্লিজ, তুমি মাথা ঠান্ডা করো। মেঘ এখনি আসতেছে।” আলী আহমদ খান আবিরের কাছে যেতে নিলে আবির দু পা পিছিয়ে তপ্ত স্বরে বলল, ” আমাকে আটকানোর চেষ্টা করবেন না, প্লিজ।” মোজাম্মেল খান আলী আহমদ খানকে টেনে সোফায় বসিয়ে অত্যন্ত নমনীয় কণ্ঠে বললেন, ” আবির, আমি জানি তুমি এত দূর্বল মনমানসিকতার ছেলে নও। ভাইজানের মতো তুমিও খুব বিচক্ষণ। তাই বোকার মতো এমন কোনো কাজ করো না যেটা তোমার সাথে সাথে এই পরিবারের সব সুখ-শান্তি নষ্ট করে দেয়।” আবিরের দুচোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পরছে। গলা অব্দি শুকনো মুখ, তবুও জিভ দিয়ে ঠোঁট ভেজানোর চেষ্টা করল। মোজাম্মেল খানের দিকে অদম্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে সুস্থির কণ্ঠে বলতে শুরু করল, “চাচ্চু,আপনি আমাকে যতই চতুর ভাবুন না কেন সত্যি এটায় আমি বড্ড বোকা। যখন ৬ বছরের অবুঝ মেয়েটা আকুল কণ্ঠে আমায় বলেছিল ‘কখনো আমায় ছেড়ে যেতে পারবা না’ আমিও বোকার মতো তাকে ছুঁয়ে প্রমিস করেছিলাম যাই হয়ে যাক না কেনো আমি বেঁচে থাকলে কোনোদিনও ওকে ছেড়ে যাব না। আমি যদি বোকা

না হতাম তাহলে সেদিন ওকে প্রমিস করতাম না। আর আজ আপনাদের সামনে চিৎকার করে বলতামও না যে, আমার ওকেই লাগবে। হয়তো আমার জীবনটা মেঘ কেন্দ্রিক হতোই না। আর আমার জন্য আপনাদের এত বছরের ইতিহাস, ঐতিহ্য, মানসম্মানও এভাবে নষ্ট হতো না।" আবির শ্বাস ছেড়ে আলী আহমদ খানের দিকে তাকিয়ে বলতে শুরু করল, "আব্বু, আমি সত্যি দুঃখিত। আপনার মতো একদম বিচক্ষণ মানুষের সন্তান হয়েও আমি এত বোকা হয়েছি, নয়তো একটা মেয়ের জন্য নিজের জীবন দিতে একবার হলেও ভাবতাম। সবসময় আপনিই বলে এসেছেন, কখনো কাউকে কথা দিলে নিজের জীবন থাকা পর্যন্ত সেই কথা রাখার চেষ্টা করতে হয়। যেই মেঘের মোহে জর্জরিত আবিরের হৃদয় সেই মেঘকে দেয়া কথা রাখতে না পারলে আমার এই জীবন রাখার কোনো প্রশ্নই আসে না। আমি না হয় বোকা হয়েই পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করবো।" আবিরের দু'চোখ বেয়ে স্বচ্ছন্দগতিতে অশ্রু গড়িয়ে পরছে। আবিরের মুখের পানে তাকিয়ে হালিমা খানও নিরবে কাঁদছেন। আলী আহমদ খান অবাক লোচনে ছেলের মুখের পানে চেয়ে আছেন, এই আবিরকে ওনি চিনতে পারছেন না। বোধশক্তি হওয়ার পর থেকে আবিরকে কোনোদিনও এভাবে কাঁদতে দেখেন নি তিনি। আলী আহমদ খান নিজের বন্ধুমহলে বরাবরই নিজের ছেলেকে একজন সাহসী, বুদ্ধিমান, দৃঢ় মনমানসিকতার মানুষ হিসেবে পরিচয় দিয়ে এসেছেন। আজ আবিরের এই রূপ দেখে নিজেই আঁতকে উঠছেন। মোজাম্মেল খানের

চোখ ছলছল করছে, অতি সন্তর্পণে নিজের চোখ মুছে নিয়েছেন। আবির চোখ ঘুরিয়ে দেয়াল ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ভেজা কণ্ঠে বলল, " ১০ মিনিট সময় শেষ।" আলী আহমদ খান ও মোজাম্মেল খান একসঙ্গে ঘড়ির দিকে তাকালেন। মোজাম্মেল খান ব্যস্ত হাতে তানভিরকে কল দিচ্ছেন। আলী আহমদ খান আবিরকে বুঝাতে ব্যস্ত। আবির ঘড়ির দিকে তাকিয়ে শক্ত কণ্ঠে বলল, " আমি এক থেকে তিন পর্যন্ত গুনবো এরমধ্যে মেঘ আমার চোখের সামনে না আসলে..... "১" মোজাম্মেল খান উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললেন, " ওরা চলে আসছে প্লিজ, থামো।" "২" মোজাম্মেল খান আর্তনাদ করছেন, অকস্মাৎ আলী আহমদ খানের নজর মেইন গেইটের দিকে পরে। মেইন গেইট থেকে কিছুটা ভেতরে মেঘ নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, প্রশস্ত আঁখিতে উদ্বেগ স্পষ্ট, ঘন ঘন শ্বাস ফেলছে। মেঘ এসেছে আরও কয়েক সেকেন্ড আগে। আবিরের মাথায় রি*ভ*ল*বার দেখে বক্ষপিঞ্জরে আবদ্ধ হৃদপিণ্ডটা প্রচন্ড বেগে দপদপ করে কাঁপছিল। কয়েক সেকেন্ডেই মস্তিষ্কে একেরপর এক ঘটনা ঘুরপাক খাচ্ছিলো। আজ থেকে আরও ৭-৮ মাস আগেই মিনহাজ বলেছিল আবিরের কাছে রি*ভ*লবা*র আছে। মেঘ তখন মিনজাজকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেছিল, ইচ্ছেমতো ঝেড়েছিল। আজ চোখের সামনে সেই দৃশ্য দেখে মেঘের দম বন্ধ হয়ে আসছে, মনে হচ্ছে কেউ শক্ত হাতে গলা চেপে ধরে আছে, নিঃশ্বাস ফেলতে পারছে না। এমনকি জোরে চিৎকার করে কিছু বলতেও পারছিল না। আলী আহমদ খানের নজর পড়তেই উত্তেজিত কণ্ঠে

বললেন, “ঐ তো মেঘ। ” আবির পূর্বের ন্যায় রি*ভ*ল*বার ধরে ঘাড় ঘুরালো। সহসা নজর আটকালো এক অপরূপার পানে। বিস্ময় সমেত তাকালো আবির, মোহনীয় সেই দৃষ্টি। মেঘের পড়নে গাঢ় হলুদ আর রানী গোলাপী পাড়ের শাড়ি, কাঁচা ফুলের গহনায় পুরো গা ভর্তি, কপালের ঠিক মাঝ বরাবর একটা গাঢ় গোলাপী রঙের জারবেরা ফুলের কারণে মেঘের মায়াবী আদল আরও বেশি রমণীয় লাগছে। মুখে বেশ ভারী মেকআপ, মনোমুগ্ধকর চোখ আর ঠোঁটের আর্ট দেখে আবির কয়েক মুহুর্তের জন্য অবিক্ষুব্ধ হয়ে রইলো। অন্যমনস্কতায় আবিরের দুচোখ বেয়ে তখনও নিরবধি অশ্রু ঝড়ছে। অলক্ষিতভাবে হাত থেকে রিভলবার পড়তেই আবির আত্মজ্ঞানে ফিরল। মেঘ তখনও পাথরের মতো ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। মোজাম্মেল খানের ঠোঁটে কিঞ্চিৎ হাসি ফুটলেও আলী আহমদ খান গম্ভীর মুখ করে দাঁড়িয়ে আছেন। আবির অব্যবহিতভাবে ছুটলো, মেঘের ঠিক সামনে গিয়ে দুই হাঁটুতে ভর ফেলে ধপ করে বসে পড়লো। অকস্মাৎ মেঘের পেট বরাবর বলিষ্ঠ হস্তে ঝাপটে ধরে উচ্চৈঃস্বরে কান্না শুরু করল। আবিরের নিরন্তর কান্না দেখে মেঘ অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। পর পর আব্বু, বড় আব্বু আর ঘাড় ঘুরিয়ে আম্মুর পানে তাকালো, সকলেই নির্বাক চোখে তাকিয়ে আবিরের কান্নার গভীরতা বুঝার চেষ্টা করছেন। মেঘের ভেতরে চলমান তোলপাড় সামলে, নিজেকে শান্ত করে চোখ নামিয়ে আবিরের পানে তাকিয়ে মোলায়েম হাতে আবিরের মাথা জড়িয়ে ধরলো। মেঘের আদুরে স্পর্শে আবির যেন কিছুটা স্বস্তি পেল।

নিজের সর্বশক্তি দিয়ে মেঘকে আরও শক্ত করে জড়িয়ে ধরলো। আবিরের কান্নার শব্দে মেঘের বুকের ভেতর ভয়ঙ্কর কম্পন শুরু হয়ে গেছে। মেঘ বুক ফুলিয়ে শ্বাস ছেড়ে আকুল কণ্ঠে বলল, " আপনি কাঁদবেন না, প্লিজ। " আবিরের কান্না থামার নাম ই নিচ্ছে না। গত ৩-৪ দিনে বুকের ভেতর যে ঝড় চলছিল সেই ঝড়ের সমাপ্তি ঘটছে আজ। কাদম্বিনীকে দেখার প্রবল আকাঙ্ক্ষা, কণ্ঠ শুনার প্রখরতা, ছুঁয়ে দেখার উমেদ আবিরের অস্তিত্বকে উধাত্ত করে তুলেছিল। তারউপর বাসার অবস্থা দেখে সারাজীবনের জন্য ইহজগতের সমস্ত মায়া ত্যাগ করতে বসেছিল। মেঘ বার বার ঢোক গিলছে, বুক খুঁড়ে কান্না বেড়িয়ে আসার উপক্রম হলো। অকস্মাৎ তানভির বাহির থেকে এসে মেঘের কাঁধে হাত রেখে উষ্ণ স্বরে বলল, " চোখ বেয়ে যদি এক ফোঁটা পানি পরে আর কিঞ্চিৎ মেকআপও নষ্ট হয় তাহলে তোর খবর ই আছে। দুই ঘন্টা রাস্তায় বসে থেকে তোকে সাজিয়ে নিয়ে আসছি, আমি কিন্তু আর পার্লারে নিয়ে যেতে পারব না। "খান বাড়িতে খনিকের নিস্তব্ধতা বিরাজমান। সবাই এতক্ষণ আশ্চর্য নয়নে তাকিয়ে মোজাম্মেল খানের কথাগুলো শুনছিল। মেঘ আবিরের মুখের পানে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে আছে, কিন্তু আবিরের অভিব্যক্তি ঠিক বুঝা যাচ্ছে না। ইকবাল খান আর মোজাম্মেল খান টুকটাক কথা বলছেন বাকিরা চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। ডেকোরেশনের জন্য আসা ৩-৪ জন ছেলে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে ছাদে যাচ্ছে, সিঁড়ির কাছাকাছি যেতেই আলী আহমদ খান হুঙ্কার দিলেন, " তোমাদের আর কতক্ষণ লাগবে? বাসায় মেহমান

আসার সময় হয়ে গেছে অথচ তোমাদের কাজ ই শেষ হচ্ছে না।” “বেশিক্ষণ লাগবে না আংকেল।” ” এই কথা সকাল থেকে শুনে আসছি। এমন তাড়াহুড়োতে কাজ করেছো যে বিয়ে বাড়িকে পুরো স্বাধীনতা দিবসের সাজে সাজিয়ে ফেলছো। শুধু লাল সবুজ দিয়ে কেউ বিয়ে বাড়ি সাজায়?” “সরি, আংকেল। সত্যি বলতে, তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে আগে চেক করতে মনে ছিল না। এখন আর ভুল হবে না।” ” শুনো, আমার একমাত্র ছেলের বিয়ে বলে কথা। এমনভাবে সাজাবে যেন বাড়ির সাজ দেখেই এলাকার মানুষ তাক লেগে যায়। টাকা নিয়ে একদম ভেবো না।’ ” জ্বি আংকেল। ” ছেলেগুলো ছাদে চলে যাচ্ছে। মোজাম্মেল খান আচমকা ধীর কণ্ঠে বললেন, “ভাইজান, একটা কথা বলি?” “হ্যাঁ” মোজাম্মেল খান শীতল কণ্ঠে বললেন, “আমি একবছর যাবৎ ওদের বিয়ের কথা বলতেছি তবুও তুমি রাজি হলে না। হঠাৎ কি এমন হলো যে হুট করে বিয়ের সিদ্ধান্ত নিলে তাও আবার আগামীকালই বিয়ে।” আলী আহমদ খান মলিন হেসে বললেন, “তোর ছেলের জন্য।” “মানে?” “তানভির বলছে, মেঘকে আবিরের কাছে বিয়ে না দিলে আবির নাকি ম* রে যাবে।” সবাই অতর্কিতে আবিরের দিকে তাকালো। অথচ আবির রুষ্ট চোখে তানভিরের দিকে তাকিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে রাগান্বিত কণ্ঠে বলল, “শালা, ম*রে যাওয়ার কথা বলতে বলছি তোকে?” তানভির ঠোঁট চেপে ডানহাতের দু আঙুলে কান ধরে বিড়বিড় করে বলল, “সরি, মুখ ফস্কে বেরিয়ে গেছিলো।” “দূর, শালা।” তানভির কপট রাগী স্বরে বলল, “শালা না সম্বন্ধী।” আবির

ঠোঁট বেঁকিয়ে রাগী স্বরে বলল, “তোকে আমি দেখে নিব।” মাহমুদা খান বললেন, “আবির, রুমে গিয়ে ফ্রেশ হয়ে খাওয়াদাওয়া করে নে। রেডি হতে হবে তো। ” আবির ঘড়ির দিকে তাকিয়ে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলল, “এই ভরদুপুরে রেডি হয়ে কি করবো?” আলী আহমদ খান মেঘকে ইশারা করে গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, “আমার বৌমার শহর ঘুরে গায়ে হলুদের ফটোশুট করার ইচ্ছে। যাও শাওয়ার নিয়ে ঝটপট রেডি হও।” আবির মেঘের দিকে একবার তাকালো পরপর সবার দিকে এক নজর তাকিয়ে আচমকা মেঘকে কোলে তুলে নিল। আলী আহমদ খান সহ উপস্থিত সবাই আঁতকে উঠল। মেঘ অস্পষ্ট গলায় আর্তনাদ করে উঠল। আলী আহমদ খান তপ্ত স্বরে বললেন, “তোমাকে রুমে গিয়ে শাওয়ার নিতে বলছি। তুমি ও কে কোলে নিয়েছো কেনো?” আবির রাশভারি কণ্ঠে বলল, “আমি আপনাদের কাউকে বিশ্বাস করি না। কোন ভরসায় রেখে যাব এখানে? যদি আবার লুকিয়ে ফেলেন? আমি আর কোনো রিস্ক নিতে পারব না, সরি।” আবির মেঘকে কোলে নিয়ে নিরুদ্বেগ ভঙ্গিতে সিঁড়ি দিয়ে উঠছে। তানভির হাত দিয়ে মুখ চেপে হাসছে। আলী আহমদ খান, মোজাম্মেল খান, ইকবাল খান স্তব্ধ চোখে সেদিকে তাকিয়ে আছে। বাড়ির মহিলারাও থম মেরে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনদিন আগে- সন্ধ্যার অনেক পরেও আলী আহমদ খান অফিসে নিজের কেবিনে বসে কাজ করছিলেন। মোজাম্মেল খান আজ অফিসে আসেন নি, আবির সিফাতের উপর রাগ করে দুপুরের দিকেই অফিস থেকে চলে গেছে। ইকবাল খান সন্ধ্যা পর্যন্ত ছিলেন হঠাৎ বাসা

থেকে কল আসছে, বাজার নিয়ে যেতে হবে তাই ওনিও সন্ধ্যার দিকে চলে গেছেন। সিফাত কাজ শেষ করে অনেকক্ষণ এমনিতেই বসে বসে আলী আহমদ খানের সাথে গল্প করছিলো। রাত বেশি হওয়ায় সিফাত কেও ছুটি দিয়ে দিয়েছেন। সিফাত অফিস থেকে বের হবার ১০ মিনিটের মধ্যে রাকিব আর রাসেল আলী আহমদ খানের কেবিনের সামনে উপস্থিত হলো।।রাকিব সালাম দিয়ে মৃদুস্বরে বলল, "আংকেল ভেতরে আসতে পারি?" আলী আহমদ খান কপালে ভাজ ফেলে বললেন, " আরে রাকিব যে, আসো ভেতরে আসো।" রাসেলকে খানিক দেখে কিছুটা চিন্তিত স্বরে জানতে চাইলেন, "কি ব্যাপার, তোমরা হঠাৎ আমার কাছে কি মনে করে?" রাকিব পেছনে ঘুরে কিছুটা তপ্ত স্বরে ডাকল, "এই তানভির, ভেতরে আয়।" তানভির গুটি গুটি পায়ে রুমে এসে মাথা নিচু করে দাঁড়ালো। রাকিবদের সাথে তানভিরকে দেখে আলী আহমদ খান একটু বেশিই অবাক হলেন। তানভিরের দিকে তাকিয়ে গুরুগম্ভীর কণ্ঠে শুধালেন, "কি হয়েছে?" রাকিব শ্বাস ছেড়ে বুকে সাহস নিয়ে বলল, " আংকেল, আপনার কাছে একটা রিকুয়েষ্ট ছিল।" "বলো।" "প্লিজ, না করবেন না।" "ঠিক আছে, বলো।" রাসেল এবার সাহস করে বলল, " আংকেল আবির একজনকে খুব বেশি পছন্দ করে। তাকে বিয়ে করতে চাই, এখন আপনার সমর্থন প্রয়োজন। প্লিজ, না করবেন না।" আলী আহমদ খান রাগী স্বরে বললেন, " আবির তোমাদের পাঠিয়েছে?" তানভির চটজলদি উত্তর দিল, " না না। ভাইয়া কিছু জানে না। আমরা নিজে

থেকে আসছি।” রাকিব ঠান্ডা কণ্ঠে বলতে শুরু করল, ” আংকেল এখানে আসার ব্যাপারে আবিরকে আমরা কিছুই জানায় নি। আবির জানলে কখনো আসতে দিতো না। কিন্তু চোখের সামনে আবিরের এত কষ্ট দেখে আমাদের সহ্য করতেও কষ্ট হয়। আবির আপনাকে খুব সম্মান করে, শুধুমাত্র আপনাদের কথা ভেবে নিজের মনের আবেগ প্রকাশ করতে পারে না। সত্যি বলতে আবির মেঘকে অনেক বেশি ভালোবাসে, মেঘকে বিয়ে করতে চায় কিন্তু আপনারা রাজি হবেন কি না সেই ভয়ে এতদিন আপনাদের কিছু করতে পারছিল না, আর না মেঘকে কিছু বলছে। এখন মেঘও আবিরকে খুব পছন্দ করে। আপনি ওদের সম্পর্কটা প্লিজ মেনে নিন।” “এখন আমার কি করতে হবে?” ” আবির আজ বাসায় নিজের মনের কথা জানাবে মানে মেঘকে বিয়ে করার কথা বলবে। আপনি প্লিজ রাজি হয়ে যাবেন। একমাত্র আপনি বললে বাসার সবাই মেনে নিবে। ” ” যদি আমিই মেনে না নেয়। তখন?” রাকিব আঁতকে উঠে বলল, ” আংকেল এমন কিছু করবেন না, প্লিজ।” “কেনো করব না? আমার ছেলের জন্য বউ খোঁজার অধিকার কি আমার নেই? সে নিজে কিছু বলতে সাহস পাচ্ছে না বলে তোমাদের পাঠিয়েছে, আর তোমরাও আমাকে মানাতে চলে আসছো। শুনো তোমাদের বন্ধুকে বলে দিও আমি ওর সম্পর্ক মানবো না।” তানভির ভ্রু কুঁচকে প্রশ্ন করল, ” কেনো মানবেন না, বড় আব্বু?” “আমার ইচ্ছে আমি ছেলেকে দেখেশুনে বিয়ে করাবো।তোমার কোনো আপত্তি আছে?” “জ্বি।” “কি ? ” ” বনু আর ভাইয়া দু’জন দু’জনকে

ভালোবাসে সেখানে অন্য কাউকে দেখার প্রশ্নই আসে না। তাছাড়া আপনি ভাইয়ার জন্য অন্য কোনো মেয়ে দেখলেও বিশেষ কোনো লাভ হবে না কারণ ভাইয়া আমার বোন ছাড়া কারো দিকে তাকিয়েও দেখবে না।" আলী আহমদ খান গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, " তানভির তুমি কি জানো না, খান বাড়িতে প্রেম নিষিদ্ধ? " " প্রেম নিষিদ্ধ বলেই ভাইয়া বনুর সাথে প্রেম করার চিন্তাও করে নি । সরাসরি বিয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আপনি কি চান না ভাইয়া ভালো থাকুক?" "হ্যাঁ চাই কিন্তু আমার নিয়মনীতি ভেঙে নয়।" তানভির রাগে ফোঁস করে বলে ফেললো, " কোন নিয়মনীতি ভাঙার কথা বলছেন? যেই নিয়মনীতি সন্তানের খুশি সহ্য করতে পারে না সেই নিয়মনীতি চিরতরে ভেঙে দেয়া উচিত। আপনাদের নিয়মনীতি কি সন্তানের জীবনের থেকেও বেশি দামী?" " মানে?" তানভির চুপ হয়ে গেছে।আলী আহমদ খান পুনরায় বললেন, 'কি বলতে চাচ্ছো?' তানভির গম্ভীর কণ্ঠে বলল, " মেঘকে না পেলে ভাইয়া সুসা*ইড করবে। " আলী আহমদ খান বসা থেকে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে উঠলেন, "হোয়াট?" রাকিব শীতল কণ্ঠে বলল, "জ্বি আংকেল। আর বিষয়টা এখন মজার জায়গাতেও নেই। আবিরের সাথে আমি পার্সোনালালি অনেকবার কথা বলেছি তার ঘুরেফিরে এই এক কথায়। " প্রায় ৩০ মিনিটের মতো তানভির, রাসেল, রাকিব আর আলী আহমদ খানের আলাপচারিতা চলল। একদম শেষ পর্যায়ে আলী আহমদ খান শর্ত সাপেক্ষে আবিরদের সম্পর্কটা মোটামুটি ভাবে মেনে নিয়েছেন। রাকিবদের বিদায় দিয়ে

তানভিরের সাথে আরও প্রায় ৪০ মিনিটের মতো কথা বলেছেন। সেখানে বসেই আবিরকে রাজশাহী পাঠানোর পরিকল্পনা করেন। আবিরকে একেবারে বাসে উঠিয়ে তারপর মাহমুদা খানের সাথে দেখা করতে যান। ওনার সাথে আলোচনা শেষ করে আলী আহমদ খান বাসায় ফিরে সরাসরি মেঘের রুমে যান। মেঘ তখন বিছানার বসে বসে আবিরের দেয়া আংটি টা দেখছিল আর আনমনে কত কি ভাবছিল। হঠাৎ আলী আহমদ খান রুমে ঢুকতেই মেঘ থতমত খেতে হাত পেছনে লুকানোর চেষ্টা করল কিন্তু আলী আহমদ খানের হুঙ্কারে সঙ্গে সঙ্গে হাত সামনে এনে আংটি দেখাতে বাধ্য হলো। আলী আহমদ খান গুরুভার কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, " তুমি আবিরকে ভালোবাসো?" মেঘ অবাক লোচনে তাকিয়ে আবিরের শিখিয়ে দেয়া কথাগুলো মনে করার চেষ্টা করলো কিন্তু আলী আহমদ খানের সামনে দাঁড়িয়ে মিথ্যা বলার মতো সাহস মেঘের নেই তাই বাধ্য হয়ে বলল, "জ্বি " "বিয়ে করতে চাও?" মেঘ আঁতকে উঠে শীতল চোখে তাকালো। কিছুক্ষণ নীরব থেকে ধীর কণ্ঠে বলল, "আপনারা রাজি থাকলে...." আলী আহমদ খান গুরুভার কণ্ঠে বলে উঠলেন, " তুমি সত্যি সত্যি আবিরকে ভালোবাসলে আর বিয়ে করতে চাইলে আমি যা বলব তা মানতে হবে। যদি রাজি থাকো তাহলে তিনদিন পর ই তোমাদের বিয়ে দিয়ে দিব। বলো রাজি আছো?" মেঘ আশ্চর্য নয়নে তাকিয়ে রইলো। আলী আহমদ পুনরায় বললেন, " আবারও বলছি যদি আবিরকে নিজের করে পেতে চাও তাহলে আমার শর্ত মানতে হবে। আবিরকে

চাও কি না?” মেঘ কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, “চাই।” “ঠিক আছে। তোমার ফোনটা আগামী তিন-চারদিন আমার কাছে জমা থাকবে। আর তুমি কোনো ভাবে আবিরের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টাও করবে না। আমার সিদ্ধান্ত ছাড়া বাসার বাহিরে পাও রাখবে না।” মেঘ শক্ত কণ্ঠে জানতে চাইল, ” এগুলো কোনো করতে হবে, বড় আব্বু?” আলী আহমদ খান মেঘের মাথায় হাত বুলিয়ে মৃদুস্বরে জিজ্ঞেস করলেন, ” তুমি আবিরের বউ হলে সম্পর্কে আমি তোমার কি হবো?” আলী আহমদ খানের মুখে এমন প্রশ্ন শুনে মেঘ বিস্ময় সমেত তাকিয়ে রইলো। মনের ভেতর উত্তর থাকা সত্ত্বেও দেয়ার মতো শক্তি পাচ্ছে না। আলী আহমদ খান ভারী কণ্ঠে বললেন, ” শ্বশুর আব্বু হবো তো নাকি?” শ্বশুর আব্বু কথাটা শুনেই মেঘ লজ্জায় নুইয়ে পড়েছে। কান দিয়ে অনবরত উষ্ণ ভাপ বের হচ্ছে। আলী আহমদ খান মুচকি হেসে বললেন, ” আমার তো মেয়ে নেই তাই আমার অনেক দিনের ইচ্ছে ছিল, আমার ছেলের বউ মানে আবিরের বউ আমাকে আব্বাজান বলে ডাকবে। আজ আমি আমার ছেলের বউকে পেয়েছি তাই আজ থেকে তুমি আমায় আব্বাজান ডাকবে। ” এই অনীস্পিত, শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতিতে মেঘ কি করবে বুঝতে পারছে না। হঠাৎ কি ভেবে, ওড়না টেনে মাথায় দিয়ে তৎক্ষনাৎ পায়ে হাত দিয়ে সালাম করল। আলী আহমদ খান সালামি দিতে দিতে বললেন, ” আব্বাজান বলো শুনি একটু। ” মেঘের বুকের ভেতর উতালপাতাল ঢেউ শুরু হয়ে গেছে। ইদানীং আবিরের সামনেও এতটা লজ্জা পায় না যতটা লজ্জা বড়

আব্বুকে সামনে পাচ্ছে। মেঘ নিজের সাথে যুদ্ধ করে বুকে সাহস নিয়ে আস্তে করে বলল, ” আব্বাজান। ” “মাশাআল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। আমার মনের আশা আজ পূরণ হলো। এখন বলো, তুমি কি তোমার আব্বাজানের জিত দেখতে চাও না? তোমার আব্বু প্রতিনিয়ত আমার সাথে খোঁচাখুঁচি করে অথচ আমি কিছুই বলি না। তুমি যদি আমার কথা মানো তাহলে এবার আমিই জিতবো। তুমি কি চাও না আমি জিতি?” “জ্বি চাই। ” “ঠিক আছে, আমাদের মধ্যকার আলোচনা যেন তোমার আব্বুর কানে না যায়। এখন বলো তুমি কি আমার শর্তে রাজি আছো?” “জ্বি। আমি সব শর্তে রাজি কিন্তু.... ” আলী আহমদ খান জিজ্ঞেস করলেন, “কিন্তু কি? কিছু লাগবে?” মেঘ মাথা নিচু করে শক্ত কণ্ঠে বলল, ” আমার শুধু আবির ভাইকেই লাগবে।” “তোমার আবির ভাইকে তুমি ঠিক সময় পেয়ে যাবে, চিন্তা করো না।” সেদিনের পর থেকে তানভির আর মেঘ দু’জনকে আলী আহমদ খান যা বলেন তারা তাই করে। মেঘকে নিয়ে শপিং এ যাওয়া, ফেসিয়াল করতে পার্লারে নিয়ে যাওয়া। এমনকি তানভির এলাকার স্পাইগুলোকে পর্যন্ত আবিরের কল ধরতে নিষেধ করে দিয়েছে। সবই আলী আহমদ খানের কথায় করেছে। ওনার কথা না মানলে ওনি মেঘ আবিরের বিয়ে মানবে না এই আতঙ্কে তানভির সব মেনে নিয়েছে। প্রথম দু’দিন বাসার কেউ ই কিছু জানতে পারে নি। কিন্তু একদিন সিফাত কাউকে না জানিয়ে বাসায় চলে আসায় কিছুটা এলোমেলো হয়ে গেছিলো। সিফাতের চালচলন খুব একটা সুবিধাজনক

মনে হয় নি তাই আলী আহমদ খান পরিকল্পনা করে তানভিরকে দিয়ে মেঘকে বাহিরে পাঠিয়ে দিয়েছিল। সিফাত বাসা থেকে যাওয়ার পর থেকে বাসায় সিফাতকে নিয়ে টুকটাক আলোচনা শুরু হচ্ছিলো। মেঘের কানে এসব গেলে মেঘ কষ্ট পাবে তাই ওনি একদিনের মধ্যে সবকিছু রেডি করে বাসার সবাইকে জানিয়ে দিয়েছে। মোজাম্মেল খান আগে থেকেই রাজি ছিলেন তাছাড়া মেঘদের ব্যাপারে ওনার সিদ্ধান্ত তেমন কার্যকর নয় সেজন্য আলী আহমদ খানের কথায় শেষ কথা ছিল। বর্তমান-বর্তমান- লজ্জায় অসাড় মেঘ জোরপূর্বক নিজের চোখ বন্ধ করে রেখেছে। আবির আবেগান্বিত দৃষ্টিতে মেঘকে নিহারা করছে। আশেপাশে না তাকিয়ে আবির সরাসরি নিজের রুমে গিয়ে মেঘকে কোল থেকে নামালো। মেঘের দিকে তাকিয়ে উদ্দীপ্ত কণ্ঠে জানতে চাইল, “আমাকে এত কষ্ট দিয়ে কি শান্তি পেয়েছিস?” “এইযে সারাজীবনের জন্য পেতে যাচ্ছি।” আবির মুচকি হেসে বলল, “তুই এমনিতেও আমারই। ” মেঘ হঠাৎ ই ভ্রু কুঁচকালো। আবিরের চোখে চোখ রেখে আতঙ্কিত কণ্ঠে বলল, “আপনি মাথায় রি*ভ*লবা*র ধরেছিলেন কোন সাহসে? যদি আপনার কিছু হয়ে যেত?” “তোকে না পেলে সত্যিই কিছু একটা হয়ে যেতো।” “বাজে কথা বলবেন না।” আবির মুচকি হেসে ফোনে সম্পূর্ণ ভলিউম দিয়ে গান চালিয়ে অতর্কিতে নাচতে শুরু করলো। মেঘ বিহ্বল হয়ে তাকিয়ে আবিরের নাচ দেখছে। আবির পুরোপুরি জ্ঞানশূন্য অবস্থায় নেচেই চলেছে। রুমের দরজা খুলা থাকায় নিচ পর্যন্ত গানের শব্দ আসছে। সবাই

অবচেতন মনে চোখাচোখি করলো। মীম মাঝখান থেকে বলে উঠল, “আমি গিয়ে দেখবো?” আরিফ নিরুদ্বেগ ভঙ্গিতে বলে উঠল, “সব ব্যাপারে মাতবরি।” মীম ভেঙচি কেটে বলল, “তোমার কোনো সমস্যা?” তানভির ব্যস্ত কণ্ঠে বলল, “ভাইয়ার জামাকাপড়গুলো দিতে হবে, আমি যাচ্ছি।” মোজাম্মেল খান উদ্বেগপূর্ণ ভঙ্গিতে বললেন, “হ্যাঁ হ্যাঁ দেখো, খুশিতে পাগল ই হয়ে গেছে কি না!” তানভির মৃদু হেসে ছুটলো। নিজের রুম থেকে আবিরের জামাকাপড় নিয়ে আবিরের রুমের দরজায় এসেই থমকালো। আবিরের এলোপাতাড়ি নাচ দেখে সহসা পকেট থেকে ফোন বের করে ভিডিও অন করলো। মেঘ এক কর্ণারে দাঁড়িয়ে হাত দিয়ে মুখ চেপে নির্বাক চোখে আবিরের তৃপ্ত আদলে তাকিয়ে আছে। কিছুক্ষণ আগে চিৎকার করে কান্না করা মানুষটা এখন কি সুন্দর হাসছে। তানভির মেঘকে আস্তে করে ডাকল, মেঘ এগুতেই আবিরের জামাকাপড়গুলো মেঘের হাতে দিয়ে মোলায়েম কণ্ঠে বলল, ” ভাইয়াকে একটু তাড়াতাড়ি রেডি হতে বলিস, ফটোগ্রাফার ওয়েট করছে। আর হ্যাঁ তোর বান্ধবীকে অনেকগুলো কল দিয়েছি, একবার অর্ধেক কথা শুনার পর থেকে কল আর রিসিভ করে না।” মেঘ মেকি স্বরে বলল, ” তোমার প্রেমিকা তুমি সামলিয়ো। আপসোস, কেউ একজন বলেছিল, সময় হলে জানাবো তার সময়ও হলো না আমাকে কিছু জানালোও না। ” তানভির মেঘের মাথায় আস্তে করে গাট্টা মেরে বিড়বিড় করল, ” আমার আগে তুই ই তো প্রপোজ করে ফেলছিস। ” “আমি আমার ভাবি বানানোর জন্য প্রপোজ করেছি

তোমার প্রেমিকা বানাতে নয়। ওকে?" "ওকে ওকে।" মেঘ জামা বিছানার উপর রাখছে এরমধ্যে তানভির আচমকা ডাকল, "ভাইয়া" তানভিরকে আগে দেখলেও আবির নাচের মনোযোগ নষ্ট করে নি। এখন তানভিরের ডাকে ফোনের দিকে নজর পড়তেই থামলো। গুরুগম্ভীর কণ্ঠে বলল, " শালা, তুই দাঁড়া শুধু.." আবির দৌড় দেয়ার আগেই তানভির দু'হাতে আবিরের রুমের দরজা চাপিয়ে দৌড়ে বেলকনি পেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে ঘন ঘন শ্বাস ফেলছে। আলী আহমদ খান মৃদুস্বরে জানতে চাইলেন, " এভাবে ছুটছো কেন? আর আবির ই বা কি করে?" তানভির সিঁড়ি তে দাঁড়িয়েই আবিরের নাচের ভিডিও অন করল। ৫ থেকে ৭ সেকেন্ড চলার পর ই অফ করে দিয়েছে। ঠোঁটে হাসি রেখে বলল, "খুশিতে পাগল না হলেও নাচতে নাচতে নিশ্চিত পাগল হয়ে যাবে।" উপস্থিত সবাই একসঙ্গে হেসে উঠল। এদিকে মেঘ আবিরকে থামিয়ে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জানতে চাইল, " আপনি আমার ভাইকে মা*রতে চাচ্ছেন কেনো?" " মা*রবো না তো কি চুমু খাবো? অবশ্য চুমু খাওয়ার জন্য তো তুই ই আছিস।" মেঘ ঠোঁট উল্টিয়ে নিরেট দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। আবির শক্ত কণ্ঠে বলল, " ইসস, ভাল্লাগে না।" মেঘ ভ্রু কুঁচকে প্রশ্ন করল, "কেনো? কি হয়েছে?" " সেজেগুজে পুরো পুতুল হয়ে আসছিস। ধরতেও পারছি না, কিছু করতেও পারছি না। দূর, ভাল্লাগে না।" মেঘ আনমনে বলে উঠল, " না সাজলে কি করতেন?" আবির মেঘের চোখের দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে হেসে আস্তে করে চোখ মেরে বলল, " রোমান্স। "

মেঘ অবিশ্বাস্য চোখে তাকিয়ে আছে। আবির প্রথমবারের মতো মেঘকে চোখ মেরেছে। হতবিহ্বল মেঘ নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। আবির দু'কদম এগিয়ে এসে মেঘের কানের কাছে ফিসফিস করল, " এভাবে তাকিয়ে নিজের বিপত্তি ডেকে আনিস না, আমাকে তোর সাজ নষ্ট করাতে বাধ্য করিস না, প্লিজ।" মেঘ নিজেকে সামলে অনুষ্ণ কণ্ঠে বলল, " শাওয়ার নিয়ে আসুন তাড়াতাড়ি।" আবির বিছানার পাশে ধপ করে বসে উদাসীন কণ্ঠে বলল, " শার্টের বোতামগুলো খুলে দে।" "আমি পারব না।" "তাহলে আমিও শাওয়ার নিতে যাব না।" আবির ভ্রু নাচালো, মেঘ কপালে কয়েকস্তর ভাঁজ ফেলে এগিয়ে এসে শার্টের বোতাম খুলতে খুলতে বলল, "আপনি বড্ড জ্বালাচ্ছেন।" আবির ঠোঁট ভিজিয়ে নরম স্বরে বলল, "পাগলকে উসকাবে আর তার পাগলামি সহ্য করবে না তা কি করে হয়, সোনা।" 'সোনা' শব্দটা শুনেই মেঘ থম মেরে দাঁড়িয়ে পরেছে। পরপর দ্রুত গতিতে সব বোতাম খুলে দিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে বলল, " শেষ, তাড়াতাড়ি যান।" আবির মুচকি হেসে টাওয়েল নিয়ে ওয়াশরুমে যেতে যেতে রাগী স্বরে বলল, " রুম থেকে বের হলে আমি কিন্তু বিয়েই করব না।" মেঘ রাগী চোখে তাকাতেই আবির ঠান্ডা কণ্ঠে বলে উঠল, " এত কিউট করে সেজে এভাবে তাকাস কেন? যাচ্ছি তো।" আবির ওয়াশরুমে ঢুকে গেছে। মেঘ বিছানার এক কোণে বসে আনমনে হাসছে। আজকের আবির ভাই যেন আগাগোড়ায় ভিন্ন, কথায় কথায় লজ্জা দেয়ায় যেন তার একমাত্র কাজ। লজ্জায় মেঘের গালে দেয়া গোলাপী ব্লাশন এখন টকটকে লাল

দেখাচ্ছে। মেঘ আবিরের হলুদের পাঞ্জাবি টা দেখছে। গায়ে হলুদের পুরো শপিং তানভির একায় করেছে যদিও আবিরের পছন্দের বাহিরে কিছুই কেনে নি। আবিরের যে রঙের পাঞ্জাবি পড়ার ইচ্ছে, মেঘকে যে রঙের শাড়ি পড়ানোর ইচ্ছে ছিল আর ঠিক যেভাবে সাজানোর ইচ্ছে ছিল তানভির সেভাবেই সবটা করেছে। আপাতত বাহিরের ফটোশুট হবে। সন্ধ্যার পর মেইন পোগ্রাম শুরু হবে। তখনের জন্য লেহেঙ্গা কিনে রেখেছে। আবির কিছুক্ষণের মধ্যে কোমড়ে টাওয়েল জড়িয়ে বেড়িয়ে আসছে। লাজুক মেঘ এক পলক দেখে লজ্জায় সেই যে মাথা নিচু করেছে আর চোখ তুলে তাকাতে পারছে না। আবির আরেকটা শুকনো টাওয়েল দিয়ে মাথা মুছতে মুছতে স্বাভাবিক কণ্ঠে জানতে চাইল, " কোথায় ছবি তুলবি?" মেঘ একনাগাড়ে অনেকগুলো জায়গার নাম বলল। আবির প্রশস্ত নেত্রে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, "এই তিনদিন কি শুধু জায়গায় ঠিক করছিস?" "হ্যাঁ।" আবির আস্তে করে বলল, "এখন পাঞ্জাবি টা পড়িয়ে দেন।" মেঘ আবারও ঠোঁট উল্টালো। আবির সঙ্গে সঙ্গে বলল, "যত দেরি করবি তত কম ছবি তুলতে পারবি এই আমি বলে রাখলাম। শ্বশুরের সাথে মিলে জামাই কে কষ্ট দেয়া না? এর প্রতিশোধ আমি কড়ায়-গণ্ডায় ফেরত নিব।" মেঘ ধীর গতিতে পাঞ্জাবির বোতাম খুলছে আর মনে মনে আবিরকে বকছে, " বেহায়া, বেয়াদব ব্যাটা।" অকস্মাৎ কেউ একজন দরজায় ডাকল। মেঘ দরজার দিকে তাকিয়ে উঁচু স্বরে বলল, "দরজা খোলায় আছে।" দরজা খুলতেই মালার গম্ভীর মুখ ভেসে উঠলো। আবির মালাকে দেখেই তড়িৎ বেগে

বিছানার উপর রেখে দেয়া টাওয়েল টা টেনে নিজের গা ঢেকে ফেলেছে। আবিরের ঝড়ের গতিতে গা ঢাকা দেখে মালা ঠোঁট বাঁকালো। মেঘ মালাকে দেখে হাসিমুখে বলল, "আপু কেমন আছেন?" "ভালো।" মেঘ পুনরায় বলল, "ভেতরে আসুন।" আবির এবার শক্ত কণ্ঠে মেঘকে বলল, " পাঞ্জাবি কি পড়িয়ে দিবি?" মালা আবিরকে এক নজর দেখে রাশভারি কণ্ঠে বলল, " অসময়ে বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত। ফুফা তোমাদের ডাকতেছে, এটায় বলতে আসছিলাম। " " ধন্যবাদ, আব্বুকে গিয়ে বল একটু সময় লাগবে আর যাওয়ার আগে দরজাটা চাপিয়ে রেখে যা।" মালা দাঁতে দাঁত চেপে দু'হাতে ঠাস করে দরজা বন্ধ করেছে। উচ্চশব্দে আবির মেঘ দুজনেই চোখ বন্ধ করে ফেলেছে। মেঘ চোখ খুলে শান্ত গলায় বলল, " আপুর সাথে এভাবে কথা বলা ঠিক হয় নি আপনার।" "ঠিক-বেঠিক আমাকে বুঝাতে হবে না ম্যাডাম। এই মালা আমাকে খুব জ্বালিয়েছে। শুধুমাত্র আব্বুর ভয়ে এতদিন বাড়াবাড়ি করি নি নয়তো মালাকে অনেক আগেই শায়েস্তা করে ফেলতাম।" মেঘ কেবল মুচকি হাসলো, কিছু বলার প্রয়োজন মনে করলো না। আবির রেডি হয়ে মেঘকে নিয়ে নিচে নামছে। আবিরের মামার বাড়ির সবাই ইতিমধ্যে চলে আসছে। মেঘের মামা বাড়ির মানুষ এখনও আসে নি। মাইশা আপুর লাস্ট মাস চলছে, কিছুদিনের মধ্যে ডেলিভারি তাই ওনি আজ আসতে পারেন নি। শরীর সুস্থ থাকলে বিয়ে বা বৌভাতে অন্ততপক্ষে আসবেন। আবির মামা মামীদের সাথে কথা শেষ করে বাসা থেকে বের হলো। বাসার সামনে

তানভির দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে বন্যাকে একাধারে কল দিয়েই যাচ্ছে। আবির আচমকা তানভিরের এক হাত পেছনে চেপে ধরে রাগান্বিত কণ্ঠে বলল, " শালা, তুই আব্বুর কাছে গেছিলি কোন সাহসে?" মেঘকে আতঙ্কিত কণ্ঠে বলল, "প্লিজ, ভাইয়াকে ছাড়ুন।" তানভির ব্যথায় আর্তনাদ করতে করতে তপ্ত স্বরে বলল, " আমাকে মেরে লাভ নেই। আমরা না গেলে আজকের এই স্পেশাল দিনটা পেতেই না।" তানভিরকে ছেড়ে আবির উদ্বিগ্ন কণ্ঠে শুধালো, "আমরা মানে? আর কে কে গেছিলি?" "রাকিব ভাইয়া, রাসেল ভাইয়া।" "হারামির দল। ঐদিন আমাকে ফেলে আসার কারণ এটায় ছিল ওদের? তোরা সব কয়টাকে দেখে নিব শুধু কয়েকটা দিন যাক।" এরমধ্যে সাকিব আসছে। এক দৌড়ে এসেই আবিরকে জড়িয়ে ধরে উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, " ভাইয়া, ফাইনালি আমি তোমাদের বিয়ে খেতে আসছি। ভাবতেই পারছি না। " সাকিব আচমকা ঘাড় কাত করে আহ্লাদী কণ্ঠে বলল, "হাই ভাবি" "হাই।" আবির আড়চোখে তানভিরের দিকে তাকালো। তানভির বন্যাকে কলের পর কল দিচ্ছে দেখে আবির মৃদুস্বরে বলল, "যতই চেষ্টা কর, আমার রেকর্ড ভাঙতে পারবি না।" "রেকর্ড ভাঙার কোনো ইচ্ছে নেই আমার, আপাতত মেয়ের রাগটা কমলেই চলবে।" আবির রাশভারি কণ্ঠে বলল, " এসব বাদ দিয়ে বিকেলে সোজা ওদের বাসায় যাবি। ওর আব্বু, আম্মু, বোনকে দাওয়াত দিবি সাথে করে বন্যা আর তার ভাইকে নিয়ে আসবি।" মেঘ, মীম, আরিফ, আইরিন, সাকিব, তানভির আর আবির

ফটোশুট করতে বেড়িয়েছে, সাথে ক্যামেরাম্যান তো আছেই। সবাই হাসিখুশিতে থাকলেও আরিফ আর মীম একটু পর পর ঝগড়া লেগে যায়। একবার তানভির আরেকবার আইরিন আঁটকে আঁটকে রাখছে। ফটোশুটের লাস্ট দিকে তানভির ওদের থেকে বিদায় নিয়ে বন্যাদের বাসায় আসছে। সাথে দুটা কার্ডও নিয়ে আসছে, একটা নরমাল দাওয়াতের কার্ড অন্যটা বন্যার জন্য স্পেশালভাবে বানানো। যদিও প্ল্যানটা মেঘ ই দিয়েছে। তানভির বাসায় ঢুকতেই বন্যার বড় বোনের সাথে দেখা। তানভিরকে দেখেই মোলায়েম কণ্ঠে বলল, " কেমন আছো ভাইয়া?" "আলহামদুলিল্লাহ ভালো। আপনি কেমন আছেন আপু?" "আলহামদুলিল্লাহ ভালো।" "আংকেল আন্টি বাসায় নেই?" " আব্বু, আম্মু আর রিদ একটু বাহিরে গেছে। বসো, শুনলাম মেঘের বিয়ে। " তানভির বিয়ের কার্ড হাতে দিয়ে বলল, " জ্বি আপু। হুট করে সবকিছু ঠিক হয়েছে যে সময় নিয়ে ঐভাবে দাওয়াত দেয়া সম্ভব হয়ে উঠেনি। আমাদের কিন্তু দু'দিনের ই দাওয়াত। আগামীকাল কমিউনিটি সেন্টারে আর পরশুদিন বাসায়। আংকেল আন্টিকে বলবেন অবশ্যই যেতে হবে। আর এখন আপনি আর বন্যা রেডি হয়ে আমার সাথে বাসায় চলুন।" "আরে না ভাই, আমি যাব না। বন্যাকে নিয়ে যাও, মেঘ আরও পাঁচবছর আগে থেকে আমাকে বলে রাখছে ওর বিয়েতে বন্যাকে কম করে হলেও তিনদিনের জন্য দিতে হবে। আমিও মেঘকে কথা দিয়েছিলাম, বন্যার বিয়ে না হলে আমি আব্বু আম্মুকে বুঝিয়ে তিনদিনের জন্য পাঠাবো। এখন দেখো মেঘের বিয়ের কথা

শুনার পর থেকে সেই যে মুখ ফুলিয়ে রুমে ঢুকেছে আর বের ই হচ্ছে না। গত দুইদিন আব্বু অসুস্থ ছিল এ অবস্থায় বাসা থেকে বের হতে পারছিল ঠিকই তবে ২৪ টা ঘন্টা শুধু মেঘ কি করছে, মেঘের কি হয়েছে, মেঘ কেমন আছে এসব করেই কাটিয়েছে। আব্বু অসুস্থ না থাকলে আমি নিজেই বন্যাকে নিয়ে তোমাদের বাসা থেকে ঘুরে আসতাম।" "বন্যা কোথায় এখন?" " রুমে। " "ওর সাথে একটু কথা বলা যাবে?" "আসো" বন্যার বোন দরজার সামনে দাঁড়িয়ে জোরে ডাকতে ডাকতে বলল, " এই বন্যা, দরজা খোল। মেঘের ভাই তোর সাথে কথা বলতে আসছে।" "আমি দরজা খুলবো না, ওনাকে চলে যেতে বলো।" "বন্যা, তানভির এখানে দাঁড়িয়ে আছে দরজাটা খোল।" "বললাম তো খুলবো না।" তানভির এবার মোলায়েম কণ্ঠে বললো, " বন্যা, প্লিজ দরজা টা খুলো।" " আপনি চলে যান এখান থেকে। ধুমধাম করে বোনের বিয়ে দেন গিয়ে।" তানভির কপালের ঘাম মুছে শক্ত কণ্ঠে বলল, " তুমি না গেলে বনু বিয়েতে বসবে না কারণ টা তুমি খুব ভালোভাবেই জানো।" বন্যা এবার একটু থামলো। তানভির শান্ত কণ্ঠে পুনরায় বলল, " প্লিজ বন্যা, দরজা টা খুলো। আমার কথাগুলো অন্তত শুনো।" বন্যা রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে দরজা খুলে রাগান্বিত কণ্ঠে বলল, " সবকিছু ঠিকঠাক করে এখন আমাকে মিথ্যা গল্প শুনাতে আসছেন?" বন্যার বোন ধীর কণ্ঠে বলল, " বন্যা, আস্তে কথা বল। " তানভির মৃদুস্বরে বলল, "সমস্যা নেই আপু। ও কে বলতে দেন।" বন্যার বোন স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, " তুমি ওর সাথে কথা বলো আমি চা নিয়ে

আসছি।” বন্যার বোন চলে যেতেই তানভির মলিন কণ্ঠে বলল, “সরি।” বন্যার দুচোখ বেয়ে অনর্গল পানি পড়ছে। কাঁদতে কাঁদতে বলতে শুরু করল, “সরি? মেঘের চিন্তায় আমি দু রাত একফোঁটাও ঘুমাতে পারি নি। আমি সেদিন কথাগুলো না বললে মেঘ শাড়ি পড়ে বের হতো না আর পরবর্তী ঘটনাগুলোও ঘটতো না। সব দোষ আমার, আমি মেঘের ভালো চাইতে গিয়ে খারাপ করে ফেলেছি, এসব ভেবে উঠতে বসতে আমার নিজেকে মা*রতে ইচ্ছে করছিল। আপনাকে কতশত কল দিয়েছি, এক পর্যায়ে আপনি আমার নাম্বার টা পর্যন্ত ব্লক করে দিয়েছেন। আমি দিশাবিশা পাচ্ছিলাম না, বাসায় আব্বু অসুস্থ, ঐদিকে মেঘের কি হয়েছে জানতে পারছিলাম না। আপনাদের বাসায় যাওয়ার শক্তি আর সাহস কোনোটায় পায় নি। আমাকে এত কষ্ট কেন দিয়েছেন আপনারা? আমি আপনাদের কি এমন ক্ষতি করেছি? একটাবারের জন্যও কি জানানো যেতো না আমায়?” তানভির বন্যার দিকে তাকিয়ে অনুষ্ণ কণ্ঠে বলতে শুরু করল, ” তুমি বিশ্বাস করো, আমি বা বনু চাইলেও কিছু করতে পারছিলাম না। যেখানে ভাইয়ার সাথে পর্যন্ত যোগাযোগ বন্ধ করতে বাধ্য করা হয়েছে সেখানে কতটা চাপে ছিলাম আমি একবার ভাবো। তোমাকে তো আগেই বলেছি বনুর ফোন বড় আব্বুর কাছে জমা ছিল। আর আমি গত তিনদিনে নিজের ইচ্ছেতে কোনোদিকে পাও বাড়াতে পারি নি। ঘুমাতে গেলে পর্যন্ত বড় আব্বুর অনুমতি নিয়ে যেতে হয়েছে। আমাকে এমনভাবে থ্রেট করা হয়েছে, যদি আমি কোনোভাবে ভাইয়ার সাথে বা কারো সাথে ভাইয়ার

বিষয় নিয়ে কথা বলি তাহলেই বিয়ে বাতিল। একজন মানুষ যদি ১০ মিনিট, ২০ মিনিট, ৩০ মিনিট অন্তর অন্তর কল দিয়ে কাজের অর্ডার দেন আর সেই কাজ হয়েছে কি না সেটার প্রমাণ পর্যন্ত চান। ঐ অবস্থায় আমি কিভাবে কি করতাম বলো, তোমাকে বাসা থেকে বের করে যে দুটা কথা বলবো এটুকু সময়ও আর সুযোগও আমাকে দেয়া হয় নি। শুধু আমি না, রাকিব ভাইয়া আর রাসেল ভাইয়াও থ্রেটের উপরে ছিল। বিভিন্ন প্রয়োজনে বড় আব্বুর সামনে দাঁড়িয়ে একে তাকে কল দিতে হচ্ছিল সেখানে বারবার তোমার কল আসা কতটা বিপদজনক একবার ভাবো। আমি সত্যি ই দুঃখিত, এখন প্লিজ চলো।" তানভির বন্যার জন্য আনা স্পেশাল কার্ডটা বন্যাকে দিল। বন্যা কার্ডটাকে ভালোভাবে পরখ করে চোখ মুছে চাপা স্বরে বলল, " আমি যাব তবে শুধুমাত্র মেঘের জন্য।" তানভির মুচকি হেসে বলল, " ধন্যবাদ। " বন্যা ফোঁস করে উঠল, " ধন্যবাদ দিতে হবে না। আপনার সাথে আমার কোনো কথা নেই। " তানভির মনমরা হয়ে বলল, " আমার কি দোষ?"বন্যা ভ্রু গুটিয়ে শক্ত কণ্ঠে বলল, "আপনার কোনো দোষ নেই। আপনি তো অপাপবিদ্ধ। সব দোষ আমার, আমি কেন এত ভাবি?" "তুমি দায়িত্বশীল, বিনম্র একটা মেয়ে। তুমি ভাববে না তো কে ভাববে বলো। তাছাড়া তুমি সেদিন বনুকে কথাগুলো না বললে বনু আর ভাইয়ার অসাধারণ মোমেন্টগুলো মিস হয়ে যেত আর সবাইকে বিয়েতে রাজি করানোর জন্য ভাইয়াকে যেকোনো পর্যায়ে যেতে হতো। এখন আলহামদুলিল্লাহ সবকিছু আমি সামলে নিয়েছি, যা ঝড় গিয়েছে

সব আমার উপর দিয়েই গিয়েছে। ভাইয়ার খুব বেশি ফাইট করতে হয় নি। আর বনুর কথা কি বলল, ও তো গত তিনদিন সারাটাক্ষন শুধু বন্যা আর বন্যায় করে যাচ্ছিল। আজ সকালে আমাকে রীতিমতো থ্রেট দিয়েছে, বিকেলের মধ্যে তোমাকে যেভাবেই হোক বাসায় নিয়ে যেতে হবে। বনুর ভাইয়াকে পাওয়ার খুশির থেকেও বেশি কষ্ট লাগছিল তোমাকে ওর মনের কথাগুলো বলতে না পারাতে। বাসায় তো সেভাবে কথা বলতে পারতাম না, কিন্তু বনুকে নিয়ে বের হলেই তোমার সাথে দেখা করতে পাগলা হয়ে যেতো। কিন্তু কি করতাম বলো, বড় আব্বু একদম সময় বেঁধে কোনো কাজে পাঠাতেন। তুমি তো জানোই ওনি এক কথার মানুষ, কাজে এদিক সেদিক হলে খবর আছে। বাই চান্স আমার কারণে ভাইয়ার বিয়ে আঁটকে গেলে আমি সারাজীবনেও নিজেকে মাফ করতে পারতাম না। ভাইয়ার সামনে দাঁড়ানোর যোগ্যতা হারিয়ে ফেলতাম। আমার মুখের সামান্য একটা কথাতে ভাইয়া যে মস্ত বড় ভুল সিদ্ধান্তটা নিয়েছিল আমি চাই নি সেই সিদ্ধান্তের জন্য বর্তমানে ওদের উপর কোনো প্রভাব পড়ুক। তাই ভাইয়াকে সারপ্রাইজ দিতে নিজেকেই বলির কুমড়ো হতে হয়েছে। সেই সাথে ভাইয়ার সারপ্রাইজের কিছুটা প্রভাব তোমার উপরও পড়ে গেছে। তারজন্য আমি আন্তরিক ভাবে দুঃখিত। এখন কি কানে ধরতে হবে?” বন্যা থতমত খেয়ে বলল, ” না, কানে ধরতে হবে না। আপনি একটু অপেক্ষা করুন আমি রেডি হয়ে আসছি।” “আচ্ছা। ” তানভির নিচে চলে আসছে। বন্যার বোন চা নাস্তা দিয়ে মেঘের বিয়ের বিষয়ে

কথা বলছেন। কিছুক্ষণের মধ্যে বন্যা নিচে এসে স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, "আব্বু আম্মু আসে নি এখনও?" "না। আমি আব্বুকে আগেই বলে রাখছি, তুই যা সমস্যা নেই।" তানভির ধীর কণ্ঠে বলল, " আমি ভাবছিলাম রিদকে নিয়ে যাব।" " রিদ যাবে না। বিয়েতে ওর ইন্টারেস্টি কম, ও শুধু ঘুরতে পছন্দ করে। এখন যদি বলা হয় চল সিলেট যায়, দু মিনিটও লাগবে না সে ব্যাগ নিয়ে হাজির। আর যদি মুখ ফস্কেও বলে ফেলি বিয়েতে যেতে হবে। তাহলে ওর তালবাহানা শুরু হয়ে যাবে। ওর আশা করে লাভ নেই তার থেকে বরং বন্যাকে নিয়ে যাও।" "আচ্ছা আপু। কাল- পরশু দু'দিনের ই দাওয়াত রইলো। অবশ্যই আসবেন, প্লিজ।" "আচ্ছা, ঠিক আছে। সাবধানে যেও।" "বন্যা, তুই ও সাবধানে থাকিস।" "আচ্ছা।" তানভির বন্যাকে নিয়ে বেড়িয়ে মোখলেস মিয়ার দোকান পর্যন্ত আসতেই মোখলেস মিয়াকে নজরে পড়লো। ওনি ওদের দেখে বসা থেকে দাঁড়িয়ে পরেছেন। তানভির একটু সামনে গিয়ে বাইক থামিয়ে ঠান্ডা কণ্ঠে বলল, "আমি আসছি এখুনি। " তানভির মোখলেস মিয়ার সামনে এসে ভ্রু নাচাতেই, মোখলেস মিয়া ভারী কণ্ঠে বললেন, " কি হইতাছে?" তানভির তপ্ত স্বরে বলল, " আপনার বউরে আমার বাড়িত লইয়া যাইতাছি।" "কেরে?" "আর কত বাপের বাড়িত থাকবো। শ্বশুরবাড়ির হাওয়া-বাতাসেরও তো দরকার আছে নাকি?" "আমার বউয়ের কিছু হইলে আমি কিন্তু তোমারে ছাইড়া দিতাম না।" "অ্যাহ! আসছে। নিজের দুইটাকে সামলান আমার টা আমি বুঝে নিব। আপনাকে শুধু জানাতে

আসছিলাম, এখন আসি।” বন্যাকে নিয়ে বাসায় আসতে আসতে সন্ধ্যার পর হয়ে গেছে। আবিরদের পুরো বাড়ি লাল, গোল্ডেন, বেগুনি, সবুজ, নীল রঙের আলোকসজ্জায় ঝলমল করছে। বাসার সামনে বিশালাকৃতির গেইটে বড় করে আবির-মেঘের নাম লেখা। বন্যা মন্ত্রমুগ্ধ নয়নে তাকিয়ে আছে। মেঘের দুই বছরের অনাবিল ভালোবাসার পূর্ণতা পেতে যাচ্ছে। গেইট পার হতেই মোজাম্মেল খান আর আলী আহমদ খানের সাথে দেখা। বন্যা সালাম দিতেই ওনারা একসঙ্গে সালামের উত্তর দিলেন। বন্যার ব্যাগের দিকে এক নজর তাকিয়ে মোজাম্মেল খান ঠান্ডা কণ্ঠে হুঙ্কার দিলেন, “তানভির, ব্যাগ টা কি তুমি নিতে পারো না?” তানভির মাথা নিচু করে হাত বাড়িয়ে ব্যাগ টা নিতে নিতে বিড়বিড় করল, “আমি আগেই নিতে চেয়েছিলাম, দেয় নি।” মোজাম্মেল খান শুনলো কি না কে জানে। বন্যা ওনাদের সাথে অল্পস্বল্প কথা বলে ভেতর চলে গেছে। ড্রয়িংরুম ভর্তি আত্মীয়স্বজন। মেঘের মামা বাড়ির মানুষজনও ততক্ষণে চলে আসছে। মীমের মামা বাড়ি, খালার বাড়ি থেকেও অনেকেই আসছে। তাছাড়া এলাকার মানুষ তো আছেই। এত এত মেহমান দেখে বন্যা মাথা নিচু করে দ্রুত মেঘের রুমে চলে আসছে। মেঘ লেহেঙ্গা পড়ে পুরোপুরি রেডি হয়ে বিছানায় বসে বসে বন্যাকে একের পর এক মেসেজ দিচ্ছে, বার বার কল দিচ্ছে। অকস্মাৎ বন্যা কোমল কণ্ঠে ডাকল, “ননদীনি” মেঘ চোখ তুলে তাকিয়ে বন্যাকে দেখেই ছুটে গিয়ে বন্যাকে জড়িয়ে ধরে আবেগ জড়িত কণ্ঠে বলতে শুরু করল, “আমার খুব কান্না পাচ্ছিলো, তোকে

বার বার কল দিচ্ছি, মেসেজ করছিলাম তুই রেসপন্স করছিলি না। আমি ভাবছিলাম তুই বোধহয় আসবিই না। এই আনন্দের দিনে তুই আমার পাশে না থাকলে আমার সব আনন্দ মাটি হয়ে যেতো। তুই বিশ্বাস করবি না, বড় আব্বু আমার ফোন নেয়ার পর থেকে তোর সাথে একটু কথা বলার জন্য আমি কি পরিমাণ ছটফট করেছি। অন্য কারো ফোন দিয়ে কল দেয়ার মতোও অবস্থা ছিল না। বড় আব্বু এই তিনদিন অফিসেও যান নি, সারাক্ষণ বাড়িতে ছিলেন। ফেসিয়াল করতে পাঠানো, শপিং এ পাঠানো থেকে শুরু করে আমার খাওয়া, রেস্ট সবেতেই ওনি নজরদারি করেছেন। আমি সুযোগ পেলেই ভাইয়াকে তোর কথা জিজ্ঞেস করতাম। ভাইয়া কবে নিজের মনের কথা আমাকে বলবে আমি সেই আশা পর্যন্ত করি নি। সকালে ভাইয়াকে বলেছি, যদি তোকে আনতে না পারে তাহলে যেন আজ বাসায় না আসে।" বন্যা মোলায়েম কণ্ঠে বলল, " আমি সবই বুঝতে পেরেছি। কোনো সমস্যা নেই। তুই যে বিপদে ছিলি এটা ঠিকই বুঝতে পারছিলাম কিন্তু আমার রাগ উঠেছিল তোর ভাইয়ের উপর। ওনি মেসেজের রিপ্লাই করে না, ফোন নাম্বার ব্লক করে রেখেছিল হুট করে আজ কল দিয়ে বলল আগামীকাল বনুর বিয়ে। এই কথা শুনামাত্র আমার মেজাজ মাত্রাতিরিক্ত খারাপ হয়ে গেছিলো সেই যে ফোন সাইলেন্ট করেছিলাম এখনও ওভাবেই আছে।সেসব ভেবে এখন মন খারাপ করে সাজ নষ্ট করতে হবে না, বেবি।" মেঘ বন্যাকে ছেড়ে আদুরে কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, " আমাকে কেমন লাগছে বেবি?" " আমি

আর উত্তর দিব না। আজ থেকে যত কমপ্লিমেন্ট দেয়ার সব আমার ভাসুর দিবে। " " ওনার নির্লজ্জ মার্কা কমপ্লিমেন্ট শোনার কোনো ইচ্ছে নেই আমার। ওনি এখন আর আগের মতো নেই। " তানভির গলা খাঁকারি দিয়ে আস্তে করে বলল, "এইযে ব্যাগ টা। মামা মামীদের সাথে কথা বলতে বলতে দেরি হয়ে গেছে।" মেঘ আহ্লাদী কণ্ঠে বলল, "ধন্যবাদ ভাইয়া, লাভ ইউ।" " থাক, এখন আর ভালোবাসা দেখাতে হবে না। দিছিলি তো বাসা থেকে বের করে, তোর বান্ধবীর রাগ না কমলে আমি এখন মোখলেস দাদার দোকানে সিঙ্গারা বেঁচতাম।" মেঘ ফিক করে হেসে উঠল। তানভির বন্যার দিকে তাকিয়ে স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, " শাড়ি পড়ে তাড়াতাড়ি রেডি হও।" যেতে যেতে আবার থামলো, ঘাড় ঘুরিয়ে হাসিমুখে বলল, "লাভ ইউ টু। " মেঘ চাপা স্বরে বলে উঠল, " কাকে বলছো?" বন্যা মেঘের দিকে তাকিয়ে রাগে কটমট করছে। তানভির ভারী কণ্ঠে জানতে চাইল, " কিছু বলছিস?" "না। " বন্যা শাড়ি পড়ে মেঘের রুমেই সাজুগুজু করছে। ধীরে ধীরে মেঘের মামীরাও মেঘকে দেখতে আসছে। জান্নাত আর আইরিন মিলে মীমকে জোর করে শাড়ি পড়াচ্ছে। সব মিলিয়ে মোটামুটি ৮-১০ জন মেঘের রুমে উপস্থিত। লেহেঙ্গা পড়ার কারণে মেঘ ঠিকমতো নড়াচড়া করতে পারছে না তাই চুপচাপ বিছানায় বসে বসে সবার সাজগোছ দেখছে। আবির মেঘকে দেখতে মেঘের রুমের দরজায় এসে থমকে দাঁড়িয়েছে। রুম ভর্তি এত মানুষ দেখে সঙ্গে সঙ্গে কপাল কুঁচকালো। ঘাড় কাত করে মেঘকে দেখার চেষ্টা করবো। লেহেঙ্গা পড়ে রাজরানী

সেজে বিছানার ঠিক মাঝ বরাবর বসে আছে মেঘ। মেঘকে দেখেই আবিরের হৃৎস্পন্দন জোরালো হচ্ছে, কেউ দেখার আগে আবির দরজা থেকে সরে কিছুটা দূরে গিয়ে উচ্চস্বরে ডাকল, "মেঘ.." মেঘ বিছানা থেকে নামতে নামতে উত্তর দিল, "জ্বি" আবির পুনরায় ডাকল, "মেঘ.." মেঘ দু'হাতে লেহেঙ্গা কিছুটা উঠিয়ে দরজা পর্যন্ত ছুটে গেল। দরজার সামনে আবিরকে না পেয়ে ভ্রু কুঁচকে আবির কোথায় আছে দেখার জন্য বেলকনির দিকে ঝুঁকল। আচমকা মেঘের স্নিগ্ধ গালে ঠোঁট ছোঁয়াল আবির। মেঘ পূর্ণব্যাদিত আঁখিতে তাকানোর পূর্বেই আবির দ্রুত স্থান ত্যাগ করল। মেঘ গালে হাত রেখে থম মেরে দাঁড়িয়ে আছে। বুকের ভেতর হৃদপিণ্ডটা পিটপিট করছে। আবিরের অযাচিত কর্মকাণ্ড গুলো মেঘকে নাজেহাল করে দিচ্ছে। মেঘ পুনরায় রুমে চলে গেছে। আবির সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে ব্যস্ত কণ্ঠে বলল, "প্রোগ্রাম কখন শুরু হবে?" আলী আহমদ খান ছেলের দিকে তাকিয়ে শক্ত কণ্ঠে বললেন, " একটু ধৈর্য রাখো।" " ১৪ মিনিট ২৩ সেকেন্ড যাবৎ ধৈর্য ধরে বসে আছি আর কত? আপনাদের বেশি দেরি হলে আমি কি মেঘকে নিয়ে পোগ্রাম শুরু করে দিব?" আলী আহমদ খান গুরুগম্ভীর কণ্ঠে বললেন, " ১০ মিনিটের মধ্যে পোগ্রাম শুরু হবে যাও এখন।" আবির বিড়বিড় করতে করতে যাচ্ছে, " ৫ মিনিট হলে ভালো হতো।" আলী আহমদ খান আবিরের দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থেকে হঠাৎ তপ্ত স্বরে মোজাম্মেল খানকে ডাকলেন। মোটামুটি ৫ থেকে ৭ মিনিটের মধ্যেই পোগ্রাম শুরু হয়েছে। সম্পূর্ণ ছাঁদ জুড়ে লাইটিং,

বিশালাকৃতির স্টেজ করা হয়েছে। ক্যামেরাম্যানরা আবির মেঘের ছবি তোলায় ব্যস্ত। আইরিন, মীম নাচের প্রিপারেশন নিচ্ছে। তানভির, সাকিব সবাইকে ঠিকঠাক মতো বসাচ্ছে, গানের লিস্ট ঠিক করছে।নিচে মেইনগেইটের বাহিরে বিরিয়ানি রান্না হচ্ছে। মোজাম্মেল খান নিচ থেকে তানভিরকে কল দিচ্ছেন। তানভির কল রিসিভ করে 'আসছি' বলে দ্রুত নামতে গেল। আচমকা বন্যাকে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে দেখে থামার চেষ্টা করলো। বন্যার পড়নে waterworld রঙের শাড়ি, প্রথমবারের মতো চুল ছেড়ে গর্জিয়াছ লুকে সেজেছে। অনাড়ম্বর মেয়েটার এই চোখ ধাঁধানো সাড়ম্বর সাজে বিমোহিত তানভির । বন্যার দিকে তাকিয়ে থেকেই উদাসভাবে সিঁড়ির পার্শ্ব ঘেঁষে পা রাখতেই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়তে নিলো। আপতিত ঘটনায় তানভিরকে থামাতে উপায় না পেয়ে বন্যা দু'হাতে তানভিরের বুক বরাবর হাত রেখে আটকানোর চেষ্টা করলো। তানভির নিজের উপর বল প্রয়োগ করে থামতে পারলেও বন্যার হাতের কব্জিতে চাপ খেয়েছে। তানভিরের ভেজা গাত্র সেই সাথে ত্রৈমাত্রিক উদ্ধত হৃৎস্পন্দন উপলব্ধি করতেই বন্যা উদ্বেগপূর্ণ কণ্ঠে জানতে চাইল, "আপনি ঠিক আছেন?" তানভির সহসা এক সিঁড়ি পেছাতেই বুকের উপর থাকা বন্যার হাতগুলোর অচিরেই সরে গেল। বন্যা আস্তে করে নিজের হাত ঝেড়ে পুনরায় জিজ্ঞেস করল, " আপনি ব্যথা পান নি তো?" তানভির মুচকি হেসে উত্তর না দিয়ে পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে। বন্যা কর্কশ কণ্ঠে ডাকল, " এইযে ভিলেন " তানভির আড়চোখে

তাকিয়ে মুচকি হেসে শম্বুকগতিতে বলল, " ব্যথা তো পেয়েছি কিন্তু এই ব্যথা যে... " বন্যার ভ্রু কুঁচকানো দেখে তানভির থমথমে কণ্ঠে "সরি সরি সরি সরি" বলতে বলতে দৌড়ে নিচে চলে যাচ্ছে। তানভির চলে যেতেই বন্যা শব্দহীন হাসলো। স্টেজে আবির-মেঘ পাশাপাশি বসা। আবির মেঘের দিকে তাকিয়ে মৃদুস্বরে ডাকল, "শুন।" "বলুন।" "তোকে আজ লাবণ্যময়ী লাগছে, আমার কি ইচ্ছে করছে জানিস?" মেঘ সূক্ষ্ম নেত্রে তাকিয়ে বিড়বিড় করল, " না, আমি কিছু জানতে চাই না।" আবির মুচকি হেসে বলল, " কিন্তু আমি তো জানাতে চাই। " মেঘ আড়চোখে তাকাতেই আবির ভ্রু নাচালো। বরাবরের ন্যায় আজও আবিরের হাসিতেই ঘায়েল হলো মেঘ। মুগ্ধ চোখে আবিরকে দেখছে, গত দুই বছর যার চিন্তায় দিন-রাত ভুলে থাকতো সেই মানুষটার সাথে তার বিয়ে হতে যাচ্ছে। হৃদয়ে অধৃষ্য হাওয়ারা তোলপাড় চালাচ্ছে। রাকিব গলা খাঁকারি দিতেই মেঘ দৃষ্টি সরালো সাথে আবিরও। রাকিব অনেকক্ষণ আগে আসলেও আবিরের সামনে আসার সাহস পাচ্ছিলো না এতক্ষণ। এখন সবার উপস্থিতিতে বুকে সাহস নিয়ে সামনে আসছে। আবিরের কানে কানে ফিসফিস করে কিছু বলে আবারও সরে গেছে। এদিকে আইরিন, মীম আর আরিফের অনবদ্য নাচ দেখে সবার চোখ কপালে উঠে গেছে। তানভির কিছুক্ষণের মধ্যেই উপরে আসছে। বন্যা কিছুটা পেছন দিকে চেয়ারে বসে বসে মেঘ আর আবিরের ছবি তুলছিল, আশেপাশে তেমন কেউ নেই। তানভির অকস্মাৎ কানের কাছে ফিসফিস করে বলল, " একটু সাইডে আসা

যাবে?” বন্যা আঁতকে উঠে ঘাড় ঘুরালো। তানভিরকে দেখেই আতঙ্কিত কণ্ঠে বলল, ” আপনি?” “সাইডে আসো।” “কেনো?” “আরে আসো তো।” বন্যা তানভিরকে ফলো করে ছাদের এক পাশে গেল। তানভির শান্ত গলায় বলল, ” শাড়ির সাথে ফাঁকা হাত ঠিক মানাচ্ছে না। ” বন্যা আস্তে করে বলল, ” চুড়ি পড়তে খুব একটা ভালো লাগে না।” তানভির মৃদু হেসে পকেট থেকে দুটা গাজরা বের করে তপ্ত স্বরে বলল, ” এখন আশা করি এটা বলবে না যে গাজরা পড়তেও ভালো লাগে না। ” “তেমন না। ” “তোমার যদি কোনো আপত্তি না থাকে আমি কি তোমার হাতে এগুলো পড়িয়ে দিতে পারি?” “আমাকে পড়াতে হবে না। মেঘ না পড়লে ওর হাতে পড়িয়ে দেন তাহলে ছবি সুন্দর আসবে।” “তোমার কি মনে হয়, ভাইয়া থাকতে বনুকে আমার পড়িয়ে দিতে হবে? বনু ছাদে আসার পরপরই ভাইয়া নিজের দায়িত্ব পালন করে ফেলেছে। ” “তাহলে মীম বা অন্য কাউকে দিয়ে দেন। আমার ফাঁকা হাত ই ভালো লাগে। ” “কিন্তু আমার ভালো লাগে না।” “মানে?” “তুমি সবার হাতের দিকে তাকিয়ে দেখেছো একবার? প্রত্যেকের হাতে চুড়িও আছে গাজরাও আছে। আর তোমার হাতে কিছুই নেই। আমি এতগুলো গাজরা এনেছি, এনে রাখতে পারি নি যে যার মতো নিয়ে গেছে। অনেক কষ্টে তোমার জন্য দুটা রেখেছি। এখন কথা না বলে হাত দাও। ” বন্যা ধীর কণ্ঠে বলল, ” আমাকে দিন আমি পড়ে নিব।” “আমি পড়িয়ে দিলে কোনো সমস্যা হবে? নাকি এখনও আমার উপর রেগে আছো?” “তেমন না।” “তাহলে কেমন?”

তানভির গম্ভীর মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে। বন্যা ভ্রু কুঁচকে সূক্ষ্ম নেত্রে তাকিয়ে কিছু না বলেই হাত বাড়ালো। কারো সাথে কথার তর্কে জড়ানোর থেকে আগেভাগে কেটে পড়ায় ভালো। গাজরা পড়িয়ে দেয়ামাত্রই বন্যা স্থান ত্যাগ করে পুনরায় স্টেজের কাছে আসছে। মেঘ বন্যাকে দেখেই হাতে ইশারা করল। মিনহাজ, তামিম, মিষ্টি আর সাদিয়া কিছুক্ষণ আগেই আসছে। এসেই মেঘ আর আবিরের সাথে ছবি তুলে ফেলেছে। কিন্তু বন্যা লজ্জায় যেতেই চাইছিল না। বন্যা স্টেজে উঠতেই আবির ব্যস্ত কণ্ঠে তানভিরকে ডাকল। আম্মুরা বা মামী, খালাদের নজর এড়াতে তানভির স্টেজে উঠতেই কানে কানে ফিসফিস করে কিছু বলল যেন সবাই মনে করে গুরুত্বপূর্ণ কথা বলতে ডেকেছে। তানভির নামতে নিলে আবির কিছুটা উঁচু স্বরে বলল, “কিরে কোথায় যাচ্ছিস? ছবি তুলবি না? দাড়াঁ।” পাশ থেকে রাকিব, রাসেল আর সাকিব সিরিয়াস ভঙ্গিতে বলছে, “একমাত্র বোনের বিয়ে অথচ বোনের সাথে তানভিরের এখনও কোনো ছবিই নেই। তাড়াতাড়ি দাঁড়া তোদের ছবি তুলে দেয়। ” তানভির হাত দিয়ে মুখের ঘাম মুছার নাম করে ঠোঁটের হাসি আড়াল করে বন্যার পাশাপাশি দাঁড়ালো। ৩-৪ ক্যামেরাম্যান ঝটপট কতগুলো ছবি তুলে ফেলল। সবার মন মতো ছবি তুলা শেষে ছেলেমেয়ে সবাই একসঙ্গে স্টেজে উঠেছে। প্রায় ১৫-২০ জন ছেলে waterworld রঙের পাঞ্জাবি পড়েছে সাথে ২০-২২ জন মেয়ের পড়নে waterworld রঙের শাড়ি । যেই মীম আজ পর্যন্ত কোনোদিন শাড়ি পড়ে নি সেই মীমও আজ শাড়ি পড়েছে। অল্প বয়স্ক

মেয়েদের মধ্যে একমাত্র মালা ব্যতীত সবাই শাড়ি পড়েছে। মালাকে জোর করেও শাড়ি পড়ানো যায় নি। গ্রুপ ছবি তোলার এক পর্যায়ে গুরুজনেরা চলে যেতে শুরু করেছেন। ছাদ মোটামুটি ফাঁকা হতেই কাপল ডান্স শুরু হয়েছে যার সূচনায় ছিল রাকিব-রিয়া আর আসিফ-জান্নাত। গুরুজনদের সামনে ওরা এতক্ষণ ভদ্র থাকলেও এখন সব ভুলে নাচতে শুরু করেছে। টানা ৩ টা গানে নাচ শেষে আবির-মেঘকে টেনে এনেছে। সবার রিকুয়েষ্টে শুরুর দিকে মেঘ আর আবির ২ টা গানে পারফর্ম করেছিল কিন্তু আচমকা মোজাম্মেল খান আসতেই মেঘ লজ্জায় সেই যে বসেছে আর উঠে নি। এখন ছাদের দরজা বন্ধ করে মেঘকে উঠিয়েছে তারপরও যেন লজ্জা না পায়। একদম লাস্টে আবির-মেঘ, রাকিব-রিয়া, আসিফ-জান্নাত, তানভির-বন্যা, আরিফ-মীম, মিনহাজ-মিষ্টি, তামিম-সাদিয়া, রাসেল-সোনিয়া, সাকিব-আইরিন সহ বাকি যারা ছিল সবাই একসঙ্গে Hawa Hawa গানে পারফর্ম করেছে। আইরিন ভালো ডান্স পারে শুধুমাত্র সেই কারণে সাকিব আইরিনের সাথে ডান্স করতে রাজি হয়েছে কিন্তু শুরুতেই করুণ কণ্ঠে বলে নিয়েছে, “আমার গ্রামে একটা নিরীহ গার্লফ্রেন্ড আছে, ও রেগে গেলে একটু বলে দিও আমার কোনো দোষ নাই।” সাকিবের এমন কথা শুনে আইরিন রাগে কটমট করে বলেছে, “আমার সাথে ডান্স করতে বলেছে কে আপনাকে? আপনি আপনার কাজিনের সাথে ডান্স করেন।” সাকিব সহাস্যে বলে, “মালা করবে ডান্স! আর মানুষ পেলে না। এই মেয়ে আসছেই শুধু দেখতে আর নিজে জ্বলতে। আমি বার বার বলেছি

নিজের কষ্ট বাড়াতে শুধু শুধু যাস না। কে শুনে কার কথা, মন ভরে দেখতে আসছে দেখুক। তোমাকে যেটা বলেছি সেটা করবা, ঠিক আছে?" "আচ্ছা। " এদিকে আরিফ আর মীমের একটু পর পর ঝগড়া লাগা দেখে তানভির দুটাকে শাস্তিস্বরূপ কাপল ডান্স করতে বলেছে। অনুষ্ঠান প্রায় শেষ পর্যায়ে, যে যার মতো গল্প করতে করতে নিচে চলে যাচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যে মেহেদী দেয়া শুরু করতে হবে। আবির আর তানভির বিয়ের কেনাকাটা করতে মার্কেটে যাবে তাই একটু তাড়াহুড়োতেই পোগ্রাম শেষ করতে হয়েছে। বন্যা আর আইরিন গল্প করতে করতে নেমে গেছে। মীম হুট করে ওদের দেখতে না পেয়ে দৌড়ে নিচে নামতে গিয়ে ছাদের দরজায় হোঁচট খেয়ে সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে বসে পড়েছে। দু'হাতে পা চেপে কান্না করছে। ছাদে সাউন্ড বক্সের শব্দের কারণে মীমের অল্পবিস্তর কান্নার শব্দ কেউ শুনতে পায় নি। আরিফ দরজা পর্যন্ত এসে মীমের কান্নার শব্দ শুনে কিছুটা চিন্তিত স্বরে জানতে চাইল, " কি হয়েছে ?" মীম কাঁদতে কাঁদতে বলল, "হোঁচট খেয়েছি।" আরিফ সঙ্গে সঙ্গে ফোনের ফ্ল্যাশ জ্বালিয়ে মীমের পায়ের কাছে ধরলো। বৃদ্ধাঙ্গুল থেকে অনর্গল রক্ত বের হচ্ছে, মীমের দু'হাতে রক্ত লেগে আছে। আরিফ নিবিষ্ট কণ্ঠে বলতে শুরু করল, " শাড়ি পড়ে এই ভাবে কেউ ছুটাছুটি করে? দেখি হাতটা ধরো।" মীম কাঁদতে কাঁদতে আরিফের হাতটা শক্ত করে ধরে বসা থেকে উঠল। কিন্তু ব্যথার চোটে পা ফেলতে পারছে না। আরিফ মীমের এক হাতে ধরে আস্তে আস্তে নামাচ্ছে। কোনোমতে নিচ পর্যন্ত

গিয়েই মীম হাউমাউ করে কাঁদতে শুরু করেছে। কি হয়েছে, কি হয়েছে বলে আশেপাশে সবাই জড়ো হয়ে গেছে। আরিফ দৌড়ে ফাস্ট এইড বক্স আনতে চলে গেছে। মীমের কান্নার শব্দে তানভির ছুটে এসে রাগান্বিত কণ্ঠে বলল, " এভাবে কাঁদছিস কেনো? কি হয়েছে? " মীম কাঁদতে কাঁদতে নিজের পা বাড়ালো। তানভির রক্তাক্ত আঙুল দেখেই কপাল কুঁচকে গম্ভীর দৃষ্টিতে আরিফের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করল, " এই আরিফ, তুইও কি ছোট মানুষ? এভাবে ব্যথা দিয়েছিস কেন?" জান্নাত ফ্রিজ থেকে বরফ এনে দিল। মীম কাঁদতে কাঁদতে বলল, " আরিফ ভাইয়া কিছু করে নি। আমিই হোঁচট খেয়ে পড়ে গেছিলাম।" তানভির ঘাড় ঘুরিয়ে আরিফের দিকে এক নজর তাকালো। আরিফ ফাস্ট এইড বক্স হাতে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে। তানভির হাত বাড়িয়ে স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, "দে" পরপর মীমের দিকে তাকিয়ে তপ্ত স্বরে বলল, " তুই কি হাঁটতে পারিস না? কথায় কথায় দৌড় দিতে বলে কে তোকে? কালকে বনুর বিয়ে আর তুই ব্যান্ডেজ বেঁধে ঘুরবি এটা কি ভালো লাগবে?" মীম কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে বলল, " আর এমন করবো না। " ছাদে মেঘ, রিয়া, আবির, রাকিব, রাসেল, লিমন দাঁড়িয়ে গল্প করছে। মালা বরাবরের মতো দূরে একটা চেয়ারে নির্বাক ভঙ্গিতে বসে আছে। সবার হাসাহাসির মাঝে মেঘ হুট করে নিজের মাথা চেপে ধরে নিচে বসে পরেছে। আবির সঙ্গে সঙ্গে মেঘকে ধরে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, "এই কি হয়েছে তোর?" " মাথা ব্যথা করছে।" মেঘের অল্প চাপেই মাথা ব্যথা শুরু

হয়ে যায়। সেখানে সকাল থেকে ঠিকমতো খাওয়া নেই, সারাদিন বাহিরে বাহিরে ঘুরে ফটোশুট করেছে, সন্ধ্যা থেকে ভারী লেহেঙ্গা পড়ে বসে আছে তারউপর এতক্ষণ নাচানাচি করলো সব মিলিয়ে মাথায় প্রচন্ড ব্যথা শুরু হয়ে গেছে। আবির মেঘকে নিয়ে রুমে চলে গেছে। মেঘের দিকে তাকিয়ে ঠান্ডা কন্ঠে বলল, " তুই ফ্রেশ হয়ে আয়, আমি খাবার নিয়ে আসছি।" "আমি নিচে গিয়ে খেতে পারবো।" "তোকে ফ্রেশ হতে বলছি।" আবির নিচ গিয়ে মীমের অবস্থা থেকে কিছুক্ষণ দাঁড়ালো। উপরে মেঘের মাথা ব্যথা নিচে মীমের পা কাটা এ অবস্থায় কাকে কি বলবে বুঝতে পারলো না। মেঘের জন্য খাবার নিয়ে আবারও উপরে আসছে। অতিমাত্রায় ব্যথা সহ্য করতে না পেরে মেঘ মাথায় ওড়না বেঁধে রেখেছে। আবির অল্প অল্প করে মেঘকে খাইয়ে দিচ্ছে। হঠাৎ দরজা থেকে এক অপরিচিত কন্ঠস্বর কানে আসলো, "আসবো?" আবির তেমন গুরুত্ব দেয় নি, মেঘ তাকিয়ে মৃদু হেসে বলল, "মুন্নি আপু, আসুন।" মেঘের খাওয়া প্রায় শেষ, আবির প্লেট হাতে নিয়ে মাথা নিচু করে বেড়িয়ে গেছে। মুন্নি মেঘের দিকে তাকিয়ে উদ্বিগ্ন কন্ঠে বললেন, " মাথায় ওড়না বেঁধে রেখেছো কেনো? মাথা ব্যথা?" "হ্যাঁ, সারাদিন ঘুরতে ঘুরতে আর পারছি না। আপু, আপনি এত দেরি করে আসলেন কেনো? আপনাকে না বলেছিলাম সন্ধ্যায় আসতে।" "কিভাবে আসবো বলো, রান্না করে বাবুকে খাইয়ে, ঘুম পাড়িয়ে রেখে আসছি। এখন বলো, মেহেদী দেয়ার মতো ধৈর্য আছে তোমার?" মেঘ মাথায় হাত চেপে ধরে শক্ত কন্ঠে বলল, " না

থাকলেও ধৈর্য রাখতে হবে। কাল যে আমার বিয়ে। ” মুন্নি মুচকি হেসে মেহেদী দেয়া শুরু করলো। মেঘদের এলাকায় মুন্নি এখন সুপরিচিত মুখ। বউ সাজাতে যেমন এক্সপার্ট তেমনি মেহেদী দিতেও এক্সপার্ট। ওনার নিজস্ব পার্লার আছে প্রায় অনেক বছর হবে। মেঘদের বাসার সবার সাথেই মোটামুটি ভালো সম্পর্ক, আগে একসময় ঈদে বাসায় এসে মীম, মেঘকে মেহেদী দিয়ে যেতো। এখন কয়েক বছর যাবৎ আসতে পারেন না কারণ ওনার বাবুর ৫-৭ বছর বয়স। তাছাড়া পার্লারের চাপেও তেমন সুযোগ পান না। মেঘের মাথা ব্যথা শুনে কেউ আর মেঘের রুমে আসার সাহস করে নি। সবাই মীমের রুমের বসে মেহেদী দিচ্ছে। আবির ফ্রেশ হয়ে একটা ফুলহাতা টিশার্ট পড়ে মোটামুটি রেডি হয়ে ঔষধ নিয়ে মেঘের রুমে আসছে। ততক্ষণে মেঘের এক হাতে অর্ধেক মেহেদী দেয়া হয়েছে। আবির মেঘের দিকে তাকিয়ে শীতল কণ্ঠে বলল, “ঔষধ খেয়েছিস?” “না।” আবির কপালে আলতোভাবে হাত রেখে উষ্ণ স্বরে জানতে চাইল, ” ব্যথা বেশি?” “হুম।” আবির একটা ঔষধ খুলে মেঘকে খাইয়ে আকুল কণ্ঠে বলল, ” টেনশন করিস না, কিছুক্ষণের মধ্যেই কমে যাবে।” মুন্নি আপু দুই-তিনবার আবিরের দিকে তাকিয়েছে। আবির গ্লাস টেবিলে রাখতে রাখতে শান্ত স্বরে বলল, “আমি শপিংয়ে যাচ্ছি, তোকে ছবি পাঠাবো। ফোন কাছে রাখিস। ” “আচ্ছা। ” আবির যেতে নিয়ে আবারও থমকালো। মেঘের হাতের দিকে তাকিয়ে মোলায়েম কণ্ঠে বলল, ” আপু নামের জায়গাটা ফাঁকা রাখবেন, আমি এসে নাম লিখে দিব। ”

মুন্নি আবিরের দিকে স্পষ্ট দৃষ্টিতে তাকিয়ে হেসে বলল, " ঠিক আছে ভাই, তোমার নাম তুমিই লিখে দিও।" আবির রুম থেকে বেড়িয়ে গেছে। মুন্নি মিটিমিটি হাসছে আর মেঘকে মেহেদী দিয়ে দিচ্ছে। মেঘ কিছুক্ষণ পর্যবেক্ষণ করে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, " আপু, আপনি হাসছেন কেনো?" " এমনিতেই হাসি পাচ্ছে।" "আপনি কি আবির ভাইকে নিয়ে হাসছেন?" " মাত্র যে আসছিলো তার নাম কি আবির?" "জ্বি। " মুন্নি কপালে কয়েকস্তর ভাঁজ ফেলে গুরুতর কণ্ঠে বলে উঠল, " ওর অন্য একটা নাম আছে না?" " আছে কিন্তু সবাই এই নামেই চিনে। " "অন্য নামটা কি?" "সাজ্জাদুল খান" "ইয়েস, সাজ্জাদ। মনে পড়েছে।" "কি হয়েছে আপু? আপনি কি ওনাকে আগে থেকে চিনেন? কিন্তু ওনি তো এত বছর দেশের বাহিরে ছিল। আপনি কিভাবে চিনবেন?" মুন্নি মলিন হেসে জিজ্ঞেস করল, " সে তোমাকে খুব ভালোবাসে তাই না?" "অনেক ভালোবাসে।" " তোমাদের রিলেশনের বিয়ে?" "জ্বি, মোটামুটি। " "কতবছরের রিলেশন?" "জানি না। আমি ওনাকে দুই বছর যাবৎ পছন্দ করি। কিন্তু ওনার টা জানি না। " " আমি যদি ভুল না করি, সাজ্জাদ মানে তোমার আবির ভাই তোমাকে কমপক্ষে ১৫ বছর ধরে পছন্দ করে। আর সেটা শুধু পছন্দ না যাকে বলে পাগলের মতো ভালোবাসা। " মেঘ নির্বাক চোখে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "আপনি কিভাবে জানেন?" " একটা গল্প শুনবে?" "জ্বি " "আজ থেকে প্রায় ১৫-১৬ বছর আগের কথা। তখন আমার নতুন বিয়ে হয়েছে, বছরখানেক হবে হয়তো। আমি আগে

থেকেই পার্লারের কাজ টুকটাক জানতাম তাই আমার হাসবেন্ড বাসাতেই পার্লার খুলে দিয়েছিল। তখনও আমাকে তেমন কেউ চিনতো না। হালকাপাতলা মেকাপ, ফেসিয়াল আর টুকিটাকি মেহেদী দিয়ে দিতাম। হঠাৎ একদিন খেয়াল করলাম একটা ছেলে আমাদের বাসার অপর পাশে দাঁড়িয়ে আমাদের বাসার দিকে তাকিয়ে আছে। ছেলের বয়স ১২-১৩ বছরের বেশি হবে না। আমি তেমন একটা গুরুত্ব দিলাম না। টানা ৫-৭ দিন খেয়াল করে দেখলাম ছেলেটা প্রতিদিন প্রায় ঘন্টা দুয়েক বাসার অপর পাশে দাঁড়িয়ে থাকে। সপ্তাহখানেক পর আমি একদিন আমার শ্বাশুড়িকে ছেলেটার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম। তখন আমার শ্বাশুড়ি বললেন, ঐ ছেলেটা আমার সাথে দেখা করার জন্য প্রতিদিন ঘন্টার ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকে। যেহেতু আমি তখন নতুন বউ তাই আমার শ্বাশুড়ি কোনোভাবেই ছেলেকে আমার সাথে দেখা করতে দিতেন না। আর ছেলেও এত ভদ্র যে আমার শ্বাশুড়ি না করার পর কোনোদিন দ্বিতীয়বার কিছু বলতো না। আমি আমার হাসবেন্ডকে বিষয়টা জানায়। তারপর আমার হাসবেন্ডকে নিয়ে একদিন ঐ ছেলেটার কাছে যাই। ছেলেটা আমাকে দেখেই আকুল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করেছিল, ” আপু আপনি কি মেহেদী দিতে পারেন?” আমি তার কথা শুনে কিছুটা বিরক্ত হয়েছিলাম। একটা ছেলে এক সপ্তাহ ধরে দাঁড়িয়ে থাকার পর জিজ্ঞেস করছে আমি মেহেদী দিতে পারি কি না। তারপরও আমি ঠান্ডা কণ্ঠে উত্তর দিলাম, “মোটামুটি পারি। কেনো?” ” দু’জনকে মেহেদী দিয়ে দিতে পারবেন?” “হ্যাঁ, পারবো। কিন্তু মেয়ে

হতে হবে আর আমার পার্লারে আসতে হবে।” ছেলেটা নরম স্বরে বলেছিল, “তারা আসতে পারবে না, আপনি বাসায় গিয়ে মেহেদী দিয়ে আসবেন, প্লিজ।” আমার হাসবেন্ড কিছুটা রেগেই বলেছিল, ” এই ছেলে তুমি কি ফাজলামো করতে আসছো? আমার ওয়াইফ কোথাও যাবে না। তুমি যাও এখান থেকে। ” আমার হাসবেন্ডের ধমক খেয়ে ছেলেটার চোখে পানি চলে আসছিল। আমি অবাক চোখে ছেলেটাকে দেখছিলাম। ছেলেটা তার ব্যাগ থেকে কতগুলো ২০, ৫০,১০০ টাকার নোট বের করে আমার হাসবেন্ডকে দিয়ে বার বার রিকুয়েষ্ট করছিল যেন আমি বাসায় যেতে রাজি হয়। আমি কৌতূহল বশতই জিজ্ঞেস করি, ” কোথায় যেতে হবে?” ” আমার বাসায়। আমার দুটা বোন আছে ঈদে তাদের মেহেদী দিয়ে দিবেন, প্লিজ।” আমি ছেলেটার কথাতে আরও বেশি বিস্মিত হলাম। এইটুকু একটা ছেলে তার বোনদের কত ভালোবাসে যে পার্লার থেকে টাকা দিয়ে তার বোনদের মেহেদী পড়াতে নিতে চাচ্ছে। আমার মন কিছুটা গললেও আমার হাসবেন্ড ছিল শক্ত মনের মানুষ। সে এত সহজে বিশ্বাস করতে পারছিল না। তাছাড়া আমরা যেহেতু শহরে নতুন ছিলাম তাই সেভাবে কাউকে বিশ্বাসও করতে পারতাম না। আমার হাসবেন্ড অনেক জোরাজোরি করার পর ছেলের মুখ থেকে সত্যি কাহিনী টা বের করতে সফল হয়। আর সেই কাহিনী কোনো রূপকথার গল্প থেকে কম না।” মেঘ এতক্ষণ পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে গল্প শুনছিল। মুন্নি আপু থেমে যাওয়ায় মেঘ কপালে কিঞ্চিৎ ভাঁজ ফেলে জানতে চাইল, ”

রূপকথার গল্প টা কি আপু?” “তিন-চার বছরের এক রাজকন্যা খেলতে গিয়ে তার খেলার সঙ্গীদের হাতে মেহেদী দেখে বাসায় এসে ঠোঁট ভেঙে মেহেদীর জন্য কান্না করছিলো। রাজকন্যার আম্মুরা মেহেদী দিতে পারতো না, কিন্তু রাজকন্যা ছিল খুব জেদি আর অভিমানী। মেহেদী না দিয়ে দিলে খাবে না বলে কান্না করছিলো। রাজপুত্র ছিল বাবামায়ের একমাত্র ছেলে। বোন না থাকায় রাজকন্যাকে নিজের বোনের মতো ভালোবাসতো। ছোট্ট বয়স থেকেই বোনকে আগলে রাখার গুরুদায়িত্ব নিজের কাঁধে নিয়েছিল। সবকিছু সহ্য করতে পারলেও রাজকন্যার চোখের পানি সহ্য করতে পারতো না রাজপুত্র। বাড়ি ফিরে বোনের চোখে পানি দেখে আঁতকে উঠেছিল। কারণ জানার পর সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গিয়ে মেহেদী কিনে নিয়ে আসছিলো। কাঁপা কাঁপা হাতে সেই রাজকন্যার কনুই অব্দি মেহেদী দিয়ে দিয়েছিল। তখন থেকে কিছুদিন পর পর মেহেদীর জন্য বায়না ধরতো রাজকন্যা আর সেই বায়না পূরণ করতে রাজপুত্র মেহেদী দেয়ার প্র্যাক্টিস শুরু করে। কিছুদিনের মধ্যে ভালোই শিখে ফেলেছিল। দু’ বছর ঈদে রাজকন্যাকে হাতে পায়ে মেহেদী দিয়ে দিলো। বিপত্তি ঘটলো তৃতীয় বছর, রাজকন্যা একটু একটু বড় হচ্ছিল সেই সাথে তার হিংসুটে মনোভাব সৃষ্টি হচ্ছিলো। তৃতীয় বার ঈদে পাশের বাসার একটা পিচ্চি মেয়েকে মেহেদী দেয়ার অপরাধে রাজকন্যা কাঁদতে কাঁদতে পুরো বাড়ি মাথায় তুলে ফেলেছিল। রাজপুত্র রাজকন্যা ব্যতীত অন্য কাউকে মেহেদী দিয়ে দিয়েছে এটা সে মেনেই নিতে পারছিল না। অবুঝ রাজকন্যার

পাগলামিতে রাজপুত্র যে কিভাবে পাগল হয়েছে সে নিজেও বুঝতে পারে নি। হঠাৎ রাজপুত্র গুরুতর অসুস্থ হয়ে গেল তখন রাজকন্যার আবেগ জড়ানো কান্না আর নিষ্পাপ হৃদয়ের প্রতিজ্ঞায় রাজপুত্র নিজের কল্পনায় অন্য এক জগৎ তৈরি করলো। যেই জগতে রাজকন্যাকে বোন নয় বরং প্রিয়তমার আসনে বসালো। রাজকন্যার প্রতি মনোভাব বদলাতে শুরু করলো সেই সাথে বাড়তে লাগলো আতঙ্ক। কারণ রাজপুত্রের বাসায় তখন ছোট আরেকটা বোন ছিল যার বয়স ২ কি ৩ । রাজকন্যার এই হিংসুটে মনোভাবের জন্য সবসময় আতঙ্কে থাকতো রাজপুত্র। রাজপুত্রকে কারো সাথে মিশতে দিতে না চাওয়া, কোমল মনের আকুতি, রাজপুত্রের প্রতি তীব্র অধিকারবোধ সবেতেই ভীত হতো রাজপুত্র। সামনে ঈদ ঘনিয়ে আসছিলো, প্রতি বছরের মতো মেহেদী দেয়ার গুরু দায়িত্ব তার উপর ই পড়তো। কিন্তু সে ভীত ছিল, আগের বছর পাশের বাসার পিচ্চিকে মেহেদী দেয়া অপরাধে কান্না করায় বাসার কেউ সেভাবে গুরুত্ব দেয় নি কিন্তু এ বছর নিজের বাসার, চাচাতো বোনকে মেহেদী দেয়ার অপরাধে যদি আবারও একই কাজ করে তখন কি হবে। আগের বছর পর্যন্ত রাজকন্যা শুধু তার বোন থাকলেও পরের বছর নাগাদ রাজকন্যার প্রতি নতুন অনুভূতি জন্মেছিল। ভয়ে সে আশেপাশে খোঁজ নেয়। আমার কথা জানতে পেরে আমাকে রিকুয়েষ্ট করতে আসে। আমি আর আমার হাসবেন্ড প্রথমদিকে পুরোপুরি বিশ্বাস না করলেও শুধুমাত্র রাজপুত্রের রিকুয়েষ্টে সেই বাসায় যায়। অভিমানী রাজকন্যা রাজপুত্র ছাড়া কারো থেকে

মেহেদী পড়তে রাজি নয়। দীর্ঘ সময় বুঝিয়ে আমি তাকে মেহেদী পড়াতে সফল হয়। সেই থেকে আজ পর্যন্ত প্রতিটা ঈদে আমিই তাকে মেহেদী পড়িয়ে দেয়। " মেঘ আশ্চর্য নয়নে চেয়ে আছে। মুন্নি আপু মুচকি হেসে ফের বললেন, " আশা করি বুঝেছো যে সেই রাজকন্যাটা তুমি আর রাজপুত্রটা তোমার আবির ভাই।"মেঘ বিমোহিত নয়নে মুন্নি আপুর মুখের পানে চেয়ে আছে। রূপকথার গল্পের মুগ্ধতায় ডুবে নিজের মাথা ব্যথার কথা বেমালুম ভুলে গেছে। যেখানে দুই বছরের প্রণয়ের পূর্ণতা পেতে, আবিরের মুখ থেকে ভালোবাসি শুনতে মেঘ উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল সেখানে আবির ১৫ বছর যাবৎ পাগলের মতো এক তরফা ভালোবেসে গেছে এটা ভেবেই আঁতকে উঠছে মেঘ। ছোটবেলার এত এত স্মৃতির ভিড়ে মেঘের মনে আবিরের স্মৃতি খুব কমই আছে। আবিরকে নিয়ে অতীত ভাবতে গেলে মেঘের সর্বপ্রথম মনে পড়ে জয়ের কারণে থাপ্পড় খাওয়ার ঘটনাটা যেখান থেকে আবিরের প্রতি ঘৃণা আর বিরক্তি জন্মেছিল যার দরুন এক বাসায় থেকেও আবিরের সাথে দুই বছরে একটা সামান্যতম কথাও বলে নি এমনকি আবির চলে যাওয়ার পর ৭ বছরে একবার হ্যালো পর্যন্ত বলে নি। অথচ আজ সেই কথাগুলো মনে করে আনমনে হেসে ফেললো, ভেতরে ভেতরে নিজের প্রতি বেশ ক্ষুব্ধও হচ্ছে। যেখানে এমপির মেয়ের দুই চারটা কমেন্টস সহ্য করতে পারে নি, আবিরের অনুমতি না নিয়েই ব্লক করে দিয়েছিল, মালার দুদিনের আলগা ভালোবাসা সহ্য করতে পারে নি সেখানে জয়ের সাথে বন্ধুত্বের কারণে আবিরের থাপ্পড়

মারাটা মেঘের কাছে আজ অযৌক্তিক মনে হচ্ছে না। মুন্নি আপু আনমনে হেসে বললেন, 'জানো মেঘ, তোমাকে যতবার আমি মেহেদী পড়িয়ে দেয় ঠিক ততবারই সাজ্জাদের কথা মনে পড়ে। হয়তো নাম খেয়াল ছিল না কিন্তু বাসার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা পিচ্চি ছেলেটার মুখটা সবসময় ভাসতো। অনেকবার তোমাকে জিজ্ঞেস করতে চেয়েছি কিন্তু সাজ্জাদের নিষেধ অমান্য করে জিজ্ঞেস করার সাহস করে উঠতে পারি নি। কাল যেহেতু তোমাদের বিয়ে তাই আজ নিশ্চিন্তমনে কথাগুলো বলতে পারছি। মেঘ, তুমি খুব ভাগ্যবতী যে সাজ্জাদের মতো একজন জীবনসঙ্গী পেতে যাচ্ছো। বড় বোন হিসেবে সাজেশন দিচ্ছি যাই হয়ে যাক না কেন, সবসময় ওর পাশে থেকো।" মেঘ সদাশয় হেসে উত্তর দিল, "ইনশাআল্লাহ আপু, আমি আমৃত্যু ওনার পাশে থাকবো একদম ওনার লক্ষ্মী বউ হয়ে।" মুন্নি আপু নিঃশব্দে হেসে মেহেদী পড়াতে ব্যস্ত হয়ে গেছেন। এরমধ্যে আবির ভিডিও কল দিয়েছে, মেঘ কল রিসিভ করেই স্পষ্ট চোখে তাকালো, মুগ্ধতায় মেঘের দুচোখ চিকচিক করছে, ঠোঁটে লেগে আছে নিকষিত হাসি। মেঘের কোমলপ্রাণ হৃদয়ের প্রাণোচ্ছল হাসিতে আবির বরাবরের মতো মোহিত হলো, বুকের ভেতরটা নিখাদ ভালোলাগায় ছেয়ে গেছে। আবিরের হৃদয়ের গহীনে চলমান উত্তাল ঢেউ সামলে অনুষ্ণ কণ্ঠে প্রশ্ন করল, "মাথা ব্যথা কমেছে?" " হুম, কিছুটা। " "মেহেদী দেয়া শেষ?" "এক হাত বাকি।" আবির কিছুটা তটস্থ হয়ে জানতে চাইল, " নাম লিখে নি তো?" "না।" আবির মৃদু হেসে বলল, " আচ্ছা, নাম কিন্তু

আমি এসে লিখবো। কালকের জন্য দুটা শাড়ি পছন্দ করেছি কোনটা নিব বল।” মেঘ ঠোঁট বেঁকিয়ে শক্ত কণ্ঠে বলল, ” আপনার যেটা ভালো লাগে সেটায় নিন। ” “আমার তো দুটায় ভালো লাগছে। আমি ভেবেছিলাম দুটায় নিয়ে নিব কিন্তু সাকিব বলতাছে বিয়ের শাড়ি নাকি একটায় নিতে হয়। এজন্য কনফিউশানে পড়ে গেছি।” মেঘ ভ্রু গুটিয়ে ধীর কণ্ঠে জানতে চাইল, “আপনি আবার কবে থেকে কুসংস্কার মানতে শুরু করেছেন?” ” তোর সাথে মিশতে মিশতে আমিও কেমন যেন হয়ে যাচ্ছি। কথায় আছে না, সঙ্গ দোষে লোহা ভাসে। ” মেঘ ক্ষুদ্র চোখে তাকিয়ে আস্তে করে বলল, ” দেখান শাড়ি। ” আবির ক্যামেরা ঘুরিয়ে শাড়ি দেখাচ্ছে। মুন্নি আপুর এক হাতে মেহেদী দেয়া শেষ। এরমধ্যে আকলিমা এসে খাওয়ার জন্য ডেকে নিয়ে গেছেন। এই সুযোগে মেঘ ঝটপট বিয়ের শাড়ি, বউভাতের লেহেঙ্গা পছন্দ করে দিয়েছে। মুন্নি আপু খাওয়া শেষ করে আসতেই মেঘ কল কেটে আরেক হাত বাড়ালো। দু’হাতে মেহেদী দেয়া শেষে মুন্নি আপু চলে গেছেন, আসিফ আর আরিফ ওনাকে বাসা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসছে। মীমের রুমে মেহেদী দেয়ার ধুম লেগেছে, বন্যা অল্পস্বল্প মেহেদী দিতে পারে তাই যত পিচ্চি ছিল সবাইকে এক নাগাড়ে মেহেদী দিয়ে দিচ্ছে। মীমকেও বন্যায় মেহেদী দিয়ে দিয়েছে। জান্নাত সহ ওর ২-৩ জন মেহেদী আর্টিস্ট ফ্রেন্ড আসছে যারা রিয়া, সোনিয়া আরও কয়েকজনকে মেহেদী দিয়ে দিচ্ছে। বন্যা মেহেদী দেয়ার ফাঁকে একবার মেঘের রুমে এসে দেখে গেছে, তখনও মেঘের মেহেদী দেয়া শেষ হয় নি। মেঘের

মেহেদী দেয়া শেষ অনেকক্ষণ হলো, এক হাত পুরোপুরি শুকালেও অন্যহাত এখনও শুকায় নি। কথার কথা মানুষজন বলে, মেহেদীর রঙ যত গাঢ় হয় জামাই তত বেশি ভালোবাসে এছাড়া মুন্নি আপুও বলেছেন, মেহেদী যত বেশি সময় রাখবে রঙ তত গাঢ় হবে। এজন্য মেঘ চিন্তা করেছে আজ সারারাতেও মেহেদী তুলবে না। মেঘ ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে আপন মনে ভাবছে, আবিরের দেশে ফেরা, প্রথম দেখা, গান গাওয়া, বাইকে উঠা, কাশবনে যাওয়া, আবিরের জন্মদিন পালন করা, মাইশা আপুর বিয়ে, নিউ ইয়ার, ভ্যালেনটাইন সহ প্রতিটা ঘটনায় মেঘের চোখে স্পষ্ট ভাবছে সেই সাথে বার বার মনে তোলপাড় চালাচ্ছে মুন্নি আপুর বলা রাজপুত্র আর রাজকন্যার কাহিনীটা। একটা মানুষের ভালোবাসা ঠিক কতটা নিখুঁত হলে ছোট বয়স থেকেই এত বিচক্ষণ চিন্তাভাবনা করতে পারে। এরমধ্যে আবির, তানভিররা শপিং শেষ করে বাসায় আসছে। আবির গেইট দিয়ে ঢুকে নিচ থেকেই কিছু সময়ের জন্য মেঘের দিকে তাকিয়ে রইলো। আলোকসজ্জার লাল,নীল, সবুজ, গোল্ডেন, বেগুনি রঙের আলোতে মেঘের মায়াবী আদলখানাও বারংবার রঙ পাল্টাচ্ছে তাই দেখেই আবির খেই হারালো। তানভির ডাকতেই মনোযোগ সরে গেছে, সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির ভেতরে ঢুকলো। ড্রয়িং রুমে বিয়ের কেনাকাটা দেখতে সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়েছে, বন্যা, জান্নাত, মীমরাও উপর থেকে ছুটে আসছে, কিন্তু মেঘের কোনো হদিস নেই। মালিহা খান প্রশ্ন করলেন, ” মেঘ কোথায়? যার জিনিসপত্র তার ই হদিস নেই। এই মীম, মেঘকে ডেকে নিয়ে আয়।”

আবির তৎক্ষনাৎ বলে উঠল, " আমি যাচ্ছি।" এত এত মুরুব্বিদের ভিড়ে আবিরের অনাকাঙ্ক্ষিত কথা শুনে মালিহা খান কপাল কুঁচকালেন, আবির কারো উত্তরের প্রতীক্ষা না করেই দ্রুত পায়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠছে। মেঘের মামীরা সহ আরও অনেকেই সেদিকে তাকিয়ে আছে। মালিহা খান তানভিরের দিকে তাকিয়ে চোখ রাঙালেন। তানভির সঙ্গে সঙ্গে বলল, " এইযে বিয়ের শাড়ি খুলছি, সবাই শাড়ি দেখুন।" এদিকে আবির মেঘের রুমে ঢুকে সরাসরি ব্যালকনিতে আসছে। আবিরের পায়ের শব্দেও মেঘের কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না। আবির আচমকা মেঘকে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরলো, মেঘের পড়নের জলপাই রঙের শাড়ির পাড় বিদীর্ণ করে আবিরের শক্তপোক্ত হাত মেঘের নিভাঁজ উদর আঁকড়ে ধরেছে, অন্যহাতে কানের পাশের চুলগুলো সরিয়ে ঘাড়ে মাথা রাখলো। আকস্মিক ঘটনায় মেঘ ভীতিগ্রস্ত হয়ে ঘাড় ঘুরালো, আবিরের উপস্থিতি টের পেরে পুনরায় মাথা সোজা করে ফেলেছে। আবিরের গাঢ় নিঃশ্বাস মেঘের ঘাড়ে পড়ছে। আবির মেঘের মসৃণ গলায় মৃদু চুমু খেয়ে অত্যন্ত নমনীয় কণ্ঠে বলল, "আড়াল থেকে অপেক্ষার দিন তোর ফুরিয়ে আসছে, এখন সদর দরজায় দাঁড়িয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করার অনুমতি পেতে যাচ্ছিস।" আবির শ্বাস ছেড়ে পুনরায় বলতে শুরু করল, "গত দুই বছর তোকে দেখেও না দেখার মতো চলেছি, কথায় কথায় রাগ দেখিয়েছি, তোর অনুভূতি উপলব্ধি করার চেষ্টা করি নি, সবকিছুতেই ব্যস্ততা দেখিয়ে তোকে কষ্ট দিয়েছি। কিন্তু বিশ্বাস কর, আমি এই সবকিছু করেছি তোকে হারানোর

ভয়ে। আমি এখনও আতঙ্কে আছি, কালকের দিন টা পার করার অপেক্ষায় আছি। অপ্রকাশিত আনন্দের অন্তরালে আমার এক নভস্থল ভয় জমে আছে, তোকে পূর্ণাঙ্গরূপে আমার করে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা আমার মস্তিষ্ককে স্থির হতে দিচ্ছে না। আমি তোকে বড্ড বেশি ভালোবাসি মেঘ। ছোটবেলা থেকে নিজেকে একটা কথায় সবসময় বলতাম, 'মেঘ আবিরের হাসির কারণ, মেঘকে কষ্ট দেয়া ভীষণ বারণ।' অথচ দেখ, গত দুই বছরে অনিচ্ছা সত্ত্বেও তোকে কতবার কষ্ট দিয়েছি, কতভাবে কাঁদিয়েছি। যারজন্য আমি নিজেকে আজও ক্ষমা করতে পারি না। গত দুই বছরে যা ঘটেছে সব ভুলে যা, প্লিজ। আজ এই মুহুর্ত থেকে আমরা নতুন জীবন শুরু করতে যাচ্ছি, যেই জীবনে কেউ কাউকে ইচ্ছেকৃত কাঁদাবো না, কষ্ট দিব না। প্রতিনিয়ত নবরূপে একে অন্যের প্রেমে পড়বো আর নতুনভাবে ভালোবাসার সূচনা হবে। তুই রাজি তো?" আবির থামতেই মেঘের নাক টানার শব্দ কানে বাজলো। মেঘ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে আর ঘন ঘন শ্বাস ফেলছে। আবির মেঘকে ছেড়ে আতঙ্কিত কণ্ঠে বলে উঠল, "এই মেঘ, কাঁদছিস কেনো?" আবিরের হাত থেকে মুক্তি পেতেই মেঘ অকস্মাৎ আবিরের দিকে ঘুরে আবিরকে জড়িয়ে ধরে কান্না করতে করতে বলছে, " আপনিও আমাকে মাফ করে দেন, প্লিজ। আমি জেনেবুঝে আপনাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি, স্বার্থপরের মতো সবসময় শুধু নিজের দিকটায় চিন্তা করেছি। একটা বারের জন্যও আপনার আবেগ, অনুভূতি, কষ্ট, খুশি নিয়ে ভাবি নি। আমি মাত্র দুই বছরেই আপনাকে

পেতে পাগলপ্রায় হয়ে গিয়েছিলাম, অথচ আপনি ১৫ বছর আমার দেয়া কষ্ট নিরবে সহ্য করে গেছেন। আপনার নিগূঢ় প্রেমানুভূতির সামনে আমার দু বছরের ভালোবাসা আজ ফিকে হয়ে গেছে। আপনাকে যে পরিমাণ কষ্ট দিয়েছি সেই কষ্ট আমি আজীবন ভালোবেসেও পরিশোধ করতে পারবো না। আমি আপনাকে ভালোবাসি, খুব ভালোবাসি কিন্তু সেটা আপনার ভালোবাসার কেবলমাত্র ১% আপনি আমাকে প্লিজ মাফ করে দেন।" আবির মেঘকে আলতোভাবে জড়িয়ে ধরে মৃদুস্বরে বলল, " আপু সব বলে দিয়েছে তোকে?" "হ্যাঁ" "এজন্যই বলি, মেয়েদের পেটে আসলেই কোনো কথা থাকে না। " মেঘ আর কিছু বলছে না, আবিরের বুকে মুখ গুঁজে একমনে কেঁদেই যাচ্ছে, মেঘের চোখের পানিতে আবিরের টিশার্ট ভিজে গায়ের সঙ্গে লেপ্টে গেছে। মেঘের দু'হাত আবিরের পিঠে থাকায় মেঘের মেহেদী রাঙা হাতের মেহেদী ডিজাইনের অল্পস্বল্প দাগ আবিরের পিঠে লেগে গেছে। মেঘকে কয়েকবার থামতে বলাতেও মেঘ যখন থামছে না তখন আবির বাধ্য হয়ে উষ্ণ স্বরে মেঘের কানে কানে বলতে শুরু করল, " সমস্যা নেই, তোর ১% আর আমার ৯৯% ভালোবাসার ফলস্বরূপ আমাদের আহিয়ার আগমন ঘটবে। তবুও তুই এভাবে কাঁদিস না প্লিজ।" আহিয়ার কথা শুনেই মেঘ লজ্জায় আড়ষ্ট হয়ে আবিরকে ছেড়ে দূরে সরে দাঁড়ালো। আবির তপ্ত স্বরে পুনরায় বলল, " তুই বললে কাল থেকেই প্ল্যানিং শুরু করি? " মেঘ ফোঁস করে বলল, "না।" আবির সহাস্যে বলে উঠল, "আজকের পর তুই কান্না করলে তোর কোলে

আরেকটা কাঁদুনে বাবু ধরিয়ে দিব, তারপর দু'জনে মিলে কান্না করিস। ঠিক আছে? " মেঘ লজ্জায় চিবুক নামিয়ে গলায় ঠেকিয়েছে। আবির মেঘের চোখ মুছে মেঘকে নিয়ে নিচে আসছে। ততক্ষণে তানভির, সাকিব আর আসিফ মিলে মোটামুটি সব কিছু দেখিয়ে ফেলেছে। মেঘ আসতেই মেঘকে পুনরায় দেখানো শুরু করলো। আবির স্থির দৃষ্টিতে মেঘের দিকে তাকিয়ে আছে। আচমকা রিয়া এসে বিড়বিড় করে ডাকল, "ভাইয়া.." আবির নড়েচড়ে উঠে উত্তর দিল, "জ্বি " "ভাবি হিসেবে বলছি, আপনার বউয়ের ভালোবাসার নিশান আপনার পিঠে লেগে আছে। অন্য কেউ দেখার আগে টিশার্ট টা পাল্টিয়ে আসুন।" আবির চোখ নামিয়ে ভীরু হেসে চটজলদি উপরে চলে গেছে। মেঘ সব জিনিসপত্র মোটামুটিভাবে দেখে নিয়েছে। অল্পস্বল্প মাথা ব্যথা নিয়ে আবার কান্না করায় মেঘের মাথা ব্যথা বাড়তে শুরু করেছে, ঘুমে চোখ টানছে। মেঘ তড়িঘড়ি করে ঘুমাতে চলে গেছে। আবির ফ্রেশ হয়ে টিশার্ট পাল্টিয়ে যেতে যেতে শুনে মেঘ ঘুমিয়ে পরেছে। মীম, আইরিন আর বন্যা মেঘের রুমের সামনে দাঁড়িয়ে গল্প করছে। আবির ভেতরে যেতে চাইলে ওরা শক্ত কণ্ঠে বাঁধা দেয়। আবির নির্বাক চোখে তাকিয়ে ভাবছে কারণ তখনও মেঘের হাতে নিজের নাম লেখা বাকি। মীম আর আইরিন আবিরকে কোনোভাবেই রুমে ঢুকতে দিবে না। তাদের শর্ত একটায় আবির যদি মেঘের হতে নিজের নাম লিখে তাহলে আবিরের হাতেও তারা মেঘের নাম লিখে দিবে। আবিরের মেহেদী দেয়ার কোনো ইচ্ছে ছিল না কিন্তু

মেঘের হাতে নাম লিখতে হবে শুধুমাত্র সেই কারণে তাদের শর্ত মেনে নিয়েছে। আবির ঘুমন্ত মেঘের দু'হাতে অতি সন্তর্পণে নিজের নাম লিখে দিয়েছে। তারপরই আইরিন আর বন্যা আবিরের দু'হাতে মেঘের নাম লিখতে শুরু করেছে। বিছানায় মেঘ ঘুমাচ্ছে তাই ওরা সবাই ফ্লোরে চাদর বিছিয়ে বসেছে। তানভির আবিরের রুমে যাচ্ছিল, আচমকা মেঘের রুম থেকে আবিরের কণ্ঠস্বর শুনে থমকে দাঁড়ালো। দরজা থেকে উঁকি দিয়ে বলল, "আমি কি আসতে পারি?" আইরিন বন্যার দিকে একপলক তাকিয়ে হেসে বলল, "কাউকে না জ্বালালে আসতে পারো।" তানভির ভেতরে ঢুকেই আইরিনের মাথায় একটা গাট্টা দিল। আবিরের হাতের দিকে তাকিয়ে উদাস ভঙ্গিতে বলল, "আজ আমার বিয়ে নয় বলে কেউ একবারের জন্যও মেহেদী দিব কি না জিজ্ঞেস করছে না। পোড়া কপাল আমার। " বন্যা মাথা নিচু করে মৃদু হাসলো। মীম পাশ থেকে আহ্লাদী কণ্ঠে বলল, "দেখো, বন্যা আপু দিয়ে দিয়েছে।" তানভির ঠোঁট বেঁকিয়ে শক্ত কণ্ঠে বলল, " বুঝলাম না, যে কয়জনের হাত দেখলাম সবাই একজনের নাম ই বলছে। সেই একজন কি পুরো বাড়ির দায়িত্ব নিয়ে নিয়েছে নাকি। ঠিক আছে, দায়িত্ব যখন নিয়েছে আমাকেও দিয়ে দিতে হবে।" বন্যা মাথা নিচু করে মনোযোগ দিয়ে মেহেদী দিচ্ছে, তানভিরের কথা শুনেও না শুনার মতো ভান করছে। আইরিন কপাল গুজিয়ে রাগী স্বরে বলল, " তানভির ভাইয়া, তোমাকে আগেই সাবধান করেছি। কাউকে জ্বালাতে পারবে না।" তানভির ভারী কণ্ঠে বলল, " আমি কি মেহেদী দিব না?

আমাকে কি মেহেদী দিয়ে দিবে না?” আবির অকস্মাৎ গুরুভার কণ্ঠে বলে উঠল, “এই আইরিন, তানভিরের হাতে একটা ব্যাঙের ছাতা এঁকে দে তো আর হ্যাঁ ছাতার নিচে একটা ব্যাঙ ও দিস।” বন্যা, মীম, আইরিন তিনজন একসঙ্গে হেসে উঠল। তানভির মুখ ফুলিয়ে রাগী চোখে তাকিয়ে বলল, ” অভদ্র জামাই, বউ এর বড় ভাইকে যথাযথ সম্মান দেয় না।” আবির শক্ত কণ্ঠে বলল, “পার্সোনালি দেখা করবেন ভাইজান, আপনাকে একদম সম্মানের চূড়ায় পৌঁছে দিব।” আবিরের মেহেদী দেয়া শেষ আবির উঠে যেতে যেতে বন্যাকে উদ্দেশ্য করে বলল, “এই অবুঝ ছেলেটাকে একটু মেহেদী দিয়ে দিও। ” আবিরের কথাটা বলতে দেরি হলেও তানভিরের হাত বাড়াতে দেরি হলো না। বন্যা তপ্ত স্বরে জানতে চাইল, ” কি লিখবো?” তানভির ভাবছে, মীম পাশ থেকে বলল, “A B C D E পর্যন্ত লিখে দাও।” তানভির চোখ ঘুরাতেই বন্যা আবারও জিজ্ঞেস করল, ” আপনার নাম লিখে দিব?” “হাতে কেউ নিজের নাম লিখে?” “তাহলে কি লিখবো?” “তোমার ইচ্ছে। ” জান্নাত আইরিনকে ডাকছে, আইরিন ওদের টা টা দিয়ে চলে গেছে। মীমের ঘুম পাচ্ছে তাই মীমও গিয়ে মেঘের পাশে শুয়ে পরেছে। বন্যা তানভিরের হাতে ছোটখাটো একটা ডিজাইন করে দিচ্ছে। প্রায় শেষদিকে তানভির হাতের একটা অংশ দেখিয়ে মোলায়েম কণ্ঠে বলল, “এখানে B লিখে দাও।” বন্যা সঙ্গে সঙ্গে ভ্রু কুঁচকে স্পষ্ট দৃষ্টিতে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, ” B কেনো লিখবো?” “আমার ইচ্ছে তাই।” “আমি পারব না।” “কেনো পারবে না?”

“এমনি।” “লিখতে বলেছি লেখো।” “B মানে কি?” “Busy.” “What?” ” আমি খুব ব্যস্ত তাই হাতে Busy লিখতে রাখবো। তাতে তোমার কোনো সমস্যা? ডিজাইনারের কাজ ডিজাইন করা, এত কথা বলা নয়।” বন্যা একদম ছোট করে B লিখে দিয়েছে যাতে স্পষ্ট না ভাসে। তানভির নিজের হাতটা ভালোভাবে দেখে আকুল কণ্ঠে বলল, “বাহ! তুমি তো খুব বুদ্ধিমতী।” বন্যা মনে মনে আওড়ালো, ” নিজের নামের অক্ষর বড় করে লিখে নিজে ফাঁসার কোনো ইচ্ছে নেই আমার। ” তানভির চলে গেছে। বন্যা দরজা বন্ধ করে মেঘের পাশে গিয়ে শুয়েছে। আজ ৩রা ফেব্রুয়ারী, আবির মেঘের বিয়ের দিন। বিয়ে উপলক্ষে শহরের প্রথম সারির একটা কমিউনিটি সেন্টার বুকিং দেয়া হয়েছে। সকালের খাওয়াদাওয়া শেষে আবির মেঘকে পার্লারে নিয়ে গেছে। যদিও মোজাম্মেল খান চেয়েছিলেন তানভির যেন মেঘকে নিয়ে যায়। কিন্তু আবির সেসবে পাত্তা না দিয়ে নিজেই নিয়ে গেছে। মেঘ আজ তেমন কথা বলছে না, বার বার শুধু হাতের দিকে তাকাচ্ছে। একহাতে বাংলায় লেখা “আবিরের মেঘ” আরেকহাতে লেখা ” Sazzadul Khan Abir” আবির যেতে যেতে মেঘকে কিছু কাজ আর দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়েছে। মেঘকে নামিয়ে দিয়ে বাসায় ফিরে শাওয়ার নিয়ে আবির রেডি হতে শুরু করলো। আবির কেবল শেরওয়ানিটা পড়েছে এরমধ্যে আইরিন আর মীম তাদের সাজুনি নিয়ে হাজির। গতকাল রাতের মতো আজও তারা আবিরকে সাজাতে চলে আসছে। নামাজের পরপর আবিররা রওনা দিয়েছে, এ পর্যায়ে এক বাড়ির

মানুষজন দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে। নিয়ে মোজাম্মেল খান, হালিমা খান, মেঘের মামা বাড়ির আত্মীয় স্বজন, তানভির, বন্যা, মীম এমনকি ফুপ্পিরাও কমিউনিটি সেন্টারে পৌঁছে গেছে। বিয়ের গেইটে দুপক্ষ মুখোমুখি হয়েছে। রাকিব, রাসেল, সাকিব, লিমনরা সবাই আবিরের পাশে। অন্যদিকে তানভিরের কয়েকজন বন্ধু, আরিফ, আসিফ, মীম, বন্যা,আইরিন ওরা গেইট আঁটকে দাঁড়িয়েছে । আইরিনদের ডিমান্ড শুনে রাকিব আবিরের দিকে তাকিয়ে মজার ছলে বলে উঠল, " নিজের বউ নিজে নিবি তাও এত ডিমান্ড।"আবির পাশ ফিরে রাকিবের দিকে ক্ষুদ্র চোখে তাকিয়ে অত্যন্ত মোলায়েম কণ্ঠে বলল, " ও চাইলে হাসিমুখে জীবনটাও দিয়ে দিতে পারবো সেখানে তাকে পাওয়ার জন্য এই সামান্য ডিমান্ড আর এমন কি!" রাকিব তপ্ত স্বরে বলল, " আবেগ ছেড়ে বিবেক দিয়ে কথা বলল। বুঝছি তুই বউ পাগল, বউয়ের জন্য যা খুশি করতে পারিস তাই বলে যে যা বলবে তাই?" "ও শুধু আমার আবেগ না, আমার চিত্ত চাঞ্চল্যের এক ফালি সুখের আভাস।" " হয়েছে, বুঝেছি। বজ্জাত ছেলে, তোর জন্য একটু মজাও করতে পারবো না। " আবির আড়চোখে তাকিয়ে মলিন হাসলো। আবির কানে কানে রাকিবকে কিছু বলতে চেয়েছে কিন্তু রাকিব সে কথা না শুনে আবিরের থেকে কিছুটা দূরে সরে রাগী স্বরে বলতে শুরু করল, " তোর আর কোনো কথায় শুনছি না আমি...!" তানভির মুচকি হেসে বলে উঠল, "রাকিব ভাইয়া, তোমার যা মজা করার ইচ্ছে আমার বিয়েতে করো। তোমার বন্ধুর বিয়েতে মজা করার আশা ছেড়ে দেও।"

“তুইও যে তোর ভাইয়ের মতো আচরণ করবি না তার কি গ্যারেন্টি আছে? শত হোক তোদের রক্ত তো এক।” আলী আহমদ খান ভেতর থেকে হুঙ্কার দিলেন, ” গেইট থেকে ভেতর পর্যন্ত আসতে এতক্ষণ সময় লাগে তোমাদের?” আবির তৎক্ষনাৎ চোখে ইশারা দিল, রাকিব টাকা বের করেও দিতে চাচ্ছে না। আইরিন, মীম, রিয়ারা জোরজবরদস্তি করে নিয়েছে। আবিরকে মালা পড়িয়ে, সাদা গোলাপ দিয়ে ভেতরে নেয়া হয়েছে। আলী আহমদ খান, মোজাম্মেল খান সহ আরও কয়েকজন একসঙ্গে বসে আছেন। আবির ঢুকতেই আলী আহমদ খান ডাকলেন, “আবির, একটু এদিকে আসো।” আবির তটস্থ হয়ে বলল, ” জাস্ট এক মিনিট আব্বু। এখুনি আসছি।” আবির সবাইকে ফেলে চটজলদি মেঘের সাথে দেখা করতে চলে গেছে। কমবেশি সবাই গেইটের কাছে ছিল তাই মেঘের আশেপাশে তেমন বড় কেউ নেই। আদি সহ আরও কয়েকটা পিচ্চি ছুটাছুটি করছে। আবির মেঘের কাছাকাছি এসে কোমল কন্ঠে সালাম দিল, মেঘও মোলায়েম কন্ঠে সালামের উত্তর দিল। আবির মেঘের সামনে এসে দুই হাঁটুতে ভর দিয়ে বসে কিছুটা ঝুঁকে ঘোমটার আড়ালে থাকা মেঘকে একপলক দেখে নিল। আবিরের অনভিপ্রেত কাণ্ড দেখে মেঘ অলক্ষিতভাবে হেসে ফেলল। আবির মেঘের মুখের পানে গভীর মনোযোগে চেয়ে ঠোঁট কামড়ে হেসে নেশাক্ত কন্ঠে বলল, “একটু ভয়ে ছিলাম তাই দেখতে আসছি, কিছু মনে করিস না। কেমন!” মেঘ তপ্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে ঠান্ডা কন্ঠে বলল, ” আপনাকে রেখে পালাবো না,

আপনি নিশ্চিন্তে থাকতে পারেন।” আবির চটজলদি মেঘের হাতে আলতোভাবে চুমু খেয়ে তটস্থ কণ্ঠে বলল, ” আব্বু ডাকছে, এখন যায়।” আবির সামনে যেতেই আলী আহমদ খান জিজ্ঞেস করলেন, ” কোথায় গিয়েছিলে?” আবির মাথা নিচু করে বিড়বিড় করল, “মেঘকে দেখতে।” “৫ মিনিট কথা বলার জন্য ডেকেছিলাম, এটাও সহ্য হয় নি তোমার?” আবির নিরুদ্বেগ ভঙ্গিতে বলল, “আসলাম তো, এখন বলুন।” আবিরের নিরুদ্বেগ ভাবভঙ্গি দেখে মোজাম্মেল খান ঠোঁট চেপে হাসলেন, সাথে আবিরের বড় মামাও মৃদু হাসলেন। তবে আলী আহমদ খান ছেলের কর্মকাণ্ডে বেশ ক্ষুদ্ধ। আবির ২-৪ মিনিট কথা বলে আবারও মেঘের কাছে চলে গেছে কিন্তু ততক্ষণে মেঘের চারপাশে সবাই জড়ো হয়ে গেছে। আবিরের আব্বু, রাকিব, মেঘের আব্বু, তানভির কাজীর সাথে কথা বলে সবকিছু ঠিকঠাক করছে। মেঘ আবিরের উপস্থিতিতে, তাদের সম্মতি নিয়ে মৌখিকভাবে বিয়ের কাজ শেষ হয়েছে। বিয়ের যাবতীয় কাজ শেষে খাওয়াদাওয়ার পর্ব শুরু হয়েছে। মেঘ, আবির, বন্যা, তানভির, রাকিব, সাকিব সবাই একসঙ্গে বসেছে, খেতে খেতে টুকটাক খুনসুটি করছে। মিনহাজরা এসেছে অনেকক্ষণ হবে কিন্তু মেঘের জন্য বন্যা ওদের সাথে ঠিকমতো কথাও বলতে পারছে না। এর কিছুক্ষণ পরেই সিফাত আসছে, আলী আহমদ খান সিফাতকে দেখেই এগিয়ে গিয়ে হাসিমুখে কথা বলতে শুরু করেছেন। এদিকে মোজাম্মেল খান বেশ কিছুক্ষণ যাবৎ চিন্তিত। সিফাত কিছুটা দূরে যেতেই মোজাম্মেল খান কিছুটা চিন্তিত স্বরে

ডাকলেন, “ভাইজান” “হ্যাঁ, বল।” “আবির আর মেঘের বিয়ের কাজ কি শেষ?” “হ্যাঁ, কেনো?” “না মানে কাবিনের কাজ টা বাকি রয়ে গেল না?” আলী আহমদ খান গুরুভার কণ্ঠে বললেন, ” ছেলে আমার মেয়ে তোর, সবচেয়ে বড় কথা তারা দু’জন দু’জনকে মন থেকে ভালোবাসে। তুই কাবিন দিয়ে কি করবি? তারপরও যদি তোর মনে হয় তাহলে ঘরোয়াভাবে বসে সেটার সমাধান করা যাবে। ” ” আমি ঐভাবে বলতে চাই নি।” আলী আহমদ খান কপাল গুটিয়ে ধীর কণ্ঠে বললেন, “বিবাহ সম্পাদনের জন্য বা বিবাহ বৈধ হওয়ার জন্য ‘কাবিননামা’ অপরিহার্য না। কাবিননামা একটা আইনি বাধ্যবাধকতা মাত্র। প্রাপ্তবয়স্ক দুজন ছেলে মেয়ের সম্মতি নিয়ে, সব নিয়মকানুন মেনেই বিয়ে হয়েছে এতে দুশ্চিন্তা করার কিছু নেই।” আলী আহমদ খান একগাল হেসে ফের বললেন, ” এখন খেতে চল।” “চলো।” মেঘ আর আবিরের ফটোশুট চলছে। বন্যা কাছেই দাঁড়িয়ে আছে যেন মেঘের কোনো সমস্যা হলে ঝটপট যেতে পারে। বন্যার আব্বু, আম্মু, ভাই আর বোন এসেছিলো, খাওয়াদাওয়া করে মেঘ আবিরের সাথে কয়েকটা ছবি তুলে কিছুক্ষণ আগেই বেড়িয়েছে। ওনারা চলে যাওয়ার খানিক বাদে আচমকা তানভির এসে বন্যার পাশ ঘেঁষে দাঁড়ালো। তানভিরকে দেখেই বন্যা কিছুটা সরে যাওয়ার চেষ্টা করলো। তানভির সহসা শীতল কণ্ঠে বলল, ” তারপর বলো, তুমি কবে বিয়ে করবে। ” বন্যা ভ্রু কুঁচকে বলে উঠল, “মানে?” “বিয়ে করবে না?” ” আগে আপুর বিয়ে হোক তারপর ভেবে দেখবো।” তানভির মনমরা হয়ে

বলল, " ওহ।" বন্যা ভণিতা ছাড়াই প্রশ্ন করল, "কেনো বলুন তো.." "তোমার বেস্ট ফ্রেন্ডের বিয়ে হয়ে যাচ্ছে, তোমার খারাপ লাগছে না?" "খারাপ কেনো লাগবে? মেঘ তার প্রিয়মানুষকে বিয়ে করতে পেরেছে, এতে আমি খুব খুশি। " " তোমার প্রিয়..." বলতেই মোজাম্মেল খান দূর থেকে উচ্চস্বরে ডাকলেন, "তানভির" তানভির ভয়ে আঁতকে উঠে, " ও বাবা " বলে তড়িৎ বেগে বন্যার পাশ থেকে সরে গেছে। বন্যা উদ্বেগহীন চোখে তাকিয়ে আনমনে হাসলো। বাহিরে তানভির যতই রাগী রাগী ভাব নিয়ে থাকুক না কেনো, বাসার ভেতরে সে আপাদমস্তক ভীতু একটা ছেলে। মীম টেবিলে মাথা রেখে মুগ্ধ চোখে চেয়ে আবির আর মেঘকে দেখছে। মেঘের চোখে মুখে লজ্জা লজ্জা ভাব থাকলেও আবিরের চোখে লজ্জার ছিটেফোঁটাও নেই। নতুন জামাইয়ের যেসব গুণাবলি থাকা প্রয়োজন তার একটাও আবিরের মধ্যে নেই। এই একবার মেঘের সাথে দুষ্টামি করছে, আবার তানভির, রাকিবের সঙ্গে দুষ্টামি করছে, ছবি সুন্দর না হলে ফটোগ্রাফারের মাথায় গাট্টা দিয়ে স্টাইল শিখিয়ে দিচ্ছে। মীম সেগুলোই মনোযোগ দিয়ে দেখছে। আরিফ একটা আইসক্রিম মীমের সামনে রেখে মৃদুস্বরে বলল, "খেয়ে নাও" মীম মাথা তুলে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, " আমি কেনো খাবো?" " গরমের মধ্যে আইসক্রিম টা খেলে তোমার ভালো লাগবে তাই নিয়ে আসছি।" মীম গম্ভীর মুখ করে বলে উঠল, " আমার ভালো কবে থেকে চিন্তা করা শুরু করেছো তুমি?" "যেভাবে এদিক সেদিক হোঁচট খাচ্ছো, চিন্তা না করে উপায় আছে?" মীম মুচকি হেসে

আস্তে করে বলল, ” তুমি ধাক্কা না মারলেই হলো।” শেষ বিকেলের দিকে হালিমা খানরা বাসায় চলে আসছেন। মেঘ আর আবিরকে বরণ করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। কাজের ফাঁকে মাহিলা খান অকস্মাৎ প্রশ্ন করে বসলেন, ” তোর মেয়ের বিয়েতে তুই খুশি তো বোন?” হালিমা খান মুচকি হেসে বললেন, “একটা কথা বলবো আফা?” ” বল।”
“আবিরের সাথে মেঘের বিয়ের ব্যাপারে আমি আরও অনেকদিন আগেই ভেবেছিলাম। ” “সত্যি? আমাকে বলিস নি কেনো?” “কিভাবে বলতাম বলো, এই বাড়ির পুরুষদের কিছু বলতে গেলে ভয় লাগে অন্ততপক্ষে বিয়ের বিষয়ে। প্রথমে মেঘের আব্বুকে বলতে চেয়েছি কিন্তু ওনার ছেলে দেখার তোরজোর দেখে আর বলতে পারি নি, তারপর একদিন আকলিমাকে কথার কথা এমনিতেই বললাম, সে তো ভয়ে শেষ। আমাকে সঙ্গে সঙ্গে বারণ করেছে যেন তোমাকে কিছু না বলি। আমি সব ভুলে একদিন তোমাকে বলে ফেলতে চেয়েছিলাম তৎক্ষনাৎ তোমার অতীতের ঘটনা মনে পড়ে গেছিলো। আমার উল্টাপাল্টা চিন্তার জন্য বাসায় যেন নতুন কোনো অশান্তি সৃষ্টি না হয় এজন্য আর কিছুই বলি নি। ” আবিরের আম্মু শীতল কণ্ঠে জানালেন, ” যা হয়েছে ভালোই হয়েছে। ছেলেমেয়ে পছন্দ করেছে, তারা ভাইয়ে ভাইয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছে এতে আমাদের কোনো হাত নেই ” মেঘের আম্মু মুখ ফুলিয়ে শ্বাস ছেড়ে মৃদুস্বরে বললেন, ” আমার মেয়েটার জন্য একটু ভয় হচ্ছে, আফা।” “কেনো?” ” আমি জানি আবির মেঘকে অনেক পছন্দ করে, সারাজীবন আগলে রাখবে

কিন্তু সবকিছুর পরেও আবিরের শরীরে ভাইজানের রক্তই বইছে তাছাড়া ওর রাগটাও বেশি। রাগের মাথায় মেঘের সাথে যদি খারাপ আচরণ করে। " মালিহা খান মলিন হেসে বললেন, " এখনই এত ভয় পাচ্ছিস কেনো, ওরা তো আমাদের চোখের সামনেই থাকবে। যা হবে দেখা যাবে। " সন্ধ্যার আগে আগে আবির-মেঘ বাসায় আসছে। ওদের বরণ করে, দুধ, মিষ্টি খাইয়ে বাকি নিয়মকানুন শেষ করে মেঘকে নিয়ে মালিহা খান ভেতরে চলে যাচ্ছেন। এদিকে আবির ড্রয়িংরুমে দাঁড়িয়ে নির্বাক চোখে তাকিয়ে আছে। সবার পূর্ণ মনোযোগ মেঘের দিকে দেখে আবির ভ্রু কুঁচকে প্রশ্ন করল, " আমি এখন কি করবো?" মালিহা খান তপ্ত স্বরে বললেন, " তোর যা ইচ্ছে কর গিয়ে।" আবির দাঁতে দাঁত চেপে বিড়বিড় করল, "বউটাকে দিয়ে গেলে অন্তত দেখতে তো পারতাম। " বন্যারা পরের গাড়ি দিয়ে আসছে তাই একটু দেরি হয়েছে। মীম, আইরিন আর বন্যা গেইটের কাছে আসতেই তানভির গুরুভার কণ্ঠে ডাকল, " বন্যা। " বন্যা সহ আইরিন আর মীম স্পষ্ট চোখে তাকিয়েছে। তানভির তৎক্ষনাৎ বলে উঠল, "আমি বন্যাকে ডেকেছি, তোদের নাম বন্যা?" "না।" "তাহলে এভাবে তাকিয়ে আছিস কেনো?" বন্যা মৃদুস্বরে বলল, "কিছু বলবেন?" সঙ্গে সঙ্গে মীম, আইরিন একসঙ্গে বলে উঠলো, "কিছু বলবা?" তানভির মুখ ফুলিয়ে রাগী স্বরে বলল, " না। " মীম আর আইরিন বন্যাকে নিয়ে চলে যাচ্ছে। তানভির কয়েক মুহুর্ত তাকিয়ে থেকে আবিরের কাছে গেল। তানভির কপাল কুঁচকে এক দৃষ্টিতে বন্যার দিকে তাকিয়ে থেকে

বলল, " ভাইয়া, তোমার বিয়ে টা তো শেষ হলোই এবার আমার টা নিয়ে একটু ভাবো।" আবির চোখ ঘুরিয়ে তানভিরের দিকে তাকিয়ে রাশভারি কণ্ঠে বলল, " আগামী দু'বছর এই বাড়িতে আর কোনো বিয়ে হবে না। " "আমি চাকরি নিলেও না?" "না" "কোনো? " "আমার বউ অন্ততপক্ষে দু'বছর এই বাড়ির একমাত্র বউ হয়ে রাজত্ব করবে। তোর বোনের বউ বউ ফিল শেষ হলেই তার ভাবিকে নিয়ে আসবো ততদিনে তুই নিজেকে গুছা।" "তাই বলে দুই বছর?" "দেখ তানভির, তুই আমার থেকে বয়সে দুই বছরের ছোট তাই বিয়েটাও দু'বছর পর করা উচিত । তাছাড়া আমি তোর বোনের মানসিক শান্তিতে ব্যাঘাত দিব না। তোকে ছয় মাসের মধ্যে বিয়ে করালাম সবকিছু ঠিকঠাক চললো। কোনো এক দিন, হয়তো আজ থেকে ১০ বছর পর মেঘ আমার কাছে এই অভিযোগটা করল তখন আমি কি করবো? ও কে কি এই দিনগুলো ফিরিয়ে দিতে পারবো?" তানভির মন মরা হয়ে বলল, " থাক, আমি আর কিছু বলব না।" তানভির মন খারাপ করে চলে যাচ্ছে। আবির মৃদু হেসে ফের ডাকল, কিন্তু তানভির আর তাকালো না। অবশ্য তাকালেও বিশেষ কোনো লাভ হবে না কারণ আবির যা ভেবে রেখেছে তাই হবে, তানভির জোরপূর্বক কোনোকিছু পরিবর্তন করতে পারবে না আর করতে চাইও না। আগামীকাল আবিরদের বাসায় অনুষ্ঠান হবে, একেবারে কাছের মানুষজন ছাড়া অতিরিক্ত কোনো মানুষ থাকবে না। আবিরের আব্বু চেয়েছিলেন একদিনেই অনুষ্ঠান শেষ করতে কিন্তু মোজাম্মেল খানের

এতে দ্বিমত ছিল। ওনি মেয়ের বিয়ের জন্য এত বছর যাবৎ স্বপ্ন দেখেছেন তাই আলী আহমদ খান ওনার স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করার সুযোগ দিয়েছেন। আবির আর রাকিব সন্ধ্যার পর পর ই বেড়িয়েছে, ফিরেছে প্রায় ১১ টা নাগাদ। ততক্ষণে বাড়ি মোটামুটি শান্ত হয়ে গেছে। আবির নিজের রুমে যেতে যেতে মেঘের রুমটা দেখে গেছে, রুমের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। সন্ধ্যার পর থেকে মেঘের সাথে আবিরের আর কোনো কথায় হয় নি। আবির দু'তিনবার ডাকতেও গিয়েছে কিন্তু আজ কেনো জানি সাহস পাচ্ছে না তাই রুমে এসে মেঘের নাম্বারে কল দিল, সারাদিনের ক্লান্তিতে মেঘ গভীর ঘুমে তলিয়ে আছে। আবিরের কল বেজেই যাচ্ছে। মেঘের পাশ থেকে মাহমুদা খান ঘুম ঘুম কণ্ঠে মেঘকে ডেকে বললেন, "মেঘ, ফোনটা সাইলেন্ট কর।" মেঘ ঘুমের মধ্যেই নড়ে উঠলো কিন্তু ফোন ধরলো না। গতকাল রাতে আবিরের রুমে আসার ঘটনা ছড়াতে ছড়াতে বড়দের কান পর্যন্ত চলে গিয়েছে। তাই মাহমুদা খান ইচ্ছে করেই আজ মেঘের রুমে শুয়েছেন। মেঘের একপাশে মাহমুদা খান অন্যপাশে বন্যা শুয়েছে। দু'বার কল কেটে পুনরায় কল বাজতে শুরু করেছে। বন্যা মেঘের পাশ থেকে ফোনটা একটু তুলতেই আবিরের ছবি ভেসে উঠেছে। বন্যা আস্তে করে বলল, "ঐ মেঘ, ভাইয়া কল দিচ্ছে।" ভাইয়া নামটা শুনতেই মেঘের গভীর ঘুম কেটে গেছে। ঘুম ঘুম চোখে পিট পিট করে কল রিসিভ করে কানে ধরল। ফোনের ওপাশ থেকে আবিরের মোলায়েম কণ্ঠস্বর শুনা গেল, "আমার বউটা এখন কি করছে?" মেঘ ঘুম ঘুম কণ্ঠে বলল,

“ঘুমাচ্ছে” আবির মুচকি হেসে বলল, ” কিন্তু আমার যে তার সাথে কথা বলতে ইচ্ছে করছে।” “সকালে বলব।” “না, এখনি বলতে হবে। ” মাহমুদা খান আস্তে করে বললেন, ” মেঘ, ফোনটা রেখে ঘুমা।” মেঘ ফিসফিস করে রেখে দেয়ার কথা বলছে কিন্তু আবির নাছোড়বান্দা, কথা তার বলতেই হবে। আবির তপ্ত স্বরে বলল, “চল ছাদে যায়।” “কেনো?” “আমার চাঁদটাকে দেখতে খুব ইচ্ছে করছে। ” “এখন ছাদে যেতে পারবো না।” ছাদের কথা শুনে মাহমুদা খান রাগী স্বরে বলে উঠলেন, “এই আবির, ফোনটা রাখবি তুই? আর একটা রাত সহ্য করতে পারছিস না?” ✎Note: আবিরের হঠাৎ পরিবর্তনে যারা খুব বেশি চিন্তিত তাদেরকে বলছি,উপন্যাসের প্রথম পর্বেই উল্লেখ করা ছিল, ”আবিরের চাঞ্চল্যে মেতে থাকতো খান বাড়ি।” সেই আবিরের চাঞ্চল্য কমার কারণটা আশা করি কারো অজানা না। তবুও বলছি, মেঘকে থাপ্পড় দেয়ার অপরাধে মেঘ যখন আবিরের সাথে টোটালি কথা বন্ধ করে দিয়েছিল তখন ধীরে ধীরে আবিরের মনে সেটার প্রভাব পড়ছিল আর সে চুপ হতে শুরু করেছিল । দুই বছর চেষ্টা করে মেঘের সাথে সম্পর্ক ঠিক করতে ব্যর্থ হওয়ায় মেঘের উপর কিছুটা অভিমান করেই দেশ ছেড়েছিল।এছাড়াও বেশ কিছু পর্বে আমি উল্লেখ করেছি, আবির পরিস্থিতির স্বীকার । তাই যারা গুরুগম্ভীর আবিরকে মিস করছেন তাদের জন্য এক বালতি সমবেদনা। ☺হমুদা খানের ধমক খেয়ে মেঘ কেঁপে ওঠে, ভয়ে সঙ্গে সঙ্গে কল কেটে দিয়েছে। মেঘ ভয় পেলেও আবিরের মনে কিঞ্চিৎ ভয় বলতে নেই।

ফুপ্পির ঝা*ড়ি খেয়েও আবির কল দিয়েই যাচ্ছে। মেঘ ফোন সাইলেন্ট করে রেখেছে ঠিকই কিন্তু আবিরের অনাবশ্যক কলে বুকের ভেতরটা অবিচ্ছিন্নভাবে কম্পিত হচ্ছে। বাহির থেকে আলোকসজ্জার ঝলমলে আলো রুমে প্রবৃত্ত হচ্ছে। মেঘ ঘাড় ঘুরিয়ে বন্যার দিকে একপলক তাকালো, বন্যা গভীর ঘুমে নিমগ্ন পরপর তাকালো ফুপ্পির দিকে, ফুপ্পির ভারী নিঃশ্বাসের শব্দে বুঝা যাচ্ছে ওনিও ঘুমে। মেঘ বুকের উপর ফোন চেপে অতি সন্তর্পণে বন্যার পাশ দিয়ে নেমে উদগ্রীব পায়ে বারান্দায় গিয়ে কল রিসিভ করল। আবির তৎক্ষনাৎ অনচ্ছ কণ্ঠে শুধালো, " তোর কি আমার জন্য একটু মায়াও হয় না?" আবিরের কথা শুনে মেঘ বিহ্বল, ভড়কে গেছে কিছুটা। কপাল কুঁচকে ভারী স্বরে বলল, " আমি কি করলাম!" " সন্ধ্যা থেকে কেউ আমাকে একটা কল পর্যন্ত দিল না। কেউ না দিলেও তুই তো একটা কল দিতে পারতি নাকি?" " আমি তো আপনার কলের অপেক্ষায় ছিলাম। অপেক্ষা করতে করতে কখন ঘুমিয়ে পরেছি বুঝতেই পারি নি।" "বাহ! কি দায়িত্বশীল বউ আমার। " মেঘ সহসা ঠোঁট বাঁকালো, সদাজাগ্রত চোখে আলোকসজ্জার লাল, নীল আলোর পানে তাকিয়ে মোলায়েম কণ্ঠে শুধালো, " বাসায় কখন আসছেন? খেয়েছেন?" "কিছুক্ষণ আগে। আমার শ্বশুর বিয়েতে যে পরিমাণ জামাই আদর করেছে রাতে আর কিছু খেতে হবে না।" "কোথায় গিয়েছিলেন?" "এখন বলবো না। " "আচ্ছা, ঘুমান তাহলে। " "শুন" "জ্বি" "চল ছাদে যাই।" "না।" "কেনো?" " আম্মুরা বলেছে বিয়ের রাতে বড়

জামাইয়ের মুখ দেখতে নেই, এতে নাকি জামাইয়ের অমঙ্গল হয়।" " ঠিক আছে, দেখলাম না মুখ। একটু কথা তো বলতে পারি। " "আব্বাজান নিষেধ করেছেন, দেখাসাক্ষাৎ ও করা যাবে না। " আবির ফোঁস করে শ্বাস ছেড়ে রাগান্বিত কণ্ঠে বলল, "কেউ আমাকে কিছু বলতে পারছে না তাই তোকে কুসংস্কার বুঝাচ্ছে আর তুইও বোকার মতো সেসব মানতেছিস।" মেঘ নিশ্চুপ, আবির দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে নিজেকে শান্ত করে আহ্লাদী কণ্ঠে বলল, " চল না ছাদে।" মেঘ অত্যন্ত ধীর কণ্ঠে বলল, " একটু বুঝার চেষ্টা করুন,আমি যেতে পারবো না। আপনি যেন রুমে না আসেন তারজন্য আব্বাজান ফুপ্পিকে আমার সাথে থাকতে বলেছেন। এখন আমি বের হলে খবরই আছে। আপনি ঘুমান, প্লিজ।" আবির ঢোক গিলে ভ্রু বাঁকিয়ে আবেগতাড়িত কণ্ঠে বলল, "I miss you. I need you. Believe me, I badly want you, Sparrow." আবিরের কণ্ঠে আবেগপ্রবণ, অস্বাচ্ছন্দ্যকর কথাগুলো শুনে মেঘের গা শিউরে উঠছে। এ যাবৎ কালে আবিরকে এতটা ব্যাকুল হতে কখনো দেখেনি সে। মেঘ নিস্পৃহায় দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ঠোঁট কামড়ে বিড়বিড় করল, "আমাকে তো খুব বলতেন সহিষ্ণু হতে হবে, ধৈর্যশীল হতে হবে তাহলে আজ আপনার এই অবস্থা কেনো? এত অধৈর্য হয়ে উঠেছেন কেনো আপনি?" " আর কত ধৈর্য ধরবো? এতদিন যাবৎ অফিসিয়াল বিয়ের অপেক্ষায় ছিলাম, করলাম তো অফিসিয়াল বিয়ে। আত্মীয় স্বজন, এলাকাবাসী সবাই জানলো তো। তাহলে এখন আমার বউ আমাকে দিচ্ছে না কেনো? মানলাম কাল

অনুষ্ঠান শেষে বাসর হবে। কিন্তু দেখা তো করতে দিবে! কথা তো বলতে দিবে! আমাদের মাঝে কংক্রিটের দেয়াল সৃষ্টির কি দরকার ছিল? " "জানি না। আমার ঘুম পাচ্ছে, ঘুমাবো। আপনিও ঘুমান।" "বুকের ভেতর আগুন জ্বললে ঘুমাবো কিভাবে?" মেঘ মুচকি হেসে বলল, " এক বোতল ঠান্ডা পানি খেয়ে ঘুমিয়ে পরেন ।" মেঘ কল কেটে রুমে চলে গেছে। আবির কপালে কয়েকস্তর ভাঁজ ফেলে বিড়বিড় করল, " এত কাহিনী করবে জানলে কমিউনিটি সেন্টার থেকেই পালাতাম। " মেঘ ভোরবেলা উঠে আবারও ঘুমিয়েছে তাই সকালে ঘুম একটু দেরিতে ভেঙেছে। আশেপাশে বন্যা, ফুপ্পি কেউই নেই। আবিরের কথা মনে পড়তেই সঙ্গে সঙ্গে ফোন হাতে নিল। মেঘ আনমনেই নেট অন করে ফেসবুকে ঢুকলো। অকস্মাৎ আবিরের পোস্ট দেখে চমকে উঠল। গতকাল বিয়ের বেশকয়েকটা ছবি আবির রাতেই তার আইডি থেকে পোস্ট করে ক্যাপশন লিখেছে, প্রিয় সহধর্মিণী, আমার অলীক কল্পনার সঙ্গী তুমি, গোধূলি লগ্নে বাড়ি ফেরার একান্ত অভিপ্রায়। তুমি আমার স্নিগ্ধ সকালের সুললিত গন্ধরাজ, পড়ন্ত বিকেলের একগুচ্ছ বাগানবিলাস। আমার শূন্য হৃদয়ের পূর্ণতা তুমি, ব্যাকুল হৃদয়ের নির্জন নির্মলা। নীল দিগন্তের উড়ন্ত মেঘেরা জানে, কত স্বপ্ন উড়িয়েছি বেনামি খামে। তোমার মায়াবী মুখের পানে চেয়ে, ভুলেছি সব যাতনা আনমনে। তোমার ঠোঁটের ঐ স্নিগ্ধ হাসি দেখে, আমার হৃদয়ের অন্তরালে নিরবচ্ছিন্ন বিক্ষোভ চলে। তুমি আমার অবসন্ন মস্তিষ্কের প্রবলতা, নব্য স্বপ্ন দেখার অদম্য স্পৃহা। তোমাকে

হাসাতে চেয়ে, বহুবার কেঁদেছি আড়ালে। তুমি আমার অপেক্ষার শেষ প্রহর, ১৬ বছরের প্রতীক্ষার অমূল্য পুরস্কার। তোমাকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেয় নি আমি, দিয়েছি আবিরের বউয়ের স্বীকৃতি। আমি তোমাকে ভালোবেসেছি, ভালোবাসি আর আমৃত্যু ভালোবেসে যাব। ইতি, তোমার আকাঙ্ক্ষিত স্বামী মেঘ ক্যাপশন পড়ে ৫ মিনিটের জন্য নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। ৫ মিনিট পর মনোযোগ দিয়ে ছবিগুলো দেখতে লাগল। গতকাল পার্লার থেকে সেজে যাওয়ার পর থেকে নিজেকে কেমন লাগছে সেটা দেখার সুযোগ ই পায় নি, বিয়ের ছবি পর্যন্ত দেখে নি তবে কয়েক ঘন্টায় আবিরের মুখ থেকে হাজারখানেক প্রশংসা সহ আবিরের দুর্বৃত্ত কথা শুনতে হয়েছে। সুযোগ পেলেই মেঘের কানের কাছে ফিসফিস করে নিজের অব্যক্ত অনুভূতি জাহির করেছে আর মেঘ শুধু আবিরের পাগলামিই দেখে গেছে। এমনকি কবুল বলার সময় আবিরের অস্থিরতা দেখে মেঘ নির্বাক ছিল, নিষ্পলক চোখে কেবল তাকিয়েই ছিল। মিনিমাম লাজলজ্জা বিসর্জন দিয়ে আবির উচ্চশব্দে বলছিল, “পৃথিবীর যা কিছুর বিনিময়েই হোক, আমি সবকিছু দিতে রাজি হয়েই মেঘকে বউ হিসেবে কবুল করলাম। আলহামদুলিল্লাহ কবুল, কবুল কবুল।” যেখানে একবার কবুল করলাম কিংবা আলহামদুলিল্লাহ কবুল বললেই বিয়ে সম্পন্ন হয়ে যায় সেখানে আবির বলেই যাচ্ছিলো। আবিরের কাণ্ড দেখে কাজী সাহেবও না হেসে পারলেন না। কাজীর মুখে হাসি দেখে আবির পরপর উদ্বিগ্ন কণ্ঠে শুধালো, ” আমাদের বিয়ে হয়েছে তো?” কাজী সাহেব উঠে যেতে

যেতে বললেন, " আলহামদুলিল্লাহ, এতদিনে পরিপূর্ণ হয়েছে।" "আলহামদুলিল্লাহ। " কাজী চলে যেতেই আবির মেঘের দিকে তাকিয়ে ভ্রু নাচিয়ে বলে উঠল, "এই ভরাট মজলিসে সবাইকে সাক্ষী রেখে আমি আবির তার মেঘকে বিয়ের প্রস্তাব দিচ্ছি। মেঘ কি আবিরকে স্বামী হিসেবে কবুল করছে?" মেঘ আবিরের ঝলমলে চোখের দিকে তাকিয়ে ঠোঁট চেপে হেসে মোলায়েম কণ্ঠে জবাব দিয়েছিল, " কবুল করলাম, আলহামদুলিল্লাহ কবুল, কবুল কবুল।" আবিরের পাগলামি সেখানেই থামেনি। গতকাল বাসায় ফেরার সময় আবির হঠাৎ ই মেঘের কানে ফিসফিস করে বলছিল, " চিরদিনের জন্য শ্বশুর বাড়িতে চলে যাচ্ছিস এবার একটু কান্না কর। মানছি একই বাড়িতে যাচ্ছিস তাই বলে কাদঁবি না?" মেঘ ভেঙচি কেটে বলেছিল, "আপনার যদি এতই শখ থাকে তাহলে আপনি কান্না করেন।" প্রতিত্তোরে আবির বলেছিল, "তুই নববধূর মতো কান্নায় ভেঙে পড়বি, নতুন জামাইদের মতো আমি তোকে সান্ত্বনা দিব। এটা আমার জীবন থেকে মিস হয়ে গেল। এক কাজ করি, চল দুজন একসঙ্গে কান্না শুরু করি।" গতকাল আবিরের আজগুবি কথা শুনে মেঘ কপাল কুঁচকালেও আজ কথাগুলো মনে করে আনমনে হেসে ফেলল। পুনরায় ছবি দেখায় মনোযোগ দিল। নিজের পড়নের মেরুন রঙের বিয়ের বেনারসি, গা ভর্তি ভারী গহনা, মাথায় ঘোমটা সহ চোখধাঁধানো আড়ম্বরপূর্ণ সাজসজ্জা দেখে মেঘ নিজেই লজ্জায় পড়ে যাচ্ছে। সেই সাথে রাজোচিত শেরওয়ানিতে আবিরকে যেন রাজপুত্রের মতো লাগছে। গতকাল আবিরের অযাচিত

দুষ্টামির জন্য সামনাসামনি ঠিকমতো দেখতেই পারে নি তবে আজ ছবিগুলো খুব ভালো করে দেখছে। আয়নায় দু'জনের মুখ দেখা, মেঘের কপালে আবিরের চুমু দেয়া, একে অপরের চোখে চোখ রেখে নিগূঢ় ঘোরে বন্দি থাকা, বরণের ছবি সহ আরও ২-৩ টা ছবি আপলোড করেছে। মেঘ সবগুলো ছবি দেখা শেষে কৌতূহল বশত কমেন্টস দেখতে গেল। আবিরের বন্ধু, ছোট ভাই, বড় ভাই, রাকিব, সাকিব, তানভির, মাইশা আপু সহ সবাই নিজেদের মতো অভিনন্দন জানানোর পাশাপাশি উস্কানিমূলক মন্তব্যও করেছে। কারো কারো মন্তব্য দেখে মেঘ বেশ বিস্মিত হচ্ছে। এরমধ্যে বন্যা আসছে। মেঘের লাজুক হাসি দেখে মৃদুস্বরে জিজ্ঞেস করল, "হাসছিস কেন? ভাইয়ার পোস্ট দেখে?" মেঘ কপাল কুঁচকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, " তুই কিভাবে জানিস?" " শুধু আমি না বাড়ির সবাই এখন ভাইয়ার পোস্ট নিয়ে গবেষণা করছে, নিচে গেলেই বুঝতে পারবি।" মেঘ শান্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, " তুই খেয়েছিস?" "না। তোকে ডাকতেই আসছিলাম, তুই ফ্রেশ হয়ে আয় একসাথে খাব।" "আচ্ছা। " বন্যা মীমের রুমে চলে গেছে। ইদানীং মেঘ ব্যস্ত থাকায় বন্যার মীম আর আইরিনের সাথে খুব ভালো সম্পর্ক হয়ে গেছে। দু'জনেই তানভিরের কথা জানে তাই তানভিরের হাত থেকে বন্যাকে সবসময় প্রটেক্ট করে। ড্রয়িং রুমে সোফায় হেলান দিয়ে চোখ বন্ধ করে বসে আছে আবির। রান্না ঘরে রান্নার আয়োজন চলছে, ইকবাল খান ছাদ থেকে নেমে আবিরকে এভাবে বসে থাকতে দেখে কিছুটা উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন,

“কিরে আবির, এভাবে বসে আছিস কেন?” আবির চোখ খুলে কাকামনিকে একপলক দেখে পূর্বের অবস্থায় থেকে উত্তর দিল, ” আমার মনটা খুব খারাপ। ” ইকবাল খান নেমে এসে আবিরের পাশে বসতে বসতে শুধালেন, ” মন খারাপ কেনো? বিয়ে তো সবাই মেনেই নিয়েছে। তাহলে মন খারাপ কেনো থাকবে?” আবির তপ্ত স্বরে বলতে শুরু করল, ” মন খারাপ থাকবে না কেন? মানুষ এলাকা ছেড়ে দু-এক বছর বাহিরে থাকলেই কথা,আচরণ, চলাফেরা সব বদলে যায় সেখানে ২০-৩০ বছর ঢাকা শহরে থেকে এখনও গ্রামের কি সব আজগুবি নিয়মনীতি পালন করছে। বিয়ের পর বউ আলাদা কেনো থাকবে? এতবছর অপেক্ষা করে, নিজের সাথে নিজে যুদ্ধ করে, আল্লাহ র কাছে চাইতে চাইতে মেঘকে পেয়েছি, কেউ কি জানে সেটা? কিছুদিন যাবৎ এই বাড়ির প্রতিটা মানুষ আমার ইমোশন নিয়ে প্রতিনিয়ত খেলতেছে তারপরও আমি চুপ করে আছি। আমি যদি ঘুনাক্ষরেও এসব টের পেতাম তাহলে মেঘকে নিয়ে আগেই পালিয়ে যেতাম। তোমরা যা করছো তা আমি কখনো ভুলবো না। আমি এর তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি।” ইকবাল খান শীতল কণ্ঠে বললেন, ” এভাবে বলছিস কেনো, একেক এলাকার একেক রীতি। একটু আধটু মেনে নিতেই হবে।” আবির কিছু বলার আগেই পেছন থেকে আলী আহমদ খান গুরুগম্ভীর কণ্ঠে বলে উঠলেন, ” তোমার নিন্দা জানানো শেষ হলে বাহিরে আসো, কাজ আছে।” আলী আহমদ খানের কণ্ঠ শুনে আবির চমকে উঠে পেছনে তাকালো। আব্বুর রাগী রাগী চোখমুখ দেখে

নিজের মুখ চেপে ধরল। আলী আহমদ খান কখন এসেছে আর ঠিক কতটুকু কথা শুনেছে এটা ভেবেই আঁতকে উঠছে আবির। ইকবাল খানের সাথে আবিরের ফ্রেন্ডলি সম্পর্ক হওয়ায় যা ইচ্ছে বলে দিতে পারে কিন্তু আব্বুর সামনে সে যথাসাধ্য ভদ্র থাকার চেষ্টা করে। কিন্তু আজ এভাবে ধরা পড়ে যাবে সেটা কল্পনাও করতে পারে নি। আবির মাথা নিচু করে দাঁত দিয়ে জিভ কামড়ে বাসা থেকে বেড়িয়ে গেছে। ইকবাল খান আলী আহমদ খানের মুখের পানে চেয়ে মলিন হাসলেন আলী আহমদ খানও নিঃশব্দে হেসে বেড়িয়ে গেছেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই মেঘ নিচে নামলো। মেঘকে দেখেই রাকিব অকস্মাৎ বলে উঠল, "এইযে ভাবি, আমার বন্ধুর ১৬ বছরের অব্যক্ত অনুভূতির বহিঃপ্রকাশে লেখা খোলা চিঠি পড়ে আপনার অনুভূতি কি?" মেঘ শাড়ির আঁচল টেনে মাথায় দিয়ে চিবুক নামিয়ে লাজুক হাসলো। রিয়া রাকিবকে উদ্দেশ্য করে বলল, " ভাইয়া সবেত প্রকাশ করেছে, মেঘকে অনুভব করার সময় দাও। বিয়ের ঘোরটা আগে কাটুক তারপর জিজ্ঞেস করো।" " ঠিক আছে জান। তুমি যা বলবে তাই হবে। " রিয়া ঠোঁট বেঁকিয়ে রাগী স্বরে বলল, " হঠাৎ এত ভালোবাসা কোথা থেকে আসছে?" "রাতে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আকাশের পানে তাকিয়ে কল্পনা করে আবির যেভাবে চিঠিটা লিখছিল সেটা দেখে আমারও খুব ইচ্ছে হয়েছিল তোমাকে নিয়ে একটা চিঠি লেখার। কিন্তু বিশ্বাস করো 'তুমি ফাল্গুনের সেই রক্তিম শিমুল ফুল, আমার হৃদয়ের..' এরপর আর কিছু ভেবেই পাচ্ছিলাম না। ৩০ মিনিট ভেবেছি, তানভিরকে নিয়ে গবেষণা

করেছি কিন্তু লাইনটা আর সম্পূর্ণ করতে পারি নি। তারপর মনে হলো, কবিতা আর চিঠি লেখার থেকে সকাল সন্ধ্যা 'বাবু খাইছো?' জিজ্ঞেস করাটা খুব সহজ সমাধান। " রিয়া বিরক্ত হয়ে বলল, " তুমি আসলেই একটা আনরোমান্টিক।" রাকিব হেসে উত্তর দিল, " বিয়ে করেছি ৬ মাস হতে চলল, এখনও আমি কত রোমান্টিক দেখেছো? তুমি বললে শিমুল ফুল না দিতে পারলেও কচুরিফুল ঠিকই দিতে পারবো। আর কি চাও? " রিয়া রাগান্বিত কণ্ঠে হুঙ্কার দিল, " তুমি আপাতত চোখের সামনে থেকে যাও।" "আজকাল ভালোবাসার কোনো মূল্য নেই। নিজের বিয়ে করা বউও বলে আমি নাকি আনরোমান্টিক। ধিক্কার জানায়। " "কাকে ধিক্কার জানাচ্ছো?" "নিজেকেই।" রিয়া সহসা হাসতে শুরু করেছে, সেই সাথে মেঘও হাসছে। আবির এসে রাকিবের কাঁধে হাত রেখে ধীর কণ্ঠে জানতে চাইল, " কি হচ্ছে এখানে?" আবিরের কণ্ঠ শুনে মেঘ আড়চোখে তাকালো।আবিরকে এক পলক দেখেই লজ্জায় নুইয়ে পড়েছে। গতকালও এত লজ্জা পায় নি যতটা লজ্জা আজ পাচ্ছে, অবিলম্বে ঘোমটা টেনে মুখ ঢাকার চেষ্টা করল। রাকিবের সাথে দু একটা কথা বলে, আবির মেঘের সামনে এসে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত কোমল কণ্ঠে বলল, "আসসালামু আলাইকুম। " লজ্জায় আড়ষ্ট মেঘ ঠান্ডা কণ্ঠে বলল, "ওয়ালাইকুম আসসালাম। " "শুভ সকাল, বউ।" "শুভ সকাল। " রাকিব গলা খাঁকারি দিয়ে বলল, " তোর বউ এটা আমরা সবাই জানি তাই বলে সারাদিন বউ বউ করবি?" " ভাবছি, কিছুদিন দিনরাত এক করে শুধু বউ ই

ডাকব।” মাহমুদা খান মালিহা খানের রুম থেকে বেড়িয়ে আসতে আসতে ভারী কণ্ঠে বললেন, ” আবির তোর কি কোনো কাজ নেই? সকাল সকাল মেঘকে জ্বালাচ্ছিস কেনো?” আবির কপাল কুঁচকে, ঠোঁট বেঁকিয়ে শক্ত কণ্ঠে বলল, ” আমি কোথায় জ্বালিয়েছি? এতক্ষণ কাজ করে কেবল ই আসলাম। ফুপ্পি তোমার আমার সাথে কিসের শত্রুতা বলো তো, আব্বুর সাথে তুমিও এমন আচরণ শুরু করেছো কেনো? তোমাদের থেকে তো আমার শ্বশুরই ভালো, মেয়ে খেয়েছে কি না দেখতে আমাকে জোর করে পাঠিয়েছেন। আর তোমরা?” মাহমুদা খান রাশভারি কণ্ঠে বললেন, ” ভাইজান খুব সহজে মেনে নিয়েছে তো তাই কিছু বুঝতে পারছিস না, ভাইজানের ধমক না শুনা পর্যন্ত শান্তি পাচ্ছিস না। তাই না? তোর আচরণে কোনো কারণে ভাইজান যদি রেগে যান, বাড়ি ভর্তি মেহমানের সামনে চিৎকার চেঁচামিচি করেন বিষয়টা কি ভালো লাগবে? তার থেকে ওনি শান্ত আছেন তুইও একটু শান্ত থাক। ” “ঠিক আছে, থাকলাম শান্ত।” আবির মুখ ফুলিয়ে শ্বাস ছেড়ে মেঘের দিকে তাকিয়ে ব্যস্ত কণ্ঠে বলল, ” বউ তুমি খেয়ে নেও হ্যাঁ, তোমার ফুফু শ্বাশুড়িটা ভালো না। একদম মহিলা হি*টলা*রের মতো আচরণ করছেন। আমি এখন পালায়। ” আবির এক দৌড়ে বাসা থেকে বেড়িয়ে গেছে, রাকিবও হাসতে হাসতে চলে গেছে। মাহমুদা খান হেসে বললেন, ” মেঘ, খেতে বস। আমি ওদের ডেকে নিয়ে আসি।” একটু পরেই সবাই খেতে নেমেছে। মেঘকে দেখেই জান্নাত বলে উঠল, “তুমি আমার স্নিগ্ধ সকালের সুললিত গন্ধরাজ,

পড়ন্ত বিকেলের একগুচ্ছ বাগানবিলাস।” পাশ থেকে আইরিন বলল, ” ভাবি এইটা না, আমার ঐ লাইনটা বেশি ভালো লেগেছে। নীল দিগন্তের উড়ন্ত মেঘেরা জানে, কত স্বপ্ন উড়িয়েছি বেনামি খামে।” রিয়া মৃদুহেসে বলল, ” তোমরা শুধু শুধু মেঘকে জ্বালিয়ো না। মেঘ আমি তোমাকে ভালোবেসেছি, ভালোবাসি আর আমৃত্যু ভালোবেসে যাব। তুমি একদম মন খারাপ করবে না কেমন!” ওদের দুষ্টামিতে মেঘ চোখ তুলে তাকাতেই পারছে না। এরমধ্যে মালা এসে একটা চেয়ার টেনে বসলো। আইরিন মজার ছলে জিজ্ঞেস করল, ” মালা আপু, আপনার কোন ডায়লগ টা ভালো লেগেছে?” “কিসের ডায়লগ?” ” আবির ভাইয়া মেঘ ভাবিকে নিয়ে ফেসবুকে খোলা চিঠি লিখেছে। আপনি দেখেন নি?” মালা আইরিনকে দেখে পরপর মেঘের লজ্জামাখা আদলের পানে তাকালো। মনে মনে বিড়বিড় করল, “আমাকে ব্লক করে রাখলে কিভাবে দেখবো।” আইরিন আবার জিজ্ঞেস করল, “দেখেন কি?” মালা বিরক্ত হয়ে বলল, ” খেয়াল করি নি।” আবারও মনে মনে বিড়বিড় করল, ” এসব আজাইরা ভালোবাসা দেখলেই শরীর টা জ্বলে। ” বউভাত উপলক্ষে মেঘ আজ অফ হোয়াইট রঙের মধ্যে গোল্ডেন স্টোনের একটা গর্জিয়াছ লেহেঙ্গা পড়েছে। আবির মেঘের সাথে ম্যাচিং করে অফ হোয়াইট রঙের স্যুট পড়েছে। বাকিরাও যে যার মতো সেজেছে। মালা আজ হুট করে একটা গর্জিয়াছ শাড়ি পড়েছে। মালার সাজ দেখে সাকিব মেকি স্বরে বলল, “ছ্যাঁকা খেয়ে মানুষকে ঘরের দরজা বন্ধ করে সপ্তাহব্যাপী বা

মাসব্যাপী কাঁদতে দেখেছি অথচ তুই তা না করে নাচতে নাচতে বিয়ে খেতে চলে আসছিস। তোর কি মিনিমাম লজ্জা নেই?" "লাজ লজ্জা ধুয়ে কি শরবত খাবো নাকি? আর একটা কথা শুনে রাখ, আমি চাইলেই আবির ভাইয়াকে বিয়ে করতে পারতাম কিন্তু আমি মেঘের মতো এত উন্মাদ না যে আমার আবির ভাইকেই লাগবে। " সাকিব ফিক করে হেসে বলল, "কথায় আছে, পাগলের সুখ মনে মনে। আর কি কি বলে নিজেকে সান্ত্বনা দিচ্ছিস জানাইস আমাকে। প্রয়োজনে আমি আরও কিছু এড করে দিব। আর রইল বাকি মেঘবতীর পাগলামির কথা, আবির ভাইয়া দেশে আসছেই মেঘকে পাগল করতে। ১৪ বছর তো একায় পাগলামি করে গেল। ভাইয়ার কি ইচ্ছে হয়না মেঘবতী তার জন্য একটু পাগলামি করবে, বাড়ি ফেরার অপেক্ষায় থাকবে, তাকে দেখার জন্য বা একটু কথা বলার জন্য উতলা হয়ে থাকবে, তার দিকে কেউ তাকালে অগ্নিকন্যার রূপ নিবে, মূল কথা ভাইয়াকে পাগলের মতো ভালোবাসবে। মেঘবতীর মনে প্রবল প্রমত্ততা জাগাতে ভাইয়া ই সব করেছে। তাই তোর চোখে মেঘবতী উন্মাদ হলে আবির ভাইয়া তার গুরু।" মালা রাগে কটমট করে চলে যেতে নিলে অলক্ষিতভাবে লিমনের সাথে ধাক্কা খেল। মালা মাথায় হাত দিয়ে রাগান্বিত কণ্ঠে হুঙ্কার দিল, " আপনি কি চোখে দেখেন না?" লিমন মালার দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বলল " মাঝে মাঝে একটু কম ই দেখি। " মালা রাগে ফোঁস ফোঁস করে চলে গেছে। মাইশা আপু আর ওনার হাসবেন্ড আজ দুপুরেই আসছেন। আবির কল দিতে দিতে

অনেক কষ্টে আপুকে রাজি করিয়েছে। মেঘ আপুকে দেখেই আহ্লাদী কণ্ঠে বলল, " আপু মনে আছে তো, বাবুকে কিন্তু সর্বপ্রথম আমার কোলে দিতে হবে।" "হ্যাঁ গো মনে আছে। দোয়া করো, বাবু সুস্থভাবে হলে তোমার কোলেই প্রথমে দিব।" মেঘ এক গাল হেসে বলল, "ঠিক আছে।" আবির মেঘের দিকে তাকিয়ে কিছু ভেবে আনমনে হাসলো। মেঘ বিষয়টা খেয়াল করে জিজ্ঞেস করল, "হাসছেন কেন?" " এমনিতেই। " "বলুন।" "রাতে বলব।" "না, এখনই বলুন।" "I love you. I want to hug you. I wanna kiss you." মেঘ সঙ্গে সঙ্গে আবিরের হাতে চিমটি কেটে ব্যস্ত কণ্ঠে বলল, " চুপ করুন।" " এখন তো চুপ করতেই বলবি। অফিসিয়াল বিয়ের ২৪ ঘন্টা পেরিয়ে গেছে অথচ এখনও অফিসিয়াল আলিঙ্গনটায় করতে পারলাম না।" মেঘ নিজের কপাল চাপড়ে বিড়বিড় করল, " এত নির্লজ্জ কবে হলেন আপনি?" " তোকে বিয়ে করার পর । " সারাদিনের অনুষ্ঠান শেষে বিকেলের দিকে অনেক আত্মীয় স্বজনই চলে গেছেন। এশা পর্যন্ত সবাই মোটামুটি ব্যস্ত ছিল। এশার নামাজ পড়ে মোজাম্মেল খান আর আলী আহমদ খান একসাথে চা খেতে বসেছেন। কিছুক্ষণের মধ্যে আবির আর ইকবাল খানও এসেছেন। তানভির, সাকিব,রাকিব, আরিফ মিলে বাসরঘর সাজাচ্ছে। গতকাল তানভির বোনের পক্ষে থাকলেও আজ সে আবিরের পক্ষে। আবির নামাজ থেকে এসেই নিজের রুমে চলে গেছে। ভুল করেও কেউ যেন লাল গোলাপ না লাগায় তারজন্যই মূলত দেখতে গেছে। ফুল কিনতে যাওয়ার আগেই তানভিরদের বার

বার বলে দিয়েছে ভুলেও যেন লাল গোলাপ না আনে। মিনহাজ মেঘকে লাল গোলাপ দেয়ার মতো বিশাল অপরাধের শাস্তিস্বরূপ আবির সেই রাগ মিনহাজের উপর না দেখিয়ে গোলাপের উপর দেখাচ্ছে। বিয়ে উপলক্ষে আবিরের রুম সম্পূর্ণ পরিষ্কার করা হয়েছে। আবিরের শৈশব-কৈশোরের যত স্মৃতি ছিল, সব সরিয়ে একদম ফাঁকা করে দিয়েছে। বিয়ের ঝামেলা মিটলে প্রয়োজনীয় সব জিনিসপত্র এনে রুম সাজানো হবে। গায়ে হলুদের দিন থেকে আবির আব্বু চাচ্চুর মুখোমুখি বসে নি। অবশেষে আজ আবির আব্বুর চাচ্চুর পাশে গিয়ে বসেছে। মোজাম্মেল খান চিন্তিত স্বরে বললেন, " কিছু বলবে?" "জ্বি।" "বলো।" " আপনাদের পরিকল্পনার বাহিরে আমি যে কাজগুলো করতে বলেছিলাম সেগুলোর খরচ জানতে চাচ্ছিলাম। আমি পেমেন্ট দিয়ে দিচ্ছি সম্ভব হলে রাতে বা সকালের মধ্যে পরিশোধ করে দিবেন। " আলী আহমদ খান ঠান্ডা কণ্ঠে বললেন, " তোমার দিতে হবে না।" " আব্বু, আমি আগেই বলে রেখেছিলাম। অন্ততপক্ষে আমার পরিকল্পনাগুলোর টোটাল পেমেন্ট আমি করব।" মোজাম্মেল খান আস্তে করে বললেন, " আচ্ছা তুমিই করো। কিন্তু এত তাড়াহুড়ো করার প্রয়োজন নেই। ইমারজেন্সি সবার পেমেন্ট করে ফেলেছি। আর যারা নেয় নি তাদের কাল পরশুর মধ্যে দিয়ে দিব।" "আমি হিসাবটা দেখতে চাচ্ছিলাম, চাচ্চু।" " আমার কি কপাল, মেয়ের জামাই কত সুন্দর করে চাচ্চু বলে ডাকছে।" আবির মৃদু হেসে মেকি স্বরে বলল, "মেঘের মতো আমিও কি আব্বাজান বলে ডাকবো?" আলী আহমদ

খান, মোজাম্মেল খান এবং ইকবাল খান তিনজনেই একসঙ্গে হেসে উঠলেন। প্রায় এক ঘন্টা যাবৎ চারজন মিলে হিসাব করছে। এদিকে জান্নাত আর রিয়া মিলে মেঘকে সাজাচ্ছে আর বাসরের নিয়মকানুন শিখিয়ে দিচ্ছে। মেঘের মনে ভয়, লজ্জা, আতঙ্কের সাথে সাথে এক অজানা ভালোলাগাও কাজ করছে। রাত ১০ টার পর পর ওদের সাজানো শেষ হয়েছে। আবিরের নিষেধাজ্ঞা থাকায় লাল গোলাপ ছুঁয়েও দেখেনি। গাদা, বেলি, কাঠগোলাপ, ৩-৪ রঙের জারবেরা, জিনিয়া সহ যে যে ফুল পেয়েছে সব দিয়েই সাজিয়েছে। সাজানো শেষেই মেঘকে নিয়ে বিছানার মাঝ বরাবর বসিয়েছে। মেঘের সামনে ফুলের পাঁপড়ি দিয়ে একটা লাভ এঁকে তাতে A আর M লিখেছে। তারপর শুরু হয়েছে দল ভাগাভাগি, কয়েকজন আবিরের পক্ষে থাকলেও বেশিরভাগই মেঘের পক্ষে। তানভির আজ আবিরের পক্ষে শুনে বন্যা রাগী রাগী মুখ করে বলল, ” আপনি দু’মুখো সাপের মতো আচরণ করছেন কেনো?” তানভির হেসে বলল, ” বোনের বিয়ের পর স্বাভাবিকভাবেই বোন শ্বশুরবাড়িতে চলে যায়। ভাগ্য ভালো আমার বোন আমার চোখের সামনে আছে। বনুর শ্বশুর বাড়ি অন্য কোথাও হলে আজকের বাসরঘর সাজানো অসম্ভব ছিল। তাছাড়া বড় ভাই হয়ে ছোট বোনের বাসর আটকানো টা তেমন শোভা পায় না।” বন্যা আর কিছু বলে নি। এদিকে আবিরদের হিসাব নিকাশের এক পর্যায়ে মোজাম্মেল খান বললেন, ” অনেক তো হিসেব দেখলে এখন বরং যাও তুমি। ” আবির ঘাড় ঘুরিয়ে মালিহা খানকে উদ্দেশ্য করে বলল, ”

আম্মু, তোমাদের যা যা নিয়মকানুন আছে তাড়াতাড়ি শেষ করো। আমার ঘুম পাচ্ছে। " মোজাম্মেল খান অকস্মাৎ কাশতে শুরু করলেন। ইকবাল খান আবিরের হাত চেপে বিড়বিড় করে বলল, "বাবা-চাচারা আছে, কথাবার্তা একটু সাবধানে বল।" আবির ভ্রু কুঁচকে মনে মনে বিড়বিড় করল, " গত দু'রাতে একফোঁটাও ঘুমাতে পারি নি। এখন বিয়ে করেছি বলে কি ঘুম পেলেও বলা যাবে না?" আবির নিশ্চুপ দেখে মোজাম্মেল খান স্বাভাবিক কণ্ঠে বললেন, " বাকিগুলো সকালে দেখে নিও।" আবির তপ্ত স্বরে বলল, "আর কিছু দেখতে হবে না। যা লাগবে তানভিরকে বললেই হবে। " মাহমুদা খান এসে মৃদুস্বরে বললেন, " আবির, তুই এখন রুমে যেতে পারিস।" আবির হঠাৎ ই কেমন যেন লজ্জা পাচ্ছে। লজ্জায় উঠে যেতে পারছে না। আলী আহমদ খান অকস্মাৎ বকে উঠলেন, " এত লজ্জা পেতে হবে না, যাও। " আবির মাথা নিচু করে উঠে রুমের দিকে চলে গেছে। রুমের সামনে যথারীতি দু'দল মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। তানভির আবিরের দলের হওয়া স্বত্তেও ওরা জোরপূর্বক তানভিরকে রুমের ভেতরে রেখেছে। আবির দরজা থেকে উঁকি দিয়ে বিছানাটা দেখে নিল। মাথায় ঘোমটা দিয়ে নববধূ বিছানায় বসে আছে। আবির বাকিদের উদ্দেশ্যে স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, "কি চাই?" "তেমন কিছু না। " রাকিব আবিরের পাশ থেকে বলে উঠল, " আজ যত ইচ্ছে দে আমি বারণ করব না। কারণ, বাসর আমিও সাজিয়েছি তাই ভাগ আমিও পাবো। " আবির রাকিবের দিকে তাকিয়ে হাসলো। আইরিন অকস্মাৎ বলে উঠল, " ভাইয়া

তাড়াতাড়ি টাকা দিয়ে আমাদের বিদায় করো।” আবির শান্ত কণ্ঠে বলল, “তোরা কত চাস সিদ্ধান্ত নিয়ে তানভিরের কানে কানে বল।” আইরিন, জান্নাত, রিয়া, মীম, বন্যা ফিসফিস করে কিছুক্ষণ ভেবে চিন্তে তানভিরকে জানালো। আবির সঙ্গে সঙ্গে বলল, ” সিদ্ধান্ত ফাইনাল?” “হ্যাঁ।” “এখন সামনে থেকে সরো।” ” কেনো সরবো? আগে টাকা দিবে তারপর যাব।” আবির তপ্ত স্বরে বলল, “আমি যেতে বলি নি আপু, সরতে বলেছি। বউ না দেখে আমি তোমাদের কিছু দিতে পারছি না ।” “বউ দেখে ফেললে তো শেষ ই।” “তোমরা যেমন আমাকে বিশ্বাস করতে পারছো না তেমন আমিও পারছি না। আমার বউ এর জায়গায় অন্য কাউকে যে বসিয়ে রাখো নি তার কি গ্যারেন্টি আছে? তোমাদের সহজ সমাধান দিয়েছি, তোমাদের এমাউন্ট আমি না জানলেও তানভির জানে। আমার বউ ঠিকঠাক থাকলে তোমরা তোমাদের প্রাপ্য পেয়ে যাবে। আগে বউ দেখব তারপর টাকা দিব। এখন তোমরা ভেবে দেখো। ” “ঠকাবে না তো?” ” তোমরা আমাকে না ঠকালে আমিও তোমাদের ঠকাবো না। ” “ঠিক আছে। ” ওরা এক প্রকার বাধ্য হয়েই আবিরকে রুমে ঢুকতে দিয়েছে। আবির রুমে ঢুকেই মেঘকে উদ্দেশ্য করে সালাম দিলো। মেঘ কাঁপা কাঁপা গলায় সালামের উত্তর দিয়েছে। এতক্ষণ যাবৎ মেঘ শান্ত থাকলেও এখন আর শান্ত থাকতে পারছে না, আবির যত কাছাকাছি আসছে মেঘের শরীরের প্রতিটা শিরা-উপশিরার রক্ত সঞ্চালন তত বেড়ে যাচ্ছে, ঢোক গিলে বার বার নিজেকে শান্ত রাখার চেষ্টা করছে। আবির কিছুটা ঝুঁকে

খুব যত্নসহকারে আস্তেধীরে মেঘের ঘোমটা উঠালো, লজ্জায় রাঙা মেঘের নামানো চিবুক দেখে কিঞ্চিৎ ভ্রু কুঁচকালো। আবির সহসা দু'আঙুলে মেঘের চিবুক উঠালো। আবিরের শক্ত হাতের কোমল স্পর্শে মেঘের শীর্ণ অধর থরথর করে কাঁপছে, হৃদয়ের তোলপাড়ে নিঃশ্বাস এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে, ঘন ঘন পল্লব ঝাপ্টে নিভু নিভু চোখে আবিরের দিকে তাকাতেই আবির সহসা বুকের বা পাশে হাত রেখে নেশাক্ত কণ্ঠে বলল, "হায়! মাশাআল্লাহ। " সঙ্গে সঙ্গে বিছানার উপর লাভ লেখা অংশে ধপ করে পড়ে গেছে। মীম, আদি,আইরিন কিছুটা আতঙ্কিত হলেও বাকিরা আবিরের কাণ্ড দেখে মুচকি মুচকি হাসছে। মেঘ কিঞ্চিৎ ভ্রু কুঁচকে আবিরের মুখের দিকে তাকালো। আবির আচমকা কাত হয়ে মেঘের দিকে ঘুরে হাতের উপর মাথা রেখে মৃদুগামী কণ্ঠে বলল, "অবশেষে, আবিরের একান্ত চাঁদ আবিরের রুমে দীপ্তি ছড়াচ্ছে।" মেঘ লজ্জায় চোখ সরিয়ে করে ফেলেছে। আবির পকেটে হাত দিয়ে যতগুলো ৫০০ আর ১০০০ টাকার নোট পেয়েছে সব মেঘের হাতে মুষ্টিবদ্ধ করে দিয়েছে। রিয়া হাসিমুখে বলল, " ভাইয়া আপনার চাঁদকে সারাজীবনের জন্য আপনার রুমে রেখে গেলাম। আপাতত আমাদের দিক টা একটু ভাবুন।" আবির মেঘের দিকে তাকিয়ে মোলায়েম কণ্ঠে বলল, " ওরা কিছু চাচ্ছে, দিব?" মেঘ কিছুই বলছে না, চুপচাপ বসে নিজের হৃৎস্পন্দন গুনছে। আইরিন সঙ্গে সঙ্গে বলল, " এটা কিন্তু কথা ছিল না। তুমি বলেছো ভাবিকে দেখেই দিয়ে দিবে। " আবির মেঘের দিকে তাকিয়ে থেকেই ঠান্ডা

কণ্ঠে বলে উঠল, ” আমি আমার বউয়ের অনুমতি ব্যতীত কিছু দিতে পারছি না, সরি। ” সবাই মেঘকে রিকুয়েষ্ট করছে কিন্তু মেঘ মুখ ফুটে কিছু বলতেই পারছে না। আবির মৃদু হেসে পুনরায় প্রশ্ন করল, ” কি হলো? দিয়ে দিব?” মেঘ ঘাড় কাত করে সম্মতি জানালো। আবির সঙ্গে সঙ্গে বিছানা থেকে উঠে স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, ” তোমাদের এমাউন্ট কত ছিল আমি জানি না আর জানতেও চাই না। আমার বউ যেহেতু সম্মতি দিয়েছে তাই তোমরা যা চেয়েছো তার ডাবল পাবে। ” তানভিরের দিকে তাকিয়ে মৃদুস্বরে বলল, ” তানভির, ওদের এমাউন্ট বুঝিয়ে দিবি।” “জ্বি ভাইয়া।” জান্নাত, রিয়া একসঙ্গে বলে উঠল, “ইসস, এত বড় মিস্টেক কিভাবে করলাম। আগে জানলে আরও বেশি চাইতাম। ” আইরিন বলল, ” আমরা এখন নতুন করে এমাউন্ট চাইবো।” আবির মুচকি হেসে বলল, ” সুযোগ একবার ই দিয়েছি সেই সুযোগ আর পাবে না। এখন সবাই যাও এখান থেকে।” রাকিব আবিরের কানে কানে ফিসফিস করে কিছু বলেই দৌড়ে বেড়িয়ে গেছে। বাকিরাও যে যার মতো চলে গেছে। বন্যা মেঘের দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বেড়িয়েছে। তানভির আগেই বেড়িয়ে গিয়েছিল, আবির দরজা বন্ধ করতে যাবে অকস্মাৎ তানভির হাজির হলো। আবির শক্ত কণ্ঠে বলল, “আবার কি?” তানভির মেঘকে এক পলক দেখে নিল। মেঘ মাথা নিচু করে নিশ্চুপ হয়ে বসে আছে। তানভির গলা খাঁকারি দিয়ে অত্যন্ত কোমল কণ্ঠে বলল, ” ভাইয়া, আমার বোনটা কিন্তু এখনও ছোট। তোমার অনাবশ্যক ভালোবাসাকে একটু

কন্ট্রোলে রেখো, প্লিজ।”আবির ভ্রু গুটিয়ে সরাসরি তানভিরের চোখের দিকে তাকিয়ে কর্কশ গলায় বিড়বিড় করল, ” তুই না আমার সম্বন্ধী?” তানভির নিঃশব্দে হেসে অত্যন্ত ধীর কণ্ঠে বলল, “তুমি না আমার ভাই? তাছাড়া পুরো পৃথিবী জানে তুমি আমার বন্ধু টাইপের ভাই তাই আমার সবদিক থেকে পারমিশন আছে।” আবির দাঁতে দাঁত চেপে বলল, ” জ্বি ভাই, বুঝতে পেরেছি। বলছিলাম কি ভাই আপনি পারমিশন দিলে আমি আপনার বোনের সাথে একান্তে কিছুটা সময় কাটাতাম। পারমিশন দিবেন, ভাই?” “জ্বি ভাই, আপনার জন্যই এত আয়োজন। বেস্ট অফ লাক, বাই। ” তানভির চলে যাচ্ছে, আবির মুচকি হেসে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। দরজা বন্ধের শব্দে মেঘের শরীর ঝাঁকি দিয়ে উঠেছে, মাথা নিচু করে জোরে নিঃশ্বাস ছাড়লো। আবির আড়চোখে মেঘের দিকে তাকালো, ঠোঁটে লেগে আছে দুষ্টু হাসি। ধীর পায়ে এগিয়ে গেল মেঘের কাছে, আবিরের তৃপ্ত দুচোখ চকচক করছে। উৎকণ্ঠায় মেঘের চিবুক নেমে গলায় ঠেকেছে, ক্ষীণ বক্ষের তীব্র কম্পনে শরীর ঘেমে একাকার অবস্থা। আবির আগপাছ না ভেবেই আচমকা মেঘের কোলে মাথা রেখে শুয়ে পরেছে। অপ্রত্যাশিত ঘটনায় মেঘ চমকে উঠে, বুকের ভেতর পর্যন্ত স্তব্ধ হয়ে গেছে। মেঘ সঙ্গে সঙ্গে চোখ বন্ধ করে ফেলেছে, হাত-পা সহ সারা শরীর থরথর করে কাঁপছে। আবির অকস্মাৎ জামা-কাপড়ের উপর দিয়ে মেঘকে জড়িয়ে ধরে পেটে মুখ গুঁজল। আবিরের অবাঞ্ছিত স্পর্শে মেঘের জোড়াল বক্ষস্পন্দন আরও বেশি জোড়ালো হতে শুরু করেছে, নিরবে

ঢোক গিলে এলোমেলো নিঃশ্বাস ছাড়ছে। আবির ভয়ঙ্কর আবেশে আবদ্ধ, সুদীর্ঘ অবকাশের অস্ফুট প্রণয়ের অফিসিয়াল অনুমোদন পেয়েছে আজ। মেঘের শরীর থেকে আসা বিমুগ্ধকারী ঘ্রাণটা আবিরের নাসারন্ধ্রের সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ে তোলপাড় চালাচ্ছে, আবির এক মনে সেই ঘ্রাণটা উপলব্ধি করছে। মেঘের অভিমানে নাক ফুলানো, গায়ের তীব্র গন্ধ, দরদী স্পর্শ, আহ্লাদী কণ্ঠের আবদার পূরণের পরিপূর্ণ অধিকার পেয়েছে আজ। এই মেঘ একান্ত আবিরের, পৃথিবীর আর কারো সাধ্য নেই যে আবিরের কাছ থেকে তার মেঘকে দূরে সরাবে। আজ ছোট্ট মেঘের আদুরে কণ্ঠে বলা কথাগুলো আবিরের খুব মনে পড়ছে, অকস্মাৎ পেট থেকে মুখ সরিয়ে ঘাড় কিছুটা ঘুরিয়ে মেঘের অভিমুখে তাকালো। মেঘের বন্ধ চোখের পাতা আর কম্পিত অধর দেখে আবির আনমনে হেসে অত্যন্ত মোলায়েম কণ্ঠে বলল, ” তুমি আমার বহু প্রতীক্ষিত একান্ত অভিলাষ, হৃদয়ের মনিকোঠায় সঙ্গোপনে রাখার নির্মম প্রয়াস। আমার অবিচ্ছেদ্য প্রণয়ের উত্তাপ তুমি, সকাল-সন্ধ্যা সর্বনাশের কারণটাও শুধু তুমি।” মেঘের সংকোচ কোনোভাবেই কাটছে না, চোখ খুলে আবিরের দিকে তাকাতেও পারছে না। আবির মুচকি হেসে ডাকল, “ওগো অপরূপা, চেয়ে দেখো না মনোরমা। ” মেঘ কিংকর্তব্যবিমুঢ়, আবিরের একের পর এক ভাবপ্রবণ কথা শুনে মেঘের অস্থিরতা বেড়েই চলেছে। বুকের ভেতরে চলমান ইতস্ততা কাটিয়ে চোখ পিটপিট করে তাকাল । আবিরের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই আবির অকস্মাৎ স্ব শব্দে হেসে উঠল। আবিরের প্রাণোচ্ছল

হাসি দেখে মেঘ না হেসে পারল না। আবির হাসি থামিয়ে জিভ দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে তপ্ত স্বরে শুধালো, " আমাকে পেয়ে খুশি তো?" মেঘ মাথা দুলিয়ে স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, " আলহামদুলিল্লাহ, অনেক খুশি। আপনি?" আবির আবারও মৃদু হাসলো। মেঘের কোল থেকে উঠে মুখোমুখি বসল। লম্বা নিঃশ্বাস ফেলে মেঘের হাতটা শক্ত করে ধরে কোমল কণ্ঠে বলতে শুরু করল, " আলহামদুলিল্লাহ আজ আমি খুব খুশি। কারণ আমার স্পেরোকে দেয়া কথা আজ পরিপূর্ণভাবে রাখতে পেরেছি। ছোট্ট স্পেরোর সেই আহ্লাদী কণ্ঠে বলা কথাটা, "আমাকে ছেড়ে যেতে পারবে না" স্পেরো ভুলে গেলেও আমি ভুলতে পারি নি। গত ১৬ টা বছর আমি শুধু এই একটা কথার জোরেই সব বিপত্তিতে টিকে ছিলাম। আজ আমার স্পেরোকে আবারও বলতে চাই, আমি ছেড়ে যায় নি কোথাও যায় নি। তোমার আবির তোমারই আছে। তুমি সেদিন শুধু বলেছিলে, "ছেড়ে যেও না" অথচ আমি বুঝেছিলাম "তোমাকে ছেড়ে বাঁচতে পারবো না"। শেষ বিকেলে পাখিদের বাড়ি ফেরার তাড়া দেখে তুমি আবেগী কণ্ঠে বলেছিলে, " ওদের মতো আমারও যদি আলাদা একটা বাড়ি থাকতো।" আর আমি ভেবেছিলাম, "যেকোনো মূল্যেই হোক তোমাকে তোমার স্বপ্নের বাড়ি উপহার দিব" একবার খেলতে গিয়ে পায়ে ব্যথা পেয়েছিলাম বলে তুমি শীতল কণ্ঠে বলেছিলে, "খেলতে না গেলে তো ব্যথা পেতে না" আমি মনে মনে বলেছিলাম, " আজকের পর খেলতে যাব না" । জ্বরের ঘোরে আমার হাতটা আঁকড়ে ধরে তুমি বলেছিলে, "আমার কাছে থাকো" "আমিও

থেকে গেলাম"। কোনো একদিন কোনোকারণে বাসায় আমাকে বকা দিচ্ছিলো দেখে তুমি সবার সামনে আমার হাতটা শক্ত করে ধরে বলেছিলে, " আবির ভাইয়া শুধু আমার তোমরা কেউ কিছু বলতে পারবে না।" "আমি আবির সেদিনই তোমার হয়ে গিয়েছিলাম" নিজের সাথে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম বাঁচলে তোমার সাথেই বাঁচবো। " মেঘ অবিশ্বাস্য চোখে আবিরের অভিমুখে চেয়ে আছে, অতর্কিতেই বেড়েছে বুকের ভেতরের ধুকপুক শব্দ। আবিরের কথাগুলো শুনে মেঘের চক্ষুদ্বয় কোটর ছেড়ে বেড়িয়ে আসতে চাইছে। ফর্সা,লাজুক আদল মুহুর্তেই পরিবর্তন হয়ে গেছে, নাকের ডগায় মুক্তোর মতো বিন্দু বিন্দু ঘাম চিকচিক করছে। মেঘের উদ্বেজিত মনোভাব চোখে মুখে ফুটে উঠছে। যেই আবিরের প্রণয়ে আসক্ত মেঘ, সেই আবির মেঘের কাছেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিল এতগুলো বছর। এটা ভেবেই মেঘের মস্তিষ্কের নিউরনে অনুরণন শুরু হয়েছে। মেঘ অসহায় মুখ করে আবিরের চোখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, " আমি আপনাকে এতকিছু বলেছিলাম?" আবির মেঘের দু'হাত নিজের দু গালে রেখে নিঃশ্বাস টেনে বলল, "হুমমমমমমম" "আমার মনে নেই কেনো?" " কারণ তখন তুমি অনেক ছোট ছিলে। " " আপনি কখনো বলেন নি কেনো?" " ভালোবাসা মুখে বলে হয় না পাগলি, তোমাকে নিজ থেকে অনুভব করতে হতো। আর আমি সেই অপেক্ষাতেই ছিলাম। " মেঘ কপাল কুঁচকে প্রশ্ন করল, " আপনি আমাকে তুমি করে বলছেন কেনো?" " শুনতে খারাপ লাগছে?" "কেমন যেন অস্বস্তি লাগছে।

আপনার মুখে তুই টায় মানায়। ” ” অভ্যাস করো, এখন থেকে তুমিটায় বেশি শুনতে হবে।” “কেনো?” আবির মৃদুস্বরে বলল, ” আমার সম্বন্ধী আমাকে ভয়ঙ্করভাবে ওয়ার্নিং দিয়েছে, বিয়ের পর তোমার সাথে তুই তুকারি করলে আমার নামে মা*ম*লা দিবে। তানভিরের এসব তুই তুকারি একদম পছন্দ না, ওর সাথে কথা বললে সচরাচর তোমাকে তুই বলে সম্বোধন করি না তারপরও ভুলে যদি বলে ফেলি তখন দেখা যায় রাগে সারাদিন আমার সাথে কথায় বলে না। গতকাল রাতে আমাকে লাস্টবারের মতো ওয়ার্ন করেছে যেন কোনোভাবেই তুই না বলি। পার্সোনালি ঘরে দরজা বন্ধ করে তুই বললেও আমার সম্বন্ধী,বাবা মা, শ্বশুর- শ্বাশুড়ি কিংবা কোনো আত্মীয়ের সামনে কোনোভাবেই তুই বলতে পারবো না। ” মেঘ অভিনিবিষ্টের ন্যায় চেয়ে থেকে শান্ত কণ্ঠে শুধালো, ” আপনি ভাইয়াকে ভয় পান?” “না। তোমাকে ভয় পায়। ” “মানে?” আবির মেঘের হাত গাল থেকে নামিয়ে বুকের উপর রেখে বলতে শুরু করল, ” তোমাকে হারানোর ভয়ে আমার এইযে এইখানটা বারংবার কেঁপে উঠে। আবিরকে ধ্বংসের একমাত্র অস্ত্রই মেঘ। তানভির সহ আমার কাছের মানুষজন খুব ভালোভাবে জানে আমার জীবনে তোমার অস্তিত্ব ঠিক কতোখানি জুড়ে। আমাকে কোনোকিছুতে রাজি করাতে ব্যর্থ হলেই ইচ্ছেকৃত তোমার নাম নেয়। কারণ তারা জানে, তুমি আমার একমাত্র দূর্বলতা। এইযে তুমি কতশত কুসংস্কার মানো, কিছু হবে না জেনেও আবেগে নাচো। আমিও ঠিক তেমন, তোমার নামে কিছু শুনলে বুঝে না বুঝে

রিয়েক্ট করি, নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলি। অন্ততপক্ষে তোমাকে নিয়ে তানভিরের সাথে আমি কোনোরকম অসদ্ভাবে জড়াতে চাই না তাই ও যা বলেছে আমি মেনে নিয়েছি।" আবিরের উৎকণ্ঠা দেখে মেঘ প্রতিনিয়ত আশ্চর্যের চূড়ায় পৌছে যাচ্ছে। মেঘ নির্বাক চোখে তাকিয়ে গভীর মনোযোগ দিয়ে আবিরকে দেখছে। আবির কয়েক মুহুর্ত মেঘের মায়াবী আদলে চেয়ে থেকে আনমনে হেসে বলল, " ম্যাম, এভাবে তাকিয়ে আমাকে আগেভাগেই দূর্বল করে দিবেন না। আপনার সাথে আমার অনেক কথা আছে। " আবিরের কথায় মেঘের ভাবনার সুতো ছিঁড়েছে, কপালে ভাঁজ ফেলে মৃদুস্বরে বলল, " কি কথা?" "আগে নামাজ পড়ে রবের কাছে শুকরিয়া আদায় করি তারপর বলবো। যাও, ফ্রেশ হয়ে ওজু করে আসো।" আবির মেঘের হাত ছেড়ে বিছানা থেকে নামছে। এত কথোপকথনের ভিড়ে রিয়া আর জান্নাতের শিখিয়ে দেয়া নিয়মকানুনের কথা মেঘ ভুলেই গিয়েছিল। মেঘ ঝটপট বিছানা থেকে নেমে আবিরের পায়ে হাত দিয়ে সালাম করতে নিল কিন্তু সালাম করার আগেই আবির মেঘের দুই বাহু ধরে উঠিয়ে আলতোভাবে বুকে জড়িয়ে মোলায়েম কণ্ঠে বলল, "তোমার অবস্থান আমার পায়ে নয় হৃদয়ে। আজকের পর কোনোদিন পায়ে হাত দিয়ে সালাম করার চেষ্টাও করবে না। মনে থাকবে?" "জ্বি।" আবির মেঘকে ছেড়ে ড্রেসিং টেবিলের উপর থেকে ফোনটা হাতে নিয়ে ব্যালকনির দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে কিছু একটা করছে। এদিকে মেঘ মনে মনে হাবিজাবি ভাবছে আর ব্যস্ত হাতে

গহনা খুলছে। গলার একটা গহনাকে খুলতে গিয়ে চুলে টান পড়তেই মেঘ ব্যথায় 'উফফ' করে উঠেছে। আবির সহসা ফোন টেবিলের উপর রেখে মেঘের কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, " কি হয়েছে?" " চুলে টান লাগছে। " " হাত সরাও, আমি দেখছি। " মেঘ ভ্রু কুঁচকালো, তবে নিষেধ করল না। আবির খুব মনোযোগ দিয়ে মেঘের চুল সরিয়ে গহনা খুলে দিয়েছে। মাথায় লাগানো ক্লিপগুলো খুলতে খুলতে কর্কশ কণ্ঠে বিড়বিড় করল, " আগেই বলেছি রাতে এত সাজগোছ করতে হবে না তারপরও কেউ কথা শুনে না। " আবিরের ঠান্ডা কণ্ঠের অভিযোগে সম্বিত ফিরল মেঘের। চোখ ঘুরিয়ে আবিরকে এক পলক দেখে হালকা করে কেশে শীতল কণ্ঠে ডাকল, " আবির ভাই.." অকস্মাৎ আবিরের সুপ্ত ক্রোধ চোখে ভেসে উঠেছে, মেঘের দিকে তাকিয়ে চোখ রাঙাতেই মেঘ দাঁত কেলিয়ে হেসে বলল, " মজা করেছি। " আবির প্রতিত্তোরে কিছুই বলল না। মেঘ ওয়াশরুম থেকে ফ্রেশ হয়ে আসতেই আবির চুপচাপ ওয়াশরুমে চলে গেছে। যথারীতি দু'জন একসঙ্গে দু রাকাত নফল নামাজ পড়ে নিয়েছে। নামাজ শেষ করে আবির মেঘের কপালে দীর্ঘ চুমু খেয়ে মেঘকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরলো। আবিরের সারাদিনের সব দুষ্টামি, খুনসুটি হঠাৎ ই পরিবর্তন হয়ে গেছে। কেমন যেন নিশ্চুপ হয়ে গেছে। আবিরের বুকের উপর মাথা থাকায় মেঘ স্পষ্টভাবে আবিরের হৃৎস্পন্দন টের পাচ্ছিল। মেঘ হঠাৎ ই তটস্থ কণ্ঠে শুধালো, " কি হয়েছে আপনার? আপনি কি কোনো বিষয় নিয়ে চিন্তিত?" আবির ঘন ঘন ঢোক গিলছে, মেঘকে বিছানার পাশে বসিয়ে

আবির ফ্লোরে বসল । মেঘ ব্যাকুল কণ্ঠে বার বার প্রশ্ন করছে, আবির উত্তর না দিয়ে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইলো। আবির আচমকা বসা থেকে উঠে ওয়ারড্রব থেকে একটা ছোট বক্স বের করল। 'Abir' নাম লেখা একটা ডিজাইনিং লকেট বের করে মেঘের গলায় পড়িয়ে দিতে দিতে মৃদু স্বরে বলল, " এটা বাসর রাতের গিফট।" মেঘ তৎক্ষনাৎ লাফিয়ে উঠে বালিশের নিচ থেকে একটা ঘড়ির বক্স বের করে আবিরকে দিয়ে বলল, " এটা আপনার জন্য। " আবির কপাল কুঁচকে প্রশ্ন করল, " বাসর রাতে গিফট দিতে হয় এটা তোমাকে কে বলেছে?" "রিয়া আপু , জান্নাত আপু তাছাড়া আমার বান্ধবীরাও বলেছে। " "আর কি কি বলেছে? " " আরও অনেক কিছু ।" আবির ভ্রু গুটিয়ে ধীর হস্তে কপাল চাপড়ে শক্ত কণ্ঠে বলল, " ইসস! আমার বউটাকে ওরাই নষ্ট করছে।" মেঘ ঠোঁট কামড়ে বিড়বিড় করল, " মোটেই না।" আবির ঘড়িটা দেখে মুচকি হেসে বলল, " পড়িয়ে দাও।" "এখন?" "হুমমমম।" মেঘ ঘড়িটা পড়িয়ে দিয়ে আহ্লাদী কণ্ঠে শুধালো, "পছন্দ হয়েছে?" " হুমমমমমমম। আমার একমাত্র বউয়ের দেয়া গিফট পছন্দ তো হবেই। " আবির তপ্ত স্বরে ফের বলল, "তোমার জন্য আরও সারপ্রাইজ আছে।" "কি?" আবির একটা অ্যালবাম বের করে মেঘের হাতে দিল। অ্যালবামের সর্বপ্রথম ছবিটা আবির আর মেঘের বিয়ের। দু'জন পাশাপাশি বসা, মেঘ ঘাড় কাত করে আবিরের বাইসেপে রেখেছে আবির মেঘের মাথায় উপর নিজের মাথা কাত করে রেখেছে। দু'জনের এক হাত সামনের দিকে ।

আবিরের হাতের তালুতে মেহেদী দিয়ে লেখা ‘মেঘের আবির’ আর মেঘের হাতে লেখা ‘আবিরের মেঘ’। মেঘ ছবিটা দেখে মৃদু হেসে অ্যালবাম খুলেছে। মেঘের জন্মের পর আবিরের প্রথম কোলে নেয়ার ছবি, মেঘের ছয় মাস, এক বছর, দুই বছর বয়স থেকে শুরু করে বিয়ে পর্যন্ত আবিরের সাথে যতছবি ছিল সবই অ্যালবামে আছে। মেঘ মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে ছবিগুলো দেখছে, আবির পাশে দাঁড়িয়ে ছবিগুলোর বর্ণনা দিচ্ছে। ছোটবেলার ছবিগুলো ফ্যামিলি অ্যালবাম থেকে সংগ্রহ করা। কোন ছবি কখন, কি অবস্থায় কাকে দিয়ে উঠিয়েছিল সবই আজ নির্দ্বিধায় বলছে। মেঘ নিস্তব্ধ হয়ে ছবিগুলো দেখছে আর আবিরকে দেখছে। মাঝখানে ৯ বছরের একসাথে ছবি না থাকলেও লাস্ট ২ বছরের ছবিতেই তার উসুল তুলে ফেলেছে। যার মধ্যে হাতে গুনা কয়েকটা ছবি মেঘ নিজের ইচ্ছেতে তুলেছিল বাকি সব আবিরের পার্সোনাল ফটোগ্রাফার তুলে দিয়েছে। অ্যালবাম দেখা শেষ হতেই মেঘ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়লো। আবির মৃদুস্বরে জিজ্ঞেস করল, “রাগ করেছো?” মেঘ ঠোঁট ফুলিয়ে চেয়ে আছে। আবির নিরেট কণ্ঠে বলল, ” রাগ করো না, প্লিজ। এটা দেখে রেগে গেলে পরের গুলো তো বলতেই পারব না।” ” পরে কি?” আবির একটা চাবির গোছা মেঘের হাতে দিয়ে বলতে শুরু করল, ” আজ থেকে এই চাবির গোছাটা তোমার। এখানে আমার রুমের প্রতিটা তালাবদ্ধ জিনিসের চাবির পাশাপাশি আমার অফিসের সব চাবি আছে। তুমি আমার অর্ধাঙ্গিনী তাই আজ থেকে আর কোনো লুকোচুরি নয়। আমার যা কিছু

আছে সবকিছুতে তোমার অধিকার আছে।” মেঘ আজ হতবিহ্বল। যে আবির নিজের জিনিসপত্র কখনো কাউকে ছুঁতে দেয় না, রুমে ঢুকতে দেয় না, সব কিছুতে তালা দিয়ে রাখে সে আজ নিজের হাতে সব দায়িত্ব মেঘকে দিয়ে দিচ্ছে। আবিরের এত পরিবর্তন মেঘ স্তব্ধ চোখে কেবল দেখেই যাচ্ছে। আবির অকস্মাৎ মেঘের মুখোমুখি দাঁড়ালো। আচমকা ধপ করে মেঘের পায়ের কাছে বসে পরেছে, আবিরের গায়ে যেন পা না লাগে তারজন্য মেঘ সঙ্গে সঙ্গে পা সরিয়ে থমথমে কণ্ঠে শুধালো, “কি হয়েছে আপনার?” আবির পেছন থেকে একটা সুন্দর গিফট বক্স বের করে মেঘের হাতে দিল। মেঘ ভ্রু কুঁচকে প্রশ্ন করল, ” কি এটাতে?” “দেখো।” বক্স খুলতেই ২ টা ব্যাংক চেক চোখে পরেছে, মেঘ এমাউন্টও ঠিকমতো খেয়াল করে নি। কৌতূহল বশত চেক তুলে বিস্ময় সমেত তাকালো । বক্সে স্বর্ণের বেশ কিছু গহনা। মেঘ বার বার আবিরের দিকে তাকাচ্ছে, আবিরের ঠোঁটে মলিন হাসি। মেঘ গহনা গুলো তুলে বিছানার পাশে রাখছে। কাগজের মতো কিছু লাল ফিতা দিয়ে প্যাঁচানো দেখে মেঘ স্বাভাবিকভাবে খুলতে নিল, খুলতেই দেখল এটা একটা দলিল। কিছুটা পড়ার পড় বুঝতে পারলো কোনো একটা জায়গা আবির মেঘের নামে করে দিয়েছে। মেঘ আশ্চর্য নয়নে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, ” এসবের মানে কি?” আবির মুচকি হেসে বলল, ” Sparrow’s Dreamhouse তোমার বাড়ি, একান্তই তোমার। সেখানে আমার কোনো অধিকার নেই।” মেঘ কিঞ্চিৎ রাগী স্বরে বলল, ” অধিকার যদি না ই থাকবে তাহলে আমার বাড়ি আপনি

আমাকে না জানিয়ে কেনো করেছেন? আগে আমাকে বললেন না কেনো?" " শুরুতে জানানোর মতো পরিস্থিতি ছিল না।" "কেনো?" " সময় টা ছিল ডিসেম্বর মাস, মাইশা আপুর বিয়ে থেকে মালার কারণে তোমাকে জোর করে নিয়ে আসছিলাম। আমি অফিস থেকে এসে তোমাকে সময় নিয়ে বুঝাতে চেয়েছিলাম মালার সাথে আমার কিছুই নেই অথচ তুমি আমার আসা পর্যন্ত জাস্ট ১০ মিনিট অপেক্ষা করতে পারলে না। আমাকে গুরুত্ব না দিয়ে মিনহাজদের গুরুত্ব দিয়েছিলে। তারজন্য তোমার প্রতি অভিমান হয়েছিল। সেই অভিমান তোমার আব্বুর কথায় জেদে পরিণত হয়েছিল। ওনার মেয়েকে রাণীর মতো রাখতে গেলে আগে রাণীর স্বপ্নগুলো পূরণ করা জরুরি ছিল। সেই রাতেই ৩-৪ দিনের জন্য চলে গেলাম, দিনরাত এক করে সবকিছু রেডি করে আসছি। যেদিন বাসার কাজ শুরু করব তার আগের দিন থেকে আপনাকে এতমতে রিকুয়েষ্ট করলাম কিন্তু তুমি এতটায় জেদি যে কোনোভাবেই যেতে রাজি হলে না। তোমাকে সারপ্রাইজ দিতে চেয়েও দিতে পারলাম না তাই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম বাসার কাজ পুরোপুরি শেষ করেই জানাবো।" মেঘ শক্ত কণ্ঠে বলল, " ইশশ! মিস করলাম।" "বাকিগুলো দেখে শেষ করো।" মেঘ আবারও বক্স হাতে নিল। কিছু চিরকুট, আবিরের অফিসের কিছু ডকুমেন্টসের সাথে কয়েকটা ৫০০ আর ১০০০ টাকার বান্ডিল। এত এত টাকার বান্ডিল দেখে মেঘ আশ্চর্যান্বিত নয়নে তাকিয়ে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে শুধালো, "এত টাকা কার?" আবির মোলায়েম কণ্ঠে বলল, "তোমার। " "মানে? এত

টাকা দিয়ে আমি কি করব?" " এগুলো সব কাবিনের।" মেঘ ধীর কণ্ঠে বলতে শুরু করল, " আমি যতদূর শুনেছি, কাবিন বউয়ের পরিবার অথবা বউয়ের ইচ্ছে অনুযায়ী দিতে হয়। আমি বউ হয়ে বলছি, আমার কাবিনের কোনো প্রয়োজন নেই। আমি আপনাকে চেয়েছি, আলহামদুলিল্লাহ আপনাকে পেয়ে গেছি। আমার আর কিছুই চাওয়ার নেই। আপনার এত এত গিফট, টাকা, ব্যাংক চেক এসবের কোনো কিছুই চাই না। বিয়েতে কাবিন যদি আবশ্যক হয় তবে আমি কাবিন হিসেবে আপনাকে চাইব, আমৃত্যু শুধু আপনাকেই চাইব।" মেঘের দুচোখ ছলছল করছে, নিজেকে সংযত করতে তাড়িত শ্বাস টানলো। আবির দুর্বোধ্য নেত্রে মেঘের মায়াবী আননে চেয়ে আছে। অল্পতে লজ্জায় আড়ষ্ট হওয়া মেয়েটার অদম্য কণ্ঠের আকাঙ্ক্ষা শুনে আবির শীতল চোখে চেয়ে মুচকি হাসলো। মেঘ এতক্ষণ কি বলেছে নিজেও জানে না, আবিরের অন্যরকম চাহনিতে কিছুটা লজ্জা পেয়েছে। আবির চোখমুখ গুটিয়ে শান্ত কণ্ঠে শুধালো, " যা দিয়েছি সবকিছু সহ আবির যদি তোমার হয় তাহলে কাবিন নিয়ে কি তোমার আর কোনো আপত্তি আছে?" মেঘ সঙ্গে সঙ্গে আবিরের দিকে তাকিয়ে শ্বাস ছেড়ে ঠোঁট ফুলিয়ে নিষ্পাপ কণ্ঠে বলে উঠল, " আমার আবির হলেই হবে।" আবির ভ্রু উঠাতেই মেঘ থতমত খেয়ে বলল, " সরি সরি সরি, আপনাকে হলেই হবে। " "আমি তো তোমার ই। বাকি যা দিয়েছি ঐ সবও তোমার। এগুলোর পর কাবিন হিসেবে তোমার কি আমার কাছে আর কিছু চাওয়ার আছে? " মেঘ সাবলীল ভঙ্গিতে বলল, " আমার

আর কিছুই লাগবে না।” “মনে কষ্ট থাকবে না তো?” মেঘ একগাল হেসে বলল, ” আমার মনে কষ্টের ছিটেফোঁটাও নেই কারণ আপনাকে পেয়ে গেছি যে।” আবির অনুগ্র হেসে টেবিলের উপরে রাখা একটা বই থেকে কাগজ এনে মেঘের হাতে দিল। তেমন একটা গুরুত্ব না দিয়েই মেঘ জিজ্ঞেস করল, ” কি এগুলো?” “পড়ো।” মেঘ বিড়বিড় করে পড়ছে, কিছুটা পড়তেই বুঝতে পারলো এটা কাবিননামার কপি। মেঘ সঙ্গে সঙ্গে নিচে তাকালো। বরের স্বাক্ষরের জায়গায় ‘সাজ্জাদুল খান আবির’ লেখা আর কন্যার স্বাক্ষরের জায়গায় ‘মাহদিবা খান মেঘ’ বিবাহ রেজিস্ট্রী করার তারিখ: ০৩/০২/২০– যা আজ থেকে আরও তিন বছর আগের। এটা দেখে মেঘ বিস্তীর্ণ চোখে তাকিয়ে এক হাতে নিজের মুখ চেপে ধরেছে। মেঘের হাত থরথর করে কাঁপছে, কান দিয়ে গরম হাওয়া বের হচ্ছে, মস্তিষ্কে বিদ্যমান স্নায়ুগুলো ধপধপ করে কাঁপছে, বুকের ভেতরটা দুরু দুরু কেঁপেই চলেছে, নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না। মেঘ শশব্যস্ত চোখে আবিরের দিকে তাকালো। আবির নিরুদ্বেগ ভঙ্গিতে মেঘকে দেখছে আর নিজের বুকে হাত রেখে অনুচ্চ স্বরে দোয়া পড়ছে। মেঘের গলায় আটকানো নিঃশ্বাস টা অতি সন্তর্পণে বেড়িয়ে আসছে, মুখ ফুলিয়ে শ্বাস টেনে জিভ দিয়ে ঠোট ভিজিয়ে থমথমে কন্ঠে প্রশ্ন করল, ” এগুলো কি সত্যি? ” আবির ঢোক গিলে ধীরস্থির কন্ঠে বলল, “হুমমমমমমম। আইনের চোখে আমাদের বিয়ের তিনবছর পূর্ণ হয়ে গেছে, গতকাল চতুর্থ বছরে পদার্পণ করেছি। তোমাকে আগেই বলেছিলাম, তুমি আমারই। কেউ

তোমাকে আমার থেকে আলাদা করতে পারবে না। কেউ যদি আমার সাথে ঝামেলা করতেও চাইতো, আমি সরাসরি কাবিননামা দেখিয়ে দিতাম।” মেঘ ভাবনাচিন্তা ছাড়াই আচমকা বলে উঠল, ” এটা কিভাবে সম্ভব?” আবির শক্ত কণ্ঠে বলতে শুরু করল, ” আমি দেশ ছাড়ার মাসখানেক আগে তানভিরকে তোমার ব্যাপারে সব বলেছিলাম। সে আমার আবেগ, অনুভূতি দেখে প্রথমদিকে মেনে নিলেও পরবর্তীতে ওর মনে কিছুটা খটকা সৃষ্টি হয়েছিল কারণ শত হলেও সে তোমার আপন ভাই। তোমার প্রতি তার দায়িত্ব, ভালোবাসা অন্য লেবেলের যেটা আমার প্রতি হাজার থাকলেও তোমার সমান নয়। বলতে গেলে তানভির, আমি দুজনেই তখন অপ্রাপ্তবয়স্ক। মজার ছলেই হোক কিংবা গভীর চিন্তা থেকেই, তানভির একদিন হুট করে বলে বসে, ” ভাইয়া, তুমি বনুকে এখন পছন্দ করো মানলাম, আমি ওকে দেখেও রাখলাম কিন্তু ৭ বছর পর তোমার মন মানসিকতা যে এরকম থাকবে তার কি গ্যারেন্টি আছে? তখন যদি বনুর প্রতি এখনকার মতো অনুভূতি না থাকে?” তানভিরের কথা শুনে আমার মনে চিন্তন জাগে। আমি নিজেও কখনো সেভাবে ভেবে দেখি নি তাই ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নিলাম তোমাকে বিয়ে করব। কেনো সেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম আমি নিজেও জানি না শুধু মনে হয়েছিল তানভির যা বলেছে একদম ঠিক বলেছে। তানভির মজার ছলে বললেও আমি দুশ্চিন্তায় ঘুমাতে পারছিলাম না। তানভিরকে জানানোর পর সে খুব রিকুয়েষ্ট করেছে যেন বিয়ের ঝামেলা না করি, ও এমনিতেই এসব বলেছিল আরও অনেককিছু।

আমার মাথায় তখন কিছুই ঢুকছিল না, আমার কাছের বন্ধুর বাবা কাজী তাই তৎক্ষনাৎ খোঁজ নিলাম। তোমার বয়স অনেক কম ছিল, তখন তোমার আমার প্রতি তীব্র ঘৃণাও ছিল সব মিলিয়ে তখন বিয়ে সম্ভব ছিল না। তাছাড়াও কিছু নিয়মনীতি ছিল যার কারণে আংকেল কোনোভাবেই রাজি হয়তেছিল না। কিন্তু তখন আমার একটায় জেদ ছিল যেভাবেই হোক বিয়ে আমার করতেই হবে। আংকেলকে বিস্তারিত বুঝিয়ে খুব কষ্টে রাজি করিয়ে, রাকিব, তানভির আর সুজনের উপস্থিতিতে বিয়ের কাজ সম্পন্ন করে দেশ ছাড়ি।" আবির দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে পুনরায় বলতে শুরু করল, " বিশ্বাস করো, আমি তখন কোনোকিছু ভাবি নি, এতকিছু বুঝি নি। শুধু বুঝেছিলাম তোমাকে আমার লাগবে সেটা যেকোনো মূল্যেই হোক। মস্তিষ্কে শুধু একটা চিন্তায় ঘুরপাক খাচ্ছিল, তোমাকে বৈধতার চাদরে মোড়ানো। পাওয়া না পাওয়ার মাঝে আমি তখন বাস্তবিক জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম, ভবিষ্যতে কি হবে বা হতে পারে সব ভুলে গিয়েছিলাম। বিয়ে পরিপূর্ণ হবে না জেনেও আবেগের তাড়নায় বিয়ে করেছিলাম।" নিশ্চুপ মেঘ এবার মুখ খুলল। কিছুটা বিস্মিত হয়ে জানতে চাইল, " আমার সাইন কে দিয়েছিল?" "তুমি। " "কিভাবে? আমি তো এসবের কিছুই জানতাম না।" "মনে আছে তানভির একদিন ঘুরতে নিয়ে তোমাকে বিয়ের কথা বলেছিল?" "হ্যাঁ, মনে আছে। আমাকে এমন ই একটা কাগজে সাইন করতে বলেছিল। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম এটা কিসের কাগজ? ভাইয়া বলেছিল বিয়ের। আমি তখন সেভাবে গুরুত্ব ই

দেয় নি, ভেবেছিলাম ভাইয়া মজা করছে।” আবির কপাল গুটিয়ে জানতে চাইল, ” কেনো আমার নাম বলেছিল মনে নেই?” “হ্যাঁ, এটাও মনে আছে। বিয়ের কথা বলায় আমি যখন হাসছিলাম তখন ভাইয়া জিজ্ঞেস করছিল আমাকে যার তার কাছে বিয়ে দিলে আমার আপত্তি আছে কি না। আমিও সুন্দর করে বলেছিলাম, কোনো আপত্তি নেই তুমি যাকে বলবা তাকেই বিয়ে করে নিব। আমার সত্যি ই তখন কোনো আপত্তি ছিল না কারণ তখন আমার জীবনে আপনি ছিলেন না। আমার চোখে আমার ভাই ই সবার সেরা ছিল, সে যা বলতো আমি সবকিছু মেনে নিতাম। ভাইয়া তখন আপনাকে বিয়ে করার কথা বলেছিল আর আমি ভাইয়ার কথায় আপনাকে বিয়ে করতেও রাজি হয়ে গিয়েছিলাম। আমি ভেবেছিলাম ভাইয়া মজা করছে তাই যা বলেছিল সবেতেই হ্যাঁ হ্যাঁ করে সাইনও করে দিয়েছিলাম। তারপর ভাইয়ার সাথে এ বিষয়ে আমার আর কোনোদিন কথা হয় নি। ভাইয়া কিছু বলে নি আর আমি তো সেই ঘটনা বেমালুম ভুলেই গিয়েছিলাম। ” আবির মলিন হেসে বলল, ” ঐদিন ই তোমার আমার সাথে বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। তানভিরের সাথে সাথে সেখানে কাজী সাহেব, সুজনরাও উপস্থিত ছিল তাছাড়া ফোনে আমিও ছিলাম।” মেঘ হা হয়ে আবিরের দিকে তাকিয়ে আছে। আবির গলা খাঁকারি দিয়ে আবারও বলতে শুরু করল, ” আমি সাইন করায় দিনই তোমাকে বউ হিসেবে কবুল করেছিলাম কিন্তু তোমারটা বাকি ছিল। তোমাকে বিস্তারিত বুঝানোর পরিস্থিতি ছিল না তাই তানভির যেভাবে পেরেছে

ম্যানেজ করেছে। আমার কথা ছিল, যেহেতু তোমার সাথে তখন মানসিক বা শারীরিক কোনো সম্পর্কে আমি জড়াবো না তাই শুধু আইনী কাজ টা সম্পন্ন করে রাখবো। বাসায় এসে যেভাবেই হোক তোমাকে পটিয়ে, বাসার সবার অনুমতি নিয়ে তোমাকে বিয়ে করব। আমি নির্বোধ ছিলাম কারণ আমি তখনও আবেগে গা ভাসাচ্ছিলাম। আমাদের বিয়ে আইনী ভাবে নিবন্ধিত হয়ে গিয়েছিল, আমার এত বছরের ভালোবাসাকে আইনী স্বীকৃতি দিতে পেরে মনে সুখের হাওয়া বইছিল। আমার আকাশে বাতাসে বিয়ের আমেজ ছিল কিন্তু সেই আমেজ বেশিদিন থাকলো না। মাস তিনেকের মধ্যে ফুপ্পির কথা জানতে পারি আর তখনই আমার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে। তানভিরের সাথে ঘটে যাওয়া ঘটনায় ভীত হয়ে আমি আইনী স্বীকৃতির জন্য জোরাজোরি করেছিলাম কিন্তু ফুপ্পির কথা শুনে সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। যেখানে ফুপ্পির প্রেমের সম্পর্ক জেনেও মানে নি সেখানে আমি কাউকে না জানিয়ে বিয়ে করে ফেলেছি। আমার বিয়েটা কোন লেবেলের অপরাধের কাতারে পড়বে সেটা ভেবেই আঁতকে উঠছিলাম। এত বছরে নিজের মনে জমে থাকা স্বপ্নগুলোকে পিণ্ডীভূত করে যে কাঁচের বাড়িটা বানিয়েছিলাম সেই বাড়িটা মনের ভেতরে ঘটে যাওয়া আকস্মিক ভূমিকম্পে তছনছ হয়ে গিয়েছিল। নিজের সাজানো স্বপ্ন ভাঙার সাথে সাথে ভেঙেছিল তোমাকে দেখার সব আকাঙ্ক্ষা। নিজের আক্ষেপে নিজেই পুড়ছিলাম। কিছু সময়ের জন্য মনে হয়েছিল পৃথিবী ছেড়ে চলে যায় কিন্তু শেষ সময়েও তোমাকে দেয়া কথাটা আমার

কানে বাজছিলো, “আমাকে ছেড়ে যেতে পারবে না” সেই আদুরে আনন আমাকে মৃত্যুর দ্বারপ্রান্ত থেকে টেনে এনেছিল। শুধুমাত্র তোমার কথা ভেবে নতুনভাবে নিজেকে তৈরি করছিলাম, কিন্তু বুকে ছিল আকাশ সমান ভয়। বাসায় বিয়ের কথা জানলে তোলপাড় শুরু হবে এটা খুব ভালোই বুঝেছিলাম, তোমাকে নিয়ে আলাদা থাকার যোগ্যতাও আমার ছিল কিন্তু তুমিই যে আমার ছিলে না। তুমি এমনিতেই ৭-৮ বছর যাবৎ আমার সাথে কথা বলছিলে না। ঐ অবস্থায় কোনোক্রমে যদি শুনতে পারতে যে তোমার সাথে আমার বিয়ে হয়ে গেছে তখন আব্বু চাচ্চু কি করতো জানি না কিন্তু তুমি হয় আমাকে খু*ন করতে, নয়তো নিজে সু*ই*সাই*ড করতে আর না হয় লাস্ট অপশন ছিল ডি*ভো*র্স। তোমার জেদকে আমি বরাবর ই ভয় পায়, তখনও খুব ভয় পেয়েছিলাম। তুমি ভুলক্রমে কিছু বললেও সেটা তুমি করেই ছাড়তে। বাসায় ফিরে ৩ মাস কিংবা ৬ মাসের মধ্যে বিয়ে করার স্বপ্ন আড়ালেই হারিয়ে গেল। সেই থেকে আমার আতঙ্ক শুরু হলো, তানভির, রাকিব দু’জনকে খুব জোর করে বললাম ভুল করেও যেন বিয়ের টপিক না উঠায়, বিয়ের কথা যেন মন থেকে ভুলে যায়। অনাকাঙ্ক্ষিত কারণে ৬ মাস আগে দেশে ফিরলাম, তখন সব ভুলে তোমাকে আমার প্রেমে পড়তে বাধ্য করলাম। প্রতিনিয়ত নিজের আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করে তোমাকে অনুভব করাতে লাগলাম। আলহামদুলিল্লাহ বছরখানেকের মধ্যে আমি সফলও হয়ে গেলাম। আমার এক্সিডেন্টের পর তোমার আবেগ জড়ানো কথাগুলো শুনে

তোমার ভালোবাসার পুরোপুরি নিশ্চয়তা পেয়েছিলাম। বাসার পরিস্থিতি, তোমার পরিস্থিতি দেখে তখন দ্বিতীয়বার উপলব্ধি করেছিলাম আমি আবেগের বশে ঠিক কত বড় ভুলটা করেছিলাম। আম্মুর বার বার জানতে চাওয়া, আমার কোনো পছন্দ আছে কি না, আব্বুর একই প্রশ্ন পরোক্ষভাবে জিজ্ঞেস করা সেই সাথে তোমার অতিরিক্ত যত্নে আমি পাগলপ্রায় হয়ে উঠেছিলাম। তখন বুঝেছিলাম, আমার বাবা মা আমাকে খুব ভালোবাসে, তাদের ইচ্ছাশক্তি এতটায় প্রবল যে আমি চাইলে তারা পৃথিবীর সবকিছু আমার সামনে হাজির করতে পারে সেখানে তোমাকে আমার সাথে বিয়ে দেয়া তেমন কোনো বিষয় ই না। বরং তোমাকে চাইলে আব্বু আম্মু খুশিই হতো। কিন্তু ওনারা তো জানতো না যে আমি ওনাদের হৃদয় আগেই ভেঙে ফেলেছি আর না তুমি কিছু জানতে। ঐ পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে আমার বিয়ের কথা বলাটা কোনোভাবেই সম্ভব ছিল না আর না সম্ভব ছিল বিয়ের ঘটনা লুকিয়ে নতুন করে বিয়ে করা। তাছাড়া তখনও তোমার স্বপ্নের বাড়ি গিফট করা বাকি, তোমাকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করাটাও বাকি ছিল। গত রমজানের আগে হুট সবার সামনে একদিন আমার বিয়ের কথা উঠল, তোমার আব্বু আগুনে ঘি ঢালার মতো কোথাকার কোন মেয়ের কথা বলল। আমি মেজাজ হারিয়ে বললাম ১ বছর বিয়েই করব না। আমি তাদের কিভাবে বুঝাতাম আমি যে তোমাকে বিয়ে করে ফেলেছি। তারপর রাকিবের বিয়ে ঠিক হলো, তখনও আব্বু আমাকে কথা শুনালো। এমনকি আমার নিজেরও খারাপ লাগছিল কারণ আমি যখন

থেকে তোমাকে ভালোবাসি তারপর থেকেই বলছিলাম আমি যেভাবেই হোক রাকিবের আগে বিয়ে করব। বিয়ে করেও ছিলাম কিন্তু কাউকে বলতে পারছিলাম। আবেগ আর কষ্টগুলো নিজের ভেতর চাপিয়ে রাখতে রাখতে আর পারছিলাম না। রাকিবের গায়ে হলুদের রাতে ফুপ্পিকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে শুধু একটা কথায় বলছিলাম, 'আমি ভুল করেছি, খুব বড় ভুল করেছি। সেই ভুলের শাস্তিস্বরূপ মেঘকে আমার থেকে কেড়ে নিও না। আমি মেঘকে ছাড়া বাঁচতে পারবো না।' ফুপ্পি নিরূপায় ছিল, আমার কান্না দেখে তবুও কয়েকবার আব্বুকে বলার চেষ্টা করেছে কিন্তু সাহস করে বলে উঠতে পারে নি। তারপর শুরু হলো তোমার আব্বুর ছেলে দেখা, বাধ্য হয়ে বাসায় রাগারাগি করলাম। তোমার বাসার কাজ শেষ করতে প্রজেক্টের দায়িত্ব নিয়ে দেশের বাহিরে গেলাম। বিয়ের কথা বাসায় বলার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। আমার পুরোপুরি টার্গেট ছিল ১ তারিখ তোমাকে প্রপোজ করবো, রাতে বাসায় বিয়ের কথা বলব, বাসায় মানলে ২ তারিখ ধুমধাম করে গায়ে হলুদ হবে, না মানলে তোমাকে নিয়ে বাড়ি ছাড়বো। মাঝখান থেকে তুমি ৩ দিন আগে প্রপোজ করতে বের হয়ে সবকিছু এলোমেলো করে দিয়েছিলে। তবে যাই হোক রবের কাছে হাজারো শুকরিয়া যে কোনো ঝামেলা ছাড়ায় তোমাকে পেয়ে গেছি।" মেঘ হতবিহবল, পাথরের মতো বসে আবিরের মুখের পানে চেয়ে আছে। কিছু জিজ্ঞেস করা বা বলার ভাষা হারিয়ে ফেলেছে। আবির দেয়াল ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সময় দেখল।

মেঘের হাত থেকে কাগজ নিতে নিতে মেঘের মসৃণ গালে চুমু খেয়ে হঠাৎ ই পুরু কণ্ঠে বলে উঠল, " বউ, আমি তোমাকে ৫ মিনিট দিচ্ছি। এরমধ্যে টাশকি খাওয়া মুড থেকে বেড়িয়ে রোমান্টিক মুডে আসো। আমার বুকের ভেতর প্রেম ভালোবাসা ফুটন্ত গরম পানির মতো টগবগ করতেছে। তুমি রোমান্টিক মুডে না আসলে আমার অন্তর পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে। তুমি কি তাই চাও?" মেঘ নির্বাক চোখে আবিরের দিকে তাকালো। আবির নিঃশব্দে হেসে চোখ টিপলো। আবিরের নির্লজ্জ মার্কা কথা আর কাণ্ড দেখে মেঘ না পারতেও কিঞ্চিৎ হাসল। সকালে নাস্তার টেবিলে আবির আর মেঘ ব্যতীত সকলেই উপস্থিত, বন্যাও আজ সবার সাথে খেতে বসেছে। ইকবাল খান ধীর কণ্ঠে শুধালো, "আবির আর মেঘ কি এখনও উঠে নি?" মালিহা খান মীমকে উদ্দেশ্য করে বলল, " মীম, দেখে আয় তো।" মীম সঙ্গে সঙ্গে উঠে গেল। আবিরের রুমের দরজায় ডাকতে গিয়ে খেয়াল করল দরজা খোলা, রুমে মেঘ আবির কেউ নেই। মীম রুমের ভেতরে ঢুকে ভালোভাবে দেখল। সহসা বাহিরে এসে উচ্চস্বরে বলল, " ভাইয়া, আপু কেউ ই রুমে নেই।" আলী আহমদ খান সঙ্গে সঙ্গে তানভিরের দিকে তাকালেন। তানভির আতঙ্কিত কণ্ঠে বলল, " আমি সত্যিই কিছু জানি না। "বন্যা ভ্রু কুঁচকে সন্দেহের দৃষ্টিতে তানভিরের দিকে তাকিয়ে আছে। তানভির চোখ ঘুরিয়ে বন্যার চোখের পানে তাকিয়ে শুকনো ঢোক গিলল। বন্যা মুখ ফুলিয়ে আলগোছে ভ্রু নাচালো। তানভির এমনভাবে ঠোঁট উল্টালো যেন সে কিছুই জানে না।

মোজাম্মেল খান স্বাভাবিক কণ্ঠে বললেন, “ওরা আর কোথায় যাবে! হয়তো ছাদে আছে।” তানভির ফোন বের করে আবিরের নাম্বারে কল দিল। আবির কল রিসিভ করে মৃদু হেসে বলল, “আসসালামু আলাইকুম সম্বন্ধী সাহেব।” তানভির গম্ভীর কণ্ঠে বলল, “ওয়ালাইকুম আসসালাম। কোথায় তোমরা?” “পালাচ্ছি।” “মানে?” “তোদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে গেছি তাই চলে যাচ্ছি।” “কিন্তু যাচ্ছো কোথায়?” “হানিমুনে, বউ ঘুমাচ্ছে এখন রাখছি।” আবির সঙ্গে সঙ্গে কল কেটে দিয়েছে, তানভির ফোনের স্ক্রিনে তাকিয়ে চাপা নিঃশ্বাস ছাড়লো। চলন্ত ট্রেনের ঝাঁকি সাথে আবিরের অল্পবিস্তর কথার শব্দে মেঘ ঘুম ঘুম চোখে তাকিয়ে নিজেকে আবিরের কোলে আবিষ্কার করল। আবির মুচকি হেসে বলল, “শুভ সকাল, বউ” মেঘ আশেপাশে চোখ ঘুরিয়ে ভালোভাবে দেখে, চিন্তিত স্বরে জানতে চাইল, ” আমরা কোথায় যাচ্ছি?” “কক্সবাজার” মেঘ প্রশস্ত নেত্রে আবিরের মুখের পানে তাকিয়েছে। আবির আলতো হাতে মেঘের চুলে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে আর মিটিমিটি হাসছে। আবিরের দুষ্টুমিপূর্ণ হাসি দেখে মেঘের স্নেহব্যঞ্জক প্রদোষের একের পর এক আবেগপ্রবণ দৃশ্য মনে পড়তে শুরু করেছে। দীর্ঘায়ত গত রাত ছিল আবিরের অত্যুষ্ণ অনুরাগ প্রকাশের রাত, নিজের অন্তর্নিহিত আবেগ, অনুভূতি জাহির করার রাত। অব্যক্ত অনুভূতি প্রকাশে চুল পরিমাণ কঞ্জুসপনাও করে নি সে। প্রায় শেষ রাতের দিকে আবিরের সন্তপ্ত ভালোবাসা অন্ত ঘটে। শাওয়ার নিয়ে ফজরের নামাজ পড়ে আবির মেঘকে একটা হালকা

বেগুনি রঙের শাড়ি পড়িয়ে, নিজের হাতে সাজিয়ে সযত্নে ঘুম পারিয়ে দিয়েছিল, সেই ঘুম ভেঙেছে এখন। মেঘের নির্বাক চোখের চাহনিতে আবির আচমকা ভ্রু নাচালো। মেঘ লাজুক হেসে সঙ্গে সঙ্গে দুহাতে মুখ লুকিয়ে ফেলেছে। আবির অত্যন্ত শীতল কণ্ঠে শুধালো, "এখনও এত লজ্জা পেলে হবে?" লজ্জায় অসাড় মেঘ মুখ ফুটে আর কিছুই বলতে পারল না। খান বাড়িতে কিছু সময় নিরবতা চলল। জান্নাত, রিয়া, আইরিন, মীম, বন্যা সবাই একে অপরের মুখের পানে চেয়ে আছে। তানভির মাথা নিচু করে বসে আছে। আলী আহমদ খান গুরুগম্ভীর কণ্ঠে শুধালেন, "ওরা কোথায় যাচ্ছে? " তানভির ধীর কণ্ঠে জবাব দিল, " ঘুরতে।" " আমাদের বললে কি আমরা পাঠাতাম না? এভাবে কাউকে না বলে যাওয়ার কি ছিল?" মাহমুদা খান তপ্ত স্বরে বললেন, "আমি ভোরবেলা উঠে তো দরজা বন্ধই দেখলাম, ওরা গেল কিভাবে?" আলী আহমদ খান সবার দিকে এক পলক তাকিয়ে ভারী কণ্ঠে বললেন, " বাসার কেউ না কেউ অবশ্যই জানতো। " আলী আহমদ খান মুখ ফুলিয়ে শ্বাস ছেড়ে বিড়বিড় করছেন। বাড়িতে এখনও কমবেশি মেহমান আছেন, তারমধ্যে ছেলে আর ছেলের বউ বাড়ি থেকে চলে গেছে বিষয়টা ওনার ঠিক পছন্দ হচ্ছে না। মোজাম্মেল খান মেকি স্বরে বললেন, " ভাইজান কি রাগ করলে নাকি?" আলী আহমদ খান রাগী রাগী মুখ করে তাকিয়েছেন কেবল এরমধ্যে মালিহা খান রাশভারি কণ্ঠে বলতে শুরু করলেন, " সব দোষ তোমাদের, ছেলেটাকে এত কষ্ট দেয়ার কি দরকার ছিল? তোমরা যেহেতু সবকিছু

আগে থেকেই জানতে তাহলে এত চ্যালেঞ্জ না নিয়ে আমাদের জানিয়ে সবকিছু মেনে নিলেই হতো। আমার ছেলেটাকে এভাবে না কাঁদালেও পারতে।” আলী আহমদ খান হঠাৎ ই উচ্চ শব্দে হেসে উঠলেন। মালিহা খানকে উদ্দেশ্য করে বললেন, ” তোমার কি মনে হচ্ছে, তোমার ছেলেকে কাঁদিয়েছি বলে তোমার ছেলে রাগ করে বউ নিয়ে চলে গেছে?” “হ্যাঁ।” আলী আহমদ খান হাসতে হাসতে বললেন, “এসবকিছু তার পূর্বপরিকল্পিত। তোমার ছেলেকে নিষ্পাপ ভেবো না, সে এতটাও নিষ্পাপ না। ” মালিহা খান রাগী স্বরে বললেন, ” আপনি মানেন আর না মানেন, আমি জানি আমার ছেলে নিষ্পাপ। ” আলী আহমদ খান চাপা স্বরে বললেন, ” এইযে আমার ছেলে আমার ছেলে করছো, তোমার আদরের ছেলে যে তিনবছর আগে বিয়ে করে ফেলেছে এটা কি তুমি জানো?” মালিহা খান তৎক্ষনাৎ বলে উঠলেন, ” কি? কে বলেছে?” মোজাম্মেল খান খাওয়া বন্ধ করে আতঙ্কিত নজরে তাকালেন। আলী আহমদ খান স্বাভাবিক কণ্ঠে ফের বললেন, “তোমার ছেলে আর মেঘ মামনির বিয়ে আরও তিন বছর আগেই হয়ে গেছে। গত পরশু দিন তিনবছর পূর্ণ হয়েছে। তোমার ছেলেকে যতটা সাধারণ ভাবো সে ততটাও সাধারণ না।” মালিহা খান নিস্তব্ধ হয়ে গেছেন। মোজাম্মেল খান গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, “ভাইজান, তুমি কি আমাদের সাথে মজা করছো? ” ” মজা করার ইচ্ছে থাকলে তোদের সাথে আগেই মজা করতাম, বিয়ে পর্যন্ত অপেক্ষাও করতাম না আর ধুমধাম করে ছেলের বিয়েও দিতাম না। তুই বিয়ের দিন

কাবিনের কথা বললি না, আমি কি কাবিন দিব আমার ছেলে আরও ৯ বছর আগে না বুঝেই কাবিন ঠিক করে ফেলেছে। যখন বুঝতে পেরেছে কাবিন মেয়ের পরিবার থেকে দিতে হয় তখন তার মাথা নষ্ট হয়ে গেছে, সে এলোপাতাড়ি ছুটাছুটি করে টাকা ম্যানেজ করে তোর মেয়েকে বাড়ি বানিয়ে দিয়েছে তবুও কাবিন নিয়ে যেন কোনো কথা না উঠে। " মোজাম্মেল খান কপাল কুঁচকে প্রশ্ন করলেন, " আবির মেঘকে বাড়ি গিফট করেছে?" "হ্যাঁ" "কোথায়?" "সেটা আমি কি করে বলবো, আমিও তো অল্প শুনেছি। " "তোমাকে এসব কে বলেছে? আবির মেঘের বিয়ে হয়েছে এটায় বা কে বলেছে?" "তোর ছেলে।" "তানভির বলেছে? " "হ্যাঁ" মোজাম্মেল খান রাগান্বিত দৃষ্টিতে তানভিরের দিকে তাকিয়ে আছেন। তানভির সেই যে মাথা নিচু করেছে, চোখ তুলে আর তাকাতেই পারছে না। বন্যা, রিয়া, মীম, আইরিন সবাই নির্বাক চোখে চেয়ে আছে। মোজাম্মেল খান গুরুভার কণ্ঠে বললেন, " এসব কি শুনছি! আবির মেঘের বিয়ে কি আগেই হয়েছে? " তানভির বার বার ঢোক গিলছে। আলী আহমদ খান মৃদুস্বরে বললেন, " তানভিরকে কিছু বলে লাভ নেই। সে এক নির্বোধ আর আমার টা ওর থেকে আরও বড় নির্বোধ। " "কিভাবে কি করেছে?" " কিভাবে করেছে এসব এখন আর জানতে হবে না শুধু জেনে রাখ, তোকে তোর ছেলে হারিয়ে দিয়েছে।" মালিহা খান শীতল কণ্ঠে শুধালেন, " আপনি এতকিছু কিভাবে জানলেন?" আলী আহমদ খান মৃদু হেসে বললেন, " তোমার কি মনে হয়, এমনি এমনি বলে

দিয়েছে? এত সহজ? সেদিন সন্ধ্যায় রাকিব, রাসেল আর তানভির তিনজনই আমার অফিসে গিয়েছিল, আবিরের পছন্দের কথা জানিয়ে আমাকে খুব করে রিকুয়েষ্ট করছিল যেন ঝামেলা ছাড়া রাজি হয়ে যায়। যেহেতু মোজাম্মেল আমাকে আগে থেকেই অনেক বার জানিয়ে রেখেছে তাই আমিও সেভাবে রিয়েক্ট করি নি। রাকিবদের বিদায় করে তানভিরের সাথে কিছুক্ষণ কথা বললাম। বিয়ে নিয়ে আমার কোনো সমস্যা নেই শুধু বলেছিলাম, মাসখানেক সময় নিয়ে বিয়ের আয়োজন করতে হবে কিন্তু তানভিরের ঘুরে ফিরে এক কথা, বিয়ে করালে ৩ তারিখ ই করাতে হবে। সে কারণ বলতে নারাজ, আমিও বার বার জিজ্ঞেস করতে লাগলাম। এক পর্যায়ে রাগ দেখিয়ে বললাম সত্যি কথা না বললে এই বিয়ে আমি কোনোদিনও মানবো না। তখন ভয়ে ভয়ে সব সত্যি স্বীকার করেছে। তোমরা এখন কি অবাক হচ্ছো আমি তানভিরের কথা শুনে তখন হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলাম। আমার ছেলের আস্পর্ধার কথা শুনে নিস্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। ঐ পরিস্থিতিতে রাগ দেখানোর অবস্থাও ছিল না। তানভিরের সাথে হুটহাট সিদ্ধান্ত নিয়ে আবিরকে রাজশাহী পাঠালাম, কারণ ও বাসায় থাকলে পরিস্থিতি আরও বেশি খারাপ হয়ে যেত। আবিরকে পাঠিয়ে সঙ্গে সঙ্গে আমিনার বাসায় গেলাম। আমিনাকে আবিরের কথা জানানোর পর সে উঠে বলে, সে সবকিছু আগে থেকেই জানে। তোমরা বিশ্বাস করবে না, আমি তানভিরের কথা থেকে আমিনার কথায় বেশি অবাক হয়েছিলাম। আমি গিয়েছিলাম ওর সাথে আলোচনা করতে কিন্তু ওর কথাবার্তা শুনে

আলোচনা তো দূর ওর বাসা থেকেই সিদ্ধান্ত নিয়ে আসছি বাসায় কোনোপ্রকার আলোচনা ব্যতীত বিয়ে হবে আর ৩ তারিখ ই বিয়ে হবে।" ইকবাল খান ধীর কণ্ঠে শুধালেন, " বাসায় বিষয়টা জানালে কি হতো?" "বিয়েটা আমার সিদ্ধান্তে হচ্ছে জানলে তোমরা কেউ সেভাবে রিয়েক্ট করতে না। কিন্তু যদি একবার আবির মেঘের বিয়ের কথা সামনে উঠে যেত তখন সবার আগে ব্যাগড়া দিতো মোজাম্মেল আর সাথে ওর মেয়ে। এজন্য তানভির আগে থেকেই বলে রেখেছিল যেন বাসায় বা আবিরের সামনে বিয়ের কথা না উঠায়। এখন যেহেতু বিয়ে হয়ে গেছে আর ওরা বাসায়ও নেই তাই তোমাদের জানালাম।" মোজাম্মেল খান মুখ ফুলিয়ে রাগী স্বরে বললেন, " আমি জিতে গিয়েও হেরে গেলাম, ভাইজান।" আলী আহমদ খান ঠাট্টার স্বরে বললেন, " তোকে আগেই বলেছিলাম, এত খুশি হয়ে লাভ নেই। কারণ আজ নয়তো কাল তোর জিত হারে পরিণত হতোই। " মোজাম্মেল খান মাহমুদা খানের দিকে তাকিয়ে ভারী কণ্ঠে বললেন, " তুই কি এই কথাটা আগে বলতে পারতি না আমাদের? " "সাহস হয় নি ভাইয়া। অনেকবার বলতে চেয়েও বলতে পারি নি।" ইকবাল খান তানভিরের দিকে তাকিয়ে রূষ্ট স্বরে বললেন, " তোর এত সাহস হলো কিভাবে?" তানভির মাথা নিচু রেখেই বলতে শুরু করল, "আপনাদের মধ্যে বন্ডিং খুব ভালো আর আমাদের বন্ডিং খারাপ নাকি! আমার ভাইদের জন্য আমি যা ইচ্ছে করতে পারি। আদি, ঠিক কি না বল ?" আদি এতক্ষণ খাওয়ার তালে ছিল, কে কি বলেছে সেসবে গুরুত্বই দেয় নি। আচমকা

তানভির প্রশ্ন করায় আদি না বুঝে সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, “একদম ঠিক।” আলী আহমদ খান মৃদু হাসলেন তবে মোজাম্মেল খান রাগে ফোঁস ফোঁস করছেন। তানভির চুপচাপ উঠে গেছে। এমন সময় রাকিব অফিসের জন্য রেডি হয়ে নামছে। কিছুদিন যাবৎ আবির ব্যস্ত থাকায় রাকিবকেই সবটা সামলাতে হচ্ছে। রাকিব নিচে আসতেই আলী আহমদ খান ঘাড় ঘুরিয়ে রাকিবকে দেখে গুরুগম্ভীর কণ্ঠে ডাকলেন, ” রাকিব এদিকে আসো। ” “জ্বি আংকেল।” “তোমার বন্ধু কোথায় গেছে?” রাকিব নির্দ্বিধায় জবাব দিল, ” কক্সবাজার।” “তুমি আগে থেকে জানতে?” “আগে জানতাম না। বিয়ের দিন রাতে জানতে পেরেছি।” “বাসার কাউকে জানাও নি কেনো?” “আবির নিষেধ করেছিল।” “নাস্তা করেছো?” “জ্বি আংকেল, অফিসে যেতে হবে।” “ঠিক আছে, যাও।” রাকিব রিয়ার দিকে তাকিয়ে মৃদুস্বরে বলল, ” আমি অফিসে যাচ্ছি, তুমি জান্নাতের সঙ্গে বাসায় চলে যেও। ” রিয়া শান্ত স্বরে জবাব দিল, “আচ্ছা।” এত সময়ের মধ্যে বন্যা শুধু নিষ্পলক চোখে তানভিরের দিকে তাকিয়েই ছিল, মুখ ফুটে একটা কথাও বলে নি। বন্যার বোন সকাল থেকে বার বার কল দিচ্ছে, বন্যা খাওয়াদাওয়া শেষ করেই ব্যাগ গুছাতে শুরু করেছে । গত দুই তিনদিন যাবৎ তানভির বন্যার সাথে আলাদাভাবে কথা বলতে ছটফট করছে কিন্তু মীম আর আইরিনের জন্য সুযোগ ই পাচ্ছে না। তানভির ঘুরেফিরে মীমের রুমের সামনে দাঁড়িয়েছে। আইরিন সহসা ভ্রু নাচিয়ে মৃদুস্বরে বলল, “কি ব্যাপার? এখানে কি চাই?” তানভির স্বাভাবিক

কণ্ঠে বলল, “বন্যার সাথে আমার একটু কথা আছে।” ” কি কথা? আমাদের বলো।” তানভির আইরিনের মাথায় গাট্টা দিয়ে গুরুগম্ভীর কণ্ঠে বলল, “তিনদিন যাবৎ তোদেরকেই বলতেছি, সামনে থেকে সর এখন।” আইরিন ঠোঁট বেঁকিয়ে বিড়বিড় করে বলল, ” এত অধিকার দেখাচ্ছো কেনো? তুমিও কি গোপনে বিয়ে করে ফেলেছো নাকি?” তানভির মৃদু হেসে বলল, ” ভাবছি। ” তানভির রুমে ঢুকতেই বন্যা আড়চোখে তাকালো। তানভির মলিন হেসে বলল, ” তোমার সাথে কিছু কথা আছে।” বন্যা গম্ভীর কণ্ঠে জানাল, ” বাসা থেকে কল দিচ্ছে, আমাকে যেতে হবে।” ” সে না হয় দিয়ে আসলাম কিন্তু তোমার সাথে কথাগুলো বলা প্রয়োজন। ” বন্যা ক্রোধিত কণ্ঠে বলল, ” আপনার সাথে কথা বলার মতো মন মানসিকতা আমার নেই। ”তানভির আশেপাশে নজর বুলিয়ে বন্যার দিকে সূক্ষ্ম নেত্রে তাকিয়ে বিলম্বিত কণ্ঠে জানতে চাইল, ” আমি কি করেছি?” বন্যা নিজেকে সামলে নিয়ে ধীরগতিতে বলল, ” আপনি কিছু করেন নি, আমারই কথা বলতে ইচ্ছে করছে না। ” তানভির মনে মনে বিড়বিড় করল, “শখের নারীর শখের থেকেও রাগের মূল্য তিনগুণ বেশি।” তানভির কিছু বলছে না দেখে বন্যা তির্যকভাবে তাকালো। বন্যার কুপিত দৃষ্টি দেখে তানভির ঢোক গিলে সহসা হাসার চেষ্টা করল। বন্যা নজর সরিয়ে ব্যাগ গুছানোতে মনোযোগ দিল। তানভির মৃদু হেসে মোলায়েম কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, ” আমাদের বাসায় থাকতে কোনো সমস্যা হয় নি তো?” বন্যা মুখ ফুলিয়ে ভারী নিঃশ্বাস ছাড়লো। মীম রুমে এসে ধপ

করে বিছানার উপর বসে শক্ত কণ্ঠে বলল, " আমার খুব সমস্যা হচ্ছে। কারণ বড় আব্বু তোমাকে ডাকছেন আর তুমি সেদিকে মনোযোগ না দিয়ে এখানে দাঁড়িয়ে আছো। " তানভির চমকে উঠে বলল, " সর্বনাশ! " "সর্বনাশ এখনও হয় নি কিন্তু তোমাকে এই রুমে পেলে নির্ঘাত কিছু একটা হবে।" তানভির চটজলদি দ্রুত পায়ে দরজা পর্যন্ত গিয়ে আবারও থামলো। বন্যার দিকে না তাকিয়ে স্বাভাবিক কণ্ঠে ফের বলল, " তুমি রেডি হয়ে আসো, আমি নিচে অপেক্ষা করছি। " বন্যা গম্ভীর গলায় জানাল, " আমি একায় যেতে পারবো।" তানভির সে কথা শুনেও না শুনার মতো চলে গেছে। নিচে নামতেই আলী আহমদ খান জানতে চাইলেন, " তুমি কি এখন ফ্রী আছো?" "কোনো কাজ ছিল?" " আবির রাতে বলেছিলো বিয়ের খরচের ব্যাপারে বাকি কথা যেন তোমার সাথে বলি। তখন তো আর জানতাম না যে তোমার ভাই এভাবে বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে। সে যাই হোক, আবির যেহেতু বলে গেছে তাই তোমাকে বিস্তারিত জানানো উচিত।" তানভির হালকা করে কেশে শীতল কণ্ঠে বলল, " শুনলাম বনুর ফ্রেন্ড বাসায় চলে যাবে। আমি কি তাকে বাসা পর্যন্ত দিয়ে আসবো?" আকলিমা খান চাপা স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, "বন্যা কি এখনি চলে যাবে?" "তাই তো শুনলাম।" আকলিমা খান সঙ্গে সঙ্গে হালিমা খানের রুমে চলে গেছেন। মেহমানদের জন্য গিফট কেনার দায়িত্ব হালিমা খান আর আকলিমা খানের ছিল। আলী আহমদ খান স্বাভাবিক কণ্ঠে বললেন, " ঠিক আছে। তাকে বাসা পর্যন্ত আগে দিয়ে আসো পরে না হয়

আলোচনা করা যাবে। আর হ্যাঁ সাকিবকেও সাথে নিয়ে যেও। ” “জ্বি, আচ্ছা।” তানভির আর সাকিব বাসার বাহিরে দাঁড়িয়ে নিজেদের মতো কথা বলছে। বন্যা সবার থেকে বিদায় নিয়ে বেড়িয়ে আসছে। বন্যাকে দেখেই সাকিব মৃদুস্বরে বলল, “আসসালামু আলাইকুম” “ওয়ালাইকুম আসসালাম।” সাকিব ঠোঁটে হাসি রেখে প্রশ্ন করল, ” আপনি কি আমাকে চিনেন?” বন্যা আস্তে করে বলল, ” জ্বি, আপনি আবির ভাইয়ার মামাতো ভাই।” “আমার কিন্তু আরও একটা পরিচয় আছে।” বন্যা ভ্রু কুঁচকে জানতে চাইল, ” কি?” “তানভিরের বন্ধু।” “ওহ।” সাকিব তানভিরের দিকে তাকিয়ে উদাসীন কণ্ঠে জানতে চাইল, “এটা কি হলো?” তানভির সহসা ঠোঁট উল্টালো। সাকিব বড় করে নিঃশ্বাস ছেড়ে মৃদু স্বরে বলতে শুরু করল, “দেখুন, আমি ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে কথা বলতে একদম পছন্দ করি না। আমার স্পেশাল বন্ধুর স্পেশাল মানুষ হিসেবে আপনাকে আমার খুব ভালো লেগেছে। আমার বন্ধুর মন খারাপের কারণ না হয়ে আপনি বরং তার সুখপাখি হয়ে... ” তানভির আচমকা সাকিবের মুখ চেপে ধরে বিড়বিড় করে বলল, “তোকে এত কথা বলতে বলেছি?” সাকিব তানভিরের হাত টেনে আহ্লাদী কণ্ঠে বলল, ” ভাবি, আমাকে বাঁচান।” বন্যার হিমশীতল চাহনি দেখে তানভির সাকিবকে ছেড়ে দিয়েছে। বন্যা কিছু না বলেই চলে যাচ্ছে। তানভির দ্রুত এগিয়ে গিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, “কোথায় যাচ্ছো?” “বাসায়।” “কেনো?” বন্যা আড়চোখে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, “মানে?” ” ওহ সরি, বলছিলাম তুমি আমার সাথে না গিয়ে একা

কেনো যাচ্ছো?” “আমার বাসা আমি চিনি। আমি একায় যেতে পারবো, ধন্যবাদ। ” তানভির মনে মনে বিড়বিড় করতে করতে গাড়ি নিয়ে আসছে। তানভিরের পাশের সিটে সাকিব বসা। বন্যার কাছাকাছি এসে গুরুগম্ভীর কণ্ঠে বলল, ” গাড়িতে বসো।” তানভিরের কৃশ রক্তিম চোখ দেখে বন্যা না করতে গিয়েও কিছু বলতে পারল না। মাথা নিচু করে গাড়িতে উঠে বসল। সাকিব যেতে যেতে গুনগুন করে গান গাইছে কিন্তু তানভির আর বন্যা একদম নিশ্চুপ। অর্ধেক পথ যাওয়ার পর তানভির অকস্মাৎ ব্রেক কষল, সাকিবের দিকে তাকিয়ে চোখে ইশারা দিল। সাকিব কপাল কুঁচকে বলে বসল, ” চোখে ইশারা দিচ্ছিস কোনো? যা বলার মুখে বল।” তানভির ভারী কণ্ঠে বলল, ” গাড়ি থেকে নামতে বলছি।” ” গাড়ি থেকে নামবো কেনো? তোরা কি কথা বলবি বল। আমি না হয় কানে আঙুল দিয়ে রাখছি।” ” যাবি? ” “যাচ্ছি। তুই যে আমাকে মাঝরাস্তায় ফেলে দিচ্ছিস এটা বাসায় গিয়ে ফুপ্পি আর ফুফাকে বলবো সাথে তোর আব্বুকেও বলবো। ” “যা ইচ্ছে বলিস।” সাকিব নামতেই তানভির আবারও গাড়ি স্টার্ট দিল, বন্যা মনোযোগ দিয়ে ফোন চাপছে। তানভিরের দিকে একবারের জন্যও তাকাচ্ছে না। বন্যাদের বাসার গলিতে না ঢুকে তানভির অন্য রাস্তায় গাড়ি নিয়ে যাচ্ছে দেখে বন্যা শক্ত কণ্ঠে বলল, ” এদিকে কোথায় যাচ্ছেন?” “তোমার সাথে আমার কিছু কথা আছে।” “আমার এখন কোনো কথা শুনার ইচ্ছে নেই। আমাকে বাসা পর্যন্ত পৌঁছে দেন, প্লিজ। না হয় এখানেই নামিয়ে দেন আমি একা চলে যেতে

পারবো। ” ” তুমি বাসায় গেলে আমার ফোন আর রিসিভ করবে না তাই এখনি শুনতে হবে।” তানভির গম্ভীর মুখ করে গাড়ি চালাচ্ছে। অনেকটা পথ যাওয়ার পর কিছুটা নির্জন রাস্তায় গাড়ি থামালো। গাড়ি থেকে নেমে বন্যাকে উদ্দেশ্য করে বলল, “নেমে আসো।” বন্যা গাড়ি থেকে নেমে চিবুক নামিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তানভির শান্ত কণ্ঠে বলতে শুরু করল, “আমি জানি তুমি আমার উপর রেগে আছো তবুও বলছি মাথা ঠান্ডা করে আমার কথাগুলো একটু শুনো, মন আর মোহনার সম্পর্ক অনেক গভীর। মনের আকস্মিক পরিবর্তন একটা মানুষকে মানসিক আর শারীরিক দু’দিকেই অকেজো করে দিতে সক্ষম। প্রতিনিয়ত রঙ বদলানোর এই পৃথিবীতে আহত মন নিয়ে বেঁচে থাকা বড্ড দায়। তবুও আমাদের নতুন করে স্বপ্ন দেখতে হয়, মনের ভেতর বেঁচে থাকার নতুন উদ্যম জাগাতে হয় কারণ আমরা কোনো না কোনোভাবে কারো না কারো কাছে না চাইতেই বন্দি হয়ে যায়। ভাইয়াকে আমি কেবল একবার মুখ ফস্কে মজা করে বলেছিলাম, “তোমার বনুর প্রতি এখন যতটা আবেগ আছে সেটা যদি পরবর্তীতে না থাকে! তখন যদি তোমার মনে হয় বনু শুধু তোমার অবুঝ মনের বিবশ বাসনা ছিল।” আমার ছেলেমানুষি কথাগুলো ভাইয়ার কাছে এতটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে যাবে আমি কোনোদিন কল্পনাও করতে পারি নি। এত রিকুয়েষ্ট করেও ভাইয়াকে থামাতে পারি নি। ঐ পরিস্থিতিতে আমি না পারছিলাম বাসায় কিছু জানাতে আর না পারছিলাম ভাইয়াকে আটকাতে। বাধ্য হয়ে চুপচাপ সবকিছু মেনে নিয়েছিলাম। সেই ঘটনার

পর থেকে আমার মাথায় সর্বক্ষণ একটা অজ্ঞাত দুশ্চিন্তা ঘুরপাক খেত তবে ভাইয়া বরাবরই নিজের জায়গায় অক্লিষ্ট ছিল। প্রথমদিকে বনুর ব্যাপারে আমার সাথে কথা বলতে ইতস্ততা বোধ করলেও বিয়ের পর ভাইয়া সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছিল। আমি এমন একটা মানুষ যে ভাইয়ার পাগলামির চরম মাত্রা যেমন দেখেছি তেমনি ভাইয়ার অবাধ ধৈর্যের অন্ত্যও দেখেছি। ১২ হাজার কিলোমিটার দূরে থেকেও একটা মানুষ আরেকটা মানুষকে ঠিক কতটা ভালোবাসতে পারে এটা ভাইয়াকে না দেখলে হয়তো আমি বিশ্বাস ই করতাম না। একটা সময় পর্যন্ত আমি খুব ভয় পেতাম, ভাই হয়ে একমাত্র বোনের ব্যাপারে এত বড় সিদ্ধান্ত একা নিয়েছি বলে নিজেকে নিজে খুব দোষারোপ করতাম। কিন্তু এখন আমি গর্ব করে বলতে পারি, আমি আমার বোনের জন্য বেস্ট সিদ্ধান্তটায় নিয়েছিলাম। হয়তো ভাইয়ার বিয়ে করার সময় টা ভুল ছিল কিন্তু নিয়তে কোনো ভুল ছিল না। ভাইয়া বনুকে সবসময় বউয়ের মর্যাদায় দিয়ে এসেছে। বন্যা তুমি বিশ্বাস করবে না, ভাইয়া কতরাত নির্ঘুম কাটিয়েছে, কতরাত বনুর জন্য সীমাহীন কেঁদেছে। বাসায় ফিরে প্রথম প্রথম বনুর চোখের দিকে তাকাতে পারতো না, বনুর সাথে দুমিনিট ভালোভাবে কথা পর্যন্ত বলতে পারতো না। ঐ পরিস্থিতি থেকে নিজেকে সামলে স্বাভাবিক জীবনে এসেছে, নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য অধৃষ্য জেদকে কাজে লাগিয়েছে। এই সবকিছু তো ভাইয়া করল কিন্তু আমি আমার ভাইয়ের জন্য কি করলাম? উত্তর ছিল, কিছুই না। তাই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, আব্বু আর বড় আব্বু দু'জনকে যা বলার

আমিই বলবো। রাকিব ভাইয়াকে জানানোর পর রাকিব ভাইয়া বলেছেন ওনারাও আমার সাথে থাকবেন। গেলাম বড় আব্বুর অফিসে কিন্তু ভাগ্যক্রমে শুধু বড় আব্বুকেই পেয়েছিলাম। সাহসের অভাবে প্রথমদিকে বিয়ের বিষয়টা মুখ পর্যন্ত এনেও বলতে পারছিলাম না। বড় আব্বু বোধহয় কিছুটা আন্দাজ করতে পেরেছিলেন তাই রাকিব ভাইয়াদের পাঠিয়ে আমার সাথে আলাদাভাবে কথা শুরু করেছিলেন। খুব সহজে কৌশলে আমার থেকে সবকিছু জেনেও নিয়েছিলেন, আমিও সেদিন কোনোকিছু বলতে দ্বিধাবোধ করি নি। আমি যা করেছি আমার ভাইয়ের জন্য করেছি, আমার বোনের জন্য করেছি কারণ আমি বরাবরই তাদের মুখে নিখাদ হাসিটা দেখতে চেয়েছি। এই সবকিছু শুনার পর তোমার যদি মনে হয় আমি ভুল করেছি তাহলে তোমার যা ইচ্ছে বলতে পারো আমি কিছুই বলবো না। ” বন্যা রাশভারি কণ্ঠে বলল, “আপনি মেঘের ভাই আর আমি জানি আপনি খুব দায়িত্বশীল একজন মানুষ। আপনি যা করেছেন তা বুঝেই করেছেন তাই এ ব্যাপারে আমার কিছু বলার নেই। ” “তাহলে তুমি রেগে আছো কেনো?” “এমনি।” “এমনি এমনি বলে কতদিন কত কথা কাটাবে? কি হয়েছে বলো” “আমার কিছু হয় নি, আমি বাসায় যাব।” তানভির আচমকা বন্যার মুখোমুখি দাঁড়ালো। বন্যার নামানো চিবুক উঠিয়ে গুরুগম্ভীর কণ্ঠে বলে উঠল, “তোমার কিছু না হলেও আমার মনে প্রতিনিয়ত তেজস্বীর ঝড় বইছে। অস্ফুট আবেগ নিয়ন্ত্রণ করতে করতে আমি ভয়াবহ অপ্রসন্নতায় জড়িয়ে গেছি। শত-শত নব্য স্বপ্নের ভিড়ে

আমার অনুভূতিগুলোকে অবাঞ্ছিতের ন্যায় পড়ে থাকতে দেখতে আর পারছি না। সবার কাছে পরিত্যক্ত হলেও আমার আবেগ আমার নিকট অত্যন্ত অভিনিবিষ্ট। অনেক সহ্য করেছি, আর সম্ভব হচ্ছে না। বন্যা, আমি....” বন্যা অতর্কিতে কয়েক পা পিছিয়ে গেল। তানভিরের কথার মাঝখানে তেজী কণ্ঠে বলে উঠল, ” জীবন যতটা সহজ বাস্তবতা ঠিক ততটায় কঠিন। আবেগের তাড়নায় নেয়া সিদ্ধান্তগুলো অগভীর মানুষের মতোই ক্ষণস্থায়ী। হৃদয়ের অপাবৃত আত্ততা কিংবা একরাশ মুগ্ধতা চাই না আমি, মুখোশধারী মানুষদের ভিড়ে নিজের অস্তিত্বকে হারাতেও চাই না। এত উচ্চাকাঙ্ক্ষী জীবন চাই না আমি যেই জীবনে আকাঙ্ক্ষার পরিসমাপ্তি ঘটার সঙ্গে সঙ্গে আমার মনটাও তিক্ততায় ছেয়ে যাবে। আমি বাস্তবতাকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চাই, অতি সাধারণ একটা জীবন চাই। আপনার আবেগ অনুভূতিকে অবজ্ঞা করার সাধ্য আমার নেই তাই ভালো হয় যদি আপনি আমাকে কোনোকিছু না জানান।” তানভির নির্বাক চোখে চেয়ে আছে। বন্যার মুখের কাঠখোট্টা কথাতে তানভির বাকরুদ্ধ হয়ে গেছে। হৃদয় অঙ্গনের উথাল-পাতাল ঢেউয়ে শ্বাস এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে, সর্বশক্তি দিয়ে নিজেকে ধাতস্থ করার চেষ্টা করল। বন্যার দিকে তাকিয়ে কাঠকাঠ গলায় বলল, ” তুমি মেয়ে ভীষণ নির্দয়া। যতটা সুকৌশলে আমার অনুভূতিগুলোকে উপেক্ষা করলে ততটা কৌশল আমার নি*পা*তেও প্রয়োজন হতো না।” বন্যা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে ফের বলতে শুরু করল, ” আমাদের মধ্যবিত্ত পরিবার তাই স্বপ্নগুলোও আমাদের মতোই মধ্যবিত্ত। আপনাদের মতো

অনাবশ্যক চিন্তা ভাবনা কখনোই করি না আমরা। বিলাসবহুল জীবনযাপন আমাদের নিকট কেবলই দুঃস্বপ্ন, ঘুম ভাঙলে যার অস্তিত্বও মস্তিষ্কে থাকবে না। আমার আব্বু একা চাকরি করে আমাদের তিন ভাই বোনকে অনেক কষ্টে বড় করেছেন। আব্বুর কষ্টের প্রতিদানরূপ আমরা কি দিতে পেরেছি? উত্তরটা আপনারই মতো, কিছুই না। আপু অনেক চেষ্টার পর একটা জব পেয়েছে। আব্বু আপুর জন্য পাত্র খুঁজছে যার বিশেষ কিছু গুণাবলি থাকা আবশ্যক তার মধ্যে মন মানসিকতার সাথে সরকারি চাকরিটাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। আপনাদের পরিবারের মতো আমাদের পরিবার কখনো ছিল না আর হবেও না। আপনাদের বাসায় আবির ভাইয়ার যোগ্যতার থেকেও ভালোবাসাকে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। আজ আবির ভাইয়া বেকার থাকলেও পরিবার ঠিকই সাপোর্ট করতো কিন্তু আমার পরিবার এমন কিছুই করবে না। কারণ একটায় আমরা মধ্যবিত্ত, আমরা আবেগে গা ভাসাতে চাইলেও বাস্তবতা আমাদের ভুলগুলো চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। আমি অপ্রকাশিতভাবে হলেও আব্বুর কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আপনার লাইফস্টাইল আপনাদের কাছে খুব স্বাভাবিক হলেও আমাদের কাছে বিশেষ করে আব্বুর কাছে খুব অস্বাভাবিক। আমি বাস্তবতা ভুলে আবেগের কাছে বন্দী হতে পারবো না। আমি কি বলতে চাচ্ছি আশা করি আপনি বুঝবেন।” তানভিরের অন্তর সহ বিস্ফোরিত দুচোখ ভেতরে ভেতরে জ্বলছে। মানুষের হৃদয় খুব দূর্বল, প্রিয় মানুষের অতি সামান্য কথাতেও হৃদয় ভেঙে চূ*র্ণবি*চূর্ণ হয়ে

যায়। বন্যার কথায় তানভিরের হৃদয় নিঙ্গড়ান ব্যথাগুলো ভেতটাকে বড্ড পোড়াচ্ছে, মনের ভেতর উদ্দীপ্ত প্রেমানুভূতি অচিরেই পুড়ে উধাত্ত ছাই হয়ে গেছে। তানভির চোখ ভরা ব্যগ্রতা আড়াল করে চুপচাপ গাড়ি স্টার্ট দিল। বন্যা ত্রস্ত পায়ে এগিয়ে গাড়িতে বসল। বাকি রাস্তা কেউ কারো সাথে একটা কথাও বলে নি। অন্যান্য দিন বন্যাকে বাসার সামনে নামিয়ে তানভির কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে তবে আজ সেটাও করে নি। মোখলেস মিয়ার সাথে দেখা পর্যন্ত করে নি। ১০ থেকে ১১ ঘন্টার জার্নি শেষে আবির আর মেঘ কক্সবাজার পৌঁছেছে। সমুদ্রের কাছাকাছি একটা রিসোর্ট আগে থেকেই বুকিং দেয়া ছিল, সেখানেই উঠেছে। আবির কোনোরকমে ফ্রেশ হয়েই লম্বা ঘুম দিয়েছে। গত এক সপ্তাহের ছুটাছুটি, অতিরিক্ত দুশ্চিন্তা, নির্ঘুম রাত কাটাতে কাটাতে আবির ক্লান্ত হয়ে গেছে। মেঘও ঘুমিয়েছিল তবে ঘন্টাখানেক পরেই মেঘের ঘুম ভেঙে গেছে। অর্ধ ঘুমে থেকেই পেটের উপর আবিরের শক্ত হাতের কোমল স্পর্শ অনুভব করতে পারছিলো। মেঘ আড়চোখে আবিরকে এক পলক দেখে আবিরের হাতটা পেটের উপর থেকে সরিয়ে ওয়াশরুমে চলে গেছে। হাতমুখ ধুয়ে রুমে আসতেই নজর আটকায় আবিরের পরিশ্রান্ত আদলে। মেঘ অবাক চোখে আবিরের দিকে চেয়ে আছে। পুরুষের কখনো রূপের প্রয়োজন হয় না, শুধু প্রয়োজন হয় মায়ার। মেঘ আবিরের মায়ায় জড়িয়ে গেছে, যে মায়া আমৃত্যু কাটাতে পারবে না। আবির নামক শখের পুরুষ এখন একান্ত মেঘের হয়ে গেছে, যে পুরুষে অন্য কোনো নারীর অস্তিত্ব নেই।

আবিরের মায়াবী আদলে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে আছে, মেঘের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রেমানুভূতি জাগ্রত হচ্ছে। শেষ বিকেলের অনুজ্বল আলোতে আবিরের মায়াময় আদল দেখে মেঘ নতুন করে আবিরের প্রেমে পড়ছে। সমুদ্রের গর্জন কানে বাজতেই মেঘ গুটিগুটি পায়ে বারান্দায় গেল, রিসোর্ট টা খুব বেশি দূরে না হওয়ার সমুদ্রের উত্তাল ঢেউগুলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। মেঘ জীবনে প্রথমবারের মতো কক্সবাজার এসেছে, বাসায় অনেকবার বলেও কখনোই সেভাবে কাউকে রাজি করাতে পারে নি। মেঘ কিছুক্ষণ সমুদ্রের ঢেউ আর গর্জন শুনে পুনরায় রুমে আসছে। আবির তখনও গভীর ঘুমে নিমগ্ন, কি করবে বুঝতে না পেরে মেঘ বিছানার পাশে বসল। আবিরের উন্মুক্ত শরীর, গলার কিছুটা নিচে কালো তিলটা জ্বলজ্বল করছে। মেঘ কিছুক্ষণ মুগ্ধ চোখে চেয়ে থেকে আচমকা সদাশয় হাসলো, হাসির সাথে লজ্জা আড়াল করতে সহসা দু'হাতে মুখ লুকিয়ে ফেলেছে। কয়েক সেকেন্ড সময় নিয়ে ধীরগতিতে নিঃশ্বাস ছেড়ে দু আঙুলের ফাঁক দিয়ে আবারও আবিরকে দেখতে লাগল। আবিরের মতো মেঘেরও আজ বলতে ইচ্ছে করছে, " আমার মনের রাজকুমার আজ আমার হৃদয়ে স্ফুরিত উত্তাপ ছড়াচ্ছে। " আবির ঘুমের মধ্যেই পাশে হাত রেখে মেঘের উপস্থিতি বুঝার চেষ্টা করছে। দু'তিনবার হাত রেখে মেঘকে না পেয়ে ঘুমের মধ্যেই কপাল কুঁচকে নিভু নিভু চোখে তাকালো। মেঘের ঠোঁটের কুহকী হাসি দেখে আবির আনমনে হেসে উঠল । আবিরের হাসি দেখেই মেঘ থতমত খেয়ে বিছানার পাশ থেকে উঠে যেতে চাইল, আবির আচমকা এক টানে

মেঘকে নিজের সাথে জড়িয়ে নিল। আতঙ্কে মেঘ দু'চোখ বন্ধ করে ফেলেছে। আবির এক হাতে মেঘের পিঠ বরাবর জড়িয়ে ধরে আছে, অন্য হাতে মেঘের কপালে পড়ে থাকা চুলগুলো কানের পাশে সরাতে সরাতে নিরূদ্যম কণ্ঠে বলল, " আর কতদিন এভাবে লুকোচুরি করবে? এখন তো আমি তোমার পার্মানেন্ট সম্পত্তি হয়ে গেছি।" আবির ভ্রু নাচাতেই মেঘ লজ্জায় আবিরের প্রশস্ত বুকে মুখ লুকালো। আবির দু'হাতে মেঘকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে কানের কাছে বিড়বিড় করল, "তুমি এত লজ্জা পেলে আহিয়া আসবে কেমন করে?" মেঘ কর্কশ কণ্ঠে বলল, "ইশশ, ছাড়ুন আমাকে।" " তুমি কি জানো, তোমার হাসিটা ভয়ংকর রকমের সুন্দর আর সেই হাসি দেখলেই আমার মনে শুধু প্রেম প্রেম ফিল হয়। গত দুইটা বছর বিয়ে করা বউয়ের কাছ থেকে কিভাবে নিজেকে দূরে রেখেছি এটা যদি তুমি বুঝতে তাহলে এক সেকেন্ডের জন্যও আমার থেকে দূরে যেতে চাইতে না।" মেঘ আবিরের বুক থেকে উঠার চেষ্টা করছে কিন্তু পারছে না। মেঘ বাধ্য হয়ে ভীতি কণ্ঠে ফের অনুরোধ করল, "ছাড়ুন।" আবির ধীর কণ্ঠে শুধালো, "মনের ভেতর যে আগুন জ্বালিয়েছো সেই আগুন নিভাবে কে শুনি?" মেঘ হতবিহ্বল, আবিরের বলা প্রতিটা বাক্য নির্লজ্জতার পরিচয় দিচ্ছে। মেঘ বলার মতো কোনো কথায় খোঁজে পাচ্ছে না। আবির মোলায়েম কণ্ঠে ডাকল, "বউ" মেঘ নিশ্চুপ হয়ে আবিরের বুকের উপর শুয়ে আছে। আবির পুনরায় ডাকল, "ও বউ.." মেঘ মৃদুস্বরে বলল, "হুমমমমমম।" আবির সহসা মেঘকে বিছানায় শুইয়ে

কাত হয়ে মেঘের মুখের উপর ঝুঁকে আলতোভাবে মেঘের কপালে কিস করল। মেঘের চোখে চোখ রেখে নিজের ঠোঁট ইশারা করে আদুরে কণ্ঠে বলল, " I want a deep kiss." মেঘ বিরস কণ্ঠে বলল, " আমি পারব না।" "কেনো?" " আমার লজ্জা লাগে। " আবির উদাস ভঙ্গিতে বলল, "আমার লজ্জা লাগছে না কেনো?" "কারণ আপনি নির্লজ্জ। " আবির ঠোঁট বেঁকিয়ে হেসে কোমল কণ্ঠে বলল, " আমি না হয় নির্লজ্জ, বেহায়া। আপনি তো খুব লজ্জাবতী। তা একটা অসহায় ছেলের অসুস্থতার সুযোগ নিয়ে তাকে কিস করার সময় আপনার লজ্জা কোথায় জমা দিয়ে আসছিলেন?" "মানে? আমি কাকে কিস করেছি?" " আমি যখন জ্বরের ঘোরে পড়ে ছিলাম তখন আপনি আমার অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়েছিলেন। এখন সবকিছু ভুলেও গেলেন। বাহ! ম্যাডাম, বাহ!" মেঘ প্রশস্ত নেত্রে তাকিয়ে আতঙ্কিত কণ্ঠে শুধালো, " আপনি সেদিন টের পেয়েছিলেন?" আবির মুচকি হেসে বলতে শুরু করল, " আম্মুর পরে তুমিই একমাত্র নারী যার গায়ের গন্ধ আমি উপলব্ধি করতে পারি। তুমি নিঃশব্দে আমার পাশ ঘেঁষে গেলেও আমি নিগূঢ় ঘুমে থেকে সেটা অনুভব করতে পারি। তুমি দূর থেকে এক পলক তাকালেও আমার হৃদয় আর মস্তিষ্ক সদাজাগ্রত হয়ে উঠে। তোমার স্পর্শে আমার শরীরের প্রতিটা শিরা-উপশিরায় রক্তসঞ্চালন তীব্র থেকে তীব্র হতে শুরু করে। তোমাকে আগেও বলেছি আমি নিঃশ্বাসের শব্দে তোমার অস্তিত্ব উপলব্ধি করতে পারি। তুমি আমাকে কিস করবে আর আমি সেটা বুঝতে পারবো না?

কিভাবে ভাবলে তুমি?” মেঘ শুকনো মুখে ঢোক গিলে মোলায়েম কণ্ঠে বলল, ” সরি ” “দূর পাগলী, ভালোবাসায় সরি টরি সব মূল্যহীন। ভালোবাসায় কেবল ভালোবাসায় অর্থবহ।” আবির পুনরায় নিজের ঠোঁট ইশারা করল। মেঘ ওষ্ঠ উল্টে অসহায় মুখ করে তাকিয়ে আছে। আবির ভ্রু নাচাতেই মেঘ এক হাতে আবিরের চোখ ঢেকে তড়িৎ বেগে আবিরের ঠোঁটে কিস করল। আবির গলার স্বর উঁচু করে বলল, “এটা কি ছিল? কারেন্টে শক খেলেও বুঝতে কয়েক সেকেন্ড সময় লাগে অথচ তুমি এক সেকেন্ড সময়ও নিলে না।” মেঘ কথা কাটাতে অন্যদিকে তাকিয়ে চাপা স্বরে বলল, ” চলুন সমুদ্রে যাই। ” ” আগে আমার ইচ্ছে পূরণ করবে তারপর ঘুরতে নিয়ে যাব। নয়তো চাবি ছুঁড়ে ফেলে দিব।” মেঘ আকুল কণ্ঠে বলল, “এখন না, প্লিজ।” আবির ঠোঁট কামড়ে হেসে আহ্লাদী কণ্ঠে বলে উঠল, “এখনি, প্লিজ।” আবিরের অনুরাগের সাগ্রহে মেঘের আকুতি অচিরেই ব্যর্থ হলো। মেঘের সর্বাঙ্গে আবিরের উষ্ণ সোহাগের নিশান, অনুভূতির রাজ্যে শাণিত নিষঙ্গের আভাস। আবিরের আবেগপূর্ণ অপ্রতীয়মান আবেশে কেটে গেল আরও কিছুটা মুহুর্ত। আবিরের প্রণয়ের পরিণীতা এখন পূর্ণতা লাভ করেছে। পরিতোষ আর লজ্জায় মেঘের ফর্সা আদল রক্তিম বর্ণ ধারণ করেছে। আবিরের তপ্ত ভালোবাসার সমাপ্তি ঘটতে প্রায় সন্ধ্যা হয়েছে। বন্যা সারাদিন যাবৎ মন খারাপ করে বসে আছে। দুশ্চিন্তায় খায়ও নি কিছু। মেঘের আবদার আর নিজের আবেগের বশবর্তী হয়ে তানভিরের প্রতি না চাইতেও খুব বেশি আবেগপ্রবণ হয়ে গিয়েছিল। মেঘদের বাসার

পরিস্থিতি দেখে সেই আবেগ এখন আতঙ্কে রূপ নিয়েছে। ইদানীং মেঘের ব্যস্ততার কারণে তানভিরের বিষয়ে বন্যার সাথে তেমন কথাও হয় নি। তানভিরের রাজনীতি ছাড়া, চাকরির প্রস্তুতি বিষয়ক কোনো কথায় বন্যা জানে না। বন্যা তানভিরকে মুখ ফুটে সরাসরি চাকরির কথা বলতেও পারছে না আবার নিজের আবেগকে নিয়ন্ত্রণও করতে পারছে না। তাই বুঝে না বুঝে তানভিরের সাথে রিয়েক্ট করে ফেলেছে। সেসব ভেবেই এখন খারাপ লাগছে। না পারছে তানভিরকে কল দিয়ে ভালোমন্দ জিজ্ঞেস করতে আর না পারছে দুপুরের ঘটনা ভুলতে। হঠাৎ রিদ এসে দরজায় দাঁড়িয়ে আস্তে করে ডাকল, "আপু" "কি?" "তোমার কি মন খারাপ? " "না। কেনো?" "স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে তোমার মন খারাপ।" বন্যা চোখ মুখ মুছে শান্ত কণ্ঠে জানতে চাইল, " কিছু বলবি?" "হ্যাঁ" "বল" "মেঘ আপুকে একটা কল দাও, আপুকে অভিনন্দন জানাতে হবে।" "মেঘ বাসায় নেই। এখন অভিনন্দন জানাতে হবে না।" " মেঘ আপু কোথায়?" "কক্সবাজার। " "কি? আপু কক্সবাজার গেছে?" "হ্যাঁ" "চলো আমরাও যায়।" বন্যা রাগী স্বরে বলল, " যা এখান থেকে। " "প্লিজ আপু, চলো না কক্সবাজার যায়। আমার খুব ইচ্ছে। " বন্যা ধমক দিতে যাবে তার আগেই রিদ উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠল, " আমি আপুকে রাজি করাতে যাচ্ছি। আমরা সবাই মিলে কক্সবাজার যাব।" রিদ এক ছুটে নিচে চলে গেছে। বন্যা নিরবে নিঃশ্বাস ছেড়ে চোখ বন্ধ করে শুয়ে পরেছে। খান বাড়ির পরিবেশ বেশ নিস্তব্ধ। আত্মীয় স্বজনরা মোটামুটি সবাই চলে

গেছেন। আইরিন, ফুপ্পি আর মালা শুধু আছে। সাকিব বিকেলের দিকে তানভিরের সাথে কথাবার্তা বলে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছে। মাইশা আপুর ডেলিভারির সময় ঘনিয়ে আসছে, মালার আম্মু মাইশা আপুর বাসায়। মালাকেও সাথে নিতে চেয়েছিলেন কিন্তু মালা জোরপূর্বক মেঘদের বাসায় রয়ে গেছে। বলেছে ডেলিভারির আগে আগে চলে যাবে। মালা সোফায় বসে মালিহা খানের সাথে গল্প করছে। মালিহা খান হঠাৎ ই শান্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, "তোর বিয়ের বয়স তো হয়েই গেছে। বিয়ে করতে রাজি হচ্ছিস না কেনো?" "এখন বিয়ের কোনো চিন্তাভাবনা নেই, ফুপ্পি।" "কাউকে পছন্দ করিস?" মালা উদাস দৃষ্টিতে মালিহা খানের দিকে তাকিয়ে মনে মনে আওড়াল, " এই সামান্য কথাটা কি এতগুলো দিনের মধ্যে একবারের জন্যও জিজ্ঞেস করা যেত না?" মালিহা খান ফের বললেন, "কি হলো?" মালা মলিন হেসে উত্তর দিল, "এখন বলে আর কোনো লাভ নেই।" মালিহা খান গম্ভীর কণ্ঠে বলে উঠলেন, " আবিরের কাহিনী তো শুনলিই, ও যদি এত যন্ত্রণা মাথায় না নিয়ে সরাসরি বলে দিত তাহলে ঘটনা এতদূর পর্যন্ত আসতোই না। অবশ্য আবিরকেও এত দোষ দেয়া যায় না। এই বাড়িতেে থেকে এত বছরে আমিই কোনো অধিকার দেখাতে পারি নি সেখানে আবির তো ছোট থেকেই দূরে ছিল। সেসব বাদ দে, তোর তো এমন কোনো সমস্যা নেই, পছন্দ থাকলে বল আমি তোর আব্বুর সাথে কথা বলে নিব।" "তোমার ছেলের মতো আমার এমন কেউ নেই। বাদ দেও এসব কথা।" এমন সময় তানভির বাসায়

আসছে, চোখে মুখে বিষন্নতা। তানভিরের নিষ্প্রভ চেহারা দেখে মালিহা খান উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, " কি হয়েছে তোর?" " কিছু হয় নি, বড় আম্মু।" "চোখমুখ এত শুকনো শুকনো লাগছে কেনো?" তানভির মলিন হেসে বলল, "কই? না তো।" মালিহা খান ধীর কণ্ঠে বললেন, " আবির আর মেঘের সাথে কিছুক্ষণ আগেই কথা বললাম। ওরা বার বার তোর কথা জিজ্ঞেস করছিলো। তুই নাকি আবিরের কল রিসিভ করছিস না। কি হয়েছে বাবা?" তানভির স্বাভাবিক কণ্ঠে জানতে চাইল, " ওরা ঠিক আছে? " " আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছে।" "ঠিক আছে। "বেলা বাজে ১০ টা ৪৫, আবির বিছানায় হেলান দিয়ে বসে ফোনে কিছু করছে। অভিমানী মেঘ ঠোঁট ফুলিয়ে আবিরের দিকে তাকিয়ে আছে। মেঘ সেই ভোরবেলা থেকে সমুদ্রে যাওয়ার জন্য বায়না ধরেছে কিন্তু আবির তার কথা কানেই তুলছে না। মেঘ হঠাৎ ই পুরু কণ্ঠে বলে উঠল, "আপনি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন না?" আবির ফোনের দিকে তাকিয়ে থেকেই আস্তে করে বলল, " বিয়ের পর থেকে কানে একটু কম শুনছি।" "কেনো?" " সারাক্ষণ যেভাবে আপনি আপনি করেন এসব শুনার থেকে কানে কম শোনাও ভালো।" মেঘ মন খারাপ করে বলল, " চলুন না সমুদ্রে যায়।" আবির হঠাৎ ই চোখ তুলে তাকালো, মেঘের কুঁচকান কপাল আর উল্টানো ওষ্ঠ দেখে আবিরের অধরের কোণে মৃদু হাসি ফুটল। নিঃশ্বাস ছেড়ে নিজেকে ধাতস্থ করে ঠান্ডা কণ্ঠে বলল, " ইশশ, তুমি তাকালেই আমার হৃদয়ে শোণিতের ঢেউ বয়ে যায়। এই ঢেউয়ের নিকট সমুদ্রের ঢেউ কিছুই

না। ” মেঘ ভেঙচি কেটে বিড়বিড় করল, ” আপনি একটা অস...” মেঘ সঙ্গে সঙ্গে নিজের মুখ চেপে ধরেছে। আবির প্রশস্ত আঁখিতে চেয়ে অদম্য কণ্ঠে বলল, “বলো বলো, বউয়ের কাছে সভ্য সেজে বিশ্বরেকর্ড করার কোনো ইচ্ছে আমার নেই। আমি নষ্ট পুরুষ হলে আমার বউয়ের কাছে হব, পরনারীর চোখে না হয় সাধু পুরুষই হব।” মেঘ চোখভরা আকুতি নিয়ে ফের প্রশ্ন করল, ” আপনি যদি সমুদ্রে নাই নিবেন তাহলে ঘুমের মধ্যে আমাকে হা*ইজ্যা*ক করে এনেছিলেন কেনো?” মেঘের মুখে এমন কথা শুনে আবির ফিক করে হেসে উঠল। কণ্ঠস্বরে কোমলতা মিশিয়ে বলল, ” বিয়ে করা বউকে হানিমুনে এনেছি তারজন্য এত বড় কথা! আজই বউয়ের মুখে হা*ইজ্যা*কার শুনতে হচ্ছে, এ জীবন রেখে কি হবে?” মেঘ ভ্রু কুঁচকে রাগী চোখে তাকিয়ে আছে, আবির এক মনে হেসেই যাচ্ছে। মেঘ কিছু না বলেই উঠে বারান্দায় চলে গেল। আবির বেশ কয়েকবার ডেকেছে কিন্তু মেঘ রুমে আসার নাম ই নিচ্ছে না। আবির বিছানা থেকে উঠে বারান্দায় গিয়ে মেঘের পাশ ঘেঁষে দাঁড়ালো। মেঘের চুলের শক্ত বাঁধন খুলে চুলগুলো উন্মুক্ত করে দিল, মেঘের সুদীর্ঘ কেশরাশি বাতাসে এলোমেলো ভাবে উড়ছে। মেঘ চোখ ঘুরিয়ে আবিরের দিকে তাকালো তবে কিছুই বলল না। আবির মুচকি হেসে আস্তে করে বলল, “হৃদয়ে প্রেমের আগুন জ্বালিয়ে অভিমানে কেনো যেতে চাও অন্তরালে?” মেঘের নিরবতা দেখে আবির মোলায়েম কণ্ঠে ফের বলল, “রাগ করে না জানু, বিকেলে ঘুরতে নিয়ে যাব।” “আপনি রুমে যান, আপনার সাথে কোনো কথা

নেই।” “সত্যি তো?” “হ্যাঁ।” “ঠিক আছে।” আবির ভাব নিয়ে রুমে চলে আসছে ঠিকই কিন্তু মেঘ আর আসছে না। ৫ মিনিট পেরিয়ে ১০ মিনিট হতে চলল, মেঘের রুমে আসার কোনো নামই নেই। আবির ফোন হাতে নিয়ে রাকিবের নাম্বারে কল দিল। রাকিব কল রিসিভ করেই গুরুগম্ভীর কণ্ঠে বলল, “খুব সুখে আছিস না? দরকারে কল দিলেও রিসিভ করার প্রয়োজন মনে করিস না। বউ পেলে আগেই তো সব ভুলে যেতিস এখন আর কি বলব। শুধু একটা কথায় বলি, বউ কিন্তু আমারও আছে।” আবির রাকিবের কথার প্রতিত্তোরে কিছু না বলে হঠাৎ ই উচ্চস্বরে বলতে শুরু করল, ” রাকিব রে, তুই ঠিকই বলেছিলি। ” রাকিব থতমত খেয়ে জিজ্ঞেস করল, ” আমি আবার কি বলেছিলাম?” আবির দাঁতে দাঁত চেপে বিড়বিড় করল, ” চুপ থাক।” আবির প্রগাঢ় কণ্ঠে ফের বলল, ” বিয়ে তো করেছি। কিন্তু এখন বুঝতেছি, তুই যা বলেছিলি একদম ঠিক বলেছিলি। ভেবেছিলাম বিয়ে করলে সব ঠিক হয়ে যাবে কিন্তু আমি ভুল ছিলাম। এই দু’দিনেই আমি আমার গার্লফ্রেন্ডের শূন্যতা উপলব্ধি করতে পারছি।” ওপাশ থেকে রাকিব চাপা স্বরে বলছে, ” কত নাটক করে বিয়ে টা করলি, এখন আবার গার্লফ্রেন্ড খুঁজিস। হারামি কোথাকার ” আবির কন্ঠ তিনগুণ শৃঙ্গে তুলে আবারও বলে উঠল, “রাকিব, তুই তাকে বলে দিস, আমি খুব মিস করছি তাকে।” মেঘ রুমে আসতেই আবির ফিসফিস করে বলে উঠল, ” কাজ হয়ে গেছে, রাখি এখন।” মেঘ রাগান্বিত কণ্ঠে হুঙ্কার দিল, “আপনি কাকে মিস করছেন?” আবির

অন্যমনস্কভাবে উত্তর দিল, “আমার গার্লফ্রেন্ড কে।” “কে সে?” “ছিল কোনো এক মায়াবতী।” ” একদম ফাজলামো করবেন না, আমি কিন্তু সিরিয়াস।” “আমিও সিরিয়াস। তুমি বিশ্বাস করবে না সে আমাকে পাগলের মতো ভালোবাসতো। আমাকে দেখার জন্য দিনরাত ছটফট করতো। আমার সাথে কথা বলার জন্য, ঘুরতে যাওয়ার জন্য দিওয়ানা ছিল। অথচ তুমি!” সামান্য কথাতেই মেঘের দু-চোখ টলমল করছে, একরাশ মন খারাপে মুহুর্তেই মনের উঠোনে অন্ধকার নেমেছে, বুকের বাম পাশে তীব্র যন্ত্রণা হচ্ছে। মেঘের মন বলছে, ” আবির মেঘ ব্যতীত অন্য কাউকে ভালোবাসতেই পারে না।” কিন্তু মস্তিষ্ক যেন মনের কথা বুঝতেই চাইছে না, তিক্ততায় বিষিয়ে দিচ্ছে মেঘের কোমল মনটাকে। আবির মুড নিয়ে অন্যদিকে তাকিয়ে আছে, আচমকা নাক টানার শব্দে আবির দৃষ্টি ফেরাল। মেঘের চোখ মুখ দেখে আতঙ্কে বিছানা থেকে নেমে মেঘের দু বাহু চেপে ধরে আদুরে কণ্ঠে শুধালো, ” এই, কি হয়েছে তোমার?” মেঘের নিস্তব্ধতা দেখে আবির ভীতিকর কণ্ঠে বলতে শুরু করল, ” আগেই বলে দিচ্ছি, একদম কাঁদবে না। তোমার বাপের কলিজার টুকরাটাকে আমি নিয়ে আসছি। যত্নে না রাখতে পারলে আমাকে সোজা জে*লে*র ভা*ত খাওয়াবে।” মেঘ শীতল চোখে তাকিয়ে কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে জানতে চাইল, ” আপনার কি সত্যি গার্লফ্রেন্ড আছে? ” আবির নিঃশব্দে হেসে মেঘের কাঁধের উপর আলতোভাবে হাত রেখে মোলায়েম কণ্ঠে বলল, ” হ্যাঁ আছে তো, এইযে আমার সামনে। আগে আবিরের নাম শুনলেই যার বুকে

তোলপাড় চলতো । আবিরকে দেখার জন্য রাতের পর রাত ব্যালকনিতে অপেক্ষা করতো, না খেয়ে বসে থাকতো। সময়ে অসময়ে আবিরকে দেখার জন্য কারণ ছাড়ায় আশেপাশে ঘুরঘুর করতো। অভিমানে গাল ফুলাতো, সেই অভিমান ভুলে আবারও আবিরের প্রণয়ে আসক্ত হতো। সে প্রেমিকা না হলে আর কি বলো?" আবির ভ্রু গুটিয়ে ধীর কণ্ঠে ফের বলল, " বউ, তুমি প্রেমিকা হিসেবেই ভালো ছিলে কারণ তখন তুমি আমার জন্য উন্মাদ ছিলে। মনে হচ্ছে বিয়ের পর তুমি সুস্থ হয়ে গেছ তাই আমার প্রতি তোমার পাগলামিও কমে এসেছে।" মেঘ আবিরের চোখের দিকে তাকিয়ে আনমনে হাসলো। আবির কিছু বলতে যাবে তার আগেই মেঘ নিচু হয়ে নিজের কাঁধে থাকা আবিরের হাত ছাড়িয়ে বিছানার উপর উঠে দাঁড়িয়েছে। তৎক্ষনাৎ আবিরের শার্টের কলার চেপে আবিরকে নিজের দিকে ঘুরালো। আবির বিপুল চোখে মেঘের দিকে তাকিয়ে আছে। মেঘের গাল আর নাকের ডগা লাল টকটকে হয়ে আছে তবে তার গভীর চোখে উৎকণ্ঠার রেশ মাত্র নেই। আবিরের কপালে পড়ে থাকা অগোছালো চুলগুলো খুব যত্নসহকারে গুছিয়ে কিছুটা ঝুঁকে মেঘ অকস্মাৎ আবিরের কপালে নিগূঢ় চুমু দিল। আবিরের প্রশস্ত দুচোখ সহসা দ্বিগুণ প্রশস্ত হয়ে গেছে, নিঃশ্বাস আঁটকে গেছে । মেঘ কিছুটা সরতেই আবিরের বিমোহিত চাহনির মুখোমুখি হলো। আবিরের চাহনি দেখে মেঘ ভেতরে ভেতরে লজ্জায় আড়ষ্ট হচ্ছে ঠিকই তবে বাহিরে প্রকাশ করলো না। মেঘ ঢোক গিলে সঙ্গে সঙ্গে আবিরের অধরে নিজের অধর চেপে

ধরেছে। আবির তড়িৎ বেগে মেঘের পেটে বরাবর ধরে মেঘকে বিছানা থেকে নামিয়ে নিজের সঙ্গে চেপে ধরেছে । মেঘের পা আবিরের পায়ের উপর, দুইটা দেহ একসঙ্গে লেপ্টে আছে, মেঘের পাতলা অধর আবিরের নিয়ন্ত্রণে। আবিরের নিখাঁদ ভালোবাসায় মেঘ আবারও ধরা দিতে বাধ্য হলো, দুচোখ বন্ধ করে শার্টের উপর দিয়ে আবিরের পিঠ থামছে ধরেছে। ২৪ ঘন্টা পেরিয়ে যাচ্ছে, তানভিরের সাথে বন্যার কোনো কথায় হচ্ছে না। বন্যা বেশকয়েকবার ফোন হাতে নিয়েছে ঠিকই কিন্তু সাহস করে তানভিরের নাম্বারে কল দিতে পারছে না। অনেক ভাবনাচিন্তার পর বন্যা তানভিরের নাম্বারে কল দিল কিন্তু তানভিরের নাম্বার বন্ধ। বন্যা ভ্রু কুঁচকে নাম্বারটা চেক করে আবারও কল দিল। তানভিরের নাম্বার বন্ধ পেয়ে বন্যার বুক কাঁপছে, ঘনঘন নিঃশ্বাস ফেলছে। চোখের সামনে আয়েশার থা*প্পড়ের ঘটনাটা বার বার মনে পড়ছে। বন্যার কপাল চাপড়ে রাশভারি কণ্ঠে বলল, “সবসময় রাগ নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারিস তাহলে কাল কোনো পারলি না, বন্যা? ওনাকে কিছু না বললে কি হচ্ছিলো না তোর?” তানভির ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ কোথাও এক্টিভ নেই, ভয়ে বন্যার হাত পা ঠান্ডা হয়ে আসছে। মেঘের নাম্বারে কল দিতে গিয়েও আঁটকে গেছে। দিশাবিশা না পেয়ে আইরিনের দেয়া একটা নাম্বারে কল দিল। মূলত ফোনটা মাহমুদা খানের। আইরিন কল রিসিভ করে ফিসফিস করে বলল, ” ভাবি, কোথায় তুমি?” “বাসায়, কেনো?” “তানভির ভাইয়া গতকাল সন্ধ্যার পর বাসায় এসে একটু পর সেই যে বের হয়েছিল,

এখনও বাসায় আসে নি। বাসার সবাই খুব টেনশন করছে। তোমার সাথে কি কথা হয়েছে?” “না। কিন্তু ওনি কোথায়?” “জানি না। ফোন বন্ধ, ভাইয়ার বন্ধুরাও কিছু জানে না। এখন রাখছি, কেউ দেখে ফেললে আবার বকা খেতে হবে। ” “শুনো..” আইরিন কল কেটে দিয়েছে, বন্যা দু’হাতে মাথা চেপে নির্বিকার ভঙ্গিতে বসে আছে। তানভিরের রাগ আর জেদ সম্পর্কে বন্যার খুব ভালোই ধারণা আছে। জেনে বুঝে এত বড় ভুল কিভাবে করল সেসব ভেবেই ক্লান্ত হয়ে যাচ্ছে। বন্যার চিৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছে করছে কিন্তু সেটাও পারছে না কারণ বাসার কেউ টের পেলে এই নিয়ে অশান্তি সৃষ্টি হবে। খান বাড়িতে তুলকালাম কান্ড চলছে। তানভিরের কি হয়েছে সেটা জানতে সবাই উঠেপড়ে লেগেছে কিন্তু কেউ ই কিছু বলতে পারছে না। এক পর্যায়ে আলী আহমদ খান আবিরের নাম্বারে কল দিল। মেঘ তখন ওয়াশরুমে, আবির কল রিসিভ করে বারান্দায় চলে গেছে। আলী আহমদ খান গম্ভীর গলায় বললেন, ” তোমার ভাইয়ের কি হয়েছে?” আবির ভ্রু কুঁচকে বলল, ” জানি না, আমার সাথে কথা হয় নি। ” “ওর ফোন বন্ধ, গতরাত থেকে বাসায় নেই। কি শুরু করেছো তোমরা? কিছু হওয়ার আগেই তুমি বাড়ি ছেড়ে চলে যাও, তোমার দেখাদেখি তানভিরও শুরু করেছে। ওর যদি কাউকে পছন্দ থাকে তাহলে বলো, বিয়ের ব্যবস্থা করি। কিন্তু এভাবে কাউকে কিছু না বলে বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার কি মানে?” আবির ঢোক গিলে শান্ত কণ্ঠে বলল, ” তেমন সিরিয়াস কিছু তো আমি জানি না, এখানে আসার পর

ওর সাথে আমার কোনোরকম কথায় হয় নি। আমার ওর সাথে আগে কথা বলতে হবে।” “ঠিক আছে, দেখো কোনোভাবে যোগাযোগ করতে পারো কি না। আর যাই হোক, পছন্দ থাকলে আগেভাগেই জানিয়ো।” “জ্বি আব্বু।” আলী আহমদ খান ফের বললেন, ” খোঁজ নিও, তোমার মতো আবার গোপনে বিয়ে করে ফেলেছে কিনা!” আবির উদ্বিগ্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করল, ” মানে?” “এখন আর মানে মানে করতে হবে না। তুমি যে আরও তিনবছর আগেই কাবিনের কাজ সেরে ফেলেছো এটা আমি খুব ভালোভাবেই জানি। শুধু আমি না, এখন বাসার সবাই জানে।” ” আপনাকে কে বলেছে?” “কে আবার বলবে, তোমার প্রাণপ্রিয় ভাই তানভির। তোমার বিয়েতে আমি যেন কোনো প্রকার বাঁধা সৃষ্টি না করি তারজন্য আমার পায়ে ধরা শুধু বাকি রেখেছে। আমি মানছিলাম না বলে এক পর্যায়ে নিজের ঘাড়ে তোমাদের বিয়ের সব দায় নিয়ে বহুবার রিকুয়েষ্ট করে আমাকে রাজি করিয়েছে। ভেবো না তোমার বিয়েতে আমি এমনি এমনি রাজি হয়ে গিয়েছি। আমি শুধু তানভিরের অসহায় মুখটা দেখে রাজি হয়েছি। আমি যদি সেদিন রাজি না হতাম তাহলে তোমাদের ভাইয়ে ভাইয়ে সম্পর্ক নষ্ট হতো যেটা আমি কোনোদিনও চাই না। আমি যেমন আমার ভাইদের সবসময় আগলে রেখেছি আমি চাই তোমাদের সম্পর্কটাও এরকম থাকুক। তাই আবারও বলছি, তানভিরের সম্পর্কে এমন কিছু জানলে আগেই জানিয়ে দাও।” আবির তপ্ত স্বরে জানাল, ” আমি তানভিরের সাথে যোগাযোগ করে তারপর আপনার সাথে কথা বলবো। আপনার চিন্তা

করতে হবে না।” “ঠিক আছে। তানভিরের সাথে কথা হলে, বাসায় আসতে বলো।” “জ্বি আচ্ছা।” আবির প্রভূত আঁখিতে দূরের আকাশে চেয়ে আছে। ‘মেঘকে না পেলে আবির ম*রে যাবে’ এই কথা আলী আহমদ খানকে বলায় আবির তানভিরের উপর নিজের রাগ ঝেড়েছিল অথচ তাদের বিয়ে কোনো ঝামেলা ছাড়া সম্পন্ন হবার পেছনে তানভিরের হাত ছিল এটা জেনে আজ আবিরের খুব খারাপ লাগছে। তানভিরকে জড়িয়ে ধরতে হাজার বার ধন্যবাদ দিতে ইচ্ছে করছে। আবির সঙ্গে সঙ্গে তানভিরের নাম্বারে কল দিল, সবার মতো আবিরও নাম্বার বন্ধই পেল। আবির কল দিতে দিতে আনমনে রুমে ঢুকতেই মেঘের লম্বা চুল আবিরের চোখে মুখে লাগে। মেঘের ভেজা চুলের পানিতে আবির মুখ সহ গলা পর্যন্ত ভিজে গেছে। মেঘ পেছনে ঘুরে আবিরকে দেখেই ভীত কণ্ঠে বলতে শুরু করল, “সরি, সরি। আমি সত্যি আপনাকে দেখি নি।” আবির মুচকি হেসে বলল, ” বিয়ের পর বউয়ের ভেজা চুল চোখে মুখে না লাগলে বিয়ের ফিল ই আসে না। যাক অবশেষে নিজেকে সর্বাঙ্গীণ স্বামী মনে হচ্ছে। ” মেঘ চিবুক নামিয়ে কয়েক কদম পেছাতেই আবির আশ্চর্য নয়নে তাকালো। মেঘের পড়নে আবিরের একটা সাদা শার্ট সঙ্গে প্লাজু, গলায় একটা স্কার্ফ ওড়না পেচানো। আবির বিস্তীর্ণ আঁখিতে তাকিয়ে আছে। মেঘ চোখ তুলে তাকিয়ে কিঞ্চিৎ হেসে বলল, “এভাবে তাকিয়ে আছেন কেনো? সুন্দর লাগছে না?” “খুব।” মেঘ মোলায়েম কণ্ঠে বলল, “ঘুরতে যখন নিয়েই যাবেন না তখন এত সুন্দর ড্রেস আর শাড়ি পড়ে

কি হবে? তাই রাগ করে আপনার শার্ট পড়ে ফেলেছি। একবার বলুন ঘুরতে নিয়ে যাবেন, তাহলে এখনই সাজুগুজু করবো।” আবির মৃদুস্বরে বলল, “থাক না, এভাবেই ভালো লাগছে। কাছে আসো হাতাটা ঠিক করে দেই।” মেঘ ভেঙচি কেটে বিড়বিড় করল, ” আমি আপনার নতুন শার্ট পড়ে নিয়েছি, আপনার কি রাগ লাগছে না?” “যেখানে আমিই তোমার সেখানে শার্ট আর এমনকি। এদিকে আসো। ” মেঘ এগিয়ে আসলো। আবির মেঘের পড়নের শার্টের হাতা ফোল্ড করতে করতে ধীর কণ্ঠে শুধালো, “বন্যার সাথে ইদানীং কোনো কথা হয়েছে?” “না, কেনো?” “তানভিরের সাথে বন্যার মনে হয় কোনো ঝামেলা হয়েছে। সাকিব কাল মেসেজ দিয়ে শুধু বলেছিল, তানভির বন্যার সাথে আলাদাভাবে কথা বলতে যাচ্ছে। কিন্তু তারপর কি হয়েছে সে জানে না। তানভিরও নাকি কিছু বলে নি। একটু আগে আব্বু কল দিয়েছিল, বললেন রাত থেকে তানভির বাসায় নেই। ” মেঘ শীতল কণ্ঠে শুধালো, “বাসায় নেই মানে? কোথায় গেছে?” “কেউ ই জানে না, তানভিরের ফোন বন্ধ। বন্যাকে কল দিয়ে জিজ্ঞেস করো কোনো সমস্যা কি না!” “আচ্ছা। ” মেঘ সঙ্গে সঙ্গে বন্যার নাম্বারে কল দিল, বন্যা কল রিসিভ করে স্বাভাবিক কণ্ঠে জানতে চাইল, “কিরে, কেমন আছিস?” মেঘ উত্তর না দিয়ে উল্টো গুরুভার কণ্ঠে বলে উঠল, ” এই তার ছিঁড়া, বদের হাড্ডি। তুই আমার ভাইকে কি বলেছিস?” আবির রাগান্বিত কণ্ঠে হুঙ্কার দিল, ” এসব কি ধরনের ভাষা?” মেঘ আড়চোখে আবিরের দিকে তাকিয়ে বেকুবের মতো হাসলো। আবির যে

তার পাশে বসা এটা কয়েক সেকেন্ডের জন্য মেঘ ভুলেই গিয়েছিল। মেঘ আস্তে করে ঢোক গিলে শান্ত কণ্ঠে বলল, " ভাবি, আপনি আমার ভাইকে কি বলেছিলেন?" আবির মৃদু হাসল। বন্যা উষ্ণ স্বরে বলতে শুরু করল, " আমার যা ঠিক মনে হয়েছে তাই বলেছি। ওনাকে আমার ভালো লাগে বলে এই না আমি আমার পরিবারের অমতে গিয়ে সব সিদ্ধান্ত নিয়ে নিব। ওনি আমার কথা ঠিকমতো না বুঝেই ফোন বন্ধ করে ফেলেছেন, এতে আমি কি করব? ওনি ছেলে মানুষ তাই রাগ করে ফোন বন্ধ করে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে পারেন আর আমি মেয়ে বলে সেসব কিছুই করতে পারি না। তুই তোর ভাইয়ের পক্ষ নিয়ে আমাকে বলতে আসছিস, আজ আমার পক্ষে কেউ নেই বলে তোদের কিছু বলতে পারে না। দিনশেষে তোদেরই সব আছে, আমি আর আমাদের কিছুই নেই।" বন্যা কথা শেষ করে সঙ্গে সঙ্গে কল কেটে দিয়েছে। মেঘ আবিরের দিকে অসহায় মুখ করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে ফোন রেখে দু'হাতে আবিরের হাত আঁকড়ে ধরে মাথা এলিয়ে দিয়ে আস্তে করে বলল, " বন্যা পা*গল হয়ে গেছে।" "এখন তোমার কি হয়েছে?" "ওদের চিন্তায় আমার মাথা ঘুরছে।" আবির কিছু না বলেই আসিফের নাম্বারে কল দিল। রিসিভ করতেই আবির একদমে বলতে শুরু করল, " ভাইয়া, আমি তোমাদের বিয়ে, হানিমুন আটকিয়েছিলাম তারজন্য আন্তরিকভাবে দুঃখিত। আমার পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য স্পেশাল অফার, আগামীকাল থেকে ৩ দিন আমার পক্ষ থেকে তোমাদের হানিমুন অফার। আইরিন, আরিফ, মীম,

তানভির সবাইকে নিয়ে আসবে। ২-১ জন স্পেশাল গেস্ট আছে তাদেরকেও নিয়ে আসবে। বুঝতে পেরেছো?" আসিফ ভারী কণ্ঠে বলল, " এটা কাপল হানিমুন অফার ছিল নাকি ফ্যামিলি প্যাকেজ ছিল ভাই?" " আসবেই যখন একা আসবে কেন? এই সুযোগে সবার ইচ্ছে পূরণ হয়ে যাবে। তোমার দায়িত্ব শুধু ওদের নিয়ে আসা, তারপর তোমাদের মুক্তি।" "তানভিরকে কোথায় পাবো? ওর ফোন তো বন্ধ। " "সেসব আমি দেখছি। তুমি কাল সবাইকে নিয়ে আসবে এটায় ফাইনাল।" " আচ্ছা।"আকাশ জুড়ে রগরগে তারার মেলা, প্রকৃতি ছেয়ে আছে অদ্ভুত শীতলতায়। সমুদ্রের ঊর্মিল ঢেউ শরীরের সাথে সাথে মনকেও প্রাণবন্ত করে তুলছে। মেঘ আবিরের হাতে হাত রেখে সমুদ্রের পাড়ে হাঁটছে, চোখে মুখে উজ্জ্বলতা। অদ্ভুত এক ভালোলাগায় মন অশান্ত হয়ে উঠেছে। সমুদ্রের পানি আপন বেগে এসে দু'জনের পা ভিজিয়ে দিচ্ছে। মেঘ সীমাহীন সমুদ্রের পানে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে আচমকা আবিরের অভিমুখে তাকায়। আবির মেঘের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে উদ্দীপ্ত কণ্ঠে বলল, " আমি যেদিন প্রথমবারের মতো কক্সবাজার এসেছিলাম, সেদিনই মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম এরপর আসলে তোমাকে নিয়েই আসবো। তানভির অবশ্য আগেও কয়েকবার বলেছিল, তোমাদের সবাইকে নিয়ে আসার জন্য। কিন্তু আমিই রাজি হয় নি।" "কেনো?" " বাড়িতে আবেগ নিয়ন্ত্রণ করে চলেছি বলে এই না যে আমি অনুভূতিহীন ছিলাম। বউয়ের সাথে বোনের মতো আচরণ করা কতটা শাস্তিস্বরূপ, এটা তুমি কি বুঝবে! তখন তোমাদের নিয়ে

আসলে নিজেকে কোনভাবেই নিয়ন্ত্রণ করতে পারতাম না।” মেঘ আবিরের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল।ঘন্টাখানেক ঘুরে ডিনার করে দু’জন একটু রাত করেই রিসোর্টে ফিরেছে। আবির মেঘের ফোন থেকে বন্যার নাম্বার বের করতে যাবে অকস্মাৎ আবিরের নাম্বার টা চোখে পড়ল। আবির মৃদু হেসে ‘আমার আবির’ এর পেছন থেকে ভাই শব্দটা ডিলিট করে দিয়েছে। বন্যার নাম্বার বের করে একটা মেসেজ লিখে পাঠিয়ে দিয়েছে। মেঘ বিকেল থেকে বন্যার বোনকে কম করে হলেও ৫০ বার কল দিয়েছে, রিদকে বলামাত্রই কক্সবাজার আসতে রাজি হয়ে গেছে। বন্যার বোন শুরুতে রাজি না হলেও মেঘের তুমুল জোরাজোরিতে এক পর্যায়ে বাধ্য হয়ে বন্যাকে পাঠাতে রাজি হয়েছে। মেঘ বলেছিল, বন্যার আপুও যেন তাদের সাথে আসে কিন্তু সময়ের অভাবে ওনি যেতে পারছেন না। বন্যার বাসার সবাই রাজি হলেও বন্যা কক্সবাজার যেতে একদম ই রাজি না। মেঘের অতিরিক্ত জোরাজোরির জন্য এক পর্যায়ে মেঘের কল রিসিভ করাও বন্ধ করে দিয়েছে। মেঘ শুয়ে শুয়ে অনর্গল তানভির আর বন্যার কথা বলেই চলেছে। আবির অনেকক্ষণ যাবৎ ট্রাই করতে করতে একসময় তানভিরের ফোনে কল ঢুকেছে। তানভির কল রিসিভ করে স্বাভাবিক কণ্ঠে জানতে চাইল, ” তোমরা কেমন আছো?” আবির উত্তর না দিয়ে তপ্ত স্বরে বলল, ” আগামীকাল ভোরে আসিফ ভাইয়া, ভাবি, আইরিন, মীমরা সবাই কক্সবাজার আসছে। তোর ইচ্ছে হলে তাদের সাথে আসতে পারিস।” তানভির শান্ত কণ্ঠে বলল, ” আমার আপাতত ইচ্ছে

নেই, তোমরা আনন্দ করো।” আবির ভারী কণ্ঠে বলে উঠল, ” সমস্যা নেই, তোর ইচ্ছে না থাকলে মনের বিরুদ্ধে আসতে হবে না। বন্যা আর তার ভাইও আসবে এই আর কি! ঠিক আছে। রাখি তাহলে।” “বন্যা কক্সবাজার যাবে?” “হ্যাঁ” “আমাদের সাথে? মানে আসিফ ভাইয়া, মীম, আইরিন ওদের সাথে?” “হ্যাঁ, তুই তো আসবি না। থাক তাহলে।” তানভির স্বাভাবিক কণ্ঠে জানতে চাইল, “কয়টায় রওনা দিবে?” “আমি জানি না, আসিফ ভাইয়া জানে।” “আমি আসিফ ভাইয়াকে কল দিচ্ছি।” “তোর ইচ্ছা। ” আবির কল কেটে মেঘের দিকে তাকিয়ে ভ্রু নাচালো। মেঘ সহাস্যে বলে উঠল, ” আপনার মাথায় এত বুদ্ধি কোথা থেকে আসে?” ” এসব তো কিছুই না, আমার মাথায় অন্য কিছু ঘুরছে।” “কি?” “এখন বলবো না, আগে ওদের অবস্থা টা বুঝি তারপর। ” “আপনি যে ভাইয়াকে বলে দিলেন, বন্যা আসবে। বন্যা যদি না আসে?” “তোমার বান্ধবীকে এমন এক মেসেজ পাঠিয়েছি তার ইচ্ছে না থাকলেও আসতে বাধ্য। ” “কি মেসেজ?” আবির মেঘের ফোন মেঘের হাতে দিয়ে বলল, “দেখো।” মেসেজে লেখা, ” শুরুতেই সরি বলে নিচ্ছি কারণ খুব সম্ভবত আমি আমার দেয়া কথা রাখতে পারবো না। আপনাকে ভাবি বানানোর ইচ্ছে অচিরেই ভুলে যেতে হবে। আপনি ভাইয়াকে কি বলেছেন আমি জানি না, কিন্তু তারপর থেকে ভাইয়ার মনের অবস্থা খুব খারাপ। ভাইয়ার অবস্থা দেখে বাসার সবাই সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভাইয়ার মন ভালো না হলে, ৭২ ঘন্টা পরে ভাইয়াকে বিয়ে করাবে। পাত্রীও রেডি আছে। আপনি

সম্মতি না দিলে আমরা কিছুই করতে পারছি না। ভাইয়া রাগ করে বাসা থেকে বেড়িয়ে গেছে। তবে ৭২ ঘন্টার মধ্যে সঠিক সমাধানে না আসতে পারলে ৭২ ঘন্টা পর পরিবারের পছন্দকেই মেনে নিতে হবে। আপনি যদি আমার ভাইকে পছন্দ করেন তাহলে আগামীকাল তাদের সাথে কক্সবাজার আসবেন, আর যদি মনে করেন আপনার আমার ভাইয়াকে প্রয়োজন নেই তাহলে ৭২ ঘন্টা পর আপনার আমাদের বাসায় বিয়ের দাওয়াত রইল। আপন ভাবি হতে না পারলেও দূরসম্পর্কের ভাবির সমান মূল্যায়ন করবো। আপনার জীবন আপনার সিদ্ধান্ত। ভালো থাকবেন, আপন ভাবি বলতে পারছি না তাই আবারও সরি।" মেঘ মেসেজ পড়ে হাসবে নাকি মন খারাপ করবে সেটাও বুঝতে পারছে না। হঠাৎ ই প্রশ্ন করল, " আপনি যে মেসেজ পাঠিয়েছেন, বন্যা যদি বুঝে যায়?" "বুঝলে বুঝবে। আজ না হয় কাল সে আমাদের বাড়ির বউ হলে সবকিছুই জানবে। কিন্তু আপাতত তাদের মধ্যেকার ঝামেলা মেটানো প্রয়োজন। " মেঘ অকস্মাৎ আহ্লাদী কণ্ঠে বললে উঠল, " বন্যাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ভাবি বানানোর ব্যবস্থা করুন, প্লিজ। আমার আর ভালো লাগছে না।" আবির মোলায়েম কণ্ঠে জানতে চাইল, " তুমি তাই চাও?" "হুমম।" " ঠিক আছে, ম্যাডাম। তুমি যা চাইবে তাই হবে।" বন্যা কাঁথা দিয়ে চোখমুখ ঢেকে শুয়ে আছে। সব কাজ শেষ করে বন্যার বোন রুমে আসছে। বন্যাকে এভাবে শুয়ে থাকতে দেখে শক্ত কণ্ঠে বলল, " কি হয়েছে তোর?" বন্যা নাক বরাবর কাঁথা নামিয়ে মৃদু স্বরে বলল, " কিছু হয়

নি।” “ব্যাগ গুছিয়েছিস?” “না।” “কেনো?” “আমি যাব না।” বন্যার বোন বন্যার পাশে বসে কোমল কণ্ঠে বলতে শুরু করল, ” ওদের বাসার কেউ কি তোর সাথে বাজে ব্যবহার করেছে? বিয়েতে কি কোনোরকম অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটেছে?” “না ” “তাহলে মন খারাপ করে আছিস কেনো?” ” মন খারাপ না।” “মেঘ, ওর হাসবেন্ড দু’জনেই খুব করে রিকুয়েষ্ট করছে। আব্বুর সাথে কথা বলে রাজিও করিয়েছে। তোর এখন কি হলো? আমি টাকা দিয়ে দিচ্ছি, রিদ আর তোর যত খরচ লাগে সব এখান থেকে করিস। উঠে প্যাকিং কর।” বন্যার শীতল চোখে বোনের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। বন্যার বোন ঠান্ডা কণ্ঠে হুঙ্কার দিল, “কি বললাম তোকে?” বন্যা উঠে বসেছে। বন্যার বোন শান্ত কণ্ঠে বলে উঠল, “তুই মন খারাপ করে থাকলে আমার ভালো লাগে না, কোনো বুঝিস না তুই? তিনদিনের মধ্যে ঘুরেফিরে মন ভালো করে বাসায় আসবি। আগামী শুক্রবার আমার বিয়ে জানিস তো? এই অবস্থাতেও তোকে ঘুরতে যেতে দিচ্ছি শুধুমাত্র তোর মন ভালো করার জন্য। তাই কোনোভাবেই মন খারাপ করে থাকা যাবে না, ওকে?” বন্যা মলিন হেসে বলল, “ওকে” সকাল সকাল সবাই কক্সবাজারের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছে। মীম, আইরিন আর বন্যা পাশাপাশি বসেছে। তানভির, রিদ আর আরিফ বিপরীত পাশে। আসিফ আর জান্নাত আলাদা বসেছে। মীম, আইরিন, আরিফ মিলে রিদের সাথে টুকটাক দুষ্টামি করছে। রিদ বয়সে আইরিন আর মীমের মতোই। বন্যা কারো সাথে তেমন কোনো কথায় বলছে না,

নির্বাক চোখে শুধু তানভিরকেই দেখছে। তানভির প্রায় পুরো রাস্তায় চোখ বন্ধ করে বসে ছিল। দু একটা কথা বললেও বন্যার সাথে না কোনো কথা বলেছে আর না একবারের জন্যও তাকিয়েছে। মেঘ আর আবির আগে থেকেই ওদের জন্য অপেক্ষা করছে। মেঘ আজ সবুজ রঙের মোটামুটি গর্জিয়াছ একটা শাড়ি পড়েছে, যদিও শাড়িটা আবিরই পড়িয়ে দিয়েছে। মেঘের শাড়ির সাথে মোটামুটি ম্যাচিং করে আবিরও একটা সবুজ পাঞ্জাবি পড়েছে। মীম, আইরিনরা নেমেই ছুটে মেঘের কাছে চলে গেছে। তাদের সাথে সাথে রিদও মেঘের সাথে কথা বলতে চলে গেছে। তানভির নামতেই আবির এগিয়ে এসে তানভিরকে জড়িয়ে ধরল। তানভির জিজ্ঞেস করল, “কি হয়েছে ভাইয়া?” “তোকে জড়িয়ে ধরতে খুব ইচ্ছে করছিলো।” মনের ভেতরের চাপা কষ্টের জন্য মন খুলে হাসতেও পারছে না তবুও তানভির মলিন হাসার চেষ্টা করল। সবাই ফ্রেশ হয়ে নাস্তা করেই ঘুরতে বেড়িয়েছে। আইরিন আর আরিফ দুই ভাই বোন এটা সেটা নিয়ে ফাজলামো করছে আবার বড় আপুকে ভিডিও কল দিয়ে সমুদ্র সৈকত দেখাচ্ছে। মীম আর রিদ টুকটাক কথা বলছে। রিদ এর আগে কোথায় কোথায় ঘুরতে গিয়েছিল, কার সাথে গিয়েছিল, এখানে কেন আসছে সেসব নিয়েই গল্প করছে। মেঘ আর বন্যা কিছুটা দূরে, মেঘ ধীর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, ” তোর আর ভাইয়ার মধ্যে কি হয়েছে? ” “কিছু না।” “কিছু তো অবশ্যই হয়েছে। ভাইয়া কি তোর সাথে রাগারাগি করেছে?” “না।” “তাহলে?” ” আমি ওনার সাথে রাগ দেখিয়েছি।” “কেনো?”

“জানি না।” এদিকে আবিরও তানভিরকে বার বার জিজ্ঞেস করছে কিন্তু তানভির সরাসরি কোনো উত্তর ই দিচ্ছে না। তানভিরের নিস্তব্ধতায় আবিরের মেজাজ চরমভাবে খারাপ হচ্ছে। ঘুরাঘুরি শেষে যে যার মতো রুমে গেলেও আবির আর তানভির যায় নি। আবির তানভিরের কাঁধে হাত রেখে গম্ভীর কণ্ঠে জানতে চাইল, ” তুই কি ভেবেছিস, নিজের মধ্যে কষ্ট চাপিয়ে রাখলে সব ঠিক হয়ে যাবে?” “ঠিক হবে না জানি তবুও আমি কারো সুখের সময়ে দুঃস্বপ্ন হতে চাই না।” ” কোন দুঃস্বপ্নের কথা বলছিস? তুই খুব ভালো করেই জানিস তুই না থাকলে আমার সুখের স্বপ্নগুলো এখনও দুঃস্বপ্ন হয়েই থাকতো। তুই আমার ভাই হয়ে আমাকে না জানিয়ে এত বড় কাজ করেছিলি বলে আমি অভিমান করে তোকে না জানিয়ে তোর বোনকে এখানে নিয়ে আসছিলাম। কিন্তু তোর দুঃখ ভুলে আমি সুখের সময় কাটাতে পারতাম না ভাই। তাই বাধ্য হয়ে তোদের জোর করে এখানে আনিয়েছি। এখন বল তোর কি হয়েছে?” “আমি নিয়তির কাছে আবারও হেরে গেলাম ভাইয়া। বন্যার চোখে আমি তানভির অযোগ্য ই রয়ে গেলাম। আমি ভাই হিসেবে যথাযথ হলেও প্রেমিক হিসেবে পরিত্যক্ত। ” “বন্যা কি বলেছে?” ” আমাকে বাস্তবতার তিনপাতা অভিজ্ঞতার অভিব্যক্তি বুঝিয়ে।” আবির মৃদু হেসে বলল, ” এটা আর এমন কি! প্রেমিকার চোখে নিজের প্রেমিক সবসময় নিষ্কর্মা আর অযোগ্যই থাকে। ” “ও ওর পরিবারের সিদ্ধান্তের বাহিরে কিছু করতে পারবে না।” ” পরিবারের সিদ্ধান্তের বাহিরে কিছু করতে বলেছে

কে?” তানভির মুখ ফুলিয়ে রাগী স্বরে বলল, ” ও আমাকে রিজেক্ট করেছে।” আবির উচ্চ শব্দে হেসে বলল, ” রিজেক্ট তাকেই করা যায় যার অবস্থান মন আর মস্তিষ্ক কোথাও নেই। হৃদয়ে জায়গা দেয়া মানুষকে রিজেক্ট করা অসম্ভব। তুই তার উপর রাগ করে ফোন বন্ধ করেছিস আর সেই রাগ সে আমার বউয়ের উপর ঝেড়েছে। কারণ বন্যার প্রিয়মানুষ তুই আর তোর কাছের মানুষ মেঘ। অধিকারবোধ না থাকলে কেউ কারো উপর রাগ দেখায় না তানভির। তুই খুব ভালোভাবেই জানিস, বন্যা বাস্তববাদী একটা মেয়ে। সে তোকে বাস্তবতা নিয়েই জ্ঞান দিবে, এই নিয়ে মন খারাপ করে থাকার কোনো মানে হয় না। ” তানভির কিছু বলছে না দেখে আবির আবারও বলল, ” তুই বন্যার জন্য রাজনীতি ছেড়েছিস এটা কি সে জানে?” “না।” “তুই চাকরির প্রস্তুতি নিচ্ছিস, এটা কি জানে?” “না।” আবির চোখ রাঙিয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে হঠাৎ ই বলে উঠল, ” শুক্রবারে বন্যার বড় আপুর বিয়ে, জানিস কিছু?” ” হ্যাঁ, আপাতত শুধু কাবিন হবে। ৫ থেকে ৬ মাস পর অনুষ্ঠান হবে শুনেছি।” “তোকে কে বলল?” “রিদ।” “বাহ! এখনই শালার সাথে এত মিল। ” “এত মিলের কিছু নেই। আসার সময় বলেছে তাই শুনেছি। ” আবির কয়েক সেকেন্ড চুপ থেকে আচমকা ভারী কণ্ঠে প্রশ্ন করল, ” তোকে শেষবারের মতো জিজ্ঞেস করছি, তুই কি বন্যাকে ভালোবাসিস?” তানভির আবিরের দিকে তাকিয়ে নিরেট কণ্ঠে জবাব দিল, ” হ্যাঁ।” ” এক মুহুর্তের জন্য মেনে নিলাম তুই অযোগ্য কিন্তু তোর ভালোবাসা কি

বিয়ের যোগ্য? নাকি এখনও মনে দুটানা আছে? মনের কোণে অভিশঙ্কা নিয়ে প্রেম হয় কিন্তু সারাজীবন পাশে থাকার সাহস হয় না। তোকে নির্ভীক ভঙ্গিতে বলতে হবে, যেকোনো মূল্যেই হোক বন্যাকে তোর চাই। প্রেমিকা কোনো কারণে রাগ দেখালে প্রেমিকার উপর রাগ করে ফোন বন্ধ করাটা বোকামি বরং প্রেমিকার রাগের কারণ উদঘাটন করাটা একজন আদর্শ প্রেমিকের কর্তব্য। বন্যা তোকে ভালোবাসে তাই ওর রাগ অভিমান প্রকাশের একমাত্র জায়গা তুই। হয়তো মেঘের মতো ও সরাসরি কিছু বলতে পারে না কিন্তু তোর উচিত তার কথার সঠিক মানে বুঝা। ভাই, ভালোবাসার মূল্য ভালোবেসেই দিতে হয়।" তানভির ঢোক গিলে অক্লিষ্ট কণ্ঠে শুধালো, " এখন আমার কি করা উচিত?" আবির মেকি স্বরে বলল, " সামনে সমুদ্র আছে, যা এক বালতি পানি খেয়ে আয়।" "ফাজলামো করো না, প্লিজ।" " সকালে বন্যার সাথে আমি কথা বলবো। তারপর তোর যা ইচ্ছে করিস।" "যা ইচ্ছে? " আবির আড়চোখে তাকিয়ে গুরুভার কণ্ঠে বলল, " রিলাক্স। " তানভির নিঃশব্দে হাসল, সাথে আবিরও হাসল। দুই ভাইয়ের কথাবার্তা শেষ করে রিসোর্টে ফিরতে অনেকটায় দেরি হয়ে গেছে। মেঘ বেঘোরে ঘুমাচ্ছে, আবির রুমে ঢুকে ফ্রেশ হয়ে বিছানায় শুয়েছে। ঘুমন্ত মেঘের শান্ত আদলখানা আজ একটু বেশিই সুন্দর লাগছে। আবির আবেশিত নয়নে মেঘকে দেখছে, এই দেখার কোনো অন্ত নেই। আবিরের হৃদয় জুড়ে যার অস্তিত্ব প্রতিনিয়ত ত*র্জনগ*র্জন দিয়ে উঠে তার সংস্পর্শ পেলেই আবিরের হৃদয়ে প্রশান্তির হাওয়া বয়ে

যায়। দিনশেষে প্রতিটা মানুষ কারো না কারো কাছে দায়বদ্ধ, কারো ভালোবাসায় পরিতৃপ্ত। মেঘের পূর্ণতা যেমন আবির তেমনি আবিরের পূর্ণতাও মেঘ। সুদীর্ঘ সময়ের নিরীক্ষণ শেষে আবির আলতো হাতে মেঘের মসৃণ গাল স্পর্শ করল। মেঘ ঘুমের মধ্যেই আঁতকে উঠেছে। কুণ্ঠায় চোখ মেলতেই আবিরকে দেখতে পেল। আবির সস্নেহে প্রশ্ন করল, " ভয় পেয়েছো?" মেঘ শুকনো ঢোক গিলে কিঞ্চিৎ হাসার চেষ্টা করল। কোনো কথা না বলে আচমকা আবিরের চওড়া বক্ষস্থলে নিজের জায়গা করে নিল। আবির মুচকি হেসে মেঘকে জড়িয়ে ধরে মেঘের চুলে হাত বুলাতে লাগলো। কিছু সময় নিরবতায় কেটে গেল। মেঘ হঠাৎ ই আবিরের উন্মুক্ত বুকে নখ দিয়ে আঁচড় দিতে দিতে ডাকল, " শুনছেন..!" আবির শক্ত কণ্ঠে বলল, " তুমি ডাক শুনার যোগ্যতা কি আমার নেই?" " আছে, কিন্তু " "কিন্তু কি? আমি যদি তুই থেকে তুমিতে আসতে পারি তুমি কেনো আপনি থেকে তুমিতে নামতে পারছো না?" মেঘ মোলায়েম কণ্ঠে বলে উঠল, " তুমি তুমি তুমি। হয়েছে? " "হুমমমমম। এখন বলো আবির " "আবির ভাই।" আবির মেঘের মাথায় আস্তে করে গাট্টা দিয়ে ভারী কণ্ঠে বলল, " আবিরের সাথে ভাইয়ের সম্পর্ক ম*রে গেছে। এখন শুধু আবির আছে। বলো আবির" মেঘ কিছুই বলছে না, তর্জনী আঙুলের নখ দিয়ে আবিরের বুকের উপর A+ M লেখায় ব্যস্ত। মেঘের লেখা শেষ হতেই আবির মেঘের হাত চেপে ধরে মোলায়েম কণ্ঠে বলল, " বুকের উপর A + M লিখতে হবে না, ম্যাডাম। এই নাম হৃদয়ে স্থায়ীভাবে লেখা হয়ে গেছে।

মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এই নাম অক্ষত থাকবে। আপনাকে যেটা বলেছি সেটা বলুন ।” মেঘ বলল, “কি বলব?” ” আবির।” ” আ.. আবির। ” “গুড গার্ল, আবার বলো।” “ইশশ, আর পারবো না। আমি কি স্কুলে পড়তে আসছি নাকি?” “হ্যাঁ, তুমি আবিরের স্কুলে ভালোবাসার ট্রেনিং করতে আসছো, বলো।” “আবির” “এখন পুরোটা বলো” মেঘ শীতল কণ্ঠে বলল, “আবির শুনছো?” আবির নিঃশব্দে হেসে বলল, ” উফফ! তুমি এভাবে ডাকলে আমি বিনাশের দোরগোড়া থেকেও ফিরে আসতে সক্ষম হবো।” মেঘ অতর্কিতে আবিরের বুকে চিমটি কাটল। আবির মৃদুস্বরে ফের বলল, ” কি বলতে চেয়েছিলে, বলো।” “আমি একবার আপনার অফিসে গিয়েছিলাম। আপনার রুমের দেয়ালে D লেখা ছিল। তখন আপনি আমাকে D এর মানে বলেন নি। আপনার বেশকিছু ফেসবুক পোস্টেও D লেখা দেখেছি। এই D এর মানে কি?” “দিলশা।” “দিলশা মানে কি?” “হৃদয়ের রাণী। ছোটবেলা স্কুলে কারো মুখে এই নামটা আমি প্রথম শুনেছিলাম। নামের অর্থ জিজ্ঞেস করায় সে এই অর্থটায় বলেছিল। বাসায় এসে আমার সে কি বায়না, তোমার নাম যেন দিলশা রাখে। এমন আজগুবি নাম শুনে বাসার মানুষ আমার কথা কানেই তুলে নি। তখন মনেকে সান্ত্বনা দিয়েছিলাম, আমার হৃদয়ের রাণীকে শুধু আমিই দিলশা ডাকব। নামটা সুন্দর না?” মেঘ অনুষ্ণ কণ্ঠে বলল, ” হ্যাঁ, খুব সুন্দর। ” “তোমাকে দিলশা ডাকলে রাগ করবে না তো?” “একদম ই না। আপনার যা ইচ্ছে তাই ডাকতে পারেন। আমার আরেকটা প্রশ্ন আছে।” “কি?” “বাসায় যখন আমার

বিয়ের আলোচনা চলছিল তখন কাউকে কিছু না জানিয়ে আপনি প্রথম বিয়েটা ভেঙেছিলেন, দ্বিতীয়বার মীম আপনাকে জানিয়েছিলো। কিন্তু তৃতীয় বার তো মীম বাসায় ছিল না আর আমার কাছেও ফোন ছিল না। আমার জানামতে বাসার কেউই আপনাকে জানায় নি।তখন আপনাকে কি বাহিরের কেউ বলেছিল?" " বাহিরের মানুষ শুধু বাহিরের নিউজ দিতে পারে। বাড়ির ভেতর কি চলে এটা কিন্তু তারা জানে না।" "তাহলে আপনি কিভাবে জেনেছিলেন?" "তোমার আব্বু আমাকে মেসেজ দিয়েছিলেন।" "আব্বু?" "হ্যাঁ" "কিন্তু তখন তো আব্বু খুব রাগারাগি করছিলেন। আমাকে ছেলের সামনে যেতে জোরাজোরি করছিলেন।" " সেসব ওনার প্ল্যান ছিল, আমি বাসায় পৌঁছানোর আগে তোমাকে ছেলেপক্ষের সামনে আনতে পারলে আমি কিভাবে রিয়েক্ট করি সেটায় দেখতে চেয়েছিলেন। সেদিন শুনোনি সবই ওনার পরিকল্পনা ছিল।" "আব্বু মেসেজ দিয়েছে জানার পরও আপনি এত ভীত ছিলেন কেনো?" "মেসেজ যে তোমার আব্বু দিয়েছেন সেটা আমি প্রথমে জানতাম না। অপরিচিত নাম্বার থেকে মেসেজ আসছিল। আমি দেশ ছাড়ার আগের দিন তোমাকে বাসার কাছে নামিয়ে দিয়ে রাকিবদের সাথে বসেছিলাম সেখানেই এক বড় ভাইয়ের সাথে দেখা। ওনি এই সেক্টরে জব করেন। নরমাললি ফেসবুকে এড হয়েছিলাম। বাহিরে থাকাকালীন হঠাৎ আমার ঐ নাম্বারটার কথা মনে পড়ে, কৌতূহল বশত নাম্বার টা ভাইকে পাঠিয়ে বলেছিলেন ডিটেইলস সংগ্রহ করে দিতে পারবে কি না। একদিনের মধ্যে ওনি ডিটেইলস

সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন। সিমটা তোমার আব্বু মানে আমার শ্বশুরের নামে রেজিষ্ট্রেশন করা ছিল। আমি সেদিন বেশ অবাক হয়েছিলাম। ৫০% সিউর ছিলাম ওনি আমাদের কথা জানেন আবার ৫০% সন্দেহও ছিল। তাই তখন বিষয়টাকে সেভাবে গুরুত্ব দেয় নি।" " ভাইয়ার ব্যাপারে কিছু ভেবেছেন?" "সকালে তোমার বান্ধবীর সাথে কথা বলব তারপর যা হোক একটা সিদ্ধান্ত নিব। তুমি আমার সাথে থাকবে।" "আচ্ছা। " "এখন ঘুমাও, ভোরবেলা সূর্যোদয় দেখতে হবে তো?" "হ্যাঁ, শুভ রাত্রি। " "শুভ রাত্রি।" সবাই ঘুমিয়ে পড়লেও পাশাপাশি দুটা রুমে দুই কপোত-কপোতীর চোখে ঘুম নেই। বন্যা, মীম, আইরিনের জন্য একটা রুম নেয়া হয়েছে। মীম, আইরিন ঘুমে তলিয়ে আছে। বন্যা সোফায় হেলান দিয়ে বসে আছে আর বার বার ফোন হাতে নিচ্ছে। তানভিরের নাম্বার বের করে দু একবার কল দেয়ার চেষ্টা করেছে আবার ফোন রেখে দিয়েছে। পাশের রুমে থাকা তানভিরও একইভাবে ছটফট করছে। ভোরে আলো ফোটার আগেই সবাই সমুদ্র সৈকতে পৌঁছে গেছে। তবে জান্নাত আর আসিফকে কেউ ই ডাকে নি। আবির আগেই বলেছিল তাদের বিরক্ত করবে না তাই ইচ্ছে করেই ডাকে নি। তানভির কিছুক্ষণ দাঁড়ালো, মেঘ আর আবিরকে একসঙ্গে কয়েকটা ছবি তুলে দিয়ে চুপচাপ চলে গেছে। কিছুক্ষণ পরেই আসিফ আর জান্নাত আসছে। আবিরের উদ্দেশ্যে রাগান্বিত কণ্ঠে বলল, " আমাদের ডাকলি না কেনো?" "তোমাদের হানিমুনের সুযোগ দিলাম।" "বিয়ে হয়েছে প্রায় দেড় বছর হতে চলল।

এখন আর আমাদের সেই সুযোগ দরকার নেই ভাই। তোরা নবদম্পতি, এখন সুযোগ তোদের লাগবে।” আবির মেকি স্বরে বলল, “আমাদের সুযোগ করে দিতে হবে না, নিজেরায় করে নিতে পারব।” ” এই জন্যই তো বাসর রাতে বউ নিয়ে পালাইছিস।” আবির শব্দ করে হাসল। সাথে আসিফও। মেঘ, মীম, বন্যা, আইরিন, জান্নাত সবাই সমুদ্রে পা ভেজাচ্ছে। ঢেউয়ের গতিতে ছুটোছুটি করছে। আরিফ আর রিদও তাদের সঙ্গ দিচ্ছে। আবির আর আসিফ তানভিরের বিষয় নিয়ে কিছুক্ষণ কথা বলল। একসময় আসিফ সবাইকে নিয়ে নাস্তা করতে চলে গেছে। বন্যা তাদের সঙ্গে যেতে নিলে আবির গম্ভীর কণ্ঠে ডাকে, “বন্যা,দাঁড়াও” “জ্বি ভাইয়া।” “তোমার সাথে আমার কিছু কথা আছে।” মেঘ চুপচাপ আবিরের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। আবির এক পলক মেঘের দিকে তাকালো। মেঘ চোখের ইশারায় বলতে বলল। আবির ঠান্ডা কণ্ঠে বলতে শুরু করল, “তোমার তানভিরের সাথে কি নিয়ে ঝামেলা হয়েছে আমি জানি না আর জানতেও চাই না। আজ আমি তানভিরের ভাই না বন্ধু হয়ে কয়েকটা কথা বলব। তুমি ইতোমধ্যে জানো তানভিরের জীবনে কেউ একজন ছিল, তুমি তাকে দেখেওছো। সেসব কৈশোরের আবেগ ছিল। এখন সে আগের থেকে অনেক বেশি ম্যাচিউর হয়েছে। তোমাকে তানভির ছোট থেকে চিনলেও কখনো তোমাকে নিয়ে সেভাবে ভাবে নি। যেদিন প্রথমবারের মতো ও তোমাকে নিয়ে ভেবেছিল সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত প্রতিনিয়ত ও শুধু নিজেকে পরিবর্তন করার চেষ্টায় আছে। ওর লাইফস্টাইল বরাবরই

ছন্নছাড়া, শুধু তোমার জন্য সেই লাইফস্টাইলে পরিবর্তন এনেছে। আমি এখন পর্যন্ত তানভিরকে কম করে হলেও ৫০ টা ঘড়ি কিনে দিয়েছি কিন্তু ও কোনোদিন ভুলেও একটা ঘড়ি পড়ে নি। অথচ তুমি একবার তাকে একটা ঘড়ি দিয়েছিলে, সে ঐ ঘড়িটা ঠিকই পড়েছে। এমন ছোটখাটো হাজারো পরিবর্তন ওর মধ্যে এসেছে। প্রথম প্রথম আমি ও কে বলে বলে সব কাজ করাতাম, এখন সে আমার থেকেও বেশি বুঝে। আমাদের বিয়ের ব্যাপারটা ও একা হাতে সামলিয়েছে। তানভিরের জেদ সম্পর্কে তোমার কিছুটা হলেও ধারণা হয়তো আছে। তোমার মুখ থেকে কোনো একদিন শুনেছিল, তোমার আব্বু তোমাদের সরকারি চাকরিজীবী ছেলের কাছে বিয়ে দিবে, সেদিনই রাজনীতি ছেড়ে চাকরি নেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বই কিনে পড়াশোনাও শুরু করে দিয়েছে। তুমি যেমন বাস্তববাদী তানভিরও নিজেকে সেভাবেই উপস্থাপন করতে চেয়েছে। তবে প্রতিটা মানুষের আবেগ, অনুভূতি ভিন্নরকম। হয়তো ওর মনে হয়েছিল তোমাকে তার অনুভূতি জানিয়ে রাখবে তাই তোমার সামনে নিজের অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ করতে চেয়েছিল। তোমাকে আমি ছোট করে কথা বলছি না কিংবা দোষারোপও করছি না, শুধু তানভির অবস্থান টা বুঝানোর চেষ্টা করছি। তানভির যদি একবার বলে সে চাকরি, ব্যবসা কিছুই করবে না তবুও তাকে কেউ কিছু বলবে না অন্ততপক্ষে আমি তো নয় ই। ও চাইলে আমি ওকে সারাজীবন বসিয়ে খাওয়াতে পারব। আমার টাকায় নয় বরং ওর নিজের টাকায় বসে খেতে পারবে। আমাদের পারিবারিক

ব্যবসা, তানভিরের ব্যাংক ব্যালেন্স বাদ দিলাম। সবাই জানে আমার ছোটখাটো বিজনেসের ৭০% শেয়ার আমার নামে। কিন্তু তারা কেউ এটা জানে না এই ৭০% শেয়ারের মধ্যে ২০% শেয়ার তানভিরের, ২০% মেঘের, ২০% আমার আর বাকি ১০% মীম আর আদির। এই কথা তানভির পর্যন্ত জানে না। আমি কোনোদিন ও কে জানানোর প্রয়োজনও মনে করি নি। আমি তানভিরকে সবসময় সুযোগ দিয়েছি, ও যখন যা চেয়েছে তাই দেয়ার চেষ্টা করেছি। তানভির ব্যবসায় অমনোযোগী বলে চাচ্চু প্রায় প্রায়ই রাগারাগি করেন। কিন্তু মেঘ, আমি আমরা দু'জনেই তানভিরকে পুরোপুরি সাপোর্ট করছি যেন পড়াশোনা করে একটা জব নিতে পারে। তোমার ইচ্ছেকে প্রাধান্য দিতেই তানভির সবকিছু ছেড়েছে, সেই তুমিই যদি তার হাত ছেড়ে দেও। ও কি করবে বলো?" বন্যা ঢোক গিলে শান্ত কণ্ঠে বলল, " ওনি আমার কথাতে এতটা কষ্ট পাবেন আমি বুঝতে পারি নি। ওনি আমার জন্য রাজনীতি ছেড়েছেন, চাকরির চেষ্টা করছেন এগুলোর কিছুই আমি জানতাম না। আমার আব্বু রাজনীতি পছন্দ করেন না, এমন অগোছালো জীবনযাপনও পছন্দ করেন না। আমি আমার পরিবারের সম্মতি ছাড়া কিছু করতে পারবো না এমনটায় বুঝিয়েছিলাম।"
"তোমার পরিবারের সম্মতি থাকলে তো তোমার কোনো সমস্যা নেই?" " না।" "ঠিক আছে। তুমি এখানে অপেক্ষা করো, তানভিরকে পাঠাচ্ছি। যত দ্রুত সম্ভব মনোমালিন্য ভেঙে মন হালকা করো।" আবির মেঘের দিকে তাকিয়ে বলল, "বউ, চলো।" বন্যা শক্ত কণ্ঠে

বলে উঠল, " মেঘ এখানে থাকুক।" আবির ভ্রু কুঁচকে মেঘের দিকে তাকিয়ে চোখে ইশারা দিল, মেঘ সঙ্গে সঙ্গে নিজের মাথা চেপে ধরে বলতে শুরু করল, " আমার মাথাটা জানি কেমন করে ঘুরছে, চোখে ঝাপসা দেখছি। প্রেশারটা মনে হয় ২০ এ নেমে গেছে। " আবির উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলল, " হায় আল্লাহ! এখন কি হবে? তাড়াতাড়ি রুমে চলো। এখানে আর থাকা যাবে না। তোমাকে কি কোলে নিতে হবে?" মেঘ কিছু বলার আগেই আবির মেঘকে কোলে নিয়ে চলে যাচ্ছে। বন্যা থ হয়ে তাকিয়ে আছে।আশেপাশে অনেক মানুষের ভিড়, বন্যা একা একা হাঁটছে আর মনে মনে ভাবছে। মেঘ গতকাল কতগুলো ফুল কিনেছিল সেগুলো যত্ন করে পানির বোতলে ভিজিয়ে রেখেছিল। মেঘ দ্রুত রুম থেকে সেই ফুলগুলো নিয়ে আসছে। তানভিরের হাত ফুলগুলো দিয়ে শক্ত কণ্ঠে বলল, " ঠিকমতো প্রপোজ করতে না পারলে আজকের পর আমার ভাবির দিকে ভুলেও তাকাতে পারবে না এই আমি বলে রাখলাম। এইযে আমার ওনি সাক্ষী। " আবির নিরেট কণ্ঠে বলল, " একদম ঠিক, আজকেই তোর জন্য লাস্ট চান্স। আজকের পর আমরা কেউ তোর সাথে নেই। " তানভির মলিন হেসে বলে উঠল, " আজ আবার কোন যুদ্ধ হতে চলেছে কে জানে" মেঘ ফের বলল, "এক্সেপ্ট না করা পর্যন্ত ফিরে আসবে না। খিদায় বেহুশ হয়ে গেলেও না। " "ঠিক আছে বোন আমার। আপনি যা বলবেন তাই হবে।" তানভির ফুলগুলো হাতে নিয়ে সমুদ্রের পাড়ে আসলো। এত এত মানুষের ভিড়ে বন্যাকে খোঁজে পেতে কিছুক্ষণ সময় লাগলো।

বন্যা সমুদ্রের পাড়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তানভির বন্যার পাশ ঘেঁষে দাঁড়াতেই বন্যা চমকে উঠে কিছুটা সরে দাঁড়ালো। এক পলক তাকিয়ে তানভিরকে দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লো। তানভির বন্যার কান্ড দেখে মৃদু হেসে বলতে শুরু করল, "নিষ্করুণ এই পৃথিবীতে অপ্রিয় কেউ অনিচ্ছাকৃতভাবে শরীর ছুঁয়ে গেলেও একটা মেয়ে যেভাবে রিয়েক্ট করে, সেই রিয়েক্ট টা হৃদয় ছুঁয়ে যাওয়া মানুষটার সাথে কখনোই করতে পারে না। হৃদয়টাকে আজীবন বেঁধে রাখবে বলা মেয়েটাও একটা সময় কারোর প্রতি অস্বাভাবিকভাবে দূর্বল হয়ে পড়ে। তাই না বন্যা?" বন্যা মাথা নিচু করে বলতে শুরু করল, " সেদিন আপনার সাথে এভাবে রিয়েক্ট করা আমার একদমই উচিত হয় নি। আমি সত্যি দুঃখিত। মেঘের বিষয়, বাসার সব বিষয় নিয়ে সেদিন একটু বেশিই চিন্তিত ছিলাম। বার বার বলেছিলাম আমি কথা বলতে চাইছি না তবুও আপনি জোর করছিলেন তাই না চাইতেও রাগ দেখিয়ে ফেলেছিলাম। আমি শুধু আমার পরিস্থিতিটা বুঝাতে চেয়েছিলাম আপনি সেটা না বুঝেই রাগ করে ফোন বন্ধ করে দিলেন। আপনার কি একবারের জন্যও আমার কথা মনে হয় নি? একবারও আমার কথা ভাবলেন না। আমি সবসময় দেখে আসছি আপনি খুব দায়িত্বশীল একটা ছেলে, আপনার দায়িত্ববোধ আর অপ্রকাশিত যত্ন দেখে আমি বার বার মুগ্ধ হয়েছি সেই আপনি কি না আমার সাথে এমন কাজ করলেন? মেঘের বিয়ের আগেও ২-৩ দিন আমার কল রিসিভ করেন নি, নাম্বার ব্লক করে রেখেছিলেন, এখন একদম বাসা

ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। এই আপনার দায়িত্ববোধ?” বন্যা শেষ কথাগুলো বলতে বলতে কান্না করে দিয়েছে। তানভির আশেপাশে তাকিয়ে দেখল, বেশকয়েকজন তাদের দিকে তাকিয়ে আছে। তানভির সহসা বন্যার কাছাকাছি এগিয়ে গিয়ে শান্ত কণ্ঠে বলল, ” কান্না করো না, প্লিজ। আমি সেদিন নিজের রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারি নি। আর কখনো এমন হবে না, সরি। ” বন্যা কাঁদতে কাঁদতে ফের বলতে শুরু করল, ” আপনি একটা পাষাণ, নিষ্ঠুর। আমার উপর রাগ করে আমাকেই কষ্ট দিতে উঠেপড়ে লেগেছেন। আপনি বাড়ি থেকে না গেলে তো আপনার বিয়ে ঠিক হতো না। আপনি এমনটা কেনো করলেন? ভালো হয় বিয়ে করার আগে আমাকে এই সমুদ্রের পানিতে ডুবিয়ে মে*রে ফেলুন।” বন্যার দুচোখ বেয়ে অনর্গল পানি পড়ছে। ঠিকমতো কথাও বলতে পারছে না তানভির সূক্ষ্ম নেত্রে তাকিয়ে থেকে অকস্মাৎ একহাতে বন্যার চোখের পানি মুছতে মুছতে শঙ্কাজনক কণ্ঠে বলতে শুরু করল, “এই মেয়ে চুপ করো। কি সব বাজে কথা বলছো! আমার আবার কিসের বিয়ে? বিয়ে যদি করতেই হয় আমি তোমাকে বিয়ে করবো। তুমি রাজি হলেও তোমাকে করবো না হলেও তোমাকেই বিয়ে করবো। হয় হিরোর মতো বিয়ে করবো নয়তো ভিলেনের মতো করবো। তবুও তোমাকেই বিয়ে করবো। এই তানভির শুধু বন্যার, আজ এই মুহুর্ত থেকে তুমি শত রাগ করলেও আমি সব সহ্য করে নিব। আমি নিষ্ঠুর হলেও তোমারই থাকবো, পাষাণ হলেও তোমারই থাকবো। বুঝেছো মেয়ে?” বন্যা শীতল চোখে তানভিরের দিকে

তাকিয়ে আচমকা তানভিরকে জড়িয়ে ধরল। আকস্মিক ঘটনায় তানভির কিছুটা ঘাবড়ে গেছে। আশেপাশে অবেক্ষণ করে কাঁপা কাঁপা হাতে বন্যার পিঠে হাত রাখলো। প্রথমবারের মতো তানভির বন্যার ঘনিষ্ঠতা উপলব্ধি করতে পারছে। তানভিরের হৃৎস্পন্দনের সাথে সাথে পেটের নাড়িগুলোর ধপধপ করে কাঁপছে। এক অদ্ভুত অনুভূতি সর্বাঙ্গে শিহরণ জাগাচ্ছে। এই অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ অসম্ভব। মেঘদের বন্ধুমহলের সবচেয়ে ম্যাচিউর মেয়েটা আজ বিবেক ভুলে আবেগের কাছে ধরা দিতে বাধ্য হলো। খোলা আকাশের নিচে, শত শত মানুষের মাঝে পরিপক্কতা ভুলে ছোট বাচ্চার মতো তানভিরকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলো। বেশ কিছুটা সময় তানভির নিজেও বন্যার আবেশে আবদ্ধ ছিল, সেই আবেশ কাটিয়ে বন্যার কানের কাছে ফিসফিস করল, ” এভাবে কেঁদো না প্লিজ, মানুষ উল্টাপাল্টা ভাববে । ” বন্যা কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে হুঙ্কার দিল, ” ভাবুক। ” বন্যা তানভিরকে আরও শক্ত করে জড়িয়ে ধরল। যা হবে দেখা যাবে ভেবে তানভিরও বন্যাকে বলিষ্ঠ হাতে জড়িয়ে ধরল। তানভিরের হাতে থাকা ফুলগুলো বন্যার পিঠে লাগছে, ফুলে থাকা পানিতে বন্যার জামা ভিজে যাচ্ছে। বন্যা বুঝতে পেরে তানভির ছেড়ে পেছনে দেখার চেষ্টা করল। তানভির বন্যার পিঠ থেকে হাত সরাতেই ফুলগুলো দেখতে দেখতে পেল। বন্যা তানভিরের দিকে তাকিয়ে তপ্ত স্বরে বলল, ” এগুলো কার জন্য এনেছিলেন?” “আসার সময় বনু দিল, তোমাকে দেয়ার জন্য। ” “দিচ্ছেন না কেনো? নাকি অন্য কাউকে দিতে চান?” তানভির ঠোঁট

বেঁকিয়ে শক্ত কণ্ঠে বলল, " তানভিরের জীবনে বন্যা এক এবং অনন্য নারী। দিলে তোমাকেই দিব। কিন্তু কথা হলো, হাঁটু গেড়ে না দিয়ে এমনি দিয়ে দিলে কি তুমি রাগ করবে? না মানে, আশেপাশে অনেক মানুষ আছে হাঁটু পানিতে হাঁটু গেড়ে প্রপোজ করলে যদি হাসাহাসি শুরু করে তখন তো নিজেকে জোকার মনে হবে।" বন্যা চারপাশে নজর বুলিয়ে নিঃশব্দে হেসে বলল, " ঠিক আছে, এমনি দেন।" তানভির নিঃশ্বাস ছেড়ে বলতে শুরু করল, " তোমার নামটা বন্যা হলেও আমার জীবনে তোমার কর্মকাণ্ড পুরো অগ্নিকান্ডের মতন। তুমি আমার চোখে মুগ্ধতার আনন, হৃদয়ের উষ্ণ প্লাবন। আমার ছায়াবৃত জীবনের দীপ্তি তুমি, স্বপ্নহীন জীবনের স্বপ্ন। তুমি আমার ছন্নছাড়া জীবনের সুনিপুণ নাটাই। এই বিস্তৃত জলরাশিতে দাঁড়িতে বলতে চাই, তোমার প্রতি আমার ভালোবাসা সমুদ্রের তরঙ্গের ন্যায় যার কোনো অন্ত নেই। আমাদের জীবনে যত ভাটায় আসুক না কেনো সব ভাটা উপেক্ষা করে আমার ভালোবাসা জোয়ারের মতো সীমাহীন গতিতে বাড়তেই থাকবে। আমি তোমাকে ভালোবাসি বন্যা, খুব বেশি ভালোবাসি।" বন্যা তানভিরের হাত থেকে ফুলগুলো নিয়ে মুচকি হেসে বলল, " ওহ আচ্ছা। আপনি আমাকে এত ভালোবাসেন? আমি তো জানতাম ই না। যাই হোক, ফুল দেয়ার জন্য ধন্যবাদ। " তানভির হুঙ্কার দিল, "ভালোবাসি বলো" "না বললে কি করবেন?" " এতক্ষণ হিরো ছিলাম এখন ভিলেন হয়ে যাবো। " "মানে?" তানভির ঠোঁট কামড়ে হেসে বন্যার কাছাকাছি এগিয়ে যাচ্ছে, বন্যা একপা দু'পা করে

পেছাতে পেছাতে একপর্যায়ে আতঙ্কে উচ্চস্বরে বলে উঠল, " আমিও আপনাকে ভালোবাসি।"আসিফ জান্নাতদের ব্রেকফাস্ট প্রায় শেষদিকে এমন সময় আবির আর মেঘ আসছে। আসিফের সাথে দু একটা কথা বলে খেতে বসেছে। আইরিন নিজের মতো খাচ্ছে আর মাঝে মাঝে জান্নাতকে এটা সেটা বলছে। রিদ আর মীম পাশাপাশি বসেছে, দু'জনেই বিভিন্ন প্রকার খাবারের নাম নিয়ে দুষ্টামি করছে। কক্সবাজার আসতে আসতে রিদের সাথে মীমের খুব ভালো একটা সম্পর্ক হয়ে গেছে। যদিও রিদ মীমের থেকে বয়সে কিছুটা ছোট তবুও তাদের বন্ডিং খুব ভালো। দু'জন দু'জনকে তুই তুই করে বলে, রিদ যেখানেই যায় মীমকে ডেকে নিয়ে যায়, কিছু খেলে মীমকেও দেয়। আরিফ গতকাল ট্রেন থেকেই এসব দেখে আসছে, তখন সেভাবে কিছু মনে হয় নি। কিন্তু রাতের আড্ডার পর থেকে আরিফের মনটা ভার হয়ে আছে। কেনো? কি হয়েছে? এর কোনো উত্তর আরিফের কাছে নেই। ভোর থেকে মন খারাপ যেন রাগে পরিণত হয়েছে। মীম আর রিদকে একসঙ্গে দেখলেই মেজাজ গরম হয়ে যাচ্ছে। খুব বেশি প্রয়োজন না হলে মীম আরিফের সাথে কথা বলা তো দূর তাকিয়েও দেখে না আর এই বিষয়টায় আরিফের সহ্য হচ্ছে না। বেশ কয়েকবার মীমের সাথে কথা বলার চেষ্টাও করেছে কিন্তু মীম "আচ্ছা, হু, ওকে" বলে কথা কাটিয়েছে। আরিফ অনেকক্ষণ অগ্নিদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে আচমকা খাবার রেখে উঠে গেছে। আবির চোখ তুলে তাকিয়ে স্বাভাবিক কণ্ঠে জানতে চাইল, "কিরে, খাবি না?" "খিদে নেই ভাই।" আরিফ হনহন

করে চলে গেছে। আসিফ, জান্নাত, আইরিন কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থেকে আনমনে বলে উঠল, “ওর আবার কি হলো?” আরিফকে ইচ্ছেকৃত খোঁচানো টা মীমের স্বভাব, আজও তেমন কিছু করেছে কি না সেটা বুঝতেই মেঘ কিছুটা ঝুঁকে মীমকে দেখে নিল। মীম তখনও রিদের সাথে গল্পে মেতে আছে। মেঘ স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে খাওয়ায় মনোযোগ দিল। আবিরও বেশ মনোযোগ দিয়ে খাচ্ছে, একেকটা আইটেম চেক করছে ভালো লাগলে মেঘকে দিচ্ছে আর ভালো না লাগলে আগেই দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। আজ সবাই সেন্ট মার্টিন যাবে তাই খাওয়াদাওয়া শেষ করেই যে যার মতো রেডি হতে চলে গেছে। মেঘ লাগেজ খুলে একটা একটা করে শাড়ি আর ড্রেস বের করে আবিরকে দেখাচ্ছে। বন্যা আর তানভির কিছুটা দেরি করেই রিসোর্টে ফিরেছে, নাস্তা শেষ করে বন্যা যেই রুমে ঢুকবে ওমনি রিদের মুখোমুখি হলো। রিদ কপাল কুঁচকে জানতে চাইল, “কোথায় গিয়েছিলে?” “কাছেই।” ” আমাকে না নিয়ে তুমি কার সাথে গিয়েছিলে? ” বন্যা উত্তর দেয়ার আগেই তানভির এসে গম্ভীর কণ্ঠে বলল, ” বন্যা, রুমে যাও। আমার শালার সাথে বুঝাপড়া আমি করে নিচ্ছি।” “কে কার শালা?” ” তোমার বোন আমার বউ হলে তুমি আমার কি হবে?” “শালা কিন্তু আমার বোন তো আপনার বউ না।” “আজ না হলেও ভবিষ্যতে তো হবে। ” রিদ চোখ ঘুরিয়ে বন্যার দিকে তাকিয়ে উচ্চ শব্দে ডাকল, “আপু..” বন্যা মৃদু হেসে রুমে চলে গেছে। রিদ অসহায়ের মতো তাকিয়ে আছে। তানভির রিদকে নিয়ে রুমে

গেছে। কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলে দু'জন একেবারে রেডি হয়ে বেড়িয়েছে। রিসোর্ট থেকে বেড়িয়ে বাকিদের জন্য অপেক্ষা করছে। মীম বের হতেই রিদ মীমের দিকে তাকালো। মীম আজ আকাশী রঙের একটা গর্জিয়াছ গাউন পড়েছে, দেখতে একদম পরীর মতো লাগছে। রিদ প্রশস্ত আঁখিতে তাকিয়ে বলে উঠল, "বেয়াইন, তোকে তো পুরায় নায়িকা লাগছে।" মীম এক গাল হেসে বলল, " ধন্যবাদ। আমি যে তোর বেয়াইন হয় এটা তুই কিভাবে জানলি?" " ছোট আপু তোর ভাইকে পছন্দ করে আর তোর ভাইও..." "হ্যাঁ, জানি । আমি আর মেঘ আপুই তো ভাবিকে প্রপোজ করেছিলাম।" রিদ শক্ত গলায় প্রশ্ন করল, " তারমানে তুই আগে থেকে সব জানতি?" "হ্যাঁ, আমি কেনো এখানের সবাই জানে। বন্যা ভাবি আর তোকে তো এই কারণেই আনা হয়েছে। " "কি?" "জ্বি।" রিদ অকস্মাৎ মীমের মাথায় গাট্টা মেরে রাগী স্বরে বলল, " পঁচা মেয়ে কোথাকার। " আরিফ পেছন থেকে এসে রাগান্বিত কণ্ঠে হুঙ্কার দিল, " রিদ, মীমকে একদম ছোঁবে না।" মীম চমকে উঠে পেছনে ঘুরল, ওষ্ঠ উল্টে মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে আরিফের দিকে তাকালো। আরিফের গম্ভীর মুখভঙ্গি দেখে মীম সহসা ভ্রু কুঁচকালো। রিদও কিছু বুঝতে পারছে না, নিরাধার মুখ করে বলল, "সরি" টেকনাফ থেকে মোটামুটি বড় একটা ট্রলার করে সেন্ট মার্টিনের উদ্দেশ্যে রওনা দিল। মেঘ, বন্যা, জান্নাত তিনজন ই আজ শাড়ি পড়েছে, আবিররাও পাঞ্জাবি পড়েছে। আইরিন তাদের পার্সোনাল ফটোগ্রাফার, বিভিন্ন স্টাইলে ছবি তুলে দিচ্ছে। মীম মেঘের ফোন দিয়ে

কয়েকটা ছবি তুলে ভয়ে ফোন ব্যাগে রেখে চুপচাপ বসে পরেছে। রিদ আর আরিফ কাছাকাছি বসা। প্রথমে আনন্দে লাফিয়ে ট্রলারে উঠলেও মীম এখন ভেতরে ভেতরে খুব ভয় পাচ্ছে। আবিররা ছবি তোলাতে মনোযোগী তাই মীম ওদের বিরক্ত করতে চাচ্ছে না। ঢেউয়ের নিমিত্তে চলন্ত ট্রলার কম্পিত হলেই মীম বার বার কেঁপে উঠছে। আরিফ আর রিদ আশেপাশে তাকিয়ে প্রকৃতি উপভোগ করছে। মীম ওদের কাছাকাছি এসে ভারি কণ্ঠে বলল, "ঐ রিদ, সর। আমি এখানে বসবো।" রিদের সঙ্গে সঙ্গে আরিফও তাকিয়েছে। রিদ সরতে যাবে আরিফ তার আগেই বলে উঠল, "এদিকে এসে বসো।" মীম রিদের দিকেই তাকিয়ে আছে, ঢেউয়ের ধাক্কায় ট্রলার কাঁপতেই মীম পড়ে যেতে নিল। আরিফ সঙ্গে সঙ্গে মীমের হাত ধরে নিজের পাশে বসালো। ভয়ে মীমের হাত পা সহ পুরো শরীর থরথর করে কাঁপছে। আরিফ মীমের হাতটা ছেড়ে দিতে নিয়েও ছাড়ল না। মীমের কম্পিত হাতটা আর একটু শক্ত করে ধরে মোলায়েম কণ্ঠে শুধালো, " ভয় লাগছে?" "হ্যাঁ" "কিছু হবে না, ভয় পেয়ো না।" খানিক বাদে ট্রলার আবারও কেঁপে উঠল, মীম সহসা অপর হাতে শার্টের উপর দিয়েই আরিফের হাত খামচে ধরেছে। আরিফ শীতল চোখে মীমের উদগ্র আননে চেয়ে আছে। সর্বক্ষণ ছটফট করা মেয়েটার ভীতিকর চেহারা দেখে আরিফ মৃদু হাসলো। আস্তে করে বলল, " তোমার না খুব সাহস? এই কি তবে সাহসের নমুনা?" মীম আড়চোখে তাকালো, আরিফের ঠোঁটে হাসি দেখে মীমের খুব রাগ হলো। আরিফের হাত

ছেড়ে সহসা উঠে যেতে চাইল। কিন্তু আরিফের হাতে বন্দি হাতটাকে ছাড়াতে ব্যর্থ হলো। মীম গম্ভীর কণ্ঠে বলল, “আমার হাত ছাড়ো।” ” এই হাত ছাড়া যাবে না।” “কেনো?” ” তোমার কিছু হয়ে গেলে আমার কি হবে?” মীম ভ্রু কুঁচকে প্রশ্ন করল, “মানে?” আরিফ গলা খাঁকারি দিয়ে আস্তে করে বলল, ” তুমি আমার ঝগড়া করার একান্ত সঙ্গী, তোমার জন্য আমার মন সর্বদা বন্দি।” মীম কপাল কুঁচকে বিড়বিড় করল, ” তোমার কি মাথায় সমস্যা? কি আবোলতাবোল বলছ?” আরিফ মুচকি হেসে জবাব দিল, ” তুমি বললে পাগল হয়ে ঘুরবো সাজেক ভ্যালিতে, তুমি বললে নীল দিগন্তে উড়বো সাদা রঙের ঘুড়িতে।” মীম বেকুবের মতো কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে অকস্মাৎ বলে উঠল, ” তুমি ভাই যা খুশি করো, আগে আমার হাতটা ছাড়ো।” ” হাত ছাড়িয়ে যাবে কোথায়, চলোনা স্বপ্নপুরীতে গা ভাসায়।” মীম তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আর্তনাদ করল, ” আমার হাতটা ছাড়ো।” ” হাত ছাড়লে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে, বাবু।” “আমি বাবু না ওকে? হাত ছাড়ো, আমি রিদের পাশে বসবো।” আরিফের হাসিমুখে সহসা আঁধার নেমেছে। কণ্ঠে রাগ ঢেলে দাঁতে দাঁত চেপে বলল, ” তুমি ওর পাশে বসবে না, বসলে শুধু আমার পাশেই বসবে। ” “কেনো? ও আমার বেয়াই, বন্ধু। ওর পাশে কেনো বসবো না?” “আমি বারণ করছি তাই।” “তুমি আমাকে বারণ করার কে?” “আমি তোমার ভাই। ” ” তানভির ভাইয়াও তো আমার ভাই। ভাইয়া তো কখনো কোনো কারণে আমাকে বারণ করে না। ” ” ভাইয়ের বারণ করার

প্রয়োজন পড়ে নি তাই করে নি। আমার প্রয়োজন তাই বারণ করছি।” “আজব তো, তোমার কি প্রয়োজন?” “আমার তোমাকে প্রয়োজন। ” “মানে?” আরিফ মীমের মাথায় আস্তে করে গাট্টা দিয়ে চাপা স্বরে বলল, ” ব্যাঙের মাথার মতো বুদ্ধি নিয়ে এত ঝগড়া করো কিভাবে?” “আমি ঝগড়া করি?” “না, কখনোই না। তুমি তো অবুঝ একটা বাবু, এখনও.. ” “এখনও কি?” “কিছু না।” আবির মেঘ কম করে হলেও শখানেক ছবি তুলে ফেলেছে। আসিফ আর জান্নাতও বেশ কিছু ছবি তুলেছে। তবে বন্যা লজ্জায় তানভিরের দিকে ঠিকমতো তাকাতেই পারে না। যে কয়টা ছবি তুলেছে সবগুলোতেই বন্যা অন্যমনস্কভাবে এদিক সেদিক তাকিয়ে আছে। তানভির বন্যার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বিড়বিড় করল, “এখন লজ্জায় আমার দিকে তাকাতেই পারছ না। সকালে এত মানুষের সামনে জড়িয়ে ধরার সময় তোমার লজ্জা কোথায় ছিল বলো তো।” বন্যা ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল, “সকালে এত মানুষ থাকলেও আবির ভাইয়া আর আসিফ ভাইয়া ছিলেন না। ” “হায় রে! তুমি ওদের দেখে লজ্জা পাচ্ছো অথচ বড় ভাই হয়েও ওদের মধ্যে মিনিমাম লজ্জাবোধ নেই। দেখেছো কত সুন্দর করে ছবি তুলছে। আর তুমি!” বন্যা মৃদুস্বরে বলল, ” ওনারা বিবাহিত, যেভাবে ইচ্ছে সেভাবে ছবি তুলতে পারেন।” তানভির নিরেট দৃষ্টিতে তাকিয়ে শক্ত কণ্ঠে বলল, ” চলো, আজই বিয়ে করবো।” “না।” “কেনো?” ” পরিবারের সম্মতি ছাড়া বিয়ে করব না আমি।” “ইশশ, বিয়ে করব না বললেই হলো? ভালোই ভালোই রাজি না হলে কি*ডন্যা*প করে এনে বিয়ে

করবো।” বন্যা মুচকি হেসে বলল, ” আপনার এত সাহস?” “নিজের সাহসে না কুলালে প্রয়োজনে আশেপাশের সবার থেকে সাহস ধার নিব তবুও তোমাকে আমার করেই ছাড়বো।” এতটা পথ জার্নিতে আবির এক সেকেন্ডের জন্যও মেঘকে ছাড়ছে না। জান্নাত অনেকক্ষণ যাবৎ বিষয়টা লক্ষ্য করছে তবে কিছুই বলছে না। ছবি তোলা শেষে জান্নাত অনুষ্ণ কণ্ঠে বলে উঠল, ” ভাইয়া, তুমি মেঘকে নিয়ে এত ভয় পাও কেনো?” আবির মেঘের দিকে এক পলক তাকিয়ে ঠান্ডা কণ্ঠে বলল, “আজকের আকাশ টা দেখেছো? চারদিকে শুধু সাদা মেঘের উড়ুপ। সেই মেঘেদের ভিড়ে আমার মেঘ হারিয়ে গেলে অন্তর্ধানের বিজ্ঞপ্তি কোথায় দিব বলো?” আসিফ মেকি স্বরে বলল, “তুই বরং মেঘকে সিন্দুকে তালা দিয়ে রেখে দে। মাঝে মাঝে বের করে দেখবি আবার সযত্নে রেখে দিবি।” আবির উচ্চ শব্দে হেসে বলল, “বুদ্ধিটা কিন্তু খারাপ না। ” ” ফাজিল। ” সারাদিনের ঘুরাঘুরি শেষে সন্ধ্যা নাগাদ ক্লান্ত হয়ে সবাই রিসোর্টে ফিরেছে। ফ্রেশ হয়ে যে যার মতো রেস্ট নিচ্ছে। তানভির বন্যাকে বার বার মেসেজ দিচ্ছে। অবশেষে বাধ্য হয়ে বন্যা রুম থেকে বেড়িয়েছে। তানভির রুমের সামনেই দাঁড়ানো। বন্যা বের হতেই বলল, “চলো।” “কোথায়?” “ঘুরতে।” “খুব ক্লান্ত লাগছে।” “কোলে নিতে হবে?” বন্যার অকস্মাৎ সকালের ঘটনা মনে পড়ে গেছে। আবিরের মতো তানভিরও যদি একই কাজ করে বসে তারজন্য আগেভাগেই বলে উঠল, ” আমি একায় যেতে পারব। ” “ঠিক আছে, চলো।” সবার রাতের খাবার শেষ অথচ

তানভিরদের আসার কোনো নাম নেই। বাধ্য হয়ে আবির তানভিরের নাম্বারে কল দিল। রিসিভ করতেই উষ্ণ স্বরে বলল, " চাঁদ, সমুদ্র আর তাকে দেখা শেষ হলে রিসোর্টে ফিরে আসেন ভাই। এটা কিন্তু আমার আপনার এলাকা না।" " ১০ মিনিটের মধ্যে চলে আসছি।" "ঠিক আছে।" মাঝখানে একদিন কেটে গেছে। কক্সবাজারের আশেপাশের সবকিছুই মোটামুটিভাবে দেখা শেষ। বন্যা আর তানভিরের সম্পর্ক অনেকটায় স্বাভাবিক হয়েছে তবে আবির কাবাব মে হাড্ডির মতো তানভিরের পেছনে লেগে আছে। বন্যা আর তানভির আলাদাভাবে কোথাও গেলে ৩০ মিনিটের উপরে হলেই ওয়ার্নিং সরূপ কল দেয়া শুরু করে। অথচ আবির মেঘকে নিয়ে ঘুরতে যাওয়ার আগেই ফোনটা বন্ধ করে ফেলে। সকালের ব্রেকফাস্ট শেষ করা মাত্রই বাসা থেকে কল আসছে। আজ মাইশা আপুর ডেলিভারি। আবির সবার উদ্দেশ্যে বলল, "আমাদের যেতে হবে, তোমরা চাইলে আরও ২-১ দিন থাকতে পারো।" আসিফ শান্ত গলায় বলল, " তার কোনো প্রয়োজন নেই, ঘুরতে আসছি ঘুরলাম। এখন আমাদের একসঙ্গে ফেরা উচিত। " "ঠিক আছে। " হুট করে ডিসিশন হওয়ায় ট্রেনের টিকিট ম্যানেজ করা সম্ভব হয় নি তাই বাসেই রওনা দিয়েছে। বন্যা আর রিদ একসঙ্গে বসেছে, তানভির আর আরিফ বন্যাদের পাশাপাশি বসেছে। তাদের সামনে মীম, আইরিন, আসিফ আর জান্নাত বসেছে। আবির আর মেঘ পেছন দিকে বসেছে। মেঘ আবিরের মুখের পানে তাকিয়ে থেকে শীতল কণ্ঠে বলল, " আমার বান্দরবান যাওয়ার খুব ইচ্ছে ছিল। " "

কিছুদিন পর আবার আসবো। তখন সাজেক, বান্দরবান সব ঘুরবো।” “আবার?” “তো কি করব? তুমি যদি মাইশা আপুর বাবু কোলে নেয়ার জন্য বায়না না করতে তাহলে আজ আমাদের এভাবে যেতে হতো না। চট্টগ্রামের সব জেলা ঘুরে তারপর বাসায় ফিরতাম।” ” আমি কি জানতাম নাকি?” আবির হঠাৎ ই মেঘের দিকে কেমন করে চাইল। মিনিট খানেক এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। মেঘ ভ্রু কুঁচকে প্রশ্ন করল, ” এভাবে তাকিয়ে আছেন কেনো?” আবির ঠোঁট কামড়ে হেসে আচমকা বলে উঠল, ” তোমার যে ছোট বাবু এত পছন্দ এটা তো আগে জানতাম না।” “জানলে কি করতেন?” আবির ফিসফিস করে বলল, ” মাইশা আপু মা হওয়ার আগে তোমাকে আম্মু ডাক শোনাতাম। ” মেঘ রাগী স্বরে বলল, ” আপনার কি একটুও লজ্জা নেই?” ” লজ্জা থাকাটা কি জরুরি, বউ?” “হ্যাঁ, খুব জরুরি। ” “তুমি একটু দিবে?” “আমি কি দিব?” “লজ্জা ” ” উফফ, আমি আপনার সাথে বসবোই না।” আবির নিঃশব্দে হেসে বলল, ” বাচ্চামি স্বভাব না ছাড়লে কিন্তু আম্মু হতে পারবে না। ” মেঘ চোখ রাঙিয়ে তাকিয়ে বলল, ” দোহাই লাগে, বাসে অন্তত এমন কথা বলবেন না। ” আবির উদাসীন কণ্ঠে বলল, ” ঠিক আছে, বাকি কথা রাতে হবে।” মেঘ জানালার বাহিরে তাকিয়ে প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করছে, আবির চোখ বন্ধ করে সিটে হেলান দিয়ে বসে আছে। কয়েক মিনিট যেতেই মেঘ অতর্কিতে আবিরের দিকে ঘুরলো। আবিরের কিছু সময়ের নিরবতায় মেঘের বুকটা কেমন যেন মোচড় দিয়ে উঠেছে, মেঘ

আবিরকে এক পলক দেখে আবিরের কাছাকাছি চেপে বসে আবিরের বুকে মাথা রাখলো। আবির তৎক্ষনাৎ মেঘকে নিজের সাথে জড়িয়ে নিয়েছে। আবিরের দুষ্টামিতে অতিষ্ঠ হলেও মেঘ আবিরের নিরবতা একদমই সহ্য করতে পারে না। আবির কিছুক্ষণ চুপ থাকলেই মেঘের মনে দুশ্চিন্তা হানা দেয়। মেঘ আহ্লাদী কণ্ঠে ডাকল, "এই শুনছো?" "বলো" "একটা গান গাও" "এখন?" "হ্যাঁ" "কি গান?" "তোমার ইচ্ছে" আবির আস্তে করে গলা ঝেড়ে গুনগুন করে গাইতে শুরু করল, "তুমি সাগর নীলিমা নও তুমি মেঘের বরষা নও তুমি শুধু আবিরের ময়না ময়না..... তুমি আবিরের ময়না" এদিকে বন্যা আর রিদ দু'জনেই ঘুমাচ্ছে, তানভির ঘাড় কাত করে মুগ্ধ চোখে বন্যাকে দেখছে। অনেকক্ষণ পর বাসের ঝাঁকিতে বন্যার ঘুম কিছুটা কেটেছে। অর্ধ ঘুমে থেকে তানভিরের বিমোহিত চাহনি দেখে লজ্জায় চোখ সরিয়ে নিয়েছে। তানভির তখনও এক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। পরিস্থিতির জন্য মুখ ফুটে কিছু বলতে পারছে না। আবিররা বাসায় এসে কোনোমতে ফ্রেশ হয়ে সরাসরি হাসপাতালে চলে গেছে। মাইশা আপুর হাসবেন্ড ওটি রুমের বাহিরে অপেক্ষা করছে। পাশেই একটা কেবিনে আবিরের মামা, মামি, আব্বু, আম্মু, মালা, সাকিব সহ মাইশার শ্বশুর বাড়ির কয়েকজন বসে আছে। আবিরের মামার বাড়ির দিকে মাইশার বেবিই প্রথম। সবার চোখেমুখে দুশ্চিন্তার ছাপ, মেঘ এতক্ষণ খুশিতে থাকলেও সবার অবস্থা দেখে এখন ভয় পাচ্ছে। মেঘের বোধশক্তি হওয়ার পর এই প্রথম বার কারো ডেলিভারির মুহুর্তে হাসপাতালে উপস্থিত হয়েছে। সময় পেরিয়ে

যাচ্ছে কিন্তু ভেতর থেকে বাবুর কান্না শুনা যাচ্ছে না, ভয়ে মেঘের কলিজা পর্যন্ত শুকিয়ে গেছে। এক মুহুর্তের জন্য নিজেকে মাইশা আপুর জায়গায় চিন্তা করতেই অতর্কিতে মেঘের মাথা ঘুরতে শুরু করেছে। মেঘ কেবিনে ঢুকে মালিহা খানের পাশে বসে কয়েক ঢোক পানি খেয়ে নিল। মালিহা খান মেঘের মাথায় হাত বুলিয়ে শান্ত গলায় বললেন, " টেনশন করিস না।" মেঘ শীতল চোখে তাকাতেই মালিহা খান মলিন হাসলেন। অকস্মাৎ পাশের রুম থেকে নবজাতকের কান্নার শব্দ শুনা গেল। বেবির কান্নার শব্দে রুমে থাকা প্রতিটা মানুষের স্বস্তি ফিরেছে। নবজাতককে কোলে নেয়ার জন্য মেঘের ডাক পড়েছে কিন্তু মেঘ ভয়ে যেতে পারছে না। মেঘ কোনমতে শক্ত গলায় বলল, " ভাইয়া, বাবুকে আপনি কোলে নেন প্লিজ। আমি নিতে পারবো না। " মাইশার হাসবেন্ড মেঘকে কয়েকবার ডেকেছে, কিন্তু মেঘের হাত পা সহ পুরো শরীর কাঁপছে। মাইশার হাসবেন্ড বাবুকে কোলে নিয়ে এসেই মেঘের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। মেঘকে উদ্দেশ্য করে কোমল কণ্ঠে বলল, "মেঘ, তুমি বলেছিলে বাবুকে কোলে নিবে। অন্ততপক্ষে একবারের জন্য নাও।" মেঘ আবিরের দিকে তাকালো, আবির মৃদু হেসে চোখে ইশারা দিল। মেঘ বিছানায় বসে দু'হাত বাড়িয়েছে। মাইশার হাসবেন্ড সঙ্গে সঙ্গে বাবুকে মেঘের কোলে দিলো, লাল টুকটুকে ছোট্ট একটা বাবু মেঘের কোলে অঝোরে কাঁদছে। দু একবার চোখ খোলার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে ফের কাঁদতে শুরু করেছে। কিছু সময়ের জন্য মেঘের সর্বাঙ্গ কালবৈশাখী ঝড়ের মুখোমুখি হলো।

অজানা এক ভয় আর আতঙ্কে মেঘের দুচোখ টলমল করছে, বাবুর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ চোখে পানি জমে বাবুকে ঘোলাটে দেখা যাচ্ছে। মালিহা খান মেঘের অবস্থা কিছুটা আন্দাজ করতে পেরে বাবুকে কোলে নিয়ে মাইশার আম্মু আর শ্বাশুড়ির কাছে নিয়ে গেছে। বাবুর কান্না, বাড়ির সবার হৈ-হুল্লোড় মেঘ সহ্য করতে পারছে না। মেঘ মাথা নিচু করে কেবিন থেকে বেড়িয়ে গেছে, আবিরও এক দৌড়ে বেড়িয়েছে। মেঘের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে চোখ মুছে দিতে দিতে শান্ত কণ্ঠে ডাকল, "এই মেঘ।" কান্নার জন্য মেঘ কথায় বলতে পারছে না। আবির ফের বলল, "কি হয়েছে তোমার?" মেঘ কাঁদতে কাঁদতে শুধু বলল, " মা হওয়া কত কষ্টের..." আবির নিঃশব্দে হেসে বলল, " এই কষ্টের আড়ালে সীমাহীন সুখ লুকিয়ে থাকে।" মেঘ ক্রন্দিত নয়নে তাকাতেই আবির নড়ে উঠলো। সহসা স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, " ঠিক আছে, সরি। তুমি মানসিকভাবে প্রস্তুত না হওয়া পর্যন্ত আমি বাবুর কথা আর বলব না। এবার তো কান্না থামাও, প্লিজ।" তানভির, মীম, আরিফ, আসিফরা কিছুক্ষণ পরে হাসপাতালে আসছে। সবাই বাবুকে দেখছে আর যে যার মতো গিফট দিচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যে মাইশা আপুকে কেবিনে শিফট করা হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে মেঘের মনের অবস্থা অনেকটায় স্বাভাবিক হয়ে গেছে। মেঘ বাবুকে কোলে নিয়ে গবেষণা শুরু করেছে, এক সময় আবিরও মেঘের সঙ্গে সঙ্গ নিল। বাবুর নাম, চোখ, ঠোঁট কার মতো হয়েছে সেসব নিয়েই তর্ক বিতর্ক লেগেছে। আলী আহমদ খান বাহিরে ছিলেন, আবির মেঘের তর্ক

বিতর্ক শুনে রুমে আসছেন। আলী আহমদ খান আসতেই আবির মাথা নিচু করে দূরে সরে দাঁড়ালো। আলী আহমদ খান কিছু বলতে চেয়েও সহসা কথা গিললেন। আবিরের দিকে তাকিয়ে ঠান্ডা কণ্ঠে বললেন, " বাহিরে আসো, কথা আছে।" আবির সঙ্গে সঙ্গে বেড়িয়ে গেছে। ১০ মিনিট পর কেবিনের দরজায় দাঁড়িয়ে তানভিরকে উদ্দেশ্য করে বলল, " তানভির, বাসায় গেলে সবাইকে নিয়ে যাস।" রুম ভর্তি মানুষ তাই মেঘকে কিছু বলতে চেয়েও বলতে পারল না। মেঘরা বাসায় ফিরেছে ১০ টার দিকে। সবাই সবার মতো শুয়ে পরেছে। মেঘ আবিরের রুমে কিছুক্ষণ পায়চারি করে হঠাৎ এক দৌড়ে নিচে চলে আসছে। আবিরের রুমটা অনেক বড় হওয়ায় মেঘের একা থাকতে ভয় লাগে তাই ড্রয়িং রুমে চলে আসছে। টিভি দেখতে দেখতে আবিরকে কয়েকবার কল দিয়েছে কিন্তু আবির কল রিসিভ করছে না। মেঘ এক এক পর্যায়ে সোফাতেই ঘুমিয়ে পরেছে। প্রায় ১২ টার দিকে মালিহা খান টিভির শব্দে রুম থেকে বেড়িয়ে আসছেন। মেঘকে সোফায় ঘুমাতে দেখে ঘড়ির দিকে তাকালেন। আবিরের আব্বু, চাচ্চু কেউ ই এখনও বাসায় ফিরে নি। মালিহা খান মেঘের মাথায় হাত বুলিয়ে আস্তে করে ডাকলেন, "মেঘ" "এই মেঘ।" "উমমম" "এখানে ঘুমাচ্ছিস কেনো?" "রুমে ভয় লাগে।" "কেনো?" "জানি না" মালিহা খান সোফার একপাশে বসলেন, মেঘকে নিজের উরুতে শুইয়ে দিলে চুলে হাত বুলাতে বুলাতে বললেন, " মাইশার বাবু দেখে ভয় পেয়েছিস?" " হ্যাঁ।" " সংসার জীবন বড়ই কঠিন মা, এই জীবনে

ভয়কে জয় করেই চলতে হবে। আবির এখনও ফিরছে না কেনো?” “জানি না, কল রিসিভ করছেন না। ” “আচ্ছা, তুই ঘুমা আমি তোর মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি।” মেঘ কিছুক্ষণ ঘুমানোর চেষ্টা করে হঠাৎ ই ডাকল, ” বড় আম্মু।” ” বল।” “একমাত্র ছেলের বউ হিসেবে তোমার কি আমাকে পছন্দ?” ” পছন্দ না হলে কি ছেলের বউ করতে রাজি হতাম নাকি? এখন ঘুমানোর চেষ্টা কর। না হয় মাথা ব্যথা করবে।” কিছু সময়ের মধ্যেই মেঘ ঘুমিয়ে পড়েছে। ১০ -২০ মিনিটের মধ্যে আবির দৌড়ে বাসায় ঢুকেছে। মালিহা খানকে সোফায় বসে থাকতে দেখে পা থামিয়ে ধীর গতিতে আগায়। আম্মুর কোলে ঘুমন্ত মেঘকে দেখে আবির অপ্রত্যাশিতভাবে হেসে ফেলল। আবিরের হাসি দেখে মালিহা খান রাগী স্বরে হুঙ্কার দিলেন, ” তোর দায়িত্ববোধ কি কোনোদিনও আসবে না?” “আসবে।” “কবে আসবে? বিয়ের পর এত রাত করে কেউ বাসায় ফিরে? মেয়েটা এমনিতেই ভয় পায় তারউপর তুইও নিরুদ্দেশ হয়ে গেছিস। তোর বউকে দেখে রাখার দায়িত্ব কি আমার?” আবির মুচকি হেসে বলল, ” সরি।” “তুই যে বিয়ে করেছিস, এটা কি তোর মনে থাকে না?” “থাকে তো” ” তাহলে? তোর আব্বু কোথায়? চাচ্চুরায় বা কোথায়?” “আসতেছে।” “কোথায় গিয়েছিলি?” “আব্বু এসে সব বলবে। আমি আপাতত ওকে নিয়ে যায়। চাচ্চু এসে মেয়েকে এ অবস্থায় দেখলে আমার খবর ই আছে।” আবির ঝটপট মেঘকে কোলে নিয়ে রুমে চলে যাচ্ছে।আজ শুক্রবার, বন্যার বোনের কাবিন হবে তাই বন্যাদের বাসায় সকাল থেকেই রান্নার

আয়োজন চলছে। কাছের আত্মীয়স্বজনরা ইতিমধ্যে চলে আসছেন। এতটা পথ জার্নি করে আসায় বন্যার শরীর খুব ক্লান্ত, এজন্য ঘুম থেকে উঠতেও একটু দেরি হয়ে গেছে। হাত মুখ ধুয়ে রুম থেকে বেড়িয়ে যেই নামতে যাবে ওমনি বন্যার মামাতো ভাইয়ের সাথে দেখা যার সাথে কোনো এক সময় বন্যার বিয়ে ঠিক হয়েছিল। ছেলেটা বন্যাকে দেখে মৃদুস্বরে বলল, "কেমন আছো?" বন্যা উত্তর না দিয়ে ফের নিজের রুমে চলে গেছে। দরজা চাপিয়ে আবারও শুয়ে পরেছে। বন্যার চোখে তীব্র আক্রোশ। মন আর মেজাজ দুটায় চরমভাবে খারাপ হয়ে গেছে। পাঁচ মিনিট পরেই তানভিরের কল আসছে। বন্যা রিসিভ করবে না করবে না ভেবেও রিসিভ করল। তানভির মোলায়েম কণ্ঠে বলল, " Good Morning, Mistress" বন্যা মলিন হেসে বলল, "Good Morning." "ব্যস্ত?" "না, বলুন।" "কি করছো?" " কিছু না, শুয়ে আছি।" তানভির ঘড়ির দিকে তাকিয়ে কিছুটা উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলল, " এত বেলা হয়ে গেছে এখনও শুয়ে আছো কেনো? শরীর কি বেশি খারাপ?" "না।" "কিছু হয়েছে?" "তেমন কিছু না। আপনি কল দিয়েছিলেন কেনো?" বন্যার ভারী কণ্ঠের কথাবার্তা শুনে তানভির শঙ্কিত হলো, পর পর ধীর কণ্ঠে জানতে চাইল, " বাসায় কি কোনো সমস্যা? " " না। " "বলো " তানভিরের গম্ভীর কণ্ঠ শুনে বন্যা সহসা হাসার চেষ্টা করল। মৃদুহেসে বলল, "আপনি অল্পতে এত সিরিয়াস হয়ে যান কেনো? আপুর বিয়ে হয়ে যাচ্ছে সেজন্যই মনটা একটু খারাপ । এখন বলুন, মেঘ, মীমদের নিয়ে কখন আসছেন?" "আমি

বোধহয় আসতে পারবো না।” “কেনো?” “ভাইয়া বলল আমাকে নিয়ে কোথায় যাবে, কিছুক্ষণের মধ্যেই বের হতে হবে। তুমি চিন্তা করো না, বনুরা সময়মতো পৌঁছে যাবে।” বন্যা মলিন কণ্ঠে বলল, “আপনি আসবেন না!” “ইচ্ছে তো ছিল, কিন্তু ভাইয়ার কথা অমান্য করে যেতে পারবো না। তবে সুযোগ পেলে অবশ্যই আসব।” “আচ্ছা।” তানভির কল কেটে দিয়েছে, বন্যা ফোন থেকে গতকালের তোলা একটা ছবি বের করে শীতল চোখে তাকিয়ে তানভিরকে দেখছে। কিছুক্ষণ পর বন্যার বোন রুমে আসছে। আপুকে দেখে বন্যা আতঙ্কিত হয়ে ফোন রেখে দিয়েছে। বন্যার বোন বন্যার মাথার কাছে বসে আস্তে করে বললেন, ” কি হয়েছে তোর?” “কিছু না।” “মন খারাপ?” বন্যা নিরবে ঢোক গিলছে। বন্যার বোন মাথায় হাত বুলিয়ে শান্ত কণ্ঠে বলল, ” মামারা তোর বিয়ের আলোচনা তুলেছে। তাদের ছেলের অতীত ভুলে আমরা যেন আবার চিন্তা করি।” বন্যা কপাল কুঁচকে তাকিয়ে আছে, বুকে অজানা ভয় হানা দিচ্ছে। চোখের কোণে পানি জমতে শুরু করেছে। বন্যার বোন কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে কোমল কণ্ঠে ডাকল, “বন্যা” “হু” “তুই কি তানভিরকে পছন্দ করিস?” বোনের মুখে এমন প্রশ্ন শুনে বন্যা কিছুটা ঘাবড়ে গেছে, কয়েক মুহুর্ত প্রশস্ত আঁখিতে তাকিয়ে রইল। বোনের এমন প্রশ্নের তোপে নিজেকে সামলাতে না পেরে হঠাৎ ই বোনকে জড়িয়ে ধরে কান্না শুরু করল। বন্যার বোন মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলল, ” হ্যাঁ কি না বল।” বন্যা তখনও অঝোরে কেঁদেই যাচ্ছে। বন্যা কাঁদতে কাঁদতে বলল,

“আমি না চাইতেও ওনাকে ভালোবেসে ফেলেছি আপু। আমি ওনাকে ছাড়া অন্য কাউকে বিয়ে করতে পারবো না।” বন্যার বোন দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে আস্তে করে বলল, ” আমি জানতাম, অবশ্য সেদিনের আচরণ দেখেই আমার সন্দেহ হয়েছিল।” বন্যা ঘনঘন নিঃশ্বাস ফেলছে। বন্যার বোন আবারও জিজ্ঞেস করল, ” মেঘ জানে?” “মেঘ, মীম, আবির ভাইয়ারা সবাই জানে।” “তাহলে মুখ ফুলিয়ে শুয়ে আছিস কেনো? নিচে চল।” “মামারা...” “আশ্চর্য! ওনাদের জন্য আমাদের জীবন থেমে থাকবে নাকি? ওনাদের হীরার টুকরা ছেলের জন্য হীরা খোঁজতে থাকুক। আমরা রূপা, রূপা নিয়েই সুখে থাকবো। কি বলিস?” বন্যা আনম্র হেসে বলল, “ঠিক আছে।” সকাল ১০ টার দিকে আরিফ আর আইরিন মেঘদের বাসায় আসছে। যদিও মাহমুদা খান এখনও খান বাড়িতেই আছেন। সবার সঙ্গে টুকটাক কথা বলে আরিফ চুপিচুপি মীমের রুমের সামনে আসছে। দরজায় ঠোকা দিয়ে ধীর কণ্ঠে শুধালো, “আমি কি আসতে পারি?” মীম চোখে কাজল দিচ্ছিলো, কাজল দেয়া থামিয়ে কিছুটা ঝুঁকে আরিফকে দেখে স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, ” তুমি?” “আসবো কি না বলো” “আসো” আরিফ রুমে ঢুকে চারদিকে নজর বুলিয়ে মীমের দিকে তাকালো। মীম নিঃশব্দে ভ্রু নাচাতেই আরিফ মুচকি হাসলো। মীম ঠোঁট বেঁকিয়ে শক্ত কণ্ঠে বলল, “আমার রুমে কেনো আসছো? ঝগড়া করতে?” “তোমার কি আমাকে এত ঝগড়ুটে মনে হয়?” “হ্যাঁ, এখন বলো কেনো আসছো?” “তোমাকে দেখতে।” মীম দু’হাতে নিজের দুগালে হাত রেখে ঘনঘন পল্লব ঝাপ্টে বলল, ”

দেখেছো?” আরিফ মুচকি হেসে বলল, ” তোমাকে খুব সুন্দর লাগছে।” মীম সঙ্গে সঙ্গে হাত নামিয়ে সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, ” ঐ তোমার মনে কি চলে? তোমার হাবভাব আমার একদম ভালো লাগছে না। আমি কিন্তু ভাইয়াকে বিচার দিব।” “কি বিচার দিবে?” “বলবো। বলবো যে তুমি আমার সাথে অসভ্যতা করো। ভাইয়া যখন তোমার পা ভেঙে হকি খেলবে তখন বুঝবা।” আরিফ জিভ দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে তপ্ত স্বরে বলল, “পা কবে ভাঙবে জানিয়ো তাহলে প্রস্তুতি নিতে সুবিধা হবে। ” ” ফাউল কথা বাদ দিয়ে যাও এখান থেকে নয়তো সত্যি সত্যি বিচার দিব।” আরিফ পকেট থেকে দু ডজন লাল রঙের কাঁচের চুড়ি বের করে বিছানার উপর রেখে শান্ত গলায় বলল, ” খুব শখ করে তোমার জন্য চুড়িগুলো নিয়ে আসছি, তুমি পড়লে খুশি হবো।” আরিফ দরজা পর্যন্ত গিয়ে আবারও থামল, আড়চোখে মীমের দিকে তাকিয়ে ফের বলল, ” তোমাকে আজ অন্যরকম সুন্দর লাগছে। কারো নজর না লাগে যেন!” মীম কপাল কুঁচকে তাকিয়ে আছে, আরিফ চলে গেছে। মীম ড্রেসিং টেবিলের আয়নার দিকে তাকালো, লজ্জা আর কুণ্ঠায় মীমের উজ্জ্বল ধৃষ্টতা আরও বেশি ঝলমল করে উঠল। আরিফকে নিয়ে কখনো সেভাবে কিছু ভাবে নি মীম, দু’জনের সম্পর্কটাও খুব বেশি মধুর নয়। এ বেলায় দুটা ভালো কথা বললে ও বেলাতেই ঝগড়া লেগে যায়। তাই আরিফের এই হঠাৎ পরিবর্তন মীমের কাছে অস্বাভাবিক লাগছে। মীম দু’জোড়া চুড়ি হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ দেখে আবারও রেখে দিল। প্রায় ৪ টার দিকে

আবির তানভিরকে নিয়ে বন্যাদের বাসার সামনে আসছে। বাইক থেকে নামতেই আবির চটজলদি পকেট থেকে টিস্যু বের করে তানভিরের মুখ মুছে দিতে লাগল। আবিরের কাণ্ড দেখে তানভির হতবিহ্বল। কাজের নাম করে সকাল থেকে ২-৩ ঘন্টা তানভিরকে সেলুনে বসিয়ে রেখেছে। ১০০ হেয়ার স্টাইল দেখে অনেক ভেবেচিন্তে একটা সিলেক্ট করে দিয়েছে, এমনকি তানভিরের পড়নের পাঞ্জাবিটাও আবিরের এর ই দেয়া। আবির তানভিরের চুল ঠিক করে দিতে দিতে মৃদুস্বরে বলল, " ভদ্র ছেলের মতো থাকবি কেমন?" তানভির ভ্রু কুঁচকে বলল, " আমার মনে হচ্ছে আমাকে মেহমানের থেকেও বেশি নতুন জামাই লাগছে। আমি কি বিয়ে করতে যাচ্ছি নাকি?" আবির হাসল, সহসা বলে উঠল, "করলে ক্ষতি কি?" তানভির আড়চোখে তাকাতেই আবির তাড়া দিল। তানভিরকে নিয়ে বাসার ভেতরে ঢুকল। মেইন গেইটের ভেতরে এক পা রাখতেই তানভির আশ্চর্য বনে গেল। আলী আহমদ খান, মোজাম্মেল খান, ইকবাল খান সহ মীম, মেঘ, আদি, আইরিন, আরিফ, আসিফ, রাকিব সবাই উপস্থিত। তারা ছাড়াও বন্যার বড় আপুর শ্বশুর বাড়ির মানুষজন, বন্যাদের আত্মীয়স্বজনে ড্রয়িংরুম পরিপূর্ণ। বন্যার আব্বু হেসে বললেন, " নতুন জামাইয়ের আসতে এত দেরি কেনো?" তানভির শুকনো মুখে ঢোক গিলে আবিরের দিকে তাকালো। আবির মুচকি হেসে বিড়বিড় করল, "সারপ্রাইজটা কেমন?" " I'm Shocked. " মেঘ দ্রুত এগিয়ে এসে আহ্লাদী কণ্ঠে বলল, "ভাইয়া, আমাকে কেমন লাগছে?" তানভির মেঘকে

আপাদমস্তক দেখে আবারও আবিরের দিকে তাকালো। মেঘের বিয়ের সময় এত এত শাড়ি আর লেহেঙ্গা দেখেছিল যে মেঘের জন্য শাড়ি, লেহেঙ্গা কেনা শেষে তানভিরকে টেনেও শপ থেকে বের করা যাচ্ছিলো না। একই ডিজাইনের দুটা লেহেঙ্গা তার খুব পছন্দ হয়েছিল এক পর্যায়ে খুব জোরাজোরি করেই দুইটা লেহেঙ্গা নিয়েছিল। তানভির ভেবেছিল, বন্যাকে যেদিন প্রপোজ করবে সেদিন মেঘ আর বন্যাকে এই লেহেঙ্গা দুটা দিবে। কিন্তু হুট করে কক্সবাজার যাওয়া, ওখানে পরিকল্পনা বিহীন প্রপোজ করা সব মিলিয়ে পরিকল্পনাগুলো এলোমেলো হয়ে গেছিল। এদিকে মেঘের ইচ্ছে ছিল তানভিরের বিয়েতে বন্যা আর মেঘ দু'জনেই লেহেঙ্গা পড়বে তাই আবির বাধ্য হয়ে তানভিরের কেনা লেহেঙ্গা দুটায় দিয়ে দিয়েছিল। আবির ধীর কণ্ঠে বলল, " আমার কিছু করার ছিল না। তুই খুব ভালো করেই জানিস তোর বোনের বায়নার কাছে আমি আবির নাথিং।" আলী আহমদ খান ভারী কণ্ঠে ডাকলেন, "ভেতরে আসো।" তানভির কিছুটা সামনে এগিয়ে সবাইকে সালাম দিল। সবার কথায় সোফায় গিয়ে বসল। আশেপাশে সবাই অদ্ভুত দৃষ্টিতে তানভিরকে দেখছে। কি হচ্ছে, কি হতে চলেছে সেটা পুরোপুরি আন্দাজ করতে না পারলেও তানভির কিছুটা হলেও আন্দাজ করতে পারছে। বন্যার আব্বু, চাচ্চু ওনারা তানভিরকে টুকটাক প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছেন। তানভির ধীরস্থির কণ্ঠে উত্তর দিচ্ছে তবে গলা প্রচন্ড বেগে কাঁপছে। আব্বু আর বড় আব্বুদের দিকে তাকানোর বিন্দুমাত্র সাহসও অবশিষ্ট নেই। আবির তানভিরের

ঠিক পেছনে দাঁড়ানো। বন্যার আব্বু সবার উদ্দেশ্যে বললেন, " পরিচয় করিয়ে দেয়, সে সাফিয়াদ্দীন খান তানভির ওরফে তানভির খান। সবার উপস্থিতিতে একটা কথা বলতে চাই, বড় মেয়ের সাথে সাথে আমি আমার ছোট মেয়ে মেহের্নাজ মুনতাহা বন্যার সাথে তানভিরের বাগদান সম্পন্ন করে রাখতে চাচ্ছি। গতকাল রাতে অলক্ষিতভাবে সিদ্ধান্ত নেয়ার কারণে সবাইকে আগে কিছু জানাতে পারি নি।" বন্যার আব্বুর কথা শুনে তানভিরের বুক ধুকপুক করছে, মনে যত সাহস ছিল সব যেন সেকেন্ডের মধ্যে উধাও হয়ে গেছে। তানভির মাথা নিচু করে আস্তে করে ঢোক গিলল। গতরাতে তানভিরকে বাসায় পাঠিয়ে সবাই যে আলোচনায় বসেছিল আর সেই আলোচনার সর্বাধিনায়ক যে আবির ছিল এটা বুঝতে সময় লাগল না। গত দুইদিনে আবিরের বলা কথাগুলো তানভিরের কানে বাজছে। আবির কয়েকবার সরাসরি জিজ্ঞেস করেছিল, 'বিয়ে করার মতো সাহস আছে তোর?' তানভির তখন কথাগুলোকে সেভাবে গুরুত্ব না দিলেও এখন সব বুঝতে পারছে। তানভিরের খুব ইচ্ছে করছে আবিরকে জড়িয়ে ধরতে কিন্তু এত মানুষের ভিড়ে সেটাও করতে পারছে না। বন্যার মামাতো ভাই এক দৃষ্টিতে তানভিরের দিকে তাকিয়ে আছে, সুপ্ত ক্রোধ চোখে উপচে পড়ছে তার। বিষয়টা তানভিরের চোখে না পড়লেও আবিরের চোখে ঠিকই পড়েছে। আবির ছেলেটাকে দেখে মিটিমিটি হাসছে। ছেলেটার নজর আবিরের দিকে পড়তেই আবির সহসা দাঁত বের করে নিঃশব্দে হাসল। ছেলেটা সূক্ষ্ম নেত্রে তাকিয়ে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই চোখ

সরিয়ে নিল। ১০ থেকে ১৫ মিনিটের আলাপচারিতা শেষে বন্যা আর বন্যার বোনকে ডাকা হলো। দুই বোন একসঙ্গে নামছে, বন্যার বোনের পড়নে বেনারসি শাড়ি আর বন্যার পড়নে তানভিরের কিনে রাখা সেই লেহেঙ্গা। ওদের সাথে মীম, আইরিন আর মেঘও নামছে। তানভির ঘাড় ঘুরিয়ে তাকানোর সঙ্গে সঙ্গে হৃদয় জুড়ে হিমশীতল হাওয়া বয়ে গেল। বন্যা ভারী মেকাপ না নিলেও লেহেঙ্গার সাথে মানানসই ভাবেই সেজেছে। মিষ্টি কালারের লেহেঙ্গার সাথে ম্যাচিং চুড়ি, অল্পস্বল্প গহনাও পড়েছে। চোখে কাজল আর ঠোঁটে গাঢ় লিপস্টিক দিতেও কৃপণতা করে নি আজ। এই অকল্পনীয়, অপরূপ সাজে বন্যাকে দেখামাত্র নিজের অজান্তেই তানভিরের ঠোঁটে প্রশান্তির হাসি ফুটলো। হৃদয়ে বইছে বসন্তের প্রেমময় হাওয়া, মনের ভেতর থেকে শুধু একটা কথায় বের হচ্ছে, “She is my better half.” তানভিরের নিষ্পলক চাহনি দেখে আবির অতর্কিতে তানভিরের কাঁধে হাত রেখে আস্তে আস্তে আঙুল নাড়ালো। তানভির সঙ্গে সঙ্গে চোখ সরিয়ে স্বাভাবিক হয়ে বসেছে। একটা সোফায় বন্যারা দুই বোন পাশাপাশি বসা, তানভির বন্যার পাশে বসেছে আর বন্যার বোনের পাশে তার হবু হাসবেন্ড। মোজাম্মেল খান চোখে ইশারা দিতেই আবির পকেট থেকে একটা আংটির বক্স বের করে দিল। মেঘ এতক্ষণ দূরে থাকলেও এখন আবিরের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। আবির তাকাচ্ছে না দেখে মেঘ আবিরের হাতে চিমটি কাটল। আবির মেঘের দিকে তাকিয়ে ভ্রু নাচাতেই মেঘ বিড়বিড় করে বলল, “আমাকে কেমন লাগছে বললেন

না তো!” মেঘের কপালের উল্টে যাওয়া টিকলিটা ঠিক করে দিয়ে আবির অত্যন্ত ধীর কণ্ঠে বলল, “তুমি তমসার বুকে অনুদার আলোকচ্ছটা হলেও আবিরের হৃদয়ে নিরন্তর দীপ্তির মেলা।” মেঘ হালকা ধমকের স্বরে বলল, “এটা প্রশংসা ছিল নাকি অবজ্ঞা?” “আপাতত অবজ্ঞায় ভাবো, প্রশংসাটা না হয় রাতের জন্য তোলা থাকলো।” আবির ঠোঁট কামড়ে হেসে আলগোছে চোখ টিপল। মেঘ মুখ ফুলিয়ে প্রশস্ত নেত্রে তাকিয়ে দু’হাতে আবিরের হাত খামচে ধরেছে। এরমধ্যে তানভির বন্যার বাগদান সম্পন্ন হয়ে গেছে। বন্যা বুক ফুলিয়ে শ্বাস টেনে পরপর দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে নিজের অনামিকা আঙুলের দিকে তাকালো, অন্তর্নিহিত অনুষঙ্গে বন্যার দুচোখ চিকচিক করছে। তানভিরের সাথে বিয়ের কথা সকাল পর্যন্তও জানতো না বন্যা। বন্যার বোন রিদের মুখ থেকে তানভিরের কথা শুনেই বন্যাকে সকালে জিজ্ঞেস করেছিল। তবে এর কিছুক্ষণ পর মেঘ, মীমরা আসতেই বাড়ির পরিবেশ বদলে গিয়েছিল। পরিশেষে বন্যার আব্বু গতরাতের আলোচনার কথা বন্যাদের জানিয়েছে। এত সহজে সবকিছু ঠিকঠাক হয়ে হয়ে যাবে এটা বন্যা কল্পনাও করতে পারে নি। আপাতত বাগদান সম্পন্ন হলেও তানভিরের জব হওয়ার পর অনুষ্ঠান করা হবে। তানভির সবার দিকে এক বার নজর বুলিয়ে অকস্মাৎ বন্যার কানের কাছে ফিসফিস করল, “তোমাকে চেয়েছিলাম আমি ভোরের স্বপ্নের মাঝে, আবৃত অনুভবের নিমিত্তে পেয়ে গেছি গোধূলি লগ্নের আগে।” বন্যা আড়চোখে তানভিরের দিকে তাকালো।

তানভিরের নেশাক্ত দৃষ্টি, মায়াবী আদল, অকৃপণ হাসি দেখে বন্যার ওষ্ঠ যুগল কিছুটা প্রশস্ত হলো। বন্যা চোখ নামিয়ে মৃদুস্বরে বলল, “সরি” ” সরি বলছো কেনো?” “আমার ফোন মেঘের কাছে তাই আপনাকে আগে জানাতে পারি নি।” ” ভালো হয়েছে জানাও নি। আগে জেনে গেলে হয়তো এত সুন্দর অনুভূতিটা মিস করে যেতাম।” বন্যা শীতল চোখে ফের তাকালো,তানভিরের সাথে চোখাচোখি হতেই নিজের চোখ নামিয়ে নিয়েছে। তানভির কয়েক মুহুর্ত তাকিয়ে থেকে উষ্ণ স্বরে বলল, ” দৃষ্টিকে জানিয়ে দাও, তানভির আজ থেকে শুধুই বন্যার। মনের সব ভয়,ভীতি শঙ্কা ভুলে, যেতে চাই নিরালায়।” ছাদে খাবারের আয়োজন করা হয়েছে। বড়দের খাবার খাওয়ানোর জন্য নিয়ে গেছে। আত্মীয়স্বজনের ভিড় কমতেই তানভির অকস্মাৎ উঠে গিয়ে আবিরকে জড়িয়ে ধরল। আকস্মিক ঘটনায় আবির কিছুটা অবাক হলো, কয়েক মুহুর্ত পর আবিরও জড়িয়ে ধরল। তানভির অধীর কণ্ঠে বলল, ” ধন্যবাদ ভাইয়া, তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমি না চাইতেই তুমি আমার জীবনের সবচেয়ে দামী গিফটটা আমাকে দিয়ে দিলে। তোমার এই আনুকূল্য আমি কোনোদিনও ভুলব না। ভালোবাসি ভাইয়া, খুব ভালোবাসি। ” আবির স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, ” তুই আমার জন্য যত ঝড়-ঝাপটা সহ্য করেছিস তার কাছে এই উপহার কিছুই না। তবে হ্যাঁ, দুই বছর আগে তোর বউকে আমাদের বাড়িতে নিচ্ছি না। আমার বউয়ের বউ বউ ফিল শেষ হলে তবেই তোর বউকে ঘরে তুলবো।” “ঠিক আছে, তুমি যা বলবে তাই হবে।” তানভিরের হাস্যোজ্জ্বল

চেহারা আর আবেগী কণ্ঠস্বর শুনে মেঘ অভিমানী কণ্ঠে বলল, " এখন সব ভালোবাসা ভাইয়ের জন্য। আমি যে এত বছর বান্ধবীটাকে আগলে রেখেছি, প্রপোজ করেছি, বিয়ের জন্য এত চিল্লাচিল্লি করেছি এগুলো কিছুই না।" তানভির আবিরকে ছেড়ে হাসিমুখে মেঘের দিকে তাকালো, আলতো হাতে মেঘকে বুকে জড়িয়ে আদুরে কণ্ঠে বলল, " তুই তো আমার সবকিছু। তুই পৃথিবীতে আসছিলি বলেই আমি তানভির পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ একটা বোন পেয়েছি। তুই আসছিলি বলেই আমি আবির ভাইয়ার মতো ভাই পেয়েছি আর বন্যার মতো একজন জীবনসঙ্গী পেয়েছি। আমার জীবনে তুই সবচেয়ে দামী। সারাজীবন ভালোবাসি বললেও তোর প্রতি আমার ভালোবাসার অন্ত ঘটবে না। তবুও বলছি, বনু আমি তোকে সীমাহীন ভালোবাসি।" মেঘ আহ্লাদী কণ্ঠে বলল, "আমার চোখে তুমি পৃথিবীর সেরা ভাই। তুমি আমার জীবনে না থাকলে আমি বোধহয় ভালোবাসার সঠিক অর্থই বুঝতাম না। আমিও তোমাকে সীমাহীন ভালোবাসি, ভাইয়া।" রাকিব শক্ত কণ্ঠে বলল, " হ ভাই, ভালোবাসা সব তোদের ই। আমরা ভাই বানের জলে ভেসে আসছি। নাকি বলো আসিফ?" "জ্বি ভাই, আমারও তাই মনে হয়।" তানভির মেঘকে ছেড়ে সবার উদ্দেশ্যে বলল, " আমি তোমাদের সবাইকে ভালোবাসি। " আরিফ ঠাট্টার স্বরে বলল, " সবার মধ্যে কি ভাবিও আছে নাকি ভাই? তুমি সরাসরি বলতে পারছো না বলে আমাদের নাম নিচ্ছো, তাই না?" তানভির ঠোঁট বেঁকিয়ে ভেংচি কাটার চেষ্টা করল। পরপর নিরেট কণ্ঠে বলে উঠল, " কেনো? আমি কি ভয়

পায় নাকি?” বন্যার দিকে তাকিয়ে মোলায়েম কণ্ঠে বলল, ” I Love You, Bonna.” সবাই একসঙ্গে হেসে উঠল, বন্যা লজ্জায় চোখ নামিয়ে নিয়েছে। সবার মধ্য থেকে আইরিন বলে উঠল, ” মানি না, মানবো না। সবার বেলায় ভালোবাসি আর ভাবির বেলায় I love you.” তানভির ভ্রু কুঁচকে ভারী কণ্ঠে বলল, ” দাঁড়া, তোর বিয়েটাও খুব তাড়াতাড়ি ঠিক করছি।” “না।” মেঘ বন্যাকে টেনে এনে তানভিরের পাশে দাঁড় করিয়ে তানভিরের হাতের উপর বন্যার হাত রাখলো। তারউপর নিজের রেখে মোলায়েম কণ্ঠে বলতে শুরু করল, ” আজ থেকে আমার বেবিটা তোমার তাই বলে এটা ভেবো না যে আমি আমার বেবিকে ছেড়ে দিব। তুমি যদি ইচ্ছেকৃত আমার বেবিকে কষ্ট দাও তাহলে এর ফল খুব খারাপ হবে। আর হ্যাঁ, আমার ভাইও আমার, আমার বেবিও আমার। তাই তোমাদের দু’জনের উপর আমার অধিকার সবচেয়ে বেশি। বুঝছো?” বন্যা আর তানভির একসঙ্গে বলল, “জ্বি আপু, বুঝেছি।” আবির মেঘের হাতের উপর নিজের হাত রেখে নিরেট কণ্ঠে বলল, ” আর আমার বউয়ের উপর আমার অধিকার সবচেয়ে বেশি। বুঝছো?” মেঘ আড়চোখে তাকিয়ে নিঃশব্দে হাসলো। তানভির, বন্যা ফের বলল, “জ্বি ভাই, বুঝেছি।” রাকিব হুট করে বলে বসল, ” মেঘের জন্মের পর থেকে মেঘের উপর তো তোর অধিকারই সবচেয়ে বেশি। মেঘের সাথে কেউ কথা বলা তো দূর, মেঘের দিকে কেউ তাকালেই তো তোর মেজাজ ৬২৬ হয়ে যেত। জয়ের কথা মনে হলে এখনও আমার কলিজা কেঁপে উঠে। রাগের বশবর্তী হয়ে মেঘকে

২-১ টা থাপ্পড় দিয়ে ফেলছিলি বলে মেঘ তোর উপর রাগ করেছিল। আর তুই সেই রাগ মিটিয়েছিলি জয়ের উপরে। ১১ বছরের ছেলেটার মাথায় তখনই ৭ টা সেলাই লাগছিলো। জয়কে মেরে নিজের রাগ কমাতে পারলেও মেঘের রাগ কমাতে পারলি না। মেঘের রাগ ভাঙানোর চেষ্টায় নিজেকে ভেঙেচুরে নতুন করে তৈরি করলি। তুই বাহির থেকে বদলে গেলি কিন্তু মেঘের প্রতি আবেগ আর নিজের রাগকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলি না। যেই শুনলি সেই জয় আবারও মেঘের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছে, তুই সব প্ল্যান বাদ দিয়ে দেশে আসলি। কেনো? জয়কে মারতে। মারলি তো মারলি, একেবারে ২ মাসের জন্য হাসপাতালে পাঠালি। বাকিদের কথা না হয় না ই বললাম। এই তুই আবার অধিকার নিয়ে কথা বলিস। মেঘের দায়িত্ব নিতে চাইলে বা মেঘের যত্ন নিতে চাইলে আগেই তাদের আধমরা করে ফেলতি। আর এখন তো প্রকাশ্যে তোর বউ। কেউ কিছু বলা তো দূর তাকালেই তুই মাটিতে কু*পে দিবি।” আবির গম্ভীর কণ্ঠে বলে উঠল, ” আমার বউ শুধু আমার। কেউ খারাপ নজরে তাকানোর দুঃসাহস দেখালে, আমি আবির তার জীবনকে দুঃস্বপ্ন বানিয়ে ছাড়বো।” মেঘ নির্বাক চোখে রাকিবের দিকে তাকিয়ে আছে।মীম দূরে দাঁড়িতে সবার কান্ডকারখানা দেখছে। হঠাৎ আরিফের নজর পড়তেই মীমের কাছে এগিয়ে গেল। মীমের হাতের লাল চুড়িগুলো দেখে মুচকি হেসে বলল, ” আমার দেয়া চুড়িগুলো পড়ার জন্য ধন্যবাদ।” ” এত খুশি হওয়ার মতো কিছু হয় নি, জামার সাথে ম্যাচ হয়েছে তাই

পড়েছি। ” “মিথ্যে বলো না মীম, আর যাই হোক তোমার সাথে মিথ্যেটা যায় না।” মীম চোখ তুলে তাকালো, আরিফের নিষ্পলক চাহনি দেখে আতঙ্ক আর কুণ্ঠায় চোখ সরিয়ে নিল। মীম বার বার বলেছিল এই চুড়িগুলো পড়বে না তবুও শেষ পর্যন্ত পড়েছে। কেনো পড়েছে নিজেও বুঝতে পারছে না। মাগরিবের নামাজের পর পর তানভিররা সবার থেকে বিদায় নিয়ে বের হচ্ছে। বন্যার আব্বু আবিরের আব্বু, চাচ্চুকে এগিয়ে দিতে বেড়িয়েছেন। রিদ,আদি, মীম, আরিফরা আগেই বেড়িয়ে গেছে। মেঘ আর আবির বন্যার আম্মু, মামী আরও অন্যান্যদের সাথে কথা বলছে। তানভিরদের এগিয়ে দিতে বন্যা গেইটের বাহিরের সরু গলিটা পর্যন্ত এসেছে। তানভির কিছুটা সামনে চলে গেছে, আচমকা কিছু ভেবে পেছনে ঘুরলো। বন্যাকে দূরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে এক ছুটে এসে বন্যাকে জড়িয়ে ধরলো। অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনায় বন্যার শরীর ঝাঁকুনি দিয়ে উঠেছে। বুকের ভেতর হৃদপিণ্ডটা অস্বাভাবিকভাবে কম্পিত হচ্ছে। তানভির কয়েক সেকেন্ডের ব্যবধানে বন্যার কপালে, গালে অগণিত কিস করে ফেলেছে। বন্যা নিস্তব্ধ চোখে চেয়ে তানভিরের পাগলামি দেখছে। তানভির আচমকা বন্যার মাথায় দেয়া ঘোমটার একসাইড টেনে বন্যাসহ নিজের মাথা ঢেকে দিল। বৈদ্যুতিক বাতির আলোতে বন্যার ভীতিকর চেহারা অল্পবিস্তর দেখা যাচ্ছে, তানভির বন্যার কাছাকাছি আসতেই বন্যার নিঃশ্বাস এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। তানভিরের নিঃশ্বাস বন্যার ঠোঁটে লাগছে, বন্যার ঠোঁট অপ্রত্যাশিতভাবে কাঁপছে। তানভির সহসা বন্যার কম্পিত অধর নিজের

দখলে নিয়ে নিল, বন্যা সঙ্গে সঙ্গে চোখ বন্ধ করে তানভিরের পেটের দুপাশ চেপে ধরেছে। আবির আর মেঘ সবার থেকে বিদায় নিয়ে বের হতেই এই দৃশ্য দেখল। মেঘ ঠিকমতো বুঝার আগেই আবির একহাতে মেঘের চোখ ধরে নিয়ে সামনে নিয়ে গেছে। মেঘ তপ্ত স্বরে বলল, " চোখ ধরেছেন কেনো?" " এসব দৃশ্য দেখার বয়স হয় নি তোমার।" "একটু দেখে ফেলি।" "এই ফাজিল, তানভির তোমার বড় ভাই হয় না?" " বন্যা তো আমার বান্ধবী হয়, দেখি না একটু।" আবির দাঁতে দাঁত চেপে বলল, " নির্লজ্জের মতো কথা বলো না।" "আপনি খুব খারাপ। " "তাই? ঠিক আছে। খারাপের রূপটা নাহয় রাতে দেখাবো, এখন চলো।" বিয়ের পর থেকে আবিরের অফিস সম্পর্কিত কোনো মাথা ব্যথায় নেই। রাকিব আর রাসেল কোনোরকমে অফিস টানছে। আবিরকে কিছু বলার মতোও অবস্থা নেই কারণ আবির অন্য এক জগতে আছে। অবশেষে আবির আজ অফিসে যাবে যদিও স ইচ্ছায় না। আবির মেঘের বিয়ের আগে থেকেই একটা মিটিং আঁটকে আছে। সেই মিটিং এর জন্য আজ বাধ্য হয়ে যেতে হচ্ছে। আবির ফ্রেশ হয়ে ওয়াশরুম থেকে বের হতেই দেখল বিছানার উপর আবিরের শার্ট, প্যান্ট, টাই সুন্দর করে গুছিয়ে রাখা আছে অথচ মেঘ রুমে নেই। আবির ভ্রু কুঁচকে রুম থেকে বেড়িয়ে বেলকনিতে গেল। মালিহা খান, হালিমা খান, মীম, আদির সাথে মেঘও গল্প করছে। মূলত তানভিরের বিয়ে নিয়েই আলোচনা চলছে। আবিরের বিয়ের বিষয়ে আগে থেকে কেউ না জানলেও তানভিরের বিষয় নিয়ে বাড়িতে

আলোচনা আগেই হয়েছিলো। তানভির বাড়ি থেকে চলে যাওয়ার পর পরিস্থিতি অস্বাভাবিক হয়ে গিয়েছিল তখন মাহমুদা খান বন্যার কথা জানিয়েছিলেন। অনেকবছর যাবৎ বন্যাকে চিনে জানে, আচার-আচরণও ভালো সবমিলিয়ে কারোর ই কোনো আপত্তি ছিল না। তানভিরের উপর অল্পবিস্তর অভিমানের কারণে সবাই ইচ্ছেকরে তানভিরকে আগে কিছু জানায় নি। আবির কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে অকস্মাৎ উচ্চশব্দে ডাকল, "বউ" মেঘ সহসা চোখ তুলে তাকালো, কিন্তু উঠে গেল না। আবির শক্ত কণ্ঠে আবার ডাকল, "রুমে আসো।" মালিহা খান শান্ত গলায় বললেন, "ডাকছে যা" মেঘ দরজায় দাঁড়িয়ে ভ্রু গুটিয়ে ধীর কণ্ঠে বলল, " সবকিছু রেডি করে রেখে গেলাম, আবার ডাকছেন কেনো?" " আমি অফিসে যাওয়ার আগ পর্যন্ত তুমি আমার চোখের সামনে থাকবে। এখন টাই টা পড়িয়ে দাও।" মেঘ তখনও দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আবির জিজ্ঞেস করল, " টাই বাঁধতে পারো না?" মেঘ মৃদু হেসে বলল, " এই দায়িত্ব টা যে আমার নিতে হবে এটা খুব ভালোকরেই জানতাম তাই আগেভাগেই শিখে ফেলেছি।" " গুড গার্ল। " আবির রেডি হয়ে অফিসের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছে। মেঘ আবিরকে এগিয়ে দিয়ে আবারও রুমে ঢুকল। বিয়ের ঝামেলা, কক্সবাজার, ভাইয়ের বিয়ে সব মিলিয়ে ব্যস্ততায় আবিরের রুমটাকে এখনও আপন করেই নিতে পারে নি। মেঘের জামাকাপড়ের প্রায় সবই এখনও মেঘের রুমে রয়ে গেছে। মেঘ সেগুলোই টুকটাক গুছাচ্ছে। সকাল থেকে তানভিরের কোনো খোঁজ

নেই, আবির কিছুদূর যাওয়ার পর তানভিরের নাম্বারে কল দিল। তানভির কল রিসিভ করতেই আবির জানতে চাইল, “কোথায় আছিস?” “মুন্সিগঞ্জ।” “ওখানে কি করিস?” “বউ নিয়ে আসছি।” “বাহ! অসাধারণ ” “এটা অসাধারণ না ভাই, খুব সাধারণ। ” “সাবধানে থাকিস।” “ঠিক আছে।” মেঘ গুনগুন করে গান গাইতেছে আর আপন মনে ওয়ারড্রবে জামা রাখছে। জামার মাঝখান থেকে একটা ওড়না নিচে পড়ে গেছে, ওড়না তুলতে গিয়ে অকস্মাৎ বেডের নিচে একটা বড় লাগেজ চোখে পরল। মেঘ তেমন একটা গুরুত্ব না দিয়ে আবারও কাজে মনোযোগ দিল । কিন্তু মনের ভেতর কেমন যেন কৌতূহল জাগছে। কিছুক্ষণ পর মেঘ বেডের নিচ থেকে লাগেজ টা বের করল, লাগেজে তালা দেখে চাবি খুঁজতে লাগলো। অবশেষে চাবির গোছা থেকে লাগেজের চাবি বের করে লাগেজ টা খুললো। লাগেজ ভর্তি জিনিসপত্র দেখে নিজের অজান্তেই কপালে কয়েকস্তর ভাঁজ ফেলল। উপর থেকে দু একটা জিনিস সরাতেই আশ্চর্য নয়নে তাকালো। মেঘের ছোটবেলার জামা, ছোট ছোট কিছু খেলনা সহ আরও অনেক জিনিস। কয়েকটা জিনিস তুলতেই একটা শাড়ি চোখে পড়লো, গাঢ় নীল রঙের অসম্ভব সুন্দর একটা শাড়ি, যার উপরে একটা চিরকুট লেখা- ” আমি জানি না তুই দেখতে কেমন হয়েছিস তবে আমার কল্পনায় তুই পরী চেয়েও সুন্দর হয়ে গেছিস। তুই ঠিক কতটা বড় হয়েছিস জানি না, শাড়ি পড়লে তোকে কেমন লাগবে সেটাও জানি না। কিন্তু আমি ঠিকই কল্পনা করে নিয়েছি। এই

প্রথমবার নিজের টাকায় তোর জন্য শাড়ি কিনেছি। এই শাড়িতে তোকে খুব দেখতে ইচ্ছে করছে রে।” নিচে আজ থেকে আরও ৫ বছর আগের একটা তারিখ লেখা। মেঘ চিরকুট টা সরিয়ে জামার উপর দিয়েই কোনোরকমে শাড়িটা পড়ল। গাঢ় নীল রঙের শাড়িতে ড্রেসিংটেবিলের আয়নায় সত্যি সত্যি একটা পরী দেখতে পেল। বাস্তবিক অর্থে পরী না হলেও আবিরের কল্পনার পরীর মতোই লাগছে। শাড়িটা অনেক বছর আগের হওয়ায় নতুনের মতো আর নেই তবুও মেঘের কাছে এটায় যেন আকাশ সম আবেগ কারণ এতে আবিরের আবেগ, ভালোবাসা জড়িয়ে আছে। মেঘ ধীরে ধীরে বাকি জিনিসগুলো দেখতে লাগলো। লাগেজে বেশকিছু শাড়ি আছে যার প্রতিটাতেই তারিখ সহ আবিরের লেখা চিরকুট লাগানো আছে। বিদেশে থাকাকালীন ৭ বছরে মেঘের কথা ভেবে যা যা কিনেছে প্রতিটা জিনিস খুব যত্নের সাথে প্যাকিং করে রেখেছে।এক পাশের সব দেখে শেষ করার আগেই মেঘের নজর আটকায় অন্য পাশের হাজারো রঙিন কাগজের দিকে। মেঘ কয়েকটা রঙিন কাগজ হাতে নিল। প্রথম কাগজের উপরে এক কর্ণারে পৃষ্ঠা নাম্বার লেখা। প্রথম পৃষ্ঠাটাতে অগোছালো অক্ষরে লেখা, ” যদি এমন হতো, ঘুম ভাঙতেই তোর আমার দূরত্বের কথা মন থেকে মুছে যেত। আমি আমার মেঘকে আবার আমার করে পেতাম। তবে কতই না ভালো হতো! অন্ততপক্ষে নির্ঘুম রাত কাটিয়ে তোকে না পাওয়ায় আক্ষেপ বুকে চেপে এক রাশ হাহাকার নিয়ে দেশ ছাড়তে হতো না। Miss You koliza.” ২য়

পৃষ্ঠাতে লেখা- “এই শহরে সব আছে কিন্তু তোর গায়ের গন্ধ নেই। আবির যে তার মেঘকে ছাড়া একদমই ভালো নেই।” ৩,৪, ৫..... প্রতিটা পৃষ্ঠা উল্টাচ্ছে। অতঃপর ২৩ নাম্বার একটা পৃষ্ঠাতে আবার নজর স্থির হলো। পৃষ্ঠাতে লেখা, ” তুই এত নিষ্ঠুর কিভাবে হতে পারলি? আমাকে দূরে ঠেলে সত্যিই কি ভালো আছিস? কিন্তু আমি কেনো পারছি না? ২৩ দিনেও কেন একবারের জন্য হাসতে পারছি না? চোখের সামনে শুধু তোর অভিমানী মুখটা ভেসে উঠছে, মেঘ। মানুষ তো কত ভুল করে, কই এত বড় শাস্তি কি কেউ পায়? আমাকে কেন এত বড় শাস্তি দিলি?” কয়েকটা পৃষ্ঠা পর আরেকটাতে লেখা- “এই দেশ আমার সব কেড়ে নিয়েছে, মেঘ। আমার আমি টাকে হারিয়ে ফেলতেছি। আমার জীবন বিষন্নতায় ছেয়ে যাচ্ছে। চারদিকের সবেতে বিরক্তি জন্মে গেছে।” মেঘের দুচোখ টলমল করছে,মেঘের হাতে থাকা সব কাগজ পড়ে গেছে। বাতাসে উড়ে পৃষ্ঠাগুলো চলে যাচ্ছে। মেঘ কাছের পৃষ্ঠা গুলো তুলে তাড়াতাড়ি করে লাগেজে রেখে লাগেজ আটকালো। দু একটা পৃষ্ঠা দূরে চলে যাচ্ছে। মেঘ পৃষ্ঠা গুলো উঠাতে উঠাতে রুমের মাঝ বরাবর চলে যাওয়া পৃষ্ঠাটা উঠালো। ঐটাতে লেখা- ” পৃথিবীতে আমার প্রাপ্য সবকিছুর বিনিময়ে হলেও যদি তোর অভিমান ভাঙানো যেত, আমি আবির সব ছেড়ে আজই দেশে চলে আসতাম। বিশ্বাস কর, আমি আজই চলে আসতাম। আমি যদি একবারের জন্যেও বুঝতে পারতাম, তোর গায়ে হাত তুললে তুই এতটা অভিমান করবি তাহলে কোনোদিন তোর গায়ে হাত তোলার

দুঃসাহস দেখাতাম না। তোর অভিমান আমাকে ভেতর থেকে ধ্বংস করে ফেলতেছে। এসব সহ্য করতে না পেরে যদি কখনো মা*রা যাই তবে জেনে রাখিস, আমি আবির আমৃত্যু তোকে ভালোবেসেছি আর তোর অভিমানের কারণেই ম*রেছি। ” মেঘের দুচোখ বেয়ে অনর্গল পানি পড়ছে পৃষ্ঠা উঠিয়ে যেই উঠতে যাবে তখন নজর পরে সামনের দেয়ালের দিকে। আগে রুমে অনেক জিনিসপত্র থাকায় এই দেয়ালের প্রতি নজর ই পড়ে নি। এখন রুম সম্পূর্ণ পরিষ্কার হওয়ায় দেয়ালের কালো পর্দার উপর মেঘের নজর আঁটকে গেছে। মেঘ মনে মনে ভীত হচ্ছে ঠিকই কিন্তু কিছুটা কৌতূহলও কাজ করছে। জোরে নিঃশ্বাস টেনে এগিয়ে গেল পর্দার কাছে। একসাইড থেকে পর্দা টেনে দেয়াল উন্মুক্ত করে দিল। দেয়ালে কিছু একটা ছবি আকাঁ, কাছাকাছি থাকায় মেঘ ঠিকমতো বুঝতে পারছে না তাই পেছাতে লাগল। কিছুটা পেছাতেই থমকে দাঁড়ালো। পুরো দেয়াল জুড়ে বড় করে মেঘের একটা হাস্যোজ্জল ছবি আঁকা যার পাশে লেখা “আমৃত্যু ভালোবাসি তোকে” নিচে গতবছর জানুয়ারির দিকের তারিখ লেখা। যখন আবিরের রুমে রঙ করানো হয়েছিল তখনই ছবিটা আঁকিয়েছিল যেটা একবছর যাবৎ পর্দার আড়ালে লুকিয়ে ছিল। আবিরের রুমে তালা দিয়ে রাখার কারণটাও মেঘ আজ বুঝে গেছে। মেঘ দুচোখ বেয়ে পানিই পড়ছে। বার বার শুধু মনে হচ্ছে, ” একটা মানুষ এতটা ভালো কিভাবে বাসতে পারেন?” মেঘ একপা একপা করে পেছাতে পেছাতে হঠাৎ শক্ত কিছুর সাথে ধাক্কা খেল। পেছনের ঘুরার আগেই আবিরের

ঠান্ডা কন্ঠ শুনা গেল, " সব রহস্য উদঘাটন করা শেষ?" মেঘ আবিরের দিকে তাকাতেই আবির মেঘের চোখ মুছে শান্ত কন্ঠে বলল, " কাঁদলে যদি তোমাকে পাওয়া যেত তাহলে আমি আবির গত ১১ বছরে তোমাকে শতকোটি বার আমার করে পেতাম।" মেঘ অতর্কিতে আবিরের প্রশস্ত বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে অবাঁধে কাঁদতে লাগল। যেই কান্নায় কোনো অভিযোগ নেই, না পাওয়ার আক্ষেপ নেই। আছে শুধু আবিরের সীমাহীন ভালোবাসা। এই কান্না কষ্টের নয়, এই কান্না সুখের। পৃথিবীর বুকে আবিরের মতো একজন মানুষকে জীবনসঙ্গী হিসেবে পাওয়ার সুখ। আবিরও মেঘকে বারণ করছে না বরং শক্ত করে বুকে জড়িয়ে ধরে মোলায়েম কন্ঠে বলল, " ভালোবাসি মেঘ, আমৃত্যু ভালোবাসি তোকে।" মিনিট দশেক পর রাকিবের কল আসছে। আবির কল রিসিভ করতেই রাকিব বলে উঠল, " মিটিং এর আর মাত্র ৩০ মিনিট বাকি। কোথায় আছিস?" " লাঞ্চের পর মিটিং দে। " "হোয়াট? তুই না বের হয়েছিলি? এখন কোথায়?" " বউকে মিস করছিলাম তাই বাসায় চলে আসছি। এখন রাখছি, কল দিয়ে বিরক্ত করবি না। অবশ্য কল দিলেও পাবি না, বাই।" আবির মেঘের কপালে নিগূঢ় চুমু খেয়ে পুনরায় জড়িয়ে ধরে বলল, "ভালোবাসি, আহিয়ার আম্মু।" মেঘ নাক টেনে ভেজা কন্ঠে বলল, "আমিও ভালোবাসি, আহিয়ার আব্বু।""আমার আবির ভাই কোথায়?" "আবির ভাই....." " ও আবির ভাই....." বন্যা এক নিঃশ্বাসে তিনবার ডেকে অতঃপর থামলো। ঠোঁটের কোণে সিক্ত হাসি ঝুলিয়ে মেঘের অভিমুখে চাইল।

মেঘ রাগে ফোঁস ফোঁস করে শ্বাস ছাড়ছে। অভিমানে নাকের ডগা ফুলে আছে। মেঘের অভিমানী চেহারা দেখে বন্যার মুখের হাসি প্রখর হলো। পরপর দুবার ভ্রু নাচাতেই মেঘ ভেঙচি কেটে অন্য দিকে মুখ ঘুরাল। বন্যা মুচকি হেসে আবারও প্রশ্ন করল, " আমার আবির ভাই কোথায়?" মেঘ কপালে কয়েকস্তর ভাঁজ ফেলে গম্ভীর কণ্ঠে বলল, " আবির ভাই তোর হলো কবে থেকে?" "তুই যেদিন থেকে আমার ভাসুরের বউ হয়েছিস সেদিন থেকেই ওনি আমার আবির ভাই হয়ে গেছে।" মেঘ দাঁতে দাঁত পিষে বলল, " আবির ভাই শুধুই আমার।" বন্যা শান্ত কণ্ঠে বলল, " আমি কি বারণ করলাম নাকি? আমার আবির ভাই তো তোরই।" "আমার আবির বলবি না। মেজাজ খারাপ হয় আমার।" "তুই যখন আমার সামনে আমার ভাসুর মানে তোর জামাইকে ভাইয়া বলে ডাকিস। তখন আমার কেমন মেজাজ খারাপ হয় বল! আমি তোর ভাইয়াকে ভাইয়া বলে ডাকলে তোর কেমন লাগবে? বলবো? তানভির ভাইয়া বলে ডাকবো?" মেঘ অগ্নিদৃষ্টিতে তাকিয়ে চিৎকার করল, " চুপ থাক। আমার ভাইয়া শুধু আমার ভাইয়া। বুঝতে পেরেছিস?" বন্যা একটু সময় চুপ থেকে ফের বলল, "এই যে তুই রাগ করে অসময়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলি আমার ভাসুর আমাকে প্রশ্ন করলে, কি জবাব দিব আমি?" "তুই বলবি তুই কিছুই জানিস না। আমাকে তুই চিনিস না।" বন্যা আড়চোখে দূরে রাস্তার দিকে তাকিয়ে মৃদুস্বরে বলল, "ঐ দেখ, তোর ভাইয়া আসতেছে।" বন্যা ঝটপট দূর্বাঘাস থেকে উঠে দাঁড়িয়ে জামা ঝেড়ে

নিল। মেঘের পাশ থেকে ব্যাগটা টেনে দ্রুত গতিতে হাঁটতে শুরু করল। এরমধ্যে মেঘও উঠে দাঁড়াল। বন্যা কয়েক কদম সামনে এগুতেই তানভির বন্যার ঠিক সামনে এসে বাইক থামালো। হেলমেট খুলতে খুলতে গুরুতর কণ্ঠে আওড়াল, " আমাকে দেখে পালাচ্ছিলে কেনো?" বন্যা এক পলক মেঘকে দেখে অত্যন্ত কোমল গলায় বলব, " আপনি যাকে ভাবছেন আমি আসলে সে না।" সঙ্গে সঙ্গে এক আঙুলে মেঘের দিকে ইশারা করে ফের বলল, "ঐ যে মেয়েটাকে দেখছেন আমি কিন্তু মেয়েটাকে একদমই চিনি না। মেঘ নামে কাউকে আমি চিনতেই পারি না। আমি হাঁটতে বেড়িয়েছিলাম। আর হাঁটতে হাঁটতেই এখানে চলে এসেছি।" তানভির হেলমেটের উপর কনুই রেখে থুতনিতে দুই আঙুল চেপে বন্যার কথাগুলো খুব মনোযোগ দিয়ে শুনছিলো। বন্যার কথা শেষ হতেই ঠোঁটে স্মিত হাসি টেনে বলল, " ও আচ্ছা। এই তাহলে কাহিনী! তুমি হাঁটতে হাঁটতে ১৪ কিলো চলে এলে অথচ জানোই না কিছু। অচেনা এক মেয়ের সাথে গত ১ ঘন্টা ২৬ মিনিট যাবৎ গল্প করতেছো সেদিকেও খেয়াল নেই। তুমি যে আমার বউ সেটা মনে আছে তো? নাকি আমি কে তাও ভুলে গেলে?" বন্যা ঘন ঘন পল্লব ঝাপটে ধীর গলায় বলল, " আপনাকে খুব চেনা চেনা লাগছে। কোথায় যেনো দেখেছি! আপনি কি নাটক করেন?" "নাহ, একদম না। আমি সিনেমা করি। পূর্ণদৈর্ঘ্য বাংলা ছায়াছবি " প্রেমের নাম বেদনা, আমার বউ আমাকে চিনে না।" বন্যা নিঃশব্দে হেসে মেঘের দিকে তাকাল। চাপা স্বরে বিড়বিড় করে বলল, " আপনার

বোন বলেছে, আমি তাকে চিনি না এটা সবাইকে বলার জন্য।” তানভির কপাল গুটিয়ে মেঘের দিকে নির্বিকার ভঙ্গিতে বলল, ” এই মেয়ে কে? আমিও তাঁকে চিনি না। আমি আমার বউকে নিতে এসেছি। যার যার বউ দায়িত্ব তার তার। আল্লাহ! তোমার কাছে লক্ষ কোটি শুকরিয়া। আমার বউ আমাকে ভুলে নি।” মেঘ কপালে কয়েক স্তর ভাঁজ ফেলে বিরক্তির স্বরে বলল, ” কালে কালে কত কি দেখব! এত ঢং নিতে পারছি না।” মেঘ মুখ ভেঙচিয়ে ভেঙচিয়ে তানভিরদের পাশ কাটিয়ে যেতে লাগল। তানভির মুচকি হেসে আস্তে করে বলল, ” সামনে যাও আপুই। তোমার ঢং স্বয়ং দাঁড়িয়ে আছে তোমার অপেক্ষায়। ” তানভিরের কথা মেঘ শুনলো কি না বুঝা গেল না। মেঘ হাতে থাকা সাইড ব্যাগটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে হাঁটতে লাগল। তানভির বন্যাকে ইশারা দিল বাইকে উঠার জন্য। বন্যা এগিয়ে এসে জানতে চাইল, ” আবির ভাইয়া এসেছেন?” “হ্যাঁ।” “কোথায়? ” “ভাইয়া আছেন জায়গা মতো। তোমার ভাবতে হবে না। তুমি কেবল আমাকে নিয়ে ভাববে। ভাইয়ার বউ ভাইয়া সামলে নিবে।” তানভিরের কথায় বন্যা লাজুক হাসল। তানভির আবারও বলল, ” তুমি এখানে এসেছো সেটা আমাকে জানানো দরকার ছিল না?” বন্যা বাইকে বসতে বসতে বলল, ” মেঘ আমার ফোন নিয়ে বন্ধ করে রেখেছিল।” “এই মেয়েটাকে নিয়ে আর পারি না। একজনের রাগ দশজনের সাথে দেখাবে। এত অভিমান মনের মধ্যে কিভাবে পুষে রাখে আল্লাহ ভালো জানেন।” বন্যা চাপা নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল, “মেঘ ভাইয়ার উপর খুব

রাগ করেছে। আপনি আর ভাইয়া দু'জনেই ওর সাথে অন্যায় করেছেন। একটা সাধারণ বিষয় নিয়ে কেউ এত বাড়াবাড়ি করে?" " বাড়াবাড়ি করলাম কোথায়? গতকাল ভাইয়ার ৩০ মিনিটের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ মিটিং ছিল। আমি সব কাগজপত্র রেডি করে দিয়ে এসেছি। ভাইয়া বনুকে এক কাপ কফি করে দিতে বলেছিল। সে ২০ মিনিট লাগিয়ে স্পেশাল কফি করে এনেছে। যেইমাত্র ভাইয়ার মিটিং শুরু হয়েছে ওমনি রুমের টাইলসে স্লিপ খেয়ে কফির কাপ সমেত ভাইয়ার উপরে গিয়ে পড়েছে। কাগজপত্র, ল্যাপটপ, ফোন, মিটিং সব শেষ। সবচেয়ে বড়ো বিষয়, ভাইয়ার হাতে, শরীরে পর্যন্ত গরম কফি পরেছে। তারজন্য ভাইয়া রাগে ধমক দিয়েছিল। একটু জোরেই ধমক দিয়েছিল। তারজন্য গতকাল থেকে গাল ফুলিয়ে বসে আছে। বাসায় কারো সাথে কথা বলছে না। কান্না করে আব্বুর কাছে বিচার দিয়েছে। মেয়ের আদুরে কান্না দেখে আব্বু ভাইয়াকে যা তা কথা শুনিয়েছেন। আমাকেও ছাড় দেন নি আব্বু। এই দায় কার বলো!" বন্যা রাশভারি কণ্ঠে বলল, " আপনার। সব দোষ আপনার।" "আমি কি করলাম। ভাইয়ার কতটা ক্ষতি হয়েছে বনু সেটা একবারও বুঝার চেষ্টা করছে না। এদিকে আব্বুর ধমক খেয়ে ভাইয়ার মনে হচ্ছে, সে আজও আদর্শ স্বামী হতে পারেনি। তার স্ট্রাগল, ভালোবাসা সবকিছু মিথ্যা মনে হচ্ছে। এই নিয়ে চলছে মান- অভিমান। এখানে আমার দোষ কোথায়?" "আমি শুনেছি, আপনি দু'জনের রাগ কমানোর চেষ্টা করার বদলে তাদের মধ্যে ঝামেলা আরও বাড়িয়ে দিয়েছেন।" তানভীর

মৃদুস্বরে বলল, " আমি তাদের দু'জনকেই খুব ভালোভাবে চিনি। দু'জনেই ভাঙবে তবুও মচকাবে না। একজন অন্য জনকে ছাড়া খাবে না, ঘুমাবে না অথচ তারা এমন ভাব নিবে যেন ১০০ বছরেও তাদের এই রাগ ভাঙবে না।" "ভাইয়া কি পারবে মেঘের রাগ ভাঙাতে?" "দেখতে চাও?" বন্যা ঘনঘন এপাশ ওপাশ মাথা নেড়ে জবাব দিল, " না না। আমি দেখতে চাই না। শত হোক ভাইয়া আমার ভাসুর হোন।" রাস্তার পাশে একটা অলকানন্দা ফুলের গাছ। যাতে হলুদ রঙের ফুলগুলো ঝলমল করছে। মেঘ যেতে যেতে থমকে দাঁড়াল। ব্যাগ থেকে ফোন বের করে গাছের কাছে দ্রুত এগিয়ে গেল। দুইটা ছবি তুলে যেইমাত্র একটা ফুল ছিঁড়তে যাবে ওমনি দুতলা থেকে একটা পিচ্চি ছেলে চিৎকার করল, " এই ফুল নিচ্ছে কে?" মেঘ দ্রুত পায়ে দূরে সরে দাঁড়াল। আমতা আমতা করতে বলল, " একটা ফুল নেই?" "না।" মেঘ মন খারাপ করে ফুলগুলোর দিকে তাকিয়ে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ল। পিচ্চিটার দিকে চেয়ে আবারও বলল, " একটা নেই?" পিচ্চিটা কণ্ঠস্বর ভারী করে চিৎকার করল, " না না না।" মেঘ ভ্রু কুঁচকে বিড়বিড় করতে করতে চলে যেতে লাগল। মেঘের হাবভাব দেখে পিচ্চিটা ফের ডাকল, " এই মেয়ে, নিয়ে যাও ফুল। একটাই নিবে কিন্তু!" মেঘ দাঁতে দাঁত পিষে বলল, " লাগবে না।" মেঘ ফুটপাতের রাস্তা ধরে হাঁটছে। কিছুদূর যেতেই মনে হলো কেউ তার পিছন পিছন হাঁটছে। মেঘ একটু থেমে পেছন ফিরে তাকালো কিন্তু কোথাও কারো অস্তিত্ব নেই। মেঘ আবারও হাঁটতে লাগল। আশেপাশে কোথাও রিক্সার

কোনো অস্তিত্ব নেই। মেঘের মনের মধ্যে ভয় ঢুকে গিয়েছে। এক পা দু'পা হাঁটছে আর বারবার থমকে দাঁড়াচ্ছে। ভয়ে ভয়ে ব্যাগ থেকে ফোন বের করে আবিরের নাম্বার বের করল। ডায়াল করতে যাবে তখনই মনে হলো, তাঁরা গতকাল থেকে কেউ কারো সঙ্গে কথা বলছে না। সামান্য কারণে কল দিয়ে কথা বলে ফেললে ভালো দেখাবে না। মেঘ ফোন ব্যাগে রেখে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ল। খানিক থেমে যখনই হাঁটা শুরু করবে তখনই মেঘের ওড়নাতে টান পড়ল। মেঘ তৎক্ষনাৎ গলার সামনের ওড়না চেপে ধরে আতঙ্কে পিছু ঘুরল। সামনে দাঁড়িয়ে আছে আবির। অনাকাঙ্ক্ষিত সময়, অপত্যাশিত ব্যক্তির উপস্থিতি হৃদয়ে তোলপাড় চালাচ্ছে। অপরিচিত কেউ ভেবে যতটা আতঙ্কিত হয়েছিল, নিজের প্রিয় মানুষটাকে দেখে সেই আতঙ্ক বিলীন হতে সময় লাগল না।। আবির এক হাতের আঙুল দিয়ে ওড়নার মাথা প্যাঁচাতে প্যাঁচাতে মেঘের গা ঘেঁষে দাঁড়াল। অন্য হাতে থাকা অলকানন্দা ফুলটা মেঘের কানের কাছে গুঁজে দিতে দিতে বলল, " ফুলকে যেমন ফুলের সাথে রাগ করা মানায় না, তেমনি আবির তার মেঘ ছাড়া একদমই বেমানান।" মেঘের শরীরের শিরা-উপশিরায় বহমান রক্তপ্রবাহ জোরালো হচ্ছে। ভয়, আতঙ্ক সবকিছুর উর্ধ্বে প্রিয় মানুষের স্পর্শ। মনে সাহস পাওয়ার একমাত্র অবলম্বন। মেঘ আড়চোখে আবিরের গালের দিকে তাকিয়ে আছে। অবসন্ন রোদে আবিরের ছাপ দাঁড়িগুলো ঝলমল করছে। না চাইতেও গাল স্পর্শ করতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু অভিমানেরা আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে রেখেছে তাকে। সহসা গাল ফুলিয়ে

নিঃশব্দে নিঃশ্বাস ছেড়ে গুরুগম্ভীর কণ্ঠে মেঘ বলল, “আপনি এখানে এসেছেন কেনো?” ” আমার বউকে ছাড়া আমি চোখে আন্ধার দেখি। কি করব বলো!” “চোখের ডাক্তার দেখান। কালো সানগ্লাসের বদলে সাদা চশমা ধরিয়ে দিবে। তখন খুব ভালো লাগবে।” আবির ভরাট কণ্ঠে বলতে শুরু করল, “স্বামীর অনুমতি ছাড়া স্ত্রী ঘর থেকে এক পা বের হতে পারে না। সেখানে তুমি আমার রুম থেকে বেরিয়ে দিব্যি টুইটুই করে এখানে চলে এলে।” মেঘ ইতস্ততভাবে জবাব দিল, “আমি অনুমতি নিয়েছি।” ” কখন? কিভাবে? আমি কোথায় ছিলাম?” “স্বপ্নে।” আবির কপালে ভাঁজ ফেলে ফের জিজ্ঞেস করল, ” আমি কি অনুমতি দিয়েছিলাম?” মেঘ এবার আবিরের অভিমুখ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে মিহি কণ্ঠে বিড়বিড় করল, “হুমমম।” ” আমি এত ভালো!” ” আমার স্বপ্নে আপনি বরাবরই সেরা। অভিমান, অভিযোগের আগেই সব বুঝে যান। রাগ... সে তো অবিশ্বাস্য ব্যাপার। হাসি ছাড়া আপনার ঠোঁটে কিছুই মানায় না।” “আর বাস্তবতা?” “বাস্তবতা সম্পূর্ণ ভিন্ন। আপনার ঘুম ভাঙে আমাকে ধমক দিয়ে। সারাদিন মুখ গোমড়া করে থাকা আপনার বদভ্যাস হয়ে যাচ্ছে। হাসি তো দূরের কথা আপনার ঠোঁট থেকে সিগারেটই সরে না।” আবির অগ্নিচোখে তাকিয়ে চিৎকার করল, ” সিগারেট! আমি কবে সিগারেট খেলাম?” “এইতো সেদিন। ” “কবে?” ” মনে নেই।” আবিরের মেজাজ তুঙ্গে। রাগে কটমট করে বলল, ” সব বিষয়ে মজা করা অন্যান্য। সাধারণ অন্যায় না। মারাত্মক অন্যায়। গত দেড় বছরে যে

জিনিস আমি ছুঁয়েও দেখিনি সেটা নিয়ে মিথ্যে বলা আমার একদম পছন্দ না। " মেঘ আমতাআমতা করে বলল, " ইদানীং আপনার ঠোঁটগুলো কালো লাগে। তাই ভেবেছি আবার বোধহয় খাওয়া শুরু করেছেন।" "আবির কথা দিলে কথা রাখে। আর যদি সেটা মেঘকে দেওয়া কোনো কথা হয় তবে আমৃত্যু সেই কথা রাখবেই রাখবে। এর প্রমাণ আপনি আগেও বহুবার পেয়েছেন, ম্যাম। আর রইল বাকি ঠোঁট কালোর কথা। সে তো অন্য কারণেও হতে পারে।" "কি কারণে?" আবির মলিন কণ্ঠে জবাব দিল, " বউয়ের ভালোবাসার অভাবে, অভিমানের কারণে।" মেঘ ভেঙচি কেটে বলল, " সে আপনার বউ আপনাকে ভালোবাসলো কি বাসলো না সেই দায়ভার আমার না। আপনার বউয়ের অভিমান অভিযোগের গল্প শুনে আমার কোনো কাজ নেই। ভালো থাকুন।" মেঘ নির্বিকার ভঙ্গিতে হাঁটতে শুরু করল। আবির পেছন থেকে আবারও বলল, "ভালো থাকতে দিলে তো থাকবো। রাগে না হয় দুটো কথা বলেই ফেলেছিলাম তারজন্য এত রাগ!" মেঘ ঘাড় ফিরিয়ে তেজী কণ্ঠে বলল, " আপনার ভালোবাসায় আমি অন্ধ হলাম। আর অবশেষে আপনি আমাকে অন্ধ বলেই গালি দিলেন। বিষয় ঠিক তেমন।" আবির হাত দিয়ে মাথা চেপে বলল, " আমার সত্যি খুব অন্যায় হয়েছে। তোমাকে ধমক দিয়ে আমি মস্ত বড় অপরাধ করে ফেলেছি। প্লিজ ক্ষমা করুন আমাকে। প্লিজ।" মেঘ আলগোছে ভ্রু কুঁচকে বলল, " অতিরিক্ত ভাব নেওয়া ছেলে আমার একদম পছন্দ না।" " তুমি কি চাচ্ছো? আমি মাঝ রাস্তায় কান ধরে

দাঁড়িয়ে থাকি। তবে কি মাফ করবে আমাকে?" আবিরের গম্ভীর চাউনিতেই থমকে গেল মেঘ। নিশ্চুপ চোখে চেয়ে থেকে ধীর গলায় বলল, " না। " "তাহলে করছ কেনো এমন?" " সরি। " "কেনো?" " আমি একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছি তাই।" আবির বলল, " বুঝতে পেরেছো তাহলে।" মেঘ ভেজা কণ্ঠে জবাব দিল, " আপনি গতকাল থেকে আমার সঙ্গে কথা বলছিলেন না তাই আমার খারাপ লাগছিলো। রাগে যা মন চেয়েছে তাই করেছি।" "হুমমম। দেখলাম তো। আর একটু হলে আমাকে ইভটিজার বানিয়ে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দিতে। আগামীকাল নিউজ হতো, নিজের সুন্দরী বউকে ইভটিজিং করতে গিয়ে পুলিশের কাছে হাতেনাতে ধরা পরেছেন খান বাড়ির অযোগ্য, লাফাঙ্গা ছেলে সাজ্জাদুল খান আবির।" মেঘ ভ্রু উঁচিয়ে প্রশ্ন করল, " আপনি খান বাড়ির অযোগ্য ছেলে?" "জি।" "কেনো?" " কারণ আমার ১৬ বছরের ভালোবাসা, তোমাকে নিজের করে পাওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা সবার নিকট বাচ্চামো মনে হয়। আমি আবির সাত সমুদ্র দূরে থেকে নিজের সাথে নিজে লড়াই করে বেঁচেছি। এ সবই এখন অহেতুক। কারণ আমি আজও আদর্শ স্বামী হতে পারি নি। খান বাড়ির রাজকন্যাকে রাজরানীর মর্যাদা দিতে পারি নি। আমি ব্যর্থ, সত্যিই ব্যর্থ।" মেঘের দুচোখ ছলছল করছে। মনের ভেতর জমে থাকা অভিমান কখন যে গলতে শুরু করেছে নিজেও বুঝতে পারে নি। আবির দু কদম এগিয়ে মেঘের গা ঘেঁষে দাঁড়াল। গালের নিচ পর্যন্ত গড়িয়ে পড়া চোখের পানি মুছে দিল। মেঘের চোখে চোখ রেখে আবির

বলল, “তোমার মনের কোণে জমে থাকা অভিমান, আমার নির্ঘুম রাত কাটানোর একান্ত সত্তা। তুমি আমার অদৃষ্টের সুখধাম, মায়াবী রাতের পূর্ণিমার চাঁদ। ভালোবাসি তোমায়, নিজের চেয়েও বেশি।”বিকেলের শেষভাগ। একটা বাগানবিলাস গাছের নিচে আবির- মেঘ মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে। আশেপাশে নিরবতা বিরাজমান। আবিরের শক্তপোক্ত হাতে মেঘের ছোট্ট, কোমল হাতটা বন্দী হয়ে আছে। কোনোমতেই ছাড়াতে পারছে না। মেঘের ফর্সা আদল ধীরেধীরে রক্তবর্ণ ধারণ করেছে। অকস্মাৎ মুখ ফুলিয়ে চোয়াল শক্ত করল। মেঘের গভীর দৃষ্টি আবিরের চোখে নিবদ্ধ। আবিরের হাতে থাকা হাতটাকে ছাড়ানোর সব চেষ্টা বৃথা গেল। আবির দু কদম পিছিয়ে দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়াল। ঠোঁট বেঁকিয়ে মৃদু হেসে পরপর দু’বার ভ্রু নাচাল। মেঘ আলগোছে ভেঙচি কেটে কটমট করল, ” ছাড়ুন, বাসায় যাব।” আবির গম্ভীর ভাব নিয়ে বলল, ” বাসা থেকে বের হওয়ার সময় মনে ছিল না? এখন বাসায় যাওয়ার কোনো দরকার নেই। আজ সারারাত এখানেই থাকবে।” মেঘ নিজের ভুল বুঝতে পেরে চাপা স্বরে বলল, ” আকাশ মেঘলা, বৃষ্টি নামবে।” ” নামুক, বৃষ্টিতে ভিজবো দু’জন। সমস্যা আছে কোনো?” “আব্বু বকা দিবেন। একদিন ভিজে গিয়েছিলাম তারপর কি হয়েছিল মনে নেই?” “তখন তুমি আমার প্রেমিকা ছিলে আর এখন বউ।” আবিরের মুখে কথাটা শুনামাত্র মেঘের বুকের বাঁ পাশটা কেঁপে ওঠল। অনুভূতিরা হৃদয়ে দোলা দিচ্ছে। আবিরের মুখে প্রেমিকা শব্দটা খুব কমই শুনেছে মেঘ। বরাবরই তীব্র অধিকার নিয়ে আবির “বউ”

বলেই ডেকে এসেছে। বিয়ের পর সেই ডাকের তীব্রতা বেড়েছে হাজার গুণ। সর্বক্ষণ সবার সামনে মুখে , “আমার বউ” লেগেই থাকে। এখন খান বাড়ির প্রতিটা ইট-পাথরেরও নখদর্পনে “মেঘ আবিরের বউ”। যেন “আমার বউ” না বললে আবিরের মস্ত বড়ো পাপ হবে। আবিরের মুখে আমার বউ, আমার বউ শুনতে শুনতে ইদানীং মেঘ নিজের নামই গুলিয়ে ফেলে। কেউ নাম জিজ্ঞেস করলে মুখ ফস্কে বলে দেয়, ” আবিরের বউ।” সেদিন ভার্সিটিতেও এমন এক কাণ্ড করে বসে। বৃষ্টির দিন ছিল। ভার্সিটিতে যাওয়ার পথে বৃষ্টি কমেছিল। ডিপার্টমেন্টের কাছাকাছি যেতেই ঝুম বৃষ্টি শুরু হয়েছে। দিশাবিশা না পেয়ে এক দৌড় দিয়েছে। ব্যালকনিতে গিয়ে থামতেই অন্য ডিপার্টমেন্টের এক স্যারের সাথে ধাক্কা। হুড়মুড়িয়ে “সরি স্যার” বলতে বলতে দূরে সরে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু তাতে বিশেষ কোনো লাভ হয় নি। স্যার মুখের উপর ধমক দিয়ে বলেন, ” এই মেয়ে, স্যার-ম্যাডাম দেখো না? নাম কি তোমার? কোন ডিপার্টমেন্টে পড়ো?” মেঘ ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে জবাব দিল, ” আবিরের বউ।” তৎক্ষনাৎ ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় সতেজ হলো। দু’হাতে নিজের মুখ চেপে ধরল। স্যার গম্ভীর কণ্ঠে আওড়ালেন, ” কি নাম বললে?” মুখ থেকে হাত সরিয়ে মেঘ আমতা আমতা করে বলল, ” স্যার, মাহদিবা খান মেঘ। উদ্ভিদবিজ্ঞান ডিপার্টমেন্ট।” স্যারের চেহারার গম্ভীর ভাব তখনও বহমান। কিছু একটা বলতেই যাচ্ছিলেন তখনই কেউ একজন স্যারকে ডাকলেন। মেঘ সে যাত্রায় খুব করে বেঁচেছে। মেঘ মনে মনে বিড়বিড় করল, ” আবির ভাইয়ের প্রেমিকা। ইস,

শুনতেই কত ভালো লাগছে।” মেঘের ঠোঁটে মিটিমিটি হাসি দেখে আবির তপ্ত স্বরে বলল, “শুনো, তোমার উপর আমার অধিকার এখন সবচেয়ে বেশি। এক বাড়িতে থাকি বলে এটা ভেবো না আমি আমার শ্বশুরের কথায় উঠব আর বসব।” আবিরের কথায় মেঘের ভাবনায় ছেদ পড়ল। ভ্রু উঁচিয়ে মিষ্টি হেসে প্রশ্ন করল, ” কথাটা কি আপনার শ্বশুরআব্বাকে জানাবো?” “তোমার-আমার মাঝে শ্বশুরআব্বাকে টানার কি দরকার। ওনারা মুরুব্বি মানুষ, থাকুক না ওনাদের মতো।” “ও তাই?” আবির মৃদু হেসে বলল, “জি, ম্যাডাম।” মেঘ আশেপাশে নজর বুলিয়ে আস্তে করে বলল, ” স্যার, অনুগ্রহ করে এখন চলুন। না হয় সত্যি সত্যি ভিজতে হবে।” আবির আর কথা বাড়াল না। আবহাওয়া সত্যি খারাপ। যেকোনো মুহুর্তে বৃষ্টি নামতে পারে। আবির মেঘের হাত ছেড়ে হাঁটতে শুরু করল। মেঘ গুটিগুটি পারে হাঁটছে আর অতীতের স্মৃতিগুলো ভাবছে। একটা সময় ছিল আবিরের সঙ্গে বাইরে বের হওয়ার জন্য, ঘুরার জন্য, একটু গল্প করার জন্য কতই না ছটফট করত। বৃষ্টিতে ভিজতে কত বায়না করত। সে সবই এখন অতীত। এখন মানুষটাকে দেখার জন্য এত ছটফট করতে হয় না। ঘুম ভাঙলে সবার প্রথমেই এই মানুষটার মায়াবী মুখটা নজরে পরে। আগে আবিরের সাথে দুই মিনিট কথা বলতে গেলে হার্টবিট কয়েকগুণ বেড়ে যেতো। সেই মেঘ এখন আবিরের বুকে মাথা রেখে আবিরের হার্টবিট গুনে। ভাবা যায়! “ভালোবাসা কতই না অদ্ভুত। অপূর্ণতায় অশান্তি মিলে আর পূর্ণতায় প্রশান্তি।” ভাবতে ভাবতে হঠাৎ নজরে পড়ল

আবির অনেকটা সামনে চলে গিয়েছে। কারো সাথে ফোনে কথা বলতে ব্যস্ত তারজন্য মেঘকে খেয়াল করে নি। মেঘ এক ছুটে আবিরের পাশে গিয়ে থামল। মেঘের উপস্থিতি টের পেয়ে আবির যেই ঘাড় ঘুরাবে ওমনি মেঘ দুহাতে আবিরের বাহু চেপে ধরল। আবির রাকিবের সাথে কথা বলছিল। আড়চোখে মেঘের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল। রাকিবকে উদ্দেশ্য করে বলল, " ফোন রাখ, এখন বউকে সময় দিতে হবে।" ওপাশ থেকে রাকিব বলল, " বিগত ৩ ঘন্টা ৫৭ মিনিট যাবৎ সে কাজটাই করছিস, ভাই। বিয়ের তো অনেকদিন হলো। বউয়ের প্রতি ভালোবাসাটা এবার একটু কমা।" " তোর কি সমস্যা? " "আমার হিংসে হয়। এত প্রেম সহ্য হয় না।" " কেনো?" "আমার বউটা সারাদিনে আমাকে একবার কলও দেয় না। আমি যখনই কল দেয় তখনই বলে এখন খাচ্ছি, এখন ঘুমাচ্ছি, এখন সাজতেছি, এখন কাজ করছি। ভুলেও একবার বলে না আমি রাগ করে আছি, অভিমান করেছি, আমাকে নিয়ে ঘুরতে যাও, সময় দাও। উল্টো আমি ঘুরতে যাওয়ার কথা বললে বলে, 'বিয়ে হয়ে গেছে এখন আবার কিসের ঘুরাঘুরি। কাজ নেই তোমার? অফিসের কাজ ফেলে আমাকে ডিস্টার্ব করলে আমি আবির ভাইয়াকে কল দিয়ে বলব তোমাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করে দিতে। এই পাগলকে কে বুঝাবে, সে যাকে দায়িত্বশীল বস ভাবছে সে বস ছুঁতো পেলেই বউয়ের কাছে ছুটে। তার কাছে মিটিং এর থেকেও বউ বেশি ইম্পর্ট্যান্ট।" আবির তেজঃপূর্ণ কণ্ঠে বলল, " তোর বকবক রাতে শুনবো। এখন রাখছি।" রাকিব মনমরা

ভঙ্গিতে বলল, ” কেউ আমাকে বুঝলো না।” আবির মুচকি হেসে কল কেটে দিল। মেঘের মনোযোগ তখনও আবিরের হাতের দিকে। খুব শক্ত করে হাতটা ধরেছে। যতটা শক্ত করে আবির একটু আগে ধরেছিল। আবির মেঘের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, ” কি ভাবছো?” ” চা খাবেন?” ” এই না বললে বৃষ্টি আসবে, বাসায় যেতে হবে।” ” আসুক বৃষ্টি। অনেকদিন হলো আপনার সাথে চা খাওয়া হয় না। একসাথে সন্ধ্যার আকাশ দেখা হয় না।” আবির কপালে ভাঁজ ফেলে বলল, ” তোমাকে কতবার বলেছি, চলো আমাদের বাড়িতে কিছুদিন থাকি। নিজের মতো করে সময় দিতে পারব। প্রতিদিন ভোরের আকাশ দেখব, চায়ের কাপের সাথে গোধূলির সময় কাটাবো। মাঝরাতে নির্জন রাস্তায় দুজন হাতে হাত রেখে হাঁটব।” “তারপর কুকুরে দৌড়ানি দিলে এলোপাতাড়ি ছুটব। ছুটতে ছুটতে ধপাস করে পুকুরে পড়ব। ” আবির রাগে চোখ গোল করে তাকাল। গম্ভীর কণ্ঠে বলল, “তোর মাথায় কি ভালো কিছু আসে না? যতসব ফালতু চিন্তাভাবনা।” ” না মানে, মাঝরাতে কুকুর ছাড়া আর কেউ তো রাস্তায় থাকে না। অবশ্য পাগলও ধরতে পারে।” “তোকে দেখলে পাগলও ভয় পাবে। দূর থেকে সালাম দিয়ে পালাবে।” মেঘ ঠোঁট ফুলিয়ে বলল, ” বলেছে আপনাকে!” আবির শান্ত কণ্ঠে বলল, ” তুমি তো আমার কোনো কথায় মানো না। একদিনের জন্যও ঐ বাসায় যেতে চাও না। তোমার জন্য এত কষ্ট করে বাড়ি করলাম কেনো ?” ” এভাবে বাসা থেকে চলে গেলে আব্বু-আম্মু কি ভাববে? বড়ো আব্বু, বড়ো আম্মু

ওনারাও তো কষ্ট পাবেন। ভাববেন ছেলে পর হয়ে গেছে। বউ নিয়ে আলাদা থাকতে চাই।” ” এটাকে আলাদা থাকা বলে না। ঘুরতে যাওয়া বলে। একপ্রকার হানিমুনও বলতে পারো।” ” হানিমুন মানুষ কতবার করে? কাউকে না বলে কক্সবাজার গিয়েছিলাম বলে আমার বন্ধুরা এখনও আমাকে খোঁচায়। ফাজলামো করে। আমি আর হানিমুনে যাব না।” ” কে খোঁচায় নামটা বলো শুধু। বাকিটা আমি দেখে নিচ্ছি! মিনহাজ, তামিম নাকি অন্য কেউ?” “বন্যা।” আবির হুঙ্কার দিতে গিয়েও থেমে গেল। বন্যা নাম শুনে নিশ্চুপ হয়ে রইল। কয়েক সেকেন্ড চুপ থেকে ধীর গলায় বলল, ” ওহ আচ্ছা। তাই না? শুনবে তবে!” “কি?” ” তুমি, পরিবার, ব্যবসা, তানভীরের বিয়ে সবকিছুর কথা ভেবে আমি দ্রুত ঢাকায় ফিরে এসেছিলাম। তোমার ভাই মানে তানভীর অলরেডি আমার থেকে দুইমাসের ছুটি নিয়ে রেখেছে। দেশের বাইরে ঘুরতে যাওয়ার প্ল্যান করতেছে। কমপক্ষে একমাস কারো সাথে যোগাযোগই রাখবে না।” “সত্যি?” ” হ্যাঁ, তোমার বান্ধবী ফিরলে তারপর তুমিও বলতে পারবে।” মেঘ জিভ দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে আস্তে আস্তে বলল, ” আমাদের হানিমুনের সময়টা কম হয়ে গেল না?” ” হুমমম। সেজন্য ভাবছি সামনের মাসে একটা ট্যুর দিব। কোম্পানির কিছু কাজ আছে, সাথে তোমাকেও নিয়ে যাব। তানভীরের আগে দেশের বাইরের হানিমুনটা আমরাই করে আসবো, ইনশাআল্লাহ। ” “কোথায়?” “এখন কিছু বলব না। আগে তোমার পাসপোর্ট করতে হবে।” ” ভাইয়া জানে?” “না। কেউ কিছুই জানে না। তুমিও আগ

বাড়িয়ে কাউকে কিছু বলবে না। তোমার বেস্ট ফ্রেন্ড বন্যাকেও না। মনে থাকবে?" "জি। " আবির আর কিছু বলে নি। চুপ করে হাঁটছে। মেঘ চোখ ঘুরিয়ে আশেপাশের মানুষদের দেখছে। ব্যস্ত শহরের সকল ব্যস্ততার মাঝেও মেঘের নজর শুধু কাপলদের দিকে। কেউ কেউ শাড়ি পড়েছে, চুলে ফুল দিয়ে বয়ফ্রেন্ড কিংবা হাসব্যান্ডের হাতে হাত রেখে রাখছে। কত স্নিগ্ধ সে দৃশ্য! মেঘ নিজের দিকে এক নজর তাকিয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল। মনে মনে বিড়বিড় করল, " আজকের পর রাগ করলেও শাড়ি পড়ে বের হতে হবে। চুলে ফুল দিয়ে সেজেগুজে ঘুরতে হবে। তবেই না মানুষ আমাদের দিকে তাকাবে। না হয় আবির ভাইয়ের পাশে আমাকে বড্ড বেমানান লাগবে।" আবির-মেঘ চা খেতে খেতে গল্প করছিল। মেঘ অন্যমনস্ক চোখে দূরে তাকিয়ে আছে। কয়েক মুহুর্ত পর হঠাৎ ডাকল, " আবির ভাই....." "জি আপু....." আপু শব্দটা কর্ণকুহরে প্রবেশ মাত্র চোখ বড় করে তাকাল। শক্ত কণ্ঠে বলল, " আপু বললেন কাকে?" "তোমাকে।" " আমি আপনার আপু হই?" আবির উত্তর না দিয়ে উল্টো প্রশ্ন করল, " আমি তোমার ভাই হই?" মেঘ দাঁত দিয়ে জিভ কেটে আওড়াল, " ভাই বলে ফেলেছি নাকি! সরি সরি।" "হ্যাঁ, প্রতিবার ভাই বলবে আর সরি বলবে। তাই না? কিন্তু তা আর হচ্ছে না। এখন থেকে তুমি ভাই বললে আমিও আপু বলবো। এখন দেখব দিনে কতবার ভাই ডাকো।" মেঘ ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল, " আমি আবির ভাই বলে অভ্যস্ত কিন্তু আপনি তো আপু বলে অভ্যস্ত না।" " অভ্যাস করব। তোমাকে হাজার বার বলেছি

আবির ডাকো। কিন্তু না! সে তুমি পারবে না। ঠিক আছে, আমিই আপু বলছি। মেঘ আপু, আপনি কি আরেক কাপ চা নিবেন?" "ছিঃ কি বলছেন এসব! প্লিজ, আমাকে আপু ডাকবেন না।" " মানতে পারি তবে একটা শর্তে।" " কি?" " আবির বলো।" "আবার..." "এখন থেকে প্রতিবার।" " আমি পারব না।" আবির ধমকের স্বরে বলল, " বলো।" মেঘ ঠোঁট উল্টিয়ে কোনোমতে 'আবির' বলেই দু'হাতে নিজের মুখ ঢেকে ফেলল। মেঘের বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে ওঠেছে। লজ্জায় ভেতরটা হাস ফাঁস করছে। আবির মেঘকে নিজের দিকে ঘুরিয়ে উদগ্রীব হয়ে বলল, "ম্যাম, এখনও এত লজ্জা পেলে হবে! সংসার করতে হবে না? আমাকে আহিয়ার আব্বু হতে হবে না?" লজ্জায় মেঘের চিবুক আরও নেমে গেছে। ঠোঁট জোড়া তিরতির করে কাঁপছে। শরীরের প্রতিটা শিরা উপশিরায় কম্পন অনুভব হচ্ছে। মেঘ মাথা নিচু করে দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়াচ্ছে। আবির মেঘের দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছে। অকস্মাৎ তানভীরের কল আসায় মেঘের দিক থেকে আবিরের দৃষ্টি খানিক সরলো। এতেই মেয়েটা স্বস্তি ফিরে পেল। আবির জিজ্ঞেস করল, " কিরে কোথায় আছিস?" "আছি তোমাদের আশেপাশেই।" "আশেপাশে থাকার কি দরকার! খুব বেশি সমস্যা না হলে চল একসাথে বসি। চা খাই, গল্প করি। এখন তো অবৈধ সম্পর্ক না। বৈধ সম্পর্কে আছিস।" "তোমরা বসো। আসছি কিছুক্ষণের মধ্যে।" "ঠিক আছে।" মেঘ লজ্জায় সেই যে চোখ সরিয়েছে আর তাকানোর নামই নিচ্ছে না। আবির কয়েকবার ডেকেছে

কিন্তু সাড়াশব্দ নেই। আবির কিছু সময় নিষ্পলক চোখে চেয়ে রইল। আবিরের কণ্ঠস্বর শান্ত। কোমল গলায় বলতে শুরু করল, "প্রিয় কাদম্বিনী, আমার প্রণয়কাব্যের না লেখা এক কবিতার শেষ..." মেঘ তৎক্ষনাৎ ঠোঁট ফুলিয়ে বলল, "প্লিজ আমাকে কাদম্বিনী ডাকবেন না।" আবির থামল। সরু চোখে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, "কেনো?" মেঘের কণ্ঠস্বর নিরেট। গম্ভীর গলায় বলতে লাগল, "আপনার মুখে মেঘ ব্যতীত অন্য কোনো মেয়ের নাম শুনতে চাই না। ডাইরেক্ট কিংবা ইন্ডাইরেক্ট কোনোভাবেই না। আপনি আমার মানে শুধুই আমার। আপনার মনের ভেতর থেকে বাইরে পর্যন্ত সবটাই আমার দখলে। কথাটা মাথায় রাখবেন।" আবির হতভম্ব হয়ে রইল। কয়েক সেকেন্ড নীরবে মেঘের দিকে তাকিয়ে থেকে আচমকা প্রশ্ন করল, " বাই এনি চান্স, তুমি কি কারো প্রতি জেলাস?" "না। আপনি আমাকে কাদম্বিনী বলেছেন যার অর্থ মেঘমালা। মেঘ আমি হলে, মালা কে? নিশ্চয়ই আপনার মামাতো বোন। যাকে আপনি এখনও মিস করেন। শয়নেস্বপনে তার কথা ভাবেন। আর সেজন্যই ইন্ডাইরেক্টলি আপনি আমাকে মেঘমালা বলে সম্বোধন করছেন।" আবির কপালে ভাঁজ ফেলে সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে মেঘকে দেখছিল। মেঘের কথা শেষ হতেই ধপ করে চেয়ারে বসে পড়ল। ডান হাতে নিজের মাথা চেপে বিড়বিড় করে বলতে লাগল, "তানভীর! ভাই রে কোথায় তুই?" মেঘ রাগী স্বরে বলল, " ভাইয়াকে ডাকছেন কেনো? ভাইয়া কি করেছে?" এরমধ্যে তানভীর এসেছে। পেছনে বন্যা বসা। বন্যা বাইক থেকে নেমে

আবিরকে সালাম দিল। আবির সালামের উত্তর দিয়ে অসহায় দৃষ্টিতে তানভীরের দিকে তাকাল। মেঘের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই বন্যা নিঃশব্দে হাসল। কিন্তু বিপরীতে মেঘের ঠোঁটে হাসির লেশমাত্র দেখা গেল না। বন্যা চোখের ইশারায় জানতে চাইল, " কি হয়েছে!" মেঘ এপাশ-ওপাশ মাথা নেড়ে বুঝাল, " কিছু হয় নি।" বন্যাকে ইশারা দিতেই বন্যা চুপচাপ মেঘের পাশের চেয়ারে বসল। আস্তে করে জানতে চাইল, " ভাইয়া কিছু বলেছেন?" মেঘ ধীর গলায় বলল, " না।" আবির তখনও অসহায় দৃষ্টিতে তানভীরকে দেখছে। বিষয়টা তানভীরের নজরে পড়তেই ভ্রু নাচিয়ে প্রশ্ন করল, কি হলো, ভাইয়া?" আবির ভাবুক স্বরে বলল, " ভাই, তুই ঠিকই বলেছিলি।" তানভীর আশ্চর্য নয়নে তাকিয়ে প্রশ্ন ছুঁড়ল, " আমি আবার কবে কি বললাম?" "আমি যখন দেশের বাইরে ছিলাম। তোকে ফোন দিলে প্রায়ই বলতিস, আমার বোন খুব একটা সুবিধার না। মনে হয় ওর মাথায় কোনো ছিট আছে। ও কখন কি বলে, কি করে সে নিজেই জানে না। আমার বোনকে সামলাতে তোমার খুব কষ্ট হবে। তোমার জন্য আমার খুব মায়া হচ্ছে ভাইয়া। আমি উল্টো তোকে ধমক দিয়ে বলতাম, আমার বউয়ের ব্যাপারে আজেবাজে কথা বলার সাহস কোথায় পাস। ও যেমন আমি ওঁকে তেমনই ভালোবাসব। ও পাগল হলে আমিও ওর জন্য পাগল হবো। আমার ভালোবাসা দিয়ে সব ঠিক করে ফেলব। আরও কত কিছুই না তোকে বলেছি। ভাই প্লিজ, আমাকে মাফ করে দিস। ভাই তুই মহান, ২০ বছর যাবৎ এই মেয়ের পাগলামি সহ্য

করতেছিস। তোর মতো ভাই প্রতিটা ঘরে ঘরে দরকার।” মেঘ চোখ রাঙিয়ে একবার আবিরের দিকে তাকাচ্ছে আবার তানভীরের দিকে। তানভীর চোখের ইশারায় আবিরকে চুপ করতে বলছে। কিন্তু আবির কথা বলেই যাচ্ছে। তানভীর দাঁত কেলিয়ে হেসে বলল, ” কোথায়! কি যা-তা বলছো! বনুর মতো ভালো মেয়ে দুইটা পাবে না। তোমার ভাগ্য ভালো আমার বনুর মতো বউ পেয়েছো। নয়তো তুমি যে বদরাগী ভাই, কপালে বউ জুটতো না। সারাজীবন অবিবাহিত ট্যাগ লাগিয়ে ঘুরা লাগতো।” ” তবুও ভালো ছিল। এখন মনে হচ্ছে ১৬ বছর কার জন্য লড়াই করেছি আমি! কোনোদিন কোনো মেয়ের দিকে তাকিয়ে দেখি নি। প্রয়োজনের বাইরে কোনো কথা বলি নি। সর্বক্ষণ মনে মস্তিষ্কে শুধু তোর বোন ছিল। ওঁকে বিয়ে করার জন্য কত কি না করলাম। সেই মেয়ে কি না বলে আমি শয়নেস্বপনে মালার কথা ভাবি। মালাকে মিস করি। মালার কথা স্মরণ করে ওঁকে কাদম্বিনী ডাকি। ” তানভীর প্রশ্ন করল, ” কাদম্বিনীর সাথে মালার কি সম্পর্ক?” ” কাদম্বিনী অর্থ মেঘমালা।” ” ওহ। আমি বাংলায় খুব কাঁচা। তাই অর্থ বুঝে ব্যাখ্যা দিতে পারলাম না। আমাকে ক্ষমা করো ভাইয়া।” মেঘ এখনও অগ্নিদৃষ্টিতে তানভীরকে দেখছে। মেঘের হাবভাব দেখে বন্যা মেঘকে শান্ত করার চেষ্টা করছে। সামান্য বিষয় নিয়ে মেঘ আবিরের সাথে রাগারাগি করেছে এটা ভেবেই বন্যার হাসি পাচ্ছে। সকালে কফির বিষয় নিয়ে রাগ করে বাসা থেকে বেড়িয়েছে সে রাগ কমতে না কমতেই আরেক বিষয়। হাসিতে বন্যার পেট ফেটে যাচ্ছে। কিন্তু

প্রকাশ্যে হাসতে পারছে না। তানভীর মেঘের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, " এভাবে কি দেখছিস?" "তুমি আমার নামে এসব বলেছো ওনাকে?" "না না, আমি কিছু বলি নি। আমার বোন কত ভালো! আমি কি জানি না? শুধু রাগটা একটু বেশি। আর কোনো সমস্যা নেই। রাগ উঠলে মাথা ঠিক থাকে না, এইতো।" মেঘ রাগে কটমট করতে করতে বলল, " ঘরের শত্রু বিভীষণ।" বন্যা মেঘকে থামাতে ধীর গলায় বলল, " কি সব বলছিস! সামান্য বিষয় নিয়ে কেউ এত রাগ করে?" "তুই ওঁদের চিনিস না। আমি ওঁদের হাড়ে হাড়ে চিনি। পুরুষ জাত মানেই খারাপ। তাদের মনে এক, বাইরে আরেক। দেখাবে খুব ভালো মানুষ। আদোতে কিছুই না।" আবির আড়চোখে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, " আমিও কি তেমন?" মেঘ ঘনঘন উপরনিচ মাথা নাড়ল। তানভীর আবিরকে সান্ত্বনা দিতে বলল, " থাক ভাইয়া, মন খারাপ করো না। ছেলে মানুষ ঝামেলা মানে পুরো পৃথিবীর সব পুরুষই খারাপ। তুমি একা ভালো হওয়ার সুযোগ নেই। যেই তুমি মালাকে মিস করো সে তো আরও বেশি খারাপ।" ওঁদের কথোপকথন শুনে বন্যা নিঃশব্দে হাসছে। কি এক বিষয় নিয়ে মেঘ, আবির, তানভীর সিরিয়াসভাবে ঝগড়া করছে। হাসিও পাচ্ছে আবার লজ্জাও লাগছে। আশেপাশের মানুষজন কেমন করে তাকিয়ে আছে। তানভীর বন্যার দিকে এক নজর দেখল। মেঘকে রাগানোর জন্য ইচ্ছে করে বলল, " ভাগ্যিস! আমার বউটা ম্যাচিউর। এ দিক থেকে আমি নিশ্চিন্ত। " আবির আড়চোখে মেঘকে দেখছে আর মুচকি মুচকি হাসছে। মেঘ যে

রাগে আগুন হচ্ছে সেটা বুঝার বাকি নেই। মেঘ চোখ লাল করে তানভীরের দিকে তাকিয়ে আছে। তানভীর মেঘকে ভেঙাচ্ছে। এতে মেঘের রাগ আরও বাড়ছে। বন্যা দু'হাতে মুখ চেপে হেসেই যাচ্ছে। কয়েক মুহুর্ত নিশ্চুপ থেকে মেঘের গর্জনের মতো হঠাৎ বলে ওঠল, " ছিঃ ভাইয়া। তুমি এখনও তোমার এক্সকে মিস করো?" তানভীর চমকে ওঠল। সেই সাথে বন্যাও। তানভীর বলল, " মানে?" " সরি ভাইয়া, অতীত ভুলতে না পারলে তোমার কাছে আমার বান্ধবীকে দিতে পারছি না। আমি আগেই বলেছিলাম পুরুষ জাতই খারাপ। দেখলি বন্যা, সেই দলে আমার ভাইও আছে।" বন্যার মুখের হাসি গায়েব হয়ে গেছে। মেঘের কথা ঠিকমতো বুঝতে পারছে না। তানভীর, আবির দুজনেই মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে। তানভীর প্রশ্ন করল, " আমি কি করলাম?" " তুমি করো নি তোমার অতীত করেছে। কি যেন নাম! আয়েশা না?" বন্যার মুখ ভার হয়ে আছে। হাসির ছিটেফোঁটাও নেই মুখে। তানভীর বক্রদৃষ্টিতে বন্যাকে একবার দেখল। মেয়েটা মুখ ফুলিয়ে বসে আছে।তানভীর ভ্রু কুঁচকে বলল, " অতীত থাকাটা কি দোষের? হঠাৎ সেই নাম কেনো উঠছে ? "কারো অতীত থাকাটা দোষের নয়। তবে অতীতের স্মৃতি আঁকড়ে, তাঁর নামের প্রথম অক্ষরের টি-শার্ট পড়ে ঘুরঘুর করাটা দোষের। আর এই দোষ ক্ষমার অযোগ্য। " তানভীর চমকে উঠে নিজের পড়নের টিশার্ট দিকে তাকাল। ডিজাইনিং টিশার্টের মাঝখানে A লেখা। স্পষ্ট তাকালে বুঝা যায় না। তবে কেউ সূক্ষ্ম নজরে চাইলে ঠিকই বুঝবে। মেঘ বেশ

কিছুক্ষণ পর্যবেক্ষণ করে অক্ষরটা খুঁজে পেয়েছে। বন্যা, আবির, তানভীর তিনজনের নজরই টিশার্টে। আবির শান্ত কণ্ঠে বলল, " বউ, আমার সম্বন্ধি তোমার মতো এত বিচক্ষণ না। টিশার্টের ডিজাইনের ভেতর A লেখা নাকি S লেখা সেসব দেখার সময় আছে নাকি তার!" " সময় না থাকলে এক কালার টিশার্ট পড়বে। দরকার হয় সাদা পাঞ্জাবি পড়ে ঘুরবে তাই বলে A লেখা টিশার্টই কেনো? B লেখা টিশার্ট বাজারে ছিল না? আপনি আবার ভাইয়ার হয়ে সাফাই গাইতেছেন।" " কি মেয়ে রে বাবা!" তানভীর বন্যার দিকে তাকিয়ে বলল, " তোমার ননদকে একটু বুঝাও।" এতক্ষণ বন্যার মুখে হাসি থাকলেও এবার সে নির্বাক। মেঘকে বুঝানোর চেষ্টাও করল না। ছোটখাটো বিষয়ে মেয়েরা খুব তাড়াতাড়ি কষ্ট পায়। এতক্ষণ মেঘের কথাগুলো ফাজলামো মনে হলেও এবার না চাইতেও বন্যা সিরিয়াস হয়ে গিয়েছে। গলা দিয়ে কথা বের হচ্ছে না। বুঝাতে চাচ্ছে সে একদম ঠিক আছে। কিন্তু চোখে মুখে ফুটে উঠছে সে ঠিক নেই। মিনিট দশেক চলল তানভীর আর মেঘের ঝগড়া। মাঝখানে মাঝখানে আবির দুয়েকটা কথা বলে সেটাতেও হাজারটা দোষ ধরছে মেঘ। সকালের রাগটা এখনও পুরোপুরি কমে নি। দশ মিনিট যাবৎ বন্যা নিশ্চুপ বসে আছে। ঝগড়ার এক পর্যায়ে মেঘ বসা থেকে উঠে দাঁড়াল। বন্যার হাত ধরে বলল, " চল আমার সাথে। ওঁদের সাথে কথা বলে কোনো লাভ নেই। পুরুষ জাতই খারাপ। একজন মালাকে ছাড়া বাঁচবে না আরেকজন আয়েশাকে ছাড়া। শুধু শুধু তোর আমার জীবন নিয়ে

ছিনিমিনি খেলছে।” আবির বসা থেকে উঠে বলল, ” এই দাঁড়াও, আমি তোমাকে বাসায় পৌঁছে দিব।” তানভীরের দিকে তাকিয়ে আবার বলল, ” এই তানভীর, ওঁকে বাসা পর্যন্ত দিয়ে আয়।” মেঘ গর্জে ওঠে বলল, ” কোনো দরকার নেই। আমরা বাসা চিনি। একায় যেতে পারব।” আবির গম্ভীর কণ্ঠে ডাকল, ” মেঘ।” মেঘ রাগে কটমট করে বলল, ” খান বাড়িতে আপনাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ। আমি এক্ষুনি বাসায় গিয়ে আব্বু, বড়ো আব্বুকে সব বলব। বাসার আশেপাশেও যেন আপনাদের না দেখি।” মেঘ বন্যাকে টানতে টানতে নিয়ে একটা রিক্সায় উঠে বসল। তানভীর হতবাক হয়ে চেয়ে আছে। মেঘের রাগ উঠলে মাথা ঠিক থাকে না। তাই বলে বন্যাও! বন্যা মুখ ফুলিয়ে চলে গেল। ওর কি উচিত ছিল না তানভীরের সাথে যাওয়া? রাত ৯ টার উপরে বাজে। তানভীর বন্যাদের বাসার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। বন্যাকে একের পর পর এক কল দিচ্ছে কিন্তু রিসিভ করছে না। নতুন জামাই অসময়ে বাসায় যেতেও লজ্জা লাগছে। অনেকগুলো কল দেওয়ার পর অবশেষে কল রিসিভ করেছে। ” বলুন।” “কোথায় ছিলে এতক্ষণ? কতগুলো কল দিয়েছি তোমাকে।” ” আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। দেখি নি।” ” আমার কেনো যেন মনে হচ্ছে না। তুমি নিচে আসো তো। দেখি একটু!” বন্যা চমকে ওঠে জিজ্ঞেস করল, ” আপনি কোথায় এখন?” ” অফিস থেকে কল দিতে দিতে এখন তোমাদের বাসার নিচে আছি। দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে পা দুটো ব্যথা হয়ে গেছে। আসো, প্লিজ।” বন্যা কিছু বলার সাহস পেল না। বেড়িয়ে এলো বাসা

থেকে। রাত গভীর। পরিবেশ একদম শান্ত। তানভীরের পড়নে এখন কালো রঙের টিশার্ট। যার মাঝখানে সাদা রঙে বড় করে লেখা ‘ B’ বন্যা টিশার্টের দিকে একবার দেখল কিন্তু তানভীরকে কিছু বুঝতে দিল না।বলল, ” এত রাতে আপনি এখানে?” “নিজের বিয়ে করা বউকে দেখতে আবার সময় লাগে নাকি? ইচ্ছে হয়েছে এসেছি। বাসায় নিতে পারছি না বলে কি বউকে দেখতেও আসতে পারব না?” “আমি সেটা বলি নি।” ” তখন রাগ করে চলে এলে কেনো?” বন্যা মলিন হেসে বলল, ” রাগ করিনি।” “তা তোমার চোখ- মুখ দেখেই বুঝা যাচ্ছে। বনু রাগের মাথায় কি কি বলল তুমিও ওর সঙ্গে সিরিয়াস হয়ে গেলে। এটা কি হলো?” বন্যা উত্তর দিচ্ছে না।। তানভীর আবারও বলল, ” বনু বাসায় গিয়ে কি বলেছে জানো?” ” কি?” “বলেছে, আমি নাকি তোমার সাথে সিরিয়াস ঝগড়া করেছি। বনুকেও বকা দিয়েছি। আরও কি কি বলেছে কে জানে। আব্বু আমাকে কল দিচ্ছে ইচ্ছে মতো বকা দিয়েছে। ওর জন্য সকালে একবার ধমক খেলাম। একটু আগে আবার। বাসায় যাওয়ার পর নিশ্চয়ই আবার খাবো। কিন্তু বনু.. সে তো দিব্যি আছে।” বন্যা চাপা স্বরে বলল, ” অনেক রাত হয়েছে বাসায় যান। ” “যাব। তার আগে A লেখা টিশার্ট টা পুড়িয়ে তোমার মনের ভেতরের ক্ষোভ, অভিমান, কষ্টগুলো দূর করে নেই।” “কিছু পুড়াতে হবে না।” “পুড়াবো তো অবশ্যই। দেখো ব্যাগে করে টিশার্ট নিয়ে এসেছি।” হঠাৎ রাস্তার পাশ থেকে কেউ একজন বলে উঠলেন, ” আগেই বলেছিলাম, এই ছেলেকে বিয়ে করো না। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে

হবে। আমার কথা মানলে না। আজ যদি আমাকে বিয়ে করতে রাজি হতে তাহলে আমার মনে জায়গা পেতে। চায়ের দোকান তোমার নামে করে দিতাম। " তানভীর বন্যা দু'জনেই সেদিকে তাকালো। মোখলেস মিয়া এক বালতি পানি হাতে দাঁড়িয়ে আছে। তানভীর রাগে ফোঁস করে ওঠল। বন্যা তৎক্ষনাৎ তানভীরের হাত চেপে ধরে বলল, " রাগ দেখাবেন না, প্লিজ।" মোখলেস মিয়া আবার বললেন, " আমি এখনও তোমাকে ভালোবাসি। আমার মনের দরজা তোমার জন্য এখনও খুলা।" তানভীর রাগান্বিত কণ্ঠে বলল, " আমি কি দাদিকে খবর দিব? আমার বউয়ের দিকে কুনজর দিলে আপনার সংসারে আগুন জ্বালিয়ে দিব। ফায়ার সার্ভিসের ৩ টিম এসেও সে আগুন নেভাতে পারবে না। এই আমি বলে রাখলাম।" মোখলেস মিয়া হাসতে হাসতে বলছেন, " দাদিরে আর কওন লাগতো না। আমি যাইতাছি। চা খাইয়া যাইয়ো।" বন্যা তানভীরের দিকে তাকিয়ে বলল, " এত ভালোবাসেন আমাকে?" "জি।" "তবে A লেখা গেঞ্জি পড়লেন কেনো?" "আবার? এরপর থেকে যা কিনব সব তোমাকে সাথে নিয়ে কিনব। দরকার হয় অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখে নিব A অক্ষর আছে কি না!" বন্যা মুচকি হেসে বলল, " আমি মজা করেছি।" তানভীর গম্ভীর কণ্ঠে বলল, " কিন্তু আমি সিরিয়াস।" ★ রাত ১০ টা বেজে ২৬ মিনিট। মেঘ সদর দরজার কাছে পায়চারি করছে। মোজাম্মেল খান সোফায় বসে চা খাচ্ছেন। হঠাৎ আবির এসে দরোজায় দাঁড়াতেই মেঘ বলল, "কোথায় যাচ্ছেন?" আবিরের সহজসরল জবাব, " বাসায়।" মেঘ চাপা স্বরে

বলল, “বলেছি না, এই বাসায় আপনার প্রবেশ নিষিদ্ধ।” আবির চোখ ঘুরিয়ে মোজাম্মেল খানের দিকে এক নজর দেখলেন। পরপর মেঘের দিকে তাকিয়ে ঠাট্টার স্বরে বলল, “আমি আমার শ্বশুরবাড়িতে যাচ্ছি। এবার কিছু বলবেন?” মোজাম্মেল খান ভেতর থেকে ডাকলেন, ” আবির, ওখানে দাঁড়িয়ে আছো কেনো? ভেতরে আসো।” আবির মেঘের দিকে তাকিয়ে আলগোছে চোখ মারল। মুচকি হেসে বলল, ” শ্বশুরআব্বু ডাকছেন। আমি কি যাব?” মেঘ আর কথা বাড়াল না। ভেঙচি কেটে বিড়বিড় করতে করতে নিজের রুমে চলে গেল। মোজাম্মেল খান শান্ত গলায় বললেন, ” বসো।” আবির সঙ্গে সঙ্গে বসল। মৃদুস্বরে আওড়াল, ” চাচ্চু, আপনার শরীর কেমন এখন?” ” আছি আলহামদুলিল্লাহ। তুমি কেমন আছো?” “আলহামদুলিল্লাহ। খুব ভালো।” “কিন্তু দেখে তো মনে হচ্ছে না। মেঘের কি হয়েছে? সন্ধ্যা থেকে রেগে আছে। এত ডাকতাম পাঁচ মিনিট বসলোও না, কথাও বলল না। ঝামেলা হয়েছে কোনো?” ” না। তেমন কোনো সমস্যা নেই।” মোজাম্মেল খানের কণ্ঠস্বর গম্ভীর । বললেন, ” দেখো আবির, তোমার পাগলামির জন্য আমার মেয়েকে তোমার হাতে তুলে দিয়েছি। এখন তোমার জন্য যদি আমার মেয়ে কষ্ট পায় তাহলে এর ফল খুব খারাপ হবে।” আবির মাথা নিচু বলে বলল, ” আমার আচরণের কারণে মেঘ কখনও কষ্ট পাবে না, ইনশাআল্লাহ।” আলী আহমদ খান রুম থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে বললেন, ” কি ব্যাপার, আমার ছেলেকে একা পেয়ে তোর শাসন করা শুরু হয়ে গেল?” “শাসন

করছি না ভাইজান। সাবধান করছি। মেয়ে কিন্তু আমার একটায়।” আবির বিড়বিড় করতে করতে বলল, ” বউও আমার একটাই।” “কি বললে?” আবির থতমত খেয়ে বলল, ” এভাবে থ্রেট না দিয়ে আমাদের জন্য একটু দোয়া করবেন।” “আমি তোমাকে থ্রেট দিচ্ছি?” আলী আহমদ খান হাসতে হাসতে সোফায় এসে বসলেন। আবির অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে বলল, ” মুখ ফস্কে সত্যি কথা বেড়িয়ে গেছে, দুঃখিত।” ” কি?” আবির মৃদুস্বরে বলল, ” আমার সাথে রাগ দেখিয়ে লাভ নেই। আপনার মেয়ের সাথে চলতে চলতে আমিও ওর মতো হয়ে যাচ্ছি।” মোজাম্মেল খান হতাশ ভঙ্গিতে আলী আহমদ খানের দিকে চেয়ে বললেন, ” ভাইজান, ওঁরা বড়ো হবে কবে? ভেবেছিলাম আবিরের মনে হয় একটু বুদ্ধিসুদ্ধি হয়েছে। বিয়ে দিলে সংসারটা মনোযোগ দিয়ে করতে পারবে। আমি নানা হবো, আপনি দাদা। কতই না ভালো লাগবে। কিন্তু এঁদের লক্ষ্মণ তো ভালো না।” আবির মলিন চোখে তাকিয়ে আবারও বিড়বিড় করল, ” শ্বশুরআব্বু, আপনার মেয়েই এখনও বাবু। তাঁকে বাবু থেকে বাবুর মা বানানোটা আমার কাছে চতুর্থ বিশ্বযুদ্ধের সমতুল্য।” “কি হলো? বিড়বিড় করে কি বলো?” ” কিছু না।” মালিহা খান রান্নাঘর থেকে ডাকলেন, ” কিরে আবির, খাবি না?” “আসছি, আম্মু। ” আবির ঝটপট উঠে গেল। আব্বুর সামনে নিজের বাবা হওয়ার কথা শুনা সত্যিই লজ্জাজনক। যদিও সেই লজ্জাবোধ আবিরের একটু কমই আছে। আবির খাওয়াদাওয়া শেষ করে নিজের রুমে গেল। রুম অন্ধকার। আবির রুমের আলো জ্বালাতেই দেখল রুম

একদম ফাঁকা। কোথাও কারো অস্তিত্ব নেই। মেঘ মেঘ বলে কয়েকবার ডাকল। কিন্তু কোনো সাড়া নেই। ব্যালকনিতেও কেউ নেই। আবির চুপচাপ ফ্রেশ হতে গেল। মিনিট কয়েক পর একটা বালিশ নিয়ে রুম থেকে বেড়িয়ে সোজা মেঘের রুমে গিয়ে ঢুকল। মেঘ টেবিল ল্যাম্প জ্বালিয়ে বই পড়ছিল। আবির বিছানার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। বালিশটা বিছানায় রাখতেই মেঘ চমকে উঠল, "আপনি এখানে কেনো?" " ঘুমাতে এসেছি।" "আপনার রুম নেই?" আবির স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, " তখন না বললাম, আমি শ্বশুরবাড়িতে এসেছি। শ্বশুরবাড়িতে আসলে বউয়ের রুমে থাকব এটায় কি স্বাভাবিক না?" "থাকুন আপনি আপনার শ্বশুরবাড়িতে । আমিও আমার শ্বশুরবাড়ি চলে যাচ্ছি।" আবির মেঘের হাত ধরে থামিয়ে দিয়ে বলল, "এই না না। একদম না। রাত কয়টা বাজে দেখেছো? কোনো ভদ্রবাড়ির মেয়ে এত রাতে শ্বশুরবাড়িতে যায় না। তুমি বরং আগামীকাল সকালে যেও। কেমন?" মেঘ ভ্রু কুঁচকে বলল, "আপনি আসলেই একটা....." "কি? বলো.." "কিছু না।" মেঘ আবিরের হাত ছাড়িয়ে উঠে যেতে লাগল। আবির জিভ দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে মৃদু হেসে গান শুরু করল, "ও বউ.... তুমি আমায় কি ভালোবাসোনা?? ও বউ.... কেন আমার কাছে আসোনা??" আবিরের কণ্ঠে এমন গান শুনে মেঘ হাসি থামিয়ে রাখতে পারছে না। তবুও গুরুগম্ভীর ভাব নিয়ে তাকিয়ে আছে। আবির আবারও বলল, " ও বউ..... তুমি রাগটা কি কমাবে না? ও বউ..... একটুও কি হাসবে না?" এবার বার হাসি চেপে রাখতে পারল না। মেঘের হাসতে সময়

লাগলেও মেঘকে নিজের কাছে টেনে নিতে আবিরের এক মুহুর্ত সময় লাগে নি। এক টানে মেঘকে শুইয়ে দিয়েছে। আবিরের বাহুর উপর মেঘের মাথা। আবির মেঘের দিকে পাশ ঘুরে শুয়েছে। মেঘের কপালের উপর পড়ে থাকা এলোমেলো চুলগুলো আলতো হাতে ঠিক করে দিচ্ছে আবির। মেঘের দুচোখ বন্ধ, হৃৎস্পন্দন বাড়ছে। গলা শুকিয়ে আসছে। ঢোক গিলতে কষ্ট হচ্ছে। আবির অকস্মাৎ মেঘের লালচে গালে চুমু খেল। মেঘের শরীরের প্রতিটা কম্পন আবির উপলব্ধি করছে। হঠাৎ মেঘের কানের কাছে ঠোঁট এগিয়ে ডাকল, ” বউ...” মেঘ জবাব দিতে পারছে না। শরীর কাঁপছে। লজ্জায় চোখ খুলতে পারছে না। আবির আবার ডাকল, “ও বউ.....” “হু” আবির নরম স্বরে ফিসফিসিয়ে বলল, ” আমার শ্বশুরআব্বু এবং তোমার শ্বশুরআব্বু দু’জনের খুব ইচ্ছে নানা-দাদা হওয়ার। একটু আগেই আমাকে বলছিলেন। আমারও খুব ইচ্ছে আহিয়ার আব্বু হওয়ার। তোমার কি আহিয়ার আম্মু হতে ইচ্ছে করে না?”